

বিষয়-সূচী

সুভূতপ্রসাদ সেন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	২১০	উত্তাপ-প্রয়োগে চিকিৎসা—শ্রীরমেশচন্দ্র রায় ...	৪০৪
অতুল জাতিদের শিক্ষা ও স্ত্রীর রাজকেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	২২৫	উদারনৈতিক ও কংগ্রেসওয়াল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪০৮
অমৃগুহীত সম্প্রদায়ের কতিলাভ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬১৭	উপনিবেশস্থাপন না বীপচালান ? (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬২৪
অন্তপুরী (গল্প)—শ্রীসীতা দেবী ...	২১০	উদ্ভিলা (কবিতা)—শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৬৭৭
অবোধ—শ্রীশশধর রায় ...	৭২৩	এই কালো মেঘ (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ...	৪৭০
অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ (দেশ-বিদেশ) ...	৮২২	একজন জো-ছকুমের উক্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৬৩
অর্থহীন (কবিতা)—শ্রীহৃদীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী ...	৩৩৬	একটি ঘেয়ে (গল্প)—শ্রীজিৎজলাল জাহ্নভী ...	১২০
অধিনীর আদি—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ...	৬৬৪	কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্বাচন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৫৮
অসংযোগ, সত্যগ্রহ ও সন্তানবান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৪৮	কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অতীত ভূক্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৯২৮
অসংযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরাতন চিঠি ...	২৩২	কংগ্রেস ও কৌলিল প্রবেশ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪২৮
অস্পৃশ্যতা—শ্রীশশধর রায় ...	৮০২	কংগ্রেসের পাশ্বেকটোরী বোর্ড (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪২৯
অস্বামী নির্বাচনে স্বাভাবিকদের জয় চাই (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬১০	কংগ্রেস, প্রেস ও সন্তানবান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৪৮
আগ্রা-অধোধ্যায় আর্বাভিক শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৪৭	কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক ভাণ-বাটোয়ারা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬০৮
আদি মানব ও আদ্য মানব (সচিত্র)—শ্রীশরৎ চন্দ্র রায় ...	১১৭	কমলা রাজা শিলে, রাজকুমারী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৪৯
আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প (সচিত্র)—শ্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	৪২৭, ৬৪৫	কমলা নেহরুর কঠিন পীড়া (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৬৫
আমাদের শিক্ষা ও অঙ্গসম্প্রদায়—শ্রীযোগীশচন্দ্র সিংহ ...	৬৬৮	করাচীর হরিজনদের বাসগৃহ ও সন্ধ্যার সমিতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৬৬
“আমরা কথা রাগিয়াছি” (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৪৫	কলকাতা—শ্রীবসন্তকুমার দাস ...	৪১২
আমেরিকার প্রতি দেনবার ত্রিভুজ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৪৬	কলিকাতার নর্দমার নিঃসারণ স্থান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৪৩
আয়ুর্বেদের ইতিহাস—শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ...	১২৫	কলিকাতার মাহ যোগান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬২৪
আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান—শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ...	৩৪২	কলিকাতার মেমর নির্বাচন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৫৬, ৪৪৩, ৪৪০
আলোচনা ...	২০৩, ৩৩০, ৭০২, ২০৩	কাপুর স্পেশালে কান্ট্রীরের পথে (সচিত্র)—শ্রীহেমেন্দ্রমোহন রায় ...	২১২
আশা-নিরাশা (কবিতা)—শ্রীহৃদীরকুমার চৌধুরী ...	৩৬৩	কান্ট্রিতে বাড়ালী বালিকা-বিদ্যালয় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪২৪
আন্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মারক-সভা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৪৬	কান্ট্রিরাম দাসের শ্রুতি-সভা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৪১
আন্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্রহ্ম-মূর্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৪২	কাশেমার রাজী (সচিত্র)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ...	৬৫৩
দাস্যমে ও বহু জলপ্রাচীন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬২০	কাহার গ্রাহক বেশী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৫৩
দার্শনিক দুর্গতি মোচন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ যোষ ...	২০৭	কুড়িবাসের আবির্ভাবকাল (কষ্ট)—শ্রীললিতীকান্ত ভট্টশালী ...	২২
দাস্যমে জয়ের হার ও জয়স্বরোধ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬২০	কুড়ী প্রবাসী বাড়ালী (দেশ-বিদেশ) ...	৮১০
উত্তাপে হৃদয়চন্দ্র বহু ...	৪৪৭	“ক্যালকাটা ক্লিক” (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৫৫২
ইতিহাস একাত্মীয় অক-স্মারক (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৪৬	কান্ট্রিরামের ভাল প্রত্যাবর্তনের অস্বাভাবিক কাজ চাই (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৪৩
ইন্সপিরেশন কেবিন্যাল কোর্স (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৪৬	কুমারদাস চৌধুরী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৪৩

বহুব্রহ্মের নীতি—শ্রীমলিনীমোহন সান্যাল	৬৮১	জেল-বিশেষে চাষী জাতিদের সামাজিক ও নৈতিক	
সর্বত আরোহণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩৯	অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩৪
কৌশলিকা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১	জৈনধর্মের প্রাণশক্তি—শ্রীক্ষতিমোহন সেন	৬৩
কোকস অভয়ান (সচিত্র)—শ্রীবিমলেন্দু কন্ডাল	৭১০	ত্রিযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের “আপীল” (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২২
গব্যোন্ট ও কংগ্রেস (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৪	ঝাড়খণ্ডে কবীর ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির প্রভাব	
গাঙ্গোত্রীর আবার উপবাসের সঙ্কল্প (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৯	—শ্রীক্ষতিমোহন সেন	৭৭১
গীতা ও গীতাঞ্জলি—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৬৯৫	টিকটিক পুলিশের নির্ভরযোগ্যতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬২
গুজরাটের ও মেন্দিনীপুরের কৃষক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২২	টেলিভিশন (সচিত্র)—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ	৩৩৭
গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	২২৮	টোকেও বোম্ব মহাসম্মিলন (সচিত্র)	২০৭
চতুষ্কটি—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য	১৬৩	টোরীদের দ্বারা ভারতীয় লোকমত নির্ণয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৭
চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২৪	ভক্তারের ভায়েকীর ছোটো পাতা (গল্প)	
চরিত্রহীনতার জন্য পদচ্যুতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২৩	—শ্রীঅমিয় রায়চৌধুরী	৩৬০
চাকরী বাটোআরা ও মহারাগীর ঘোষণাপত্র			
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৫	ডুএল (গল্প)—শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী	১২০
চাকরী-বাটোআরা ও শিক্ষার উন্নতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৮	ঢাকার আনন্দ-আশ্রম (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২৫
চাকরী-বাটোআরা ও স্বাভাবিকদের কর্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৮	তহের সাধনা—শ্রীচতুর্হরণ চক্রবর্তী	৫৬৮
চাকরী-বাটোআরা করা এখন ভারত-গভর্নমেন্টের		তাহাকে বিশ্ব দেন না কেন ? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৫
অধিকার-বহিষ্কৃত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৯	তিব্বতে বিশ্বব না আর কিছু (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৮
চাকরী-বাটোআরার ওজুহাত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৪	তুর্ক নারীদিগের প্রগতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৬৯
চাকরী-বাটোআরার কারণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৪	তুরস্ক তুর্কদের জন্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩৯
চাকরীর সাম্প্রদায়িক বাটোআরার সমাজ ও রাষ্ট্রের		ত্রিপুরা সেবাসমিতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২৮৮
ক্ষতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৭	ত্রিমুক্তি শিব (দেশ-বিদেশ)	৮২১
চাকরী-বাটোআরার হেতুবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৬	দক্ষিণ-আফ্রিকা চন্দ্রবেশী শ্রেত স্বার্থপরতা	
চাটার্জি মুখার্জি বানার্জি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫০	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৪
চিত্র-পরিচয়	৩০৪	দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ফুটবল দলের প্রত্যাবর্তন	
চীনা তুর্কীস্থানে চীনাধিকার পুনঃস্থাপিত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২২	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৩
চেকের কথা—শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র	৫০৭	জুই বন্ধু (গল্প)—শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী	২২৯
চৈতন্য শঙ্করন নাথান, স্তর (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৩	ছুটি কথা (কবিতা)—শ্রীবি.রঙ্গ চক্রবর্তী	৪৫
ছোট ছোট শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১১	দুশমন (গল্প)—শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ	৭১৯
জমির স্বাধীনতার চিন্তাধারা বন্দোবস্ত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫০	দেওলী কাহাদের ভোটে কয়েম হইল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৬
জয় না পরাজয়—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ	৮২৬	দেওলী কয়েম হইল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৪৭
শ্রীযুক্ত জগদ্বর সেনের স্মৃতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২১	দেশ-বিদেশের কথা	
জাগ্রত রাশি ও মোরে (কবিতা)—শ্রীহরিধন		(সচিত্র)	১০৫, ২৮০, ৪১৯, ৫৯৮, ৭২২, ৮৮৯
মুখোপাধ্যায়	২৩৮	দেশবাসী ঝড় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৩
জাপানে, ভারতবর্ষে ও কৃষ্ণায় শিক্ষাবিস্তার		দেশী রাজাদিগকে স্বপদান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৮
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২২	দৃষ্টি-প্রদীপ (উপন্যাস)—শ্রীবিভূতিভূষণ	
জাপানকে স্বত্ব সুরবাহা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩৮	বন্দোপাধ্যায়	২০, ১৬৬, ৩১৬, ৪৮৬, ৬৩৫, ৮০৭
জাপানের ও ভারতবর্ষের বজেট (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৪৪	নন্দলাল বহু (কষ্টি) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২
জামশেদপুরের বাঙালী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২৪	নন্দলাল বহু ও তাহার চিত্রকলা (সচিত্র)	
জাতিনীতি অশান্তি ও হত্যাকাণ্ড (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২২	—শ্রীমণীভূষণ গুপ্ত	১৮৩
জাতিমির একটি বিশাল (সচিত্র)—শ্রীঅনাথনাথ বহু	৫৬০	নব-স্বরাজ্য দল ও পালেমেণ্টারী বোর্ড (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩০
জীবনবী (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬২৫	নাক্ষত্রিক জগৎ (সচিত্র)—শ্রীস্বকুমাররঞ্জন দাশ	৮০০
		নাবালকদের ধূমপান নিবারণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৬

নারায়ণী—শ্রীশান্তা দেবী	...	৭৭৫	প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার বাঙালী ছাত্র	...	২৯৬
নারীর উপর অত্যাচার কি বাড়িতেছে না ?	...	২০৪	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৭৬৭
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২০৪	প্রতুলচন্দ্র সোম (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২১২
নারীর উপর অত্যাচার বৃদ্ধি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২০৭	প্রদেশসমূহে শিক্ষার সরকারী ব্যয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	১৫৭
নারীদের উপর অত্যাচার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	১৫৮	প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের দোষ	...	৮২৮
নারীনিগ্র হর প্রতিকারে সামাজিক কর্তব্য	...	২১২	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮২৮
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২১২	প্রবাসীর চতুঃপাশে সংখ্যা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	১৫৬
নারীরহণাদি অপরাধ বৃদ্ধি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২১৭	প্রবাসীর শারদীয় সংখ্যাঘর (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২৮৮
নারীরহণ সংঘে ভাই পরমানন্দ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬২১	প্রথমনাথ বহু (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	১৬০
নিরুপদ্রব বা অহিংস জাইন লজ্জন ও কংগ্রেস	...	৮২১	প্রস্তাবিত স্বাভাৱিক দল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৫০৮
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮২১	প্রাচীন ভারতে বাস্তুতন্ত্রের দৃষ্টান্ত	...	৬২০
নিখিল ভারত নারী-সংমেলনের কলিকাতা শাখা	...	৬২১	—শ্রীপ্রমত্তকুমার আগাখা	...	১৫৪
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬২১	প্রাচীন ভারতে বাসস্থান নির্ধারণ পদ্ধতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	১৬১
হুলিয়া সমাজ (সচিত্র)—শ্রীনিখিলকুমার বহু	...	৮৬৪	প্রাচীন স্থাপত্য গ্রন্থ ‘মানসার’ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮২৫
নেপালে মহারাজা হইবার অধিকার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	১৫৪	প্রাণের ডাক (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৮২০
নোসেনাপতি টোগো (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮৪৫	প্রান্তর লক্ষ্য (কবিতা)—শ্রীশান্তা দেবী	...	৬২২
নৃত্যরতা ভারতী (সচিত্র)—শ্রীমতি মুখোপাধ্যায়	...	৮২৫	ফরিদপুরে ব্রতচারী বিদ্যালয় (দেশ-বিশেষ)	...	৬১৬
স্বর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তৃতাগুলি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮৪৮	ফিরিঙ্গিদের ও মুসলমানদের চাকরীর বণ্টন	...	৮১৫
পঞ্চশস্য (সচিত্র)	১০২, ২৫২		(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৫
পঞ্জাবে ও বঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	...	৮৪৭	ফিরিঙ্গী ও স্থায়ী বাসিন্দা ইউরোপীয়দের জগৎ	...	৮১৬
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮৪৭	চাকরীর বণ্টন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
পশ্চিম বৈশাখ (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ	...	২০	বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আয়ুক্তি ? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
ভট্টাচার্য	...	২০	বঙ্গীয় মহিলাদের কৌশল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
পাটের দর (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২২৬	বঙ্গে অবাঙালী এজেন্টদের (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
পাটিকা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৮৪২	বঙ্গে আর মন্ত্রী অনাবশ্যক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
পাণিনি-ব্যাকরণ ও সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভাব	...	৩০৭	বঙ্গে উচ্চশিক্ষা সংঘে সরকারী জগন্নাথ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	...	৩০৭	বঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থখরচ বিস্তার	...	৮১৬
পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২৮৫	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
পালেমেটোরী বোর্ডে নারীর অঙ্গতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮৪৪	বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সরকারী ব্যবস্থা	...	৮১৬
পুণ্য মহাশয়াজীর প্রতি (২) বোম্বা নিক্ষেপ	...	৬১২	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬১২	বঙ্গের গভর্ণরকে বখ করিবার চেষ্টা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
পুণ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়—শ্রীগীর্জাশেখর বহু	...	৮৫১	বঙ্গের নারীদের উপর অত্যাচার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
পুরুষিয়ার হরিপদ দা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬১১	বঙ্গের রাজস্ব ভারত-সরকারের লিহের ভাগ	...	৮১৬
পুরুষনা ভাগ্য (গল্প)—শ্রীগণেশনাথ মিত্র	...	৬৫২	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
পুত্রোহিত (গল্প)—শ্রীভাষাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫৪	বঙ্গের সংস্কার মূর্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
পুস্তক-পরিচয়	৪৬, ২২৬, ৩৪৬, ৬৭৮, ৮৪২		বর (গল্প)—শ্রীমোক্ষ বহু	...	৮১৬
পুজারিণী (গল্প)—শ্রীশর্পলতা চৌধুরী	...	৫২৭	বর-চুর—শ্রীসীতা দেবী	...	৮১৬
পূর্ণ স্বাধীনতা ও ডোম’নয়ন টেট স. বিবিধ প্রসঙ্গ	...	৮০৮	ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
পূর্ণবীর বৃহদ্রথ জঙ্ক (সচিত্র)—শ্রীশর্পলতা বহু	...	৮৬৭	ব্যাকিং-জগতে বাঙালীর স্থান—শ্রীমলিনীকান্ত সরকার	...	৮১৬
পেট খেলে পিঠে নয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬১৪	ব্রজেননাথনাথ আচার্য চৌধুরী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
পোয়ে নৃত্য (সচিত্র)	...	২২	ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও তত্ত্বাবধান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬
	...	২২	ব্রিটেন ও বঙ্গে উচ্চ শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮১৬

বলীদীপে অষ্টোষ্টিক্রিয়া—শ্রীবিমলেন্দু কয়াল	৩৭২	ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা—শ্রীঅম্বাচরণ	
বহির্জগৎ (সচিত্র)	৫২০, ৭৩২, ২০৪	বিভাজ্যষণ	৫১০
বাংলা-সাহিত্যে মহাকাব্য—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	৭৮৬	ভারতে রাষ্ট্রনীতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬০৫
বাংলার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	২৪১	ভারি জল—শ্রীচাক্ষুঃ ভট্টাচার্য্য	৪৮১
বাংলার যুগশিল্প ও কুস্তকার জাতি—শ্রী—	৮১৭	ভারতীয় সামরিক অফিসারদের ক্ষমতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৭
বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা		ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংখ্যাবৃদ্ধি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৭
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২৩	ভুবনেশ্বর (সচিত্র)—শ্রীনির্মলকুমার বসু	৩৫
বালিকাদিগকে সাতার শিক্ষা দেওয়া (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪০	ভূদেব মুখোপাধ্যায় (সচিত্র)— শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ	৫৮৪
বাণবৈদ্যায় অবৈতনিক আবৃত্তিক শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২৭	ভূষণা (গল্প)—শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য	২০৪
বিদেশভ্রমণ দ্বারা শিক্ষার্থী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২০	ভোলানাথ দত্তের কাগজের ব্যবসা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৫
বিধবার সজ্জা (গল্প)—শ্রীশান্তা দেবী	৫৫০	ভূদেব স্মৃতি-সভা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪০
বিনা-বিচারে বন্দী বুদ্ধিমান যুবকবৃন্দ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩৩	“মন্ত্রব মাত্রাশার বাংলা”—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৩
বিনা-বিচারে বন্দীদের শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪২২	মন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অস্বামী পদোন্নতি	
বিপরীত (গল্প)—শ্রীসীতা দেবী	৭৩	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২০
বিপিনবিহারী ঘোষ, স্ত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪০	মন্ত্রি ও শাসনপরিষদের সভাস্ত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০১
বিবাগী (গল্প)—শ্রীবন্দনা দেবী	৩৩১	মণিপুরী নৃত্য-উৎসবের চিত্র (সচিত্র)	
বিনা বিচারে স্বাধী ভাবে বন্দী রাখিবার ফন্দি		—শ্রীললিতাকুমার ভদ্র	৭২৬
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২৩	মনের গহনে—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী	৮৭৮
বিমানচালক চাণ্ডাল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৩	মনোরাজের কাহিনী—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	১২৪
বিরহী (কবিতা)—শ্রীশান্তি পাল	৭০৯	“মন্তব্যযুগ” শৈবসম্মানী—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৫
বিলাতে সামরিক শিক্ষায় বাঙালী বালক (দেশ-বিদেশ)	৮৮২	মন্ত্রপথে (গল্প)—শ্রীস্বপ্নাতা চৌধুরী	৩২০
বিভারতীয় বর্ষা-উৎসব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫৭	মদ্যাল সর্প (সচিত্র)—শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু	৩৭০
বিহারের আক ও বজের পাট (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৩	মহাত্মা গান্ধীর উপবাস শেষ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫৬
বুদ্ধদেবের স্মারক সভা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৫	মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতা আগমন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২৮৭
বুলগেরিয়ায় রক্তপাতহীন বিপ্লব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৮	মহাত্মাজী বঙ্গ স্বাগত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৯
বুলবুলের প্রেতি (কবিতা)—কামিনী রায়	১২৪	মহাত্মা গান্ধীর ভ্রমণরীতি পরিবর্তন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২০
বেকার অবস্থা ও সম্মানবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৪	মহিলা ‘বেদতীর্থ’ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২০৯
বেকারদের ক্ষত্র বিলাতী ব্যয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬০	মহিলা-সংবাদ (সচিত্র) ১০৪, ২৬৪, ৩৭৭, ৫৮৮, ৭৩০, ৮৬৬	
বেকার সমস্যা ও শিক্ষাসঙ্কোচন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫১	মহেন্দ্রলাল সরকারের জাতীয়তা-প্রীতি	
বেকারের সম্বন্ধে বড়লাটের মন্তব্য এবং বঙ্গীয়		—শ্রীনেত্রজনাথ বসু	৫৮৫
ঐষ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৬	ম্যাডাম কুরী (সচিত্র)—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও	
বেগম সাহেবের নথ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১২	শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী	৫৮০
বেথুন কলেজ ও বঙ্গ নারীশিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২১	মাদাম ক্যুরি—শ্রীশিরীষকুমার মিত্র	৫৮৪
বৈপ্লবিক অপরাধের দ্বাস (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২৩	মাস্ত্রাজ শিল্পপ্রদর্শনী (সচিত্র)	২৫৬
বোধনা নিকেতন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২১	মাস্ত্রাজীরা কি কি বই পড়ে ? (কষ্টি)	২৩
বোধাইয়ের ধর্মঘট (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০২	মাস্ত্রাজ শহরে ঘনবসতি ; কলিকাতায় ?	
বৌদ্ধধর্মে কর্ম ও জন্মান্তরবাদ—শ্রীরাধাগোবিন্দ		(বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৩
বসাক	১৭৫	মাসিক কাগজের সমালোচনা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৪
ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালী—শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী	৫৩৫	মাইকেলের জন্ম-তারিখ—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭১
ভারতবর্ষে বিদেশী চাল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২৩	মিস মেয়ারের আবার ভারত-ভ্রমণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২১
‘জবজী’ বরণা কলমের কারখানা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২৮৫	মীনাজার—শ্রীকালিকারঞ্জন কায়ুনগো	৫৪৬
		মৌরী কহে বিনা প্রেম সে—শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ	৬০২

বিষয়-সূচী

মুক্তি (উপন্যাস)—শ্রীআশালতা দেবী	৮৫, ২৫২, ৩৫৭, ৫৭৩, ৭০৩, ৮৪৬	শারদীয় অবকাশে কর্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
মুসলমানদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা চাই (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৮	শ্রামল-রাণী (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	
মুনশী ঈশ্বর শরণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪০০	শ্রামাদাস বাচস্পতি, কবিরাজ-শিরোমণি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১০
মুহুর্তের মূল্য (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৪১	শিল্পকলাপ্রদর্শনী (দেশ-বিদেশ)	৮২১
মেঘদূত (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	২৭৩	শিকার আমেরিকার 'নিগ্রো' ও ভারতবর্ষের 'আর্ধ্য' (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৬
মেঘনাদ সাহা সম্বন্ধে অমূলক গুণ্ডব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩৮	শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের স্থান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২১৩
মোদনীপুর জেলা কংগ্রেসকক্ষী সম্মেলন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪২	শিক্ষাবিভাগের ভার কে পাইবেন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০২
মেদিনীপুরে সিপাহী প্রভুতির বিরুদ্ধে অভিযোগ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৩	শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে দেশের লোকদের কর্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫৪
মৈথিলী সাহিত্য-পরিষৎ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৩	শিক্ষাব্যয়ের ছাত্রদত্ত অংশ বঙ্গে অধিকতম (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২১৩
মৌদিক জ্ঞানির সেন্সস নাই (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৫	শিশু-সাহিত্য—শ্রীঅনাথনাথ বসু	২৪৭
ম্যাডেম মেরিয়া মটেশরীকে আহ্বান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২৪	শেষের কবিতার লাবণ্য—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	৮৩৮
যক্ষ (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৬২	যেতপত্র দুঃখমন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাটোআরা? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০০
যক্ষানিবারক সভায় রমেশ মিত্র আরেক ফণ্ডের দান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৮	গ্রীষ্টের বঙ্গভুক্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৮
যাত্রাওয়ালা মুকুন্দ দাস (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪২	স্পষ্টকথা (কবিতা)—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী	৯০৪
যুদ্ধ 'গ্রীষ্টধর্মসঙ্গত' এবং সভ্যতাপাদক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩২	সংবাদপত্র-পরিচালনে বাড়ালী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫১
রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫৭	সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সাহায্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২৭
রবীন্দ্রনাথ ও সিংহল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৪	সঙ্গীত কণ্ঠের তালিকা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২২
রবীন্দ্রনাথের পত্র	৫৪৫	সঙ্গীতসন্যাসবাদের উত্তরের কারণ ও প্রতিকার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৪৮
রাজনারায়ণ বসুর দেওঘরস্থিত বাটী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪১	সঙ্গীতসনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪২
রাজস্ব সম্বন্ধে বঙ্গের প্রতি অবিচার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২০২	সঙ্গীতসনবাদ বিনাশের উপায় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩৬
রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্ত্রী—শ্রীসত্যপ্রিয় বসু	৮২	সঙ্গীতসন্যাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারী অভিযান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩৪
রাতের দান (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬২৬	সর্বজাতীয় মানবিকতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫২
রাম ও বালী—শ্রীরজনীকান্ত গুহ	১৪	সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের সরকারী শিক্ষা ব্যয় শুধু লগুনের চেয়ে কম (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২১৬
রামনের অবদানপরম্পরা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৩	“সরকারী কর্মচারীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধান না” (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৪
রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৬	সরলা (কবিতা)—শ্রীশৈলবালা দেবী	৪০০
রুচিরা (কবিতা)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	৬৩৩	স্বল্পমূল্য ও আকাশযুদ্ধ শিক্ষার্থী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৫
রূপকার (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০৫	স্পোর্টসম্যান (গল্প)—শ্রীনির্মলকুমার রায়	৬৭১
লগুনের পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৫৬	“স্বদেশ হিতৈষণার একচেটিয়া” (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৫
লাইব্রেরী পরিচালন বিধা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৮	স্বরলিপি—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ	৮৮৬
লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অবসরগ্রহণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫১	স্বরাজ্যলাভার্থ আইনলঙ্ঘনপ্রচেষ্টা স্থগিত রাখিবার কারণ বিবৃতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৪৬
লুই প্রান্তর ও তাঁহার গবেষণা (সচিত্র)—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী	৪২, ৩২৪, ৮২০	স্বরাজ্য দলের পুনরুজ্জীবন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৪১
লেখকের বিচার (গল্প)—শ্রীমঞ্জলাল বসু	৪৫২	স্বাধীনতার দ্বারদেশে (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৩
শঙ্কুস্তম্ভ দেবীর বৃত্তিলাভ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৭	সাধনা (গল্প)—শ্রীসত্যপ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি-এসসি	৫১৪
শব্দ-প্রসঙ্গ—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য	৫২১	সামুয়েল সগাসের লক্ষ টাকার দান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৭
শবরীর প্রতীক্ষা (কবিতা)—শ্রীবিপা দেবী	৮৫৫		
শরৎ চন্দ্র চৌধুরী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২৩		

স্বয়ং সামুদ্রিক হোরের উপভোগ্য বক্তৃত্য	...	৪৩১	স্বয়ং-চন্দ্র রায়, অধ্যাপক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪৪২
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪৩১	সেনহাটীর মহিলাদেও পুণ্যকীৰ্ত্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৩০৪
সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোআরার প্রত্যাশিত ফল	...	২৯০	সেনহাটী মহিলা-সমিতির সংবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬২১
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২৯০	সৈয়দুল সম্বন্ধে সরকারী প্রবন্ধ	...	১৫৩
সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬০৬	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	১৫৩
সাহিত্যতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪	সোভিয়েট রাশিয়ায় নারীর স্থান—শ্রীশশধর সিংহ	...	৪০২
সাহিত্যের তাৎপৰ্য্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬২৭	শ্রোতবদল—শ্রীপাকুল দেবী	...	৭২৬
সারদা আইনকে ফাঁকি দেওয়া (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬২৩	হরিন্দাস হালদার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪৪৬
সাহিত্যে প্রাদেশিকতা—শ্রী অমিনাশচন্দ্র মজুমদার	...	৭৪৫	হরিন্দন বসু সম্বন্ধে দলিত হুম্মার সমিতির পত্র	...	৪৪৩
সাহিত্য ও সমাজ—শ্রী অমরুপা দেবী	...	৪২৪	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪৪৩
সিংহলের চিত্র (সচিত্র)—শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	...	২৮	হিংস্র (গল্প) শ্রীনির্মলকুমার রায়	...	৩৪৫
সিংহলে রবীন্দ্রনাথ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪৪৭	হিংস্রবর্ণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৭৬৭
সুনামগঞ্জের কয়েকটি ছাত্রের চুঃখ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৭৬৪	হিন্দু বিশ্ববাদের প্রতি সমাজের কর্তব্য	...	৬২০
স্বভাষচন্দ্র বহুর নতন পুস্তক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬২৪	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬২০

চিত্র-সূচী

অতুলপ্রসাদ সেন	...	২১১	—কিছু-জাতীয় কল্পা	...	১০২
অমরুপা রায়—বরণ নৃত্য	...	২০০	—চিন্তাময়	...	৬৪৮
অপরেণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৪২৪	—তিন-কল্পা	...	৫০৪
অভিশপ্ত (রঙীন)—শ্রী রামগোপাল বিজয়বর্গী	...	৩২২	—নিগোহকল্পার মুখ	...	৪২২
অমল্যকুমার ভৌমিক	...	৭৩৫	—নিগোহ মেঘে	...	৫০০
অমলা নন্দী—নৃত্য	...	৮২২	—নিগোহ যুবকের মুখ	...	৫০১, ৫০৩
অমৃত কাউর	...	৭৩১	—পক্ষী-শিকার	...	৪২৮
আদি মানব	...	১২৩	—পিতল মূৰ্ত্তি	...	৬৪৬
—আধুনিক অষ্টেলিয়ার আদিম-নিবাসীর কঙ্কাল	...	১২৩	—বাকুবা জগতির রাজার মূৰ্ত্তি	...	৬৪৬
—নতন প্রস্তর-যুগের মানুষদের কাল্পনিক ছবি	...	১২৩	—বৈদ্য-যোদ্ধা	...	৫০০
—নিম্নাণ্ডারথাল মানবের কঙ্কাল	...	১২৩	—বৈদ্য-রাজ	...	৫০০
—রোডেসিয়ান মানব	...	১২২	—বুদ্ধা	...	৬৪২
—স্পেনদেশে প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষদের কাল্পনিক ছবি	...	১২১	—মাতৃমূৰ্ত্তি	...	৬৪৭
—মাতৃমূৰ্ত্তি	...	১২১	—মুখের মুখ	...	৫০২
—মুখের মুখ	...	১২১	—শুদ্ধদেবতার কাঠময় মুখ	...	৬৪২
—শুদ্ধদেবতার কাঠময় মুখ	...	১২১	—হাতীর পাঁজের কৌটী	...	৪২২, ৫০১
—হাতীর পাঁজের কৌটী	...	১২১	—হাতীর পাঁজের কৌটী	...	৪২২, ৫০১
—আফ্রিকার মানচিত্র	...	৫০৮	—আফ্রিকার হাউসা জাতি	...	২৬২
—ইউরোপীয় যোদ্ধা	...	৫০৪	—আমোনা খাতুন	...	১০৪
—কল্পার মুখ	...	৪২৮	—আন্তোনিও মুখোপাধ্যায়ের ত্রুষ্ণ-মূৰ্ত্তি	...	১৪২
—কাঠের মূৰ্ত্তির অংশ	...	৫০৩	—ইউরোপ-যাত্রী মহিলাবদল	...	৩৭৮
—কাঠময় দেবতার মুখ	...	৬৫০	—ইউরোপে স্বভাষচন্দ্র	...	৪৪০
—কাঠময় দেবী বা জীমূৰ্ত্তি	...	৬৫১	—উৎসর্গ (রঙীন)—শ্রীকিরণময় ধর	...	২০০
—কাঠময় পানপাত্র	...	৬৫২	—উৎসর্গ (রঙীন)—শ্রীকিরণময় ধর	...	২০০

চিত্র-সূচী

উদযশস্কর

ওভেন্‌ভালড বিদ্যালয়, জামশেদী

—অভিনয়ের দৃশ্য

—একটি ক্লাস

—ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের দৃশ্য

—ছেলে-এ খেলার জায়গা করিতেছে

—ছেলেদের ব্যায়াম

—বিদ্যালয়ের তিনটি শিশু

—যাত্রাগারে একটি বালক

কটল ফিশ

কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ

কমলা রাজা শিল্প

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির

করাত মাছ

কাশেশ্বর যাত্রী

—কাশেশ্বর মহাপরিনির্বাণ স্তূপ

—দাহ-স্তূপ

কাম্বীরের পথে

—আমিরাকদল সেতু

—খিলমতটস্থ বারামুলা শহর

—ডল-হ্রদের একাংশ

—দোমেল নামক স্থানে সেতুর দৃশ্য

পু। তন রাজপ্রাসাদ

—ভাসমান নৌগৃহ

—মারি শহরের বাজার

—রাজপথ, শ্রীনগর

কুরী, ম্যাডাম

—পীক্ষাগারে ম্যাডাম কুরী

—কুরী, পেরী

কোকস্‌ অভয়ান

—ইন্কা কাংকিরের খোদিত স্বর্ণমূর্তি

—ইনকাদের স্বর্ণময় পাত্র

—ওয়েফার উপসাগর

—ওয়েফার উপসাগরের উপকূলভাগ

—কমাণ্ডার উরসলে

—কোকস্‌ দীপের মানচিত্র

—গুপ্তধনের অহুসন্ধান

—সোনার ঢাল

স্বার্থ (রডীন)—শ্রীদীপ্তনাথ মুখোপাধ্যায়

গেহেব, পল

চন্দ্রাবতী লখন পাল

চিংড়ি মাছ

... ৮০৭

... ৭৬৪

... ৭৬১

... ৭৬৭

... ৭৭২

... ৭৬৩

... ৭৬৫

... ৭৬৬

... ৭৬৪

৮৭৩, ৮৭৪

... ১০৮

... ১৪২

... ২৭২

... ১০৫

... ৮৭২

... ৬৪৪

... ৬৪৫

... ২২২

... ২২০

... ২২৫

... ২২১

... ২৩২

... ২২৩

... ২১২

... ২২১

... ৫৮১

... ৫৮৩

... ৫৮২

... ৭১৪

... ৭১৭

... ৭১৩

... ৭১৩

... ৭১৭

... ৭১৮

... ৭১৫

... ৭১৬

... ২৪৮

... ৫৬৭

... ২৬৪

... ৮৭৫

জয়ন্তী নৈখাম বায়জী

জাপানের আদর্শ উদ্যান রচনা

জাপানের কীড়াবৃত্ত

জাপানের মহিলা-প্রগতি

জায়াগীর নাংসি-নলে বিপ্লব

জেনার

টেলিভিশন

উলকিন

ড্রেসডেনে ভারতীয়দের প্রত্নতত্ত্ব

তলোয়ার মাছ

তিমি উকুন

তিমি - গ্রীণলাণ্ডের

তিমি হস্তাঙ্কি

তৈল তিমি

তৈলতিমি—ভোঁতাযুখে

হুই বোন (রডীন) - শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা

বেবেজনাথ ভাটুড়ী

নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

নন্দলাল বহুর চিত্র

—কুহুর ছানা

—গজ

—চিত্রকর

—ছাগলখানা

—বানরগুহা

—শান্তিনিকেতনের গজলেখক

—হরিণ

—সাঁওতাল জননী

নলিনীরজন সরকার

নাঃ ডিফেল, ফ্লোরেন্স

নাক্ষত্রিক জগৎ

—কাসিওপিয়া, স্বাতি ইত্যাদি

—কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ

—ঋষভারা ও কাসিওপিয়া

—লুপক, কালপুরুষ, রোহিণী

—সপ্তর্ষি নক্ষত্রপুঞ্জ

নার্কাল

নি বদন (রডীন)—শ্রীমদীপ্রশান্ত রায় চৌধুরী

নিশীথে (রডীন)—শ্রীকালীকঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

নীল ফুল (রডীন)—শ্রীকিরণ ধর

নীলিমা দত্ত

হুলিয়া জাতি

—অমিকুণ্ডের চারিদিকে নৃত্য

—হুই জন হুলিয়া

... ৭৩১

... ২৬১

... ৭৪৪

... ১০৬

... ৩২৫

... ৩৪৭

... ৮৬২

... ৪৪০

... ৮৭২

... ৮৭৫

... ৮৮৮

... ৮৭৬

... ৮৬৮

... ৮৭০

... ৫৭৬

... ৮২৮

... ৮২৮

... ১৮৫

... ১৮২

... ১৮৭

... ১৮৮

... ১৮৬

... ১৮২

... ১৮৮

... ১৮৬

... ৫২২

... ৫১

... ৮০১

... ৮০২

... ৮০৩

... ৮০৪

... ৮০৫

... ৮৭০

... ৪২৬

... ৫৪৪

... ৬৬৫

... ৩৭৭

... ৪৬৫

... ৪৬৬

হুগলি	...	৪৬২	বিগাখী (রঙীন)—শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্তী	...	৭৬২
—ভালা	...	৪৬২	বৈশাখী-সন্ধ্যাসী	...	৪১২, ৪২০
—শ্রীভকাল বাবহুত বড় নৌকা	...	৪৬৮	বৌদ্ধ মহাসম্মিলন, টোকাও	...	২০৭, ২০৮
—সমুদ্রে জাল ফেলা	...	৪৬৭	বাঙ্গাচিত্র	...	১০০-০২
নৃত্য—নটরাজ	...	২০১	ব্রতচারী বিদ্যালয়, ফরিদপুর	...	৮২০
—নর্ত্তনী	...	৮২৮	ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়গণ, দক্ষিণ-অ ফ্রিকাস	...	৬০০
—পরিবাহিত ভঙ্গী	...	৮২৬	ভুবনেশ্বর	...	৮২০
—প্রণয়	...	৮২৬	—কুপের মধ্যে প্রাপ্ত বুদ্ধমুষ্টি	...	৫২
—ভ্রমবী ভঙ্গী	...	৮২৫	—কুপের মধ্যে প্রাপ্ত জৈনমুষ্টি	...	৬৮
—রাস-নৃত্যে রাধাকৃষ্ণ	...	২০১	—চিন্তাশ্রিতা নারী	...	৬৬
—সাগতাল নৃত্য	...	৮২৮	—ভাস্করের মন্দির	...	৩৭
পল্লী-গৃহ	...	৩৩০	—ভাস্করের মন্দির	...	৫৮
পালালাল শ্রীল বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকগণ ও প্রবাসীর	...	২৮৬	—মন্দিরদ্বারে প্রাচীন অলঙ্কার	...	৩৬
সম্পাদক	...	২৮৬	—মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দিরগায়ে মৃষ্টিশ্রেণী	...	৩২
পূর্বাঙ্গ (রঙীন) শ্রীশোভনগঙ্গা গেল্লাট	...	১	—পাথরের বেষ্টিত অংশ	...	৩২
পোলা মেগ্রী ও উদয়গঙ্গার	...	২৬৩	—বেষ্টিত গায়ে প্রাচীন মৃষ্টি	...	৪০
প্রকৃতি দেবী	...	৫৮৮	—রামেশ্বরের নিকট স্তম্ভশীর্ষ	...	৩৮
পাষণপুরীর পুতুল (রঙীন)—শ্রীম্বেদপ্রসাদ	...	৬২৫	—যৌবনে ভূদেব	...	৩৮৫
রাম চৌধুরী	...	৬২৫	—প্রোচে ভূদেব	...	৩৮৭
পুষ্করবরণ ঘোষ	...	৭৩৫	ভূপেশচন্দ্র কর্মকার	...	১০৭
পোয়ে নৃত্য	...	২২	ভোক্তার য্যাগন	...	১৩২
প্রবাসী বাঙালীর নববর্ষোৎসব	...	২৮৪	মণিপুরের নৃত্য-উৎসবের চিত্র	...	৭২২
প্রমথনাথ বসু	...	২৮৮	‘মন্তময়ুর’ শৈব সন্ন্যাসী	...	২৭১
প্রভাময়ী ঝিঞ	...	৭৩০	—গুপ্তী এসানের শিবমন্দির	...	২৬৭
বর্ধানৃত্য (রঙীন)—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ গুপ্ত	...	৩০৫	—কামকন্দলা নটীর মন্দির	...	২৭০
বলীদীপে অন্তোষ্টিক্রিয়া	...	৩৮২	—প্রবোধশিবের মন্দির	...	২৬৮
—গরীবদিগের জন্ম নিশ্চিত শবাধার	...	৩৮৩	—মন্তময়ুর সম্প্রদায়ের মঠ	...	২৬৬
—বেদী লইয়া যাওয়া হইতেছে	...	৩৮১	—যুবরাজদের নিশ্চিত মন্দিরের তোরণদ্বার	...	২৬৬
—বেদী এবং শবাধার	...	৩৭২	—লক্ষ্মণদাগর	...	২৬৬
—বৌদ্ধ ভিক্ষুণী	...	৩৮০	—হরগৌরীর মৃষ্টি	...	২৬৭
—মহিলাগণ অর্ঘ্যবহন করিতেছেন	...	৩৭২	মহাল সর্প	...	৩৭৬
—‘মেক’ বা সাংকেতিক পর্কত	...	৩৮১	—আক্রমণোদ্ভূত “বোয়া কনষ্ট্রিক্টর”	...	৩৭৫
—শবদেহ বহনকারিগণ	...	৩৮২	—আমেরিকান মহাল	...	৩৭১
—শবদেহ বহন উপর স্থাপন করা হইতেছে	...	৩৮০	—মহালসর্পী অঙ্গতাপ প্রাঙ্গণ করিতেছে	...	৩৭৩
—স্বপ্নজ্ঞতা শোভাযাত্রাকারিগণ	...	২৭২	—মহাল শাবক বিশ্রাম লইতেছে	...	২৮৭
বাংলার পল্লী	...	৮১৮	মহাস্মা গাঙ্গী	...	৭৩১
বাংলার যুগ্মচিত্র	...	৮১৯	মহিলা-বিখ্যাবিদ্যালয়ের কনভোকেশন	...	৫৮৭
—ইন্দ্রনভা	...	৮১৭	মহাকৈল সরকার	...	৪৭১
—গণেশ-মৃষ্টি	...	৮১৭	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	...	৮০
—বুদ্ধমুষ্টি	...	৮১৭	মহাকৈল গায়ত্রী (রঙীন)—শ্রীনরেন্দ্র মল্লিক	...	১২০
—যমুনামুষ্টি	...	২৮৩	মাগন (রঙীন) শ্রীইন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	...	২৫৭, ২৫৮
বিদেশে রুতী বাঙালী ছাত্র	...	৫৮৮	মাক্সাজ শিল্প-প্রদর্শনীর চিত্র	...	২৫২
বিশিনী জাগামিয়া	...		মাটিন লুথার	...	

মোহাঃ ডান স্পেটিং দল	...	৫৯৮	শব্দক	...	৮৭৫
মিলন (রঙীন) শ্রীঃ গোপাল বিজয়বর্গী	...	৮৪৮	শাস্তময়ী বালিকা-বিদ্যালয়	...	৭৩৩
মূলগঙ্ঘ নরসিংহ	৭৩৫, ৭৩৬		আমানাশ বাচস্পতি, কাবরাজ-শিগোমণি	...	৫৩৭
মেন্সকোর পরামিড	...	১৫৯	শিব, ত্রিমূর্তি	...	৮৯১
মেন্সকো-ব লক	...	১৪০	শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনী (রঙীন)		
মেটিজো রমণী	...	১৪০	শ্রীশোভনমল গেহলোট	...	৮০৮
মেরী স্টেপ্ত	...	৩২৭	শুকতরু (রঙীন)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৭০৪
মোরগ, দ ঘ লেজবিশিষ্ট	...	২২০	শুকতরু	...	৮৭৫
যতীন্দ্রমোহন (সনগুপ্ত)	...	৭৩২	খেতভল্লুক	...	৮৭২
যক্ষপত্নী (রঙীন)—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	...	৪৪৯	শৈলেন্দ্রমোহন দাস	...	৪২৪
যাদবপুর যক্ষ-চিকিৎসালয়	৪২১, ৪২২, ৪২৩		সঙ্ঘাশ্রমীপ (রঙীন)—শ্রীন্দ্রলাল বসু	...	৮৮৮
রবীন্দ্রনাথ ও পল গেহেব	...	৫৬২	সমুদ্র-শাসন (রঙীন)—শ্রীশরদিন্দু সন রায়	...	১৬১
— ভাংসী বরণ-কলম কারখানায় রবীন্দ্রনাথ	...	২৮৫	সাপ্তাহী (রঙীন)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৩১২
— সিংহলে রবীন্দ্রনাথ	...	৪৩২	সিংহল চিত্র		
রমা বসু	...	১০৪	— দেবনামপিয় তিস্রসএর মূর্তি, মিহিনতাল	৩০, ৩৫	
রবকোয়াল	...	৮৬৯	— নাগপোকুন, মিহিনতাল	...	৩২
রাক্ষপুত-নারী	...	২৬৪	— বোধিবৃক্ষ (অম্বু ধাপুর)	২৯, ৩৪	
রাভেন্সাথ মুখোপাধ্যায়, স্ত্র	...	৮৩	— মহাসেয়া দাগেব, মিহিনতাল	...	২৯
রামনাথ বিদ্যাস ও শৈলেন্দ্র দে	...	৬০০	— মিহিনতালের একটি গুহা	...	৩১
রামপুরের নবাবের বেগম সাহেবা	...	৫৮৯	— মিহিনতালের সিঁড়ি	...	৩০
কাক্সগীঃ কেশোর দত্তরায়	...	১০৬	— মিহিনতাল হইতে বাহিরের দৃশ্য	...	৩৩
বইতা নাজমুদ্দিন	...	৩৭৭	— সিংহপোকুন, মিহিনতাল	...	৩৪
লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, স্ত্র	...	৩০৪	সিংহলে মন্ডে ও সন্ধ্যা দেবনামপিয় তিস্রস (রঙীন)		
লিষ্টার, বোশেক	...	৫২	— শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	...	৩২
লুই পাস্তুর			সীতাবাসী মোরে	...	৭৩০
— গবেষণাগারে পাস্তুর	...	৪৯	সেনহাটীর মহিলাবৃন্দ	...	৫৮৯
— পাস্তুরের মূর্তি	...	৮২১	হর-পার্বতী	...	৩২৩
— রাখালবালক	...	৮২৪	হরিপদ দা	...	৭৩৩
— দোরবেণে পাস্তুরের মূর্তি	...	৮২৩	হরিপদ সাহিত্য মন্দির	...	৭৩৩
শকুন্তলা দেবী	...	৯১০	হালফ্যানের স্বাধীনতা ।	...	২৪৬
শক্তিসাধনায় বাঙালী	...	১০৭	ছসেন, এম. এ. (হিলা)	...	৮৬৬

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

শ্রীমজিতকুমার মুখোপাধ্যায়— নৃত্যবৃত্ত ভাষ্য	...	৮৯৫	শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ— মীরা কহে বিনা প্রেম সে...	...	৬৭২
শ্রীঅনাথনাথ বসু— শিশুসাহিত্য	...	২৪৭	শ্রীগিরীজশেখর বসু— পুরাণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়	...	৪৫১
জাফর শীর একটি বিদ্যালয় (সচিত্র)	...	৫৬০	শ্রীসারকচন্দ্র ভট্টাচার্য— ভারি জল	...	৪৮১
শ্রীঅমরুপা দেবী— সাহিত্য ও সমাজ	...	৫২৪	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী— তত্ত্বের সাধনা	...	৫৬৮
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার— সাহিত্য প্রাদেশিকতা	...	৭৪৫	শ্রীভারতেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়— পুরোহিত (গল্প)	...	৫৪
শ্রীঅমরকুমার ঘোষ— ভূশমন (গল্প)	...	৭১২	শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী— ব্রহ্মপ্রবাসী বাড়ালী	...	৫৩৫
শ্রীঅমর রায় চৌধুরী— ডাক্তারের ভাইয়ের দুটো পাতা (গল্প)	...	৩৬৮	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভারদ্বাজ— একটি মেয়ে (গল্প)	...	১২০
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ— জম, না পাওয়া	...	৮২৬	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু— ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জাতীয়তা-প্রীতি	...	৫৮৫
শ্রীঅমৃতচন্দ্র বিনোদকৃষ্ণ— ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা	...	৫১০	শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী— কৃতিবাসনের আবির্ভাব-কাল (কাহিনী)	...	২২
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্তী— উদ্ভাস (কবিতা)	...	৬৭৭	শ্রীনলিনীকুমার ভট্ট— মণিপুরী নৃত্য-উৎসবের চিত্র (সচিত্র)	...	৭২৬
শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু— মহাল সর্প (সচিত্র)	...	৩৭০	শ্রীনলিনীমোহন সাত্তাল— কুরল বা তিরুবল্লুরের নীতি	...	৬৮১
পৃথিবীর বৃহত্তম জন্তু (সচিত্র)	...	৮৬৭	শ্রীনলিনীব্রজেন সৎকর— ব্যক্তি-জগতে বাড়ালীর স্থান	...	১৩২
শ্রীশাশালতা দেবী— মুক্তি (উপন্যাস) ৮৫, ২৫২, ৩৫৭, ৫৭৩, ৭০৩, ৮৪৬	...	৮২৫	শ্রীনির্মলকুমার বসু— ভুবনেশ্বর (সচিত্র)	...	৩৫
শ্রীসত্যজিৎ সাহা— প্রান্তর-লক্ষ্মী (কবিতা)	...	৮২৫	ভুলিয়া সমাজ (সচিত্র)	...	৪৬৪
শ্রীকান্দিলাল গাঙ্গুলী— ছুই বন্ধু (গল্প)	...	২২২	শ্রীনির্মলকুমার রায়— হিংস্র (গল্প)	...	৩৪৫
ডুগল (গল্প)	...	৬২০	স্পোর্টসম্যান (গল্প)	...	৬৭১
কা'মনী রায়— বু'বুলের প্রতি (কবিতা)	...	১২৪	শ্রীপারুল দেবী— স্রোত-বদল	...	৭২৬
শ্রীকালিকারঞ্জন কাহ্ননগো— মীনাবাজার	...	৫৪৬	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী লুই পাস্তুর ও তাঁহার গবেষণা (সচিত্র) ৪২, ৩২৪, ৮২০	...	৫৮০
শ্রীকবিতামোহন সেন— কৈনিকের প্রাণশক্তি	...	৬৩	ম্যাডাম কুরী (সচিত্র)	...	৫৮০
ঝাড়খণ্ডে কবীর ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির প্রভাব	৭৭১		শ্রীপ্রমথনাথ রায়-চৌধুরী— স্পষ্ট কথা (কবিতা)	...	২০৪
শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র— পুরুষ ভাগ্য (গল্প)	...	৬৫২	শ্রীপ্রমথনাথ আচার্য— প্রাচীন ভারতে বাসগৃহের দিও নির্বাচন	...	৫৩৮

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেব— বাংলা-সাহিত্যে মহাকাব্য	...	৭৮৬	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী— এই কোনো মেঘ (কবিতা)	...	৪৭০
শ্রীমন্দনা দেবী— বিবাহী (গল্প)	...	৩৩১	শ্রীযোগীচন্দ্র সিংহ— আমাদের শিক্ষা ও অন্ন-সমস্যা	...	৬৬৮
শ্রীবদন্তকুমার দাস— কলঙ্ক-মোচন (গল্প)	...	৪১২	শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র— চেকের কথা	...	৪০৭
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার— কচিরা (কবিতা)	...	৬৬৩	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি— অখিনার আদি	...	৬৬৪
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়— মনে রা জাও কাহিনী	...	১২৪	শ্রীবজ্রনীকান্ত গুহ— বাম ও বালী	...	১৪
গীতা ও গীতাঞ্জলি	...	৬২১	শ্রীরমা প্রসাদ চন্দ— ভূবৈব মূখোপাধায় (সচিত্র)	...	৩৮৪
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য— চতুষ্কটি	...	১৬৩	শ্রীবিশ্বচন্দ্র রায়— উদ্ভাপ-প্রয়োগে চিকিৎসা	...	৪০৪
পাণিনি-ব্যাকরণ ও সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভাব	...	৩০৭	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— কৈশোরিকা (কবিতা)	...	১
শব্দপ্রবন্ধ	...	৪২১	সাহিত্যতত্ত্ব	...	৪
শ্রীবত্ৰ তত্বব বন্দ্যোপাধ্যায়— দৃষ্টি-প্রদীপ (উপন্যাস) ২০, ১৬৬, ৩১৬, ৪৮৬, ৬৩৫, ৮০৭	...	২৭৩	নন্দাঙ্গ বসু (কষ্টি)	...	২১
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়— মেঘদূত (গল্প)	...	২৭৩	মজুমদার-মাস্তোয়ার বাংলা	...	১০৩
শ্রামল রাণী (গল্প)	...	১৭২	প্রাণের ডাক (কবিতা)	...	১৬১
কাশেমার বাহা (সচিত্র)	...	৬১০	রূপকার (কবিতা)	...	৩০৫
শ্রীবিমলেন্দু কল্যাণ— বলী-দীপে অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়া (সচিত্র)	...	৩৭২	পাঠিকা (কবিতা)	...	৪৪২
কোকস্ অভিব্যাস (সচিত্র)	...	৭১০	জীবনগী (কবিতা)	...	৬২৫
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য— ভূষণ	...	২০৪	রাতের দান (কবিতা)	...	৬২৬
শ্রীবাণী দেবী— শবরীও প্রতীকা (কবিতা)	...	৮১৫	সাহিত্যের তাৎ-ব্য	...	৬২৭
শ্রীবিবেক চন্দ্র ভৌ— ছুটি কথা (কবিতা)	...	৪৫	যক্ষ (কবিতা)	...	৭১২
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— মাৎসকেনের জন্মতারণ	...	৪৭১	লগুনের পত্র	...	৮৫৬
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ— টোলভসন (সচিত্র)	...	৩৩৭	রাণা-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়— “১ ত্ত্ব-যুব” শব্দ-সম্মান	...	২৬৫
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ গুপ্ত— সিংহলের চিত্র (সচিত্র)	...	২৮	শ্রীরাধাচরণ বিদ্য বসাক— বৌদ্ধধর্মের কথ্য ও জ্ঞানান্তরবাদ	...	১৭৫
আচার্য্য নন্দলাল বসু ও তাঁহার চিত্রকলা (সচিত্র)	...	১৮৩	শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়— মহুস্তের মূর্তি (গল্প)	...	৪১
শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু— লেখকের বিচার (গল্প)	...	৪১২	শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়— আদি মানব ও আসল মানব (সচিত্র)	...	১১৭
শ্রী নোজ বসু— বর (গল্প)	...	১০২	শ্রীশশধর রায়— অস্পৃশ্যতা	...	৩০২
			অবোধ	...	৭২৩
			শ্রীশশধর সিংহ	...	৪০২
			গোভিন্দেট রাশিয়ান নারীর স্থান	...	৪০২

শ্রীশাস্তা দেবী—	অনুপূর্ণা (গল্প)	... ২১০
নবরামণী (গল্প)	... ৭৭৫ বর-চুরি	... ৮৫৮
বিধবার সজ্জা (গল্প)	... ৫৫০ শ্রীস্বকুমার রঞ্জন দাশ—	
শ্রীশাস্ত্র পাল—	লাক্ষ্যদ্রক ভগৎ (সচিত্র)	... ৮০০
বি হা কবিতা)	... ৭০২ শ্রীস্বধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী—	
শ্রীশাস্ত্রদেব ঘোষ—	অর্থহীন (কবিতা)	... ৩৩৬
স্বর্গ-পি	... ৮৮৬ শ্রীস্বধীরকুমার চৌধুরী—	
শ্রীশিবকুমার মিত্র —	আশা-বি. রাশা (কবিতা)	... ৩৬৩
হাদান ক্যারি	... ৫৮৪ শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—	
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—	আফ্রিকা-নিগো-শিল্প (সচিত্র)	৪২৭, ৩৪৫
যে যের কবিতার লাবণ্য	... ৮৬৮ শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত —	
শ্রীশৈলবা দেবী—	আয়ুর্কেতের ইতিহাস	... ২৫
সর-পা (কবিতা)	... ৪০০ আয়ুর্কেদ-বিজ্ঞান	... ৩৪২
শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—	শ্রীস্বর্নলা চৌধুরী—	
পাঁচশে বৈশাখ (কবিতা)	... ২০ মরুপথে (গল্প)	... ৫২০
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—	পূজারগী	... ৫২৭
সামনা (গল্প)	... ৫১৪ শ্রীস্বদেব মুখোপাধ্যায়—	
শ্রীসত্যপ্রিয় বসু —	জাগত রাশিগণ সেরে (কবিতা)	... ২৫৮
স্বর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	... ৮২ শ্রী স্বরেন্দ্রনাথ ঘোষ—	
শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী—	আর্থিক দুর্গতি : মামল	... ২৩
১২নং গহনে	... ৮৭৮ বাংলার জমিদারী ব্যাঙ্ক	... ২৪১
শ্রীসীতা দেবী—	শ্রীস্বদেশেন্দ্রনাথ রায় —	
বিপর্যাস (গল্প)	... ৭৩ কাপুর স্পেশালে কাম্বীরের পথে (সচিত্র)	... ২১২

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নাথ্যাস্তা বলহীনেন সভাঃ”

৩৪শ ভাগ

১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৪১

১ম সংখ্যা

কৈশোরিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে কৈশোরের প্রিয়া,

ভোরবেলাকার আলোক-আধার-মাথা

চলেছিলে তুমি আশ্রয়-আশ্রয়

মোর জীবনের ঘন বনপথ দিয়া।

ভায়ায় ভায়ায় আমি ফিরিতাম একা,

দেখি দেখি করি শুধু হায়ছিল দেখা

চকিত পায়ের চলার উসারাত্মি।

চলের গন্ধে ফলের গন্ধে মিলে

পিছে পিছে তব বাতাসে চিহ্ন দিলে

বাসনার রেখা চাঁদে ॥

প্রভাত উঠিল কুটি'

অরুণ রাঙিমা দিগন্তে গেল ঘুচে,

শিশিরের কণা কঁড়ি হ'তে গেল মুছে,

গাঢ়িল কুণ্ডে কপোত-কপোতী ভটি,

ছায়াবীথি হ'তে বাহিরে আসিলে ধীরে

ভরা জোয়ারের উকল নদীতীরে,

প্রাণ-করোলে মুখের পরিবাটে।

আমি কহিলাম, “সময় হয়েছে, চলো,
তরুণ রৌদ্র জলে করে ঝলমলো,
নৌকা রয়েছে ঘাটে ॥”

স্রোতে চলে তরা ভাসি’ ।
সে তরা আমার চিরজীবনের স্মৃতি :
দিনরজনীর সুখের দুখের গীতি
কানায় কানায় ভরা তাহে রাশি রাশি ।
পেনব প্রাণের প্রথম পসরা নিয়ে
সে তরায় পূরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,
পাশাপাশি সেথা খেয়েছি চেউয়ের দোলা ।
কখনো বা কথা কয়েছিলে কানে কানে,
কখনো বা মুখে ছলোচ্ছিলো ছ-নয়ানে
চয়েছিলে ভাষা ভাষা ॥

বাতাস লাগিল পালে
ভাঁটার বেলায় তরা যবে যায় থেমে,
অচেনা পুনিনে কবে গিয়েছিলে নেমে,
মলিন ছায়ায় ধূসর গোষ্ঠীকালে ।
ফিরে এলে যবে অভিনব সাজে সাজি’
ডালিতে আনিলে নতুন কুসুমরাজি,
নয়নে আনিলে নতুন চেনার হাসি ।
কোন সাগরের অর্ধার জোয়ার লেগে
আবার নদার নাড়ি নেচে ওঠে বেগে,
আরবার ঘাই ভাসি’ ॥

তুমি ভেসে চলো সাথে ।
চিররূপখানি নবরূপে আসে প্রাণে :
নানা পরশের মাধুরার মাঝখানে
তোমারি সে হাত মিলেছে আমার হাতে ।

গোপন গভীর রহস্তে অবিরত
 ঋতুতে ঋতুতে স্নরের ফসল কত
 ফলায়ে তুলেছ বিস্মিত মোর গীতে ।
 শুকতারা তব কয়েছিল যে কথারে
 সন্ধ্যার আলো সোনায়ে গলায় তারে
 সন্ধ্যার পূর্ববীতে ॥

চিনি নাহি চিনি তবু ।
 প্রতি দিবসের সংসারমাঝে তুমি
 স্পর্শ করিয়া আছ যে-মর্ত্যভূমি
 তার আবরণ খ'সে পড়ে যদি কভু
 তখন তোমার মূর্তি দীপ্তিমতী
 প্রকাশ করিবে আপন অমরাবতী,
 সকল কালের বিরহের মহাকাশে ।
 তাহারি বেদনা কত কীর্তির স্তূপে
 উচ্ছিত হয়ে ওঠে অসংখ্য রূপে
 পুরুষের ইতিহাসে ॥

হে কৈশোরের প্রিয়া,
 এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে
 কোন্ পার হ'তে এনে দিলে মোর পারে
 অনাদি যুগের চির মানবীর তিয়া ।
 দেশের কালের অতীত যে মহা দূর,
 তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর,
 বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে ।
 অসীমের দূতী ভরে এনেছিলে ডালা
 পরাতে আমারে নন্দন ফুলমালা
 অপূর্ব গৌরবে ॥

সাহিত্যতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি আছি এবং আর সমস্ত আছে আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই মূল মিলন। আমার বাইরে কিছুই যদি অসুভব না করি তবে নিজেকেও অসুভব করিনে। বাইরের অসুভূতি যত প্রবল হয় অস্তরের সত্তাবোধও তত জোর পায়।

আমি আছি এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেই জ্ঞান যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ। বাইরের যে-কোনো জিনিষের 'পরে' আমি উদাদীন থাকতে পারিনে, যাতে আমার ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ যা আমার চেতনাকে জাগিয়ে রাখে সে যতই তুচ্ছ হোক তাতেই মন হয় খুশী, তা সে হোক না ঘুড়ি-গুড়ানো হোক না লাটিম-ঘোরানো। কেন-না, সেই আগ্রহের আঘাতে আপনাকেই অত্যন্ত অসুভব করি।

আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র করে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্ব্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা এক্ষেত্রে হ'লে মানুষকে মন-মরা করে।

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হ'ব, নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। এ'কেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য্য সেই তার বহুলক্ষে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রূপে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারি প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি'—এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।

একলা কারাগারের বন্দীর আর কোনো পীড়ন যদি নাও থাকে তবু আবছায়া হয়ে আসে তার আপনার বোধ, সে যেন নেই-ইত্তরার কাছাকাছি আসে। আমি আছি এবং না-আমি আছে এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি করে চলছে; অস্তর বাহিরের এই

সম্মিলনের বাধায় আমার আপন-সৃষ্টিকে ক্লেশ বা বিরক্ত করে দিলে নিরানন্দ ঘটা।

এইখানে তর্ক উঠতে পারে যে, আমার সঙ্গে না-আমির মিলনে দুঃখেরও তো উদ্ভব হয়। তা হতে পারে। কিন্তু এটা মনে রাখা চাই যে, সুখেরই বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়; বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অসুভূতি। কথাটা শুনে স্বতোবিরুদ্ধ কিন্তু সত্য। যা হোক এ 'আলোসনাট' আপাতত থাক, পরে হবে।

আমাদের জানা দু-রকমের, জানে জানা আর অসুভব জানা। অসুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অসুভব কিছুর অসুপারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয় অস্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রূপে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অসুভব করা। সেই জ্ঞানে উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ। অসুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অস্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা। প্রতিদিনের ব্যবহারিক ব্যাপারে ছোট ছোট ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রসারণকে অবরুদ্ধ করে, মনকে বেঁধে রাখে বৈষয়িক সঙ্কীর্ণতায়, প্রয়োজনের সংসারটা আমাদের আপনকে ঘিরে রাখে কড়া পাহারায়; অপরোধের নিত্য অভ্যাসের জড়তায় ভুলে যায় যে, নিছক বিষয়ী মানুষ অত্যন্তই কম মানুষ,—সে প্রয়োজনের কাঁচি-ছাঁটা মানুষ।

প্রয়োজনের দাবি প্রবল এক তা অসংখ্য। কেন-না

যতটা আয়োজন আমাদের জরুরি তা আপন পরিমাণ রক্ষা করে না। অভাব মোচন হয়ে গেলেও তৃপ্তিহীন কামনা হাত পেতে থাকে, সফরের ভিড় জমে, সন্ধানের বিশ্রাম থাকে না। সংসারের সকল বিভাগেই এই যে চাই-চাইয়ের হাট বসে গেছে, এরই আশপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোজে যেখানে তার মন বলে চাইনে, অর্থাৎ এমন কিছু চাইনে যেটা লাগে সক্ষে। তাই দেখতে পাই প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত করে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশি। তার গোরব সেখানে, ঐশ্বর্য সেখানে, যেখানে সে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে।

বস: বাহ্যিক, বিপুল সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়যুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার পোনার-কাঠি-ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনায়ই সত্য। তার সেই অহুতবে অর্থাৎ আপনায়ই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ-দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অস্ত্র কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানিনে।

লোকে বলে সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্যের আনন্দ। সে কথা বিচার করে দেখবার ব্যাঘ্য। সৌন্দর্য-রহস্যকে বিশ্লেষণ করে বাখা। করবার অসাধ্য চেষ্টা করব না। অহুত্বের বাইরে দেখতে পাই সৌন্দর্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থ্যৎ ক্যাক্টসকে অধিকার করে আছে। সেগুলি হৃন্দরও নয় অহৃন্দরও নয়। গোলাপের আছে বিশেষ আকার আয়তনের কতকগুলি পাপড়ি বেঁটা, তাকে ঘিরে আছে সবুজ পাতা। এই সমস্তকে নিয়ে বিরাজ করে এই সমস্তের অতীত একটি ঐক্যত্ব, তাকে বলি সৌন্দর্য। সেই ঐক্য উন্মোচিত করে তাকেই, যে আমার অন্তরতম ঐক্য, যে আমার ব্যক্তি-পুঙ্খ। অহৃন্দর সামগ্রীরও প্রকাশ আছে, সেও একটা সমগ্রতা, একটা ঐক্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বস্তুকপী তথ্যটাই মুখ্য, ঐক্যটা গৌণ। গোলাপের আকারে আয়তনে তার হৃদয় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্য বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে, সেইজন্মে গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে হৃন্দর।

কিন্তু শুধু হৃন্দর কেন, যে-কোনো পদার্থই আপন তথ্যমাত্রকে অতিক্রম করে সে আমার কাছে তেমনি সত্য

হয় যেমন সত্য আমি নিজে। আমি নিজেও সেই পদার্থ যা বহু তথ্যকে আবৃত করে অখণ্ড এক।

উচ্চ অঙ্গের গণিতের মধ্যে যে একটি গভীর সৌম্য, যে একটি ঐক্যরূপ আছে, নিঃসন্দেহ গাণিতিক তার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। তার সামঞ্জস্যের তথ্যটি শুধু জানের নয়, তা নিবিড় অহুত্বের; তাতে বিপুল আনন্দ। কারণ জানের যে উচ্চ শিখরে তার প্রকাশ সেখানে সে সর্বপ্রকার প্রয়োজননিরপেক্ষ, সেখানে জানের মুক্তি। এ কেন কাব্য-সাহিত্যের বিষয় হয়নি এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। হয়নি যে তার কারণ এটাই যে, এর অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকের মধ্যে বহু, এ সর্বসাধারণের অগোচর। যে ভাষার যোগে এর পরিচয় সম্ভব তা পারিভাষিক বহুলোকের হৃদয়বোধের স্পর্শের দ্বারা সে সজীব উপাদানরূপে গড়ে ওঠেনি। যে-ভাষা হৃদয়ের মধ্যে অব্যবহিত আবেগে প্রবেশ করতে পারে না সে ভাষায় সাহিত্যরসের সাহিত্যরূপের সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ আধুনিক কাব্যে সাহিত্যে কলকারখানা স্থান নিতে আরম্ভ করেছে। যত্নের বিশেষ প্রয়োজনগত তথ্যকে ছাড়িয়ে তার একটা বিরাট শক্তিরূপ আমাদের কল্পনায় প্রকাশ পেতে পারে, সে আপন অহুত্বিত হৃদয়িত হৃদয়তিকে অবলম্বন করে আপন উপাদানকে ছাড়িয়ে আবির্ভূত। কল্পনাদৃষ্টিতে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গভীরে যেন তার একটি আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। সেই আত্মস্বরূপ আমাদেরই ব্যক্তিস্বরূপের দোসর। যে মানুষ তাকে যান্ত্রিক জানের দ্বারা নয় অহুত্বিত দ্বারা একান্ত বোধ করে সে তার মধ্যে আপনাকে পায়, কলের জাহাজের কাপ্তেন কলের জাহাজের অহুতবে যেমন পরম অহুত্বকে আপন-ব্যক্তিপুঙ্খকে অহুত্ব করতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচন বা দোষাত্মকের উদ্ভবন তত্ত্ব এ জগতের নয়। এ সব তত্ত্ব জানার দ্বারা নিকাম আনন্দ হয় না তা নয়। কিন্তু সে আনন্দ হওয়ার আনন্দ নয়, তা পাওয়ার আনন্দ; অর্থাৎ এই জ্ঞান জানীর থেকে পৃথক, এ তার ব্যক্তিগত সত্যের অন্দর মহলের জিনিষ নয়, ভাণ্ডারের জিনিষ।

আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে বলেছে বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। সৌন্দর্যের রস আছে, কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যরসের সঙ্গে

সকল রসেরই মিল হচ্ছে এখানে, যেখানে সে আমাদের অহুভূতির সামগ্রী। অহুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।

বস্তুর ভিত্তির একান্ত আধিপত্যকে লাঘব করতে লেগেছে মায়ায়। সে আপন অহুভূতির জন্তে অবকাশ রচনা করেছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। ঘড়ায় ক'রে সে জল আনে, এই জল আনায় তার নিভা প্রয়োজন। অগত্যা বস্তুর দৌরাণ্য তাকে কাঁখে ক'রে মাথায় ক'রে বইতেই হয়। প্রয়োজনের শাসনই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে তা হ'লে ঘড়া হয় আমাদের অনাস্থ্য। মায়া তাকে হৃদয় ক'রে গড়ে তুলে। জল বহনের জন্য সৌন্দর্যের কোনো অর্থই নেই। কিন্তু এই শিল্পসৌন্দর্য প্রয়োজনের রূঢ়তার চারিদিকে ফাঁকা এনে দিলে। যে ঘড়াকে দায়ে পড়ে মেনেছিলেম, নিলেম তাকে আপন ক'রে। মায়াবের ইতিহাসে আদিম যুগ থেকেই এই চেষ্টা। প্রয়োজনের দ্বিনয়কে সে অপ্রয়োজনের মূল্য দেয় শিল্পকলার সাহায্যে, বস্তুকে পরিণত করে বস্তুর অতীতে। সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রায়শ্লোকে যেখানে দায় নেই, তার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া, তার ধানরূপটাই সত্য, যেখানে মায়া আপনাতে সমস্ত আত্মসাৎ করে আছে

কিন্তু বস্তুকে দায়ে পড়ে মেনে নিয়ে তার কাছে মাথা হেঁট করা কাকে বলে যদি দেখতে চাও তবে ঐ দেখো কেরোসিনের টিনে ঘটস্থাপনা; নীকের দুই প্রান্তে টিনের কানেক্টা বেঁধে জল আনা। এতে অভাবের কাছেই মায়াবের একান্ত পরাভব। যে-মায়াব হৃদয় ক'রে ঘড়া বানিয়েছে সে-ব্যক্তি তাড়াতাড়ি জলপিপাসাকেই মেনে নেয় নি, সে যথেষ্ট সময় নিয়েছে নিজের ব্যক্তিকে মানতে।

বস্তুর পৃথিবী ধুলোমাটি পাথর লোহা ঠাসা হয়ে পিণ্ডীকৃত। বায়ুমণ্ডল তার চারদিকে বিরাট অবকাশ বিস্তার করেছে। এরই পরে তার আত্মপ্রকাশের ভূমিকা। এইখান থেকে প্রাণের নিবাস বহমান; সেই প্রাণ অনির্বচনীয়। সেই প্রাণ-শিল্পকারের তুলি এইখান থেকেই আলো নিয়ে

রং নিয়ে তাপ নিয়ে চলমান চিত্রে বার-বার ভরে দিচ্ছে পৃথিবীর পট। এইখানে পৃথিবীর লীলার দিক, এইখানে তার সৃষ্টি, এইখানে তার সেই ব্যক্তিরূপের প্রকাশ, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না, যার মধ্যে তার বাণী, তার ব্যাখ্যা, তার রস, তার শ্রামলতা, তার হিজোল। মায়াবও নানা জরুরি কাজের দায় পেরিয়ে চায় আপন আকাশমণ্ডল, যেখানে তার অবকাশ, যেখানে বিনা প্রয়োজনের লীলায় আপন সৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশই তার চরম লক্ষ্য, যে-সৃষ্টিতে জ্ঞান নয় পাণ্ডা নয় কেবল হওয়া। পূর্বেই বলেছি অহুভব মানেই হওয়া। বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্বল হয়ে ওঠে। আমাদের হৃদয়বোধের কাজ আছে জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে। আমরা আত্মরক্ষা করি, শত্রু হনন করি, সন্তান পালন করি, আমাদের হৃদয়বৃত্তি সেই সকল কাজে বেগ সঞ্চার করে, অভিকর্ষি জগায়। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে জন্তুর সঙ্গে মায়াবের প্রভেদ নেই। প্রভেদ ঘটেছে সেইখানেই যেখানে মায়াব আপন হৃদয়স্রোতকে কণ্ঠের দায় থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে বহমান সঙ্গ সৃষ্টি করে দেয়, যেখানে অহুভূতির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য, যেখানে আপন অহুভূতিকে প্রকাশ করবার প্রেরণায় ফললাভের অত্যাবশ্যবৃত্তাকে সে বিদূত হয়ে যায়। এই মায়াবই যুদ্ধ করবার উপলক্ষ্যে কেবল অন্তর্জালনা করে না, গৃহের বাসিন্দা বাজায়, গৃহের নাচ নাচে। তার হিংস্রতা যখন নিদারুণ ব্যবসায় প্রস্তুত তখনও সেই হিংস্রতার অহুভূতিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে অন্যবস্তুরূপে দেয়। হৃত সেটা তার সিঁহলাভে ব্যাঘাত করতেও পারে। শুধু নিজের সৃষ্টিতে নয় বিশ্বসৃষ্টিতে সে আপন অহুভূতির প্রান্তিক খুঁজে বেড়ায়। তার ভালবাসা কেরে ফুলের বনে, তার ভক্তি তীর্থযাত্রা করতে বেরায় দাগর-সঙ্ঘমে গুরুত্বশিখরে। সে আপন ব্যক্তিরূপের দোদরকে পায় বস্তুতে নয়, তথ্যে নয়। লীলাময়কে সে পায় আকাশ যেখানে নীল, শ্রামল যেখানে নবদরীয়া। ফুলে যেখানে সৌন্দর্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবের প্রতি যেখানে আছে বরণা, ভূমার প্রতি যেখান আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সঘর্ষের চিরন্তন যোগ অহুভব

করি হুদয়ে। এঁকেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সভ্য হয়েছে আমার আপন।

যেখানে আমরা এই আপনকে প্রকাশের জন্য উৎসুক, যেখানে আমরা আপনের মধ্যে অপরিমিতকে উপলব্ধি করি সেখানে আমরা অমিতব্যয়ী, কী অর্থের কী সামর্থ্যে। যেখানে অর্থকে চাই অর্জন করতে, সেখানে প্রত্যেক সিন্ধি পয়সার হিসাব নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি; যেখানে সম্পদকে চাই প্রকাশ করতে সেখানে নিজেই দেখতে দেউলে করে দিতেও সক্ষম নেই। কেন-না সেখানে সম্পদের প্রকাশে আপন ব্যক্তিগতবোধেরই প্রকাশ। বস্তুত, আমি ধনী এই কথাটি উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করার মত ধন পৃথিবীতে কারও নেই। শত্রুর হাত থেকে প্রাণরক্ষা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন দেহের প্রত্যেক চাল প্রত্যেক ভঙ্গী সম্বন্ধে নিরতিশয় সাবধান হতে হয়, কিন্তু যখন নিজের সাহসিকতা প্রকাশই উদ্দেশ্য তখন নিজের প্রাণপাত পথান্ত সম্ভব, কেন-না এই প্রকাশে ব্যক্তিগতবোধের প্রকাশ। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমরা খরচ করি বিবেচনাপূর্বক, উৎসবের সময় যখন আপনার আনন্দকে প্রকাশ করি, তখন তহবিলের সীমিততা সম্বন্ধে বিবেচনামূলক বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ যখন আমরা আপন ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে প্রবলরূপে সচেতন হই, সাময়িক তথাকথালোকে তখন গণাই করিনে। সাধারণত বাস্তবের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পরিমাণ রক্ষা করেই চলি। কিন্তু যাকে ভালবাসি অথবা যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতবোধের পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে না। তার সম্বন্ধে অনাম্যদেই বলতে পারি—

জনম অবধি হুম রূপ নেহারছ নয়ন না তিরপিত ভেল,

লাখ লাখ ঝুগ দিয়ে দিয়ে রাখছ তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তথ্যের দিক থেকে এত বড় অদ্ভুত অভ্যুত্থি আর কিছু হ'তে পারে না, কিন্তু ব্যক্তিগতবোধের অস্বাভাবিকতার মধ্যে কখনো কখনো সীমায় সংহত হ'তে পারে চিরকাল। “পাখান মিলিয়ে যায় লায়ের বাতানে” বস্তুজগতে এ কথাটা অসম্ভব, কিন্তু ব্যক্তি-জগতে তথ্যের ব্যতিক্রমের এর চেয়ে কম ক'রে বা বলতে হাট না সভ্য পৌছয় না।

বিশ্বদৃষ্টিতেও তাই। সেখানে বস্তু বা জাগতিক শক্তির তথ্য হিসাবে কড়াকড়ির এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

কিন্তু সৌন্দর্য তথ্যসীমা ছাপিয়ে ওঠে, তার হিসাবের আদর্শ নেই পরিমাণ নেই।

উচ্চ আকাশের বায়ুস্তরে ভাসমান বাষ্পপুঞ্জ একটা সামান্য তথ্য কিন্তু উদয়ান্তকালের সূর্যরশ্মির স্পর্শে তার মধ্যে যে অপরূপ বর্ণালীর বিকাশ হয় সে অসামান্য, সে “ধূমকোটি-সলিলমল্লতাং সন্নিপাতঃ” মাত্র নয়, সে যেন প্রকৃতির একটা অদারণ অভ্যুত্থি, একটা পরিমিত বস্তুগত সংবাদ-বিশেষকে সে যেন একটা অপরিমিত অনির্কটনীয়তায় পরিণত ক'রে দেয়। ভাষার মধ্যেও যখন প্রবল অস্বাভাবিকতার সংঘাত লাগে তখন তা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করে।

এই জগতে সে যখন বলে “চরণনখের পড়ি দল চাঁদ কাঁদে” তখন তাকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতে পারিনে। এই জগত সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথভাবে আটের বেদীর উপরে চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কেন-না আটের প্রকাশকে সভ্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিচক তথ্য তা নয় না। তাকে যতই ঠিকঠাক করে বলা যাক না, শব্দের নির্বাচনে ভাষার ভঙ্গীতে চন্দের ইস্যারাদ এমন কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে যায় যেটা অতিশয়। তথ্যের জগতে ব্যক্তিস্বরূপ হচ্ছে সেই অতিশয়। কেজো ব্যবহারের সঙ্গে সৌজন্যের প্রভেদ ঐখানে; কেজো ব্যবহারে হিসেব করা কাজের তাগিদ, সৌজন্যে আছে সেই অতিশয় বা ব্যক্তিগতবোধের মহিমার ভাষা।

প্রাচীন গ্রীসের প্রাচীন রোমের সভ্যতা গেছে অতীতে বিলীন হয়ে। যখন বেঁচে ছিল তাদের বিস্তার ছিল বৈশ্বিকতার দায়। প্রয়োজনগুলি ছিল নিরেট নিবিড় গুরুভার, প্রবল উদ্বেগ প্রবল উদ্ভাব ছিল তাদের বেইন করে। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। কেবল এমন সব সামগ্রী আজও আছে, যাদের ভার ছিল না, বস্তু ছিল না, দায় ছিল না, সৌজন্যের অভ্যুত্থি দিয়ে সমস্ত দেশ যাদের অভ্যর্থনা করেছে; যেমন করে আমরা সন্তানবোধের পরিভূষি সাধন করি রাজতন্ত্রবতীর নামের আদিত পিচটা শ্রী যোগ করে। দেশ তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল অতিশয়ের চূড়ায়, সেই নিম্নভূমির সমতল-ক্ষেত্রে নয় যেখানে প্রাত্যহিক ব্যবহারের ভিড়। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের যে পরিচয় চিরকালের দৃষ্টিপাত নয়, পাথরের

রেখার শেষের ভাষায় তারি সন্দ্বন্ধনাকে স্থায়ী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।

যা কেবলমাত্র স্থানিক সাময়িক, বর্ষমান কাল তাকে বহু প্রচুর মূল্য দিক্, দেশের প্রতিভার কাছ থেকে অতিশয়ের সমাদর সে স্বভাবতই পায়নি যেমন পেয়েছে জ্যোৎস্না রাতে ভেসে-বাওয়া নৌকোর সেই সারিগান,—

মাঝি হোর বৈঠা নে রে

আমি আর বাইতে পারলাম না।

যেমন পেয়েছে নাইটিঙ্গেল পাখীর সেই গান, যে গান শুনতে শুনতে কবি বলেছেন তাঁর প্রিয়াকে :—

Listen Eugenia,

How thick the burst comes crowding through
the leaves.

Again—thou hearest ?

Eternal passion !

Eternal pain !

পূর্বেই বলেছি রস মানেই অর্থাৎ সকল রকম হৃদয়-বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি সেই জানাতোই বিশেষ আনন্দ। এখানেই তর্ক উঠতে পারে যে-জানায় হৃৎ সেট গনাতোও আনন্দ এ কথা স্বতোবিরুদ্ধ! হৃৎকে ভয়ের বিষয়কে আমরা পরিহাস্য মনে করি তার কারণ তাতে আমাদের হানি হয়, আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়, তা আমাদের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়। প্রাণরক্ষার স্বার্থরক্ষার প্রবৃত্তি আমাদের অত্যন্ত প্রবল, সেই প্রবৃত্তি ক্ষুর হ'লে সেটা হৃৎহ হয়। এই জন্তে হৃৎবোধ আমাদের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ববোধকে উদ্দীপ্ত করে দেওয়া সবচেয়ে সাধারণত তা আমাদের কাছে অপ্ৰিয়। এটা দেখা গেছে, যে-মানুষের স্বভাবে ক্ষতির ভয় প্রাণের ভয় যথেষ্ট প্রবল নয় বিপদকে সে ইচ্ছাপূর্বক আহ্বান করে, দুর্গমের পথে যাত্রা করে, হৃৎসাধের মধ্যে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে। কিসের লোভে? কোনো দুল্লভ ধন অর্জন করবার জন্তে নয়, ভয় বিপদের সংঘাতে নিজেকেই প্রবল আবেগে উপলব্ধি করবার জন্তে। অনেক শিশুকে নিষ্ঠুর হ'তে দেখা যায়, কীট পতঙ্গ পণ্ডকে বধুণা দিতে তারা তীব্র আনন্দ বোধ করে। শ্রেয়োবুদ্ধি প্রবল হ'লে এই আনন্দ সম্ভব হয় না, তখন শ্রেয়োবুদ্ধি বাধা রূপে কাজ করে।

স্বভাবত বা অভ্যাসবশত এই বুদ্ধি হ্রাস হ'লেই দেখা যায় হিংস্রতার আনন্দ অতিশয় তীব্র; ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে এবং জেলখানার এক শ্রেণীর কণ্ঠচারীর মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দুল্লভ নয়। এই হিংস্রতারই অহৈতুক আনন্দ নিন্দুকদের—নিজের কোন বিশেষ ক্ষতির উত্তেজনাতেই যে মানুষ নিন্দা করে তা নয়। যাকে সে জানে না, যে তার কোনো অপকার করেনি তার নামে অকারণ কলঙ্ক আরোপ করায় যে নিঃস্বার্থ দুঃখজনকতা আছে দলেবলে নিন্দা-সাধনার ভৈরবীচক্রে বসে নিন্দুক ভোগ করে তাই। ব্যাপারটা নিষ্ঠুর এবং কদর্য কিন্তু তীব্র তার আব্বাদন। বার প্রতি আমরা উদাসীন সে আমাদের স্বর্থ দেয় না, কিন্তু নিন্দার পাত্র আমাদের অহুত্বকে প্রবল ভাবে উদ্দীপ্ত করে রাখে। এই হেতুই পরের দুঃখকে উপভোগ্য সামগ্রী করে নেওয়া মানুষ-বিশেষের কাছে কেন বিলাসের অঙ্গরূপে গণ্য হয়। কেন মহিমের মত অত বড় প্রকাণ্ড প্রবল জন্তকে বলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা উন্নত নৃত্য সম্ভবপর হ'তে পারে, তার কাবণ বোঝা সহজ। হৃৎের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। হৃৎের কটুস্বাদে হুট চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। হৃৎের অন্তর্ভূতি সহজ আরাধনাবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নিরাসন, মহুরার উল্লাস, দশরথের যুত্যা, এর মধ্যে ভাল কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা হৃদয়ের বলি এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয় একথা মানুষেই হবে। তবু এই ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহু কাল থেকে চলে আসছে। ভিড় জমছে কত, আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিগুণের প্রবল আত্মতত্ত্ব। বহু জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই হৃৎে বিপদে বিশ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেগ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায়

লিখেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তরের আমি আলস্তে
আবেশে বিলাসের প্রাশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, নির্দিয় আঘাতে
তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে, তবেই সেই
আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাণ্ডহাতেই
আনন্দ।

এতকাল আমি রেখেছিছ তারে যতন ভরে

শয়ন 'পরে ;

বাখা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে

নিশিদিন তাই বহু অহুসারে

বাসর শয়ন করেছি রচন কুসুম খরে,

দুয়ার রুদ্ধিরা রেখেছিছ তারে গোপন ঘরে

যতন ভরে।

শেষে হৃথের শয়নে শ্রান্ত পরাণ আলসরসে

আবেশ বশে।

পরশ করিলে জাগে না সে আর,

কুসুমের হার লাগে গুরুভার,

ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার নিশিদিবসে ;

বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে

আবেশ বশে।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নতুন খেলা

রাত্রিবেলা।

মরণদোলায় ধরি রসিগাছি

বসি বহুজনে বড়ো কাছাকাছি,

ঝঙ্কা আসিয়া অটু হাসিয়া মারিবে ঠেলা,

প্রাণেতে আমাতে খেলি বহুজনে ঝুলন খেলা

নিশীথ বেলা।

আমাদের শাস্ত্র বলেন, “তং বেদাং পুরুষং বেদ
খা মা বো মৃত্যুঃ পরিবাখাঃ।” “সেই বেদনীয় পুরুষকে
কোনো যাতে মৃত্যু তোমাকে বাখা না দিক।” বেদনা
অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই ঠাঁকে জানা যায় জানে।
সেই পুরুষকে অর্থাৎ পাসে ঈশালিষ্টিক। আমার
ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অহুভূতি দিয়ে জানে
অসীম পুরুষকে, জানে রূপা মনীষা মনসা, তখন তাঁর
মধ্যে নিঃশব্দরূপে জানে আপনাকে। তখন কী হয় ?

মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার বাখা চলে যায়, কেন-না বেদনীয়
পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিকল্প।

এই আধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে
নামিয়ে আনা চলে। জীবনে শূন্যতাবোধ আমাদের বাখা
দেয়, শূন্যতাবোধের স্নানতায় সংসারে এমন কিছু অভাব
ঘটে যাতে আমাদের অহুভূতির সাড়া জাগে না, যেখানে
আমাদের ব্যক্তিবোধকে জাগ্রত রাখবার মত এমন
কোনো বাণী নেই যা স্পষ্ট ভাবায় বলছে আমি আছি।
বিরহের শূন্যতায় যখন শব্দস্তলার মন অবসাদগ্রস্ত তখন
তাঁর দ্বারে উঠেছিল ধ্বনি “অয়মহং ভোঃ”। এই যে আমি
আছি, সে বাণী পৌছল না তাঁর কানে, তাই তাঁর অস্তরাস্তা
জবাব দিল না এই যে আমিও আছি। দুঃপের কারণ
ঘটল সেইখানে। সংসারে আমি আছি এই বাণী যদি
স্পষ্ট থাকে তাহলেই আমার আপনার মধ্য থেকে তার নিশ্চিত
উত্তর মেলে, আমি আছি। আমি আছি এই বাণী প্রবল
হৃরে ধ্বনিত হয় কিসে ? এমন সত্যে যাতে রস আছে পূর্ণ।
আপন অন্তরে ব্যক্তি-পুরুষকে নিবিড় করে অহুভব করি
যখন আপন বাইরে গোচর হয়েছে রাসাত্মক রূপ। তাই
বাউল গেয়ে বেড়িয়েছে—

আমি কোথায় পাব তারে

আমার মনের মাহুয যে রে।

কেন-না আমার মনের মাহুযকেই একান্ত করে পাবার
জন্তে পরম মাহুযকে চাই, চাই তং বেদাং পুরুষং, তা হ'লে
শূন্যতা বাখা দেয় না।

আমাদের পেট ভরাবার জন্তে, জীবনযাত্রার অভাব
মোচন করবার জন্তে আছে নানা বিদ্যা নানা চেষ্টা ; মাহুযের
শূন্য ভরাবার জন্তে, তার মনের মাহুযকে নানা ভাবে নানা
রসে জাগিয়ে রাখবার জন্তে, আছে তার সাহিত্য তার শিল্প।
মাহুযের ইতিহাসে এর স্থান কী বৃহৎ, এর পরিমাণ কী
প্রভূত। সভ্যতার কোনো প্রলয় ভূমিকম্পে যদি এর
বিলোপ সম্ভব হয় তবে মাহুযের ইতিহাসে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা
কালো মরুভূমির মত ব্যাপ্ত হ'য়ে যাবে। তার কৃষ্টির ক্ষেত্র
আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায় ; তার সংস্কৃতির
ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনাই সংস্কৃতি, সে তাতে

আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে।
এতরয়ে ব্রাহ্মণ ভাই বলেছেন, “আত্ম-সংস্কৃতিবাব শিল্পাণি।”

ক্লাস ঘরের দেয়ালে মাধব আরেক ছেলের নামে বড়
বড় অক্ষরে লিখে রেখেছে “রাখালটা বাদর।” খুবই রাগ
হয়েছে। এই রাগের বিষয়ের তুলনায় অল্প সকল ছেলেই
তার কাছে অপেক্ষাকৃত অগোচর। অস্তিত্ব হিসাবে রাখাল
যে কত বড় হয়েছে তা অক্ষরের ছাঁদ দেখলেই বোঝা যাবে।
মাধব আপন স্বল্প শক্তি অল্পসারে আপন রাগের অহুভূতিকে
আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেইটে দিয়ে দেয়ালের উপর
এমন একটা কালো অক্ষরের রূপ সৃষ্টি করেছে যা খুব বড়
করে জানাকে মাধব রাগ করেছে, যা মাধব চাচ্ছে সমস্ত
জগতের কাছে গোচর করতে। এটেকে একটা গীতি-
কবিতার বামন অবতার বলা যেতে পারে। মাধবের অন্তরে
যে অপরিণত পঙ্খ কবি আছে, রাখালের সঙ্গে বানরের
উপমার বেশি তার কলমে আর এগোলো না। বেদব্যাস ঐ
কথাটাই লিখেছিলেন মহাভারতের পাতায় শকুনির নামে।
তার ভাষা স্বতন্ত্র, তা ছাড়া তার কয়লার অক্ষর মুহূর্তে না
যতই চুনকাম করা যাক। পুরাতত্ত্ববিদ নানা সাক্ষ্যের জোরে
প্রমাণ করে দিতে পারেন শকুনি নামে কোনো ব্যক্তি
কোনো কালেই ছিল না। আমাদের বুদ্ধিও সে কথা মানবে,
কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অহুভূতি সাক্ষ্য দেবে সে নিশ্চিত
আছে। ভাঁড়ু লম্বও বাদর বই কি, কবিকল্প সেটা কালো
অক্ষরে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু এই বাদরগুলোর
উপরে আমাদের যে অবজ্ঞার ভাব আসে সেই ভাবটাই
উপভোগ্য।

আমাদের দেশে এক প্রকারের সাহিত্যবিচার দেখি
যাতে নানা অবাস্তব কারণ দেখিয়ে সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষ-
গোচরতার মূল্য লাঘব করা হয়। হয়ত কোনো মানব-
চরিত্রজ্ঞ বলেন, শকুনির মত অমন অবিমিশ্র দুর্কৃত্ততা
স্বাভাবিক নয়, ইয়াগোর অহৈতুক বিদ্রোহবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে
মহৎগুণ থাকা উচিত ছিল; বলেন যেহেতু কৈকেয়ী বা লেডি
ম্যাকবেথ হিড়িম্বা বা শূর্ণনখা নারী, মায়ের জাত, এইজন্তে
এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা কদাশরতার অত নিবিড় কালিমা
আরোপ করা অশ্লীল। সাহিত্যের তরফ থেকে বলবার
কথা এই যে এখানে আর কোনো তর্কই গ্রাহ্য নয় কেবল

এই জবাবটা পেলেই হোলো যে-চরিত্রের অবতারণা হয়েছে
তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ। কোনো এক খেয়ালে
সৃষ্টিকর্তা জিরাফ জন্তটাকে রচনা করলেন। তাঁর সমালোচক
বলতে পারে এর গলাটা না-গোফার মত না-হরিণের মত,
বাঘ ভালুকের মত তো নয়ই, এর পশ্চাদ্ ভাগের ঢালু
ভঙ্গীটা সাধারণ চতুষ্পদ সমাজে চলতি নেই অতএব ইত্যাদি।
সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে একটিমাত্র জবাব এই যে, ঐ জন্তট
জীবসৃষ্টিপথ্যায় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ; ও বলছে আমি আছি, না
থাকাই উচিত ছিল বলাটা টিকবে না। যাকে সৃষ্টি বলি তার
নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়ৎ। সাহিত্যের
সৃষ্টির সঙ্গে বিধাতার সৃষ্টির এইখানেই মিল; সেই সৃষ্টিতে
উট জন্তটাই হয়েছে বলেই হয়েছে, উটপাখীরও হয়ে ওঠা ছাড়া
অল্প জবাবদিহী নেই।

মাহুঘও একেবারে শিশুকাল থেকেই এই আনন্দ পেয়েছে,
প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আনন্দ। এই বাস্তবতার মানে এমন নয়
যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে, যা যুক্তিসঙ্গত। যে-কোনো রূপ
নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে
ভাষায় ভঙ্গীতে ইন্দ্রিতে যখন সেই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে, সে
তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তার কোনো
ব্যাবহারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে এমন একটা কিছু
প্রকাশ পায় যা tease us out of thought as doth
eternity।

ওপারেতে কালো রং

বুটি পড়ে বম্ বম্,

এ পারেতে লম্বা গাছটি রাঙা টুকটুক করে,

গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।

এর বিষয়টি অতি সামান্য। কিন্তু ছন্দের দোল খেয়ে এ
যেন একটা স্পর্শ-যোগ্য পদার্থ হয়ে উঠেছে।

ভালিম গাছে পরভূ নাচে,

তাক্ ধুমধুম বাগ্মি বাজে।

স্তনে শিশু খুশি হয়ে ওঠে। এ একটা স্পষ্ট চলন্ত জিনিষ,
যেন একটা ছন্দে-গড়া পতঙ্গ, সে আছে, সে উড়ছে, আর
কিছুই নয়, এতেই কোঁতুক।

তাই শিশুকাল থেকে মাহুঘ বলছে গল্প বলা, সেই
গল্পকে বলে রূপকথা। রূপকথাই সে বটে, তাতে না থাকতে

পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যক সংবাদ, লভ্যবপরতা সম্বন্ধেও তার হয়ত কোনো কৈফিয়ৎ নেই। সে কোনো একটা রূপ দাঁড় করায় মনের সামনে, তার প্রতি উৎসৃষ্ট জাগিয়ে তোলে, তাতে শৃঙ্খতা দূর করে ; সে বাস্তব। গল্প হ্রস্ব করা গেল :—

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে গিয়ে ঘরে
আয়নাটা পড়েছে নড়রে।
এক ছুটে পালালো বেহারী,
বাঘ দেখে আপন চেহারী।
গাঁ গাঁ করে রেগে ওঠে ভেকে,
গায়ে দাগ কে দিয়েছে ঢেকে।
চেকিশালে মাসি খান ভানে
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।
পাকিয়ে ভীষণ ছই গৌণ
বলে, “চাই মিসেরিন সোপ !”

ছোটো মেয়ে চোখ দুটো মস্ত করে হাঁ করে শোনে।
আমি বলি আজ এই পর্যন্ত। সে অস্তির হয়ে বলে, না, বল
তারপরে। সে নিশ্চিত জানে, সাবানের চেয়ে, যারা সাবান
মাথে বাঘের লোভ তাদের পুরে বেশি। তবু এই সম্পূর্ণ
আজগবী গল্প তার কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব, প্রাণীরক্তান্তের
বাঘ তার কাছে কিছুই না। ঐ আয়না-দেখা জ্যাগা বাঘকে
তার সমস্ত মনপ্রাণ একান্ত অচল করাতেরেই সে খুঁশি হয়ে
উঠেছে। একেই বলি মনের লীলা, কিছুই-না-নিম্নে তার
সৃষ্টি, তার আনন্দ।

হৃন্দরকে প্রকাশ করাই রস-সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য
নয়, সে কথা পূর্বেই বলেছি। সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় একটা
স্তর আছে, সেখানে সৌন্দর্য্য খুবই সহজ। ফুল হৃন্দর,
প্রজাপতি হৃন্দর, ময়ূর হৃন্দর। এ সৌন্দর্য্য একতলাওয়াল,
এর মধ্যে সদর হৃন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়,
সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই প্রাণের কোঠায়
যখন মনের দান মেশে, চরিত্রের সংস্রব ঘটে তখন এর
মহল বেড়ে যায়, তখন সৌন্দর্য্যের বিচার সহজ হয় না।
যেমন মাহুঘের মুখ। এখানে শুধু চোখে চেয়ে সরাসরি

রায় দিতে গেলে ভুল হবার আশঙ্কা। সেখানে সহজ
আদর্শে বা অহৃন্দর তাকেও মনোহর বলা অসম্ভব নয়।
এমন কি সাধারণ সৌন্দর্য্যের চেয়েও তার আনন্দ-
জনকতা হয়ত গভীরতর। রূপের টপ্পা শোনবামাত্র মন
চঞ্চল হয়ে থাকে, টোড়ির চৌতাল চৈতন্যকে গভীরতায় উদবুদ্ধ
করে। “মলিত লবঙ্গলতা পরিশীলন” মধুর হইতে পারে
কিন্তু “বসন্ত পুষ্পাভরণং বহুতী” মনোহর। একটা কানের
আর একটা মনের, একটাতে চরিত্র নেই লালিত্য আছে, আর
একটাতে চরিত্রই প্রধান। তাকে চিনে নেবার জন্তে
অহুশীলনের দরকার করে।

যাকে হৃন্দর বলি তার কোঠা সঙ্গীর্ণ, যাকে মনোহর
বলি তা বহুদূরপ্রসারিত। মন ভোলাবার জন্তে তাকে
অসামান্য হইতে হয় না, সামান্য হয়েও সে বিশিষ্ট। বা
আমাদের দেখা অভ্যস্ত, ঠিক সেইটেকেই যদি ভাষায় আমাদের
কাছে অবিকল হাজির করে দেয় তবে তাকে বলব সংবাদ।
কিন্তু আমাদের সেই সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিষকেই সাহিত্য
যখন বিশেষ করে আমাদের সামনে উপস্থিত করে তখন সে
আসে অভূতপূর্ব্ব হয়ে, সে হয় সেই একমাত্র, আপনাতো
আপনি স্বতন্ত্র। সম্ভানস্নেহে কর্তব্যবিস্তৃত মাহুঘ অনেক দেখা
যায়, মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র আছেন সেই অতি সাধারণ বিশেষণ
নিম্নে। কিন্তু রাজ্যাধিকারবদ্ধিত এই অন্ধ রাজা কবিলেখনীর
নানা স্বপ্ন স্পর্শে দেখা দিয়েছেন সম্পূর্ণ একক হয়ে। মোটা
গুণটা নিয়ে তাঁর সমাজাতীয় লোক অনেক আছে, কিন্তু
জগতে ধৃতরাষ্ট্র অদ্বিতীয়, এই মাহুঘের একান্ততা তাঁর
বিশেষ ব্যবহারে নয়। কোনো আংশিক পরিচয়ে নয়,
সমগ্রভাবে। কার্বর সৃষ্টি-ময়ে প্রকাশিত এই তাঁর অনন্ত-
সদৃশ স্বকীয় রূপ প্রতিভার কোন সহজ নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ হয়ে
উঠেছে। ক্ষুদ্র সমালোচকের বিশ্লেষণী লেখনী তার অস্থ
পাবে না।

সংসারে অধিকাংশ পদার্থ প্রত্যক্ষত আমাদের কাছে
সাধারণ শ্রেণীভুক্ত। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলে ;
তারা যদিচ প্রত্যেকেই বিশেষ লোক তবু আমার কাছে
তারা সাধারণ মাহুঘমাত্র, এক বৃহৎ সাধারণতার আশ্রয়ে
তারা আবৃত, তারা অস্পষ্ট। আমার আপনার কাছে
আমি হুনিশ্চিত আমি বিশেষ, অল্প কেউ যখন তার বিশিষ্টতা

নিরে আসে তখন তাকে আমারই সমগ্ৰাণ্যে ফেলি, আনন্দিত হই।

একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। আমার ধোবা আমার কাছে নিশ্চিত সত্য সন্দেহ নেই এবং তার অমুগ্ধতা যে বাহন েও। ধোবা বলেই প্রয়োজনের যোগে সে আমার খুব কাছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগতব্ধের সমাক্ষ অমুগ্ধতার বাইরে।

পূর্বে অগ্ৰে এক জায়গায় বলেছি যে, যে-কোনো পদার্থের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধই প্রধান, সে-পদার্থ সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়, তার বিশিষ্টতা আমাদের কাছে অগোচর হয়ে পড়ে। কবিতায় প্রবেশ করতে সজনে ফুলের বিলম্ব হয়েছে এই কারণেই, তাকে জানি ভোজ্য বলে একটা সাধারণ ভাবে; চালতা ফুল এখনও কাব্যের ধারের কাছেও এসে পৌঁছয় নি। জামকলের ফুল শিরীষ ফুলের চেয়ে অযোগ্য নয়; কিন্তু তার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন সে আপন চরমরূপে প্রকাশ পায় না, তার পরপাখারের খাদ্য কলেরই পূর্বপরিচয় রূপে তাকে দেখি। তার নিজেরই বিশিষ্টতার ঘোষণা যদি তার মধ্যে মুখ্য হ'ত তা হ'লে সে এতদিনে কাব্যে আদর পেত। মুরগী পাখীর সৌন্দর্য বঙ্গসাহিত্যে কেন যে অস্বীকৃত সে কথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। আমাদের চিত্ত এদেরকে নিজেরই স্বরূপে দেখে না, অগ্র কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে তার দ্বারা আবৃত করে দেখে।

যায়! আমার কবিতা পড়েছেন তাঁদের কাছে পুনর্কতি হ'লেও একটা ধবর এখানে বলা চলে। ছিলেম মফস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার যোগ্য ছিল না। রাত্রে বাড়ী চলে যায়, সকালে এসে বাড়ন কাঁধে কাজকর্ম করে। তার প্রধান গুণ, সে কথা বেশী বলে না। সে যে আছে সে তথ্যটা অমুগ্ধব করলুম যেদিন সে হ'লো অমুগ্ধবিস্ত। সকালে দেখি স্নানের জল তোলা হয়নি, বাড়পৌছ বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ একটু ঝড়বধের জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় ছিল! সে বললে, আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে। বলেই বাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল। বুকটা ধক করে উঠল। ভূতরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা,

তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ বলে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হ'য়ে গেল, সে হ'লো প্রত্যক্ষ, সে হ'লো বিশেষ।

সুন্দরের হাতে বিধাতার পাসপোর্ট আছে, সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজে। কিন্তু এই মোমিন মিঞা, একে কী বলব? সুন্দর বলা তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য, সেই সাধারণ তথ্যটা সুন্দরও না অসুন্দরও না। কিন্তু সেদিন করুণরসের ইঞ্জিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিলল, প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম ক'রে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হ'লো বাস্তব।

লক্ষপতির ঘরে মেজো মেয়ের বিবাহ। এমন ধুম পাড়ার অতিরিক্তেরাও বলে অভূতপূর্ব। তার ঘোষণার তরঙ্গ খবরের কাগজের সংবাদ-বীথিকায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। জনশ্রুতির কোলাহলে ঘটনাটা যতই গুরুতর প্রতিভাত হোক, তবু এই বহুবায়স্য বিপুল সমারোহেও ব্যাপারটাকে মেয়ের বিয়ে নামক সংবাদের নিত্যন্ত সাধারণতা থেকে উপরে তুলতে পারে না। সাময়িক উন্মুগ্নতার জোরে এ স্বরবীষ হয়ে ওঠে না। কিন্তু কতরা বিবাহ নামক অত্যন্ত সাধারণ ঘটনাকে তার সাময়িক ও স্থানিক আত্মপ্রচারের আক্সলানতা থেকে যদি কোনো কবি তাঁর ভাষায় ছন্দে দীপ্তমান সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলেন তা হ'লে প্রতিদিনের হাজার লক্ষ মেয়ের বিবাহের কুহেলিকা ভেদ করে এ দেখা দেবে একটি অদ্বিতীয় মেয়ের বিবাহরূপে, যেমন বিবাহ কুমার-সন্তবের উমার, যেমন বিবাহ রঘুবংশের ইন্দুমতীর। সাক্ষোপাঞ্জা ডনুইক্সোটের ভূতমাত্র, সংসারের প্রবহমান তথ্যপুঞ্জের মধ্যে তাকে তর্জমা করে দিলে সে চোখেই পড়বে না—তখন হাজার লক্ষ চাকরের সাধারণশ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে? ডনুইক্সোটের চাকর আজ চিরকালের মানুষের কাছে চিরকালের চেনা হ'য়ে আছে, সবাইকে দিচ্ছে তার একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ; এ পথ্য ভারতের যতগুলি বড়লাট হয়েছে তাদের সকলের জীবনরাস্তা মেলালেও এই চাকরটির পাশে তারা নিস্তভ। বড় বড় বুদ্ধিমান রাজনীতিকের দল মিলে অন্তর্লোম্ব ব্যাপার নিয়ে যে বাদবিতণ্ডা তুলেছেন তথ্যহিনাবে সে একটা মস্ত তথ্য, কিন্তু বুদ্ধে পঙ্ক একটি মাত্র সৈনিকের জীবন যে-বেদনায় জড়িত

টাকে সুস্পষ্ট প্রকাশমান করতে পারলে সকল কালের মানুষ রাষ্ট্রনীতিকের গুরুতর মন্তব্য ব্যাপারের চেয়ে তাকে প্রধান হান দেবে। এক কথা নিশ্চিত জানি যে-সময়ে শকুন্তলা রচিত হয়েছিল তখন রাষ্ট্রিক আর্থিক অনেক সমস্যা উঠেছিল, যার প্রকৃষ্ট তখনকার দিনে অতি প্রকাণ্ড উদ্বেগরূপে ছিল; কিন্তু সে সময়ের আশ্রয় চিহ্নমাত্র নেই, আছে শকুন্তলা।

মানবের সামাজিক জগৎ ছালোকের ছায়াপথের মত। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের অর্থাৎ যাব-
 ঙ্যাকশনের বহুবিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ; তাদের নাম হচ্ছে রাজ্য, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য এবং আরও কত কি। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা ছাচ্ছন্ন। বুদ্ধ নামক একটি মাত্র বিশেষ্যের তলায় হাজার হাজার ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়দাহকর দুঃখের জলন্ত অঙ্গার বাস্তবতার অগোচরে ভাস্কর্যত। নেশন নামক একটা শব্দ চাপা দিয়েছে বত পাপ ও বিভীষিকা তার আবরণ তুলে দিলে মানুষের জন্তে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না। সমাজ নামক পদার্থ বত বিচিত্র রকমের মূঢ়তা ও দাসত্বশৃঙ্খল গড়েছে তার স্পষ্টতা আমাদের চোখ এড়িয়ে থাকে, কারণ সমাজ একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব, তাতে মানুষের বাস্তবতার বোধ আমাদের মনে অসাড় করেছে, সেই অচেতনতার বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে রামমোহন রায়কে, বিদ্যাসাগরকে। ধর্ম শব্দের মোহ-ঘবনিকার অন্তরালে যে-সকল নিরাশ্রয় ব্যাপার সাধিত হয়ে থাকে তাতে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত সকল নরকের দণ্ডবিধিকে ক্রান্ত করে দিতে পারে। ইফুলে ক্লাস নামক একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব আছে সেখানে ব্যক্তিগত ছাত্র অগোচর থাকে শ্রেণীগত সাধারণতার

আড়ালে, সেই কারণে যখন তাদের মন নামক সজীব পদার্থ মুখস্থ বিদ্যার পেয়ে গ্রন্থের পাতার মধ্যে পিষ্ট ফুলের মত শুকোতে থাকে আমরা থাকি উদাসীন। গবর্মেন্টের আমলা-
 তত্ত্ব নামক অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব মানুষের ব্যক্তিগত সত্যবোধের বাহিরে, সেইজন্য রাষ্ট্রশাসনের হৃদয়স্পর্কহীন নামের নীচে প্রকাণ্ড আয়তনের নির্দয়তা কোথাও বাধে না।

মানবচিন্তার এই সকল বিরাট অসাড়তার নীহারিকা ক্ষেত্রে বেদনাবোধের বিশিষ্টতাকে সাহিত্য দেনীপামান করে তুলছে। রূপে সেই সকল সৃষ্টি সসীম, ব্যক্তিপুরুষের আত্মপ্রকাশে সীমাতীত। এই ব্যক্তিপুরুষ মানুষের অন্তরতম ঐক্যতত্ত্ব, এই মানুষের চরম রহস্য। এ তার চিন্তার কেন্দ্র থেকে বিকীর্ণ হয়ে বিশ্বপরিধিতে পরিব্যাপ্ত, আছে তার দেহ, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে, আছে তার মনে, কিন্তু মনকে অতিক্রম করে, তার বর্তমানকে অধিকার করে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকূলগুলিকে ছাপিয়ে চলেছে। এই ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়মানরূপে যে সীমায় অবস্থিত, সত্যরূপে কেবলি তাকে ছাড়িয়ে যায়, কোথাও থামতে চায় না! তাই এ আপন সত্তার প্রকাশকে এমন রূপ দেবার জন্তে উৎকণ্ঠিত যে রূপ আনন্দময়, বা যুত্বাহীন। সেই সকল রূপসৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা। এই সকল সৃষ্টিতে ব্যক্তিপুরুষ পরমপুরুষের বাণীর প্রত্যুত্তর পাঠাচ্ছে, যে পরমপুরুষ আলোকহীন তথ্যপুঞ্জের অভ্যন্তর থেকে আমাদের দৃষ্টিতে আপন প্রকাশকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করেছেন সত্যের অসীম রহস্যে সৌন্দর্যের অনির্বাচনীয়তা।*

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত।

রাম ও বালী

(আখ্য ও অনাথো সংঘাত)

শ্রীরজনীকান্ত গুহ

দুখুঝেরা বলে, খেতাজ রাজপুরুষগণ প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিবার কালে তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলখানি যুযুজ প্রণালীতে নিক্ষেপ করেন ; তাহার কারণ এই যে, ঐ শাস্ত্রের উপদেশগুলি স্বদেশেই অঙ্গ হইয়া উঠিতেছে, বিজিত দেশগুলিতে উহার এক বর্ণও ব্যবহারে আসিতে পারে না।

এই নিন্দা শুধু খেতবর্ণ খ্রীষ্টশিষ্যদিগেরই প্রাণ্য নয়। প্রাচীন ও আধুনিক কোন যুগেই জয়গর্ভিত প্রবলতর জাতি দুর্বলতর জাতির সহিত আদানপ্রদান করিতে গিয়া ধর্মগ্রন্থশাসন গ্রাহ্য করিয়া চলে নাই। পরাজিত জাতির শাসন-সংরক্ষণে বিদ্রুত ধর্মনীতি মানিয়া চলিয়াছে, এমন জাতির নাম ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের আধ্যাত্মিক যদি এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইতেন, তবে আজ এদেশে অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের জন্ত মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইত না।

আর একটা কথা। সকল সভ্য দেশেই শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট বিধি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে ; কিন্তু কাড়ের বেলায় সেগুলি পদে পদে লজ্জিত হইতেছে। বর্তমান কালের ইতিহাস আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই—বাহা সকলেই প্রতিনিয়ত চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছে, তাহা দেখাইয়া দিবার প্রয়াস নিরর্থক। মহাভারত হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরু, পাণ্ডব ও দ্রৌপদগণ যুদ্ধের কতকগুলি নিয়ম নির্ধারণ করিলেন—

“আরক যুদ্ধ নির্ধারিত হইলে আমাদের পরস্পর খ্রীতি সংস্থাপিত হইবে। সমযোগ্য ব্যক্তিরই পরস্পর স্ত্রীসন্তানসহ যুদ্ধ করিবে। কদাচ প্রতারণা করা হইবে না। বাহারা বাগ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত বাক্য দ্বারাই যুদ্ধ করিবে। বাহারা সেনার মধ্য হইতে নিজস্ব হইয়াছে, তাহাদিগকে কদাপি প্রহার করিবে না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বরোহী অশ্বরোহীর সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, অভিল্যভ, উৎসাহ ও বল অনুসারে যুদ্ধ করিবে। অগ্রে বলিয়া পরে (প্রতিপক্ষকে) প্রহার করিবে। বিষম ও ভীত ব্যক্তিকে প্রহার করিবে না। যে একজনের সহিত যুদ্ধ নিযুক্ত রহিয়াছে ; যে শরণাপন্ন ; যে সগ্রামে পরাধূত, তাহার

অগ্রশস্ত্র নিঃশেষ হইয়াছে, যে ধর্মবিহীন, তাহাকে কখনও প্রহার করা হইবে না। সারথি, ভারবাহী শস্ত্রোপজীবী, ভৈরবীবাদক ও শয্য-বাদককে কদাপি আঘাত করিবে না।”

(ভীষ্মপর্ব। ১।২৭-৩২। প্রতাপ রায়ের অনুবাদ, স্থানে স্থানে পরিবর্তিত।)

কুরুপাণ্ডবগণ ধর্মযুদ্ধের নিয়মাবলি অঙ্গীকার করিয়া লইলেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সব নিয়ম মানিয়া চলিলেন কি ? কোরবেরা ছয় রথীতে মিলিয়া কিশোর অভিমুখ্যাকে সংহার করিলেন। পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, তিন জনেই কোন-না-কোনও নিয়ম পদদলিত করিয়া জয়ের পথ স্তূগম করিয়া তুলিলেন। “কদাচ প্রতারণা করা হইবে না,” এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের বধসাধনে সহায় হইলেন। “যে এক জনের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাকে কদাপি আঘাত করিবে না,” এই নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া অর্জুন সাত্যকির শিরশ্ছেদদোষ্যত ভূবিশ্রবাব বাত ছেদন করিয়া পরাজিত শক্রর দ্বারা তাহাকে হত্যা করাইলেন। ভীম অত্যন্তপুরুষ দুর্যোগ্যদের উরু ভঙ্গ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সমাগরা পৃথিবীর অসপত্র অধিকার প্রদান করিলেন। ক্রোধাক্ষ অশ্বখামা গভীর নিশীথে স্তম্ভ শক্রশিবিরে উৎপত্তিত হইয়া এবং দৃষ্টদ্রায়, শিখণ্ডী, জৌপদীর পক্ষপুত্র প্রভৃতি বীরগণকে সংহার করিয়া এই অধ্যক্ষের প্রতিশোধ লইলেন ; মাতুল রূপাচার্যের “ন বধঃ পূজাতে লোকে স্তম্ভানামিহ ধর্মতঃ”—(প্রমত্ত ব্যক্তিরগের বধ ইহলোকে ধর্মাত্মগত কাব্য নহে)—এই নিষেধ বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। পরিশেষে, ত্রুতশস্ত্রভীষ্মবধে ধর্মযুদ্ধের কোন কোন নিয়ম অটুট ছিল, তাহা নির্ণয় করা এক দুর্লভ সমস্যা। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, “সারথিকে প্রহার করা হইবে না,” এই নিয়ম দুই পক্ষই প্রতিদিন লঙ্ঘন করিয়াছেন।

তবেই দেখা যাইতেছে, ধর্মশাস্ত্রের উপদেশগুলি তত্বের দিক দিয়া উপাদেয় হইলেও ব্যবহারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, সেগুলি

সম্যক প্রতিপালিত হয় নাই। রাম-বালীর কাহিনীতেও আমার তাহাই দেখিতে পাই। “অস্ত্রের সহিত যুদ্ধে আসক্ত ব্যক্তিকে যোদ্ধা কন্যাপি বধ করিবে না” (ন পরেণ সমাগতম্.. হত্যাৎ। ৭।২২) —এই নিয়ম মহুর যুদ্ধবিষয়ক বিধানের মধ্যেও স্থান পাইয়াছে। অথচ বালী বধন স্ত্রীগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হীনবল করিয়া ফেলিতেছিলেন, তখন সহসা রাম অলঙ্কিতে থাকিয়া তাঁহাকে কালাঙ্কুচ বাণে বিন্ধু করিলেন। বালী এই অধর্মকর্মের জ্ঞাত রামকে তিরস্কার করিলেন, রামের উত্তরে অনাধাগণের প্রতি আধাজাতির মনোভাব স্পষ্ট পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল; ধর্মনীতির তুল্যদণ্ড অনাধা বালী না আধা জাতির আদর্শ পুরুষ রামের দিকে কুঁকিয়া পড়িল, তাহা বুঝিবার সাহায্য হইবে বলিয়া আমার উভয়ের কথোপকথনটি সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বালী রামের শরে আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন; তাহার সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে দেখিলেন, রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন তিনি গর্বিত ভাবে ও পক্ষম বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

“হাম, আমি তোমার সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলাম না; আমাকে বধ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? আমি অস্ত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া কোণ প্রকাশ করিয়াছিলাম অথচ তোমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলাম। রাম সমুদ্রযাত্রা, বলবান, তেজস্বী, ব্রতনিষ্ঠ, দয়া, প্রভাগণের হিতৈষী—এইরূপ তোমার গুণের আরও কত খ্যাতি আছে। আমি কবির নিষেধ না মানিয়া স্ত্রীগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম। তোমাকে দেখিবার পূর্বে আমার এই উত্তর হইয়াছিল যে, আমি পক্ষম অস্ত্রের সহিত যুদ্ধে বাপূত থাকিব, তোমার সমক্ষে সাধবান থাকিব না, তখন তুমি আমাকে কখনই বাধিত করিবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি ছয়বেশী আধাধিক জানিলাম, তোমার আশা নর হইয়াছে, কেননা, তুমি ধর্মধরজী আধাধিক, লজ্জনের বেশ ধরিয়া পাপাচরণ করিতেছ তুমি ভূপাঙ্কুর কুপের জায়, ভয়ানকচিত্ত বন্ধুর জায়; আমি জানিতাম না, যে, তুমি ধর্মের ছয়বেশে আত্মগোপন করিয়াছ। আমি তোমার দেশে বা পুরীতে আসি ও অস্ত্রায় কর্ম করি নাই, তোমাকে অবজ্ঞাও করি নাই তবে তুমি আমাকে কেন বধ করিলে? আমি নিত্যা ফলমূলভোজী বনবাসী বানর তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে যাই নাই, অস্ত্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম কেন আমার বধ করিলে? তুমি রাজপুত্র, স্থিতিপাত ও প্রিয়দর্শন; তোমার অঙ্গে জটাবল্লভাদি অসিহাস্যচক ধারণ করিয়া আছে। কোন ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও সামর্থ্যবান হইয়া এবং ধর্মচিহ্নে আপনাকে আচ্ছাদিত রাখিয়া এই প্রকার উগ্র কাণ্ড করিয়া থাকে? তুমি রায়বল্লভ জাত ও ধার্মিক বলিয়া খ্যাতি; তবে তুমি কি জন্ম অবস্থা হইয়া ভবের বেশে বিচরণ করিতেছ? নাম দান, কমা, ধর্ম, সত্য, ধৈর্য, পরাক্রম, অপকারী

দণ্ডবিধান—এইগুলির রাজ্য ভুল। আমরা বনচর, ফলমূলভোজী বানর—ইহাই আমাদের প্রকৃতি:—হে নরেশ্বর, তুমি তো গ্রামবাসী অন্নভোজী পুরুষ! তুমি, স্বর্ণ ও রৌপ্য (অপরের) বধ করিবার কারণ; তবে বনে এবং আমার কলে তোমার লোভ ক্রমে থাকিতে পারে? (বনচর ও পুরচর, বানর ও মনুষ্য, ফলমূলভোজী ও অন্নভোজী, বানরেশ্বর ও নরেশ্বর—উভয়ে সুপূর্ণ ত্রুটিবর্জী:—ইহাদের মধ্যে যিহাদের পল কোথায়?) নীতি ও অনীতি, নিগ্রহ ও অনগ্রহ—এই সকল বিষয়ে রাজার আচরণ বিপরীত:—রাজা কখনও খেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। কিন্তু তুমি খেচ্ছাচারী, কোণী ও অস্ত্রচিহ্ন তোমার রাজব্যবহারে উদাণ নাই তুমি কেবল যেখানে সেখানে শর নিক্ষেপ করিতে পটু। তোমার ধর্মে আশ্রয় নাই, অর্থ স্থির বৃদ্ধি নাই; তুমি কামনার অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়গণ বাধা উত্তমত্ত: আতুর হইতেছ। আমি নিরপরাধ, আমাকে তুমি বাধা দাখ্য হইয়া করিলে এই মিন্দনীয় কর্ম করিয়া সাধুগণের মধ্যে তুমি কি বসিবে? সাধু লোকেরা আমার চর্ম ধারণ করেন না, রোম ও অস্ত্র বর্জন করেন তোমার ক্ষার ধার্মিকের পক্ষে আমার মাসেও অভ্যঙ্গ্য। ভ্রাঙ্কণ ক্ষত্রেরা শরাক, শজার, গোধা, শল ও কূর্ম—এই পাঁচটি পক্ষমণ প্রাণী ভক্ষণ করিতে পারেন। পণ্ডিতেরা আমার চর্ম ও অস্ত্র স্পর্শ করেন না; আমার মাসেও অভ্যঙ্গ্য; তথাপি পক্ষমণ আমি (অভ্যঙ্গ্য হইলেও) হত হইলাম। সর্বত্র তারা আমাকে সত্য ও হিত বাক্যই বলিয়াছিলেন; আমি মোহবশত: তাহা অবহেলা করিয়া কালের কবলে পতিত হইলাম। স্থলীল রমণী বৈদ্যী পতি বিভ্রম্যান থাকিতেও যেমন অনাথা, তেমনি তুমি নাগরূপে বিভ্রম্যান থাকিতেও বৎসরা অনাথা হইয়াছেন। তুমি শত্রু, গোপনে অপরের অনিষ্ট করিয়া থাক: তুমি পরের অপকারী, ক্ষত্রান্তকরণ, অমহতচিহ্ন মহামনা: দম্যতা হইতে তোমার ছায় পাণ্ডিত্য ক্রমে জন্ম পরিগ্রহ করিল: তোমার সহিত আমাদের কোনও সংঘর্ষ ছিল না আমাদের প্রতি তুমি এই বিভ্রম প্রকাশ করিলে; কিন্তু, যাহারা তোমার অপকারী, যাহারা তোমার রীকে অপহরণ করিতে, তাহাদিগের প্রতি তো তোমাকে বিভ্রম প্রকাশ করিতে দেখিলাম না। রাম, তুমি যদি দৃষ্টিপথে থাকিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে, তবে তোমাকে অদ্যই বধ করিয়া যমলয়ে প্রেরণ কর্তাম: সর্ব যেমন শত্রু ব্যক্তিকে দামন করে, তেমন তুমি অন্তরালে থাকিয়া দুর্জয় আমাকে হত্যা করিলে। তুমি স্ত্রীগ্রীবের প্রিয় কাণ্ড করিবার বানসার আমাকে বধ করিলে কিন্তু যদি তুমি নীতাকে উদ্ধার করিবার কথা পূর্বে আমাকে বলিতে, তবে আমি একদিনেই তাহাকে আনিতে পারিতাম এবং তোমার ভাষাপ্রসারী সেই চক্রাঙ্কর বান্দব রাবণকে কঠে বন্ধন করিয়া জীবিত অবস্থায় তোমার হস্তে সমর্পণ কর্তাম। আমি স্বর্ণে গমন করিলে স্ত্রীগ্রীব রাজ্য পাইবে, ইহা স্মারদ্রজাত বটে, কিন্তু তুমি যে যুদ্ধে অধম করিয়া আমাকে হত্যা করিলে, ইহা অস্ত্রায় হইল। সকল জাণীই সূত্রার অধীন, কালকশে সকলেই সূত্রায়ুখে পতিত হয় হতভাগ: মরণের জন্ম আমার খেদ নাই; কিন্তু আমাকে বধ করিয়া তোমার কি লাভ হইল, ইহাই এখন চিন্তা কর।”

বালীর কটুকণ্ঠলি বর্জন করিয়া তিনি কি কি কারণে রামের কাণ্ড গহিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। (১) রাম ধর্মযুদ্ধের একটি সনাতন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন; (২) বালী রামের রাজ্যে গিয়া কোনও উৎপাত করেন নাই, তাহার

প্রতি অবজ্ঞাও প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং অপকারের প্রতিশোধ, অথবা আত্মসম্মান বোধের প্রয়োজন (lese majeste)—আলোচ্যস্থলে এই দুইটির কোন হেতুই বর্তমান ছিল না; (৩) বালী ও রাম সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী—বনচর ও পূরচর; কলমূলভোজী ও অন্নভোজী; বানরেখর ও নরেখর—ইহাদের পরম্পরের স্বার্থ বিভিন্ন, সুতরাং স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষের অবসর নাই; (৩) তুমি, স্বর্গ ও রৌপ্যের লোভে এক রাজা অল্প রাজাকে আক্রমণ করেন। রাম বালীর রাজ্যে লোভ করিতেছেন, ইহার কোনও প্রমাণ নাই; তিনি জটাবদ্ধলধারী তপস্বী, স্বর্গ-রৌপ্যে লোভ জ্বাছে, ইহাও সম্ভবপর নহে। (বালী বানর, তাহার স্বর্গরৌপ্য থাকিবেই বা কি প্রকারে? যদিচ কিছুক্ষণের বর্ণনায় দেখা যায়, তথায় স্বর্গরৌপ্য-মণিমুস্তার অভাব ছিল না।) সুতরাং ধনলিপ্সাও বালীবধের হেতু হইতে পারে না। (৫) কিন্তু রাজ্যার মৃগয়াপ্রিয়, মাংসার্থে বিবিধ প্রাণী হত্যা করেন। সে-হেতুও স্থলে বিদ্যমান নাই; কেন-না, বানরের মাংস রামের পক্ষে অভক্ষ্য।

(আমরা এতক্ষণ বালীকে একটা অনাধা জাতির রাজা বলিয়া ভাবিতেছিলাম; মাংস, চর্ম ও রোমের কথা তুলিয়া কবি আমাদেরকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, বালী সত্য সত্যই পক্ষবান বানর, রূপক বানর নহেন। এই বস্তুতন্ত্রতা (realism) পূর্ণাঙ্গের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিয়াছে কিনা পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।)

এক্ষণে দেখা যাক, রাম তাহার উত্তরে বালীর অভিযোগ-গুলি খণ্ডন করিতে পারিলেন কিনা।

রাম বালী দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া তাহাকে ধর্মসম্বত, অর্থসম্পন্ন ও গুণমণ্ডিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন—

“তুমি ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং লোকচার না জানিয়া কেন আর অজ্ঞানভাষ্যতঃ আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি বুদ্ধিমান বয়োবৃদ্ধ আচার্যগণের উপদেশ শ্রবণ না করিয়াই বানরহুলত চপলতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমাকে এইরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। পুরুষজন-কানন সমন্বিত এই পৃথিবী ইক্ষু, কুশলীম বরপাতিগণের অধিকারভূক্ত; পশুপক্ষীসমূহের নিগ্রাহভূতগ্রহও তাহারাই প্রভূ। সত্যবাদী, সরল-বস্তুব, মহাত্মা ভরত এক্ষণে পূর্বপুরুষগণত এই পৃথিবী পালন করিতেছেন। তিনি ধর্ম, অর্থ ও কাম অবগত আছেন এবং ছত্রের দমন ও শিষ্টের পালনে রত রহিয়াছেন। তাহাতে নীতি, বিদ্যা ও সজা বিদ্যমান; তিনি দেশকাল বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে বিফলও যথেষ্ট আছে। আমরা ও অজ্ঞান্য পার্শ্ববর্তন তাহার

ধর্মাত্মগত আদেশে ধর্মবিস্তারের মানসে সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতেছি। যখন সেই ধর্মবৎসল বৃশভিঃশ্রেষ্ঠ ভরত অখিল পৃথী শাসন করিতেছেন, তখন কোন ব্যক্তি ধর্মবিগর্হিত কাণ্ড করিতে পারে? আমরাও ভরতের আদেশানুসারে পরম ধর্মে অবস্থিত থাকিয়া ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তির যথাবিধি বিচার করিতেছি। তুমি গর্হিত কর্ম দ্বারা ধর্মকে স্রষ্ট করিয়া তুলিয়াছ এবং কামপরবশ হইয়া রাজধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছ। ধাঁহার ধর্মপথে চলন, তাহারিগণের নিকটে পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও বিনাদাতা—এই তিন জন পিতা বলিয়া গণ্য। কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আপনার পুত্র এবং গুণবান শিষ্য—এই তিন জনকে পুত্র মনে করিবে; ধর্মই ইহার কারণ। বানর, সাধুদিগের ধর্ম অতি হৃদয়, সদ্গুরুর উপদেশ ভিন্ন উহা অবগত হওয়া যায় না। সর্বভূতের হৃদয়িত আত্মাই শুভাশুভ জ্ঞানিতছেন। যে নিজে জন্মাক, সে কি অন্ত জন্মাক ক পথ দেখাইতে পারে? তেমনি তুমি চপল, তুমি চপল ও মূর্খ বানরগণের সহিত মথরা করিয়া ক্রিপণে ধর্ম অবগত হইবে? আমি এই বাক্যের তাৎপর্য্য তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি: শুধু ক্রোধের বশবর্তী হইয়া আমাকে হত্যা করা তোমার উচিত হইবে না। যে জন্ম আমি তোমাকে হত্যা করিয়াছি, তাহার এই কারণ তোমাকে বলিতেছি, তুমি জন:—

“তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করিয়া জাতুজায়ার সহিত বাস করিতেছ। মহাত্মা হৃদয়ী জীবিত থাকিতেই তুমি প্রবৃত্তহীনীয়া রমাকে কামপরবশ হইয়া শয্যাসঙ্গিনী করিয়াছ—তুমি পাপাচারী। রে বানর, তুমি ধর্মভ্রষ্ট, কামপরবশ: জাতুজায়ার এই দণ্ডে মৃত্যুই একমাত্র দণ্ড, তাহাও তোমাকে প্রদান করিয়াছি। বানরেখর, যে ব্যক্তি লোকবিরুদ্ধ কণ্ঠে লিপ্ত হয় এবং লোকবাবহরের মণ্ডালা আক্রমণ করে, মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন তাহার অঙ্গ নিঃসৃত দেখিতে পাইতেছি না। আমি সবলোত্তর দণ্ডদাতা ক্ষত্রিয় হইয়া তোমার এই পাপ ক্রমা করিতে পারিলাম না। যে ব্যক্তি কামবশত: কত্যা, ভগিনী বা কনিষ্ঠ জাতুবধূতে পসক্ত হয়, শাস্ত্রে বধই তাহার দণ্ড বলিয়া বিহিত হইয়াছে। এগণে ভরত: সীতাপাল, আমরা তাহার আদেশ বহন করিয়া চলিতেছি। তুমি ধর্মপথচ্যুত তোমাকে আমরা ক্রিপণে উপেক্ষা করিব।

“তৎপরে, লক্ষণের সহিত আমার যে প্রকার সৌহৃদ্য, হৃদয়বীর সহিতও সেই প্রকার সৌহৃদ্য। হৃদয়ী নিজের স্ত্রী ও রাজা প্রাপ্তির বাসনার আমার হিতসাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, আমিও সেই সময়ে বানরগণের সহকে তাহাকে (সাহায্য করিবার) প্রাক্কল্পিত দিয়াছি। আমার মত লোক কি কখনও প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে? এই সকল গুণভর ধর্মাত্মগত কারণ তোমার দণ্ড শাস্ত্রমুদ্রিত হইয়াছে কিনা, তাহা তুমি ভাষিয়া দেখ। যে ব্যক্তি ধর্ম মানিয়া চলে, সে বলিবে, যে, তোমার নিগ্রহও সম্পূর্ণরূপে ধর্মকার্য্য, সখার উপকার করাও কর্তব্যকর্ম। ধর্মব্রূতিতে দেখিলে তুমিও তাহা স্বীকার করিবে। চরিত্রোন্নতির সহায় মমুর দুইটি শ্লোক আছে।—মানুষ পাপ কার্য্য করিলে রাজার দণ্ডও গ্রহণ করিয়া নিশাপ হই এবং পুণ্যকর্ম সাধুদিগের স্তায় স্বর্গে গমন করে। দণ্ড সহিয়াই হউক বা মুক্তি পাইয়াই হউক, পাপী পাপ হইতে মুক্ত হয়: কিন্তু রাজা যদি পাপীকে শাসন না করেন, সেই পাপ রাজাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

“যে বানরশ্রেষ্ঠ, ইহার আর একটি কারণ আছে, তাহা তুমি শুন; তাহা শুনিলে তুমি আর (আমার উপরে) ক্রোধ করিবে না। তোমাকে প্রচ্ছন্নভাবে বধ করিয়া আমার মনতাপ বা শোক হইতেছে না। (কেন-না, তাদৃশ ভাবে পণ্ড বধ করা রাজগণের স্বাভাবিক কর্ম।) লোকে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট থাকিয়া বাস্তব্য, পাপ প্রভৃতি বিবিধ কুট উপায়ে বহু যুগ ধরিয়: থাকে। ঐ সকল যুগ পলায়নের উদ্দেশ্যে ধাবমান হউক,

সহিত হটক, পালিত পশুর সহিত যুদ্ধে নিরত থাকুক, প্রমত্ত হটক বা প্রমত্ত হটক, অথবা তাহার। সংগ্রামে যিগুণ হটক, মাংসাদি নাহয় হটকাদিগকে কত কত বধ করে। ইহাতে কিছুই দোষ নাই। তৎপরে, রাজ্যের রাজমিরা সুগয়া করিতে গিয়া থাকেন। সুগয়াচ্ছেই তুমি যুদ্ধ আমার বাণে নিহত হইয়াছ : যেহেতু তুমি শাপাসুগ : তুমি আমার সহিত যুদ্ধ নাই কর অথবা অস্ত্রের সহিত যুদ্ধেই নিযুক্ত থাক, তোমাকে বধ করিয়া আমি অধর্ম করি নাই।) যে বানরশ্রেষ্ঠ রাজগণ জলিত ধর্ম, জীবন ও কল্যাণ প্রদাতা, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদিগকে হিংসা করিবে না, নিন্দা করিবে না, অপমান করিবে না, অপ্রিয় বাক্য করিবে না। তুমি ধর্ম না জানিয়া কেবল ক্ষোষের বশীভূত হইয়া আমাকে দাস দিতেছ, আমি কুলাগত ধর্মই পালন করিয়াছি।"

এখন আমরা বালীর অভিযোগের এক একটি ধারা এবং রামের উত্তর পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। তৎপূর্বে রামের উক্তিগুলির বিশ্লেষণ আবশ্যক।

(১) কিঙ্কিঙ্ক্যা ভরতের অর্থাৎ রামের রাজ্যভুক্ত, হৃতরাং বালীকে দণ্ড দিবার অধিকার তাহার আছে।

(২) বালী কনিষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষকে গ্রহণ করিয়া যোরতর দক্ষ্য করিয়াছেন; মৃত্যুদণ্ডই উহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

(৩) রাম স্বকায়-সাধন অর্থাৎ সীতার উদ্ধারের জন্ত স্ত্রীবেদের সহিত সখ্যস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন এই সর্ভে যে, রাম বালীকে বধ করিয়া স্ত্রীবেদকে কিঙ্কিঙ্কয়ার রাজ্য করিবেন, স্ত্রীবেদ সীতার উদ্ধারে সহায় হইবেন। রাম এই শাস্তি বা পাক্টি (pact) অনুসারে কাব্য করিতে বাধ্য, কেননা, কথা দিয়া কথা রক্ষা না করা গুরুতর অধর্ম।

(৪) রাম কিঙ্কিঙ্কয়ার অধিপতি, বালী তাহার প্রজা; অপরাধী প্রজার দণ্ডবিধান না করিলে রাজ্য পাপে পতিত হইয়া থাকেন।

(৫) বালীকে প্রচ্ছন্ন ভাবে বধ করিয়া রাম কিছুই অজ্ঞায় করেন নাই, কেননা, বালী বানর, যুগযাতে এইরূপে পশুবধ কর্দাই হইতেছে।

(৬) পশুবধে ধর্মগুণের নিয়ম খাটে না।

১। বালী রামের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া উপদ্রব করেন নাই, তবে রাম তাহাকে মারিলেন কেন? ইহার উত্তরে রাম বলিতেছেন, কিঙ্কিঙ্ক্যা তাহাদেরই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, হৃতরাং বালী অপকর্ম করিলে রামের কিঙ্কিঙ্ক্যায় আসিয়া তাহাকে দাসন করিবার অধিকার আছে; শুধু অধিকার আছে, তাই নয়; তিনি ধর্মভঃ রাজকর্তব্য সম্পাদন করিতে, অর্থাৎ অপরাধী বালীকে দণ্ড দিতে, বাধ্য।

কিঙ্কিঙ্ক্যা রঘুবংশীয়দিগের রাজ্যভুক্ত, ইহা আমরা এই প্রথম শুনিলাম। রাম ও স্ত্রীবেদের সখ্যবন্ধনের সময়ে ইহার উল্লেখ থাকিবার কথা, কিন্তু প্রাসঙ্গিক স্থলে তাহার নাম-গন্ধও নাই। ইহাতে মনে হইতেছে, এখানে কবি প্রাচীন ও আধুনিক কালে স্থপরিচিত সাম্রাজ্যবাদীদিগের নীতি (imperialistic policy) স্থাপন করিতেছেন। "আমি তোমার রাজ্য আক্রমণ করি নাই, তবে তুমি আমার রাজ্য আক্রমণ করিলে কেন"—ইহার উত্তর, "তোমার রাজ্য আবার কি? উহা আমার"—অর্থাৎ "জোর বার, মূলক তার।" আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্টেলিয়ার স্বৈরাচার-উপনিবেশগুলি এই নীতির প্রতিমূর্তি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য। ভরত নন্দিগ্রামে রামের পাতৃকা অভিষেক করিয়া তাহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্য পালন করিতেছিলেন। (অযোধ্যা, ১১৫ অধ্যায়)। কিন্তু রাম বলিতেছেন, এক্ষণে ভরত সসাগরা বহুস্রার অধিপতি, তিনি ভরতের আজ্ঞাবহ হইয়া হুস্তের দমন করিতেছেন। এই উক্তিতে রামের মহত্ব ও উদায্যই প্রকাশ পাইতেছে। রাম চতুর্দশ বৎসরের জঙ্গ ভ্রটাবঙ্গলধারী বনবাসী হইয়াছেন; বনবাসের প্রতিক্রমত সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আপনাকে রাজ্য বলিয়া প্রচার করিবেন না। কবি কি রাম ও ভরতের ভ্রাতৃত্বপ্রেম ও রাজ্যের প্রতি অলোভ দ্বারা বালী ও স্ত্রীবেদের রাজ্যলোভ ও জিয়াংসাকে দ্বিষ্ট করিতেছেন? যদি তাহাই হয়, তবে বলা বাইতে পারে, ইহা চারুশিল্পে বৈসাদৃশ্যমূলক চিত্রাঙ্কনের (a study in contrast) একটা দৃষ্টান্ত।

২। বালীর দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, রাম ও তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী; উভয়ের স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ ঘটিবে, ইহা সম্ভবপর নহে; রাম তাহার রাজ্যের বা ঐশ্বর্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাহারও কোন নিদর্শন নাই; তবে তাহাকে বধ করিলেন কেন?

রাম এই অভিযোগ খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, হাঁ, স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ ঘটিয়াছে বইকি। তিনি যখন একেবারে নিঃসহায়, তখন সীতার উদ্ধারের জন্ত স্ত্রীবেদের সাহায্য একান্ত আবশ্যক জ্ঞান করিয়া তাহাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যে, বালীকে বধ করিয়া স্ত্রীবেদকে

কিচ্ছিক্যার রাজ্য দান করিবেন। বালীর স্বার্থ, আপনার জীবনরক্ষা; রামের স্বার্থ সীতার উদ্ধার। এইখানে স্বার্থে স্বার্থে বিরোধ রহিয়াছে।

কিন্তু বালী বলিতেছেন, সীতার উদ্ধারের জন্ত তাঁহাকে বধ করিবার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহাকে বলিলে তিনি অন্যায়সে সীতাকে উদ্ধার করিয়া রামের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিতেন।

রাম স্পষ্ট করিয়া এ-কথার উত্তর দেন নাই। উত্তরটা বোধ হয় এই যে, তিনি যখন নিঃসহায় অবস্থায় সীতার অন্বেষণে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহারই জ্যেষ্ঠ রাজ্য-ভ্রষ্ট ও নিঃসহায় স্ত্রীস্বামীর সহিত তাঁহার অগ্রে সাক্ষাৎ হয়, অবস্থাসাম্যের জন্ত সহজেই উভয়ের সখ্যবন্ধন হইয়াছিল। ‘আমি স্ত্রীস্বামীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তাহা কদাপি ভঙ্গ করিতে পারি না’—এই উক্তিই এই উত্তর অল্পহাত আছে।

তারপর সহায়শূণ্য বনবাসী ব্রাহ্মচারী রামের সহিত দুর্জয় বানরপতি বালী যে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইতেন, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ছিল ?

আর একটা কথা। পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্ত রাম বনবাসী হইয়াছিলেন। তিনি কি নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারেন ? সত্যপালন রামায়ণের মূলমন্ত্র; উহার মুখ্য অর্থ. যে-বাক্য একবার উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা কার্যে পরিণত করিতেই হইবে।

৩। বালী বলিতেছেন, তিনি বানর; বানরের মাংস ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অভক্ষ্য; অতএব রাম তাঁহাকে নিরর্থক হত্যা করিয়াছেন। রাম এই অভিযোগের স্পষ্ট উত্তর দেন নাই; বোধ হয় দেওদা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

৪। বালীর সর্কাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ, রাম ধর্মযুদ্ধের একটি সুবিদিত নিয়ম উলঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছেন।

রাম এই অভিযোগের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ, তিনি বালীকে কেন বধ করিলেন, তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপরে ধর্মযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার যে প্রত্যাবাস হয় নাই, তাহাই বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মসমর্থনের এই দুই ভাগ পবনস্বরসিদ্ধাণী।

(ক) বালী কনিষ্ঠ ভ্রাতার জীবনরক্ষায় তাঁহার পত্নী

কমাকে শয্যাসজিনী করিয়া মহাপাণে লিপ্ত হইয়াছেন; যত্নই উহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। একজ্ঞ রাম স্বয়ং রাজা বা রাজ্য ভরতের প্রতিনিধিরূপে বালীকে বধ করিয়াছেন।

এই যুক্তি বিচারসহ নহে। যদি মনে করি, বালী অনাথ, একটা অনাথ জাতির অধিপতি, তবে আর্থ্যধর্মসীতার দ্বারা তাঁহার বিচার করা কিরূপে জায়সত্ত্ব হইতে পারে ? “কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য, তাহার পত্নী পুত্রবধূস্থানীয়া”—ইহা আর্থ্যজাতির ধর্মশাস্ত্রের কথা। অন্যায়েরা ইহা শুনে নাই, শুনিলেও মানিত না। বালীর কাণ্ড কিচ্ছিক্যায় পাপাচার বলিয়া গণ্য হইলে বানরেরা তাঁহার নিন্দা করিত, রাজ্যে বিদ্রোহ হইত। কবি নিন্দা বা বিদ্রোহের কোনই আভাস দেন নাই। গাংহারা রামের এই যুক্তিটির অল্পমোদন করেন, তাঁহারা বলুন ভারতবর্ষের আইনে যখন জাল করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না, তখন ইংলণ্ডের বিধান মতে এই অভিযোগে নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়া হেষ্টিংস ও ইম্পী কি দুরূহ করিয়াছিলেন ? ফলতঃ আখ্য ও অনাখ্য, সভ্য ও অসভ্য, প্রবল ও দুর্বল—ইহাদিগের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে জায়স্বার্থের এই প্রকার ব্যভিচার অহরহই ঘটনা থাকে।

আবার আমরা ধরিয়া লই, বালী সত্য সত্যই পক্ষপাত বানর, অর্থাৎ পশু। তবে তাঁহার প্রতি শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রয়োগ কি একটা অধৌক্তিক, হাস্যজনক ব্যাপার নহে ? পশুদিগের কি বিবাহপ্রথা বা গম্যাগম্য বিচার আছে ? একটা বানর “সনাতন ধর্ম” ত্যাগ করিয়াছে, ইহার অর্থ কি ?

(খ) রাম ধর্মযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, এখন আমরা এই অভিযোগের উত্তর পাইতেছি। বালী শাখামুগ, পশু। তিনি মুগদ্বার কথা তুলিয়াছেন, রামও মুগদ্বার দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা আত্মসমর্থন করিতেছেন। মুগদ্বারে ধর্মযুদ্ধের কোন বিধানই প্রযোজ্য নহে। বালী একটি নিষেধবচন উল্লেখ করিয়া রামের নিন্দা করিয়াছেন; রাম আরও কয়েকটি নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, পশুবধে সেগুলি নিয়তই লঙ্ঘিত হইতেছে, তাহাতে মুগদ্বারীদিগকে কোনও দোষই স্পর্শ করিতেছে না।

রামায়ণের কবি অনাথ্য জাতিসমূহকে বানর ভ্রূক ইত্যাদি নামে আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা প্রকৃতপক্ষে পশু ছিল

না। ঐশ্বৰ্য্যে ও বিলাসসামগ্রীতে কিঙ্কিৰ্ণ্য অযোধ্যার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিত না। হনুমান শুধু বল বৃদ্ধি ও পরাক্রমে বিখ্যাত ছিলেন, তাহা নহে; তিনি দেশ, কাল বৃদ্ধি কার্য্য করিতে জানিতেন এবং নীতিশাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল; এজন্য স্বপ্ত্রীৰ তাঁহাকে “নয়পণ্ডিত” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (কিঙ্কিৰ্ণ্য। ৪৪।৭।) ইন্দ্রপুত্র বালী ইন্দ্ৰের তুল্যই পরাক্রমশালী ছিলেন (১২।২৩।)। তিনি ইন্দ্রপ্রদত্ত রত্নধৰ্ম্মচিহ্ন স্বৰ্ণহাৰে অলঙ্কৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন (১৭।৫।)। বানরেরা বস্ত্র পরিধান করিত (১২।১৫); বালী স্বগ্রীব প্রভৃতি মহাই পখ্য, মণিমুক্তা ব্যবহার করিতেন। (৩৩।১২, ২০, ২৩)। বালীর অস্তোষ্টিক্রিয়া ও দশরথের অস্তোষ্টিক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। রামের উক্তি হইতেও প্রতিপন্ন হয়, তিনি বালীকে মাহুঘ বলিয়াই দণ্ড দিয়াছিলেন।

কিন্তু রাম অস্ত্রের সহিত যুদ্ধরত বালীকে বধ করিয়া ধৰ্ম্মযুদ্ধের একটি নিবেদবাণী পদদলিত করিয়াছেন, এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়া তাঁহাকে বালীর মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়া বানরত্বের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। প্রাণদণ্ড সহিবার সময় বালী মাহুঘ; অধৰ্ম্মযুদ্ধে নিহত হইবার সময় বালী বানর বা পশু। ইহার পোষকতার জন্ত বালীর দ্বারাও কবি একবার বলিয়াছেন, তিনি বানর। এই অসঙ্গতি বানরবর্ণনায় পূৰ্ণাপন রক্ষিত হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। হনুমান্ জ্ঞানে ও গুণে কোনও মাহুঘ অপেক্ষা হীন ছিলেন না; কবি যেন তাঁহার চিত্র আঁকিতে আঁকিতে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, “ও, হনুমান্ তো বানর,” স্মৃতির বহু বিলম্বে হঠাৎ একবার হনুমানের লাঙ্গুলটি উল্লেখ করিতে হইল। (কিঙ্কিৰ্ণ্য। ৬৭।৪।)।

মহাকবিদিগের অসঙ্গতি ধৰ্ম্মব্যা নহে। মিল্টন তাঁহার

মহাকাব্যে দেবাত্মা ও চুষ্টাশ্বাদিগকে শরীরী ও অশরীরী, দুই প্রকারই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়ুরোপীয়েরা আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে পশু জ্ঞান করিত। তথাকার যুক্তরাজ্যের একটি প্রদেশে (Pennsylvaniaতে) তাম্রবর্ণ জাতির এক এক জনের মস্তকের উপরে বয়ঃক্রমামুসারে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এদেশে যেমন বিষাক্ত সৰ্প মারিতে পারিলে লোকে পুৰস্কার পাইয়া থাকে, তেমনি তথায় এক একটা রেড ইণ্ডিয়ানের মাথা আনিতে পারিলে শিকারীরা রাজসরকার হইতে যথেষ্ট অর্থ লাভ করিত। রামায়ণের কবি কি বালী-বধের কাহিনীদ্বারা ইঙ্গিত করিলেন, আধ্যাত্ম অনায়াদিগকে পশুর অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিতেন না?

কাহিনীটির উপসংহার চমৎকার। রামের উত্তর শুনিয়া বালীর প্রবোধ জন্মিল; তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া রামের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বালীর প্রবোধ জন্মিল বটে, কিন্তু প্রাচীন কালে ধৰ্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সকলের প্রবোধ জন্মে নাই। দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টিষ্ঠিরের মুখে “অন্থ্যামা হত ইতি গভঃ”—এই কথা শুনিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। অজ্ঞান তখন দূরে সংশ্লিপ্তকণের সহিত বৃদ্ধ করিতেছিলেন। আচাৰ্য্যদেবের এই নৃশংস বধের বৃত্তান্ত শুনিয়া বিলাপ করিতে করিতে তিনি ধৃষ্টিষ্ঠিরকে বলিলেন,

চিরঃ স্থাপতি চাক্ষুঃস্থেলোকো সচরাচরে।

রামে বালিবধাব্যবধেবঃ দ্রোণে নিপাতিতে ॥

দ্রোণপৰ্ব। ১২৫।৩৫॥

“বালী-বধে রামের যেরূপ অকীৰ্ত্তি হইয়াছিল, দ্রোণ-বিনাশের জন্য আপনারও সেইরূপ অকীৰ্ত্তি চিরকাল সচরাচর ত্রিভুবনে বিদ্যমান থাকিবে।”

দৃষ্টি-প্রদীপ

ত্রিবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বাদভূষণ :-

জিতু, নীতু ও সীতার পিতা চা-বাগানে কাজ করতেন ও স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া বিদেশেই থাকিতেন চিরকাল। তিনি নাস্তিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ধর্মকর্ম মানিতেন না, পানদোষও ছিল। চা-বাগানে থাকিবার সময় বিশনরী মেমেরা বাসায় আসিয়া ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেলাই শিখাইত। মদ খাইয়া কাজে অবহেলা করার দরুণ হঠাৎ তাঁর চাকরি বায়। এ অবস্থায় দাঁড়াইবার বা মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া কপর্দকশূন্য অবস্থায় তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া গেলেন। অবশেষে নিকরপার অবস্থায় দেশে ফিরিয়া জাতি ভ্রাতার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন।

২

বাবা কলকাতা থেকে দুপুরে বাড়ি ফিরলেন। কাপড় জামা এত ময়লা কখনও বাবার গায়ে দেখিনি। আমায় কাছে ডেকে বললেন,—শোন জিতু, এই পুঁতুলিটা তোর মাকে দিয়ে আয়, আমি একবার ও-পাড়া থেকে আসি। ভট্টাচার্যদের নসিয়ার কারখানায় একটা লোকের নামে চিঠি দিয়েচে—ওদের দিয়ে আসি।

আমি বললাম—এখন যেও না বাবা। চিঠি আমি দিয়ে আসবো'খন, তুমি এসে চা-টা খাও,—বাবা শুনলেন না, চল গেলেন। বাবার মুখ শুকনো, দেখে বুঝলাম যে-জন্তে গিয়েছিলেন তার কোনো জোগাড় হয়নি, অর্থাৎ চাকরি। চাকরি না হলেও আর এদিকে চলে না।

হাতের টাকা ক্রমশঃ ফুরিয়ে এসেচে। আমরা নীচের যে ঘরে থাকি, গল্পবাহুরেরও সেখানে থাকতে কষ্ট হয়। আমরা এসেছি প্রায় মাস-চারেক হ'ল, এই চার মাসেই যা দেখেছি শুনেচি, তা বোধ করি সারা জীবনেও ভুলবো না। যাদের কাছে জ্যোতিষ, কাকীমা দিদি বলে হাসিমুখে ছুটে যাই, তারা যে কেন আমাদের ওপর এমন বিরূপ, কেন তাঁদের ব্যবহার এত নিষ্ঠুর, ভেবেই পাই নে এর কোনো কারণ। আমরা তো আলাদা থাকি, আমাদের খরচে আমাদের রান্না হয়, ওঁদের তো কোনই অঙ্গবিধের মধ্যে আমরা ফেলিনি, তবু কেন বাড়ির লোকের আমাদের ওপর এত রাগ ?

আমার বাবার আপন ভাই নেই, ঠোরা হ'লেন খুঁড়তু-জ্যাঠিতু ভাই। জ্যাঠামশায়ের অবস্থা খুবই ভাল—পাটের বড় ব্যবসা আছে, দুই ছেলে গদিতে কাজ দেখে, ছোট একটি ছেলে এখানকার স্কুলে পড়ে, আর একটি মেয়ে ছিল সে আমাদের আসবার আগে বসন্ত হয়ে মা'বা গিয়েচে। মেজকা'কার তিন মেয়ে—ছেলে হয়নি বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে—আর দুই মেয়ে ছোট। ছোটকা'কার বিয়ে হয়েছে বেশী দিন নয়—বৌও এখানে নেই। ছোটকা'কা অত্যন্ত রাগী লোক, বাড়িতে সর্বদা ঝগড়াঝাঁটি করেন, গানবাজনার ভক্ত, ওপরের ঘরে সকাল নেই সন্ধ্যা নেই হারমোনিয়ম বাজাচ্ছেন।

জ্যাঠাইমার বয়স মায়ের চেয়ে বেশী, কিন্তু বেশ ঠান্ডারী—একটু বেশী মোটা মোটা। গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা। এর বিয়ের আগে নাকি জ্যাঠামশায়ের অবস্থা ছিল খারাপ—তারপর জ্যাঠাইমা এ বাড়িতে বধূরূপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে উন্নতিরও স্বরূপাত। প্রতিবেশীরা খোসামোদ ক'রে বলে—আমার সামনেই আমি কত বার শুনেচি—তোমার মত ভাগ্যিমাণি ক'জন আছে বড়-বৌ? এদের কি-ই বা ছিল, তুমি এলে আর সংসার সব দিক থেকে উৎকলে উঠলো, কপাল বলে একেই বটে!...সামনে বলা নয়—এমন মন আজকাল ক'জনের বা আছে? দেওয়ান-খোঁসার, খাওদানোর-মাগানোর—আমার কাছে বাপু হক কথা।...মেজখুড়ীমা ওর মধ্যে ভাল লোক। কিন্তু তিনি কাকুর সপক্ষে কথা বলতে সাহস করেন না, তাঁর ভাল করবার ক্ষমতা নেই, মন্দ করবারও না। মেজকা'কা তেমন কিছু রোজগার করেন না, কাজেই মেজখুড়ীমার কোনো কথা এ বাড়িতে খাটে না।

বছরখানেক কেটে গেল। বাবা কোথাও চাকরি পেলেন না। কত জায়গায় ইন্টারিট করলেন, শুকনো মুখে কত বার বাড়ি ফিরলেন। হাতে যা পয়সা ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে এল।

সকালে আমরা বাড়ির সামনে বেলতলায় খেলছিলাম। সীতা বাড়ির ভেতর থেকে বার হয়ে এল, আমি বললাম—
চা হয়েছে সীতা ?

সীতা মুখ গম্ভীর করে বললে—চা আর হবে না। মা বলচে চা চিনির পয়সা কোথায় যে চা হবে ? কথাটা আমার বিশ্বাস হ'ল না। সীতার চালাকি আমি যেন ধরে ফেলেচি, এই রকম হুরে তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললাম,—যাঃ, তুই বুঝি খেয়ে এলি ? চা-বাগানে আমাদের জন্ম, সকালে উঠে চা খাওয়ার অভ্যাস আমাদের জন্মগত, চা না খেতে পাওয়ার অবস্থা আমরা কল্পনাই করতে পারিনে। সীতা বললে—না দাদা, সত্যি, তুমি দেখে এসো চা হচ্ছে না। তারপরে বিজ্ঞের স্বরে বললে—বাবার যে চাকরি হচ্ছে না, মা বলছিল দু'দিন পরে আমাদের ভাতই জুটবে না তো চা!...আমরা এখন গরিব হয়ে গিয়েছি যে।

সীতার কথায় আমাদের দারিদ্র্যের রূপটি নূতনতর মূর্তিতে আমার চোখের সামনে ফুটল। জানতুম যে আমরা গরিব হয়ে গিয়েছি, পরের বাড়িতে পরের মুখ চেয়ে থাকি, মথলা বিভানায় শুই, জলখাবার খেতে পাইনে, আমাদের কারুর কাছে মান নেই। সবই জানি। কিন্তু এসবেও নিজের দারিদ্র্যের স্বরূপটি তেমন ক'রে বুঝিনি, আজ সকালে চা না খেতে পেয়ে সেটা যেমন ক'রে বুঝলাম।

বিকেলের দিকে বাবা দৌঁপ পথ বেয়ে কোথা থেকে বাড়িতে আসছেন। আমায় দেখে বললেন—শোন জিতু, চল শিমুলের তুলো ফুড়িয়ে আনি গে—

আমি শিমুল তুলোর গাছ এই দেশে এসে প্রথম দেখেছি—গাছে তুলো হয় বইয়ে পড়লেও চোখে দেখেছি এখানে এসে এই বৈশাখ মাসে। আমার ভারি মজা লাগল—উৎসাহ ও খুশীর হুরে বললাম—শিমুল তুলো ? কোথায় বাবা ?...চল বাই—সীতাকে ডাকবো ?...

বাবা বললেন—ডাক্, ডাক্, সবাইকে ডাক্—চল আমরা যাই—

বাবাও আমার পেছনে পেছনে বাড়ি চুকলেন। পরের দিন যষ্ঠী ও দানার জন্ম-বার। মা কোথা থেকে খানিকটা দুধ জোগাড় ক'রে রান্নাঘরের দাণ্ডায় উঠলে বসে বসে কীরের পুতুল গড়ছিলেন—বাবার স্বর শুনেই মুখ তুলে

চেয়ে এক চমক বাবার দিকে দেখেই একবার চকিত দৃষ্টিতে ওপরে জ্যাঠাইমাদের বারান্দার দিকে একবার কি জল্পে চাইলেন—তারপর পুতুল-গড়া ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বাবার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন—যা জিতু, বাইরে হেলা কর গে যা—

আমি অবাক হয়ে গেলুম। বলতে যাচ্ছিলাম—মা, বাবা যে শিমুল তুলো ফুড়োবার—কিন্তু মার মুখের দিকে চেয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। একটা কিছু হয়েছে যেন—কিন্তু কি হয়েছে আমি বুঝলাম না। বাবা মদ খেয়ে আসেন নি নিশ্চয়—মদ গেলে আমরা বুঝতে পারি—খুব ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি, দেখলেই বুঝি। তবে বাবার কি হ'ল ?...

অবাক হয়ে বাইরে চলে এলাম।

৩

এখানকার স্কুলে আমি ভর্তি হয়েছি, কিন্তু দাদা আর পড়তে চাইলে না বলে তাকে ভর্তি করা হয়নি। প্রথম কয় মাস মাইনের জন্মে মাষ্টার-মশায়ের তাগাদার চোটে আমার চোখে জল আসত—সাড়ে ন' আনা পয়সা মাইনে—তাও বাড়িতে চাইলে কারুর কাছে পাইনে, বাবার মুখের দিকে চেয়ে বাবার কাছে তাগাদা করতে মন সরে না।

শনিবার, সকালে সকালে স্কুলের ছুটি হবে। স্কুলের কেরানী রামবাবু একখানা খাতা নিয়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকে মাইনের তাগাদা শুরু করলেন। আমার মাইনে বাকী দু-মাসের—আমার ক্লাস থেকে উঠিয়ে দিয়ে বললেন—বাড়ি গিয়ে মাইনে নিয়ে এস থোকা। নইলে আর ক্লাসে বসতে দেবো না কাল থেকে। আমার ভারি লজ্জা হ'ল—দুখ তো হ'লই। আড়ালে ডেকে বললেই তো পারতেন রামবাবু, ক্লাসে সকলের সামনে—ভারি—

দুপুরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করচে। স্কুলের বাইরে একটা নিমগাছ। ভারি স্নানর নিমফুলের ঘন গন্ধটা। সেখানে ঝাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম কি করা যায়। মাকে বলব বাড়ি গিয়ে ? কিন্তু জানি মায়ের হাতে কিছু নেই, এখনি পাড়ায় ধার করতে বেরুবে, পাবে কি না-পাবে, ছোট মুখ ক'রে বাড়ি ফিরবে—ওতে আমার মনে বড় লাগে।

হঠাৎ আমি অবাক হয়ে পথের ওপারে চেয়ে বইলুম—ওপারে সামু নাপিতের মদীখানার দোকানটা আর নেই, পাশেই সে ক্ষিতে ঘুমির দোকানটাও নেই—তার পাশের জামার দোকানটাও নেই—একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের ধারে বড় বড় বাঁশগাছের মত কি গাছের সারি—কিন্তু বাঁশগাছ নয়। দুপুরবেলা নয়, বোধ হয় যেন রাত্রি—জ্যোৎস্না রাত্রি—দূরে সাদা রঙের একটা অদ্ভুত গড়নের বাড়ি, মন্দিরও হ'তে পারে।

নিমগাছের গুঁড়িটাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, যাত্রায়ে সামনের দিকে ঝুঁকি ভাল দেখতে পাওয়া গেল, তখনও তাই আছে জ্যোৎস্নাভরা একটা মাঠ, কি গাছের সারি—দূরের সাদা বাড়িটা। দু-মিনিট.. পাঁচ মিনিট। তাড়াতাড়ি চোখ মুছলাম আবার চাইলুম—এখনও অবিকল তাই। একেবারে এত স্পষ্ট, গাছের পাতাগুলো যেন গুণ্ণতে পারি, পাখীদের ডানার সব রং বেশ ধরতে পারি।...

তার পরেই আবার কিছু নেই, খানিকক্ষণ সব শূন্য—তার পরেই সামু নাপিতের দোকান, পাশেই ক্ষিতে ঘুমির দোকান।

বাড়ি চলে এলুম। এখনই আমি এই রকম দেখি, তখন আমার গা কেমন করে—হাতে পায়ে যেন জ্বোর নেই, এমন হয়। মাথা যেন হালকা মনে হয়। কেন এমন হয় আমার? কেন আমি এ-সব দেখি, কাউকে একথা বলতে পারিনে, মা, বাবা, দাদা, সীতা, কাউকে নয়। আমার এমন কোনো বন্ধু বা সহপাঠী নেই, যাকে আমি বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বলি। আমার মনে যেন কে বলে—এরা এ-সব বুঝবে না। বন্ধুরা হয়ত হেসে উঠবে কি ওই নিয়ে ঠাট্টা করবে।

ওবেলা খেয়ে বাইনি। রান্নাঘরে ভাত খেতে গিয়ে দেখি শুধু সিমভাতে আর কুমড়োর ডাটা চচ্চড়ি। আমি ডাটা খাইনে—সিম যদি বা খাই সিমভাতে একেবারেই মুখে ভাল লাগে না। মাকে রাগ করে বললুম—ও দিয়ে ভাত খাবো কি করে? সিমভাতে দিলে কেন? সিমভাতে আমি খাই কখনও?

কিন্তু মাকে এখন আমি বকছিলুম আমার মনে তখন মায়ের ওপর রাগ ছিল না। আমি জানি আমাদের ভাল

খুওয়াতে মায়ের ঘরের ক্রটি কোনো দিন নেই, কিন্তু এখন মা অকম, অসহায়—হাতে পয়সা নেই, ইচ্ছে থাকলেও নিরুপায়। মায়ের এই বর্তমান অকমতার দরুন মায়ের ওপর যে করুণা সেটাই দেখা দিল রাগে পরিবর্তিত হয়ে। চেয়ে দেখি মায়ের চোখে জল। মনে হ'ল এ সেই মা—চা-বাগানে থাকতে মিস নটনের কাছ থেকে আমাদের খাওয়ানোর জন্তে কেক তৈরী করার নিয়ম শিখে বাজার থেকে ঘি-ময়দা কিচমিচ ডিম চিনি সব আনিয়ে সারা বিকেল ধরে পরিশ্রম করে কতকগুলো স্বাদগন্ধহীন নিরুচি ময়দার চিপি বানিয়ে বাবার কাছে ও পর দিন মিস নটনের কাছে হাঙ্গাম্পদ হয়েছিলেন। তারপর অবিশ্রান্ত মিস নটন ভাল করে হাতে ধরে শেখায় এবং মা ইদানীং খুব ভাল কেক তৈরী করতে পারতেন।

মা বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের ধরণ-ধারণ, রান্না, আচার-ব্যবহার ভাল জানতেন না। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে চা-বাগানে চলে গিয়েছিলেন, সেখানে একা একা কাটিয়েছেন চিরকাল সমাজের বাইরে—পাড়াগাঁয়ের ব্রত নেম্ পূজো আচ্ছা আচার এ-সব তেমন জানা ছিল না। এদের এই ঘোর আচার্যী সংসারে এসে পড়ে আলাদা থাকলেও মাকে কথা সহ্য করতে হয়েছে কয় নয়। পয়সা থাকলে যেটা হয়ে পাড়াত গুল—হাত খালি থাকতে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাট্টা, বিজ্রপ, শ্লেষের ব্যাপার—জংলীপনা থিরিষ্টানি বা বিবিয়ানা। মার সহগুণ ছিল অসাধারণ, মুখ বুজে সব সহ্য করতেন, কোনদিন কথাটিও বলেন নি। ভয়ে ভয়ে ওদের চালচলন, আচার-ব্যবহার শিখবার চেষ্টা করতেন—নকল করতে যেতেন—তাতে ফল অনেক সময়ে হ'ত উল্টো।

আরও মাসকতক কেটে গেল। এই ক-মাসে আমাদের যা অবস্থা হয়ে পড়লো, জীবনে ভাবিনিও কোনো দিন যে অত কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। দু-বেলা ভাত খেতে আমরা ফুলে গেলাম। ফুল থেকে এসে বেলা তিনটের সময় খেয়ে রাজে আর কিছু খাওয়ার ইচ্ছেও হ'ত না। ভাত খেয়ে ফুলে যাওয়া ঘটত না প্রায়ই, অত সকালে মা চালের জোগাড় করতে পারতেন না, সেটা প্রায়ই ধার করে নিয়ে আসতে হ'ত। সব সময় হাতে পয়সা থাকত না—এর মানে, আমাদের চা-বাগানের সৌখীন জিনিষপত্র, দেওয়াজ, বাজ—

এই সব বেচে চলছিল—সব সময়ে তার খন্দের জুটতো না। মা বোমাহুঘ, বিশেষতঃ এটা অপরিচিত স্থান, নিজের গুপ্ত-বাড়ি হলেও এর সঙ্গে এত কাল কোনো সম্পর্কই ছিল না—কিন্তু মা ওসব মানতেন না, লজ্জা ক'রে বাড়ি বসে থাকলে তাঁর চলত না, যে-দিন ঘরে কিছু নেই, পাড়ায় বেরিয়ে যেতেন, দু-একটা জিনিষ বেচবার কি বন্ধক দেবার চেষ্টা করতেন পাড়ায় মেয়েদের কাছে—প্রায়ই সৌখীন জিনিষ, হয়ত একটা ভাল কাচের পুতুল, কি গালায় পেলুনা, চন্দনকাঠের হাতপাখা—এই সব। সেলাইয়ের কলটা ছোটকাকীমা সিকি দামে কিনেছিলেন। বাবার গায়ের ভারি পুরু পশমী ওভারকোটটা সরকাররা কিনে নিয়েছিল আট টাকায় মোটে এক বছর আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাবা তৈরি করেছিলেন।

চাল না-হয় একরকম ক'রে জুটলো, কিন্তু আমাদের পরণের কাপড়ের দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। আমাদের সবারই একগানা ক'রে কাপড়ে এসে ঠেকেচে—তাও ছেঁড়া, আমার কাপড়খানা তো তিন জায়গায় সেলাই। সীতা বলত তুই বড় কাপড় ছিঁড়িস দাদা। কিন্তু আমার দোষ কি? পুরোনো কাপড়, একটু জ্বরে লাফালাফি করাতেই ছিঁড়ে যেত, মা অম্মি সেলাই করতে বসে যেতেন।

বাবা আজকাল কেমন হয়ে গেছেন, তেমন কথাবার্তা বলেন না—বাড়িতেও থাকেন না প্রায়ই। তাঁকে পাওয়াই যায় না যে কাপড়ের কথা বল। তা ছাড়া বাবার মুখের দিকে চেয়ে কোনো কথা বলতেও ইচ্ছে যায় না। তিনি সব সময়ই চাকরির চেষ্টায় এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু কোথাও এ পর্যন্ত কিছু জোটেনি। মাস দুই একটা গোলদারী দোকানে খাতাপত্র লেখবার চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর সে চাকরি নেই—সেইজ্যোতামশায়ের ছেলে নবীন বলছিল নাকি মদ খেয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এসে বাবা এক দিনও মদ খেয়েছেন ব'লে আমার মনে হয় না, বাবা মদ খেলেই উৎপাত করেন আমার ভাল করেই জানি, কিন্তু এখানে এসে পর্যন্ত দেখছি বাবার মত শাস্ত মাছুষটি আর পৃথিবীতে বৃষ্টি নেই। এত শাস্ত, এত ভালমাহুঘ স্নেহময় লোকটি মদ খেলে কি হয়েই যেতেন! চা-বাগানের সে-সব রাতের কীষ্টি মনে হলেও ভয় করে।

রবিবার। আমার হুল নেই, আমি সারাদিন বসে বসে

ম্যাজেন্টা গুলে রং তৈরি করেছি, দু-তিনটে শিশিতে ভর্তি করে রেখেছি, সীতার পাঁচ-ছথানা পুতুলের কাপড় রঙে ছুপিয়ে দিয়েছি—ক্লাসের একটা ছেলের কাছ থেকে অনেকখানি ম্যাজেন্টার গুঁড়ো চেয়ে নিয়েছিলুম।

সন্ধ্যার একটু পরেই খেয়ে শুয়েছি। কত রাগে যেন ঘুম ভেঙে গেল—একটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখি আমাদের ঘরের দোরের জ্যোতাইমা, আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনের দল, ছোটকাকা—সবাই দাঁড়িয়ে। মা কান্দচে—সীতা বিজানায় সব ঘুম ভেঙে উঠে বসে চোখ মুছে। আমার জ্যাঠতুতো ভাই হেসে বললে—ঐ দ্যাখ তোর বাবা কি করছে! চেয়ে দেখি ঘরের কোণে থাটে বাবা তিনটে বালিসের তুলো ছিঁড়ে পুটুলি বাঁধছেন। তুলোতে বাবার চোখমুখ, মাথার চুল, সারা গা এক অদ্ভুত রকম হয়েছে দেখতে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করলুম—কি হয়েছে বাবা?

বাবা বললেন—চা-বাগানে আবার চাকরি পেয়েছি—ছোট সাহেব তার করেছে; সকালের গাড়ীতে যাব কি-না তাই পুটুলিগুলো বেখেঁচে—এখন না রাগলে—ক'টা বাজল রে থোকা?

আমার বয়স কম হলেও আমার বুঝতে দেরি হ'ল না যে এবার বাবা মাতাল হ'ল নি। এ অল্প জিনিষ। তার চেয়েও গুরুতর কিছু। ঘরের দৃশ্যটা আমার মনে চিরকালের একটা ছাপ করে দিয়েছিল—জীবনে কখনও তুলিনি—চোখ বুঁজলেই উত্তরজীবনে আবার সে রাত্রির দৃশ্যটা মনে এসেচে। একটা মাত্র কেরোসিনের টেমি জলচে ঘরে—তারই রাঙা ক্রীণ আলোয় ঘরের কোণে বাবার তুলো-মাথা চোঁরা—মাথায় মুখে, কানে পিঠে সর্বত্র ছেঁড়া বালিসের লালচে পুরানো বিচি-গুলা তুলো মেজতে বসে মা কান্দছেন—দরজার কাছে কৌতুক দেখতে খুড়ীমা জ্যোতাইমারা জড় হয়েছেন—খুড়তুতো ভাই বোনেরা হাসচে।...দাদাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম না, বোধ হয় বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবে।

পর দিন সকালে আমাদের ঘরের সামনে উঠানে দলে দলে লোক জড় হ'তে লাগল। এদের মুখে শুনে প্রথম বুঝলাম বাবা পাগল হয়ে গিয়েছেন। সংসারের কষ্ট, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, পরের বাড়ির এই যন্ত্রণা—এই সব দিনরাত ভেবে ভেবে

বাবার মাথা গিয়েচে বিগড়ে। অবিশি এ-সব কারণ অনুমান করেছিলুম বড় হ'লে অনেক পরে।

বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে লাগল, যারা কোনো দিন এর আগে বাবার সঙ্গে মৌখিক ভিত্তি আলাপটা করতেও আসেনি তারা মজা দেখতে আসতে লাগল দলে দলে।

বাবার মৃত্তি হয়েছে দেখতে অদ্ভুত। রাত্রে না ঘুমিয়ে চোখ বসে গিয়েচে—চোখের কোনে কালি মেড়ে দিয়েচে যেন। সন্ধ্যাে তুলো মেখে বাবা সেই রাতের বিছানার ওপরই বসে আপন মনে কত কি বকছেন। ছেলেপিলের দল এপাড়া-ওপাড়া থেকে এসেছে। তারা ঘরের দোরের ভিড় করে দাঁড়িয়ে। কেউ বা উকি মেরে দেখচে—হাসাহাসি করচে। আমাদের সঙ্গে পড়ে এই পাড়ার নবীন বীড়ুয়ার ছেলে শার্ট—সে একবার উকি মেরে দেখতেই বাবা তাকে কি একটা ধমক দিয়ে উঠলেন। সে ভাব করা ভয়ের স্বরে বলে উঠল—ও বাবা! মারবে না কি?—বলেই পিছিয়ে এল। ছেলের দলের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ পড়ে গেল।

এক জন বললে—আবার কি রকম ইংরিজি বলচে দ্যাখ—

আমি ও সীতা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি। আমরা কেউ কোনো কথা বলছি নে।

আর একটু বেলা হ'লে জ্যাঠামশায় কি পরামর্শ করলেন সব লোকজনের সঙ্গে—আমার মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—বৌমা সবাই তো দেখতে পাচ্—তোমাদের কপাল ছাড়া আর কি বলব। ভূষণকে এখন বেঁধে রাখতে হবে—সেই মতই সবাই করেচেন। ছেলেপিলের বাড়ি—পাড়ার ভেতরকার কাণ্ড—ওরকম অবস্থায় কখন কি করে বসে, তা বলা যায় না...তা তোমায় একবার বলটি দরকার তাই—

আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল—বাবাকে বাঁধবে কেন? বাবা তো এক বকুনি ছাড়া আর কান্নার কিছু অনিষ্ট করতে বাচ্ছেন না? কেন তবে—

আমার মনের ভাষা বাঁকা খুঁজে গেলে না প্রকাশের—মনেই রয়ে গেল। বাবাকে সবাই মিলে বাঁধলে। আচ্ছা, কি কসে কসেই বাঁধলে! অস্ত্র ডাড়া কোথাও পাওয়া গেল না বা ছিল না—জ্যাঠামশায়ের খিড়কী পুকুর ধারের গোয়াল বাড়ি থেকে গরু বাঁধবার দড়া নিয়ে এল—তাই দিয়ে বাঁধা হ'ল।

আমার মনে হ'ল অতটা ছোর করে বাবাকে বাঁধবার দরকার কি! বাবার হাতের শির দড়ির মত ফুলে উঠেচে যে। সেজকাকাকে চুপিচুপি বললুম—কাকাবাবু, বাবার হাতে লাগচে, অত কসে বেঁধেচে কেন? বলুন না ওদের?।

কাকা সে-কথা জ্যাঠামশায়কে ও নিতাইয়ের বাবাকে বললেন—তুমিও কি খেপলে নাকি রমেশ? হাত আলগা থাকবে পাগলের?...তা হলে পা খুলতে কতক্ষণ—তারপরে আমার দিকে চেয়ে জ্যাঠামশায় বললেন—বাও জিতু বাবা—তুমি বাড়ির ভেতর যাও—নয় তো এখন বাইরে গিয়ে বসো।

আবার বাবার হাতের দিকে চেয়ে দেখলুম—দড়ির দাগ কেটে বসে গিয়েচে বাবার হাতে। সেই রকম তুলো-মাথা অদ্ভুত মৃত্তি!...

বাইরে গিয়ে আমি একা গাঁয়ের পেড়নের মাঠের দিকে চলে গেলুম—একটা বড় তেঁতুলগাছের তলায় শরা ধপুস ৫ বিকেল চাপ করে বসে রইলুম।

৪

দিনকতক এই ভাবে কাটল। তার পর পাড়ার দু-পাঁচ জন লোকে এসে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কি পরামর্শ করলে। বাবাকে কোথায় তারা নিয়ে গেল সবাই বললে কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তারা ফিরেও এল, শুনলুম বাবাকে নাকি হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েচে। শীগগিরই সেরে বাড়ি ফিরবেন। আমরা আশঙ্ক হনুম।

দশ-বার দিন পরে একদিন বিকেলের দিকে আমি ও সীতা পথে খেলা করছি, এমন সময়ে সীতা বললে—এ যে বাবা!...দূরে পথের দিকে চেয়ে দেখি বাবাই বটে। ছুটে আমরা বাড়িতে মাকে খবর দিতে গেলুম। একটু পরে বাবা বাড়ি ঢুকলেন—এক হাঁটু ধুলো, রুম্ব চুল। ওপর থেকে জ্যাঠাইমা নেমে এলেন, কাকারা এলেন। বাবাকে দেখে সবাই চটে গেলেন। সবাই বুঝতে পারলে বাবা এখনও মারেন নি, তবে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসার কি দরকার?

বাবা একটু বসে থেকে বললেন ভাত আছে? কাল ওই দিকের একটা গায়ে ছপরে ছুটে খেতে দিয়েছিল, আর কিছু খাইনি সারাদিন, খিদে পেয়েচে। কলকাতা থেকে পায়ে

হেঁটে আস্চি—ছেলেপিলে ছেড়ে থাক্তে পারলাম না—চলে এলাম।

একটু পরেই বোঝা গেল বাবা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং যেমন পাগল তেমনি আছেন। এবার আমাদেরও রাগ হ'ল—মায়ের কথা বলতে পারিনে, কারণ তাঁকে রাগ প্রকাশ করতে কখনও দেখিনি—কিন্তু আমি সীতা দাদা স্মিন ভাই বোনে খুবই চটলাম।

আমাদের চটবার কারণও আছে—খুব সঙ্গত কারণই আছে। আমাদের প্রাণ এখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাবা আবার পুরোমায় পাগল হয়ে উঠলেন—তিনি দিন রাত বসে বসে বকেন আর কেবল খেতে চান। মা ছুটি বাসি মুড়ি, কোনো দিন বা ভিজ্জ চাল, কোনো দিন শুধু একটু গুড়—এই খেতে দেন। তাও সব দিন বা সব সময় জোটানো কষ্টকর। আমরা দুপুরে খাই তো রাতে আর কিছু খেতে পাইনে—নয়ত সারাদিন পরে হয়ত সন্ধ্যার সময় খাই। মা কোথা থেকে চাল জোগাড় করে আনেন আমরা জানিনে—কখনও জিগেসও করিনি। কিন্তু বাড়িতে আর আমাদের তিষ্ঠবার যো নেই। বাড়িহস্ত লোক আমাদের ওপর বিরূপ—হু-বেলা তাদের অনাদর আর মুখাড়া সহ্য করা আমাদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের দিনগুলোর কথা মনে হয়, সেখানে আমাদের কোনো কষ্ট ছিল না—অবস্থা ছিল অত্যন্ত সচ্ছল—ছেলেবেলায় সীতাকে ভুটিয়া চাকরে নিয়ে বেড়াতে আর থাপা মালুষ করেছিল আমাকে। ছ-বছর বয়েস পর্যন্ত আমি থাপার কাঁধে উঠে বেড়াতাম মনে আছে। আমাদের এই বর্তমান দুরবস্থার জন্ত বাবাকে আমরা মনে মনে দায়ী করেছি। বাবা কেন আবার ভাল হয়ে সেরে উঠুন না? তা হ'লে আর আমাদের কোনো দুঃখই থাকে না। কেন বাবা গুরুকম পাগলামি করেন? ওতে লজ্জার যে ঘরে-বাইরে আমাদের মুখ দেখাবার যো নেই।

সে-দিন সকালে মেজখুড়ীমা এসে আমাদের সঙ্গে খুব ঝগড়া বাধালেন। মেজখুড়ীমাও এসে যোগ দিলেন। তাঁদের বাগানে বাতাবী নেবুগাছ থেকে চার-পাঁচটা পাকা নেবু চুরি গিয়েছে। খুড়ীমা এসে মাকে বললেন—এ আমাদেরই কাজ—আমরা খেতে পাইনে, আমরাই লেবু চুরি ক'রে ঘরে রেখেছি। তাঁরা সবাই মিলে আমাদের ঘর খানাতল্লাসী করতে চাইলেন।

মা বললেন—এসে দেখে যান মেজদি, আমার ঘরে তো লোহার সিন্দুক নেই যেখানে আমার ছেলেমেয়েরা নেবু লুকিয়ে রেখেছে—এসে দেখুন—

শেষ পর্যন্ত বাবা ঘরে আছেন ব'লে তাঁরা ঘরে ঢুকতে পারলেন না, কিন্তু সবাই ধরেই নিলেন যে, নেবু আমাদের ঘরেই আছে, খানাতল্লাসী করলেই বেরিয়ে পড়ত। খুব ঝগড়া-বাঁটি হ'ল—তবে সেটা হ'ল একতরফা, কারণ এ-পক্ষ থেকে তার জবাব কেউ দিলে না।

জ্যাঠাইমা এ-বাড়ির কর্তা, তাঁকে সবাই মেনে চলে, ভয়ও করে। তিনি এসে বললেন—হয় তোমরা বাড়ি থেকে চলে যাও নয়ত ঘরের ভাড়া দাও।

সীতা এসে আমাদের বললে—জ্যাঠাইমা এবার বাড়িতে আর থাক্তে দেবে না, না দেবে না দেবে, আমরা কোথাও চলে যাই চল দাদা।

দিন দুই পরে জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে কি একটা মিটমাট হ'ল। ঠিক হ'ল যে দাদা চাকুরির জোগাড় করতে কলকাতায় যাবে, ঘরে আমরা আপাততঃ কিছুকাল থাক্তে পাব। কিন্তু বাড়ির ওপাড়ার সবাই বললে—পাগলটাকে আর বাড়ি রেখে দরকার নেই, ওকে জলেদলে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আস।

সত্যি কথা বলতে গেলে বাবার ওপর আমাদের কাকুর আর মমতা ছিল না। বাবার চেহারাও হয়ে উঠেছে অদ্ভুত। একমাথা লম্বা চুল জট পাকিয়ে গিয়েছে—আগে আগে মা নাইয়ে দিতেন, আজকাল বাবা কিছুতেই নাইতে চান না, কাছে যেতে দেন না, কাপড় ছাড়েন না—গায়ের গন্ধে ঘরে থাকা অসম্ভব। মা এক দিনও রাতে ঘুমতে পারেন না—বাবা কেবলই ফাইফরমাজ করেন—জল দাও, পান দাও—আর কেবলই বলেন খিদে পেয়েছে। কখনও বলেন চা ক'রে দাও। না পেলেই তিনি আরও খেপে ওঠেন—এক মা ছাড়া তখন আর কেউ সামলে রাখতে পারে না—আমরা তখন ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই, মা বুঝিয়ে-হুজিয়ে শান্ত করে চুপ করিয়ে রাখেন, নয়ত জোর ক'রে বালিশে শুইয়ে দিয়ে বাতাস করেন, পা টিপে দেন—কিন্তু তাতে বাবা সাময়িক চুপ ক'রে থাকেন বটে, ঘুমোন না। পাগল হয়ে পর্যন্ত বোধ হয় একদিনও বাবার ঘুম হয়নি। নিদ্রাও

ঘুমলেন না, কাউকে ঘুমতে দেবেনও না—সারারাত চীৎকার, বকুনি, ইংরিজি বক্তৃতা, গান—এই সব করবেন। সবাই বলে ঘুমলে না-কি বাবার রোগ সেরে যেত।

শেষ পর্যন্ত হয়ত মা মত দিয়েছিলেন, হয়ত বলেছিলেন—তোমরা যা ভাল বোঝা করো বাপু। মোটের ওপর এক দিন স্কুলে দাদা এসে বললে—সকাল সকাল বাড়ি চল আজ জিভু—আজ বাবাকে আড়াগাঁয়ের জলার ধারে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে—তুই আমি নিতাই সিধু আর মেজকাকা যাব।

একটু পরে আমি ছুটি নিয়ে বেরুলাম। গিয়ে দেখি মা দালানে বসে কাঁদছেন, আমরা যাবার আগেই নিতাই এসে বাবাকে নিয়ে গিয়েছে। আমরা খানিক দূরে গিয়ে ওদের নাগাল পেলাম—পাড়ার চার-পাঁচ জন ছেলে সঙ্গে আছে, মধ্যখানে বাবা। ওরা বাবার সঙ্গে বাজে বকচে—শিকারের গল্প করচে, বাবাও খুব বক্চেন। নিতাই আমাদের বাবার সামনে যেতে বারণ করতে আমি আর দাদা পেছনেই বইলাম। ওরা মাঠের রাস্তা ধরে অনেক দূর গেল, একটা বড় বাগান পার হ'ল, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঘেমে আমরা সবাই নেয়ে উঠলাম। রোদ যখন পড়ে গিয়েছে তখন একটা বড় বিলের ধারে সবাই এসে পৌঁছলাম। নিতাই বললে—এই তো আড়াগাঁয়ের জলা—চল, বিলের ওপারে নিয়ে যাই—ওই হোগলা বনের মধ্যে ছেড়ে দিলে আর পথ খুঁজে পাবে না রাস্তিরে। আমরা কেউ ওপারে গেলুম না—গেল শুধু সিধু আর নিতাই। খানিকটা পরে ওরা ফিরে এসে বললে—চল পালাই—তোর বাবাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়ে এসেচি—বসে বসে টান্চে। চল ছুটে পালাই—

সবাই মিলে দৌড় দিলাম। দাদা তেমন ছুটেতে পারে না, কেবলই পেছনে পড়তে লাগল। সন্টার ঘোরে জলা আর জঙ্গলের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া যায় না—এক প্রহর রাত হয়ে গেল বাড়ি পৌঁছতে। কিন্তু তিন দিনের দিন বাবা আবার বাড়ি এসে হাজির। চেহারার দিকে আর তাকানো যায় না—কাদা-মাখা ধুলো-মাখা অতি বিকট চেহারা। বেল না কি ভেঙে খেয়েচেন—সারা মুখে, গালে বেলের আটা ও শাস মাখানো। মা নাইয়ে-ধুইয়ে ভাত খেতে দিলেন, বাবা খাওয়া-দাওয়ার পর সেই

যে বিছানা নিলেন, দু-দিন চার দিন ক'রে ক্রমে পনের দিন কেটে গেল, বাবা আর বিছানা থেকে উঠলেন না। লোকটা যে কেন বিছানা ছেড়ে ওঠে না—তার কি হয়েছে—এ-কথা কেউ কোনো দিন জিগ্যাসও করলে না। মা যে-দিন যা ছোট্টে খেতে দেন, মাঝে মাঝে নাইয়ে দেন—পাড়ার কোনো লোকে উকি মেরেও দেখে গেল না।

জ্যাঠামশাইরা হতাশ হয়ে গিয়েচেন। তাঁরা আর আমাদের সঙ্গে কথা কন না, তাঁদের ঘরে-দোরের ওঠা আমাদের বন্ধ। আমরা কথা বলি চুপি চুপি, চলি পা টিপে টিপে চোরের মত, বেড়াই মহা অপরাধীর মত—পাছে ওঁরা রাগ করেন, বিরক্ত হন, আবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে আসেন।

এক দিন না খেয়ে স্কুলে পড়তে গিয়েচি—অল্প দিনের মত টিফিনের সময় সীতা খাবার জুড়ে ডাক্তার এল না। প্রায়ই আমি না খেয়ে স্কুলে আসতাম, কারণ অত সকালে মা রান্না করতে পারতেন না—রান্না শুধু করলেই হ'ল না, তার জোগাড় করাও তো চাই। মা কোথা থেকে কি জোগাড় করতেন, কি ক'রে সংসার চালাতেন, তিনিই জানেন। আমি কখনও তা নিয়ে ভাবিনি। আমি ক্ষুধাতুর অবস্থায় বেলা একটা পর্যন্ত ক্লাসের কাজ ক'রে যেতাম আর ঘন ঘন পথের দিকে চাইতাম এবং রোজই একটার টিফিনের সময় সীতা এসে ডাক দিত—দাদা ভাত হয়েছে, খাবে এস।

এ-দিন কিন্তু একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল, সীতা এল না। ক্লাসের কাজে আমার আর মন নেই—আমি জানালা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি। আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল, বেলা আড়াইটা। এমন সময় কলুদের দোকানঘরের কাছে সীতাকে আসতে দেখতে পেলাম। আমার ভাবি রাগ হ'ল, অভিমানও হ'ল। নিজেরা সব খেয়েদেয়ে পেট ঠাণ্ডা ক'রে এখন আসছেন!

মাষ্টারের কাছে ছুটি নিয়ে তাড়াহাড়ি বাইরে গেলাম। সীতার দিকে চেয়ে দূর থেকে বললাম—বেশ দেখচি—আমার বুঝি আর ঝিদে-তেঙা পায় না? কটা বেজেচে জানিস?

সীতা বললে—বাড়ি এস ছোড়া, তোমার বই দপ্তর নিয়ে ছুটি ক'রে এস গে—

আমি বললাম—কেন রে?

সীতা বললে—এস না, ছুটির আর দেরি বা কত ?
তিনটে বেজেচে ।

আমার মনে হ'ল একটা কি যেন হয়েছে । স্থল থেকে
বেরিয়ে একটু দূর এসেই সীতা বললে—বাবা মারা গিয়েচে
ছোড়না ।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—সীতার মুখের দিকে চেয়ে
সে যে মিথ্যা কথা বলচে এমন মনে হ'ল না । বললাম—
কখন ?

সীতা বললে বেলা একটার সময়—

নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—নিয়ে
গিয়েচে তো ?

অর্থাৎ গিয়ে মৃতদেহ দেখতে না হয় । কিন্তু সীতা বললে—
না, নিয়ে এখনও কেউ ঘাইনি । মা একা কি করবে ?...
জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই—ছোটকাকা একবার এসে দেগে
চলে গেলেন—আর আসেন নি । মেজকাকা পাড়ায়
লোক ভাক্তে গেছেন ।

বাড়িতে ঢুকতেই মা বললেন—ঘরের মধ্যে আয়—মড়া
ছুঁয়ে বসে থাকতে হবে, বোস এখানে । কেউই কাঁদে না ।
আমারও কান্না পেল না—বরং একটা ভয় এল—একা মড়ার
কাছে কেমন ক'রে কতক্ষণ বসে থাকব না জানি !

অনেকক্ষণ পরে স্তন্যতে পেলুম আমাদের পাড়ার কেউ
মৃতদেহ নিয়ে যেতে রাজী নয়, বাবা কি রোগে মারা
গেছেন কেউ জানে না, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করানো হয়নি মৃত্যুর
পূর্বে—এ অবস্থায় কেউ সংস্কার করতে রাজী নয় । প্রায়শ্চিত্ত
এখন না করালে কেউ ও-মড়া ছোঁবে না ।

প্রায়শ্চিত্ত করতে পাঁচ-ছ টাকা না-কি খরচ । আমাদের
হাতে অত তো নেই ? মা বললেন । কে যেন বললে—তা
এ অবস্থায় হাতে না থাকলে লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে
আন্তে হয়, কি আর করা ?

দাদাকে মা ও-পাড়ায় কার কাছে যেন পাঠালেন টাকার
জন্তে । খানিকটা পরে ও-পাড়া থেকে জনকতক যণ্ডামত
লোক এল—সুন্লাম তারা গালাগালি দিতে দিতে বাড়িতে
ঢুকচে—এমন ছোটলোকের পাড়াও তো কখনও দেখিনি ?
কোথায় পাবে এরা যে প্রাচিতির করাবে ? প্রাচিতির না
হ'লে মড়া কি সারা দিন রাত ঘরেই পড়ে থাকবে ? যত

ছোট লোক সব—কোনো ভয় নেই, দেখি মড়া বার হয়
কিনা ।

আমি উত্তেজনার মাথায় মড়া ছুঁয়ে বসে থাকার কথা ভুলে
গিয়ে তাড়াতাড়ি দোরের কাছে এসে দাঁড়ালাম । এদের মধ্যে
আমি এক জনকে কেবল চিনি—মাঠবাড়ির ফুটবল খেলার
ময়দানে দেখেছিলাম ।

ওরা নিজেরাই কোথা থেকে পাশ কেটে নিয়ে এল—
পাট নিয়ে এসে দড়ি পাকালে, তারপর বাবাকে বার ক'রে নিয়ে
গেল দাদা গেল সঙ্গে সঙ্গে শয়ানে । একটু পরে সন্ধ্যা
হ'ল । সেজখুড়ীমা এসে বললেন—মুড়ি খাবি জিতু ? আমি ও
সীতামুড়ি খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম ।

* * *

তিন বছর আগেকার কথা এসব । তারপর থেকে এই
বাড়িতেই আছি । জ্যাঠামশাইরা প্রথমে রাজী হননি,
দাদা যগীতলায় বটগাছের নীচে মূদীখানার দোকান করেছিল
—সামান্য পুঁজি, আড়াই শের চিনি, পাঁচ শের ডাল, পাঁচ
শের আটা, পাঁচ পোয়া ঝাল-মসলা—এই নিয়ে দোকান কতদিন
চলে ? দাদা ভেলেমালুং, তা ছাড়া ঘোরপেচ কিছু বোঝে
না, এক দিক থেকে সব ধারে বিক্রী করেছে, যে ধারে নিয়েচে
সে আর ফিরে দোকানের পথ মারায় নি । দোকান উঠে
যাওয়ার পরে দাদা চাকুর চেষ্টায় বেকলে সে তার ছোট
মাথায় আমাদের সংসারের সমস্ত ভাবনা-ভার তুলে নিয়ে
বাবার প্রতিনিধি রূপে আমাদের খণ্ডা পরানোর দৃষ্টিভঙ্গায়
রাতে ঘুমতো না, সারা দিন চাকরি ঝুঁকি বেড়াত । নগ্নির
কারখানায় একটা সাত টাকা মাইনের চাকরি পেলেও—
কিন্তু বেশী দিন রইল না, মাস দুই পরে তারা বললে—ব্যবসার
অবস্থা খারাপ, এখন লোকের দরকার নেই ।

সুতরাং জ্যাঠামশায়দের সংসারে মাথা গুঁজে থাকা ছাড়া
আমাদের উপায়ই বা কি ? নিতান্ত লোকে কি বলবে এই
ভেবে এঁরা রাজী হয়েছেন । কিন্তু এখানে আমাদের খাপ
থায় না—এখানে মাঝে যে স্বপ্ন এ বাড়িতে তা নয়, এ দেশটার
সঙ্গেই খাপ খায় না । বাংলা দেশ আমাদের কারও ভাল
লাগে না—আমার না, দাদার না, সীতার না, মায়েরও
না । না দেশটা দেখতে ভাল, না এখানকার লোকেরা
ভাল । আমাদের চোখে এ দেশ বড় নীচু, আঁটসাঁট,

ছোট ব'লে মনে হয়—যে-দিকেই চাই চোখ বেধে যায়, হয় ঘরবাড়িতে, না-হয় বাশবনে আমবনে। কোথাও উচু-নীচু নেই—একঘেয়ে সমতলভূমি, গাছপালায়ও বৈচিত্র্য নেই। আমাদের এ গায়েই যত গাছপালা আছে, তার বেশীর ভাগ এক ধরণের ছোট ছোট গাছ, এরা নাম বলে আশশে-ওড়া, তাদের পাতায় এত ধুলো যে সবুজ রং দিনরাত চাপা পড়ে থাকে। এখানে সব যেন দীনহীন, সব যেন ছোট মাগকাঠির মাপে গড়া।

আমাদের দিক থেকে তো গেল এই ব্যাপার। ওঁদের দিক থেকে ওঁরা আমাদের পর ক'রে রেখেছেন এই তিন-চার বছর ধরেই। ওঁদের আপনার দলের লোক ব'লে ওঁরা আমাদের ভাবেন না। আমরা খিরিঠান, আচার জানিনে, হিঁদুয়ানী জানিনে—জংলী জানোয়ার সামিল, গারো পাহাড়ী

অসভ্য মানুষদের সামিল। পাহাড়ী জাতিদের সহজে ওঁরা যে খুব বেশী জানেন, তা নয়—এবং জানেন না ব'লেই তাদের সহজে ওঁদের ধারণা অদ্ভুত ও আজগবী ধরণের।

এদেশে শীতকাল নেই—মাস দুই তিন একটু ঠাণ্ডা পড়ে। তা ছাড়া সারা বছর ধরে গরম লেগেই আছে—আর সে কি সাংঘাতিক গরম। সে গরমের ধারণা ছিল না কোনো কালে আমাদের। রাতের পর রাত ঘুম হয় না, দিনমানেও ঘামে বিছানা ভিজ়ে যায় ব'লে ঘুম হয় না। গা জলে, মাথার মধ্যে কেমন করে, রাত্রে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এক এক দিন। তার ওপরে মশা। কি হুখেই লোকে এ-সব দেশে বাস করে!

(ক্রমশঃ)

সিংহলের চিত্র

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার

দেবনামপিতৃ তিসস: ৩০৭ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে সিংহলের সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার বন্ধু ভারত-সম্রাট অশোককে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সম্রাট অশোকও বহুমূল্য উপহার পাঠাইয়া তিসসকে নিজের সৌহার্দ্য জানান এবং সঙ্গে এই সংবাদও পাঠান “আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্যের আশ্রয় লইয়াছি, শাক্যবংশীয়দের ধর্মে আমার আস্থা ও ভক্তি। হে নৃপতি, এই সত্য ধর্মে আপনার বিশ্বাস হউক এবং মুক্তির জন্য আপনি ইহাতে আশ্রয় লউন।” এই বার্তা লইয়া অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে গমন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের লঙ্কাদ্বীপে আগমন

প্রাচীন ইতিহাস মহাবংশ উল্লেখ আছে, বুদ্ধ অনেক বার সিংহলে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার বর্নিত

ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, তবুও সিংহলের বৌদ্ধগণ এই আখ্যায়িকা বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

উল্লেখ আছে যে বুদ্ধ মহেন্দ্রের জন্ম পূর্ব হইতেই স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখেন, কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, লঙ্কাদ্বীপে তাঁহার ধর্ম গৌরবান্বিত হইবে। লঙ্কাদ্বীপে পূর্বে ছিল যক্ষদের (যক্ষ) বাস। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে দ্বীপ হইতে বাহির করিয়া দেন। যক্ষরা যেখানে সমবেত হইত বুদ্ধ সেখানে আকাশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আকাশে ঝড় বিহ্বল অন্ধকার আনিয়া যক্ষদের মনে শঙ্কা জন্মাইলেন।* যক্ষরা ভীত হইয়া রূপা প্রার্থনা করিল, বুদ্ধ বলিলেন, “তোমাদের মুক্তি দিব, যেখানে আমি তোমাদের সকলের অহুমতি অহুসারে অবতরণ করিতে পারি এমন স্থান

* যক্ষদ্বীপদ্বীপী বিশ্বাস করে বুদ্ধ পদ্মপত্রের ভাসিয়া যক্ষদ্বীপে আসিয়াছিলেন ধর্ম প্রচার করিতে; বরভূষণের একজন মুক্তি খোদিত আছে।

দাও।" যক্ষরা বলিল সমগ্র দ্বীপই তাহার। বুদ্ধের জন্ত ছাড়িয়া দিতে পারে। বুদ্ধ তখন মাটিতে অবতরণ করিয়া আসনে বসিলেন, অমনি আসনের চারিধারে আগুন জলিয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ দূরে দূরে ছড়াইতে লাগিল। তখন যক্ষরা ভীত হইয়া সমুদ্রতীরে দৌড়াইয়া গেল। বুদ্ধ তখন সমুদ্রের স্তম্ভের 'গিরি' দ্বীপকে তীরের নিকট লইয়া আসিলেন; যক্ষরা সেই দ্বীপে গিয়া প্রাণরক্ষা করিল। 'গিরি' দ্বীপ তখন এই নতুন অধিবাসীদের লইয়া সমুদ্রের ভিতর পূর্বস্থানে সরিয়া গেল, যক্ষরা তাড়িত হইলে বুদ্ধ নিজের আসন 'উটাইয়া' লইলেন। দেবতা-সকল তখন বুদ্ধের নিকটে সমবেত হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে নিজের ধম্মে দীক্ষিত করিলেন। বর্তমানে যে শৈল এডাম্‌স্ পিক্‌ নামে অভিহিত তার অধিপতি ছিল দেবতা 'সুম্ন', বুদ্ধ তাঁহাকে নিজের কেশের এক গুচ্ছ দান করিলেন। সুম্ন সোনার কোটায় কেশের গুচ্ছ রাখিয়া তাহার উপর মরকত মণির স্তূপ নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিল।

আদিম অধিবাসীরা ছিল নাগপূজক। বুদ্ধ দ্বিতীয় বার

(কলসো হইতে ৬ মাইল দূরে, এখানে একটি পুরাতন বিহার আছে) একটি ভোজ দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। এই আগমন চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার জন্ত বুদ্ধ আকাশে উঠিলেন এবং সুম্ন পর্বতের (এডাম্‌স্ পিক্‌) শিখরে পায়ের ছাপ



মহাসো দাগোবা—মহিন্তাল

রাখিয়া গেলেন। আড়াই হাজার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই পর্বতশিখরে আরোহণ করে এবং বুদ্ধের পদচিহ্নকে পূজা করিয়া থাকে।

এডাম্‌স্ পিক্‌

এডাম্‌স্ পিক্‌ সিংহলের মধ্যভাগে অবস্থিত, সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চ হইবে। উপরভাগ সমতল, কোণাকৃতি—কতকটা জাপানের কুসিমায়ার মত দেখিতে। নরম মাটির উপরে যে রকম পাঁচ আঙুলের ছাপ পড়ে, সে রকম পাথরের উপরে পায়ের ছাপ—গোড়ালি হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত চার-পাঁচ ফুট লম্বা হইবে। বৌদ্ধরা এই পায়ের ছাপকে বুদ্ধের বলিয়া উল্লেখ করে, হিন্দুরা বলে বিষ্ণুর, মুসলমান ও খৃষ্টানেরা বলিয়া থাকে আদমের। মানবের আদিপিতা আদম্‌ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া স্বর্গ হইতে দেবদূত কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া এই শৈলশিখরে পতিত হন, তাই আদমের পায়ের ছাপ। বছরের বিশেষ



বোধিবৃক্ষ—অম্বরাদাপুর

যখন আসেন তখন নাগরাজকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, বৎসর কয়েক পর বুদ্ধ লঙ্কাদ্বীপে আবার আসিলে নাগরাজ কেলানীতে

সময়ে তীর্থযাত্রীরা বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই এখানে দর্শন করিতে আসে। অল্প সময়ে ঝড় বজ্রপাত ও হিংস্র পশুর আধিক্যের জন্ত এডাম্‌স্ পিক্‌ দুরধিগম্য। অতি প্রত্যুষে শৈলশিখরে পৌঁজিতে হয়, সেজন্ত রাত্রে মশালহন্তে



দেবানামপিষ তিসল-এর মূর্তি—মিহিনতাল

পর্কিতারোহণ করিতে হয়। সে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য—অন্ধকারে পাহাড়ের গায়ে দীপের মালা মেঘে ঢাকিয়া অদৃশ্য হইতেছে, ক্ষণেক পরে প্রকাশিত হইতেছে; মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন দৃশ্যের অবতারণা! মাঝে মাঝে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্ত পানশালা অর্থাৎ পাছশালা আছে, এগুলি পুণ্যাভিলাষী সিংহলীরা নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে; নারিকেল পাতায় ছাওয়া, ভিতরে বসিবার জন্ত শীশের বেঞ্চ আছে। পানশালাতে গরম কাকি বিতরিত হয়। পথপ্রশ্নে ক্লান্তি এবং রাতে পাহাড়ের শৈত্যের ভিতর এই গরম কাকিটুকু যে কি আরামপ্রদ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অতি প্রত্যুষে শৈলশিখরে আরোহণ করিলে দেখা যায় আলোর খেলা, রঙের মেলা—

চতুর্দিকে দিকচক্রবাল ঘিরিয়া আলোর বহা। এডাম্‌স্ পিক্‌ হঠাৎ উদ্কে উঠিয়া গিয়াছে—চতুর্দিকে অনেক নীচে—সমুদ্রের মত নানা রঙের পাহাড়ের ঢেউ দিকচক্রবালে গিয়া মিশিয়াছে। কোথাও সব মেঘের যবনিকায় ঢাকা—কোথাও বা যবনিকা ছিঁড়িয়া ঘন নীল শৈলশ্রেণীর প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতির সম্মিলিত যাত্রা এবং সকলের একই স্থানে পূজা। পৃথিবীতে এবং কোন কালে বোধ হয় এরূপ ঘটনার সমাবেশ হয় নাই। সকলেই নিজের অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে চলিয়াছে; কারও সঙ্গে কারও বিবাদ-বিসম্বাদ নাই।



মিহিনতালের সিঁড়ি

যাত্রাকালে বৌদ্ধরা উচ্চারণ করিতেছে “সাদু” “সাদু”, হিন্দুরা “হর” “হর”, মুসলমানেরা “আল্লা হো আকবর”।

মিহিনতাল

মিহিনতাল শৈল ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের স্মৃতিপুত। এখানেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। অম্বুরাধাপুর হইতে মিহিনতাল শৈল ৮ মাইল দূরে, অরণ্যের ভিতর দিয়া পথ।

বৃহৎ সরোবর নৃথর বেওয়া (Nuwara Wewa) পথের ধারে। রাজধানী অম্বরাধাপুর হইতে মিহিনতালের পথে এক সময় নুপতি ভটিকাভয় (১২ পৃঃ খুঃ) চাদর বিছাইয়া দিয়াছিলেন—যাহাতে তীর্থযাত্রীরা ধূলা না মাড়াইয়া ক্রয়ানবেলি দাগোবা হইতে মিহিনতালে যাইতে পারে। মিহিনতাল শৈল ১০০০ হাজার ফিট উচ্চ। ১৮৫০ খানা পাথরের সিঁড়ি পার হইয়া উপরে পৌঁছিতে হয়। রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি কোথাও দেখা যায় না—এই সিঁড়িকে “স্বর্গের সিঁড়ি” আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। দুই পাশের বৃক্ষরাজি এবং মাঝে মাঝে বিহারের ধ্বংসাবশেষ এই সোপানাবলিকে একটা গাভীয়া দান করিয়াছে। ইটালীর শিল্পী লরেনজো ঘিবার্টি (Lorenzo Ghiberty) নির্মিত দুইটি ব্রোঞ্জের দ্বারকে মাইকেল এঞ্জেলো ‘স্বর্গদ্বার’ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, এই সোপানাবলিকে ঠিক তেমনি ‘স্বর্গের সিঁড়ি’ বলা যায়।

সমগ্র মিহিনতাল এক সময় বিহার ও স্তূপে ভরিয়া গিয়াছিল। তিস্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বৌদ্ধ নুপতিই মিহিনতালকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ভিক্ষু, চিকিৎসক, ভাস্কর, নুপতি, চিত্রকর, কারুশিল্পী, ভূত্যা ও নানা শ্রেণীর কৰ্মচারী—সকলের ব্যবস্থা বিবিধ ছিল। রাজকোষ হইতে সকলের বেতন ও বিহার প্রভৃতির জ্ঞাত অর্থ নির্দিষ্ট ছিল। মিহিনতালে অনেক শিলালেখ পাওয়া যায়—তাহাতে প্রাচীনকালের বিবিধব্যবস্থা অনেক জানা যায়। প্রাচীন চিকিৎসাশালা ও পার্শ্বশালার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মিহিনতালের অধিবাসীদের জ্ঞাত জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল। পাহাড়ে মাঝে মাঝে ছোট স্বাভাবিক জলাশয় আছে—সিংহলী ভাষায় তাহাকে পোকুন (পুকুর) বলে। মিহিনতালের নাগ পোকুন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ের গায়ে পাঁচ ফণা-ওয়ালা এক বিষধর সর্প খোদাই করা, সাপের লেজ জলের ভিতরে রহিয়াছে, সাপ যেন জলের উপরে মাথা তুলিয়া বিষ

উদগীরণ করিতেছে। চারি দিকের শ্রামল বৃক্ষরাজি, ঝিঁঝিঁ-পোকার একটানা শব্দ এবং নির্জনতা এ স্থানকে রহস্যময় করিয়াছে। সাপ হইতেই ‘নাগ পোকুন’ এই নামের উৎপত্তি। এই পোকুন হইতে পাথরের পদ্মপ্রণালী ও লোহার



মিহিনতালের একটি গুহা

নলের সাহায্যে অগ্নিজ্বল লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এসব অবস্থা এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নাগ পোকুনের জল অনেক দূরে একটা চৌবাচ্চায় লওয়া হইত। চৌবাচ্চার গায়ে একটা সিংহের মূর্তি খোদাই করা; ৭ ফিট ৪ ইঞ্চি উচ্চ। সিংহ সামনের দুই পা তুলিয়া গর্জন করিতেছে, কারও উপর যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িবে এই ভাব। এই চৌবাচ্চার নাম ‘সিংহ পোকুন’। চৌবাচ্চা হইতে একটা লোহার নল সিংহের মাথার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, মুখের দিগে দিয়া জল পড়ার ব্যবস্থা। ইহার শিল্পনৈপুণ্যকল্পে নৈমিত্তিকতা নিশ্চয়ই খুব প্রশংসার বিষয়। পর্তুগিজের দাগোবা এট বিহার (Et Vihara); বুদ্ধের কপালে বামচক্ষুর দ্বার উপরে যে একটি কেশ তার উপরে এট স্তূপ নির্মিত। আর একটি প্রাচীন দাগোবা—মহাসেয়া দাগোবা। এই দুই দাগোবা খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে প্রস্তুত। মিহিনতালে মহেন্দ্র দেহরক্ষা করেন; তাহার দেহাবশেষের উপর ‘আম্বাস্তল’ দাগোবা নির্মিত। আম্বাস্তল দাগোবার চারিদিকে পঞ্চাশটি সৰু পাথরের স্তূপ আছে। মিহিনতালের সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য ‘মহিন্দগুহা’—মহেন্দ্র দেখানো

শয়ন করিতেন। গুহ্য দুই দিক খোলা, উপরে পাখর ছাদের মত রহিয়াছে, ভিতরে স্থান মোটেই প্রশস্ত নয়। একজন মানুষ কোনো রকমে শয়ন করিতে পারে। ‘মহিন্দ-গুহা’ হইতে দূরের উপত্যকার দৃষ্ট অভিশয় মনোরম।



নাগ পে-বুন—মহিন্তাল

সমুদ্রের মত উপত্যকা দিগন্তবিস্তৃত, হরিৎ পাত ও নীল রঙের অপূর্ণ সমাবেশ। অনেক দূরে সবুজ বনের মধ্যে সরোবর দেখা যায়; রূপালী জলরেখা-মকমলের মধ্যে খেন তরবারি। যোগী মহেন্দ্র প্রকৃতির এই অপূর্ণ নয়ননিগ্নকর শোভার মধ্যে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন।

মহিন্তালে মহেন্দ্র ও দেবানামপিয় তিস্স

মহাবংশ উল্লেখ আছে মহিন্তাল পর্বতে অনেক সহস্র সঙ্গী লইয়া নৃপতি তিস্স যুগায় বাহির হইয়াছিলেন। বর্ষমানে যেখানে আশ্বাশ্বল দাগোবা তাহার নিকটেই আমগাছের নীচে মহেন্দ্র বসিয়াছিলেন। নৃপতি মহেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাড়াইলেন। মহেন্দ্র সন্মুখটিকে সন্ধান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে রাজন, এই যে গাছ, এর নাম কি?”

“ইহাকে আষোগাছ (আম) বলে।”

“এই গাছ ছাড়া আরও আষোগাছ আছে কি?”

“আরও অনেক আষোগাছ আছে।

“এই আষো এবং আর এই সব আষো ছাড়া পৃথিবীতে আরও আষোগাছ আছে কি?”

“প্রভু! আরও অনেক গাছ আছে, কিন্তু সে-সব আষোগাছ নয়।

“অন্ত সব আষোগাছ এবং অন্ত সব গাছ, যারা আষো-গাছ নয়, সে-সব ছাড়া আরও কিছু আছে কি?”

“কি আশ্চর্য! এই যে আষোগাছ।”

“হে নরপতি, আপনি জানী।”

মহেন্দ্র তখন তিস্স-এর কাছে বৃদ্ধের বাণী প্রচার করিলেন, তিস্স সদলবলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন।

পুরবাসী সকলে যাহাতে “থেরো”-এর দর্শন পায়, সেজন্ত মহেন্দ্রকে রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। রাজ-প্রাসাদের প্রাঙ্গণে পুরবাসীদের ভিড়। রাজা জনতা দেখিয়া বলিলেন, “এই প্রাসাদে যথেষ্ট স্থান নাই, রাজকীয় বিরাট হস্তীশালায় স্থান হউক।” লোকেরা বলিয়া উঠিল, “হস্তীশালাও যথেষ্ট প্রশস্ত নয়,” কাজেই সকলে “নন্দন” নামক প্রমোদ-উদ্যানে গমন করিল। নন্দনের দক্ষিণদ্বার পোলা ছিল, “নন্দন” সুরমা অবশ্যে অবস্থিত, গভীর ছায়া এবং কোমল শ্রামল তৃণের জন্ত লীতল। পুরবাসী-সকল “নন্দন” উদ্যানে থেরো-এর দর্শন পাইল। তাঁহার নিকট বৃদ্ধের অমৃতবর্ণী বাণী শুনিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিল।

মহেন্দ্র সমবেত জনমণ্ডলীকে উপদেশ দান করিয়া “নন্দন” উদ্যানের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া “মহামেব” প্রমোদ-উদ্যানে উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক মনোরম রাজপ্রাসাদ, অল্পময় শয্যা, আসন প্রভৃতি আরামোপযোগী উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাজা মহেন্দ্রকে বলিলেন “এখানে আরামে বাস করুন।” রাজা তখন মহামেব প্রমোদ-উদ্যান ভিক্রুদের জন্ত উৎসর্গ করিলেন। রাজা নিজের হাতে সোনার লাঙ্গল দিয়া মাটিতে দাগ কাটিয়া চারিদিকের সীমা নির্দেশ করিয়া দিলেন। সীমারেখা সমাপ্ত হইবার সময় ভূমিকম্প হইয়াছিল।

নৃপতি তিস্স-এর প্রধান কীর্তি অহুরাধাপুরের বোধিবৃক্ষ।



মিহনচাল হইতে বাহিরের দৃশ্য

বুদ্ধগয়াতে যে-বুদ্ধের নীচে বুদ্ধ নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন, তিস্ত তাহার শাখা আনাইয়া রোপণ করিয়াছিলেন। দুই হাজার বৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে, আজও এই বৃক্ষ অত্যন্তের সাক্ষ্য দিতেছে— এই বৃক্ষই এখন পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম।

রাজা এবং রাজ্যের অপরাধের সকলে বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হইলে স্রীলোকেরাও দীক্ষালাভের ইচ্ছা জানায়। রাজকুমারী অম্বলা ও তাহার সঙ্গীরা ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন। মহেন্দ্র বলেন ধর্মে দীক্ষাদানে তাহার অবিকার আছে, কিন্তু ভিক্ষুণীর ব্রতে দীক্ষা দেওয়া স্রীজাতির এক জনের পক্ষেই সম্ভব। অশোকের কথা সংঘমিত্রা ছিলেন পাটলীপুত্রের ভিক্ষুণীদের মঠের অধিনেত্রী, তাহাকে আনয়ন করার প্রস্তাব হইল। তাহাকে লঙ্কাদ্বীপে আনিতে তিস্ত মন্ত্রী অরিত্থকে পাঠান এবং অশোককে অহরোধ করিয়া পাঠান যে, অশোক যেন এই সঙ্গে বোধিবৃক্ষের শাখা পাঠাইয়া দেন। ইহার পরে রাজকুমারী ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের শাখা লইয়া লঙ্কাদ্বীপে আগমন

করেন। সংঘমিত্রা ও তাহার সঙ্গিনীদের বাসের জগু এক সুরমা প্রাণাদ দেওয়া হইয়াছিল, তার নাম ছিল হথালোক।

সিংহলে বোধিবৃক্ষের শাখা আনয়ন

বোধিবৃক্ষের শাখা আনয়নের অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা মহাবংশে আছে। শাখা স্থাপন করার জগু ১৪ ফুট পরিধি এবং ৮ ইঞ্চি পুরু এক সোনার পাত্র নিষ্পিত হইল।

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময় এই পাত্র দীপ্তি পাইতেছিল। সৈন্ত, সামন্ত ও ভিক্ষুদের লইয়া বোধিবৃক্ষের নিকট অশোক গমন করিলেন। বিরাট উৎসবের অহুষ্ঠান,—মণি, মুক্তা নানাপ্রকার অলঙ্কার এবং পতাকা দ্বারা বোধিবৃক্ষকে সাজান হইয়াছিল। নানা বর্ণের পুষ্পসজ্জায় চতুর্দিক আমোদিত। হাত তুলিয়, সম্রাট অশোক আট দিকে প্রণাম করিলেন, পরে সোনার পাত্রটি একটি সোনার আসনে রাখিয়া নিজে বোধিবৃক্ষের উচ্চ শাখায় আরোহণ করিলেন এবং স্বর্ণলেখনী দ্বারা শাখায় লাল সিন্দুরের দাগ টানিয়া বলিলেন, “বোধিবৃক্ষের সকলো শাখা যদি লঙ্কাদ্বীপে গমন করে এবং আমার যদি

বৃক্ষের ধর্ম্মে অবিচলিত বিশ্বাস থাকে তবে এই শাখা নিজে নিজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া এই দোনার পাत्रে আসিয়া পড়ুক।” তৎক্ষণাৎ শাখা, যেখানে সিন্দুরের দাগ টানা ছিল, সেখানে বিচ্ছিন্ন হইয়া হৃগন্ধ তৈলে পূর্ব পাत्रে আসিয়া পড়িল।



সিং পোকুন—সিংহনতাল

অশোক এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; সমবেত জনমণ্ডলীও আনন্দের প্রতিক্রিয়া করিল। ভিক্ষুগণ ‘সাদু’ ‘সাদু’ উচ্চারণ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিল। চারিদিকে নানা প্রকার গীতবাদ্য ধ্বনিত হইল।

স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, দেবদেবী, ভূত, প্রেত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকল প্রাণীর শব্দে সকল বিশ্ব নিনাদিত হইল। তার সঙ্গে প্রকৃতিও যোগ দিল, ভূমিকম্প—সব মিলিয়া যেন তুমুল প্রলয়কাণ্ড!

রাজবংশের অনেকের উপর এই শাখার ভার দিয়া পোতের উপর তুলিয়া দেওয়া হইল। সম্রাট অশোক গদ্যাপথে এই সঙ্গে সমুদ্রসঙ্গম অবধি অহুগমন করিয়া পোত হইতে অবতরণ করিলেন। তারপর তিনি উপরের দিকে হাত তুলিয়া তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন; বোধিবৃক্ষের শাখার

বিদায়জনিত শোকে অধীর হইয়া গভীর আবেগে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে অশ্রুশ্রব্দে ক্রন্দন করিতে করিতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বহুদিন সমুদ্রযাত্রার পর সিংহলের তীরে পোত উপস্থিত হইল। তিন্দু এক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বোধিবৃক্ষের শাখার অভ্যর্থনার জন্ত সমুদ্রতীরে বাস করিতেছিলেন। সমুদ্রপোত দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “বুদ্ধ ধর্ম্ম-বৃক্ষের নীচে নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের শাখা আসিতেছে।” তিন্দু অধীর হইয়া সমুদ্রজলে নামিলেন এবং গলাজলে দাঁড়াইলেন। বোল জন বিভিন্ন জাতির লোকদের দ্বারা শাখাকে পোত হইতে নামাইয়া, এক স্তরমা রথে স্থাপন করিলেন। পথে পরিষ্কার শাখা বালি ছড়ান ছিল। চৌদ্দ দিন চলার পর রথ অহুরাধাপুরে প্রবেশ করিল। পতাকা ও তোরণে পথ সাজান ছিল। দিনের শেষে ছায়া যখন দীর্ঘ, তখন এই শোভাযাত্রা মহামেঘ উদ্যানে থামিল।

স্বর্ণপাত্র রথ হইতে নামান হইলে শাখা মুহূর্ত্তের মধ্যে ৮০ হাত উর্দ্ধে উঠিয়া গেল এবং স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ছয় রঙের জ্যোতি প্রকাশ পাইল। পৃথিবী আলোকিত করিয়া সে দীপ্ত স্বর্ণ পৃথিবী পৌছিয়াছিল; সমুদ্রের ভিতরে সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সে আলোক প্রকাশিত ছিল।



বোধিবৃক্ষ (অহুরাধাপুর)

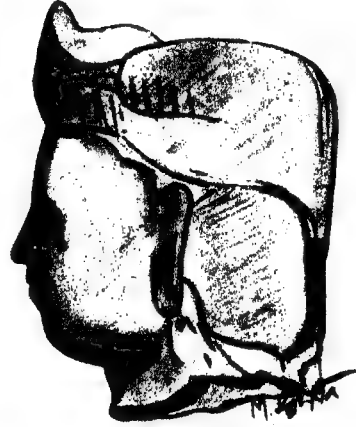
রাহিণী নক্ষত্রে বৃক্ষশাখা পুনরায় স্বর্ণপাত্র প্রবেশ করিল এবং বৃক্ষমূল পাত্রের উপরে উঠিয়া মাটির দিকে চলিল, স্বর্ণপাত্রসমেত মূল মাটির ভিতর প্রবেশ করিল। সকলে তখন ফুল ও নানাবিধ উপাদানে বৃক্ষকে পূজা করিল। গভীর ধারায় আকাশ হইতে বৃষ্টি নামিল এবং ঘনশীতল

মধ্যে বৃক্ষকে ঢাকিয়া রাখিল। সাত দিন পরে বৃষ্টি ধামিলে বৃক্ষের জ্যোতি প্রকাশ পাইল।

সিংহলের বৌদ্ধদের মতে আটটি প্রধান তীর্থ আছে, তাহার মধ্যে এই বোধিবৃক্ষ অত্যন্তম। সিংহলী ভাষায় এই আট তীর্থকে বলে “অটম স্থান”।

নৃপতি তিস্-এর অগ্ন্যন্ত কীর্তি—মহাবিহার, থুপারাম দাগোবা, মাংছকন দাগোবা, ইহুহু মুনিয়া বিহার, বেসসা গিরি দাগোবা, তিস্ বেওয়া (সরোবর) ইত্যাদি।

তিস্ ৩০৭ খৃঃ পূঃ হইতে ২৬৭ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার দীক্ষার উনিশ বছর পরে অর্থাৎ ২৮৮ খৃঃ পূঃ-তে সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষ লইয়া সিংহলে অবতরণ করেন। তিস্-এর মৃত্যুর আট বৎসর পর পর্যন্ত মহেন্দ্র বাচিয়াছিলেন অর্থাৎ ২৫০ খৃঃ পূঃ-তে দেহত্যাগ করেন। সংঘমিত্রা আরও এক বৎসর বেশী বাচিয়াছিলেন, অর্থাৎ ২৫৮ খৃঃ পূঃ-তে সংঘমিত্রা দেহত্যাগ করেন। অহুরাধাপুরে থুপারাম দাগোবার নিকটে একটি ছোট স্তূপ আছে তাহা



দেবানাম, পয় তিস্-এর মূর্তি—মিহিনতাল

“সংঘমিত্রা সোহন” নামে খ্যাত। সকলের বিশ্বাস যে, সংঘমিত্রার দেহাবশেষ এই স্তূপের নীচে আছে।

ভুবনেশ্বর

শ্রীনির্মলকুমার বসু

চারভবর্ষের মধ্যে স্থাপত্যের জন্য যে-সকল স্থান প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর তাহার মধ্যে অত্যন্তম। পুরীর পথে পড়ে বলিয়া এখানে যত যাত্রীর পদধূলি পড়ে, থাকুরাহা, ওসিয়া প্রভৃতি স্থানে তত পড়ে না। অথচ ছুঁথের বিষয়, এত ঘনিষ্ঠতা কেও ভুবনেশ্বরের প্রাচীন ইতিহাসের সম্বন্ধে আমরা অতি মনোহী ভানি।

ভুবনেশ্বরের প্রাচীন কীর্তিরাজি প্রায় চার-পাঁচ ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরকে যদি কেন্দ্র ধরা যায় তাহা হইলে তাহার অধিকোণে চার-পাঁচ মাইল দূরে ধউলি গাহড়ে মহারাজ অশোকের শিলালিপি অবস্থিত, অপর দিকে প্রায় অল্পদূর দূরে ধারবেল নরপতির শিলালিপি বিশিষ্ট ওগিরি ও উন্নয়গিরি পর্যন্ত বিস্তারিত। এই দুই স্থানেই

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় শতকের নিদর্শন রহিয়াছে। অথচ উভয়ের মধ্যস্থলে ভুবনেশ্বর গ্রামে এখন পর্যন্ত অত পুরাতন কিছু বিশেষ পাওয়া যায় নাই। বাহা আছে, এবং যাহার সন তারিখ ঠিকমত বলা যায়, তাহাও নবম খৃষ্টাব্দের চেয়ে প্রাচীন নয়। অথচ এখানে যে ধউলি ও বঃ গিরির সমসাময়িক কিছুই ছিল না, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। অন্ততঃ কিছু ছিল কি-না তাহা আমাদের আরও ভাল করিয়া এবং নিয়মিতভাবে অনুসন্ধান করা দরকার।

মন্দিরের স্থাপত্যরীতির বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে কয়েক বৎসর পূর্বে একটি মন্দিরের গঠন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পশাস্ত্রে যাহাকে রেখ-দেউল এবং যাহাকে ভদ্র-দেউল বলে বর্তমান মন্দিরটি তাহার কোনটির

মধ্যেই পড়ে না। ইহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে মনে হয় যে মন্দিরের মধ্যে যে অতিকায় শিবলিঙ্গটি আছে, তাহাকে আচ্ছাদন করিবার জগাই যেন কোনও রকমে, শিল্পশাস্ত্রের রীতি লঙ্ঘন করিয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল। মন্দিরটি



চিত্তাংখতা নারী

ভাস্করেখর নামে খ্যাত। ইহা কে কবে রচনা করিয়াছিলেন তাহা কিছুই জানা যায় না। তাহা সন্দেহও নানা কারণে ইহা ঐতিহাসিকের নিকট ভুবনেশ্বরের অপর অনেক মন্দির অপেক্ষা সমধিক মূল্য লাভ করিয়াছে।

ভাস্করেখরের মন্দিরের মধ্যে যে লিঙ্গটি পূজিত হইতেছে তাহা প্রায় নয় ফুট উচ্চ এবং গৌরীপট্টের উপরে তাহার ব্যাস প্রায় চার ফুট। লিঙ্গের উপরের অংশ ভাঙা বলিয়া মনে হয়। আশ্চর্যের বিষয়, লিঙ্গটি যে-পাথরে তৈয়ারী, গৌরীপট্ট সে-পাথরের নয়। দ্বিতীয়তঃ গৌরীপট্টের আয়তনের সঙ্গেও লিঙ্গের আয়তনের কোনও সামঞ্জস্য নাই। বহুদিন পূর্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অজুমান করিয়াছিলেন যে, ইহা অশোকের স্থাপিত কোনও স্তম্ভ ছিল এবং পরে কোনও সময়ে স্তম্ভটিকে শিবলিঙ্গে পরিণত করিয়া উপরে আচ্ছাদন স্বরূপ একটি মন্দির রচনা করা হয়।

ভুবনেশ্বর শৈল্য হইতে যে পথটি লিঙ্গরাজ মন্দিরের দিকে গিয়াছে তাহার উপর যাত্রীরা প্রথমে বে মন্দিরটি দেখিতে পান, তাহার নাম রামেশ্বরের মন্দির। রথযাত্রার সময়ে ভুবনেশ্বর-মহাদেবের রথ এই মন্দির পর্য্যন্ত

আনা হয়। এই রামেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমে অশোকা কুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে। কুণ্ডের উত্তর তটে সারনাথের অশোকস্তম্ভের নীচের মত, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড়, একটি স্তম্ভশীর্ষ আছে। ইহার উপরে হয়ত কোনও জীবমূর্তি বা অত্বিধ মূর্তি ছিল। ভূগের বিষয়, তাহা হারাইয়া গিয়াছে। শুধু ইহার গায়ে সামান্য লতাপাতা কাককাণ্ড বরা আছে, উপরে মূর্তি বসাইবার জগা সমতল আসন আছে এবং নীচে স্তম্ভের উপরে খাপ খাইয়া বসিবার মত একটি অর্ধ বর্ন্ত লাকার খাঁজ কাটা আছে।

ভাঙ্গা স্তম্ভশীর্ষটি ৪' ৫" উচ্চ এবং তাহার ঘের ১২ ফুট, অর্থাৎ তাহার ব্যাস ৫' ফুটেরও অধিক। ইহার নীচে যে



মন্দির দ্বারে গাটান অলঙ্কার

খাঁজটি আছে তাহার কানার ব্যাস ৩' ৩" ইঞ্চ। ভাস্করেখর লিঙ্গের সহিত ইহাকে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, সে লিঙ্গটির ঘাটা মাপ এবং তাহার উপরের দিকে মারোণী (batter)।

যতটুকু তাহাতে তাহাকে সবহুঙ্ক জমি হইতে ১৫' ফুট পর্যন্ত দখল করিলেই অশোক কুণ্ডের শীর্ষটি তাহার উপর বসিতে পারে। কিন্তু ১৫' ফুট স্তম্ভের উপর ৭০' ফুট শীর্ষ এবং হয়ত বা তাহারই অহরূপ একটি জীবমূর্তি অতিশয় বিসদৃশ দেখায়। যদি স্তম্ভশীর্ষটি সত্যই ভাস্করেশ্বরের তথাকথিত লিঙ্গের উপরিভাগ হয় তবে বলিতে হইবে যে স্তম্ভটি মাটির ভিতরে নিশ্চয়ই অনেক খানি পুঁতিয়া আছে। কতখানি পুঁতিয়া গিয়াছে তাহাই প্রশ্ন।

ভারতবর্ষে বহু স্থানে প্রাচীন স্তম্ভ পাওয়া যায়। মহারাজ অশোক ছাড়াও সমুদ্রগুপ্ত, হেলিওদোরস প্রমুখ অনেকে সে সময়ে স্তম্ভ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেগুলির শীর্ষ ও দেহের অল্পপাত বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে মনে হয় ভাস্করেশ্বরের স্তম্ভটি আরও ২০' হইতে ৩০' ফুট মাটির মধ্যে লুকাইয়া আছে। অতএব তখন জমি এখনকার জমি হইতে ঐ জায়গায় প্রায় ৩০' ফুট নীচে ছিল।*

এই অল্পমানে নানাবিধ ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ আমাদের ভবিষ্যৎ কাম্যস্বার্থ একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমরা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারি যে, জমির উপরের চেয়ে নীচের দিকেই বেশী খোঁজ করা দরকার। ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহাই বঞ্চে লাভ।

এই অল্পমানের ইঙ্গিত অল্পসারে আমরা কিছুদিন ধরিয়া আশপাশের জমি খুঁজিতে লাগিলাম। জমির নীচের স্তরে খোঁজার কৌশল হইল নিকটে যদি কোনও নদী, নালা অথবা পুষ্করিণী থাকে তবে তাহার পাড় ভাল করিয়া সন্ধান করা। অনেক সময়ে এরূপ ক্ষেত্রে জমি স্তরের স্তরে সজ্জিত দেখা যায় এবং সহজবুদ্ধিতে ইহাই বলে যে নীচের স্তরের মাটি এবং সেখানে পাওয়া জিনিষ উপরের স্তরের মাটি অপেক্ষা

প্রাচীন। এই ভাবে সন্ধান করিতে করিতে একদা আমাদের ভাগ্যা স্বপ্নদয় হইল। ভাস্করেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে এক হস্তলোক একটি কুটার নির্মাণ করাইতে ছিলেন। তাহার বাড়িতে কৃষা খুঁড়িবার সময়ে নীচের স্তর হইতে হঠাৎ দুইটি



ভাস্করেশ্বরের মন্দির

মূর্তি পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটি বুদ্ধদেবের, অপরটি কোনও জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি। বুদ্ধমূর্তির চালচিহ্নে “যে দম্মা হেতুপ্রভবা ইত্যাদি” শিলালিপি খোদিত আছে। তাহার অক্ষর পরীক্ষা করিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে মূর্তিটি খৃষ্টীয় নবম শতকের হইবে। ইহা কম লাভের কথা নয়। অন্ততঃ বুঝা গেল মাটির নীচে কিছুদূরে খৃষ্টীয় নবম শতকের জমির স্তর বর্তমান রহিয়াছে এবং ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে সেই স্তরে হয়ত আরও কিছু জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে।

ভাস্করেশ্বরের কাছে জমির নীচের স্তরে যেমন সন্ধান

* Journal of the Bihar and Orissa Research Society পত্রিকায় Vol. XV-এ পৃঃ ১৯৯-২০২ পৃষ্ঠায়।

চলিতে লাগিল, উপরের দিকেও তেমনি কিছু দৃষ্টি রাখা হইল। অশোকের স্তম্ভ ও স্তূপের মধ্যে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল, তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণের পথ চাঁড়িয়া গোলাকার একটি পাথরের বেড়া দেওয়া থাকিত। এই

উদয়গিরির রাণীগুপ্তার সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। এগুলি হয়ত ভরহুতের কিছু পূর্বের হইবে।



কূপের মধ্যে গ্রীষ্ম জৈনমূর্তি

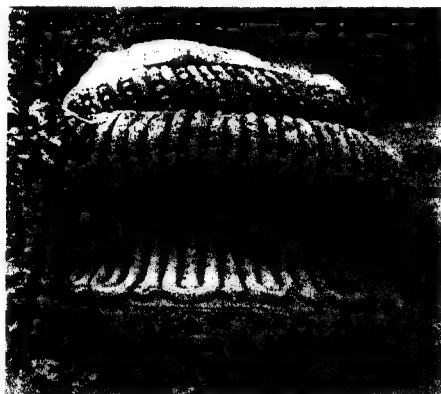
বেড়ার গায়ে নানাবিধ মূর্তি ও চিত্র দিয়া প্রদক্ষিণকালে যাত্রীর মনোরঞ্জনও করা হইত, ধর্মশিক্ষাও দেওয়া হইত। সঁচিস্তূপের চতুর্দিকে অথবা ভরহুতের পাথরের বেড়া যেমন, ভাস্করেখরের সন্নিকটে সৌভাগ্যক্রমে আমরা তেমনি বেড়ার তিনটি টুকরা কুড়াইয়া পাইলাম। তিনটিকে আনিতে দুইটি গরুর গাড়ী বোঝাই করিতে হইয়াছিল; অতএব সেগুলি যে কত বড় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে।

এই বেড়ার ভগ্নাবশেষ পাওয়ার পর ভাস্করেখরের লিঙ্গটি যে স্তম্ভ, এবং হয়ত বা অশোক-স্তম্ভ ছিল, তাহা অনেকটা স্থিরীকৃত হইল। বেড়ার গায়ে যে মূর্তিগুলি আছে তাহাদের গঠন, পরিচ্ছদ, মাথার উচ্চীষ, হাতের দস্তানা প্রভৃতি দেখিলে



ভাস্করেখরের লিঙ্গ ও পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি

যাহাই হউক, একটি স্তম্ভের ইতিহাস সন্ধান করিতে গিয়া এতখানি পাওয়া ভাগ্যের কথা। ভাস্করেখরের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আরও কতকগুলি বস্তু প্রসঙ্গক্রমে দেখা গিয়াছিল। মন্দিরের উত্তর দিকে, একটু পশ্চিম ঘেঁসিয়া,



রামেশ্বরের নিকট গুপ্তশিখা

কতকগুলি গিরিগুহা আছে। তাহার মধ্যে দু-একটি ক্ষুদ্র জৈনমূর্তি দেখা গেলেও তাহাদের বয়স সব্বদে ঠিকমত কিছু বলা যায় না। গুহাগুলির মধ্যে মাটিতে বুজিয়া গিয়াছে,



মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দির-গারে মূর্তি:শ্রেণী

মাটি খুঁড়িয়া মেজে বাহির করিতে করিতে হয়ত বা হঠাৎ কোনও নতুন তথ্যের আবিষ্কার হইয়া যাইতে পারে।

কিছুকাল পূর্বে আমার জনৈক বন্ধু এই পদ্ধতি অনুসারে খড়লির নিকট অশোকের পুরাতন রাজধানী অনুসন্ধান

করিলে পাটলিপুত্রের মত অনেক নতুন তথ্য মিলিবার সম্ভাবনা আছে।

একদিকে খড়লি, অপরদিকে ঋগুরি-উদয়গিরির মত ভুবনেশ্বরেও তাহা হইলে প্রাচীন স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষ এবং পাথরের বেটনীর টুকরা পাওয়া গেল। কিন্তু ইহার গরে প্রাচীনতম মন্দিরে আসিলে একেবারে খৃষ্টীয় নবম শতকে নামিতে হয়।



পাথরের বেটনীর অংশ

করিতে গিয়াছিলেন। প্রায় একমাস পরিশ্রমের পর তিনি বহু ভাঙা মাটির বাসন, মূর্তা এবং মাটির তৈয়ারী যুগ ও হস্তী-অঙ্কিত চাক্ৰতিও পান। সেই যুগ ও হস্তীর অঙ্কনপদ্ধতি দেখিয়া তাহাকে বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। যেখানে তাহা পাওয়া গিয়াছিল সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে গবেষণা



কূপের মধ্যে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি

যে শৈলীতে উড়িষ্যায় প্রাচীনতম মন্দির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে স্থানীয় প্রভাব থাকিলেও তাহা যে উত্তর-ভারতের কোথাও

হইতে আমদানী, উড়িষ্যাতেই প্রথম স্টেট হাউস নাই, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ওসিয়া, বাজুগ্রাহ, কাংড়া, পট্টাদকল প্রভৃতি স্থানে সমকালে উৎকৃষ্ট মন্দির দেখা যায় এবং সেগুলির মোট গড়ন উড়িষ্যারই মত। খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকেই যখন এই ব্যবস্থা তখন শৈলীটি নবম শতকের পূর্বে কোনও সময়ে উত্তর-ভারতের

করদরাজ্যে কতকগুলি পুরাতন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের কোন কোন লক্ষণ ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরগুলির মত। অতএব উত্তর-ভারতের যে অল্পমিত কেন্দ্রের কথা আমরা বলিয়াছি তাহার সহিত উড়িষ্যার যোগাযোগ হয়ত বা মহানদীপথেই হইত। মহানদী ছাড়াইয়া পথটি হয় সখলপুর ও ববগড়ের ভিতর দিয়া, নয় ত গাংপুরের দিক দিয়া গিয়াছিল।

যাহাই হউক, ভুবনেশ্বরের প্রাচীন কীর্তিগুলির সন্মুখে পর্যালোচনা করিতে গিয়া আমরা প্রথমে কয়েকটি অল্পমান, পরে ইঙ্গিত ও তৎপরে কতকগুলি নতুন তথ্যের সন্ধান পাইলাম। উড়িষ্যার সঙ্গে উত্তর-ভারতের কোনও প্রাচীন শিল্পকেন্দ্রের যোগস্বত্বের অল্পমান তেমনই পাওয়া গেল এবং কোন্ পথে অগ্রসর হইলে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যাইতে পারে তাহারও নতুন ইঙ্গিত লাভ করা গেল।

ঐতিহাসে নতুন তথ্য লাভ করিবার ইহাই হইল পথ। ঐতিহাসিক তখনই বলিতে পারেন যে তিনি সত্য পাইয়াছেন যখন তিনি একটি যুগের মানুষের প্রধান কীর্তিগুলি এবং সেই কীর্তি-রচনার পিছনে যে উদ্দেশ্য কার্য্য করিয়াছে তাহার সন্মুখে সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তাহার কম যাহাই হইবে তাহা অল্পমান। অল্পমান লইয়া কেহ বড়াই করে না। তাহার মূল্য হইল এই যে, তাহা আমাদের নতুন তথ্য-ভাণ্ডারের দিকে ইঙ্গিত দেয়। হৃত সে-তথ্য আবিষ্কৃত হইলে পুনরায় শুদ্ধতর অল্পমান গঠন করিতে হয়, আবার সেই অল্পমানে নতুন ইঙ্গিত দেয়। এমন একটর পর একটি পা করিয়া ঐতিহাসিক আবিষ্কৃত তথ্যের অঙ্ক-বনানীর মধ্যে বিচরণ করেন। যে অল্পমান দূরের সন্ধান দেয়, গভীরতম লোকের সন্ধান দেয় তাহাই মূল্যবান। কিন্তু অল্পমান চিরকালই অল্পমান। সত্য সম্পূর্ণ। লোকে সহজে তাহাকে পায় না। হয়ত ঐতিহাসিককে চিরজীবন ব্যাধের মত সেই মায়া-মৃগের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতে হয়। ইহাই তাহার লাভ, ইহাতেই তাহার আনন্দ।



কৈটবীর গায়ে প্রাচীন মূর্তি

কোনও স্থানে আবিষ্কৃত হইয়া নবম শতক নাগাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সেই অল্পমিত কেন্দ্রের সহিত ভুবনেশ্বরের যোগ নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় নবম ও ষষ্ঠপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের মধ্যে ছিল। গোড়ার চেয়ে শেষের দিকেই তাহা ঘনিষ্ঠ থাকিবে সম্ভব। সেই যোগ কিরূপ ছিল এবং কোন পথেই বা সেই শিল্পস্বত্বের সূত্র ছিল তাহা আমাদের এখন অল্পসন্ধান করা আবশ্যক।

মহানদীর উভয় কূলে সোনপুর, বৌদ, নরসিংপুর প্রভৃতি

মুহূর্তের মূলা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মাসের শেষ। দুটি হাতে জিনিষপত্র বোঝাই করিয়া শব্দ বাড়ি ফিরিতেছিল। গতি দ্রুততর। কোথায় লাল-বাজারের মোড়—আর কোথায় মাণিকতলা! মাঝপথে বৌবাজারের মশলার দোকান হইতে জিনিষগুলি সে কিনিয়াছে। মাণিকতলার চেয়ে হিসাবে আনা দুই সস্তাই হইয়াছে। ওদিকে সন্ধ্যা আসিবার বড় পূর্বে রাস্তায় আলো জলিয়া গৃহস্থী পথিককে সত্বর গৃহে ফিরিবার ইঙ্গিত জানাইতেছে।

আপিসের বিপুল প্রাসাদকক্ষ; চেয়ার, টেবিল, আলো, পাথর যেন স্বর্ণভবন। খোলা বড় জানালার ধারে দাঁড়াইলে নিম্নের চলমান জনশ্রোত চিত্রলেখার মত চক্ষুতে বিন্দুম ভ্রমায়। নিজেকে বহু উর্দ্ধে কল্পনা করিয়া কিছু যে গর্ব বোধ হয় না তাহাই বা কে বলিবে? তবু আশ্চর্য! শব্দর মত মাসমাহিনার অঙ্ক কষিতে মাহারা এই কক্ষগুলিতে আসিয়া বসে তাহাদের প্রয়োজন বাহিরের আলো বাতাস বা সৌন্দর্যকে লইয়া মিটে না। শুপীকৃত ফাইলের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া লাল এবং কাল কালির সাহায্যে অঙ্কগুলির সাথায় দাগ মারে, আপিস-নোটে বাঁধা গৎ লিখিয়া দিনের কর্তব্য শেষ করে। কৰ্ম-অবসরে দৃষ্টি ফিরাইলে পড়ন্ত রৌদ্রের পানে চাহিয়া মনটা চকল হইয়া উঠে। কৰ্মবাহু মেলিয়া এই দুরন্ত কর্তব্য যেন তাহার বন্দীভবন রচনা করিয়াছে। সৌষ্ঠবশ্রুত কক্ষে চেয়ার, টেবিল, ট্রে, ফাইল, রাক্—এমন কি ক্ষুদ্রাকৃৎ চক্চকে পিনগুলি পণ্যস্ত কাজের কদ্য মৃতি লইয়া অনবরত দৃষ্টিকে বিধিতে থাকে। চকল মন চাহে মুহূর্তের পাখায় ভর করিয়া বন্ধ গলির আলোকবঞ্চিত বায়ুস্তর বাড়িতে একখানি জীর্ণপ্রায় কক্ষে ছুটিয়া যাইতে।

সেখানে নীলের টুকরা ঢাকিয়া সন্ধ্যার ধূম-কুণ্ডলী। গাঁত মেঝের ভাঙা তক্তপোষের উপর বসিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই গাঢ় ধোঁয়া টানিবার মধ্যেই প্রচুরতর উল্লাস। কৰ্মের

রুচতা হইতে মুক্তিতা! বোয়ার মধ্যে আরাম বিলাইতে যে দু-খানি মমতাসিদ্ধ করার নিপুণ কৰ্মপ্রয়াস,—কৰ্মক্রান্ত কেরাণী কি বলিয়া সে-দিক হইতে মূপ ফিরাইবে!

ধোঁয়ার মধ্যেই ছেলেমেয়েরা আসিয়া পাশে বসিবে, ধোঁয়ার মধ্যেই কাপড় জামা টানিয়া নতনতর খেলনার খোজ করিবে। পিতার দীর্ঘ অন্তর্যমুখিতার মধ্যে ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্রতর ঘটনাগুলি একনিঃশ্বাসে বলিয়া যাইবে,—যে কোনো কৌতুহলজনক গল্পের চেয়ে তাহা কি কম রোমাঞ্চকর? তারপর ধোঁয়া পাতলা হইতে হইতে মিলাইয়া যাইবে। হাসিমুখে জলখাবার সাজাইয়া গৃহিণী আসিয়া লাড়াইবেন। দুখানা রুটি, অল্প একটু হালুয়া বা এক কাপ চা। চারিধারের প্রসাদ-পিপাসাদের মুখে অল্প ঢালিয়া দিয়া যেটুকু বৃপে যাক, তাহার প্রত্যেকটি কণায় অমৃত।

তারপর রোগা তাকিয়াটায় হেলান দিতে গিয়া তক্তপোষে মচ,মচ শব্দ উঠিবে হয়ত। আর! মটু পিঠে স্ফুটন্ত লাগাইবে। হরি দ্বিতীয়ভাগের যুক্তাক্ষর শিখিয়াছে; বাপের পিঠে পায়রার পালক বা আঙুল দিয়া অবীত বিদ্যার পরিচয় দিবে। বাপ সে লেখা বুঝিতে পারিয়াও বলিতে পারিবে না। হরি হাসিবে,—আবার লিখিবে। পিঠের সঙ্গে মনটি পণ্যস্ত তক্তাতুর হইয়া উঠে। পালকের চেয়ে কচি আঙুলগুলির স্পর্শ আরও মনোরম। ছোট মেয়েটা ইতাবসরে দুরন্ত হাতে মাথার চুলগুলি এলোমেলো কারিয়া দিবে। তা দিক। এমন মধুর উৎপীড়নের মধ্যে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া কি যে ভূপ্তি! কোথায় লাগে খোলা মাঠ, উল্লার বিস্তৃত আকাশ, আকাশপটে অসংখ্য তারাবিন্দু, চাঁদ বা অন্তর্গামী সূর্য! বায়ুর সাধ্য কি এমন স্পর্শবহিষ্ণু বহিষ্ণু আনে!

দ্রুত চল—দ্রুত চল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী মিলাইয়া গেলে স্বর্ণের সূর্যমা থাকিবে না। গাঢ়তর ব্যাপ্তির মধ্যেই কল্পনার প্রথরতা। কোথায় চূর্ণবালি খসিয়া ইট বাহির হইয়াছে, কড়িকাঠে যুগ জন্মিয়াছে প্রচুর, মেঝের পা চালাইতে গেলে

খোয়া ফুটে, আসবাবপত্র মলিন, একটি মাত্র জানালায় অপ্রচুর আলোর বাত্ম—এসব বাস্তবকে আড়াল করিয়া ধূমধূমী সন্ধ্যা এ-বাড়িতে আবির্ভূত হন। শঙ্করোলে নিরমিত সময়ের বহু পূর্বেই তিনি আসেন,—প্রত্যহ। এমন মুহূর্তগুলি পাড়ে পলাইয়া যায়—এই জ্ঞাত শব্দের গতি ক্রান্তর।

কলেজ ষ্ট্রাট ছাড়াইতেই কে পিড়ন হইতে কাঁধে হাত দিয়া ডাকিল।

শব্দ ফিরিলে সে হাসিয়া বলিল, “চিনতে পার ?”

ন চিনিবার কথা নহে। তবে কয়েকটি বংশরের ব্যবধান। অজিত তেমনই লম্বা ছিপছিপে—গৌরবর্ণ। মাথার চুল ও জুঁপির ফ্যানটিন বা নৃতন। মুখে সেই অল্প হাসি, কপালে কয়েকটি রেখা, চোখের কোমল চাইনিটুকু পৃথক অপরিস্ফুট। কথা বলিবার সময় ঘন ক্রমে অল্প একটু তরঙ্গ খেলে। ডান হাতখানি নাড়িয়া কথার সঙ্গে সেই সঙ্কেতময়তা। বয়সের কোঠায় পড়িয়াও মাথার চুলে শুধু বিন্দু ফুটে নাই।

অজিত বলিল, “আরে হাঁ করে কি দেখচিস ? চিনতেই পারলি নে। আমি অজিত,—ক্লাসের মধ্যে গাধা ছেলে।”

শব্দ মান হাসিয়া বলিল, “ভাল ত ?”

‘তবু ভাল যে জিজ্ঞাসা করেচিস! তোর ত দেখছি প্রকাণ্ড সংসার। মাসকাবারি বাজার বুঝি ? সরস্বতীর মত নদীও যে অতি মাত্রায় রূপালু! আহা! একটু আস্তে। ছুটি যখন পেয়েচিস বাসায় তখন পৌছবিই। কি আশ্চর্য! পুরোণো বন্ধুর সঙ্গে কত দিন পরে দেখা, চলা কমিয়ে একটু গল্পই না-হয় করলি।”

শব্দ অপ্রতিভভাবে কহিল, “গল্প করতে কি আমার অনিচ্ছা ? তারপর—তোর খবর ? বিয়ে করেচিস ? ছেলে-পুলে—”

অজিত হাসিয়া বলিল, “হাঁ, ও ছবটনা বাঙালী মাত্রেই একবার না একবার হয়। তবে ফলেফলে জীবনতরু এখনও বিকশিত হয়নি। যাবি ?—চ’ না!—এই ত কালীতলার ওপাশে দু-মিনিটের রাস্তা।”

শব্দ বাস্তব হইয়া কহিল, “দর, তা কি হয়। হাতে একরাশ থাকা—”

অজিত কহিল, “এ তো আর কুটুমবাড়ি যাচ্ছ না, থাকলোই বা বোঝা ?”

শব্দ বলিল, “এই ময়লা কাপড়, আপিসের খাটুণীর পর দেই টলছে।”

অজিত তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “তা হোক, চল একটু জিরিয়ে—”

আতঙ্কে দুই পা পিছাইয়া শব্দ হাত ছাড়াইবার জ্ঞাত রীতিমত ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। নিশ্চিত অজিত হাত ছাড়িয়া দিল। ফাঁক পাটবামাত্র শব্দ কয়েক পা আগাইয়া গিয়া কহিল, “আজ থাক, আর এক দিন আসব। শুভ বাই।”

কয়টি বংশরেরই বা ব্যবধান ? কলেজ-জীবনের কথাই বলা থাক। অজিত যদি বলিত, “আমাদের এ-জীবনে ছাড়া-ছাড়ি হবে যে-দিন—”

শব্দ উত্তেজিত কর্তে প্রতিবাদ করিত, “সে-দিন বন্ধুত্বের সঙ্গে আমরাও মরব। ও ভাবনা মিছে। পৃথিবীতে একটি মাত্র পথ আছে, যেখানে স্বস্তি, সবল দেহে ও মনে প্রচুর কর্ম-প্রেরণা নিয়ে আমরা জগীর মত চলতে পারি। সে-পথ বন্ধুত্বের।”

অজিত হাসিয়া বলিত, “তুই বড় সেন্সিমেণ্টা্যাল। রোমান্সের মোতে ভোরাই যাবি আগে ভেসে।”

শব্দ হাসিত না। মুখ গম্ভীর করিয়া কহিত, “আমার মত মনের জোর থাকলে ও-কথা তুলতিসুই না।”

সে কথা সত্য। কত বার এমন কত বিপদ আসিয়াছে, পাতলা আজন্মের পিছনে বলিষ্ঠ শব্দ—দেহের অস্বস্তী ছায়ায় মতই নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অজিতের দেহে আঁচড় লাগিবার পূর্বে তার পেশীপুট বাহু আততায়ীর উদ্যম পণ্ড করিয়া দিয়াছে। কেহ কাহাকেও কৃতজ্ঞতা জানায় নাই, শুধু অন্তরগ্রস্থিতে ফাঁসের পর ফাঁস পড়িয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে—নিত্য চায়ের পিপাসার মত, উভয়ের সঙ্গ উভয়ের কাছে—প্রতীক্ষামুখর। মাঝে মাঝে তর্ক তুমুল হইয়া কলহে রূপান্তরিত হইত এবং ভালবাসার ওজনে সেই কলহসঙ্কুল মুহূর্তগুলি তৌল নিরুপণ করিত।

অজিত যদি জোরে কথা কহিত, শব্দ টেবিল চাপড়াইত আরও দোরে। অজিত হাসিলে শব্দ গম্ভীর ভাবে বই পড়িত। অন্তর-তারে চড়া স্বর। আঙুলের আঘাত

অপেক্ষা করিয়া আছে। চড়াপাড় বা হাসি—এমনই একটা হরন্ত মাতামাতির মধ্যেই তরী উঠিত বাজিয়া। কুম্ভার মত অতিমান মিলাইয়া যাইত।

কিন্তু সে বন্ধুত্বের স্বরূপাত স্থলেই। কতকগুলি ক্ষুদ্র ঘটনা হৃৎককে নিকটে টানিয়া বন্ধুত্বের বাস্তবতা কানে কানে জানাইয়া দিয়াছিল।

ম্যাটিক পাস করিবার পর কি করিবে এই ভবিষ্যৎ ভাবনার মধ্যে হৃৎকনেই স্থির করিয়াছিল, যদি পড়িতে হয় হৃৎকনে একই কলেজে পড়িবে, চাকুরি করিতে হয় একই আপিসে চুকিবে। বিবাহ তা সে স্বযোগ উভয়কে দিয়াছিলেন।

ছটি বাড়ির দ্বয় অনেকপানি হইলেও ব্যবধান বিশেষ ছিল না। উত্তর পাড়া হঠতে দক্ষিণ পাড়া এক মাইল। মাঝখানে জেলা স্কুল। স্কুলের প্রকাণ্ড মাঠে ছেলের দল প্রতিদিন খেলার কোলাহল জমাইত। খেলাশেষে নদীর ঘাটে পা ধুইয়া বাথানে চাতালে বসিয়া এ-দেশ ও-দেশের নানা গল্প করিত। তারপর সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনিতে গৃহে ফিরিত। অজিত ও শঙ্খ কোলাহলময় নদীর ঘাটে না বসিয়া খন্ডের বটতলে যাত্রীপূর্ব খেয়ার নৌকা দেখানে পারাপার করিত সেইখানে আসিয়া বসিত। গোব্দবিবেকার আবছা খন্ডকাবে নদীপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কল্লনার অথ ছুটিত দেশদেশান্তরে।

“আচ্ছা শঙ্খ, এই একঘেয়ে জীবন তোর ভাল লাগে?”
শঙ্খ উত্তর দিত, “মন্দ কি।”

অজিত বলিত, “চমৎকার! সামনের নদীটার মতই মধুর অলস। না-টেউ, না-স্রোত। জীবন হবে পদ্মার মত। বেগমত্তায় সে যেমন ভাঙবে এক হাতে, দানের গৌরবে অন্য হাতে করবে সৃষ্টি। আমি বুঝে যাব।”

“তাতে লাভ?”

“লাভ? সে লাভ বোঝাতে পারব না। কত দেশ দেখব, গোলার সামনে বুক পেতে দাঁড়াব। এরোপ্লেন-বোমা,—”

শঙ্খ হাসিয়া অজিতের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিত, ‘দেহের কাঠামো আর একটু শক্ত হোক, নার্ভগুলো উঠক বজবুত হয়ে তবে ত! আমার ইচ্ছে—জাতারী শিখর। অতঃপর মারার চেয়ে শুক্রা করা ঢের বেশী শক্ত।’

অজিতও হাসিয়া উত্তর দিত, ‘তবে এম হৃৎকনের ইচ্ছাটা বদল করে নিই। আশ্চর্য! দেহে অত ক্ষমতা থাকতে বেছে বেছে নিতে হবে কর্মণার কাজ!’

শঙ্খ উত্তর দিত, ‘ক্ষমতা যার আছে—সেই কর্মণা করে, দুর্বল মুহূর্ত আনে উত্তেজনা। ধারা খুঁচী তারা শতকরা নব্বই জন দুর্বল। আমি ছবি দেখেছি।’

অজিত সে তর্কের শেষ করিয়া কহিত, ‘চল, এখন গুঠা থাক। উঁহ, ও-পথে নয়, আমাদের বাড়ি হয়ে। আজ একটা মস্ত খাওয়া আছে, তুই না গেলে খাওয়াই আমার মাটি।’

বিনা নিমন্ত্রণে এমন কত দিন বন্ধুর বাড়ি শঙ্খ গাইয়া আসিয়াছে।

আর এক দিনের কথা।

“এত ময়লা কাপড় পরে আসতে তোর খেদ হয় না?”

শঙ্খ হাসিয়া জবাব দিত, ‘তুই ত আর কুটুপ নোস? তোর কাছে আমার লজ্জা-খেদা কি?’

“বটে। চ’ দেখে আমাদের বাড়িতে মা কি বলেন?”

“বলবেন না-হর গুটা আমার চাকর। কিন্তু সত্যি কথা কি জানিস, অজু, একজোড়া ছাড়া কাপড়ই নেই আমার।

“চ’ তবে আমাদের দোকান থেকে আর একজোড়া নিবি। লজ্জা হবে না ত? যে দীরপুরুষ! আবার আত্ম-সম্মানে না বাধে।”

হাসিয়া শঙ্খ কহিত, “তোর কাছে ত আত্মাকেও বিক্রয় করেছি, সম্মান দেবে কে?”

বন্ধুর দেওয়া কাপড় লইতে এতটুকু ফুটী সেদিন আগে নাই।

তারপর কলেজ হঠতে বিদায় লইবার পূর্বদিন অজিত শঙ্খকে টানিয়া আনিয়া সেই ছায়াশিখর বটতলে। গাঁয়ের দুপুর। পারষাত্রির কোলাহল নাই, কন্দের বাস্তবতা নাই! তীব্র রৌদ্রের তাপে সারা জগৎ স্রিয়মান।

বহুক্ষণ পরে শঙ্খ কথা কহিল, ‘কালই চলে যাচ্ছি। বাবা বদলী হলেন কি-না।’

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, “পড়বি নে?”

“কি জানি! জানিস ত সংসারের সব কথা। হৃত পড়া আর হবে না।”

“আমিও কলেজ ছাড়ব।”

“দূর পাগল! তোর এ সমবেদনার মূল্য কি?”

অজিত ধরাগলায় বলিল, “সমবেদনা নয়, আমার উৎসাহ—”

বাধা দিয়া শঙ্কু বলিল, “পাগলা! না, না, ভাল ক’রে মন দিয়ে পড়বি।”

“কিন্তু পাস না করতে পারলে দোষ দিস্ না।”

“আচ্ছা সে দেখা যাবে। চিঠি লিখবি ত?”

“না।”

“না! তুই রাগ করছিস, অজিত। চিঠি না লিখলে—”

“কেন? আমিও ত তোর সঙ্গে চাকরি করতে পারি একই আপসে। পারবি নে জোগাড় ক’রে দিতে?” মাথা নাড়িয়া শঙ্কু কহিল, “কিন্তু তোর পড়া ছাড়া হবে না। না, কিছুতেই না।”

মান হাসিয়া অজিত কহিল, “ও বুঝি আমার শাস্তি! আর তোর শাস্তি কি?”

শঙ্কু তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া কহিল, “এখান থেকে চলে যাওয়ার শাস্তি যে কত বড়—”

আশ্চর্য! কথাও ভাল করিয়া কথা যায় না। প্রতি বাক্যের শেষে অশ্রু কণ্ঠ রোধ করে। বুকের মাঝে ভারী নিঃশ্বাস-গুলিতে এত অশ্রুর তরঙ্গ কে জানিত?

“তুই হৃতত ভুলে যাবি?”

“তুই-ও।”

শঙ্কু পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া বলিল, “তবে একটা চিহ্ন ক’রে রাখি। কেমন? এইটে দেখলেই কেউ কাউকে ভুলব না।”

অজিত হাত আগাইয়া দিয়া কহিল, “তোর নামের আদ্যাক্ষর থাক আমার হাতে—তুই লেখ। আমি লিখব তোর হাতে।”

লেখা শেষ হইলে দু-জনে সেই রক্তচিহ্নিত হাত দুখানি একত্র করিয়া শপথের ভঙ্গীতে উচ্চারণ করিল, “বন্ধু”।

“আহা-হা—! সব ফেলে গিলেন যে?”

চমকিত শঙ্কু ভূপতিত জিনিষগুলির পানে না চাহিয়া জামার আন্তরিক তুলিয়া দেখিল, কালো রেখায় এখনও সেই নাম লেখা।—কত বৎসর গত হইয়াছে, কে জানে, স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল সেই গেছাঘাট—ঝুরিমা ছায়াধন বটতল—গ্রীষ্মের সেই বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন! তাহারা একেবারে মরে নাই। লাল রক্ত যেমন দেহে শুকাইয়া কালো হরফের জন্ম দিয়াছে, তেমনই সেই দিনের বিদায়ক্ষণ অপার বিশ্বস্তির বালুগর্তে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। আছে যাত্রা একটা রেখা—বৈচিত্র্যহীন টানা লাইনের মত নিষ্কলী রূপহীন!

বিজ্ঞান,—এতটুকু তার মিথ্যা নহে। পৃথিবী প্রতি-নিয়ত ঘুরিতেছে—জীবনকে ঘুরাইতেছে।

শৈশবের নিষ্কর্মান দৃষ্টিতে ধরণীর ঘে আলোক ফুটিয়া উঠে, আজ জীবনমধ্যাহ্নে প্রভাতের সে পীতি কোথায় গেল! অল্পবয়স্ক বাল্যের পরম সম্পদ ছিল একখানি হাসিভরা মুখ—প্রতিটি রেখা যার স্নেহ-সমাকুল, প্রতিটি আবেগ যার লালন-গৌরবে তটপরিপ্লাবী।

সেই শৈশব যেন একটি ক্ষুদ্র কক্ষ; মাতৃস্নেহের মটি-দীপ জলিয়া অপরিণত আশা ও সসীম কামনাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিত। বিদ্যারতনের পরিবর্তে সে-কক্ষ হইত বহুতর। মুগ্ধ দীপ যুচ্চিয়া লগ্ননের আলোয় আসিলে বন্ধু। তারপর শহর। প্রদীপ গেল, লগ্নন গেল, বিজ্ঞানে বাধা পড়িয়া উপর হইতে নামিলেন বিজ্ঞানী। সারা শহর বিছাতে ভরিয়া গিয়াছে। মাটির প্রদীপের অন্তরালে মায়ে: স্নেহ সভ্যই কি মরিয়া গেল? না, স্মৃতিতে তিনি নবজীবন লাভ করিলেন? বাহার হাত ধরিয়া প্রথম যৌবনের জয় ধরনি গাহিয়াছিল সেই বন্ধুই বা কোথায়?

আজ দামিনীর দীপ্তিতে যে-সমস্ত আবেগ কেন্দ্রীভূত করিয়াছে—সে প্রিয়া। মাতৃ-অঙ্কের হৃৎশৈশব মরিয়াছে কৈশোরাকাশের হৃদয়-হৃদয় অন্তর্মিত, রাত্রির রোমাঞ্চে শবী-সৌন্দর্যে প্রিমার আবির্ভাব; চারি পাশে নক্ষত্ররূপী পুত্র কন্যা। আকাশের অবকাশ কোথায়? উদয়গিরির বর্ণচ্ছটা সে অম্লরজিত হইবে না, অন্তঃসমারোহেও তাহার স্থান নাই ঐ ধোঁয়া, ঐ বসন্ত, ঐ কোলাহল। অথবা এই বর্তমান।

ভাস্কর সে হয় নাই। যে দুঃখ এক দিন অগ্নির

দগ্ধ করিয়াছিল, আজ নাই। বিধের হিত? নিজের মঙ্গল-মূলে যে জল ঢালিতে না পারে সে সাধিবে বিধের হিত? হাসি পায়। একটি ঘণ্টা। পরের ঘণ্টার মুখ চাহিয়া আসে না। সমস্ত ও স্রোতস্বিনী ছুটিগাছে। অসংখ্য দেশকে ছুঁইয়া সৌন্দর্য বিলাইয়া ক্রকুটি করিয়া ছুটিগাছে। সে কি বদ্ধ গম্বরে গহিন লালনায় গতি সংহত করিয়াছে?

আশ্চর্য-হাতের রক্তরেখায় যে-অক্ষর আঁকা প্রাণের স্পন্দন সেখানে আজ কোথায়?

মায়ের স্মৃতি সে ভুলে নাই, ভুলিবে না। কিন্তু সেই স্মৃতির ধ্যান করিয়া জীবনযাপন মৃত্যুর মতই বর্ণস্বাদহীন নহে কি? সে বাচিয়া আছে—এইটাই ত পরম সত্য।

আপিসের ত্রিভুজ গৃহে উপরিতন কর্মচারীর তাড়না খাইয়া এই ত ঘণ্টাখানেক পূর্বে তাহার একটুও দুঃখ হয় নাই। প্রত্যাহের পাণ্ডনার মতই সে ক্রকুটি বা শাসন সহজ হইয়া গিয়াছে। লালদীঘি হইতে মাণিকতলার এই জনবহুল হৃদীয় পথ যেমন সহজ। তেমনই সহজ বদ্ধ ঘরের মধ্যে সজ্জার প্রাণাস্তকর ধোঁয়া, দৈনন্দিন দুঃখ, অভাব অভিজোগ!

জীবন যেন নদ। সমুদ্র অভিমুখী আবর্তসঙ্কল উগ্রগতি নদ। যে জনপদ বন্দর দিয়া বন্দনা করিবে সেইখানেই সে বাণিজ্যের বেসাতি বসাইবে। যে জনপদ অনন্তবিস্তারী রক্ষ মাঠ মেলিয়া ধরিবে, সে দানের বকনা তাহারই। মানুষ একটি মুহূর্তের নহে, প্রতিটি মুহূর্তের আয়, তার নিঃশাস-তরঙ্গে।...বুখা জামার আস্তিন গুটাইয়া শুষ্ক রক্তলেখার পানে চাহিয়া নিঃশাস ফেল কেন? ওই বন্ধুর অবসর-মুহূর্তের বিলাস হইয়া থাকে।—হাঁ, কাল—কালই আসিবে। বেশে, প্রসাধনে নবীন হইয়া মুখের কথায় অতীতকে অজস্র ধারে উজ্জিত করিয়া পুরাতন স্মৃতির রোমন্থন করিও। একফোটা অশ্রু, কতকগুলি দীর্ঘনিঃশ্বাস, কিছু বা হাসি, সামান্যতর কোলাহল! কাল, কালই ভাল। আজ পায়ের গতি দ্রুত কর। সজ্জা বহুক্ষণ আসিয়াছেন। ধোঁয়ায় সে বাড়ি ভরিয়া গিয়াছে, সর্বদিকে তার গাঢ় অম্লভব। তোমার হাতের অতগুলি জিনিষ সেখানে আনন্দের শ্রাবণধারায় করিয়া পড়িবে। তুমি আকাশাংশের পানে চাহিও না, আলোর পানেও না, শুধু চল দ্রুত, আরও দ্রুত। আরও।

জামার হাতাটা বুলাইয়া শব্দ জিনিষগুলি তুলিয়া লইল।

ছুটি কথা

শ্রীবীরেন্দ্র চক্রবর্তী

ঘে-ফুলে রয়েছে মধু—

সে-ফুল চুমিয়ে।

পথ চলিবার আগে—

পাথের গুণিয়ে॥



মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বিচার—পণ্ডিত শ্রীমুক্ত বলদেবশ্রাদ্ধ
পাণ্ডেয় বোগেশ্বরী, মৈস্য, শান্তি-আশ্রম, মর্শিদাবাদ। ৬১ পৃঃ মূল্য ১০
টালি আনা মাত্র।

গ্রন্থকারের স্বর্গীয় স্নেহপুত্র পিতার নিকট পুনর্জন্ম বিষয়ক আলোচনা
শ্রুতিতে চান। এক তাহার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই এই পুস্তিকাখানি
সমাপ্ত হইল, কিন্তু অর্থাভাবে ছাপা হইতে একটু দেরি হয়। তারপর,
গ্রন্থকারের শিষ্য 'চারুচরিত্র', 'মহামূর্তি', 'পুণ্ডরীক' শ্রীমান কালিদাস পালের
অর্থসাহায্যে উহা মুদ্রিত হয় (পৃষ্ঠা ১০)।

প্রত্নশোকাতুর পিতা শোকাপনোদনের জন্য যেখানে শারচর্য
করেন, সেখানে হইতে তিনি সমালোচকের নিকটও কতকটা সহানুভূতি
আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থ কি অবস্থায় লিপিত
হইয়াছে তাহা শুনিয়া সমালোচকের উহার মূল্য নিরূপণ করা
উচিত কি-না সন্দেহ। এই বইয়ের লেখক কতকগুলি সংস্কৃত বচন
উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা বিষয়ের নীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন
এক পাশ্চাত্য দর্শনে যে পুনর্জন্ম স্বীকৃত হয় নাই, তাহার বিরুদ্ধেও
যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার চেষ্টা প্রশংসনীয়, কিন্তু সফল
হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ৫ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রশ্ন
নীমাংসার যুগ চলিয়া গিয়াছে, এই কথাটা গ্রন্থকারের মনে রাখা উচিত
ছিল। ত্রিকালজ্ঞ স্বর্গদেব মতই হউক কিবা এক-কালজ্ঞ আধুনিক
কাহারও মতই হউক,—অস্ত্রের মত উদ্ভূত করার নাম যুক্তি নয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পাথের পথিক—এ. মামাসাঁর বঙ্গোপাধায় প্রণীত। গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ১০ পাঁচ সিকা।

এখনি উপস্থাপন। একদল নিতান্ত স্বর্ণের দেহতা আর একদল
একেবারেই নরকের কীট—এই চরিত্রগুলি। মাঝপানের পৃথিবীর মানুষকে
কোথাও বড়-একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

একটু বৈচিত্র্য হুটামাছে শেষের দিকে, যেখানে হৃৎক্লিষ্ট নায়িকা
সারা পৃথিবীর উপর অভিমানভরে, বন্ধুর সমবেদনায়-বাড়ান হাতটি
প্রত্যাখ্যান করিল। বাকীটা সব একটানা শ্রোতা। ছাপা, বীধাই, কাগজ
বেশ ভাল।

বধু—শ্রীজয়তুমার বধ প্রণীত। নিউ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী,
২৫২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। মূল্য ১০ পাঁচ সিকা।

একটু ছোট অনাড়ম্বর সংসারের হৃৎক্লিষ্ট মান-অভিমান লইয়া
উপস্থাপন। মোটের উপর একটি সিদ্ধতা আছে বটে, তবে একটি লোব
বড় চোখে ঢেকে,—তাঁহা এই যে অধ্যায়গুলি বড়ই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন;
এক এক জায়গায় মেহাং যেন খণ্ডিত ঘটনার তালিকা পড়িয়া যাইতেছি
বলিয়া মনে হয়। ছাপা, বীধাই চমকনীয়।

হরগৌরী—শ্রীনীরতন মুখোপাধ্যায়, বি-ই, সি-ই, এম-আর-
ম্যান-আই—প্রণীত। প্রকাশক কালীদাস সিংহ, এম-এ। ৩২৮,
রাসবিহারী এজিন্ডি।

চার অঙ্কের পৌরাণিক নাটক। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। দক্ষযজ্ঞের
স্থচনা হইতে আরম্ভ করিয়া যজ্ঞস্থলে নভীর দেহত্যাগ, আবার হিমালয়কন্ঠা
উমাশুকে শিবের সহিত বিবাহ—এই নাটকের বিষয়বস্তু। আজকাল
অল্প লোকে সাতকাণ্ড রামায়ণ আর অষ্টাদশপর্বে মহাভারত এক
বৈঠকে নাট্যকাারে দেখিয়া আসিতেছে তবু বলিতেই হয়,
দুইটি নাটকের মালমসলা একটিকেই টানিয়া দেওয়ার নাটকের
সম্বাদ্য নষ্ট করা হইয়াছে। দেবীর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে একটি
ভাষাতাত্ত্বিক যতি বা বিরাম আছে, এইখানে মানের একটি রসভূক্তি
ঘটে; ইহার পর আবার তাহাকে উমার বিবাহ দেখাইতে গেলে নাট্যকারের
নিজের উদ্দেশ্যই এক দিক দিয়া বিকল হয়।

লেখকের ছন্দে হাত এখনও একটু কাঁচা আছে, এবং হাস্যরসসজ্জনে
আর একটু সযত্ন রক্ষা করিলে ভাল হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শরীর সামলাও—ঈশ্বরপ্রকাশ শীল প্রণীত। সরস্বতী লাইব্রেরী,
৯ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার স্বয়ং একজন ত্রুটিপূর্ণ মূল্যবোধী। কিন্তু তিনি কেবল
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসম্পদ লাভকেই যথেষ্ট মনে করেন না আমাদের দেশের
বালক, যুবক ও হোচরের মনেও যাহাতে নিয়মিত ব্যায়ামাদৃশীলন-সুখ
জন্মে, তাহাদের অপরিপূর্ণ, দুর্বল দেহ বাহাতে সুস্থ, সবল ও কন্দর্প হয়,
প্রাণশক্তিতে তাহারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠেন, সে-বিষয়েও সর্বিশেষ যত্নবান।
এতদুদ্দেশ্যে তিনি এই চম্পর পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি
সহজ ভাষায় শরীরগঠনবিষয়ক নানা কার্য্যকরী উপদেশ ও সেগুলিকে
আরও স্পষ্ট করিতে অনেকগুলি চিত্রে পরিপূর্ণ। ইহার উপদেশমালা
নিয়মিত পালন করিলে অনেকেই যে স্বাস্থ্যসম্পদ লাভ করিবেন, ক্রমে
জাতির একটি পরম দৈন্য বিদূরিত হইবে, ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহ।

মোটো বোর্ডে বীধানো, ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সমাজ-বীণা—শ্রীঅরুণচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

কবিতাগুলির উদ্দেশ্য সমাজের উন্নয়ন করা। গ্রন্থকার বর্ণবিষয়ের
শাসনকে চূর্ণ করিবার জন্য জাতিভেদের বৃদ্ধি লাগিতে বলিয়াছেন।
ব্রাহ্মণ-বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে এইখানি মন্দ লাগিবে না, কারণ এই ছোট
বইখানি আগাগোড়া ব্রাহ্মণ-বিষয়ে পরিপূর্ণ। কবিতার ছন্দ কাঁচা।
ছাপা ও কাগজ বিকী।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মোপাসাঁর গল্প—শ্রীনীরামচন্দ্র চৌধুরী, এম-এ। মডার্ন বুক
এজেন্সী, ১০ কলেজ রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। ১৯৩৩

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাসে মোপাসাঁর নাম উল্লেখ অক্ষরে লিপিত।
অমুবাদক মহাশয় মোপাসাঁর আটটি গল্প বাংলার অমুবাদ করিয়াছেন।
ইহাদের মধ্যে সাতটি ইতিপূর্বে 'তারতী' ও 'সুবর্ণপত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ হ্রস্ব ব্যাপার এবং গ্রন্থ যত উৎকৃষ্ট হইবে তাহার অনুবাদ ততই কঠিন হওয়ার কথা। গল্পগুলির নিকটাত্মক রূচি ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এবং মূল রচনার সৌন্দর্য্য যে অনুবাদের ভিত্তি দিয়া আয়তপ্রকাশ করিতেছে তাহাতে অনুবাদক মহাশয়ের কৃতিত্ব বলিতে হইবে। শেষের গাঢ় কথা ভাষায় নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কোনও হানি হয় নাই; রসবোধের দিক হইতে বাংলা-রচনায় লেখা ও কথা ভাষার প্রভেদ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা রচনা-কৌশলে দূর হইয়াছে। 'মোপাসাঁর গল্প' বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সাম্যবাদের গোড়ার কথা—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

আত্মশক্তি আইহেরা, ১৫ নং কলেজ স্টোরার, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা। ১/০+১২০ পৃষ্ঠা।

বার্ণাড শ-র An Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism বইখানি যেমন প্রাঞ্জল তেমনই সরস। বর্তমান লেখক উপরিউক্ত গ্রন্থখানিতে তাহারই সারভাগ আপন ভাষায় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবির ভাষা প্রাঞ্জল, কিন্তু বার্ণাড শ-র পুস্তকে মুক্তানীতি, স্বাধীনতা প্রভৃতির সম্বন্ধে যে-সকল অভ্যন্তরীণ জটিল বিষয়ও সরলভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই পুস্তকে সেগুলির প্রতি ঠিক তেমন স্ফুটায় করা হয় নাই। মূল গ্রন্থে ভাব অপেক্ষা বুদ্ধি যেমন বেশী স্থান পাইয়াছে, কবির গ্রন্থে তাহার পরিবর্তে বুদ্ধি অপেক্ষা ভাবের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থ তাহাতে সাম্যবাদের জটিল তত্ত্বগুলি খননকাণে বার পড়িগাছে।

তাহা সন্দেহও মনে হয় যে হস্ত এমনি গ্রন্থেরও প্রয়োজন আছে। পণ্ডিত বর্ধমান দ্রুপের যুগে, মানুষ যখন নিজের হাতে-গড়া দুঃখকণ্ড বুদ্ধির আলোতে ভগবানের দেওয়া দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, তখন হস্ত তাহাদের জ্ঞাত করিতে হইলে প্রথমে ভাবের দিকেই জোর দেওয়া দরকার। সেইজন্য এই পুস্তকখানির যাগাতে প্রচার হয় আমরা তাহা কামনা করি।

বইখানির দাম কিছু বেশী হইয়াছে। এত শ্রমের বাধাই সংস্করণের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কন দামে কোনও সুলভ সংস্করণ বাহির করিলে প্রচারের দিক হইতে হস্ত আরও ভাল হইত।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

আমীর আলী—মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ, বি-এ প্রগত। “বুকসেলেক”

ধান বাঙ্গার ভবন “তামাকমুণ্ডি” চট্টগ্রাম, মূল্য ১০ আনা, পৃ. ৪৮।

লেখক ভাষার দোষে ও অনুপ্রাণের বার্থে চোঁয়ানী আলীর জীবনী লিপিতে সমর্থ হন নাই। বইখানিতে তথ্য অপেক্ষা লেখকের কথা বেশী হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বেদসার—শ্রীদত্তবঙ্ক বেলপাত্রী, বোলোদেশক, বঙ্গ-আসাম আশা

প্রতিনিধি সভা। ৩১ নুজারাম রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা দুই আনা। আকার ডবল ক্রাউন বোলপত্রী—/০—১০+১—১২৬।

বৈদিক মন্ত্র ও আর্থানাদির সংগ্রাহক একাধিক গ্রন্থ আজকাল বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও বাখ্যাদির সহিত প্রচারিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। সমালোচনাময় গ্রন্থখানিও এই জাতীয় একখানি গ্রন্থ। ইহাতে সর্বসম্মত চারি শত বৈদিক মন্ত্র বিবর্তবিভাগানুসারে সঙ্গীতবিশিত

হইয়াছে। সকলগুলি মন্ত্রেরই আকারের হ্রস্বতা, প্রতি পদের অর্থ ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদকার্যে সর্বত্র পূর্বোক্তা প্রচলিত অর্থের অনুসরণ না করিয়া দৃশ্যমান সরস্বতী মহোদয় প্রবর্তিত অভিনব ভাষা অবলম্বিত হইয়াছে। চুই-এক স্থলে (পৃ. ১৩৮-৪০) তুলনার জন্য সাম্যভাষ্য ও তাহার অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অনুবাদ ভাষামুগ্ধ না হইয়া ভাষাবিরোধী হইয়াছে। এইরূপ বিকৃতি গ্রন্থকারের চোঁয়ানীত কি অনবধানতাপ্রযুক্ত তাহা বলিতে পারি না। তবে আমাদের মনে হয়, গ্রন্থকারের ব্যাখ্যার সহিত সর্বত্র সাম্যমুগ্ধোচিত অর্থের নিখুঁত অনুবাদ থাকিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে অর্থ নিরূপণ বিষয়ে বিশেষ উপকার হইত। গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষাে অনেক মুদ্রাকরপ্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সকল স্থলে পদচ্ছেদ করা কর্তব্য, সেসকল বহুস্থলে পদচ্ছেদ করা হয় নাই। এজাতীয় গ্রন্থে এরূপ প্রমাদ সর্বথা পরিহার্য। মন্ত্রগুলির বিবর্তবিভাগ তেমন সন্তোষজনক ও সুবোধ্য হয় নাই। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই সন্দেহ। দেশের প্রাচীন চিত্রাধারা ও জীবনযাত্রার সহিত আধুনিক সম্প্রদায়ের পরিচয় ও যোগস্বাপনের জন্য এ-জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই সামান্ত ক্রটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

রাজা রামমোহন—অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত। ইউ এন থর এন্ড কো., ৮৮ ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও ২ কলেজ স্টোরার, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

ব্রিটিশ বংশের বরেন অজিতকুমার চক্রবর্তীর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। রসপ্রাণী স্নানপূর্ণ কাব্যসমালোচকরূপে তিনি ঐ বয়সেই সম্পূর্ণচিত হইয়াছিলেন। জীবনচরিত রচনাতেও তাহার কতিপয় মহাবিদেবেশ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী রচনা পরিচালিত হইয়াছিল। তিনি আচার্য্য ব্রজেননাথ শীল মহাশয়ের সাহায্যে ও উপদেশ অনুসারে রামমোহন রায়ের একখানি বৃহৎ জীবনচরিত ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করেন। তাহা সমাপ্ত করিয়া যাঁহাতে পারেন নাই। গতকাল লিপিবদ্ধছিলেন, তাহাও হারাইয়া গিয়াছে। রামমোহন সম্বন্ধে তিনি যেটুকু যে-সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা এই পুস্তকখানিতে সংগৃহীত হইয়াছে। রচনাক্তির নাম রাজা রামমোহন রায়, রাজা রামমোহনের স্বরূপ, এবং রামমোহন ও দেবেশ্রনাথ। রামমোহন রায়কে বুঝিবার ও চিনিবার এক রামমোহনের মূল্যকে বুঝিবার পক্ষে এই দৃষ্টান্ত ও স্তল্লিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ সাহায্য করিবে। মহাবিদেবেশ্রনাথকে বুঝিবারও সুবিধা হইবে। পুস্তকখানি ভাল কাগজে বড় অক্ষরে হস্তলিখিত। ইহাতে রামমোহনের, দেবেশ্রনাথের এক লেখকের তিনটি ছবি আছে।

প্রাচীন কীর্তি—আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার, এম-এ, ডি-ডি

প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, এম-এ, সম্পাদিত। সচিত্র। মূল্য আট আনা। ২১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

ইহাতে ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি, ত্রিচিনপত্রী, মালব, তক্ষশিলা, তাজমহল, আগ্রার মোগল প্রাসাদ, ধানমহল, সিকন্দরা, কতেপুরসী (১), কতেপুর সী (২), ইন্দ্রাউদৌল, আশের রাজপ্রাসাদ, দিল্লী (১), দিল্লী (২), দিল্লী (৩)—এই প্রবন্ধগুলি আছে। বাগক-বালিকারা এট বইটি হইতে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবে, অধিকবয়স্কদেরও ইহা পাঠের যোগ্য। ভাল কাগজে ছাপা। পুরস্কার দিবার উপযোগী।

জীবনীশুদ্ধি—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য যথাক্রমে আট আনা ও এক টাকা। আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। ২১১ বর্ণওয়ালিস্ ট্রাট, কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা কেবল বিদেশী বিখ্যাত লোকদের জীবনচরিত হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, দেশী লোকদের জীবনচরিত হইতে কিছু শিখিতে পারে না, ইহা যেমন সত্য নহে, তেমনি ইহাও সত্য নহে যে, কেবল দেশী লোকদের জীবনীই আমাদের পঠনীয় ও তাহা হইতেই তাহারা শিক্ষা পাইতে পারে। দেশী ও বিদেশী সকল রকম জীবনী হইতেই দ্রাণ লাভ, নৈতিক উপদেশ ও আনন্দ পাওয়া যায়। স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সরকার 'জীবনীশুদ্ধি'র দুই ভাগে চল্লিশ জন বিদেশী পুরুষ ও মহিলা জীবনী গুল্লের মত করিয়া বলিয়াছেন। বহিঃস্থানি ছেলে-মেয়েদের হাতে দিলে তাহারা পড়িয়া ক্রীত ও উপকৃত হইবে। বহিঃস্থানি সচিত্র। ছাপা ও কাগজ ভাল। পুরস্কার দিবার উপযোগী।

নানা প্রবন্ধ—২য় ভাগ। আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য লেপা নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে পাওয়া যায়।

ইছাও বালকবালিকাদের উপযোগী ভাল বই। ছাপা ও কাগজ ভাল।

মেরু প্রদেশ—আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। মূল্য লেখা নাই। প্রাপ্তিস্থান সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ কার্যালয়, কলিকাতা। ছবি আছে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এবং তথাকার মানুষদের বিবরণ, কি প্রকারে এই সব ভূপুণ্ড আবিষ্কৃত হইল, ইত্যাদি বড়ই কৌতুকাবহ ব্যাপার। বালকবালিকারা আগ্রহের সহিত পড়িবে।

আচার্য্য হেমচন্দ্রের এই সমুদয় বহিঃস্থানি নির্ভয়ে বালকবালিকাদের হাতে দেওয়া যায়। এগুলিতে জ্যাঠামি নাই, অথচ এগুলি উপদেশপূর্ণ নীরস বলুভাও নহে।

জীবনতরঙ্গ—আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। কাগজে বাঁধান। ৩৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য লেখা নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার আত্মজীবনী যতদূর লিখিগাছিলেন তাহা আছে এবং বাকী, পুস্তকের অধিকাংশ, তাঁহার দৈনন্দিন লিপি অর্থাৎ ডায়েরী। তাঁহার পালিতা বিদূষী কস্তা পিতৃভক্তিমতী শকুন্তলা ইহা এবং অন্যান্য বহিঃস্থানি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই "জীবনতরঙ্গ" প্রাপ্ত-বয়স্ক ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদের ভাল লাগিবে। তাহারা ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

কবি ও কাব্যের কথা—স্বর্গীয়া লাক্ষ্যপ্রভা সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। মূল্য লেখা নাই। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য। ছাপা ও কাগজ ভাল।

স্বর্গীয়া লাক্ষ্যপ্রভা সরকার বিদূষী ও অলেখিকা ছিলেন। তাঁহার লিখিত কুস্তিবাগ, কাণীয়ায় দাস, দীনবন্ধু মিত্র, স্বর্ষচন্দ্র গুপ্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নধুসূদন দত্ত ও বক্রিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং তাঁহার স্বামী স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সরকারের লেখা রবার্ট বার্ডিন ও আলফ্রেড টেনিসনের সাহিত্যিক পরিচয় এই বহিঃস্থানিতে আছে। ইহা অল্পবয়স্ক ও অধিকবয়স্ক স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর পড়িবার উপযোগী ভাল বহিঃস্থানি বটেই, গাহারা ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন ইহা তাহাদেরও অধ্যয়নের উপযুক্ত।

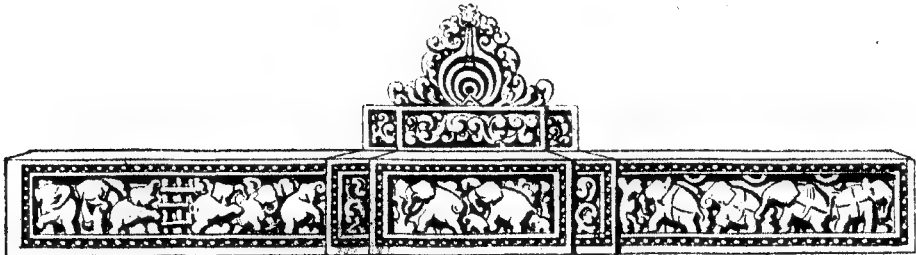
পৌরাণিক কাহিনী—তৃতীয় ভাগ (গ্রীক পুরাণ)। স্বর্গীয়া লাক্ষ্যপ্রভা সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। মূল্য আট আনা। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য। ছবি আছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

গ্রীক পুরাণের চৌদ্দটি ঋনোহর আখ্যানিক ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলি সরল সরস ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিরচন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। প্রথম ভাগ, একাদশ খণ্ড। শান্তিনিকেতনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৯০, ডাকনামাগুলি ৮০।

প্রথম ভাগ, একাদশ খণ্ডে "আওয়াজ" হইতে "আগ্রহায়ণ" শব্দগুলির অর্থ প্রভৃতি আছে।

এই অভিধানের পরিচয় গত কোন কোন সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে।



লুই পাস্তুর ও তাঁহার গবেষণা

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি-এসসি

১

লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষাগারে যে-সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করেন, তাহা চিরস্থায়ী এবং সমস্ত মানব তাহার ফল ভোগ করে। যে-সকল স্বনামখ্যাত মনীষী নিজেদের ঐকান্তিক সাধনা বলে জগতের বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাশি সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, মাহুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দান করিতেছে। লুই পাস্তুর ইহাদেরই অন্ততম।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ফ্রান্সের অন্তর্গত ডোল নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে পাস্তুরের জন্ম হয়। পাস্তুরের পূর্বপুরুষগণ



লুই পাস্তুর

ঐয্যবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা জিন যোসেফ বংশাভ্রুত শ্রমিকের বৃত্তি অবলম্বন করেন, কিন্তু নেপোলিয়নের রাজত্বকালে প্রায় তিন বৎসর ‘তৃতীয় সৈনিকবিভাগে’ সৈনিকের পদে পরিণত হইয়া সত্ৰাট কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মানিত হন। পাস্তুরের

শৈশবকালে জিন যোসেফ আর্বোয়া শহরে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং এই স্থানেই পাস্তুরের প্রথম বিদ্যালিক্ষণ আরম্ভ হয়। তিনি প্রথমে একোন্ প্রিমিয়াতের এবং পরে আর্বোয়া কলেজে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কলেজের পরীক্ষায় পদক, পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করা সত্ত্বেও শিক্ষকের মনে ‘তিনি ভাল ছাত্র’ বলিয়া দৃঢ় ধারণা ছিল না—কারণ তিনি কোন বিষয়েই তাড়াতাড়ি আদৃত করিতে পারিতেন না। পাস্তুরের সমাই ইচ্ছা হইত যে তিনি প্যারীর বিখ্যাত একোন্ নর্মাল (Ecole Normale) নামক প্রতিষ্ঠানায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া সেখানকার প্রথম উপাধি পরীক্ষায় (baccalaureat—Bachelor’s degree) কৃতকাণ্ড হন। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার এই সুযোগ ঘটে এবং তিনি এক বন্ধুর সহিত প্যারীতে উপস্থিত হন। কিন্তু বাল্য স্বথস্থতি-জড়িত গ্রাম হইতে শহরের বিলাসভূমিতে আসিয়া তাঁহার অত্যন্ত মনঃকষ্ট হইল—এক তিনি অস্থস্থ হইয়া পড়েন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্যারীর আবহাওয়া তাঁহার সহ্য হইল না—সুতরাং বাধ্য হইয়াই একোন্ নর্মালে বিদ্যালভ করার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় স্বগ্রামে কিরিয়া আসিলেন। প্যারীতে শিক্ষালাভের আশা হৃদয়পর্যন্ত দেখিয়া তিনি দুই বৎসর পরে পিতার অহুমতিক্রমে আর্বোয়া হইতে পঁচিশ মাইল দূরে বেসাকো (Besacon) কলেজে শিক্ষা লাভ করিতে যান এবং অভ্যাজকাল মধ্যেই অতিরিক্ত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আহাঙ্গাদির ব্যয় ব্যতীত প্রতি বৎসর তিন শত ফ্রাঙ্ক বৃত্তিলাভ করেন। এই সময়ে তিনি কি প্রকার পরিশ্রম করিতেন তাহা তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর নিকট লিখিত এক পত্র হইতে জানা যায়।

‘তোমরা পরস্পরকে ভালবাসিবে এবং অগল হইবে না। একবার কাজ করার অভ্যাস হইয়া গেলে বিনা কাজে বসিয়া থাক। আর জানিও যে পৃথিবীর সমস্তই মানুষের কর্তব্যমতার উপর নির্ভর করে।’

এইখানে শার্লশাপুই (Charles Chappuis) এর সূত্র

পাস্তুরের আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং তাঁহার নিজেদের ভবিষ্যতের জীবনধারা নিরূপণ করেন। শার্ল শাপুই একোল নময়ালে প্রবেশ লাভ করার এক বৎসর পরে পাস্তুরও সেইখানে ভর্তি হন। বাইশ বৎসর বয়সে পাস্তুর সম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তিনি পরীক্ষায় খুব উচ্চ স্থান লাভ করেন নাই এবং পরীক্ষকগণ তাঁহাকে রসায়ন শাস্ত্রে মাঝারি রকম (moderate in chemistry) বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর পাস্তুর তাঁহার ভূতপূর্ব শিক্ষক এবং ব্রোমিন (Bromine) নামক মৌলিক পদার্থের আবিষ্কর্তা এম্ বালার্ড (M. Balard) এর সহকারী নিযুক্ত হন। স্ফটিক-তত্ত্ব (crystallography) সম্বন্ধে বিশেষ অগ্রগতি থাকায় তিনি ঐ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং সর্বপ্রথম সফলতা লাভ করেন। তিষ্ঠিডিকার (Tartaric acid) হইতে উদ্ভূত একটি যৌগিক পদার্থের স্ফটিক (Sodium ammonium tartrate) লইয়া গবেষণা করিবার সময় তিনি আবিষ্কার করেন যে, এই যৌগিক পদার্থের মধ্যে দুই প্রকারের স্ফটিক বর্তমান আছে।* উক্ত দুই প্রকারের স্ফটিক আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন করে (optical rotation)। আলোকতত্ত্ব ও স্ফটিকতত্ত্ব সম্বন্ধে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তি এম্ বিয়ো (M. Biot) এর নিকট এই আবিষ্কারের বিষয় জ্ঞাপন করা হইলে তিনি পাস্তুরকে পুনরায় ঐ পরীক্ষার বাখাখ্য প্রতিপাদন করিতে বলিলেন। পাস্তুর পুনরায় ঐ পরীক্ষা করিলে বিয়ো দেখিলেন যে, পাস্তুরের সিদ্ধান্ত সত্য সত্যই নির্ভুল। বিয়োর জীবন-ব্যাপী সাধনা আজ পাস্তুরের পরীক্ষা দ্বারা জয়যুক্ত হইল। তিনি আনন্দের আবেগে পাস্তুরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “প্রিয় পাস্তুর, আমি সারাজীবন বিজ্ঞানকে এত অধিক ভালবাসিয়াছি যে, তোমার এই আবিষ্কার আমার হৃদয়কে বিচলিত করিয়াছে।” তখন পাস্তুরের বয়স মাত্র পঁচিশ কি ছাব্বিশ বৎসর।

এই সময়ে পাস্তুরের বয়স চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে দিজন লিসেতে (Dijon lycee) পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন।

এই পদে অবস্থান কালে তাঁহার গবেষণাক্ষেত্রে বিশেষ বিষয় ঘটে। এই জ্ঞান বিয়ো ফ্রঙ্ক হইয়া বলিয়াছিলেন, “গভর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষগণ ধারণা করিতে পারেন না যে, গবেষণাক্ষেত্রে সকল কাণ্ডের উপরে।”

বাস্তবিক দেখা গিয়াছে যে, অনেক সময়ে যাহারা আজীবন মৌলিকতত্ত্বে নিমগ্ন থাকিয়া বহু গুঢ় রহস্যের আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কোনও বিভাগের সর্বময় কর্তা করিলে নানাপ্রকার কাণ্ড পরিচালনায় ব্যাপ্ত থাকিতে হয় এবং অনেক চিত্তিপ্রদ লেখালেখি করিতে হয়। এইরূপ ধরাবাধা কাজে অনেক মহামূল্য সময় অপচয় হয়। এই কারণে পাস্তুরের মহামূল্য গবেষণাক্ষেত্রে বিয় জন্মে।

কিছুকাল পরেই বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় পাস্তুর স্ট্রাসবুর্গ (Strasbourg) এ রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং এই স্থলে তাঁহার গবেষণাক্ষেত্রে সুবিধা ঘটে।

এই সময়ে স্ট্রাসবুর্গ একাডেমীর অধ্যক্ষ ছিলেন এম্ লোরঁ (M. Laurent)। তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত পাস্তুরের



গবেষণাগারে পাস্তুর

বান্ধিতা হয় এবং কিছুদিন পরে তিনি অধ্যক্ষের কন্যা মারি লোরঁর গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

* তিষ্ঠিডিকার তেঁতুলের মধ্যে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

পাস্তুরের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে তাঁহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু লিখাছেন যে, মারি লোর। কেবল গৃহিণী ছিলেন না, গবেষণা-কার্যেও তিনি পাস্তুরের প্রধান সাহায্যকারিণী ছিলেন।

চ্যাকালে পাস্তুর তাঁহার দৈনিক কার্যাবলী বলিয়া যাইতেন এবং তাঁহার উপযুক্ত সহধর্মিণী সেই সমস্ত একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া পাস্তুরকে উহা ব্যাখ্যা করিতে বলিতেন। ইহাতে পাস্তুরের এই সুবিধা হইত যে, ঐগুলি ব্যাখ্যা করিবার সময়ে তাঁহার মনে নূতন নূতন চিন্তার দ্বারা প্রবাহিত হইত এবং গবেষণাকার্য্য সত্যপথে পরিচালিত করিবার শক্তি সঞ্চার হইত। তাঁহার দাম্পত্যজীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের না হইলে পাস্তুর এক জীবনে এত লোকহিতকর কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন কিনা সন্দেহ।

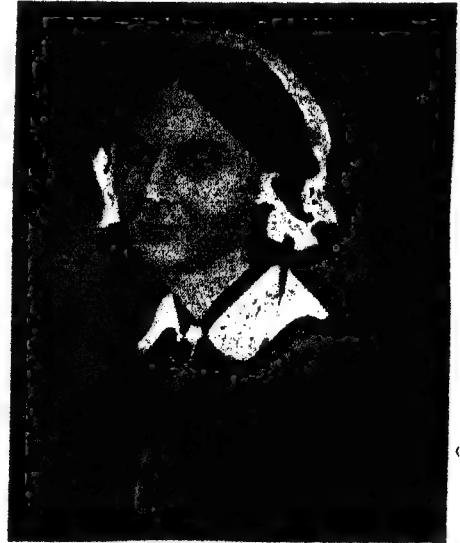
এই সময়ে তিস্তুড়িকায় সম্বন্ধে গবেষণা সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টি অগ্র দিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি 'সন্ধান' বা 'গাঁজন প্রক্রিয়া' (fermentation) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার স্ববেগেও জটিয়া যায়। তিনি এই সময়ে লিল্ (Lille) নগরে বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লিলের বিজ্ঞান সমিতিতে ল্যাক্টিক (lactic acid) * 'সন্ধান' বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। এই প্রবন্ধের বক্তব্য আমাদের কাছে বিশেষ বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তৎকালে এই নূতন মতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ দিয়াছিল। ক্রমাগত বিশ বৎসর পরীক্ষার পর পাস্তুর হার মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং দীর্ঘ বিরোধ অবসানের পর সকলেই স্বীকার করিলেন যে, জীবাণু ব্যতীত 'সন্ধান' না।

তাঁহার প্রিয় শিক্ষা-মন্দির একোন্স নর্মালের দুরবস্থা থাকা তিনি স্বহস্তে ইহার বিজ্ঞান শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। সময়ে কতকগুলি পারিবারিক দুর্ঘটনার জ্ঞাত তাঁহার গবেষণাকার্য্যের সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। যাত্রা ছেচলিশ বৎসর স তিনি সন্ধ্যা রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব লেই ভাবিলেন যে, এইবার তাঁহার কর্মজীবনের অবসান

ঘটিল। কিন্তু ভগবানের রূপায় পাস্তুর আরোগ্য লাভ করেন এবং কিছুকাল পরেই গুটাপোকার সংক্রামক রোগের জীবাণু আবিষ্কার করিয়া তাঁহার প্রিয় মাতৃভূমির নষ্টশিল্পের পুনরুদ্ধার করেন।

এইখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পাস্তুরের প্রবর্তিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ফরাসী দেশে লিয়ঁ (Lyons) নামক স্থানে কোটি কোটি টাকার রেশমের ব্যবসা হইতেছে। জাপানও এই উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রেশমের ব্যবসায় প্রবৃত্ত লাভবান হইতেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে রেশমশিল্প প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতে চলিল, কিন্তু তথাপি আমাদের দেশের লোকের চোখ ফুটিল না। আমাদের দেশের রেশমশিল্প উন্নত করিতে হইলে বর্তমান বিজ্ঞানমত প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যিক।

তৎকালে কোন বুদ্ধের সময়ে শত শত পীড়িত এবং



ক্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

* দধি তৈয়ারি করিবার সময় দুধে যে দ্রব দিতে হয় তাহাতে এক রি জীবাণু থাকে। এই দ্রব দেওয়ায় জীবাণুর প্রসার বৃদ্ধি হয়। এই কারণে দুধ অম্লাক দধিতে পরিণত হয়।

আহত ব্যক্তি উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। বুদ্ধজ্ঞের হাসপাতালগুলির উন্নতির কথা

বলিতে গেলে আমাদের সর্বগ্রেহে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়ে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত 'ক্রিমিয়ান' যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং স্কুটারীতে (Scutari) যে সামরিক হাসপাতাল ছিল তাহার অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়।

মাতৃঘের দুঃখ এবং যন্ত্রণা দেখিলে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের হৃদয়ে অত্যন্ত করুণার সঞ্চার হইত এবং তিনি দেশের এই দুর্দিনে নিজেকে সৰ্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সাইপ্রিশ জন শুক্রব্যাকারিণীর সহিত তিনি স্কুটারীতে উপস্থিত হন। এই সময় তিনি যেরূপ পরিশ্রম এবং স্বেচ্ছাক্রমে তাহার কর্তব্য সমাধান করিয়াছিলেন, ইংরেজ জাতির ইতিহাসে তাহা চিরকাল সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি অস্ত্রোপচারের গৃহে উপস্থিত থাকিয়া নিয়ত আহত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সাহসের কথা শুনাইতেন। রাত্রিকালে একটি প্রদীপহস্তে তিনি হাসপাতালের প্রতি গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং অনেক সময় হতভাগ্য আহত ব্যক্তিগণের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি যে-সমস্ত পরিচর্যার নিয়মাবলী অবলম্বন করাইলেন তাহাতে হাসপাতালে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল। তিনি আদিবার পূর্বে মৃত্যুসংখ্যা শতকরা বিয়াল্লিশ জন ছিল, কিন্তু তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মৃত্যুসংখ্যা অবশেষে মাত্র শতকরা দুই জনে দাঁড়াইল। তাহার পরিশ্রমের প্রতিদানে রক্তাক্ত ইংরেজ জাতি চালা তুলিয়া তাহাকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাত লক্ষ টাকা উপহার দেন, এবং তিনি সেই অর্থ দ্বারা সেন্ট টমাস ও কিংস কলেজ হাসপাতালে শুক্রব্যাকারিণীদিগের শিক্ষার জন্য 'নাইটিঙ্গেল হোম' (Nightingale Home) প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ফ্রান্সো-প্রুসিয়ান (Franco-Prussian) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাতৃভূমির পরাজয়ে এবং লোকস্বর্গে পাতঙ্গরের মনে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা প্রাণ দিয়াছে তাহারা বীরোচিত সম্মান লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে সমস্ত সৈনিক সামান্য আহত হইয়া হাসপাতালে ক্ষতস্থান-বিষাক্ত (septic) হইয়ায় অসহায় ভাবে মৃত্যুর কবলে পড়িত হয় তাহাদের জন্য পাতঙ্গরের বর্জ্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পচন নিবারণের জন্য পাতঙ্গর কথাইলেন যে, বাতাসের ঝোলকে উত্তপ্ত করিয়া জীবাণু-

বিহীন বাতাসে (filtered air) রাখিয়া দিলে পুনরাপচন হইতে পারে না। কিন্তু মহত্মশরীরে পচন নিবারণ সম্বন্ধে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য নহে। ঘাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য-বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক লিটার পচননিবারণ



জোসেফ লিটার

চিকিৎসা প্রণালীর (antiseptic treatment) প্রবর্তন করিয়া মহত্মা জাতির অশেষ উপকার করিয়াছেন এবং এই ক্ষেত্রে জোসেফ লিটার সম্বন্ধে দুই-চারটি কথা বল প্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই বিখ্যাত ইংরেজ অস্ত্র-চিকিৎসক এসেঞ্জের অন্তর্গত আপটন (Upton) নামক স্থানে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা জোসেফ অ্যাক্সন লিটার যশস্বী বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জোসেফ লিটার লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এম. বি. ও এক. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালে হাসপাতালে অনেক রোগী তাহাদের ক্ষতস্থানে পচনের জন্য মারা যাইত। লিটার অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এই পচনের কারণ নিরূপণ করিতে চেষ্টা আরম্ভ করেন। তিনি পায়েরিয়া (Pyæmia) নামক দুর্বল

ব্যাধির কারণও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষভাবে অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

লিষ্টারের কাজের প্রকৃত উপকারিতা বুঝিতে হইলে, আমাদের সেই সময়কার অস্ত্র-চিকিৎসার প্রণালী মোটামুটি জানা আবশ্যক। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অস্ত্র-চিকিৎসায় জ্ঞানলোপকারী বা বেহুঁস করিবার (anaesthetic) পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ হইলে পর তৎকালীন অস্ত্র-চিকিৎসকগণ ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের দ্বারা অধিকতর সাহস এবং দক্ষতার সহিত রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার সমাধান করিতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ রোগীরই ক্ষত স্থলে পচন আরম্ভ হইয়া প্রাণসংশয় হইত। সুতরাং তৎকালে হাসপাতালে অস্ত্র-চিকিৎসা করা ভয়ের ব্যাপার ছিল এবং লোকের শরীরের কোন স্থানে অস্ত্র-চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কেহ তৎকালীন অতি বিচক্ষণ অস্ত্র-চিকিৎসক দ্বারাও অস্ত্রোপচার করিতে সাহস করিত না।

লিষ্টার গ্রাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র চিকিৎসার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অধীনস্থ হাসপাতালগুলিতে এইরূপ পচনজনিত মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখিয়া ইহার মূল কারণ নির্ণয়ের জন্য বন্ধপরিকর হইলেন। তিনি রোগীর ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন এবং প্রত্যেক রোগীর নিকট তাহার ব্যবহারের জন্য পরিতৃপ্ত ভোজ্যে রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এই সকল সতর্কতা সত্ত্বেও পচনের

জন্ম হ্রাসসংখ্যা কিছুই কমিল না। এই সময়ে রোগের জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে পাস্তুরের অভিনব আবিষ্কার লিষ্টারের নিকট এক নূতন আলোক আনিয়া দিল। লিষ্টার প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, পচনের সহায়ক জীবাণুগুলি বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া আসে। তখনকার দিনে কারবলিক এসিড জীবাণু ধ্বংসের একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইত। লিষ্টার ক্ষতস্থানে কারবলিক এসিডের প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ফল এই হইল যে, ক্ষতস্থানের উপরে একটি পর্দা পড়িয়া যাইত এবং ক্ষতস্থানও তাড়াতাড়ি শুকাইয়া আসিত। কিন্তু রোগীর শরীরে কারবলিক এসিড পোড়ার ভীষণ দাগ থাকিয়া যাইত এবং সেজন্য অস্ত্রোপচারের পক্ষে ইহা রোগীদের মনঃপূত ছিল না। ইহার পরে আরও গবেষণার পর লিষ্টার বুঝিতে পারিলেন যে বাতাসের জীবাণুগুলি ক্ষত স্থানের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর নয়। পচনকাথ্যের প্রধান সহায়ক হইতেছে চিকিৎসকের হাতের, এবং ছুরি, কাঁচি, ব্যাণ্ডেজ ও রোগীর পোষাক পরিচ্ছদের ময়লা। তিনি উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা এই সকল জিনিষকে জীবাণুবিহীন করিতে লাগিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই উচ্চাঙ্গ অস্ত্র-চিকিৎসা-বিদ্যার উৎপত্তি। আজও পর্যন্ত সকল অস্ত্রোপচারে লিষ্টার প্রবর্তিত পচননিবারক প্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্ত্র-চিকিৎসায় লিষ্টারের অমূল্য দান লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতেছে।



পুরোহিত

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মা বলিলেন—দিন যখন খারাপ তখন আজ যাওয়া হ'তেই পারে না। কিন্তু দিন খারাপ বলিয়া পৃথিবী ত তাহার কক্ষপথে নিম্নমিত একটি আবর্তন না দিয়া বসিয়া থাকিবে না এবং সে আবর্তনে একটি দিব্যরাত্রি অতিক্রান্ত হইলেই বিমলের টেপার দিবার নিদিষ্ট দিনটি যে পার হইয়া যাইবে! সে উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—কে বললে যে দিন খারাপ? কোন মূর্থ বলেছে?

মা চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখ বিমল লঘু গুরু মাত্র করে কথা ক'ম। দিন দেখেছেন ভট্টাচার্য মশায়।

পুরোহিত যত ভট্টাচার্য বিমলের বাপের বয়সী লোক। এ-বাড়িতে তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত। বিমলের পিতা জন্মিয়ার পঞ্চানন রায় তাঁহার কথায় না-কি উঠিতেন বসিতেন। লোকে বলিত যত ভট্টাচার্য পঞ্চানন রায়কে 'বাদের নাচ' নাচাইত। এক সোনার তুলসীপত্র আর বিহুপত্র একত্র করিয়া যত ভট্টাচার্যের স্ত্রীর দশখানা ভারী ভারী গহনা হইয়াছে। একবার তাগা, একবার হার, একবার চুড়ি-বার-বারের হিসাব মনে থাকে না, তবে মনে করিলেই মনে পড়িবে ইহা নিশ্চয়। বিমল মনে মনে ভট্টাচার্যের মাথা খাইয়া বলিল—আচ্ছা, যাই আমি ভট্টাচার্যের কাছে।

রাগাগোবিন্দ-স্বামীজীর মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া ভট্টাচার্য চশমা-চোখে ঘাস ছিঁড়িতেছিলেন। বাঁধান আঙিনায় একটা ফাটল দেখা দিয়াছে, সেই ফাটল আশ্রয় করিয়া উঠিয়াছে ঘাস।

বিমল ডাকিল—এই যে ভট্টাচার্য মশাই।

ভট্টাচার্যের চশমাটা ঝুলিতেছিল নাকের ডগায়। নাকের ডগাটা বিমলের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া ভট্টাচার্য বলিলেন—বিমল! ভালই হয়েছে। তোমাকেই খুঁজছিলাম আমি। দেখ দেখি—উঠানের ফাটল—এটা ঘেরামত—

বাধা দিয়া বিমল বলিল—কি বলেছেন মাকে আপনি?

বিস্মিত হইয়া ভট্টাচার্য বলিলেন—কি বলেছেন?

—আমার জরুরি কাজ রয়েছে আর আপনি মাকে বলেছেন আজ দিন খারাপ—যাত্রা নাই।

ভট্টাচার্য একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—তা বাজ যখন রয়েছে তখন যাত্রা না থাকলে চলবে কেন? চলে যাও তুমি আজ।

বিমল একটু নরম হইল, বলিল—কিন্তু মা যে—

—দাঁড়াও পাঞ্জিটা একবার দেখি। ভট্টাচার্য উঠিয়া হাত-পা বাঁড়িয়া পাঞ্জি লইয়া বসিলেন। দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন—হুটো আটচল্লিশ মিনিটের পর তিনটের মধ্যে চলে যাও তুমি গোবিন্দ স্বরূপ করে। গমনে বামনশৈব—বামনমূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করে বেরিয়ে পড়বে।

—বেশ লোক ত তুমি ভট্টাচার্য ঠাকুরপো! বিমলকে যেতে বলছ তুমি? তবে যে আমাকে বললে আজকে দিন খারাপ—যাত্রা হতেই পারে না।

মা কখন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কেহ লক্ষ্য করে নাই। ভট্টাচার্য নাকের ডগা আকাশে তুলিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—সে কথা ত মিথ্যে বলি নাই আমি। দেখ না পাঞ্জি—যাত্রা নাই আজ।

বিমলের মা ব্যস্ত দিয়া বলিয়া উঠিলেন—তবে? তবে যে বিমলকে যেতে বলছ তুমি?

বিমল বলিল—এই যে বললেন আমাকে হুটো আটচল্লিশ মিনিটের পর তিনটের মধ্যে যাবে।

—হাঁ তা যাওয়া চলতে পারে। ভাল সময় শুটো। এই সময়টাতেই বেরিয়ে যেয়ো তুমি।

বিমলের মা রুডভাবে বলিয়া উঠিলেন—যাত্রা নাই ত বেরিয়ে যাবে কি রকম? তুমি কি পাগল হ'লে না কি?

ভট্টাচার্য বলিলেন—ওর যে কাজের কতি হবে বলছে বোঠাকরুণ।

গিন্নী বলিলেন—তা বলে অ-দিনে অ-ক্ষেণে যাওয়া-আসা করে না-কি? তুমি বলছ কি?

ভট্টাচার্য বলিলেন—ঠিকই বলছি বউ। বুঝিয়ে দিই তোমাকে। বিমল ব্যবসায়কর্ষ ত আজ থেকেই আরম্ভ করছে না। এ কর্ষে যাত্রা করেছে ও অনেক দিন আগেই—শুভদিন শুভক্ষণেই সে ও আরম্ভ করেছে। এটা হচ্ছে মধ্যপথে সেই যাত্রাতেই একটা ছোট যাত্রা আর কি। ধর না, যেমন তুমি শুভ দিন স্নান দেখে যাত্রা করলে তীর্থে। পথে গাড়ী বদলের সময় পড়ল বারবেলা কি একটা খরাপ লম্ব। সে ক্ষেত্রে গোবিন্দ স্মরণ করে বামনমূর্তি চিন্তা করে যাত্রা করলেই দোষ খণ্ডন হয়ে যায়।

বিমলের হাসি পাইয়াছিল। অতি কষ্টে সে আশ্ব-সংবরণ করিয়া রহিল। গিন্নী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—তা হ'লে তুমি অমুমতি দিচ্ছ ত ?

ভট্টাচার্য বলিলেন—হ্যাঁ আমি দিচ্ছি—তুমিও স্থিতি না করে আশীর্বাদ করে অমুমতি দাও।...হ্যাঁ—আর গোবিন্দের চরণে পাঁচ পাতা তুলসী—সেটাও বরণ ব্যবস্থা করা ভাল, বুঝলে। গিন্নীর যেন ব্যবস্থাতা এতক্ষণে মনঃপূত হইল। হঠাৎ বলিলেন—সেই ভাল। তা হ'লে আর আমার মনে কোন খুঁত থাকবে না। তুমি ত সহজে সে ব্যবস্থা করবে না। বিমল, নায়েবকে তুই তা হ'লে ডেকে দে আমার কাছে। বাগল সেকরার কাছে গড়ান মজুতই আছে সোনার তুলসীপাতা—ওজনটোজন দেখে নিয়ে আসুক।

বিমলের মনটা কিন্তু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। এমন করিয়া যাত্রার লগ্ন শুভ করিতে হইলে যে অবশেষে দিন দেখিবার জন্ত পাঁজি কেনার পরমা জুটিবে না। টিকি ও কোঁটার উপর বিরূপ সে চিরদিন। কিন্তু আজ আর সে-বিরূপতা ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা পরিণত না হইয়া পারিল না।

ভট্টাচার্য বলিতেছিলেন তাহার মাকে—তোমার ত সব জানাই আছে—কি-কি লাগবে। পঞ্চগব্য—পঞ্চামৃত—নৈবিদ্য, আর কাপড় একখানা। কাপড়খানা দশ গজা শাড়ীই যেন আনে। কাপড় কাপড় করে আমাকে জানিয়ে খেলে বাপু।

বিমল ঘৃণাতরে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। স্থির করিল এবার কলিকাতা হইতে করিয়া ভট্টাচার্যের ব্যবস্থা একটা করিতে হইবে। মনে মনে বলিল—দাঁড়াও—

তোমারও যাত্রার দিন আমি দেখছি। অগস্ত্য যাত্রা—কিংবা জাহস্পর্শ কি মথাই হবে প্রশস্ত দিন।

* * *

মাসখানেক পর বিমল দেশে ফিরিল। মনটা খুশীই ছিল। টেওয়ার তাহার মজুর হইয়াছে। পাঁচ পাতা সোনার তুলসীপত্রের জন্ত কোভটা কমিয়া গিয়াছে। আর কথাটা তাহার মনেও ছিল না। কাজের ভিড় অভ্যস্ত বেশী। বিষয়পত্র কোথায় কি সে-সব জানিবার জন্ত বিপুল পরিশ্রম তাহাকে করিতে হইতেছে। বাগ্যকাল হইতে লেখাপড়ার জন্ত কলিকাতায় মাসির বাড়িতে মাসুদ হইয়াছে। তাহার পর মাসতুত ভাইদের দেখাদেখি কয়লার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া কর্মজীবনও কলিকাতায় কাটিতেছিল। এমন সময় পঞ্চানন রায় হঠাৎ মারা গেলেন। অকস্মাৎ বিষয় জমিদারী ঘাড়ে পড়ায় সে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাঁটার মুখে সান দিতে হয় না। বিষয়ী ঘরের ছেলে সে—নিজেও ব্যবসায়বৃত্তিতে ধানিকটা সাক্ষ্য লাভ করিয়াছিল—তীক্ষ্ণ চতুরতার সহিত সব দিক গুছাইয়া লইতে তাহাকে বেগ পাইতে হইবে বলিয়া তাহার মনে হয় না। তবে কলিকাতায় ব্যবসা আর এখানে জমিদারী—দুই দিক লইয়াই হইয়াছে মুশ্কিল। মা বলেন—কাজ কি বাপু তোর ব্যবসায় ? জমিদারের ছেলে জমিদারী কর। যার যা কাজ বুঝিল ? বিমল হাসে। জমিদার ! হাজার-পাচেক টাকা আয়ের জমিদার। চামচিকাই বা তবে পাণী নয় কেন ? জীও তাই বলেন। কাজ কি বাপু ব্যবসায় ?

বিমল মনে মনে বলে—দাঁড়াও না। বছর দুই তোমাকে কলকাতার জল খাইয়ে আনি। তারপর আবার শুনব তোমার মত।

যাক।

সে-দিন ভোরেই তাহার খুম ভাঙিয়া গেল খুঁকীর কান্নার শব্দে। খুঁকী তাহার আট বছরের মেয়ে হুয়মা। কান পাতিয়া শুনিয়া মনে হইল দক্ষিণের জানালায় নীচেই বাগান হইতে কান্নাটা জানিয়া আসিতেছে। সময়টা কান্টিকি মাস। ঠাণ্ডা পড়ার জন্ত জানালাটা বন্ধ ছিল। জানালাটা খুলিতেই নজরে পড়িল খুঁকী বৃদ্ধ ভট্টাচার্যের পিছনে পিছনে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটাছুটি করিতেছে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য।

কেলিয়া একরূপ ছুটিতেছেন। আর গট্ গট্ করিয়া ফুল ছিড়িয়া সাজিতে পুরিতেছেন।

খুকী চীৎকার করিতেছিল—ওগো বাবা গো,—সব নিলে গো—আমি কি করব গো? আমার সেজুতি কেমন ক'রে হবে?

ফুল তুলিতে তুলিতে ভট্টচাষ বলিল—এ্যাঃ, ভারি তোর সাজপুছনী। তার জন্যে আবার ফুল চাই! গোলাপ ফুলটা তুলে নিয়েচিস তুই—ওইটি দে। তা হ'লে তোকে চারটি ফুল আমি দেব। নইলে একটি ফুলও আজ পাবে না তুমি। রাধাগোবিন্দের চেয়ে ওর সাজপুছনী বড়!

খুকী ভীত স্বকার দিয়া মুখ ভেঙাইয়া উঠিল—এ্যা-এ্যা-এ্যা, ভারি ত ওর রাধাগোবিন্দ! ছাই ছাই ছাই তোমার রাধাগোবিন্দ! কালো—ডাবডাব চোক—এ-দিক ঝাঁক—ও-দিক ঝাঁক—

বিপুল রোবে ভট্টচাষ চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যাই-খুকী! এক চড়ে তোর গাল ভেঙে দেব বলছি। খবরদার।

খুকী ঝাড় উচু করিয়া বলিল—বটেই ত, বটেই ত তোর ঠাফুর ছাই কালো। বলছিই ত—ছাই—ছাই—ছাই! আমার সন্ধ্যামণি অরুন্ধতীকে কেন এ্যাঃ বলবে তুমি!

—নাঃ বলবে না! যেমন ব্রত তেমনি তার মন্তর! তিনি ভেঙাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—সন্ধ্যামণি অরুন্ধতী অজ্ঞবতী বেলফুল—

খুকী রুক্মসুন্ডরী ভক্তিমা বিরক্তভাবে অহুকরণ করিয়া ভট্টচাষকে মুখ ভেঙাইয়া পাড়াইল। সহসা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জ্ঞান-গম্য যেন লোপ পাইয়া গেল। পাগলের মত খুকীকে ধরিয়া তাহার গালে সজোরে এক চড় বসাইয়া দিলেন। খুকী আর্জবরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভট্টচাষ তাহাতেও তাহাকে নিষ্প্রতি দিলেন না। খুকীর আঁচল হইতে গোলাপ ফুলটি কাড়িয়া লইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন স্বন্দীরের দিকে। জানালায় পাড়াইয়া বিমল যেন বিশ্ময়ে ঝাঁকু হইয়া পলায়িল। বাট বৎসর বয়সের বৃদ্ধ লোট বৎসরের শিশুর দ্বিতীয় এমন আচরণ করিতে পারে এ জগৎ তাহার ছিল না।

সে ঋতুরে ভাকিল—ভট্টচাষ মশাই!

লগ্না লগ্না পা কেলিয়া ভট্টচাষ তখন দটপথের বাড়ির

খুকীর চীৎকার তখনও শাখে নাই। তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া সে দেখিল তাহার কচি গালে পাচটি আঙুলের লগ্না রাঙা পড়ির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল—বর্কর—জানোয়ার!

খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ভট্টচাষ-দাদা মেলে আমায়। বিমল মনে মনে ভাবিতেছিল প্রতিবিধানের কথা। সে গম্ভীর ভাবে বলিল—চুপ কর। আজই তাড়াব ওকে আমি। খুকী চুপ করিয়া, তাহার অভিযোগ তখনও শেষ হয় নাই। সে বলিল—রোজ আমার সঙ্গে বগড়া করবে, রোজ আমার সঙ্গে বগড়া করবে। একটি ফুল আমাকে দেয় না।

তাহাকে বুকে করিয়াই বিমল কাছারীর দিকে চলিল। জানোয়ারের সঙ্গে জানোয়ারের মত ব্যবহার করিয়া ফল নাই, তাহাকে আজই বিদায় করিয়া দিবে। কাছারীতে তখনও নায়েব আসে নাই। এক জন পাইককে সে হুকুম করিল—নায়েববাবুকে একুনি ডেকে নিয়ে আয়। বলবি বাবু ব'সে আছেন।

নায়েব আসিতেই বিমল বলিল—আজই একজন পুরোহিত টিক করতে হবে দুপুরের আগেই।

কথাটা সম্পূর্ণ ব্রীতে না পারিয়া নায়েব বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিমল বলিল—যহু ভট্টচাষকে জবাব দিয়ে দেন। আজই—একুনি।

নায়েব চুপ করিয়া রহিল। এমন পরমাশ্চর্যের কথা সে যেন কখনও শোনে নাই। বিমলের রুদ্ধ রোষ যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে আবার বালল—লোকটা লোভী, অভিবড় লোভী, তা ছাড়া বর্কর, জানোয়ার, কাণ্ডজানহীন।

নায়েব বলিল—আজ্ঞে—তা যে হবার উপায় নাই।

—উপায় নাই! কেন?

রোবে বিমল গজ্জন করিয়া উঠিল।

—আজ্ঞে দোবোস্তরের দলিল বোধ হয় আপনি দেখেন নি?

অদহিহু হইয়া বিমল বলিয়া উঠিল—কি বলছেন আপনি স্পষ্ট করে বলুন। হী, দোবোস্তরের দলিল দেখনি আমি, কিন্তু কি প্রকারে তাহা?

ভট্টাচার্য মশায় দলিদের হর্তাকর্তা থাকবেন। বাবতীর পূজা-পার্বণ তাঁর নির্দেশমত হতে হবে। তাঁর জীবনভোর ত তিনি পুণ্যাহিত থাকবেনই, এমন কি তাঁর পরে কে পুণ্যাহিত হবেন তাও নির্দেশ করে যাবেন তিনি। তবে গিন্নীমায়ের একটা সম্মতি চাই।

বিমল অবাক হইয়া নারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল লোকটা প্রলাপ বকিতেছে। নারের তখন বলিতেছিল—এমন কি যত ভট্টাচার্য ইচ্ছে করলে দেবোত্তর সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ পর্যন্ত ট্রাষ্টার কাছে চাইতে পারেন। যদি তাঁর মতে ট্রাষ্টা স্বেচ্ছাচারী হয়, কি হিন্দুধর্মবিগর্হিত কোন কাজ করেন, তবে তিনি আদালতে ট্রাষ্টাকে পদচ্যুত করতে পারবেন। তাঁর আর গিন্নীমায়ের ক্ষমতা এক।

বিমল বিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বলিল—নিরে আত্মন দলিল।

নারের দলিল আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—দলিলের আবার তিনখানা কপি,—একখানা আছে এন্ট্রের সেরেস্তায়, একখানা আছে গিন্নীমায়ের কাছে, আর একখানা আছে ভট্টাচার্যের হাতে।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তিন-চার বার দলিলখানা পড়িয়া বিমল টেবিলে মাথা ঝুজিয়া গুন্ম হইয়া বসিয়া রহিল। তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল চাবুক মারিয়া সে পাষাণকে বিদায় করে। আপনার জ্ঞাত্য অধিকারে বঞ্চিত হওয়ার একটা প্রচণ্ড আক্ষেপ আছে, সে আক্ষেপে সে যেন পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। ইচ্ছা করিতেছিল সন্ধ্যায় ঐ দলিলখানা হুটুহুটু করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

আবার সে দলিলখানা পড়িল। দেখিল ইহার প্রতি-বিধানে কিছু করিতে পারেন না। সে উঠিয়া চলিল তাহার কাছে। যা সমস্ত ভূনিয়া বিমলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বহিলেন। তারপর বলিলেন—একবার যা বললে তুমি বিমল, বারান্তরে আর বণো না। বললে—দেবোত্তরের ট্রাষ্টা ঘুচোবার জন্তে আমাকে দরখাস্ত করতে হবে।

বিমল আর কিছু বলিল না। সে সটান উপরে উঠিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। নারীচরিত্র তাহার অজানা নয়—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের মেয়েদের সে বেশ চেনে।

যুব বেশী দৃঢ় লক্ষ্যকে টলাইতে হইলে বড়-বোর প্রয়োজন এক দিন উপবাস।

চাকর চা লইয়া আসিতেই সে বলিল—নিরে বা, আমি খাব না।

জলখাবার-হাতে স্ত্রী প্রায় সবে সবে আসিয়াই বলিলেন—তোমার এ মতিভ্রান্তি দিন দিন কি হচ্ছে বল দেখি?

বিমল কিন্তু হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া সে বলিল—ইচ্ছে করছে আজ কালাপাহাড় হতে। তুমি এই বাড়ির কেন—দেখতা-টেবতা টান ঘেরে জলে কেলো—

শিহরিয়া উঠিয়া স্ত্রী কানে আঙুল দিয়া বলিলেন—চুপ—চুপ—চুপ!

তাহার মুখের লক্ষ্যভ্রম বিকল্পই বেশিয়া বিমল আপনাই হইতেই চুপ করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী তখনও ধমু ধমু করিয়া কাঁপিতেছিলেন।

একটু স্নানকরইয়া লইয়া তিনি বলিলেন—বাই থাকে বলিগে—গোবিন্দের চরণে তুলসী দেওয়ার স্বাক্ষর করুন না। কি হবে যা আমার সর্বস্বস্বরূপী কাঁপছে। অধিকার বিমল চীৎকার করিয়া উঠিল—থবরবার। এই জানোয়ার বামন—

স্ত্রী ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? কাঁকে কি বলছ? জান, গোবিন্দীর সঙ্গে ওর কথা হয়!

এবার বিমল হতবাক হইয়া গেল। এত বড় লক্ষ্যভ্রমী ত তাহার জানা ছিল না! স্ত্রী বলিলেন—আজ আমি এখন কিছু খেয়ো না তুমি। তোমার নামে তুলসী কেজা হবে। চরণামৃত—আশীর্বাদ নিয়ে তবে...। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কর কি—ছি—ছি—ছি, তুমি যে মেলেছ হয়ে উঠবে মিন মিন।

চারের টেটে চায়ের কাপটা তখন ঠাণ্ডা জল হইয়া গিয়াছিল। বিমল ঢক ঢক করিয়া সেই ঠাণ্ডা চা গিলিয়া কাপটা ঠক করিয়া নামাইয়া দিল।

স্ত্রী বলিলেন—বাকু আমি উপোস করে থাকলেই হবে। আর কিছু খেয়ো না ঘেন।

তিনি জলখাবারের ভিট্টা লইয়া আক্ষেপ করিতে করিতেই চলিয়া গেলেন।

—কি হবে বাগো, তবে আমার সর্বস্বস্বরূপী কাঁপছে।

মাঝেই বা বলব কি করে আমি। লক্ষ্যের বেলায় মাথাটা আমার কাটা যাচ্ছে যে! হি! হি!

বিমলের ইচ্ছা করিল রাক্ষস হইতে বন্দুকটা লইয়া নিজের বুকেই লাগিয়া দেয়।

হুই হাতে মাথা ধরিয়া সে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর সে শুনিল—ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর।

—কই—সে শালী কই গো বউঠাকরুণ?

গিন্নী গগগগ ভাবে বলিলেন—কি হ'ল আজ আবার শবীর সঙ্গে!

—ভারি ছুটু হয়েছে সে বউ। গোবিন্দজীকে বলেছে ছাই কালো। বাল্যভোগের প্রসাদ আনলাম—চরণাশ্বেত এখনছি।

সঙ্গে সঙ্গে খুকীর ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। তারপরই ভট্টাচার্যের ভীত তিরস্কার প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—খবরদার বউমা, খবরদার! কেন মারবে ওকে তুমি! মার বউ-ঠাকরুণ, বউটাকে এক চড় তুমি কসে দাও।

তারপর মঙ্গলকণ্ঠে তিনি বলেন—কেন না ভাই সখি, কই না তুমি। এস আমার সঙ্গে এস। বাল্যভোগের প্রসাদ খেতে খেতে গল্প শুনেবে এস। এস ভীষ কি করে বক রাক্ষসকে ঘেরেছিল বলব এস। খুকী ঝিল্ ঝিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে—কল—সেই পায়ের খেতে খেতে—

কথা তাহার সম্পূর্ণ হয় না। কলসরা হাসি চক্মিলান বাড়ির বিলানে বিলানে জলতরঙ্গের মত বাজিয়া বাজিয়া উঠে।

ভট্টাচার্য বলেন—বউমা তোমার আজকাল দেবসেবার এমন অকল্যাণ হ'ল কেন বল ত? আগের মতন ত কই—

গিন্নী বাধা দিয়া বলেন—তুমি এক এক সময় এমন কথা বল ঠাকুরপো! বিমল বাড়ি রয়েছে এখন—

হা হা করিয়া হাসিয়া ভট্টাচার্য বলেন—বুড়ো হয়েছি কি-না বউ। তা আমি-সেবা করা ভাল—পরম ধর্ম।

বিছানার উপর বিমল লাক দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলে ক্রট!

ভট্টাচার্য বলেন—তুলসী ক-পাতা পড়ান আছে ত?

* * *

নিষ্কাশে মনের ঘা মনে রাখিয়াই বিমলের দিন কাটিতেছিল। সেখানে সমস্ত সত্যের বিরোধী সেখানে সে ছাড়া

উপায় কি? তাহা ছাড়া আর একটা দিকও ছিল। আর একাদক দিয়া বিপুল পরিতৃপ্তিতে মন তাহার ভরিয়াছিল জমিদারী ও ব্যবসারে আশাতীত সাফল্য তাহাকে এ-দিকট ঘেন ভুলাইয়া দিয়াছিল। সম্পত্তির পর সম্পত্তি সে কিনিয় চলিয়াছে।

সে-দিন নায়েব বলিল—সরকারদের লাট খড়বোন বিজী হচ্ছে বাবু।

লাটখড়বোনা! বিমল লাফাইয়া উঠিল। লাটখড়বোন যে সোনার সম্পত্তি! এ চাকলার এমন সম্পত্তি আর নাই তাহা ছাড়া যে-গ্রামে বিমলের বাস সে-গ্রামধানিও লাট খড়বোনার অন্তর্গত। নিজে জমিদার হইয়া অপরের জমিদারীর মধ্যে প্রজা হইয়া বাস করার আক্ষেপ ও লজ্জা আজ তিনপুরুষের মধ্যে মিটিল না।

নায়েব বলিল—রত্নপুরের চাটুজেরা না-কি কিনছে।

বিমল বলিল—একুনি ঘান আপনি সরকারদের গুণানে।

নায়েব হাসিয়া বলিল—কাল রাজে শুনে রাজেই আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

—তারপর?

—কথাবাণী একরকম কয়ে এসেছি। পরত্রিশ হাজার টাকা দাম চায়। চাটুজেরা তেত্রিশ হাজার কথা কয়ে গেছে। বড় সরকার বললেন পরন্তু পর্যন্ত দলিল রেজেষ্ট্রী করে কাজ শেষ করতে হবে। কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত টাকা দিয়ে রাজেই দলিল লেখাপড়া শেষ করতে হবে, নইলে আর হবে না। চাটুজেরা পরন্তু টাকা নিয়ে আসবে।

বিমল বলিল—আম্বন আমার সঙ্গে। বাগল সেকরাকে ডাকতে পাঠান।

সিম্রুক খুলিয়া বিমল দেখিল মজুত মাত্র দশ হাজার। ব্যাঙ্কের খাতার মজুত বার হাজার দু-শ পঁচিশ। কথাটা শুনিয়া মা-জী আপনাদের গহনা বাহির করিয়া দিলেন। বাগল স্বর্ণকার ওজন করিয়া মুদ্রা অতুমান করিল—হাজার আটেক। এখনও চাই পাঁচ হাজার! কণ স-এ-হের সময় নাই। মধ্যে মাত্র দশটা-ত্রিশেক সময়। বিমল ক্ষুধার হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সকল তাহার মাথার বিভ্রান্তের মত একটা কথা খেলিয়া গেল। দেবোত্তরের খাতার সে দেখিয়াছে বিজ্ঞানের

অলসারে বহু টাকা আদায় হইয়া আছে। সে মায়ের পা দুইটা
জড়াইয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

ব্যস্ত হইয়া চিবুকে হাত দিয়া চুমা খাইয়া মা বলিলেন—
ওঠ—ওঠ—কি হ'ল কি ?

বিমল উঠিল না। বলিল—আগে বল—আমার কথা
রাখবে ?

—রাখব রাখব—ওঠ—তুই।

—আমার মাথায় হাত দিয়ে বিব্যা কর।

—তাই করছি—সাধ্য থাকলে করব। তুই ওঠ বাবা।

বিমল উঠিয়া বলিল—ঠাকুরদের গমনাগুলি দাও।

মা সভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।—দে কি রে ?

বিমল বলিল—আমি আবার গড়িয়ে দেব। যত টাকার
নেব তার চেয়ে বেশী দেব।

মা কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। বিমল বলিল—
গোবিন্দজীর নামেই ও-সম্পত্তি কিনব মা। তা হ'লে ত হবে।

মা বিধাভরে বলিলেন—তাই ত বিমল।

আবার তাঁহার পা দুইটা ধরিয়া বিমল বলিল—স্তন পুরুষের
লজ্জা মা—এ স্বযোগ পেলে সে লজ্জা আর ঘুচবে না।

মা বলিলেন—দাঁড়া বাবা, ভট্টাচার্য ঠাকুরপোকে ডাক।

বিমল বলিয়া উঠিল—না—না—না। তা হ'লে আর হবে
না। সে একধারার মানুষ—সে প্রাণ ধরে কখনও দিতে
বলতে পারবে না।

মা বলিলেন—কিন্তু গয়না যে তাঁর কাছেই বাবা।

বিমল আতকাইয়া উঠিল।—বল কি মা! সে কি ?

সে যদি হঠাৎ মরে যায়—কি—

মা বাধা দিয়া বলিলেন—ছিঃ বিমল—কাকে কি বলছ ?

দৃঢ়স্বরে বিমল বলিল—ঠিক বলছি মা। তোমরা বাই
ভাব এমন লোভী আমি কখনও দেখিনি।

মা বলিলেন—গয়না কখনও তিনি বাড়ি নিয়ে যান না
বিমল। ঠাকুরঘরেই দেবোত্তরের আয়রণ চেটে সে-সব
মজুত থাকে।

—চাৰি ?

—চাৰি তাঁরই কাছে থাকে।

—হঁ।

নায়েবাবু ভট্টাচার্য ফলায়কে ডাকুন ত।

উত্তেজনায বিমল অস্থিরভাবে পার্শ্বে গিয়া বসিয়াছিল।
হাসিন্ধুধে বাড়ি ঢুকিয়া ভট্টাচার্য বলিলেন—কি হ'ল সে
বউ-ঠাকুরপা।

বিমল এবার তাঁহার পায়ে উপুড় হইয়া পড়িল। ব্যস্তভাবে
ঠাকুর তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—কি—কি—হ'ল
কি—বাবা বিমল ?

বিমলের মা সমস্ত কথা বলিয়া বলিলেন—সম্পত্তি
গোবিন্দজীর নামেই কেনা হবে ঠাকুরপো। আর যে-টাকার
গয়না নেওয়া হবে এক বছরের মধ্যে বিমল তার দেড়গুন
বেশী দেবে।

মাথা নাড়িয়া ভট্টাচার্য বলিলেন—তা হয় না বউ। সে
আমি দিতে পারব না। না—সে কিছুতেই হবে না।

বিমল বলিল—বুঝুন আপনি ভট্টাচার্য কাকা—গোবিন্দজীর
সম্পত্তি বাড়বে।

—উহ। সম্পত্তি নিয়ে কি করবে ঠাকুর ? উহ, সে আমি
দিতে পারব না।

নায়েব বলিল—নিজ গ্রাম ঠাকুরের দখলে আসবে।
পরের জমিদারীতে ঠাকুরকে বাস করতে হয় ভট্টাচার্য
মশাই—

ভট্টাচার্যের সেই এক জবাব—উহ—গয়না আমি দিতে
পারব না বাপু। উ—হঁ।

এবার বিমল উঠিল। দৃঢ়স্বরে বলিল—চাৰি মেন সিদ্ধকৈর।

বিস্মিতভাবে ভট্টাচার্য তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—
কেন ?

কঠোর স্বরে বিমল আদেশ করিল—মেন ! মেন বলছি !

ভট্টাচার্য বলিলেন—চাৰি ত আমার কাছে নাই।

অকস্মাৎ তাহার হাত ধরিয়া রূঢ় ভাবে আঁকি দিয়া বিমল
চীৎকার করিয়া উঠিল—চাৰি সে বলছি জগৎ বায়ুন ! নইলে
গুলী ক'রে তোকে মেরে ফেলব !

গিন্নী চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—বিমল !

ভট্টাচার্য বিমলের মুক্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন—
ভীতস্বরে বলিলেন—চাৰি ত তোমার মায়ের কাছে থাকে
বাপু !

দৃঢ়স্বরে বিমল বলিল—চাৰি দাও মা !

মা বলিলেন—ঠাকুরপো !

ভট্টাচ্য ধীরে ধীরে বাড় নাড়িয়া বলিলেন—উহ—সে হয় না বউ। প্রাণ ধরে সে আমি বলতে পারব না। উ—হ!

বিমল ক্রমপদে মায়ের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কাঠের হাতবান্ধটা ধাক্কিত সম্মুখেই একটা জলচৌকীর উপর। সেটাকে আনিয়া সে উঠানের উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিল। পাথরের টালি দিয়া বাঁধানো উঠানে আছাড় খাইয়া বান্ধটা চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল। ভিতরের জিনিষপত্র চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। রিঙে-গাঁথা গোছা দুই চাবি তাহার মধ্য হইতে কুড়াইয়া লইয়া বিমল উন্নতের মত মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল।

একটা মাহুঘ যখন উন্নত হইয়া উঠে তখন অপর সকলে হইয়া যায় যেন মুক—পঙ্ক। বাড়ির সমস্ত লোক বিমলের উন্নততায় মুক—পঙ্কর মত পাড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বিমল আসলে করিয়া একরাশি অলঙ্কার আনিয়া বাগল স্বর্ণকারের সম্মুখে ঢালিয়া দিল। বলিল—ওজন কর।

মুক—পঙ্ক ভট্টাচ্য অলঙ্কারগুলির দিকে তাকাইয়া বরং বরং করিয়া কানিয়া ফেলিলেন। তার পর বাঁপ দিয়া উপুড় হইয়া পড়িলেন অলঙ্কাররাশির উপর। বকের মধ্যে ঢালিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—না—না—এ দেব না, দিতে পারব না। আমার—এ আমার।

বিমল ক্রতভাবে হাতে ধরিয়া সবলে ভট্টাচ্যকে টানিয়া সরাইয়া ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রলয় ঘটয়া গেল যেন। সহসা ভট্টাচ্য পাথরের উঠানে মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিলেন উন্নতের মত।

—এই নে—এই নে—তবে এই নে। এই নে—এই নে।

আবাড়ের পরিমাণ বোধ নাই—জীবনের মমতা নাই—উন্নত বিকারগ্রস্ত যেন! ফিন্কে দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। সে রক্তে ভট্টাচ্যের দেহ ভাসিয়া গেল—খানিকটা মাটি রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।

বিমলের মা চীৎকার করিয়া কানিয়া উঠিলেন। ছুটিয়া আসিয়া ভট্টাচ্যকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিলেন—ঠাকুরপো! ঠাকুরপো!—

ভট্টাচ্য বলিয়া উঠিলেন—না—না—পারব না—পারব না আমি দিতে।

হা বিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাবা বিমল!

লজ্জাসরম তুলিয়া গিয়া স্ত্রী আসিয়া বলিল—ওগো! খুঁকী ভাশাশে পাড়াইয়া ভয়ে কানিতেছিল। নাহবে পাড়াইয়াছিল পাথরের মূর্তির মত। বিমলেরও উন্নততায় ছুটিয়া গিয়াছিল। বিপুল যথাবিমিশ্রদৃষ্টিতে সে চাহিয়াছিল ঐ লোভজঙ্ঘর বৃদ্ধের দিকে। সে বেশ বুঝিল, বৃদ্ধের সর্বদেহ ঐ লোল-কুঞ্চন—ও জরা নয়—লোভজঙ্ঘরতা। সে স্থান ত্যাগ করিতে করিতে বলিল—নে—নিয়ে যা। ইচ্ছে হয় ত বাড়িও নিয়ে যা ওগুলো।

কাচারীবাড়িতে গিয়া সে উঠিল। কিছুক্ষণ পর দেখিল বাগল স্বর্ণকার আবার চলিয়াছে অন্দরের দিকে। সে বুঝিয়াছিল—তবু জিজ্ঞাসা করিল—কি রে বাগল?

—আজ্ঞে তুলসী পাচপাতা।

* * *

বিমল ভাবিয়াছিল এই ঘটনার পর সে এখানে বাস করিবে কি করিয়া। তাহার দারুণ পরাজয়ের বার্তা লেগা রহিল ওই লোভী ব্রাহ্মণটার ললাটে। নিত্য দুইটি বেলা ঐ লিপি-অঙ্কিত ললাট লইয়া তাহারই সম্মুখ দিয়া তাহারই বাড়িতে যাইবে আসিবে—সে তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিবে? কিন্তু নিরুপায়ে মাহুঘকে সব সহ্য করিতে হয়—ধীরে ধীরে সব সহ্য হইয়া যায়ও। বিমলেরও সহ্য হইল। যেমন পৃথিবী চলিতেছিল তেমনি চলিয়াছে। কিন্তু আক্কেশ বিমলের গেল না। মনে মনে সে স্ববেগ সন্ধান করিয়া চলিল। বহুকষ্টে কৌশলে তুলসী-পাতার ওজন সে কিছু কমাইল। শুভদিন না দেখিয়া সে আর যায় না। মামলা-মকদ্দমার সংবাদ গোপনে থাকে। বাড়িতে মেয়েদের কানে আর তোলে না। কিন্তু তবুও বাগলের আসা-যাওয়ার বিবরণ নাই। তাহার মুখে দ্বিতীয় কথাও নাই।

—বাগল—কিরে?

—আজ্ঞে—তুলসীপত্র।

বিমল মনে মনে গজ্জায়। খুঁকীটা পর্বাঙ্ক বস্ত্র বড় হইতেছে তত তাহার ঐ লোভী ব্রাহ্মণটার উপর ভক্তির প্রাণলতা বেগা যাইতেছে। দিবারাজি সে এখন মন্দিরে আছে। ফুলভোলা মালাগাঁথার ভার নাকি রূপা করিয়া বৃদ্ধ তাকাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এক এক সময় মনে হয় যাক গে বাহা করিতেছে সে কক্ক, উহার আর কম দিন? পরকণ্ঠেই সে আশ্বির হইয়া

উঠে। অন্ধের মত বিপদের মৃত্যুকামনা ও আয়ুর দিন গণনার লক্ষ্য কাঁটার মত তাহাকে বিধিতে থাকে।

সে-দিন সকালে বসিয়া এই চিন্তাই সে করিতেছিল। এই মাত্র বৃদ্ধ সমুখ দিয়া ঘড়ির কাঁটাটির মত একগতিতে চলিয়া গেল।

খুকী আসিয়া ডাকিল—বাবা! ঠাকুমা তোমাকে ডাকছেন।

বিমল ভেলেবেগুনে জলিয়া উঠিল। নিশ্চয় কোন ব্রত-পাকল!

বৃদ্ধ গেল—অব্য-বহিত পরেই মা ডাকিলেন—ডাক লইয়া আসিল খুকী। সাজান বন্দোবস্ত। এ ঘেন নাগিণ ঘায়ের হইল—হাকিম সমন সহি করিয়া দিলেন—পেয়াদা সমন জারি করিল। সে বিরক্তিরে বলিয়া উঠিল—যা—এখন আমার সময় নাই যা!

খুকী বলিল—মায়ের যে জর হয়েছে বাবা।

বিমলের মনে পড়িল সত্যিই ত গত রাত্রে চারু সমস্ত রাত্রি কাতরাইয়াছে। শরীরে ঘেন উত্তাপও সে অনুভব করিয়াছিল। সে তড়াতাড়ি উঠিয়া বাড়ির ভিতর গেল।

মা বলিলেন—বউমার জর হয়েছে রে, ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দে।

—কতটা জর হয়েছে?

—খুব বেশী নয়। কিন্তু বেলার সঙ্গে জরটা বাড়ছে মনে হচ্ছে। ওঠেনি বেচারী আজ সকাল থেকে।

বিমল উপরে উঠিয়া গেল। বিছানায় শুইয়া চারু ছটকট করিতেছিল। দাছে হৃদয়ের রং রাজা হইয়া উঠিয়াছে। কপালে হাত দিয়া সে অনুভব করিল উত্তাপ অনেকখানি।

* * *

দেখিতে দেখিতে চারুর অস্থি ভীষণীকর ধারণ করিল। জেলার সদর হইতে বড় ডাক্তার আনান হইল। তিনি বলিলেন—টাইফয়েড। মিনের পর দিন কাটিতে আরম্ভ করিল—যমের সঙ্গে বৃদ্ধ করিয়া। বিমল মাথার শিয়রে বাসা গাড়িয়াছে। একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া তাহার বিনোদন নগ্নে দিনরাত্রি কাটিয়া যায়। মনের মধ্যে অশ্রুচোচনার তাহার অন্ত নাই। ইদানীং এই বৃদ্ধের প্রতি আকোশ—বৃদ্ধের প্রতি ভক্তির জন্ত চারুর উপরও কতকটা

আসিয়া পড়িয়াছিল। শুধু চারু কেন এই বৃদ্ধ আজ তাহার সংসারের সকলকে আড়ালে রাখিয়া তাহার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইয়া আছে। একদিকে সে একা; অন্য দিকে বৃদ্ধের আড়ালে দাঁড়াইয়া সকলে যেন সন্তুষ্ট তাহার দিকে চায়।

—বউঠাকরুণ!—

মা বলেন—এস ঠাকুরপো!

—গোবিন্দজীর চরণামৃত এনেছি।

বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া তিনি ডাকেন—বউমা! বউমা!

গোবিন্দজীর চরণামৃত—হাঁ কর!

সামান্য জ্ঞান থাকিলেও চারু মুখ মেলিয়া চরণামৃত পান করিয়া বলে—আঃ।

জ্ঞান না থাকিলে সজলনয়নে বৃদ্ধ লগাটে স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া চলিয়া যান। মা বলেন—ঠাকুরপো, দেবার ভার তোমার ওপর।

কথা বলিতে বৃদ্ধের ঠোট দুইটা ধর ধর করিয়া কাপে। বলেন—নিশ্চিন্ত থাক বৌ!

প্রয়োজনে বা বিপুল আশঙ্কার দুর্ঘোষ ঘনাইয়া আসিতেছে মনে হইলে বিমল পলাইয়া আসে কাছারীতে। পথে দেখে মন্দিরের মধ্যে বসিয়া বৃদ্ধ কিছু-না-কিছু করিতেছে। সন্ধ্যায় ডাক্তার আসেন—তাহাকে বিদায় করিতে গিয়া নিত্য বিমলের নজরে পড়ে একটি পুঁটুলী হাতে বৃদ্ধ চলিয়াছে। এই অবস্থাতেও বিমলের হাসি পায়—লুণ্ঠন চলিয়াছেই—লুণ্ঠন চলিয়াছেই।

যাই হউক, চারু বাঁচিল। আটশ দিনের পর ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন—আজ ভরসা হচ্ছে বিমলবাবু। উঃ, যা ভয় আমাদের হয়েছিল। সকল কথা ত আপনাকে বলতে পারতাম না। বত্রিশ দিন পেরিয়ে গেলেই ‘আউট অব ডেঞ্জার’।

তিনি একটু হাসিলেন।

বিমল কৃতজ্ঞ ভাবে তাহার দিকে চাছিল বলিল—কি বলে ধন্যবাদ দেব আপনাকে—

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—ওপরের তাঁকে ধন্যবাদ দেন বিমলবাবু। ধন্যবাদ আমাদের পাওনা নয়—আমরা নিই ফি। একটা কথা জানেন—Medicine can cure disease but cannot prevent death. ডাক্তার চলিয়া গেলেন। বিমল

দেখিল চাক প্রশান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। পরম স্নেহভরে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল অরু নাই। পাণ্ডুর ললাটে বিন্দু বিন্দু স্নেহবিন্দু দেখা দিয়াছে।

বাহির হইতে মা ডাকিলেন—বিমল!

—মা।

—রয়েছিস? একটা কথা আছে বাবা।

মন ছিল প্রশান্তিতে ডরিয়া। পরম পরিতুষ্ট স্বরে একান্ত আত্মবাহের মত সে বলিল—বল মা।

মা ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন—এস ঠাকুর পো, এস।

বুড় ভট্টাচার্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া অকারণে বার-কতক কাসিয়া উঠিলেন। হাতে তাঁর নিত্যকার সেই একটা পুটলী।

মা বলিলেন—বল ঠাকুরপো—তুমি বল।

—বলছিলাম কি—ডাক্তার বললেন—বউমার নাকি আর কোন ভয় নাই। তা হ'লে যদি তোমরা বল তবে আমি লক্ষ্য লক্ষ করি।

মা বলিলেন—কি বলিস বিমল?

ক্রুদ্ধকিত করিয়া বিমল বলিল—কিসের লক্ষ্য মা?

মা বলিলেন—তুই বুঝি জানিস নে। বউমার অস্ত্রের পাঁচ দিনের দিন থেকে বরাবর সমস্ত দিন উপবাসী থেকে ঠাকুরপো গোবিন্দজীর পূজা ক'রে যাচ্ছেন। রাতে ছুটি হবিষ্য করেন। তাই বলছেন...

তাহার চাকর জন্ত ভট্টাচার্য কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়াছেন শুনিয়া বিমল একটু খুশী হইল। বলিল—তা বেশ।

ভট্টাচার্য বলিলেন—তা হলে কালকেই ব্রত শেষ করব। তুলসীপত্র ইত্যাদি মা-বা লাগবে কর্দ ক'রে দিয়েছি। সে-গুলো জোগাড় ক'রে রেখো।

বিমলের মা বলিলেন—আমি বলছিলাম কি ঠাকুরপো—চল্লিশ দিন মা গেলে বোমা কোল পাবেন না। আর এ রোগটা নাকি ভারি কুপেকে রোগ।

ভট্টাচার্য বলিলেন—তাই হবে বউ। তুমি এখন বলছ তখন তাই হবে। বা হুকুম করবে তোমরা।

বিমল ভট্টাচার্যের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সে ভাবিতেছিল এই জীবটির উপর আক্রোশ সে পোষণ করিয়াছিল কেমন করিয়া!

সে প্রচ্ছন্নবাক্য তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া গ্রহণ করিল—কত দিন আপনি উপোস ক'রে থাকতে পারেন ভট্টাচার্য-মশায়?

ভট্টাচার্য হাসিলেন একটু শুক হাসি; বলিলেন—এই যে আমাদের জীবিকা বাবা। এতে অশক্ত হলেও যে উপবাস ক'রে মরতে হবে। না পারলেও প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে বইকি।

উপবাসব্লিষ্ট কণ্ঠস্বর—কথা বলার কক্ষণ দীন ভঙ্গী বিমলের প্রশান্ত মনকে স্পর্শ করিল। অকস্মাৎ তাহার লজ্জার আর অবধি রহিল না। দৃষ্টান্তে পড়িল দারিদ্র্যশীর্ণ কঙ্কালসার মানব—আর তাহার স্বার্থান্বেষিত অন্তরের অন্তরাল হইতে উকি মারিতেছে এক স্নেহপরায়ণ কাঙাল।

সে তাড়াহাড়ি বলিয়া উঠিল—না—মা—থাক। কালই কাকা ব্রত শেষ করুন। কেন শুকে কষ্ট দেওয়া—ডাক্তার ত বলে গেলেন—

ভট্টাচার্য বলিলেন—না—না—বাবা। কোন কষ্ট হবে না আমার। আমার বোমার জন্ত গোবিন্দের মুখচেয়ে আনন্দেই কেটে যাবে কটা দিন।

বিমল আর আপত্তি করিল না। ভট্টাচার্য তাহার পুটলিটি তুলিয়া লইয়া ঠুকঠুক করিয়া নিজা যেমন ঘান জেমন চালায় গেলেন। মাও নামিয়া গেলেন নীচের তলায়। বিমল তখন ভাবিতেছিল—শুধু কি উমরের দানে—শুধু কি লোভ? আর কিছু? দেবতার প্রতি একবিন্দু ভক্তি? তাহাদের প্রতি একবিন্দু ভালবাসা?

কথপোকথনের মধ্যে চাক কখন জাগিয়া উঠিয়াছিল। নিরালস্য স্বামীকে পাইয়া সে বলিয়া উঠিল—ভট্টাচার্যকাক! আমার বড় ভালবাসেন।

জৈনধর্মের প্রাণশক্তি

শ্রীক্ষতিমোহন সেন

আমার কাজ প্রধানতঃ ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মের আন্দোলন লইয়া। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম-আন্দোলনের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তাহার যোগ থাকিলেও আমার আলোচনার ক্ষেত্র ততটা দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে চাহি না। তবু আমার একটি স্নেহাস্পদ জৈন ছাত্র আমাকে ধরিয়াছেন এই মহাবীর-জন্মদিনের উপলক্ষ্যে যেন আমি আমার তরফ হইতে কিছু বলি।

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার প্রধান গৌরবের কথা হইল মানব-মনের ধর্মচিন্তার স্বাধীনতা। জৈন ও বৌদ্ধ যতেরও উৎপত্তি তো এই স্বাধীনতা হইতেই। প্রচলিত বেদবাদের বিরুদ্ধে সত্য ও মহৎ আদর্শ লইয়া কি ভীষণ যুদ্ধই তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন! তাই মধ্যযুগের প্রতি বাহাদুরের শ্রদ্ধা আছে তাঁহারা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের এই স্বাধীন সাধনাকে কখনও শ্রদ্ধা না করিয়া পারেন না।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে বিহার প্রদেশে পাটনা হইতে ২৭ মাইল দূরে, 'বসার'তীর্থে শ্রীমহাবীরের জন্ম। সে দিন ছিল চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী। কিন্তু এখন তাঁহার জন্মোৎসব প্রধানতঃ পালিত হয় ১লা ভাদ্রে, পূর্বাষণের চতুর্থ দিনে। ৫২৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বিহারের পান্ডুপুরীতে মহাবীরের তিরোধান ঘটে, তাই পান্ডুপুরী জৈনদের একটি বিশেষ তীর্থ, ইহা দক্ষিণ-বিহারে রাণগহের নিকটে অবস্থিত।

বুদ্ধের সময় খুব সম্ভবতঃ ৫৮৮ হইতে ৫০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, কাজেই মহাবীর ও বুদ্ধ অনেক পরিমাণে সমসাময়িক। উভয়েই অনেকটা একই প্রদেশে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। কাজেই অনেকে যে মনে করেন বিহার ও পশ্চিম-বঙ্গে পার্ব-রজন কালে উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষ্য ঘটিয়াছিল, তাহা নিতান্ত অব্যক্তিক নয়।

মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই বেদের উপদিষ্ট বাগযজ্ঞাদির বিরোধী, লাংগ ও যোগ মতও তাই। ইহাদের সবারই মতে, "সত্তাযাত্রই দুঃখময়, কর্মবশেই নিরন্তর সংসারপ্রবাহ; তাই

দুঃখময় জন্মজন্মান্তরপ্রবাহ হইতে মুক্তিই সাধনার পরম ও চরম কথা।" জৈন বৌদ্ধ ও সাংখ্য মতে ঈশ্বরের স্থান নাই। যোগমতের ঈশ্বরও প্রায় না-থাকারই সাক্ষ্য। মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই সর্বজাতিনির্ভেদে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় ধর্ম প্রচার করেন। উভয়েই সম্রাটের উপর খুব খোঁক দেন, যদিও গৃহস্থ-আশ্রম লুপ্ত হয় নাই; হইলে ধর্মের ধারা এতকাল কেমন করিয়া টিকিত? এই সব নানা কারণে কেহ কেহ জৈন ও বৌদ্ধ মতকে গোলেমাতে এক করিয়া কেলিয়াছেন।

বুদ্ধের সময়েও দেশা যায় নিগ্রহ মত চলিয়াছে। নাত-পুত তাহার উপদেষ্টা। তখন নিগ্রহদের যে খবর মেলে তাহাতে বুঝা যায় তাহা এই জৈনদেরই কথা।

জৈনধর্মে সঙ্গামী ও সন্ন্যাসী এই দুই ভাগ তো আছেই, কিন্তু তাহাদের আসল বিভাগ হইল খেতাবর ও দিগম্বর এই দুই বিভেদ লইয়া। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

বুদ্ধের ধর্মের সঙ্গে মহাবীরের ধর্মের এক বিষয়ে পার্থক্য বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে। বুদ্ধ তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের আদি উপদেষ্টা আর মহাবীর তাঁহার ধর্মের চতুর্কিংশ বা শেষ তীর্থঙ্কর। বুদ্ধ পূর্ব পূর্ব আচাযাগণের উপদেশে বীতভ্রম হইয়া স্বাধীন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন আর মহাবীর হইলেন তাঁহার মতবাদের পূর্বতন সব মহাপুরুষদের সমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা।

চকিণ জন তীর্থঙ্করের শেষ হইলেন মহাবীর আর তাঁহার পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর হইলেন পার্শ্বনাথ। ওঙ্গালরা পার্শ্বনাথকেই বিশেষ করিয়া মানেন। অনেকে বলেন পার্শ্বনাথ মহাবীর হইতে ২৫০ বৎসর পূর্বেরকার। উত্তরাধার্যন সূত্রমতে (২০ অধ্যায়) পার্শ্বনাথের শিষ্য কেশীর সঙ্গে মহাবীরের শিষ্য গোতমের দেখা ঘটয়াছিল বলিয়া যে কেহ কেহ মনে করেন পার্শ্বনাথ ও মহাবীর প্রায় সমকালীন তাহা ঠিক নহে,

কারণ পাশনাথের শিষ্য কেন্দ্রী ছিলেন সেই পরম্পরাতে বহু পয়ে উৎপন্ন।

মহাবীরের পরবর্তী আচার্য ও স্থবিরাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় জৈন কল্পসূত্রে। মহাবীরের শিষ্য স্বধর্ম হইতে শাণ্ডিল্য পর্যন্ত তেত্রিশ জন স্থবির। দিগম্বর-মতেও বহু স্থবির আছেন। তাঁহাদের প্রথম ও বৃষ্ঠ স্থবিরের নাম খেতাধর-মতের সঙ্গে মেলে, আর সব নাম ভিন্ন।

বৃষ্ঠ স্থবির ভক্তবাহু হইতে চতুর্দশ স্থবির বজ্রসেন পর্যন্ত স্থবিরগণের শিষ্য, নাম, গণ, কুল ও শাখা জৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে।

বুলর তাঁহার এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকার (১৮২২) যে মথুরায় প্রাপ্ত এক খোদিত লিপি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে লিখিত সব নামের সঙ্গে জৈনশাস্ত্রোক্ত নামের মিল আছে।

এই সব গণ-কুল-শাখা প্রভৃতি অহুসরণ করিয়া জৈন সাধনার ধারা অনেকটা দূর পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। তাহার পর আবার বহু সন্ধান মেলে হেমচন্দ্রের গুর্জাবলী ও পট্টাবলীতে। তাহাতে বহু “গচ্ছ” বা পরম্পরার কথা আছে।

গুজরাতে খেতাধর জৈনদের মধ্যে স্থানকবাসীরা মূর্তি-পূজা স্বীকার করেন না; ডেরাবাসীরা করেন। ডেরাবাসীদের প্রধানতঃ চারিটি গচ্ছ—

- ১। ভূপাগচ্ছ। ইহাদের ভিক্ষাপাত্র লাল।
- ২। ধরতর গচ্ছ। ইহাদের ভিক্ষাপাত্র কাল।
- ৩। অচঞ্চল গচ্ছ।
- ৪। পয় চন্দন গচ্ছ।

গুজরাতে ইহা ছাড়া আরও চারিটি গচ্ছ দেখা যায়।

খেতাধরদের মতে মহাবীর ছিলেন বিবাহিত। পিতার মৃত্যুর পরে বড় ভাইয়ের অহুমতি লইয়া কস্তা প্রিয়দর্শনাকে ঘরে রাখিয়া খ্রিষ্ট বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হন। সৎসার ত্যাগ করিয়া গেলে মহাবীরের দৌহিত্রী যশোবতী ভয়গ্রহণ করেন। দিগম্বর-মতে মহাবীর ছিলেন বাল-সন্ন্যাসী। অষ্টম বৎসরে তিনি সৎসার ত্যাগ করেন।

খেতাধরদের মতে মহাবীরের জামাতা জমালি হইতেই ‘নিম্বক’ বা ভেরের স্তব্ধ। অষ্টম ‘নিম্বক’ই হইল দিগম্বর মত; এই ভেদ বর্টে ৮৩ খৃষ্টাব্দে।

দিগম্বররা আবার কেহ কেহ বলেন বৃষ্ঠ স্থবির ভক্তবাহুর সময়ে অর্দ্ধকালক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, তাহা হইতেই (৮০ খৃষ্টাব্দে) হয় খেতাধরদের উদ্ভব। ইহার পূর্বে আর কোনো নিম্বক বা বিভাগ ঘটে নাই। মূল সম্মু আবার পরে (১) নন্দী, (২) সেন, (৩) সিংহ, (৪) দেব—এই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

খেতাধর সাধুরা কৌপীন ও উত্তরীয় এই দুইখানি বস্ত্র ব্যবহার করেন। কৌপীনকে তাঁহারা বলেন “চোল পট্ট” আর উত্তরীয়কে বলেন “পছেড়ী”। তাহা ছাড়া তাঁহারা কদল বা কাঁথাও ব্যবহার করিতে পারেন।

স্থানকবাসী সাধুরা মূখের উপর একটি বস্ত্রাচ্ছাদন বাধেন, তাহাকে বলে “মুখ-পত্তী,” সাধারণ লোকে বলে “মোমতী”। ধূল কীটাদি সরাইবার জন্য সাধুরা যে কাঁটা রাখেন তাহার নাম “পিছী”। তাহা ছাড়া কাঠ পাত্র প্রভৃতি লইয়া চৌদ্দটি জিনিষ পর্যন্ত তাঁহারা রাখিতে পারেন।

দিগম্বর সাধুরা বস্ত্র ব্যবহার করেন না কাজেই তাঁহারা বনবাসী। তাঁহারা ময়ূরপুচ্ছের “পিছী” রাখেন কীটাদি জীব সরাইতে। খেতাধর সাধুদের মত তাঁদের “উপাশ্রয়” বা থাকিবার নিদিষ্ট বাড়ি নাই। খেতাধর ধনী গৃহস্থেরা নিজেদের জন্য আপন বাড়িতে গৃহ-মন্দির রাখিতে পারেন; দিগম্বররা পারেন না। উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিমার মধ্যেও পার্থক্য আছে। খেতাধরদের প্রতিমাতে বস্ত্র অলঙ্কার মণিমাণিক্যাদি বহু আভরণ থাকে, দিগম্বরদের সেরূপ থাকে না। খেতাধর প্রতিমার চক্ষু ফটিকনির্মিত, দিগম্বর প্রতিমার চক্ষুতে এমন কোনো বিলাসবৈভব নাই এবং তাহার দৃষ্টি ভূতলবিস্তৃত। ইহা ছাড়া পূজার উপচার বা উপকরণাদিতেও পার্থক্য আছে।

খেতাধর দিগম্বর উভয় মতই আপন আপন মতকেই বলেন প্রাচীন। মহাবীরের সময়েও মনে হয় এইরূপ কোনো একটা ভাগ ছিল। তিনি স্থবিরকল্প ও জিনকল্প এই দুই দলকে একত্র করেন। প্রথমোক্ত দল বস্ত্র ব্যবহার করিতেন, দ্বিতীয় দল করিতেন না। তাই কেন্দ্রী ছিলেন সঙ্ঘ আর পৌত্তম্য ছিলেন বিবস্ত্র। তৈরীকদের অনেক গুরু যো নয়ই থাকিতেন। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই এর হইয়া সাধনা করার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

খেতাবর দিশবর বিভাগ বিষয়ে স্থানকবাসীদের দুইটি মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে একটি মহাভূক্তিক হয়। তখন জৈন সাধুর সংখ্যা ছিল চক্ষিশ হাজার। সকলের আর ভিক্ষা মেলে না। তাই বার হাজার নিষ্ঠাবান দৃঢ়ব্রত সাধু, গুরু ভদ্রবাহুর সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতে চলিয়া যান ও বার হাজার সাধু গুরু ভুলভদ্রের সঙ্গে এই দেশেই থাকেন। এই ভুলভদ্রের অধীনস্থ সাধুর দল কৃচ্ছাচার সহ করিতে না পারিয়া বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ভূক্তিক চলিয়া গেলে যখন ভদ্রবাহু এদেশে ফিরিলেন তখন এই দল আর বস্ত্র ব্যবহার ছাড়িতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় মতে ভূক্তিক বশতঃ যখন ভদ্রবাহু দক্ষিণ-ভারতে যান তখন তাঁহার অহুপস্থিতির অবসরে ভুলভদ্র পাটলিপুত্রে একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। তাহাতে প্রাচীন উপদেশের বারটি অঙ্ক সংগ্রহের চেষ্টা হয়। এগারটি অঙ্ক তো যথাযথভাবে মিলিল, বাকী অষ্টটি পূরণ করিয়া দিলেন ভুলভদ্র। ভদ্রবাহু যখন আসিয়া দেখিলেন তাঁহাকে বাদ দিয়াই মহাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ও ঘোষণা করিলেন ঐ দ্বাদশ অঙ্ক অপ্রামাণ্য।

এই বিভেদ সবেও কিছুকাল এই উভয় দল একত্র চলিল, তারপর আর একত্র থাকা অসম্ভব হইল। খেতাবর তপাগচ্ছ মতে এই বিচ্ছেদটি পূর্ণ হয় ১৪২ খৃষ্টাব্দে, চল্লিশবর্ষব্যাপী এক ভূক্তিকের অবসানে। স্থানকবাসীরা বলেন এই বিচ্ছেদটি মতে ৮৩ খৃষ্টাব্দে। কেহ কেহ বলেন বজ্রসেনের দুর্কলতা শতঃই এই বিচ্ছেদটি সম্ভব হয়।

খেতাবরদের মধ্যে একটি গল্প চলিত আছে যে সাধু শিবভূতি গৃহস্থ অবস্থায় এক রাজার অধীনে কাজ করিতেন। শিবভূতি যখন সন্ন্যাসী হন তখন সেই রাজা তাঁহাকে একটি হাফী কথল উপহার দেন। শিবভূতির গুরু বলিলেন, এইরূপ জমূল্য বিলাসগ্রন্থ সন্ন্যাসীর পক্ষে রাখা উচিত নয়। তবু শিবভূতি তাহা ত্যাগ না করাতে গুরু একদিন তাহা গোপনে কাটিয়া ফুটিয়া রাখিলেন। শিবভূতি যখন তাহা দেখিলেন তখন রেগিত হইয়া মহাবীরের মত একেবারে সর্বপ্রকার বস্ত্রই ত্যাগ করিলেন। ইহা হইতেই হইল দিশবর দলের উদ্ভব। কাজেই দেখা যায় নরনার উদাহরণ জৈনধর্মের আদি ভাগেও আছে।

সন্ন্যাসীকে দিশবর হইতে হইলে নারীদের সন্ন্যাস চলে না। তাই শিবভূতির ভগ্নী যখন সন্ন্যাস লইতে চাহিলেন তখন কহিলেন, “আমি কেমন করিয়া বস্ত্রত্যাগ করি?” শিবভূতি তাঁহাকে বুঝাইলেন, “এই জন্মের মুকুতিবশে পরজন্মে পুরুষ হইয়া জন্মাইও, তার পর সন্ন্যাসী হইও।” তাই দিশবরদের মধ্যে নারীর সন্ন্যাস নাই, নিবারণও নাই। উদাখিষ তীর্থঙ্কর “মল্লিক”কে খেতাবররা নারী বলিয়া মানিলেও দিশবররা বলেন, তিনি ছিলেন পুরুষ, কারণ নারী হইয়া লেহ তীর্থঙ্কর হইবেন ইহা একান্ত অসম্ভব কথা।

এ-পর্যন্ত জৈনধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ কথাই আলোচনা করা গেল যাত্র। এখন দেখা যাক ভারতের বৈদিক ধর্ম হইতে জৈনধর্মের বিশেষত্ব কোথায়? বৈদিক মতে মুখ্য ধর্মই হইল যজ্ঞ, তাহাতে পণ্ডবধ আবশ্যক। জৈনধর্মে প্রধান কথাই অহিংসা। বৈদিক ধর্মে যজ্ঞ গো আশ্রয়নীয়, জৈনধর্মে প্রধান ব্রতই গো-রক্ষা। এখনও ভারতে জৈনদের প্রধান কাজ গো-রক্ষার্থ পিঞ্জরাগোল প্রভৃতি করা।

বৈদিকদের আগমনের পূর্বে ভারতে সম্ভবতঃ এমন কোনো অতি প্রাচীন সভ্যতা ছিল যাহাতে গো ছিল অতি পবিত্র। তাহার প্রমাণও এখন কিছু কিছু মিলিতেছে, যদিও এখন এখানে সে-সব কথা আলোচনার অবসর নাই। জৈনরা হয়ত দেখান হইতেই তাঁহাদের এই বস্তুটি পাইয়াছেন। পরে বৈদিক মতেও ক্রমে গো হইয়া পাঁড়াইল জন্মিয়া। এক সময় বিবাহকালে যে গবালন্তন হইত তাহা বুঝা যায় এখনও বিবাহকালে উচ্চারিত বিখ্যাত “গৌ গৌ” মন্ত্রে। ভূতা যখন উচ্চারণ করে “গৌ: গৌ:” অর্থাৎ “এই যে গো ইহাকে এখন কি করা যায়?” তখন বর বলেন, “ও মুকগাম্” ইত্যাদি, অর্থাৎ “গো-টি ছাড়িয়া দাও।” তারপর এই মন্ত্র দিয়া শেষ করেন—“আ গাম্ অনাগাম্ অদিতিন্ বধিষ্ঠ।” অর্থাৎ “এই বেচারার নিরপরাধ গো-কে বধ করিয়া কাজ নাই” (সামবেদ মন্ত্র-ব্রহ্ম ২, ৮, ১৩-১৫; গোভিল গৃহ্যসূত্র ৪, ১০, ১৯-২০; ইত্যাদি ইত্যাদি)

ক্রমে ভারতে গোমেষ শূণ্যই হইয়া গেল। আজ ভারতে গবালন্তনের কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারেন না। যে বেদপূর্ব অতি প্রাচীন ধর্মধারা ধরিয়া ভারতে এত বড়

অষ্টনও ষষ্টিতে পারিল হয়ত সেই ধর্মধারার সঙ্গে জৈন বৌদ্ধাদি অহিংসাবাদীদের মূলতঃ বিলম্বন যোগ ছিল।

বেদের কাম্য ছিল স্বর্গ; মুক্তিবাদ বেদের বাহিরের কথা। অবশ্য পরে এই মুক্তিবাদ বেদেও প্রবেশ করিয়াছে। এই মুক্তিবাদ হয়ত বেদের পূর্ব হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে, সাংখ্যাদি মতেও সেই স্থান হইতেই হয়ত মুক্তিবাদটা আসিয়াছে। জয়ান্তরবাদ লক্ষ্যে এই একই কথা। এক সময়ে দক্ষিণ-ভারতে জৈন-মত অতিশয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। জৈন-মত যে শুধু সেখানে গিয়াছেই তাহা নহে; হয়ত সেখান হইতে বহু প্রাচীন বেদ-পূর্ব ভারতীয় ভাব ও জৈন মতের আদিতে আসিয়াছে।

বেদের প্রাচীন আদর্শ ছিল গার্হস্থ্য ধর্ম। সন্ন্যাসাচার বেদের পূর্ব হইতেই ভারতে ছিল এবং পরবর্তী বৈদিক কালে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। চতুর্দশম যাবৎকার মধ্যে কি এই উভয়ের মধ্যে একটা আপোষ-রকার চেষ্টা দেখা যায় না? জৈন বৌদ্ধাদি ধর্মের সন্ন্যাস-প্রাধান্তের মূলও হয়ত ঐখানেই।

বেদে সাহিত্য সঙ্গীত নাট্য অভিনয়াদি কলার প্রসারের পীঠস্থান ছিল যজ্ঞভূমি। অবৈদিক কালচারের সেই ভূমি ছিল তীর্থে। বৈদিককাল প্রখ্যাত অষ্টাদশ তৈরিক ছাড়া আরও বহু তৈরিকের কথা আমরা পাই। জৈনদের আচার্য্যরাও তীর্থর।

রথযাত্রা জ্ঞানযাত্রা প্রভৃতি উৎসবও আর্ধ্যপূর্ব এমন কোনো ধারা হইতে আসিল কি-না তাহা সন্ধান করিয়া দেখিবার বিষয়। নামো গেজেটিয়রে আছে কুন্তলপুরে রথ-উৎসবের প্রধান কথা হইল জলযাত্রা। তাহাতে মহাবীরকে স্নান করান হয়। সেই স্নানবিশেষ জল ভক্তরা ক্রয় করিয়া অন্ধার সহিত হাতে মুখে মাখেন।

জৈন বৌদ্ধাদি ধর্মে ধর্মপ্রবর্তকরা সবাই ক্রিয়। সকলেই দেখাইতে চার তাহার ধর্ম খুব উচ্চবর্ণীর মহাপুরুষের কাছে প্রাপ্ত। তাই ভারতে মধ্যযুগে জোলা ধুনকার প্রভৃতি জাতীয় ধর্মপ্রবর্তকদেরও ব্রাহ্মণ বানাইবার চেষ্টা হইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে গিয়াও জৈনরা কখনও একথা বলেন নাই যে আমাদের আদি গুরুরা ব্রাহ্মণ। দেখা যায় ভারতে বেদের বাহিরের সভ্যগুলি উদারভাবে সর্ব-প্রকমে গ্রাহ্য করিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।

মগধ ও বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তেই জৈনধর্মের আদি ও পবিত্র স্থান। খুব সম্ভব এক সময় বাংলা দেশে বৌদ্ধ মত অপেক্ষা জৈনধর্মেরই বেশী পসার ছিল। ক্রমে জৈনধর্ম সরিয়া গেলে বৌদ্ধধর্ম সেই স্থান অধিকার করে। এখনও বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে সরাক জাতি শ্রাবকদের পূর্বসূরীত্ব বহন করিতেছে। এখনও বহু জৈন-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বহু জৈনমূর্তি, শিলালেখ প্রভৃতি জৈন-চিহ্ন বাংলার নানা স্থানে দৃষ্ট হয়।

বাংলার অনেক স্থানে দিগম্বর বিশাল সব জৈনমূর্তি ভৈরব নামে পূজিত হয়। বিশেষতঃ বাঁহুড়া মানকুম প্রভৃতি স্থানে বহু গ্রামে এখনও অনেক জৈনমন্দিরের অবশেষ দেখা যায়। পককোটের রাজাদের অধীনে অনেক গ্রামে বড় বড় জৈনমূর্তির পূজা এখন হিন্দু পুরোহিতরা করেন দেবতার নাম ভৈরব। সাধারণে সেখানে পশু বলি দেয় সেই সব মূর্তির গায়ে এখনও জৈন-লেখ পাওয়া যায়। স্বর্গী রাখালদাস ব্যানার্জিও এইরূপ মূর্তি ওখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। বাংলার ধর্মে ব্রত ও আচারে এখনও জৈন ধর্মের প্রভাব খুঁজিলে বাহির হইয়া পড়ে। জৈন বহু শব্দ এখনও বাংলাতে প্রচলিত। পার্থনাথ হেমচন্দ্র প্রভৃতি বহু জৈন নামে এখনও বাংলার নামকরণ হয়।

জৈন সাধুদের উত্তরীয়কে বলে ‘পাছেড়ী’ তাহাই আমাদের ‘পাছুড়ি’। জৈন সাধুদের কীট-অপসারণের জন্ত যে ষাঁটা তাহাকে বলে ‘পিছী’, পূর্ব-বাংলাতে ষাঁটাকে বলে ‘পিছা’। দিগম্বর সাধুরা ময়ূরপুচ্ছ দিয়া এই ‘পিছী’ করেন। এইরূপ খোঁজ করিলে আরও বহু শব্দ বাহির হয়। বেদবিরুদ্ধ ধর্মদেশক প্রাকৃত ভাষাকে এক সময় বাংলা দেশে জৈন ভাষা বলিয়াই জানিত। বুদ্ধও জিন কি-না। পালি বলিয়া আলাদা কোনো ভাষার উল্লেখ তাহারা করেন নাই।

প্রাচীন বাংলা-লিপির অনেক অক্ষর—বিশেষতঃ কৃতাকর-গুলি মেঘনাগরী অক্ষরের সঙ্গে মিলে না অথচ প্রাচীন জৈন-লিপির সঙ্গে মিলে। এইরূপ লিপি শুজরাত রাজপুতানা পঞ্জাব প্রভৃতি দেশের পুঁথিতেও দেখা যায়। জৈন সাধুরা এখনও ঐ লিপিতেই লেখেন।

বাংলা দেশে জৈন ধর্ম কেন তবো টিকিল না তাহা অসম্ভবান করা উচিত। এখানকার আচার বিহার আজরাগি

সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য হইল না ; না তাহার আরও কোনো হেতু আছে, তাহা দেখা দরকার। বৌদ্ধধর্ম হয়ত সেই সব বিষয়ে অনেকটা মিটমিট করিয়া বাংলা দেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল।

অধ্যাপক সিলভা লেভি প্রমুখ কেহ কেহ অভিযোগ করেন যে বৌদ্ধধর্ম যেমন অকৃষ্টিত ভাবে ভারতের ভিতরে বাহিরে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, জৈনধর্ম সেইরূপ করিতে পারে নাই। উভয় ধর্মের উৎপত্তিস্থান এক হইলেও ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইল যে বৌদ্ধধর্ম বেশী প্রতিষ্ঠিত হইল পূর্ব-ভারতে ও জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল পশ্চিম-ভারতে। পূর্ব দিকে বৌদ্ধধর্ম ভারত ছাড়িয়া ব্রহ্ম স্রাম চীন প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হওয়ায় এসব দিক হইতে ভারতবর্ষের কোনো রাজনৈতিক-বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা গেল দূর হইয়া। জৈনধর্ম যদি তেমন করিয়া ভারতের বাহিরে পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িত তবে হয়ত ভারতের ঐক্যবর্তী বহু দুঃখ ও দুর্গতি ঘটিতেই পারিত না। কথাটা গবিয়া দেখিবার মত। আবার অনেকে এই অভিযোগও করেন যে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের মত পরকে আপনার করিয়া হইতে পারে নাই, সকলকেই দূরেই ঠেকাইয়া রাখিয়াছে।

জৈনদের গ্রন্থভাণ্ডারগুলি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দৃষ্টি অমূল্য সব উপকরণে ভরা। যদি এগুলি সবার কাছে প্রস্তুত হইতে পারিত তবে ভারতের ইতিহাসগত অনেক প্রশ্ন দূর হইয়া যাইত আর জৈনধর্মের মাহাত্ম্যও প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু যখন দেখি যুনি জিন বিজয়জী, গুণ্ডিত সুখলালজী, পণ্ডিত বেচরলাসজী প্রভৃতির মত লোকের কাছেও তাহা উন্মুক্ত হইতে চাহে না তখন আর চরসা কোথায় ?

যাহারা অভিযোগ করেন তাহারা ইহাও বলেন জৈনধর্মে ক্রমে বণিকরাই হইলেন প্রধান, তাই সংগ্রহ ও রক্ষার কাজে ত সহজে হইয়াছে প্রসার ও প্রচারটা তত সহজে হয় নাই।

অহিংসার আদর্শ বে-জৈনধর্মে সর্বাপেক্ষা বড় কথা ছিল সেই যৈত্রী-প্রধান জৈনধর্মের বণিকদের বাণিজ্যনীতি আজ পাশ্চাত্য সব নিষ্ঠুর বাণিজ্য-ব্যবস্থার সঙ্গে মিশিয়া কলুষিত হইয়াছে। আজ গোপভাবে নানাবিধ ব্যাপক মানব-হিংসার জন্য এই ব্যবসায়পদ্ধতি দারী। সভ্যতার দাউলতের

এই দিনে দেখা যাইতেছে ‘হাতে মারা’ হইতেও বহুব্যাপক ও অতি নিষ্ঠুর ভাবে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে বধ করা যায় ‘ভাতে মারিয়া’। যাহাতে এইরূপ বহুব্যাপক হৃগতীর নরহিংসার অপ্রত্যক্ষ রক্তে এই প্রাচীন পবিত্র ধর্ম কলুষিত না হইতে পারে তাহা প্রত্যেক মৈত্রীর সাধক জৈনধর্ম-হিতৈষীর দেখা উচিত।

যে-জৈনধর্ম ছিল সম্যাস ও তপস্চর্যার আদর্শে অনুপ্রাণিত আজ তাহাই কত বার্থ ঐশ্বর্যবিলাসে ও আড়ম্বরে হইয়াছে পর্যাবসিত। জৈন দেবালয় প্রতিমা উৎসব প্রভৃতি সবই নিষ্ঠুর বৈভববিলাসে ভারাক্রান্ত। একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে আর্থিক যে ভিত্তির উপর এই সব ধর্ম-উৎসবগুলি প্রতিষ্ঠিত তাহা নানা প্রকারের লোকসম্মত বহুব্যাপক হিংসার অপ্রত্যক্ষ রক্তে কলুষিত, কাজেই এই সব ধর্মোৎসবকে পবিত্র করার জন্যও সর্ববিধ বিলাস ও আড়ম্বর তাগ করা প্রয়োজন।

ধর্মের পক্ষে দারিদ্র্য মোটেই অশোভন নহে। এবং আদর্শের বিস্তারিত জন্ত আদি ধর্মওকরা সেই দারিদ্র্যকে গৌরবের সঙ্গেই বহন করিয়া গিয়াছেন। বরং যে ঐশ্বর্যের মূলে কোথাও কিছুমাত্র বিস্তারিত অভাব আছে, সেই ঐশ্বর্যই ধর্মের পক্ষে একান্ত অশোভন ও সাধনার সর্বাপেক্ষা কঠিন বাধা। জৈনদের এক একটা শোভাযাত্রায় যে ব্যয় হয় তাহা ভাবিলেও অম্বাক হইয়া যাইতে হয়। এমন অবস্থার ইহাদের মহাতপসীদের কঠোর তপস্রা দেখিয়াও যদি কেহ মনে করেন তাহার মূলেও এক প্রকার অপ্রত্যক্ষ রাজ-সিকতা আছে, তবে তাহাকে নিত্যম গোব মেওয়া যায় না। তপস্রার মূলেও যদি দেখাইবার ইচ্ছা বা রাজসিকতা থাকে, তবে তাহা বাহ্য বৈভব হইতেও ধর্মের পক্ষে সামাজিক, কারণ তাহাকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়াই সবাই জানে।

সকলের উপর শোচনীয় ইহাদের একান্ত তীব্র আক্রমণ কলহ। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহাদের মধ্যে দলাদলির আর অন্ত নাই। ইহাদের ‘নিষ্ঠুর’ ‘গর্হ’ প্রভৃতি ভেদের কথা ত পূর্বেই বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও দেখা যায় ইহাদের ডেরাবাসী বৃত্তিপূজক শাখাতে চৌরশিটি নন্দাবার, হানকবাসী শাখাতে বহুশিটি ভেদ। ভেদ ও ভাগের আর অন্ত নাই।

এক একটি তীর্থ লইয়া মোকদ্দমায় ইহাদের যে অসম্ভব ব্যয় হইয়াছে তাহা ভারত ছাড়া আর কোনো দেশে কেহ বিশ্বাসই করিতে পারিবে না। এক পরেশনাথ পর্বতের অর্থাৎ সমেত তীর্থের মোকদ্দমা লইয়া খেতাবদর ও দিগম্বর এই উভয় দলে যে বিপুল ব্যয় হইয়াছে তাহাতে আর একটি পরেশনাথ পর্বত নির্মাণ করিয়া আর একটি তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করা যাইত। শুধু টাকার স্তূপ দিয়াই পর্বতই করা যাইত।

এই সব তীর্থ লইয়া যে লাঠালাঠি মারামারি হত্যা প্রভৃতিই কত ঘটে তাহা কি লিখিয়া শেষ করা যায়? ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে যে মাসে উদয়পুরে কেসরিয়া তীর্থে একটি জীর্ণ ধ্বংস সঙ্কার লইয়া খেতাবদর ও দিগম্বর এই দুই দলে যে লড়াই হয় তাহাতে খেতাবদর দিগম্বরদের পাঁচ জনকে তখনই খুন করে, পনের জনের আর জীবনের আশাই দেখা যায় নাই, আর ১৫০ জন আহত হয়। এই খবরটি বাহির হয় খেতাবদরদেরই মুখ্য পত্র “জৈন ব্লগে” (১২২৭ বৈশাখ)। পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ কাগজেই বোম্বাইয়ের একজন খেতাবদর জৈন সলিসিটর এক প্রতিবাদ বাহির করেন। তিনি লেখেন—এই লোকায় খেতাবদরদের কোনোই দোষ নাই, যদিও তিনি এ-কথা স্বীকার করেন যে, চারি জন দিগম্বরী মারা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মতে সে দোষ তাঁহাদের নিজেরই। তিনি এই কথাও লেখেন যে, বাহা ইউক, জৈনতীর্থে বাহুব মারা গেলেও এক কিছু রক্তপাত ঘটে নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে বাহারা মারা গিয়াছেন তাঁহারা লোক ভাল, কারণ তাঁহারা ধাক্কা ও মর্দনেই মরিতে রাজি হইয়াছেন। অস্বাভাব্যপ্রাপ্তির দুঃস্বাদা জ্ঞা করিয়া তাঁহারা প্রতিপক্ষকে বুঝা হইরাণ করেন নাই। বাহা ইউক, প্রাণ মেলেও এমন পবিত্র জৈন-তীর্থে রক্তপাত যে ঘটে নাই ইহাই পরম সাধনা। সলিসিটর মহাশয় জৈনতীর্থের পবিত্রতার সাক্ষ্যরূপে এই পরম সাধনার কথা বহুবার উৎসাহ-ভরে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই জাতীয় রক্তের অভিযোগ জৈনদের ধর্মের বিরুদ্ধে দেশ বিদেশে শোনা যায়। মুখে বা লেখায় নিম্নোক্ত রচনায় তাহার কোনো উত্তর দিয়া কিছু লাভ আছে কি? জৈনধর্মের উন্নত সাধনা পবিত্রতা ও প্রেমে মৈত্রীতে

পরিপূর্ণ জীবনের দ্বারা যদি এই সব অভিযোগকে নিঃশেষে নিরস্তুর না করা যায়, তবে তর্কের বিরুদ্ধে তুমুলতর তর্ক দিয়া বুঝা মুক্ত করিয়া লাভ কি? তাহাতে নৈপুণ্য প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্মের মহত্ত্ব তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এতক্ষণ শুধু নানা অভিযোগ ও বিরুদ্ধতার কথাই বলা গেল। এখন বলিতে চাই ইহাতেও হতাশ হইবার কোন হেতু নাই, যদি দেখা যায় যে এই ধর্মের মধ্যে এখনও প্রাণশক্তি আছে। যে ধর্মে হেমচন্দ্র যশোবিনয়জীর মত বহু বহু মহাপণ্ডিত জন্মিয়াছেন আর বাহারা জগতে অভুলনীয় সব গ্রন্থভাণ্ডার রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের হতাশ হইবার কোনো কারণ নাই। এই-সব লক্ষণ ছাড়াও জৈনধর্মের মধ্যে নানাভাবে যে অতিগভীর প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে আজ সে-সম্পর্কে চাই একটি কথা বলিলে যথার্থই অন্তরে আশার সঞ্চার হয়।

জৈনরা যদিও সত্যগতভাবে ভারতের বাহিরে প্রচার করেন নাই, তবু ব্যক্তিগত ভাবে মাঝে মাঝে এক এক জন জৈন সাধু ভারতের বাহিরে গিয়া অহিংসা মৈত্রী প্রভৃতির মহা আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিয়াছেন। খোঁজ করিয়া দেখিলে এইরূপ ধর মাঝে মাঝে পাওয়া যাইবে।

প্রাচীন কালেও ভারতে যোগী নাথপন্থী প্রভৃতি মতের সাধুরা পারস্ত আরব সিরিয়া মিশর তুরস্ক প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিতে বাহিতেন। আমার বালাকালেও কানীতে আমি মাঝে মাঝে এমন যোগী দেখিয়াছি বাহারা নীলনদী ও কাম্পিমান সাগরে স্নান করিয়া আসিয়াছেন।

১২৮ খ্রীষ্টাব্দের কল্যাণকালি এইরূপ বিশ জন যোগী সা একত্র হইয়া এক দল বাঁধিয়া ভারতের বাহিরে পরিভ্রমণে বাহি হন, তাঁহাদের সঙ্গে চিকিৎসকরূপে এক জন জৈন সন্ন্যাসী গিয়াছিলেন। তাঁহারা মাঝে একবার দেশে কিরিয়া আবার ঐ সব দেশে পর্যটন করিতে যান। দুইবার এইরূপ নান দেশ পর্যটন করিয়া ছাব্বিশ বৎসর পরে ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে শেখবার তাঁহারা দেশে করেন। এই দলের সঙ্গে সিরিয়া দেশের প্রখ্যাত কবি আব্দুল জাহানী সাধক আব্দুল আলার পরিচ ঘটে।

সিরিয়া দেশে “রা আব্দুল্লাহ আল হুমান” নামক এক প্রামে ১১৩ বা ১১৪ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস “তসুং” নামক আর

বংশে আবুল আলার জন্ম। তাঁহার পিতামহ হুসেইন আল মসআরী দীর্ঘকাল কাজী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চারি বৎসর বয়সে আবুলের যে দারুণ বসন্ত রোগ হয় তাহাতে তিনি দৃষ্টিহীন হইয়া যান। তথাপি তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল এমন অদম্য যে তিনি যোরকো হইতে বোগদাদ পর্যন্ত নানা স্থানে জ্ঞানার্থী হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার মত ছিল অতিশয় উদার ও একেবারে অশাস্ত্রানুগতিক। তিনি এতদূর স্বাধীন-চেতা ছিলেন যে, কি ধনী, কি প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুরু কাহারও কোনো অত্যাশ্রয়কে তিনি রেহাই দিয়া কথা বলেন নাই। তাঁহার রচিত “সকুত-অল-জন্দ” সেই দেশে অতিশয় সম্মানিত কাব্যগ্রন্থ ছিল। উদার মত ও স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁহার সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে বহু তীব্র আন্দোলন চলিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই। পরিশেষে বোগদাদে গিয়া ভারতীয় এই সব জ্ঞানীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে, তার পরই তাঁহার মতামত একেবারে আশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। আবুল আলার কাব্যের শক্তিশালী প্রভাব ওমর খয়্যামের মত মহাকবিও এড়াইতে পারেন নাই।

এই দলের সঙ্গে পরিচয়ে ও আরও নানা সূত্রে আবুল আলার ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতি রীতিমত অহুস্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বোগদাদে তিনি ভারতীয় সাধকদের মতই ধর্মের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ঈশ্বর তাঁহার চারিদিকের বা তাঁহার সমধর্মাবলম্বী সকলের স্বীকৃত ঈশ্বরের মত নহেন; তিনি অনেকটা ভারতীয় যোগীদের ঈশ্বরের মতই সর্বব্যাপী নির্লিপ্ত। ধর্মজগতের কুসংস্কার ছিল আবুল আলার অসহ্য। এই-সব কুসংস্কারের বলে যে একদল লোক অস্ত্র সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইয়া ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

স্বর্ণামিতে তাঁহার বিশ্বাস ও আস্থা আর রহিল না বরং জৈন-বৌদ্ধাদির মত তিনি মনে করিতে লাগিলেন মৃত্যুতেই আমাদের দুঃখের সস্তার অবধান ও সত্তাই আমাদের সকল দুঃখের আধার। তাই একমাত্র নির্বাপ মুক্তিই প্রার্থনীয়। তিনি বোগদাদ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া ভারতীয় তপস্বীদের মত গুহাতে বাস করিয়া অতি কষ্টে তপস্করণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহার কাব্য আর এক ভাবে ভরপুর হইয়া উঠিল। মল্ল বংশের রাজা সিব, এমন কি দুঃখ

প্রভৃতিও তিনি ভাগ করিলেন। তাঁহার বাক্যের তীব্রতা ক্রমে তপস্কার কষ্টে তায় পরিণত হইল। জীবন শান্তি ও মৈত্রীতে ভরিয়া উঠিল।

কুজ বৃহৎ সর্বজীবের প্রতি তিনি ছিলেন অপারীক্ষিত করুণাপরায়ণ। তাঁহার কবিতাতে দেখা যায়, “কেন বৃথা পশুহিংসায় জীবন কর কলঙ্কিত? বেচারী বনচারী শিকারের কেন নিষ্ঠুর হইয়া কর শিকার? চিরদিন তুমিও কিছু ব্যাধ রহিবে না, সেও কিছু ব্যাধ থাকিবে না। এক দিন তোমাকে এই পাপের কালন করিতেই হইবে।”

শাস্ত্রানুগতিক ভাবে লোকে তাঁহার বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তপস্কার্যের খ্যাতিতে নানা স্থান হইতে তাঁহার কাছে বহু উপহার আসিত। তিনি তাহা দীনদুঃখীকে বিলাইয়া দিয়া নিজে মূনিজনোচিত সরল জীবন যাপন করিতেন।

আবুল আলার এই অহিংসবাদের মূলে যে ভারতীয় ধর্মের প্রভূত প্রভাব আছে ইহা ত সকল দেশের বিদ্বজ্জনেরাই জানেন। কিন্তু তাঁহার মতামতে জৈনধর্মের কোনো প্রভাব দেখা যায় না? তাঁহার কবিতার রস বাহ্যার ইংরেজী ভাষার আবাদ করিতে চান, তাঁহার্য্য ত্রিভুজ অমীর রিহানী কর্তৃক অহুস্রাস্থিত আবুল আলার “লুজু মিহাত” নামে কাব্যসংগ্রহ পড়িয়া দেখিতে পারেন। (James T. White, & Co., New York)।

আবুল আলার এই-সব মতবাদ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়া যায় নাই। পরবর্তী সূফী-মতবাদের মধ্যে তাহা স্থান পাইয়াছে। তাই বিখ্যাত মরুমী কবি আলাল আল দীন রুমীর (জন্ম ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে) কবিতার মধ্যেও জয়ান্তরবাদের চমৎকার উল্লেখ মেলে।

রুমী বলিতেছেন, “ছিলাম পাষণ, মরিয়া হইলাম বৃক্ষলতা; ছিলাম উদ্ভিদ, মরিয়া হইলাম জন্তু; ছিলাম জন্তু, মরিয়া হইলাম মানব। এখন আমি বাঁচিয়া উঠিব অমরলোক-বাসী হইয়া; ক্রমে সে অবস্থাও অতিক্রম করিয়া আমি অপূর্ণ অল্পম গতি করিব লাভ: আমি হইব শূন্য, শূন্য হইব লয়প্রাপ্ত”—ইত্যাদি। এই-সব কথার মধ্যে কি নির্কাণের ভাব পাই না?

তাঁহার আবার এমন সব বাণীও আছে বাহাতে ভারতের

পূর্ণ প্রেমপন্থী মরহীমের পরিচয় পাওয়া যায়। কথা—“সুধের রস্মির মধ্যে দীপ্ত রেণুরূপে আমিই ভাসমান, সুধের দীপ্ত গোলকরূপে আমিই দীপ্যমান, আমিই উদার প্রথম জ্যোতি-লেখা, আমিই সন্ধ্যার শান্তপ্রাণ সমীরণ”—ইত্যাদি।

জৈনধর্মের অন্তরে যে গভীর প্রাণ আছে তাহার আর একটি মহালক্ষণের কথা এখন বলিব। অনেক সময় মনে হয় একটা বৃক্ষ পুরাতন হইয়া মরিয়া গিয়াছে। বুঝাই যায় না যে, তাহার মধ্যে কোথাও প্রাণ আছে। তাহার পর হঠাৎ একদিন যখন নব কল্যাণগমে কি আকাশের বারিবর্ষণে দেখা যায় তাহাতে পল্লবমুকুল ধরিয়াছে, তখন আর আশা না হইয়া যায় না।

ভারতে এইরূপ একটি নবদুগ্ধ আদিল গুরু রামানন্দের সঙ্গে সঙ্গে। তাহার পরই কবীর, রবিদাস, নানক প্রভৃতি নানা মহাপুরুষের সংখ্যার উত্তর-ভারতবর্ষের ধর্মের ঐশ্বর্য্য উঠিল ভরপুর হইয়া।

জৈনদের মধ্যেও এই সময়ে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়, তাহার নাম লোকা শাহ। মূর্তিপূজক জৈনধর্মের মধ্যে জন্মিয়াও ইনি কবীর নানক প্রভৃতির মত মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ঘোর হুজুর করিয়াছেন। জৈন বৈষ্ণবুলে তাহার জন্ম। আমেদাবাদেই তিনি বাস করিতেন, কিন্তু কেহ কেহ বলেন তাহার পূর্বনিবাস ছিল কাঠিয়াওয়ারে।

জম্মি পণ্ডিত হুত্বীণের একটি হস্তলিখিত লেখায় দেখিয়াছি যে, তাহার মতে লোকার সময় ১৪৫২ খৃষ্টাব্দ। লোকার সম্বন্ধে আর কোনো খবর হুত্বীণের সেই লেখায় পাইলাম না। তাহার নিরূপিত সময়ের উপরও নির্ভর করিতে পারিলাম না। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দ কি হুত্বীণের মতে লোকার জন্মসময়? তাহা কেন যে সম্ভব নহে তাহা পরে দেখান যাইতেছে।

কবীর প্রভৃতির মত লোকা শাহ পুরাতন শাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে বাবে ছাড়িয়া দিয়া কেবল স্বাধীন আত্মস্বভাবের উপর ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তিনি প্রচলিত মূর্তিপূজা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বার্ষ আচার-অহুতান, কল্যাণের প্রভৃতি দূর করিতে প্রধানতঃ প্রাচীন বিদ্যুৎ শাস্ত্রের আলোচনা করিলেন। তাহার সঙ্গে এই বিষয়ে অনেকটা মার্টিন লুথারকে তুলনা দেওয়া চলে। লোকা শাহ এই অস্বভাবীদের বলে স্বানকবাসী। লোকার মৃত্যুর প্রায় তিন শতাব্দী পরে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কাঠিয়াওয়ারের

স্বানকবাসীদের মধ্যে পাঁচটি “সংঘাড়া” বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। স্বানাকুলসারে এই পাঁচ সম্প্রদায়ের নাম (১) গোণ্ডাল, (২) লিমড়ী, (৩) বড়দালা, (৪) চুড়া ও (৫) গ্রাংগড়া। এই গোণ্ডাল শাখার সাধুদের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে লোকার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মুসলমানদের রাজত্ব যখন গুজরাটে স্থপ্রতিষ্ঠিত তখন একদিন লোকা শাহ দেখিলেন একটি মুসলমান “চিড়া” নামক যন্ত্রদ্বারা পক্ষীশিকার করিতেছে। এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া লোকা মনের ভূত্রে মুসলমান রাজার রাজ্যে চাকরি ছাড়িয়া দিলেন এবং সাধারণ শ্রাবক রূপে পুথিলেখার দ্বারা জীবিকানির্ভর করিতে লাগিলেন ও আমেদাবাদেই রহিলেন।

একদিন এক “লিঙ্গধারী” খেতাবের জৈন ভক্তলোক একখানি “দশ বৈকালিক সূত্র” গ্রন্থ লোকাকে নকল করিতে দেন। লোকা গ্রন্থখানি পড়িয়া মুগ্ধ হন ও নকল করিতে গৃহে লইয়া আসেন। তাহার একটি বিধবা কন্যা ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া তিনি গ্রন্থখানির দুইটি প্রতিলিপি করিয়া একখানি নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন ও আর একখানি সেই ভক্তলোককে দিলেন। এরূপ ভাবে আরও কিছু গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করিয়া খুব ভাল করিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতে ও লোকমধ্যে বিতরণ জৈন-মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহার মধুর ও সহজ প্রচার উচ্ছ্বাসিত উপদেশে লোকের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল।

তিনি সাধু নহেন, তাই সাধুরা তাহার এই আচরণ পছন্দ করিলেন না। এমন সময় একদল জৈন তীর্থযাত্রী তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে আমেদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। এই দলের মধ্যে বোধ হয় প্রধান ব্যক্তি ছিলেন শত্ৰুজী নামে এক ভক্তলোক। তাহার পৌত্রী মোহ বাই অতি অল্পবয়সে বিধবা হওয়ার সেই বালিকা ও তাহার মাতাকে লইয়া তিনি তীর্থযাত্রার বাহির হন। সেই দলে নাগজী, যোতিচন্দ, গুলাচন্দ প্রভৃতি ভক্তলোকও ছিলেন। আমেদাবাদে লোকা শাহ নাম শুনিয়া তাহার তাহার উপদেশ শুনিতে বান।

সেই ব্যক্তিদের নেতা সাধুরা এই-সব কথা শুনিয়া মেলেন চট্টা, কারণ লোকা একজন সামান্য বৈষ্ণব গৃহস্থ স্বামী, তিনি সন্ন্যাসীও নহেন। কিন্তু লোকার উপদেশ সকলের এত ভাল লাগিল যে, তাহার সেই সাধুদের

নিবেশ মানিলেন না। তাই সেই সব সাধু বতিরা এই যাত্রীদের ভাগ করিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। তখন সেই দলের পরভ্রমিণ জন লোক লোকের কাছে নৃতন করিয়া নীক্ষা লইলেন। এই ঘটনা ঘটিল ১৫৩১ সংবতের জ্যৈষ্ঠ শুক্লাপক্ষমীতে, অর্থাৎ ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। কেহ বলেন এই ঘটনা ঘটে ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।

এই ঘটনার কিছু পূর্ব হইতেই লোকের প্রচার চলিয়াছিল এবং তাঁহার প্রচারের পূর্বে তিনি পৃথী তাঁহার বিধবা কন্যাকে দিয়া প্রভিগিণি করাইডেন। তাঁহার বিধবা কন্যার বয়স যদি তখন হুড়ি বৎসরও ধরা যায় তবে সেই পৃথী নকলের সময়ে লোকের বয়স আনুমানিক পরভ্রমিণ বৎসর হওয়া সম্ভব। তার পরও কয়েক বৎসর প্রচারকাণ্ডে ব্যতীত হইলে এই দল তাঁহার কাছে নীক্ষা নেয়। যাহা হউক, খুব সাবধানে খুব কম করিয়া ধরিলেও লোকের তখন বয়স পরভ্রমিণ হইতে কম হইতেই পারে না। তাহা হইলেই দেখা যায়, ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই লোকের জন্ম। মোটকথা, ইহা বলা চলে যে, ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি লোকের জন্মকাল। কাজেই দেখা যায় কিছুকালের জন্য অন্ততঃ লোকা কবীরের সমসাময়িক।

প্রাচীনপন্থী সাধু ও গৃহস্থরা লোকের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে লাগিয়া গেলেন, তবু নানাবিধ বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়াও লোকের প্রভাব বাড়িয়াই চলিল। লোকা গৃহস্থই রহিলেন, সন্ন্যাসী হইতে স্বীকার করিলেন না; অথচ তাঁহার শিষ্যরা অনেকেই মূনি হইলেন। তাহার মধ্যে মূনি সর্বাঙ্গী, মূনি ভাণ্ডারী, মূনি মুন্ডারী, মূনি জগমলারী সমধিক প্রখ্যাত। লোকের ধর্মকে তখন সকলে দম্বাধর্ম বলিত এবং গৃহস্থ হইলেও লোককে সকলে দম্বাধর্ম মূনি বলিত। লোকের দল দম্বাগজ নামে প্রসিদ্ধ হইলেও কেহ কেহ তাঁহাকে তপাগজও বলিত। এই হইল হানকবাসী সাধুদের সম্প্রদায়ের হুচনা।

তখন মুসলমান রাজত্ব। নানাস্থানে মূর্তি ও জৈনপ্রতিমা ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলা হইতেছে; কোথাও কোথাও তাহা দিয়া মন্দির, প্রাসাদ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করা চলিয়াছে। শুধু এই-সব কারণে নয়, বিজয় ধর্ম বলিয়াও লোকা এই প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে লাগিয়া গেলেন। জৈনধর্ম তখন তাহার প্রাচীন বিস্তৃতি হারাইয়া প্রতিমাপূজা, উৎসব, আড়ম্বর ও

নানা ব্যর্থ অহুতানে ও মিথ্যা রাজনৈতিকতার ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। লোকা সেই সব মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মহাবীরের জন্ম-উৎসব উপলক্ষে যে ব্যর্থ আড়ম্বর হইত হানকবাসীরা তাহাও তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন।

আম্বেবাদের পর পাটনে লোকের কাছে রূপচন্দ্র শাহ প্রভৃতি ১৫২ জন নীক্ষা লইলেন। রূপচন্দ্রের নাম হইল রূপ ঋষি। লোকা অর্থাৎ দম্বাধর্ম মূনির পর রূপ ঋষিই বসিলেন গুরুর আসনে। তাঁহার পর বসিলেন হরভের জীরা ঋষি।

যতদিন পর্যন্ত ইহারীরা নানা বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন ততদিন আপন বিপুল আচার রক্ষা করিয়াই চলিয়াছিলেন। তার পর যখন লোকমধ্যে ইহাদের রীতিমত প্রতিষ্ঠা হইল, তখন এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এক এক জায়গায় জমাইয়া বসিয়া বাইতে লাগিলেন, সাম্প্রদায়িক বৈভব জমিয়া উঠিতে লাগিল। তখন ক্রমে ‘হানক দোব’ তাঁহাদের স্মরণ করিতে লাগিল বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে বলিতেন হানকবাসী। সাধুরা পাত্রাদির মধ্যমা লব্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ শাস্ত্রের অননুমোদিত নানা বস্তুর ব্যবহার ও সঞ্চয় চলিতে লাগিল। কেহ কেহ আবার জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের দ্বারা অর্ধোপাধানেও প্রবৃত্ত হইলেন।

জীবনধর্মের পর তাঁহার স্থানে বসিলেন নানাঋষি, তাঁহার পরে সম্প্রদায়গুরু হইলেন জীবরক্ষা ঋষি। এই পক্ষে ভীমালী, রতনালী, উদালী, বীজালী, জীবরক্ষালী, শ্রীকৃষ্ণালী, লালালী প্রভৃতি সকলে ঋষি নামেই প্রখ্যাত হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু হানকবাসীরা চিরদিনের জন্য প্রতিমাধি পরিহার করিয়া রাখিতে পারিলেন না। পরে তাঁহাদের সম্প্রদায়ে আবার প্রতিমা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ডেরাধারীদের প্রতিমা ক্রমে হানকবাসীদেরও পাইয়া বসিল। এই ভাবে হানকবাসীদের পূণ্য প্রভাব পরে ক্রমে ক্রীণ ও হান হইয়া আসিল।

গোড়াল শাখার হানকবাসী সাধু প্রাণলালজীর লিপি অনুসারে আমরা আরও অনেক শাখার উৎপত্তির খবর পাই। যথা, ১৫৬৪ সংবতে কতক সাধু কতক-মত প্রবর্তন করেন। ১৫৭০ সংবতে বীজসাধু বিজয়-মত চালান—

এই মত আদর্শমত। ১৫৭২ সংবতে পাশচন্দ্র নিকন্তি, ভাষা, চূর্ণী, ছেদগ্রন্থ প্রভৃতির প্রামাণ্যতা অস্বীকার করেন। ১৭৬২ সংবতে কড়বা বাণিয়া কড়বা-মত চালান। ১৭৭২ সংবতে যশোবিজয়জী আনন্দঘনজীর সময়। ১৮১৮ সংবতে ভীষ্মজী তের জন সাধু লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া তেরপহ নামে এক মত চালান। ইত্যাদি ইত্যাদি এই-সব ধর্মের সকলের কোতুহল হইবে না মনে করিয়া আর উদ্ধৃত করিলাম না।

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি মহাপণ্ডিত যশোবিজয়জী ও বিখ্যাত মরমী কবি আনন্দঘনজীর কাল। আনন্দ ঘনজীর কিছু পরিচয় আমি পূর্বে আর একটি লেখায় দিয়াছি। চিদানন্দ প্রভৃতির কথা আর উল্লেখ করিলাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কাঠিয়াওয়ারে স্থানক-বাদীয়া পাটট শাখার বিভক্ত হইয়া যান। তার পর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে লিমড়ী শাখা হইতে “সায়লা” শাখার উদ্ভব হয়। এই সায়লা শাখার গ্রন্থালয়ে বাংলা অক্ষরে লেখা বাঙ্গালী সাধুর সংগৃহীত তন্ত্র ও চিকিৎসার পুঁথী দেখিয়াছি। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে গোণ্ডাল শাখা হইতে সংঘালী শাখা এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঝাংগড়া শাখা হইতে বোটাড শাখার উৎপত্তি হয়। এই ত গেল খেতাবের সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার একটু বিবরণ।

দিগ্বজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে তারণ-স্বরের বিশেষ প্রভাব হয়। তারণ মূনি তাহার প্রবর্তক। তিনিও মৃত্তিপূজা, কলাচীর ও মিথ্যা ধর্মের বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধ করেন।

কাজেই যে-ধর্ম যুগে যুগে এই ভাবের নব নব প্রাণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে হতাশ হইবার কোনোই হেতু নাই। শুধু তর্ক করিয়া বিপক্ষকে নিকন্তর করিবার চেষ্টা করিয়া কোনো লাভ নাই, সাধনার জীবনে

বিশুদ্ধ তপস্যার অগ্নি জ্বালাইয়াই প্রাণশক্তির লক্ষ্য দিতে হইবে।

সত্য ও জীবন্ত মহৎ আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সরল পথ গ্রহণ না করিয়া যদি শুধু নিপুণ বাক্য, তর্ক ও প্রমাণ-চাতুর্যের পথেই এই সম্প্রদায় চলিতে চাহেন তবে বিশ্বের শাস্ত্র ধর্মের মহাকালের বিধান ইহাদের কোনোই ভরসা নাই।

এখন এই জিনভাষিত ধর্ম যদি আপনার নানা মিথ্যা আড়ম্বর, অর্থহীন সব আচার, আত্মঘাতী ব্যর্থ সব আত্ম-কলহ পরিহার করিয়া দয়া, মৈত্রী ও উদারতায় আপনাকে বিশুদ্ধ করিতে পারে তবে সে নিজেও ধ্বংস হইবে এবং সমগ্র মানবসভ্যতাকেও ধ্বংস করিবে। অন্তরে-বাহিরে নব আলোকের নব প্রেমের উদার তপস্যার দ্বারা যদি এই জিন-প্রবর্তিত মহাধর্ম আজও আপনার অন্তর্নিহিত মৃত্যুহীন অধ্যাত্মজীবনের পরিচয় দিতে পারে, তবে বাহিরের নানা প্রকারের অভিযোগ আপনিই শাস্ত হইয়া স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

মহাবীর প্রভৃতি মহাসাধকগণের মৃত্যুহীন তপস্যার অনন্ত সাধনার বেদীর কাছে সেই মহতী আশা ও আকাঙ্ক্ষা আজও আমরা উপস্থিত করিতে চাই। আজ সমস্ত জগৎ হিংসার স্বর্ষে কুটিলতার ভরসা উঠিয়াছে। কে আজ ইহার মধ্যে মৈত্রী ও প্রেমের নবপ্রাণ সঞ্চার করিবে? তাই হিংসার কুটিলতার মিথ্যাচারে ব্যথিত মুমূর্ষু মানবসভ্যতা এই সব মহাপুরুষের সাধনার দ্বারে অনেক ভরসা লইয়া আজ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের মহাসাধনার বাহারা উত্তরাধিকারী তাঁহারা ক্ষুদ্র চালাকী ও সম্প্রদায়গত কোনো চাতুরীর দ্বারা আমাদের কখনও ফাঁকি দিবেন না, এই আশা অন্তরের অন্তরে না রাখিয়া পারি না। এই মহা বিশ্বাসে এই সাধনার ভবিষ্যৎ মহাসাধকদের উদ্দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নম্র আমাদের প্রণতি রাখিয়া বাইতেছি।

বিপরীত

শ্রীসীতা দেবী

ভগবান রামহরি মুখোজ্যের অদৃষ্টে সবই উল্টা শিথিয়া-
ছিলেন। এক ত মা-বাণ তাঁহাকে স্বথের পৃথিবীতে আনিয়া
দিয়াই বিদায় হইলেন, রামহরিকে মাহু হইতে হইল
মামা বাড়ির হড়কো ঠাণ্ডা এবং দই সন্দেশ উভয়ের সাহায্যে।
দিদিয়া বাঁচিয়া থাকিতে দই সন্দেশের ভাগটাই বেশী ছিল,
তিনি মারা বাইবার পর হড়কো ঠাণ্ডার অংশটাই প্রবল হইয়া
উঠিল। কিন্তু রামহরি তখন ডানপিটে হইয়া উঠিয়াছেন,
কাজেই ইহা সব্বেও টিকিয়া রহিলেন।

তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবার বিশেষ কোনো চেষ্টা
হইল না। কিন্তু তবু লেখাপড়া তিনি শিখিয়াই ফেলিলেন।
বড়মামীর এক ভাই তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া আসিয়াছিলেন,
ছেলেটার একটা গতি করিয়া দিবার জন্ত। ইচ্ছা ছিল বামুন-
স্বাক্ষরের স্থানে না হোক, বাজারসরকারের পদে তাঁহাকে
অবৈতনিকভাবে বাহাল করিয়া রাখিবেন। কিন্তু রামহরি
প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যালয়গর প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অমূল্য করিয়া
লেখাপড়া শিখিবার জন্ত অসন্তব উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন।
বাজারসরকারের কাজে সময় খুব বেশী যাইত না, কাজেই
পড়ার সময় ছিল। দেখিয়া শুনিয়া বাড়ির গৃহিণী তাঁহাকে
বৈঠকখানাঘর বাড়পোছের কাজটাও দিয়া দিলেন। ইহাতেও
রামহরিকে দমান গেল না, বরং কোথা দিয়া সুপারিশ করাইয়া
তিনি অবৈতনিক ছাত্ররূপে স্থলে ঢুকিয়া গেলেন। বড়মামীর
বৌদিদি ইহাতে একান্তই চটিয়া বেয়াসব ছেলেটাকে বাড়ি
হইতে বিদায় করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময় কৰ্ত্তা
বলিলেন, “থাক না ছোঁড়া, টেবী আর বটুর মাঠারটাকে
ছাড়িয়ে দিলেই হবে। ছুবেলা বসে গিলছে আর এইটুকু
পারবে না?”

রামহরির আপত্তি ছিল না, তিনি পড়িতে লাগিলেন, এবং
পড়াইতে লাগিলেন। নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের
কোনো চেষ্টা ছিল না, সুতরাং এম-এ পাস না করা পর্যন্ত
এইখানেই থাকিয়া গেলেন এবং বাড়ির ছেলেমেয়েদের যখন

বাহাকে প্রয়োজন পড়াইতে লাগিলেন। আগের চেয়ে বে-
শি ভাল খান, শুইবার জন্ত যে তক্তাপোষ এবং ভাল বিছানা
পাইয়াছেন, বাড়ির সব কয়জন চাকরের সঙ্গে যে তাঁহাকে
শুইতে হয় না, এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি কোনোদিনই
মনোযোগ দিলেন না।

সর্বপ্রথম তাঁহারও মনে সাদা জাগিল যখন তিনি
শুনিলেন তাঁহার কৈশোরের প্রথম ছাত্রী শ্রীমতী টেবী ওরফে
কুমারী নীহারিকার সঙ্গে তাঁহার বিবাহের আয়োজন হইতেছে।
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বাড়ির গৃহিণীর কাছে গিয়া বলিলেন,
“রাঙা মামীমা, এটা কি রকম যেন হ’ল। টেবীকে আমি
ছোটবেলা থেকে—”

রাঙামামী সাতজন্মেও রামহরিকে কোনো ভাবে খাতির
করা আবশ্যক বোধ করেন নাই; আজ কিন্তু ভবিষ্যৎ শাশুড়ী
রূপে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ
বাবা, সেই জগ্রেই ত ভরসা করে মেয়েকে তোমার হাতে
দিচ্ছি। মেয়ে আমার দেখতে ভাল নয়, অল্প জায়গায় বড়
হেনস্থা হবে। তোমার কাছে সে ভয় নেই, তুমি ওর ভিতরে
কত গুণ তা জান।”

টেবীর রূপ বা গুণ কিছুই বেচারী রামহরির অজ্ঞাত
ছিল না; কিন্তু এ বাড়িতে তাঁহার সম্বন্ধে যখন বা ব্যবস্থা
হইয়াছে, কোনটাতেই তিনি যেমন আপত্তি করেন নাই,
এটাতেও ভেদনি করিলেন না। শুভদিনে শুভক্ষেত্রে শ্রীমতী
নীহারিকা তাঁহার পরীষে অধিষ্ঠিত হইয়া বর জুড়িয়া বলিলেন।

নীহারিকার রূপ গুণ বাহা থাক বা না থাক, পর ছিল।
রামহরির একটা চাকরিও ভালমত জুটিয়া গেল। বস্তুরবাড়ি
ভাগ করিয়া এইবার তিনি বাড়ি ভাড়া করিয়া আলাদা
সংসার করিলেন। নীহারিকা গৃহিনীপণায় মাকে এক
শিসিমাকেও ছাড়াইয়া গেল। রামহরি কতকগুলি টাকা
রোজগার করিয়া আনেন মাত্র, সংসার পরিচালনার আর
তাঁহার কোনোই হাত নাই। তাঁহাকে বাহা থাইতে দেখিয়া

হয় তাহাই তিনি খান, বাহা পরিতে দেওয়া হয় তাহাই তিনি পরেন এবং বাহা শুনিতে বলা হয় নীরবে তাহা শুনিয়া যান। অবশ্য এ ব্যবস্থায় তাঁহার নিজের কোনো অমত ছিল না। জয়াবধি কোনো-না-কোনো রমণীকে ভাগ্যবিধাত্রী হিসাবে সমীহ করিয়া চলিতে তিনি অভ্যস্ত, সেই হিসাবেই তিনি নীহারিকাকেও মানিয়া চলিতেন। বরং আগে আগে বাহারা তাঁহার দণ্ডমুণ্ডের কত্রী ছিলেন, এটি তাহাদের চেয়ে অনেক অংশে দয়াবতী, ইহার অধীনে আদর যতটা চের বেশী পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে যত্নের আশিকতা অসহ লাগিলেও রামহরি সহ করিয়া যাইতেন, কারণ জীবাতির কথার যে প্রতিবাদ করিতে নাই, এ শিক্ষা তাঁহার ভাল রকমই হইয়াছিল। স্বতরাং আমি হইয়াও তিনি অতি সাধবী পত্নীর মত নীহারিকার একান্ত অহুগত হইয়া রহিলেন এবং নীহারিকা আসলে গৃহিণী হইলেও কাষ্যতঃ কণ্ঠা হইয়া উঠিলেন।

ইহাদের সংসারে যে-দুইটি শিশুর আবির্ভাব হইল, তাহারাও যেন ঠিক বাহা হওয়া উচিত, তাহার উন্টাটাই হইল। ছেলটি হইল অতি সুন্দর দেখিতে, মেয়েটি হইল ভ্রামবর্ণ অতি সাধারণ চেহারার। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই বুঝা যাইতে লাগিল যে, ভ্রীমান দেখিতেই শুধু সুন্দর, ভিতরে বিশেষ কোনো বস্তু নাই। বুদ্ধি স্বচ্ছ নাই, লেখাপড়া শিখিবার প্রবৃত্তি নাই, তবে স্বথের বিষয় এইটুকু যে, সুবুদ্ধিও বিশেষ নাই। চুপ করিয়া এক আয়গায় বসিয়া থাকিতে পাইলে সে সবচেয়ে খুশী হয়, একমাত্র স্বখামোর প্রলোভনে তাহাকে একটু নড়িতে চড়িতে দেখা যায়। স্বাস্থ্যও ভাল নয়, অল্পতেই তাহার ঠাণ্ডা লাগে, পান হইতে চুপ খসিলেই তাহার হজমের গোলমাল উপস্থিত হয়। নীহারিকা দেখে শোনে কপাল চাপড়ায়, আর বলে ভগবান্ একে গরিবের ঘরেই বা কেন পাঠালেন? আর বেটীছেলে করেই বা কেন পাঠালেন? রাজবাড়ির রাজনন্দিনী হলেই এর শোভা পেত। কিন্তু সমস্ত ক্ষম তাহার এই অকর্মজ সুন্দর ছেলেই জুড়িয়া থাকে। মেয়ের দিকে মন দিবার তাহার অবসরই হুন্না, যদিও মেয়েই ছোট।

তা কপালগুণে মেয়ের তাহাকে খুব বেশী মরকারও হয় না। মেয়ে ত নয় যেন লোহার বাটল। বেশ ভ্রামবর্ণ,

গোলগোল চেহারা, মাথায় এক মাথা জ্বরক্ক কৌকড়ান চুল। সে দশ মাসে হাঁটতে শিখিল, এগারো মাস পুরিতে না পুরিতে কলরব তুলিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

দুধ কোথায় থাকে, কলা কোথায় থাকে, মিছরী চিনি কোথায় থাকে, তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। ছেলের তদারক করিতে করিতে নীহারিকা হয়ত খুকীকে খাওয়াইতেই তুলিয়া গেল, কিন্তু খুকী রমিবার মেয়ে নয়। সে বাটি হাতে করিয়া, সিকি কড়া দুধ উন্টাইয়া দিয়া, খানিক দুধ খাইয়া, খানিক বুকে পেটে মাখিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া বসিয়া আছে। রাত্রে নিজের কাঁথা টানিয়া নিজে পাতে, দানার বালিশ ঠিক করিয়া দেয়, খোকা ভয়ে ভা করিয়া উঠিলে খুকী তাহাকে বসিয়া সাহায্য দেয়। নীহারিকা অবাক হইয়া বলে, “একে ভগবান করলেন কি-না মেয়ে, এ যে জেলার ম্যাজিষ্টার হবার যুগ্য।”

যত দিন যাইতে লাগিল, ছেলেমেয়ের অসাধারণ তকাংটা বড় বেশী উগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল। ছেলের নাম হইল কান্তিচন্দ্র, তিনি শুধু কান্তিসর্ব্ববই হইয়া রহিলেন। মুলে তাহাকে ভর্তি করিতে না করিতে ছেলে অস্থখে পড়িয়া শয্যাগ্রহণ করিল, মাস কয়েক শুধু শুধু মাহিনা গণিয়া নীহারিকা শেষে ভাস্করবিরক্ত হইয়া ছেলের নাম কাটাইয়া দিলেন। ঘরেই অল্প মাহিনার এক ছোকরা-মাঠার রাখিয়া দেওয়া হইল, সে রোজ নিয়মমত হাজিরা দিতে লাগিল, তবে কান্তিচন্দ্রের বিদ্যালাত কতটা হইল, তাহার কেহ কোনো খোজ করিল না। চেহারাটা কিছু দিনের ভিতর বেশী খুলিতে লাগিল, পাড়াপড়শীর নজরের ভয়ে কান্তির মা ক্রমেই বেশী করিয়া সশঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

মেয়ের নাম রাখিলেন বাপ ভ্রামলতা, ডাকনামটা লভাই থাকিয়া গেল। সাধারণ হিন্দু গৃহস্থঘরের মেয়ে, তাহার শিক্ষার ভাবনা বড় একটা কেহ ভাবে না। আর ভাবিয়াই বা হইবে কি? বড় হইয়া ত দেবী সরস্বতীর সহিত কোনো সম্পর্কই তাহার থাকিবে না, দিন কাটিবে রান্নাঘরে আর হুতিবাগুহে, তখন তাহাকে আবার অত ঘটা করিয়া লেখা পড়া শেখান কেন? তাহার উপর লতা দেখিতে হুন্দরী নয়, নীহারিকার ইচ্ছা খুব ছোট থাকিতে থাকিতে কোনগতিতে তাহার বিবাহ দিয়া পার করিয়া দেওয়া। কচিকলা

তবু গোলগাল আছে, হানি খুশী আছে, এক রকম দেখায়, বড় হইয়া এ যে আবার কি রকম মেথিতে হইবে কে জানে ? বলা বাহুল্য, বেশে তখনও শারদা আইন জারি হইতে অনেক বিলম্ব ছিল, সুতরাং নীহারিকার ইচ্ছাটাকে কেহই আপত্তিকর বা অযুত মনে করিত না। লতাকে যে বাপের বাড়ি বছর দশের বেশী বাস করিতে হইবে না, এ-বিষয়ে ঘরে বাহিরে কাহারও কোনো সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু যে-মেরে এক বছর বয়স হইতে না হইতে নিজের গাওয়া পরা, শোয়া সব-কিছুর ব্যবস্থা নিজে করিয়া আসিতেছে, তাহার চিরজীবনের ব্যবস্থা অন্য লোকে অত চট করিয়া করিয়া দিতে পারে না। দাদাকে মাঠার পড়ায়, সে উন্টা দিকে বসিয়া দেখে। হঠাৎ এক দিন একখানা পবরের কাগজ উন্টা করিয়া ধরিয়া গড় গড় করিয়া পড়িয়া সে সকলকে তাক লাগাইয়া দিল। ছোকরা-মাঠারটির ব্যাপারটা বড়ই মনে লাগিল। এই একটা মাকল ফলের মত ছেলে, ইহার পিছনে সে পুরা একটা বছর খাটিতেছে, ইহাকে কি সে বিন্দুমাত্র কিছু শিখাইতে পারিল ? আর এইটুকু মেয়ে, ইহাকে কোনো দিন কেহ ক'খ চিনাইবারও চেষ্টা করে নাই, ইহার বুদ্ধি দেখ ? সে-দিন হইতে কান্তিচন্দ্রের মাঠার নামে তাহারই মাঠার থাকিলেও কার্যতঃ লতারই মাঠার হইয়া গড়াইল। লতাকে বাহা শেখান যায়, তাহা ত সে শেখেই, বাহা না শেখান হয় তাহাও কোথা হইতে যে সে শিখিয়া আসে তাহার মাঠার ভাবিয়া পায় না।

শুধু পড়াশুনাতাই নয়, অন্য দিকেও লতা বাড়ির লোককে থাকিয়া থাকিয়া তাক লাগাইয়া দেয়। ঠিকা বি আসে নাই, নীহারিকার মাথা ধরিয়াছে। কলতলায় জ্বপীকৃত এঁটো বানানের দিকে তিনি যতবার তাকাইতেছেন, তাহার ধরা মাথা আরও বেশী ধরিয়া বাইতেছে। হঠাৎ বাসন নাড়ার শব্দ হইল, চৌবাচ্চার মধ্যে কলের জল ঝিরঝির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। নীহারিকার মনে হইল যেন মরুতে পথভ্রান্ত পথিকের কর্ণে জলধারার শব্দ আসিতেছে। আতুল আগ্রহে শরনকক হইতে গলা বাড়াইয়া বাহিরের উঠানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। ওমা, কোথায় বা পোড়ার-মুখী ক্যাডালীর মা। ভোট লতা ডুরে শাড়ীর খাঁচলটি কোমরে আচ্ছা করিয়া জড়াইয়া, হাতের সোনার

বালা উর্কে বাহতে টানিয়া তুলিয়া মহোৎসাহে বাসন মাজিতেছে।

নীহারিকা ধরামাথার যত্না কেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, “এই, এই, সব বুদ্ধি, সব লীপু গীর। একরত্তি মেয়ে, রকম দেখ না, কাঁড়িখানেক এঁটো মাজতে বলেছে। তারপর সর্দি কাশি ক’রে মর আর কি। একেই ত আমার ছেলেকে নিয়ে কত হুখ।”

লতা নড়িবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া বলিল—“আমি তোমার আহ্বানে ছেলের মত কিনা ? কতবার আমি ক্যাডালীর মাঝের সঙ্গে বাসন মেজেছি, কখনো আমার কিছু হয় না, বলিয়া ঘষ ঘষ করিয়া মাজিয়া চলিল।

নীহারিকা হরত জরে শয্যাশায়ী, বামুন ঠাকরুণ সময় বুঝিয়া নিজের বাড়িতেই থাকিয়া গেলেন। কান্তি সময়মত গোছাতরা লুচি না পাইয়া নাকে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রামহরির চোক প্রায় কপালে উঠিবার ভোগাড়, এমন সময় দেখা গেল লতা গোল গোল ছোট ছুইটি হাত প্রাণপণে চালাইয়া আটা ঠাসিতেছে এবং দাদাকে সাব্বনা দিতেছে, “বাবা, আচ্ছা ছেঁচ কাঁদুনে ছেলেবাণু তুমি। একটু সবুর কর না, লুচি এখনই হয়ে যাবে।”

আট বছরের মেয়ে যখন লতা, তখনই সে রান্নাবান্না সব শিখিয়া ফেলিল। বামুনঠাকরুণ না আসিলে নীহারিকাকে আর একেবারে পথে বসিতে হয় না, লতাই তাহার অর্ধেক কাজ করিয়া দেয়। এইটুকু মেয়ের গায়ে ভগবান শক্তিও দিয়াছেন আশ্চর্য। সে-দিন পাড়ার শ্রেষ্ঠ ডানপিটে ভোষালাকে এমন এক চেলা কাঠের বাড়ি লাগাইয়াছে যে, পাড়ায় লতার নাম রটিয়া গিয়াছে। কান্তিচন্দ্র সকালে নিজে খাইবার জন্য ছুইটি রসগোল্লা কিনিয়া আনিতেছিল, হঠাৎ ভোষালা কোথা হইতে চিলের মত ছোঁ মারিয়া রসগোল্লা দুটি ঠোঙা হইতে তুলিয়া নিজের মুখে কেলিয়া দিল। কান্তি ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই লতা বাহির হইয়া আসিল। কাঠ কাটিয়া দিয়া সে মাঝের উঠন ধরানোর সাহায্য করিতেছিল। সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল কান্তি খালি ঠোঙাটা হাতে করিয়া হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে, আর ভোষালা একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে কলা দেখাইয়া বলিতেছে “ও বানর, কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি ?”

তাদের মত ছুটিয়া গিয়া লতা ভোঙ্কার পিঠে চেলা কাঠের বেশ এক বা বশাইয়া দিয়া বলিল, “বানর ত তুমি, এইবার লেখ জয় জগন্নাথ” বলিয়া ক্রন্দনপূরক দানব হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। এই-টুকু মেয়ের হাতে মার খাইয়া ভোঙ্কলস্ক্র এতই অবাক হইয়া গিয়াছিল যে, প্রতিবাদ করিবার চেষ্টাও সে করিল না। নীহারিকা অবশ্য ব্যাপার শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, ‘ওমা কোথায় বাব! বেটাছেলেকে ঠেঙিয়ে এলি এমন করে? লোকে বলবে কি? মা, মা, মা, এ মেয়ে ত নয়, একেবারে মহিষমর্দিনী!’

লতার মাটার হঠাৎ এই সময় দেশে চলিয়া গেল। কান্দির আর আনন্দ ধরে না, সকালবেলাটা এখন বেশ খুশীমত খেলা এবং খণ্ডার চর্চা করিতে পারিবে। লতা কিন্তু ভাবিয়াই অস্থির, তাহাকে পড়াইবে কে? মায়ের এ-সব দিকে সহানুভূতি নাই, তাহা সে এখনও বুঝিতে পারে, অগত্যা নিরীহ বাবাটিকেই গিয়া আক্রমণ করিল, “আমি বুঝি পড়ব না? আমি বুঝি তোমার লুকা ছেলের মত মুখ্য হয়ে থাকব?”

রামহরি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “না মা না, মুখ্য কেন হবে? মাটার ত খোঁজ। হুজ্জ, পাওয়া গেলে সে তোমাকেও পড়াবে।”

লতা বলিল, “হ্যাঁ, মাটারও এসেছে, আর আমিও পড়েছি। ঐ যে বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ী যায় রোজ এই গলি দিয়ে, সেই বালিকা বিদ্যালয়ে আমি পড়ব।”

রামহরি অল্পগত অধস্তন কর্মচারীর মত নীহারিকাকে ধর দিলেন। গৃহিণী ঠোট উন্টাইয়া বলিলেন, “হুজ্জ, হুজ্জ, মেয়ে সত্যিই ত আর মাজিষ্টার হবে না, এখন বসে বসে তাঁর টাইমের ভাত রাধি আর ইঙ্কলের মাইনে গুণি। অতর কাজ নেই।”

কিন্তু কে বা তাঁহার কথা শোনে? তাঁহারই মেয়ে ত? লতা খাওয়া, নাওয়া, শোওয়া, কাজ করা, লাবাকে সামলান, সব হঠাৎ একমুহুরে তাকে তুলিয়া রাখিয়া, এমন সগর্জনে কায়া হুক করিল যে, নীহারিকার মত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাসটা পড়িল রামহরির উপরেই। এমন বাপ না হইলে, এমন মেয়ে হয়? সাতজন্মে তিনি এমন কাণ্ড দেখেন নাই। তাঁহারাও ত মা-বাপের মেয়ে, এমন অজ্ঞান আচরণ করিতে কে কবে

তাঁহাদের দেখিয়াছে? আপদ মেরেকে ইঙ্কলেই দিয়া আসি হোক, মাহুঘের কান চুটা জুড়াক। রামহরি লতাকে ফুলে ভর্তি করিতে চলিলেন। মনে মনে বুঝিলেন, তাঁহার রাজ্যে আবার সম্রাজ্ঞী বনলের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

লতা ফুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের একেবারে অবাক করিয়া দিল। এমন ভীষণ বুদ্ধি, এমন মনোযোগ, তাঁহারা ইতিপূর্বে কোনো ছাত্রীর মধ্যে দেখেন নাই। স্বতঃশক্তিও তাহার অসাধারণ, কোনো কথা তাহার কাছে পড়িতে পার না। বৎসরের মাঝখানে ভর্তি হইল বটে, কিন্তু বৎসরের শেষে পরীক্ষায় সব কটা বিষয়ে প্রথম হইয়া ক্লাসের সব কয়জন মেয়েকে সে একান্তভাবে চটাইয়া দিল। হরেক রকম প্রাইভেট ছই হাত ভরিয়া যে-দিন সে বাড়ি আসিয়া হাজির হইল, সে-দিন এমন কি নীহারিকা পর্যন্ত খুশী না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সত্যি মেয়েটার গুণ আছে। হায়, হায়, ইহার শতাংশের একাংশ বুদ্ধি যদি ছেলেরটার থাকিত। পোড়া ভগবানের কি বিচার আছে গা? এই মাকাল ফুলের মত ছেলে, বাপ-ম যখন থাকিবে না, তখন খাইবে কি? স্বাস্থ্যও তাহার এমন যে, মুটেগিরি করিবার যোগ্যতাও তাহার কোনো দিন হইবে না। আর এই মেয়ে, গুণের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে হীরার টুকরা, কিন্তু একটুখানি রূপের অভাবে কোনো আদরই ইহার হইবে না। বিবাহ দিতেই জিব বাহির হইয়া পড়িবে, কেমন যে বর জুটিবে কে জানে?

লতার পড়াশুনার ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল। বিশ পচিশ বৎসর আগের কথা, তখন কলিকাতা শহরেও হাজারে হাজারে মেয়ে ফুলে পড়িত না। পরীক্ষা দিতে অগ্রসর কে-ক’ট মেয়ে হইত, তাহাদের দিকে লোকে সম্ভ্রমবিশ্বাসে তাকাইয়া থাকিত। আই-এ, বি-এ পাস করা মেয়ের সংখ্যা তখন এক হাতের আঙুলে গোনা যাইত। মেয়েরা ছেলেরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যে পরীক্ষার প্রথম বিভাগ হইতে পারে এমন অসম্ভব সম্ভাবনাও কাহারও মাথায় আসিত না।

কিন্তু লতা সম্বন্ধে ক্রমে এই রকম একটা অম্পট সম্ভেদ, তাহার ফুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মাথায় আসিতে আরম্ভ করিল। এমন ছাত্রী তাঁহারা কখনও পান নাই, ইহাকে শিক্ষাইতে গিয়া নিজেদেরই যেন মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হইয়া পড়িতে হয়। ফুলের বাৎসরিক পরীক্ষার প্রথম প্রাইভেটলা ত তাহার হাতে ধর,

এন্টাল পরীক্ষা অবধি দিতে পারিলে সে ছেলের মাথা চাট মাঝিরা প্রথম স্থান অধিকার করিবে। হুবিধা পাইলেই তাঁহারা লতার মাকে বলিয়া পাঠান, যেন অনর্থক বিবাহ দিবার জন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া এমন মেয়ের ভবিষ্যৎ তিনি নষ্ট না করেন।

লতার বয়স এখন বছর তেরো। চেহারাটি আগেরই মত আছে। শুধু লম্বা হইয়াছে খানিকটা, আর ঘন চুলের গুচ্ছ কাঁধ ছাড়িয়া পিঠের মাঝামাঝি নামিয়া আসিয়াছে। চোখ দুটি বৃদ্ধিতে সমুজ্জল, হাত দুটি কশ্মে তৎপর। নীহারিকার মেয়ের বিবাহ দিবার ইচ্ছাটা মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দিয়া ওঠে, আবার শিক্ষয়িত্রীদের কথা ভাবিয়া সে উৎসাহটাকে তিনি চাপিয়া যান। অপদাৰ্থ ছেলের জন্ত তাঁহার মনে একটা প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য সর্বদাই গুমরিতে থাকে। পাড়ার অন্য ছেলেরা টপাটপ ক্লাসে উঠিতেছে, স্পোর্টে প্রাইজ পায়। বড় হইয়া, কাহাকে কোন্ লাইনে দেওয়া হইবে, তাহা লইয়া বাপ-মায়েরা কত আশা উৎসাহে আলোচনা করে। আর তাঁহার ছেলে দেখে না? ইহাকে পুতুল সাজাইয়া এক দেয়ালের তাকে বসাইয়া রাখা চলে, আর কোনো কাজ ইহার দ্বারা হইবে না। মেয়ে হইতে হইত, তাঁহার মূখের জননা হওয়ার অপবাদ ঘুচিবে। রামহরির আর যা দোষই থাক, মুখ তিনি নন, হুতরাং নীহারিকার জন্তই ছেলে মুখ হইল, এ কথা কি আর লোকে বলিতে ছাড়িবে? কাজেই মেয়ের বিবাহের বিষয় তিনি চুপ করিয়াই আছেন। মেয়েটা কপালক্রমে দেখিতে ছোটখাট, এখনও তাহাকে দশ-এগার বছরের বলিলে লোকে জোর করিয়া মিথ্যাবাদী বলে না।

কান্তি এখনও বৈশাখ ভাগ সময় বাড়িতেই পড়ে। স্কুলে তাহার নাম আছে, কিন্তু ঐ নাম পর্যন্তই। স্কুলে পাঠাইলেই তাহার হজমের গোলমাল হইতে শুরু হয়, আর নীহারিকা ব্যস্ত হইয়া তাহাকে আবার ঘরে আটক করেন। দেখিতে সে কিশোর কন্দর্পের মত হৃন্দর, বেশ সাজিয়াগুজিয়া থাকে। তবে গোকের রেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাজের ভিতর একখানি মোটা বাঁধান খাতা আছে, মাঝে মাঝে তাহাতে কাব্যলক্ষীর আরাধনাও করে। সস্ত্রাতি এ-বিষয়ে তাহার বিশেষ উৎসাহ দেখা হইতেছে। ভ্রামলতার স্কুলের গাড়ীতে উমা বলিয়া একটি মেয়ে বার, মেয়েটি দেখিতে ভারি হৃন্দর।

মেয়েটি আবার ঠিক দরজার সামনেই বসে, বড় বড় হরিণনয়ন মেলিয়া কাহার সন্ধানে যেন এদিক ওদিক তাকায়। কান্তিকেই সে দেখিতে চায় কি? তাহার মত হৃন্দরন অন্ততঃ এ গলির ভিতর আর কেহ নাই। উমা লতারই বয়সী হইবে বোধ হয়। তবে লতার চেয়ে লম্বা বড়, চোখ দুটিও একেবারে শিশুর সারল্যেই শুধু পূর্ণ নয়। স্কুলের গাড়ীর সহিস আগিয়া যখন ডাক দেয়, “গাড়ী আয়া বাবা,” তখন লতার আগে কান্তিচন্দ্রই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসে। কিন্তু দুই মেয়েগুলি আবার ইহা লইয়াও হাসাহাসি করে। তাই মাঝে মাঝে সে সামনের ঘরের জানালার আড়াল হইতে দেখে। মধ্যে মধ্যে সে অবশ্য বাহিরও হয়, কারণ উমাকে দেখাত ত তাহার কাজ নয়, উমাকে দেখা দেওয়াও কাজ। কি হৃন্দর মেয়েটি। আর সর্বদাই হালকা এক একটা রঙের শাড়ী পরে, এমন চমৎকার তাহাকে মানায়। কান্তি যদি কবি না হইয়া চিত্রকর হইত, তাহা হইলে উমার একখানি ছবি আঁকিয়া নিজে খন্ত হইত, উমাকেও খন্ত করিয়া তুলিত, বোধ হয়।

শ্যামলতা দাদার কাণ্ড দেখে আর রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জলিয়া যায়। আর উমালক্ষ্মীছাড়ার রকম দেখ। বিশ্বের সঙ্গে খোঁজ নাই সব কুলোপানা চক্র। বিদ্যা দাদারও যত, উমারও তত। রাগের চোটে আর কিছু করিতে না পারিয়া লতা গাড়ীতে উঠিবার সময় বেশ করিয়া উমার পা মাড়িয়া দেয়। উমা আপত্তি করিলে বলে, ‘তা ভোঁদা শরীর নিয়ে সামনেটা জুড়ে বসিস্ কেন? তোকে কি ডিঙিয়ে উঠব?’

উমাদের বাড়ি কাছেই, কলিকাতা শহর তাই, না হইলে ইটিয়া বাওয়া-আসা চলিত। তাহার বাবার অবস্থা ভাল নয়, মেয়ে অনেকগুলি, ছেলে মাত্র তাহারও একটি। মেয়েদের ভিতর উমা দ্বিতীয়, বড়মেয়েটির অর্থাভাবে অতি অপাত্রে বিবাহ হইয়াছে। ইহাকে তাই কষ্ট করিয়াও তিনি স্কুলে দিয়াছেন। মেয়ে দেখিতে খুব ভাল, পড়াশুনা করিলে ভাল বিবাহ হয়ত হইবে। চেহারাও শুধে লোকের হৃন্দরও পড়িতে পারে। স্কুলের প্রাইজ ইত্যাদিতে লোকের চোখের সামনে তাহাকে ভাল করিয়াই তুলিয়া ধরা হয়। উমার ভাই সকলের বড়।

কান্তিচন্দ্র কয়েক দিন ঘোরাফেরা করিয়াই বিনয়ভূষণের সঙ্গে ভাব জমাইয়া লইল। সে অন্য স্কুলে পড়ে, না

হইলে তাহার সঙ্গে বেশী করিয়া খাতির জমাইবার লোভে কান্দি ফুলে হুকু যাইতে রাজী ছিল। বিনয় ছেলেটি ভাল, পড়াশুনার মন আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য তাহারও ভাল নয়। তবে পরিবের ঘরে তাহাকে অত নন্দলালী চণ্ডে মাহুষ করা সম্ভব নয়, কাজেই অল্প দশ জনে বাহা খায় পরে, সেও তাহাই খায় পরে। অস্থ করিলেও ফুলে যায়। সম্ভ্রান্তি সে ম্যাটিক পরীক্ষার জন্য প্রাণপণে খাটিয়া প্রস্তুত হইতেছে। তাই ইচ্ছা থাকিলেও কান্দি বেশী আড্ডা দিতে পারে না।

দিনগুলি যেন পাখায় ভর করিয়া হু হু করিয়া উড়িয়া চলিতেছে। শ্রামলতা সে-দিন শিশু ছিল, দেখিতে দেখিতে কিশোরী হইয়া উঠিল। পাড়ার ছেলেদের সম্বন্ধেও সে আজকাল সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তবে তাহার ভিতর রোমান্সের ভাব বেশী কিছু নাই, প্রতিযোগিতার ভাবই প্রবল। এক দিন কান্দিচন্দ্র রাত্রে একথানা প্রশ্নপত্র হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “দেখেছিস এবারে ইংলিশের কোম্পানি কি রকম শক্ত? তোদের বারে এই রকম হলেই চকু স্থির। বিনয়টাও ভাল করে লিখতে পারেনি।”

লম্বা কাগজখানা হাতে করিয়া বলিল, “ইং, ভাবি ত, যাও আমাকে খাতা, আমি পটাপট সব লিখে দিচ্ছি, তোমার বিনয়কে দেখিও।”

সত্যিই একথানা খাতা টানিয়া লইয়া সে প্রশ্নের উত্তর লিপিতে বসিয়া গেল। ঘণ্টা দুই খাটিয়া, সব ক’টা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া কান্দির হাতে দিয়া বলিল, “যাও তোমার বন্ধুকে দেখাও গিয়ে।”

রাত্রেই না দেখাইলে কিছু চণ্ডী অশুভ হইয়া যাইত না। কিন্তু কান্দি রাত্রেই চলিল, তাহার নমনতারাটিকে আর এক বার দেখিতে পাইবার লোভে।

বিনয় খাতাখানা লইয়া উঠাইয়া পান্টাইয়া অনেকগুলি পাতা পড়িয়া ফেলিল। তাহার পর সংক্ষেপে বলিল, “তোমার বোন ইউনিভার্সিটিতে নাম রাখবে।”

কান্দিচন্দ্রের কানে কথাটা গেল কিনা বুঝা গেল না, পাশের ঘর হইতে কে মিটি গলায় মিহি স্বরে গান করিতেছিল, সে ভয় হইয়া তাহাই শুনিতেছিল।

লতারও পরীক্ষার বৎসর দেখিতে দেখিতে আসিয়া

পড়িল। তাহার পরিচিত অগতঃ-সংসারে এই বৎসরের মধ্যে নানা পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছে। নীহারিকা দাক্ষ পক্ষাবাত পীড়ায় একেবারে জীবন্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কথা পর্যন্ত একরকম বন্ধ। অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে জড়াইয়া জড়াইয়া বাহা বলেন, তাহা স্বামী পুত্র কন্যা ভিন্ন কেহ বোঝে না। শ্রামলতা ঘরের কাজও দেখে, পরীক্ষার পড়াও পড়ে। কান্দিচন্দ্র এখনও তেমনি পাড়ার লোকের চোখে বিশ্বয় জাগাইয়া গলিতে গলিতে ঘোরে। তাহার শরীর আরও খারাপ হইতেছে, হস্তরাং নিশ্চয়ই সে পরীক্ষা দিবে না। মা অক্ষম হইয়া পড়ার পর তাহার আর নিয়মমত খাওয়া-দাওয়া হয় না। লতা পোড়ারমুখী নিজের পড়ার জাঁক করিতেই ব্যস্ত। বাবা ত মাহুষের মধ্যেই গণ্য নহেন।

উমাদের বাড়িতেও বিপদ আপদের শেষ নাই। তাহার বাবা মারা গিয়াছেন, বিনয় আই-এ পাস করিয়া অর্ধাভাবে পড়িতে পারে নাই, গোটা পাঁচ ছয় টাশনি করিয়া কোনো মতে সংসার চালাইতেছে। উমা আর ফুলে পড়ে না, তাহার মা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু গরিব ঘরের পিতৃ-হীনা মেয়ে, কে তাহাকে বিবাহ করিবে?

লতার পরীক্ষা হইয়া গেল। শেষের দিন বাড়ি ফিরিয়া সে নিজেই বলিল, “ফাষ্ট’না হই, দেকেও ত নিশ্চয় হব।”

নীহারিকার যোগপাতুর মুখে হাসি দেখা দিল। রামহরি বলিলেন, “তা হবে বৈ কি মা? শুধু কান্দি মুখখানাকে অসম্ভব বাঁকা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বন্ধুবান্ধব সকলকে মনের দুঃখ জানাইয়া, দিন কয়েক বলিয়া বেড়াইল, বোনের বোল বছর বয়স হইয়া গেল, মা-বাবা বিবাহ দিবার নাম করেন না, ইহাতে কান্দির মানসস্ত্রমের বড় হানি হইতেছে।

তাই ত, এখন আর লতাকে দশ-এগার বৎসর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া চলে না। তাহার স্ব স্ব সবল দেহটি হঠাৎ যেন বর্ষার নদীর যত ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, লম্বাও বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। তা ছাড়া ম্যাটিক পরীক্ষা যে দিল, সেই ত বৎসর একটা স্থির নির্দর্শন? বোল বৎসর না পুরিলে কাহাকেও ত খাতির করিয়া পরীক্ষা দিতে দিবে না? পাড়ার লোকে রামহরিকে এমন কি পীড়িতা নীহারিকাকেও বাড়ি বহিয়া অবাচিত উপদেশ দিয়া যাইতে

লাগিল। মেয়ে যে হাজার পড়ায় ভাল হইলেও জঙ্গ বা মাজিষ্ট্রেট হইবে না, ইহাও বিজ্ঞানের দ্বারা অনেক জানাইয়া দিল।

রামহরি এখনও বিচলিত হইলেই নীহারিকার কাছে ছুটিয়া আসেন, চিরদিনের অভ্যাস যাইবে কোথায়? জিজ্ঞাসা করেন, “কি করা যায়, খোকার মা?”

নীহারিকা জড়াইয়া বলেন—“কিছু করতে হবে না। মেয়ে পড়ুক।

রামহরি বলেন, ‘পাড়ার লোকে বড় নিন্দে করছে।

নীহারিকা বলেন, “তাদের মুখে পোকা পড়ুক, আমরা নৈকিয়া কুলীনেয় ঘর, মেয়ে চিরকুমারী থাকলেও নিন্দে নেই।

লতা পরীক্ষায় প্রথমই হইল। সে নিজে কিছুই বিস্মিত হইল না, কিন্তু চেনা-অচেনা সকলকে রিস্মিত করিয়া দিল। নীহারিকা মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। রামহরি আনন্দে অধীর হইয়া কি যে করিবেন ভাবিয়াই পাইলেন না। কান্তিচন্দ্র রাগের চোটে বাড়ি হইতে সেই যে বাহির হইয়া গেল। আর রাত বারটার আগে ঘরেট ফিরিল না। চেনা শুনা কাহারও বাড়িতে না গিয়া, ইডেন গার্ডেনে গিয়া বসিয়া রহিল। চেনা মানুষে দেখিলেই ত লতার সাক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশ করিতে বসিবে? আর তাহার সঙ্কল্প হয় না। একে ত উমার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে শুনিয়া অবধি সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এ-দুঃখের কথা কাহাকে সে জানাইবে? আঠার বৎসরের জেলে, পড়াশুনা কিছু করে নাই, শুধু রূপ দেখিয়া কেহ কি তাহাকে কত সন্তুদান করিবে? মা বাবা তাহার দারুণ মনোবেদনার কথা একবারও কি ভাবেন? তাহার বলিলে কহিলে উমাকে কি আর কান্তির সঙ্গে বিবাহ দেন না? যাহা হউক, গরিবের মেয়ে ত? কত ভাল বিবাহই আর তাহার হইবে? কান্তি একগাছা ইথরজী বইই না হয় মুখস্থ করে নাই, কিন্তু তাহার মত সাহিত্যিক প্রতিভা তাহার বয়সের কোন্ ছেলের আছে? আর ঘরটা কত বড় তাহাও ত দেখিতে হইবে? কিন্তু পিতামাতা নিজের ঐ কলে হোৎকা খেয়ের বিদ্যাবতীর গর্বে একবারে দিনে তারা দেখিতেছেন, কান্তি-বোচারার কথা তাবিবারই তাহাদের সময় নাই।

লতা আই-এ পড়িতে ঢুকিল। এখন স্কলারশিপের জোর আছে, কাজেই কিছুতে আর আটকাইবে না। ঘরের বাহিরের কোনো কথাতেই আর সে কান দেয় না। প্রতিবেশিনীরা তাহার দোমাক দেখিয়া দিনের দিন রুগ হইয়া উঠিতেছে। অত্যন্ত রকমের দুই-চারটি পাত্রও অনেক সময় তাহার খুজিয়া আনে, কিন্তু তাহাদের পরিচয় শুনিবা মাত্র লতা এমন হাসির কোয়ারা ছুটাইয়া দেয় যে, ঘটকী এবং পাত্র অগ্রসৃত হইয়া পলাইবার পথ পায় না। কান্তির ইচ্ছা করে বোনের মাথাটা গুঁড়া করিয়া দেয়, কিন্তু সে জোর তাহার কোথায়?

ফাষ্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারের দুইটা বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এমন সময় নীহারিকা হঠাৎ ঘর-সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। শেষ কথা স্বামীকে বলিয়া গেলেন, “লতা আমার যত পড়তে চায় পড়িও।”

শোকের ঘোরে কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। লতাই ঝাড়িয়া উঠিল সবার আগে। মুখ স্নান, চোখে জল, কিন্তু সমানে ঘরের কাজ করিতেছে, পড়া করিতেছে। প্রতিবেশিনীরা গালে হাত দিয়া বলিল, “ধন্নি মেয়ে বাবা, এমন ব্যর্থপরনাই মা, সে চলে গেল, তাতেও দু-দিন সবুজ নেই, কেতাবী বিবির মুখ থেকে কেতাব নামল না। সাথে শাস্ত্রে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে মানা আছে?”

কান্তিচন্দ্রের বয়স এখন কুড়ি বৎসর। দেখিতে রাজ-পুত্রের মত। দেহাজে কবিতার খাতাও জমা হইয়াছে অনেকগুলি। ভাগ্যবিধাতা নিতান্তই প্রসন্ন, তাই উমার এখনও বিবাহ হইয়া যায় নাই। তাহার বয়স আজকাল বৎসরে বৎসরে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। কান্তিচন্দ্রের অবস্থা অবর্ণনীয়। তলে তলে এক দিন বিনয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাবও তুলিয়াছিল, সে একরকম অপমান করিয়াই কান্তিকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। বিনয় বলিয়াছে, “তুমি না হয়ে লতা যদি পাত্ররূপে হাজির হ’ত, এখনি বোনকে ধরে দিতাম। তুমি বিয়ে ক’রে ক্রীক খাওয়াবে কি? ঐ বুড়ো বাপ যে কদিন সেই ক’দিন ত?”

কান্তি ভারি চালে বাবার কাছে গিয়া বলিল, “বাবা, সংসারটা ত রসাতলে যেতে বসল, লতা কিছুই দেখে না।”

রামহরি বলিলেন, “এই যে পরীক্ষাটা হয়ে থাক, এখন কিছু ব্যস্ত আছে কিনা?”

কান্তি বলিল, “ওর ভরসা করা বুঝা, আই-এ হয়ে গেলেই বি-এ পড়তে শুরু করবে ত?”

রামহরি অতি অবুঝ মানুষ, বলিলেন, “তা আর কি করা যাবে বল, ক’টা বছর একটু কষ্ট করেই চলবে। কান্তি মূখ হাড়ি করিয়া চলিয়া গেল। এতদিন পর্যন্ত তলে তলে নানাপ্রকার ডাঙুচি দিয়া উমার বিবাহ সে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু চিরকালই কি পারিবে?”

লতা আই-এতেও প্রথম হইল এবং সত্যি বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বি-এ পরীক্ষা দিতে যখন আর মাস তিন মাত্র বাকি, সেই সময় হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটিল। তাহার জীবনে মত একটা উলটপালট হইয়া গেল। লতা দেখিল, বতই কেন-না নিজের জীবনের সব ব্যবস্থা সে করিয়া থাকুক, তাহারও উপরে এক জন অদৃশ্য দেবতা বসিয়া আছেন, তাহার বিধির উপর কথা নাই।

উমার দাদা বিনয় হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বলেন অতিরিক্ত খাটুনি এবং পুষ্টির অভাবই এ রোগের মূল। এই সময় সাবধান না হইলে, ক্রমে ক্ষয়রোগে দাঁড়ানও অসম্ভব নয়। কান্তি রোগ ছুপুরে খাইয়া বাহির হইয়া যায়, বাড়ি ফেরে রাত এগারটায়। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, “বিনয়ের কাছে থাকি। ডাক্তার তাকে একটু চিন্মারফুল রাখতে বলেছে।”

সে-দিনও সে নিয়মমত বাহির হইয়া গেছে। লতার টেবিলে হইয়া গিয়াছে, এখন সে বাড়িতে থাকিয়া পড়ে। পড়িতে পড়িতে একবার জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল, রোদ পড়িয়া আনিতেছে, বাবার চা খাইবার সময় হইল বোধ হয়। চেয়ার হইতে না উঠিয়া বায়ুন-ঠাকরণকে ডাক দিয়া বলিল, “বায়ুন-ঠাকরণ, চায়ের জল চড়িয়ে দাও, আর চারটি চিড়ে ভাজ।”

লতার কব্জের পাশেই কান্তির ঘর। হঠাৎ বিবর্ণ পাণ্ডুমুখ, আর দুই চোখের জল লইয়া কান্তি হন হন করিয়া ছুটিয়া আসিয়া লতা’ করিয়া নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বিল। তাহার কান্নার শব্দ এ ঘর হইতে স্পষ্ট শোনা বাইতে লাগিল।

লতা একেবারে অবাক হইয়া গেল। এ আবার কি কাণ্ড? দিন দুপুরে দাদা কান্নাতে বসিল কেন? লতার মনে হইতে লাগিল, হঠাৎ মাঝের দশ-বারটা বৎসর তাহার জীবন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, সে আবার বালাকালে ফিরিয়া গিয়াছে। চক্কাফুনে কান্তিকে লামলাইয়া বেড়াইতেছে।

অনেক ঠেলাঠেলির পর ত কান্তি দরজা খুলিল। তখনও রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। লতা জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে কি?”

কান্তি বলিল, “ওরা চুপি চুপি উমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। কাল তার বিয়ে।”

লতা বলিল, “তা তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে না, তা ত জানই, নতুন কথা ত নয়? এখন কেনে লাভ কি? তোমাকে মেয়ে মেয়ে কে?”

কান্তি বলিল, “উমার সঙ্গে যদি অশ্রু কারো বিয়ে হয়, আমি আশুহত্যা করে মরব। তোরা কেউ আমায় রাখতে পারবি না।”

লতা অত্যন্ত চট্টিয়া বলিল, “তুমি একেবারে অপদার্থ। লজ্জা করে না তোমার এই রকম “সীন” করতে? পুরুষ হয়ে জন্মে শেষে কেনে জিততে চাও?”

কান্তি বলিল, “তা ত তুমি বলবেই, উচ্চশিক্ষিতা মহিলা কিনা? আমার মা বেঁচে থাকলে এটা হতে দিতেন না, বতই মূর্থ হই, আমাকে তিনি বাঁচাতেনই, যেমন করে হোক। তুমি যাও আমাকে নিজের বাখা নিয়ে একলা থাকতে দাও।”

সে এক রকম ঠেলিয়াই লতাকে বাহির করিয়া দিল। রাগে, উত্তেজনায়, এবং খানিকটা ভয়েও লতার পক্ষে তখন কাপিতেছিল, কোন মতে নিজের ধরে গিয়া সে শুইয়া পড়িল। বই পড়িবার মত মনের অবস্থা আর তাহার ছিল না।

কিন্তু শুইয়াও স্থির থাকিতে পারিল না। কান্তি বরষে লতার বড় বটে, কিন্তু তাহাকে লতা বালাকাল হইতে একান্ত অপহার শিশুর মতই দেখিয়াছে এবং বখাশক্তি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। মা অসহ্য হইয়া পড়ার পর কান্তির সকলরকম থাকা লামলাইয়াছে ছোটবোন লতা, যদিও অকৃতজ্ঞ কান্তি একদিনের জন্যও তাহা স্বীকার করে নাই।

আজও তাই কান্টিকে কাদিতে দেখিয়া লতা অস্থির হইয়া উঠিল, কোনোমতে তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার প্রাণ ছট্‌কট করিতে লাগিল। সত্যই যদি আত্মহত্যা করিয়া বসে? অতবড় মূর্খের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। উমার উপরেও তাহার রাগ হইতে লাগিল। জানিয়া তুমিয়া সে দাদাকে অত আন্তর্য্য দিল কেন?

স্থির থাকিতে না পারিয়া লতা উঠিয়া বাবার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, “বাবা, দাদার কাণ্ড শোন। তুমি ত কিছু দেখবে না এদিকে সে যে কি-না করছে!

রামহরি ভীত ত্রস্তভাবে বলিলেন, “কি করেছে সে মা?”

লতা সব কথা খুলিয়া বলিল। রামহরি চিন্তিতভাবে মাথায় হাত ব্লাইতে ব্লাইতে বলিলেন, “তাই ত কাল বিয়ে? এর মধ্যে কিই বা করা যায়?”

লতা বলিল, “সময় থাকলেই বা কি করতে? ওরা অমন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে কেন?”

রামহরি বলিলেন, “তা বুঝিয়ে বললে কি হয় বলা যায় না। আমার লাইকইনস্‌য়ারেন্সের হাজার কয়েক টাকা পাওনা আছে, আর তোমার মা থাকতে দেশের সেই জমিটা কিনেছিলেন। এর ভিতর কিছু টাকা তোমার জন্যে—”

লতা বাধা দিয়া বলিল, “আমার জন্যে তোমার কিছু রাখতে হবে না বাবা, আমি ক’রে খেতে পারব। যা আছে সব দিয়েও তোমার হাবা ছেলেকে বাচাতে পার ত দেখ।”

রামহরি বলিলেন, “তা হ’লে আমি যাব না-কি একবার কিনয়ের কাছে?”

লতা একটু খামিয়া বলিল, “তিনি ত বড় অহং, উমার মায়ের কাছে বলতে পারলে হয়। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাবি।

লতা প্রস্তুত হইবার জন্য উপরে ছুটিল। দাদার ঘরের দরজায় একটা থাক দিয়া বলিয়া গেল, “আমরা উমাদের ওখানে যাবি, একটু ঠাণ্ডা হও।”

উমার মা তাহাদের দেখিয়াই মুখ গম্ভীর করিলেন। রামহরি বিনয়ের কাছে গিয়া বসিলেন। লতা বলিল, “আপনি দোজবরে পায়ে দিচ্ছেন ত, সেও খুব ভাল নয়; না হয় দাদার সঙ্গেই দিন। তার অন্ততঃ বয়স কম, আর কোনো ঝগড়া নেই। খাবার পরবার মত ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

উমার মা বলিলেন, “কি ব্যবস্থা? ছেলে কি কোনো দিনও কিছু রোজগার করবে?”

লতা বলিল, “তা হয়ত করবে না, কিন্তু বাবার ভবিষ্যৎ টাকাকড়ি কিছু আছে, তাতে সাধারণভাবে একটা সংসার চলতে পারবে।”

উমার মা খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন,—“তবে বাছা আসল কথা বলি, মেয়েকে শুধু খাওয়ালে ত হবে না, আমাদের সকলেরই একরকম ভার নিতে হবে। আমার বিনয়ের যদি ভগবান স্বাস্থ্য ভাল রাখতেন তা হ’লে কি আর উমাকে আমি বুড়ো বরে দিই? অমন সুন্দর মেয়ে আমার। কান্টির সঙ্গে বেশ মানাত, কিন্তু যেমন অদৃষ্ট। এ পাত্রের কিছু টাকাকড়ি আছে, তাই ভরসা আমাদের ফেলবে না।”

লতা গম্ভীর হইয়া গেল। খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করিল, “উমা কই?”

উমার মা বলিলেন, “ছাদে আছে বুঝি।”

লতা ধীরে ধীরে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবা মাত্রই উমা মুখে আঁচল শু জিয়া কাদিয়া ফেলিল।

লতা একটুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, “তোমরা আছ ভাল। কাঁদলেই সব সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। আমার কোনো দিন কাঁদবারও সুবিধে হ’ল না।” বলিয়া আবার নীচে নামিয়া গেল।

উমার মা তাহাকে নামিতে দেখিয়া বলিলেন, “উমি নেই ছাদে? তবে গেল কোথা, এই সন্ধ্যা বেলা?”

লতা বলিল, “উপরেই আছে, বসে বসে কাঁদছে।”

উমার মা স্নানমুখে বলিলেন, “কি আর করব মা, পোড়া জুড়ে।”

লতা বলিল, “দেখুন, এক কাজ করলে হয়, আপনি যদি রাজী হন। তা হ’লে সকলেরই সুবিধে হয়।”

উমার মা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি?”

“আপনি যদি উমাকে আমাদের বাড়িতে বেন, আর আমাকে ঘরে নেন। শি-এতেও আমি ফাটাই হব। টাকাকড়ির হুঁতবনা আপনাকে আর কিছু ভাবতে হবে না।”

উমার মা তাহার দিকে ইঁা করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, “সে ভাগ্যি কি আর

আমার হবে? আমার রোগা ছেলে। তোমার বাবা রাজী হবেন কেন?”

লতার মুখানা একটু লাল হইয়া উঠিল, বলিল, “তিনি রাজী হবেন।”

এমন সময় উমা ছুটিয়া আসিয়া লতাকে টানিয়া লইয়া গেল।

এক দিনেই এক জোড়া বিবাহ হইয়া গেল। বাসর ঘরে লতার কানের কাছে মুখ লইয়া উমা ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল “আচ্ছা দীক্ষী তুই, নিজেই নিজের বিয়ের সঞ্চয় করলি।”

লতাও তেমনিভাবে বলিল—“তা তোমার বরটি পৌরাণিক রাজনন্দিনীর মত “হা হতোম্মি” বলে গড়িয়ে গেলেন, কাজেই আমাকেই নায়করূপে অবতীর্ণ হতে হ’ল।”

শ্রুর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীসত্যপ্রিয় বসু

আজকাল বেকার-সমগ্রার দিনে যুবকেরা ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। আমি এক কৃতী যুবকের জীবনের প্রতি যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ অধ্যবসায় ও কর্মশক্তির বলে উন্নতি লাভ করিয়া বাঙালীর গৌরবস্থল হইয়াছেন।

রাজেন্দ্রনাথ ১৮৫৪ সনে ভাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, তাঁহার মাতাই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। তিনি খুব মেহনতী ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ পরে যে-সব গুণাবলীর জন্য বশ ও কৃতিত্ব লাভ করেন, তাহা বাল্যকালে মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন রাজেন্দ্রনাথ এগার-বার বৎসরের বালক তখন তাঁহার মাতা নিজের স্বল্প পুঁজি ভাঙিয়া পুত্রকে উচ্চ শিক্ষার্থ হৃদয় আগ্রাস্য কোন আশ্বীয়ের নিকট প্রেরণ করেন; কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে পুত্রের অভাব এত অশুভব করেন যে, অনেক দিন পর্যন্ত তিনি পীড়িত থাকেন। তথাপি পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও উচ্চ শিক্ষার বাহাতে কোনও ব্যাঘাত না হয়, এজন্য নিজের হৃৎ-স্ববিধার প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই।

রাজেন্দ্রনাথও অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। একবার যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার আশ্বীয়স্বজনরা মাতার অসুস্থতার খবর দিয়া একটি তার পাঠান। তিনি এই সংবাদ পাইয়া অতি দুঃখিত মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আসিয়া দেখেন, মাতার অসুস্থতার কথা সত্য নহে; তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। পাছে তিনি না আসেন, সেজন্য এই মিথ্যা সংবাদ পাঠান হইয়াছিল; কেননা, তাঁহার জানিতেন মাতার অসুস্থতার সংবাদ শুনিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না। তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে অতি অল্পবয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলিকাতায়

প্রেসিডেন্সী কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে ভর্তি হন। কিং এ-সময় এমন ভীষণ রোগে আক্রান্ত হন যে, তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। পারিবারিক অবস্থাও এরকম যে আর্থিক সাহায্যের নিত্য প্রয়োজন হয়। স্বতরাং কাজে চেষ্টায় তাঁহাকে বাহির হইতে হইল। শেষ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি চিরকাল দুঃখ অশ্রুভব করিয়াছেন এবং পরে যখন তাঁহার অবস্থার উন্নতি হয় তখন বা ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। বহু অর্থব্যয়ে নিজগ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও একা বালিক-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং যাহাতে তাঁহার অবর্তমানে অখ্যাভাবে বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য টাউন্সদের হাতে বহু টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহাবিধ্যমান। তিনি বহুকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকালটির সভ্য আছেন এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উন্নতির জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে সর্বোচ্চ অনারারি ডি-এসসি উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন আর একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। সেটি বঙ্গীয় অগ্রমত জাতিসমূহের উন্নতি বিধায়ক সমিতি (Society for the Improvement of the Backward Classes)। আজকাল অগ্রমত জাতি প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, কিন্তু যাহারা খবর রাখেন তাঁহার জানেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটি প্রায় পঁচিশ বৎসর কয়েকটি নীরব কর্মীর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণীয় মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। শ্রুর রাজেন্দ্রনাথ শুধু অর্থসাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহার সভাপতিরূপে ইহাকে দৃঢ়ভিত্তি উপর স্থাপন করিতে পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার সাফল্যের মূল ইহার বহু বৎসর নিহিত আছে। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রায় ৪৫০টি বিদ্যালয়ে অল্প ১৭০০০ বালকবালিকা শিক্ষা পায়। রাজেন্দ্রনাথের সাফল্যের কারণ নির্দেশ করিতে গেলে

দখা যায় কয়েকটি গুণের অপূর্ণ সমাবেশ। এইরূপ দৃষ্টান্তিজ্ঞা : কাঙ্ক্ষা, অক্লান্তকর্মী, কষ্টসহিষ্ণু ভাগ্যবান পুরুষ খুব কমই দখা যায়। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক ত্রিপুরা মহীন্দ্র তাঁহার পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন পলতা : লকলে কাজ আরম্ভ করেন, তখন : নেন তের-চৌদ্দ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম : রিতেন। মস্তকের সাধন কিংবা শরীর : তন ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র।

তিনি জীবনের প্রারম্ভে দুঃখকষ্ট ও : ণেকরুতার ভিতর কাহারও অধীনতা : িকার করিবেন না বলিয়া যে-প্রতিজ্ঞা : রিয়াছিলেন, আজও জীবন-সাম্যরে : ন-প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

যখন তিনি মার্টিন কোম্পানীতে : ণীদাররূপে প্রবেশ করেন, তখন মার্টিন : ণীদারের অত্যন্ত অংশীদার শ্রম : ঙ্গইন মার্টিনের সহিত এই চুক্তি : রেন যে, সমান অংশীদার রূপেই তিনি : যাসিতে রাজী, নতুবা নহে। সেই : ময় তিনি ইউরোপীয় কর্মক্ষেত্রে ক্লাইভ : টে অপরিচিত ছিলেন।

যদিও তিনি জানিতেন যে, মার্টিন : ণীদাররূপে প্রবেশ না করিলে তাঁহার : হ অধিক ক্ষতি হইবে এবং ব্যাপক- : গবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অপূর্ণ : যোগ হাবাইবেন তথাপি তিনি নিজের : দাদর্শচ্যুত হইলেন না। শ্রম একইন : টিন রাজেন্দ্রনাথের গুণাবলীর পরিচয় : ইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সমান : ণীদার রূপেই গ্রহণ করিলেন, তাঁহারই : হায্যে তিনি এলাহাবাদ, লক্ষৌ, : টিনা ইত্যাদি শহরে জলকলের : টাঙ্কি পান ও তাহা স্বচাচরূপে সম্পন্ন : রেন। কোন কাজে হাত দিলে : হা স্বন্দররূপে সম্পন্ন করাই তাঁহার বিশেষত্ব। কলিকাতা : : অত্যন্ত স্থানে মার্টিন কোম্পানীর ইমারতসকল নির্মাণ : ণালীতে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। কলিকাতা : ঙ্গস্তোরিয়া মেমোরিয়াল তাঁহার নির্মাণশক্তির অপূর্ণ : দর্শন। যদিও ইহার পরিকল্পনা বিলাতের প্রসিদ্ধ স্থপতি : র উইলিয়াম এমারসন প্রস্তুত করেন, তথাপি রাজেন্দ্রনাথের : ণাম্য অঙ্গসারে মূল নক্সা তিনি অনেক পরিবর্তন করেন। : ণ রাজেন্দ্রনাথের পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হইত,

তাহা হইলে পূর্ব পরিকল্পনা অঙ্গসারে সবটাই শেষ করা : যাইত। ভিত্তি অত্যধিক ভারাক্রান্ত হওয়ায় কয়েকটি : মিনারেট বগান হয় নাই।

কলিকাতার উপকণ্ঠে ও অস্থানা স্থানে তিনি লাইট



শ্রম রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রেলওয়ে স্থাপন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদিগের অনেক : অহবিধা দূর করিয়াছেন। জলকল বা রেলওয়ে নির্মাণ : অথবা এলাহাবাদ, লক্ষৌ, বেনারস, জবলপুর, ইত্যাদি স্থানের : বৈজ্ঞানিক কারখানা স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কাণ্ডে তাঁহার : নৈপুণ্য নিয়োগ করিয়াছেন।

আগ্রা জলকল প্রস্তুত করিবার জন্য টেওয়ার বাহির হইলে : রাজেন্দ্রনাথ যে দর দেন তাহা অত্যন্ত কোম্পানী হইতে অনেক : কম হইলেও, তিনি দেশী লোক তদুপরি বাড়াণী, এই

অজ্ঞাতে সেই অর্ডার পান নাই। এই সম্পর্কে তিনি তখনকার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সহিত বিশেষ পরিচিত হন এবং এলাহাবাদ জলকল প্রস্তুত করিবার ক্রীম ঠিক হইলে, তিনি রাজেন্দ্রনাথকে কোন ইউরোপীয় কোম্পানীর নামে কোটেশন পাঠাইতে পরামর্শ দেন। এই সুত্রেই তিনি সার একুইন মার্টিনের সহিত মিলিত হইয়া মার্টিন কোম্পানী স্থাপন করেন। টেওয়ার খুলিবার দুই-তিন দিন আগে তিনি ও একুইন মার্টিন এলাহাবাদ গমন করেন এবং পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থার খোঁজ করিয়া টেওয়ার দাখিল করেন। টেওয়ার খুলিবার দিন সকালবেলা দেখা গেল, যে-বাক্সে টেওয়ার ছিল, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বহু অস্থসন্ধানের ফলেও তাহার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। টেওয়ার খুলিবার মাত্র দুই ঘণ্টা বাকী। দুই জনে সেই একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলায় যান এবং বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সময় চাহিয়া লন। নূতন টেওয়ার-পত্র লইয়া দু-জনে হোটেলের কিরিয়া আসেন এবং বহু পরিশ্রমে দুই জনে মিলিয়া পাঁচ ঘণ্টার ভিতর আবার টেওয়ার-পত্র সম্পূর্ণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যদিও চার-পাঁচ লক্ষ টাকার কাজের টেওয়ার, তথাপি তাহাদের পূর্ব টেওয়ারে যে দর ধরিয়াছিলেন এটাতে তাহার চেয়ে অতি সামান্য তফাৎ হয় এবং টেওয়ার খুলিলে দেখা গেল যে, তাহাদের টেওয়ারই সর্বনিম্ন এবং তাহারাই সেই কাজ পাইলেন। কোন বোম্বাইওয়ালার উপর সন্দেহ হয়, কিন্তু কে যে সেই বাক্স চুরি করিয়াছিল তাহা আজ পর্যন্ত জানা যায় নাই।

শ্রম প্রকল্পচক্র রায় বলেন যে, বাঙালীর ব্যবসার অবনতির অগ্রতম কারণ, পাকা ব্যবসায়ীরা মুন্সফার টাকা হয় কোম্পানীর কাগজ, না-হয় জমিদারী ক্রয়ে খাটান, কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ সবেশে এ-কথা বলা চলে না। তিনি আজীবন যে-প্রতিষ্ঠানটি স্বহস্তে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেইটি বাহাতে উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে পারে এবং তাহার উন্নতিসাধন হইতে পারে সেই চেষ্টাতেই ব্যাপৃত আছেন।

কিছুদিন হইল তিনি বারুন কোম্পানীর হুপ্রসিদ্ধ লৌহ কারখানা ক্রয় করিয়াছেন এবং তাহার সুব্যোগ্য পুত্র বীরেন্দ্রনাথকে তাহা চালাইবার ভার দিয়াছেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করেন না। তাহার কারণ, বাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতে পারে, তাহাতে তিনি যোগদান করিতে চান না; কেন-না, তিনি যেন করেন ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতর দিয়াই দেশের ও দেশের প্রভুত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। তাই যখন বাংলার স্বাধীন গ্রহণের ডাক আসিল, রা গোলটেবিলের বৈঠকে যোগদানের নিমন্ত্রণ আসিল, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া সমস্ত হক

লোক চিনিকার ক্ষমতা, ব্যবসায়ে সততা, তীক্ষ্ণ অগ্রগণ্ডিত,

অধিকতর কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মিত ব্যবহার তাহার উন্নতির অগ্রতম কারণ। গত বৎসর তাহার অষ্টতিম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাহার কর্মচারীরা তাহাকে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন, উত্তরে তিনি তাহার কারবারের কর্মচারীদের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্বন্ধের উল্লেখ করেন। তাহার একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। একবার কোন একটি জমদারী কার্যোপলক্ষে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমার থাকিবার বা খাইবার কোন অসুবিধা হয় নাই ত। তারপর কাজের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কেন তিনি তাহার কর্মচারীদের শ্রদ্ধাভক্তি ভালবাসা পান, তাহা এই সামান্য ঘটনা হইতে বুঝা যায়।

বাল্যকালে তিনি একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে মাহুত হইয়াছিলেন এবং এখনও একান্নবর্তী পরিবারের কর্তৃত্বপে বাস করিতেছেন। সব জিনিসেই ভালমন্দের সংমিশ্রণ বিদ্যমান। একান্নবর্তী পরিবারেও সুখে বাস করা যায় যদি পরিবারের সকলে স্বার্থপর না হন। রাজেন্দ্রনাথের পত্নী লেডী বাহুমণি মুখার্জী হিন্দু স্ত্রী ও মাতার কর্তব্য স্বচাক্ষুণ্যে সম্পন্ন করিতেছেন এবং তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে সার রাজেন্দ্রনাথ এই উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে পারিতেন কি-না সন্দেহ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিদ্যমান। এক সময় এই সমাজ দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইলেও তিনি দীক্ষিত হন নাই এবং প্রচলিত হিন্দুধর্ম অনুসারেই ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দিয়াছেন।

কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন। বাঙালীদের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি তাহার চেষ্টায় ও যত্নের কথা কাহারও অবিদিত নাই। বম্বকাউট, অলিম্পিক এসোসিয়েশন, মোহনবাগান ক্লাব, আহিরীটোলা ক্লাব, স্পোর্ট ইউনিয়ন ক্লাব ইত্যাদি বহু ক্লাব তাহার সাহায্য লাভ করিয়াছে।

কলিকাতা শ্রামবাজারে একটি অতি পুরাতন অনাথ আশ্রম আছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ রাজেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানটিকে বহু যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অল্পদিন হইল ইহার অধিবাসীদের জন্য একটি হাসপাতাল খোলা হয়। ডাক্তাররা তাহার অসুস্থতার জন্য সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা বাধণ করা সত্ত্বেও তিনি উপরে না উঠিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, পাছে অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য সুবন্দোবস্ত না হয়। এখানে যে-সব অনাথা বালিকাদিগকে পালন করা হয় তাহাদের কয়েক জনের উপযুক্ত পাত্রের সহিত গুজরাটে বিবাহ হয়। অল্প কোন একটি প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের প্রতি ভাল ব্যবহার হয় নাই এবং নানা রূপ গোপলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে শুনিয়া

তিনি এই প্রতিষ্ঠানের একটি কর্মচারীকে হৃদয় গুজরাটে প্রেরণ করেন ও প্রত্যেকটি মেয়ের প্রতি ভাল ব্যবহার হইতেছে কি-না এবং তাহার স্বপ্ন আছে কি-না ইহা জানিয়া আসিবার আদেশ দেন। তাহার সাধের পরিবারে গৃহীত হইয়াছে এবং আনন্দে ঘরসংসার করিতেছে এই সংবাদ পাইয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

রাজেন্দ্রনাথ বাঙালীর কর্মপ্রচেষ্টাকে একটি নূতন ধারা দিয়াছেন। নিজের জীবন দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অতি

সামান্য অবস্থা হইতেও চরিত্রবলে অদ্ভুত কর্মশক্তি দ্বারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়।

তিনি জীবনে অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা হইতেও একটি বড় ভ্রমিষ অর্জন করিয়াছেন, দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। পরামুখ্যাপেক্ষী হইয়া গবর্ণমেন্টের চাকুরির জগৎ বসিয়া থাকিলে আর চলিবে না। স্বাধীন ব্যবসা ও কর্মশক্তি দ্বারা বাঙালীকে আবার বড় হইতে হইবে।

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

স্বাম্যমুখ্যঃ—নির্মলার বাবা চন্দ্রনাথ বাবু আজকালকার অনেক উচ্চশিক্ষিত স্বাধীনচিত্তাশীলের মত আচরণব্যবহার এবং চালচলনে ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি অসুরক্ত ছিলেন। যদিচ প্রকৃত্তে কোনদিন দীক্ষা লন নাই। তাহার স্ত্রী পরীগ্রামের মেয়ে, অল্পবয়সে বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী এবং স্ত্রীর ভাবনা, বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝে ছিল আকাশপাতাল ব্যবধান। সেটা যে কেবল চন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অসুরক্ত কারণ তাহাই নয়। তিনি ছিলেন স্বভাবতঃই জ্ঞানালোচকের মানুষ। সংসারের প্রয়োজন এবং ভাগিদের চাপে তাহার প্রকৃত্তিকে থরকি করিয়া চলা—এ তাহার খাতিয়ে আসে। সহিত না। বস্তুতঃ আইডিয়া এবং আইডিয়ালের ভ্রমভেদে পুরুষ যেমন চিরনিঃসঙ্গ, তিনিও ছিলেন তাহাই। তা এজন্য তাহার স্ত্রীর কোন রোষ কোত ছিল না; যদিবা ছিল বাহিরে প্রকাশ পাইত না। তিনি পরীগ্রামের মেয়ে, জীবনের সমস্ত অভাব অপূর্ণতাতেই নিমগ্নতার মত মানিয়া লনতে শিখিয়াছিলেন। এমন করিয়া একবারে তাহার স্ত্রী হুশীলা ছেলেপুলে ঘরসংসার লইয়া নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। অল্পবারে চন্দ্রকান্ত ভাবরাজ্যের নেশায় ভরপুর হইয়া থাকিতেন। এমন করিয়া অনেক দিন কাটিয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রকান্তের সবচেয়ে ছোট মেয়ে নির্মালা যখন হইতে হইয়াছে, তখন হইতে প্রকৃত্তিতে তাহার পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। উদাসীন পুরুষের যে দিকটা ছিল শুষ্ক, রেহাভূত, অনেকদিন পরে আজ তাহাই এই গুজ হৃদয়ের সফলতার শিশু-কন্ডটিকে কেন্দ্র করিয়া বিমণ্ডিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রকান্ত নির্মালাকে শিশুকাল হইতে শিক্ষার দীক্ষার সর্বতোভাবে নিজেকে দিয়া বেঁধেন করিয়া গলিলেন। এমন করিয়া নির্মালা ক্রমে সন্তের বৎসরের হইয়াছে, এখন সে বেথুন কলেজের প্রথম বামিক শ্রেণিতে পড়ে, কিন্তু কেবলমাত্র পিতার নস এক সাহচর্য্যে আশ্রয়িত অভ্যস্ত হওয়ার ফলে তাহার প্রকৃত্তিতে বহিরা গেছে একটা অপূর্ণতা। নবযৌবনের প্রত্যন্তপ্রদেশে পা দিলে তরুণীর মনে যে-সকল কথা যেমন করিয়া উদয় হয়, মনে যেটুকু ভাবের মায়া, যেটুকু আবেশ বাস্পসিক্ত হইতে থাকে নির্মলার তাহা হয় নাই। বরঞ্চ অবিব্রাজিত চন্দ্রকান্তের মত পিতার সঙ্গশর্মে থাকিয়া জ্ঞানের এক

মননশীলতার একটা আভাস তাহার চরিত্রে লাগিয়াছিল এক তাই তাহার প্রকৃত্তিতে একটা অনাসক্তির ভাব ছিল, বাহা ঠিক স্ত্রী-স্বলভ নয়।

এমনি করিয়া স্বামী সংসারের প্রতি উদাসীন থাকিয়াও পিতা এক কন্ডার মাঝে একটি হৃদয় যেরূপ স্নেহসম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। একদিন কলেজ যাইবার আগে চন্দ্রকান্তের ঘরে স্বামীর সঙ্গে নির্মলার একটুখানি আলোচনের মত এবং সামান্য দুই চারিটা কথা হইল। হঠাৎ তাহার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছুই ছিল না। স্বামীর মত এমন কত ছাত্র কত লোকই তাহার বাহিরের ঘরে তাহার সহিত বিশ্ববাস্যের দ্বারতীর বস্তু লইয়া তর্ক করিতে আসিত এক সকলের সহিতই নির্মালাকে তিনি পরিচয় করিয়া দিতেন।

৪

নির্মলা বাবার কাছে রাজ্যের বই পড়িয়াছে। নব্য ব্রাহ্মণ্যের অসমসাহসিক উদ্যম হইতে মুক্ত করিয়া বার্গসে। এবং সোপেনহাওয়ারের দার্শনিক মতামত পর্যন্ত সমস্ত বিষয়েই সে কিছু কিছু জানে। কিন্তু আশ্রয়িত বাবার কাছে মায়া হইয়া তাহার এমন স্বভাব হইয়া গিয়াছিল, যে, বইয়ের আলমারীতে ঠাসা তাহাদের এই বাহিরের ঘরের বাহিরে যে আর একটা জগৎ আছে, যে-জগতে সমস্তই স্বাধীনতার নিয়ম অনুসারে চলে না এবং যেখানে স্বাধীনতা কামনা-আকর্ষণের দ্বাভ-প্রতিঘাত অহরহ চলিতেছে, তাহা সে অনুভবই করিত না। সে জগৎ হইতে সে অনেকটাই বাহিরে রহিয়া গিয়াছিল। নির্মলাদের সংসারের এই বাহিরের ঘরটিতে সংসারের ভাবনা-চিন্তা দুই-

দৈন্য কিছুই প্রবেশ-পথ পায় নাই। এখানে চন্দ্রকান্তবাবু বন্ধুদের সঙ্গে বসিয়া সাহিত্যের সীমা এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় লইয়া তর্ক করিতেন, গোপালী বেলার আলোতে নিখল। সেতার বাজাইত; এবং দীপালোকিত এই ঘরেই সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া বই পড়িত। এইখানেই জ্ঞানের অপরিমিত মুক্তির মধ্যে এবং সাংসারিক চিন্তাবিরহিত বিশুদ্ধ আটের আলোচনায় সে তাহার সমস্ত দিনরাত্রি কাটায়াছে। স্থলীলা যেখানে সংসারের ধ্বংস বাঁচাইবার জন্ত গুঁড়া কয়লার সহিত মাটি মাখাইয়া গুলু প্রস্তুত করিতেন, নিজের হাতে গরুর জন্ত ছানি কাটিতেন, যেখানে তাঁহার সেজভাইটি আই-এ পরীক্ষায় বৃত্তি না পাইয়া কলেজ হইতে আসিয়াই এক পেয়ালা চা খাইয়া গৃহশিক্ষকতা করিতে ছুটিত—সংসারের সেই নীচের তলার সহিত তাহার বিশেষ জ্ঞানোশ্মান ছিল না। তাহার সপ্তদশ বর্ষের জীবনে সে কখনও বাংলা বা ইংরেজী নভেল পড়ে নাই, লুকাইয়া আড়ি পাতে নাই, পান চিবাইতে চিবাইতে কিংবা চকোলেট চুষিতে চুষিতে সমন্বয়বাদের সহিত সরস আলোচনা করে নাই। এখনও তাহার তরুণ জীবনের মধ্যে সে আত্মনিমগ্ন, একা। চন্দ্রনাথ এককালে কলিকাতার কোন বে-সরকারী কলেজে বছর দুই-তিন অধ্যাপনা করেন, তাহার পরে কি জানি কেন তাহা হঠাৎ ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সেই হইতেই কলেজের ছেলেদের প্রতি, ধীমান্ চিন্তাশীল অল্পবয়সী ছেলেমাত্রের প্রতিই তাঁহার একটা আকর্ষণ থাকিয়া গিয়াছে। পথেঘাটে ট্রামে বইয়ের দোকানে সামান্য দু-চার ঘণ্টার আলাপীকেও তিনি সাগ্রহে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহার সহিত হাসিয়া অজস্র বাক্যা তর্ক করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন।

যামিনী অল্প কয়েক দিন হইতে এখানে আসিতেছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহার আর আসা-বাওয়ার কোন আইন-কানুন নাই। তাহা সময় হইতে অসময়ে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাত্রি দশটা অবধি সে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে বসিয়া তর্ক করে, সকালের দিকে কখনও কখনও বেলা বারটাও হইয়া যায়। সে যে কেবল হোয়াইটহেলের নতুন বই একত্র করিবার প্লান আর বলশেভিজমের মূল কথাটা লইয়াই আলোচনা করিতে এত উৎসাহ দেখায়—তাহা কখনও মনে হয় না।

কিন্তু নিখল! তাহাকে লক্ষ্যও করে নাই। চন্দ্রকান্তের সহিত যামিনী নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে মাঝে মাঝে যখন বিমনা হইয়া বাইত তখন নিখল বাবার পাশে প্রায়ই উপস্থিত থাকিত বটে; কিন্তু চিরকালের অভ্যাসমত চুপ করিয়া শোনা ছাড়া আর কোন কথা তাহার মনেও আসিত না। বস্তুতঃ সাধারণ মেয়েদের চেয়ে অগ্ররকম ভাবে মায়াব হওয়ার জন্ত নিখলার কোন কোন হৃদয়বৃত্তি একেবারে অপরিণত ছিল। তাহার বাবা এই বয়স হইতে জ্ঞানের প্রতি, গভীর চিন্তার প্রতি তাহার মনে এমন একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। যে, নিজের বয়সের সঙ্গিনীদের সঙ্গে থাকিলেও স্বভাবতঃই সে থাকিত একা। তাহারা যখন শাড়ী, গয়না, নতুন উপহাস এবং মুখরোচক পরচর্চা লইয়া পরম উৎসাহে মাতিয়া উঠিত, তখন সে-সব হইতে মন তাহার বিতৃষ্ণায় সরিয়া আসিত।

যেদিন নিখলা জন্মিয়াছিল সেই দিন হইতেই চন্দ্রনাথ তাহার মেয়ের জীবনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, যে, তাহাকে বাদ দিয়া অপর কোনখানে তাহার কল্পার জীবনের যে কোন অর্থ থাকিতে পারে এ কথাটাই যেন তাহার মনে আসিত না। নিখলাও তেমনি করিয়া ভাবিতে শিখিয়াছিল এবং সেইজন্তই শিশুকাল হইতেই বাবা ছাড়া আর কাহাকেও সাথী বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। তাই সমবয়সী সখী এবং সঙ্গিনীদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া হাসিকোটুক ঠাট্টা মান-অভিমান এই সকল জড়াইয়া তরুণ বয়সে মনের উপর রহস্তবিজড়িত যে একটি হুমধুর ভাবের ছায়াপাত হয়, নিখলার তাহা হইতে পায় নাই। তাহার কুমারী-জীবনের স্ব-উচ্চ গিরিশিখরে কেবল অপরিমেয় স্তব্ধ তুষারের কঠিনতা এবং বর্ণহীন শুভ্রতা। তাহার চোখের চাওয়া এখনও যেন কোন বেদনার ঘোর লাগে নাই, মুখের উপর তরুণকালের ভাবমৃদুতার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। সে সহজ সরল খল্ল।

কিন্তু সেই নীরব সৌন্দর্য দেখিয়াই আর একজন পলে পলে মুগ্ধ হইতেছিল। চন্দ্রকান্তের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিবার ইচ্ছা যামিনীর দিন দিন কেন যে এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে, কেন যে এ বাড়িতে ঢুকিলে নিজেকে স্থির করিয়া

রাখা তাহার পক্ষে এত কঠিন হইয়া উঠে, একটা কথা বলিতে বলিতে সে এমন অন্তমনস্ক হইয়া যায়, হঠাৎ সমস্ত মন এত উতলা হইয়া উঠে যে, প্রাণপণ বলে আপনাকে সংবরণ করিতে হয়, এ-সকল কথার উত্তর দেওয়া কঠিন।

৫

সেদিন সকাল হইতে বাদলা করিয়াছিল। মেঘলা খোলাটে আকাশ, শীতের তীক্ষ্ণ বায়ু। মাঝে মাঝে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। বাহিরের আবহাওয়ার জন্য ভিতরটাও ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। পাচটা বাজিতে না বাজিতেই ইলেকট্রিক আলো জালাইয়া কাচের শাসি বন্ধ করিয়া চন্দ্রকান্ত বিকালবেলাকার দ্বিতীয় পেয়ালা চা খাইতে খাইতে কহিলেন, “নিখিলা, একটা গান কর তো, মা।”

বাজনার ডালা খুলিয়া নিখিলা গান করিতেছিল, এমন সময় বন্ধ দরজার শাসিতে কে ঢোকা মারিল। এমন বাদলায় কলিকাতার কদমাক্ত পথ বাহিয়া যে কেহ আসিতে পারে, চন্দ্রকান্ত কল্পনাও করেন নাই। তাই যামিনীকে দেখিয়া অতিমাত্রায় খুশী হইয়া বলিলেন, “আরে এই যে! এস যামিনী, ভাল কথা—কাল সকালে যে বইটা নিয়ে তর্ক করছিলে, সেইটে তুমি চলে যাবার পরেই খ্যাকারের দোকান থেকে কিনে আনলুম। অনেক দিন আগে এক বছর কাছে চেয়ে নিয়ে পড়েছিলাম কি-না, ঠিক মনে ছিল না। আর একবার আগাগোড়া মন দিয়ে পড়লুম। অনেক জিনিষ নতুন ক’রে চোখে পড়লো। সে-সব আমি দাগ দিয়ে রেখেচি। দাড়াও, বার ক’রে নিয়ে আসি পাশের ঘরের আলমারী থেকে।”

চন্দ্রকান্ত বাস্তবমুখ হইয়া লাইব্রেরী ঘাটিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু যামিনীর বইয়ের প্রতি আদৌ মনোযোগ ছিল না। বাজনার উপর নিখিলার সুকুমার আঙুলের গতি-লাঁচার দিকে সে নির্বিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। বৃষ্টি পড়িতেছে, আন্ধ আর চন্দ্রকান্ত বাবুর বাড়িতে যাইবে না এমনই স্থির করিয়া যামিনী আইনের একখানা মোটা কেতাব খুলিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারে নাই, কিন্তু দৃষ্টি সংযোগ করিয়াছিল। অথচ যতই সময় বহিয়া বাইতে লাগিল, ততই চেয়ার টেবিল এবং আইনের বইসমেত এই শুষ্ক

শূন্য ঘরটা একটা বিরাট ভারের মত তাহার মনের উপর চাপিয়া বসিতে লাগিল। অবশেষে নিজের সঙ্কল্প এবং নিজের কামনার সহিত বিবাদ করিতে করিতে সে আলনা হইতে বর্ষাতি কোট টানিয়া লইয়া গায়ে দিয়া চন্দ্রকান্তের বাড়ি অভিমুখেই দ্রুতপদে আসিতে হুকু করিল। বর্ষার দিনে পিচ্ছিল কদমাক্ত পথে বর্ষাতি গায়ে দিয়াও একজন যে আর এক জনের বাড়িতে কেবল মাত্র তর্ক করিতেই যায়, একখাটা আর যাহারই কাছে অবিশ্বাস্য হটক, চন্দ্রকান্তের কাছে ছিল না; কারণ তাহার এ-সকল কথা খেয়ালেও আসিত না।

তিনি ত পাশের ঘরে বই খুঁজিতে গেলেন, বাহিরে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল এবং গানের জ্বরের মধ্যে নিখিলা ভগ্ন হইয়া গেল। কেবল যামিনী নিজের মনের মধ্যে নাগরের মত আবেগ চাপিয়া ধরিয়া সেই সঙ্গীতাবিষ্ট তরুণীর পানে চাহিয়া থাকিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, বাজনার পদ্যের উপর হৃদয়ের রক্তভাষে আঙুলগুলি সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে তাহাদের চাপিয়া ধরে। এমন সময়ে চন্দ্রকান্ত বাবু পাশের ঘর হইতে ডাকিলেন, “নিখিলা, নতুন বইখানা কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্চিনে যে মা।” তাহার আস্থানে নিখিলা বাজনা ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইল। হর কাটিয়া গেল। গান থামিয়া গেল এবং যামিনী স্বপ্নলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিল, তাহার মানসী শুভ্র হৃদয়ের হাত দুইখানি একত্র করিয়া তাহাকে নমস্কার করিতেছে।

* * *

সুশীলা তাহার বড় বোমাকে কিছুদিনের জন্য এ-বাড়ি আনিয়াছেন। এ তাহার বহুদিনের সখ। সুখান্তর স্ত্রী প্রতিমাহৃদয়ের রং উজ্জ্বল শ্রামবর্ণ, গড়ন মোটা মোটা। বয়স বছর পনের বোল। বয়সে নিখিলার চেয়ে বছর-খানেকের ছোটই বোধ করি। কিন্তু ইহারই মধ্যে একটি ছেলে হইয়াছে। মেয়েমানুষের জীবনে স্বামীকে হাতের মুঠোয় রাখা ছাড়া আর যে কোন লক্ষ্য থাকিতে পারে, প্রতিমা তাহা ভাবিতেও পারে না। সকালবেলায় সামান্য দুই-একটা কাজের পর স্নান সারিয়া মাথার ভিজা এলো চুলে একটা গেরো দিয়া লইয়া জলযোগের পরে প্রতিমাহৃদয়ী আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার টিপের কোঁটা বাহির করিয়া

সময়ে একটি কাঁচপোকার টিপ পড়িল। টিপ পরিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানের রসে ঠোট দুইটি লাল করিয়া যখন যুথিকা-সাহিত্য-মন্দিরের একটি বই হাতে বিচানায় একটু গড়াইয়া লইবার উপক্রম করিতেছে, ঠিক তখনই জানালা হইতে মেবিল নির্মলা হাতে খাতা বই লইয়া কলেজের জগ্ন প্রস্তুত হইয়া বাসের অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। প্রাতিমার অবাক লাগিল। বুঝিতে পারিল না, যেহেতু হইয়া এই বয়সে এতখানি কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনটা কোন্‌খানে? বড় হইয়া আর কিছু তাহাকে জিজ্ঞাসী করিতে হইবে না। পানের বোটার করিয়া একটু চুষ লইয়া এই কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে সে উপত্যাসের প্রথম পাতাখানা খুলিয়াই একবার শেষের পাতাটা দেখিয়া লইল।

বিকালবেলায় কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গা ধুইয়া নির্মলা যেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রতিমা তাহাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়াকহিল, “ঠাকুরঝি ভাই, আমার মাথা খাস, একটা টিপ পড়।”

নির্মলা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কয়েকদিন দূর হইতে কি যেন লক্ষ্য করিয়া প্রতিমার মন ভিতরে ভিতরে রহস্যসমাকুল ও পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সে বলিল, “অবাক হয়ে এমন ক’রে মুখের পানে চাইছিল কেন ভাই? আমি বলছি একটা টিপ পড় আর একটা পান খা। এমন রাঙা দুটি ঠোঁটে পান না খেলে কি মানায়?...তাছাড়া যামিনী বাবু দেখলে কত খুশী হবেন, বল ত?”

নির্মলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল; তাহার পরে প্রতিমার দিকে চোখ তুলিয়া কহিল, “যামিনী বাবু কেন খুশী হবেন? তিনি কি আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে যাবেন যে, আমি টিপ পরেছি কি না-পরেছি।”

প্রতিমা অবাক হইয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল যামিনীবাবুর নাম শুনিবামাত্র নির্মলা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিবে, ভিতরে ভিতরে খুশী হইবে, কিন্তু উপরে কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিবে, ‘যাও!’ কিন্তু তাহার ধারণার সহিত কিছুই মিলিল না। প্রতিমা অবাক হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটু রাগও হইল। ‘যেহেতু অনেক লেখাপড়া

শিখিয়া মনে করিয়াছেন যেন পুরুষ হইয়া গিয়াছেন—নির্মলাকে উদ্দেশ্য করিয়া সে মনে মনে বলিল, ‘ছাই এমন লেখাপড়ায়! যাহার একটু ঠাট্টা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, হৃদয়ের রস জীবনের সহজ আনন্দ-কৌতুক সমস্তই বর্জন করিয়া আগাগোড়া যে ঠিক ঐ ছাপার বইয়ের মতই ঝংঝরে হইয়া উঠিয়াছে, সে কেবল দশটা পাঁচটা কলেজই করিতে পারে, আর কিছু পারে না।’

এমন রসবোধহীন মাতৃষের কাছে প্রতিমা আর তাহার দুলভ টিপের বাস্তু খুলিতে কোন উৎসাহ বোধ করিল না। সেখান হইতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নির্মলা প্রতিদিনকার মত তেতলার ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবিতে লাগিল, নীটশের যে বইখানা বাবা পড়িতে দিয়াছেন তাহার অনেক স্থল সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, সেই সব জ্ঞায়গাণ্ডা বাবাকে দিয়া বুঝাইয়া লইতে হইবে। তখন একেবারে সর্বনিয়ন্তায়া সম্ভারের খরচ বাঁচাইবার জগ্ন তাহার মা হুশীলা একরাশ কয়লার গুঁড়া একত্র করিয়া তাহাতে মাটি মিশাইয়া গুল প্রস্তুত করিতেছিলেন।

এমনি করিয়া নির্মলা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হইয়া জন্মিয়াও মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্ত দুঃখ-দৈন্য সন্নিহিত অভাব অনটন হইতে একেবারে দূরে রহিল। তাহার রাজ্যে কেবল নীটশের শক্ত অধ্যায়গুলি বুঝিতে না পারার ক্ষোভ, তাহার পৃথিবীতে কেবল রবীন্দ্রনাথের পূর্ববী আর মহাদার কবিতাগুলির সম্পূর্ণ রস জয়দ্রুম না করিতে পারার অতৃপ্তি।

৬

সে বছর পূর্ববঙ্গে বন্যা হইয়াছিল। বন্যা রিলীফ কমিটির সাহায্যের জগ্ন কলেজের মেয়েরা নিজেরদের মধ্যে কিছু ছোটখাট অভিনয় ইত্যাদি করিবে স্থির করিয়াছিল। মাসাদিক কালব্যাপী উদ্যোগ আয়োজন এবং রিহাসালের পর অবশেষে সেই বিশিষ্ট দিনটি আসিয়া পৌছিয়াছে। স্থির হইয়াছে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী সভায় উপস্থিত থাকিবেন। অভিনয় অন্তে বাহাদের অভিনয় ভাল হইবে ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী তাহাদের নিজে হইতে কতকগুলি প্রাইজ্ এবং মেডেল দিবেন বলিয়াছেন।

নির্মলা কলেজের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল গান

হের। তাহার সেতারের হাতও মিষ্ট এবং নিপুণ। কয়েক
মাস পূর্বে একজন মহিলা-অধ্যাপকের বিদায়-অভিনয়
মঞ্চশৈল্পীরের ‘মার্চেন্ট অব্ ভেনিস’ হইতে সে যে
ব্যবৃত্তি করিয়াছিল, তাহার সেই আবৃত্তির নিখুঁত উচ্চারণ,
গলিতা এবং মধুরতা সকলকেই অবাক করিয়াছিল। তাই
এবারেও অভিনয়ে সে অনেক ভূমিকাতেই দেখা দিবে।
শৈল্পীরের ‘ম্যাকবেথ’ হইতে কোন কোন অংশ এবং
বীজ্ঞনাথের দুই একটি কবিতাও সে আবৃত্তি করিবে, এইরূপ
ঠিক ছিল।

চক্রকান্ত মেয়ের বিষয়ে সর্বদাই গল্প করেন এবং তাহার
জানা বিষয়ের কৃত্রিম কল্পনার আরও রং চড়াইয়া লোকের
গাছে বলিয়া ছুখ পান। তাই তাহার কথাবার্তা হইতে
নির্মলার কলেজের এই সকল ব্যাপার এবং তাহাতে নির্মলার
ধন ভূমিকা লইবার কথা সমস্তই যামিনী জানিয়াছিল।

সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় অভিনয় আরম্ভ। চক্রলা সাজঘরে
টাছুটি করিতেছিল, টিকিটের ঘন্টা পড়িয়াছে। হঠাৎ এক
ময় চক্রলা সেখান হইতে ছুটিয়া আসিয়া নির্মলার কানে কানে
হিল, ‘তোরা বাবার সঙ্গে আর একজন কে কস্মিমত চমাপরা
হসছেন রে? তোরা বাবার সঙ্গে তিনিও নশ টাকার
কটা টিকিট কিনলেন। কেবল তোদের বাড়ি থেকেই
গমরা কুড়ি টাকা পেলাম।’

নির্মলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, ‘উনি
মিনীবাবু?’ তাহার স্বভাব কলেজের মেয়েরা সকলেই
গনিত। এই নিদ্বিষ্ট, সংক্ষিপ্ত উত্তরের চেয়ে আর একটুখানিও
গাহার কাছে আশা করা চলে না। তথাপি চক্রলা একটু
সিঁইয়া, কানের ইয়ারিংটা একবার ঠিক করিয়া লইয়া, চোখের
সমার্টা খুলিয়া আবার মুছিতে মুছিতে কহিল, ‘যামিনীবাবু
করে? মানে তোরা কে হন? দাদা?’

‘না।’

‘জবে কে?’

এবারে চক্রলার চাপাংসি অঞ্চলপ্রাপ্ত দিয়া হাস্যরোষ
বিবারণ চেষ্টা যামিনী না।

‘কে? ঠিক জানিনে ত। বাবার বন্ধু।’

‘সংসারে কোন্ জিনিষটা তুই ঠিকমত জানিস?’

চক্রলা নির্মলার বেনী ধরিয়া একটা টান দিয়া সেখান হইতে

চলিয়া গেল। কারণ আর দাঁড়াইবার সময় নাই, অভিনয়
আরম্ভ হইবার তৃতীয় ঘন্টা পড়িয়াছে।

আলো জলিল, পর্দা উঠিল। নির্মলা প্রথম উদ্বোধন-
সঙ্গীত গাহিল। বারংবার লোকের ‘এনকোরে’ তাকে ঘুরাইয়া-
ফিরাইয়া দুই তিন বার গাহিতে হইল। দুই একটা অভিনয়ের
ছোটখাট পালা শেষ হইয়া বাইবার পরে সে যখন শৈল্পীরের
ম্যাকবেথ হইতে আবৃত্তি করিতে লাগিল,

‘To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time.
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death—out, out, brief candle!’

তখন তাহার সমস্ত সত্তা যেন সেই সর্বকালান্তক মরণের
প্রতি ম্যাকবেথের এই ক্লান্ত উক্তির সহিত নিজেকে এক করিয়া
মিলাইয়া লইল। শৈল্পীরের কাবোর এই সকল ভীষণ
মধুর অংশের অনেকখানি সৌন্দর্যই সাধারণের কাছে শুধু
পড়ার ভিতর দিয়া ধরা দেয় না, তাহার আবৃত্তির মধ্য দিয়া
সেই সকল অনাবিকৃত সৌন্দর্যও যেন সকলের কাছে ফুটিয়া
উঠিতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে সে যখন বলিতে লাগিল,

‘হে ভারতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তর তটে

যেখানে কালের কোলাহল

প্রতিকূলে ডুবিছে অতলে

নিশ্চর সেই দিক্বীয়ে

তীর্থস্নান করি’

রাত্রির নিকর কক শিলাঘেরী মূলে

এলোচুলে করিছ প্রণাম

পরিশূণ সমান্তরে।

তখন মনে হইতে লাগিল, এ শুধু তাহার আবৃত্তি
করিয়া যাওয়া নয়। তাহার সমস্ত অস্তিত্বই যেন এই গুজ
শান্ত শেষ প্রণামের সহিত নিজেকে আনত করিয়া ধরিয়াছে।

যামিনী বসিয়া মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া
তরুণীর অন্নান হৃদয় যৌবনাকাশে কুমারী-জীবনের নির্মল
নীলিমা এখনও দিগন্তবিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে—কোথাও
এতটুকু ভাবের বাষ্প, বেদনার মেঘ আসিয়া ছায়া ফেলে
নাই। চোখের দৃষ্টি সহজ। গুজ হৃদয়ের লগাটে এখনও
অন্যহত প্রশান্তি। তাহার সমস্ত মনশানি যেন স্বচ্ছ দর্পণের
মত, অলোড়োণ্ডা বুড়িহীন শরতের আকাশের মত। সে-মনে

কোন বাসনা-বেদনা বিকার জন্মায় নাই। তাই সে বাহাই অভিনয় করিতেছে, তাহার স্পষ্ট সত্য প্রতিক্রম নিজেকে দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছে। অভিনয় শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী তাহাকে ডাকিয়া শ্রিতহস্তে একটুখানি আলাপ করিলেন। তাঁহারই দেওয়া একরাশি বই, সোনার মেডেল ও ফুলের ভায়ে নির্মলা যখন বিব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার শিথিল হস্ত হইতে দুই-একটা জিনিষ স্থলিত হইয়া এদিকে-ওদিকে পড়িয়া যাইতেছিল, তখন যামিনী পিছন হইতে নিঃশব্দে আসিয়া তাহার হাত হইতে জিনিষগুলো লইয়া কহিল, “চলুন। আপনার বাবা ট্যান্ড্রি ঠিক করে অনেক কণ থেকে দাঁড়িয়ে আছেন।”

দ্বারাস্তরাল হইতে চকলা তাহার সঙ্গিনীর গা টিপিয়া কহিল, “দেখলি, আমি সেই কালেই বলেছিলুম, There is something... (এর ভিতর কিছু আছে...)।

ভরলা কহিল, “কিন্তু তোরা যাই বলিস, নির্মলা যতটা সত্য সত্যতে চায়, আসলে ও তা নয়। ওর অনেকখানি পোজ (চং)।”

“নিশ্চয়।”

“তা কি আর আমরাও বুঝতে পারিনে!”

“আর তোরা যাই বলিস, নির্মলার চেয়ে যুথিকা ঢে ভাল আবৃত্তি করে।”

“আমারও তাই মনে হয়।”

“যুথিকার উচ্চারণগুলো খাটি ইংরেজী।”

“হবে না কেন? ওদের বাড়ির পাটিতে সাহেব-সুবে আসা প্রায়ই ত লেগে রয়েছে। তা ছাড়া যুথিকার দা ফি ইংরেজী টকিতে (সবাক ছায়াচিত্র প্রদর্শনে) ওকে নি যায়। একটাও বাদ দেয় না।”

ক্রমশঃ

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বাজা তোরা শাঁখ,
ধন্য হোক পঁচিশে বৈশাখ।
কোন সে আদিম উষা-চক্রবাল-তলে,
অনাদি শ্রীহৃন্দরের আনন্দের রসপদ্মদলে,
প্রথম সে মূর্তি নিল রূপে, গগনে অখণ্ড মহাকাল—
সৃষ্টির অনন্ত মহাস্বরে খণ্ডে খণ্ডে বেঁধে দিল তাল।
সেই তালে বন্দী হ'ল তিথিরূপে আনন্দহৃন্দর,
সে বন্ধন-গ্রন্থি হ'তে অরিল ঝবঝব,
ব্রহ্মের মানস-মধু-ধারা।
সারা সৃষ্টি চিত্তহারা
চাহিল উন্ননে,
কোন পুণ্যক্ষেত্রে—

সেই মধু-ধারা
রবিরূপে হ'ল মূর্তিধারা।
হেরেছিল তারে বিষ্ণুভূমিপদ্মদলে,
জন্মজন্মান্তর বহি কোটি মূর্তি ধরিল সে ছলে।
স্বপ্ননের নব ছন্দে গানে বহি এল যুগযুগান্তর,
গ্রহ হ'তে ফিরি গ্রহান্তরে চক্রে সূর্য্যে করিল হৃন্দর
হেরিলাম স্বর্গলোকে তারপর তমসার ভীরে,
তারোপরে অকস্মাৎ কালগর্ভচিরে,
বন্ধে রবি হইল উদয়,
চিরন্তন সৃষ্টির বিস্ময়।
বাজে তারি জয়শাঁখ,
পঁচিশে বৈশাখ।



নন্দলাল বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্পিনোজা ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁর তত্ত্ববিচারকে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যদি মিলিয়ে দেখা হয় তবে তাঁর রচনা আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রথম দলেই সমাজ তাকে নিধনভাবে তাগ করেছিল কিন্তু কঠিন হুবেও তাকে তিনি তাগ করেননি। সমস্ত জীবন সামান্য কয় পরসায় এর দিন চলত; ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই তাকে মোটা অঙ্কের পলন দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, সন্ত ছিল এই যে তাঁর একটি বই জার নামে উৎসর্গ করতে হবে। স্পিনোজা রাজি হলেন না। তার কোনো বন্ধু হুতুকালে আপন সম্পত্তি তাকে উইল করে দেন, সম্পত্তি তিনি গ্রহণ না করে দাতার হাঁকে দিয়ে দেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, আর তিনি যে মানুষ ছিলেন এ দুটোকে এক দোঁর মিলিয়ে দেখলে তাঁর সত্য সাধনার স্বার্থ স্বরূপটি পাওয়া যায়, বোঝা যায় কেবলমাত্র তাকিক বুদ্ধি থেকে তাঁর উদ্ভব নয়, তাঁর পূর্ণ স্বভাব থেকে তাঁর উপলব্ধি ও প্রকাশ।

শিল্পকলার রসসাহিত্যে মানুষের স্বভাবের সঙ্গে মানুষের রচনার খন্ড বোঝা যায়। সব সময় তাদের একত্র করে খবার সুযোগ পাউনে। যদি পাওয়া যায় তবে তাদের কল্পের কৃতিত্ব সত্যতা সথকে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হোতে পারে। স্বভাব-বকে স্বভাবশিল্পকে কেবল যে আমরা দেখি তাদের লেখায়, তাদের তের কাজে তা নয়, দেখা যায় তাদের বাবহারে তাদের দিনবারায়, দের জীবনের প্রাত্যহিক ভাবাণ্ডা ও ভঙ্গিতে।

চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর নাম আমাদের দেশের অনেকেরই জানা আছে। নিঃসন্দেহে আপনি আপন কৃতি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথাগত ধ্যান অনুসারে তাঁর ছবির বিচার অনেক অনেক রকম করে কেন। এরকম ক্ষেত্রে মনের একা কখনো সত্য হোতে পারে না, রত এতিকূলতাই অনেক সময়ের প্রেতাতার প্রমাণরূপে ঠাঁড়ায়। কিন্তু কত থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভাল করে জানবার সুযোগ মি পেয়েছি। এই সুযোগে যে-মানুষটি ছবি আঁকেন তাকে পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে গেছি। এই শ্রদ্ধায় যে দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গৌরবে প্রবেশ করে।

নন্দলালকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন চীনে আপন ভ্রমণ করতে গেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার ইংরেজ বন্ধু এলফ্রিড। নি বলেছিলেন, নন্দলালের সঙ্গে একটা এডুকেশন। তাঁর সেই খাটি একবারেই যথার্থ। নন্দলালের শিল্পদৃষ্টি অত্যন্ত খাটি, তাঁর চার-শক্তি অন্তর্দর্শী। একদল লোক আছে আর্টকে বারা কৃত্রিম গীতে সীমাবদ্ধ করে দেখতে না পারলে দিশেহারা হয়ে যায়। এরকম করে দেখা খোঁড়া মানুষের লাঠি ধরে চলার মত, ফটা বাঁধা বাহু আদর্শের উপর ভর দিয়ে নজির মিলিয়ে বিচার না। এই রকমের বাচাই-প্রাণী মুজিয়ম সাজানোর কাজে

লাগে। যে জিনিষ মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, তার সমস্ত পরিচয়কে নিঃশেষে সংগ্রহ করা সহজ, তাই বিশেষ ছাপ মেয়ে। তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। কিন্তু যে আর্ট অতীত ইতিহাসের স্মৃতিভাণ্ডারের নিশ্চল পদার্থ নয়, সজীব বর্তমানের সঙ্গে বার নাড়ির সঞ্চদ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের দিকে; সে চলছে, সে এগোচ্ছে, তার সন্ততির শেষ হয়নি, তার সত্তার পাকা দলিলে অচির স্বাক্ষর পড়ে নি। আর্টের রাজ্যে বারা সনাতনীর দল তারা সত্তার লক্ষ্য মিলিয়ে জীবিতের জঞ্জলে প্রাণবিভাগের বাতায়ন-হীন কবর তৈরি করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নয়, আর্ট তাঁর পক্ষে সজীব পদার্থ। তাকে তিনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেই জন্তই তাঁর সঙ্গে এডুকেশন। বারা ছাত্ররূপে তাঁর কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছে তাদের আদি ভাগাবান বলে মনে করি,—তাঁর এমন কোনো ছাত্র নেই এ কথা যে না অনুভব করেছে এবং স্বীকার না করে। এ সবকিছু তিনি তাঁর নিজের গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা আপন স্বভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে। ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাহিরের কোনো সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তিনি কখনোই করেন না; সেই শক্তিকে তাঁর নিজের পথে তিনি মুক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি কৃতকার্য হন যে হেতু তাঁর নিজের মধ্যেই সেই মুক্তি আছে।

কিছুদিন হোলো, বোম্বায়ে নন্দলাল তাঁর বর্তমান ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী গুলেছিলেন। সকলেই জানেন, সেখানে একটি স্থল অফ আর্টস আছে, এবং একখণ্ড বোম্বইয় অনেকের জানা আছে সেই স্থলের অনুবর্তীরা আমাদের এদিককার ছবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কোরে লেখালেপি কোরে আসছেন। তাঁদের নালিশ এই যে, আমাদের শিল্পশক্তি আমরা একটা পুরাতন চালের ভঙ্গিমা স্থলি করেছি, সে কেবল সস্তায় চোখ ভোলাবার স্বলী, বাস্তব সন্দোহের প্রাণ-বৈচিত্র্য তাঁর মধ্যে নেই। আমরা কাগজেপায়ে কোনো প্রতিবাহ করিনি,—ছবিগুলি দেখানো গোলো। এতদিন যা বলে তাঁরা বিজ্ঞপ কোরে এসেছেন, প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন তাঁর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রমাণ। দেখলেন বিচিত্র ছবি, তাতে বিচিত্র চিত্তের প্রকাশ, বিচিত্র হাতের ছাঁদে, তাতে না আছে সাধক কালের নকল না আছে আধুনিকের; তা ছাড়া কোনো ছবিতেই চলতি বাজারদরের প্রতি লক্ষ্য নাই নেই।

যে নবীতে প্রোত অঙ্গ সে জোড়া করে তোলে শৈবালবাসের বাহ, তাঁর সামনের পথ বার বন্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে বারা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাঙ্কণের বারা আপন অচল সীমা রচনা করে তোলে। তাদের কখনো প্রলোভনোত্তাপ গুল থাকতে পারে কিন্তু সে আর বাক ধেরে না, এগোতে চায় না, ভ্রম্যগত আপনানি নকল আপনি করতে থাকে, নিঃস্বেরই কৃতকর্ষ থেকে তাঁর নিরন্তর নিজের চুরি চলে।

আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড় বারা এই সীমা বন্ধ নন্দলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না আমি তা জানি। আপনানি মধ্যে তাঁর এই বিজ্ঞান কৃত্রিম দেখে আসছি। সর্বকর্তাই এই বিজ্ঞান

হৃষ্টশক্তির অন্তর্গত। বর্ষার্থ হৃষ্ট বাঁধা রাখার চলে না, প্রলয় শক্তি কেবলি তার পঞ্চ ভৈরব করতে থাকে। হৃষ্টকায়ো জীবনীশক্তির এই আস্থারতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ। কোনো একটা আড্ডার পৌঁছে আর চলবেন না, কেবল কেদারায় বসে পা দোলাবেন, তাঁর জাগানিধিতে তা গেলে না। যদি তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভবপর হতো তাহলে বাজারের তাঁর পসার জমে উঠত। যারা বাঁধা বরাদ্দকার তাদের বিচারবুদ্ধি অশল শক্তিতে গুটিতে বাঁধা। তাদের দর-বাচাট প্রণালী অভ্যন্ত আদর্শ মিলিয়ে। সেই আদর্শের বাইরে নিজের কুচক্ষে ছাড়া দিতে তারা ভয় পায়, তাদের ভাল লাগার পরিমাণ জনশ্রুতির পরিমাণের অমুসারী। আটিন্টের কাজ সম্বন্ধে জন-সাধারণের ভালো লাগার অভ্যাস জমে উঠতে সময় লাগে। একবার জমে উঠলে সেই ধারার অনুধর্মন করলে আটিন্টের আপদ থাকে না। কিন্তু যে আশ্ববিজ্ঞোই শিল্পী আপন তুলির অভ্যাসকে ক্ষণে ক্ষণে ভাঙতে থাকে আর যাই হোক, হাতে বাজারে তাকে বায়ে বায়ে ঠকতে হবে। তা হোক বাজারে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো তো ভালো নয়। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলাল সেই নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন, তাতে তাঁর লোকমান যদি হয় তো হোক। অমুক বই বা অমুক ছবি পণ্যস্ত লেখক বা শিল্পীর উৎকণ্ঠের সীমা—বাজারে এমন জনরব মাঝে মাঝে ওঠে, অনেক সময়ে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, লোকের অভ্যন্ত বগাদে বিশ্ব বচতে। সাধারণের অভ্যাসের বাধা জোগানবার হবার ভোক্ত সামলতে না পারলে সেই লোভে পাপ, পাপে বৃত্তা। আর যাই হোক সেই পাপলোভের আশঙ্কা নন্দলালের একেবারেই নেই। তাঁর লেখনী নিজের অত্যন্ত কালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রীর। বিশ্বহস্তির যাত্রাপথ তো সেই দিকেই, তার অভিসার অগ্রহীনের আস্থানে।

আটিন্টের স্বকায় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার চরিত্রে তার জীবনে। আমরা বারবার তার প্রমাণ পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাব। প্রথম দেখতে পাই আটের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নিলোভ নিষ্ঠা। বিশ্ববুদ্ধির দিকে যদি তাঁর আকাঙ্ক্ষার দোঁড় থাকত, তা হলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার স্বযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাক্ষ্যরাম-বাচাটইয়ের পরাক্রম ইন্দ্রদেব শিল্প সাবকদের তপস্কার সমুদ্রকণ্ঠে নুপুরনিকণের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শ সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেবী অর্ঘ্যের স্বদন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তির দেন। সেই মুক্তিলোকে বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই।

তাঁর সাপাত্তিক আভিজাত্যের আর একটি লক্ষণ দেখা যায় সে তাঁর আবির্ভাব। বহুরূপের অজ্ঞায় নিন্দাতেও তাঁর প্রসন্নতা ক্ষুর হয় নি তার দৃষ্টান্ত দেখেছি। যারা তাঁকে জানে এমনতরো ঘটনার তরায়ী দ্রুত পেয়েছে, কিন্তু তিনি অতি সহজেই ক্ষমা করতে পেরেছেন। এতে তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য প্রমাণ করে। তাঁর মন প্রাণ নয়। তাঁর সমাবদ্যার কারো প্রতি ধাঁধার অভ্যাস মনে তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায় নি। যাকে যার দেন সেটি চুকিয়ে দিতে গেলে নিজের বশে কম পড়বার আশঙ্কা কোনোদিন তাঁকে ছোটো হোতে দেয় নি। নিজের সম্বন্ধে ও পরের সম্বন্ধে তিনি সত্য; নিজেকে ঠকান না ও পরকে বঞ্চিত করেন না। এর থেকে দেখতে পেয়েছি নিজের রচনায় স্বৈর, নিজের স্বভাবও তিনি তেমনি শিল্পী, কৃষ্ণতার প্রতি স্বভাবতই কোথাও রাখতে চান না।

শিল্পী ও মানুষকে একর জড়িত করে আমি নন্দলালকে নিকটে দেখেছি। বুদ্ধি, জ্ঞান, নৈপুণ্য-অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এরকম

সমাবেশ অল্পই দেখা যায়। তাঁর ছাত্র, যারা তাঁর কাছে শিক্ষা পাচ্ছে, তারা একথা অস্বস্ত্য করে এবং তাঁর বন্ধু যারা তাঁকে অত্যন্ত সন্মানের ছোটো বড়ো নানান বাঁপারে বেষ্টে পায় তারা তাঁর উদ্যোগ ও চিন্তার গভীরতায় তাঁর প্রতি আর্ত। নিজের ও তাঁদের হয়ে এই কথাটি জানাবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এই লেখার প্রকাশ পেয়েছে। এরকম প্রশংসার তিনি কোনো অপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমরা নিজের মনে এর প্রেরণা অস্বস্ত্য করি।

বিচ্ছিন্ন—চৈত্র ১৩৪০

কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল

“বাঙ্গালা রামায়ণের আদি কবি কৃত্তিবাস কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন” তাহা লইয়া পণ্ডিত সমাজে যে “বাদামুবাণ” চলিতেছিল, বোধ হয় এই বার তাহা শেষ হইল। “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলিতেছেন যে, বাঁকুড়া ও হুগলী জিলার সীমানায় বদনগঞ্জে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি পুঁথি পাওয়া যায়—ইহা ১৪২৩ শকব্দে (১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে) নকল এবং ইহাও কৃত্তিবাসের আশ্ব-বিবরণ আছে।

“এই আশ্ব-বিবরণ দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়া সাধারণের পরিচি- হয়।

এই আশ্ব-বিবরণেই আছে—

আদিভাবার ঐশ্বক্য পূর্ণ মাঘ মাস।

তথি মধো জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।

ইহা অবলম্বন করিয়া রায় মহাশয় গণনা আরম্ভ করেন। ১৩২০ সনের পরিসং পত্রিকায় তিনি যে গণনার ফল প্রকাশিত করেন তাহাতে দেখা যায়, ১২৫৯ শকে ৩০শ মাঘ রবিবার ঐশ্বক্য পূর্ণ হইয়াছিল এবং ১৩৫৪ শকে ২৯ দিনে মাঘ মাস পূর্ণ হইয়াছিল এক ঐদিনও রবিবার ঐশ্বক্য পূর্ণ ছিল। নানা প্রমাণে তখনকার মতে ১৩৫৪ শকট (১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ) কৃত্তিবাসের জন্ম শক বলিয়া নির্দিষ্ট হইল।

কিন্তু এই নির্দ্ধারণে সমস্ত সন্দেহ মিটিল না। প্রধান আপত্তি আশ্ব-বিবরণ পড়িয়া পরিকার বুঝা যায়, যে গৌড়েশ্বরের সন্তায় বিদ্য সমাপনান্তে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই হিং রাজসভা। উহাতে একটিও মুসলমান কর্মচারীর বা মুসলমান আচার ব্যবহারের উল্লেখ নাই। বাঙ্গলার একমাত্র হিন্দু গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ ১৩৩৩ ও ১৩৪০ শকে সমগ্র বাঙ্গলায় প্রবল ছিলেন কাজেই রাজা গণেশের সন্তায় ২০ হইতে ৩০ বছর বয়সে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়া থাকিলে তাঁহার জন্ম শক ১৩০৯/১০ হইতে ১৩১৯/২০ শক হওয়া আবশ্যিক।

আর এক আপত্তি ‘পূর্ণ’ শব্দটিতে। প্রাচীন পুঁথি বাঁহারা যাঁটির থাকেন তাহারা জানেন, কোন কোন মাসকে ‘পূর্ণা’ বিশেষণে বিশেষিত করা প্রাচীন সাহিত্যের প্রথা ছিল এবং ‘পূর্ণা’ প্রাচীন পুঁথিতে সন্দেহ ‘পুর্ণ’রূপে লিখিত হয়। কাজেই গণনায় সফল মাত্র আদিভাবার এবং ঐশ্বক্য।

আমার এই সকল আপত্তি রায় মহাশয়কে জানাইলে তিনি আবার গণিতে বসিলেন। এইবার তিনি গণিয়া বাহির করিয়াছেন

১৩২০ শকে রবিবার দিন ঐশ্বর্যময়ী ও সরস্বতী পূজা হইয়াছিল। এই একেই কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এজ্ঞেই, যখন কৃত্তিবাস ১৯২০ বছরের নবযুবক, তখন তিনি বড় রঙ্গা অর্থাৎ মুল গঙ্গার (ভাগীরথীর নহে) তীরের রাঢ় দেশীয় গুরুগৃহে বিশাখ সমাপন করিয়া রাজপণ্ডিত হইবার আশায় পৌড়েশ্বরকে ভট্টতে চলিয়াছিলেন। রাজা গণেশ ১৩৩৯৪০ শকে (১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে) এই প্রতিভাশালী ক্লিয়্যার মুখটিকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করিলেন।”

মাস্তাজীর কি বই পড়ে ?

“মহাবিশ্ব বাঙ্গালী নভেল, নাটকই বেশীর ভাগ পড়ে” এবং অনেক মনে করেন যে “পাঠকগণ আপিসে হাড়ভাঙ্গা বাটিনির পর কেবলমাত্র সময় কাটাইবার ও চিন্তাবিনোদনের জন্ত পড়েন, কোনও প্রকৃতির বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা তাহাদের পক্ষে বিরক্তিকর” যথবা “বাটীর স্ত্রীলোকদের পাঠের সুবিধার জন্ত অনেকে বাবা হইয়া নাটক, নভেল লাইব্রেরী হইতে লইয়া যান”। “ক্লাইভ স্ট্রিট” গ্রন্থিকার ঐশ্বর্য চরিত্র গঙ্গাপাথায় মাস্তাজের মামারগুড়ি চলন্ত লাইব্রেরীর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

মামারগুড়ি হইতে ১২ মাইলের মধ্যে যে যে গ্রাম আছে, সেই গ্রামে যদি অল্পতরুণকে ১৬ জন পাঠক একত্র হইয়া একটি “গ্রামা কল্ল” স্থাপন করেন এবং তাহাদের মধ্যে তিন জন পুস্তক বিলি, ফরৎ লওয়া ও যন্ত্র লওয়ার ভার এবং হারাইয়া গেলে ক্ষতিপূরণের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই গ্রামে গরুর গাড়িতে করিয়া চলন্ত লাইব্রেরী উপস্থিত হইবে। গ্রামা কেন্দ্রের সভারা যে যে বই পড়িতে ইচ্ছা করেন সেই সেই বই লইতে পারেন। কাহাকেও কোন

প্রকার টাণ দিতে হইবে না, প্রত্যেকেই গ্রামা কেন্দ্রে বিলি করা সকল পুস্তকই পাঠ করিতে পারেন। এক মাসের মধ্যে পাঠ সমাধা করিতে হইবে, এবং এক মাস বাদে চলন্ত লাইব্রেরী উপস্থিত হইলে সেই সেই বইগুলি ফেরত দিতে হইবে।

চলন্ত লাইব্রেরীতে পুস্তকসংখ্যা ৩,৭৮২। এক বৎসরে যে যে সংখ্যক পুস্তক বিলি হইয়াছিল তাহার শ্রেণী বিভাগ সহ নিম্নে দেওয়া হইল।

ধর্ম	২৪৩	চিকিৎসা	৪০
জীবনী	২৩৪	রাজনীতি	৩৭
কুল পাঠ	১৪৮	স্বাস্থ্য	১৩১
ইতিহাস	৯২	সাময়িক পত্রিকা	১৭৩
কৃষি	৪৯	ভূগোল	৫৮
মাহিত্য	৫০	শাসন-সংস্কার	২৪
রামায়ণ ও মহাভারত			৩২
নভেল			১২৪
গল্প			১১২
উপদেশাবলী			৯১
প্রকৃতি পরি			২১
ইঙ্গাম			২৭

উপর উদ্ধৃত অঙ্কগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাস্তাজী গ্রামা পাঠকগণের মধ্যে নভেল বা গল্প পড়িবার আগ্রহ থাকিলেও বাঙ্গালা দেশের নবাবিশ্ব শ্রেণীর পাঠকগণের নাটক নভেল পড়িবার আগ্রহের জায় উৎকট নহে। তাহারা ধর্মসংক্রান্ত পুস্তক, রামায়ণ, মহাভারত যথেষ্ট পাঠ করেন। আজকাল যে বাঙ্গালীরা ক্রমাগত পিচ্ছাইয়া বাটতেছেন মনে হয় অধীত পুস্তক সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ রুচি তাহার অজুতম কারণ। সেকালের বাঙ্গালীরা আনন্দের জায় এত অধিক বাজে বই পড়িতেন না।

আর্থিক দুর্গতি মোচন

আইহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভারত-সরকার ও বাংলা-সরকার এদেশে আর্থিক দুর্গতি মোচনের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই। বিলাত হইতে দুইজন বিশেষজ্ঞ আনাইয়া ভারত-সরকার যে অরুসন্ধান আরম্ভ করাইয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি, সে-সম্বন্ধে ভারত-সরকারের কথা সে-দিন ব্যবস্থা-পরিষদে ব্যক্ত হইয়াছে :—

(১) উৎপন্ন দ্রব্যাদির হিসাব সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহের জন্ত সরকারের একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা ;

(২) উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব কিনা, সে-বিষয়ে মত প্রকাশ ;

(৩) জাতির আয় ও সম্পদ নির্ধারণ সম্বন্ধে যে-সব উপকরণ পাওয়া যায়, সে-সকলের আলোচনা ;

(৪) দ্রব্যের মূল্য, উৎপন্নদ্রব্য, পারিশ্রমিক প্রভৃতির হিসাবের পত্তন।

স্থূলের বিষয় বাংলা-সরকার পুনর্গঠনের কাণ্ডে যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার কাজ এইরূপ নহে।

তাহার কাজের প্রত্যক্ষ ফল পাইবার আশা করা যায়। এ-বিষয়ে সম্প্রতি বাংলা-সরকার যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে :—

বর্তমান অর্থনীতিক অবস্থায় পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা যে নশ্বর উপনীত হইয়াছে, তাহাতে সরকার শঙ্কিত হইয়াছেন এবং সেই জন্ত পল্লীগ্রামের অর্থনীতিক অবস্থার পুনর্গঠনভার একজন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে “ডেভেলপ-মেন্ট কমিশনার” নাম দিয়া একজন কর্মচারীকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি যে-সমস্তর সমাধানে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা নানা অংশে বিভক্ত এবং সেইজন্ত নানা বিভাগের সহিত তাহার সাক্ষাৎ আছে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে যে-যে কাজ আছে, সে সকল কোনরূপে বিচলিত করা হইবে না। কমিশনার যে কাজ করিবেন, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সহিত একযোগে কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য সাহায্যে সম্মিলিত ভাবে করা যায়, সেজন্ত যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিবেন।

এই ব্যবস্থার স্বীকা যে সম্প্রকাশ, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণ হিসাবে পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, সেচ প্রভৃতি বিবিধ বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য যদি বর্তমানে বাদ দেওয়া যায়, তবে যে অভিজ্ঞত ফললাভে বিলম্ব ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, কৃষিশিল্প ও বহু পরিমাণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। আবার সেচের দ্বারা যেমন কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তেমনই স্বাস্থ্যেরও উন্নতি সাধিত হয়। বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপের উল্লেখ করিয়া বাংলার গতপূর্ব আদমশুমারের বিবরণে লিখিত হইয়াছিল :—

“বৎসরের পর বৎসর জর লোকনাশ করিতেছে। প্রায় যদি সহস্র লোককে সংহার করে, তবে জর দশ সহস্র লোকের মৃত্যুর কারণ। জর যে কেবল মৃত্যুর দ্বারাই লোকসংখ্যা হ্রাস করে, তাহা নহে; পরন্তু সাধারণ জীবিত থাকে তাহা-দিগের জীবনীশক্তি ক্ষয় করে, উদ্যম ও প্রজ্ঞানশক্তির ক্ষতি করে, লোকের সাধারণ জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে বাধা জন্মায় এবং ব্যক্তিগত উন্নতির গতি প্রহত করে। বাংলার দারিদ্র্য ও অন্ত বহুরূপ দুর্দশার ইহাই অন্ততম প্রধান কারণ

বাঙ্গালীর উদ্যমহীনতার জন্তও ম্যালেরিয়া প্রধানতঃ দায়ী।”

ডাক্তার বেটলী সেচের ব্যবস্থা করিয়া ম্যালেরিয়ার নিবারণের উপায় করিতে বলিয়াছেন। সেজন্ত বাংলায় নদীনালা প্রভৃতির সংস্কার করিতে হইবে।

আবার পল্লীগ্রামের দুর্দশার জন্ত গ্রামে শিক্ষিত লোকের অভাবও অল্প দায়ী নহে। দেশের শিক্ষিত লোকেরাই অল্প লোককে আদর্শ ও উপদেশের দ্বারা উন্নতির পথ দেখাইয়া দিবেন।

এইরূপে নানা কারণের সমন্বয়ে যে সমস্তর উদ্ভব তাহা সমাধান সহজসাধ্য নহে। সহজসাধ্য নহে বলিয়াই এই কাণ্ডে সকলের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। এ কার্যের শেষ সাধাই কেন হউক না—ইহার আরম্ভ স্থির করাই দুরূহ। যে দুর্দশা বাংলার জলবায়ুতে দ্রুতবর্ধনশীল বটবৃক্ষের মত সমাজসৌভে তাহার সহস্র মূল প্রসারিত করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করিয়াছে, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করা যেমন দুরূহ, সে কার্য অসাধ্যমান ভাবে করিলে তাহাতে সমাজসৌভের সর্বনাশ সাধনের সম্ভাবনাও তেমনই প্রবল। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। ইহাকে অবহেলা করা যায় না; অবজ্ঞা কর অসম্ভব। কাজেই আরম্ভ করিতেই হইবে। সেই আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

বাধা আছে, কিন্তু উদ্যোগ ত্যাগ করিলে চলিবে না। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। বাংলার অনেক জলপথ ও প্রায় সব জলাশয় কচুরী পানায় পূর্ণ হইয়াছে—ইহাতে বাংলার লোকের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে; কোন কোন জলপথে নৌকাচালাচল বন্ধ হইয়াছে—কোন কোন নদীতে বা নালায় বর্ষার জল পতিত হইলে জল যখন কুল ছাপাইয়া যায়, তখন জলের সঙ্গে সঙ্গে পানারও ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, ফলে ধান নষ্ট হয়। কয় বৎসর ধরিয়া পানার দূর করিবার কথা আলোচিত হইতেছে—কল কিছুই হইতেছে না। পানার দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন জন্ত প্রথম যে সানিতি গঠিত হইয়াছিল, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাহার অন্ততঃ সঙ্গত ছিলেন। তিনি আমাদেরকে বলিয়াছিলেন—সাধারণ পানার দোষাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহাদিগের দ্বারা পানার দূর করানই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। গ্রামের লোককে পানিভ্রমি দিয়া যদি নালা, খাল, পুকুরগী পরিষ্কার করান যায়, তবে

তাহারা পারিশ্রমিক লাভ করে—পানাও যায়; এরোপ্লেন হইতে ঔষধ দিয়া পানা দূর করিবার কল্পনা কার্যে পরিণত করা যাইবে না। কেহ কেহ বলেন, পানা পরিষ্কার করিলে জাবার হইবে; স্বতঃপাৎ পরিষ্কার করিয়া লাভ কি? ইহা জলসের উক্ত। উড়িষ্যা দেখা গিয়াছে, যে-সব পুষ্করিণী হইতে পানা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, সেগুলি পরিষ্কারই আছে। কোন দেশই এরূপ বিপদে নিশ্চেষ্ট থাকে না। অষ্ট্রেলিয়ার গবেষণা-সমিতির গত বৎসরের যে কার্যবিবরণ তথায় পার্লামেন্টে পেশ হইয়াছে, আমরা তাহার এক খণ্ড পাইয়াছি। তাহাতে দেখিতে পাই, ঐ দেশে যে-সব উদ্ভিদ অনিষ্টকর ও বাড়িয়া যাইতেছে, সে-সকল নষ্ট করিবার জন্ত নানা উপায় পরীক্ষা করা হইতেছে—এমন কি যে-সব কীট-পতঙ্গ এই সব উদ্ভিদ নষ্ট করে বিদেশ হইতে তাহা আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। উগা হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

“Consignments of seven species of insects attacking St. John's wort have been received from abroad, and a number of some of them have already been liberated in the districts where the weed is a pest...In 1933, liberations were made in Queensland of a seedfly which attacks Noogoora burr.”

এদেশে আচার্য জগদীশচন্দ্র যে সহজ উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা করিলে স্বফল ফলিতে পারে; কারণ, এদেশে শ্রমিকের পারিশ্রমিক অল্প। এইরূপ কাণ্ড যে পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনকার্যে সহায় হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

সরকার যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে :—

কমিশনারকে যে-সব সমস্তার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে, সে-সকলের সংখ্যা অল্প নহে। পল্লীগ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধে নানা প্রস্তাবও বিচার করিতে হইবে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে, পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের স্বপ্নের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যাহাতে কৃষকের স্বপ্নভার লঘু হয় এবং কৃষিকার্যের জন্ত সে আবশ্যক অর্থ পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে তাঁহাকে নানা প্রস্তাব বিচার করিতে হইবে। সে-সব প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা গেল—

(১) যেচ্ছায় অর্থাৎ আইনের সাহায্য না লইয়া স্বয়ং মিটাইয়া লওয়া।

(২) বর্তমানে যে-স্বয়ং পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা মিটাইয়া লইতে বাধ্য করা অর্থাৎ সে-বিষয়ে আইন করা।

(৩) বাহাতে পল্লীগ্রামে লোক সহজে দেউলিয়া হইতে পারে, আইনে তাহার ব্যবস্থা করা।

(৪) কৃষক বাহাতে অমিতব্যয়ী হইয়া পুনরায় স্বয়ং হ্রাস পায়, তাহার ব্যবস্থা করা।

(৫) জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা।

(৬) কৃষকের যে টাকা প্রয়োজন হয় তাহার অধিকাংশ দিবার জন্ত স্বপ্নদান প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।

বলা বাহুল্য, এই সব ব্যবস্থা বিচারকালে বাংলার সমবায় অঙ্গঠানের অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে।

কৃষকে মহাজনের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার আবশ্যক অর্থ পাইবার সুবিধা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই সমবায় স্বপ্নদান সমিতিগুলি প্রবর্তিত হইয়াছিল। সেগুলির ফল যে আশারূপ হয় নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অল্পদিন পূর্বে এদেশে সমবায় সমিতিসমূহের প্রতিনিধিদিগের যে সম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছে, জার্মান যুদ্ধের সময় হইতে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের যে অবনতি আরম্ভ হইয়াছে তাহা নিবারণ করা যায় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ যাহাই কেন হউক না, এই অবনতির নিদান নির্ণয় করিতে হইবে। বিশেষ নূতন যে-সব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সে-সকল সমবায় নীতিতে গঠিত করাই প্রয়োজন হইবে।

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এ-বিষয়ে যে তৎপরতা দেখা গিয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। প্রথমে পাঁচটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। ময়মনসিংহ প্রথমটির উদ্বোধনকার্য সম্পন্ন করিবার সময় মন্ত্রী তাহার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। এবার বাকী ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা-সরকারের যে বজেট পেশ হইয়াছে তাহাতে এই বাবদে ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ইহা কেবল ব্যাঙ্কের কর্মচারী প্রভৃতির বেতনের জন্ত। মন্ত্রীর উদ্ভিষ্টে প্রকাশ—

“ডিবেঞ্চার” স্বয়ং করিয়া এই-সব ব্যাঙ্কের মূলধন সংগৃহীত হইবে এবং যত দিনের জন্ত স্বয়ং গৃহীত হইবে, ততদিনের জ

সরকার ঐ টাকা সরকার হস্তের জন্ত জামিন থাকিবেন। বর্তমানে ঋণদান সম্বন্ধে সমিতিগুলি যেভাবে সভাদিগকে ঋণ দিয়া থাকে, তাহাতে কৃষকের কৃষিকাৰ্য্যের জন্ত প্রয়োজন টাকা পাওয়া গেলেও তাহার অল্প ঋণ শোধের উপায় হয় না—এমন কি জমির উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় না। সেজন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালে পরিশোধ করা যায়, এমন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই-সব ব্যাঙ্কে তাহাই হইবে। মন্ত্রী বলিয়াছেন—এইরূপে দীর্ঘকাল মেয়াদে যে-সব ঋণ প্রদান করা হইবে, কিছু দিন তাহা পূৰ্ণ ঋণ ও জমি বন্ধক দিয়া গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতেই প্রবৃত্ত হইবে। জমির ও চাষের উন্নতিসাধন, জমিক্রয় প্রভৃতি ব্যবস্থা-বিষয় পরে বিবেচিত হইবে। এইরূপ ব্যাঙ্ক পরিচালিত করিয়া অগ্রাংশ দেশে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার করা যে প্রয়োজন হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যদি আইনের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই মহাজনের সহিত খাতকের ব্যবস্থায় ঋণ মিটাইবার উপায় হয়, তবে তাহাই যে অভিজ্ঞত তাহাতে দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু সেরূপ কাজের জন্ত কোন কৰ্মচাৰী বা কোন সমিতির মধ্যস্থতা অবশ্যই প্রয়োজন হইবে।

এ-বিষয়ে যত শীঘ্র কাজ আরম্ভ হয়, ততই ভাল; কারণ বর্তমান ব্যবস্থা-মন্দের সময় মহাজন স্বভাবতই প্রাপ্য টাকা কতকটা বাদ দিয়াও লইতে আগ্রহী। কিন্তু আইন করিবার প্রয়োজন যে অভিক্রম করা যাইবে, এমন মনে হয় না। বরং আইন থাকিলে মহাজনের মিটাইয়া লইবার আগ্রহ হইবে।

ঋণভার লঘু হইলে কৃষক বাহাতে আবার অমিতব্যয়ী হইয়া ঋণ না করে, সে ব্যবস্থার ভিত্তি—শিক্ষা। কিভাবে তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে—কিভাবে সেজন্য প্রচারকাৰ্য্য পরিচালিত করিতে হইবে, তাহা বিবেচনার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি অহুতানের উল্লেখ করিতে পারি। অল্পদিন পূৰ্বে বাংলা-সরকার শোককে স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে একখানি মেটরবাস সজ্জিত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহাতে ছবি দেখাইবার ব্যবস্থাও আছে। পল্লী প্রদেশে এখন বেতারের সাহায্যে লোককে শিক্ষা ও উপদেশ দিবার প্রচেষ্টা বিবেচিত হইতেছে।

বাংলায় এখন সেরূপ ব্যবস্থা হয়ত সম্ভব হইবে না। কিন্তু গ্রামে গ্রামে যদি চলচ্চিত্র সহযোগে বা এইরূপ যানের সাহায্যে প্রচারকাৰ্য্য পরিচালিত হয়, তবে তাহাতে সহজে সফল ফলিতে পারে।

ইহাতে নানা বিভাগের কাজ হইতে পারে। বাংলার শিল্পবিভাগ ইতোমধ্যেই মফস্বলে শহরে শিক্ষকদল পাঠাইয়া কতকগুলি শিল্পের উন্নত পদ্ধতি শিখাইতেছেন। বাহাতে লোক সে-সকলের সংবাদ পায় ও সে-সকলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহা এইরূপ যানের দ্বারা করা যায়। প্রধানতঃ বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা সমাধানকল্পে এই-সব শিল্পশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কাব্য-ক্ষেত্র প্রসারিত করা সহজসাধ্য। প্রথমে যাহারা সন্দেহ করিয়াছিলেন, ভয় সম্প্রদায়ের যুবকরা কায়িক শ্রমবিমুখ বলিয়া শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে চাহিবে না তাহাদিগের সে সন্দেহের আর অবকাশ নাই। এখন দেখা যাইতেছে, যুবকরা যেমন “হাতে হাতীয়ারে” কাজ করিতে আগ্রহী, তাহাদিগের অভিভাবকরাও তেমনি তাহাদিগকে এ-বিষয়ে উৎসাহ দিতে প্রস্তুত; দেখা যাইতেছে, যুবকরা শিক্ষালাভ করিলে অভিভাবকরা তাহাদিগকে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত আবশ্যক মূলধন প্রদান করিতেছেন। ইহার মধ্যেই শিক্ষালাভ করিয়া যুবকরা নানা স্থানে আপনারা কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও করিতেছে এবং যে-সব কারখানা আছে অনেকে সেইগুলিতে চাকরি পাইতেছে।

বাহারা এইরূপে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহারা বাহাতে সরকারের কাছে ঋণহিসাবে অর্থসাহায্য পাইতে পারে, সেজন্য আইন হইয়াছে। কিন্তু আইন বিধিবদ্ধ হইলেও অর্থাভাবে সাহায্যদান সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য বিভাগের ভায়প্রাপ্ত মন্ত্রী, এঞ্জিনিয়ার ও বাহিরের কয় জন ভ্রমলোক টাকা দিয়া একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার পর বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভা স্থির করিয়া দিয়াছেন, এই কাৰ্য্যের জন্ত সরকার জামিন হইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় হইতে দিতে পারিবেন। ঋণ হিসাবে আরও টাকা দিবার ব্যবস্থাও এবার হইতেছে। কাজেই আশা করা যায়, এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাৰ্য্য অগ্রসর হইবে। পল্লীগ্রামেও এই-সব শিল্প অনামলে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে

বং তাহাতে পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনকার্য সহজে সম্পন্ন হবে—অন্ততঃ সে-কার্যে সাহায্য হইবে।

সরকারী বিবৃতির শেষাংশে লিখিত হইয়াছে :—

কমিশনারকে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা রিতে হইবে। বাংলার যে-সব অঞ্চল লোকশূন্য ও শ্রীহীন হইতেছে, সে-সব অঞ্চলে বস্তার জলে সেচ ব্যবস্থা করিলে ঐহাতে বস্তার জল জমিতে যায় তাহা করিলে উপকার-প্রাপ্তি আছে। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ও পরবর্তী সেচের লের আয়ের বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে।

পলিপূর্ণ বস্তার জল জমিতে আসিলে যে জমির উর্বরতা দ্বিত হয় এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপও প্রশমিত হয়, তাহা ক দিকে যেমন ভাক্তার বেটলী, অপর দিকে তেমনই সেচ-যেয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রুর উইলিয়ম উইলকিন্স দৃঢ়তা সহকারে লিয়া গিয়াছেন। শ্রুর উইলিয়ম মিশরে এইরূপ ব্যবস্থার রা অসাধ্য সাধন করিয়া অক্ষয় যশ অর্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরিণত বয়সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাংলার বস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—জমিতে বস্তার ল প্রবেশ বন্ধ হওয়াতেই পশ্চিম-বঙ্গের দুর্দশা ঘটিয়াছে। খণ্ডলি এই দুর্দশা আরও দ্রুত করিতেছে। কি পায় অবলম্বন করিলে ইহার প্রতিকার হয়, তিনি াহাও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তখন তাঁহার পদেশ গৃহীত হয় নাই। কিন্তু এখন সেচের প্রয়োজন ও পযোগিতা উপলব্ধ হইতেছে। কিরূপে বস্তার জল জমিতে ্রবেশ করান যায়, তাহার বিষয় বিবেচিত হইবে জানিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

আমাদিগের মনে হয়, আজ যখন নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইতেছে, যখন বাংলার শ্রীহীন পল্লীগ্রামকে শ্রীসম্পন্ন করিবার— াংলার দুর্দশা দূর করিবার উপায় আলোচিত হইতেছে, পন যদি পুনর্গঠন-কর্মচারী শ্রুর উইলিয়ম উইলকিন্সের ণ্ডাবটি পরীক্ষা করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিবার কথা লেন, তবে কৃষি, স্বাস্থ্য ও সেচ তিন বিভাগই তাঁহাকে হায্য করিতে অগ্রসর হইবেন। এতদিন এই পথে ারাট বাধা ছিল—অর্থাত্বে। এবার সে বাধা দূর হইবার াবনা লক্ষিত হইতেছে। মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্থার বর্তনাবধি বাংলা-সরকারের আর্থিক দুর্গতির অন্ত ছিল না।

বাংলার জনমত ও বাংলা-সরকার উভয়েই সেই জন্ত বলিয়া আসিয়াছেন—

(১) পাটের উপর যে রপ্তানি-শুল্ক আদায় হয়, তাহার সব টাকা বাংলার প্রাপ্য; সে টাকা বাংলাকে প্রদান করা হউক;

(২) বাংলায় যত টাকা আয়কর হিসাবে আদায় হয়, তত টাকা আর কোন প্রদেশে আদায় হয় না; সে টাকার কতকাংশও বাংলার প্রাপ্য।

দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে পার্লামেন্ট প্রস্তাব করিয়াছেন, —পাটের উপর রপ্তানি-শুল্কের আয়ের অর্দ্ধাংশ পাট-উৎপাদনকারী প্রদেশগুলিকে যথাযথভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে এবং সেই জন্তই পার্লামেন্ট বাংলার আয়ে তাহার ব্যয় সঙ্কলন হইবে, ধরিয়া লইয়াছেন। এবার ভারত-সরকার সেই হিসাবে বাংলাকে তাহার প্রাপ্য ঐ টাকার অর্দ্ধাংশ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। ফলে বাংলা এবার আর পূর্ববৎ আর্থিক দুর্গতি দুঃখ ভোগ করিবে না। অতঃপর বাংলা উৎপাদক কাজের জন্ত ঋণগ্রহণ করিতেও পারিবে। বলা বাহুল্য, ঐহাতে পাটের শুল্কের সব টাকাই বাংলা পায়, সেজন্ত এখনও আন্দোলন পরিচালিত করিতে হইবে এবং আয়করের কতকাংশও পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সে-বিষয় আজ আমাদের আলোচ্য নহে। আজ আমরা বাংলার আর্থিক দুর্গতি মোচনের স্থায়ী উপায়ের কথাই বলিতেছি।

বাংলার অর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে অহুসন্ধান দ্বন্দ্ব যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার সদস্যদিগের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সরকারের নির্দিষ্ট বিষয়ে অহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। সরকার তাঁহাদিগকে কোন কোন বিষয়ে অহুসন্ধান করিতে বলিবেন, তাহাও কমিশনার স্থির করিয়া দিবেন। কমিশনার কোন বিশেষ বিভাগের অধীন থাকিবেন না, পরন্তু লাটপরিষদের আর্থিক সমিতির সভাপতির অধীনে কাজ করিবেন। গভর্নর, তাঁহার শাসন-পরিষদের সদস্যগণ ও মন্ত্রীগণ—এই কয়জনে বাংলার গভর্নরের পরিষদ গঠিত। ইহার মধ্যে তিন জনকে লইয়া আর্থিক সমিতি। পরিষদের সর্কোপেক্ষা পুরাতন সদস্য স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, অর্থসচিব এবং কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই কয়জন এই সমিতির সদস্য ছিলেন। স্যর প্রভাসচন্দ্র

মৃত্যুতে যিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন তিনিই, তাঁহার মত, এই সমিতির সভাপতি হইবেন কি-না, তাহা আমরা জানি না। প্রভাসচন্দ্র বিষয়টি বিশেষ ব্যঙ্গস্বরে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই জন্ত তাঁহার মৃত্যুতে এই কার্যে কিছু বিঘ্ন ঘটয়াছে, বলিতে হইবে। আমরা আশা করি, এখন যিনি সমিতির সভাপতি হইবেন, তিনি এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে আবশ্যক মনোযোগ দিবেন। কারণ, বাংলার পল্লী-গ্রামের দুর্দশা দূর না হইলে বাংলার উন্নতি অসম্ভব।

অর্থনৈতিক অসুসন্ধান জন্ত বাংলায় যে বোর্ড বা সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে পরামর্শ হিসাবেও যে উল্লেখযোগ্য কিছু পাইবার আশা আছে, তাহা মনে হয় না। নানা সম্প্রদায়ের ও নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া যে সমিতি গঠিত হয়, তাহার সদস্যরা যে অনেক সময় কোন বিষয়ে একমত হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ সম্প্রতি পাট-কমিটির রিপোর্টে পাওয়া গিয়াছে। বোর্ডের সভারা কেহ কেহ বাঙালী নহেন—বাংলার আর্থিক অবস্থার সহিত তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই; কেহ কেহ এই বিষয়ে কখন মন দেন নাই। তথাপি যদি বোর্ড তাঁহাদিগের নির্দিষ্ট কার্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন, আমরা তাহা ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিব।

কাজ কমিশনারকেই করিতে হইবে। আর তাঁহার কাজ করিবার উৎসাহ ও দক্ষতার উপর সরকারের এই প্রশংসনীয় চেষ্টার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। যে বক্তৃতায় বাংলার গভর্ণর এই চেষ্টার কথা প্রথম উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কার্যের বিরাট ও জটিলতা বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, এ-কাজ এক। সরকারের নহে এবং ইহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে সমাজের সকল উৎকৃষ্ট অংশকে ইহাতে প্রযুক্ত করিতে হইবে। আমরা আশা করি, দেশের লোক উপদেশ ও সহযোগ দিয়া এই কাজ সম্পূর্ণ করিতে সহায় হইবেন।

বাংলার পল্লীগ্রামের ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনের উপায় যিনি বাহা চিন্তা করিয়াছেন, তাহা কমিশনারকে জানাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—তাহা এইবার কার্যে পরিণত হইতে পারে। আর গ্রামে কোন কাজ আরম্ভ হইলে তাহার সাফল্য সম্বন্ধে আবশ্যক সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বিধারে গওক নদীর বাধ মেরামত করিবার জন্ত যেমন সরকারী কক্ষচারী ও বে-সরকারী লোক, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলে একযোগে কাজ করিয়া কাজ সফল করিতে হইলে কি করিতে হয় তাহা দেখাইয়াছেন, তেমনই এ কাজে বাঙালী মাত্রেরই অগ্রসর হইয়া সোংসাং কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। লোকের আন্তরিক উৎসাহই সরকারের কাষে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

আজ বহুদিন পরে শ্রীহীন বাংলাকে পুনরায় শ্রীসম্পন্ন করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, যেন সহসা বহুশ্রোত নদীতে বন্যার জল প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে। আজ যে সুযোগ আসিয়াছে, তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার বাঙালীকেই করিতে হইবে; বুঝিতে হইবে—ঘে-টাকা ব্যয়িত হইবে তাহা যেমন বাঙালীর, যে উপকার হইবে তাহাও তেমনই বাঙালীর—এই পুরাতন পরিচিত বাংলায় শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন, ব্যবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে ও হইবে—কিন্তু ইহার অধিকারী হইয়া থাকিবে—বাঙালী; সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, রোগে-সম্মোহে, প্রাচুর্যে-অভাবে—বাঙালীর সম্বল এই বাংলা।

বাংলার ও বাঙালীর উন্নতির চেষ্টা বাঙালীকেই করিতে হইবে—নহিলে সে চেষ্টা কখনও সফল হইবে না। তাই আমরা আশা করি, আজ যে-চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীর সাহায্যে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে—বাংলা আবার তাহার পূর্বরূপ করিয়া পাইবে।

পোয়ে নৃত্য



পোয়ে নৃত্য

ব্রহ্মদেশের একরকম লোকনৃত্যকে ‘পোয়ে নৃত্য’ বলে।

পোয়ে নৃত্যে সাধারণতঃ দুইটি মেয়ে, দুইটি অভিনেতা ও কয়েকটি বাদ্যকর থাকে। প্রথমে একটি মেয়ে নৃত্য করে। পরে অভিনেতার হাঙ্গি-ভাঙ্গাসার কথা বলিয়া আসার জমায়। অতঃপর দ্বিতীয় মেয়েটি আসরে অবতীর্ণ হয়। এই রূপে এক একটি মেয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা নৃত্য করে। অভিনেতাদের ভাষা বুঝা যায় না বটে কিন্তু তাহাদের ভাবভঙ্গী বেশ কৌতুকপ্রদ।

নর্তকীদের মাথার চুল মুকুটের মত করিয়া বাঁধা। সেই চুলের গায়ে বোলে ফুলের মালা। ইহারা যিন্মকিনে পাতলা আঙ্গুর কোট পরে, গলায় পরে নানা রঙের জরি, কাচ, সাজের মালা ও হার। রাত্রির আলোতে এই সব স্বকৃমকৃ করে। ইহাদের পরণে রঙীন রকমার লুঙ্গী। পায়ে যোজা, তাহার উপর সোনার একগাছি করিয়া মল।

নৃত্যকালের বাদ্য বড়ই মনোরম—তাল লয় সংবদ্ধ। তিমিরবরণের বাদ্য বাঁহারা শুনিয়াছেন তাহাদের পক্ষে এই বাদ্য কত উচ্চাঙ্গের তাহা বুঝা কঠিন নয়। তাল মান জ্ঞানে ইহারা সত্যই উন্নত। অথচ ইহারা মূর্খ, নিরক্ষর।

পোয়ে নৃত্য কতকটা আমাদের দেশের যাত্রার মত। ধনীরা এই নৃত্যের আয়োজন করিয়া থাকেন। ধনীদেব বাড়ির চত্বরে বা বাহিরে রাডায় একটি স্থানে মঞ্চ তৈরি হয়। সেখানে নৃত্য ও অভিনয় হয়। ধনী-দরিদ্র, পাড়া-প্রান্তবেশী সকলেই মঞ্চের চারিদিকে সমবেত হইয়া ইহা দর্শন করে।

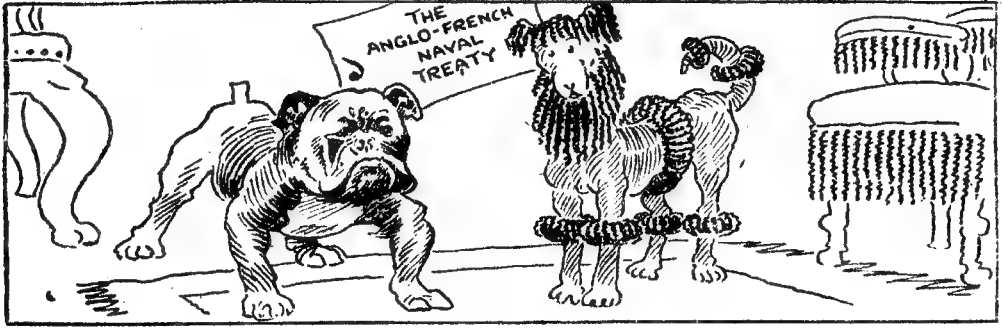
ব্রহ্ম-সরকার এই পোয়ে নৃত্যের পোষকতা করিয়া থাকেন। লাটের বাড়িতে, স্কুল-কলেজে, বিখবিদ্যালয়ে এই নৃত্য হয়। সাধারণের আমোদ-প্রমোদের জন্ত রেভিনিউ কর্পোরেশন প্রতি সপ্তাহে পোয়ে নৃত্যের আয়োজন করিয়া থাকেন।

প্রসিদ্ধ নর্তকী পাতলোভা তাহার পুত্রকে পোয়ে নৃত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। নৃত্যকলাবিশারদ উদয়শঙ্করের এই নৃত্য এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি ইহার অঙ্করণে একবার নৃত্য করিয়াছিলেন।

পোয়ে নৃত্যে মিঞা তান জি ও মা তান জি ইদানীং বেশ নাম করিয়াছেন। ইহাদের দলের নাম “ভাঙ্গিট টুপ” (Varsity Troup)—মিঞা তান জি ইহার প্রধান নর্তকী। মিঞা তান জির নৃত্যে ব্রহ্মদেশের আবালবৃদ্ধবিনিতা মুগ্ধ।

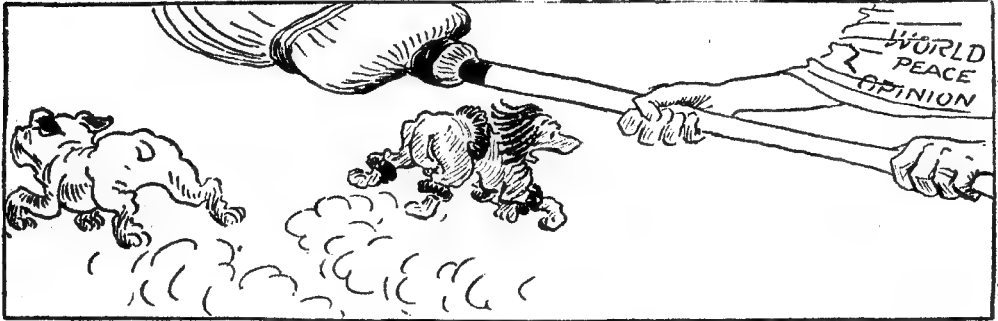
আমেরিকার চোখে ইউরোপ

ভূভাগ্যকর আন্তর্জাতিক বিবাহ !



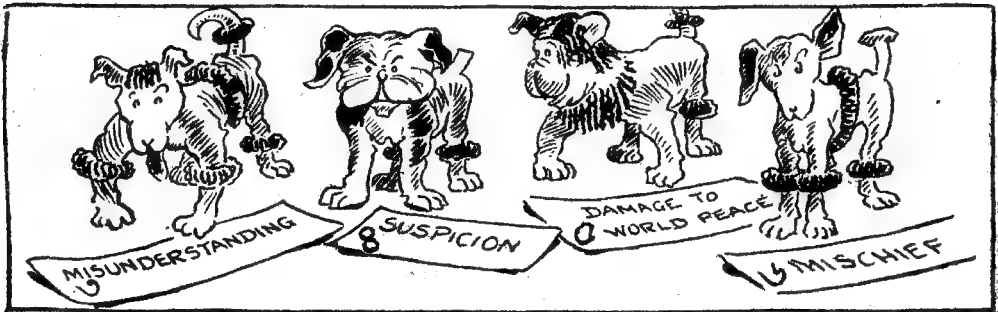
বিবাহিত।

১। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে জলযুদ্ধ ও রণতরী সম্বন্ধে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাকে আমেরিকান ব্যঙ্গচিত্রকর বিবাহ বলিয়াছেন।



বিবাহ বিচ্ছিন্ন।

২। পৃথিবীব্যাপী শান্তিপ্রবণ মতের গোটে ইঙ্গ-ফরাসী বিবাহ টিকিল না।



কুফল।

৩। পরস্পরকে ভুল বুঝা। ৪। সন্দেহ। ৫। জগতের শান্তির ক্ষতি। ৬। অনর্থ।



নেতৃত্বের জন্য ঝগড়া !

- ৭। বৃহৎ জাতিসমূহ।
- ৮। ক্ষুদ্র জাতিসমূহ।
- ৯। পৃথিবীর ভাগ্য।
- ১০। লীগ অব নেশন্স বা জাতি-সংঘ।
- ১১। ইউটোপিয়ার বা কাল্পনিক-আনন্দময় দেশের অভিমুখে।

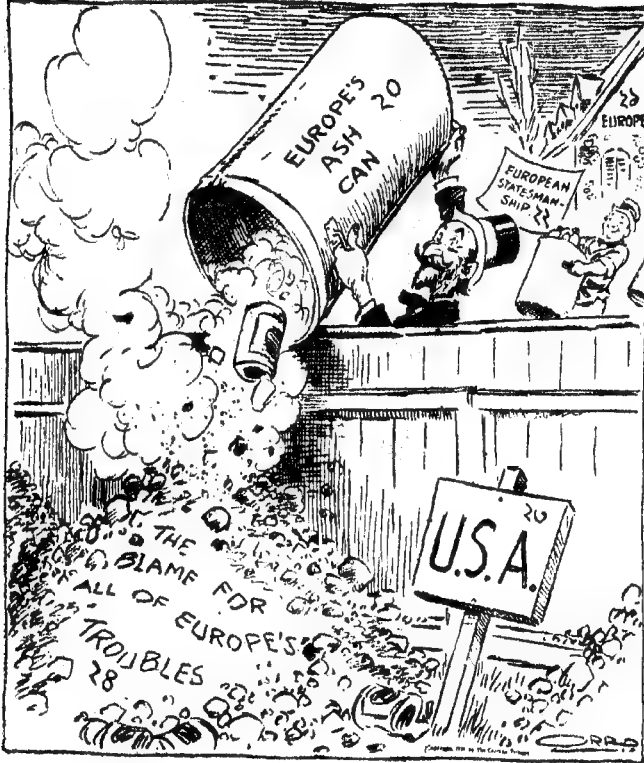
মানবজাতিকে ইউটোপিয়ায় লইয়া
যাইবে কে, তাহা লইয়া
ঝগড়া !

আরও কঁপিতেছে !

- ১২। মুসোলিনীর ক্ষমতার বিস্তার।
- ১৩। ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল।
- ১৪। সিংহাসন।
- ১৫। রাজনৈতিক দলসমূহ দলন।
- ১৬। সংবাদপত্র দমন।
- ১৭। বক্তৃতার স্বাধীনতা লোপ।
- ১৮। সভা করিয়া সমবেত হইবার অধিকার লোপ।
- ১৯। ধর্ম বিষয়ক স্বাধীনতার ব্যাঘাত উৎপাদন।



আমেরিকা ইউরোপের আস্তাকুড় !



- ২০। ইউরোপের আবর্জনার পাত্র
উজাড়।
- ২১। ইউরোপ।
- ২২। ইউরোপীয় রাজনীতি-
কোশল।
- ২৩। আমেরিকার ইউনাইটেড-
ষ্টেটস।
- ২৪। ইউরোপের সব ব্যক্তাদের
বাহ্য মূলভূত।

এই ছবিতে এই ব্যঙ্গ করা হইতেছে যে, ইউরোপের সব উদ্ভা লোক ও অল্প আবর্জনা আমেরিকায় ঢালিয়া দেওয়াই ইউরোপের রাজনীতিকোশল! তাহারাই নাকি ইউরোপের সব অনর্থের মূল।

এই ছয়খানি ছবিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে, লীগ অব নেশন্সের সভ্য বড় ও ছোট জাতিসমূহকে, মুসোলিনীকে, এবং সমগ্র ইউরোপকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। এগুলি আমেরিকার সংবাদপত্র হইতে গৃহীত।

কেবল মুসোলিনীই যে অল্প সকলের সব রকমের স্বাধীনতা লোপ করিতেছে, তাহা নহে। ইউরোপে ও এশিয়ায় অল্প অনেক স্বাধীনতাশত্রু স্বদেশে বা বিদেশে এইরূপ চক্রান্ত করিতেছে।

“মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

— গত ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসী পত্রিকার রবীন্দ্রনাথ মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা বিষয়ে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন তাহারই লোচনা করিয়া জনৈক মুসলমান পত্রলেখক কথিকে একটি চিঠি ন। নিম্নলিখিত পত্রট তাহারই উত্তর স্বরূপে লিখিত। পত্রলেখকের দ্বা কি ছিল তাহা জানিলে কবির উত্তরটি বুঝিবার পক্ষে অধিকতর বদা হইবে এই জন্ত তাহার চিঠি হইতেই কয়েকটি পংক্তি তুলিয়া তেছি।

“বাংলার মুসলমান যেদিন হতে বৃথতে পেরেছে বাংলা তার নিজের সা সে-দিন হতে সে তার ভাষায় নিজের হামেশা বোলচালের একটা শব্দ ক্রমশঃ আব্রজরব করে নিজে।”

“মুসলমান ঘরে ‘মাক্কে’ ‘আম্মা’ বলে। লিখতে বসে ঠিক ‘আম্মা’ বললে তার মা ডাকার সাধ মেটে না। প্রাণের ভাষাকে কলম যদি লে না করে তর্জমা করতে হয় করে তবে অচিরে সাহিত্যে একটা টোড়া ভাষার অভিনয় মাত্র হবে।”

ও

বিনয় নিবেদন,

সর্বপ্রথমে বলে রাখি আমার স্বভাবে এবং ব্যবহারে মুসলমানের দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি মান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত শ্রেণীর অগৌরব বলে মনে করে থাকি।

ভাষা মাত্রেই একটা ইতিহাসমূলক মজাগত স্বভাব আছে, তাকে না মানলে চলে না। স্কটল্যান্ডের ও ওয়েলসের গাকে সাধারণত আপন ঘরে ঘরে স্বজন পরিজনের মধ্যে মিলই যে সব শব্দ ব্যবহার করে তাকে তারা ইংরেজী ভাষার মধ্যে চালাবার চেষ্টা মাত্র করে না। কেননা, তারা ই সহজ কথাটি মেনে নিয়েছে যে, যদি তারা নিজেদের ভাষা প্রাদেশিকতা ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে চালাতে চায় হইলে ভাষাকে বিকৃত ও সাহিত্যকে উচ্ছৃঙ্খল করে লাবে। কখনো কখনো ববুল (Burns) প্রভৃতি বিখ্যাত স্কট লোক কথন কবিতা লিখেছেন তখন সেটাকে স্পষ্টত স্বচ বারই নমুনাক্রমে স্বীকার করেছেন। অথচ স্কট ও ওয়েলস্ যন্ত্রের সঙ্গে এক দেশের অন্তর্গত।

আরল্যান্ডে একদা আইরিশে ব্রিটিশে “ব্ল্যাক্‌ গ্যাণ্ড ট্যাক্‌”

নামক বীভৎস খুনোখুনি ব্যাপার চলেছিল, কিন্তু সেই হিংস্রতার উত্তেজনা ইংরেজী ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে নি। ওয়েলসবাসী ও আইরিশরা অনেকে সৈন্যদল ব্যবহারের জন্ত এখন তাঁদের প্রাচীন কেল্টিক্‌ ভাষা অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের কবি ও লেখকেরা তাঁদের রচনায় যে ইংরেজী ব্যবহার করেন সে অবিমিশ্র ইংরেজী। তাঁদের লিখিত ইংরেজীর মধ্যে পারিবারিক বা প্রাদেশিক ভাষার শব্দ আরোপ করবার চেষ্টা মাত্র তাঁরা করেন নি। এ থেকে ঐ সকল জাতির সভ্য মনোভাবেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই।

আজকের বাংলা ভাষা যদি বাঙালী মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্টরূপে ও সহজভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে তাঁরা বাংলা পরিত্যাগ করে উর্দু গ্রহণ করতে পারেন। সেটা বাঙালী জাতির পক্ষে বড়ই দুঃখকর হোক না, বাংলা ভাষার মূল স্বরূপকে দুর্ব্যবহারের দ্বারা নিগীড়িত করলে সেটা আরো বেশি শোচনীয় হবে।

ইংরেজীতে সহজেই বিস্তর ভারতীয় ভাষার শব্দ চলে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত jungle—সেই অজুহাতে বলা চলে না, তাই যদি হ’ল তবে কেন “অরণ্য” শব্দ চালাব না। ভাষা খামখেয়ালি। তার শব্দনির্বাচন নিয়ে কথা কাটাকাটি করা বৃথা।

বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পাসি আরবি শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কুজ্জিম জেমের কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু যে-সব পাসি আরবি শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত, অথবা হঠাত কোনো এক জেলীর মধ্যে বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হতা অর্থে খুন ব্যবহার করলে বেখাপ হয় না; বাংলার সর্বজনীন ভাষায় সেটা বেমানাম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলে নি, তা নিয়ে তর্ক করা নিফল।

উর্দু ভাষায় পারসি আরবি শব্দের সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃত

শব্দের মিশোল চলেছে—কিন্তু স্বভাবতই তার একটা মীমা আছে। কোনো পণ্ডিতও উর্দু লেখার কালে উর্দুই লেখেন। তার মধ্যে যদি তিনি “অপ্রতিহত প্রভাবে” শব্দ চালাতে চান তাহলে সেটা হাস্যকর বা শোকাবহ হবেই।

আমাদের গণশ্রেণীর মধ্যে যুরেশিয়েরাও গণ্য। তাঁদের মধ্যে বাংলা লেখায় যদি কেউ প্রবৃত্ত হন এবং বাবা মা শব্দের বদলে পাপা মামা ব্যবহার করতে চান এবং তর্ক করেন, ঘরে আমরা ঐ কথাই ব্যবহার করে থাকি, তবে সে তর্ককে কি মুক্তিসঙ্গত বলব? অথচ তাঁদেরকেও অর্থাৎ বাড়ালী

যুরেশিয়কেও আমরা দূরে রাখা অত্যন্ত বোধ করি। খুশী হ তাঁরা বাংলা ব্যবহার করলে; কিন্তু সেটা যদি যুরেশিয় বাংলা হয়ে ওঠে তাহলে ধিকার দেব নিজের ভাগ্যকে। আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে ওঠে, তবে এর অভিসম্পাত আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করবে। ইতি ১১ই, চৈত্র ১১৪০।

ভবদীয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহিলা-সংবাদ

কলিকাতার কয়েকটি চিত্র-প্রদর্শনীতে যে-সব মহিলার আঁকা ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাদের নামের তালিকা গত মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী রমা বসু অন্যতম। শ্রীমতী রমা চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শিনী। তাহার যে চিত্রগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার মধ্যে “শেষ আরতি” মাত্র পনের বৎসর বয়সে ও “নিরঞ্জন” বোল বৎসর

উভয় সম্প্রদায় হইতে অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া যশোহা মিউনিসিপালিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতা



শ্রীমতী রমা বসু

বয়সে আঁকা। তিনি গৃহে বসিয়া মাতার নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। তাহার মাতা শ্রীমতী প্রভামতী মিত্রের আঁকা ছবিও প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত আমেনা খাতুন গত ২৩এ মার্চ হিন্দু ও মুসলমান



শ্রীযুক্ত আমেনা খাতুন

করপোরেশন ছাড়া বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটিতে তিনিই প্রথম মহিলা-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।



বাংলা

রূক্সভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির—

চন্দ্রনগরে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া
রূক্সভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির নামক যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন

পরিবর্তন সাধন করিয়া বাহির হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, অল্পেরে একেশ
করিয়া, আমাদের একান্ত নিজস্ব চরিত্র-সম্পদ হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত
করিতে পারিবে না, এই সকল দৃঢ়রূপে জগরে ধারণ করিয়া জনচাঙ্গিণী
বিদ্যার্থিনীকে শিক্ষারত উদযাপন করিতে হইবে।"

"তোমরা এই প্রতিষ্ঠানে যে সযোগ লাভ করিবাছ তাহার যথাসাধা



রূক্সভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরে পুরস্কার-বিতরণ সভা

করিয়াছেন ও চালাইতেছেন, তাহার পরিচয় আমরা আগে আগে
দিচ্ছি। এখানে বালিকাদিগকে সর্বদাঙ্গীন শিক্ষা দিবার আয়োজন
হাচে এবং চেষ্টা করা হয়। ইহার গত পুরস্কার-বিতরণ সভায়
চাক্ষুরিগকে সম্বোধন করিয়া সভাপনতরী বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল
শ্রীমতী ভট্টনী দাস বলেন :—

"সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সমস্ত প্রতিকূল শিক্ষার মধ্যেও আমাদের
নিজস্ব বিশেষত্বকে অক্ষুর রাখিতে হইবে। আমরা আজকাল পাশ্চাত্য
শিক্ষা লাভ করিতেছি, পশ্চিমের ভাষা কলা বিজ্ঞান বহু বিষয়েরই
সহায়তা প্রতিনিয়ত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইতেছে। বিদ্যার এই
প্রাধান-প্রধান নিম্নলিখিত নহে, কারণ বিদ্যার জাতিভেদ নাই। যাহা-কিছু
শিক্ষণীয় বৈদেশীয়-বিদেশীয় নির্দিষ্টপথে আমরা তাহা গ্রহণ করিব, কিন্তু এই
শিক্ষার মধ্যে আমরা নিজেকে হারাইয়া ফেলিষ না। বিদেশাগত বিদ্যা
আমস্ত করিতে পারি, সকল রকমে বিদেশীয়ের অনুকরণ করিব না।
বিদ্যার মধ্যে যাহা বাহিরের বস্তু, তাহা বাহির হইতে আসিয়া, বাহিরের

ব্যবহার করিয়া লও, প্রভূত পরিমাণে বাহিরের বিদ্যা আচ্ছন্ন কর, কত
তাহার মধ্যে আত্মসমাহিত থাকিও, বাহিরের মোটে মুক্ত হইয়া অল্পেরে
পরম বস্তুটিকে বিমূর্ত হইও না।



রূক্সভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির—চন্দ্রনগর

“ধাঁহার অরূপ এই শিক্ষারতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার পূত চরিত্রের নান্দ্রী ভোমানের অন্তরে প্রতিফলিত হউক।”

হুগলী জেলার ঐতিহাসিক অঙ্গসন্ধান ও সাহিত্যিক সমিতি—

গত মাসে চুচুড়ার একটি ঐতিহাসিক অঙ্গসন্ধান ও সাহিত্যিক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র হুগলী জেলা আশাততঃ ইহার কার্যক্ষেত্রে হইবে। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ইহার সভাপতি ও শ্রীযুক্ত সুবীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। সত্য নির্বাচিত হইয়াছেন ‘চুচুড়া বার্তাবাহক’ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দিতাইচাঁদ মুখোজা, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ আতা, শ্রীযুক্ত ভারতনাথ মুখোজা, শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোখরায়ী, শ্রীযুক্ত রমণো রায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বাড়জো, শ্রীযুক্ত যেন্দ্রেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত দুর্গাদেবানন্দ মুখোজা ও শ্রীযুক্ত কণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রাজশাহীর স্বরূপ-অঙ্গসন্ধান-সমিতি, অনেক ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়াছেন এবং একটি মিউজিয়মে প্রাচীন বস্তু, শিল্পাদি প্রভৃতি রাখিয়াছেন। হুগলীর সমিতিটিরও ক্রমে ক্রমে এইরূপ কাজ করিতে পারা উচিত।

চুচুড়ার প্রাচ্যকলা প্রদর্শনী—

চুচুড়ার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডলের চতুর্থমণ্ডে একটি প্রাচ্যকলা-প্রদর্শনী গত মাসে খোলা হয়। তাহাতে অনেক ছবি, কাঠের কাজ, কাপড়ের উপর সেলাইয়ের কাজ এবং চামড়ার কাজ প্রদর্শিত হয়। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত বামিনীন্দ্রনাথ রায় ইহা উপলব্ধি করেন। মকমলের সর্বত্র এইরূপ প্রদর্শনী হওয়া উচিত।

চুচুড়া দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষক বিদ্যালয়—

চুচুড়ার দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষক বিদ্যালয় একটি সুপরিস্ফুট বিদ্যালয়। ছাত্র জিন্ন ইহা হইতে একটি বালিকাও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং আরও কয়েকটি ছাত্রী এখানে পড়িতেছে।

ভালভলায় সাহিত্য-সম্মেলন—

ভালভলা সাধারণ পুস্তকালয়ের উদ্যোগে এ-বৎসরও কুমার সিংহ হলে অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র বসুদেবায়ের সাধারণ সভাপতিত্বে সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। ইহাতে অনেকগুলি ভাল অভিজ্ঞতা ও প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর কুমার সিংহ হল ব্যবহার করিতে দিয়া শ্রীযুক্ত পুরাটাই নানার সর্বসাধারণের রক্তজ্ঞাতাজন হইয়াছেন।

বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বহু স্মৃতি-বার্ষিকী—

চল্লিশ পরগণার বোড়াল গ্রামে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বহু মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের শেষ ভাগ তিনি বৈদ্যনাথ-দেওঘরে বাসন করেন। বোড়ালে এখনও তাহার বাসগৃহের বৈঠকখানা আগের দেওয়াল-গুলি দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকের বাগান জঙ্গলময় হইয়াছে। বোড়ালের সিলদঙ্গ তাহার স্মৃতির প্রতি আত্মা প্রদর্শনের জন্য বার্ষিক সভা করিয়া থাকেন, গত মাসেও করিয়াছিলেন। সভা যদি বহু মহাশয়ের বাড়ির ভগ্নাবশেষ ঘেরামত করাইয়া তাহাতে কোন গ্রামবাসিনীর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। বহু মহাশয়ের বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থাবলী তাহার দোহিত্রী শ্রীমতী কুমুদিনী বহু ও দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নরেশ্বর সিংহের সহযোগিতায় পুনরুজ্জীবিত হইলে একটি জাতীয় কর্তব্য করা হইবে। পাঁচ শত বৎসর হইতেই জন্মবলীর ব্যয় নির্বাহিত হইবে। তাহার আনুমানিক ব্যয় স্থির করিয়া উভোভারায় যদি পাঁচ শত জন গ্রাহক সমগ্রদের চেষ্টা করেন, তাহা সম্ভব হইবে মনে করি। আদর্শ গ্রাহক-সংগ্রহ কার্যের সাহায্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ দ্বারা করিতে পারি। হৃদযথাত শ্রীজগদীশ ঘোষ বহু মহাশয়ের দৌহিত্র।

তিনি মাতামহের গ্রন্থাবলী একশ্রে তাহার গ্রন্থাবলির সাহায্য দি কাজ অগ্রসর হইতে পারে। বহু মহাশয় সে কিরূপ খাটি স্বাক্ষর ছিলেন, তাহা আলোকালার তরুণেরা জানেন না। তিনি বর্ণ-সংস্কারক সমাজ-সংস্কারক ছিলেন বলিয়া তাহার অনাদর হওয়া উচিত নয়।

কোরগরের বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে লোকনৃত্য—

কোরগর ইংরেজী বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিত্ত উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গুরুদাস দত্ত প্রভৃতি কিছু লোকনৃত্য বালকে দেখাইয়াছিল। নৃত্যগুলি ক্ষুদ্রিযাঙ্গক, ক্ষুদ্রিজনক ও নির্দোষ আমোদপ্রদ যে অল্পবয়স পরিবর্তন আবশ্যক মনে হইল, তাহা চূড়ো নাহে।

চট্টল দিয়াশলাই কারখানা—

চট্টগ্রামে “চট্টল দিয়াশলাই কারখানা” নাম দিয়া একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনটি জাপানী কল ছাড়া ইহার আর সমস্ত ক কলিকাতার ভবানী এঞ্জিনিয়ারিং ট্রেডিং কোম্পানী নির্মাণ করিয়াছে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এত কারখানার দিয়াশলাই শীঘ্রই বাজার বাহির হইবে।

রুতী বাঙালী ছাত্র—

শ্রীযুক্ত রত্নীশীকেশর দত্তরায় সম্প্রতি জার্মানী হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত করিয়াছেন। জার্মানীর হেনোভের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (Technical University, Hannover) হইতে তিনি কৃতিত্বের সহ জার্মানীর সর্বোচ্চ স্টেট ডিগ্রী (State Degree) ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়ারিং



শ্রীযুক্ত রত্নীশীকেশর দত্তরায়

(Dr. Ing.) পদে করিয়াছেন। তিনি তথাকার কেমিক্যাল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর প্রাথমিক অধ্যাপক ডাঃ কেপলারের

বর

শ্রীমনোজ বসু

তখনে সময় হইল বুঝি !

দোর খুলিয়া পাশিয়া টিপিয়া সন্তপণে ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে আসিল। আসিয়া করিল কি—জানিবার ধারে যথানে উমা একেলা পড়িয়া আছে ঠিক সেই খানটিতে একেবারে শিয়রের উপর বসিয়া চোখের পল্লবের কাছে খুঁটি নামাইয়া আনিল।

—উমারাণী, উমারাণী—

চুপ, চুপ,...কি লজ্জা !

মাঠের বেথানে বস জ্যোৎস্না ছিল শুপাংকার মল্লিকার হাতে সব কি ঘরের মধ্যে আসিয়া জমিয়াছে ! তেঁতুল গাছ ছায়াপাশী একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে, ক্লান্তি নাই।...ফান্সন পত্রির মিঠা হাওয়া এক একবার আসিয়া ছোট মেয়ের দালনার মতো বিছানা-মশারী দোলাইয়া দিয়া যায়।

—উমারাণী, রাণী গো—জাগো, চোখ দুটো মেল দিক একবার—

কিন্তু চোখ না মেলিলে কি হয়, কীটিকলাপ তোমার সব যে দেখা যাইতেছে ! স্বকুমার স্বন্দর চোরের মুখখানি ভরিয়া মধুর চাপাহাসি। হাসিভরা সেই মুখ ধীরে ধীরে নীচু হইয়া আসিতেছে, আরো নীচু—আরো—আরো—আরো—

—খ্যৎ, দুটু কোথাকার !

খিল-খিল করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইতে উমার ঘুম ভাঙিল।...কে কোথায় ! ঘরের দরজা বন্ধ। হঠাৎ এঞ্জিনের হুতীর বাঁশি। নৈশ নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া চুরিয়া প্রলয়ের নৈ বাড়ির পাশের রেললাইন বহিয়া এগারোটার গাড়ী ঠশনের দিকে ছুটিয়া গেল।

পাড়ার গুটি পাচেক মেয়ে সোরগোল করিয়া রান্নাঘরে গজে লাগিয়াছিল। বিভার ফুঁটিটাই সব চেয়ে বেশী। ডীর শব্দে তার টনক নড়িয়া উঠিল। ডাকাতের মতো টিয়া আসিয়া সে এ ঘরের দরজা ঝাঁকিহাতে লাগিল।

—ওঠ, ওঠ, এগেছে—

অলস ভদ্রাচ্ছর হাসিহাসিয়া উমারাণী বলিল—কর কেন, চলে গেছে।

—আবার তর্ক করে। খোল না দরজা ; বেশ এসে কি চমৎকার বর—

জানে, পোড়ারমুখী আসিয়াছে যখন, না উঠাইয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। তবু যতশন পারা যায়। বলিল—তোমার বর—

—দিবি ? এদিক ওদিক তাকাইয়া বিভা বলিল—দিয়ে পারিস প্রাণ ধরে ?

উমারাণী সম্মুখে এবং পরম নির্ভয়ে বলিয়া দিল—নি গে যা—

—ইস, দাতাকর্ণ একেবারে। বুঝেছি, বুঝেছি। কেন্দার মিত্রির চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

দুই সখীর মধ্যে কেন্দার মিত্রকে লইয়া আজকাল প্রায়ই এমনি আলোচনা হয়। আসলে কিন্তু মিত্র মহাশয় মোটেই তুচ্ছ ব্যক্তি নহেন। বাড়ী তাঁর কোশ দুই তিনের মধ্যে ; প্রচুর যান সন্মম, কোন অংশে কাহারও অপেক্ষা খাট নহেন—না বিত্তে না বয়সে। সম্প্রতি ভদ্রলোকের পর পর দুইটি মহা সর্কনাশ ঘটয়া গিয়াছে। প্রথমে স্ত্রী গত হইলেন, তারপর সেই পিছু পিছু সেজ ছেলোট। ছেলোট আবার পথ কিছু সংক্ষেপ করিয়া লইল। রাত্রে বাপের সঙ্গে সামান্য একটু কথান্তর—প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখা গেল, তার প্রাণহীন দেহ পোম্বালের আড়ার সঙ্গে ঝুলিতেছে। তারপর থানা, সেখান হইতে সদর। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চুকিয়াছে এই মাস থানেকের বেশী নয়।

বিভা নিতান্ত ভাল মানুষের মতন বলিয়া চলিল—কেন্দার মিত্রিরই মাথা খেয়েছে। তা তোর দোষ দেব কি ভাই। একসঙ্গে অমন ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী—একেবারে একটা পুরো সংসার। কার না লোভ হয় বল।

—দেখাচ্ছি তোমায়। বলিয়া বড় রাগে রাগে দরজা খুলিয়া উমারাণী বিভাকে টানিয়া ঘরে লইল। বলিল—

তুই বড় ইয়ে হয়েছিল। বিপদের সময় মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা ?

— ঠাট্টা ? ককখনো না। দুঃখ করছি। বলিয়া বিভা চেট-চরিত্র করিয়া মুখখানা মলিন করিল। বলিল—বিপদই বটে। এমন সাধু সজ্জন লোকেরও এমন দুর্গতি হয়। ধানায় নিয়ে বটতলায় নাকি খাড়া দাঁড় করিয়ে দিল। তখন দারোগাকে ধরমবাপ বলে সমস্ত বেলা ধরে ভেউ ভেউ করে কান্না। বাবার কাছে গল্পটা শুনে অবধি—। কথা আর শেষ করিতে পারিল না ; প্রবল দুঃখের যন্ত্রণাতেই বোধ করি বিছানার উপর একেবারে লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

কিন্তু উমারানী তাহাতে যোগ দিল না, যান হাসিয়া বলিল—কিন্তু, বুড়ো হোক, যাই হোক—ঐ কেদার মিত্রের ছাড়া তোর সহকে আর কার মনে লাগল বল দিকি ? একটু চুপ থাকিয়া গভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিল—দাদুর অবস্থা দেখে কান্না আসে ভাই। বুড়ো মানুষ, এ দেশ সে দেশ করে এক একটা সম্বন্ধ নিয়ে আসেন ; মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দাদুর আহা-নিন্দা ত্যাগ। আজ এই দুপুর থেকে ষ্টেশনে যাবার যোঁক। বলেন, কলকাতার ছেলে পাড়াগায়ে আসছে, পথঘাট চেনে না—আগে গিয়ে বসা ভাল। যেন কলকাতার ছেলেকে খাতির করে গাড়ী আজ সকাল সকাল পৌছে যাবে। গাড়ী ত এল এতক্ষণে, আর সেই সঙ্গে থেকে ষ্টেশনে গিয়ে বসে আছেন।

বিভার চোখে জল আসিয়া পড়িল। দুই জনে বড় ভাব। উমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—বসে বসে ঐ সব ভাবছিল। আজকে বর আসবার দিন, আনন্দ করতে হয়। চল দিকি রামদায়ের দিকে—

হঠাৎ উমারানী বলিল—বিভা, একটা জিনিষ ধার দিবি ?

—কি ?

—তোর ঐ গায়ের রঙটা। বড় ডয় করছে। ওরা দেখে শুনে চলে গেলে কাল আবার তোকে কির দেখে।

বিভা একেবারে আশ্চর্য হইয়া উঠিল—তুই হিংস্রক, তুই কাপা। একবার আঁমনা ধরও দেখিস নে ?

উমারানী বলিল—সে জাই, তোর চোখে। তুই যদি লক্ষ্য হতিল—

—আলবৎ। গ্রীষ্ম দোলাইয়া প্রবলকণ্ঠে বিভা বলিতে লাগিল—তা হলে নিশ্চয় তোকে বিয়ে করতাম। বিয়ে না করে সকালে ঘাড়ের উপর এক কিল, আর সন্ধ্যায় আর এক দফা। বলিতে বলিতে পদম স্নেহে উমাকে সে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—চুলোয় যাকগে কেদার মিত্রের। আমি ছাড়া আর কারো চোখে লাগে না—বটে ? আজকে তবে কি হচ্ছে মণি ? ছবি দেখে যে পাগল হয়ে রাজপুত্র ছুটেছে—

রাজপুত্র অর্থাৎ প্রশান্ত। কলিকাতায় কলেজে পড়ে। ফোটোগ্রাফ দেখিয়া বিচার বিবেচনা করিয়া অবশেষে আজ সে নিজেই আসিতেছে। সদয়গোপাল ষ্টেশনের বেঞ্চে বসিয়া বসিয়া বিম্বাইতেছিলেন। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ, বড় শীত করিতে লাগিল। চাদরটা গায়ে দিয়া রুমটার ভাল করিয়া গলায় জড়াইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। অবশেষে গাড়া আসিল।

কলিকাতার ছেলে, দেখিয়াই চেনা যায়। দুজন আসিয়াছে। একজন টুকটুকে স্নন্দর, চশমা-পরা। অপর জন কশা ভেমন নয়, লম্বা চওড়া স্ফুটিত দেহ। গাড়ী হইতে নামিয়া সেই সর্কাগ্রে পরিচয় দিল—আমার নাম নিমাই গোস্বামী, নিবাস নীলগঞ্জ। পাত্র কিছুতে এল না।

সদয়গোপালের এমন ভাব হইল, বুঝি ঐখানেই বসিয়া পড়িবেন। নিমাই বলিতে লাগিল—এত করে বললাম, চলো যাই প্রশান্ত, আজকালকার দিনে এতে আর লজ্জা কি ? শিয়ালদহে এসেও টানাটানি। কিছুতে নয়। আমাদের দু'জনকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসছি বলে চম্পট।

কিন্তু বয়স কম হইলে কি হয়, নিমাই গোস্বামী অতিশয় বিবেচক ব্যক্তি। বাড়ি পৌছিয়া বলিল—এই রাত্তিরে আজ্ঞে আর হাঙ্গাম হজুত করে কাজ নেই। আমরা কে ? দেখা-টোকা হবে একেবারে সেই আসল মানুষের সঙ্গে শুভদৃষ্টির সময়। আমরা দেখব শুধু তরিবংটা। বরঞ্চ খাবার টাবার গুলো খুকীকে দিয়ে পরিবেশন করান। তাতে আন্দাজ পাওয়া যাবে—

বিভা ছুটিয়া গিয়া উমারানীকে চিমটি কাটিল।—বা খুকী,

খাবার দিগে যা। রাগের আর তার অস্ত রহিল না। খুকী! পিতামহ ভীষ্মেরা সব আসিয়াছেন কিনা, তাই খুকী বলা হইতেছে!

বিভার বাপ ভুবনবিহারী রায় চৌধুরী—চৌধুরীদের বড় তরফের কর্তা। তিনি আসিয়াছেন; রাত্রি একটু বেশী হইলেও গ্রামস্থ আরও ছু'পাঁচজন আসিয়াছেন। খাইতে খাইতে নানাবিধ উচ্চাঙ্গের আলোচনা চলিয়াছে। ভুবন চৌধুরী ত নিমাইএর মুখের দিকে চাহিয়া ঈ হইয়া গিয়াছেন। ঐ টুকু চেলে, ঐ বয়সে এত শিথিয়া ফেলিয়াছে—অবলীলাক্রমে এমন করিয়া কহিয়া যায় যেন তার বিদ্যাবুদ্ধির তল নাই। পাশের ঘর হইতে বিভা উঁকি দিয়া দিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং সেই আনন্দে ছুটিয়া ঈপাইতে ঈপাইতে বাগ্নাঘরে গিয়া খবর দিল, বর আসিয়াছে, উহারই মধ্যে আছে।

মেঘেরা নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আবার পাশের ঘরে গিয়ায়ত হইতে লাগিল। সদয়গোপাল আনন্দে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—সত্যির বিভা, সত্যি?

বিভা চশমা-পরা ভদ্রলোককে দেখাইয়া দিল।—দেখছেন না, কি বকম ঘাড় নুঁকে পড়েছে..তাকায় না, মুখ তোলে না। ঐ—ঐ—

সদয়গোপাল সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন উনি যে আর কি একটা নাম বললেন—

—বলেছে তবে আর কি! একেবারে বেদবাকা বলেছে। দাড়ুর যেমন কথা!

বিভা একেবারে হাসিয়া খুন।

চশমাপরা ভদ্রলোকটির ইহার পরে আর বিপদের অবধি থাকিল না। জানালার ওদিক হইতে কাপড়ের খসখসানি, ছড়ির আওয়াজ। ভদ্রলোক বুলিলেন, দৃষ্টির শতরীবাণ গুলি তাঁহারই পিঠে আনিয়া পড়িতেছে; মুখ ও চশমা খালার উপর ততই যেন ঠেকিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ওদিকে উমারানীও বিস্রোহী। হাতের পাত্রটা ফেলিয়া ঝপ করিয়া সে বসিয়া পড়িল। বিভাকে বলিল—আমি পারব না, তুই যা—

বিভা জিভ কাটিয়া বলিল সর্বনাশ। তা করিস নে।

জীবে দয়া করতে হয়। তা হলে ওর চোখ কেটে জল বেকবে। দেখিস নি, তোর পিছনে কি রকম চেয়ে চেয়ে দেখে চোরের মতো। দেখিস নি তাই,—দেখলে মায় হত।

উমার বিশ্বাস হইল কথাটা। মামুষটি এমন দেখিতে গোবেচারার মতো, আসলে কিন্তু দুইয়ের শিরোমণি।

খাওয়ার পরে আবার পানের জগ্ ডাকাডাকি।

উমা হাতজোড় করিয়া বলিল—বিভা, লক্ষী ভাই, এবারে আর কাউকে—

কিন্তু বিভার দয়ামায়া নাই। হাত মুখ নাড়িয়া ঝগড়া আরম্ভ করিল—কি রকম মেয়ে তুই লো? আমাদের হ'লে আরও কত ছুতোনাতা খুঁজে বেড়াইতাম। যা পোড়ারমুখী—যা শিগগির—

ভদ্রলোকেরা তখন সতর্কির উপর স্থগামী হইয়াছেন। উমারানী গিয়া দাঁড়াইতে ভুবন রায় গুণ-ব্যাখ্যা শুরু করিলেন—মেয়ে নয়, আমার মা লক্ষী। বুঝলেন মশাইরা, আমার বিভাও যা এ-ও তাই। ঐ রং যা একটুখানি চাপা, নইলে কাজ-কর্ম স্বভাব-চরিত্র দেখলেন ত বাই হোক কিছু। আহা-হা, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। বড্ড খেটেছিল—বোস দিকি মা, বুড়ো ছেলের পাশে একটুখানি বোস—

নিমাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। কলিকাতার ছেলে, কথায় তুলিবার পাত্র নহে। বলিল না খুকী, দাঁড়াও আর একটু। চুলটা একবার ঝুলে দিন না কেউ। ঐ দরজাটার ঈগানে চলে বাও খুকী, -তাড়াতাড়ি যাও, একটু জোর জোর পায়ে এইবার চোখ তুলে তাকাও ত নজরটা দেখতে হবে—

অকস্মাৎ বিভা আসিয়া উমারানীর হাত ধরিয়া লইয়া গেল। ভুবন রায় হা-হা করিয়া উঠিলেন—ওরে কি করিস? ভদ্রলোকেরা যে—

বিভার জবাব আসিল—ভদ্রলোকেরা বিশ্রাম করুন। হাকামা হুজুতের ত আজ কথা ছিল না বাবা। খুকী মামুষ—খেটে খুটে এখন বড্ড ঘুম ধরেছে, ও আর চোখ তুলতে পারবে না।

সকালে উঠিয়াই নিমাই গোস্বামী বলিল—নমস্কার!

সদয়গোপালের মুখ শুকাইল, দেবতা কষ্ট হইয়াছেন।
কিন্তু অপরাধ ত তাঁহার কিছুই নয়।

নিমাই হাসিমুখে বুদ্ধকে নির্ভর করিল। বলিল—আর
কত দেখবো? এ ত হোলো। অনর্থক কলেজ কামাই করে
দরকার কি?

সদয়গোপাল শুনিলেন না, ষ্টেশন অবধি সঙ্গে সঙ্গে
চলিলেন। গাড়ী প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ নিমাই
অবাক করিয়া দিল। বলিল—মাণ করবেন আমাকে; একটু
মিথ্যাচার হয়েছে। পাত্র নিজেই এসেছে।

বিভার সম্বন্ধ ঠিক তাহা হইল। বুদ্ধ দুই স্তিমিত-
চোখের সকল প্রত্যাশা লইয়া চশমাধারীর দিকে তাকাইলেন।

গোষ্ঠামী পুনশ্চ বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে আমিই প্রশান্ত—

আরও আশ্চর্য্য হইয়া সদয়গোপাল বলিলেন—আপনার
বাড়ি কি ভাবে—

কথা মুক্তি লইয়া প্রশান্ত বলিল—নীলগঞ্জ নয়। জন্মে
দেখিনি কখনো। তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিতে
লাগিল—পরিশ্রম দিলে কি আর অমনি করে দেখা যেতো!
তা ছাড়া অস্ত্রাঘটাই বা কি? আপনার সঙ্গে ত ঠাট্টা-তামাসারই
সম্পর্ক।

সাহস পাইয়া এককণ্ঠ পরে বুদ্ধ মুখ তুলিলেন। ঢোক
গিলিয়া বলিলেন—মেয়ে তবে পছন্দ হয়েছে দাদা?

—হয়েছে।—কর্ণাটি। আপনার ঐ ঘেঁকে হয়
বলছিলেন না?

সদয়গোপালের কথা ফুটিল না। তারপর অনেককণ
পরে কথা ধ্বনন বলিলেন, যেন হাফাকারের মতো শুনাইল।
বলিলেন—ও ভুবন চৌধুরীর মেয়ে, ওর পাজের অভাব কি?
আমার এই মা-বাপ মরা বাচার একটা গতি করে দাও
তোমরা—

প্রশান্ত উদাসীনের মতো আর একদিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর বলিল—গাড়ী এসে পড়েছে; আচ্ছা, নমস্কার।
ভুবন চৌধুরী মশায়কে বলবেন ঐ কথা। আর হুনীল
ঝাড়িয়ে রইল যে—

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু চশমাধারী ছেলেটি
নড়িল না। এক মুহূর্ত্ত সে সেই সর্ব্বহার্য্য বুদ্ধের দিকে
তাকাইল। কথা সে কাল হইতে রড় বোঝে কহে নাই,

গাড়ীর সামনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমার নাম
হুনীলকুমার রায়, বাড়ি প্রশান্তদের ওখানে। আমার সঙ্গে
একটু খোজ খবর করে দেখবেন। আমি অযোগ্য, কিন্তু
যদি আপনার পৌরীকে—

বুদ্ধ যেন পাগল হইয়া উঠিলেন, শুধু চোখ একতরফে
সজল হইয়া উঠিল। অধীর আকুলকণ্ঠে বারবার বলিতে
লাগিলেন—আমার উমারাবীকে নেবে তুমি? দুঃখিনীকে পায়ে
ঠাই দেবে তুমি দাদা?

অশ্রুট স্বরে হুনীল বলিল—যদি দেন দয়া করে। এবং
তারপর সেই বা আর কি কি বলিল, বুড়াই বা কি বলিতে
লাগিলেন গাড়ীর শব্দে লোকজনের কোলাহলে তাহার একবর্ণ
শোনা গেল না।

বৃত্তান্ত শুনিয়া ভুবন চৌধুরী মৎস্যধী। বলিলেন—বেশ
হয়েছে, দিবা হয়েছে। এক ঢিলে দুই পাণী। হীরের
টুকরো ছেলে ও ছুটি। দেখেই বুঝছি—

এবং আরও ভাল করিয়া বৃষ্টিবার জন্ত পরদিনই রওনা
হইয়া গেলেন। ফিরিতে দিন আটেক দেবী হইল।
গিড়কীতে পা দিয়াই আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—উলু দাও
সব—শব্দ বাজাও—

উলোগীপুত্র। একেবারে বিয়ের তারিখ পর্যন্ত ঠিক।
শামনের চৈত্রটা বাদ দিয়া বৈশাখ মাসের এগারোই।

হাত-পা ধুইয়া চৌধুরী মহাশয় বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন,
সদয়গোপাল আসিয়া ফরাসের একপাশে চূপচাপ বসিয়া
আছেন। ই, লক্ষ্য বটে। সেই কথাটাই সর্বাগ্রে উঠিয়া
পড়িল। এমন ঘর-বর ভুবন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।
প্রায় বেকুব হইতে বসিয়াছিলেন; তারপর বুদ্ধি করিয়া
নিজের হাতের হীরার আংটি বরের আঙুলে পরাইয়া মান
বাচাইয়া আসিয়াছেন। সদয়গোপাল খুব ঘাড় নাড়িয়া
ভুবনের বুদ্ধির তারিফ করিলেন, তারপর কাছে গিয়া কাশিয়া
গলাটা পরিষ্কার করিয়া সমস্তোচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইয়া
ভুবন, আর ঐ খবরটা নিয়েছিলে কি?

ভুবন বলিলেন—নেব না কি রকম? সে-ও ত এবাড়ি
ওবাড়ি। শুটীও ভাল সব্ব। উনিশ আর বিশ। বরক

এক হিসেবে উমার অদৃষ্ট আরও ভাল। স্বপ্নের শান্তি দুইই বর্তমান। স্বপ্নের নিশি রায়—ও অঞ্চলের ডাকসাইটে লোক। আমি গিয়ে পরিচয় দিলাম। তৎকালিক তখন পুতুর জাল নামিয়ে দিলেন।

সদয়গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন—আর স্থানীয় যে কথাটা বল গিয়েছেন?

ভুবন ষাড় নাড়িয়া বলিলেন—তাও হোলো। নিশিবাবু বাইরে লোক মন্দ নন। বললেন—ছেলের পছন্দেই আমাদের পছন্দ। উপযুক্ত ছেলে, আমরা কি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাব?

আনন্দে বিহ্বল হইয়া সদয়গোপাল বলিলেন—ভুবন, তবে তোমাকে আরও একদিন যেতে হচ্ছে। ষাড় নাড়লে হবে না—আমিও যাব। গিয়ে বলব, আমার দুই নাতনৌকেই একদিনে নিতে হবে—ঐ এগারোই বোশেখ। তা নইলে শুনব না।

ভুবন বলিলেন,—তাও বলেছিলাম। কিন্তু বিস্তারিত অজ্ঞাত। ছেলেরই নাকি আপত্তি, পরীক্ষার আগে স্থবিধে হয়ে উঠবে না। বাবাজী বাড়িতে নেই—আসল কথাটা তাই বোঝা গেল না। আমার মনে হয়, বুড়োরও কিছু হুইমি আছে।

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া দুজনে অনেক পরামর্শ চলিতে লাগিল।

এদিকে খুব জাঁকাইয়া প্রাণপণ শক্তিতে উলু দিরা উমারানী হাঁপাইতে হাঁপাইতে অবশেষে বিভাকে নির্জনে ধরিয়া বলিল।

—জেরে রাজ্জী, লজি লজি আমার বর ছিনিয়ে নিলি?

এই কথাটাই ঝাঁক হালির সঙ্গে ক'দিন ধরিয়া মেয়ে অল্পে অল্পে মুখে মুখে চলিতেছে। উমারানীকে দেখিলেই সকলে চুপ করিয়া যায়। সেই কথা মনে করিয়া লজ্জায় লহসা বিভার উত্তর ঘোষাইল না। উমা বলিতে লাগিল—তুই ডাকাত। ডাকাতি করে বর কেড়ে নিয়ে গেবে—একদিন পরে আমাদের হেঁকে ছুকে তবি—

—ছাড়ব কি সহজে? বিভা সামলাইয়া তখন বগড়া শুরু করিল।—অত আত্মসাৎ করিসনে রে। না হয়, দুটো একটা মাসের এদিক ওদিক। দেখানো পাশাপাশি বাড়ি।

তোর সঙ্গে চুলোচুলি না করলে একদিনেই ঘে মরে বাব তাই—

তারপর আবার বলিতে লাগিল—বোশেখে না হয় কলোজের এগজামিন। জোড়িতে বাঁচবে কি করে? পুরুষগুলো ভাই বড় বোকা। সেই সেই মাথা খুঁড়তে হবে, খামকা আমাদের চটিয়ে রেখে দেয়। তখন আচ্ছা করে কৈকিয়ৎ নিবি, ছাড়িস নে—বুঝি?

উমা বলিল—দয়ার উপর জুলুম?

বিভা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—কিসের দয়া লো? মেরেমাছুষ গাঙের জলে ভেবে আসে নাকি? পুরুষ জাতকে অমন আঁকড়া দিস নে—দিস নে। তা'হলে কত হেনস্তা করবে দেখে নিস—

ঘেন পুরুষের সঙ্গে ঘরকরা করিয়া করিয়া বিভা বস্তু বড় গিন্নি ঠাকরুণ হইয়া গিয়াছে। উমারানী হাসিয়া উঠিল।—সবাইকে তোর গৌসাই ঠাকুর ভাবিস নাকি? তারপর টিপি টিপি হাসিতে হাসিতে বলিল—ভাল হয়েছে যে ঐ দিন আমাকে বোঁ সেজে বসতে হবে না, বাসরঘরে নিমাই গৌসাইয়ের কাছে দিবিয়া ভাগবত শোনা যাবে। রাগ করিস নে ভাই, আর একটা লোকও এসেছিল সেদিন—কিন্তু জালিয়াতি বুদ্ধি তার ত মাথায় আসে নি—

বলিতে বলিতে অকস্মাত উমার মুখ অপূর্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এক মুহূর্ত সে চুপ করিয়া রহিল, তারপর স্বহস্তে লিডকণ্ঠে বলিতে লাগিল—দাছ বলেন, দেবতা। আমার দাছর মুখে যিনি হাসি ফুটিয়েছেন, সত্যি তিনি দেবতা। তোর কাছে বলব কি ভাই, সকালে উঠে রোজ মনে মনে তাঁকে প্রণাম করি। সেদিনের কাণ্ড নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে, আমি তা বুঝি। তবু আমি শুভি, জাগিয়া গৌসাই ঠাকুর আমাকে পছন্দ করে বলেন নি—কিন্তু তে বিখাল হতে চায় না যে সত্যি সত্যি কোনদিন ঐ দেবতার পায়ে মাথা রাখতে পারব—

ছাতের প্রান্তে দুইজনে নিঃশব্দ মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পরম মধুর আশ্রয় সেই দিনগুলিকে লইয়া স্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিল। শেষ কাহিনীর মত। শিশুর বসে এখনও সব স্থল ফুটে বাই, তাদের মাঝার মৃত্যু ভটা পড়িতেছে, বৈচিত্র্য

লাল লাল ফুলের কুঁড়ি দেখা দিচ্ছে। গাঙের দিক হইতে আকাশে মেঘের কৈলে কৈলে এক ঝাঁক সাদা পাখী উড়িয়া যাইতেছে। যেন খেতপদ্মের মালা; সে মালা কখনো দীর্ঘ হইতেছে—কখনো আঁকিয়া বাঁকিয়া তার কাটিয়া যাইতেছে। ...ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখনো দুজন বসিয়া আছে।

সেদিন বাড়ি কিরিয়া সকল কাজকর্ম সারিয়া উমারানী একলা তার জানালাটিতে বসিল। বাহিরে ছোট্ট উলুক্ষেতের উপর ঝাপসা ঝাপসা অন্ধকার। তাহারই সীমানা দিয়া সারবন্দী টেলিগ্রাফ-পোষ্টগুলা। যেন রাত্রি আগিয়া তাহার সায়ীর মতো রেললাইন পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উমার মনের উপর তন্দ্রাচাপিয়া বসিল, বিয়ে যেন তার আজই। আলো জালিয়া বাজনা বাজাইয়া বড় জাঁকজমক করিয়া ষ্টেশন হইতে বর তাদের বোধনতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; চীৎকার কোলাহলে কান পাতা যায় না। বিভা মল বাজাইয়া ছুটিল বর দেখিতে। সেও ছুটিল। গুড্রুম করিয়া তার পিঠে বিভা দিল এক কিল।

—বাচ্ছিন কোথা পোড়ারমুখী? বলে থাক পিড়ির উপর। একদিনে লোভ মেটে নি? শুভদৃষ্টি হয়ে থাক, তারপর দেখিস যত খুশী

অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক হুঁকি পরামর্শের পর ঠিক হইল, শুভকর্ম কিছুতে কেলিয়া রাখা যাইবে না; যেমন করিয়া হোক ঐ এগারোই এক দিনে দুইটি সারিতে হইবে। ভুলন চৌধুরী অনেক মুশ্লিয়ানা করিয়া একখানা চিঠি লিখিলেন। পড়িয়া দেখিয়া সদয়গোপাল খুব খুশী হইলেন।

কিন্তু নিশি রাই অবিচল। জবাব আসিল, জ্যেষ্ঠের শেবাশেষি ছাড়া কোন ক্রমে বিয়ে হইবার ঘো নাই। স্রীমানের পরীক্ষার জন্য অহুবিধা তেমন নয়; দু-তিনটা দিনে এমন কি আর আসিয়া যাইবে। আসল কথা, ওদিককার গোছ-গাছ সমস্ত হইয়া উঠিবে না। বাড়ির মধ্যে প্রথম ছেলে, অতএব—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভুক্তনী ও বৃহাদুলে কাজনিক টাকা বাজাইয়া ভুবন চৌধুরী কথাটা পরিকার করিয়া দিলেন।

সদয়গোপাল আরও কথিয়া উঠিলেন—এগারোই খুঁকীর

বিষে আমি দেবোই। হুনীল কিছু জানে না; সে আমার ভেলানাথ।—সমস্ত ঐ বৃদ্ধের কারগাজি।

ইতিমধ্যে বৃত্তান্ত শুনিয়া একদিন কেদার মিত্র মহাশয় স্বয়ং চলিয়া আসিলেন। উপযুক্তপরি শোক ও বিপদের অবধি নাই, কিন্তু সে সব সবেও তিনি এক কথার মাহুয়; ভদ্রলোকের উপকারার্থ ঐ এগারোই তারিখেই তিনি রাজী। মাথা নাড়িয়া পরম গম্ভীরভাবে কেদার কহিলেন—নিশি রাখকে আমি জানি মশায়,—হু-এক হাজারের কর্ম নয়। মিছে মিছি হয়রান হচ্ছেন। আমাকেও হয়রান করছেন।

—দেখা যাক।

সদয়গোপাল ও ভুবন চৌধুরী যাত্রা করিলেন। এবং মন্ত্রবলেই নিশি রাইয়ের গোছ-গাছের সমস্ত অহুবিধা দূর হইয়া গেল। আর কোন আপত্তি রহিল না। তাঁরপর এক দিন গ্রামের মেয়েরা আনন্দ উৎসব সারিয়া যে ঘর বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, সদয়গোপাল ভুবনের বৈঠকখানায় নিবিষ্ট মনে ফর্দ করিতে বসিয়াছেন, সেই সময়ে উমারানী চুরি করিয়া দাড়র দেওয়াজ হইতে টাকার ছাপ-মারা চন্দন-মাখানো লগ্ন-পত্র টানিয়া বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল, ঠাঙ্গ-আঁটা আর একখানি কাগজ।

এগারোই বৈশাখ পাশাপাশি দুই বাড়িতে পান্না দিয়া রত্ননচৌকি বাজিতেছে। সদয়গোপালের স্মৃতির আর অবশি নাই। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নার ঘেন প্রাণন বহিয়া যাইতে লাগিল। ঘটিয়াছেও বেশ—দুইটা লগ্ন। উমারানী বয়সে একটু বড়, তার বিয়ে প্রথম লগ্নে হইবে। শেষের লগ্নে বিভায়। ভুবনই বিবেচনা করিয়া এই ব্রহ্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরাসন এক জারগাতেই; খাওয়া দাওয়া সমস্তই একত্র হইবে। সন্ধ্যার গাড়ীতে দুই বর আসিবে। আলো জালিয়া বাজনা বাজাইয়া সকলে ষ্টেশনে বর আনিতে গিয়াছে।

সর্বকর্তা অলকার বলাবল করিয়া উমারানী বসিয়া আছে। বিভা পলাইয়া আসিয়া পাশে বসিল। হাসিয়া হাসিয়া হু' জনে কি পান্না করিতেছে। এমনি সব সময়ে

বাহির বাড়িতে আর্দ্রনাদ। সদয়গোপাল ছুটিয়া আসিলেন।
বেখানে তারা বসিয়াছিল সেইখানে আসিয়া উয়ার চুলের
মুঠি ধরিয়া পিড়ি হইতে মাটিতে কেলিলেন। নিজেও
আছড়াইয়া পড়িলেন। চীৎকার করিয়া উঠিলেন—হতভাগী—

বিহ্বল উমারানী; বিভা কাদিয়া উঠিল। সদয়গোপাল
আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—হতভাগী,
এত লোকে মরে তুই মরিস না কেন? ঘেমা করে না?
গলায় দড়ি দিগে যা, কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে পড়গে যা।
যা—যা—বলিয়া সবলে তাকে ঠেলিয়া দিলেন।

বিভা আকুল হইয়া প্রাণ করিতে লাগিল—কি হয়েছে
দাদু, কি হয়েছে বলুন শিগগির—

আর কথা নাই। বুদ্ধের সঙ্গ নাই। সেইখানে
এলাইয়া পড়িয়াছেন। ভুবন চৌধুরীও ছুটিয়া আসিয়াছেন,
আরও কে কে আসিয়াছে। বিভা বাঁপাইয়া বাপের কোলে
পড়িয়া কাদিতে কাদিতে বলিল—কি হয়েছে? ও বাবা,
কি হয়েছে বল আমায়—

ভুবন একবার উমারানীর দিকে তাকাইলেন, পাখান
প্রতিমার মতো স্থির নির্নিমেষভাবে সে বসিয়া আছে। বিভা
বলিতে লাগিল—বলছ না কেন বাবা? বলো, বলো, পায়ে পড়ি
তোমার—

ভুবন বলিলেন—হুনীল আসে নি। শুধু একলা
প্রশান্ত—

একজন প্রাণ করিল—গাড়ি ফেল করেছে?

—না গো। সর্বনাশ করেছে। বিয়ের সজ্জা করতে
নিজেই কলকাতা যায়! তারপর আর পাতা নেই।
আজকে বাপের কাছে হঠাৎ এই টেলিগ্রাম। ওরা
এনে দিল।

টেলিগ্রামখানা সকলে পড়িল। ঘটনা সংক্ষিপ্ত। অবস্থা-
গতিকে হুনীলভুয়ার কলিকাতাতেই বিবাহ করিয়া বসিয়াছে।
কোঁকের আশায় একটা কথা দিয়া বসিয়াছিল বটে, কিন্তু
সেই হইতে ভাবিতে ভাবিতে ঠেল পাগল হইয়া উঠিয়াছে।
বাবা কেন তাকে ক্ষমা করেন। এক উপসংহারে বাপকে
আখাল দিয়াছে, দু-এক দিনের মধ্যেই তাঁর পুত্রবধূর
মুখকর্ণি বাটবে।

সদয়গোপাল চেতনা পাইয়া আর্দ্রনাদ করিতে লাগিলেন—

আমার কি হবে? ও বাবা ভুবন, কি উপায় হবে আমার?
জাত গেল, মান ইজ্জত গেল। এই হতভাগী কালমুখী
বাপ খেয়েছে, মা খেয়েছে, আমার জাতকুল খেলে, আমাকে
খেয়ে কেনে—

ভুবনের দল তখন কেমিয়া উঠিয়া টেচামেচি হুক
করিয়াছে—বেইমান। আমরা ত তাকে দেখেছি; ঠিক চিনব।
গাড়ি পাহারা দেব—দেখি, বউ নিয়ে কবে যার। হিড় হিড়
করে নামিয়ে এনে আটপেটে জুতো—

সদয়গোপাল উঠিয়া আলো ও লাঠি হাতে নইলেন।

—কোথায় যান?

—কেদারের কাছে। তার দয়ার শরীর, সে কথা
ফেলবে না।

ভুবন চমকিয়া বলিলেন—কেদার মিস্ত্রি?

—হা বাবা। একুনি যাব। আজ রাজের মধ্যেই
ঐ আপদ বিদায় করব। তোমরা কেউ যাবে সঙ্গে?
দু-একজন সঙ্গ লইল।

আশ্চর্য, উমারানীর চোখে জল নাই। ধীরে ধীরে সে-ও
উঠিয়া দাঁড়াইল। সেখানে তখন একলা মাত্র বিভা। সন্ডয়ে
সে জিজ্ঞাসা করিল—কোথা বাচ্চিস?

উমারানী সহজ কণ্ঠে বলিল—বাই, একটু ঘুমিয়ে নি গে।
কেদার মিস্ত্রিরের খুব দয়া, নিশ্চয় আসবেন। এলে উঠব
তারপর—

আর একটি কথাও বলিল না, বিহ্বানায় গিয়া পাশ ফিরিয়া
সে শুইয়া পড়িল। বিভা ভাকাভাকি করিতে বলিল—ঘুমুই
ভাই। তোমরও লগ একটু পরে। তুই বা।

হয়ত চুপি চুপি কাদিয়া লজ্জা ও অপমানের ভার একটু
লঘু করবে। বিভা আর কিছু না বলিয়া উঠিল। তখন
এ বাড়ী একবারে নিস্তক, উৎসবের বাজনা কোলাহল সমস্ত
থামিয়া গিয়াছে। এখানে ওখানে মুখোমুখি দু-চার জন
কিসকিস করিয়া বোধ করি এইসব আলোচনাই করিতেছিল।

টং টং করিয়া বাড়ি বাজিয়া যাইতেছে,—নয়, গাড়ে নয়,
দশ...

মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা। কথাটা মনে করিয়া উমারানীর

বৃকের মধ্যে আনন্দ ঘন নাচিয়া উঠিল। ওরা সব ঠাট্টা করিয়াছে, টেলিগ্রাম মিথ্যা,—তুমি নিশ্চয় আসিবে। কলিকাতা হইতে বলমলে বরের সজ্জা কিনিয়া রাজপুত্রের মত তুমি আসিতেছ।...এগারোটার গাড়ীর আর দেবী কত? দিগদিগন্ত ভেদ করিয়া বর লইয়া কলিকাতার গাড়ী ছুটিতেছে। কেনার মিত্রের আর্গেই পৌছিতে হইবে। এঞ্জিনের গতি ক্ষত হইতে দ্রুততর হইতেছে—একশো মাইল, হাজার মাইল, নশ হাজার মাইল, হাউই বত জোরে আকাশে ওঠে, আকাশের উচ্চ বত জোরে ছুটিয়া আসে—

সহসা উমারানীর মনে হইল, শিয়রের ধারে আসিয়া চুপিচুপি আদর করিয়া বর ডাকিয়া উঠিল উমারানী, উমারানী—

জবাব সে দিবে না। উপড় হইয়া জোর করিয়া বালিশে মুখ শুজিয়া পড়িল। তোমার সঙ্গে কথা সে আজ কিছুতে কহিবে না। তুমি যাও—

—তোমার পরীক্ষার পড়া নিয়ে থাক তুমি। গোছগাছ হয় ত সমস্ত এখনো হয়ে ওঠেনি। কেন এই পাড়াগাঁয়ের বন জঙ্গলে কষ্ট করে এলে? কেন—কেন?...

দাঁড় চোখের ঘুম গেছে কত দিন থেকে। আমার কিছু নয়, আমার বয়ে গেছে,—আমি খুব ঘুমাই।...দাঁড় কি করেছে জান?

বর জিজ্ঞাসা করিল—কি?

এই বাড়ির সমস্ত বিক্রি করেছে তুবন চৌধুরীর কাছে।

ফিল আর লগপতোর একসঙ্গে দেওয়ালে রয়েছে। আমার দাঁড়কে ওরা পথে বের করে দেবে।

—রাণী, উমারানী!

মুহু হাসিয়া, হাসিতে গিয়া মুখখানি রাজা করিয়া দেবতার মতো পরম স্নান বর কত কাছে আসিয়া বলিয়াছে। চোখ মুছাইয়া দিয়া কোমল মেহে বীরে বীরে মাথাটি কোলের উপর লইল। কোলের উপর লইয়া তারপর—

—না, না, না। খুব চিনেছি জোন্সন। সময় হল এতদিন পরে। তুমি যাও—তুমি যাও—

চপচাপ। আর কিছু নাই। চমকিয়া উমারানী উঠিয়া বসিল। চৌধুরী বাড়ির কোন্‌দিক দূর আর কানে আসিতেছে।

সে কান পাতিয়া রহিল। আবার ঘন শুনি, বৈচিত্র্যের আবছায়া হইতে সেই ডাক অভিশপ্ত যুগ হইয়া আসিতেছে—

—রাণী, উমারানী গো—

খপাচ্ছ কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইল। দিগন্তবিসারী জ্যোৎস্নার সমুদ্রে নৈশ বাতাস আজ তরঙ্গ তুলিয়াছে, তরঙ্গে তরঙ্গে সেই ডাক কীণ—কীণতর—অদ্ভুততম হইয়া দূর হইতে দূরে মিলাইয়া বাইতে লাগিল। সুপারীবনের ফাঁকে ফাঁকে, শুকনা ঝিলের পাশ দিয়া, উল্লুকেত পার হইয়া সেই ডাক শুনিতে শুনিতে উমারানী রেললাইনের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। বতদূর অবধি দেখা যায় লোহার পাটি বিকমিক করিতেছে। অশ্রু উৎস খুলিয়া আকুল হইয়া সেইখানে সে কাঁদিতে বসিল।

চৌধুরী বাড়িতে ভারী গগুগাল। বাজনা বাজিতেছে, বাজি পুড়িতেছে, লোকজনের হাঁকডাক। লগের আর দেবী নাই।...হঠাৎ এ বাড়িতেও রহনচৌকি বাজিয়া উঠিল। কেনার মিত্র আসিলেন নিশ্চয়। দম্ভার শরীর, পুত্র-শোকের মধ্যেও পরের বিপদ অবহেলা করিতে পারেন নাই।

দুই চক্ষের সমস্ত দৃষ্টিশক্তি পুঞ্জিত করিয়া উমারানী তখন দেখিতেছে, কোথায় রেলগাড়ী? দূরে—অনেকদূরে ঘন একটুখানি আলোর মতো। লগ যে অ্যাসিয়া গিয়াছে।—গাড়ীর এত দেবী!

বাড়ির মধ্যে খোজাখুঁজি পড়িয়া গিয়াছে। চাপা গলায় হাঁকডাক চলিয়াছে। সদহগোপাল অত্যন্ত ত্রুত হইয়া উঠিয়াছেন—কোথায় গেল খুঁকী, ওরে তোমরা দেখাদিকি একবার।...লগ্ন লইয়া কান্না ঘন এদিকে আসিতেছে।...আর উমার কান্ডজান রহিল না। ধরিয়া কেলিল বুঝি। পাগল হইয়া লাইন বহিয়া সে ছুটিল। খোয়া তোলা পথ—দুইদিকে সোহাগ লীলনা। আঘাতে আঘাতে পা কাটিয়া রক্তের ধারা বহিল। তবু ছুটিয়াছে। যেদিক দিয়া কলিকাতার পাড়ী আসে উমারানীর মতো দুই আকুল বাহ সেদিকে প্রসারিত করিয়া সে কাঁদিতে লাগিল—তুমি এসো—এসো—আর কত দেবী বরহ, এসো—তুমি—

না, দেবী নাই আর। সহসা টেনে সিগভালের ডগদগে লাল আলো হ্রীল দিগ হইয়া চিরদগ্ধকীর্ণা—সেইদিক অস্তর নিল। স্বর্গীর সার্বজনীন টো চারিদিক উজ্জ্বলিত

রিয়া বিপুল সমারোহে বর আসিতেছে। তারপর কি
ইয়া গেল; সকল ছুখ ভুলিয়া পরম আরামে উমারাণী
ইখানে শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া দেখিতে লাগিল,
গেলের বজায় সমস্ত একাকার করিয়া গাড়ী ছুটিতেছে,
খিৰী কাপাইয়া রাজির নিঃশব্দতা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া হাজার

হাজার মাইল বেগে ঘন বড় আঁবরের আফ্রান ছাটিল
আসিতেছে—উমারাণী, উমারাণী!

সেই বজুর রাস্তা, লোহার লাইন, অল্পদুয়ারী প্রত্যঙ্গর
একিন একমুহূর্তে তার কাছে পরম মনোহর হইয়া উঠিল।
নিশ্চিন্ত আলস্তে উমারাণী চোখ বুজিল।

আদি মানব ও আসল মানব

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়, এম্ এ, বি এল

ত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে “নর ও বানর” শীর্ষক প্রবন্ধে
প্রাচীন নর-কল্প জীবের বা “প্রাক্‌মানবের” (Pre-man এর)
বা তৎপূর্ববর্তী “গোড়ার মানুষের” (Proto-man এর)
মাত্র পরিচয় দিবেছি। এই প্রবন্ধে তাদের পরবর্তী “আদি
নর” (Homo Primigenius) এবং তারও পরের
আধুনিক” বা “আসল মানব” (Homo reconis বা Homo
apiens) সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব।*

আমরা দেখেছি যে, ক্রমবিকাশবাদীরা “বানর হ’তে
মানুষের উৎপত্তি নির্দেশ করেন,” এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক।
আমরা দেখেছি যে, তাঁরা ভ্রূতর-প্রোথিত কঙ্কালাবশেষ
খালোচনা করে কেবলমাত্র এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে,
তৃতীয়ক যুগের (Tertiary period-এর) উবাধুনিক
Eocene) অন্তর্ভূগে, বনন মানুষও ছিল না, বন-মানুষও
ছিল না, বানরও ছিল না, কেবলমাত্র তাদের সকলের পূর্বজ
অ-বিশিষ্ট-মহুষ্যকল্প গোষ্ঠী (undifferentiated genera-
lized anthropoid stock) ছিল, সেই কালে বাহ্যগ্রকৃতির
যথিক কঠোর প্রভাব ও পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার
দে মিলিয়ে চলবার উপযোগী দৈহিক ও বৈজ্ঞিক (germinal)
পরিবর্তন সাধন করতে না পেরে, এই বহুজ-কল্প গোষ্ঠীর
এক দল ক্রমোন্নতির সোজা পথে অগ্রসর হ’তে অসমর্থ হ’ল
এবং অবশেষে পথে গিয়ে আটকে থাকুলো ও ক্রমে পারিপার্শ্বিক

প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবে অন্য প্রকারের দৈহিক ও বৈজ্ঞিক
পরিবর্তন লাভ করে ‘বানর’ হয়ে পড়ল। আবার আধুনিক
বন-মানুষদের পূর্বজেরাও অ-বিশিষ্ট-মহুষ্যকল্প গোষ্ঠীর সঙ্গে
অভিন্ন ভাবে আরও কিছু দূর সোজা উন্নতির পথে
অগ্রসর হয়ে পরিবর্তনশীল নৈসর্গিক অবস্থার সঙ্গে আর
যুঝতে না পেরে ক্রমে পথভ্রষ্ট হয়ে অবশেষে পথে গিয়ে
পাঁড়াল ও পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবে বিভিন্ন বনমানুষ
(anthropoid apes) জাতিতে পরিণত হ’ল। কিন্তু অ-বিশিষ্ট
মানবকল্প গোষ্ঠী অধিকতর উদ্যমশীল নাছোড়বন্ডা জীবগুলি
পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক অবস্থার অল্পপ
আপনাদিগকে প্রাকৃতিক ও ঐন্দ্রিয়িক নির্বাচনের (natural
and organic selection-এর) দ্বারা প্রয়োজনীয় দৈহিক ও
বৈজ্ঞিক পরিবর্তন (germinal variations) হাশিল করে
মানবীয় শাখা (Humanoid stem) রূপে উন্নতির সোজা পথে
ক্রমিক অগ্রসর হ’তে লাগল।

গত মাসের প্রবন্ধে আমরা আরও দেখেছি যে,
তৃতীয়ক যুগের অন্ত্যধুনিক (Pliocene) অন্তর্ভূগে এক দল জীব
অ-বিশিষ্ট-মানবকল্প গোষ্ঠী হ’তে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোজা উন্নতির
পথ হারিয়ে মানবীয় শাখার একটি ফ্যাকড়া বা প্রশাখা
(offshoot) রূপে কিছু দূর চলে গিয়ে বন-দীপের ট্রিনি
মানব (Trinil man বা Pithecanthropus Erectus)
জাতীয় প্রাক্‌মানবে পরিণত হ’ল এবং কাকতালীয় লক্ষ্যপ্রাপ্ত
হ’ল। ট্রিনি মানবকে মস্তক-গহবরের পরিমাণ (cranial

* ল্যাটিন “হোমো সেপিয়েল” শব্দ দুটির অর্থ “স্থিতিশীলবিশিষ্ট
হয়”।

capacity) ও অজ্ঞাত লক্ষণ দেখে উহাকে সম্পূর্ণ মহা-
পদ-বাচ্য নির্দেশ করা যায় না। যদিও ইহা সোজা হ'য়ে
মানুষের মতন দুই পায়ে চলতে পারত, এবং সম্ভবতঃ হাতের
বৃদ্ধাঙ্গুল অপর আঙ্গুলগুলির উপর ফেলে জ্রাবাদি ধরতে
পারত, তবু এই জাতীয় নর-প্রায় জীবের মানুষের মতন
বাক-শক্তির এবং বুদ্ধি-শক্তির সম্পূর্ণ ক্ষুরণ হয় নি। এজ্ঞাত
ইহাদিগকে প্রাক-মানব বলা যেতে পারে। ইংলণ্ডের
সাঙ্গে জেলার পিল্টডাউন (Piltdown) গ্রামে সম্ভবতঃ
অত্যাধুনিক (Pliocene) অস্ত্রযুগের কৃত্তরে প্রাপ্ত
পিল্টডাউন-মানব (*Eoanthropus Dawsonii* বা *Pilt-
down man*), যদিও যব্বোপে প্রাপ্ত টিনিল মানব অপেক্ষা
অধিকতর পরিণত অবয়ব-বিশিষ্ট ছিল, তবুও ইহাকেও
সম্পূর্ণ মহাপদবাচ্য বলা যায় না। এরাও প্রাক-মানবের মধ্যে
পরিগণিত হ'তে পারে। জার্মানি দেশের হাইডেলবার্গ
শহরের নিকটস্থ ম্যার (Mauer) গ্রামে অত্যাধুনিক অস্ত্রযুগের
শেভভাগের কৃত্তরে কিংবা পরবর্তী উষ্মতরে প্রাপ্ত চিবুক-হীন
চোমালবিশিষ্ট ককালাবশেষ হ'তে যে হাইডেলবার্গ মানুষের
(*Homo heidelbergensis* বা *Palaeanthropus* এর) সন্ধান
পাওয়া যায়, তাকেও এই প্রাক-মানব দলভুক্ত করা যেতে
পারে। দক্ষিণ-আফ্রিকার টাঙ্গস্ (Taung) রেলওয়ে স্টেশন
হ'তে লাভ মাইল দূরে বাক্সটন (Buxton) চুণের খনির
(limestone quarry) নিকট যে নর-প্রায় জীবের
মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তাহা স্তর আরথার কীথ
(Sir Arthur Keith) প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে প্রাক-
মানবের নর, একটি উন্নত বন-মানুষের মাথা ব'লে স্থির করা
হয়েছে ও ইহার অস্ট্রেলোপিথেকস্ (*Australopithecus*)
নাম রাখা হয়েছে।

অ-বিশিষ্ট-নরকল্প গোষ্ঠী হ'তে কোন্ দেশে প্রথম মানবীয়
গোষ্ঠীর উদ্ভব হ'ল, ইহা নিশ্চিত নির্ধারণ করার উপযোগী
উপকরণ এখনও পাওয়া যায় নি। সুতরাং এ-সম্বন্ধে
পণ্ডিতদের প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন মত দেখা যায়।
কেহ কেহ মধ্য-এশিয়া, কেহ বা উত্তর-ইউরোপ ও কেহ
দক্ষিণ-আফ্রিকা মানবীয় গোষ্ঠীর উদ্ভবস্থান ব'লে নির্দেশ
করেন। কিন্তু বড়দূর দেখা যায়, মধ্য এশিয়া বা তার নিকটবর্তী
কোনই মানুষের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ব'লে মনে

হয়। তৃতীয়ক যুগে মধ্য-এশিয়া খুব উষ্ণ ও অল্পলম্ব দে
ছিল। যেখানে এখন হিমালয় পর্বত ও তিব্বত দেশ বর্তমান
সেখানে তখন টেথিস সমুদ্র (Tethys sea) ছিল। ক্রম
এ যুগে মধ্যভারতের ও টেথিস সমুদ্রের মাঝে হিমালয় পর্বত
শ্রেণী মাথা তুলে উঠল। কাজেই এই সমুদ্র হ'তে যে বা
উঠে যে ঘ ঘ বৃষ্টিদ্বারা মধ্য-এশিয়ার ভূমিকে উষ্ণ করতো, ও
আটকে দিল ও সেই বৃষ্টির গতি হিমালয়ের দক্ষিণে ঢালি
কাজেই মধ্য-এশিয়া ক্রমে নর-কল্প জীবের বাসে
অযোগ্য হ'য়ে উঠল। হরিৎ বর্ণ বনরাজির স্থলে প্রথমে
লম্বা লম্বা ঘাস জন্মাতে লাগলো; পরে তাও লুপ্ত হয়ে যাওয়া
মধ্য-এশিয়া মরুভূমিতে পরিণত হ'ল। প্রাকৃতিক পরিবর্তনে
আত্মরক্ষার অসমর্থ হ'য়ে অনেকজাতীয় পশুপক্ষী লোপ পেল
আর কোনও কোনও জাতীয় পশুপক্ষী প্রয়োজনীয় দৈহিক
পরিবর্তন হাঙ্গল ক'রে রক্ষা পেল। জীবের খাদ্য বদলে
গেল। অ-বিশিষ্ট-নরকল্প গোষ্ঠী, যাহা এতদিন প্রধানত
ফলমূল ভক্ষণ ক'রত ও গাছে গাছে বেড়াইত, এখন তাহা
বাসভূমি গাছশূন্য হওয়ার, মাটিতে দুই পায়ে হাঁটতে অভ্যাস
হ'তে লাগল; ও ক্রমে হাতের অঙ্গ আঙ্গুলগুলির সাহায্যে কাজ
করবার উপযোগী বৃদ্ধাঙ্গুল (opposable thumb) হাঙ্গল ক'
পিথেকানথোপাস বা পিল্টডাউন মহাপ্রাণ প্রভৃতির রূপ গ্রাহ্য
হ'য়ে “প্রাক-মানব” পরিণত হ'ল ও নানা দেশে ছড়িয়ে
পড়লো। হিমালয়ের দক্ষিণে যে উপসাগর হয়েছিল, ও
ক্রমে পলিমাটিতে ভরে গেল ও ক্রমে সঙ্কুচিত হ'য়ে কেবল
একটি প্রকাণ্ড নদে পরিণত হ'ল। এই নদ তখন বর্তমান
সিন্ধুনদের মুখ হ'তে গঙ্গার মুখ পর্যন্ত, — অর্থাৎ আরব্যোপ
সাগর হ'তে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কালক্রমে
তাও অনেকটা ভরাট হ'য়ে সিন্ধু উপত্যকা ও গঙ্গাতীরে
সমতল ভূমি গড়ে উঠল, ও আরও ভরাট হয়ে পঞ্জাব
বা পঞ্চ-নদের দেশ, উত্তর-পশ্চিমের দোয়াব, বিহারে
পলিমাটিপূর্ণ সমতল ভূমি ও বাজলার ব-দ্বীপ তৈরির হ'ল এবং
তাদের মধ্যে সিন্ধুনদ ও তার শাখাগুলি, এবং গঙ্গা ও যমুনা
প্রবাহিত হ'তে লাগল। এই সব কারণে মধ্য-এশিয়া হ'য়ে
দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে দিকে বাতারাতের পথ হ্রাস হ'ল।

মধ্য-এশিয়াতে মানবের উদ্ভব হওয়ার পক্ষে অজ্ঞাত বৃত্তি
যদিও সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৃত্তি এই যে, প্রথমতঃ, সব জে

আদিম মন-প্রায় জীব-অর্থাৎ, পিথেকানথোপাস ইবের্টাস বা টিনিল মানবের কঙ্কালবশেষ এশিয়ায়ই যব-দ্বীপে (Javaতে) পাওয়া গেছে; দ্বিতীয়তঃ এশিয়াতে মানবের তিনটি প্রধান শাখাই (যেত, পীত ও কৃষ্ণ-ত্বক মানব) বর্তমান; তৃতীয়তঃ, যে সব ভাষা একশব্দ-শব্দ-বহুল (monosyllabic), যে-সব ভাষার শব্দরূপ ও ধাতুরূপ হয়, এবং যে-সব ভাষায় মূল শব্দসমূহ অর্থ বা রূপের পরিবর্তন ব্যতিরেকে সম্মান-বদ্ধ হয়, ভাষার এই তিন প্রধান শাখাই এশিয়ায় ব্যবহৃত হয়; চতুর্থতঃ, সকল প্রাচীনতম মানব সভ্যতার জন্মস্থান এশিয়াতে; পঞ্চমতঃ, আধুনিক মানব জাতির (Homo sapiens এর) সর্বপ্রথম প্রধান ইউরোপীয় প্রতিনিধি ক্রোমাগনন (Cromagnon) জাতিরও কোনও কোনও দৈহিক আকৃতিতে মধ্য-এশিয়াবাসী মানবের আকৃতির আভাস পাওয়া যায়; এবং ষষ্ঠতঃ, অধিকাংশ গৃহপালিত জন্তুরও উৎপত্তিস্থান এশিয়াতেই অবস্থিত।

সে যা হোক, এ-পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ যত দূর পাওয়া গেছে, তার সাহায্যে মানবের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের ইতিহাস যতটা অল্পমান করা যায়, তা এইরূপ। অ-বিশিষ্ট মানবীয় গোষ্ঠী সোজা উন্নতির পথে উঠতে উঠতে অ-বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হ'ল। কিন্তু তাদেরও এক দলের পর আর এক দল খানিকদূর এগিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে অবাস্তব পথে এক একটি ফাঁকড়া বা প্রশাখা রূপে মানবীয় শাখা হ'তে বিচ্যুত হ'তে লাগলো এবং কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হ'ল। এইরূপেই পেকিং মহত্ম (Sinanthropus Pekinensis) এবং রোডেসিয়ান মহত্ম (Homo Rhodesiensis) প্রধান মানব শাখা হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোজা ক্রমোতির পথ হারিয়ে ফেললো, এবং অবাস্তব পথে প্রগাধারূপে কিছু বৃদ্ধি পেয়ে অবশেষে ক্রমে লোপ পেল। সম্ভবতঃ তৃতীয়ক যুগের (Tertiary period এর) অন্তে কিংবা চতুর্থক যুগের (Quaternary period এর) প্রারম্ভেই এই দুই জাতিরই লয় হয়। ইহাঙ্গিকে সকলের "গোড়ার মাছুষ" বলা যেতে পারে। এদের হিংস্রপশুভাবাপন্ন (brutal-looking) আকৃতি এবং এদের নির্ধৃত উবা-শিলা (Eoliths) বা প্রাথমিক পাথরের অস্ত্রের কথা পূর্বে প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। এই উবা-শিলাগুলির গঠনভেদে রয়টিলিয়ান (Reutehian),

ম্যাফলিয়ান (Maffian) এবং মেসভিনিয়ান (Mesvinian) নামকরণ করা হয়েছে।

এই গোড়ার মানব-জাতি যদিও মানব-শাখার প্রথম প্রশাখা বলে পরিগণিত হয়, তবুও আধুনিক মানব (Homo recens) বা আসল মানব (Homo sapiens) হ'তে দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষে এদের স্থান অনেক নীচে। এদের কঙ্কালবশেষ এবং হাতের তৈরি অস্ত্রাদি ইহার প্রমাণ।

বস্তুতঃ এই 'গোড়ার মানবের' আবির্ভাবের অনেক পরে অ-বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীর আর একটি অধিকতর পরিপুষ্ট ও উন্নত প্রশাখা রূপে আর-এক-জাতীয় মাছুষের হঠাৎ অভ্যুদয় দেখা যায়। অত্যাধুনিক যুগের (Pliocene age-এর) শেষভাগ হ'তে চতুর্থক যুগের (Quaternary period-এর) অন্ততঃ তৃতীয় তুষার অন্তর্গত (Third glacial age) ও তৃতীয় অন্তস্তষার অন্তর্গত (Third Inter-glacial age) পর্যন্ত জর্দীখকাল পৃথিবীর নানা দেশে এই জাতীয় মানবের প্রাদুর্ভাব হয়। এই জাতীয় মানবের কঙ্কালবশেষ প্রথমে প্রুসিয়া দেশের ডুসেলডরফ (Dusseldorf) শহরের নিকটবর্তী নিয়াণ্ডারথাল (Neanderthal) নামক গিরিবন্ধে (ravine) তুষার-কালে (Pleistocene) ভূস্তরে ডাক্তার ফুলরট (Dr. Fuhlrott) ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। এই স্থান হ'তেই ইহার নামকরণ হয়। এই জাতির মাথা একটু চাপা এবং খড়ের উপর ঘাড় ও মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে; তুরুর উপরের হাড় (eye-brow ridges) অনেকটা উচু (beetling), কপাল খোদল (retreating forehead), খুব মস্ত চোয়াল (massive cheek-bones) জন্বা দেশ একটু বাঁকা (curved), ঠাং ছুটি খড়ের তুলনায় একটু লম্বা; আর লোকগুলি কিছু বেঁটে-৫ ফুট ৪ ইঞ্চির বেশী লম্বা নয়। মোটের উপর সব চেয়ে গোড়ার মাছুষদের মতন ইহাদেরও খানিকটা পশুভাবাপন্ন (brutal-looking) চেহারা। যদিও আধুনিক মহাজাতির (Homo sapiens-দের) মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বর্কসকায় অসভ্য আদিমনিবাসীদের সঙ্গেই নিয়াণ্ডারথাল মানবের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং যদিও কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মনে করেন যে, নিয়াণ্ডারথাল মানবের রক্ত অস্ট্রেলিয়ানদের

ধমনীতে কিছু থাকিতে পারে, তবু এই দুই জাতি শারীরিক গঠনে কত দূর বিভিন্ন, তাহা এই প্রবন্ধের চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। নৃত্যবিশিষ্ট পণ্ডিতেরা প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে এই নিম্নাণ্ডাখাল জাতিকে আধুনিক মানব-জাতি হইতে বিভিন্ন জাতি ব'লে স্থির করেছেন এবং নিম্নাণ্ডাখাল মানুষকে “আদিম মানব” (*Homo Primigenius*) ও তৎপরবর্তী মানব বা আধুনিক মানবকে “আসল মানব” (*Homo sapiens*) নাম দিয়েছেন।

আসল বা আধুনিক মানব-জাতির মধ্যে যেমন তিন রকমের মাথার গড়ন দেখা যায়,—গোল ধরণের মাথা (*brachycephaly*), লম্বাটে মাথা (*dolichocephaly*) এবং মাঝারি ধরণের মাথা (*mesocephaly*), নিম্নাণ্ডাখাল মানবের মধ্যেও সেইরূপ তিন বিভিন্ন ধরণের মাথা-বিশিষ্ট লোক দেখা যায়; যেমন ক্রাপিনার (*Krapinar*) প্রাপ্ত লম্বাটে নিম্নাণ্ডাখাল কঙ্কালের গোল মাথা, স্পাই (*Spy*) এবং ডুসেলডরফে (*Dusseldorf*) প্রাপ্ত কঙ্কালের লম্বাটে মাথা এবং জিত্রালটারে প্রাপ্ত কঙ্কালের মাঝারি ধরণের মাথা। ইহাতে অসম্ভব হয় যে, আধুনিক মানবের মধ্যে যেমন লম্বাটে মাথা-বিশিষ্ট (*long-headed*) নর্ডিক (*Nordic*) ও মেডিটারেনিয়ান (*Mediterranean*) প্রভৃতি জাতি, গোল ধরণের মাথা-বিশিষ্ট (*round-headed*) আলপাইন (*Alpine*), মঙ্গোলিয়ান (*Mongolian*) প্রভৃতি জাতি, এবং মাঝারি ধরণের মাথা-বিশিষ্ট (*Medium-headed*) আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান জাতি প্রভৃতি দেখা যায়, ঐ ‘আদি-মানব’ জাতিও তেমনি নানা জাতিতে বিভক্ত ছিল।

এই “আদিম মানব” জাতির কঙ্কালবশেষগুলির সঙ্গে তাদের হস্তনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্র-যে-কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা হুইতে জানা যায় যে, ইহারা পূর্ববর্তী “গোড়ার মানুষ” (*Proto-man*)দের চেয়ে কেবল যে দৈহিক গঠনে উন্নত হইতেন তা নয়, সভ্যতার দিক্‌তে কয়েক ধাপ উপরে উঠেছিল। এরা আত্মনের ব্যবহার জানতো; মাংসাদি কোথ হই-কলসে খেতে জানতো; মৃত আত্মীয়ের কবরের সঙ্গে কবর দিত এবং মৃতের কবরে তাদের অঙ্গাদিও দিতে দিত। মৃত্যুমান অসম্ভব কষ্ট দাঁত, তাহা পরলোকে বিবাহ করতো। ইহাদের অস্ত্রগুলি পাথরের তৈরি

এই জাতির নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র যা-কিছু পাওয়া গেছে তার মধ্যে অবশ্য তেমন বৈচিত্র্য নাই। একটা পাথরে চোলা নিয়ে অস্ত্র পাথর দিয়ে ভাঙতো আর পাশগুলি (*sides*) ভেঙে (*chipping*) আগাটা ধার করতো; পরবর্তী নৃত্যপ্রস্তর-যুগে (*Neolithic age*) যেমন পাথর ভেঙে টুকরো করে এক একটি টুকরোকে ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতন বিভিন্ন আকার দিয়ে অস্ত্র পাথরে ঘষে পালিশ করা হ’ত, এরা তেমনি করিতে শেখেনি। পুরাতন প্রস্তর-যুগ (*Palaeolithic age*) আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—নিম্ন ও উর্দ্ধ। যদি নিম্নাণ্ডাখাল-মানবের অস্ত্র-শস্ত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না, তবু তাহাদের বহুসহস্রবর্ষব্যাপী স্থিতিকালের মধ্যে অস্ত্রের গঠনভঙ্গি যে ক্রমিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল, তাহা তাহাদের নির্মিত স্ট্রেপিয়ান (*Strepian*), চেলিয়ান (*Chellian*), অসোইলিয়ান (*Acheulian*) এবং মুষ্টিরিয়ান (*Mousterian*) অস্ত্রগুলি একের সহিত অপরের তুলনা করলে বুঝতে পারা যায়। এগুলি সব নিয়ে পুরাতন প্রস্তর-যুগের (*Lower palaeolithic*)।

এই নিম্নাণ্ডাখাল জাতি সম্ভবতঃ উত্তর-আফ্রিকা হ’তে ইউরোপে যায়; উত্তর-পশ্চিম ইংলণ্ড পর্যন্ত এই জাতি কঙ্কালবশেষ ও হস্তনির্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া গেছে। পূর্বে প্যালেস্তাইন দেশের গ্যালিলি প্রদেশেও ইহাদের কঙ্কালবশেষ পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষে যদিও নিম্নাণ্ডাখাল মানব কঙ্কালবশেষ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, তাদের নির্মিত চেলিয়া ও মুষ্টিরিয়ান অস্ত্রের অনুরূপ পুরাতন প্রস্তর-যুগের অস্ত্র (*palaeoliths*) ভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে, পাওয়া যায়; বর্তমান লেখক এবং আরও কেহ কে এক্ষণ অস্ত্রাদি পেয়েছেন; এবং ভারতের কোনও কোনও যাহুঘরে কিছু নমুনা রক্ষিত আছে।

কোনও কোনও নৃত্যবিশিষ্ট পণ্ডিত মনে করেন যে, তুষার যুগের (*Glacial age* এর) শেষ ভাগে যেমন ইউরোপে তুষার-নদী (*glacier*) গুলি উঠের স’রে খেতে লাগলো, পৃথিবীর জলবায়ু, উদ্ভিদ ও জীব-জগতের পরিবর্তন হ’তে লাগলো, মানুষের চোহাও তেমনি বদলে গিয়ে নিম্নাণ্ডাখাল মানবেরই কণ্ঠধরো তুষার-যুগের পরবর্তী কালে (*Post glacial period*) অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ও হুই অওরিগনেসিয়ান (*Aurignacian*) ও ক্রেকমান



শ্পেন দেশে প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষদের কার্জনিক ছবি

(Cromagnon) প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হ'ল। কিন্তু অধিকসংখ্যক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে এই নিয়াণ্ডারথাল জাতিও অবশেষে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হয়ে ক্রমে লোপপ্রাপ্ত হয়। তবে হযত অষ্ট্রেলিয়া দেশের অসভাদের মধ্যে তাহাদের কিছু রক্তসংশ্রমণের চিহ্ন বর্তমান। তুহার-যুগের পরবর্তীকালে ইউরোপে যে অওরিগনেসিয়ান ও ক্রোমাগনন প্রভৃতি জাতির আবির্ভাব হ'ল এবং অস্ত্রাচ নামে অস্ত্রাচ দেশে ছড়িয়ে পড়ল, তারা নতুন মানব-জাতি (Neanthropic Man)। নিয়াণ্ডারথাল মানুষ জীবরক্ষের মানবশাখার প্রশাখামাত্র ছিল; প্রধান মানব শাখা আরও পরিপুষ্ট হয়ে উঠে উঠে শেষে এই নতুন মানব-জাতিতে পরিণত হল। এই ক্রোমাগনন প্রভৃতি নতুন মানুষের (Neanthropic Man-এর) চেহারা: আধুনিক মানুষের (Homo recens বা Homo sapiens এর) অনেকটা অনুরূপ, যদিও তত হুত্মী ও হৃদয় নয়। বস্তুতঃ এদেরই বংশধররাই আধুনিক মানব (Homo sapiens) হয়ে দাঁড়াল। এদের মাথার খুলি উঁচু, নিয়াণ্ডারথাল-মানবের মতন চ্যাপ্টা নয়; ত্বকুর হাড় নিয়াণ্ডারথালদের মতন উঁচু (prominent বা bulging) নয়, দাঁতের নীচের মাড়ি (lower jaw) ছোট, দাঁতও ছোট, এবং লম্বায় ক্রোমাগনন জাতি দীর্ঘকায়।

তুহার-যুগের পরবর্তী নাতিশীত নাতিগ্রীষ্ম আবহাওয়ায় এই সব জাতিদের জীবনসংগ্রামের দায় অনেক হালকা হয়ে গেল; এবং সভ্যতার সিঁড়িতে এগিয়ে উঠবার অনেক বেশী সুবিধা ও সময় এরা পেল। নানা রকমের হৃদয় হৃদয়

গঠনের পাশি করা অস্ত্র এই পুরাতন প্রস্তর-যুগের শেষভাগে (Upper Palaeolithic ageএ) প্রস্তুত হ'তে লাগলো। ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে আজকাল আমরা তৎকালীন সভ্যতার স্তর বা শ্রেণী বিভাগ করেছি। প্রথম, অওরিগনেসিয়ান সভ্যতা (Aurignacian Culture); সেই আদিম সভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ প্রস্তরের বহুবিধ হৃদয় অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া পশ্চিম-ইউরোপের পর্বতগুহার গায়ে বা ছাদে আঁকা অনেক জীবন্ত (life-like and realistic) রঙীন চিত্র, বিশেষতঃ শিকারের, শিকারীর ও বজ্র পশুপক্ষীর, পাওয়া গেছে। ভারতে মধ্যপ্রদেশের নিকটবর্তী ছত্তিশগড়ের অন্তর্গত রায়গট রাজ্যে সিদ্ধানপুর গ্রামের পর্বতগুহার সেইরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের সিদ্ধানপুর স্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। এই প্রবন্ধ-লেখক সিদ্ধানপুরের সেই পাহাড়ের নীচে অওরিগনেসিয়ান শিলা-অস্ত্রের অনুরূপ (Aurignacian flakes) কয়েকটি পেয়েছেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মিরজাপুর জেলার ছাতা গ্রামের অনতিদূরে কাইনুর পর্বতশ্রেণীর কয়েকটি গুহার (cave sheltersএ) ও পাহাড়ের গায় যে-সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক চিত্র দেখা যায়, সেগুলি নতুন প্রস্তর-যুগের হওয়া সম্ভব। ভালদরিয়া নদীর তীরে লিম্বুনিয়া গুহার নিকট নতুন প্রস্তর-যুগের শিলা-অস্ত্র পাওয়া গেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, অল্পসময়ের অভাবে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক কালের নরককালাবশেষ এখনও বিশেষ পাওয়া যায় নি।

ইউরোপে অওরিগনেসিয়ান সভ্যতার প্রাচুর্য কালে

যে গ্রিমালডি জাতির কঙ্কালবশেষ পাওয়া গেছে, তারা আফ্রিকার আধুনিক নিগ্রোজাতির পূর্বপুরুষদের জাতি বলিয়া অনুমিত হয়। আর ফারফুজ (Farfooz) নামক গোলমস্তকবিশিষ্ট (brachycephalic) যে জাতির কঙ্কালবশেষ ইউরোপে পাওয়া গেছে, তারা সম্ভবতঃ



রোডো-গামান মানব দেখিতে সম্ভবতঃ এইরূপ ছিল

এশিয়ার মোকোশিয়ানদেরই পূর্বপুরুষদের জাতি ছিল বলে মনে করা হয়।

অওরিগনেসিয়ান সভ্যতার (Aurignacian culture) পরে ইউরোপে ক্রোমাগন জাতির পর্যায়ক্রমে সলুট্রিয়ান (Solutrean) ও তার পর ম্যাগডেলেনিয়ান (Magdalenian) সভ্যতার (culture) অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। সলুট্রিয়ান সভ্যতাকালের সুন্দর লরেল পাতার নমুনা নির্মিত (laurel-leaf pattern) শিলা-অস্ত্র দেখিতে বড় সুন্দর। তার পরের ম্যাগডেলেনিয়ান সভ্যতা-প্রসূত আরও সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র ও ইউরোপের পর্বত-গুহায় অঙ্কিত চিত্রগুলি আরও মনোরম। এই সময় হাতীর দাঁতের ও হরিণের শিঙের দ্বারা সুন্দর বস্ত্র বা বর্ষা ও তীর তৈরি হ'ত এবং তার উপর সুচিকন কারুকাৰ্য করা হ'ত। ইহাদের গোরস্থানে সুন্দর সুন্দর অস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি পাওয়া যায়, এবং কোনকোন শব এক প্রকার লাল মাটির (red ochre) ভিতর পোতা হ'ত।

এর পরে কিছু দিন মধ্য-প্রস্তর-যুগ (Mesolithic culture) আরম্ভ হ'ল এবং অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই তিরোহিত হ'ল। এটা পুরাতন প্রস্তর-যুগ হ'তে নতুন প্রস্তর-যুগের পরিবর্তন হবার সন্ধিকাল (transitional period) তার পর চতুর্থক যুগের (Quaternary period) প্রাথমিক (Pleistocene) অস্ত্রযুগ শেষ হ'য়ে আধুনিক (recent) অস্ত্রযুগ এল। এই অস্ত্রযুগের প্রারম্ভে এ সময়ে ইউরোপে শিল্পকলা কিছু যান হয়েছিল। এই কালের আজিলিয়ান ও টারডিনেসিয়ান সভ্যতার (Azilian-Tardenoisian Culture) সন্ধ্যা উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নেই। কেবল অতি ক্ষুদ্র শিলা-অস্ত্র নির্মাণে তখনকার লোক সিদ্ধহস্ত ছিল।

চতুর্থক যুগের (Quaternary Period) প্রাথমিক (বা Pleistocene) অস্ত্রযুগের অস্ত্রে, 'আধুনিক মানব' জাতি-সমূহের অ-বিশিষ্ট পূর্ব-পুরুষেরা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। চতুর্থক যুগের (Quaternary Period) প্রাথমিক (Pleistocene) অস্ত্রযুগ শেষ হয়ে আধুনিক (Recent) অস্ত্রযুগ এল। এই অস্ত্রযুগের প্রারম্ভে নতুন প্রস্তর-কাল ছিল। ঐ সময় সুন্দর পাশিশ করা নানা রকম পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কারাদি তৈয়ার হ'ত। চাষবাসের ও পশুপালনের আরম্ভ হ'ল। মাটির বাসন ও হাড়িকুড়ি হাতে গড়া হ'তে লাগল। মাতৃষের মৃতদেহ প্রোথিত করবার জন্য পাথরে মণ্ডিত গোল এবং লম্বা কবর (dolmens, stone-circles, etc.) প্রভৃতি প্রস্তুত হ'তে আরম্ভ হ'ল; এবং স্মরণীয় মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতিচিহ্নরূপ প্রস্তরস্তম্ভ (menhirs) খাড়া করবার প্রথ প্রবর্তিত হ'ল। এই কালের পাথরের ও মাটির প্রস্তুত অনেক প্রকার তৈজসপত্র ও শকটের চাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়।

কিছুকাল পরে ইউরোপে দস্তা ও তামার সংমিশ্রণ প্রস্তুত একরূপ কঁাসার (bronze) চলন হ'ল ও ভারতে তামার ব্যবহার আরম্ভ হ'ল। ছোটনাগপুরে এই প্রবন্ধলেখক একটি ব্রোঞ্জের কুঠার পেয়েছিলেন। এটি পাটনা যাত্রাঘরে রক্ষিত আছে। ভারতে আর দ্বিতীয় ব্রোঞ্জের কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে বলে জানা নাই। নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার, ও বাসন হাড়িকলদী প্রভৃতি এই সব ঋতুতে প্রস্তুত হ'তে লাগল; পোনার এবং মূল্যবান পাথরের অলঙ্কারাদিও তৈয়ার হ'তে লাগলো। প্রথমে পাথর ও তামা দুই-ই এক সময় ব্যবহার হয়; তাই সে কালকে তাম্র-প্রস্তর-যুগ (chalcolithic period) বলা হয়। তাম্র-যুগ ও তাম্র-প্রস্তর-যুগের এত সুন্দর সুন্দর খাঁচের (pattern) অলঙ্কারাদি দেখা যায় যে, তা আধুনিক সেকরাদের তৈরি জিনিষের সঙ্গে সমকক্ষতা করতে পারে। সিঙ্কনদের উপত্যকার মহেঞ্জোদাড়ো এক

হারাশ্মায় এবং ভারতের আরও কোনও কোনও স্থানে ই যুগের ধরাবশেষের মধ্যে এরূপ দ্রব্যসম্ভার পাওয়া গেছে। তাম্র-যুগের পরে পুরাতন লৌহ-যুগ এবং এখন আধুনিক লৌহ-যুগ।

তৃতীয় যুগের অন্ত্যাদুনিক (Pliocene) অন্তর্ভুক্ত যে মানবীয় শাখা (Humanoid stem : মানব-শাখায় (Human stemএ) পরিণত হয়ে ক্রমে প্রাথমিক মানব (Homo Primigenius) বা নিয়াণ্ডারথাল-মানব নামক প্রশাখা উৎপন্ন করেছিল; এবং ক্রমে মূল অ-বিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীর উদ্যমশীল প্রধান শাখা আবার পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক অবস্থার সঙ্গে প্রাকৃতিক ও ঐচ্ছিক নির্বাচনের সাহায্যে আপনাদিগকে মিলিয়ে বীজের ক্রমিক প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হাসিল করে অবশেষে চতুর্থক যুগের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তির অন্তর্গত 'আসল মানব' বা 'আধুনিক মানব' পরিণত হ'ল,—সেই ক্রম-বিকাশ-পদ্ধতির সমগ্র ইতিহাস



নিয়াণ্ডারথাল
মানবের কঙ্কাল।



আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার
আদিম-নিবাসীর
কঙ্কাল

আমরা জানতে পারিনি। তৃতীয়ক যুগের অজ্ঞাত ইতিহাস অলিগোথিক (Oligocene) ও মধ্যাদুনিক (Miocene) যুগযুগের অঙ্ককারে অ-বিশিষ্ট মানবকল গোষ্ঠীর কত কত প্রশাখা পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক পরিবর্তনের সঙ্গে আপনাদিগকে মিলিয়ে নিতে না পেরে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, তার সব নিদর্শন পাওয়া যায় না। চতুর্থক যুগের প্রাথমিক (Pleistocene) অন্তর্ভুক্ত যে-সব মানব-শাখার যে-সব প্রশাখা আপন আপন অযোগ্যতার জন্য বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের সমস্ত হিসাব আমরা পাই না। কেবল এই মাত্র অনুমান করতে পারি যে অন্ত্যাদুনিক (Pliocene) কালের প্রধান মানব-শাখা

(main human stem) হ'তে যে আধুনিক মানব-জাতির (Homo sapiensএর) উৎপত্তি হয়েছে, তাহা প্রাকৃতিক ও ঐচ্ছিক নির্বাচনের এবং বৃদ্ধির পরস্পরসাপেক্ষ নিয়মের (law of correlated growthএর) সাহায্যে যথোচিত



নতুন প্রস্তর-যুগের মানুষদের কাল্পনিক ছবি

ক্রমিক অল্পকাল পরিবর্তন (successive favourable variations) ভূমিতে যোগ্যতমের উদ্ভব (survival of the fittest) নিয়ম অনুসারে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হাসিল করেই (by a process of extraordinary progressive differentiation) এইরূপ হ'তে পেরেছে।

যে-সমস্ত অল্পকাল পরিবর্তনের সমষ্টি অ-বিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীকে আসল মানব বা আধুনিক মানবে পরিণত করতে পেরেছে, সেগুলি সমস্তই ক্রমিক বা ধীরে ধীরে আয়ত্ত (gradual) নয়, কোন-কোনটিকে হঠাৎ করায়ত্ত পরিবর্তন (saltatory changes বা sudden mutations) বলা যেতে পারে। এইরূপে যে-সমস্ত পাশবিক লক্ষণ অ-বিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীকে 'আসল মানবে' পরিণত হ'তে বাধা দিচ্ছিল, সেগুলি একে একে অপসারিত হওয়ার আধুনিক উচ্চতর মানব-জাতির আবির্ভাব হ'ল।

পিথেকানথোপাস (Pithecanthropus) প্রভৃতি প্রাক-মানবের উদ্ভবকাল হ'তে আজ পর্যন্ত কত শত লক্ষ বৎসর গত হয়েছে। পণ্ডপ্রায় অসভ্য বর্বর 'গোড়ার মানুষের' অপেক্ষা 'আধুনিক মানুষ' সভ্যতার পথে অনেক দূর অগ্রসর

হয়েছে সত্য, কিন্তু এখনও মানবের চরম উন্নতির—বর্থাৎ
মহুগ্ধ বা ‘দেবত্ব’ লাভের আশা ক্ষুদ্রপর্যায়ত। এখন
পর্যায় উচ্চসভ্যতামানী জাতিদের মধ্যেও পশু-গন্ধ
(smell of the beast) বিলুপ্ত হয় নি; এখনও
মানুষের রক্ত মাছুষে শোষণ ক’রছে—কেবল অসভ্য মানব-
মস্তক-শিকারী (head-hunters) আদিম জাতিরা নয়,
অসভ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমুদ্রশালী জাতিরাও এ-বিষয়ে তাদের
চেয়ে পশুংপদ নন। কেবল হনন-কৌশলে যা-কিছু প্রভেদ।

এই সব দেখে মনে হয়, মানুষ এখনও উন্নতির পথের
নতুন যাত্রী যাত্র; উন্নতির হৃদয়ী রাস্তা এখনও অন্তহীন
বলে মনে হয়। ইংরেজ-কবি টেনিসন তাঁহার “উষা”
("The Dawn") নামক কবিতায় বর্থাৎই বলেছেন,—
আমরা এখনও সভ্যতার রক্তাক্ত উষাকাল অতিক্রম
করিনি :—

"Red of the dawn !

* * * * *
For Babylon was a child new-born, and Rome was a
Labe in arms,
And London and Paris and all the rest are as yet
but in leading strings."

কবির সঙ্গে বিবর্তনবাদী মৃতদেবীরাও মনশ্চক্রে দেখেন,
একদিন—

"Earth at last a warless world, a single race,
a single tongue,
—I have seen her far away—for is not earth
as yet so young ?—
Every tiger madness muzzled, every serpent
passion killed,
Every grim ravine a garden, every blazing
desert filled."

(Locksley Hall Sixty Years After.)

কারণ,—

"Only that which made us, meant us to be mightier
by and by :
Set the sphere of all the boundless Heavens within
the human eye,
Sent the shadow of Himself, the boundless, through
the human soul :
Boundless inward, in the atom, boundless outward,
in the Whole."

(Locksley Hall Sixty Years After.)

মনোরাজ্যের কাহিনী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নদীর বুকে যেমন ডেউয়ের পর ডেউ জাগে, মনের মধ্যেও
তেমনই চিন্তার পর চিন্তা জাগে। ডেউ জলের ভিতর
হইতে উঠিয়া জলের ভিতরেই আবার মিলাইয়া যায়;
চিন্তাও মনের অন্তর হইতে উঠিয়া আবার মনের অন্তরেই
আত্মগোপন করে। নদীর বুকে ডেউয়ের গুঠা-পড়ার যেমন
বিরাম নাই, মনের মধ্যেও চিন্তার ভরঙ্গ তেমনই কেবলই
উঠিতেছে, কেবলই পড়িতেছে।

মনের উপরিভাগে যখন একটি চিন্তা জাগিয়া থাকে,
তখন অজ্ঞাত চিন্তা মনের অন্তরে অপেক্ষা করে উপরে
উঠিবার জগ্ন। যে-চিন্তাটি চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করিয়া
থাকে, সেটি কিছুক্ষণ পরে বিশ্বস্তির রাজ্যে চলিয়া যায়।
চেতনার রাজ্যে নতুন নতুন চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়
নেপথ্যের অন্ধকার হইতে। মন যেন থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ।
রঙ্গমঞ্চে নটবালকেরা নাচিয়া গাহিয়া নেপথ্যে চলিয়া যায়।
নতুন অভিনেতারী আসে নতুন ভূমিকা লইয়া উপস্থাপনা
হইতে প্রকাশ্যে। মনের রঙ্গমঞ্চেও জাহ। বিশ্বস্তির
অন্ধকার হইতে চেতনার আলোকে এবং চেতনার আলোক
হইতে বিশ্বস্তির অন্ধকারে চিন্তার ছুটাছুটির বিরাম নাই।

মনের যে-দিকটা চেতনার আলোকে আলোকিত তাহাকে

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, সজ্ঞান অবস্থা (conscious state)
মনের যে-দিকটা চেতনার রাজ্যের বহির্ভূত, যে-
দিকটা বিশ্বস্তির অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সেই দিকটার নাম
অসজ্ঞানিক অবস্থা (sub-conscious state)। এট
আন্তর্জাতিক প্রদেশের অলক্ষ্যে কত চিন্তাই যে লুকাইয়া
আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা জীবনে যত কিছু চিন্তা
করি তাহার কোনটাই একেবারে নষ্ট হয় না। সেগুলি
চেতনার রাজ্য হইতে বিশ্বস্তির রাজ্যে চলিয়া যায়। সেই
বিপুল অন্ধকারের রহস্যময় রাজ্যে কত দিনের কত আশা-
আকাঙ্ক্ষাই না লুকাইয়া আছে। কবে পৈশবের সোনালী
প্রভাতে যা আমার চিবুক ধরিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিয়াছে,
ঠাকুরমা ভোরের বেলায় কৃষ্ণের শতনাম শুনাইয়াছে, আহা
করাইবার সময় রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলিয়াছে, লক্ষণের
শক্তিশেল, অভিমত্যাযধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে দুই গণ্ড
বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়াছে, প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে একে একে
কত কথাই না মনে পড়িতেছে। সে কতকালের কথা!

এতক্ষণ এই সব ছবি কোথায় আত্মগোপন করিয়া ছিল?
কোথায় ছিল আমার ছোট চিবুকটিতে মাঘের হাতের
সেই স্পর্শের স্মৃতি?

দমদম জেলের কক্ষের শয্যা বসিয়া লিখিতে লিখিতে মনের সামনে বায়স্কোপের ছবির মত শুধু ছবির পর ছবি জাগিতেছে। অনেক দিন তাহাদের কথা ভাবি নাই। কিন্তু একটি কথাও শৃঙ্খলার মধ্যে নিঃশেষ এবং নিষ্কিছ হইয়া যায় নাই। নিঃশেষে মুছিয়া গেলে আজ তাহারা মনের আকাশে তারার মত এমন করিয়া একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিত না। আরও অনেক কথা, লজ্জার কথা, গৌরবের কথা, ভয়ের কথা, সাহসের কথা, দুঃখের কথা, সুখের কথা, সোহাগের কথা, শাসনের কথা—অনেক কথা মনের কোণে গুপ্ত হইয়া আছে, হুপ্ত হইয়া আছে। মনের যে-প্রদেশে অতীতের এবং বর্তমানের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে তাহাই হইতেছে অবচেতনার প্রদেশ। সেই বিশ্বস্তির কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রদেশে এক দিন এই দমদম জেলের ছবিও মিলাইয়া যাইবে। সে-দিন নতুন দৃষ্ট চোখের সামনে জাগিয়া উঠিবে; চোখ দেখিবে নতুন মাল্লারের মৃৎ, কান শুনিবে নতুন মাহুষের কথাধনি। বর্তমান সে-দিন অতীতের গর্ভে ঢলিয়া পড়িবে, ভবিষ্যৎ বর্তমানের মধ্যে আসিবে। এমনি করিয়া যাহাকে বর্তমানে জানিতেছি রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মধ্য দিয়া, তাহা অতীতের মধ্যে নিমিষে নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে; যাহাকে পূর্বে জানি নাই তাহাকে মুহূর্তে মুহূর্তে জানিতেছি। কিন্তু সমস্ত পারবর্তনের মধ্যে একটি সত্য আছে যাহা আমরা ভুলিব না। যাহা যায় তাহা নিঃশেষে মুছিয়া যায় না—তাহা মনের অতল প্রদেশে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

মনের এই অবচেতনার ক্ষেত্রে আমরা চিন্তের চোরাকুঠুরীও বলিতে পারি। অন্তরের অসংখ্য বৃত্তি বা চিন্তা চেতনার আলোকে দীপ্তমান মনের প্রাকান্ত রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়া চোরাকুঠুরীতে চলিয়া যায়। তখন তাহাদের কথা আমরা ভুলিয়া যাই। কোন কারণের স্বরূপ অবলম্বন করিয়া তাহারা যখন-তখন চেতনার ক্ষেত্রে আসিতে পারে।

দুঃস্থের হৃদয় হইতে শকুন্তলার স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছিল। কথের তপোবনে প্রিয়ার সহিত সেই প্রথম সাক্ষাৎ, কুঞ্জকূটারে প্রেয়সীর সহিত সেই গোপনমিলন, কানে কানে সেই কত সোহাগবাণী—দুঃস্থ সব ভুলিয়া গিয়াছিল। শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার মূলে এই বিশ্বাস্তি। তাহার পর দীর্ঘর আসিয়া যখন শকুন্তলার হারাণে অদুরীয়টি আনিয়া রাজাকে দেখাইল তখন রাজার একে একে সব কথা মনে পড়িয়া গেল। বিশ্বস্তির দুয়ার খুলিয়া রাজার চেতনার রাজ্যে আসিয়া দাঁড়াইল কথের দুহিতা শকুন্তলা; নবযৌবনা হৃদয়ী যুবতী সখীদের সঙ্গে আলবালে জলসেচন করিতেছে। আরও কত কথা একে একে রাজার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল। অদুরীয়কে আশ্রয় করিয়া বিশ্বস্তির আবরণ

ঠেলিয়া শকুন্তলা স্মৃতিপথে আসিয়া দাঁড়াইল এবং রাজাকে অল্পশোচনার তীক্ষ্ণ শরে একেবারে অভিভূত করিয়া দিল। এমনি করিয়াই বাহা বিশ্বস্তির রাজ্যে এক দিন চলিয়া যায় তাহা সহসা স্মৃতিপথে আসিয়া উদ্ভিত হয়—যাহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে আসিয়া কখন চোখের সলে বঙ্গ ভাগাইয়া দেয়—যাহার মুখের ছবি বহু দিন মনে পড়ে নাই সে কখন রাতের অন্ধকারে নিদ্রাহীন আঁধার আগে আসিয়া দাঁড়ায় এবং অভিমানভরা চলছিল চোখে নীরবে আমাদের গিকে তিরস্কার করে।

সকল সময়ে একটা কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়াই যে বিশ্বস্ত চিন্তা মনের চোরাকুঠুরী হইতে চেতনার প্রকাশে আসিয়া উপস্থিত হয় এমন নহে। অনেক সময় অকারণে অনেক কথা মনে পড়িয়া যায়। উপাস সন্ধ্যায় দূর আকাশের পানে চাহিয়া হঠাৎ মনে পড়ে প্রিয়জননের কথা। বিরহী মন কাদিয়া উঠে। নিশীথ রাতে বাণীর করণ সুর শুনিয়া সহসা মনে পড়িয়া যায় গত জীবনের বিষাদমাখা স্মৃতি; অতীতের অস্পষ্ট গর্ভ হইতে জাগিয়া উঠে বেদনার সক্রম ছবিগুলি। কেন যে এমন হয় ইহার উত্তর দেওয়া স্বকঠিন। হেমস্তের সন্ধ্যায় বাতের পথে চলিতে চলিতে মনে পড়িয়া যায় বাল্যবন্ধুর কথা যাহার সঙ্গে জীবনের বহুস্মৃতি জড়াইয়া আছে। শ্রাবণরাত্রি; আকাশে জল ঝরিতেছে; বাতাস হাহাকার করিয়া কাদিয়া ফিরিতেছে; সহসা মন কাদে প্রিয়জননের জন্ম। যাহাকে বহু দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি তাহাকে বৃকের কাছে পাইবার জন্য হৃদয় অস্থির হয়। দূরের বিশ্বস্ত মাহুষ কেন যে বর্ষার মেঘ-কজ্জল দিবসে, আশ্বিনের বর্ষণমুখর রাতে প্রাণের অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদের গিকে কাদায়, কে বলিবে? মেঘের নীলিমা দেখিয়া; রাধা কাদিতেন। সেখানে নতুন মেঘের ঘনিমার পানে চাহিয়া রাখার মনে পড়িত কৃষ্ণের চন্দনচর্চিত নীল-কলেবরের কথা। মেঘের সেতু বাহিয়া কৃষ্ণ আসিতেন রাখার মনের মধ্যে। কিন্তু বর্ষণমুখর বাদলরাতে কেন শূন্য জন্মমন্দির বাস্তবের জন্ম হাহাকার করিতে থাকে? ইহার উত্তর কে দিবে?

কিন্তু কতকগুলি স্মৃতি ও চিন্তাকে সহস্র চেষ্টাতেও আমরা চেতনার আলোকে আনিতে পারি না। তাহারা বিশ্বস্তির অন্ধকারে চিরতরে অবলুপ্ত হইয়া যায়। সেই অতল অন্ধকার হইতে কোন ভুবুরীই তাহাদিগকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলিতে পারে না। মনঃসমীক্ষণে (Psycho-analysis) ইহাদিগকে সঙ্ঘবিস্তৃত চিন্তা (dissociated thoughts) বলে। মনস্তত্ত্ববিদগণের মতে এই-সব চিন্তাকে চেতনার ক্ষেত্রে আনা যায় না। ম্যাকডুগ্যাল সাহেব তাহার যাবনমর্গাল সাইকলজী (Abnormal Psychology) নামক গ্রন্থের মধ্যে মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত কতকগুলি রোগীর ইতিহাস দিয়াছেন। ইহারা বিগত যুদ্ধের সৈনিক। একটি ক্যানাডাবাসী কৃষক

সৈনিক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল। একটি সাংঘাতিক যুদ্ধের দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনের রাজ্যে একেবারে ওলটপালট ঘটিয়া গেল। এই যুদ্ধে তাহার প্রথমত বন্ধুর মৃত্যু ঘটে। মৃত বন্ধুটির ক্ষতিবিক্ষত দেহের বীভৎস দৃশ্য তাহার মনকে এমন নাড়া দিল যে, সেই আঘাতে তাহার মন একেবারে বিকল হইয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল চাষবাসের কথা, কানাদার জীবন-যাত্রার কথা। গাধার ছবিকে বলিতে লাগিল ঘোড়ার ছবি, শেয়ালকে বলিল কুকুর, লাল্লুর বর্ণনা দিতে পারিল না। তাহার সত্তার এক অংশ যেন অতীতের গর্ভে চিরতরে বিলীন হইয়া গিয়াছে; তাহার মনের এক অংশ যেন হিঁড়িয়া গিয়া কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে; তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এমনি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগীর অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। অতীতে সে বাহা করিয়াছে, দেখিয়াছে, শুনিয়াছে তাহার কোন কথাই তাহার মনে নাই। অতীতের মানুষ আর বর্তমানের মানুষটি যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহাদের কোথাও যোগ নাই। রোগী কিছুতেই তাহার অতীত জীবনের কথা মনে করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার সাহায্যে পূর্বের স্মৃতি আবার ফিরিয়া আসে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। কানাদার সৈনিকটি তাহার পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে স্মৃতি আর চেতনার ক্ষেত্রে জাগে না। অপ্রীতিকর চিন্তাকে চেতনার ক্ষেত্রে হইতে নির্দাসন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা হইতে অনেক সময়ে এই স্মৃতিলোপ ঘটিয়া থাকে। রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস দৃশ্য ও গৃহের চিন্তাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতে গিয়াই বহু সৈনিক এই মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। গৃহে বহু বিপদের মধ্যে অসহায় জীপুত্রকে ফেলিয়া আসা সহজ ব্যাপার নহে। চক্ষের সম্মুখে মানুষের মাথা উড়িয়া যাইতেছে, নাড়িভূঁড়ি বাহির হইয়া পড়িতেছে—সেও কি দুঃসহ দৃশ্য! এই-সব অপ্রীতিকর স্মৃতিকে ভোর করিয়া দাবাইয়া রাখার চেষ্টা অনেক সৈনিকের মনকে বিকল করিয়া দিয়াছে। মনঃসমীক্ষণে (Psycho-analysisএ) ইহাকে বলে সঙ্গবিচ্ছাদিত (Dissociation)

“আমরা যাহাকে চেতনা বলিয়া থাকি তাহা আমাদের সত্তার অংশ-মাত্র—অভিস্কৃত অংশমাত্র। যে-কোন একটি সময়ে আমাদের সত্তার প্রায় সবটুকু অংশ দৃষ্টির আড়ালে থাকে। চেতনা সত্তার উপরিভাগে থেলিয়া বেড়ায়—ইহা এবং সত্তা এক নহে। আমাদের পক্ষে যত কিছু চিন্তা করা, স্মরণ করা অথবা বর্ণন করা সম্ভবপর তাহাদের অতি অল্প অংশ কোন একটি সময়ে আমাদের চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে।”
—Outline of Modern Knowledge.

তাহা হইলে বুঝিতে পারা গেল, আমার মনের যে-অংশ চেতনার আলোকে আলোকিত হইয়া আছে তাহাই আমার সত্তার সবটুকু নয়। সেই অংশ আমার সমগ্র সত্তার অতি

ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ। আমার অবশিষ্ট সত্তা সকল সময়েই দৃষ্টির বাহিরে লুকাইয়া থাকে। সমুদ্রের উপর দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের পাহাড় অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। পাহাড়ের খানিকটা অংশ জলের উপরে জাগিয়া থাকে—বাকী অনেক-খানি থাকে সমুদ্রের ভিতরে দৃষ্টির বাহিরে। আমার মনের যে-অংশ চেতনার ক্ষেত্রে অধিকার করিয়া থাকে তাহা সমুদ্রের উপরে ভাসমান বরফখণ্ডের মত—তাহা আমার সবটুকু নয়। আমার মনের প্রায় সবটুকুই গুপ্ত হইয়া আছে আমার চেতনার বহির্ভাগে। উহাকে আমি জানিতে পারিতেছি না, দেখিতে পারিতেছি না। উহা সমুদ্রের তলদেশে লুকাইত বরফের পাহাড়ের মত।

আমাদের মনের গোপন কক্ষে, অন্তরের অতল প্রদেশে যে-সকল ইচ্ছা বিদ্যমান আছে তাহার সর্বদাই চেষ্টা করিতেছে চেতনার রাজ্যে আসিবার জন্ত। কিন্তু অন্তরের সকল ইচ্ছাকে চেতনার ক্ষেত্রে আমরা স্থান দিতে পারি না। কোন্-চিন্তা ভাল এবং কোন্ চিন্তা মন্দ তাহার সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা বোধ আছে। যে-ইচ্ছাকে আমি মন্দ ইচ্ছা বলিয়া মনে করি, যে-ইচ্ছাকে মনে স্থান দিলে আমি নিজের কাছে ছোট হইয়া যাই, সেই ইচ্ছাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবার জন্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি। সেই অন্তত চিন্তা যখন চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করে তখন তাহাকে তাড়াইবার জন্ত আমিও প্রাণপণ চেষ্টা করি। মনের মধ্যে ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার, প্রবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তির সংগ্রাম সর্বদাই চলিতেছে। ‘পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।’ আমি সম্মানার্থে দীক্ষিত হইয়াছি—স্ট্রীলোকেবের সঙ্গে একাসনে বস। আমার পক্ষে অধর্ম। কিন্তু অন্তরে আমার মধ্যে যে আদিম পুরুষ রহিয়াছে সে নারীর অধরস্বা পান করিবার জন্ত পিপাসু হইয়া আছে। তাহাকে কত বুঝাইতেছি, কত শাসাইতেছি—কিন্তু কোন ধর্মকথাই সে শুনিতো চাহে না, কোন শাসনই সে মানিবে না! সে চায় রমণীর প্রেম, সে চায় নারীদের সৌন্দর্য। আমার সম্মান-ধর্মের বাধ ভাঙিয়া সেই আদিম পুরুষ আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু আমি তো তাহাকে স্বীকার করিতে পারি না! আমার মধ্যে যে বৈরাগী-মানুষ একতারা বাজাইতেছে সে বলিতেছে, নারীর সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী; নারীর প্রেমে শান্তি নাই। দেহের জন্ত দেহের যে বাসনা সেই উন্নত বাসনা অগ্নিশিখার মত জ্বালাময়ী; তাহা আমাদের পক্ষে দগ্ধ করে, স্নিগ্ধ করে না। লোকলজ্জা আমাকে বলিতেছে, ছিঃ ছিঃ, সামান্য ইন্দ্রিয়প্রোতে যদি ভাসিয়া যাও তবে সমাজে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? লোকের নিকট চিরকাল কলঙ্কী হইয়া রহিবে। তোমাকে দেখিয়া রাস্তার লোকে হাসিবে, আত্মীয়-স্বজন বিদগ্ধ করিবে। এমনি করিয়া একদিকে আমার মধ্যে আদিম পুরুষের উদ্দাম কামনা এবং

আর একদিকে সম্মানীয় ভাগের আদর্শ, অনাসক্তির আদর্শ—এই উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। নরনারীর অস্তরে এই আদিম যৌনপ্রবৃত্তি সাগরের মত তরঙ্গিত হইতেছে। এই সাগরের আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্ত মাহুষ নীতির কত বাঁধই না বাঁধিয়াছে! কিন্তু সহসা সাগরে দোলা লাগে; বাঁধ ভাঙিয়া উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশি সমস্ত একাকার করিয়া দেয়। কোন নিষ্ঠুর দেবতা আমাদেরকে পাগল করিয়া বিনাশের পথে ঠেলিয়া দেয় তাহা আমরা জানি না। শুধু জানি, অতি কঠোর সম্মানীয়ও আজন্মের সাধনা কখনও কখনও এই তরঙ্গবেগ সহ্য করিতে পারে না; উর্বশীর চটুল নয়ন উজ্জ্বলিত। সম্মানীয় মনকে প্রলুব্ধ করে; উমার সৌন্দর্যরাশি সর্বভাগী শব্দের তপস্বী ভাঙিয়া দেয়।

যে-ইচ্ছাকে আমরা মনের মধ্যে স্থান দিতে চাহি না সেই ইচ্ছাকে আমরা দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চাই। অনভিপ্রেত চিন্তাকে চেতনার ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিবার এই প্রযত্নই 'Repression' অথবা 'অবলম্বন' বলিয়া অভিহিত হয়।

যে-পেয়াদা অনভিপ্রেত ইচ্ছাগুলিকে দূরে ঠেলিয়া দেয়, চেতনার ক্ষেত্রে অথবা চিন্তের খাসকামরায় তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না, তাহার নাম Censor অথবা প্রহরী। আমরা ইহাকে বিবেকও বলিতে পারি। জন্মদারের কাছারিবাটি ও খাসকামরার মত যে-দুইটি প্রকোষ্ঠ আমাদের মনের মধ্যে বিদ্যমান, যে প্রকোষ্ঠ দুইটির একটির নাম সংজ্ঞান (the conscious) এবং অপরটির নাম অসুজ্ঞান (the sub-conscious) সেই প্রকোষ্ঠ দুটির মধ্যবর্তী দ্বারদেশে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে সেন্সর। প্রহরীর অল্পমোদন ব্যতীত কোন ইচ্ছা চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাদেবের তপস্বীক্ষেত্রের প্রান্তে সে নন্দীর মত বৈত্র উচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। কোন চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার উপক্রম করিতেছে দেখিলেই দ্বারী জিজ্ঞাসা করে, হু কাম্‌স্‌ থেরার (Who comes there) ? যদি ইচ্ছাটি আমাদের নীতিধর্মের অনুরোধিত হয় প্রহরী তাহাকে চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার অনুরোধিত দান করে। যদি ইচ্ছাটি আমাদের নীতিধর্মের অনুরোধিত না হয় তবে প্রহরীর কাছে উহা বন্ধু (friend) নহে, শত্রু (foe)। প্রহরী ধাক্কা দিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দেয়।

প্রহরী যে-সকল ইচ্ছাকে চেতনার রাজ্য হইতে নির্বাসিত করে তাহাদের সবগুলিই যে সেই আজ্ঞা নতশিরে মানিয়া লইয়া প্রস্থান করে এমন নহে। অনেক ইচ্ছা আমাদেরকে জড়াইয়া থাকে বাহাদিগকে আমরা নীতিপথে বাধা বলিয়া জানি। তাহাদিগকে আমরা যে ছাড়াইয়া যাইতে চাহি না এমন নহে, কিন্তু ছাড়াইতে গেলেই কোথায় যেন যথ

পাই। তাহাদিগকে আমরা শত্রু বলিয়া জানি; তবুও তাহাদিগকে প্রাণপণে আদর করিতে ইচ্ছা করে। প্রহরী তাহাদিগকে চেতনার ক্ষেত্রে কখনই আসিতে দিবে না—কিন্তু তাহারা যে আমার মস্তকের মূলে বাসা লইয়াছে! তাহাদিগকে নির্বাসন দিতে আমার মন যে কিছুতেই চাহে না! উপায় কি?

উপায় ছদ্মবেশ। যে-সকল প্রবৃত্তিকে নীতিধর্মবিগহিত বলিয়া প্রহরী চেতনার ক্ষেত্রে আসিতে দেয় না অথচ যাহারা আমার একান্তই প্রিয় তাহাদিগকে ছদ্মবেশ পরাইয়া তবে চেতনার ক্ষেত্রে আনিতে হয়। নিজের সঙ্গে এমন করিয়া আমরা কতই না লুকোচুর খেলিয়া থাকি। আমরা ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাই, ভাবের ঘরে চুরি করি। রোমা রংলার একখানি উপন্যাসের নাম মায়ামন্ত্রম্ভ আত্মা (Soul Enchanted)। এই উপন্যাসের নায়িকা এনেট তরুণ চিত্রকর ফ্রাঙ্কে ভালবাসিয়াছে। নায়িকা চিত্রকরটির মাতার বয়সী; নায়িকার নিজেরও একটি পুত্র আছে। এইস্থলে নোজাহুজি প্রেমিকার মত ভালবাসিতে নায়িকার সঙ্কল্পে বাধে। যে ছেলের বয়সী, যাহার সঙ্গে বয়সের এত ব্যবধান তাহাকে নোজাহুজি প্রেমিকের আসন দান করিতে সংস্কারে যখন বাধে তখন উপায় কি? প্রহরী মনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, ছদ্মস্বামী! চিত্রকরের চিন্তা মনে স্থান দিতে পারিবে না। তাহাকে ভালবাসা অসম্ভব। নারীর মন কাঁদিয়া বলিতেছে—সে না থাকিলে জীবন শূন্য হইয়া যায়। সে যে প্রাণের প্রাণ! নিরুপায় হইয়া নায়িকা নিকরুণ প্রহরীকে ফাঁকি দিল। সে প্রহরীকে বলিল, আমি উহাকে ছেলের মত ভালবাসি। এই ভালবাসার মধ্যে কামগন্ধ নাই। প্রহরী চিত্রকরের চিন্তাকে নারীর চেতনা ক্ষেত্রে তখন আসিতে দিল। রমণী আপনাকে ফাঁকি দিল, প্রহরীকে ফাঁকি দিল—কিন্তু সত্যকে ফাঁকি দিতে পারিল না। সে অলক্ষ্যে হাসিল এবং সময় আসিলে নারীকে বুঝাইয়া দিল, মায়ের ভালবাসার মুখোমুখি প্রবৃত্তির মধ্যে লুকাইয়াছিল কামনা—পুরুষের জন্ত নারীর চিরন্তন দুর্বীর কামনা।

এমনি করিয়া তুষারশুভ্র নিরুপায় ভালবাসার মুখোমুখি পরিয়া কামনা আশিয়া আমাদের চিন্তাকে অধিকার করে। আমরা অস্তুরে অস্তুরে জানি, যাহাকে ভয়ী বলিয়া কাছে রাখিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাকে ঠিক ভয়ীর মত দেখি না, যাহাকে ভাই বলিয়া আদর করিতেছি তাহার প্রতি ভালবাসা আপনার সংগ্রামের প্রতি ভালবাসার ঠিক অনুরূপ নহে। তবুও এক-কথা বন্ধুর কাছে দূরে থাকুক, নিজের কাছেও সংক্ষেপ স্বীকার করি না। স্বীকার করিতে আমরা লজ্জিত হই, আমাদের সঙ্কল্পে বাধে। পাছে বিবেকের দংশনে উৎপীড়িত হইয়া তাহাদিগকে ছাড়িতে হয় তাই নিজে

এই বলিয়া ভুলাই—আমি উহাকে ভয়ীর মত ভালবাসি, ভায়ের মত ভালবাসি, বন্ধুর মত ভালবাসি। আমি যদি এখন উহাকে ত্যাগ করি তবে সে মনে নিদারুণ ব্যথা পাইবে। অথচ সে-সব ক্ষেত্রে নিষ্করণ হওয়ার মত করণা আর নাই। যেখানে মিলনের কোন আশাই নাই, পরিণয় যেখানে অপরাধ। সেখানে প্রিয়জনের নিকট হইতে সরিয়া আসা নিঃস্বর্তা সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাকে আমি বন্ধুর মত ভালবাসি—এই ভাবে নিজেকে ভুলিয়া রাখিয়া প্রিয়জনকে আঁকড়াইয়া থাকা আরও নিঃস্বর্তা। কারণ বিচ্ছেদের দিন যখন একান্তই আসিবে তখন ভালবাসার জনকে মিলনের আনন্দ যত বেশী করিয়া দিয়াছি বিচ্ছেদের বেদনাও তত বেশী করিয়া দিব। তাহা ছাড়া নিখল ভালবাসার মুখাস পরিয়া বাহারা দূরে বাস লইয়াছে তাহারা কখন যে গভীর রাতে অতর্কিত মুহুর্তে অকস্মাৎ ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিয়া নিজমূর্তি ধারণ করিবে—কে বলিবে? মনের ক্ষেত্রে ভালবাসা চিরদিন যে সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? মাহুষের মধ্যে যে আদিম যৌনপ্রবৃত্তি রহিয়াছে চিরদিন তাহার আকর্ষণ। যে-কোন মুহুর্তে ভালবাসা মনের ক্ষেত্রে ছাড়াইয়া দেহের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারে।

এই জগতই আমাদের মনকে ভাল করিয়া জানিবার প্ররোজন আছে। প্রহরীর উপর একান্ত ভাবে সবটুকু ছাড়িয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। কারণ, নিজেকে যেখানে নিজের সঙ্গে লক্ষ্যতা করি সেখানে প্রহরী কি করিবে? বিতাড়িত ইচ্ছাকে ছদ্মবেশ পরাইয়া প্রহরীকে ভুলাইয়া যখন চেতনার ক্ষেত্রে আসিতে দিই তখন সেই ফাঁকির পথ রুদ্ধ করিবে কে? এই ফাঁকির পথেই ত পাপ আসিয়া মনের মধ্যে বাসা গ্রহণ করে। সদর দরজায় প্রহরী পথ আঙুলিয়া আছে—পাপ তাই আশ্রয়প্রবন্ধনার খিড়কির দরজা দিয়া চোরের মত অন্তরে আসিয়া আশ্রয় লয়; তাহার পর এক অতর্কিত মুহুর্তে আমাদের দুর্বলতার সুবিধা লইয়া সে অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি হরণ করে। মাহুষের পতনের ইতিহাস এই আপনাকে ভুলাইবার ইতিহাস। প্রহরী যে-সকল ইচ্ছাকে নীতিবিগ্নহিত বলিয়া দূরে সরাইয়া দেয় তাহারা নিঃশেষে শূন্যতার অন্ধকারে মিলাইয়া যায় না—মনের চোরাবুড়ীতে গিয়া আশ্রয় লয়। রাতের বেলায় আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি প্রহরীর চক্ষুও তখন ঘুমে মুদ্রিয়া আসে সে কিমাইতে থাকে। চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার এই ত উপযুক্ত সময়। প্রহরী কিমাইতেছে! দিনের বেলায় বাহার অন্তর চক্ষু এড়াইয়া চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার কাহারও উপায় ছিল না, রাতের বেলায় সে ঘুমাইতেছে! দিক্‌দশর বিতাড়িত ইচ্ছাগুলি চোরাবুড়ী হইতে বহির হইয়া এবং নিশ্চিন্ত মনে চেতনার ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিভাল যখন ঘুমায় ইন্দুর তখন

মহোলাসে নৃত্য করে; গৃহস্থ যখন নিদ্রামগ্ন তখনই ত তঙ্করের গৃহপ্রবেশের সময়!

দিবসে প্রহরীর তাড়নায় যে-সকল বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যায় রাত্রে স্বপ্নে সেই সকল সাধ আমরা মিটাইয়া থাকি। তখন ব্যথা দিবার কেহ থাকে না। এই সব স্বপ্ন এমন সব মূর্তি ধারণ করিয়া আমাদের চেতনার আলোকে ভাসিয়া উঠে যে ঘুম ভাঙিয়া গেলে লজ্জায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি। অত্যন্ত সাধুপুরুষ বলিয়া গাহাদের খ্যাতি আছে তাহারাও স্বপ্নে অনেক তৃণ্য কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনোবিক্রান গাহারা আলোচনা করেন তাহারা ইহার মধ্যে বিশ্বাসের হেতু খুঁজিয়া পাইবেন না। আমরা কেহই নিষ্কলক দেবতা নহি। আমাদের সকলের প্রকৃতির মধ্যেই আদিম যুগের বর্বর মাহুষটা এখনও লুকাইয়া আছে। সভ্যতার প্রলেপটুকু একটু সরাইয়া ফেলিলেই সকলের ভিতর হইতেই বুনো মাহুষের কদম্ব মূর্তিটা বাহির হইয়া পড়ে। আদিম যুগের বহু প্রবৃত্তিগুলিকে চাপিয়া রাখিবার জগ্‌ আমাদের চেতনার বিরাম নাই। কিন্তু চাপা দিলেই তাহারা যে নিঃশেষ হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ, আমরা তাহাদিগকে চাপিয়া রাখিবার যত চেষ্টাই করি না, তাহারা সময়ে সময়ে আশ্রয়প্রকাশ করে। তাহাদের এই আশ্রয়প্রকাশের সুযোগ মিলে স্বপ্নে। তখন প্রহরীর চোখে নিদ্রা ঘনাইয়া আসে। আমাদের ভিতরের বহু শূকরটা তখন দন্ত উচাইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতে থাকে, সর্প নিঃশব্দ চিত্তে বিষ উদদীর্ণ করে, শকুনিটা অগাধা বগ্ন কুঠা বজ্জন করিয়া উৎসে পুরিয়া দেয়, নিলজ্জ ছাগটা অন্তর হইতে চেতনার ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে।

স্বপ্ন আমাদের সমগ্র রূপটিকে চেতনার আলোকে প্রকটিত করে। আমাদের চেতনার বাহিরে অন্তরের বিপুল অন্ধকারময় প্রদেশে যে-সকল ইচ্ছা তরঙ্গিত হইতেছে প্রহরীর সতর্কতার জগ্‌ জাগ্রত মুহুর্তগুলি তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে পারে না। স্বপ্নের রহস্যময় লোকে মনের অতল হইতে তাহারা জাগিয়া উঠে অনাবৃত মূর্তি লইয়া। আমরা স্বপ্নলোকের নিজের সেই অনাবৃত রূপ দেখিয়া লজ্জায় শিরিয়া উঠি সত্য, কিন্তু সেই লজ্জার মধ্য দিয়া জানিতে পারি নিজের স্বরূপকে। স্বপ্নের এই দিক দিয়া একটা বিপুল সার্থকতা আছে। স্বপ্নের কষ্টপাথরে আমাদের স্বার্থ চেহারাটার যাচাই হইয়া যায়। স্বপ্নের দর্পণে আমাদের মনের সত্যিকারের রূপটি প্রতিকলিত হইয়া উঠে। এখানে একটি কথা। স্বপ্নে নিজের কদম্ব ইচ্ছা সব সময়েই যে অনাবৃত রূপ লইয়া আশ্রয়প্রকাশ করে এমন নহে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিম ইচ্ছা ছদ্মবেশে অথবা বিকৃত মূর্তি লইয়া স্বপ্নলোকে দেখা দিয়া থাকে।

আমরা তাহাদিগকে যত ভাল মনে করি আমরা ঠিক তত ভাল নই। আমাদের মনের কোণে অনেক কদম্ব

অনেক কাকি লুকাইয়া থাকে বাহার কথা আমরা নিকটতম বন্ধুর কাছেও বলিতে সাহস করি না। সেই কাকির কথা প্রকাশ পায় শুধু আমার কাছে এবং আমার অন্তর্ভাবময় কাছে।

“লোকে যখন ভালো বলে,
যখন হৃদয় থাকি,
জানি মনে তাহার মানে
অনেক আছে কাকি।”

কিন্তু আমার মধ্যে যে উলঙ্গ বর্কর রহিয়াছে—বাহাকে চাকিবার জন্য আমি ভক্ততার ছদ্মবেশ পরি—সেই বর্করটাই আমার সবটুকু নয়। তাহাকে একান্ত বড় করিয়া দেখিলে নিজের প্রতি অবিচার করা হয়। আমার মধ্যে কাঁদিতেছে নিঃসঙ্গ দেবতা। তাহাকে ত আমি জীবনে উচ্চ আসন দান করি নাই। সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, পরিবার, সাহিত্য আমাকে যে সংস্কার এবং আচারের অচলায়তনের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাদিগকেই আমি পদে পদে কুণিষ করি। তাহারাই আমার জীবনের অনেকখানি স্থান নিলজ্জভাবে জুড়িয়া বসিয়া আছে। আমার সত্যের যে-অংশ এইভাবে সামাজিক নিয়মকানুন এবং আদবকায়দার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহাকে আমি আমার বাহিরের মানুষ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই বাহিরের মানুষটা হাঙ্গ, নাচে, গল্প করে; নিমগ্ন করিয়া লোক ধাওয়া, ঘটা করিয়া ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয়। ইহার মুখে হাসি, লম্বাটে সিন্দুরবিন্দু, চুলে বেশমণী ফিতা, অনামিকায় অঙ্গুরীয়, অঙ্গে হুন্দর পরিচ্ছদ; রেল, শীমারে, কংগ্রেসে, উৎসবপ্রাঙ্গণে নিমগ্নসভায় এই বাহিরের মানুষটা সকলের সঙ্গে ভাল রাখিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু আমার অন্তরের দেবতা যবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দে অঙ্গমোচন করিতেছে। আচার-অনুষ্ঠানের রাস-পুরীতে সে অশোককাননের সীতার মত একাকিনী; নিয়মকাননের জটিল-কুটিল-পরিবৃত্ত হইয়া সে রাখার মত নিঃসঙ্গ। তাহার রক্তে কাঁদিতেছে রক্তের বাঁশি। সভ্যতার সহস্র আড়ম্বরের মধ্যে তাহার কুণ্ঠি নাই। তাহার মধ্যে বাজিতেছে শ্রামল অরণ্যের গান, উদ্ভূত আকাশের বাঁশরী, অবারিত প্রান্তরের আছান, ফুলহীন সাগরের কলধ্বনি। সে মিথ্যার আবরণ তৈলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায় সত্যের মধ্যে। সতীর্ঘতা তাহাকে পীড়িত করে, বন্ধন তাহাকে বেদনা দেয়, কণ্ঠতা তাহাকে আঘাত হানে, কদম্বতার সে অশান্তি পায়। অন্তরের এই গোপন দেবতা—এই দেবতাকে আমরা অস্বস্ত্য করি ব্যাধির মধ্যে, অশান্তির মধ্যে। এই ব্যাধি, এই অশান্তি আমাদের প্রত্যেকের বৃকে। কিন্তু পাছে কঠোর সত্যের আঘাতে আমাদের সমাজ ও পরিবার-ভাঙিয়া-চুরিয়া যায়, পাছে আমাদের আত্মীয়-বন্ধন কিছু আঘাত পায়, এইজন্য অন্তরের এই কান্নার কথা স্বামী ক্রীকে বলে না, ক্রী

স্বামীকে বলে না, বন্ধু বন্ধুকে বলে না, পিতা পুত্রকে বলে না, পুত্র পিতাকে বলে না। দেবতা আঁড়ালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সভ্যতার সমস্ত উপাদান, সংসারের সমস্ত আয়োজন, পরিবারের সমস্ত হৃথের অভিনয়ের মধ্যে মানুষের অন্তরতম দেবতার এই যে গোপন বেদনা—এই বেদনার ছবি আঁকিচ্ছিলেন আমেরিকার বিখ্যাত উপন্যাসিক সিনক্লেয়ার লুইস্ (Sinclair Lewis) তাহার ব্যাবিট মেনস্ট্রিট (Babbitt Mainstreet) প্রভৃতি উপন্যাসগুলির মধ্যে। সমস্ত বন্ধনের বিচ্ছিন্ন দেবতার এই বিস্তোহের গানই উৎসারিত হইয়াছে হাইটম্যানের কণ্ঠ হইতে। টলষ্টয়, ইবসেন, বার্বর্ড-শ সকলের মধ্যেই বিস্তোহী দেবতার এই অসন্তোষের স্বর। মাঝে মাঝে কোথা হইতে আসে এইরূপ এক একজন অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাহার হাটে হাড়ি ভাঙিয়া দেয়, মানুষের গোপনতম কথা প্রকাশ করে। নির্দম সত্যের অনাবৃত মুণের দিকে চাহিবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে। তাই সত্যের হুঃসহ মুখকে ভীক সমাজ চাকিয়া রাখে মিথ্যার মনোহর আবরণে। সেই আবরণ রচনা করিয়া থাকে প্রবীণ পাকার দল আর অপ্রবিলানী কবিদের বাক্যজালের অলীক ইন্দ্রধনুজটা। শেলী, ইবসেন, হাইটম্যান, বার্বর্ড-শয়ের মত মানুষেরা আসিয়া সেই আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলে, বাহা কালো তাহাকে কালো বলে; সত্যের অনাবৃত কঠিন নির্মল রূপকে প্রকাশ করে। যে-কথা সকলেই জানিত অথচ কেহ কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না, যে-ব্যাধি সকলেরই ব্যাধি অথচ বাহা একে অন্তের নিকট মুখ ফুটিয়া বলিত না তাহাকে যে হাটে জানাইয়া দেয় সমাজ তাহাকে কোন দিনই ক্ষমা করে নাই। তাহাকে প্রবীণ পাকার দল ক্রমে বিদ্ধ করিয়াছে, আগুনে পোড়াইয়াছে, তাহার পুত্রকন্যাকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে, সমাজ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহার উপর নিন্দা ও অপমানের বোঝা চাপাইয়াছে।

আমাদের মধ্যে বৃহত্তর, মঙ্গতর জীবনের জন্য এই যে বেদনা রহিয়াছে, এই বেদনাই আমাদের গকে বলিয়া দেয়, আমি আমাকে যত ভাল বলিয়া মনে করিতাম তাহার অপেক্ষা আমি অনেক ভাল, অনেক বড়।

“I am larger, better than I thought,
I did not know I hold so much goodness.”

আমার মধ্যে দেবতা অন্তরের জন্য কাঁদিতেছে, তাই ত আমি বর্তমানের বন্ধনকে অতিক্রম করিতে চাই। তাই ত আমার মধ্যে এই চাক্ষুশ, এই অতৃপ্তি, এই হৃদয়ের নিপাতা। আমি ভিতরে ভিতরে শুধু বর্কর নহি, আমি ভিতরে ভিতরে দেবতা। যেখানে আমি বর্কর সেখানে আমাকে সাবধানে হিসাব করিয়া পথ চলিতে হইবে; কিন্তু যেখানে আমি দেবতা সেখানে আমি আশা করিব, বিকাশ করিব, আপনাকে জ্ঞা করিব; সেখানে কোন ক্ষেপে আমি

বিস্ময় হইব না, কোন পরাক্ষরে পিছাইয়া যাইব না, কোন আঘাতে ক্ষয়কে বিচলিত হইতে দিব না। অন্তরেই এই স্বেচ্ছা-মাত্রাটির প্রতিই লক্ষ রাখিয়া ক্রয়েড্ (Freud) বলিয়াছেন,—

"The normal man is not only far more immoral than he believes (referring to the repressed tendencies) but also far more moral than he has any idea of (referring to the Super-Ego)."

"প্রকৃতির বাসন নিজেকে বেরূপ মনে করে, তার চেয়ে কেবল যে অনেক বেশী দুর্নীতিপরায়ণ তাহা নহে, কিন্তু তার চেয়ে এত বেশী সুনীতিপরায়ণ, যে, তাহা তাহার ধারণার অতীত।

প্রহরী যে-সকল ইচ্ছাকে চেতনার আলোকে আসিতে দেয় না, জ্ঞানের বাহিরে ঠেলিয়া দেয় সেই অনভিপ্রেত বিভাঙিত ইচ্ছাই গুটেন্সা (complex) বলিয়া অভিহিত হয়। দলিত ইচ্ছা সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। বাঁকাচোরা পথে ভোল বদলাইয়া চেতনার ক্ষেত্রে উঠা দেখা দেয়। প্রথমদৃষ্টিতে তাহাকে চিনিতে পারা মুশ্কিল—কিন্তু সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, আমাদের অনেক বিদলিত বিভাঙিত ইচ্ছাই পোষাক বদলাইয়া আমাদের স্বভাবের এবং আচার-ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পায়। গুটেন্সার একটি দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নে দিলাম। এই দৃষ্টান্তটি লওয়া হইয়াছে ম্যাগডুগাল সাহেবের যাবনমর্গ্যাল সাইকলজী (Abnormal Psychology) হইতে।

রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের একজন উৎসাহী ধর্মশিক্ষক গোড়া নাস্তিক হইয়া গেলেন। ভগবান নাই—ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত তাহার অপরিমীম উদ্যম দেখা যাইতে লাগিল। আপনার মত সম্রমাণ করিতে বহু গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিলেন। ধর্মশিক্ষকের হঠাৎ এই অদ্ভুত ভাবান্তরের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখা গেল, তিনি একটি মেয়েকে ভালবাসিতেন। ঐ মেয়েটি তাঁহাকে পরিভ্যাগ করিয়া বাঁহার সহিত পলায়ন করেন তিনি ছিলেন তাহার এক বন্ধু এবং রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের উৎসাহী সহকর্মী। এই আচরণে সহকর্মীর প্রতি তাহার মন অত্যন্ত বিরূপ হইয়া গেল। বন্ধুর উপর এই তীব্র বিতর্কই প্রকাশ পাইল পূর্বের ধর্মবিশ্বাসগুলির প্রতি বিতর্করূপে। কারণ ঐ সকল বিশ্বাসই যৌগ্মস্বরূপে বন্ধুর সহিত তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

এইরূপ অঙ্গসম্বন্ধনের ফলে জানা যায়, আমাদের মনের তলদেশে অনেক বিভাঙিত ইচ্ছা আত্মদোষন করিয়া থাকে। সেই গুপ্ত ইচ্ছাই অনেক সময়ে বিকৃত নৃত্যে আত্মপ্রকাশ করে।

আমাদের মনে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বন্ধ লাগিয়াই আছে। কতকগুলি ইচ্ছা আছে বাঁহাদের মূল আমাদের আদিম

প্রকৃতির মধ্যে নিহিত। যৌন ইচ্ছাকে আমরা এইরূপ একটি আদিমপ্রবৃত্তির মধ্যে গণ্য করিতে পারি। নরের নারীসেহের জন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং নারীর নরসেহের জন্ত আকাঙ্ক্ষা—ইহা চিরন্তন। কোন আদিকাল হইতে নরনারী পরস্পরকে তন্ময়ন দিয়া আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছে। এক দিন ছিল যখন মানুষ সহজভাবে তাহার যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করিতে পারিত। বিধি-নিষেধ তখন যে ছিল না—এমন নহে। তবে এখনকার মত এত বেশী ছিল না। মানুষের স্বজন-শক্তির প্রকাশ তখন দেহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে মানুষ সভ্যতার সোপানে বসি উঠিতে লাগিল ততই সে দেখিতে পাইল, কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তি লইয়াই তাহার জীবন নহে। তাহার অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে অসীমের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিবার দুনিবার পিপাসা; তাহার আত্মায় আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন। মানুষ দেহের স্তর অতিক্রম করিয়া মনের স্তরে উঠিল এবং সমাজকে নতুন ভাবে গড়িল। এই নতুন সমাজ আদিম প্রবৃত্তিগুলির আত্মনাকে উপেক্ষা করিতে সাহস করিল না বটে, কিন্তু বিধি-নিষেধের পর বিধি-নিষেধের সৃষ্টি করিয়া সেই প্রবৃত্তিগুলিকে বর্ধা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিকে সমাজের বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলগুলি এবং আর একদিকে আদিম প্রকৃতির দুর্ব্বার দাবি—এই দুইয়ের সংঘর্ষের ফলে আমাদের অনেকের জীবন কেনিল, বিষমর এবং দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। যখন সমস্তার কোনরকমেই নিরাকরণ করিতে পারি না তখন তাহার সমাধানের জন্ত আমরা অবদমন অথবা নিগ্রহের পন্থা অবলম্বন করি। মনের মধ্যে যৌন ইচ্ছা বা অন্ত কোন আদিম ইচ্ছা জাগিলেই সেই ইচ্ছাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলি। ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার সংঘর্ষ হইতে মনের মধ্যে যে অশান্তি জাগে একটি ইচ্ছাকে দমন করিবার ফলে সেই অশান্তির হস্ত হইতে কিছুকালের জন্ত আমরা রক্ষা পাই এবং তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলি, আঃ বাঁচলাম।

কিন্তু ভাবী ভুলিবার নয়। সমাজ ও প্রকৃতি—এই উভয়ের দাবির মধ্যে সমাজের দাবি মানিয়া লইয়া মনে করিলাম, খুব জিতিয়া গিয়াছি—তাই সত্যিনের টানাটানির মধ্যে পড়িয়া আর প্রাণান্ত হইতে হইবে না! প্রত্যাখ্যাভা প্রকৃতি এবার নিকৃতি দিবে।

কিন্তু প্রকৃতি এত সহজে কাহাকেও নিকৃতি দেয় না। সে অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া নিঃশব্দে প্রতিশোধের পথ বুজিয়া বেড়ায়। আমাদের এই আদিম প্রকৃতি বেগবতী পার্শ্বভা নদীর মত। আমরা এই নদীর সমুখে নিগ্রহের পাথর ফেলিয়া মনে করি, জলধারাকে পাশাপাশ্বে রাখিয়া ফেলিলাম। কিন্তু নদী বাঁধা পড়ে না। সোজা সহজ পথ ছাড়িয়া উঠা বাঁকিয়া অন্তপথে প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করে।

আমাদের আদিম প্রযুক্তিগুলি সবচেয়ে এই কথাই খাটে। সেই প্রযুক্তিগুলির বেশ অতি প্রচণ্ড। মনের যৌন-ইচ্ছার দুর্বল শক্তিকে ক্রমেতে বলিরাছেন লিবিডো। এই লিবিডোর সহক প্রকাশকে যখনই আমরা চাপিরা মারিবার চেষ্টা করি ধর্মের নামে, নীতির নামে, সংঘের নামে তখনই দেখিতে পাই, অবলম্ব ইচ্ছা। মনের অন্তল গুহায় কেনিল আবর্তনের সৃষ্টি করে। আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা দারুণ সংগ্রাম চলিতে থাকে। সেই সংগ্রাম নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম। একদিকে উদ্দাম আদিম যৌনপ্রবৃত্তির দাবি, আর একদিকে সংঘের দাবি, ভাগের দাবি, নীতিধর্মের দাবি। বৃত্ত করিতে করিতে মনের শক্তি চলিয়া যায়, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা হ্রাস পায়, অশ্রদ্ধা এবং দীর্ঘাশাসে জীবন ভরিয়া উঠে, আমরা দিন-দিন নিস্তেজ হইয়া পড়ি।

আমাদের অনেক মনের অন্তরের কারণ এই অবদমন অথবা নিগ্রহ। নিগ্রহীত ইচ্ছাগুলি মনের কোণে জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত উৎকট আকারে ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করে। হিষ্টিরিয়া অন্তরের কারণ অনেক সময়েই এই নিগ্রহ। বাল্যেই স্বামী হারাইয়াছে—এমন অনেক বয়সী পত্নী-বিধবাকে পরভিত্র অধেষণে অত্যন্ত উৎসাহী দেখা যায়। কে কাহার সহিত কু-অভিপ্রায়ে হস্তাশাপ করিয়াছে, কাহার সহিত কাহার অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছে,—পত্নীর সমস্ত ঘটনা তাহাদের নন্দর্পণে এবং সেই সমস্ত প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার লইয়া পথেঘাটে তাহাদের আলোচনার অন্ত নাই। অন্তের প্রণয়-ঘটিত দুর্বলতা লইয়া এই অত্যধিক মাথাঘামানোর মূল নিজের নিগ্রহীত যৌন-ইচ্ছার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নাই। অনেক সময়ে এইরূপ নারীর দিকে কেহ নির্দল দৃষ্টিতে চাহিলেও সে মনে করে এবং বলিয়া বেড়ায়, অমুক লোকটা অত্যন্ত অসচ্চরিত্র। সে নারীর মধ্যদা জানে না। আসলে যেটির নিজের মনেই যৌন-ইচ্ছা জাগিয়া রহিয়াছে। নিজের সেই অপরিচুপ্ত আকাঙ্ক্ষাই সে অন্তের উপর ব্রূহ আর্দ্রাণ করে।

তবে কি নিগ্রহ অথবা অবদমন আমাদের কল্যাণের পথে অন্তরায়? এক কথা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। উহার উত্তরে 'না' এবং 'হ্যাঁ' দুই-ই বলা যাইতে পারে। নিগ্রহ আমাদের দেহের এবং মনের কি পরিমাণ কতি করে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অবলম্বনের মধ্যে রহিয়াছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিরোধ। ইহা অব্যাহািক। দেহ এবং দেহের ক্রমকে অস্বীকার এক দৃশ্য করিবার অধিকার আবাদিসকে কে দিয়াছে? আমার দেহ ভগবানের স্বমিহ—আমার প্রতি একে বিখাতার চুবনের ছাপ!

হেসেবেলা হইতে আমরা ভনিরা আসি, যাহুদের যৌন আকাঙ্ক্ষা একটা অপরাধের কারণ। দেহের ক্রমের মধ্যে আছে কেবল পুস্তর প্রযুক্তি। কলে প্রযুক্তিগতিক আমরা

সলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করি। পারি না; প্রকৃতি পরিশোধ লয়। এই জন্তই বনস্তম্ববিসেরা বলিয়া থাকেন,

“আমাদের অন্তরের যৌনপ্রবৃত্তিকে স্বপ্নে পরিচালিত করিতে হইলে একটা ভিন্দিবের প্রয়োজন আছে। আমরা এ-পুস্তর প্রযুক্তির দাবিগুলিকে ক্ষমতাযে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছি। এখন হইতে এই দাবিগুলির প্রতি আবাদিসকে আরও সদর হইতে হইবে।” (*Outline of Modern Knowledge*)

কিন্তু সহক আদিম প্রবৃত্তি যখন একান্ত বড় হইয়া উঠে তখনও সর্বনাশের কারণ ঘটে। আমাদের মনের মধ্যে যে যৌন-ইচ্ছার দুর্বল শক্তি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে তাহাকে ইঞ্জির-পরিচালিত পথে যথেষ্ট পরিচালিত করিলে উচ্চতর বৃত্তির বিকাশ হওয়া অসম্ভব। আমাদের জীবন শুধু দেহকে ঘিরিয়া নহে। দেহকে ছাড়াইয়া আমরা মনের ক্ষেত্রেও বিচরণ করিতে পারি। আমরা কেবল আহাির এবং বংশবৃত্তি করি না। আমাদের মধ্যে রহিয়াছে হৃদয়ের পিপাসা, হৃদয়ের স্বপ্ন, আলোকের ধ্যান। সেই পিপাসা এবং স্বপ্ন হইতে বৃগে বৃগে কবিতার জন্ম হইয়াছে, সঙ্গীতের প্রস্রবণ বহিয়াছে, ভাজমহল ফুটিয়াছে, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ঘটিয়াছে। অন্তরের সমস্ত শক্তি যদি ইঞ্জিরের পথে ধাবিত হইয়া আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে তবে মনের রাজ্যে আমরা সেউদিয়া হইয়া যাইব। এইজন্ত শক্তির সঙ্গে সংঘের প্রয়োজন। যে বিরাট আদিশক্তির উৎস হৃদয়ে বর্তমান রহিয়াছে সেই শক্তির থানিকটা অংশ আদিম যৌন প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত করা সমীচীন। কিন্তু সেই প্রবৃত্তির খেলা কখনও উদ্দাম হইবে না। শক্তির ধারাকে ইঞ্জিরের খাত হইতে উচ্চতর সৌন্দর্য এবং আনন্দসৃষ্টির নব-নব খাতে বহাইতে হইবে। মানুষের ইতিহাসকে যাহারা প্রতিভার দানে সম্পদশালী করিয়াছেন তাহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই যৌন-শক্তি রূপান্তরিত হইয়া প্রেমের মধ্যে, সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে সার্থক করিয়াছে। তাহা উদ্দাম ভোগের পথে অথবা অন্তরের স্বপ্নের জটিলতার মধ্যে ব্যর্থ হয় নাই।

“All great mystics and the majority of great idealists, the giants among the creators of spirit have clearly and instinctively realized what formidable power of concentrated soul, of accumulated creative energy, is generated by the renunciation of organic and psychic expenditure of sexuality. Even such free-thinkers in matters of faith, and such sensualists as Beethoven, Balzac and Flaubert, have felt this.”

(Romain Rolland—*Ram Krishna's Life*.)

“Chastity is the flowering of man; and what are called Genius, Heroism, Holiness and the like, are but various fruits which succeed it.” (Thoreau—*Walden*).

আমাদের বস্তুর বিবলকে আরও পরিচুপ্ত করিবার জন্ত আমরা রোমা রুলা এবং বোরোর লেখা উপরে উদ্ধৃত করিলাম। কৌশলগতিকে এই উচ্চতর শক্তিতে রূপান্তরিত করাকেই ক্রমেতে বলিরাছেন Sublimation বা উল্লাসিত।

বাহ্যিক প্রতিভাবান এবং বাহ্যিক আনন্দিক ব্যক্তি হারা আকর্ষণ—এই উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভেদরেখা অত্যন্ত কঠিন। পাগল এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি উভয়েই প্রবল প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। উদ্দাম ভাব না থাকিলে কোন মানুষ বড় হইতে পারে না। উহা কাজের মধ্যে বেগ আনিয়া দেয়। যেখানে উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলি সজ, শিব ও হৃদয়ের পথে ধাবিত হয়, যেখানে মনের আদিম সহজ ইচ্ছাগুলি একটি বিরাট মহান আদর্শের কাছে মাথা নত করে, সেখানে মানুষ হইয়া উঠে প্রতিভাবান অতুষ্কতিসম্পন্ন। যেখানে উদ্দাম আদিম প্রবৃত্তিগুলি হাঁজরের ক্ষেত্রে অতিক্রম করিতে পারে না, যেখানে ইচ্ছার সঙ্গে রহিয়াছে ইচ্ছার দৃষ্টি, প্রবৃত্তির সঙ্গে

রহিয়াছে প্রবৃত্তির বিরোধ, যেখানে একটি মাত্র অতুল আদর্শ বিভিন্নমুখী ইচ্ছাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে না, সেখানে হৃদয় মগের মুহুর্ত হইয়া উঠে। সেই হৃদয় হয় পাগলামীর আভা, ব্যর্থতার মরুভূমি, ব্যাধির আলয়। সেই জীবনই হইতেছে পরিপূর্ণ সার্থক জীবন, যেখানে ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে, যেখানে প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির দৃষ্টি মিলিয়াছে, যেখানে দেহ আত্মাকে স্বীকার করে, আত্মাও দেহকে স্বীকার করে, যেখানে ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভেদের কোলাহল নাই, যেখানে জীবনের সকল দূর একত্র মিলিত হইয়া এক অখণ্ড ঐকতানের স্রষ্টি করিয়াছে। ইহাকেই মাগডুগাল সাহেব বলিয়াছেন স্বরাট আত্মন (autonomous self); গীতা বলিয়াছে যতাত্মা।

ব্যাকিং-জগতে বাঙালীর স্থান

ত্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

বাংলা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান আজ কত পক্ষান্তরে, তাহা আমরা প্রত্যেকেই অবগত আছি; তাহার আর্থিক দুর্গতি প্রতিনিয়ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অতি রক্তপাতের দৃষ্টিমা উঠিতেছে; ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাহার ব্যর্থতা ও নৈরাশ্রের বেদনা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। এই দারুণ দুর্দশার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, সর্বসাধারণকে, বিশেষতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভ্রমসম্প্রদায়কে, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের কর্মপন্থার অনেকটা পরিবর্তন করিতে হইবে। এখানেও কৃষিকার্যের উন্নতি-অবনতির উপরই প্রায় সকল প্রকার ব্যবসায়ীর লাভক্ষতি নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এতদিন শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মনোযোগী না হইয়া, নিজেদের সামাজ্য ক্ষেত্রে থাকার রক্ষণাবেক্ষণ, জমিদারী, চাকুরি, ডাক্তারী বা ওকালতী প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকিতেন। ফলে এই হইয়াছে যে, তাহাদের পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে অবাঙালী কায়দা হইয়া বসিয়া গিয়াছে এবং দুনিয়ার ধনদৌলত বড়, তাহারাই এখন ভোগ করিতেছে। শুধু ওকালতী, ডাক্তারী, জমিদারী প্রভৃতির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া বাঙালীর আয় চলিতেছে না; উপস্থিত সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এতদিনের পরিত্যক্ত শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতি তাহাকে অত্যন্ত অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে। এখন কেঁদে কেন মনে না করেন, আমি চাকুরি, জমিদারী—এই সকলকে অবহেলা করিতে বলিতেছি। আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমানে

দেশের আন্তরিক উন্নতিবিধান করিতে হইলে প্রধানতঃ শিল্প-বাণিজ্যের পথই অবলম্বনীয়। কিন্তু এই পথে বাঙালীকে যথেষ্ট প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বিদেশী এবং অবাঙালী ব্যবসায়ীগণ এই ক্ষেত্রে যে ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা হইয়া বসিয়াছে, তাহাতে তাহাদের প্রবল শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শীঘ্র প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা বর্তমানে একমাত্র বাংলায় প্রতি বাঙালীর সম্ভবোপায় এবং সম্ভবদ্রব্য দ্বারাই সম্ভবে।

ব্যবসায় বা শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং তাহার পরিচালনার জগৎ, ব্যবসায়-শিল্পের যেকোনও যে অর্থ-শক্তি, সেই অর্থ-শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে বাঙালীর এখন সক্রিয়পন্থা অধিক প্রয়োজন,—সম্ভবদ্রব্যতা। বর্তমান জগতে যে আর্থিক সম্ভবশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায়-শিল্পের মূলধন সংগৃহীত হইতেছে, ব্যাক তাহারই একটি নিদর্শন। আজিকার দিনে এই চট্টগ্রাম শহরে যে শাখা-প্রতিষ্ঠানটি জন্মলাভ করিতেছে, তাহাকে আমি বাঙালীর আগ্রহ সম্ভবশক্তির নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেছি। এই প্রকার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত সমগ্র বাঙালীজাতির শিল্পব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠালাভের আশঙ্কনা ও সম্ভাবনা যে বর্তমানের জগতে আছে, একথা বলাই বাহুল্য। এই ভাবী যুগের সম্ভাবনার আভিকার সম্ভবতঃ যোগদান করিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিতেছি। শুধু আনন্দিত কেন,—আপনাদের এই প্রচেষ্টা আমাকে বিশেষ আশাশ্রিতও করিয়াছে। চট্টগ্রাম বাংলায় দ্বিতীয় প্রধান বন্দর, এই বন্দরের শিল্প

এবং ব্যবসায় এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করে নাই; শীঘ্রই ইহা ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি বিরাট কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই বলরের উন্নতিশীল ব্যবসায়ের বাঙালী তাহার স্রাব্য স্থান অধিকার করিয়া লউক,— ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীজাতির যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা আজ সকলেই অনুভব করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠালাভের অল্পকালে চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতকগুলি লক্ষণ বর্তমান দেখিতেছি। বর্তমানে কলিকাতায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িগণ বৈরুপ বিস্তৃত ও হৃদচড়ায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সেখানে বাঙালীর পক্ষে এখন আপনাত্মক স্থান করিয়া লওয়া সহজসাধ্য নহে। কিন্তু চট্টগ্রামের অবস্থা এখনও তেমন সমস্তাসম্বল হইয়া উঠে নাই; এখানে বিদেশীয় এবং অবাঙালী-সম্প্রদায় এখনও তেমন প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই;— বাঙালীর পক্ষে এখানে ব্যবসায়শিল্পে যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। যে-সকল প্রতিষ্ঠান কারণে কলিকাতার ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঙালীর পক্ষে আপাততঃ নিতান্ত দুর্লভ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়, চট্টগ্রামে সে-সকল কারণ অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও, কৃতকাৰ্য্য হইবার পক্ষে অল্পকাল কারণও যথেষ্ট আছে। বাঙালী ব্যবসায়িগণ এবিধে অবহিত হইয়া বাহাতে তাহারা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার জ্ঞান এখন হইতেই চেষ্টা করা উচিত। এখানকার এই সমবেত ব্যবসায় প্রচেষ্টাকে সফল করিবার কার্যে এই নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাংকটি যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। শিল্পবাণিজ্যের সম্প্রসারণের দিক দিয়া যে ইহার বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা বিস্তৃতভাবে বলা অনাবশ্যক।

এই উৎসবের আরও একটি বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া আমার মনে হয়। আমাদের দেশে ব্যবসায় শিল্পে আত্মনিয়োগের প্রচেষ্টা এবং আকাজক্ষা এখনও তেমন বিস্তৃতিলাভ করে নাই। এই প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে জাগ্রত করিতে হইলে সাধারণের মনোযোগ ক্রমাপত্ত এইমূহকে আকর্ষণ করিতে হইবে। আর্থিকতার এই উৎসব সেই বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়াই আমার মনে হয়।

বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি ও প্রসারকল্পে এই প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও প্রভাব যে কত বেশী তাহা আজ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশে ব্যাঙ্ককে দেশের ধনসম্পদের ব্যাপকায়ী বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে; কারণ সেখানে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—সকলেরই জরাজীর্ণ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের উপর। সেই সকল দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়তার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা বিভিন্ন জাতীয় ব্যাঙ্কই সরবরাহ করিয়া থাকে এবং এই সকল কার্যক্ষেত্রে প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে

ব্যাঙ্কের কারবারও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্কের সঙ্গে কৃষি-শিল্পাদির এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহাকে অন্যতম জাতীয় প্রধান প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্কের শুধু এই সকল প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ্য করিয়াই যে আমি কৃষিমা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের শাখা-প্রতিষ্ঠানকে চট্টগ্রামের কার্যক্ষেত্রে বরণ করিতেছি, তাহা নহে। আমাদের বাংলা দেশে বাঙালীর আর্থিক জীবনে এইপ্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যে আরও গুরুতর ও ব্যাপক তাহা বাংলা দেশে ব্যাঙ্কিং কারবারের উদ্ভব ও প্রসারের তুলনায় তাহার বর্তমান ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্পের আর্থিক প্রয়োজননের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে।

আপনারা জানেন, বাংলা দেশে মহাজনীরাতিতে টাকা ধার দিবার প্রথা অনেককাল হইতেই প্রচলিত আছে; এই প্রকার বিষয় অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, মহাজনগণ আপন আপন মূলধনে আপন আপন কারবারই চালাইয়াছেন এবং তাহাদের প্রস্তুত কর্তৃক টাকা অধিকাংশ স্থলেই ‘জমী-বন্ধকী’ কারবারে নিয়োজিত হইয়াছে। বহু জনের টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যাপকভাবে লম্বীকারবার করার প্রথা সাধারণতঃ এই মহাজনী-কারবারের অঙ্গীকৃত ছিল না। ভূ-সম্পত্তির প্রতি অত্যধিক মোহবশতঃ প্রত্যেক মহাজনই নিজ নিজ সংস্থান অনুযায়ী কর্তৃক দিতেন। আর বাংলার ‘চিরস্থানী বন্দোবস্ত’ এই প্রদেশের ভূ-সম্পদের উপর যে অসাধারণ মূল্য আরোপ করিয়াছে, তাহাতে জমির উপর টাকা ধার দেওয়া এতকাল খুব সহজ ও নিরাপন্ন বলিয়াও বিবেচিত হইয়াছে। বাংলার ব্যাঙ্কিং-কারবারের ক্রমবিকাশের ইহাই প্রথমাবস্থা;— ইহার জের এখনও চলিতেছে।

তারপর বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে এই ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়—বাংলা দেশে বাঙালীর চেষ্টায় বৌদ্ধনীতি কারবারের সুরপাতের সহিত। ইহাতে দেশের জনসাধারণের সঞ্চিত টাকা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত হইতে থাকে এবং তাহার সাহায্যে দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনের পথ প্রস্তুতিরও সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই ব্যাঙ্কিং-প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রথমাধিই কতকটা নিজের উল্লাসিনীতায়, কতকটা বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা পাটাইবার উপযুক্ত উপায়ের অভাবে, তাহাদের সংগৃহীত অর্থ পুরোক্ত মহাজনদিগের হায়েই মুখ্যতঃ ‘জমী-বন্ধকী’ কারবারে নিয়োজিত করিতে থাকে। টাকা-লম্বী ব্যাপারে খাটী কমান্ডিয়াল বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাঙ্কের সহিত বাংলার এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ একটা পার্থক্য লক্ষিত হওয়ায় এইমূহকে ‘লোন-ব্যাঙ্ক’ আখ্যা দিয়া বিভিন্ন পণ্যায়কৃত করা হয়।

বাঙালীর শিল্পব্যবসায় এই লোন-ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা পুষ্টিলাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে

সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এভাবে মহাকেন্দ্র নিজেই দিয়াছেন;—কখনওবা নিজ জামিনে অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজন মিটাইয়াছেন। কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তিগত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান ব্যবসায়-জগতে দীর্ঘকালের জন্য টিকিয়া থাকা সম্ভবপর নহে; কারণ, দেশের ব্যবসায়ের পোষকতা করিবার সমগ্র শক্তি কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কখনও যথেষ্ট হইতে পারে না। যে-যুগে বাংলার লোন-অফিসগুলি ব্যবসায়-শিল্পের প্রতি প্রসারিত দেখাইয়া কেবলমাত্র জমি-বন্দকী-কারবারে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল, দেশের শিল্প-জীবনে তাহাকে ‘অন্ধবুগ’ বলা যাইতে পারে। বাঙালীজাতি তখন চাকরি, জমিদারি প্রভৃতির স্বেচ্ছা আকর্ষণে ভুবিয়াছিল। সেই স্বযোগে ইংরেজ বণিকগণের সহিত একযোগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত অবাঙালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বাঙালীকে ব্যবসায়-শিল্প হইতে হানচুত করিয়া আপনাদিগকে স্বচলুভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

এইরূপে একদিকে যেমন লোন-অফিসগুলি হইতে বাঙালী ব্যবসায়িগণ কোনও সাহায্য পান নাই, তেমনি আবার লোন-অফিসগুলিও ব্যবসায়-শিল্পের প্রতি বাঙালীর বিমুখতার জন্য খাটি কমাণ্ডাল বা বাণিজ্যসাহায্য ব্যাঙ্করূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে, বাঙালীর লোন-অফিস এবং বাঙালীর ব্যবসায় দুই-ই আজ এই প্রকার বিপর্যয় হইয়া পড়িয়াছে।

এই লোন-অফিসগুলি অনেক স্থলেই কমাণ্ডাল বা বাণিজ্য-সাহায্য ব্যাঙ্কের মূলনীতি অনুসারে সংগঠিত। ইহাদের মূলধনের অধিকাংশই অল্পকালের জন্য আমানতহিসাবে রক্ষিত টাকা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই টাকা আমানত-কারীদিগকে অল্পকাল মধ্যেই ফিরাইয়া দিবার সর্ব্ব খাচার দক্ষ লোন-অফিসগুলির উচিত ছিল;—অল্পকালের জন্যই ঐ টাকা লয়ী করা। কিন্তু এই দিকে লক্ষ্য না করিয়া অধিকাংশ লোন-অফিসই আমানতী টাকা জমি-বন্দকী কারবারে নিয়োগ করিয়াছে। আজ ব্যবসায় বাজার মন্দা, জমির মূল্য কম; কাজেই সেই টাকা আদায় করা ক্রোধোদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, লোন-অফিসগুলির অবস্থাও আজ শঙ্কাজনক।

এই লোন-অফিসগুলি বিভিন্ন লোকের সঞ্চিত টাকা সংগৃহীত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে সন্দেহ নাই; বর্তমানে ব্যবসায় বাজার মন্দা এবং জমির মূল্য হ্রাস না হইলে হয়ত এগুলির তেমন দুরবস্থা হইত না। কিন্তু ব্যসায়সম্মত উপায়ে কার্য পরিচালনা না করিয়া অল্প কালের লোন-অফিসগুলির পক্ষে যে সমস্ত সাফল্য লাভ করা অসম্ভব ছিল, তাহা সহজেই অসম্ভবের। বাহ্য হটক, ক্ষিপ্রভাবে কার্য-পদ্ধতি নিরাসিত করিলে লোন-অফিসগুলি বর্তমান বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহা এখনও ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

বাংলার বাঙালীপরিচালিত ব্যাঙ্ক-কারবারের প্রসার সম্বন্ধে এখন আমাদের ব্যাপকভাবে চিন্তা করিবার সময় আদিয়াছে। ‘এই কারবারে বাঙালীর স্বত্বই উল্ল্যম নাই’—এ-কথা সত্য নহে। এই প্রদেশে বাঙালীর উন্মোগেই সত্তর বৎসর পূর্বে প্রথম লোন-অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই হইতে এপর্যন্ত বাঙালীর চেষ্টা,—বাঙালীর মূলধনে যত লোন-অফিস স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা আট শতেরও অধিক হইবে; ইহাদের সবগুলিই বৌদ্ধনীতিতে প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যাগরিমে ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এত ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠান হয় নাই। কিন্তু আপনারা মনে করিবেন না,—এই সংখ্যাবাহুল্য বাংলার ব্যাঙ্ক-সমুদ্রের পরিচায়ক। এই সকল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোন ব্যাপক পরিচালনা নাই; অবস্থার সংঘাতে পড়িয়া এগুলি ক্রমশঃ বাণিজ্যসাহায্য অথবা কমাণ্ডাল ব্যাঙ্কের মূলনীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং ব্যাঙ্কের কারবারের কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট গভীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে; কিন্তু এই সীমাবদ্ধ কার্যপদ্ধতি যে ব্যাঙ্ক-পরিচালন নীতির দিক দিয়া মোটেই নিরাপদ নহে, তাহা পূর্বে কেহই বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই; তাই আজ বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্ক কারবার সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও হীনশক্তি এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি,—এতদিন বাঙালীর প্রচেষ্টায় যে-সকল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সংগৃহীত টাকা মুখ্যতঃ জমি-বন্দকী কারবারেই নিয়োজিত হইয়াছে এবং সেই কারণে ব্যবসায়-জগৎ যে-প্রকার ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা থাকার দরকার, সে প্রকার ব্যবস্থা করা হয় নাই। বাংলার লোন-অফিসগুলি একান্তভাবে জমি-বন্দকী কারবারে আত্মনিয়োগ করিয়া ভুল করিয়াছে। আমার এ-কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, বাংলার ব্যাঙ্কসংস্থানে জমি-বন্দকী কারবারের স্থান অপ্রধান। বাংলার স্থায়ী কৃষিপ্ৰধান দেশে এই কারবারের যে নিত্য প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ক্ষুদ্রশক্তি লোন অফিসগুলি এই প্রকার কারবারের দারিদ্র্যতার গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়সম্মত ব্যাঙ্ক-পরিচালনা-পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই,—ইহাই আমার মন্তব্য। এই সত্ত্বে আমি ইহাও বলিতে চাই যে, জমি-বন্দকী কারবারের প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকার দক্ষ আমদের ব্যাঙ্ক-কারবারের প্রসার বিভিন্নমুখী হইতে পারে নাই। বর্তমান জগতের অগ্রণী দেশগুলির দিকে দৃষ্টপাত করি, তখনই আমরা ব্যাঙ্কের মধ্যে বিবিধ প্রতী-বিশাল দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। এই সকল ব্যাঙ্কের মূলধন সংগ্রহের পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতার উপর ইহাদের প্রতী-বিশাল নির্ভর করে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি-

দিধানের জন্ত প্রয়োজনীয় ঋণের স্থিতিকাল সমান নহে; এই বিভিন্ন প্রকার ঋণের স্থিতিকাল অতুসারে ব্যাঙ্কেরও অর্থসংগ্রহের জন্ত যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। দেশের আর্থিক সংস্থানে রুবি, শিল্প, বাণিজ্য—এই তিন প্রকার কর্মক্ষেত্রেই প্রশস্ত,—এই তিনটিই অবলম্বনীয়; ইহাদের কোনটিকেই উপেক্ষা করা সমীচীন হইতে পারে না এবং প্রত্যেকটির জন্তই যথাযথ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা থাকা দরকার।

জমি-বন্ধকী কারবারের জন্ত এদেশে ব্যাঙ্কের গঠন এবং পরিচালনপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে ‘ভারতীয় ব্যাঙ্ক অফিসিয়াল কমিটি’ যে বিস্তারিত অফিসিয়াল করিয়াছেন, তাহা হইতে আপনারা অবগত আছেন। এই তদন্ত কমিটির প্রস্তাব অতুসারে বাংলার গবর্নমেন্ট কিছুদিন পূর্বে যৈমনসিংহে এবং কুমিল্লায় দুইটি ‘জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক’ স্থাপনের আয়োজন করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, গবর্নমেন্ট হুদ দিবার জামীন স্বীকারে ‘ডিবেঞ্চার’ অর্থাৎ দীর্ঘকাল মেয়াদে পরিশোধনীয় প্রতিজ্ঞাপত্র বিলি করিয়া, এই সকল ব্যাঙ্কের মূলধন সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং এই টাকা দ্বারা বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি রুসক ও জমিদারবর্গের পূর্করুত ঋণ পরিশোধের সহায়তা করিবে। জমি-বন্ধকী কারবারের জন্ত যে-মূলধন প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিতে হইলে দীর্ঘকাল মেয়াদী আমানত অথবা হস্তান্তর-যোগ্য ডিবেঞ্চার বিক্রয়ে প্রকৃষ্ট পথ। বাংলা গবর্নমেন্টের ব্যবস্থার শেষোক্ত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আমাদের লোন-অফিসগুলি মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে সর্বতোভাবে অনতিকালস্থায়ী আমানতের উপর নির্ভরশীল হইয়াও জমি-বন্ধকী কারবারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। তাহার অবশ্রম্ভাবী ফল আপনারা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আজ এখানে যে ব্যাঙ্কের শাখা-কাৰ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা প্রধানতঃ কন্মার্শ্যাল বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাঙ্কের আদর্শে পরিচালিত; কাজেই এখানে লোন-অফিসের সমস্তর আর বিস্তৃত পুনরাবলোচনা অনাবশ্যক।

বাংলাদেশে কন্মার্শ্যাল বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাঙ্ক-কারবার এখন মুখ্যতঃ বিদেশীয় এবং ভিন্ন প্রদেশবাসিদের দৃষ্টিভারতীয় হইয়া রহিয়াছে। কলিকাতার ভায় কম্বর, বেখানে বাংসার প্রায় সমগ্র অন্তর্বর্ণিজা এবং বহিবর্ণবিজা কেন্দ্রীভূত

হইয়াছে এবং যেখানে ব্যবসায়গত কর্ম্ম সরবরাহ করিবার সুবিধার্থে ক্ষেত্র রহিয়াছে, সেখানেও দূর্তাগ্যক্রমে বাঙালীর প্রচেষ্টায় কোন বৃহৎ কন্মার্শ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বাংলায় ব্যাঙ্কিং-কারবারের প্রসার আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বিদেশীয় বা ভিন্নপ্রদেশবাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেও শিল্প-ব্যবসায়ের সাহায্যকল্পে যে যে প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, বাংলায় তাহার অভাব নাই। কেহ কেহ আবার বাংলায় স্বস্বাধিকারীনীর্ণিশেবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলির মোট কারবারের পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া, তাহাকেই বাংলার ধনসম্পদের বাস্তব মাপকাঠি বলিয়া ভ্রম করিয়া বসেন। সত্য বটে, বিদেশী একসঙ্গে ব্যাঙ্ক এবং কন্মার্শ্যাল ব্যাঙ্কগুলির সহায়তায় বাঙালী ব্যবসায়িগণও কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তর্বর্ণিজা এবং বহিবর্ণবিজা চালাইতে সক্ষম হইতেছেন; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা কোনমতেই স্বীকার করা যায় না যে, বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যাঙ্কের প্রয়োজন নাই। তাহার অভাব আমরা অনুভব করিতেছি না। দূর্তাগ্যক্রমে আজ বাংলা এবং বাঙালী তুল্যার্থবোধক কথা নহে। আপনারা এখানে ঘাহারা ব্যবসায়ী রহিয়াছেন, তাহারা সকলেই জানেন যে, বিদেশীয় ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের স্বদেশবাসী ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়ের পোষকতা করিবার জন্ত অনেক বিষয়ে তাহাদিগকে অনেক সুবিধা দিয়া থাকে; পক্ষান্তরে বাঙালীরা সে-সকল সুবিধা পায় না। অগ্নিবীমা, নৌ-বীমা প্রভৃতির সুবিধা বিদেশী প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলি হইতে বাঙালী ব্যবসায়িগণ কখনও আশা করিতে পারেন না। ঐ সকল ব্যাঙ্কে বাঙালীদিগকে কেয়াগী প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করা হয় বটে, কিন্তু কোন দায়িত্বশূণ্য উচ্চ পদে প্রায়ই তাহাদিগকে স্থান দেওয়া হয় না। এই প্রকার আচরণ যে সকল ক্ষেত্রেই পক্ষপাতমূলক, তাহা বলিতে চাই না। ব্যাঙ্কিং-কারবারে অনেক সময় ইহা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এই-সব কারণেই ব্যাঙ্ক জাতীয়প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য হইয়া থাকে।

আজ আমরা বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক শুধু ব্যাঙ্কিং-কারবারের জন্তই চাহিতেছি না,—এই প্রতিষ্ঠান বাঙালীর শিক্ষকত্রে হইয়া বাঙালী জাতির প্রতি বাঙালীর

মমস্বৰূপ জাগাইয়া তুলিবে, ব্যবসায়-শিল্পের প্রতি বাঙালীকে অগ্রপ্রেরণা দিবে এবং এই ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারে তাহাকে সহায়তা করিবে, এইগুলিও এই প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অন্ততম উদ্দেশ্য। বেকার-সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া বিচার করিলেও বাংলা দেশে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের প্রয়োজন যে যথেষ্ট রহিয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

দেশের অর্থনৈতিক জীবনে কমাৰ্শ্যাল ব্যাঙ্কের প্রয়োজনের প্রতি বাঙালীর মনোযোগ যে আকৃষ্ট হয় নাই, এমন নহে। বস্তুতঃ, স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই এ-বিষয়ে বাঙালী জাতি অবহিত হইয়াছে। অল্পকালমধ্যেই অনেকের সমবেত চেষ্টায় কলিকাতায় দুইটি কমাৰ্শ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ইহার একটি ‘বেঙ্গল স্ত্রাশনাল ব্যাঙ্ক,’ অপরটি ‘হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক’। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুইটি ব্যাঙ্কই কারবার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক দুইটির শোচনীয় পরিণতির জন্য বাঙালীর ব্যাঙ্ক-পরিচালনের অক্ষমতার উপর যে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে, তাহার মূখ্য এখনও আমরা ভোগ করিতেছি। কিন্তু ইহার জন্য আমাদের নিরক্ষরসহ ইহবার কোন কারণ নাই। এই সন্দেহ বিশেষ করিয়া আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

আমার মনে হয়, যাহারা এই দুই ব্যাঙ্কের দৃষ্টান্তে বাঙালীর ব্যাঙ্ক-পরিচালনার ক্ষমতার উপর কটাক্ষপাত করেন, বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কের ইতিহাসের সন্নিহিত তাহাদের সম্যক পরিচয় নাই। প্রথম কথা,—অসাধুতাই ব্যাঙ্কের সর্বনাশ ঘটবার একমাত্র মুখ্য কারণ নহে। তা ছাড়া অসাধুতা কোন ব্যাঙ্কের সর্বনাশ সাধনে সমর্থ হইলেও একথা মনে রাখা দরকার যে, এই দোষ সর্বদেলে সর্বজাতির মধ্যেই অজ্ঞাধিক পরিমাণে বিরাজ করিতেছে এবং সর্বত্রই কোন-না-কোন ব্যাঙ্ক ইহার জন্য কতিপয় হইয়াছে; কিন্তু পৃথিবীর কোন অগণী দেশেই এই কারণে ব্যাঙ্কের প্রাণর ও স্রীবৃদ্ধি প্রভেদ হয় নাই।

বেঙ্গল স্ত্রাশনাল ব্যাঙ্কের পতনের পর আমি তাহার যথাযথ কারণ নির্দেশ করিবার জন্য অল্পকালমধ্যে প্রবৃত্ত হই। এই অল্পকালের মধ্যে আমার দুঃখবিশাল জন্মিয়াছে যে, আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের এই প্রকার দুর্গতির মুখ্য কারণ হইল,—হীনব্রত ব্যবহার অভাব। ব্যাঙ্কের কর্মচারীবৃন্দের

অসাধুতারও ব্যাঙ্ক কতিপয় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যাঙ্কের সমুহ সর্বনাশ সাধিত হইতে পারে না। যথাযথভাবে কার্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকিলে এই প্রকার অসাধুতা প্রশ্রয় পায় না এবং বিধি-বিগর্হিত কার্য বন্ধ করাও সহজসাধ্য হয়।

ব্যাঙ্কের পতনের কালে তাহার ধন-সম্পত্তি টাকা যে-যে স্থানে নিয়োজিত ছিল, তৎপ্রতি একটু মনোযোগী হইলেই কতকগুলি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমাৰ্শ্যাল ব্যাঙ্কের মূলনীতি এই যে, এমন ভাবে টাকা খাটাইতে হইবে যে, নির্দিষ্ট সময়মধ্যে ঐ টাকাটা আপনা-আপনি ফিরিয়া আসিবার উপায় বা বন্দোবস্ত থাকে; কিন্তু স্ত্রাশনাল ব্যাঙ্ক এই নীতির দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ অথবা নিছের দলকে পরিপুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে অনেক লোককে বিনা জামীনে অথবা উপযুক্ত জামীন না থাকা সত্ত্বেও টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। লম্বীর টাকার অল্পপাতে তাহার জামীন সন্দেহে বিশেষ প্রাধান্য করা হয় নাই। আর স্বদেশিকতার প্রেরণায় এমন অনেক শিল্পে টাকা নিয়োগ করা হইয়াছিল যে, যাহা আদায় হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ব্যাঙ্কের ব্যবসায়নীতিসম্মত মূলধন সংগ্রহের রীতি এবং তাহা লম্বী করিবার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটিতে থাকিলে তাহার সর্বনাশ অবশ্যস্বাভাবী; চরম সাধুতাও তখন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। পরিচালকবর্গের অসাধুতারও ব্যাঙ্কের অনেক ক্ষতি হয় বটে; কিন্তু এতদ্ব্যতীত আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই যে, হীনব্রত ব্যবহার অভাব ঘটিলে অতি বড় সাধুও অসাধু হইয়া পড়িয়া,—বেঙ্গল স্ত্রাশনাল ব্যাঙ্কের ব্যাপারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের পতনের মূলে বিশেষ ‘কান অসাধুতার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বটে; কিন্তু ব্যক্তি কার্য প্রাণী সন্দেহে অজ্ঞতাই ইহার খসের প্রধান কারণ।

আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্যভিত হইবেন যে, বর্তমান সময়ে সাধু বলিয়া পরিচিত লোক অসাধু লোক অপেক্ষাও সন্মাজের অনেক অধিক অনিষ্ট করিতেছেন।

এই দুইটি ব্যাঙ্কের পতনের প্রকৃত কারণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সাবধানতার সহিত যদি আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই,

তাহা হইলে ভবিষ্যতে অমোদের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। 'বাঙালীর ভিতর এমন কোন মজ্জাগত দোষ আছে, তাহাতে তাহারা ব্যাঙ্ক-পরিচালনায় অক্ষম'—একথা মোটেই বীকার্ধ্য নহে। ব্যাঙ্কগুলির অসফলতার মূল কারণ অসুস্থ মানসিকতা। এই ধারণা আমার স্পষ্ট জ্ঞান আছে যে, সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার দ্বারা কাজ চালাইলে সাফল্য অনিবার্ধ্য। আমার মনে হয়, কলিকাতার মত সুবৃহৎ বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বাঙালীদের দ্বারা একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে। বাহারা অর্থশীলী, বাহারা এই কাজে উপযুক্ত, বাহাদের উপর লোকের বিশ্বাস আছে, তাহারা যদি এই কাজে হাত দেন, তাহা হইলে তাহাদের সাফল্যমণ্ডিত না হইবার কোনই কারণ নাই। কলিকাতায় এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে অতীব শক্তিদায়ক হইবে।

কেবল কলিকাতা বা চট্টগ্রাম বন্দরেই নয়,—মফঃস্বল বাংলায়ও এই প্রকার কমাৰ্শ্যাল ব্যাঙ্কের প্রয়োজন রহিয়াছে; নতুবা মফঃস্বলের শিল্পব্যবসায়ের পুষ্টিলাভ হইবে না এবং তাহার ফলে বাঙালীকে এই দিকে আকৃষ্ট করিবার পথ আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কলিকাতাতে বিদেশী এবং ভিন্ন প্রদেশবাসীরা এমনভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে যে, সেখানে বাঙালীর পক্ষে তাহার জায়গা স্থান অধিকার করিয়া লওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার হইবে। কিন্তু বাংলার মফঃস্বলে অবাঙালী ব্যবসায়িগণ তেমনভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। এক হিসাবে মফঃস্বলই বাণিজ্যের প্রধান স্থান; অধিকাংশ জিনিষপত্র এবং কাঁচামাল সেখানে উৎপন্ন হয় এবং সেখানেই জিনিষপত্রের ব্যবহার হয় বেশী। আমরা যদি মফঃস্বলে একবার কয়েমী হইয়া বসিতে পারি, তাহা হইলে কলিকাতায়ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

মফঃস্বল-বাংলার ব্যবসায়ের বাঙালীর ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হইতেছে। বিদেশীয় এবং অবাঙালী ব্যবসায়িগণ এখন নিজ নিজ শাখা-কাৰ্যালয় বা 'এজেন্সী' প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার মফঃস্বল ব্যবসায় অধিকার করিয়া লইবার আয়োজন করিতেছে। এই আসন্ন প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে পাড়াইতে হইলে, মফঃস্বলে কমাৰ্শ্যাল ব্যাঙ্কের মূল পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যাঙ্কের সহায়তা নিত্য প্রয়োজন।

কিন্তু এখানে আমি বলিতে চাই, এই প্রকার ব্যাঙ্কের প্রবর্তন-কালে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, মফঃস্বলে কমাৰ্শ্যাল ব্যাঙ্কিং-কারবারের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ আছে কিনা। এই প্রকার ব্যাঙ্কিং-কারবারের মূলনীতি যে 'লব্ধীটাকা অল্পকাল মধ্যেই আদায়-যোগ্য হওয়া চাই',—তাহা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণতঃ ব্যবসায়ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর লব্ধীর পথ প্রশস্ত দেখা যায়। আমাদের দেশের অসুস্থ বাণিজ্য বৎসরের দুই এক সময়ে প্রধানতঃ দুই একটি ফসলের উপরই নির্ভর করে বেশী। এই বাণিজ্যে একস্থান হইতে আর একস্থানে মাল পাঠাইবার ব্যাপার সাধারণতঃ অল্পকালই স্থায়ী হইয়া থাকে। এই প্রকার মাল চলাচল সম্পর্কে যে-সকল দলিলের উদ্ভব হয়, তাহা হস্তান্তরকরণোপযোগী হইলে, কমাৰ্শ্যাল ব্যাঙ্কের কৰ্ম্ম দিবার পক্ষে ঐগুলি বিশেষ উপযোগী 'সিকিউরিটি' বা জামীন বলিয়া বিবেচিত হয়। আমাদের দেশে ছত্তী, রেলের রসিদ, গুদাম রসিদ প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর দলিল। ছত্তীর উপর টাকা ধার দেওয়ার কারবার অনেককাল হইতেই এদেশে প্রচলিত আছে। আমার মনে হয়, কমাৰ্শ্যাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা এবং সহায়তা দ্বারা গুদামী ও আড়ম্বারী কারবারাদি বৃদ্ধি পাইবে এবং এই সকলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমাৰ্শ্যাল নীতিতে টাকা ধার দিবার পক্ষে উপযুক্ত 'সিকিউরিটি' বা জামীনের অভাব ঘটিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিস্তৃতভাবে কমাৰ্শ্যাল ব্যাঙ্কিং-কারবার চালাইতে হইলে কতগুলি মূলনীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ কৰ্ম্মচারী নিয়োগ, শাখা কাৰ্যালয় প্রতিষ্ঠা, গুদামী ও আড়ম্বারী কারবারের পরিপোষণ এবং অন্যান্য স্বল্পবহুল ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে। কার্যকম কৰ্ম্মচারী ও পরিচালক নিয়োগ করিয়া সর্ববিধের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা করিবার পক্ষে ব্যাঙ্কের যথেষ্ট আর্থিক সংস্থান না থাকিলে, সেই ব্যাঙ্কের পতন অবশ্যজ্ঞাবী। আর এইরূপ ক্ষুদ্রশক্তি ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীল বিনিয়োগেরও উন্নতি নাই। এক্ষণে দৃঢ় এবং ব্যাপক ভিত্তির উপর কমাৰ্শ্যাল বা বাণিজ্য-সাহায্য ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কমাৰ্শ্যাল ব্যাঙ্কের এই নীতির অচলরূপ না করিবার ফলে, আমেরিকার মত দেশেও বিগত তিন-চার বৎসরের

মধ্যে অন্যান্য বার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক অল্প বিবিধ প্রকার সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও কারবার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। আমেরিকার এই দৃষ্টান্ত হইতে অক্ষম ক্ষুদ্রশক্তি কমাশ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। বিপুল আর্থিক সংস্থানের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যাহারা কেবল প্রতিযোগিতা করিবার জন্যই এক নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে অসংখ্য ব্যাঙ্ক খুলিয়া বসেন, প্রতিযোগিতায় জয়লাভ দেখানে তাঁহাদের হয় না—হয় কেবল দুর্গতি।

বাংলার বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কমাশ্যাল ব্যাঙ্কগুলির যে আজ দায়িত্ব এবং গুরুত্ব কত, তাহা দুই-এক কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। এইগুলির উন্নতি অবনতির উপর বাংলার জাতীয় উন্নতি-অবনতি নির্ভর করিতেছে। এইগুলির সাফল্য আজ ব্যক্তি-বিশেষের বা দল-বিশেষের সাফল্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না, আজ সমস্ত বাঙালী জাতির সাফল্য এদের উপর একান্তভাবে র্ত্তম্ব রহিয়াছে। এই এক একটি ব্যাঙ্ক আজ সহস্র সহস্র বাঙালীকে শিল্প-ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট করিবে; আবার এক একটি শিল্প-ব্যবসায় বিরাট রকমের এক একটি ব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সাহায্য করিবে; সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর আর্থিক দুর্গতির ও বেকার সমস্যার অবসান ঘটবে। সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অভাবে অথবা পরিচালকবর্গের শৈথিল্যে যদি বাংলায় বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের পতন হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জগতের অগ্রণী দেশগুলির সঙ্গে বাঙালীর আর পা কেলিরা চলিবার উপায় নাই।

বর্তমানে সুমিয়ার দুইটি ব্যাঙ্ক কমাশ্যাল নীতিতে কাজকর্ম পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন; আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহাদের পরিচালকবর্গ যে কেবল আমানতী টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট আছেন বা কাজ চালাইতেছেন, তাহা নহে; ইহারা নিজেদের টাকাও যথেষ্ট পরিমাণে এইগুলির মধ্যে রাখিয়াছেন, ইহার ফলে ব্যাঙ্ক পরিচালনা বিষয়ে ইহাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে এবং ব্যাঙ্ক দুইটির পূর্ণ সাফল্যের দিকে ইহারা প্রত্যেকেই মনোযোগী হইয়াছেন। এই দুইদিনেও

তাঁহারা যে কেবল বাঁচিয়া রহিয়াছেন, তাহা নহে,—প্রশংসা লাভও করিতেছেন যথেষ্ট। ১৯২০ সনে সুমিরা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন; ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত মহাশয় সর্বজনবিদিত। ব্যাঙ্কিং-কারবার বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় দক্ষতা ও অজুরক্তি যে এই ব্যাঙ্কটি সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত করিবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না। তাঁহার বাচনিক জানিতে পারিলাম যে জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম যে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক আমানতী টাকার লগ্নী কারবারে কমাশ্যাল নীতির অনুসরণ করিতেছে এই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কলিকাতায় এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি মধ্যস্থলের বিভিন্নকেন্দ্রে শাখা-কাঞ্চালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সকলস্থানেই তাঁহারা বাঙালীর সহায়ত্ব পাইতেছেন ও পাইবেন। চট্টগ্রামের এজেন্ট শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রচন্দ্র সেন এবং কলিকাতার এজেন্ট শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন,—এঁদের আমি বিশেষ জানি। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে মহৎ এবং বৃহৎ পরিকল্পনা এবং তাহার পরিচালনা সম্বন্ধে এঁদের যথেষ্ট ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা আছে। ইহারা উভয়েই বাংলা সম্ভ্রান্তধরের লোক এবং বহু বিশিষ্ট লোকের সহিত ইহার সংশ্লিষ্ট। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং চাঁদপুরের এজেন্টদের সঙ্গেও আমার আলাপ-পরিচয় করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে কমাশ্যাল ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা থাকার দরকার, তাহা তাঁহাদের যথেষ্টই আছে বলিয়া মনে হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম ব্যাঙ্কের উপর ইহারা কত মহতী আশা পোষণ করেন ব্যাঙ্ককে জাতীয় বিরাট প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে ইহাদের উৎসাহ উদ্যম আমাকে চমৎকৃত করিয়াছে আমার দৃঢ় আশা এবং বিশ্বাস, এই কমাশ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় এবং পরিচালনায় ইহারা দেশের এবং জাতির যে দায়িত্বভার স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে অতিরিক্ত ভবিষ্যতে ইহারা অবশ্য জয়যুক্ত হইবেন। দেশের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় এখনও ইহাদের প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র হইলেও অদূর ভবিষ্যতে সকলের সাধু প্রচেষ্টায় ইহাই স্ফূট ও বিরাট হইয়া উঠিবে,—বাংলার বাঙালী আশ্বস্তপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদ আমাদের সহায় হউক।

* সুমিরা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের চট্টগ্রাম শাখার উদ্বোধন-উৎসব উপলক্ষে অভিনন্দন।



ঈশ্বরশাস্ত্র



ভোজনের ফাশন—

উড়ু হইয়া শুইয়া কিংবা বাম কনুইয়ের উপর ভর দিয়া অর্ধশয়ান অবস্থায় ভোজনের রীতি হোমরের যুগে গ্রীসে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু তাহার পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগে গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে ইহার চলন দেখা যায়। এই প্রকারে ভোজন করিবার ছবি গ্রীস ও রোমের প্রাচীন ভাণ্ড আদিপাত্রের গারে অঙ্কিত দেখা যায়। কথিত আছে, যে, এই রীতি প্রাচ্য দেশ হইতে ঐ দুই দেশ গ্রহণ করে। কিন্তু কোন্ প্রাচ্য দেশ হইতে উহা গৃহীত তাহা জানি না। যাহারা এই প্রকারে



অর্ধশয়ান অবস্থায় ভোজন

ভোজন করিত, তাহার। কোঁচে শুইয়া বা অর্ধশয়ান হইয়া খাদ্য গ্রহণ করিত। তাহাদের বকের বা বা কনুইয়ের নীচে গদি বা বালিশ থাকিত। যে-টেবিলে ভোজ্য দ্রব্য থাকিত, তাহা কোঁচের চেয়ে কিছু নীচু করা হইত। এরকম রীতি অলস অকর্মী বিদ্যাসীদের পিপেযোগী।

আফ্রিকার উগাণ্ডা দেশের এক জারগার রাজা নিজের হাতে পাওয়াটাকে অপমানকর মনে করেন। তাহার পাচক তাহাকে খাওয়াইয়া দেয়। কিন্তু খাওয়াইতে খাওয়াইতে যেচোরা যদি লগপুলবের দাঁত ছুইয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার আঁখিও হয়।



আফ্রিকার উগাণ্ডা দেশের এক রাজাকে পাচক খাওয়াইতেছে



মিসরের অজুজপ মেসিকোর একটি প্রাচীন পিরামিড

মেসিকোর সভ্যতা ও সংস্কৃতি—

কলম্বাস ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিতে যখন হইয়া আমেরিকার উপহিত হইয়াছিলেন, এই হেতু আমেরিকার অন্ত নাম ওয়েট ইন্ডিজ। ইহার আদিব অধিবাসিগণও যেই ইন্ডিয়ান (লাল ভারতীয়) বলিয়া পরিচিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আদিব অধিবাসীরা প্রায় নিম্ন ল হইলেও মেসিকোতে এখনও বাঁচিয়া আছে। সেখানে আদিব ইন্ডিয়ান এখনও জনসংখ্যার শত করা উল্লিখিত ভাগ। স্পেন-দেশীয় হারনেভো কোর্টেজ ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে মেসিকো জয় করেন। তদবধি প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত ইহা স্পেনের সম্পর্কে থাকায়, ইহার অধিবাসীদের মধ্যে সেনার রক্ত প্রবেশ করিয়াছে। স্পেন ও ইন্ডিয়ান জনিত 'মেসিকো' নামক মিশ্র জাতি শতকরা ভিন্নার জন। অবশিষ্ট সাড়ে সাত ভাগ মাত্র সেনীয়।



একটি মেসিডো রমণী (শেনোয়-ইন্ডিয়ানের দৃষ্টান্ত)

শেনোয়দের আবির্ভাবের পূর্বে গণ্যস্ত মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছিল। আদিম অধিবাসী বলিতে আমাদের মনে কোল, ভীল, মৌণ্ডাল, নাগা, কুকী প্রভৃতি কথা স্বতঃই উদয় হয়। কিন্তু মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীরা এরূপ ছিল না



হুইহুং খড়ের চুপী মাথার মেক্সিকো-বালক

তাহারা স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা 'কোয়েটসকোটি'। ইনি মাতৃবীর সকল রকম মহৎ গুণের প্রতীক। মেক্সিকোর এরূপ উন্নত অধিবাসীরা শেনোয়দের অধীনে আসিয়া ক্রমশঃ বৈশিষ্ট্য হারা হইতে বসিয়াছিল। ইহারা ইহারা আবার আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে।



স্বরাজ্য-দলের পুনরুজ্জীবন

কংগ্রেস যখন রাজনৈতিক বিষয়সমূহে গবয়েন্টের সহিত অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেন, তখন সমগ্রভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সভা হওয়াও কংগ্রেস-ওয়ালাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়। পরে, ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সদস্যরূপে প্রবেশ করিয়া সেখানেও গবয়েন্টের কোন কোন প্রকার আইনপ্রণয়নাদি কার্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কংগ্রেসওয়ালার ব্যবস্থাপক সভার সভা হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কংগ্রেসের এই দলের নেতা হন চিত্তরঞ্জন দাস। বস্তুতঃ তিনিই এই স্বরাজ্য-দল গঠন করেন এবং এই দলের মতের প্রবর্তকও তিনি। তাঁহার মৃত্যুর পর পণ্ডিত যোতীলাল নেহরু এই দলের নেতা হন।

অসহযোগ নীতির অমূল্যসরণ দ্বারা যেমন, তেমনই এই স্বরাজ্য-দলেরও নীতির অমূল্যসরণ দ্বারা কংগ্রেসের বাঞ্ছিত পূর্ণ স্বরাজ্য লক্ষ্য হয় নাই, ডোমিনিয়নও লক্ষ্য হয় নাই। কিন্তু অসহযোগ নীতির অমূল্যসরণ দ্বারা পরোক্ষ লাভ অনেক হইয়াছে এবং ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য-দলের সভ্যরা যত দিন ছিলেন, তত দিন তাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতা, প্রগতি ও উন্নতির প্রতিকূল আইনাদির বিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্যবস্থাপক সভাসমূহে স্বরাজ্য-দলের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় তাঁহারা কোর্পিলপ্রবেশ নীতি পরিত্যাগ করেন। এখন, কিছু দিন হইতে কংগ্রেস বিশেষ কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া অনেক কংগ্রেসওয়ালার আবার স্বরাজ্য-দলের পুনরুজ্জীবন দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রবেশের সমর্থন করিতে ছিলেন। এ বিষয়ে দিল্লীতে তাঁহাদের কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। কনফারেন্সে কোর্পিল প্রবেশের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনাও ডাক্তার আলালী, শ্রীমুক্ত ভুল্লাভাই দেশাই

এবং ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় কনফারেন্সের পক্ষ হইতে পার্টনারি করিয়াছেন। তাহার ফলে গান্ধীজী ডাক্তার আলালীকে এক খানি ইংরেজী চিঠিতে লিখিয়াছেন :—

I have no hesitation in welcoming the revival of the Swarajya party and the decision of the meeting to take part in the forthcoming election to the Assembly, which, you tell me, is about to be dissolved. My views on the utility of the legislatures in the present state are well known. They remain on the whole what they were in 1920, but I feel that it is not only right but it is the duty of every Congressman, who for some reason or other does not want to, or cannot take part in, civil resistance and who has faith in entry into the legislatures, to seek entry and form combinations in order to prosecute the programme which he or they believe to be in the interest of the country. Consistently with my view above mentioned, I shall be at the disposal of the party at all times and render such assistance as it is in my power to give.

তাৎপৰ্য্য। স্বরাজ্য-দলের পুনরুজ্জীবন এবং ব্যবস্থাপক সভার আগামী সভানিকাচনে আপনাদের যোগ দিবার সিদ্ধান্তকে 'স্বাগত' বলিতে আমি দ্বিধা বোধ করিতেছি না। বর্তমান অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভাগুলির (দেশের পক্ষে) উপকারিতা সন্দেহ আমার মত হইবে। তাহা ১৯২০ সালে যাহা ছিল এখনও মোটের উপর তাহাই আছে। কিন্তু আমি অনুভব করি, যে, যে-সব কংগ্রেসওয়ালার যে-কোন কারণে নিরুপদ্রব প্রতিরোধে যোগ দিতে চান না বা পারেন না, এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে বাঁহাদের বিশ্বাস আছে, ব্যবস্থাপক সভায় দল বাঁধিবার জন্য এবং দেশের পক্ষে যাহা তাঁহারা হিতকর মনে করেন সেই কর্তৃপক্ষের অমূল্যসরণ করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে চাহিবার শুধু যে অধিকার তাঁহাদের আছে, তাহা নহে, তাহা তাঁহাদের কর্তব্যও বটে। আমার উপরি উল্লিখিত (ব্যবস্থাপক সভাসমূহের উপকারিতা সন্দেহ) মতের সহিত সঙ্গতি রাখা করিয়া আমি সন্দেহই স্বরাজ্য-দলের আজ্ঞাধীন থাকিব এবং আমার যেরূপ সাহায্য করিবার ক্ষমতা আছে তাহা করিব।

গান্ধীজীর চিঠিটির মানে যিনি যেরূপ বুঝিতে চান বুঝুন, আমার এ-বিষয়ে কোন তর্ক করিব না। যত কংগ্রেসওয়ালার মত কাগজে বাহির হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই স্বরাজ্য-দলের পুনরুজ্জীবনের পক্ষেই মনে হইতেছে। বড় নেতাদের মধ্যে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কিছু কিছু করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এ-বিষয়ে কোন নির্ধারণ না-হওয়া পর্যন্ত দিল্লী-কনফারেন্সের

প্রস্তাব কংগ্রেস-ওয়ালারা মানিতে পারেন, না-মানিতেও পারেন।

এ-বিষয়ে আমাদের মত অনেক বার প্রকাশ করিয়াছি। সকল কংগ্রেসওয়ালারা ত কাণ্ডিত: অসহযোগ নীতির বা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতির অহুসরণ করেন না—এখন ত অতি অল্প লোকই তাহা করিতেছেন। ঐহারা অসহযোগ নীতির অহুসরণ করেন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের কৌশলি গিয়া বক্তৃতা, তর্কবিতর্ক ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার যোগ্যতা আছে। ব্যবস্থাপক সভাগুলি কাণ্ডিত: জো-হুমুদের একচেটিয়া লীলাক্ষেত্র যাহাতে না-হয়, তাহা তাঁহারা করিতে পারেন এবং তাহা করা তাঁহাদের কর্তব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, তাহাতে কি লাভ? আগেই বলিয়াছি, কৌশলি প্রবেশ দ্বারা স্বরাজ্য লক্ষ্য হয় নাই, হইবেও না। সে আশায় কোন দল কৌশলি প্রবেশ করিলে তাঁহারা নিরাশ হইবেন। কিন্তু স্বরাজ্য-দলের লোকেরা দলবলে বর্তমানে কৌশলি দখল করিতে পারিলে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর কোন আইন ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা প্রণয়নের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারেন। অস্তিত্ব: তাঁহারা এরূপ বিরোধিতা করিতে পারেন, যে, এদেশে বা বিদেশে একথা রটান চলিবে না, যে, অমুক আইন দেশ-প্রতিনিধিরাই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

অসহযোগ আন্দোলন যখন আরম্ভ হয়, তখন দেশহিতকর অনেক কাজ কোন আইন লঙ্ঘন না করিয়া করা চলিত, দেশহিতকর অনেক কথা লেখা ও বলা কোন আইন লঙ্ঘন না করিয়া লেখা ও বলা চলিত। তাহা সত্ত্বেও অনেক হাকিম ও পুলিশের লোক তাগাতে বেআইনী ভাবে বাধা দিত বটে; কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে আদালতে প্রতিকার চাহিতে পারিত। কিন্তু তৎপরে অনেকবৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে সরকারী কর্মচারীরা ঐসব কাজ ও কথা ক্রমশ: ব্যবস্থাপক সভায় নতুন নতুন আইন করাওয়া এখন বেআইনী করিয়া ফেলিয়াছে। কংগ্রেসওয়ালারা দলবলে ব্যবস্থাপক সভায় থাকিলে হয়ত কোন কোন আইন ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা করান যাইত না, বা করা হইতে খুব বেগ পাইতে হইত, কিংবা কিছু সংশোধিত আকারে প্রণীত হইত।

অত্যাচারের সংবাদ পর্যন্ত প্রকাশ করা ক্রমশ: কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে। এখন যে আইন হইয়াছে, তাহাতে

খবরের কাগজে—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের কোন খবরের কাগজে—অত্যাচারের অভিযোগ পর্যন্ত মুদ্রিত হইতেছে না। কিন্তু এই সব অভিযোগ অস্তিত্ব: এক শত দেড় শত জন লোকও যদি শুনে, তাও ভাল। শ্রোতাদের মধ্যে একজনেরও মনুষ্যত্ব যদি উদ্বোধিত হয়, ভাল। সে দিন দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় মেদিনীপুরের কোন কোন গ্রামের কোন কোন মহিলার ও পুরুষের উপর যে অত্যাচারের অভিযোগ সত্যোক্তবাবু গবন্মেণ্টের গোচর করেন, তাহা নামধামসহ কোন খবরের কাগজেই বাহির হয় নাই। তিনি যখন দিল্লীতে অভিযোগসমূহ পাঠ করিতেছিলেন, তখন শ্রোতাদের চেহারা ও মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল জানি না। ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসওয়ালার সংখ্যা বেশী হইলে আশা করা যায় কোন গুরুতর অভিযোগই অকথিত থাকিয়া যাইবে না, এবং অভিযোগ শুধু কথিত হইবে না, তাহার প্রকাশ্য তদন্তের দাবী অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হইবে। সত্যোক্তবাবুর দুই বৎসরের অভিযোগাবৃত্তির ফলে এরূপ দাবীর প্রস্তাব উত্থাপিত পর্যন্ত হয় নাই। ইহা লক্ষ্যার বিষয়। তদন্তের দাবীতেই কি প্রতিকার হইবে? হইবে না জানি। এক বৎসর পূর্বে ঠিক এরূপ অত্যাচারের অভিযোগ সত্যোক্তবাবু ব্যবস্থাপক সভার ও গবন্মেণ্টের গোচর করিয়াছিলেন। তাহার কোন অহুসন্ধান পর্যন্ত হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি। তথাপি, অভিযোগ উচ্চারিত হওয়া ভাল। ব্যবস্থাপক সভায় যাইব না, এবং সেখানে গিয়া কিছু করিব না, ব্যবস্থাপক সভার বাহিরেও কিছু করিব না—অথচ দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিব। এরূপ মনের ভাব অস্তিত্ব: কংগ্রেসওয়ালাদের হওয়া উচিত নয়। অবস্থাটা কিন্তু এখনও এরূপই আছে। স্বরাজ্য-দল ব্যবস্থাপক সভায় গেলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক পক্ষাঘাত-গ্রস্ততাটির কিঞ্চিৎ উপশমও যদি হয়, তাহা খুবই বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে সঙ্গে এই ফলও যদি ফলে যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলি জো-হুমু ও ডাভা-উপাভ্রজকদের একচেটিয়া লীলাক্ষেত্র হইয়া না-থাকে, তাহাও কম লাভ হইবে না।

ব্যবস্থাপক সভায় একাধিক বার ভোটের আধিক্যে জাতীয় দাবী ('national demands') গৃহীত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট সে দাবী শুনিয়া স্বরাজ্য মঞ্জুর করেন নাই। বস্তুত: শুধু দাবী দ্বারা স্বরাজ্য পাওয়া যাইবে না। যখন আমাদের

স্বরাজ্য লাভে সম্মতি না দিলে চলিবে না, তখন ব্রিটিশ জাতি সম্মতি দিবে, তাহার আগে নয়।

এই জন্ত, কি ব্যবস্থাপক সভায়, কি ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে একরূপ কাজ করিতে হইবে যাহাতে ব্রিটিশ গবর্নেন্ট ও ব্রিটিশ জাতির উপর অপ্রতিরোধ্যীয় চাপ পড়ে। দেশকালপাত্র বুঝিয়া প্রত্যেক জাতিকে এই প্রকার স্বরাজ্য-সংগ্রাম চালাইতে হয়।

ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক থাকিতে হইলে তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা প্রদর্শন ও নির্দেশ করিবার জন্য ভারতীয়দিগকে এখনও অনেক বক্তৃতা, আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিতে হইবে, অনেক প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও পুস্তক লিখিতে হইবে। যাহা কিছু বলা বা লেখা হইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গত, গ্রাম্যসঙ্গত, সভ্যসঙ্গত, মানবিকতাসঙ্গত হওয়া আবশ্যিক। এই প্রকার উক্তির ও লেখার একটা প্রভাব অন্যান্য জাতির আদর্শসূচীরা মানুষদের মত আদর্শসূচীরা ইংরেজরাও অনুভব করিবে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কম। সমগ্র ইংরেজ জাতি—বা অন্য কোন জাতি—যদি কখন আদর্শসূচী হয়, তাহা দূর ভবিষ্যতের কথা। আমরা তত দিন অপেক্ষা করিতে পারি না, অপেক্ষা করা উচিত নয়। এই জন্য অন্যবিধ চাপ প্রয়োগ আবশ্যিক। এই চাপ ভারতীয় ঘটনা, ভারতের বাহিরের ঘটনা, বা উভয়বিধ ঘটনার দ্বারা প্রযুক্ত হইতে পারে।

সম্ভবপর যত রকম চাপ আছে, তাহার মধ্যে যাহা দৈহিক ও আত্মিক বলপ্রয়োগসাপেক্ষ, তাহা ভারতীয়দিগকে কাণ্ডের ও অভিশ্রাবের বাহিরে রাখিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর মত যাহারা অহিংসাকে পরম ধর্ম মনে করেন, তাঁহারা যে-যে কারণে দৈহিক ও আত্মিক বল পরিহারের পক্ষে, অন্য অনেকে সেই সেই কারণে বিশ্বাসবান না হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও প্রধান নেতৃস্থানীয়েরা মনে করেন ও বলিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষের স্বরাজ্য-সংগ্রাম দৈহিক ও আত্মিক বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে অথচ সমষ্টিগত ভাবে চালাইতে হইবে। আমরা এই মত ঠিক মনে করি।

যে-সব কংগ্রেসওয়ালারা কোকিলে ঢুকিবেন, তাঁহারা কি করিবেন না-করিবেন, সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু একথা নিশ্চয়, যে, তাঁহারা যদি

যজ্ঞি বা তজ্রপ কোন চাকরী গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহা গর্হিত হইবে।

কৌশল প্রবেশের বিরুদ্ধেও ভাবিবার কথা আছে। ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা, প্রশ্ন, প্রস্তাব-পেশ ইত্যাদি করিলেই দেশের প্রতি সব কর্তব্য করা হইল, অনেকের পক্ষে একরূপ মনে করিয়া মনকে প্রবোধ দিবার খুব সম্ভাবনা আছে। সমস্ত বা অধিকাংশ কংগ্রেসওয়ালারা যদি এই ভ্রমের বশবর্তী হন, তাহা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে।

এখন ভারতবর্ষের কন্সটিটিউশন দেখণ আছে, তাহাতে ভারতীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দল প্রবল হইলে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর আইন প্রণয়নে বাধা দিতে পারেন এবং দেরূপ বাধা জন্মিলে লার্ডসাহেবদের হুম্যাসস্থায়ী অর্ডিন্যান্স জারী করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু যেত পথে ভারতের মূল শাসনবিধির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ভবিষ্যৎ কন্সটিটিউশন সেইরূপ হইলে ব্যবস্থাপক সভায় কোন আইন প্রণয়নে বাধা জন্মিলেও গবর্নেন্টকে অল্পকালস্থায়ী অর্ডিন্যান্সের আশ্রয় লইতে হইবে না, বড়লাট ও প্রাদেশিক লার্ডরা ইচ্ছা করিলেই গবর্নর-জেনারালের আইন ও গবর্নরের আইন নামক আইনসকল করিতে পারিবেন, সেগুলি ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে প্রণীত আইনের সমান বলবৎ ও স্থায়ী হইবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কন্সটিটিউশন একরূপ হইলেও একটা কাজ কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা করিতে পারিবেন—তাঁহারা লার্ডদিগকে নিজের নিজের আইন বানাইতে বাধা করিয়া ইহাই কাণ্ডাভ: ঘোষণা করিতে বাধা করিতে পারিবেন, যে, তাঁহারা লোকমতের বিরুদ্ধে দেশশাসন করিতেছেন।

কিন্তু কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা ভবিষ্যৎ কন্সটিটিউশন অনুসারে ইহাও করিতে পারিবেন কি না, সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। সমগ্রভারতীয় ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় রাজাদের মনোনীত সদস্যদিগকে এবং অমুগ্ধহীত মুসলমান, “অবনত” হিন্দু ও ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় প্রভৃতিকে যত আসন দিবার প্রস্তাব ইহা আছে, তাহাতে স্বাধীনচেতা নির্দোষিত সদস্যদের পক্ষে নিজেদের দলে ভোট দিবার জন্ত অধিক সদস্য পাওয়া অসম্ভব, অন্ততঃ দুঃসাধ্য, হইবে। হুডরাং গবর্নেন্ট ইচ্ছা করিলে নিজের আবশ্যক-

মত আইন ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা করাইয়া লইতে পারিবেন। তবে, কংগ্রেসওয়ালারা সদন্ত অনেক থাকিলে তাঁহারা খুব তর্কবিতর্ক করিতে এবং সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিবেন বটে। পূর্বেই বলিয়াছি, গবন্মেণ্ট ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা কোন আইন করাইয়া লইতে অসমর্থ হইলে বড়লাট ও অত্র লার্ডের নিজেদের ইচ্ছামত স্থায়ী আইন জারী করিতে পারিবেন।

অতএব, পুনর্ব্বার বলিতেছি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কিছু কাজ করিয়া পূর্ণ বারাক্ষিক বার আনা বা তার চেয়েও কম আংশিক স্বরাজ্য লাভের আশা বৃদ্ধি। এই সকল সভা দ্বারা ছোটখাট দেশহিতকর কাজ—সামাজিক, কৃষিশিক্ষণসম্বন্ধীয়, শিক্ষাসম্বন্ধীয় কিছু কিছু ব্যবস্থা—করান সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে বা বিশেষ ভাবে জাতীয়শক্তিবর্দ্ধক ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠাপক কিছু কাজ কোন সদন্ত করিতে গেলেই তাহাতে সরকার-পক্ষ হইতে তিনি বাধা পাইবেন।

ব্যবস্থাপক সভার প্রবেশ না করিয়া কংগ্রেসওয়ালারা অসহযোগ নীতি যত প্রকারে প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহার দ্বারাও যে স্বরাজ্য লক্ষ্য না হইবার সম্ভাবনা কি কি কারণে আছে, আমরা তাহা ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে ‘মজার্ন রিভিউ’ মাসিক পত্রের ৪৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম। আমাদের এই মত ঐহারা জানিতে চান, তাঁহারা এই মাসের ‘মজার্ন রিভিউ’ দেখিতে পারেন। এই মত ঐতিহাসিক মেজর বামন দাস বহু তাঁহার “ইণ্ডিয়া আন্ডার দি ব্রিটিশ ক্রাউন” পুস্তকের ৫১৫-৫১৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পুস্তকের ৫১৫-৫১৬ পৃষ্ঠায় লালার লালপণ্ড রায়ের তর্কবাক্য কোন কোন মতও উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে-সব কারণে আমরা ১৯২০ সালে বলিয়াছিলাম অসহযোগের পথে স্বরাজ্য লক্ষ্য না হইবার সম্ভাবনা, সেই সব কারণ এখনও বিদ্যমান আছে এবং সেগুলি এখন আগেকার চেয়ে প্রবলতর বাধা।

পুনরুজ্জীবিত স্বরাজ্য-দল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ “সাধারণ” আসনগুলি দখল করিতে পারিলে সম্ভবতঃ এই কাজটি হইবে, যে, কংগ্রেস যে দেশের বৃহত্তম প্রতিনিধিত্ব, তাহার স্বস্ব প্রমাণ ইংরেজ জাতিও পাইবে।

পাঠকেরা বলিতে পারেন, কিসে কি হইবে না আপনি তাহাই বলিতেছেন, স্বরাজ্য কি প্রকারে লক্ষ্য হইবে, তাহা ত বলিলেন না? তাহার উত্তর, আমরা উহা বলিতে অসমর্থ।

জাপানের ও ভারতবর্ষের বজেট

আগামী বৎসরে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের এবং এক একটি প্রদেশের সরকারী রাজস্ব ও ব্যয় কত হইবে, তাহার একটা আনুমানিক হিসাব প্রতিবৎসর বসন্ত কালে ভারতীয় ও প্রাদেশিক রাজস্বসচিবেরা ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে পেশ করেন। সদন্তেরা তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক করেন, কাউন্সিলের প্রস্তাব করেন, কোন কোন বিভাগের বরাদ্দ কমাইয়া অত্র কোন কোন বিভাগের বরাদ্দ বাড়াইবার চেষ্টা করেন। এরূপ তর্কবিতর্কের প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে। কিন্তু এই উপকারিতা সীমাবদ্ধ। প্রকৃত কথা এই যে, সমগ্র ভারতের ও প্রদেশ-গুলির রাজস্ব অনেক বেশী না-বাড়িলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভাগে যথেষ্ট ব্যয় করা যাইতে পারে না; কিন্তু অত্র দিকে ইহাও সত্য যে, এই সব বিভাগে যথেষ্ট ব্যয় না-করিলে, ব্যয় ক্রমশঃ বাড়াইয়া না-গেলে, দেশের লোকদের ধন বাড়িতে পারে না ও সরকারী রাজস্বও বাড়িতে পারে না। দেশ স্বশাসক না হইলে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগের বরাদ্দ ক্রমশঃ আশানুরূপ অধিক হইবে না, দেশ স্বশাসক না-হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি দ্বারা শিক্ষাদি বিষয়ে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধিও সম্ভাব্য হইবে না। অতএব, ঘে-দিক দিয়াই বিধগতি বিবেচনা করা যাক, দেশ স্বশাসক হওয়া সকলের চেয়ে অধিক আবশ্যক রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের চেয়ে ছোট এবং অল্প লোকের বাসভূমি প্রত্যেক সভ্য দেশের বজেট স্বশাসক দেশসমূহের ধনশালিতার সাক্ষ্য দেয়। ইউরোপ আমেরিকার কথা ছাড়িয়া দিয়া এশিয়ারই একটি দেশ জাপানের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক।

খাস জাপানের আয়তন ১,৪৭,৫৯২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৬,৪৪,৫০,০০৫; জাপান সাম্রাজ্যের আয়তন ২,৬০,৬৪৪ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ২,০৩,২৬,০৪০। ব্রিটিশ ভারতের আয়তন ১৩,১৮,৩৪৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২৭,১৫,২৬,০৩০।

জাপান ভারতবর্ষের একটা প্রদেশের সমান পার্বত্য ভূমিকম্পবহুল দেশ। ইহার ঘটনাশ মাত্র চাষের যোগ্য। জাপান-সাম্রাজ্যও ভারতের চেয়ে ছোট।

গত ২-শে ফেব্রুয়ারী জাপানী পালেমেন্টে জাপানের আগামী বৎসরের বজেট মঞ্জুর হইয়াছে। উহার পরিমাণ দুই শত বার কোটি ইয়েন। অল্প দেশের মুদ্রার তুলনায় সব দেশেরই মুদ্রার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। জাপানী ইয়েনেরও আপেক্ষিক মূল্য বাড়ি কমে। সাধারণতঃ উহা দেড় টাকার সমান ধরা হয়। তাহা হইলে আগামী বৎসর জাপানের রাজস্ব ও ব্যয় তিন শত আঠার কোটি টাকা হইবে ধরা হইয়াছে। জাপানী বজেট কেবল খাস জাপানের, না সমুদয় জাপান-সাম্রাজ্যের, তাহা ঠিক জানি না। দুই রকম অহুমানই করা যাক। উহা যদি জাপান-সাম্রাজ্যের হয়, তাহা হইলে, ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা জাপান-সাম্রাজ্যের তিনগুণ বলিয়া, ভারতবর্ষ জাপানের মত ধনী হইলে ব্রিটিশ-ভারতের রাজস্ব জাপানের তিনগুণ অর্থাৎ নয় শত চুয়াড় কোটি টাকা হওয়া উচিত। কিন্তু যদি উহা খাস জাপানের হয়, তাহা হইলে, ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যা খাস জাপানের চারিগুণেরও বেশী বলিয়া, ভারতীয়েরা জাপানীদের সমান ধনী হইলে ব্রিটিশ ভারতের বজেট হওয়া উচিত বার শত বাহাত্তর কোটি টাকার। এখন দেখা যাক, ভারতবর্ষের বজেটে ধৃত রাজস্ব কিরূপ হইয়া থাকে। ব্রিটিশ-ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বজেট আলাদা আলাদা ধরা হয়, অর্থাৎ ভারত-গবর্নমেন্টের বজেট এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের বজেট আলাদা ধরা হয়। জাপানে তাহা ধরা হয় না, সমস্ত রাষ্ট্রটির একটি বজেট হয়। তাহা হইলে জাপানের সহিত তুলনার জন্ত, ভারত-গবর্নমেন্টের ও সমুদয় প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের বজেটের সমষ্টি লইতে হইবে। বর্তমান বা আগামী বৎসরের এই সমষ্টি আমাদের সম্মুখে নাই, কোন প্রাথমিক বহিষ্ঠে পাওয়া যায় না। ১৯৩৩ সালের টেটসুমান ইয়ারবুকে ১৯৩১-৩২ সালের আছে। তাহা ২০৬,৭২,৫২,০০০ টাকার। জাপানকে মাপকাঠি ধরিলে ইহা নিতান্ত কম। জাপানী বজেটে যদি সে দেশের মিউনিসিপালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির আয়ও ধরা হইয়া থাকে—খুব সন্দেহ হয় নাই, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বজেটেও

তাহা ধরা উচিত। তাহা ধরিলে ভারতীয় বজেট হয় মোট ২৫৭,৮৭,০১,৪৫২ টাকার। ইহাও জাপানী মাপকাঠি অনুসারে অত্যন্ত কম। এরূপ তর্ক উঠিতে পারে, যে, ইয়েনের দর ১১০ টাকা ধরা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক এখন উহার দাম এত নয়। তাহা মানিয়া লইয়া যদি ইয়েনের দর বার আনা ধরা হয়, তাহা হইলেও, জাপানী বজেট খাস জাপানের হইলে সেই মাপকাঠি অনুসারে ব্রিটিশ-ভারতের বজেট হওয়া উচিত ছয় শত ত্রিশ কোটি টাকার; আর উহা জাপান-সাম্রাজ্যের হইলে সেই মাপকাঠি অনুসারে ব্রিটিশ-ভারতের বজেট হওয়া উচিত চারি শত সাতাত্তর কোটি টাকার। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতের রাজস্ব এই উভয় অর্থ অপেক্ষাই অত্যন্ত কম।

ভারতবর্ষের তুলনায় জাপান ধনী এই জন্ত যে, জাপান “জাতিগঠনমূলক” শিক্ষাশিল্পবাণিজ্যাদি বিভাগে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক টাকা খরচ করে ও করিয়া আসিতেছে, এবং জাপান তাহা করিতে পারে, যেহেতু জাপান ধনী। এক দিক দিয়া দেখিলে যাহা কারণ, অল্প দিক দিয়া দেখিলে তাহা ফল। আরও একটা কারণ আছে। জাপানের সরকারী কর্মচারী দিগকে নবাবী চালে থাকিবার বা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিবার মত বেতন দেওয়া হয় না। প্রভূত শক্তিশালী জাপান-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর বেতন এদেশের প্রথম শ্রেণীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বেতনের চেয়ে অনেক কম। এই জন্ত দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত জাপানী গবর্নমেন্ট যথেষ্ট খরচ করিতে পারে।

সকলের মূলে এই কথাটি রহিয়াছে, যে, জাপানের গবর্নমেন্ট নিজের দেশের জাতীয় গবর্নমেন্ট উহাকে কেবল জাপানের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে হয়, অল্প কোন দেশের স্বার্থ ও প্রভূত রক্ষাকে মুখ্য লক্ষ্য করিতে হয় না। তাই, ভারতবর্ষ বজেটের আলোচনার প্রয়োজন থাকিলেও, ভারতীয়দের প্রধান চেষ্টা হওয়া উচিত ভারতবর্ষ জাতীয় গবর্নমেন্ট স্থাপন করা। এই চেষ্টা প্রত্যেক প্রান্তবহুল ভারতীয়ের এবং প্রত্যেক ভারতীয় লোকসমষ্টির বা দলের করা একটি প্রধান কর্তব্য।

স্বরাজ্যলভার্থ-আইনলঙ্ঘন-প্রচেষ্টা স্থগিত

রাখিবার কারণ বিবৃতি

মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্যলভার্থ নিরপত্তাবোধে আইন লঙ্ঘনের বা তাহা প্রতিরোধের প্রচেষ্টাকে স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন। বিশেষ কোন অভিযোগের প্রতিকারার্থ নিরপত্তাবোধ প্রতিরোধ করিতে তিনি নিষেধ করেন নাই। এইরূপ পরামর্শ দিবার কারণ তিনি যে মতবিবৃতি পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৈনিক কাগজসকলে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু দৈনিক কাগজ অল্প লোকেই বাঁধাইয়া রাখেন, মাসিক কাগজ তাহা অপেক্ষা অধিক লোক রক্ষা করেন। মহাত্মাজীর মতবিবৃতিটি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া উহার মর্ম গভীর ভাবে অনুভব করা আবশ্যক। এই জন্ত আমরা উহা প্রবাসীতেও আদ্যোপান্ত ছাপিতেছি। উহার বাংলা অনুবাদে উহার অন্তর্নিহিত সভ্য সম্পূর্ণ পাওয়া যাইবে না বলিয়া মূল ইংরেজী বিবৃতিটি আগে ছাপিতেছি।

This statement owes its inspiration to a personal chat with the inmates and associates of the Satyagraha Ashram who had just come out of prison and whom at Rajendra Babu's instance I had sent to Bihar. More especially is it due to revealing information I got in the course of a conversation about a valued companion of long standing who was reluctant to perform the full prison task and preferred his private studies to the allotted task. This was undoubtedly contrary to the rules of Satyagraha. More than the imperfection of the friend, whom I love more than ever, it brought home to me my own imperfection. The friend said he had thought that I was aware of his weakness. I was blind. Blindness in a leader is unpardonable. I saw at once that I must for the time being remain the representative of civil resistance in action. During the informal conference week at Poona in July last, I had stated that while many individual civil resisters would be welcome, even one was sufficient to keep alive the message of Satyagraha. Now after much searching of the heart, I have arrived at the conclusion that in the present circumstances only one, and that myself and no other, should for the time being bear the responsibility of civil resistance if it is to succeed as a means of achieving Purna Swaraj.

ADULTERATION

I feel that the masses have not received the full message of Satyagraha owing to its adulteration in the process of transmission. It has become clear to me that spiritual instruments suffer in their potency when their use is taught through non-spiritual media. Spiritual messages are self-propagating. The reaction of the masses throughout the Harijan tour has been the latest forcible illustration of what I mean. The splendid response of the masses has been spontaneous. The workers themselves were amazed at the attendance and the fervour of vast masses whom they had never reached. Satyagraha is a purely spiritual weapon. It may be used for what may appear to be mundane

ends and through men and women who do not understand its spiritual (nature ?), provided the director knows that the weapon is spiritual.

EXPERT IN THE MAKING

Everyone cannot use surgical instruments. Many may use them if there is an expert behind them directing their use. I claim to be a Satyagraha expert in the making. I have need to be far more careful than the expert surgeon who is complete master of his science. I am still a humble searcher. The very nature of this science of Satyagraha precludes the student from seeing more than the step immediately in front of him.

SUSPEND CIVIL RESISTANCE

The introspection promoted by the conversation with the Ashram inmates has led me to the conclusion that I must advise all Congressmen to suspend civil resistance for Swaraj as distinguished from a specific grievance. They should leave it to me alone. It should be resumed by others in my lifetime only under my direction, unless one arises claiming to know the science better than I do and inspires confidence. I give this opinion as the author and instigator of Satyagraha. Henceforth, therefore, all who have been impelled to civil resistance for Swaraj under my advice, directly given or indirectly inferred, will please desist from civil resistance. I am quite convinced that this is the best course in the interest of India's fight for freedom.

I am in deadly earnest about this greatest of weapons at the disposal of mankind. It is claimed for Satyagraha that it is a complete substitute for violence or war. It is designed, therefore, to reach the hearts both of the so-called "terrorists" and the rulers who seek to root out the "terrorists" by emasculating the whole nation. But the indifferent civil resistance of many, grand as it has been in its results, has not touched the hearts either of the "terrorists" or the rulers. Unadulterated Satyagraha must touch the hearts of both. To test the truth of the proposition, Satyagraha needs to be confined to one qualified person at a time.

The trial has never been made. It must be made now. Let me caution the reader against mistaking Satyagraha for mere civil resistance. It covers much more than civil resistance. It means relentless search for truth and the power that such a search gives to the searcher. The search can only be pursued by strictly non-violent means. What are the civil resisters thus freed to do if they are to be ready for the call whenever it comes? They must learn the art and the beauty of self-denial and voluntary poverty. They must engage themselves in nation-building activities, the spread of *khaddar* through personal hand-spinning and handweaving, the spread of communal unity of hearts by irreproachable personal conduct towards one another in every walk of life, the banishing of untouchability in every shape or form in one's own person, the spread of total abstinence from intoxicating drinks and drugs by personal contact with individual addicts and generally by cultivating personal purity. These are services which provide maintenance on the poor man's scale. Those for whom the poor man's scale is not feasible should find a place in small unorganized industries of national importance which give a better wage. Let it be understood that civil resistance is for those who know and perform the duty of voluntary obedience to law and authority.

It is hardly necessary to say that in issuing this statement I am in no way usurping the function of the Congress. Mine is mere advice to those who look to me for guidance in matters of Salyagraha.

বিবৃতিটির বাংলা ভাষণও নীচে দিতেছি।—

সত্যগ্রহআশ্রমবাসী যে-সকল কর্মী এবং আশ্রমের সহযোগী সম্প্রতি কারামুক্ত হইয়াছেন এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুরোধে আমি ঐশ্বরিকগকে বিহারে প্রেরণ করিয়াছি, তাঁহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা হইতে আমি এই বিবৃতি প্রদানের প্রেরণা লাভ করি। বহুদিনের এক সমাদৃত সঙ্গী কারাগারের সমস্ত নিষিদ্ধ কর্তব্য করিতে অসম্মত হইয়া পড়াশুনা করাই পছন্দ করিয়াছিলেন। ইহা নিশ্চয়ই সত্যগ্রহের নীতি-বিরুদ্ধ। তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্তা বাহা জানিতে পারি, তাহাই আরও বিবেচ্য ভাবে এই বিবৃতির কারণ। এই সম্বন্ধে অবগত হইয়া আমি যে কেবল আমার বন্ধুর অপসংগততা জানিতে পারিলাম, তাহা নহে—তাঁহার প্রতি আমার ভালবাসা পূর্ণাংকো বর্ধিত হইল, এই সম্বন্ধে আমি আমার অপর্যাপ্ত বুদ্ধিতে পারিলাম। বন্ধু বলিয়াছেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার দুর্দশলা অবগত ছিলাম। আমি অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছিলাম, —কিন্তু একজন নেতার পক্ষে অজ্ঞতা ক্রমাভীত অপরাধ। আমি তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিতে পারিলাম, একাকী আমারই আচরণগত নিরপত্তার প্রতিরোধের প্রতিকল্পপ্রদর্শক থাকি উচিত।

গত জুলাই মাসে আমি ঘরোয়া পুণ্য বৈঠকে বলিয়াছিলাম, একা একা নিরপত্তাপ্রতিরোধপ্রতীকী সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই বাঞ্ছনীয় হইবে, কিন্তু সত্যগ্রহের বাণী বা মন্ত্র চির-সমীকৃত রাখিবার পক্ষে একজন সত্যগ্রহীই যথেষ্ট। আত্মরক্ষার পরীক্ষার পর এখন আমি এই নিশ্চিন্তে উপনীত হইয়াছি, যে, পূর্ণ স্বাধীন লাভের উপায় স্বরূপ নিরপত্তার প্রতিরোধ যদি সার্বক করিতে হয়, তাহা হইলে বর্ধমান অবস্থায় কেবল এক ব্যক্তির—একমাত্র আমারই, আগভোগ: নিরপত্তার প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করা কর্তব্য।

আমি বুদ্ধিতে পারিলাম, দেশের জনগণ সত্যগ্রহের পরিপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিতে পায় নাই: কারণ এই বাণী প্রচার করা ইহাতে স্বেচ্ছাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। আমি স্পষ্টই বুদ্ধিতে পারিলাম, যদি আধ্যাত্মিকতাবিহীন স্বাধীনতার মারফতে আধ্যাত্মিক উপায়সমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার কার্যকারিতার লাঘব হয়। আধ্যাত্মিক বাণী আত্মপ্রচারশীল। আমার হরিনাম-ত্রায়ণ কালে সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই আমার বক্তব্য বিধান করিবার পক্ষে নুতনতম দৃষ্টান্ত। জনসাধারণ যত:প্রবৃত্ত হইয়া আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। তাহারা যে বিশুদ্ধ সংখ্যায় উপস্থিত হইয়া উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া কর্মীরাও বিস্ময়কিত হইয়াছেন—ইতিপূর্বে তাহারা এই সব লোকের কাছে পৌঁছেন নাই।

সত্যগ্রহ নিরুদ্ধ আধ্যাত্মিক অগ্রবিশেষ: ঐহিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহার আধ্যাত্মিকতা সর্বত্র অঙ্গ নবনবীরণের সাহায্যেও এই অন্তরে প্ররোগ সম্ভবপর হইতে পারে, যদি ঐ অন্তরে প্ররোগ-পরিচালকের এই জ্ঞান থাকে যে, অন্তর্নি আধ্যাত্মিক। সব লোকেরই অন্তঃপ্রাচীরের যত্নপাতি ব্যবহার করিতে পারে এমন নহে। তবে একজন বিশেষজ্ঞ যদি শিষ্টনে পাশ্চাত্য নির্দেশ দিতে থাকেন, তবে হস্ত অর্ন্তকই ঐগুলি ব্যবহার করিতে পারে। আমি সত্যগ্রহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হই নাই, হইয়া উঠিতেছি বলিয়াই দাবী করি: সত্যগ্রহ অপ্রতিকংকার সম্পূর্ণ পারদর্শী সার্বজন অপেক্ষা আমার অধিকতর সতর্কতার সহিত চলা দরকার, কেননা, আমি এখনও সত্যগ্রহ সম্বন্ধে একজন সামান্য তথ্যসূচী। সত্যগ্রহ-বিজ্ঞানের

প্রকৃতিই হইল এই যে, ইহা ক্রিয়াধীক টিক তাহার সম্ভবত্বই ধাপটি ছাড়া আর একটুও বেশী দেখিতে দেয় না।

আশ্রমবাসীদের সহিত কথাবার্তা হইতে উদ্ধৃত আত্মপরীক্ষণ আমার এই সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছে যে, নিবেশ কোন অভিযোগের প্রতিকার্য্য নহে, কিন্তু কেবল স্বাধীনতাভাষণ প্রায় নিরপত্তার প্রতিরোধ প্রচেষ্টা স্বগিত রাখিবার জন্য সমস্ত কংগ্রেস কমিটিগণকেই আমার পরামর্শ দেওয়া একান্ত কর্তব্য। স্বাধীন লাভের জন্য নিরপত্তার প্রতিরোধ প্রচেষ্টা চালাইবার ভার কংগ্রেস-কমিটিগণ কেবলমাত্র আমার উপরই স্তব্ধ রাখুন। নিরপত্তার প্রতিরোধের নীতি সম্পর্কে আমি অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অপর কোন ব্যক্তির অভ্যুত্থান না-হওয়া পর্যন্ত আমার জীবদ্দশায় কেবলমাত্র আমার নির্দেশে পরিচালিত হইয়াই অপর সকলে ঐ আন্দোলনে পুনরায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন। সত্যগ্রহ আন্দোলনের প্রভা এবং প্রসবক হিসাবেই আমি এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছি। কাজেই যাহারা আমার প্রত্যেক বা পরোক্ষ নির্দেশে চালিত হইয়া স্বাধীন লাভার্থ নিরপত্তার প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, তাহারা অমুদ্রহপূর্বক এখন হইতে উহা ত্যাগ করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সিদ্ধির দিক হইতে ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

মন্ত্রের আশ্রয় যত অল্প আছে, তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় এই সত্যগ্রহ সম্বন্ধে আমি সর্বান্তঃকরনে আগ্রহাশ্রিত। [অর্থাৎ ইহা আমার বা অন্য কাহারও খেলার জমিই নহে।] সত্যগ্রহকে বুদ্ধ-বিগ্রহ বা বল-প্ররোগের পরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য পূর্ণকল্পগ্রহ অল্প বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে। তথাকথিত সন্তানদ্বাদারের এবং সমগ্র জাতিতে পৌরস্বহীন করিয়া ফেলিয়া সন্তানদ্বাদারের উচ্ছেদকারী সরকারের হস্তের জয় করা সত্যগ্রহের উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেকের আত্মরিকতাহীন নিরপত্তার প্রতিরোধ—উহার বলা জালাল হইয়া থাকিলেও, সন্তানদ্বাদার বা শাসকসম্প্রদায় কাহারও হস্তের স্পর্শ করিতে পারে নাই। বীতি সত্যগ্রহ নিশ্চয়ই উত্তরের হস্তকেই স্পর্শ করিবে। এই উত্তির সন্তাত্য পরীক্ষা করিতে হইলে, এক সময়ে কেবল একজন করিয়া যোগ্য ব্যক্তির সত্যগ্রহ করা উচিত। এভাবেও সেরূপ পরীক্ষা করা হয় নাই—একদমে তাহাই করিতে হইবে।

পাঠককে আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, কেবলমাত্র নিরপত্তার প্রতিরোধকে তিনি যেন সত্যগ্রহ বলিয়া ধরেন না। ইহা আরও ব্যাপক। সত্যগ্রহের অর্থ নিরুদ্ধ সত্যানুসন্ধান এবং এইরূপ সত্যানুসন্ধানমাত্র শক্তির সম্ভান। কেবলমাত্র নিরপত্তার উপায়েই এই সম্ভান সম্ভবপর।

যে-সকল নিরপত্তাপ্রতিরোধকারীগণকে বর্তমানে স্বাধীনতা দেওয়া হইল, তাঁহাদিগকে যদি ভবিষ্যতের আহ্বানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কি করিতে হইবে? তাঁহারা আত্মস্বত্বকেন্দ্র এবং স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যপ্রভের বিঘা ও বাধা হস্তগত করিবেন। তাহারা জাতিগঠনমূলক কাণ্ডে, যথা—বহুস্তর কাটা পুতার বহুস্তর ফেনা বন্ধনের প্রচার সম্প্রদায়ের, ব্যক্তিগত আচরণ দ্বারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তরের মিলন সম্বন্ধে আত্মনিয়োগ করিবেন; তাঁহারা নিজ আচরণের মধ্য দিয়া সর্বত্রভাবে অস্পৃশ্যতা বর্জন করিবেন, নিজ পবিত্রতা সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়া ও লোপাধারদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে মেলামেলা করিয়া পানদোষাদির সম্পূর্ণভাবে বর্জনের আন্দোলন চালাইবেন। এই সকল অনুসন্ধান কাজে পরীক্ষা লোকদের যত চালে জীবনযাত্রা। নির্বাহের ব্যবস্থা হইতে পারে। গরীবদের মত জীবনযাত্রা—প্রাণী বাহাদের পক্ষ

না হইবে বা বাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত না হইবে, তাঁহারা জাতীয়তার দিক হইতে স্বরূপের এরূপ প্রকাশের প্রতি অনুরোধ দিতে পারেন, বাহাতে মানুষ দলবদ্ধভাবে কারখানার ব্যাপৃত হয় না, এবং বাহাতে পরীক্ষানার জন্ত আবশ্যিক আয়ের চেয়ে বেশী মজুরী পোষায়। সকলেই মনে রাখিবেন যে, বাঁহারা আইন ও কর্তৃপক্ষের প্রতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বাধ্যতা স্বীকারের দ্বারা সম্বন্ধে অবহিত এবং উচ্চা পালনও করিয়া থাকেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধের অধিকারী কেবলমাত্র তাঁহারা হই।

একথা বলার প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়, যে, এই বিবৃতি প্রকাশ করিয়া আমি কোন ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের ক্ষমতা আক্রমণ করিতেছি না। বাঁহারা সত্যগ্রহ সম্পর্কে আমার নির্দল চাহেন, আমি কেবল মাত্র তাঁহা-দিগকেই এতদ্বারা পরামর্শ দান করিলাম।

মহাত্মা গান্ধী বাঁহাকে পরামর্শ বলিয়াছেন, অধিকাংশ কংগ্রেসওয়ালারা তাঁহা আদেশ বলিয়াই পালন করিবেন।

আমরা কখনও সত্যগ্রহ করি নাই, নিরুপদ্রব ভাবে আইনলঙ্ঘন বা প্রতিরোধ করি নাই; (অবশ্য সোপানব আইন লঙ্ঘন ত করিই নাই!)। বাঁহারা নিরুপদ্রব অসহযোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া অসহযোগ প্রচেষ্টাটিকে ভিতরের দিক হইতে জানিবার সুবিধার সুযোগ আমাদের হয় নাই। হয়ত সেই কারণে এবং আধ্যাত্মিকতার পথে আমরা অনগ্রসর বলিয়া মহাত্মাজীর সব কথা বুঝিতে পারিয়াছি কি-না সন্দেহ হইতেছে। বাহির হইতে দেখিয়া শুনিয়া আমাদের যে ধারণা হইয়াছে, তাহাতে মহাত্মাজী স্বরাজ্যলাভার্থ-নিরুপদ্রব-আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা যে স্থগিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহা আমাদের ঠিকই মনে হইয়াছে। বাঁহা মধ্য আর উৎসাহ আগ্রহ প্রাণ ছিল না। তাঁহার কেবল ঠাট্টা বজায় রাখিলে তাঁহাকে কেবল লোকের চক্ষে অবজ্ঞেয় ও হাস্যস্পদই করা হইত। তার চেয়ে, যিনি নিজের মন ব্যয়েন, যিনি নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়াছেন, যিনি অসহযোগ সত্যগ্রহ প্রভৃতির প্রবর্তক, একা সেই মহাত্মাই ব্রতী থাকুন, ইহাই ভাল।

তবে, গান্ধীজী বিশেষ করিয়া তাঁহার যে সমাদৃত পুণ্যতন বন্ধুর ফেলের আচরণ হইতে আলোচ্য শিক্ষাশ্রুতিতে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াছেন, তাঁহা তাঁহাব শিক্ষান্তের পক্ষে যথেষ্ট হেতু বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না। আমরা সত্যগ্রহের নিয়ম কি কি জানি না, কিন্তু গান্ধীজী যখন বলিতেছেন, যে, তাঁহার বন্ধুর আচরণে সত্যগ্রহের নিয়মভঙ্গ হইয়াছে, তখন তাঁহা ঠিকই ঠিক। কিন্তু এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে ত প্রমাণ হয় না যে, অনেক অল্প সত্যগ্রহীর মধ্যে অধিকাংশই সত্যগ্রহের অন্তরে প্রবেশ করে নাই, তাঁহার আধ্যাত্মিক

স্বরূপ বুঝে নাই, সকলেই বা অধিকাংশই সত্যগ্রহের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। হইতে পারে, যে, মহাত্মাজী সব কথা খুলিয়া বলেন নাই, অনেকেই হয়ত বাহিরে সত্যগ্রহী কিন্তু অন্তরে তাঁহার বিপরীত কিছু ছিলেন। কিন্তু আমরা মহাত্মাজী বাঁহা বলিয়াছেন, তাঁহারই আলোচনা করিতেছি। তাঁহার মনের মধ্যে কি আছে, তাঁহা জানি না; সুতরাং তাঁহার আলোচনাও অধিকারচর্চা হইবে। তিনি বাঁহা বলিয়াছেন, তাঁহা হইতে মনে হয়, তাঁহার উদ্ভিঙে অনেক প্রকৃত সত্যগ্রহীর উপর অবিচার ও তাঁহাদের অপমান করা হইয়াছে।

মহাত্মাজী যে-সব গঠনমূলক কার্যের কথা বলিয়াছেন, শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞান-বিস্তার, নিরক্ষরত-দূরীকরণ তাঁহার মধ্যে নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নহে। কারণ ঠিক এই জিনিষটিতে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ কোন কালেই দেখা যায় নাই। এই কারণে তিনি এক সময় বাঙালীদিগকে 'শিক্ষাপাগল' বলিয়াছিলেন। আমরাও লিখনপঠনক্ষম-ত্ব ও শিক্ষিত-ত্বকে অভিন্ন মনে করি না। কিন্তু লিখনপঠনক্ষমত্বকে ভিত্তি না করিলে আধুনিক কালে কোন জাতি যথেষ্ট উন্নত ও শক্তিমান হইতে পারে না, ইহাও আমাদের বিশ্বাস। বাঁহা ইউক, শিক্ষা সাধারণ ভাবে গান্ধীজীর "জাতিগঠনমূলক" কাজের তালিকার মধ্যে না থাকিলেও 'হরজনদের' উন্নতির জন্ত উহার প্রয়োজন গান্ধীজী স্বীকার করিয়াছেন, এবং শিক্ষাদানকে 'হরজন' সেবার একটি অঙ্গ করা হইয়াছে।

ইহাও হইতে পারে, যে মহাত্মাজী তাঁহার মতবিবৃতিটিতে 'জাতিগঠনমূলক' কার্যের পূর্বা তালিকা দিতে চান নাই; কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিয়াছেন।

অসহযোগ, সত্যগ্রহ ও সন্ত্রাসবাদ

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, খাঁটি সত্যগ্রহ এক দিকে সরকারী শাসকসম্প্রদায় ও অন্য দিকে বেসরকারী সন্ত্রাসবাদী উভয়েরই হৃদয় স্পর্শ করিবে। উক্ত দুই শ্রেণীর লোকদের কাহারও সঙ্গে অন্ন বা অধিক সাহচর্য আমাদের ঘটে নাই বলিয়া আমরা বলিতে পারি না তাঁহাদের হৃদয় কিসে লাড়া দিবে। কিন্তু সত্যগ্রহ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে সম্ভবতঃ সন্ত্রাসবাদের উন্নয়ন হইত না, কিংবা উহা উন্নয়নের পর লোপ পাইত, এরূপ কোন একটা অনুমান

বা তত্ব হস্ত সরকারী মনের কোণে উকি মারিয়া থাকিতে পারে। কারণ, দেখিতেছি, বছর ১৯৩২-৩৩ সালের সমাপ্রকাশিত শাসনবৃত্তান্তের প্রথম ভাগের একাদশ অঙ্কুচ্ছেদ এই বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে :—

"11. While the star of civil disobedience and the prestige of Congress were thus waning, numerous incidents illustrated the strength and the widespread nature of the terrorist movement."

ভাষ্যগত। যখন এই প্রকারে নিরুপদ্রব আইন-সম্মান প্রচেষ্টার গুণ-গ্রহ ও কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ক্ষয় পাইতেছিল, তখন মহৎসংখ্যক গটনা সন্ন্যাসকদিগের প্রচেষ্টার শক্তি ও ব্যাপকতা সপ্রমাণ করিতেছিল।

একের হ্রাস ও অন্যটির বৃদ্ধির মধ্যে কারণকাণ্ড সম্পর্ক আছে কি ?

সরকারী মতে তাহা থাক বা না-থাক, বেসরকারী বিস্তর লোকের মতে তাহা আছে।

রাজকুমারী কমলা রাজা শিন্দে

গোআলিরের মহারাজা শিন্দের ভগ্নী রাজকুমারী কমলা রাজা শিন্দের সহিত শিবাজীর বংশধর অকালেক টের



রাজকুমারী কমলা রাজা শিন্দে

রাজার বিবাহ হইবার পর এক মাসের মধ্যে রাজকুমারী আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সমস্ত গোআলিরের শোকে নিমগ্ন হইয়াছে। এই রাজকুমারীকে তাঁহার পিতামহাজ কেতাবী শিক্ষা ত দিয়াছিলেনই— তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, অধিকত

তিনি চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি ললিতকলাও শিখিয়াছিলেন। তিনি আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকলার অমুস্বাপিণী ছিলেন। ইতা ছাড়া মহারাষ্ট্রীয় রীতিতেও তিনি শিক্ষা পাইয়াছিলেন। অথারোহণে তিনি পারদর্শিনী ছিলেন এবং সৈন্তমলে ভর্তি হইয়া পুরুষ সৈনিকদের মত যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন।

স্তর আন্তত্বের মুখোপাখ্যায়ের ব্রজ মূর্তি

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও চৌরঙ্গীর মোড়ে স্তর আন্তত্বের মুখোপাখ্যায়ের ব্রজ মূর্তিটির প্রতিষ্ঠাকার্য্য সেদিন সম্পন্ন হইয়া



স্তর আন্তত্বের মুখোপাখ্যায়ের ব্রজ মূর্তি

গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। অঙ্কুর্ভনটির বর্ণনা করিতে গিয়া স্টেটসম্যান কাগজ লিখিয়াছে, মূর্তিটি ইটালীতে প্রস্তুত। যাহারা মনে করে ভাল কোন জিনিষ ভারতবর্ষের লোকেরা করিতে পারে না, স্টেটসম্যান চালায় সেই রকম লোকেরা। ঐ প্রকৃতির লোকেরাই রটাইয়াছিল, তাকব্বল ইটালীর লোকের

পরিকল্পিত। প্রকৃত কথা এই যে, মুক্তিটির আসল শক্ত কাজ, শিল্প-প্রতিভার কাজ বাহা, তাহা করিয়াছেন বাঙালী চিত্রকর ও মুর্জিনর্মাতা শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। তিনি এখন মাদ্রাজের সরকারী আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। ইহার পরিকল্পনাটি তাহার, হাচ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তিনি। এত বড় মুক্তির ঢালাই ভারতবর্ষে হয় না বলিয়া কেবল ঢালাইটি ইটালীতে হইয়াছে। ইউরোপেরও অনেক বড় বড় মুক্তিকার নিজেদের তৈরি ছাঁচের অল্পযায়ী মুক্তি ঢালাই করান ব্যবসায়ী কারিকরদের দ্বারা। কিন্তু তাহাতে কেহ বলে না, যে, ঐ ঢালাইকারীরাই মুক্তিকার।

কুমুদনাথ চৌধুরী

কুমুদনাথ চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের অল্পতম বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল শিকারী বলিয়া। তাহার লেখা শিকারবিষয়ক পুস্তক ও অনেক গ্রন্থ আছে। দুঃখের বিষয়, তিনি গত মাসে মধ্যপ্রদেশে বাঘ শিকার করিতে গিয়া বাঘের দ্বারাই নিহত হইয়াছেন।

জমির খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

আমরা ইহা বার-বার দেখাইয়াছি, যে, বাংলা দেশে সংগৃহীত রাজস্বের খুব বেশী অংশ ভারত-গবর্নেন্ট লণ্ডনায়, অল্প যে-কোন দুই প্রদেশ হইতে গৃহীত রাজস্বের সমষ্টি অপেক্ষা বেশী লণ্ডনায়, বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহের জন্য প্রধান প্রধান প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্নেন্টের চেয়ে কম টাকা বাংলা-গবর্নেন্টের হাতে থাকে; অথচ বঙ্গের লোকসংখ্যা অল্প যে-কোন প্রদেশের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী। বঙ্গের প্রতি এই অজিয়ারে ও বঙ্গের এই দুঃস্বপ্নের দুঃখিত হওয়া দূরে থাক, অন্ত্যস্ত প্রদেশের অনেক নেতা বলেন, ভূমির খাজনা প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্নেন্টের গ্রাণ্য, যে-যে প্রদেশে এই খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই তাহাদের গবর্নেন্ট ভূমির খাজনা বাবদে অনেক টাকা পায়, কিন্তু বাংলা দেশে খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় উহার গবর্নেন্ট এই বাবদে বেশী টাকা পায় না, এই কারণে বাংলা সরকারের ভাগে কম টাকা থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বঙ্গে যত জমি আছে তাহার ভুলনার জমির খাজনা কম। তাহা সত্য কি-না দেখা যাক।

বাংলার লোকসংখ্যা সর্বাধিক হইলেও বাংলার আয়তন বড় সব প্রদেশের চেয়ে কম। ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত সরকারী স্ট্যাটিষ্টিক্যাল স্যাবলুইট নামক বহিতে প্রদেশগুলির আয়তন ও সর্বাধুনিক যে খৎসরের ভূমির খাজনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা নীচে লিখিত হইল।

প্রদেশ	বর্গমাইলে আয়তন	জমির খাজনার টাকা
মাদ্রাজ	১৪২২৭৭	৪,৮৮,৬১,৯৬৪
বোম্বাই	১২৩৬৭৯	৪,৭৪,৪৭,১৩৯
বাংলা	৭৭৫২১	৩,০৮,৯৩,১০২
আগ্রা-অযোধ্য	১০৬২৪৮	৬,৪৭,৯৮,৯৩৩
গজাব	৯৯২০০	২,৬৯,৪২,৬৩১
বিহার-উড়িষ্যা	৮০০৫৪	১,৮০,০৩,৭০৮
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	৯৯২০	২,১৮,৫৯,২৯২

বঙ্গের আয়তন এই সব প্রদেশের মধ্যে কম, কিন্তু বাংলার প্রত্যেকের চেয়ে কম খাজনা দেয় না; বাদের চেয়ে কম দেয়, তাদের চেয়ে বঙ্গের বিস্তৃতিও খুব কম।

তবে একথা উঠিতে পারে বটে, যে, সব প্রদেশের সমস্ত ভূমি ত চাষের যোগ্য নয়, হয়ত বঙ্গে চাষের যোগ্য জমি বেশী। তাহা সত্য কিনা দেখা যাক। অবশুণ নিম্নত একরে দেওয়া হইয়াছে। এক একর তিন বিঘার কিছু বেশী।

প্রদেশ	বাণ্ডবিক বাপিত জমি। চলিত পতিত। তত্তির চাষযোগ্য পতিত।	৩৪	১০	১২
মাদ্রাজ	৩৪	১০	১২	
বোম্বাই	৩২	১০	৬	
বাংলা	২৩	৫	৫	
আগ্রা-অযোধ্য	৩৫	২	১০	
গজাব	২৬	৪	১৪	
বিহার-উড়িষ্যা	২৪	৬	৬	
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	২৫	৩	১৪	

যত জমি বাণ্ডবিক করিত ও বাপিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ বঙ্গে সব চেয়ে কম। যত জমি সাধারণতঃ চাষ করা, হয়, কিন্তু কোন কোন বৎসর হ্রত পতিত রাখা হয় এবং যত জমি চাষযোগ্য অথচ এপর্যন্ত বাহাতে চাষ হয় নাই, এই উভয় প্রকার জমির সমষ্টিতেও বাংলা দেশ সবলের নীচে।

কুতরাং বঙ্গে জমির খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকিলেই এখান হইতে গবর্নেন্ট বেশী খাজনা পাইতেন বা জায়গা পাইবার অধিকারী হইতেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ রামমোহন রায় লিখিয়া গিয়াছেন, এবং এ-বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা জানান, যে, ১৭৯৩ সালে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে খাজনা ধার্য হয় তার চেয়ে বেশী কখনও ধার্য হয় নাই, বরং ইহা অনেক স্থলে পূর্ববর্তী মুসলমান ও ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সর্বোচ্চ আদায়ের চেয়ে বেশী।

কথিত হইতে পারে, যে, বঙ্গের অনেক জমি খুব উর্বরা, কিন্তু তাহা ও অল্প অনেক প্রদেশের পক্ষেও সত্য। অল্প দিকে বঙ্গের দুটা অস্থি আচ্ছ, বাহা অল্প প্রদেশগুলির নাই। যথা—বাংলা দেশকে অল্পতম জমীর দ্বারা অধিকতম কৃষিজীবী লোকসিগকে পালন করিতে হয়, এবং অল্প বহু প্রদেশ কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সরকারী জলসেচনের পালের যে স্থবিধা পাইয়া থাকে, বঙ্গের তাহা নাই।

স্বর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের

অবসর গ্রহণ

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ স্বর লালগোপাল



স্বর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

মুখোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করিতেছেন। সেই উপলক্ষে তাঁহাকে গত মাসে এলাহাবাদে বিদায়-ভোজ দেওয়া হইয়াছে। ভোজ-সভায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অল্প অনেকে তাঁহার বিচারকাৰ্য্যদক্ষতা ও অল্প গুণাবলীর প্রশংসা করেন। তিনি সৌজন্যের জন্ত এবং স্থবিচারক বলিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিলে মনে হয় না, যে, তাঁহার বয়স ৬০। হইতে যাইতেছে। শুধু চেহারার নয়, তিনি কঠিনতাতেও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কঠিন লোকদের মত। হুতরাং তিনি জজিয়তী আরও কয়েক বৎসর বেশ করিতে পারিতেন। তাঁহার অবসর গ্রহণে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কতিপয় হইবে এবং তাঁহারও আয় কমিবে। কিন্তু তিনি অল্প প্রকারে দেশের হিত করিতে পারিবেন।

প্রবাসী বাঙালীরা তাঁহার নেতৃত্ব দ্বারা উপকৃত হইবার আশা রাখে। তিনি আগে হইতেই প্রবাসী-বঙ্গ-পাহিতা-সম্মেলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। এখন অবসর গ্রহণের পর ইহার কাজে আরও বেশী সময় দিতে পারিবেন। বঙ্গ ও বঙ্গের বাহিরে সর্বত্রই বাঙালীদের বিজ্ঞ স্থবিবেচক পরামর্শদাতা ও নেতার খুব আবশ্যক।

সংবাদপত্র পরিচালনে বাঙালী

এলাহাবাদের দৈনিক ইংরেজী কাগজখানি আজকাল এলাহাবাদে যে-দিন বিলি হয়, কলিকাতাতেও সেই দিন বিকালে সম্ভায উহার বিভরক দ্বারা বিলি হয়। থাঙ্গ কলিকাতার চারি লক্ষের উপর হিন্দীভাষী উর্দুভাষী লোক আছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ নিরক্ষর হইলেও কয়েক শত — সম্ভবতঃ হাজারখানেক—লোক ইংরেজী জানে, এবং তাহার। সবাই সচ্ছল অবস্থার লোক। তাহার। যে-যে প্রদেশের লোক তথাকার ধবর ও খবরের উপর মন্তব্য তাহার। কলিকাতার চেয়ে পশ্চিমের কাজে বেশী পাইবার আশা করে বলিয়া এলাহাবাদের কাগজখানার স্থবিধা হইয়াছে। পাতনার দৈনিকেরও এই স্থবিধা হইতে পারে।

বঙ্গের বাহিরে যে-সব আঙ্গণার বাঙালী বেশী আছে, তাহাদের দ্বারা দ্বায়ে বঙ্গের দৈনিকগুলি পৌছাইবার এইরূপ চেষ্টা মালিকরা করেন কিনা, জানি না।

কলিকাতার ইংরেজদের দৈনিক তিন খানা ছিল। এখন কম্বা এক খানায় ঠেকিয়াছে। ‘ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস’ অনেক বৎসর আগে উঠিয়া যায়। ‘ইংলিশম্যান’ কয়েক বৎসর হইল সাপ্তাহিকের আকার ধারণ করে। সম্প্রতি সাপ্তাহিক ইংলিশম্যানও ভারতের ভারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ‘বিদ্বেষ-স্তোত্র’ (hymn of hate) শেষবার গাহিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে। দেশী কাগজের প্রতিযোগিতার প্রবলতার ইহা একটি প্রমাণ। কিন্তু এক দিকে যদিও ইংরেজ সাংবাদিককে ও সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীকে হটিতে হইয়াছে, অন্য দিকে বঙ্গের বাহিরের সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী কলিকাতায় নিজেদের স্থান করিয়া লইতেছে। উদ্যোগিতার দ্বার সর্বত্র অব্যাহত থাকা ভাল। এলাহাবাদের কাগজখানার যেমন কলিকাতায় কটিতি হইতেছে, তেমনই স্বাধীন স্বত্বাধিকারীর দৈনিক ইংরেজী কাগজও কলিকাতা হইতে বাহির হইতেছে। বাঙালী স্বত্বাধিকারীর ইংরেজী দৈনিক বঙ্গের বাহিরে কোন আয়গায় নাই।

বাঙালী সাংবাদিকদের দৃষ্টি আর একটা বিষয়ে পড়িয়া থাকিবে। পাতনা হইতে ‘ইণ্ডিয়ান নেশন’ নামক একখানি দৈনিক একবার বাহির হইয়া বন্ধ হয়। উহা আবার বাহির হইতেছে। উহার সম্পাদক লণ্ডন হইয়াছে বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যা ডিভাইয়া মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সী হইতে। আগ্রা-অবোধা প্রদেশও নিকটতর ছিল। সেখান হইতেও লণ্ডন বা পাওয়া যায় নাই। এই সম্পাদকটির যোগ্যতা সন্দেহ কিছু বলিতেছি না—সে-বিষয়ে কিছু জানি না। বাঙালী সাংবাদিকদিগকে কেবল লক্ষ্য করিতে বলিতেছি, যে, আজকাল তাঁহাদিগকে লোকে চায় না বা পুঁছে না। তাহার অসুস্থিত অন্ততম কারণ, তাঁহারা পরম্পরকে পুঁছেন না; যেখানে কোন প্রতিযোগিতা নাই—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রই নাই, সে-স্থলেও বাঙালী সংবাদপত্রপরিচালকদের অ-সহযোগিতা ও ঈর্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়। কার্য উদ্ধারের জন্য অতিভয়, এমন কি খোশামোদকারী, কিন্তু অন্য সময়ে নিজস্বিত্বাধী, এরূপ লোকও আছে।

সুদূরতম কাগজও বৃহত্তম কাগজের বাস্তবিক সহযোগী। প্রত্যেক কাগজেই এমন কিছু থাকে, যাঁহা জাতব্য এবং যাঁহা অন্য কাগজে পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতার স্বাস্থ্য

বড় শহর মাত্রেরই স্বাস্থ্য ভাল রাখা অতিশয় কঠিন—বিশেষতঃ সেই রকম শহরের যেখানে স্থলপথে জলপথে আকাশপথে দেশবিদেশ হইতে নানা রকমের মানুষ ও অন্ত্র জীব এবং বাণিজ্যস্রাব আসে, এবং তাহাদের সঙ্গে নানা রোগবীজ আসে। কিন্তু রোগের আগমন এইরূপে হইতে পারে বলিয়া কোন শহরেরই অন্য সব স্থানের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা চলে না—সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিতও নহে। যাহা করা যায় ও করা উচিত, তাহা নগরপালদিগের দ্বারা নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা এবং যাহা স্বাস্থ্যতত্ত্ব বুঝেন তাহাদের দ্বারা স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রচার। ইংরেজী সাপ্তাহিক কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সাধারণসংখ্যাসমূহে শহরের স্বাস্থ্যসদ্বক্ষী তথ্য এবং রোগের প্রতিষেধক উপায় ও রোগের প্রতিকার সম্বন্ধী প্রবন্ধাদি থাকে। তা ছাড়া সম্পাদক মধ্যে মধ্যে যে একটি স্বাস্থ্যসংখ্যা বাহির করেন, তাহাতে এরূপ জিনিষ প্রচুর থাকে। এই সংখ্যাগুলি, এবং বার্ষিক সংখ্যাগুলিরও পঠিতব্য জিনিষ, চিত্র ও মন্তনের উৎকর্ষে এইজাতীয় পত্রিকাসমূহের মধ্যে যে স্থানটি অধিকার করিয়া আছে তাহা অনন্যস্থান। সম্প্রতি যে ফঠ স্বাস্থ্যসংখ্যা বাহির হইয়াছে, তাহা কলিকাতার বর্তমান অসুস্থ প্রায়ভূমি রোগসমূহের ভয়ে ভীত লোকদের বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

“ক্যালকাটা ক্লক্”

বিলাতে যেমন লণ্ডনে রয়্যাল শোসাইটি আছে, ভারতবর্ষে সেই-রকম একটি বৈজ্ঞানিক সভা (ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স) প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা অনেক দিন হইল উঠিয়াছে। বিবরণটির সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত ও আলোচনা গত মার্চ মাসের ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকার একটি প্রবন্ধে আছে। তাহা মাসিক কাগজের প্রবন্ধ এবং কলিকাতার মাসিকের প্রবন্ধ; সুতরাং কলিকাতার দৈনিক কাগজগুলোর দ্বারা তাহা না-পড়িতে বাধ্য, এবং তাহার শিরোনামটী দেখিয়া আশ্চর্য ও তাহার উল্লেখ না-করিতে বাধ্য। (এই প্রবন্ধ হোনোলুলু কোন কাগজে থাকিলে অবশ্য উদ্ধৃত হইতে পারিত।) সেই জন্য কলিকাতার ভারত হইতে বৈজ্ঞানিক স্তর চক্রশেখর বেক্ট রাইসনের

ই-বিষয়ক একটা বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তারবাগে ফলিকাতার দৈনিকগুলির আফিসে পৌঁছিল, তখন তাঁহার। এই বিষয়ের সংবাদেব জন্ত ব্যাকুল হইলেন। অধ্যাপক আশ্চর্যকর কিছু সভা খবর দিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন। পরে উত্তর মেঘনাদ সাহার উক্তিও আসিয়া পৌঁছিল।

ব্যাপারটা এই, যে, যেহেতু অধ্যাপক রামন্ নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, অতএব তাঁহার মতে ভারতবর্ষে আর কোন বৈজ্ঞানিক নাই, এবং তিনি যেখানে বিরাজ করিবেন, তাহাই ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র স্বতই হইতে বাধ্য। পৃথিবীতে মোটে কয়েক গুণ্য বৈজ্ঞানিক নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্ত আছেন। কিন্তু সেই জন্ত কোন পাগলেও এরূপ ভাবে না, যে, অজ্ঞ বহু সহস্র বৈজ্ঞানিক নগণ্য। কলিকাতা তাঁহাকে বড় হইবার সুযোগ দিয়াছিল, কিন্তু এখন তিনি ফলিকাতায় নাই। অতএব, যদিও কলিকাতায় ভারতবর্ষের যত সরকারী বৈজ্ঞানিক বিভাগের (ডিপার্টমেন্টের) সদর কাঞ্চালয় অবস্থিত ভারতীয় অজ্ঞ কোন শহরে তত নাই, এবং যদিও ফলিকাতায় সরকারী ও বে-সরকারী অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণাগারে যত রবর্মের যত গবেষণা হয়, ভারতবর্ষের অজ্ঞ কোথাও তত হয় না, এবং সেই কারণে ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব সায়েন্সের সীঠস্থান স্বভাবতই ফলিকাতায় হইবার কথা, তথাপি অধ্যাপক রামন্ কল্যাণ করিয়াছেন, ফলিকাতার একটা ক্লাব (অর্থাৎ মন্দ অভিশ্রমে গঠিত একটা ক্ষুদ্র দল) ই একাডেমীকে ফলিকাতায় বসাইবার চেষ্টা করিতেছে! কেহই সে চেষ্টা করিতেছে না, কারণ তাহা অনাবশ্যক। হস্তের সহিত ক্ষুদ্রের উপমা দেওয়া মার্ক্সনীয় হইলে বলা যায়, যথাক্রমে পূর্বদিকে উদ্ভিত করিবার জন্ত যেমন কোন ক্লাবের প্রকার হয় না, তেমনি ফলিকাতা যাহার কেন্দ্র উহাকে তাহার কেন্দ্র বানাইবার জন্তও ক্লাবের প্রয়োজন নাই।

কাহার গ্রাহক বেশী

এটা সবাই জানে, সরকারী বেসরকারী যে-সব প্রতিষ্ঠান, আফিস, ডিপার্টমেন্ট প্রভৃতির কর্মী ইংরেজ বা ফিরঙ্গী, সেই সকলের বিজ্ঞাপন ইংরেজদের কাগজগুলো পায়—যদি বিজ্ঞাপনগুলো প্রধানত ভারতীয়দের অবগতির জন্ত অভিপ্রাণে হয়, তাহা হইলেও সেগুলো এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজে বেশী দাম দিয়া দেওয়া হয়। স্টেটসম্যান এইরূপ কোন কোন বিজ্ঞাপনের প্রকাশে অমৃতভাঙ্গার পত্রিকা হুত করেন। তাহাতে চৌরঙ্গীর কাগজ বলিতেছেন, তাহার ভারতীয় পাঠকসংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত যে-কোন কাগজের চেয়ে বেশী। অমৃতভাঙ্গার তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং দেশের বুদ্ধিসঙ্গত স্বরণও বলিয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকাও এ-বিষয়ে কলম ঢালাইয়াছেন,

লিখিয়াছেন, “স্টেটসম্যান একটু অল্পসঙ্কট করিলেই জানিতে পারিতেন যে, এই ফলিকাতা শহর হইতে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচার তাহার চেয়ে বহুগুণে অধিক। স্টেটসম্যান যদি প্রকাশ্যে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া এ-বিষয়ে মীমাংসা করিতে সম্মত থাকেন, আমরা প্রস্তুত আছি।” স্টেটসম্যান এই হিসাব-বুদ্ধি অগ্রসর হইবেন বলিচা মনে হয় না। আমরা অবজ্ঞা কোন কাগজেরই কাটতি কত জানি না। কিন্তু আজকালকার দিনেও যদি স্টেটসম্যানের বাড়ালী পাঠক যে-কোন বাড়ালী-পরিচালিত ইংরেজী বা বাংলা কাগজের চেয়ে বেশী থাকে, তাহা বাড়ালীদের লজ্জার বিষয় হওয়া উচিত।

তিনিয়াছি, কোন কোন বিজ্ঞাপনসংগ্রাহক, যে-কাগজের জন্ত বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেন, শুধু তাহার কাটতি বাড়াইয়া বলিয়াই ক্ষান্ত হন না, অজ্ঞ সব কাগজের কাটতিও খুব কমাইয়া বলেন। মাসিক পত্রিকাগুলিও হেঁচাই পায় না।

বুদ্ধিমান বিজ্ঞাপনদাতারা শুধু কাটতির পরিমাণ বিবেচনা করেন না, দৈনিকের সঙ্গে মাসিকের কাটতির তুলনাও করেন না। কেন-না দৈনিক কাগর কম লোকই বাঁধাইয়া রাখে বা বাসি হইয়া গেলে পড়ে; কিন্তু মাসিক অনেকে মাসের ১লা তারিখের পরেও পড়ে, এবং বাঁধাইয়া রাখে। তাহার বাঁধান পুরাতন ভলুমের পর্য্যন্ত পাঠক অনেক। যিনি ঘেরকম জিনিষের বিজ্ঞাপন দিতে চান, সেইরূপ জিনিষের ক্রেতা কোন কাগজের পাঠকদের মধ্যে কত, তাহার একটা অনুমানও তাহাকে করিতে হয়।

সৈয়দুল সম্বন্ধে সরকারী প্রবন্ধ

কাগজের কাটতি ও সরকারী বিজ্ঞাপনের বিষয়ে কিছু লিখিতে গিয়া একটা কথা মনে পড়িল। যখন ফলিকাতার ও অন্য কোন কোন শহরের ইংরেজী দৈনিকে ভারতবর্ষের সৈন্য-দলের সম্বন্ধে লখা লখা সরকারী প্রবন্ধ দেখি, তখনই মনে প্রব্র উঠে, “আচ্ছা, এগুলার জন্যে সরকার বাহাদুর কি কর্মপত্র-ওয়ালদিগকে বিজ্ঞাপনের দরে টাকা দিতেছেন?”

আনন্দবাজার পত্রিকার নিয়োক্ত বাক্যগুলি পড়িয়া দেখি প্রথমটা আবার মনে উদ্ভিত হইল।

করেক দিন পূর্বে আমরা বাংলা সাপ্তাহিকের প্রেস-অফিসারের দ্বারা “কমিউনাল ডিরেক্টর, বেঙ্গল” যে-জেরাম বুকাংকে নিকট হইতে একটি “সংবাদ” প্রকাশার্থে পাই। আমরা সন্নিহনে দেখিয়া যে, গত ৭ই এপ্রিল তারিখে ‘স্টেটসম্যান’ এবং ‘প্রায় অব ইণ্ডিয়া’—এই উভয় পত্রই ঐ সংবাদটি বিজ্ঞাপনরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যে-সংবাদ জনসাধারণের উপকারার্থে কামাদিগকে প্রকাশ করিবার জন্ত অরোপ করা হইল, তাহাই বিজ্ঞাপন-রূপে হাশাইবার লজ্জা ‘স্টেটসম্যান’ ও ‘প্রায় অব ইণ্ডিয়া’কে অর্থ দেওয়া হইল! এই বৈষম্যের কারণ কি? কাহার আদেশে এইরূপ সম্মতি হইল! ইহা কি অজ্ঞপ্রবর্তনজনক সংবাদপত্রগুলিকে “স্ব-সিদ্ধাইজ” করা নহে?

সরকারী সামরিক প্রবন্ধসমূহ সৈনিকগণের বিনামূল্যে ছাপিয়েছেন, না তাহার জন্য বিজ্ঞাপনের দ্বারা টাকা পাইয়েছেন, তাহা জানিবার কোনো প্রমাণের কারণ বলিতেছি।

বেসরকারী লোকেরা অনেক মূলধন খেলিয়া খবরের কাগজ বাহির করেন, এবং অনেক খরচ করিয়া ও দায়বদ্ধ কি লইয়া সেগুলি চালাইয়া সর্বসাধারণকে সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য, লোকমত প্রচার করিবার জন্য এবং আপনাদের মত ও মন্তব্য ও স্বাধীনচিত্ত জ্ঞানবান্ লোকদের লেখা প্রবন্ধ প্রকাশ দ্বারা লোকমত গঠন করিবার জন্য। যদি কোন কাগজে সরকারী বিষয়ে কোন ভুল খবর বাহির হয়, তাহার সরকারী সংশোধন মুদ্রিত করা কর্তব্য বটে। কিন্তু বেসরকারী লোকেরা পয়সা খরচ করিয়া দায়বদ্ধ কি লইয়া কাগজ চালাইবে আর সরকার বাহাদুর আত্মপক্ষ প্রচার ও সমর্থনের জন্য লম্বা লম্বা প্রবন্ধ তাহাতে বিনামূল্যে ছাপাইবেন, এই বদোবস্ত মুক্তিসঙ্গত বা বাণিজ্যরীতিসঙ্গত মনে হয় না। সরকার বাহাদুর যদি লোককে বুঝাইতে চান, যে, ভারতবর্ষের সৈন্যদল প্রয়োজনের অভিরিক্ত বড় নহে এবং ইহার ব্যয়ও যথাসম্ভব কম, তাহা হইলে নিজের পরসার কাগজ বাহির করিয়া বা বহি লিখাইয়া তাহার মারকতে এসব কথা প্রচার করুন।

যে-সব সংবাদপত্র এই সকল লম্বা প্রবন্ধ ছাপাইয়া গিয়াছেন, তাহাদের পাঠকেরা সেগুলি খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছেন, না ভাবিয়াছেন এগুলার পরিবর্তে পাঠযোগ্য মুক্তিসঙ্গত কিছু পাইলে তাহারা খুশী হইতেন, বলিতে পারি না। আমরা এই সরকারী প্রবন্ধসমূহের একটি বাক্যও পড়ি নাই, হুতরাং তৎসমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ সন্দেহ কিছুই বলিতে পারি না।

প্রাচীন স্বাণ্ডাত্য-গ্রন্থ “মানসার”

গত চৈত্রের প্রাঙ্গণীর ৮-৭ পৃষ্ঠায় আমরা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর প্রেসমহুমার আচার্য মহাশয়ের সম্পাদিত প্রাচীন স্বাণ্ডাত্য-গ্রন্থ মানসারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। তাহার বিস্তারিত পরিচয়ও দিবার ইচ্ছা আছে। এখন, চৈত্রে বাহা লিখিতে তুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা লিখিতেছি। এই গ্রন্থের এই সংস্করণে কেবল যে মূল সংস্কৃত পাঠটি দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, ইংরেজী অন্ববাদও দেওয়া হইয়াছে এবং বিস্তারিত নক্সাও দেওয়া হইয়াছে। এই ভজ ইহা ভারতবর্ষের যে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এজিনিয়ারিং বিভাগ আছে, তাহার অঙ্গীকৃত এজিনিয়ারিং কলেজগুলিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্কসম্পন্ন এজিনিয়ারিং কলেজ ও বিদ্যালয়সমূহে অগ্রসর ছাত্রদের অধ্যয়ন পুস্তক বলিয়া নির্ধারিত হওয়া কর্তব্য। আমাদের বিশ্বাস এই, যে, যদি উক্ত আভ্যন্তরীণ মুখোপাধ্যায় এখন

জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এজিনিয়ারিং উপাধি প্রার্থীদের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থসমূহের অন্ততম বলিয়া নির্ধারণ করিতেন। এখন ইহা অন্ততঃ কালীয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এজিনিয়ারিং কলেজে অধ্যীত হওয়া উচিত। গ্রন্থখানিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যীতব্য করিলে পরোক্ষ ফল এই হইবে, যে, প্রাচীন ভারতীয়দের স্বাণ্ডাত্য ও যুক্তি-শিল্পের জ্ঞানের পরিমাণ সন্দেহ সত্য ধারণা জন্মিবে। তা ছাড়া, এই উভয় শিল্পে প্রাচীনরা যদি কোন ভ্রম করিয়া থাকেন, নতুন জ্ঞান ও গবেষণার প্রভাবে তাহার সংশোধন হইবে। কারণ, প্রাচীন বা আধুনিক কোন লেখকদিগেরই কোন বিষয়ের জ্ঞান সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নহে।

নেপালে মহারাজা হইবার অধিকার

নেপালের নৃপতিক বলা হয় মহারাজাধিরাজ। বিশ্ব তিনি প্রতীক মাত্র। সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর। তাহার উপাধি মহারাজা। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে রাণা পরিবারের লোকেরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়া থাকেন। ইহাদের সকলের আছে কিনা জানি না, কিন্তু অনেকের যেমন বৈধভাবে বিবাহিতা “উচ্চজাতীয়া” পত্নীর গর্ভে জাত সন্তান আছে, তেমনি “নীচজাতীয়া” রমণীর গর্ভে জাত সন্তান আছে। এইরূপ কেহ কেহ খুব যোগ্য লোক। তৃত্যপূর্ব মহারাজার “রক্ত” নামক এইরূপ এক পুত্র সেদিন পর্যন্ত নেপালের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং সৈনিকদের খুব প্রিয় ছিলেন। সম্প্রতি তিনি, তাঁহার মাতা সমমর্যাদার ছিলেন না এবং “নীচজাতীয়া” ছিলেন বলিয়া, প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপস্থত হইয়াছেন। তাহাদের মাতা “নীচজাতীয়া” বলিয়া বা বৈধরূপে বিবাহিতা হন নাই বলিয়া এইরূপ আরও অনেকের কাজের অবলম্বন হইয়াছে। বর্তমান মহারাজা এইরূপ করিবার এই কারণ দেখাইয়াছেন, যে, তাহা না করিলে রক্তই ইহার পর প্রধান মন্ত্রীর পদের জ্ঞাত অধিকারী হইতেন, কিন্তু তাহাতে প্রজারা অসন্তুষ্ট হইত এবং শাসক রাণা-বংশের রক্তের বিশুদ্ধি নষ্ট হইত। প্রজারা অসন্তুষ্ট হইত কি না জানি না কিন্তু যোগ্যতা সন্দেহ অধিকারসোপকূপ ও পদচ্যুতিরূপে শাস্তি পাইবে এইরূপ মতামতের পুঞ্জেরা, ইহা ভ্রাসনকর নহে। স্থনীতিপরাণ মহারাজাদের সামাজিক বা অন্তর্বিধ কোন পাসন বা শাস্তি হয় কি?

পৃথিবীতে জাতির বিশুদ্ধতা (racial purity) বলিয়া কোন জিনিস নাই; উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির লোকদের মধ্যে অসামাজিক রক্তমিশ্রণ

পটীয়াছে। স্বতরাং কেবলমাত্র বংশের রক্তগুহির কারণে গুণটা করা ভাবনামত হয় কি? তবে যদি প্রজাতন্ত্রোৎপত্তি বা অন্য রাষ্ট্রনৈতিক কারণ ইহার সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহা অঙ্গ ব্যাপার।

‘তাঁহাকে বিষ দেন না কেন?’

খান্ ওবেইদুদাহ্ খান্ নামক একজন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক বন্দীর কারাগারে ক্ষয়রোগ হইয়াছে। তিনি মুসলমান জেলে আবদ্ধ আছেন। (অদ্য ২৮শে চৈত্র কাগজে দেখিতেছি, তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছেন।) তাঁহাকে মৃত্তি দেওয়া হইবে কিনা, কিংবা তাঁহাকে অন্ততঃ মুসলমান জেলে হইতে তদপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থানের জেলে সরান হইবে কিনা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ভারত-গবর্নমেন্টের সরাষ্ট্রসচিব স্ত্র হারি হেগ এই মর্মেণ্ডের উত্তর দেন, যে, সেজন্য কিছু করা হইবে না। তখন মিঃ মাহুদ আহমেদ নামক এক জন সদস্য বলেন :—

“If the Government propose to get rid of the man, why not poison him?”

“যদি গবর্নমেন্ট একবারে মাহুদকে সরাইয়া ফেলিতে চান, তাহা হইলে তাহার প্রতি বিষপ্রয়োগ করেন বা কেন?”

প্রশ্নকর্তা মুসলমান, হিন্দু নহেন; ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে থাকেন, বলে নহে।

স্ত্র হারি হেগ যুতুভাবে উত্তর দিলেন :—

“That’s not a reasonable way of looking at a hunger-striker who chooses to do so voluntarily, with the result that he has impaired his health.”

“একজন প্রায়োগবোধক যে নিজে বেছায় উপবাস দিতেছে ও তাহার ফলে বাহার স্বাস্থ্যহানি ঘটাইয়াছে। তাহার বিষয়ে এই প্রকার (মানসিক) দৃষ্টিনিক্ষেপ যুক্তিসঙ্গত নহে।”

মিঃ মাহুদ ব্যবস্থাপক সভায় অচিন্তিতপূর্ব, অপ্রতপূর্ব প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি কি জানেন, সন্দেহ করেন বা কল্পনা করেন, যে, গবর্নমেন্ট কখনও কোন বন্দীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন বা করেন বা গবর্নমেন্টের পক্ষে তাহা করা সম্ভব; অন্ততঃ তিনি কি মনে করেন, যে, গবর্নমেন্ট কোন বন্দীর মৃত্যুকামনা করিয়াছিলেন বা করেন বা গবর্নমেন্টের তাহা করা সম্ভব, যে তিনি এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন? স্ত্র হারি হেগও হরত মিঃ মাহুদ আহমেদের প্রশ্নের উত্তরে এরূপ প্রতিপ্রশ্ন করিতে পারিতেন। স্ত্র হারি তাহা করিলে মিঃ আহমেদ কি উত্তর দিতেন জানিতে কোতূহল হয়। কিন্তু বাহা হয় নাই তাহা হইলে আরও কি হইত, সে-বিষয়ে জল্পনা বুঝা।

“স্বদেশহিতৈষণার একচেটিয়া”

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অঙ্গতম সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বিনাবিচারে বন্দীকৃত বাঙালীদের অসহ্যতা দি অভিযোগের কথা মধ্যে মধ্যে সভায় তুলিয়া থাকেন। সেই সম্বন্ধে ভারত-গবর্নমেন্টের সরাষ্ট্রসচিব স্ত্র হারি হেগ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

Referring to the problem of detenus, Sir Harry Haig was astonished at Mr. Mitra’s charges. Mr. Mitra had declared that Government should not imagine that by merely keeping in restraint a few thousand young men they would kill the ideas of patriotism.

Sir Harry asked : Does Mr. Mitra think that we are keeping these young men in order to kill the ideas of patriotism? The problem of detenus is practically confined to Bengal. Are there no patriots in other provinces? Has Bengal the monopoly of patriotism? Or is it not that Bengal has the monopoly of something different (political murder)? What Government are seeking is not to suppress patriotism, but the desire for murder. That is the justification for the policy of keeping these young men under restraint. We fully believe that they are terrorists...

...I would invite Mr. Mitra to make it clear whether by expressing his feelings, as he did, he in any way desired to support the murder of Government officials or their friends.

Mr. Mitra immediately answered in the negative.

ভাষণার্থ। স্ত্র হারি মিঃ মিত্রের অভিযোগগুলিতে আশ্চর্যভিত্ত হইয়াছিলেন। মিঃ মিত্র বলিয়াছিলেন, গবর্নমেন্টের কল্পনা করা উচিত নয়, যে, কয়েক হাজার যুবককে আটক রাখিয়া স্বদেশহিতৈষণার জাব বিমূঢ় করিবেন।

স্ত্র হারি জিজ্ঞাসা করেন : মিঃ মিত্র কি মনে করেন, যে, আমরা এই যুবকগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি স্বদেশহিতৈষণার জাব নষ্ট করিবার নিমিত্ত? বিনাবিচারে আটক রাখার সমস্তটা কার্যতঃ বজেই সীমাবদ্ধ। অন্ততঃ প্রদেশে কি স্বদেশহিতৈষী নাই? স্বদেশহিতৈষণা কি স্বদেশের একচেটিয়া? না, পৃথক একটা জিনিষ (রাষ্ট্রনৈতিক হত্যাকাণ্ড) স্বদেশের একচেটিয়া? গবর্নমেন্ট বাহা চাহিতেছেন তাহা স্বদেশহিতৈষণার ধমন নহে, কিন্তু নরহত্যার ইচ্ছার বিন্যাস। তাহাই এই যুবকগুলিকে আটক রাখিবার নীতির ভ্রাত্যপ্রতিপাদক। আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, যে, তাহারা সত্যসিদ্ধাী।.....

.....মিঃ মিত্র যে প্রকারে নিজের মনের জাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা তিনি সরকারী কর্মচারী বা তাহাদের বন্ধুদের হত্যাকাণ্ড সমর্থন করিতে কোন রকমে ইচ্ছা করিয়াছেন কিনা, তাহা পরিষ্কার করিয়া জানাইতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি।

মিঃ মিত্র ভৎসনাৎ বলিলেন, তিনি সেজন্য কোন ইচ্ছা করেন নাই।

পাঠকেরা! লক্ষ্য করিবেন, স্ত্র হারি হেগ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের কথাগুলিতে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, এবং ভয়ভাষার তাহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ মাহুদ আহমেদের প্রশ্নে বিশ্বাস প্রকাশ করেন নাই, এবং তাঁহাকে ভয়ভাষাও আহ্বান করেন নাই তাহার প্রশ্নের কারণ বলিতে। অথচ, মিঃ আহমেদের প্রশ্নের মধ্যে, গবর্নমেন্টের পক্ষে কাহাকেও বিবপ্রয়োগ সম্ভব হইতে

পারে, এইরূপ যে করুন। উহা থাকিতে পারে মনে করা যাইতে পারে, তাহা মিঃ মিলের উক্তির মধ্যে, গবন্মেণ্টের পক্ষে স্বদেশহিতৈষণা বিনাশের জন্য কতকগুলি লোককে আটক করিয়া রাখিবার যে সম্ভাবনা উহা থাকিতে পারে মনে করা যাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা কম আশ্চর্যজনক নহে—বরং বেশী আশ্চর্যজনক।

বিনাবিচারে বন্দী সব বাঙালী যুবককে স্তর হারি হেগ সন্ত্রাসবাদী মনে করেন, বলিয়াছেন। হুতরাং তিনি সত্যোক্ত বাবুকে যাহা কৈফিয়ৎ দিতে আহ্বান করেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু বিনাবিচারে বন্দীদিগকে বেসরকারী প্রত্যেক লোক সন্ত্রাসবাদী বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য নহে, কারণ তাহা প্রমাণ হয় নাই। সেই কারণে, বঙ্গ বিস্তর লোক বিশ্বাস করে, যে, তাহাদের মধ্যে সবাই না হউক, অনেক যুবক সন্ত্রাসবাদী নহে, এবং বঙ্গ কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী থাকায় পুলিশ বিস্তর অ-সন্ত্রাসবাদী স্বদেশভক্ত যুবককে সন্ত্রাসবাদ দমন উপলক্ষ্যে আটক করিয়াছে। সত্যোক্ত বাবুর উক্তি এইরূপ কোন বিখ্যাতের ফল বলিয়া অস্বাভাবিক।

তিনি কিংবা সার্বজনিক কার্যে ব্যাপৃত অল্প কোন বাঙালী এমন আহাশুক নহেন, যে, স্বদেশহিতৈষণা বঙ্গের একচেটিয়া সম্পত্তি বলিবেন। স্তর হারি বলিয়াছেন, রাজনৈতিক হত্যা বঙ্গের একচেটিয়া জিনিষ। স্যর হারির উক্তি সর্বদেশে ও সর্বকালে প্রযোজ্য সত্য না হইলেও ভারতবর্ষে আপাততঃ তাহা বটে।

কলিকাতার মেয়র নির্বাচন

এ-বৎসর কলিকাতার মেয়র নির্বাচন যে অশুভলভাবে হইতে পারে নাই, ইহা দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। যে-রূপে ইহা হইয়াছে তাহা নিয়মাহুগতের ও নিয়মাহুগত প্রণালীতে কাজ করার পক্ষে বিপজ্জনক। অবিসংবাদিত নিয়ম অমুসারে নির্বাচনের ফলে যে-কেহ নির্বাচিত হউন, তাহাতে কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু স্বাভাসিক ও স্বায়ত্তশাসনপ্রার্থী কোন দলের পক্ষে এমন কিছু করা আবশ্য্যাতী, যাহা স্বায়ত্তশাসক প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিবার ছিন্ন গবন্মেণ্টকে দেয়, কিংবা যাহা হাইকোর্টে মোকদ্দমার কারণীভূত হইতে পারে।

শেখসীমের জুলিয়স সীমর নাটকে জীবিত জুলিয়স সীমর বরাবর না থাকিলেও যেমন তাহার অশরীরী আত্মার প্রভাব অস্বত্ব হইয়াছে, তেমনই বঙ্গের দুই কংগ্রেস উপদলের একটির নেতা স্বর্গগত ও অপরটির নেতা বিদেশ-প্রবাসী হইলেও দলদ্বিধা বিরতিতে না, ইহা দুঃখের বিষয়।

শিক্ষায় আমেরিকার নিগ্রো ও ভারতবর্ষের “আর্য্য”।

আমেরিকার নিগ্রোদের আদি বাসস্থান আফ্রিক সেখানে তাহাদের বর্ণমালা বা সাহিত্য ছিল না। তাহারা ক্রীতদাস রূপে আমেরিকায় আনীত হয়। ১৮৬৫ সালে ডিসেম্বর মাসে তাহারা দাসত্বমুক্ত হয়, এবং তখন হইতে তাহাদের শিক্ষালাভ ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান আইন লব্ধ হয়—তাহার আগে উহা আইনবিরুদ্ধ ও দণ্ডনীয় কাজ ছিল।

১৮৬৫ সালের পর ৬৫ বৎসরে ১৯৩০ সালে দেখা গেল অসভ্য, নিজেদের বর্ণমালাহীন, নিজেদের সাহিত্যহীন আমেরিকান নিগ্রোদের মধ্যে শতকরা ৮৩.৭ জন মোটামু ৮৪ জন, লিখনপঠনক্ষম হইয়াছে। অনেক হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের লোকদের বর্ণমালা আছে, সাহিত্য আছে ব্রিটিশ শাসনের আগে লিখনপঠনক্ষমতা এখনকার চেয়ে বেশী লোকের ছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালের সেলসে দেখা গিয়াছে, ভারতে শতকরা ৮ (আট) জন, বঙ্গ শতকরা ১১ (এগার) জন লিখনপঠনক্ষম। অর্থাৎ আমেরিকা নিগ্রোরা ভারতীয়দের চেয়ে শতকরা দশগুণেরও বে লিখনপঠনক্ষম।

বেকারদের সম্বন্ধে বড়লাটের মন্তব্য, এবং বঙ্গীয় ঔষধ

ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের এক কনফারেন্স গত মার্চ মাসে দিল্লীতে হয়। তাহার কা আরম্ভ করিতে গিয়া বড়লাট যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে, বহু বক্তৃতা অনেক কষ্টস্বীকার ও পরিশ্রম করিয়া উচ্চ ডিগ্রী ও সম্মান লাভ সত্ত্বেও যে জীবিকানির্ভারের বা স্বদেশবাসীদের সেবা সুযোগ পান না, একান্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং বলেন :—

“Keen and unmerited disappointment, accentuated by irksome inactivity, are apt to lead high-spirited young men into dangerous and unexpected channels.”

তাৎপৰ্য্য। যে-রূপ আশাতন্ত্রের তাহারা বোধ্য নহে সেইরূপ তঁ নৈরাত্ত বিরক্তির নিষ্ক্রিয়তার ফলে বুদ্ধি পাইয়া অতিভেদজী যুবকদিগ বিপজ্জনক ও অপ্রত্যাশিত পথের পথিক করিতে পারে।

অতি সত্য কথা।

এরূপ সম্ভাবনার বঙ্গ প্রযোজ্য প্রাথমিক ঔষধ হিজলী বজা, দেওলা ইত্যাদি স্থানে বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

পুলিসের ঘরে এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হইতে কিন্তু তখনও কোন নরহত্যা না-ঘটিয়া থাকিলেও, অবশেষের স্ববস্থা বঙ্গীয় অতি-আধুনিক লক্ষ্যোদ্ভিত কৌশল আইনে আছে। উহা কীসী।

টোরাীদের দ্বারা ভারতীয় লোকমত নির্ণয়

বিশ্বস্তের স্বাক্ষরিত অর্থাৎ টোরাীদের দুইজন সভ্য, ডাইকোট লাইমিটন ও মেজর কোটল্ড, ভারতীয়দের রাজনৈতিক মত সাক্ষাৎভাবে জানিবার জন্য ভারতভ্রমণ করিতেছেন। ইতিমধ্যেই নেতৃস্থানীয় কাহাকেও কাহাকেও প্রশ্নবলী দিয়া তাহার জবাব চাহিয়াছেন এবং কিছু জবাব পাইয়াছেন। প্রশ্নগুলি নীচে দিতেছি।

1. Do you approve of or do you condemn the White Paper scheme ?

2. Are the Hindus in British India really interested in the Federation between the Princes and British India, or are you indifferent to the Federal programme ?

3. What are the dangers in the Federal scheme which the Hindus visualize ?

4. If the Federal scheme is scrapped and only reforms in the British Indian Provinces are granted, will this meet with the approval of the Hindus ?

5. Would the Hindu community prefer the Simon recommendations on the assumption that those recommendations will not be based on the Prime Minister's Communal Award ?

এই প্রশ্নগুলি একটি একটি করিয়া বাংলায় দিয়া তাহার উপর কিছু টিপ্সনী যোগ করিয়া দিতেছি।

১। আপনি যেত পত্রের প্রস্তাবাবলীর অনুমোদন করেন, না তাহা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া তাহার নিন্দা করেন ?

এরূপ প্রশ্ন যে করা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, যে, ইংলণ্ডের শোকেরা ভারতের জনমত সবক্ষে কত অজ্ঞ, এবং যে অল্পসংখ্যক ইংরেজ হয়ত তাহা জানে, তাহাদের অনেক কি পরিমাণ অজ্ঞতার ভাগ করে।

মহাদানামধ্যে যে-যে ভারতীয় জীবন জীবনমণ্ডি সরকার বাহাদুরের অঙ্গুষ্ঠীত ও ভবিষ্যতে অধিকতর অঙ্গুগ্রহপ্রার্থী, এবং ধামাধরা ও ধামা ধরিতে আগ্রহান্বিত, তাহারা ছাড়া কেহই যে যেত পত্রের অনুমোদন করে না, ইহা ভারতবর্ষে হবিদিত। কোনও স্বাভাবিক (nationalist) ইহার অনুমোদন করে না, করিতে পারে না—তাহার ধর্ম ও জাতি বাহাই হউক। ইহার অনুমোদনকারী কোন ব্যক্তি স্বাভাবিক বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে সে হয় ছদ্মবেশী, নয় কল্পনাবিলাসী আত্মপ্রত্যাক।

যেত পত্রের ভিত্তি প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা। ইহাতে হিন্দুদের উপর যোরতর অবিচার এবং ইউরোপীয় ও মুসলমানদের প্রতি অতি অন্যায় ও গহিত পক্ষপাতের দেখান হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা ছাড়িয়া দিলেও, ইহাতে ভারতীয়দিগকে বড়টুকু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—যদি কিছু দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক, এবং তাহার দ্বারা ভারতীয়দের অসন্তোষ দূরীকৃত হইবে না।

২। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের হিন্দুরা কি দেশী রাজ্যের স্বাধীনতা এক ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে কেভারেন্ডনে আগ্রহান্বিত ? না, তৎসম্বন্ধে উদাসীন ?

ভারতবর্ষের হিন্দুরা ও অন্ত ভারতীয়েরা বস্তুতঃ দেশী রাজ্যদের সহিত কেভারেন্ডনে আগ্রহান্বিত নহে। তাহারা চায় ব্রিটিশ ভারতের যত শীঘ্র সম্ভব স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীন—তাহাকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটস বা পূর্ণ স্বরাষ্ট্র বা অন্ত যে নামই দেওয়া হউক। তাহারা কেভারেন্ডনে রাজ্যী হইয়াছেন, তাঁহারাও এই কারণে রাজ্যী হইয়াছেন, যে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট বলিয়াছেন যে তা ছাড়া কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টকে ব্যবস্থাপক সভার কাছে দায়ী করা হইবে না। দেশী রাজ্যেরা কবে কি সপ্তে কেভারেন্ডনে রাজ্যী হইবেন, তাহার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতে পারি না। তাহারা বহু মাস বৎসর ইচ্ছা নিজেদের মন স্থির করিবার জন্য সময় লট্টন। আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে স্বাধীন চাই। আর, বাস্তবিক, সুশাসিত পুণবর্ষের ত নিজেদের মত অমুসারে কাজ করিবার স্বাধীনতা নাই। তাহাদিগকে ভারত-গবর্নমেন্টের রাজনৈতিক বিভাগের মত অমুসারে চলিতে হয়।

কেভার্যাল ব্যবস্থাপক সভার তাঁহাদের রাজ্যের প্রতিনিধি রাজ্যরাই মনোনীত করিবেন, তাঁহাদের প্রজারা নহে। রাজ্যেরা এই কাজ করিবেন তাঁহাদের প্রধান মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে। ইহা কুলিলে চলিবে না, যে, একটি এংলো-মুসলিম সন্ধি বিদ্যমান আছে। যেমন উপরে আকাশ ও নীচে মাটির মধ্যে মিলনরেখা, অর্থাৎ চক্কাল আছে, নিশ্চয়, অথচ তাহাকে কেহ ধরিতে চুইতে পারে না, তেমনি এংলো-মুসলিম সন্ধিও নিশ্চয় আছে—যদিও সে জিনিষটি ধরিতে চুইতে পারা যায় না। এই সন্ধি-অনুসারে যেমন ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানরা তাহাদের সংখ্যা লিখা খনশালিতা প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক বেশী কমতা ইংরাজদের নীচে পাইয়াছে ও পাইবে, তেমনি দেশী রাজ্যসকলের প্রধান মন্ত্রীর কাজও বড় বড় রাজ্যগুলিতে হয় ইংরেজ নয় মুসলমানকে দেওয়া হইতেছে। এই সব রাজ্যেরাই প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী চাইবে, এবং তাহাদিগকে রাজ্যদের নামে মনোনীত করিবে এই ইংরেজ ও মুসলমান প্রধান মন্ত্রীরা।

যদি সব দেশী রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ ভারতের মত সামান্য আইনামুযায়ী শাসনও থাকিত, যদি রাজ্যগুলির প্রতিনিধির সংখ্যা প্রজাদের সংখ্যার অনুপাতে নির্দিষ্ট হইত, যদি প্রতিনিধিরা প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হইত, এবং যদি রাজ্যেরা ইংলণ্ডের রাজ্যের অধীনতার জন্য ব্যাকুল না হইয়া সমগ্র ভারতীয় কেভার্যাল গবর্নমেন্টকে কর্তৃপক্ষ বলিয়া মানিতে রাজী হইতেন, তাহা হইলে কেভারেন্ডনের বিরোধী না হইয়া আমরা সে-সম্বন্ধে হয়ত কিছু আগ্রহান্বিত হইতাম। যেত পত্রে বেরূপ কেভারেন্ডনের প্রস্তাব আছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

রাজাদিগকে ও তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে কেভারেজনে আনা হইতেছে, ব্রিটিশ ভারতের স্বাভাবিকদিগকে সম্পূর্ণ হীনবল করিবার জন্ত। হীনবল করা হইবে নানা উপায়ে। একটা উপায়, ইউরোপীয়দিগকে অভ্যস্ত বেশী প্রতিনিধি দান, আর একটা উপায় দেশী রাজাদিগকে বেশী করিয়া প্রতিনিধি দান, তৃতীয় উপায় মুসলমানদিগকে বেশী প্রতিনিধি দান, এবং চতুর্থ উপায় হিন্দুদিগকে স্বিকৃতি করিয়া “সর্বদ” হিন্দু ও “অবনত” হিন্দুদিগকে আলাদা আলাদা প্রতিনিধি দান। এ ছাড়া আরও অনেক উপায় আছে। তাহার আলোচনা গত দু-তিন বৎসরের প্রবাসীতে অনেক বার করিয়াছি।

৩। কেভারেজনের স্বীকৃতি বা পরিকল্পনার হিন্দুরা কি কি বিপদ দেখিতেছেন?

ইহা অনেক বার বলা হইয়াছে। ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভার ব্রিটিশ-ভারতীয় অংশে থাকিবে ২৫০টি আসন। তাহার মধ্যে ১০৫টি “অবনত” হিন্দুসম্মত সকল হিন্দুরা পাইবে। বাকী ১৪৫টির অধিকাংশ মুসলমান, ইংরেজ, ফিরঙ্গী, দেশী খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির পাইবে, বাহারা অসহগৃহীত বলিয়া গবর্ণমেন্টের অসহগত। অর্থাৎ হিন্দুরা যদিও সংখ্যায় অল্প সকলের সমষ্টির বহুগুণ, তথাপি তাহাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইবে। ইহাতেও সন্দেহ না হইলে যেতগজরচয়িতারা সমগ্র ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভার রাজাদের প্রতিনিধিদিগকে রাজ্যগুলির লোকসংখ্যারূপে প্রাপ্য অংশে অনেক বেশী আসন দিতেছেন। তাহাতে হিন্দুদিগকে একেবারে নগণ্যে পরিণত করা হইবে। ইহার উপর হিন্দুদের আরও বিপদ ঘটাইবার প্রয়োজন আছে কি?

৪। যদি ফেডার্যাল পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়, এবং যদি ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিতেই শাসনসংস্থার রক্ষণ করা হয়, তাহা কি হিন্দুদের অনুমোদন পাইবে?

বাহাকে সরকারপক্ষীয় লোকেরা বলেন প্রভিন্সিয়াল অটনমি অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্তকর্তৃত্ব, ইহা যদি সেই চীজ হয়, তাহা হইলে বলা, ইহাতে ভারতীয়েরা সন্তুষ্ট হইবে না। তাহার কেন্দ্রীয় ভারত-গবর্ণমেন্টেও “দারিদ্র্য” চায়। অবশ্য নির্দিষ্ট দু-চার বৎসরের জন্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের হিউমর জন্ত আবশ্যিক এরূপ কোন কোন বিষয় গবর্ণমেন্টের হাতে রাখিত থাকিতে পারে।

৫। হিন্দুরা কি সাইমন কমিশনের সুপারিশগুলি গ্ৰহণ করিবে, যদি এই সর্বত্র বায় যে তাহা প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাবধারাটোআরা অনুসারী হইবে না?

সাইমন কমিশনের সুপারিশগুলি প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাটোআরার চেষ্টার জাল বটে। কিন্তু তাহাতেও হিন্দুদের প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করা হয় নাই। তাহা ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দুরা ও অন্য স্বাভাবিক ভারতীয়েরা এখন একটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা চায়, বাহাতে কেন্দ্রীয় দারিদ্র্য থাকিবে, এবং বাহা

করক বৎসরের মধ্যে আপনা আপনিই, অর্থাৎ ব্রিটিশ জাতির বা পাল্‌মেণ্টের পুনর্বিচার ব্যতিরেকে, ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন, অন্ততঃ ডোমিনিয়নকে, উপনীত করিবে।

আমরা উপর যে প্রশ্নাবলী দিলাম, দেখা যাইতেছে, যে, তাহা হিন্দুদের জন্ত। অন্য লোকদিগকে কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছে জানি না। ভিন্ন ভিন্ন লোকসমষ্টিতে আলাদা আলাদা প্রশ্ন করা হইয়া থাকিলে, তাহার মধ্যেও ভেদনীতি বিদ্যমান মনে করা যাইতে পারে।

দেশী রাজাদিগকে স্বাধীন

দেশী রাজারা বলেন, তাঁহাদের সম্পর্ক সাক্ষাৎভাবে ব্রিটিশ নৃপতির সহিত, তাঁহারা তাঁহারই জন্ত। ভারত-গবর্ণমেন্টের কাছে, অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়, তাঁহাদের স্বদেশী লোকদের সামান্য একটু ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহারা ঐ সভায় তাঁহাদের রাজ্যের বা তাঁহাদের কোন কিছু আবেদন বরদাস্ত করিবেন না। কিন্তু ধার চাহিবার বেলা তাঁহারা ব্রিটিশ নৃপতির বা ব্রিটিশ পাল্‌মেণ্টের কাছে হাত পাতিতে পারেন না; হাত পাতেন ভারত-গবর্ণমেন্টের কাছে এবং ভারত-গবর্ণমেন্টকে স্বর্ণের আবেদন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিতে হয়। ইহাতে মহামহিম রাজা মহাশয়ের আশ্বাসদানে আবাত লাগে না।

এরূপ স্বর্ণ দেওয়া অভ্যস্ত অস্বাভাবিক। স্বর্ণ আদায় হইবে কিনা তাহার কোন স্থিরতা নাই। বাহাওলপুরের নবাবের কাছে পাওনা করকে কোটি টাকা খুব সম্ভব পাওয়া যাইবে না। তার পর, এই যে স্বর্ণ দেওয়া হয়, ইহা উদ্ভূত টাকা হইতে নয়। ভারতীয় স্বর্ণের ট্যাঙ্ক লাসিয়াই আছে। বাহুতি পুরণের জন্য ব্রিটিশ ভারতের গরীব লোকদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া টাকা আদায় করা হয়। এইরূপে সংগৃহীত টাকা হইতে বহু লক্ষ, কখন কখন বহু কোটি টাকা অমিতব্যয়ী স্বৈচ্ছাচারী সেই সব রাজাকে দেওয়া হয়, বাহাদের প্রজাদের উপর ব্যবহার সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতের ট্যাক্সদাতাদের কিছুই বলিবার অধিকার নাই।

নারীদের উপর অত্যাচার

১৯৩২-৩৩ সালের বাংলা দেশের যে সরকারী শাসনবৃত্তান্ত সম্প্রতি বাহির হইয়াছে, তাহাতে নারীদের উপর অত্যাচার-মূলক অপরাধ সম্বন্ধে একটি অহুচ্ছদ আছে। তাহাতে বলা হইতেছে, যে, এইরূপ অপরাধ বাড়িয়া চলিতেছে, এই বেনরকারী ধারণাটা ঠিক নয়। শাসনবৃত্তান্তে অপরাধের যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহার নিকটাত্ম পরীক্ষা করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেগুলি নিতুল বলিয়া

ধরিয়া লইলেও, সরকারী রিপোর্টের উক্তি প্রমাণিত হয় না। রিপোর্টে প্রথমতঃ ১৯২৯-৩২ এই চারি বৎসরের অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। পুলিশের কাছে এই চারি বৎসরে যথাক্রমে ৭৭৮, ৬২৭, ৭২২, ও ৭৭২টি অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে উপস্থাপিত “সত্য” অভিযোগ এই চারি বৎসরে যথাক্রমে ১০২২, ৬৮৪, ৬২০ এবং ৮২১। এই চারি বৎসরে অপরাধের জন্ত গ্রেপ্তার করা হয় যথাক্রমে ২০০৬, ১৩৮২, ১৫৫২ ও ১৬৫৭। যদি ১৯২৯ সালের সংখ্যাগুলি বিবেচনা না করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, তাহার পর পর তিন বৎসর ক্রমাগত সংখ্যাগুলি বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং সরকারী রিপোর্টের সংখ্যাগুলিতে ত সর্বসাধারণের ধারণাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। অথচ গবর্নমেন্ট বলিতেছেন, তাহা ঠিক নয়।

অতঃপর সরকারী রিপোর্টে বলা হইতেছে, ১৯২৬ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত ছয় বৎসরে অত্যাচারিতা হিন্দুনারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩২৪, ৩২৫, ৩০৪, ৩৬৭, ৩৬২, ও ৩৩৮; এবং অত্যাচারিত মুসলমান নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪২৪, ৫২, ৬৫৭, ৫৩৮ এবং ৫৮২। অত্যাচারিতারা যে ধর্মাবলম্বিনীই হউন, অত্যাচারটা পান্থিক বা পৈশাচিক এবং তাহার দমন হওয়া চাই। সরকারী সংখ্যাগুলি ঠিক হইলে, মুসলমান কাগজগুলো ও নেতারা যে বলিয়া থাকেন তাহাদের সমাজে চিরবৈষম্য আদি সামাজিক প্রথা না-ধাকার মুসলমান সমাজে নারীদের উপর এরূপ অত্যাচার হয় না, তাহা সত্য নহে। অথচ এ-পর্যন্ত নারীর উপর অত্যাচার দমনে মুসলমান সমাজের কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই।

সরকারী রিপোর্টে দেখান হইয়াছে, যে, এই ছয় বৎসরে মুসলমান দ্বারা অত্যাচারিতা হিন্দু নারীদের সংখ্যা যথাক্রমে ১১৪, ১২২, ১০৫, ১১৪, ১০২ ও ১২৫, এবং হিন্দুদ্বারা অত্যাচারিতা হিন্দু নারীর সংখ্যা ২০৫, ২০১, ১৯৮, ২৩১, ২৩৪ ও ১৯৪। কিন্তু রিপোর্টে ইহাও দেখান উচিত ছিল, যে, মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিতা মুসলমান নারী এই ছয় বৎসরে কত, এবং হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিতা মুসলমান নারীই বা কত। তাহা হইলে বুঝা হইত, মুসলমান বদমায়েসরা কত নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে, এবং

হিন্দু বদমায়েসরাই বা কত নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। আমরা সব বদমায়েসের শাস্তি ও সংশোধন চাই, এবং সর্বধর্মের নারীর রক্ষা চাই। কিন্তু গবর্নমেন্ট যদি দেখাইতে চান কোন সম্প্রদায়ে বদমায়েস বেশী আছে, তাহা হইলে সরকারী রিপোর্টে লেখা উচিত ছিল, মুসলমানরা মোট হিন্দু-মুসলমান কত নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং হিন্দুরা মোট কত হিন্দু-মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। ছয় বৎসরে হিন্দুরা কত মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং মুসলমানরা কত মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে, এই দুই প্রান্ত সংখ্যা রিপোর্টলেখক গোপন রাখার তাহার উদ্দেশ্য সন্দেহ নানাধি অসম্মান হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য, রিপোর্টে বলা হইতেছে, যে, রিপোর্ট-প্রদত্ত সংখ্যাগুলি হইতে সিদ্ধান্ত করা যায়, যে, এই প্রকার অপরাধ দমনের জন্ত বিশেষ কোন আইন প্রণয়ন বা বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক। আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত! এরূপ পান্থ ও পৈশাচিক অপরাধ বাদুক বা না-বাদুক, বাহা আছে, তাহারই ত বর্তমান আইন দ্বারা ও বর্তমান পুলিশকাধ্যপ্রণালী দ্বারা দমন হইতেছে না। সেই জন্তই আইনের ও কাধ্যপ্রণালীর পরিবর্তন ও উন্নতি আবশ্যিক।

—

সর্বজাতীয় মানবিকতা

সৈদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ক্লাব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় একটি ভ্রমণ করতঃ যাহাকে ইংরেজীতে ইন্টার-কন্টিনেন্টালিজম ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল কালচার বলে, তিনি সেই বিশ্বমানবীয় সংস্কৃতি ও একপ্রাণতা বিষয়ে কিছু বলেন। তাহার বক্তৃতাটির ভাল বাংলা বা ইংরেজী রিপোর্ট বাহির হয় নাই। তবে, শ্রোতারা আশা করি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, তিনি, এই বাংলা দেশেই যে এক শত বৎসর পূর্বে রামমোহন রায়ের দ্বারা বিশ্বমানবিকতার আদর্শের প্রতিষ্ঠার আশ্রয় চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা অস্বাভাবিক মনে করেন নাই, পরিহাস উপহাসের বিষয় মনে করেন নাই, বরং গৌরবের বিষয়ই মনে করিয়াছিলেন।

—

বেকারদের জন্য বিলাতী ব্যয়

আমাদের দেশে কর্তৃপক্ষ বেকারসমূহ বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তাও খুব বেশী বার নয়। এবং বড়লাট পর্যন্ত, “মহাতেজা” (“high-spirited”) মুবকেরা বেকার থাকায় বিপজ্জনক বিপথে যায়, তাহার জন্য দুঃখও করিয়াছেন। কিন্তু কার্যতঃ এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য প্রধানতঃ শান্তিরই ব্যবস্থা হইয়াছে। বিলাতী ব্যবস্থা অল্প প্রকার। ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, ১৯২০ সাল হইতে এ-পর্যন্ত অলস বেকারদিগকে ডিন্ডা দিবার নিমিত্ত ব্রিটেন ১১০,০০,০০,০০০ এক শত দশ কোটি পাউণ্ড খরচ করিয়াছে। তাহা মোটামুটি ১৪৬৭ (চৌদ্দ শত সাতষট্টি) কোটি টাকার সমান। তিনি মনে করেন, এই টাকাটা ডিন্ডা দেওয়ায় বেকারদের কেবল নৈতিক অবনতি হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যয় না করিলে খুব অসন্তোষ হইত, হয়ত বিপ্লব ঘটিত। তিনি মনে করেন, কোন জনহিতকর সার্বজনিক পুষ্ক বা অন্য কাজে ইহা ব্যয় করিয়া সেই কাজে বেকারদিগকে লাগাইয়া দিলে সুফল হইত। তাহা সত্য কথা।

ভারতবর্ষে কিন্তু এরূপ কোনপ্রকার ব্যবস্থাই হয় নাই, যদিও এদেশে বেকারের সংখ্যা ব্রিটেনের চেয়ে ঢের বেশী।

আমাদের ক্ষমতা থাকিলে আমরা কয়েক কোটি টাকা সরকারী ঋণ করিয়া তাহার সুদ হইতে বঙ্গের সর্বত্র বিদ্যালয় চালাইতাম এবং জাহাজে সমুদ্র বেকার যোগ্য শিক্ষিত যুবককে

শিক্ষক নিযুক্ত করিতাম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সামান্য এক-একটা অভিযানের জন্য ২০২৫১৩০ কোটি ঋণ বাড়িয়া যায়। তাহা শোখও হয়। শিকার জন্য ঋণ তাহার চেয়ে কম হইত এবং তাহা শোখও হইত। কিন্তু শিক্ষাকে সরকার অবশ্য-প্রয়োজনীয় মনে করেন না।

চাটার্জি মুখার্জি বানার্জি

বাংলা দেশে কে যে প্রথমে ইংরেজীতে চাটার্জি মুখার্জি বানার্জি ইত্যাদি পদবী লিখিতে আরম্ভ করেন, জানি না। তাঁহার প্রতি একটুও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি না। আমি নিজেও কুক্ষণে ছেলেবেলা ইংরেজীতে চ্যাটেজি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা এখনও চালাইতে হইতেছে। কিন্তু তা বাল্য বাঙালয় চাটার্জি মুখার্জি ইত্যাদি অসহ্য। চাট্জো, মুখ্জো, প্রভৃতি কি দোষ করিল? এগুলি লিখিতে বেশী জায়গা লাগে না, বেশী অক্ষরও লাগে না।

বাংলা বক্তৃতায় ও খবরের কাগজে আর এক উপদ্রব দেখিতে পাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীষ ‘মালবা’ নহেন। তিনি নিজেও লেখেন মালবীষ। অথচ বাঙালীরা তাঁহাকে ‘মালবা’ না করিয়া ছাড়িবেন না। গোখলেকে গোখেল, নটরাজনকে নটরজন, নটেশনকে নেটসন, রামনকে রমণ অনেকই করেন। নামগুলির প্রতি তাঁহাদের একটু দয়া থাকা আবশ্যক।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ হৃদয়ম্”

“নারায়ণা বলহীনেন লভাঃ”

৩৪শ ভাগ

১ম অঙ্ক

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

২য় সংখ্যা

প্রাণের ডাক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখনো কি ক্লান্তি ঘোচে নাই,

ওঠো তবু ওঠো,

বুখা হোক তবুও বুখাই

পথপানে ছোটো ।

স্বপ্ন যত ঘিরেছিল রাতে

অবসন্ন তারাদের সাথে

মিলাল আলোকে অবগাহি ।

আয়ুঃকৌণ নিঃস্ব দীপগুলি

নিশীথের স্মৃতি গেছে ভুলি,

অন্ধ আঁখি শূন্যে আছে চাহি ।

সুদূর আকাশে ওড়ে চিল,

উড়ে ফেরে কাক,

বারে বারে ভোরের কোকিল

ঘন দেয় ডাক ।

জলাশয় কোন্ গ্রামপারে,

বক উড়ে যায় তারি ধারে,

ডাকডাকি করে শালিখেরা ।

প্রয়োজন থাক্ নাই থাক্

যে যাহারে খুশি দেয় ডাক

যেথা সেথা করে চলাফেরা ।

উছল প্রাণের চঞ্চলতা
 আপনারে নিয়ে ।
 অস্তিত্বের আনন্দ ও ব্যথা
 উঠিছে ফেনিয়ে
 জোয়ার লেগেছে জাগরণে,
 কলৌল্লাস তাই অকারণে,
 মুখরতা তাই দিকে দিকে ।
 ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়
 কী মদিরা গোপনে মাতায়,
 অধীরা করেছে ধরণীকে ।

নিভতে পৃথক কোরো নাকো
 তুমি আপনারে,
 ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখো
 কেন চারিধারে ?
 প্রাণের উল্লাস অহেতুক
 রক্তে ভব হোক না উৎসুক,
 খুলে রাখো অনিমেষ চোখ,
 ফেলো জাল চারিদিক ঘিরে
 যাহা পাও টেনে লও তীরে,
 বিহ্বলক শামুক যাই হোক ।

হয় তো বা কোনো কাজ নাই
 ওঠো তবু ওঠো,
 বৃথা হোক তবুও বৃথাই
 পথপানে ছোটো ।
 মাটির হৃদয়খানি ব্যোপে
 প্রাণের কাঁপন ওঠে কঁপে,
 কেবল পরশ তার লহ,
 আজি এই চৈত্রেয় প্রভাতে
 আছ তুমি সকলের সাথে
 এ কথাটি মনে প্রাণে কহ ॥

চতুর্কোটি

ত্রিবিধুশেখর ভট্টাচার্য

বৌদ্ধ ধর্মে প্রধানত দুইটি মধ্যম পথের কথা দেখা যায়।
নিরীকণলাভের অস্ত্র যে, অষ্ট-অলম্বক পথের (“আষ্টাঙ্গিক মার্গ”) কথা বলা হইয়াছে, ইহা প্রথম মধ্যম পথ; কারণ এক দিকে বিষয়সম্প্রাপ্তি, অত্যন্ত আসক্তি, এই এক অস্ত্র বা কোটি; আর অস্ত্র দিকে শরীরকে নিত্যন্ত ক্লেশ দিয়া তপস্যা করা, এই অপর অস্ত্র বা কোটি; এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের মধ্য অবলম্বন করিয়া ঐ পথের নির্দেশ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মধ্যম পথে পরম্পরবিরুদ্ধ কতকগুলি মত পরিহার করিয়া তাহাদের মধ্য অবলম্বন করিয়া চলিবার কথা আছে। ঐ পরম্পরবিরুদ্ধ মতগুলি এইরূপ :—অস্তি, নাস্তি; নিত্য, অনিত্য; স্থখ, দুঃখ; আত্মা, অনাত্মা; শূন্য, অশূন্য; ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় মধ্যম পথের সম্বন্ধে নাগার্জুন নিজের মূলমধ্যম ককারিকার (১৫.৭) বলিয়াছেন :—

“কাত্যাবনাব্বাদেচ অস্তি নাস্তীতি চোভয়ম্ ।
প্রতিবিদ্ধা ভগবতা ভাবাজবাবিভাবিনা ॥”

“যিনি ভাব ও অভাব উভয়কেই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন সেই ভগবান্ কাত্যাবনাব্বাদ (স্থত্রে) ‘আছে’ ও ‘নাই’ এই উভয়কেই নিবেদন করিয়াছেন।”

নাগার্জুনের এই কথার মূল কাশ্যাপ পুরি বর্ত্তে (Stāvil Halstein-সংস্কৃত, §৬০. জটব্য §§২-৩) এইরূপ দেখা যায় :—

“অতীতি কাল্পন অয়মেকোহস্তঃ, নাতীত্যয়ঃ দ্বিতীয়োহস্তঃ । যদনয়ো-
ধরোরস্তয়োঃ ধাম্ ইদমুচ্যতে কাল্পন মধ্যমা প্রতিপদ ভূতপ্রত্যবেক্ষা ॥”

“হে কাল্পন, ‘আছে’ এই এক অস্ত্র, আর ‘নাই’ এই দ্বিতীয় অস্ত্র। বাহ্য এই উভয় অস্ত্রের মধ্য, তাহাকেই মধ্যম পথ বলা হয়, ইহা দ্বারা পরমার্থের প্রত্যবেক্ষণ হয়।”

এই কথাটি পালিতেও (সংস্কৃত নিকার, PTS, ২. ১৭) পাওয়া যায় :—

“সক্কং অবীতি থো কচ্চায়াং একো অস্তো, সক্কং নবীতি অর-
হুত্তিযো অস্তো । এতত্তে কচ্চায়াং উত্তো অস্তে অম্পপসং বসিষসে
ভগবগতো ধম্মং মেসেতি ॥”

“হে কাত্যাবন, ‘সমস্ত আছে’ এই এক অস্ত্র, ‘সমস্ত নাই’

এই দ্বিতীয় অস্ত্র। হে কাত্যাবন, এই উভয় অস্ত্রেই গমন না করিয়া তথাগত মধ্য দ্বারা ধর্ম্ম দেখনা করেন।”

নাগার্জুন যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহা এই দ্বিতীয় মধ্যম পথে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে মধ্যমক; এবং এই মত অনুসরণ করিয়া চলেন বলিয়া তাহার অনুগামিগণ মাধ্যমিক।

মাধ্যবাচার্য নিজের সর্বদর্শন সংগ্রহে লিখিয়াছেন যে, নাগার্জুনের অনুগামিবর্গের প্রজ্ঞা মধ্যম রকমের ছিল বলিয়া তাহাদের নাম হইয়াছে মাধ্যমিক। বলাই বাহুল্য, এ ব্যাখ্যা নিত্যন্ত কল্পিত।

নাগার্জুন পূর্কোক্ত এই দুইটি অস্ত্রের সম্বন্ধে বলিয়াছেন (মূলমধ্যম ককারিকা, ৫.৮) :—

“অস্তিত্বং যে তু পশন্তি নাস্তিত্বং চারম্ভুচ্ছনঃ ।
ভাবানাং তেন পশন্তি জটব্যোপপদং শিবম্ ॥”

‘যাহারা বস্ত্রসমূহের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব দর্শন করে, তাহাদের বুদ্ধি অল্প, তাহারা বস্ত্রসমূহের দর্শনীয় যে উপশম (নিবৃত্তি), বাহ্য শিব, তাহা দর্শন করিতে পারে না।’

জ্ঞানসারসমুচ্চয় নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আছে। ইহার মূল সংস্কৃত এখনও পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী ভাষায় ইহার একখানি অনুবাদ আছে (তজুর, মদো, চ.; Cordier, III. p. 267)। ইহাতে তাহার নাম যে. যে. স্. স্. ঐওঙ্. পো. কু. ন্. ল. স্. ব্. তু. স্. প। ইহা আর্থ্য দেবের রচনা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার ২৮শ শ্লোকটি বহু বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকটি এই :—

“ন সন্ নাসন্ ন সমসন্ ন চাপ্যসুত্তরান্বকম্ ।
চতুর্কোটিবিন্দুঃ তথঃ মাধ্যমিকা বিদ্বঃ ॥”

‘মাধ্যমিকেরা জানেন যে, তথ্য হইতেছে চতুর্কোটি-বর্জিত, সেই চারটি কোটি এই—(১) সং নহে, (২) অসং নহে, (৩) সং ও অসং এই উভয় নহে, এবং (৪) সং নহে ও অসং নহে এই উভয়ও নহে।’

১। এখানে মাধ্যম ককারিকার (৪.৩০) নিম্নলিখিত পঙক্তিটি তুলনীয়—

“অস্তি নাস্তিত্বনাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ ॥”

দুই দিকে দুই অঙ্ক বা কোটি থাকায় উভাদের মধ্যবর্তীকে মধ্যম অথবা মধ্যমক বলা হইয়া থাকে, কিন্তু উল্লিখিত কারিকায় আমরা দুইটির স্থানে চারিটি কোটির কথা দেখিতে পাইতেছি। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমত দুইটি কোটি ছিল, পরে তাহাতে আর দুইটি যোগ করা হইয়াছে।

অন্তি ও নান্তি, অথবা সং ও অসং, এই শব্দগুলি পূরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবে প্রকাশ করে। এই উভয়কেই অস্বীকার করার প্রথম উল্লেখ আমরা ৯ শে শ্লোকের অন্তর্গত না স দা সী য় শ্লোকে (১০. ১২২. ১) দেখিতে পাই :—

“নাসদাসীন্ ন সদাসীন্ তদানীন্।”

‘তখন সং ছিল না, অসং ছিল না।’

ক্রমশ এই ভাব উপনিষদে দেখা গেল। যে তা শ্রুত রে (৪. ১৮) উক্ত হইয়াছে :—

“ন সন্ ন চাসহিঃ এষ কেবলঃ।”

‘সং নহে, অসংও নহে, কেবল শিব।’

নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ এই মন্তব্য বর্ণনা করিয়াছেন :—

“ন সং তন্ম নাসদ্ব্যভ্যন্ত।”

‘তাহাকে সং বলা যায় না, অসং বলা যায় না।’

বৌদ্ধ ধর্মের মূল শাস্ত্রসমূহে আমরা দুইটিমাত্র অন্তের কথা দেখিতে পাই। সমাধি রাজশ্রুত্রে (কলিকাতা, পৃ. ৩০)ঃ

“অন্তীতি নান্তীতি উভোহপি অন্তা

শুভী অন্তীতি ইমোহপি অন্তা।

তন্মা উভে অন্ত বিবর্জিয়া

মধ্যেহপি স্থানং ন করোতি পণ্ডিতঃ।”

‘অন্তি ও নান্তি এই উভয়ই অন্ত; শুভি ও অন্তি

এই উভয়ও অন্ত। অতএব পণ্ডিত জন উভয় অন্ত বর্জন করিয়া (তাহাদের) মধ্যে অবস্থান করেন না।

“অন্তীতি নান্তীতি বিবাদ এব

শুভী অন্তীতি অঃ বিবাদঃ।

বিবাদপ্রাপ্ত্যা ন দুঃখ প্রশাম্যতে

অবিবাদপ্রাপ্ত্যা চ দুঃখঃ নিরূপ্যতে।”

‘অন্তি ও নান্তি ইহা বিবাদ; শুভি ও অন্তি ইহাও বিবাদ; বিবাদে গেলে দুঃখ প্রশান্ত হয় না, অবিবাদে না গেলেই দুঃখ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।’

এখানে একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। এই উক্ত জ্যোতিষ দুইটির প্রথমটিতে বলা হইয়াছে যে, পণ্ডিতেরা উভয় অন্তের যে মধ্য, তাহাতেও অবস্থান করেন না। ইহাতে বুঝা যায়, উভয়ের মধ্য একটি অন্ত নহে। কিন্তু, মনে হয়, যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য মৈত্রেয় নাথ এই মধ্যকেও অন্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ তিনি নিজের একখানি অতি উপদেশ গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন মধ্যান্ত বিভজ্যজ্ঞঃ।^৫ এখানে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, মাধ্যমিকদের জ্ঞান যোগাচার সম্প্রদায়ও মধ্যম পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, যদিও ইহার মাধ্যমিক নামে পরিচিত নহেন।^৬

বস্তুর দুইটি অন্ত প্রসিদ্ধ, কিন্তু ক্রমশ আরও একটি অন্তের আলোচনা আরম্ভ হইল। আমরা মহোপনিষদে (পৃ. ৩৭২) দেখিতে পাই :—

“ন সন্ নাসন্ ন সদসন্।”

‘সং নহে, অসং নহে, সং ও অসং এই উভয়ও নহে।’

পরব্রহ্মোপনিষদে (পৃ. ৪৫৭)^৭ আছে :—

“ন সন্ নাসন্ ন সদসন্

ভিন্নাভিন্নং ন চোত্তরম্।”

৫। ইহার চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ আছে। কিন্তু মূল সংস্কৃত এখনও পাওয়া যায় নাই। বহু বস্তু ইহার একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহারও মূল সংস্কৃত পাওয়া যায় নাই, তবে তিব্বতী অনুবাদ আছে। হিরমতি আবার এই ভাষ্যের একখানি টীকা লিখিয়াছেন। এই টীকারও তিব্বতী অনুবাদ আছে। ইহার মূল সংস্কৃতের একখানি যাত্র পুঁথি বেঙ্গালের রাজগুরু জি হেম রাজ জর্জার নিকটে আছে। ইহা নানাবাহনে বণ্ডিত। ইহারই প্রতিগিণি লইয়া মূল, ভাষ্য ও টীকার তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে রোমক পণ্ডিত জ্যাকুজি. ডুভি ও বর্জমান লেখক টীকাখানির প্রথম অধ্যায় সংকলন করিয়াছেন (Calcutta Oriental Series)। ইহাতে মূল মধ্যান্ত বিভজ্যজ্ঞের পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

৬। ঐষ্ট্য মধ্যমক বৃত্তি, পৃ. ২৭৪।

৭। ঐষ্ট্য টিঙ্গনী ৩।

২। সেই স্থানেই (২) তুলনীয় :—

“ন স্তুরাসীদবুদ্ধং ন তর্জি।”

‘তখন স্তুরা ছিল না, অমৃত (অদম্য) ছিল না।’

৩। জট্টাঙ্গী ত্তুরাশ্রুতপনিষৎ (ত্রিপাঠবিভূতি-মহাভাষ্যে পণিষৎ), নির্ণয় সাগর, ১৯১৭, পৃ. ৩০৮ :—

“কসেব সরস্বতীলক্ষণঃ।”

‘তুমিই সং ও অসং হইতে জিন্ন।’

৪। মূল মধ্যমক বৃত্তির (চন্দ্রকীর্তি-রচিত প্রসঙ্গপদ্যর, Bibliotheca Buddhica) ১৩৫ তম পৃষ্ঠায় এই শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

নহে, অসৎ নহে, সৎ ও অসৎ এই উভয়ও নহে; ভিন্ন
হে, অভিন্ন নহে, ভিন্ন ও অভিন্ন এই উভয়ও নহে।'

বৌদ্ধগানেও এই তিন অঙ্ক বা কোটির আলোচনা দেখা
যায়। সঙ্কল্প পুণ্ডরীকে (২.৬৫, পৃ. ৪৮) আছে :—

“বিলম্ব দৃষ্টিগহনেন্ নিত্যম্
অন্ত্যন্তি নান্ত্যন্তি তথান্তি নান্তি।”

শান্তি, নান্তি, ও অস্তি-নান্তি এইমত রূপ গহনে বিলয়।'

লঙ্কাবতারে (ত্রাঞ্জি ও, ১২২৩, পৃ. ১৫৬) দেখা
যায় :—

“অসন্ ন জায়তে লোকে। ন সন্ ন সদসন্ কচিং।
প্রত্যয়ৈঃ কার্ষৈশ্চাপি যথা বাসেবিকল্পাতে ॥
ন সন্ নাসন্ ন সদসন্ বদ। লোকং প্রপশ্যতি।
তদা বাবর্ত্ততে চিত্তং নৈরাশ্র্যং চাধিগচ্ছতি।”

‘বালকেরা যেমন কল্পনা করে, বস্তুর সেইরূপ মূল কারণ
সহকারী কারণে সৎ-স্বরূপ, অসৎ-স্বরূপ, বা সদসৎ-স্বরূপ
এই লোক উৎপন্ন হয় না। কেহ যখন (এই) লোককে
যে যে, ইহা সৎ নহে, অসৎ নহে, এবং সদসৎ নহে, তখন
হার চিত্ত নিবৃত্ত হয়, সে নৈরাশ্র্য অধিগত হয়।’

নিম্নলিখিত কারিকাটি নাগার্জুনের, ইহা তাঁহার
৫৫ কাতী তত্ত্ব বে (১৩) ও অচিন্ত্য তত্ত্ব বে (২) আছে :—

“ন সমুৎপদ্যতে ভাবো নাপাসন্ সদসন্ চ।
ন যন্তো নাপি পরতো ন দাত্যো জায়তে কখন্ ॥” ৮

‘সৎ বস্তু উৎপন্ন হয় না, অসৎও উৎপন্ন হয় না, সদসৎও
উৎপন্ন হয় না। আবার বস্তু নিজ হইতে উৎপন্ন হয় না, অন্য
তেও হয় না, এবং ইহাদের দুইটি হইতেও হয় না। অতএব
রূপে ইহা উৎপন্ন হয় ?

আর্য দেব এক স্থানে (চতুঃশতক, ১৬. ২৫)
দেখাছেন :—

“সদসৎ সমসন্ধ্যাপি বদ্য পক্ষো ন ক্রিয়তে।
উপালম্ব্যন্তিরপ্যপি তস্য কর্ত্বুঃ ন শক্যতে ॥”

‘সাঁহার নিকটে সৎ, অসৎ, ও সৎ-অসৎ বলিয়া কোনো

পক্ষ নাই, দীর্ঘকালেও তাহার তিরস্কার করিতে পারা
যায় না।’

পূর্বে যাহা বলা হইল তাহা দ্বারা ইহা মনে করিতে
পারা যায় না যে, লঙ্কাবতারে, নাগার্জুন, বা আর্য
দেবের সময়ে চতুর্কোটি বা চারিটি অঙ্কের আলোচনা
আরম্ভ হয় নাই, কারণ উল্লিখিত গ্রন্থ কল্পানির প্রত্যেকটিতেই
তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। লঙ্কাবতারে (পৃ. ১২২,
১৫২) চতুর্কোটি কাশ্যকটিরই বহুবার প্রয়োগ আছে,
উহার অর্থ চতুর্কোটি-বিষয়ক পদ্ধতি। মূলমধ্যমক-
কারিকা, ২২. ১১, ও চতুঃশতক, ৮. ২০, ১৪. ২১
দ্রষ্টব্য।

এইরূপে বুঝা যাইবে যে, যদিও এই সময়ে ত্রিকোটি ও
চতুর্কোটির চিন্তা উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং প্রয়োজনানুসারে
যে-কোনোটি প্রয়োগ করা হইত, তথাপি সাধারণত দ্বিকোটিরই
প্রথম স্থান ছিল।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রথমত দ্বিকোটির চিন্তা
বেদে পাওয়া যায়। বৃহদেব ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।
চতুর্কোটির প্রথম প্রবর্ত্তক তিনি বা তাঁহার সাক্ষ্য অল্পগামি-
গণ নহেন। সাম্যত্রয়কলসুত্র (দীর্ঘনির্কায়, ২.৩২)
অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধগণের মতে ছয় ‘বিধর্মী’
আচার্যের মধ্যে অন্ততম বেলটুটিপুত্র সঞ্জয় কেই
প্রথমে এই মত প্রচার করিতে দেখা যায়। ইহার মতের
দ্বারা জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই বিশেষরূপে প্রভাবিত
হইয়াছিলেন।

জৈনগণের স্যাদাদ অথবা সপ্তভগ্নান্নয় প্রথমত
‘অস্তি’ ও ‘নান্তি’ এই দুইটি মাত্র ভদ্রী অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত
হইয়াছিল, পরবর্ত্তী আর পাচটি ভদ্রী পরে যোজিত হইয়াছে,
ইহাই মনে হয়। এই দুই কোটির সম্বন্ধে এখানে বিশেষ
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জৈন ধর্মে বা দর্শনে উহা বিধি-
রূপে (affirmation), কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে বা দর্শনে তাহা নিবেদ-
রূপে (negation) গৃহীত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে ইহাই
ভেদ।

দৃষ্টি-প্রদীপ

ত্রিবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্যাঠামশাইদের বাড়ির শালগ্রামশিলার ওপর আমার ভক্তি ছিল না। ওদের জাঁকজমক ও পূজার সময়কার আড়ম্বরের ঘটা দেখে মন আরও বিরূপ হয়ে উঠল। আগেই বলেছি আমার মনে হ'ত ওদের এই পূজা-অর্চনার ঘটার মূলে রয়েছে বৈষম্যিক উন্নতির জন্তে ঠাকুরের প্রাতি কৃতজ্ঞতা দেখান ও ভবিষ্যতে যাতে আরও টাকাকড়ি বাড়ি দেউদ্ধেশে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান। তাঁকে প্রসন্ন রাখলেই এদের আয় বাড়বে, দেশের খাতির বাড়বে—আমার জ্যাঠাইমাকে সবাই বলবে ভাল, সংসারের লক্ষী, ভাগ্যবতী—জীর পরেতে এ-সব হচ্ছে, সবাই খোশামোদ করবে, মন জুগিয়ে চলবে। পাশা-পাশি অম্মনি আমার মায়ের ছবি মনে আসে। মা কোন্ গুণে জ্যাঠাইমার চেয়ে কম? মাকে চা-বাগানে দেখেছি কল্যাণী মৃতিতে—লোকজনকে খাওয়ানো-মাখানো, কুলীদের ছেলে-মেয়েদের পুঁতির মালা কিনে দেওয়া, আদরবশত করা, আমাদের একটু অস্থখে রাত বেগে বিছানায় বলে থাকা। কাছাকাছি কোনো চা-বাগানের বাড়ালীবাবু পোনামায় নেমে যখন বাগানে বেত, আমাদের বাসায় না-থেকে যাবার উপায় ছিল না। আর সেই মা এখানে এদের সংসারে দাসী, পরণে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কাজ পারলে স্বখ্যাতি নেই, না পারলে বকুনি আছে, গালাগাল আছে—সবাই হেনস্থা করে, কারও কাছে এতটুকু মান নেই, মাথা তুলে বেড়াবার মুখ নেই। কেন, ঠাকুরকে মূল দিতে পারেন না বলে? আমার মনে হ'ত জ্যাঠাই-মাদের শালগ্রামশিলা এই বড়বস্ত্রের মধ্যে আছেন, তিনি বোড়শোপচারে পূজা পেয়ে জ্যাঠাইমাকে বড় ক'রে দিয়েছেন, অস্ত্র সকলের ওপর জ্যাঠাইমা যে অত্যাচার অবিচার করছেন, তা চেয়েও দেখছেন না ঠাকুর।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর ঘরে আরতি শুরু হয়েছে; নক, সীতা, সেজকাবার ছেলে পুতিন আর আমি দেখতে গেছি।

পুরুতঠাকুর ওদের সবাই হাতে একটা ক'রে রূপোবাধানো চামর দিলে—আরতির সময় তারা চামর ঢুলুতে লাগল। আমার ও সীতার হাতে দিলে না। সীতা চাইতে গেল, তাও দিলে না। একটু পরে ধূপ ধূনোর ধোঁয়ায় ও হৃগন্ধে দালান ভরে গিয়েছে, বুলু ও ফেশী কাঁসর বাজাচ্ছে, পুরুত-ঠাকুরের ছোট ভাই রাম ঘড়ি পিটিচে পুরুতঠাকুর তব্বার হয়ে পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের বাতি জেলে আরতি করতে—আমি ও সীতা ছিটের দোলাইমোড়া ঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে আছি—এমন সময় আমার মনে হ'ল এ-দালানে শুধু আমরা। এই ক'জন উপস্থিত নেই, আরও অনেক লোক উপস্থিত আছে, তাদের দেখা বাড়ে না, তারা সবাই অদৃশ্য। আমার গা ঘুরতে লাগল, আর কানের পেছনে মাথাব মধ্যে একটা জায়গায় যেন কতকগুলো পিঁপড়ে বাসা ভেঙে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। আমি জানি, এ আমার চেনা জানা, বহুপরিচিত লক্ষণ, অদৃশ্য কিছু দেখবার আগেকার অবস্থা—চা-বাগানে এ-রকম কতবার হয়েছে। শরীরে মধ্যে কেমন একটা অস্থিতি হয়—সে ঠিক বলে বোঝাতে যায় না, জ্বর আসবার আগে যেমন লোকে বুঝতে পারে এইবার জ্বর আসবে, এও ঠিক তেমনি। আমি সীতাকে কি বলতে গেলাম, পিছু হঠে গিয়ে দালানের থাম ঠেস দি দাঁড়লাম, গা বমি-বমি ক'রে উঠলে লোকে যেমন সে ভাবা কাটাবার চেষ্টা করে, আমিও—সেই রকম স্বাভাবিক অবস্থা থাকবার জন্তে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম—কিছুতেই কি হ'ল না, ধীরে ধীরে পূজার দালানের তিন ধারের দেওয়া আমার সামনে থেকে অনেক দূরে...অনেক দূরে সরে যেতে লাগল...কাঁসর ঘড়ির আওয়াজ ক্রীণ হয়ে এল...কতকগুলো বেগুনী ও রাঙা রঙের আলোর ঢাকা যেন একটা অ একটার পিছনে তাড়া করেছে...সারি সারি বেগুনী রাঙা আলোর ঢাকা খুব লম্বা সারি আমার চোখে সামনে দিয়ে গেলে বাচ্ছে...তারপর আমার ঝাঁ

অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বড় নদী, ওপারেও হৃদয় গাহপাল। নীল আকাশ...এপারেও অনেক বোপ বন...কিন্তু ঘেন ঘেন হ'ল সব জিনিষটা আমি বাড়-লঠনের তেঁকেণা কাচ দিবে দেখছি...নানা রঙের গাহপাল, নদীর জলের ঢেউের নানা রং...ওপারটা লোকজনে ভরা, যেহেও আছে, পুরুষও আছে...গাহপালার মধ্যে দিয়ে একটা মন্দিরের সড় চুড়ে ঠেলে আকাশে উঠেছে...আর ফুল যে কত রঙের আর কত চমৎকার তা মুখে বলতে পারিনে, গাছের সারা গুড়ি ভরে যেন রঙীন ও উজ্জল থোকা থোকা ফুল...হঠাৎ সেই নদীর এক পাশে জলের ওপর ভাসমান অবস্থায় জ্যাঠামশাইদের ঠাকুর-ঘরটা একটু একটু ফুটে উঠল তার চারিদিকে নদী, কড়ি কাঠের কাছে কাছে সে নদীর ধারের ডাল তার থোকা থোকা ফুলহক হাওয়ার হুলচে...ওদের সেই বেশটা যেন আমাদের ঠাকুর-ঘরের চারি পাশ ঘিরে...মধ্যে, ওপরে, নীচে, ভাইনে, বাঁয়ে আমার মন আনন্দে ভরে গেল...কাল আসতে চাইল...কি জানি কোন্ ঠাকুরের ওপর ভক্তিতে...আমার ঘোর কটিল একটা টেসা-ঘেচির শব্দে। আমার সবাই মিলে ঠেলে। সীতা আমার ডান হাত কোব করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে...পুরুতঠাকুর ও পুলিন বেগে আমার কি বলচে...চোখে দেখি আমি ভোগের লুটির থালার অভ্যস্ত কাছে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি...আমার কৌচা লুট্টে উঠু করে সাজানো ফুলকা লুটির রাশির ওপরে। তারপর যা ঘটল! পুরুতঠাকুর গালে চার-পাঁচটা চড় কসিয়ে দিলেন...মেজকাঁকা এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কেতে বললেন। জ্যাঠাইমা এসে নক-পুলিনদের ওপর আঙন হয়ে বলতে লাগলেন সবাই জানে আমি পাগল, আমার মাথার রোগ আছে, আমার তারা কেন ঠাকুরদালানে নিয়ে গিয়েছিল আরতির সময়।...

মেজকাঁকার মারের ভরে অধীকার রাত্রে জ্যাঠামশায়ের খিড়কীপুকুরের মাদার-তলায় একা এসে দাঁড়ালাম। সীতা গোলমালে টের পাননি আমি কোথায় গিয়েছি। আমার পা কাঁপছিল ভয়ে...এ আমার কি হ'ল? আমার এমন হয় কেন? এ কি খুব শক্ত ব্যারাম? ঠাকুরের ভোগ আমি ত ইচ্ছে করে ছুইনি? তবে ওরা বুঝলে না কেন? এখন আমি কি করি?

আমি হিন্দু দেবদেবী জানতাম না, সে-শিক্ষা আমাদের কাছে নেই। কিন্তু মিশনরী মেয়েদের কাছে জান হওয়া পর্যন্ত বা শিখে এসেছি, সেই শিক্ষা অল্পসারে অন্ধকারে মাদারগাছের গুড়ির কাছে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে যেন যেন বললাম—হে প্রভু বিত্ত, হে সর্বাশ্রিত, তুমি জান আমি নির্দোষ—আমি ইচ্ছে করে করিনি কিছু, তুমি আমার এই রোগ সারিয়ে দাও, আমার যেন এ-রকম আর কখনও না হয়। তোমার জয় হোক, তোমার রাজত্ব আমুক, আমেন।

২

সকালে স্নান করে এসে দেখি সীতা আমাদের ঘরের বারান্দাতে এক কোণে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে পড়ছে। আমি কাছে গিয়ে বললাম—দেখি কি পড়ছিল সীতা? সীতা এমন একমনে বই পড়ছে যে বই থেকে চোখ না তুলেই বললে—ও-পাড়ার বৌদিদির কাছ থেকে এনেছি—প্রফুল্লবালা—গোড়াটা একটু পড়ে দ্যাখো কেমন চমৎকার বই দাদা—

আমি বইখানা হাতে নিয়ে দেখলাম, নামটা 'প্রফুল্লবালা' বটে। আমি বই পড়তে ভালবাসিনে, বইখানা ওর হাতে ফেরৎ দিয়ে বললাম—তুই এত বাজে বইও পড়তে পারিস!

সীতা বললে—বাজে বই নয় দাদা, পড়ে দেখো এখন। জমিদারের ছেলে সতীশের সঙ্গে এক গরিব ভট্টাচার্য বামুনের মেয়ে প্রফুল্লবালার দেখা হয়েছে। ওদের বোধ হয় বিয়ে হবে।

সীতা দেখতে ভাল বটে, কিন্তু যেমন সাধারণতঃ ভাইয়েরা বোনদের চেয়ে দেখতে ভাল হয়, আমাদের বেলাতেও তাই হয়েছে। আমাদের মধ্যে দাদা সকলের চেয়ে সুন্দর—যেমন রং, তেমনই চোখমুখ, তেমনই চুল—তারপর সীতা, তারপর আমি। দাদা যে হৃদয়, এ-কথা শব্দভেদেও বীকার করে—সে আগে থেকে ভাল চোখ, ভাল মুখ, ভাল রং দখল করে বসেছে—আমার ও সীতার অস্ত্রে বিশেষ কিছু রাখেনি। তা হলেও সীতা দেখতে ভাল। তা ছাড়া সীতা আমার সৌখীন—সরস। তবে মেজে, খোঁপাটি বেঁধে, টিপটি প'রে বেড়ান তার বভাব। কথা বলতে বলতে দশ বার খোঁপার হাত দিয়ে মেখে খোঁপা ঠিক আছে কিনা। এ নিয়ে এ-বাড়িতে তাকে কম কথা লজ করতে হয়নি। কিন্তু সীতা বিশেষ কিছু গায়ে

মাঝে না, কাকর কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—চিরকালের একপুঁরে বজাব তার।

আমার মনে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, আমাদের তো পয়সা নেই, সীতাকে তেমন ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারব না—এই সব পাড়াগাঁয়ে আমার জ্যাঠামশায়দের মত বাড়িতে, আমার জ্যাঠাইয়ার মত শান্তভীর হাতে পড়বে—কি দুর্দশাটাই যে ওর হবে! ওর এত বইপড়ার ঝোঁক যে, এ-পাড়ার ও-পাড়ার বৌবিয়েদের বাস্তব ঘট বই আছে চেয়ে-চিন্তে এনে এ-সংসারের কঠিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব পড়ে ফেলে দিয়েছে। জ্যাঠাইমা তো এমনিই বলেন, “ও-সব অলুফুণে কাণ্ড বাপু—মেয়েমানুষের আবার অত বই পড়ার লখ, অত লাজগোজের ঘটা কেন? পড়বে তেমন শান্তভীর হাতে, ঝাঁটার আগায় বই পড়া ঘুচিয়ে দেবে ভিন দিনে।”

সীতার বুদ্ধি খুব। ‘শতগল্প’ বলে একখানা বই ও কোথা থেকে এনেছিল, তাতে ‘সোনামুখী ও ছাইমুখী’ বলে একটা গল্প আছে, সংসার সংসারে গুণবতী লক্ষ্মীমেয়ে সোনামুখী ঝাঁটা লাগি খেয়ে মানুষ হ’ত—তারপর কোন্ দেশের রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল ভগবানের দয়ায়—সীতা দেখি গল্পটার পাতা মুড়ে রেখেছে। ও-গল্পটার সঙ্গে ওর জীবনের মিল আছে, এই হয়ত ভেবেচে। কিন্তু সীতা একটা কথাও মুখ ফুটে বলে না কোনো দিন। ভাবি চাপা।

সীতা বই থেকে চোখ তুলে পথের দিকে চেয়ে বললে—ঐ হীরাঠাকুর আসচে দাদা আমি পালাই—

আমি বললাম—“বোস, হীরাঠাকুর কিছু বলবে না। ও ঠিক আজ এখানে থাকার কথা বলবে দ্যাখ।”

হীরাঠাকুরকে এ-গাঁয়ে আসা পর্যন্ত দেখছি। রোগা-কালো চেহারা, খোঁচা খোঁচা একমুখ কাঁচ-পাকা নাড়ি, পরনে থাকে আধময়লা খান, খালি পা, কাঁধে ময়লা চাদর, তার ওপরে একখানা ময়লা গামছা ফেলা। নিজের ঘরদোর নেই, লোকের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ানো তার ব্যবসা। আমরা যখন এখানে নতুন এলাম, তখন কত দিন হীরাঠাকুর এসে আমাদের কাছে, “তোমার মাকে বল খোকা, আমি এখানে আজ দুটো থাকবো।” মাকে বলতেই তখনুি তিনি রাজী হতেন—যা চিরকাল এমন ছিলেন না, লোককে ধাক্কাতে-মাখাতে চিরদিনই তিনি ভালবাসতেন।

সীতার কথাই ঠিক হ’ল। হীরাঠাকুর এসে বললে—“শো খোকা, তোমার মাকে বলো আমি এখানে আজ দুপুঁরে চাটী ভাত খাবো।” সীতা বই মুখে দিয়ে খিল খিল করে হেসেই খুন। আমি বললাম, “হীরা-জ্যাঠা, আজকাল তো আমরা আলাদা খাইনে? জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে খাই বাবা মারা গিয়ে পর্যন্ত। আপনি সেজকাকাকে বলুন গিয়ে। সেজকাকা কাঁটালতলায় নাপিতের কাছে নাড়ি কামাচ্ছেন।”

সেজকাকা লোক ভাল। হীরাঠাকুর আসার পেয়ে আমাদেরই ঘরের বারান্দার বসল। সীতা উঠে একটা কদল পেতে দিলে। হীরাঠাকুর বললে, “তোমার দাদা কোথায়?” দাদার সঙ্গে ওর বড় ভাব। হীরাঠাকুরের গল্প দাদা শুনে ভালবাসে, হীরাঠাকুরের কষ্ট দেখে দাদার দুঃখ খুব, হীরাঠাকুর না খেতে পেলে দাদা বাড়ি থেকে চাল চুরি করে দিয়ে আসে। এখানে যখন খেতে আসত, তখনি প্রথম দাদার সঙ্গে ওর আলাপ হয়, এই বারান্দায় বসেই। হীরাঠাকুরের কেউ নেই—একটা ছেলে ছিল, সে না-কি আজ অনেকদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। হীরাঠাকুরের এখনও বিশ্বাস, ছেলে এক দিন ফিরে আসবেই এবং অনেক টাকাকড়ি আনবে, তখন তার দুঃখ ঘুচবে। দাদা হীরাঠাকুর ওই সব গল্প মন দিয়ে বসে বসে শোনে। অমন প্রোতা এ-গাঁয়ে বোধ হয় হীরাঠাকুর আর কখনও পায়নি।

খেতে বসে হীরাঠাকুর এক মহা গোলমাল বাধিয়ে বসল। জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ে সরিকে ডেকে বললে, (হীরা কাকুর নাম মনে রাখতে পারে না) “খুকী শোনে, বাড়ির মধ্যে জিগ্যেস কর তো ডালের বাটীতে তাঁরা কি কিছু মিশিয়ে দিয়েছেন? আমার গা যেন ঘুরচে।” সবাই জানে হীরাঠাকুরের মাথা ধারাপ, সে ও-রকম একবার আমাদের বাড়ি খেতে বসেও বলেছিল, কিন্তু বাড়িহুত্ব মেয়েরা বেজার চটল এতে। চটবারই কথা। জ্যাঠাইমা বললেন—“সেজঠাকুরপোর খেয়ে-মেয়ে তো আর কাজ নেই, ও আপন মাসের মধ্যে দশ দিন আসে এখানে খেতে। তার ওপর আবার বলে কি-না ডালে বিব মাখিয়ে দিইচি আমরা। আ মরল বড়ুইপোড়া বামুন, তোক বিব খাইয়ে মেয়ে কি তোর লাখো টাকা’র ভালুক হাত করব? আজ থেকে বলে দাও সেজঠাকুরপো, এ-বাড়ির ঘোর বন্ধ হয়ে গেল, কোনো দিন সন্দের জোঁকাই মাড়লে ঝাঁটা মেয়ে তাড়াবে।”

হীক তখন খাওয়া শেষ করেছিল। জ্যাঠাইমার গালাগালি শুনে মুখখানা কাঁচুমাচু করে উঠে গেল। দাদা এ-সময় বাড়ি ছিল না—আমাদের মুখে এরপর শুনে বললে—আহা, ও পাগল, ছেলের শোকে পাগল হয়েছে। ও কি বলে না-বলে তা কি ধরতে আছে? ছিঃ, খাবার সময় জ্যাঠাইমার গালমন্দ করা ভাল হয়নি। আহা!

সীতা বললে, “গালাগাল দেওয়া ভাল হয়নি কেন, খুব ভাল হয়েছে। খামোকা বলবে যে বিব মিশিয়ে দিয়েচে? লোক কি মনে করবে?”

দাদা আর কিছু বললে না, চুপ করে রইল। সে কাকর সঙ্গে ভর্ক করতে পারে না, সীতার সঙ্গে তো নয়ই। একবার কেবল আমার জিগেস করলে, “হীকজ্যাঠা কোন্ দিকে গেল রে নিতু?” আমি বললাম আমি জানিনে।

এর মাস দুই তিন পরে, মাঘ মাসের শেষ, বিকেল বেলা। আমাদের ঘরের সামনে একটুখানি পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে খুলের অঙ্ক কবচি—এমন সময় দেখি হীকঠাকুরকে সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ঘরে নিয়ে আসছে দাদা। হীকঠাকুরের চেহারা শীর্ণ, মাথার চুল আরও উসকোখুসকো, মুখ প্যাডাস্—জ্বরে যেমনি কাঁপচে, তেমনি কাশচে। শুন্লাম আজ না-কি চার-পাঁচ দিন অস্থব্ধ অবস্থায় আমাদেরই পাড়ায় ভটচাষীদের পূজোর দালানে শুয়েছিল। অল্পবেশে কাশ-খুঁকে ঘর অপরিস্কার করে দেখে তারা এই অবস্থায় বলেচে সেখানে জায়গা হবে না। হীকঠাকুর চলতে পারে না, যেমন দুর্বল, তেমনি জ্বর আর সে কি ভয়ানক কাশি! কোথায় যায়, তাই দাদা তাকে নিয়ে এসেচে জ্যাঠামশায়দের বাড়ি। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। দাদার কি এতটুকু বুদ্ধি সেননি ভগবান! এটা কি নিজের বাড়ি যে এখানে যা খুশী করা চলবে? কোন্ ভরসায় দাদা ওকে এখানে নিয়ে এল দ্যাখো তো?

যা ভয় করেছি, তাই হল। হীককে অস্থব্ধ গায়ে হাত ধরে বাড়িতে এনেচে দাদা, একথা বিজ্ঞাৎসে বাড়ির মধ্যে প্রচার হয়ে যেতেই আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনেরা সব মজা দেখতে বাইরের উঠানে ছুটে এল, সেজ-কাকা এসে বললেন—“না না—এখানে কে নিয়ে এল ওকে? এখানে জায়গা কোথায় যে রাখা হবে?” কিন্তু ততক্ষণ

জ্যাঠামশায়দের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় হীক শুয়ে ধুঁকচে, দাদা চণ্ডীমণ্ডপের পুরোনো সপটা তাকে পেতে দিয়েচে। তখনি একটা ও-অবস্থার রোগীকে কোথায় বা সরানো যায়? বাধ্য হয়ে তখনকার মত জায়গা দিতেই হ'ল।

কিন্তু এর জন্তে কি অপমানটাই সহ্য করতে হ'ল দাদাকে। এই জন্তেই বলচি মিনটা কখনো তুলবো না। দাদাকে আমরা সবাই ভালবাসি, আমি সীতা দু-জনেই। আমরা জানি সে বোকা, তার বুদ্ধি নেই, সে এখনও আমাদের চেয়েও ছেলেমানুষ, সংসারের ভালমন্দ সে কিছু বোঝে না, তাকে বাঁচিয়ে আড়াল করে বেড়িয়ে আমরা চলি। দাদাকে কেউ একটু বকলে আমরা সহ্য করতে পারিনে, আর সেই দাদাকে বাড়ির মধ্যে ভেঙে নিয়ে গিয়ে প্রথমে সেজকাকা আখালিপাখালি চড়াপাড়া মারলেন। বললেন, “বুড়ো ধাড়ী কোথাকার, ওই হীপকানের রুগী বাড়ি নিয়ে এলে তুমি কার হুকুমে? তোমার বাবার বাড়ি এটা? এতটুকু জ্ঞান হয়নি তোমার? সাহসও তো বলিহারি, জিগেস না বাদ না কাউকে, একটা কঠিন রুগী বাড়ি নিয়ে এসে তুললে কোন্ সাহসে? নবাব হয়েচ না দ্বিধী হয়েচ? না এটা তোমার চা-বাগান পেয়েচ?”

এর চেয়েও বেশী কষ্ট হ'ল যখন জ্যাঠাইমা অনেক গালি-গালাজের পর রোষাকৈ দাঁড়িয়ে হুকুম জারি করলেন, “যাও, রুগী ছুঁয়ে ঘরে দোরের উঠতে পাবে না, পুকুর থেকে গায়ের ও-কোটবুট ডুব দিয়ে এস গিয়ে।”

মাঘ মাসের শীতের সন্ধ্যা আর সেই কনকনে ঠাণ্ডা পুকুরের জল—তার ওপর চা-বাগানের আমলের ওই ছেঁড়া গরম কোটটা ছাড়া দাদার গায়ে দেবার আর কিছু নেই, দাদা গায়ে দেবে কি নেয়ে উঠে? সীতা ছুটে গিয়ে শুকনো কাপড় নিয়ে এসে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। মাও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি ভালমানুষ, দাদাকে একটা কথাও বললেন না, কেবল ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে জল থেকে সে যখন উঠে এল, তখন নিজের হাতে গামছা দিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিলেন, সীতা শুকনো কাপড় এগিয়ে দিলে, আমি গায়ের কোটটা খুলে পরতে দিলাম। রাজে যা সাবু করে দিলেন আমাদের ঘরের উঠানে—দাদা গিয়ে হীক-ঠাকুরকে খাইয়ে এল।

সকালবেলা সেজকাকা ও জ্যাঠামশাই দস্তদের কাঁটাল-বাগানের খারে পোড়ে জমিতে বাড়ির কৃষাণকে দিয়ে খেজুর-পাতার একটা কুঁড়ে বাঁধলেন এবং লোকজন ডাকিয়ে হীককে ধরাধরি করে সেখানে নিয়ে গেলেন। দাদা চুপি চুপি একবাটি সাবু মার কাছ থেকে ক'রে নিয়ে দিয়ে এল। দিন দুই এই অবস্থায় কাটলো। মুখুন্ডে-বাড়ির বড়মেয়ে নলিনীদি রাত্রে এক বাটি বালি দিয়ে আসতো আর সকালবেলা বাবার সময় বাটটি ফিরিয়ে নিয়ে যেত। একদিন রাতে দাদা বললে—“চল্ নিতু, আজ হীকজ্যাঠার ওখানে রাতে থাকবি? রামগতি-কাকা দেখে বলেচে অবস্থা খারাপ। চল্ আগুন জালাবো এপন, বড় শীত নইলে।”

রাত দশটার পর আমি ও দাদা দু-জনে গেলাম। আমরা যাওয়ার পর নলিনীদি সাবু নিয়ে এল। বললে, “কি রকম আছে রে হীক-কাকা?” তারপর সে চলে গেল। নারকোলের মালা দু-ভিনটে শিয়রের কাছে পাতা, তাতে কাশখু ফেলেচে রুগী। আমার গা কেমন বমি-বমি করতে লাগল। আর কি কনুনে ঠাণ্ডা! খেজুরের পাতার ঝাঁপে কি মাঘ মাসের শীত আটকাই? দস্তদের কাঁটালবাগান থেকে শুকনো কাঁটালপাতা নিয়ে এসে দাদা আগুন জ্বাললে। একটু পরে দু-জনই ঘুমিয়ে পড়লাম। কত রাত্রে জানি না, আমার মনে হ'ল হীকজ্যাঠা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হীক-জ্যাঠা আর কাশচে না, তার রোগ যেন সেরে গিয়েচে! আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, “নিতু বললে, আমি বাঁশবেড়ে যাচ্ছি গদা নইতে। আমার বড় কষ্ট দিয়েছে হরিবল্লভ (আমার জ্যাঠামশাই), আমি বলে যাচ্ছি, নির্বংশ হবে, নির্বংশ হবে। তোমরা বাড়ি গিরে শোওগে যাও।”

আমার গা শিউরে উঠলো—এত স্পষ্ট কথাগুলো কানে গেল, এত স্পষ্ট হীকজ্যাঠাকে দেখলাম যে বুকে উঠতে পারলাম না প্রত্যক দেখছি, না স্বপ্ন দেখছি। ঘুম কিছু ভেঙে গিয়েছিল, দাদা দেখি তখনও কুঁকড়ি হয়ে শীতে ঘুসুকে, কাঁটালপাতার আগুন নিবে জল হয়ে গিয়েচে, হীকজ্যাঠাও ঘুসুকে মনে হ'ল। বাইরে দেখি তোর হয়ে গিয়েচে।

দাদাকে উঠিয়ে নলিনীদিদির বাবা রামগতি মুখুন্ডেকে

ডাকিয়ে আনলাম। তিনি এসে দেখেই বললেন, “ও তো শেষ হয়ে গিয়েচে। কতক্ষণ হ'ল? তোরা কি রাত্রে ছিলি না-কি এখানে?”

হীকঠাকুরের মৃত্যুতে চোখের জল এক দাদা ছাড়া বোধ হয় আর কেউ ফেলেনি।

অনেক দিন পরে শুনেছিলাম, হীকঠাকুর পৈতৃক কি জমিজমা ও দুখানা আমকাঁটালের বাগান বন্ধক রেখে জ্যাঠামশায়ের কাছে কিছু টাকা ধার করে এবং শেষ পর্যন্ত হীকঠাকুর সে টাকা শোধ না করার দক্ষ জ্যাঠামশায় নালিশ ক'রে নীলামে সব বন্ধক বিষয় নিজেই কিনে রাখেন। এর পর হীকঠাকুর আপোষে কিছু টাকা দিয়ে সম্পত্তিটা ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল—জ্যাঠামশায় রাজী হননি। কেবল বলেছিলেন, ব্রাহ্মণের ভিটে আমি চাইনে—ওটা তোমায় ফিরিয়ে দিলাম। হীক তা নেয়নি, বলেছিল, সব ষে-পথে গিয়েছে, ও ভিটেও সে-পথে যাক। এর কিছুকাল পরেই তার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

৩

বিষয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের দানখান ধর্মাহুষ্ঠানও বেড়ে চলেছিল। প্রতি পূর্ণিমায় তাঁদের ঘরে সত্যনারায়ণ পূজা হয় যে তা নয় শুধু—একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিতেন বই কেনবার জন্তে; দ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে নৌকো আসে নানা জিনিষপত্রে বোকাই হয়ে—বছরের ধান, জালাভরা কইমাছ, বাজরাভরা ইসের ডিম, তিল, আকের গুড় আরও অনেক জিনিষ। প্রতি বছরই সেই নৌকার হুটি একটি হরিণ আসে। ধনধান্যপূর্ণ ভিড়া নিরাপদে দেশে পৌঁছেচে এবং তার জিনিষপত্র নির্বিঘ্নে ভাঁড়ার-ঘরে উঠল এই জানকে তাঁরা প্রতিবার দ্রাবণ মাসে পাঠা বলি দিয়ে মনসাপূজা করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওরাতেন। বৈশাখ মাসে গৃহ-দেবতা মদনমোহনের পূজার পালা পড়ল তাঁদের। জ্যাঠামশায় পরদের জোড় পরে লোকজন ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে কাঁসরকটা, ঢাকঢোল বাজিয়ে ঠাকুর নিয়ে এলেন ও-পাড়ার জ্যাতিদের বাড়ি থেকে—জ্যাঠাইমা খুড়ীমারা বাড়ির ঘরে দাঁড়িয়েছিলেন—প্রকাণ্ড পেতলের সিংহাসনে বসানো

শালগ্রাম বসে আনছিলেন জ্যাঠামশায় নিজে—তিনি বাড়ি ঢুকবার সময়ে জ্যাঠাইমা জলের খারা দিতে দিতে ঠাকুর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন—মেয়েরা শীথ বাজাতে লাগলেন, উলু দিলেন। আমি, সীতা ও দাদা আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে দেখছিলাম—অত্যন্ত কৌতূহল হলেও কাছে যেতে সাহস হ'ল না। মাকে মেয়ে পড়াতো সে-কথা ঠন্দের কানে যাওয়া থেকে মাহুঘের ধারা থেকে আমরা নেমে গিয়েছি ঠন্দের চোখে—আমরা খ্রীষ্টান, আমরা নাস্তিক, পাহাড়ী জানোয়ার—ঘরেলোর ঢুকবার যোগ্য নই। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন কত কি খাবার তৈরি হ'তে লাগল ঠাকুরের ভোগের জন্তে—ওঁরা পাড়ার ভ্রাতৃগণের নিমন্ত্রণ করে প্রায়ই খাওয়াজেন, রাত্রে শীতলের লুচি ও ফলমিষ্টান্ন পাড়ার ছেলেমেয়েদের ভেঁকে দিতে দেখেছি তবুও সীতার হাতে একথানা চন্দ্রপুলি ভেঙে আখখানিও কোনো দিন নেননি।

জ্যাঠাইমা এ সংসারের কর্তা, কারণ জ্যাঠামশাই রোজগার করেন বেশী। ফরসা মোটাসোটা, একগা গহনা, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—এই হলেন জ্যাঠাইমা। এ-বাড়িতে নববধূরূপে তিনি আসবার পর থেকেই সংসারের অবস্থা কিরৈ যায়, তার আগে এদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—তাই তিনি নিজেকে ভাবেন ভাগ্যবতী। এ-বাড়িতে তাঁর ওপর কথা বলবার ক্ষমতা নেই কারও। তাঁর বিনা হুকুমে কোনো কাজ হয় না। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে এত আম বাড়িতে, বৌদের নিয়ে খাবার ক্ষমতা নেই, যখন বলবেন খাওগে, তখন খেতে পাবে। জ্যাঠামশায়ের বড় ও মেজ ছেলে, শীতললা ও সলিলদার বিয়ে হয়েছে, যদিও তাদের বয়স খুব বেশী নয় এবং তাদের বোয়েদের বয়স আরও কম—দুই ছেলের এই দুই বৌ ও বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে আছে এক ভাগ্যেবৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে, আর আমার মা আমাদের নিয়ে—এ ছাড়া ভুবনের মা আছে, কাকীমারা আছেন—এর মধ্যে এক ছোটকাকীমা বাদে আর সব জ্যাঠাইমার সেবাদানী। ছোটকাকীমা বাদে এইজন্তে যে তিনি বড়মাহুঘের মেয়ে—তাঁর ওপর জ্যাঠাইমার প্রভুত্ব বেশী খাটে না।

প্রতিদিন খাওয়ার সময় কি নির্জঙ্ক কাণ্ডাই হয়। রোজ রোজ দেখে সন্ধ্যা গিয়েছে যদিও, তবুও এখনও চোখে কেমন ঠেকে। রান্নাঘরে একসঙ্গে ভায়ে, জামাই, ছেলেরা খেতে

বসে। ছেলেরদের পাতে জামাইয়ের পাতে বড় বড় জামবাটিতে ঘন দুধ, ভাগ্যেদের পাতে হাতা করে দুধ। মেয়েদের খাবার সময় সীতা ভাগ্যেবৌ এরা সবাই কলারের ডাল মেখে ভাত খেয়ে উঠে গেল—নিজেরদের দল, দুই বৌ, মেয়ে নলিনীদি, নিজের জন্তে বাটিতে বাটিতে দুধ আম বাতাস। নলিনীদি আবার মধু দিয়ে আমদুধ খেতে ভালবাসে—মধুর অভাব নেই, জ্যাঠামশাই প্রতি বৎসর আবাদ থেকে ছোট জালার একজালা মধু নিয়ে আসেন—নলিনীদি দুধ দিয়ে ভাত মেখেই বলবে মা আমায় একটু মধু দিতে বলো না সত্বর মাকে? কালেকজ্ঞে হয়ত জ্যাঠাইমার দম্বা হ'ল—তিনি সীতার পাতে দুটো আম দিতে বললেন কি এক হাতা দুধ দিতে বললেন—নয় তো ওরা ওই কলারের ডাল মেখে খেয়েই উঠে গেল। সীতা সে-রকম মেয়ে নয় যে মুখকুটে কোন দিন কিছু বলবে, কিন্তু সেও তো ছেলেমাহুঘ, তারও তো খাবার ইচ্ছে হয়? আমি এই কথা বলি, যদি খাবার জিনিষের বেলা কাউকে দেবে, কাউকে বঞ্চিত করবে, তবে একসঙ্গে সকলকে খেতে না বসালেই তো সবচেয়ে ভাল?

এক দিন কেবল সীতা বলছিল আমার কাছে,—দাদা, জ্যাঠাইমারা কি রকম লোক বল দিকি? মা ভাল ভাল বাটনা বাট'বে, বাসন মাজবে, রান্নার বাসি কাপড় কাচবে, কিন্তু এত ভাবের ছড়াছড়ি এ-বাড়িতে, পাছেরই তো ডাব, একাদশীর পরদিন মাকে কোনো দিন বলও না যে একটা ডাব নিয়ে যাও।

৪

আমি মুখে মুখে বানিয়ে কথা বলতে ভালবাসি। আপন মনে কখনও বাড়ির কর্তার মত কথা বলি, কখনও চাকরের মত কথা বলি। সীতাকে কত শুনিয়েছি, এক দিন মাকেও শুনিয়েছিলাম। এক দিন ও-পাড়ার মুখোজ্জ-বাড়িতে বীকর মা, কাকীমা, দিদি—এরা সব ধরে পড়ল আমাদের বানিয়ে কিছুর বলতে হবে।

ওদের রান্না-বাড়ির উত্তানে, মেয়েরা সব রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধানিকটা ভাবলাম কি বলব? সেখানে একটা বাঁশের ঘেরা পাঁচিলের গায়ে ঠেসান ছিল। সেইটের দিকে চেয়ে আমার মাথায় বুদ্ধি

এসে গেল। এই বাঁশের ঘেরাটা হবে যেন আমার দ্বী, আমি যেন চাকরি করে বাড়ি আসছি, হাতে অনেক জিনিষপত্র। ঘরে যেন সব চুকেছি, এমন ভাব করে বললাম—“ওগো কই, কোথায় গেলে, ফুলকপিগুলো নামিয়ে নাও না? ছেলেটার জর আজ কেমন আছে?” মেয়েরা সব হেসে এ গর গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

আমার উৎসাহ গেল আরও বেড়ে। আমি বিরক্তির স্বরে বললাম—“আঃ, ঐ তো তোমার দোষ। কুইনিং দেওয়া আজ খুব উচিত ছিল। তোমার দোষেই গর অস্থখ যাচ্ছে না। থেতে দিয়েছ কি?”

আমার দ্বী অপ্রতিভ হয়ে খুব নরম স্বরে কি একটা জবাব দিতেই রাগ পড়ে গেল আমার। বললাম—“ওই পুঁটুটিটা খোলো, তোমার এক জোড়া কাপড় আছে আর একটা তরল আলুতা—” মেয়েরা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। বীরুর ছোটবোদিদি মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে লাগল। আমি বললাম—“ইয়ে করো, আগে হাত-পা ধোয়ার জল দিয়ে একটু চায়ের জল চড়াও দিকি? সেই কখন ট্রেনে উঠেচি—রাহুনির চোটে আর এই দু-কোশ হেঁটে খিদে পেয়ে গিয়েচে—আর এই সঙ্গে একটু হালুয়া—কাগজের চোড়া খুলে দেখ কিমসি এনেচি কিনে, বেশ ভাল কাবুলী—”

বীরুর কাকীমা তো ডাক ছেড়ে হেসে উঠলেন। বীরুর মা বললেন—“ছোড়া পাগল! কেমন সব বলচে দেখ, মাগো মা উঃ—আর হেসে পারিনে।...”

বীরুর ছোটবোদিদির দম বন্ধ হয়ে যাবে বোধ হয় হাসতে হাসতে। বললে—“উঃ মা, আমি যাযো কোথায়! গর মনে মনে ওই সব সখ আছে, গর ইচ্ছে গর বিয়ে হয়, বৌ নিয়ে অম্মি সংসার করে—উঃ, মা রে!”

সজ্জা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমি রান্নাঘরে বসে দ্বীর সঙ্গে পল্ল করছি। রান্না এখনও শেষ হয়নি। আমি বললাম—“চিড়ি মাছটা কেমন দেখলে, খুব পচেনি তো? কালিরাটার কাল একটু বেশী করে দিও।”

বীরুর কাকীমা বললেন, “হ্যাঁ রে, তুই কি কেবলই খাওয়ারা-নাওয়ার কথা বলবি বৌয়ের সঙ্গে?” কিন্তু আমি আর কি ধরনের কথা বলব বুঝে পাইনে। ডাবলায় ধানিকন্দ, আর কি কথা বলা উচিত? আমি এই ধরনের কথাই সকলকে

বলতে শুনেচি দ্বীর কাছে। ভেবে ভেবে বললাম, “বুকের ভুলে জামাটা আনবো, কাল গর গায়ের মাপ দিও তো? আর জিগোস করো কি রং গর পছন্দ—না, না—এখন আর খুব ডাঙিয়ে জিগোস করবার দরকার নেই, ছেলেমাছ খুচ্ছে, থাক। কাল সকলেই—খুব গম্ভীর মুখে একথা বলতেই মেয়েরা আবার হেসে উঠল দেখে আমি ভারি খুশী হয়ে উঠলাম। আরও বাহাদুরী নেবার ইচ্ছায় উৎসাহের স্বরে বললাম—“আমি নেপালী নাচ জানি—চা-বাগানে নাচতো আমি দেখে দেখে শিখেচি।” মেয়েরা সবাই বলে উঠলো, “তাও জানিস না কি? বারে, তা তো তুই বলিসনি কোনো দিন? দেখি—”

“কিন্তু আর একজন লোক দরকার যে? আমার সঙ্গে আর কে আসবে? সীতা থাকলে ভাল হত। সেও জানে। আপনাদের বীণা কোথায় গেল? সে হ'লেও হয়।”

এ-কথায় মেয়েরা কেন যে এত হেসে উঠল হঠাৎ, তা আমি বুঝতে পারলাম না। বীণা বীরুর মেজবোন, আমার চেয়ে কিছু ছোট, দেখতে বেশ ভাল। সে গুথানে ছিল না তখন—একা একা নেপালী নাচ হয় না বলে বেশী বাহাদুরীটা আমার আর নেওয়া হয়নি সে-দিন।

সীতার বইপড়ার ব্যাপার নিয়ে জ্যাঠাইমা সকল সময় সীতাকে মুখ নাড়া দেন। সীতা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিটকাট থাকতে ভালবাসে, এটাও জ্যাঠাইমা বা কাকীমারা দেখতে পারেন না। সীতা চিরকাল ওই রকম থেকে এসেচে চা-বাগানে—একটি মাত্র মেয়ে, যা তাকে সব সময় লাজিয়ে-গুজিয়ে রাখতে ভালবাসতেন, কতকটা আবার গাড়ে উঠেছিল মিস্ নটনের দরশন। মিস্ নটন যাকে পড়াতে এসে নিজের হাতে সীতার চুল আঁচড়ে দিত, চুলে লাল কিত্তে বেঁধে দিত, হাত ও মুখ পরিষ্কার রাখতে শেখাত। এখানে এসে সীতার দুখানার বেশী তিনখানা কাপড় জোটেনি কোনো সময়—জামা তো নেই—ই—(জ্যাঠাইমা বলেন, মেয়েমানুষের আবার জামা গায়ে কিসের?) কিন্তু গরই মধ্যে সীতা করসা কাপড়খানি পরে থাকে, চুলটি টান টান করে বেঁধে পেছনে গোলা খোঁপা বেঁধে বেড়ায়, কপালে টিপি পরে—এ-গায়ের এক পাল অসত্য অপরিষ্কার ছেলেমানুষের মধ্যে

ওক সম্পূর্ণ অস্ত্র রকমের দেখায়, যে-কেউ দেখলেই বলতে পারে ও এ-গায়ের নয়, এ অকলের না—ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ছুটো জিনিষ নীতা খুব ভালবাসে ছেলেবেলা থেকে—সাবান আর বই। আর এখানে এসে পধ্যস্ত ঠিক ওই ছুটো জিনিষই মেলে না—এ-বাড়িতে সাবান কেউ ব্যবহার করে না, কাকীমাদের বান্ধে সাবান হয়ত আছে, কিন্তু সে বান্ধ-সাজানো হিসেবে আছে, যেমন তাঁদের বান্ধে কাচের পুতুল আছে, চীনেমাটির হরিণ, খোকা পুতুল, উট আছে—তেমনি। তবুও সাবান বরং খুজলে মেলে বাড়িতে—কেউ ব্যবহার করুক আর নাই করুক—বই কিন্তু খুঁজলেও মেলে না—হুপানা বই ছাড়া—নতুন পাজি আর সত্যনারায়ণের পুঁথি। আমরা তো চা-বাগানে থাকতাম, সে তো বাংলা সেশেই নয়—তবুও আমাদের বান্ধে অনেক বাংলা বই ছিল। নানা রকমের ছবিওয়ালা বাংলা বই—বীণুর গল্প, পরিত্রাণের কথা, জবের গল্প, স্ববর্ণবণিক পুত্রের কাহিনী—আরও কত কি। এর মধ্যে মিশনরী মেমেরা অনেক দিয়েছিল, আবার বাবাও কলকাতা থেকে ডাকে আনাতেন—নীতার জন্তে এনে দিয়েছিলেন ককবতী, হাতেমতাই, হিতোপদেশের গল্প, আমার জন্তে একখানা ‘ভূগোল-পরিচয়’ ব’লে বই, আর একখানা ‘চাকুরদার কুঁলি’। আমি গল্পের বই পড়তে তত ভালবাসিনে, হু-ভিনটে গল্প পড়ে আমার বইখানা আমি নীতাকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার ভাল লাগে যিশুখৃষ্টের কথা পড়তে। পর্কতে যিশুর উপদেশ, যিশুর পুনরুত্থান, অপরাধী পুত্রের প্রত্যাবর্তন—এ-সব আমার বেশ লাগে। এখানে ও-সব বই পাওয়া যায় না ব’লে পড়িনে। যিশুর কথা এখানে কেউ বলেও না। একখানা খৃষ্টের রঙীন ছবি আমার কাছে আছে—মিস্ নটন দিয়েছিল—সেখানা আমার বড় প্রিয়। মাঝে মাঝে বার করে দেখি।

হিন্দু দেবতার কোনো মূর্তি আমি দেখিনি, জ্যাঠামশায়েরা বাড়িতে যা পূজা করেন, তা গোলমত পাথরের হুড়ি। এ-গ্রামে দুর্গাপূজা হয় না, ছবিতে দুর্গামূর্তি দেখেছি, ভাল বুঝতে পারিনে, কিন্তু একটা ব্যাপার হচ্ছে মধ্য। চৌধুরী-পাড়ার বড় পুতুল ধারের পাহাড়গাছের তলায় কালো পাথরের একটা দেবমূর্তি গাছের ঝড়িতে ঠেসানো

আছে—আমি এক দিন দুপুরে একলা পাহাড়তলা দিয়ে যাচ্ছি, বাবা তখন বেঁচে আছেন, কিন্তু তাঁর খুব অসুখ—ওই সময় মূর্তিটা আমি প্রথম দেখি—জায়গাটা নির্জন, পাহাড়গাছের ভালপালার পিছনে অনেকখানি নীল আকাশ, মেঘের একটা পাহাড় দেখাচ্ছে ঠিক যেন বরকে ঘোড়া কাকন-জন্তা—একটা হাতভাঙা যদিও কিন্তু কি সুন্দর যে মুখ মূর্তিটার, কি অপূর্ব গড়ন—আমার হঠাৎ মনে হ’ল ওই পাথরের মূর্তির পবিত্র মুখের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ বীণুখৃষ্টের মুখের মিল আছে—কেউ ছিল না তাই দেখিনি—আমার চোখে জল এল, আমি একদৃষ্টিতে মূর্তিটার মুখের দিকে চেয়েই আছি—ভাবলাম জ্যাঠামশায়েরা পাথরের হুড়ি পূজা করে কেন, এমন সুন্দর মূর্তির দেবতাকে কেন নিয়ে গিয়ে পূজা করে না? তার পরে শুনেছি ওই দীঘি খুঁড়বার সময়ে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগে মূর্তিটা হাত-ভাঙা অবস্থাতেই মাটির তলায় পাওয়া যায়—নীতাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলাম একবার—একবার নীতা জ্বা, আকন, ঝুম্কা ফুলের একছড়া মালা গেঁথে মূর্তির গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। এমন সুন্দর দেবতাকে আজ পঁচিশ বছর অনাদরে গ্রামের বাইরের পুতুরপাড়ে অমন করে কেন যে ফেল রেখে দিয়েছে এরা!

একবার একখানা বই পড়লাম—বইখানার নাম চৈতন্য-চরিতামৃত। এক জায়গায় একটি কথা পড়ে আমার ভারি আনন্দ হ’ল। চৈতন্যদেব ছেলেবেলার একবার আঁতাকুড়ে এঁটো হাঁড়িকুড়ি যেখানে ফেলে, সেখানে গিয়েছিলেন ব’লে তাঁর মা শচীদেবী খুব বকেন। চৈতন্যদেব বললেন—মা, পৃথিবীর সর্বত্র ঈশ্বর আছেন, এই আঁতাকুড়েও আছেন। ঈশ্বর যেখানে আছেন, সে-জায়গা অপবিত্র হবে কি ক’রে?

ভাবলাম জ্যাঠাইম’দের বিরুদ্ধে চমৎকার যুক্তি পেয়েছি তাঁদের ধর্মের বইয়ে, চৈতন্যদেব অবতার, তাঁরই মুখে। জ্যাঠাইমাকে একদিন বললাম কথাটা। বললাম—“জ্যাঠাইমা, আপনি যে বাড়ির পিছনে বীশবনে গেলে কি শেওড়া গাছে কাপড় ঠেকলে হাত-পা না ধুয়ে, কাশড় না ছেড়ে ঘরে ঢুকতে দেন না, চৈতন্যচরিতামৃতে কি লিখেছে আনেন?” চৈতন্যদেবের সে-কথাটা বলবার সময়ে আনন্দে মন আমার ভরে উঠল—এমন নতুন কথা, এত সুন্দর কথা আমি কখনও শুনিনি। ভাবলাম জ্যাঠাইমা বই পড়েন না ব’লে এত সুন্দর কথা যে

ওদের ধর্মের বইয়ে আছে তা জানেন না—আমার মুখে শুনে কেনে নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝে খুব অপ্রভিত হয়ে যাবেন।

জ্যাঠাইমা বললেন—তোমাকে আর আমার শেখাতে হবে না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, উনি এসেচেন আজ আমার শান্তর শেখাতে। হিঁদুর আচার-ব্যভার তোর জানুবি কোথেকে রে ডেপো ছোঁড়া। তুই তো তুই, তোর মা বড় জানে, তোর বাবা বড় জানতো—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা এমন সুন্দর কথা শুনে চটলেন কেন? তা ছাড়া আমি নিজে বানিয়ে কিছু বলছি কি?

আগ্রহের স্বরে বললাম—আমার কথা নয় জ্যাঠাইমা, চৈতন্যদেব বলেছিলেন তাঁর মা শচীদেবীকে—চৈতন্যচরিতামৃত লেখা আছে—দেখাবো বইখানা?

—খুব তক্তাবাজ হয়েচ, থাক। আর বই দেখাতে হবে না। তোমার কাছে আমি গুরুমন্তর নিতে বাচ্চিনে—এখন যাও আমার সামনে থেকে, আমার কাজ আছে—তোমার তক্তা গুনবার সময় নেই।

বা রে, তর্কবাজির কি হ'ল এতে? মনে কষ্ট হ'ল আমার। সেই থেকে জ্যাঠাইমাকে আর কোনো কথা বলিনে।

সীতা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করে বসল। জ্যাঠামশাইদের বাড়ির পাশে বড় অধিকারীর বাড়ি। তারা বারেন্দ্রজ্যেষ্ঠীর

ব্রাহ্মণ। তাদের বাড়িতে বড় অধিকারীর বড় মেয়েকে বিয়ের জন্য দেখতে এল চার-পাঁচ জন ভদ্রলোক কলকাতা থেকে। সীতা সে-সময় সেখানে উপস্থিত ছিল।

বড় অধিকারীর বাড়ির মেয়েরা তাকে নাকি জিগোস করেচে—শোন সীতা, আচ্ছা উমার যদি বিয়ে না হয় ওখানে, তোর বিয়ে দিয়ে যদি দি, তোর পছন্দ হয় কাকে বলত?

সীতা বুঝতে পারেনি যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করচে—বলেচে না-কি চোখে চশমা কে একজন এসেছিল তাকে।

ওরা সে-কথা নিয়ে হাসাহাসি করেচে। জ্যাঠাইমার কানেও গিয়েছে কথাটা। জ্যাঠাইমা ও সেজকাকীমা মিলে সীতাকে বেহারা বোকা বদমাইস্ জ্যাঠা মেয়ে যা তা বলে গালাগালি আরম্ভ করলেন। আরও এমন কথা সব বললেন যা ওঁদের মুখ দিয়ে বেরুলো কি করে আমি বুঝতে পারিনে। আমি সীতাকে বকলাম, মাও বকলেন—তুই যাস কেন যেখানে সেখানে, আর না বুঝে যা-তা কথা বলিসুই বা কেন? এ-সব জায়গার ধরণ তুই কি বুঝিসু?

সীতার চোখ চল্‌লল করে উঠল। সে অতশত বোঝেনি, কে জানে ওরা আবার এখানে বলে দেবে! সে মনে যা এসেচে, মুখে সত্যি কথাই বলেচে। এ নিয়ে এত কথা উঠবে তা বুঝতে পারেনি।

ক্রমশঃ



বৌদ্ধধর্মে কৰ্ম ও জন্মান্তরবাদ

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পিএইচ-ডি

কোন সময়ে কি ও প্রকারে জন্মান্তরবাদ ভারতবর্ষীয় লোকের মনে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ধর্মেতিহাসের গতি ঘুরাইয়া দিয়া মাহুকের ধর্মভাবনায় সরসতা বা আশাস আনয়ন করিয়াছিল, সর্বাঙ্গে ইহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। মনীষিগণ, বিশেষতঃ প্রাচীন পণ্ডিতগণ, মনে করিয়া থাকেন যে, হুপ্রাচীন সময়ে আর্ধ্যগণ স্বনিবাসস্থান হইতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্বে, খুব সম্ভবতঃ, তাঁহাদের ধর্মচিন্তার ধারাতে জন্মান্তরবাদ (Theory of Transmigration or Transmutation of Souls) ধর্মবিশ্বাসরূপে জনগণে পোষণ করিতেন না। মাহুকের আত্মা মৃত্যুর পরে যে পুনর্ব্যায় মাহুযী তছু অথবা পশাদিশরীর পরিগ্রহ করিতে পারে, এইরূপ মত যে গ্রীকজাতীয় দার্শনিক পাইথাগোরাস্ (Pythagoras) ও প্লেটো (Plato) পোষণ করিতেন, হয়ত ইহাও কেবল এই দুই দার্শনিকের স্বচিন্তাপ্রসূত ভাবমাত্র ছিল, ইহা যে গ্রীক জনসাধারণেরও বিশ্বাস বস্তু ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এমনও মনে করেন যে, মিশর দেশীয় দার্শনিকগণের সম্পর্কে আসিয়া গ্রীক দার্শনিকগণের মনে এইরূপ কল্পনা উদ্ভিত হইয়া থাকিতে পারে। ভারতীয় আর্ধ্যগণের অতিপ্রাচীন ধর্মসাহিত্য ঋগ্বেদাদিতেও জন্মান্তরবাদ পরিষ্কাররূপে বিশেষ কোন স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয় না। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে সিদ্ধ ও পজাবের মহেঞ্জদারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে অচিরাবিকৃত প্রত্ননিদর্শনসমূহের নিপুণভাবে পরীক্ষার ফলে স্তর স্তর মার্শাল-প্রমুখ মনীষিগণ প্রাগাধ্য ভারতীয়গণের সভ্যতা সম্বন্ধে যে-সমস্ত মতবাদ প্রচার করিতে সমর্থ হইতেছেন, তৎপাঠেও জানা যায় যে, ভারতীয় আর্ধ্যগণ পঞ্চনদ ও সিদ্ধ দেশবাসী প্রাগাধ্য জাতিগণের সহিত মিশ্রণের ফলে সেই সেই প্রাচীনতর আদিম জাতিসমূহ হইতে অনেক প্রকার ধর্মভাব ও ধর্মমত ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিয়া লেগলিকে পরবর্তী সময়ে রচিত বেদাংশ, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ ও আরও পরবর্তীকালে রচিত বৃতি-পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন! শিবশক্তির

উপাসনা, নাগ-নাগীর ও বক্ষ-বক্ষীগীর পূজা, লিঙ্গ-যোগির অর্চনা, বৃক্ষ-পশাদির পূজা, ভক্তিবাদ, এমন কি সংহতি (Doctrine of metempsychosis) বা জন্মান্তরপরিগ্রহবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে মতামত কেন যে ভারতীয় আর্ধ্যগণ তাঁহাদের অতিপ্রাচীন নিজস্ব গ্রন্থে (অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থে) স্পষ্টতঃ উল্লেখ বা আলোচনা করেন নাই, এইরূপ প্রশ্ন বহুকাল ধাবৎ প্রশ্নরূপেই থাকিয়া যাইতেছিল। সম্প্রতি পরিজ্ঞাত প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী এই হুসভ্য পঞ্চনদ ও সিদ্ধ দেশবাসী প্রাগাধ্য ভারতীয়গণের সংসর্গে আসিয়া আর্ধ্যগণ যে জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাস ক্রমশঃ ক্রমশঃ ধার করিয়া জনগণে ধারণ করিয়া থাকিবেন, এমন কথা আর সহসা নিষেধ করা যায় না। তৎপর কালে কালে দেশে দেশে প্রচারের ফলে এই মতবাদ সাধারণের ধর্মবিশ্বাসরূপে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছিল। এ সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত এমনও মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষে আর্ধ্যগণের আগমনের পূর্বে, যদি অত্য় কোন বৈদেশিক জাতি ভারতে প্রবেশলাভ করিয়া থাকেন এবং যদি বাস্তবিক আর্ধ্যগণ সেই জাতিকে পরাভূত করিয়া নিজ গোষ্ঠীতে মিশাইয়া লইয়া থাকেন তাহা হইলে এমনও অসম্ভব নহে যে, আর্ধ্যগণ সেই সেই পরাভূত জাতি হইতে একত্রবাসের ফলে জন্মান্তরবাদের কল্পনার ধারা ধার করিয়া শিথিয়া থাকিবেন। সে বাহা ইউক, এখন দেখা যাউক কোন প্রাচীন আর্ধ্যগ্রন্থে এই বাহাটি প্রথমতঃ স্পষ্টভাবে সূচিত ও ধর্মাকাজী ব্যক্তিগণের বিশ্বাসবস্তু বলিয়া উল্লিখিত পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (পঞ্চম অধ্যায়ের দশম খণ্ডে) ইহজন্মে আচারিত হকৃত কৃত্তভেদের কলাহুসারে শরীরীয় বা আত্মার পরজন্মে শরীরান্তর পরিগ্রহের বিষয় অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্রুতি* বলিতেছেন যে,

* “তদা ইহ রমণীয়রূপা অভ্যাসে হ যন্ত রমণীয়াং বোনিমাপনোয়ন্ ব্রাহ্মণবোনি বা কত্রিগবোনি বা বৈশ্যবোনি বাখব ইহ কপুতরগা অভ্যাসে হ যন্ত কপুতরাং বোনিমাপনোয়ন্ময়মোনি বা শূকরবোনি বা গণ্ডালবোনি বা।”—হা. উ. ১১.১৭

বর্তমান জন্মে রমণীয় কৰ্মের আচরণ দ্বারা শুভাশুভ হওয়ায় জীব পরজন্মে ব্রাহ্মণাদি রমণীয় ঘোনিতে জন্মলাভ করিবে এবং জুগপিত কৰ্মের আচরণদ্বারা অশুভাশুভ হইয়া অশ্মাদি জুগপিত ঘোনিতে জন্মলাভ করিবে। উপনিষদের রচনাকাল মোটামুটি ভাবে বুদ্ধদেবের জন্মের অন্তর তিন চারি শত বৎসর পূর্বে ধরিয়া লইলে শাস্ত্রের মর্যাদা নষ্ট হইবে এক্ষণ বিবেচিত হয় না। বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারের পরবর্ত্তী সময়ে রচিত কোন কোন উপনিষদে এবং ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি-সংহিতা ও পুরাণাদিতে দেখা যায় যে, তৎ-তৎ সময়ে পুনর্জন্মবাদ ও জন্মান্তরে দেহান্তর-প্রাপ্তিবাদ সমগ্রভাবে ভারতবাসিগণের স্বীকৃত বিশ্বাস হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু জীবের এই সংস্রুতি বা সংসার কি কেবল দুই একবার মাত্রই ঘটে, অথবা ইহা অনন্তকালস্থায়ী—এইরূপ প্রশ্নও উত্থিত হইতে পারে। দেখা যায় যে, বুদ্ধদেবের পূর্বে জীবের পুনঃ পুনঃ সংস্রুতির কল্পনাটি ধর্মস্মৃতিধারাতে ততটা প্রকৃষ্ট স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এমনও মনে করা অসম্ভব হয় না যে, বুদ্ধদেবের ধর্মবিশ্বাসে ও তৎকর্ত্তক ধর্ম-প্রচারেই পুনর্জন্মের অনন্ত প্রবাহের কল্পনা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে এতটা পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পুনর্জন্মের অনন্ত চক্রের ধারণা বুদ্ধদেবের পূর্ববর্ত্তী কোন ঋষি বা ধর্মাচাৰ্য্য প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন—তদ্বিম্বশেও পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া কঠিন। বৌদ্ধগণের দৃঢ় বিশ্বাস এই ছিল যে, মোক্ষ বা নির্ব্বাণের পূর্ব পর্যন্ত জীব বা পুঙ্গবলের জন্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। এক একটা জন্ম পাপপুণ্য কৰ্মে ভোগের শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে। জন্মের অবধি হইল জীবের কৰ্ম্মকর। ভোগের জন্মে জীবের তৎ-তৎ-জন্ম শেষ হইলে পূর্বকৃত অজ্ঞাত কৰ্ম্মের সঞ্চিত ফলে পুনর্জন্ম হইতে থাকে। ব্রাহ্মণধর্মাবলম্বী ব্যক্তি এই স্থলে গীতার প্রসিদ্ধ বাক্য স্মরণ করিয়া ঐক্লবের সঙ্গে সঙ্গে বলিবেন—“বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাক্ষুণ” (হে অর্জুন, আমার ও তোমার, উভয়েরই, বহু বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে), কিন্তু, “ভাক্ষুণ বেন সর্কানি ন যৎ বেধ পরজগৎ” (আমি ইহার সবগুলির বিষয় অবগত আছি, আর হে পরজগৎ, সেগুলিকে তুমি বুঝিতে পার না)।

কি হিন্দুশাস্ত্রে, কি বৌদ্ধশাস্ত্রে কৰ্ম্মকে মানসিক, বাচিক ও কাযিক ভেদে তিন প্রকারে কল্পনা করা হইয়াছে। এই তিন প্রকার কৰ্ম্মের শুভাশুভ ফলেই মানুষের মনুষ্য-ভিত্তিগাদিভাবে উত্তম, মধ্যম বা অধম জন্মান্তর ঘটিয়া থাকে। হিন্দু মনে করেন যে, অগ্নি হইতে সৃষ্টিদেবের ত্রায় পরমাত্মার রূপ হইতে অসংখ্য সৃষ্টি লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন হইয়া নির্গত হইয়াই যেন জীবরূপে সর্বভূতকে কৰ্ম্মে প্রেরিত করিতেছেন। ধর্মার্থ কৰ্ম্মের আচরণজনিত স্বর্গনরকাদি-ভোগের কল্পনাও মানুষের ধর্মশিক্ষার জন্য একটি উপদেশ উপায়। অজ্ঞভাবে শাস্ত্রকারগণ কৰ্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—স্বর্গাদিহৃৎপ্রাপ্তিকর সংসরণের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয় বলিয়া কোন কোন কৰ্ম্ম (যথা—যজ্ঞ, উপাসনা, প্রভৃতি) ‘স্বরূতাথ্য’ কৰ্ম্ম (বা ‘হৃথাত্মাদায়িক’) এবং কোন কোন কৰ্ম্ম (যথা, তপোবিদ্যা, প্রভৃতি) জীবের সংসরণ নিবৃত্ত করিতে পারে বলিয়া ‘নিবৃত্তাথ্য’ কৰ্ম্ম (বা ‘নৈশ্রেয়সিক’) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ‘জ্ঞানাদিহৃৎকৰ্ম্ম’ না হইতে পারিলে জীবের পক্ষে পরমপুণ্যার্থ বা মোক্ষলাভের আধিকারী হওয়ার জন্য উপায় হিন্দুশাস্ত্রে কীৰ্ত্তিত হয় নাই। ব্রহ্মজ্ঞানী কৰ্ম্মজ দোষকে দহন করিয়া এই লোককেই ব্রহ্মধ্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। অগ্নি সংবর্দ্ধিত হইলে আর্দ্র কাষ্ঠও দহন করিতে সমর্থ হয় না কি? যিনি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন, তিনিই ধর্মার্থ কৰ্ম্মের অতীত হইতে পারেন। কৰ্ম্ম-সম্বন্ধে আরও এক প্রশ্ন এইরূপ উত্থিত হয়, জীব বা পুঙ্গবলের কৰ্ম্মে প্রেরণা উৎপাদন করিয়া দেন কে? হিন্দু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবেন—

“এব হ্যেব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি যমুর্জং নিনীষতি এব হ্যেবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি যমধো নিনীষতি”—

আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞাদিতে কৰ্ম্মসাধনের প্রেরণা উৎপাদন করিয়া দেন। তাই ইহা সকলেরই অস্বত্ব হইতেছে যে, কৰ্ম্মহেতুক পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরপ্রবাহ স্বীকার না করিলে পরমাত্মার উপর বিষমহষ্টির দোষ ও নিষ্ঠুরতার আরোপ করিতে হয়। কিন্তু, পরমাত্মা সাধারণভাবে জীবের কৰ্ম্মাহরণ হষ্টির বিধান করেন মাত্র; বৈদ্য কেবল জীবের কৰ্ম্মজনিত ঘটনা। বিষমহষ্টির এই ব্যাখ্যা কৰ্ম্মবাদ স্বীকার দ্বারাই স্থাপিত হয়। পঞ্চদশদেবত্ৰীহিংসাদিহিংসিতে সাধারণ

কারণ, কিন্তু ত্রীহিষবাদির বৈষম্য তত্ত্ব-বীজগত-কারণ জন্ম ঘটনা থাকে। জীবের কর্মকে অপেক্ষা করিয়াই পরমাত্মা অনাদিকাল হইতে বিভিন্ন প্রকার সংসারের বিধান করিতেছেন।

কর্মের পায়ত্ত্ব্য জীবের পক্ষে ভাগ্য করা বড়ই দুঃস্থ ব্যাপার। কর্মই বন্ধনদুঃখের ও বার-বার জন্মান্তরপরিগ্রহের হেতু। তবে কি পুনর্জন্ম নিরোধ করিতে হইলে কর্মের নিরোধ বা সম্যাস করিতে হইবে? মানুষের চেষ্টা থাকিবে কেমন করিয়া তাহার আত্মা—‘তাত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি’—দেহভাগের পর আবার দেহান্তরগ্রহণদ্বারা সংসারে ফিরিয়া না আসেন এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ বা ত্রিতাপের হস্ত হইতে, অর্থাৎ জয়, জরা, রোগ, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কঠোর ও কর্শ শৃঙ্খলবন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত করিবার উপায় খুঁজিয়া লইতে পারে। কিন্তু, কোন জীবের পক্ষেই সর্বতোভাবে ‘অকর্মক্লং’ থাকা সম্ভাবিত নহে। ক্লম, জনক, বৃদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা জীবের উদ্ধারকল্পে কর্মসম্যাস অপেক্ষায় কর্মযোগের, অর্থাৎ কৌশলপূর্বক কর্মের আচরণের, পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কর্মের পরিসমাপ্তি জানে, স্তবরাং কর্মের জ্ঞান দ্বারা ই মুক্তি সম্ভাবিত হয়। পরলোকে অধিকতর সুখের ও আনন্দের আশা না থাকিলে, মানুষ ইহলোকে দুঃখ এড়াইবার জন্ত আত্মঘাত দ্বারা নিজের ও হত্যাদি দ্বারা শিশুসন্তানের প্রাণনাশ অবিশেষ মনে করিত না। স্বর্গাদিতে স্তবভোগের আশা, অথবা ঐকান্তিকভাবে অপবর্গ লাভ, করিতে হইলে, কৌশলে কর্মসাধন করিতে হইবে। ইচ্ছাং কর্মভাগ করিয়া বসিতে চাহিলেও তাহা কাহারও সম্ভবপর হইয়া উঠে না। যে কৌশলদ্বারা—“কৃত্যাপি ন নিবদ্ধতে, ত্বর্কমপি ন লিপ্যতে”—কর্ম করিয়াও মানুষ নিবদ্ধ বা লিপ্ত হইবে না এবং সংসৃতির কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে সেই কৌশলের শিক্ষা উপদিষ্ট রহিয়াছে। জলে ও বায়ুতে অদৃশ্যভাবে অনেক রোগবীজাণু বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেমন সেই ভদ্রে আঘাত জীৱনরক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় এই প্রধান ব্রহ্মবায়ুর ব্যবহার ভাগ করিয়া আত্মঘাতী হই না, কেবল বুদ্ধির কৌশলে ব্রহ্মবায়ুকে নির্দোষ করিয়া

পান ও সেবন করি, তেমনই জ্ঞানদ্বারা কর্মকেও নির্দোষ করিয়া লইতে পারিলে জীবকে আর কর্মবশতঃ পুনর্জন্ম-বন্ধনে পড়িয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। ছানোগ্য উপনিষদের সেই মহাবাক্য এখানে স্মরণীয় বাগ্মতে শ্রুতি বলিতেছেন—“যথা পুত্ররপলাশ আপো ন স্নিগ্ধত এবমেবংবিদ্বি পাপং কর্ম ন স্নিগ্ধতঃ”—যেমন পশুপত্রে জল স্নিগ্ধ হয় না, তেমন তত্ত্ববিৎ জ্ঞানীতে পাপকর্মও স্নিগ্ধ হয় না। কর্ম করিব, অথচ তৎফলদ্বারা বদ্ধ হইয়া পুনর্জন্মের জন্ত সংসৃতি লাভ করিব না—এমন কোন উপায়ের কথা শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে কি? গীতার কর্মযোগ-অধ্যায়ে উক্ত আছে যে, যে-কর্ম করণীয়, তাহা অনাসক্ত ও নিরভিমান হইয়া তৎফলাকাজ্ঞা বর্জন করিয়া ভগবদর্পণপূর্বক সম্পাদন করিতে পারিলে তদ্বারা জীব ভববন্ধন প্রাপ্ত হয় না, বরং তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে, সর্বপ্রকার কর্ম প্রশংসাই নহে; স্বার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়া কর্মাচরণ বিধেয় নহে, কিন্তু কর্মের মূলে পরার্থপরতা নিহিত রাখিয়া কর্ম করিলে তবেই জগতের কল্যাণার্থ কর্ম অল্পেষ্ট হইল—এরূপ বলা যাইতে পারে। কর্মের ফলে আকাজ্ঞা রাখার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, জগতের প্রাণীর জন্ত হিতকর কর্ম করিব, তাহাতে আমার নিজের লাভ, ক্ষতি, সিদ্ধি, অসিদ্ধি কিছুতেই উৎফুল্ল বা বিষন্ন হইব না। হিন্দুধর্মের মতে কর্মফলভোগের প্রধান কারণ এই যে, জীব মায়াপ্রভাবে নিজের উপর কর্মের কর্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকেন, তিনি যে ‘অকর্তা’ তাহা তিনি যেন বিস্মৃত হন। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অত্যাচারে বা মায়া-প্রভাবে যে সর্বকর্ম অল্পপ্রতি হয়, জীব তাহা যেন সর্বদাই তুলিয়া যান। তাই নিকাম-কর্ম-কর্তা ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া কাম্য কর্মের সম্যাস বা পরিহারপূর্বক সর্বভূতের হিতার্থে কর্ম করিয়া তৎফলভোগী হন। ইহারই অপর ব্যাখ্যা পরমাত্মা বা ভগবানের প্রীতির জন্ত তদর্পণপূর্বক কর্ম-সম্পাদন। এই ত গেল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপদেশমত কর্মফলের আলোচনা।

বৌদ্ধগণের ধর্মশাস্ত্রেও পুণ্যকর্মের সঞ্চয় ইহ-পরলোকে সুখের নিদান ও পাপকর্মের সঞ্চয় দুঃখের আকর বলিয়া উদ্ঘোষিত হইয়াছে। তবে আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই েন এই

পৃথিবীতে পানী নানারূপে হুৎ অহুভব করিতেছে ও গৃহকারী হুৎ ভোগ করিতেছে—কিন্তু, ইহা দৃশ্যতঃ সত্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে সম্পূর্ণরূপে সত্য নয়, কারণ পাপপুণ্যের বিপাক বা পরিপাক প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত পুরুষের প্রত্যয়ে এইরূপ বিসদৃশ ভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। 'ধম্মপদ' গ্রন্থে (পাপবর্গগে) এইরূপ উপদেশ আছে,—

“তোমার নিকট পাপকর্ম আসিবে না, এই মনে করিয়া তুমি পাপকে অবজ্ঞা করিও না; তোমার নিকট পুণ্যকর্ম উপস্থিত হইবে না ইহা মনে করিয়া পুণ্যকেও অবজ্ঞা করিও না। কারণ, বিন্দু বিন্দু করিয়া জলপাতে যেমন জলকলস পরিপূর্ণ হইতে পারে, তেমনি মূর্খ বা অজ্ঞানী ব্যক্তি অল্প অল্প পাপ সঞ্চয় পূর্বক, এক বীর বা জ্ঞানী ব্যক্তি তেমনি অল্প অল্প পুণ্য সঞ্চয় পূর্বক স্বাভাবিক পাপ ও পুণ্য পরিপূর্ণ হইতে পারে। প্রভূত-বন-বিশিষ্ট বণিকের যেমন স্বল্পসংখ্যক সন্নি সসে থাকিলে, ভগ্নসকল পথ পরিভ্রমণে এক যেমন জীবনাত্তরীণী ব্যক্তির পক্ষে বিশ্ব-বর্জন বিধেয়, তেমনি পুণ্যগণের বা জীবের পক্ষেও পাপ-বর্জন সর্বদা কার্য্য।”

কারণ, কি অন্তরীক্ষে, কি সমুদ্রতলে কি পর্বতগুহায়—জগতে এমন কি কোন নিভৃত স্থান আছে, যেখানে পাপ অনাচারিত থাকিতে পারে? তাই, সেই শাস্ত্রে আরও উপদেশ আছে—

গরম্বে উপপজ্জতি নিরম্ম পাপকামিনো।

সগং অগন্তিনো বন্তি পরিনিবন্তি অনাসবো ॥ (পাপবর্গগে-১১।)

এই শ্লোকে কর্মবান্ধব সম্বন্ধে বোধগণের বিধাসূচি হ্রস্বর ভাবে উল্লিখিত পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের ধারণা এই যে, “পাপ আচরণ করিয়া কেহ কেহ পুনর্জন্ম জন্ম গর্ত পরিগ্রহ করিয়া থাকে, কেহ কেহ নরকে গমন করে, কিন্তু, পুণ্য-কর্মকারীরা স্বর্গে গমন করেন এবং ‘আসব’ বা আস্রব-রহিত (অর্থাৎ বিষয়বাসনাবিহীন) ব্যক্তিগণ নির্বাণ প্রাপ্ত হন।” এক কথায় বলিতে গেলে, পুণ্যগল সর্বদাই ‘কম্মসূকো’ অর্থাৎ কর্ম-পরতন্ত্র। বোধগণের নিত্য প্রত্যবেক্ষণের মধ্যে এই ভাবনাটিও নিয়ত ভাবিতে হইবে বলিয়া উল্লিখিত আছে, যথা,—

“যঃ কম্মং করিসুসামি কল্যাণং বা পাপকং বা ভয়ং দায়াদো ভবিসুসামি”

“আমরা কল্যাণ কর্ম বা পাপ কর্ম যেটারই আচরণ করিব, তদনুসারে ফল-ভাগী বা ‘দায়াদ’ অর্থাৎ উত্তরাধিকারস্বত্রে ভৎকলভাগী হইব।”

সুতরাং তাহাদের মতে কর্মই (ফলরূপে) জীবের বা পুণ্যগলের অস্থাবর করিয়া নব-সৃষ্টির হেতু হইয়া দাঁড়ায়। পরমসৌগত মহারাধিরাজ অশোক তৃতীয় অম্মশাসনে পাপ পুণ্য কর্ম সম্বন্ধে প্রজাবর্গের বর্ধোন্নতিকামনায় নিজ মত দ্বারা

পরিপোষিত যে উপদেশবাণী প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে প্রস্তরস্তম্ভলিপি রূপে উৎকীর্ণ করাইয়া রাখিয়াছেন তাহা হইতে কয়েকটি বাক্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইতে পারে। নীতিমূলক কর্ম আচরণ করার উপদেশ যে বোধধর্মের একটি বিশেষত্ব, তদ্বিষয়ে মহারাজ অশোকের এই কথাগুলি অলস্ত নিদর্শনরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য। ধর্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট (দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে) লিখাইতেছেন—

“কিয়ং চু ধম্মে তি প? অপানিনবে বহকল্যাণে দদ্যা দানে সতে সোচয়ে চ পু।”

‘ধর্ম কাহাকে বলা যায়? (উত্তর) অপানীনব (বা মতান্তরে অপাশ্রব) অর্থাৎ দোষরাহিত্য, বহুকল্যাণ, দয়া দান সত্য ও শৌচ।’ তৎপরে সম্রাট (তৃতীয় স্তম্ভলিপিতে) আরও লিখাইয়াছেন যে, সর্বসাধারণের পক্ষে পাপপুণ্যের প্রত্যবেক্ষণ নিত্যকরণীয় হইলেও, ইহা বড়ই কঠিন কার্য্য। কোন্ কোন্ পাপ চিত্তবৃত্তি আদিনব-গামিনী বা দোষোৎপাদনকারিণী বা পরলোক-নাশ-বিধায়িনী, প্রজাবর্গকে তদ্বিষয়ে সাবধান রাখিবার জ্ঞাত্তি তিনি সেই সেই বৃত্তিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। তিনি লিখাইতেছেন প্রত্যেক ব্যক্তির—

“কেবল স্বকৃত কল্যাণ বা পুণ্যকর্মই দেখিয়া থাকে (এক বলিয়া থাকে) ‘আমি এমন কল্যাণ কার্য্য করিয়াছি’। কিন্তু, সে কিছুতেই তাহার স্বকৃত পাপ কার্য্য দেখিতে চায় না (এক বলিয়া থাকে না) ‘আমি এমন পাপ কার্য্য করিয়াছি এবং ইহা আমার পরিরূপের বা ভবিষ্যৎ অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে’। বাস্তবিক এইরূপ অজ্ঞত্ব চিত্তপ্রত্যবেক্ষণ অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের এমন পরিমাপের প্রত্যবেক্ষণ কঠিন কার্য্য। (অন্তএব) সকলেরই এইট লক্ষ্য করিয়া রাখা উচিত যে, চণ্ডতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, মান, দর্পণা—এইরূপ মনোবৃত্তিগুলির আচরণ মানুষের পরিরূপের কারণ হইয়া থাকে এবং সকলকেই সর্বদা সাবধান থাকিতে হইবে যেন, এই পাপবৃত্তিগুলি তাহারদিকে পরিব্রজ না করিয়া ফেলে। আরও লক্ষ্য রাখা উচিত—কোন কর্মটি গ্রহিক স্বভাবের ও কোনটি পারত্রিক স্বভাবের নিদান।”

তবেই দেখা যাইতেছে যে, বোধগণের মতেও তাহাই স্বকর্ম, যাহা পারত্রিক মঙ্গলকর এবং যাহাবারা সর্বসত্ত্বের প্রতি কল্যাণ আচরিত হইতে পারে। বোধশাস্ত্রেও অভিহিত হইয়াছে যে স্বকর্মকারী ব্যক্তিগণ অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে তাহার ফলে পুনর্জন্মরহিত হইয়া নির্বাণ বা বন্ধনমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ কর্মাচরণ দ্বারা কর্মজনিত বন্ধন ছিন্ন করিতে পারা যায়। ‘মিল্লিপ-পঞ্জ্যো’

গ্রন্থে লিখিত আছে যে, স্বর্ষির নাগসেন রাজা মিলন্দকে (Menandar) বুঝাইতেছেন যে তিনি নিজে যদি—

“স-উপাদানো ভবিস্সামি—পটিসল্লহিস্সামি, সচে অহুপাদানো ভবিস্সামি ন পটিসল্লহিস্সামীতি”—

“আসক্তিযুক্ত হন, তবেই তাহার পুনর্জন্ম হইবে, অনাসক্তিযুক্ত হইলে তাহা হইবে না।” উভয় শাস্ত্রই (হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র) স্পষ্ট শিক্ষা দিতেছেন যে, অনাসক্ত হইয়া জগতের হিতের জন্ত অদীনবগামী নিষ্ঠুরাচরণ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্বক দয়া, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি সদ্বৃত্তিভায়া প্রণোদিত হইয়া কল্যাণ কর্ম করিতে পারিলে, তাহার ফল উত্তম এবং তজ্জন্ত তদাচরণ-কারীর পুনর্জন্ম লাভ করিতে হইলেও, সেই কারণে তাহার উত্তম যোনিতে জন্মান্তর পরিগ্রহ হইতে পারে।

প্রব্রজিতের পক্ষেও বন্ধনের হেতুভূত কর্মসমূহের মধ্যে দুইটি কোটি বা অস্ত্র (extremes) পরিত্যাগ করিবার জন্ত বুদ্ধদেব স্বয়ং ধর্মচক্রপ্রবর্তনসময়ে তলীয় পূর্ব ধর্মবৈরী কৌণ্ডিণ্য প্রভৃতি ভিক্ষুপঞ্চকের নিকট যে ধর্মদেশনা (sermon) প্রদান করেন বা যুগদাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই প্রথম অস্ত্রটি ‘কামহুত্মিকারূপযোগে’ অর্থাৎ গ্রাম্য ও পামরজনোচিত কামহুত্মে ও বিষয়ভোগে আসক্তি এবং দ্বিতীয়টি “অন্তকিলমাত্মরূপযোগে” অর্থাৎ কঠিন ও কঠোর তপস্বাদি দ্বারা শরীরের ক্লেশোৎপাদন। এই দুইটি অস্ত্রপদ্ধতির কোনটিই ব্রহ্মচর্য, বিরাগ, সংবর (ধর্মক্রিয়াসম্পাদন), নির্কেদ, নিরোধ, বিমুক্তি, অভিজ্ঞা, বোধি বা নির্বাণ সম্পাদন করিতে দমর্থ নয়। বরং এই দুই পদ্ধতিই কেবল দুঃখকর, অনার্থ ও অনর্থযুক্ত পদ্ধতি। তিনি তাঁহাদিগকে আরও বলিয়াছিলেন— ‘অয়ং ধো না ভিক্ষুথ্বে মজ্জিমা পটিপা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধ। ক্ষুৎকরণী এগনকরণী উপসমায় অভিজ্ঞ-এগয় সম্বোধায় নিকানায় সংবত্ততি।’ “তথাগত যে মধ্যম পথের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা চক্ষুর ও জ্ঞানকর মার্গ—ইহা দ্বারা মগ্ধের হইলে উপশম, অভিজ্ঞা, সংবোধি ও নির্বাণলাভ হয়।” ইহাই ‘অট্টঠঙ্গিকোমগ্গো’—আষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা সম্যাদিষ্ট (সম্যক দৃষ্টি—বিষয়ের ঠিক ধর্শন), ‘সম্মা-সংকল্পো’ সম্যক সংকল্প—সংকল্প ছির রাখা), ‘সম্মা বাচা’ (সম্যক বাক্য—প্রিয় সত্য কথন), ‘সম্মা কম্মন্তো’ (সম্যক কর্মান্ত—দাচরণ ও সম্ভবহার), ‘সম্মা আজীবো’ (সম্যক আজীব—সাধু

উপায়ে জীবিকোপার্জন), ‘সম্মা বারামো’ (সম্যক ব্যায়াম—সাধু উদ্যোগ বা চেষ্টা), ‘সম্মা সতি’ (সম্যক স্মৃতি—স্মরণ ও ধারণশক্তি) ও ‘সম্মা সমাধি’ (পরমতত্ত্বাবগতির জন্ত প্রবণ-মন-নিদিখাসন প্রভৃতির সম্পাদন)। ভগবান বুদ্ধের মতে ভিক্ষু ভিক্ষুগীরা ও উপাসক উপাসিকারা যদি এই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়া কর্ম করিতে থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহারা ধাষণ-নিদানাত্মক কাঞ্চ-কারণ-শৃঙ্খলার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ও পুনর্জন্মের দুঃখ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া তথাগতের ন্যায় সম্বোধি-জ্ঞানার্জনপূর্বক নির্বাণরূপ পুরুষার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। বৌদ্ধধর্মের মূল উপদেশ এই ধর্মচক্রপ্রবর্তনশব্দেই নিহিত আছে। ভগবান বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম যে অনেকাংশেই নৈতিক কর্মের ধর্ম তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। সাধু ও শুদ্ধ জীবন যাপন করিয়া সর্বসত্ত্বের দুঃখ হানির সহায়তা করিতে পারিলেই নির্বাণ-পথ পরিষ্কার হইয়া উঠে। মুক্তির জন্য বুদ্ধের নিকট বৈদ্যান্তিকের তত্ত্বভাসক-নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-ব্রহ্ম প্রত্যর্ক্যেত্তত্ত্ব পরমাত্মার জ্ঞান, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান, অথবা পাতঞ্জলের প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রয়োজন অহুত্ব হয় না। ‘চতুরার্যসত্য’ ঠিক নয় কি? ‘যাহা কিছু জন্মশীল তাহাই নশ্বর’—ইহা সত্য নয় কি? এইরূপ ধ্যানই বৌদ্ধের প্রধান ধর্মোচরণকর্ম।

আষ্টাঙ্গিক মার্গে চলিলে চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করা যায় এবং সর্বশেষে গন্তব্য স্থান নির্বাণে উপস্থিত হওয়া যায়—ইহাই বুদ্ধের বিশ্বাস ও জ্ঞান এবং তিনি সংবোধিলাভের পর ইহাই জীবনের শেষ পয়তালি বৎসর প্রচার করিয়া জগতের উদ্ধারার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

উপরি উল্লিখিত ‘কাঞ্চ-কারণ-শৃঙ্খলা’ কথার অর্থ কি? এবং চতুরার্যসত্যই বা কি, তাহার একটু উল্লেখ প্রয়োজনীয়। যে রজনীতে গোতম বুদ্ধগায় বোধিধ্রুমে নীচে (অধঃমূলে) সম্যক জ্ঞানলাভসহকারে “সম্বুদ্ধ” হইয়াছিলেন, তাহার প্রথম ধামে তিনি প্রাপ্তন জন্মসমূহের সর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন, দ্বিতীয় ধামে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া বর্তমান কালের সর্বভূতের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তৃতীয় ধামে সর্ববিষয়ের কাঞ্চ-কারণ-শৃঙ্খলার জ্ঞান লাভ

করিয়াছিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অতি-প্রভাষে তিনি সর্বজ্ঞতালাভে রুতরুতার্থ হইয়া লিঙ্গার্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা বা দ্বাদশ নিদান উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—জগতের লোকের জরা-মরণ-দুঃখ (শোক পরিদেবনাদি সহকারে) জাতি (জন্ম) হইতে সমুদ্ভূত হয়, জাতি ভব (হওয়ার ভাব) হইতে, ভব উপাদান (হওয়ার আসক্তি) হইতে, উপাদান তৃষ্ণা (আকাঙ্ক্ষা) হইতে, তৃষ্ণা বেদনা (অনুভূতি) হইতে, বেদনা স্পর্শ (বিষয়ের সহিত সংসর্গ বা সম্পর্ক) হইতে, স্পর্শ বড়ায়তন (ইন্দ্রিয়গ্রাম) হইতে, বড়ায়তন নামরূপ (মানসিক ও বাহ্যিক ব্যাপার বা বৃত্তি ইহার অপর নাম ‘পপঞ্চ’=প্রপঞ্চ বা মায়ার অর্থ্যাৎ ‘human body as an aggregate of physical and mental phenomena,’ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্দের সমষ্টি ও ‘নামরূপ’ সংজ্ঞার আখ্যাত) হইতে, নামরূপ বিজ্ঞান (অহংভাব, consciousness) হইতে, বিজ্ঞান সংস্কার (বাসনা, impressions) হইতে, এবং সংস্কার অবিন্যা হইতে সমুৎপন্ন হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই নিদান-পরম্পরার নাম প্রতীত্য-সমুৎপাদ (পটিক্সমুদ্রাদ)। স্তবরাং দুঃখবাদী ভারতীয় অগ্রাশ্র দর্শনে যেমন অবিন্যাকেই সর্বদুঃখের কারণ বলিয়া অভিহিত করা হয়, বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে তদ্রূপ মানুষ্যের অবিন্যামূলক দুঃখস্বচ্ছ সমুদিত হয়। মাছুষ এই দুঃখ হইতে “নিঃসরণং ন জানাতি”—কেমন করিয়া মুক্ত হইবে তাহা জানে না। এই শৃঙ্খলাতে উক্ত অবিন্যা প্রভৃতি দ্বাদশ নিদানগুলির মধ্যে পূর্ব-পূর্বটির নিরোধে পর-পরটির নিরোধ হইলেই সর্বদুঃখহানি নিশ্চিত, বুদ্ধদেব ইহাও সকলকে জানাইয়াছিলেন। সম্বোধির ফলে তিনি আরও একটি মহাদত্ত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বধা—

‘ইদং দুঃখমহং দুঃখ-সমুদয়ো জগৎখাপ।

অমঃ দুঃখ-নিরোধোহপি চেহং নিরোধপামিনী ॥

প্রতিপদিত বিজ্ঞান বখাত্তমবখাত ॥”

প্রথম সত্য—সংসারে দুঃখ আছে, দ্বিতীয়—দুঃখের কারণও আছে, তৃতীয়—দুঃখের অতিক্রম বা নিরোধও আছে এবং চতুর্থ—দুঃখের উপশমের আট্টাঙ্গিক মার্গরূপ উপায়ও আছে। পূর্বোক্তাধিত মধ্যম পথ বা ‘মজ্জিম পটিপ্পাহ’ দুঃখবিনাশের প্রকৃত সাধন। মোট কথা, বৌদ্ধ প্রতীত্য-সমুৎপাদ হইতেও

ইহাই অস্বমিত হয় যে, অবিন্যাই জরা, মরণ, পুনর্জন্মাদিরূপ রোগের বীজাণুসদৃশ। এই রোগের চিকিৎসার জন্য প্রধান বৈদ্য বুদ্ধদেবও প্রতীকার বা ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমাদের শেখ গ্রন্থ এই—বৌদ্ধমতে কর্মজনিত পুনর্জন্মটাকহার ও কেমন করিয়া ঘটয়া থাকে?

হিন্দুশাস্ত্রে আত্মার অস্তিত্ব ও সেই আত্মারই পুনর্জন্ম ও জন্মান্তর পরিগ্রহ বা সংসৃতি স্বীকার করিয়া কর্মবাদে অত্যাগম লক্ষিত হয়। সেই জন্য কর্মকারীর সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের ফল সমর্পণ করিয়া কর্ম করা বিধেয়। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে আত্মা বা ঈশ্বর বিশেষ কোন স্থান লাভ করেন নাই। এই শাস্ত্র এক প্রকার অনাত্মবাদী শাস্ত্র। বৌদ্ধ নরপতি কণিষ্কের সমসাময়িক মহাকবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষের রচিত ‘বুদ্ধচরিত’ নামক মহাকাব্যে প্রতীত্য-সমুৎপাদ ও তৎক্রমনিরোধের উপদেশ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব যেভাবে সংসারের কারণ ও মুক্তি বিষয়ে সমসাময়িক দার্শনিকগণের প্রচলিত মতভেদের খণ্ডন করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি বর্ণনা করিতেছেন যে, বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—চতুর্দ্বার্যাসত্য ও আট্টাঙ্গিক মার্গই যে মুক্তিবিধায়ক তাহা না জানিয়া “দৃষ্টি-বিপন্ন”বাদিগণ অভিমান-বশতঃ স্ব-স্ব মত পোষণ ও প্রচার করিয়া সংসৃতি হইতে মুক্তিলাভ দূরে থাকুক, বরং সংসারবন্ধনের পথ অধিকতর পরিষ্কার করিতেছেন। এই বিপ্রবাদ সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন,—কোন কোন বাদীরা কেবল আত্মাকে একমাত্র অস্তি-বস্তু মনে করিয়া মননাদিদ্বারা তাহারই জ্ঞান ও তৎপুণ্যজনিত মুক্তির উপদেশ করিয়াছেন, অপর প্রেক্ষীর বাদীরা বলেন সবই ‘স্বাভাবিক’ অর্থাৎ অকারণ-সমুদ্ভূত, আবার অন্য দলের বাদীরা বলেন সবই ‘ঈশ্বরাদীন,’ কিন্তু তথ্যগতের মতে এই মতগুলির প্রত্যেকটিই সংসার-সাধন-বর্ধক। তিনি মনে করেন যে, এই বাদিগণ সকলেই সংসৃতি-বর্ধকবাদী, কেহই নিবৃত্তি-বিধান-বিৎ নহেন। তাই তিনি প্রতীত্য-সমুৎপাদকে সংসৃতি-বর্ধক-সাধন মনে করিয়া জাহার নিরোধকেই নিবৃত্তি-পদ-সাধন বলিয়া প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার মতে—

“পঞ্চকলময়ং দেহং পঞ্চভুতসমুদবৎ।

শূন্যমকলময়ং সর্বং প্রতীত্যোৎপাদ(ন)সমুদবৎ ॥”

পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন দেহ রূপাদি পঞ্চক্কের সমষ্টি (এবং) প্রতীত্য-সমুৎপাদ-সম্বৃত্ত সব বস্তুই অনাস্বক। বৌদ্ধগণও পরলোক মানেন, দেব-দেবীর কল্পনা করেন, স্বর্গ-নরকভোগের কথাও বলেন—কিন্তু তাঁহাদের মতে দেবদেবীর স্থান বড় নীচে। অত্যুচ্চ স্থান কেবল কর্মের। কর্মকেই তাঁহারা পুনর্জন্মের কারণ বলিয়া মানেন। ভববন্ধ-বিমুক্তির জন্য দুঃখমূলক অবিদ্যার সংচ্ছেদ করিতে হইবে; তাহা করিলেই সংসারের নিবৃত্তি ও পুঙ্গলের নির্বাণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। এই নির্বাণের লক্ষণ এই যে, ইহা নিশ্চাপক, অদুঃখপাদ, অসংভব ও অনালায়,—ইহা বিবিক্ত, প্রকৃতিশূন্য ও অলক্ষণ;—ইহা “আকাশেন সদাতুলাং নির্বিকল্পং প্রভাশ্বরং”—ইহা ‘অস্তি-নাস্তি-বিনিমুক্ত’ ‘আশ্র-নৈরাশ্র্য-বজ্জিত’। হিন্দুদিগের গ্রাম বৌদ্ধগণ সালাকা, সারূপ্য বা মাযুজ্য প্রভৃতি নামে অভিহিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষী নহেন। তাঁহারা নির্বাণান্তে শূন্য শূন্য হইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের মতে এই শূন্য ব্যতিরেকে আর যাহা কিছু আছে, তাহা সবই—

“মায়া-মরীচি-স্বপ্নাভ্য জলেন্-প্রতিদাশবৎ”

“মায়া বা মরীচিকার গ্রাম, তাহা স্বপ্নের গ্রাম, জলচন্দ্রের গ্রাম, অথবা প্রতিধ্বনির গ্রাম প্রতীয়মান হয়।” পূর্বেও হুচিৎ হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে সৃষ্টি বা সংসারের কোন কথা লক্ষিত হয় না। স্নেহ বা তৈলের অভাবে প্রদীপ নিবিয়া গেলে, তাহা যেমন অন্তরীক্ষ বা অবনী বা অগ্নি কোন দিগ্‌বিদিকে গমন করে না, সেইরূপ কর্মজনিত ক্লেশকরে পঞ্চক্কেদ্বয় (নাম-রূপী) পুঙ্গলও কেবল শান্তিই লাভ করে এবং তাহার অস্তিত্ব পূর্ণভাবে লোপ পাইয়া যায় মাজ। পরবর্তীকালে আচার্য্য নাগার্জুন রচিত চতুস্তব পাঠেও জানা যায় যে, এই শূন্যতার উপলব্ধিরই নামান্তর পরমার্থ। এই অবস্থায় বোধো ও বোধকের কোন ভেদ থাকে না, এমন কি সংসারের অপকর্ষদ্বারা নির্বাণলাভের কোন কথাই খাটে না, সংসার ও নির্বাণ এই দ্বন্দ্বটি পর্যন্ত অস্তিত্ব হইয়া দাঁড়ায়। বোধান্তের ক্রমের স্তায়, কেবল লোকাত্মবৃত্তি ও লোকাত্মকম্পার জন্মই শূন্যতার লৌকিকী ক্রিয়া ও “কর্মশূন্য” প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কোন বস্তুর নাশ না হইলে, তাহা হইতে নতুন জন্ম হয় না। বৌদ্ধদের মতে “স্বপ্নাভ্য সংসারা”—“অনিচ্ছা সংসারা”

—যাহা-কিছু সংসার বা আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বস্তু (all mental and physical constituents of being) আছে, তাহাই নাশশীল, তাহাই অনিচ্ছ। নাশ ও অনিত্যতা আছে বলিয়া সেগুলিরই পুনরাগমন বা পুনর্জন্ম সম্ভাবিত। এগুলি সবই যত্নের অধীন, কেবল কৃত্তিকর্ম কর্মের বেলায়। বৌদ্ধ-মতে কর্মের উপর যত্নের হাত নাই। মরণের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চক্কের পরম্পর বিরোধ ঘটিলেও কর্মফলে সেগুলির পুনঃ-সংযোগের সম্ভাবনা থাকে। নতুন পুঙ্গলে যেন পূর্বের কর্মেরই সংযোগ বা আবর্তন (transfer) ঘটিয়া থাকে। নতুন সৃষ্ট ব্যক্তির পূর্বজন্মের জ্ঞান আবৃত থাকে মাজ, কিন্তু তিনি পূর্বজন্মের ব্যক্তিরই প্রবাহস্বরূপ। বৌদ্ধগণ এই স্থলে এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, যেমন—এক প্রদীপ হইতে জালিত অগ্নি প্রদীপ, এবং শেষোক্ত প্রদীপ হইতে জালিত ৭পর এক প্রদীপ এবং তাহা হইতে জালিত আর একটি ইত্যাদি; এবং এক আশ্রবীজ হইতে নতুন বৃক্ষ এবং তৎফলের বীজ হইতে অপর বৃক্ষ ইত্যাদি।

‘মিলিন্দ-পঞ-হে’ পাঠ করা যায় যে, রাজা মিলিন্দ স্ববির নাগসেনকে ক্রিজাসা করিয়াছিলেন—“ভণ্ডে নাগসেন, যো উল্লজ্জতি সো এব সো, উদাহ অঞ-এগেতি” ?—ভণ্ড নাগসেন, যিনি উৎপন্ন হন, তিনি কি তিনি (অর্থাৎ পূর্বেকার তিনি) অথবা অগ্নি কেহ ? স্ববিরের উত্তর হইল—“ন চ সো, ন চ অঞ-এগেতি”—তিনিও নহেন, অন্যও নহেন। রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে কথটি উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দিতে অল্পরোধ করায়, নাগসেন ‘রাজন, শিশু অবস্থার তুমি এবং বৃদ্ধ অবস্থার তুমিই যে বৃদ্ধ অবস্থার তুমিই রহ, না—ও তুমি রহ; প্রথম প্রহরের প্রদীপ যেমন মধ্যম ও পশ্চিম বা শেষ প্রহরের প্রদীপও রহে, না-ও তাহা রহে; দ্বন্দ্ব যেমন দধি, নবনীত ও ঘৃতও রহে, না-ও তৎসমুদয় রহে’ ইত্যাদি রূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, যিনি উৎপন্ন হন, তিনি তিনিও নহেন, অন্যও নহেন। দেখা যাইতেছে যে, যাহা ধর্মসম্বন্ধিত বা বস্তুর ধর্মপ্রবাহ তাহাই বস্তুতে সম্মিলিত হয়। যাহার নিরোধ ঘটে তাহারই ঠিক উৎপত্তি হয় না, কিন্তু নিরুৎপাদনের ধর্মপ্রবাহ উৎপাদ্যমান বস্তুতে সংক্রান্ত হয় মাজ।

নিজের পুনর্জন্ম আর হইবে কি না, মাছুষ তাহা কিরূপে জানিতে পারে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে নাগসেন রাজা

মিলনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, “যে হেতু যে পক্ষেরা পটিনন্দনায়, তস্ হেতুস তস্ পক্ষস্ উপরমো জানাতি সো—ন পটিনন্দনিসামীতি।”—পুনর্জন্মের যাহা হেতু, যাহা কারণ তাহার উপরমের দ্বারাই সে জানিতে পারিবে যে, আর তাহার পুনর্জন্ম হইবে না। জন্মান্তরপরিগ্রাহী পুঙ্গলে কি প্রকারে পূর্বজন্মের পাপকর্ম সংক্রান্ত হয়, তৎপ্রশ্নে সেই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, “কোন ব্যক্তি মরণ পর্যান্ত যেমন একপ্রকার নারক, আবার তাহার পুনর্জন্ম হইলে তিনি অন্য প্রকার নারক। তথাপি পরবর্তী নারক পূর্ববর্তী নারক হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য সে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে না।” আরও উক্ত হইয়াছে—“প্রথম নারক যে পাপ পুণ্য কর্ম আচরণ করে, তৎফলে পুনর্জন্মে পরবর্তী নারকও সেই কর্ম হইতে মুক্ত হয় না।”

বৌদ্ধদর্শনে কর্মই যেন একমাত্র সত্য পদার্থ, ইহাই ছায়া মত সর্বদা জীবের অহুসরণ করিয়া থাকে। কর্মবন্ধনই পুঙ্গলের স্বল্পপঞ্চকে আটকাইয়া রাখিয়াছে—এই কর্মফল-বশতঃ স্বল্পসমষ্টির পুঙ্গলের সংসৃতি বা পুনঃ পুনঃ জন্ম। এই জীবনপরম্পরায় জীব একও নয়, ভিন্ন নয়। হিন্দুদর্শনে জীব শরীরী ও ক্ষেত্রজ নামেও পরিচিত—এবং সেই দর্শনের উপদেশ এই যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবের পঞ্চভূতাত্মক (ষাটকোশিক) শরীর বা ক্ষেত্র পরিত্যক্ত হইলে, জীব বা পুরুষ আমোক্ষস্থায়ী লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর লইয়া সংসৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। বৌদ্ধমতে যখন জীব বা পুঙ্গল পঞ্চভূতাত্মক সমষ্টিবিশেষ, তখন ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। তাই ইহা বড় কঠিন কথা, কেমন করিয়া পুঙ্গলের যৌনভ্রমণ সম্ভবিত হয়। দৃশ্যতঃ অনাত্মবাদী বুদ্ধদেব পাপ ও পুণ্যের ফলে স্থলভূতভাগী জীবের জীবনসমস্তার সীমাংসা করিতে

উদ্যত হইয়া কর্মফলের বলবত্তা সম্বন্ধে এক অভিনব বিচারের প্রবর্তন করিয়াছেন। কর্মের আদি নাই—কিন্তু ইহার অন্ত হইতে পারে। আত্মজিক মার্গের অহুসরণ করিয়া কর্মফল নষ্ট করিতে পারিলে পুঙ্গলের নিকৃষ্ণাধি নির্বাণ লাভ হয়। এই দর্শনে আমার আশঙ্কা, তোমার তুমিহ ও তাহার তত্ত্ব কিছুই স্বীকৃত নাই। অথচ কোন অজ্ঞাত বা বা অজ্ঞেয় নিয়মানুসারে কর্মফল আমাকে তোমাকে ও তাহাকে পঞ্চস্বভাত্মক শরীরধারী করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিতে পারে, এবং এইভাবে জীবনপ্রবাহও আমোক্ষ চলিতে থাকে? বৌদ্ধ-গণের উত্তর এই হইবে যে, পুঙ্গলের সমস্ত উপাদান নষ্ট হইয়া গেলেও তাহার কর্মফল (হিন্দুর আত্মার মত) অবিনাশী এবং বৈদ্যাতিক শক্তির ন্যায় সেই কর্মশক্তি পুঙ্গলের বিজ্ঞেয়িত স্বল্পগুলিকে পুনঃ সংযোজিত করিয়া নব নব সৃষ্টিসাধনে সমর্থ হয়। ইহাই সংসৃতির অখণ্ড নিয়ম। প্রকৃতির বশে পড়িয়া কর্মকারী কোন পুরুষের বা ‘নিত্যোপলব্ধিরূপ’ আত্মার স্বাধীন বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন বুদ্ধদেব অস্বীকার করেন নাই।

তবে মোটামুটি এই মনে হয় যে, বৌদ্ধের ‘শূন্য’, বৈদ্যান্তিকের ‘ব্রহ্ম’, সাংখ্য ও পাতঞ্জলের ‘পুরুষ’ ও ‘ঈশ্বর’ এবং প্রথমের প্রতীত্য-সমুৎপাদ জন্ম ‘স্বল্পপ্রপঞ্চ’, দ্বিতীয়ের ‘মায়’ ও তৃতীয়ের ‘প্রাধান’ বা ‘প্রকৃতি’ প্রায় পরস্পর সমস্থানীয়।

ললিতবিস্তরের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি—

“চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশ-ব্যাধি-প্রপীড়িতে।

বৈদ্যরাষ্ট্রং সন্সংপন্নঃ সর্বব্যাধিপ্রমোচকঃ॥”

“হে বুদ্ধদেব, ক্লেশরূপ ব্যাধিরাষ্ট্র প্রপীড়িত হইয়া বহুকাল জীবলোক আতুর অবস্থায় পতিত রহিয়াছিল, তুমিই সর্বপ্রকার ব্যাধির প্রমোচন কারি রূপে বৈদ্যরাজ হইয়া সন্সংপন্ন হইয়াছিলে।”

আচার্য নন্দলাল বসু ও তাঁহার চিত্রকলা

শ্রীমণীশ্র ভূষণ গুপ্ত

মনে পড়িতেছে অনেক বছর আগে কোন একটা বাংলা দৈনিক কাগজে এক ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গকবিতা দেখিয়াছিলাম; বিষয় ছিল “রাজী পক্ষী নিরীক্ষণ করিতেছেন”। মনে পড়িতেছে কবিতাটা যেন এরূপ—

“সবেরঙের অগ্নিকণা
হাত দুটো ঠিক সাপের কণা
মৎস্যাক্ষা কিয়া নারী
সেইটি বোঝা শক্ত ভারি।”

সে দিন বোধ হয় আজ চলিয়া গিয়াছে। রাস্তায় যখন বাহির হই, চারিদিকে দেখি দেওয়ালে পোষ্টার; সাবান, এসেন্স, তেলের বিজ্ঞাপন। মাসিকপত্রে নানা চিত্র—সবটাত্তেই “তথাকথিত” ভারতীয় শিল্প চুকিয়া বসিয়াছে। “তথাকথিত” বলিলাম, কেননা ভারতীয় শিল্পের রূপ সম্বন্ধে নানা আলোচনা চলিতে পারে। সরিষাপড়া দিয়া ভূত ত্যাগন হয়, কিন্তু সরিষার ভিতর যদি ভূত চুকিয়া বসে, তবে ভূত ত্যাগইবার উপায় কি? আমার এই উক্তি একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিই।

বোধে স্থূল অব আর্ট নিজের স্বাতন্ত্র্য চলে; বাংলার নয়া পদ্ধতির অহসরণ করে না। কিন্তু সেখানকার শিল্পীরাও বলিয়া থাকেন যে তাঁহারাও ভারতীয় শিল্পের “রেনেসাঁ” বা পুনরুত্থান সম্বন্ধে চিন্তিত। ১৯২২ সনে বোধে স্থূল অব আর্ট পরিদর্শন করি। তথায় ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের কয়েকটি স্থলিকায়াল চিত্র দেখি—তাহার একটি গুপ্ত-যুগের চিত্র। একটি মেঘে সোজা দাঁড়াইয়া, গ্রীক মূর্তির ছায় নিখুঁত গড়ন, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ অজ্ঞতার মত, পিছনে আবার পরীর মত ডানা আছে। অজ্ঞতার পোষাক থাকা সত্ত্বেও ছবিখানি গুপ্ত-যুগ অপেক্ষা বিলাতের ভিক্টোরিয়া যুগের “প্রিয়াফেলসাইট” আর্টিষ্ট—রসেট, ওয়াটস, বা বার্ণ জোন্স প্রমুখ শিল্পীদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। ছবিখানির সবই বুঝিলাম, যানটমি ঠিক হইয়াছে, কোনো চিত্রপরিচয়ের দরকার নাই; কিন্তু অজ্ঞতার পোষাকটা যেন বিসদৃশ লাগে—এ যেন সরিষার ভিতর ভূতের প্রবেশ।

গুপ্ত-যুগের আবহাওয়া যদি সত্যি আনিতে হয়, তবে কিরূপ মূর্তি হইবে?

“মুখে তার লোখ রেণু লীলাপন্ন হাতে,
কণনুলে কুমকলি, কুমকুম মাথে
তমুদেহে রক্তাশ্রু নীলিখক বাধা,
চরণে নুপুরখানি বাজে আধা আধা।”

অথবা

“কার্ণাৎ দৈকতলীন হস্তমিবুনা শ্রোতবহাঙ্গালিনী
পাদান্তনুভিত্তো নিমগ্নহরিণী গৌরীশুরোঃ শাবনাঃ
শাখালবিত্ত বক্ষলস্য চ তত্তো নিম্নাত্তনিক্কামাখঃ
শুলে কুম্ভগঙ্গা স্বামনয়নঃ কণ্ডুমানাঃ বৃগীম্।”

এবং

সূক্তঃ ন কর্যাপিত যক্ষনঃ সপে শিরীষমাগন্ত বিলম্বী কেশরম্
নবা শরচ্ছত্র মরীচি কোমলঃ বৃণালপুংঃ রচিতং শুভানন্তরে

(শকুন্তলা)

গুপ্ত-যুগের আদর্শ চিত্র করিতে গিয়া বোম্বাইয়ের শিল্পী অজ্ঞতার আভরণখানি লইয়াছেন, তার স্পিরিট বা প্রাণ ধরিতে পারেন নাই। শিল্পের সেই প্রাণ কোথায়? বিশেষ ধরণে কাপড়-পরানোতে এবং অলঙ্কারে? শিল্পের এই প্রাণটুকু ধরিতে পারিলে শিল্পের ভাষা বোঝা হইল।

বাংলায় যে ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থান, তার উৎপত্তি ক্লাসিক্স হইতে। ক্লাসিকাল ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য হইতে তাহার প্রেরণা। কিন্তু যদি কেহ শুধু ক্লাসিক্স লইয়া থাকে, তার মন পঙ্ক হইয়া যাইতে পারে। নন্দলালের কাজে ক্লাসিকাল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্লাসিকাল ভারতকে তিনি তাঁর শিল্পে যেমন ব্যক্ত করিয়াছেন, অল্প কেহই তেমনটি করেন নাই। তাহা সত্ত্বেও নন্দলাল ক্লাসিক্স-এ বদ্ধ হইয়া থাকেন নাই, প্রকৃতি বা বর্তমানকে উপেক্ষা করেন নাই।

তাহার বালুকার উপরে গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের রৌত্র, তার মধ্যে তালপাতার ক্ষুর এক সবুজ শীষ মাখা তুলিয়াছে, যেন মরকত মণি জলিতেছে। আচার্য বসু মহাশয় তাঁর এক চিত্রকে বলিতেছেন, “দেখ, তালপাতার সবুজ পাতাটুকু যেন আগুনের ফুলকি, এ যদি আঁকা যায় এরই দাম হবে লাখ টাকা; এ ছবি কম কি? বুদ্ধ কি শিবের ছবি থেকে এ কম হবে কেন?”

এ যেন ক্লাসিকাল নন্দলাল হইতে শৃঙ্খল আর এক শিল্পীর উক্তি।

আমাদের জাতীয় রুষ্টির পরিপূরণের পক্ষে নন্দলালের কাজ কম নয়। বর্তমানে শিল্পজগতে ভারতের প্রতিনিধি যদি কেহ থাকে, তবে নন্দলালই হইতে পারেন। কি চিত্রশিল্পে কি মণ্ডনশিল্পে, তাঁর স্বাতন্ত্র্য সর্বদা ভিতরেই আছে। বাংলার খিয়েটারে নতুন রূপসজ্জার তাঁর কাজই কি কম? রবীন্দ্রনাথের ‘কান্তনী’, ‘তপতী’, ‘নটীর পূজা’, ‘শাপমোচন’, ‘তাসের দেশ’ প্রভৃতি নতুন ধরণের নাটিকা বাংলার নাট্যজগতে নতুন রূপলোকের সন্ধান দিয়াছে। তার শাস্ত্রসজ্জা পরিকল্পনা কোপাইয়াছে কে? নন্দলালের মত শিল্পীর হাত না পড়িলে রবীন্দ্রনাথের নাটিকার অর্ধেকই মারা যাইত।

শুধু বড় চিত্রে বা মাষ্টারপীসে নয়, পেন্সিল ড্রিং ও স্কেচেও তাঁর প্রতিভার ছাপ পড়ে। অটোগ্রাফের অর্থাৎ নানা জনের নামস্বাক্ষরের বহিতে তিনি যে-সব ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন, স্বজনী শক্তির পরিচয় তাহাতে কম পাওয়া যায় না। এ-সব কাজ কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। তাঁহার সম্মুখে অটোগ্রাফের খাতাখানা ধরিলে নিমেষে আঁকিয়া দেন—অনন্ত আকাশে উজ্জয়মান বলাকাশ্রৈণী, পদ্মনদীর বাসুর চর, পাল-তোলা নৌকা, হাঁস, মুরগী, কুকুর ছানাকে স্তম্ভদান করিতেছে, এক টুকরা পাখরকে বিরিয়া বর্ষার জলধারা চলিতেছে, কেমন ফুল ফুটিয়াছে, পলাশ গাছে রঙের উৎসব, বাছুর লাকাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে, হরিণের দল দৌড়াইতেছে, এমন কত কি!

তিনি যখন ভ্রমণে বাহির হন সঙ্গ থাকে একতাবা সাদা কার্ড, তাতে কত রকমের স্কেচের সংগ্রহ। এগুলি অনেক সময় ঝাঁক হয় খেলাচ্ছলে। শিল্পানুগামীরা কাছে যে এতে কেবল রেখার দৃঢ়তা, পেন্সিল তুলি চালাইবার অপূর্ব ক্ষমতা প্রকাশ পায় তাহা নহে—অনেক সময় ইহার ভিতর পাওয়া যায় শিল্পীর একটি প্রচ্ছন্ন হিউমার বা অনাবিল হাস্তরস।

তিনি অল্প আর্টিষ্টদের বা তাঁর ছাত্রদের কাছে যখন চিঠি লেখেন, তার ভিতর লেখা বিশেষ কিছু থাকে না, ছবি আঁকা থাকে। শান্তিনিকেতনে গই পৌষের মেলা উপলক্ষে সাদা কার্ডে ছবি আঁকা হয়, মেলায় নাযাত্রা নামে এগুলি বিক্রী হয়। নববর্ষ বা অল্প কোন সময়ে শুভ ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে এগুলির ব্যবহার হয়। নন্দলালের স্কেচ (স্কেচা)

ও পোট কার্ডের ছবি জাপানের বিখ্যাত আর্টিষ্ট হোকুসাইর কাজকে স্মরণ করাইয়া দিবে। দুই শিল্পীর যেন এ-বিষয়ে খুবই নিকট সম্বন্ধ। জাপানীরা নববর্ষে ছোট ছোট ছবি পাঠাইয়া বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছে শুভ ইচ্ছা জানাইয়া থাকে। এ-সব ছবিকে জাপানীরা বলে সুরিমোনো (Surimono) হোকুসাইর ভিজাইন (এগুলি হইত রঙীন উডকাটের ছবি) করা। সুরিমোনো জাপানীদের কাছে খুব আদৃত ছিল, এগুলির সহিত শান্তিনিকেতনের গই পৌষের কার্ডের যেন সাদৃশ্য আছে। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে-আর্টিষ্ট চিত্র দেওয়া গেল, এগুলি গই পৌষের কার্ড। লরেন্স বিনিয়ন যেমন হোকুসাইর ছবি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, সেইরূপ নন্দলালের কার্ডের ছবি সম্বন্ধে বলিতে পারি—“কল্পনা ও মাধুর্যে অফুরন্ত; শিল্পীর পরিপক্ব ক্ষমতা ব্যক্ত করে...তাঁর অল্পসঙ্কীর্ণ চক্ষু এবং লিপিকুশল হাতের কাছে প্রকৃতির কিছুই এড়ায় না, প্রকৃতির সকল বস্তু তাঁর গতিমান রেখাপাতে মূর্ত হইয়া উঠে।”

নন্দলালের অটোগ্রাফ এবং অন্যান্য স্কেচ সংগ্রহ করিতে পারিলে ভারতীয় শিল্পের একটি অপূর্ব শমগ্রী হইতে পারে।

বৈষ্ণব গান আছে “কাহু ছাড়া গীত নাই।” তিনি তাঁর স্বজনী শক্তিকে “কাহুর গীতে” বা কোনো বিশেষ বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তাঁর প্রতিভা “নবনবোন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি” শিল্পের বিভিন্ন দিকে প্রকাশিত হইয়াছে। নানা কারুক্ষেত্রে তাঁর যত পাওয়া যায়। কারুশিল্পকে তিনি তাঁর চিত্র অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন না। একবার এক আমেরিকান আর্টিষ্টের কাছে নন্দলালকে আর্টিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তিনি উত্তর দেন—“আমি আর্টিষ্ট নই—কারিগর মাত্র।” শুধন সেই আমেরিকান বলেন—“তাহলে আমি জানি না যে আমি কি।”

কারুশিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে ও ক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। বিভিন্ন শিল্পীজ্ঞানোচিত উপকরণে যন্ত্রনা দেওয়ার চেষ্টা—কাগজ, সিল্ক, মাটি, কাঠ, পাথর, রবার প্রভৃতিতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা—বিভিন্ন উপকরণে ব্যস্তির ছাপ ফোটান তাঁর বৈশিষ্ট্য। উডকাট, লিনোক্যাট, লিথো, বাটিক ওয়ার্ক, টুকো, টেরাকোটা, মূর্তি নির্মাণ প্রভৃতি সকল কাজই তিনি করিয়াছেন। সকল কাজেই দেখা যায় তাঁর মণ্ডনশিল্পের ক্ষমতা। তাঁর চিত্রের ভিতরে আছে আকারসজ্জা পৌষা।

তিনি যে কয়টি মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় তিনি যদি চিত্রকর না হইয়া ভাস্কর হইতেন তবে একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলিয়া পরিচিত হইতেন। গণেশ, নটীর পূজা প্রভৃতি মূর্তিতে তাঁর মূর্তি-নির্মাণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর তুলির টানে যে লিপিকুশলতা বা ক্যালিগ্রাফির পরিচয়, মূর্তি নির্মাণেও সে-রকম, আঙুলের টানে গঠনের (moulding) পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন কালের চিত্রকররা, আমাদের দেশেই হউক বা ইউরোপেই হউক, শুধু চিত্রকর ছিলেন না। তাঁহারা কারিগরও, ছিলেন; তাঁহারা ছিলেন—এনগ্রেভার, স্বর্ণকার, ভাস্কর, স্থপতি ইত্যাদি। বর্তমানে জগতের শিল্পীদেরও বৌদ্ধ বোধ হয় এদিকে; শিল্পীর পরিকল্পনাকে নানা কারুকার্যে প্রকাশ করা। বাংলার নয়া শিল্পীদের যে আজকাল নানা কারুশিল্পে মনোনিবেশ করিতে দেখা যায়, তাঁর আরম্ভ নন্দলাল হইতে।

বাংলার এই নয়া শিল্পীদের গোড়াপত্তন করিয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ ত্রিংশ বৎসর পূর্বে। অবনীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে লিখিয়াছিলেন “ভারতীয় শিল্প”। তার ভিতর একটা রক্ষণশীলতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। তখন হয়ত এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল—নয়া পদ্ধতিকে প্রকাশের জন্য। এখন “ইণ্ডিয়ান আর্ট” এই নামের আওতার অনেক আগাছা জন্মিতেছে। যে-সব চিত্র বাহির হইতেছে, তাহার ভিতর না-আছে মৌলিকতা, না-আছে রেখা বা বর্ণের মৌল্য। তাহার ভিতর কোনো অঙ্গুলীন নাই; অঙ্গুসন্ধিসা নাই, পর্যবেক্ষণ নাই—আছে কেবল মান্যারিজ্জ্ বা মূত্রাদোষ। যে-সব বিষয় লইয়া চিত্র রচনা কর; হয়, আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ও চারি দিকের আবেষ্টনের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই। কল্পনার অসংযত দৌড় তাহাতে খুব বেশী। বর্তমানের অনেক চিত্র বেশী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি কোথায় মিগিরে? প্রকৃতির ভিতরে শক্তি মিগিরে। শিল্পী প্রকৃতির কোড়ে কিরিয়া পেলেই নবজীবন ও নবচেতনা লাভ করিবে। এই যে প্রকৃতির

ভিতর কিরিয়া যাওয়া—Back to Nature—এর নীতি—এর থেকে উৎপত্তি “রোমান্টিসিজম্”। ইউরোপে উদ্ভূত রেনেসাঁর শিল্প ক্রমশঃ বহু বিদ্যার ভারাক্রান্ত প্রাণহীন ইণ্টেলেকচুয়ালিজম্ দ্বারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃতির ভিতরে শিল্পীরা পাইল সহজ সরল মুক্তির আশ্বাস।



কুকুরখানা

অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পে যদি রেনেসাঁ আনিয়া থাকেন, তবে নন্দলাল আনিয়াছেন রোমান্টিসিজম্। নৈসর্গিক যে-সব চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন বা স্কেচ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার উদাহরণ মিগিরে। এ-বিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ “প্রত্যাবর্তন” নামে একটি বড় পেন্সিল ড্রম্ভের চিত্র। সাঁওতাল পুরুষ বহুদিন পরে প্রবাস হইতে ফিরিয়াছে, দরজার পাড়াইয়া স্ত্রী, বিশ্বয়বিমুখ, আনন্দের আভির্ভাষে বাক্য স্মার সরে না। রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে এর নীচে নিজের গান লিখিয়া দিয়াছেন—“ফিরে চল মাটির টানে।” সমস্ত ছবির স্বর যেন এই গানের ভিতর পাওয়া যায়, আর রোমান্টিসিজমের উদ্দেশ্যই এই—“ফিরে চল মাটির টানে।” Back to Nature—শিল্পের বহুদুঃখিত হইবে মুক্ত আকাশে, প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।

“ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি” সৃষ্টি করিয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ, তাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন নন্দলাল। এ-সময়ে নন্দলালের সম্বন্ধে যে আলোচনা হওয়া উচিত তা বলাই বাহুল্য।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে খড়গপুরে নন্দলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন সেখানে দ্বারভাণ্ডার। ষ্টেটের ম্যানেজার। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয় খড়গপুরের মিডল ভার্ণাকুলার স্কুলে। পনের বছর অবধি এখানে কাটে; হিন্দী ভাষাতেই



বানরওয়ালা

শিক্ষা পাইয়া থাকেন। এই স্কুল হইতে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় জুদিরাম বোসের স্কুলে (সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল) ভর্তি হন—এখানে কুড়ি বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একশু বছরে তাঁর বিবাহ হয়।

ইহার পর তিনি আট স্কুলে ভর্তি হইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু অভিভাবকদের অসহমতি মিলিল না, তাঁহাকে বি-এ পাস করিতে হইবে। তিনি জেনেরাল এ্যাসেম্বলীতে এক-এ ক্লাসে ভর্তি হইলেন। এক-এ ফেল করিয়া মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হইলেন,

এখানেও এক-এ ফেল করিলেন। দাদাধন্তর মশায় ছিলেন অভিভাবক, তিনি বেলগাছিয়ার আর. জি. কবের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইতে বলিলেন। নন্দলালের মেডিক্যাল কলেজ ভাল লাগিল না। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন কমান্ডার্স (বাণিজ্য-বিষয়ক) ক্লাস ছিল, মি: চ্যাপম্যান ছিলেন তার প্রিন্সিপাল; তিনি সেখানে ভর্তি হইলেন। ছয় মাস ছিলেন সেখানে—কিন্তু পড়াশুনা কিছুই করেন নাই, বইও কেনা হয় নাই, ছয় মাসের মাহিনাও দেওয়া হয় নাই। তখন ভাবিল কি দিলেই কলেজে প্রবেশ করা যাইত। তিনি মাহিনার টাকা দিয়া হারিসন রোডের মোড়ে পুরাতন বইয়ের দোকান হইতে ছবির ম্যাগাজিন কিনিতেন।



গাঁওতাল-কনরা

কমান্ডার্স ক্লাসে যখন কিছু হইল না, দাদাধন্তর মশায়কে বার দকা দিয়া এক চিঠি লিখিলেন—(১) কমান্ডার্স ক্লাস ভাল লাগে না; (২) ক্লাক হইলে বড়-জোর ঘাট টাকা রোজগার করিবেন, কিন্তু আর্টের লাইনে গেলে এক শত টাকা আসে



চিত্রকর

নিশ্চয়ই রোজগার হইবে ইত্যাদি। আর্টস্কুলে ভর্তি হওয়ার অহুমতি আসিল। কিন্তু এর আগেই তিনি আর্ট স্কুলে ভর্তি হইয়া গিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র ‘বৃদ্ধ ও স্ত্রীজাতা’ এবং ‘বজ্র মুহূর্ত’ পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। এই চিত্র দেখিয়া এন্ট্রান্স পাস করার পরই তিনি স্থির করিয়াছিলেন অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য হইবেন। একদিন তিনি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন; সঙ্গে ছিল নিজের আঁকা কয়েকখানা চিত্র—রাক্ষসের যেডোনার নকল, সন্ পেক্টিং, গ্রীক মূর্তির নকল, still life painting ও কাপড়ের চিত্র। অবনীন্দ্রনাথ চিত্র দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন—“ইন্সুল পালিয়ে আসা হয়েছে?” উত্তর, “না, এন্ট্রান্স পাস করে এসেছি।” “বিশ্বাস হয় না, সার্টিফিকেট দেখতে চাই।” নন্দলাল সার্টিফিকেট দেখাইয়া ভর্তি হন।

আর্ট-স্কুলে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে হাভেল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন; হাভেল নন্দলালের চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হন। ঈশ্বরীবাবুর নিকট ডিজাইনের ক্লাসে নন্দলাল ভর্তি হইলেন। তিনিই ডিজাইনের ক্লাসে প্রথম ছাত্র। তখন এই বিভাগের ছাত্রেরা stained glass

stencilling ও jesso work করিত। নন্দলাল কতক সময় করিভেন ডিজাইন, কতক সময় কারিগরের কাজ—কাঁচ কাটা ইত্যাদি।

ভর্তির সময় ঈশ্বরীবাবু পরীক্ষা করিলেন, গণেশ আঁকিতে দিলেন; নন্দলালের কাজ দেখিয়া অবনীন্দ্রনাথ বলিলেন, “হাত পোক্ত হার।” हरिनारायणবাবুর কাছে মডেল ড্রয়িংয়ের পরীক্ষা হইল। টেবিলের উপর কুঁজা, বাটি সাজান। हरिनारायणবাবু ঘড়ি ধরিয়া বলিলেন, “সব পনের মিনিটের মধ্যে আঁকতে হবে।” নন্দলাল দুই ইঞ্চি জায়গার ভিতর সব আঁকিয়া দিলেন পাঁচ মিনিটের ভিতর। हरिनारायणবাবু বলিলেন, “ও, তুমি ফাঁকি দিয়েছ, ও-সব হবে না।” অবনীন্দ্রনাথ বলিলেন, “ঠিক হয়েছে—সবই তো আছে।”

ভবিষ্যতের “ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির” বীজ উগ্ঠ হইল, একা নন্দলালকে লইয়া কাজ আরম্ভ হইল।

বাংলা নন্দলালের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল মূর্তি-নির্মাণ রূপে। খড়াপুরে থাকিতে তিনি কুস্তকারের কাজ দেখিয়া মুগ্ধ-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন। চিত্রাঙ্কনের পূর্বে তাঁহার মূর্তিনির্মাণ শিক্ষা আরম্ভ হয়। কলিকাতায় আসিয়া

স্কুলে পড়িবার সময় তিনি ডয়িং ক্লাসেই সর্বপ্রথম ছবি আঁকিবার উৎসাহ পান। কলেজে ভর্তি হইলে ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে কবিতার বই পড়ানো হইত তাহার পাতার দুই পাশে বর্ণনীয় বিষয়ের ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দলাল আর্ট-স্কুলে পাঁচ বছর ছিলেন, সেখানে মাছিয়া



হরিণ

দিতে হইত না। বছর দুই পরে বার-তের টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতে থাকেন।

ক্লাসে সর্বপ্রথম তিনি যে চিত্র অঙ্কিত করেন তাহার বিষয়—বুদ্ধ হাঁস কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি হাঁসের পা আঁকিয়াছিলেন গোল, অবনীন্দ্রনাথ শুদ্ধ করিয়া দেন। ছাত্তেল সাহেব এই ছবি দেখিয়া খুব থুশী হন, আর বলেন, “বেশ হয়েছে, বেশ অর্গামেন্টাল ছবি।” নন্দলালের আর্টস্কুলে আসার আট-দশ মাস পরে ছাত্তেল সাহেবের মৃত্যু বিকৃত হয়। তিনি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে অবনীন্দ্রনাথ চার বছর অস্থায়ীভাবে প্রিন্সিপালের কাজ করেন। বাঙালীকে এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করা তখন সরকারের নীতিবিরুদ্ধ ছিল।

অবনীন্দ্রনাথ স্কুলে বসিয়া নিজে ছবি আঁকিতেন, তাহাতে ছেলেরা ভাল শিক্ষা হইত। তাহার প্রথম ছবি “বন্ধুত্ব” বন্ধুত্বের ব্যাপারে আঁকা অশ্বশী ভাবের ছবি।

আর্ট-স্কুলে আঁকা নন্দলালের ছবি সতী, শিবসতী, কর্ণ, তাণ্ডবনৃত্য, বোতালপকবিশিষ্ট, ভীমের প্রতিজ্ঞা, গান্ধারী, শূরভট্ট-সম্মত ইত্যাদি।

যোগল চিত্র সকল এখন যাদুঘরে থাকে, আগে এগুলি ডিক্রাইনের ক্লাসে টাঙান থাকিত। এই ছবির চার পাঁচখানা নন্দলাল নকল করেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে শিবসতী চিত্রের জন্য তিনি পাঁচ শত টাকা পুরস্কার পান। এই টাকায় তিনি মথুরা অবধি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

যখন আর্ট-স্কুল ত্যাগ করেন, তখন পার্সি ব্রাউন সাহেব স্কুলের প্রিন্সিপাল। তিনি বলিলেন, “এখানেই কাজ কর, এখানে জায়গা পাবে।” অবনীন্দ্রনাথও ভাবিলেন তাঁর বাড়িতে থাকিয়া কাজ করার জন্য। নন্দলাল ব্রাউন সাহেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অবনীন্দ্রনাথের নিয়ন্ত্রণই গ্রহণ করিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাহাকে ষাট টাকা করিয়া একটা বৃত্তি প্রায় তিন বছর দিয়াছিলেন। এ সময়ে নন্দলাল নিবেদিতার *Indian Myths of Hindoos and Buddhists* পুস্তকের চিত্র আঁকেন। ডক্টর আনন্দ কুমারশাস্ত্রী আসিয়া অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের সংগ্রহে যে প্রাচীন চিত্র আছে তাহার তালিকা করিতে নন্দলাল সাহায্য করেন।



হাস

বিলম্ব হইতে লেডী হেরিংহাম আসেন অজুটায় প্রতিমূর্তি লওয়ার জন্য। নন্দলাল এবং অসিতকুমার হালদারকে অবনীন্দ্রনাথ অজুটায় পাঠান, পরে আসিয়া ছুটিলেন ভেক্ট আপ.পা এবং সময় গুপ্ত।

অঙ্কটর এই অভিযান নূতন পদ্ধতিকে একটা স্থান দিচ্ছে।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যগণ শিল্পীদের একটা উপনিবেশ স্থাপন করার জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। বাড়িও একটা দেখা হইয়াছিল। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়িল। ১৯১৬ সনে কবি জোড়াসাঁকোর নিজ বাড়িতে “বিচিত্রা” স্থাপন করেন। শিল্প কারুকার্য প্রভৃতির সৌকর্য্য এই



গরু

“বিচিত্রা” মণ্ডলীর উদ্বোধন। নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার, মুকুল দে ও সুরেন্দ্রনাথ কর বিচিত্রার শিল্পী নিযুক্ত হইলেন। সকলের বাট টাক। করিয়া মাসিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছিল। মুকুল দে তখন আমেরিকা জাপান ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

জাপানের খ্যাতিমায়া শিল্পী আরাই সান এ-সময়ে কলিকাতায় আসেন। তিনি বিচিত্রার অতিথি ছিলেন।

বিচিত্রা উঠিয়া যাইবার পর নন্দলাল ঐযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী প্রতিমা দেবীর শিক্ষকতার কাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন। এর পরে তিনি নিজের দেশে হাওড়া জেলায় রাজপল্ল গ্রামে অবস্থান করেন। এ-সময়ে আর্কেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বাড়ির জন্ত মহাভারতের চিত্র ও তাঁর ল্যাবরেটরীর চিত্র। দেশে অবস্থানকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বিশ্বভারতী স্থাপিত হইলে নন্দলাল কলাভবনের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন—



শান্তিনিকেতনের গল্পকথক

পূর্বে কিছুদিন কলিকাতায় ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির অধ্যক্ষ ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে নন্দলালের জীবনের এক কর্মধারার এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। শিল্পী-জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে তাঁহার মানবতা ও আদর্শবাদ। তাঁর ভাগ্য ও জীবনের সাধনাকে অবলম্বন করিয়া শিল্পের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

অর্থলিপ্সা তাঁহাকে সাধনা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে

নাই; বাজারের চাহিদা অহুযায়ী শিল্প সৃষ্টি করিয়া তিনি শিল্পকে সস্তা ও খেলো করেন নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ যেমন শিল্পের নূতন ধারার, নূতন অভিব্যক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার শিল্পেও তেমন নূতনের অভিব্যক্তি আছে। তাঁহার শিল্পে ভারতের শিল্পযুগের নূতন অধ্যায় স্থচিত হইবে। তিনি “সিদ্ধ শিল্পী”।

নন্দলালের অসামান্য প্রতিভার আকৃষ্ট হইয়া বাংলার নানা

জেলা হইতে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে, অন্ধ্র, তামিল, মালাবারী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, রাজপুত ছাত্র আসিয়াছে। এমন কি হৃদয় সীমান্ত-প্রদেশ, সিংহল ও জাভা হইতেও ছাত্র আসিয়াছে।

নন্দলালের বহুমুখী প্রাতিভা শুধু শিল্পসৃষ্টিতে নিঃশেষিত হয় নাই, তিনি শিল্পীও সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিবে।

একটি মেয়ে

শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল ভাট্টা

“হচ্চে কি?”

প্রশ্ন থেকেই বুঝতে পারছেন, যিনি প্রশ্নকর্তা তিনি হচ্ছেন শাস্ত্রমতে আমার হৃদয়-মনের অধীশ্বরী আর লোকমতে আমি তাঁর খুঁটিতে বাঁধা, একান্ত তাঁরই বলে ছাপমারা একটি বুদ্ধিহীন জীবিশেষ।

হ্যানটি হচ্ছে ছাদের ঘর। একটা টেবিল—তার ওপর কাগজ ছড়ানো, এক দিকে একটা দোয়াত আর এক দিকে একটা কলম। আমার সামনেই খোলা জানলা এবং জানলার ঠিক পাশেই একটা আয়না। আয়নার ওপর একটু চোখ ঘুরিয়ে নিলেই দেখা যাবে, আমার পিছনে দাঁড়িয়ে শাড়ীবেষ্টিত একটি নারীমূর্তি এবং তাঁর চোখের কোণে অর্ধাংশ অপাঙ্গে একটু বক্ররেখা।

“দেখতেই পাচ্চ?”

বেশ সহজ ও মোলায়েম কণ্ঠস্বরে প্রত্যেক বর্ণটি স্পষ্ট করে উচ্চারিত উত্তর।

আয়নার দেখা গেল, রেখার বক্রিমতা বেড়েছে, আশেপাশে লক্ষী দেখা দিয়েছে।

“বসে বসে কুঁড়েমি করে সময় কাটাতে লক্ষ্য করে না?”

“উপায় কি?”

“বলতে লজ্জা করল না? রোজ্ঞ ধানিকরণ করে

ছেলেমেয়েদের খরলেও ত লংসারের একটু আর দেখে—”

তারপরেই যে আঙুরাট্টা সহসা থর হতেই কীণ হয়ে

মিলিয়ে গেল তার নাম দেওয়া যেতে পারে স-রাগে স-শব্দে ক্ষত প্রস্থান।

প্রিয়া দিয়ে গেলেন একটা আর্থিক তত্ত্ব। টংকা আনা পাইয়ের হিসাব ক’বে এর ওপর একটা বড় প্রবন্ধ লেখা চলে। আমার মত নিষ্কর্ষা ব্যক্তির তাই কর্তব্য এবং তারপর তার জন্তে অহুশোচনা করা। কিন্তু সামনের এই জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে গাঢ় নীল রঙের একটুখানি আকাশ আর তারই এক কোণায় একটা ছোট্ট নক্ষত্র, সন্ধ্যার আভালে অস্পষ্টভাবে বিক্মিক্ করা হুক করেছে। অর্থশাস্ত্রের কেসাবে নক্ষত্রদের কোনো কথাই লেখা নেই।

তাই ভাবচি—কাগজ, কলম, দোয়াতও সামনে হাজির—

হঠাৎ দেখা গেল, মনটা হয়ে উঠেছে রূপকথার সেই অতি বৃহৎ পাখীটির মত, আকাশের বকে বিশাল পক্ষপুট বিস্তার করে উড়ে চলচে ওই নক্ষত্রলোকটি লক্ষ্য করে। পৃথিবীর লতা পাতা গাছ, ঘর বাড়ি ছাট, মাছ পশু পাখী, তাদের অসংখ্য বিচিত্র কলকাকলি—সবই একে একে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাচ্ছে। তারপর নক্ষত্রলোক পৌছে জানা গুটিয়ে স্থির হয়ে বসল ওর ছাদে। বসে বসে সন্দেশে নিরীক্ষণ করতে লাগল তার পরিত্যক্ত নিশ্চিহ্ন-জীবন পৃথিবীটাকে।

দেখতে লাগল একটা অভ্যন্তরীণ অগ্নিমণ্ডলকে পরিবেষ্টন করে ঐ ঘাটির তাল জড়পিণ্ড পৃথিবীটা বিপুল বেগে

ঘুরে। একটি নিরুদ্দেশ অন্ধ গতি। ছুটতে আর তার সঙ্গে বোধ করি একটু দুলচেও।

আরও পরে দেখা গেল, ঐ চলন্ত পৃথিবীর বুকে অকস্মাতঃ জেগে উঠেছে একটি মুখ। একটি মেয়ের মুখ। কবি-প্রসিদ্ধ উপমায় বলা যায়, পদ্মপত্রের ঢাকা সরোবরের মাঝখানে ফুটে উঠল কমলদল, যেন অরুণোদয়ে একটি স্বাত্র সন্ধ্যাকোটা স্বর্গমুখীর নিঃশব্দ নিরাড়ম্বর প্রগতি।

একটি মেয়ের মুখ। ডাগর ডাগর ছুটি চোখ। চোখের তারা স্থির থাকলেও মনে হয় যেন ওর চাকলা ঐ স্বৈর্য উপচে বেয়ে পড়ছে। পাতলা ছুটি চোঁট, লাল টুকটুকে। গাল ছুটি ঈষৎ ভারি, ওর হাসিভরা মুখে সর্কুদাই টোল খেয়ে আছে। একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল, কান ঢেকে রুম্বাকার মত বুলচে।

কেউ কেউ মনে করতেন, শুধু প্রেম করার জগ্জেই বুঝি ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে-কথা এখনও ঠিক ক'রে বলতে পারচিনে; তবে প্রেম করার বয়সে ওর প্রেমে হয়ত অনেকই পড়বে,—সে-বয়সে পৌঁছতে ওর ঢের দেয়। ওর গলায় ঐ যে ছোট্ট ভাঁজের রেখাটি দেখা যাচ্ছে, বয়স-কালে এটি হয়ে উঠবে আশ্চর্য বস্তু; তখন মনে হবে ঐ পেলব রেখাটির আদেশ সব চেয়ে কঠিন আর অনতিক্রম্য।

ওর গানের রং চাপার মত হওয়াই উচিত। সত্যিই তাই; চাপার মত নরম, মৃদু, আলো-করা। ও যখন বড় হয়ে ব্রীড়ার মুখ নেবে ঘুরিয়ে, তখন ওর গণ্ডে দেখা দেবে রক্তোক্তাসের প্রাণব্যঞ্জন। সেই জগ্জেই ত ওর রং হয়েছে অত গৌর আর ও হয়েছে গৌরী।

বিরল বিজ্ঞান প্রান্তে ফুলের মত ছোট্ট একটি মেয়ে অকারণ খেলায় সর্বক্ষণ মত্ত, খলখলিয়ে হাসে, আপন মনে মাথা নাড়ে, চুলগুলো এসে পড়ে কানের ওপর, চোখের ওপর, আর সেই সঙ্গে ফুলে ওঠে সমগ্র পৃথিবীটা। নিরু-রিণীর মত ওর দুঃস্বপ্ন চাকলা, ফুলের সীমানা পেরিয়ে দূর দিকচক্রবালে তার আভাস বার হারিয়ে।

ওকে দেখে আমার মনটা খুশীতে ভরে উঠেছে। আমার ইচ্ছে করচে ওকে ডেকে ওর সঙ্গে দু-বণ্ড আলাপ করি।

“ও খুকী, ও খুকী, শোনো।”

ও চোখ তুলে চাইলে।

“তোমার নাম কি খুকী?”

অনুটি ক'রে তাকিয়ে ও বললে “খোত, বলব না।” তার বলার ভঙ্গীটা এই যে, নাম জিজ্ঞাসা করলেই যে বলতে হবে তার কোনো মানে নেই।

“ও খুকী, শোনই না। তুমি কি খেলা খেলচো?”

“বেশ করচি”—ব'লেই সে দিল ছুট।

ও আমার সঙ্গে ভাব করতে চায় না।

এতক্ষণ ওই ছিল আলো ক'রে, আর চারপাশে অন্ধকার, —কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এখন দেখা গেল ওর বিধবা মাসী বলচেন, “কোথায় ছুটে চললি ওরে হতভাগী মেয়ে? তোমরা কি কেউ গোরীকে একটুখুও শাসন করবে না?... ”

তোমরা অর্থাৎ গোরীর মা ও পিসি বন্ধার দিয়ে উঠলেন, “মেয়েটা গেল কোথায়? আন তো ধরে—”

গৌরী ততক্ষণে বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার আশ্রয় নিয়েছে। প্রশ্ন করচে, “দাদু, তোমার মাথায় নোংরা কেন? কালো-কালো চুল তুলে দেবো?”

গৌরী বড়ই চঞ্চল, বড়ই অস্থির। ওর মা-পিসি-মাসীর সর্বক্ষণ ওকে নিয়েই ব্যস্ত। বাপও চিন্তিত,—“তাই তো মেয়েটা বড় হ'লে...”

বাড়িতে ছেলেমেয়ের অভাব নেই, কিন্তু তাদের সঙ্গে গৌরীর বনে না, বড়র শাসন মানতে চায় না, বরঞ্চ উন্টে ও-ই করতে যায় শাসন। যেমন দুঃস্বপ্ন তেমনি অবাধ্য মেয়ে। দয়ামাত্রা যেন ওর মধ্যে স্থান পায় নি, স্নেহোণ পেলই ভাইবোনদের ধ'রে অকারণেই মারে।

তবু সর্বক্ষণই ও কোঁচুকে ভরা। কেউ আছাড় খেতে পড়লে ও ওঠে খলখলিয়ে হেসে, যেন লোকের আছাড় খাওয়া ওর হাসির খোরাক যোগান দেওয়ার জন্যেই।

নোংরা ওর বড় ঘেরা। কাকুর নাকে সর্দি বরতে দেখলে ওর গা বমি-বমি করে, তাই মলমূত্রের ত্রিসীমানা দিয়ে যায় না। মাসী পিসি রেগে আগুন হয়ে বলেন, “ওরে হতভাগি, মেয়ে হয়ে জমালা কেন?”

গৌরী উত্তর দেয়, “বেশ করেচি, খুব করেচি।” ওরা করেন জোর, মেয়ে দাঁড়ায় বৈকে। মা মঙ্গলচণ্ডীর পারে গৌরীর মা প্রগতি জানান, “হে মা মঙ্গলচণ্ডী, মুখ তুলে চেয়ো, বয়সকালে মেয়ের বুদ্ধিভক্তি ওখরে দিও।”

গৌরীর দোষ অনেক, তবুও একে আমার খুব ভাল লাগে। পিসি-মাসীর কাছে ওর বা দোষ, হৃদয় নন্দ্যলোকে বসে আমি দেখি, তাই যেন মুক্তির হাসির টুকরো। ওর যত কিছু মাধুর্য ওর অস্থিরতায়। ওর চঞ্চলতা দিকদিগন্তে প্রাণের ঢেউ তোলে। ও যেন একটা জাগরণ, একটা অবিকল্পিত মিষ্টি হাসি, ভোরের ধরণার কলকলানির স্বর। তাই পুতুলখেলার ওর মন বসতে চায় না, ও চায় প্রাণের আনন্দে অকারণে ছুটে বেড়াতে বন-হরিণীর মত। ওকে কি বাঁধা যায় ?

তবুও গৌরী হ'ল বড়, শিশল কিছু লেখাপড়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামলা ঘরকন্নার, রান্নাবান্নার কাজে। কিন্তু ঘেরা তাকে ছাড়ল না, নোংরা পরিষ্কার করতে হলেই ও এখনও ঝিম করে। হুযোগ পেলেই তুটু মিও করে। পেয়ারাগাছে যে ছেলোটা ওঠে তাকে ও ক্ষেপায়, আবার তার সঙ্গে ভাব ক'রে পেয়ারা পাড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাগ বুঝে নেয়। ছোট ভাইবোনদের ওপর তেমনি কঠিন শাসন চলে, তারপর মুখ বুজে বসুনি যায়।

ওর মেহে পড়চে আট-স টি-বাঁধন, চলন হ'তে শুরু করেছে ভারী, ঘরে হ'তে চলেচে বন্দিনী। তবুও ওর মনটা আছে ছাড়া; জানলার ধারে, চিকের ফাঁকে, ছাদের উন্মুক্ততায় ও পায় মুক্তি; ওর মন আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় প্রান্তরে প্রান্তরে খুঁচি বিলিয়ে।

তারপর একদিন বাজল সানাই করুণ হুরে। আলো ও কোলাহলের মধ্যে দিয়ে একরাতে গৌরীর আঁচলটি বাঁধা পড়ল এক তরুণের উত্তরীয়ে। খেয়ে চলেচে অচেনা অজানা ঘরে। মা ঘুরেফিরে চোখের জলে ভিজ়ে বারংবার উপদেশ দেন, “দেখিস মা, জোরে হাসিস না, শান্তভাৱী ননদের কথা শুনে চলবি, যুগটি বুজে সব কাজ করবি”—ইত্যাদি।

গৌরী এল খুশরবাড়ি। ওর একদিকে শান্তভাৱী, জা, নন্দ; আর একদিকে বগুন; ভাস্কর, দেওর; তার সঙ্গে উৎসুক দানবাসীর দৃষ্টি আর প্রতিবেশীদের নানা মন্তব্য। তাই ওকে এখানে যা ফেলতে হয় গুণে গুণে। অবশেষে আবৃত্ত হাশ্বতে হয় ওর আকাশে-ওড়া চঞ্চল দৃষ্টি।

গৌরীর স্বর দেখতে বন্ধ নয়, হুজীই বলা চলে। এরই মধ্যে

গৌরী বরের চলনের ছন্দ, পায়ের শব্দ চিনে ফেলেচে। তার আভাস কানে গেলেই ও হয় খুব জড়ো-সড়ো, হাতের চুড়ী অকারণে বেজে উঠে ওর অবস্থিতি জানিয়ে দেয়। ননদেরা হেসে পরম্পরের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। উদ্যত হাসি চাপতে গৌরী ওষ্ঠাধর দাঁতে চেপে ধরে।

আমার চোখ জলে ভরে উঠতে চাইচে। চাকল্যের ধারা বন্দিনী হয়ে হয়েছে বুঝি কষ্ট !

মহাশব্দের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবচি, প্রাণ ত পড়ল বাঁধা, ওর আকাশ কি আর থাকবে তেমন বড়, তেমন দিগন্ত-প্রসারিত ? সেখানে কি আর মেঘের গায়ে অহেতুক রঙের লীলা দেখতে পাব ?

রাজে গৌরীর বর আসে ওর গা-ঘেঁষে, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, “তোমায় আমি খুব ভালবাসি, গৌরী—খুব ভালবাসি।...”

এই হুযোগে অতি সজোপনে ও বরকে চিম্টি কাটে। “ওঃ,” বলে ওর বর সরে যায়। ও খুব ব্যস্ত হয়ে বলে, “কিছু কামড়ালো নাকি ? ওমা, বিছে এল কোথেকে ?”

ওর বর লাকিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ে। আর সেই সঙ্গে ওর চাপা হাসির ফিন্কে ছোটো, ঘরের বন্ধ বায়ু আলোড়িত হয়ে ওঠে, বরটির প্রাণে পুলকের ঝাঁপন ধরে।

কখনও দেখা গেল বরটি এসে ওর আঁচলটি চেপে ধরেচে, আর ও জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টায় বলচে, “আঃ, কি যে করো! ছাড় বলচি এখুনি, এখুনি—”

“আচ্ছা চললুম, আর কথ খনো আসব না—” বর যাচে দরজার দিকে। আর ও তার হাত ধরে টেনে আনতে আনতে বলচে, “ঈস, ভারী যে ভেজ। কই বাও দিকি—দেখি কেমন পায়—”

এমনিভর কত ব্যাপার। কপট কোথ, ভুঙ্কর শাসন আর মান-অভিমানের মায়ামেলা। বন্ধ ঘরের অঙ্গ পরিসরে আজ গৌরী পায় তার মুক্তি। বাইরের আকাশ গাছপালার ইয়ারায় আর মাফা দেয় না, ঐ এক টুকরা ঘরের জন্মেই ওর মন থাকে উন্মুক্ত। ও করে ও কেটে পড়ে হাসিতে, ঘরের দেয়াল ভেদ ক'রে তা আর দিকদিকের রঙ ধরায় না। ওর বতকিছু কোঁচুক, রক্ত, খেলা—সবই এখন

এই একটি লোককেই কেন্দ্র করে। এই লোকটি আজ হঠাৎ
 গুর আকাশ, হৃদয়ের হ্রদ অকাবণ খেলার ডাক। আমার
 মনে পড়েচে, কালো চুলের বাশি নিয়ে এই চকলাই একদিন
 মাথা ঢুলোতো আর তালে তালে ছলে উঠত পৃথিবী, সমগ্র
 বিশ্বলোক। অগোছালো চুলের রাশি বাঁধা পড়েচে কৃষ্ণসর্পিণীর
 বেগীতে, যার মেলনে ডেউ ওঠে এই একটি লোকেরই বকে।
 বিশ্বলোকের কথা কি আজ ও ভুলল?

একটা কিছু ঘটেচে। গৌরী অত্যন্ত প্রবল হয়ে আপত্তি
 জানায় যদি ওর জা বলে, “তোমার কিছু হয়েছে বাপু গৌরী।”
 আপত্তির ভঙ্গীটা সম্পূর্ণ নতুন, ওর ছেলেবেলাকার
 মোটেই নয়। এ পর্য্যন্ত ওর তহুদেহটি ঘিরে রয়েছিল
 পুষ্পদোরভের অপূর্ণ রহস্য; বাঁধনের সে আঁট ব্যাচে খুলে,
 ফল সম্ভাবনায় হয়ে আসচে নত, যেন মধ্যাহ্নের ধানের ক্ষেতে
 কালো মেঘের লঘু ছায়া।

দিন এল। গৌরীর সেই ডাগর ডাগর চোখ দুটি ভরে
 উঠল জলে।...আমি এখানে বসেই শুনতে পাচ্ছি নক্ষত্র-
 লোকের চেয়ে বহুদূরে ঐ নীহারিকাপুঞ্জ ঢাকা কোনো এক
 অচেনা অজানা দেবতার কাছে ও প্রার্থনা জানাচ্ছে, “আর যে
 আমি সইতে পারচি না ঠাকুর।...আমার মুক্তি দাও, মুক্তি
 দাও...”

কি করণ আর্তনাদ!

গৌরী নিশ্চয় মরতে বসেচে। দেখছিলাম ও মবছিল
 তিলে তিলে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে; এবার মরবে সত্যি করাই।

একটি ঘরে গৌরী আছে শুয়ে। ওর পাশেই বিছানায়
 ছোট্ট একটি ছেলে,—অতি ক্ষুদ্র মানবক। আমি ঘরের
 অস্পষ্ট আলোর হৃৎকোণ নিয়ে ওর কানে কানে মুহূর্তের প্রশ্ন
 করলুম, “গৌরী, তোমার হ’ল কি?”

ও হাসল। আমার চোখে ওর এই স্নিগ্ধ হাসিটি
 ঠেকলো য়ান। বলল, “আমার ছেলে হয়েছে—” ব’লে ঐ
 ছোট্ট শিশুটিকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টায় হাত বাড়াল।
 হাতের রেখায় দেখলুম সর্বাঙ্গের ছকটিন বাথা রূপ নিয়েচে
 একটা নিবিড় স্নেহে।

“দেখেচ, কেমন পিট পিট করে চাইচে। ওর নাকটি হয়েছে
 ঠিক ওর বাপেরই মত।”—গৌরীর গণ্ডে রক্তোচ্ছাস খেলল।

কত আশাই ছিল, ওই চন্দ্রকবর্ষে দেখা দেবে শোণিত-
 রাগের লীলায় প্রাণের বাজনা। আজ দেখলুম, শুধু উচ্ছাসই
 আছে, বাজনা নেই, রূপ উপচে ওঠে না, সীতের নদীর লীলতার
 মত শাও, ধীর, শীতল। ওর চকল চোখ আজ হয়েছে স্থির,
 দেখানে নেমেচে কালো গভীরত, একটা কাজল মায়া।

মরণ আর কা’কে বলব? আমি স্পষ্ট দেখছি গৌরীর
 চিতার অগ্নিশিখা উর্দ্ধমুখী হয়েছে।

ছেলে কোলে করে গৌরী বাপের বাড়ি কিংবদে।
 পিসি-মাসী-মায়ের মুখে আর হাসি ধরে না। ভাইবোনের
 আবদার আজ ও হাসিমুখে সহ করে, বাপকে জল দেবার
 সময় ভাল করে দেখে জলে কিছু পড়েচে কি-না।

গৌরীর পিসি শোনাচ্ছেন গৌরীর মাসীকে, “তখুনি
 আমি বলেছিলাম, ছেলেপিলের মা হ’লে এতটা ঘোষাপক্তি আর
 থাকবে না। দেখলেত...”

আর ওর মা মনে মনে নীরব প্রগতি জানাচ্ছেন, “মা
 মঙ্গলচণ্ডী, মূখ রেখেচ।”

নক্ষত্রলোক থেকে আমি যে-গৌরীকে দেখেছিলাম সে-
 গৌরী আজ মরে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, পৃথিবীর বুক থেকে
 নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। এ গৌরী আর একটি মেয়ে।
 কি আশ্চর্য, পিসি মাসী মায়ের দল বৃকতে পারচে না, ও
 তাদের সেই ছোট গৌরীটি নয়, সেই দেহে অত কেউ,—
 সম্পূর্ণ আলাদা আর একটি মেয়ে।

মাহুয়ের জীবনের কি অন্তত ট্রাজেডি,—এই মরণের
 অপরূপ রূপ! শোকাব্র দিয়ে মাহুয় এ মরণের তর্পণ
 করে না।

গৌরীকে বারবার আমার মনে পড়েচে, বারবারই তুলনা
 করচি, প্রাণের সঙ্গে প্রাণীর, চকলের সঙ্গে শক্তির, অধৈর্যের
 সঙ্গে ধৈর্যের। মনে হচ্ছে, ভোরের শিশিরের মরণোৎসব
 চলচে এমনি অগোচরে, অস্তরালে, সহজ অনাড়ম্বরে। আর
 আমার চোখ বেয়ে পড়েচে জল, বুকভরা দীর্ঘশ্বাস মুক্তি
 খুঁজচে মহাকাশে। সমগ্র সৌরলোককে আহ্বান করে বলতে
 চাইচে,—সব নবহৃদিকে তোমরা বরণ করো লক্ষ্যধনি ক’রে,
 উলু দিয়ে, লাজ ডড়িয়ে।

বিস্তৃত হৃদয়ের মধ্যে এই যে মহতী বিনষ্ট, এই যে অপরূপ

মরণ, তাকে কি এক ফোঁটা চোখের জলে কিদার দেবে
না? সে কি মায়ের প্রসব-বেদনার অশ্রুর মধ্যে চিরকালই
লুকিয়ে থাকবে?

ব্যথাময় মনটা হঠাৎ জেগে উঠে দেখলো, কাঁধের উপর
কার কোমল হাতের স্পর্শ এলিয়ে পড়েচে। পরিচয় দেওয়া
বাহুল্য। আমার মন-মোহিনী বললেন, “উজ্জ্বলের মাত্রাটা
যে খুব বেড়ে উঠচে দেখছি।”

“তাই নাকি? দেখে ফেলচো?”

“তোমরা মিথ্যে নিয়ে এত হা হতাশও করতে পার।
তোমার গৌরীরা মরেও না নতুন ক’রে হয়ও না। ওরা যা
তাই-ই থাকে। সবটাই চণ্ড আর জাকামি—”

আমার অন্তর্ধানিনীর দৃষ্টিটা খুব তীক্ষ্ণ। স্ববক্তা
এঁরাই স্পষ্ট চেনেন।

বললুম, “সত্যি নাকি? খুব ঝাটিয়ে দিয়েচ আর
একটু হলেই চোখের জল খরচ ক’রে ফেলেছিলুম আর কি।”

বুলবুলের প্রতি

কামিনী রায়

তুমি চলে গেছ, বারটি বছর গিরাছে তাহার পরে,
তোমাতে কি আমি পেরেছি তুলিতে একটি দিনেরও তরে?
দ্বাদশ বরষ, সে তো দীর্ঘকাল। আজ তাই মনে হয়
আমাদের মাঝে বর্ষ মাস দিন এসব কিছুই নয়।
দৈশ কাল নাহি আনে ব্যবধান, মায়ের ব্যাফুল মন
পাশাপাশি রেখে গত অনাগত, খোঁজে তোরে অহুঙ্কণ।

আমি হেথা; তুমি যেথাই থাক না, তুমি যে আমারি মেয়ে,
মাতৃপদ সহ অমৃতের স্বাদ লভেছিছ তোরে পেয়ে;
বুকে যেই দিন তুলিছ প্রথম, সে-দিন হিয়ার পুরে
তোমার লাগিলা বাঁধিছ যে বাসা আজও তা’ রয়েছ জুড়ে।
শিশু ও কিশোরী হাসিতে রোদনে, চাহনি চলনে আর
খেলায় সেবায়, আলাপে সঙ্গীতে ঢেলেছ যে স্থাপ্যার,

এতটুকু তার না ফেলি হেলায়, আগ্রহে করেছি পান,
অন্তরেতে মোর অক্ষয় হয়ে করে তা’ আনন্দ দান।

শৃঙ্খল করি যবে মেহের পিঙ্গর জীবন-বিহঙ্গ তোর
অলক্ষ্যে উড়িল অমরের দেশে, রহিল স্বতির ভোর,
সেই ভোর টানি নিভা তোরে আনি,
পার কি ছি ড়িতে তায়?

পার কি তুলিতে, স্বর্গবিহারিণি,
ফুলিতে লুপ্ততা মায়?

এস তবে আজ এস ভাল ক’রে, মায়ের নীরব প্রাণ
নব গীতিরসে ভরে তোলা পুনঃ

তোমাতে স্তন্যদে পান।

২১শ ও ২২শে জুলাই,
১৯৩২

আয়ুর্বেদের ইতিহাস

ডক্টর শ্রীমুরেশনাথ দাসগুপ্ত

আয়ুর্বেদ অনাদি। যতদিন ধরিয়া মনুষ্যজীবন আরম্ভ হইয়াছে, ততদিন ধরিয়াই জীবনকে জানিবার চেষ্টা চলিয়াছে। এমন কি পশুপক্ষীর মধ্যেও আহাৰবিহারের একটা নিয়ম আছে; রুগ্ন হইলে তাহারাও রোগ-প্রশমনের কোন-না-কোনও উপায় অনেক সময়েই অবলম্বন করিয়া থাকে। অভ্যস্ত অসভ্য জাতিদের মধ্যেও রোগ-নিবারণের নানাবিধ বাহুমুখ, নানাবিধ প্রক্রিয়া ও ভেষজ-সেবনের ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রাচীন সভ্য জাতিদের বিষয়ে আলোচনা করিলে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নানারূপ ব্যাধি, তাহার লক্ষণ ও সেই রোগ নিবারণের বিবিধ উপায় দেখা যায়। প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যে নানারূপ তৈল ঘৃত ব্যবহারের কথা শুনা যায়, নানারূপ ধাতব বস্তু ও বৃক্ষভেষজের প্রয়োগের কথাও শুনা যায়। প্রায় সাড়ে চারি হাজার বৎসর পূর্বের চীনাগ্রন্থে দশ হাজার রকম জ্বর ও চৌদ্দ রকম আমাশয়ের উল্লেখ আছে, নাড়ীবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদের প্রধান দৃষ্টি ছিল। পিয়ানো বাজাইবার মত আব্দুল বাজাইয়া তাঁহারা নাড়ী পরীক্ষা করিতেন। চীনা ভৈষজ্যাগ্রন্থে আদা, বেদানার মূল, বৎসনাদ (একোনাইট), আফিং, লেকোবিষ (আর্সেনিক), গন্ধক, পারদ, বহুবিধ প্রাণীর মলমূত্রাদি ও অসংখ্য বৃক্ষের পত্রমূলাদি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। চীনাদেশে লক্ষ লক্ষ টাকার গাছগাছড়ার ঔষধ প্রতি বৎসর বিক্রয় হয়। প্রাচীন চীনারা বসন্তের টীকা দিতে জানিতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা গ্যারিসন বলেন যে এই তথ্যটি তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে শিখিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব এগার-শ অঙ্গ হইতে চীনদেশে প্রতিবর্ষে কি কি জাতীয় রোগ কি কি পরিমাণে হয় তাহার তালিকা প্রস্তুত হইত। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর হিপোক্রেটিসের পূর্ব হইতেই চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভব দেখা যায়। কিন্তু হিপোক্রেটিসের সময়েই তাহার সমধিক উন্নতি হয়। হিপোক্রেটিস নিজে রোগী দেখিবার সময়ে নাড়ী দেখিতেন, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস শুনিতেন, মলমূত্রাদি পরীক্ষা

করিতেন ও তাহার মুখচোখের বিকারাদি লক্ষ্য করিতেন। নানাবিধ শস্ত্রোপচারেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। হিপোক্রেটিসের পূর্ব হইতেই অনেক ক্ষতস্থান আশ্রিত দিয়া পোড়াইয়া সারাইবার ব্যবস্থা ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনে করেন যে এই পদ্ধতি গ্রীকেরা হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল।

খৃষ্টাব্দে ১ম শতাব্দীর ৩৪শ সূক্তে ত্রিখাতুর উল্লেখ আছে। সায়নাচার্য্য এই ত্রিখাতুতে বায়ু পিত্ত ও কফ বুঝিয়াছেন। হস্তত বলেন, আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের উপাঙ্গ এবং সূত্র অধ্যায়ে লক্ষ লোকে ইহা ত্র্যম্বক দ্বারা নির্ণীত হইয়াছিল। উল্লগ তাঁহার নিবন্ধসংগ্রহ নামক টীকায় বলেন যে, অল্পাঙ্গ বলিয়া আয়ুর্বেদকে উপাঙ্গ বলা হইয়াছে, কিন্তু অথর্ববেদে মোট ছয় হাজার মন্ত্র আছে, লক্ষলোকাস্ত্রক আয়ুর্বেদ তাহার উপাঙ্গ হইতে পারে না। চরক বলেন যতদিন হইতে প্রাণ ততদিন হইতে আয়ুর্বেদ, যতদিন হইতে দেহ ততদিন হইতেই দেহবিদ্যা। আয়ুর্বেদের উৎপত্তি বলিতে এইটুকু বোকা যায় যে কোন সময়ে কোনও মনীষী কোনও একটি বিশেষ নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা রোগ রোগহেতু ও আরোগ্যোপায়কে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। চরক আয়ুর্বেদকে স্বতন্ত্র বেদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা জীবন পাওয়া যায় বলিয়া এবং জীবনের উপরেই ইহা লোক ও পরলোকের মঙ্গল নির্ভর করে বলিয়া ইহাকে সকল বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বেদ বলিয়াছেন। স্নায়ুহস্তে ও তাহার টীকাভাষ্যাদিতে আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যদ্বারা ই অগ্র সকল বেদের প্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জয়ন্ত তাঁহার স্নায়ুসংগ্ৰহীতে বলিতেছেন প্রত্যাশীকৃততমেশকালপুরুষশা-ভেদাহুসারিসমস্তবাস্তবপদার্থসার্থশক্তিনিশ্চয়শাস্ত্রকায়ঃ। এই আশ্রোক্ত-নিবন্ধন আয়ুর্বেদের যেমন প্রামাণ্য বেদাদি গ্রন্থেরও সেইরূপ আশ্রোক্ত-নিবন্ধন প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। বৃদ্ধ বাগ্‌ডট আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপবেদ বলিয়াছেন। অথর্ববেদের সহিত আয়ুর্বেদের বোধ হয় অতি প্রাচীনকাল হইতেই কোনও বিশেষ যোগ ছিল। কৌশিক হস্তের টীকায়

দারিলভট বলেন যে, ব্যাধি দুই প্রকার—অনিষ্টআহার জন্ম আর অধর্মজন্ম। আয়ুর্কর্মেদের দ্বারা প্রথম জাতীয় ব্যাধির নিবৃত্তি হয় এবং আত্মকর্মেদের দ্বারা দ্বিতীয় জাতীয় ব্যাধির নিবৃত্তি হয়। চরক নিজেও প্রায়শ্চিত্তকে ভেষজ বলিয়া ধরিয়াছেন।

আয়ুর্কর্মেদ অষ্টাদ্বে বিভক্ত। শল্য (শস্ত্রচিকিৎসা), শালাক্য (শিরোরোগ-চিকিৎসা), কাথচিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার ভূত (শিশুচিকিৎসা), অগদত্ত্ব (বিষচিকিৎসা), রসায়ন (শরীরে তারুণ্য আনয়নের বিধি) এবং বাজীকরণ (ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বৃদ্ধি)। হৃশ্ৰত বলেন যে পূর্বকালে আয়ুর্কর্মেদের মধ্যে এই আট প্রকার বিভাগ পৃথক পৃথক করিয়া নিদিষ্ট ছিল না। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যের মধ্যে হুভিবজ্জ নামক প্রাচীন আয়ুর্কর্মেদ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, মহাভারতের মধ্যেও আয়ুর্কর্মেদ অষ্টাদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মারও উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের মধ্যেও তিন জাতীয় রোগের কথা উল্লিখিত আছে। সকারী রোগ, সিন্ধা রোগ ও শুক রোগ—এই তিন প্রকার রোগই বোধ হয় পরে বায়ুপিত্ত-কফাত্মক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অথর্ববেদ পড়িলে দেখা যায় যে, সে সময়েও শত শত চিকিৎসক ছিলেন এবং সহস্র সহস্র ঔষধ পৃথিবীতে প্রচার ছিল। শতং হুশ্র ভিষজঃ সহস্রম্ উত বীক্ষঃ—অথ, ২১১০। সেকালে দুই উপায়ে রোগের চিকিৎসা চলিত। যন্ত্র ও কবচধারণাদি এবং ঔষধ প্রয়োগ। এই দুই প্রকারের চিকিৎসাই আমাদের দেশে এখনও পঞ্চম চলিয়া আসিয়াছে।

চরক ও হৃশ্রত উভয়েই আয়ুর্কর্মেদ অথর্ববেদের সহিত সংশ্লিষ্ট এইরূপ লিখিয়াছেন। চরক লিখিতেছেন, তত্র ভিষজা পৃষ্টেন এবং চতুর্নাম্ ঋক্‌সামযজুর্বথর্ববেদানাম্ আত্মনোহ-থর্ববেদে ভক্তিরাদেশ্য। বেদোহাথর্বকঃ স্বস্তয়নবলিমদল হোমনিয়ম্ প্রায়শ্চিত্তোপবাসমন্ত্রাদিপরিশ্রুতং চিকিৎসাং প্রাহ। উভয়েই বলেন যাহা দ্বারা আয়ু পাওয়া যায় বা যাহাতে আয়ুর বিচার আছে তাহাকে আয়ুর্কর্মেদ বলে এবং আয়ুর্কর্মেদের প্রয়োজন ব্যাধিপর্যায় ও স্বাস্থ্যের পরিরক্ষণ। কিন্তু এই উভয় পদ্ধতির সম্প্রদায় বিভিন্নরূপ ছিল বলিয়াই মনে হয়। আয়ুর্কর্মেদের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে গিয়া হৃশ্রত ৫ বৈকুণ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন, কাশীরাজ দিবোদাস ধর্মভট্ট প্রভৃতির

উল্লেখ করিয়াছেন, চরকে সেইরূপ দেখিতে পাই না। আবার হৃশ্রতে অষ্টাদ্ধ চিকিৎসার মধ্যে শল্যকেই প্রধান অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (এতদ্ভি অঙ্গপ্রথমং প্রাগভিঘাতব্রহ্মণঃ রোহাং যজ্ঞশিরঃসন্ধানাক্)। হৃশ্রত পড়িলে দেখা যায় যে, ইহাতে শস্ত্রচিকিৎসা ও বিষচিকিৎসাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, অথচ চরকে কার্যচিকিৎসাও প্রধান। হৃশ্রতে অস্থিসংখ্যা-গণনার সহিত চরকের অস্থিসংখ্যা-গণনার সামঞ্জস্য নাই। হৃশ্রতের মতে অস্থিসংখ্যা ৩০০, চরকের মতে ৩৬০। চরক ও হৃশ্রতের সহিত অথর্ববেদ ও শতপথব্রাহ্মণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অস্থিসংখ্যা-গণনায় চরকের সহিত ইহাদের সঙ্গতি আছে, হৃশ্রতের সহিত নাই। হৃশ্রত নিজেও বলিয়াছেন যে বেদবাদীদের মতে অস্থিসংখ্যা ৩৬০। ইহা ছাড়া যেকুণ্ঠ সাম্রাজ্যাদি সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া চরক তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছেন, হৃশ্রত সেরূপ করেন নাই। হৃশ্রতের সাম্রাজ্য, ঈশ্বরকৃষ্ণের সাম্রাজ্যকারিকার সাম্রাজ্য এবং চরকোক্ত সাম্রাজ্য হইতে অনেক পরিমাণে বিভিন্ন। ইহা ছাড়া, চরকে 'য সমবায় সাম্রাজ্য বিশেষ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, হৃশ্রতে সেরূপ নাই। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় যে, হৃশ্রতের সম্প্রদায় চরকের সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন। চরককে যদি আত্রেয় সম্প্রদায় বলা যায়, তবে হৃশ্রতকে ধর্মভট্টর সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। এই দুইটি সম্প্রদায় ছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রের আরও বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। চরক বিমানস্বানে বলিয়াছেন—“বিবিধানি ভিষজানি প্রচরন্তি লোকে।”

যদিও অথর্ববেদে শুক, সিন্ধু ও সকারী এই তিন প্রকার ব্যাধির উল্লেখ দেখা যায়, তথাপি অনেক স্থলেই অথর্ববেদের রোগনির্দান, ভূতবিদ্যার সহিত প্রায় এক পর্যায়ভূক্ত বলা যাইতে পারে। অথর্ববেদের বহুস্থলেই অরতি, পিশাচ, রক্ষঃ, অত্রিন, কথ, প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ভূতবর্গের আক্রমণে নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিভিন্ন রোগের উৎপাদক বলিয়া যে-সমস্ত প্রাণীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের কন্তকগুলির নাম দিতেছি;—যতুধান, ক্রীড়াদিন, পিশাচ, পিশাচী, অমীষা, দ্ব্যাবিন্, রক্ষঃ, মণ্ডলী, অলিংশ, বংশক, পলাল, অচুপলাল, শর্ক, কোক, মল্লিচ, পলীজক, বজ্রীষাস, অশ্রোষ, বিকগ্রীব, প্রমালিন ইত্যাদি। এই সমস্ত পিশাচ-জাতীয় প্রাণীরা দেহের

নানাস্থানে বিচরণ করিয়া নানাবিধ রোগের উৎপত্তি করিত, এইরূপ কথার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক সময়ে এই সমস্ত প্রাণীর সহিত ব্যাদিকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অপচিৎ নামক ক্ষতের কথা উল্লেখ করিয়া এরূপ কথিত আছে যে, তাহার বাতাসে উড়িয়া বেড়াইত এবং মাহুকের দেহে আশ্রয় লইয়া মাহুকে আক্রমণ করিত। কোন-কোন স্থানে এই অপচিৎকে একরকম কীট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। একজাতীয় ক্রিমির আক্রমণে নানাবিধ ব্যাদি উৎপন্ন হয়, ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিলে মনে হয় যে, নানাবিধ ক্রিমি দ্বারা যে ব্যাদি উৎপন্ন হইত তাহা অথর্কবেদ স্বীকার করিয়াছেন। বৃক্ষের সমসাময়িক আত্মরোগাণ্ডী জীবকের সম্বন্ধে যে সমস্ত উপাখ্যান লিখিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে, তিনিও মনে করিতেন যে, নানা প্রকার জীবগণ বা ক্রিমি হইতে নানা প্রকার ব্যাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবকের সম্বন্ধে ইহাও লিখিত আছে যে, তাহার এক প্রকার মণি ছিল, সেই মণি শরীরের রক্তস্থানে রাখিলে শরীরের অভ্যন্তর দেখা যাইত। জীবক অনেক সময়ে সেই মণি দিয়া রক্তস্থানের অভ্যন্তরবর্তী জীবগণগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া শল্যোপচারের দ্বারা সেই স্থান ছেদন করিয়া এই জীবগণগুলি নিষ্কাশিত করিয়া দিয়া পুনরায় সেই স্থান সীবন করিয়া দিয়া লোককে রোগমুক্ত করিতেন।

অথর্কবেদে 'তন্মুন' বলিয়া যে রোগের উল্লেখ আছে তাহার লক্ষণ পড়িয়া মনে হয় যে, তাহা আধুনিক কালের ম্যালেরিয়া জ্বর। এই তন্মুনের প্রায়ই শরৎকালে প্রাচুর্য্যব হইত ও ইহা হইতে কামলা উৎপন্ন হইত। ইহা ছাড়া কাসিকা (কাস), যক্ষ্ম (যক্ষ্মা), পামন (পাচড়া), অক্ষত (ত্রণ বা টিউমার), বিদ্রব, কিলাস (কুষ্ঠ), গণ্ডমালা, জলোদর, আশ্রাব (অতিসার), বলাস (ক্ষয়), শীর্ষক্টি (শিরশীড়া), বিশল্যক (স্নায়ুবেদনা বা নার্ভিবেদনা), পৃষ্ঠাময়, বিলকন্দ (বাতব্যাদি), আশরীক, বিশারীক অঙ্গভেদ (বাতব্যাদিরই রূপান্তর), অলজী (চক্ষুরোগ), বিলোহিত (রক্তস্রাব), অপম্মার, গ্রাহি (ভূতধরা) প্রভৃতি বহুবিধ রোগের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া, বংশাশ্রুকে যে সমস্ত রোগ হইয়া থাকে তাহাদিগকে ক্ষেত্রীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অথর্কবেদের সময়ে একদিকে যেমন শাস্তি-অস্ত্রায়ন মন্ত্রপাঠ

কবচধারণাদির ব্যবস্থা ছিল, অপর দিকে তেমন বহুবিধ ঔষধ ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু অথর্কবেদে ময়-চিকিৎসারই প্রাধান্ত দেখা যায় এবং অথর্কবেদের অনেক স্থান পড়িলে মনে হয় যে, ময়বাদী ও ভেষজবাদীদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু গোপথব্রাহ্মণ ও কৌশিকসূত্রের সময়ে এই উভয় বাদীদের মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কৌশিক সূত্রে বহুবিধ ঔষধের উল্লেখ আছে, যথা— পলাশ, কাম্পিল, বরগ, জঙ্জিড়, অজ্জুন, বেতস, শমী, শমকা, দর্ভ, দূর্বা, যব, তিল, ইলিড়, তৈল, বীরণ, উষীর, ক্ষদির, ত্রপুস, মুঞ্জ, ক্রিমুক, নিতরী, জীবী, অলাকা, লাক্ষা, বিদ, হরিদ্রা, পিপ্পলী, সদাপুষ্ণা, কুষ্ঠ, অলাবু, খলতুল, করীর, শিগক, বিভীতক, নিকটা, শামীবিধ, শীর্ণগর্বা, প্রিহঙ্গু, হরীতকী, পূতিকা, ইত্যাদি।

কৌশিকসূত্রে কতস্থানে জলৌকা লাগাইবার বিধি দেখা যায় এবং সর্প-দন্ত স্থান অগ্নিকর্ম্মদ্বারা পুড়াইয়া দিবারও বিধি দেখা যায়। ঋগ্বেদ প্রভৃতিতে অশ্বিনীকুমারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে তিনি বিপ্লার একটি পদ যুদ্ধে ছিন্ন হওয়াতে তাহার বদলে একটি লোহার পা জুড়িয়া দেন। ঋগ্বেদ ও পরাবৃজের আত্মা দূর করেন। যোযাকে কুষ্ঠব্যাদি হইতে মুক্ত করেন। কণ ও কক্ষিৎসকে নবদুষ্টি প্রদান করেন, বামদেবকে মাতৃকৃষ্ণি হইতে প্রসব করান, বন্ধা নারীদিগকে সূত্রজা করিতে পারিতেন। যজ্ঞীয় পণ্ডর ছিন্নশিরকে প্রতিলক্ষ্যন করিতে পারিতেন এবং এই কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি পূর্বে শত্রুচিকিৎসকদিগকে লোকসমাজে সমাদৃত করেন। তাহাদের নামে অশ্বিনীকুমারের সহিতা নামক গ্রন্থের কথা শুনা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, তিনি চিকিৎসা-সার নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভাস্কর্য্য কতিপয় লিখিয়াছেন যে, তিনি এই গ্রন্থের স্বপ্নাবশেষ পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া তাহার নামে বহু ঔষধ প্রচলিত আছে। কাশ্যপের নামেও কাশ্যপতন্ত্র কাশ্যপসংহিতা নামে প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণ পড়িলে জানা যায় যে, সে সময়েও সূত্রতন্ত্র শাস্ত্র সমাজে প্রচলিত ছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণের রচনাকাল ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৭০০ বলিয়া মনে করেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে,

হুশ্রুতের শত্রুচিকিৎসা অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৮০০, ৯০০ কি ১০০০ হইতে চলিয়াছে এবং সে সময়েও বেদবাদীদের একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসা ছিল। হুশ্রুত প্রায় ১২০টি শত্রুযন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হারিতেও ১২টি যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। বাগ্‌ভটে ৬০টি যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা ছাড়া পশুশাস্ত্রেও অস্ত্রাস্ত্র শস্ত্রোপচার যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। পালকাপ্য নামক হস্তাব্যুর্কেদে প্রায় পঁচিশটি স্বতন্ত্র যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। হুশ্রুত পড়িলে দেখা যায় যে, সে সময়ে যে কেবল শব্দব্যবচ্ছেদ হইত তাহা নহে, শরীরের হস্তপদাদি বিভিন্ন স্থানে যে শস্ত্রোপচার হইত তাহা নহে, এমন কি উন্নয়ের মধ্যেও শস্ত্রোপচার চলিত এবং কঠিন শস্ত্রোপচারের দ্বারা উন্নয়ন সম্ভবনাকে প্রসব করান হইত। তাহা ছাড়া মাথার মধ্যেও শস্ত্রোপচার করিয়া অনেক হুরারোগ্য ব্যাধি দূর করা হইত।

নানা গ্রন্থে জীবক সম্বন্ধে যে-সমস্ত কাহিনী বিবৃত আছে তাহাতে দেখা যায় যে তিনি অনেক স্থলেই মাথার করোটিকা কর্তন করিয়া মাথার মধ্যের ক্ষতস্থান হইতে ক্রিমি নিঃসারণ করাইয়া অনেক শিরঃপীড়া আরোগ্য করাইয়াছিলেন। রাজগৃহে তিনি যে একটি শস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় যে, একটি ধনীর স্ত্রীকে হস্তপদাদি বদ্ধ করিয়া তাহার উন্নয়ে শস্ত্রোপচার করিয়া উন্নয়ের অস্ত্রতন্ত্রগুলি বাহির করিয়া তাহার মধ্যে যে কতগুলি গ্রন্থি পাকাইয়া গিয়াছিল সেগুলি উন্মোচন করাইয়া পুনরায় সমস্ত অস্ত্রতন্ত্রকে যথাস্থানে নিবেশ করাইয়া সৌজন্য করিয়া দেন। জীবক ভগবান বৃদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন এবং অনেক সময়ে তাঁহাকে নানা হুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নীরোগ্য করিয়াছিলেন। জীবক আত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন। চরকও আত্রেয়-সম্প্রদায়ের লোক। চরক প্রধানতঃ কায়চিকিৎসক ছিলেন, সেইজন্য অনেক স্থানে (যথা—উদরি) শত্রুনাশ্য ব্যাধির কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত ব্যাধি শত্রুবিদেরা আরোগ্য করিতে পারেন। অতএব মনে হয় যে, ঋষভুর সম্প্রদায় ছাড়া আত্রেয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও শস্ত্রোপচারের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। হুশ্রুতের মধ্যে চক্ষুর ছানি কাটিবার যে পদ্ধতি ছিল আজও তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর ছানি কাটিবার পদ্ধতি আবিস্কৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। সাধারণ আতুরালয় স্থাপনের পদ্ধতি

বোধ হয় ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম। ঋশোকেব শিলালিপিতে দেখা যায় যে, সে সময়ে পশুদিগের ও মহুয্যদিগের অন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভৈষজ্য উদ্যান স্থাপনা করিয়া নানা দেশের দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সকল একত্র রোপিত হইত। সিংহলীয় লেখমালা হইতে জানা যায় যে খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতেও এদেশে আতুরালয় বা হাসপাতাল ছিল। এই সমস্ত হাসপাতাল এবং গৃহীদের আতুরালয় ও প্রসবগৃহ প্রভৃতির ব্যবহারের জন্য নানাবিধ উপকরণের ব্যবস্থা দেখা যায়। হুশ্রুত চরক প্রভৃতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধানের অঙ্গ বলিয়া দন্তকর্ষণ, জিহ্বানিলেখন, ক্ষুর, কেশপ্রসাধনী বা চিক্ণী, আদর্শ, পট্টবস্ত্র পরিধান, উষ্ণীয়, ছত্র, উপানহ বা ব্যজন ইত্যাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অপরিষ্কৃত জল পরিষ্কার করিবার জন্য নানাপ্রকার ফিল্টারের ব্যবস্থা দেখা যায়। আতুরালয়ের জন্য চামচ, নিদ্রীবনপাত্র, মলপাত্র (বেডপ্যান) মূত্রপাত্র ও পুঞ্জপাত্র প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। ঔষধাদি পানের জন্য রজত, স্বর্ণ, তাম্র, মুৎ বা শুক্লি পাত্র ব্যবহৃত হইত।

আলেক্সান্ডারের পূর্বে গ্রীকদের সহিত ভারতীয়দের বিরূপ আদানপ্রদান চলিত তাহা বলা কঠিন, কিন্তু নিয়ার্কাস (Nearchus) বলেন যে, গ্রীকঔষধোদ্যায় হিন্দুদের চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। গ্রীকদের ভৈষজ্যগ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, পদ্মবীজ, তিল, জটামানী শৃঙ্গবের, মরীচি, এলাচি প্রভৃতি বহুবিধ ভারতীয় ঔষধ তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে আরবেরা চরক হুশ্রুত ও মাধবনিদান অহুবাদ করেন, ইহা ছাড়া ভারতীয় সর্পবিদ্যা, বিববিদ্যা ও পশুচিকিৎসাও আরব ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, এবং অনেক সময়ে হিন্দু চিকিৎসকেরা আরব দেশে চিকিৎসার জন্ত নীত হইতেন। আরব দেশের চিকিৎসা-গ্রন্থে বহু ভারতীয় ঔষধের ব্যবহার দেখা যায়, যথা—দেবদারু, জগন্ধ মরীচ, সোণামুখী, স্বর্ণধ, ফুলীজল, গুগগুল, তিস্তিভী, জিকলা, হরীতকী, বিষ, চন্দন, নিষ, তাম্বুল, খদির, বিষমুষ্টি, কদলী, নাগরজ, মাতুলজ, ইত্যাদি বর্তমানে ইউরোপে প্রচলিত ভৈষজ্যমধ্যেও বহু ভারতীয় ঔষধের ব্যবহার দেখা যায়, যথা—অতিবিষ, পলাশ, খদির, যবল, সন্তুপর্ণ, এলা, উশীর দারুহরিদ্রা, পলাশ, সোণামুখী

ইন্দ্রবরণ, ধুতুর, অভসী, করঞ্জ, আজমোদ, এড়গু, শত-পুষ্পা, উদ্ভূরকণিকা, চন্দন, অজকর্ণ, গুরুচি, টগর, ইন্দ্রবর্ষ ইত্যাদি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সহস্র সহস্র আম্বুর্বেদীয় ভৈষজ্যের মধ্যে ইউরোপীয় ভৈষজ্য প্রায় একটিও দেখা যায় না। উপন্যস কৃষ্টাদি ব্যাধিতে নাসিক! প্রভৃতি বসিয়া গেলে শস্ত্রোপচার করিয়া নূতন হাড় বসাইয়া আরোগ্য করিবার যে বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল তাহা ভারতবর্ষ হইতেই ইউরোপে গৃহীত হইয়াছে। বালিনের ডাক্তার রিসবার্গ বলেন যে, এই জাতীয় শস্ত্রবিদ্যায় ইউরোপ যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছে তাহার প্রথম নিদর্শন ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতেই পাওয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, চামড়া কাটিয়া চামড়া জোড়া লাগাইবার যে পদ্ধতি তাহাও ভারতবর্ষ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। কোবে শস্ত্রোপচারের অনেক ব্যবস্থাও ভারতবর্ষ হইতেই ইউরোপে গৃহীত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কীট ও জীবাণু দ্বারা যে নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহা অতি প্রাচীন কালেই এদেশে জানা ছিল তাহা পুর্বেই বলা হইয়াছে। মার্কোপলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে মশক-দংশনে যে জরের উৎপত্তি হয় তাহাও এদেশে জানা ছিল এবং মশক-নিবারণের জন্ত দক্ষিণ-ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানে মশারি ব্যবহৃত হইত।

মহুয্যচিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চচিকিৎসাও অতি প্রাচীন কালেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অখচিকিৎসার প্রধান প্রবর্তক ছিলেন শালিহোজ্জ ঋষি। ইহা ছাড়া অগ্নি-পুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও গুরু পুরাণে অখচিকিৎসার কথা দেখা যায়। শুক্রাচার্যের নীতিশাস্ত্রেও অববৈদ্য সন্থে অনেক কথা লেখা আছে। সহদেব ও লব উভয়েই অখ-চিকিৎসা সন্থে প্রবীণ ছিলেন। জয়দত্তহরীর অববৈদ্যকও এ-বিষয়ের একখানা প্রধান গ্রন্থ। তাহা ছাড়া সিংহদত্ত অব-শাস্ত্রসমুদ্র নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যমিনাথ হব-লীলাবতী হইতে স্থানে স্থানে স্নোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভোজও বাজীচিকিৎসা নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। দীপকরও অববৈদ্যশাস্ত্র নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া শাকদ্বার লিখিয়াছিলেন তুরঙ্গ পরীক্ষা, এবং ইন্দু-সেন শালিহোজ্জের সার সংগ্রহ করিয়া সারসংগ্রহ নামে গ্রন্থ

লিখিয়াছেন। পালকাপ্য প্রণীত গজাম্বুর্বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা ছাড়া গজনিরূপণ, মাতঙ্গলীলা, গজচিকিৎসা প্রভৃতি গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। অগ্নিপুরাণে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রেও গজচিকিৎসার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শৈনিক শাস্ত্রে পক্ষিচিকিৎসা ও পক্ষীদের আহার-প্রণালীর ব্যবস্থা দেখা যায়। গো-চিকিৎসার কথা অথর্ববেদে উল্লিখিত হইয়াছে এবং পরাশরসংহিতা ও আপস্তম্ব সম্যক ও বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে গো-চিকিৎসার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। শালিহোজ্জের সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় না। যে পুস্তকখানি পাওয়া যায় তাহা স্থানে স্থানে খণ্ডিত। এই গ্রন্থখানি শল্য শালাক্যাদি ক্রমে ৮টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। কথিত আছে যে, শালিহোজ্জ ছিলেন হম-ঘোষের পুত্র এবং হৃশ্ভতের পিতা, এবং হৃশ্ভতের প্রপ্নের উত্তর দিতে গিয়াই শালিহোজ্জ তাহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন স্থানে হৃশ্ভতকে বিধামিত্রের পুত্র বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। গণ তাঁহার অখাম্বুর্বেদে হৃশ্ভতকেও স্বতন্ত্রভাবে অংশান্তের কর্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অগ্নিপুরাণে দেখা যায় যে, হৃশ্ভত অখবিদ্যা, গজবিদ্যা ও গোচিকিৎসা-বিদ্যা ধনুস্তরির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। শালিহোজ্জ গান্ধার দেশের লোক ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। শালিহোজ্জের গ্রন্থখানি ১৩০১ খৃঃ অব্দে পারস্ত ভাষায় অনূদিত হয়। গ্রন্থখানির উন্নয় স্থান, উত্তর স্থান, শারীরিক, চিকিৎসা স্থান, কিশোর চিকিৎসা, উত্তরোত্তর ও রহস্ত স্থান—এই কয় অধ্যায়ে বিভক্ত। পালকাপ্য ঋষি সামগায়নান্ন মুনির পুত্র ছিলেন। ইনি চম্পা (ভাগলপুর) দেশের রোমপাদ রাজ্য কর্তৃক হস্তিচিকিৎসার জন্ত আহৃত হন। এই কাণ্ড-শেষে লিখিত আছে যে, পালকাপ্য ও ধনুস্তরি একই ব্যক্তি ছিলেন। ইহার গ্রন্থখানি অতি বিস্তৃত এবং ইহাতে প্রায় ১৬৪টি অধ্যায় আছে। মহাবগ্গে লিখিত আছে যে আকাশগোস্ত যখন একটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভগন্দর স্থানে শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহার একটি বিরাট মুখ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া বুদ্ধদেব অত্যন্ত বীতশ্রুতভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মহুয্যদেবে এইরূপ শস্ত্রপ্রয়োগ করিতে নিষেধ করিলেন। বোধ হয় তাহার পর হইতে এই দেশে শস্ত্রোপচারের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। কালক্রমে এই শস্ত্রচিকিৎসার

এমন অবনতি হইয়াছিল যে, যখন শব্দাচার্য ভগবদ্রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন তখন এই রোগ অচিকিৎসিত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু চরকাদির সময়েও শস্ত্রবিদ্যাদিগের বিশেষ সমাদর ছিল এবং বাগ্‌ভটাদির সময়েও শস্ত্রবিদ্যা যে একেবারে চলিত ছিল না, এ-কথা বলা যায় না।

চরক পড়িলে দেখা যায় যে, অঙ্গীরা প্রভৃতি ঋষিরা ভরদ্বাজকে ইন্দের নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁহার নিকটে হেতু লিঙ্গ ও ঔষধজ্ঞানাস্ত্রক ত্রিহৃত শিক্ষা করেন। অম্বাত্ত ঋষিরা ভরদ্বাজের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করেন। ভরদ্বাজের নিকট হইতে আত্রেয় পুনর্কর এই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অগ্নিবেশ, ভেল, জতুর্কর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপানি—এই ছয় শিষ্যকে ইহা শিক্ষা দেন। ইহাদের মধ্যে অগ্নিবেশই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন। সেইজন্য তিনিই প্রথম অগ্নিবেশসংহিতা প্রণয়ন করেন। তদনন্তর ভেল, পরাশর, জতুর্কর্ণ প্রভৃতিরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই পুনর্কর আত্রেয় ছাড়া কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ ও ভিক্ষু আত্রেয় নামে আর দু-জন আত্রেয়ের কথা পাওয়া যায়। জীবক কোন্ আত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। ইহা ছাড়া নাড়ীতত্ত্ববিধির প্রণেতা দত্তাত্রেয় নামে আর একজন আত্রেয় ছিলেন। চরক পড়িলে পুনর্কর আত্রেয়ের সমসাময়িক আরও অনেক ভিবকের নাম পাওয়া যায়, যথা—হিরণ্যকেশী বড়িশ, সাকুভ্যায়ণ, শরলোম কাপা, কাকায়ন কুমারশিরা, ভরদ্বাজ, রাজর্ষি, বাকম, বাঘোবিদ্য শৌনক, মৈত্রেয়, পৈল, শাকুন্তেয় ইত্যাদি। চরকের অনেক অধ্যায়ের লিখন-প্রণালীতে ইহা বোঝা যায় যে, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক একত্র সম্মিলিত হইয়া নানা রোগের বিষয় ও আয়ুর্কর্মের নানা সমস্তা পরস্পর আলোচনা করিয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিতেন এবং পরিশেষে আত্রেয় যেন সভাপতিরূপে সেই সব মতের সামঞ্জস্য করিয়া সমাধান করিতেন। এই সমস্ত স্থানগুলি দেখিলে অনেক সময়েই মনে হয় যে, চরকসংহিতাখানি যেন কোনও ভিবকসমিতির বক্তৃতাগুলির সারসংকলন। যে-সকল স্থলে মতবৈধ ছিল না সে-সমস্ত স্থলে আত্রেয় যেন নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। অগ্নিবেশ-লিখিত তন্ত্র চরক পুনরায় প্রতিসংস্কার করিয়া তাহার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই অগ্নিবেশসংহিতা একাদশ শতাব্দীতে

চক্রপাণির সময় পর্য্যন্তও পাওয়া বাইত। যে কারণেই হউক চরকমূত্র, নিদান, বিমান, শারীর ও চিকিৎসা-স্থানে ১৬শ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিয়া যান। চিকিৎসাস্থানের শেষ ১৭টি অধ্যায় এবং সিদ্ধিস্থান ও কল্পস্থান কাশ্মীরী ভিবক কপিলবলের পুত্র দৃঢ়বল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আপূরণ করেন। দৃঢ়বল যে কেবলমাত্র আপূরণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, অনেক সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রোগাধ্যায়ের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। চক্রপাণি ও বিজয় রক্ষিত যখন কাশ্মীরপাঠ বলিয়া সময়ে সময়ে নির্দেশ করিয়াছেন তখন এই দৃঢ়বলেরই প্রতিসংস্কারকে লক্ষ্য করিয়া তাহা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মাধব সম্ভবতঃ দৃঢ়বলের পূর্বের লোক ছিলেন, কাজেই মাধব নবম শতাব্দীরও পূর্বের লোক। বুদ্ধ বাগ্‌ভট বোধ হয় ৭ম শতাব্দীর লোক ছিলেন, কারণ সপ্তম শতাব্দীতে ইংসিন সমসাময়িক বলিয়া তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। চক্রপাণিও একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন এবং অরুণ-দত্ত ও বিজয় রক্ষিত উভয়েই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ভূত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন কালে কাশী ও তক্ষশিলা বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র ছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শান্তিহোত্র গান্ধার-দেশীয় লোক ছিলেন। জীবকও তক্ষশিলার লোক ছিলেন। চীন-দেশীয় বিবরণ হইতে জানা যায় যে, চরক কণিষ্ক মহারাজের রাজবৈদ্যা ছিলেন। কণিষ্ক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর লোক এবং তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। চরক পড়িলে দেখা যায় বাহলীক-দেশীয় ভিবকরা আত্রেয় পুনর্করের ভিবক-পরিষদে সমবেত হইতেন। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অসম্ভব নহে যে, আত্রেয় পুনর্কর যেখানে বাস করিতেন, বা তাঁহার সমধর্মী চিকিৎসকেরা যেখানে বাস করিতেন তাহা বাহলীক দেশের নিকটবর্তী স্থান; কাজেই এরূপ মনে করা বাইতে পারে যে, তক্ষশিলার নিকটবর্তী কোনও স্থানে তাঁহাদের এই চিকিৎসা-পরিষদ বসিত। দৃঢ়বল যে কাশ্মীরের লোক ছিলেন তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। ইংসিন নলান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন এবং তিনি যে-ভাবে বাগ্‌ভটের কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে বাগ্‌ভট যেন তৎসমীপবর্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন। তাহাতে এরূপ

মনে করা যাইতে পারে যে, বৃদ্ধ বাগ্‌ডট সম্ভবতঃ মগদেরই লোক ছিলেন। মাধব কোন দেশের লোক ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অনেকে বলেন যে, মাধব এবং বিজয় রক্ষিত উভয়েই বাংলা দেশের লোক। ইহার সপক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ নির্দেশ করা কঠিন। দূতবল বাদ নবম শতাব্দীর লোক হন তাহা হইলে মাধব হয়ত ৭ম শতাব্দীর লোক হইবেন এবং অষ্টাদশদ্বয়কার বাগ্‌ডট হয়ত ৯ম শতাব্দীর লোক হইবেন। চরক ও মাধবের মধ্যে এই যে প্রায় ৬০০ বৎসরের ব্যবধান ইহার মধ্যে কোনও প্রসিদ্ধ ভিবকের নাম পাওয়া যায় না। কিছু দিন হইল তুর্কীস্থানের বালুস্তূপের মধ্যে নাবনীতক নামে এক সংগ্রহগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই সংগ্রহগ্রন্থ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর লেখা এইরূপই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ইহা চরক, সুশ্রুত ও অস্ত্রাক্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং প্রধানতঃ একখানি ভেষজসারসংগ্রহের গ্রন্থ। এই নাবনীতকে সাধব্য, গর্গ, বশিষ্ঠ, করাল, সুপ্রভ, বাড়, বলি প্রভৃতি ভিবকের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে হব্যাবস্তি নামে একরূপ অন্ত্রবস্তি (Enema) ব্যবহারের বিধান আছে। চরক সুশ্রুতেও মলদ্বার দিয়া প্রয়োগের জন্ত নানাজাতীয় বস্তির বিধান ছিল। এই সকল বস্তিদ্বারা নানাবিধ ঔষধ সঞ্চার নলের মধ্য দিয়া অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া ক্রীলোক ও পুরুষের মূত্রদ্বারের নানা প্রকার ব্যাধির জন্ত বিভিন্ন প্রকারের বস্তি প্রয়োগের (cathetar) বিধি ছিল।

চক্রপাণিদত্ত গোড় দেশেরই লোক ছিলেন ইহা প্রমাণ করা কঠিন নহে। সম্ভবতঃ অষ্টম কি নবম শতাব্দী হইতেই বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদ-চর্চার প্রসার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। বিজয় রক্ষিতের পূর্বেও যে বহু আয়ুর্বেদের গ্রন্থকর্তা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অনেকেই যে চরকের উপরে টীকা ও অস্ত্রাক্ত প্রকার গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহার পরিচয় আমরা বিজয় রক্ষিতের টীকার মধ্য হইতে পাই। তজ্জল (১১শ কি ১২শ শতাব্দী) তাঁহার নিবন্ধনগ্রন্থে বলিয়াছেন যে, প্রাচীন বৃদ্ধসুশ্রুতরূত সুশ্রুতসংহিতা নাগার্জ্জুনের দ্বারা প্রতিলিপ্ত হইয়া বর্তমান সুশ্রুতসংহিতা নামে চলিয়াছে। বর্তমান সুশ্রুত গ্রন্থে যে একটা উত্তর ভাগ আছে তাহাও ইহার পরিচায়ক। চক্রপাণি

তাঁহার ভাস্কর্যমতী নামক টীকাতে এই প্রতিলিপ্তকারের উল্লেখ করিয়াছেন। সুশ্রুতচক্রিকা বা স্মারচক্রিকা নামে প্রচলিত গয়দাসের পঞ্জিকাতে নাগার্জ্জুনের পাঠ বলিয়া যে পাঠটি চলিয়াছে তাহা বর্তমান সুশ্রুতেরই পাঠ, অষ্টাদশদ্বয়-সংহিতার ভট্টনারায়ণরূত বাগ্‌ডটখণ্ডনমণ্ডনটীকার সুশ্রুতের নাগার্জ্জুনের পাঠ বলিয়া কতক পাঠোক্ত আছে। আমরা তিনটি নাগার্জ্জুনের কথা জানি। প্রথম, শূন্তবাদী নাগার্জ্জুন (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী); দ্বিতীয়, বৃন্দসিদ্ধযোগে যে নাগার্জ্জুনের কথা উল্লেখ করিয়াছে, ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীর লোক ছিলেন; তৃতীয়, নবম শতাব্দীর গুজ্জরের রাসায়নিক নাগার্জ্জুন। এই তৃতীয় নাগার্জ্জুনই বোধ হয় কল্কপুটতন্ত্রের লেখক ছিলেন। আর দ্বিতীয় নাগার্জ্জুন বোধ হয় সুশ্রুতসংহিতার প্রতিলিপ্তকরণ করিয়াছিলেন। জৈষাট, গয়দাস, ভাস্কর, শ্রীমাধব, ব্রহ্মদেব প্রভৃতির রহস্যপঞ্জিকা আর স্মারচক্রিকা, পঞ্জিকা ও ক্লো-বাস্তিক নামে সুশ্রুতের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া চক্রপাণিদত্তও ভাস্কর্যমতী নামে এক টীকা লিখিয়া ছিলেন। গোমিন্, আবাচ বর্দ্ধী, জিনদাস, নরদত্ত, গদাধর, বাস্পচন্দ্র, সোম, গোবর্দ্ধন, প্রশ্ননিধান প্রভৃতিরাও সুশ্রুতের টীকা লিখিয়াছিলেন। চরকের উপর চক্রপাণিদত্তের টীকাখানি এখন মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্বামিনুয়ার, হরিশ্চন্দ্র, শিবদাস সেন, বাস্পচন্দ্র ঈশান দেব, ঈশ্বর সেন, বকুল কর, জিনদাস, মুনিদাস, গোবর্দ্ধন, সন্ধ্যাকর, জয়নন্দী ও গয়দাস প্রভৃতিরাও চরকের টীকা লিখিয়াছিলেন।

চক্রপাণির সময় পর্যন্ত জটুকর্ণসংহিতাখানি পাওয়া যাইত। পরামরসংহিতা ও কারপাণিসংহিতা ও ক্রীকর্কসংহিতা ও শিবদাসের সময় পর্যন্ত পাওয়া যাইত। চক্রপাণির টীকার খরনামসংহিতা ও বিদ্যামিত্রসংহিতারও উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন হারীতসংহিতাখানি চক্রপাণি ও বিজয় রক্ষিতের সময় পর্যন্ত ছিল। ভেলসংহিতাখানি কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। ধনুস্তরির চিকিৎসাভিজ্ঞান, কান্দীয়ারের চিকিৎসাকৌমুদী, দিবোদাসের চিকিৎসাধর্শন, অশ্বিনীর চিকিৎসাশাস্ত্র ও ভ্রমর, নবুলের বৈদ্যকসংগ্রহ, সহস্রবের ব্যাধিসিদ্ধিবিবর্দ্ধন, যমের জ্ঞানার্থ, চ্যবনের জীবাদন, জনকের ব্যাধিসংলোভজন, চক্রহৃৎতের সর্করার,

জাবালের তত্ত্বসার, জাঙ্গলির বেদান্তসার, পৈলের নিদান, করঠের সৰ্ব্বধর, অগস্ত্যের বৈদ্যনির্ব্যস্ততত্ত্ব প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের কথা কেবল নামমাত্রই শুনিয়াছি। বুদ্ধ বাগ্‌ভট তাঁহার ইন্দুকৃত টীকাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার অৰুণপত্ত, আশাধর, চন্দ্রচন্দন, রামনাথ ও হেমাজিকৃত পাঁচ খানি টীকা ছিল। তন্মধ্যে কেবলমাত্র অৰুণপত্তের সৰ্ব্বাঙ্গহৃদয় টীকাটি ছাপা হইয়াছে। মাধব-নিদানেরও অন্ততঃ সাতটি টীকা ছিল। বিজয় রক্ষিতকৃত মধুকোষ, বৈদ্যবাচস্পতিকৃত আতঙ্গদর্পণ, রামনাথ বৈদ্যকৃত টীকা, ভবানীসহায়কৃত টীকা, নাগনাথকৃত নিদানগ্রন্থীপ, গণেশভিক্তকৃত টীকা, নীলকণ্ঠ-ভট্টপুত্র নরসিংহ কবিরাজকৃত বিবরণসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা। এই শেষোক্ত গ্রন্থের মুদ্রাপনের আয়োজন চলিতেছে। এই গ্রন্থখানি আমার পারিবারিক গ্রন্থাগারে পাওয়া গিয়াছে। বিজয় রক্ষিতকৃত নিদানের টীকা নিদানের ত্রয়ত্রিংশদধায় পঞ্চম আসিয়া ক্ষণে হই। বাকী অংশটি তাঁহার ছাত্র শ্রীকণ্ঠদত্ত সমাপন করিয়াছেন। বুদ্ধকৃত সিদ্ধযোগখানিও একখানি অতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। অনেকে বলেন যে বুদ্ধ এবং মাধব একই ব্যক্তি ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শাক্যধরের গ্রন্থখানি ও পঞ্চদশ শতাব্দীর শিবদাসকৃত চক্রদত্তের টীকা ও বঙ্গদেশের গ্রন্থখানি কবিরাজ-সমাজে অভ্যস্ত সমাদৃত। ভাস্করের শারীরপদ্মিনী গ্রন্থের এখন আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। ঔপধেনবত্তর পৌকলাবতত্ত্ব, বৈতরণতত্ত্ব এবং ভোজতত্ত্ব ডহলণের সময় পর্য্যন্ত ছিল। তালুকাতত্ত্ব ও কপিলতত্ত্ব চক্রপাণির সময় পর্য্যন্ত ছিল। বিদেহতত্ত্ব, নিমিত্ততত্ত্ব, কাব্যনতত্ত্ব, সাত্যকী-তত্ত্ব, করালতত্ত্ব, কৃষ্ণাজ্ঞেরতত্ত্ব গ্রন্থগুলি চক্রুরোগের উপর লিখিত হইয়াছিল। শ্রীকণ্ঠদত্তের টীকার মধ্যে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। চক্রুরোগের উপর লিখিত শৌনকতত্ত্ব চক্রপাণি ও ডহলণের টীকার উল্লিখিত দেখা যায়। খাজী-বিজ্ঞা সম্বন্ধে লিখিত জীবকতত্ত্ব, পর্য্যক-তত্ত্ব ও বদ্ধকতত্ত্বের কথা ডহলণের টীকার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সম্বন্ধে হিরণ্যাক-তত্ত্বের কথা শ্রীকণ্ঠও তাঁহার টীকার লিখিয়াছেন। বিষশাস্ত্র সম্বন্ধে কান্তপ ও আলদায়ন সংহিতা শ্রীকণ্ঠ তাঁহার টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। বিষশাস্ত্র সম্বন্ধে উপনস্ সংহিতা-সনক-সংহিতা ও লাটায়ন-সংহিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাগার্জুনের যোগশতক জীবপুত্র ভেদভঙ্গকল্প ও অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের চারখানি টীকা (অষ্টাঙ্গহৃদয়বৈদ্যকভাষ্য, পদার্থ-চন্দ্রিকাশ্রোভাস, অষ্টাঙ্গহৃদয়বৃত্তি, অষ্টাঙ্গহৃদয়ভেদভঙ্গত্টি) তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাদের পুনরুৎপাদ একান্ত আবশ্যক। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে ভাবমিশ্র তাঁহার ভাবপ্রকাশ লিখিয়া যান। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে লিখিত বলরামের আতঙ্কতিমির-ভাস্কর, মাধবের আয়ুর্বেদপ্রকাশ, ত্রিমল্লের যোগতরঙ্গিনী, রঘুনাথের বৈদ্যবিলাস, বিদ্যাপতির বৈদ্যরহস্য, কবি-চন্দ্রের চিকিৎসারত্নাবলী, মণিরাম মিশ্রের বৃন্তরত্নাবলী, জগন্নাথের যোগসংগ্রহ, হর্ষকীর্ত্তিকরীর যোগচিন্তামণি বৈদ্যকসারসংগ্রহ ও লোলিথরাজের বৈদ্যজীবন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে যোগরত্নাকর নামেও এক গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহাতে চিকিৎসাপ্রণালীর সহিত শস্ত্রক্রিয়ারও নানা পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে নারায়ণের রাজবলভীজয়বাণ্য, বৈদ্যচিন্তামণির প্রয়োগমৃত, নারায়ণের বৈদ্যামৃত, বৈদ্যরাজের স্বথবোধ, গোবিন্দদাসের ভৈরবজারত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে অমুখ্যাবন-যোগ্য। আধুনিক কালেও কবিরাজচূড়ামণি গঙ্গাধর তাঁহার জলকল্পকৃত টীকাতে আয়ুর্বেদের প্রসার বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গৈলার মদনকৃষ্ণ কবীজ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ, কবিরাজ দ্বারিকা-নাথ সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কৈলাসচন্দ্র সেন, পীতাম্বর সেন ও শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন প্রমুখ কবিরাজগণ বঙ্গদেশকে আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার পীঠস্থান করিয়া গিয়াছেন। জাখান ভাষায় পণ্ডিত জলী আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে একখানি নাতিবিস্তার গ্রন্থ ১২০১ সালে বাহির করেন। ১২০৭ খৃঃ অব্দে হর্পলে ইংরেজী ভাষায় আয়ুর্বেদীয় অস্থিতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির করেন ও কর্ণেল বাওয়ার কর্তৃক প্রাপ্ত গুপ্তাক্ষরে লিখিত ৪র্থ শতকের নাবনীতক গ্রন্থখানি অশেষ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্বক অক্সফোর্ড হইতে মুদ্রিত করিয়াছেন। ডাঃ গিরীন্দ্র মথোপাধ্যায় মহাশয় আয়ুর্বেদীয় শল্যসত্ত্ব সম্বন্ধে ও আয়ুর্বেদের ইতিহাস সম্বন্ধে দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মংকৃত হিন্দুধর্মের ইতিহাসের ২য় খণ্ডে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে এক অতিবিস্তৃত নিবন্ধ লিখিত হইয়াছে। মহাক্ষোপাধ্যায় কবিরাজ

গণনাথ সেন মহাশয় তাঁহার প্রত্যক্ষকারী, সিদ্ধান্তনিদান প্রণয়ন করিয়া কবিরাজমণ্ডলীর রক্তজ্ঞাতভাজন হইয়াছেন। প্রথম গ্রন্থে তিনি ইউরোপীয় অস্থিবিজ্ঞানের কতগুলি তথ্য আয়ুর্বেদ-পাঠীদের জন্য সংকৃত ভাষায় আহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে অধুনাতন কালে প্রচলিত অনেকগুলি রোগকে আয়ুর্বেদীয় প্রণালীতে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্তমান কবিরাজমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু আয়ুর্বেদীয় গবেষণায় লিপ্ত আছেন ও নানা আয়ুর্বেদ পত্রিকার প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া নানা প্রবন্ধাদি প্রণয়ন করিয়া আয়ুর্বেদের জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। ৬/বামিনীভূষণ-রুত কুমারতন্ত্র, বিষতন্ত্র ও শ্রীমন্ত বিরজাচরণ গুপ্তের ‘বনৌষধি-দর্পণ’ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। হারাগচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের

স্বশ্রুতের টীকা এবং যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের চরকের টীকা স্বীয়সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্ত উ. সি. দত্ত মহাশয়রচিত *Materia Medica of the Hindus*, ত্রয় ভগবৎ সিংহজীর “A Short History of Aryan Medical Science, উমেশচন্দ্র গুপ্তের বৈজ্ঞানিকবসিদ্ধি, বিনোদলাল সেনগুপ্তের আয়ুর্বেদীয় ত্রব্যাভিধান, গোড়বালের নিষট্টরত্নাকর, দত্তরাম চৌবের রহসিষট্টরত্নাকর, রঞ্জিত সিংহের চৌবতীনী-প্রকাশ ও বিনোদলাল সেনের আয়ুর্বেদবিজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আয়ুর্বেদের আর একটা বড় দিক্ তাহার রসশাস্ত্রের দিক্, তাহা আগামী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

আলোচনা

“অগ্রসর” হিন্দু বাঙালী শিক্ষায় ভরপুর।”

এই বিষয়ে গত চৈত্র মাসের ‘প্রবাসী’র বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, ‘বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে সকলের চেয়ে শিক্ষার অগ্রসর জাত বৈদ্যের। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও শতকরা ৩৩.৫ জন নিরক্ষর। ১০০ বৈদ্যদের মধ্যে কম অগ্রসর ব্রাহ্মণেরা, তাহাদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৪৪.৮—এই নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষাখীন হইবার বয়সের কিন্তু লোক আছে।’ ইত্যাদি

মধ্যে মধ্যে পত্রিকায় দেখিরা থাকি বৈদ্যদের চেয়ে কম অগ্রসর ব্রাহ্মণেরা; কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিতে যে আমার কি বুঝি তাহা অনেকেই জানেন না। ব্রাহ্মণ অর্থে—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্যতীত লম্বাচাণ্য, অগ্রদানী, ভাটব্রাহ্মণ, বর্ণব্রাহ্মণ, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, নারায়ী, বাজালী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বোধ হয় বুঝায়।

সংখ্যালব্ধি বাঙালী বৈদ্য জাতির সহিত যদি তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে শুধু বাঙালী রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত তুলনা করিলেই বোধ হয় উহা সঙ্গীত হইবে। কারণ সর্বশ্রেণীর সময়ে বিরাট ব্রাহ্মণ জাতি গঠিত, কাজেই উহার সহিত বৈদ্য জাতির তুলনা কোনরূপেই সম্ভব নহে। আমার মনে হয় এক্ষণ তুলনামূলক আলোচনা করিলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নিরক্ষর শতকরা ৪৪.৮ হইবে না, উহার অনেক কম হইবে সন্দেহ নাই।

এখানে লিখিলে বোধ হয় অশাস্ত্রিক হইবে না যে, ব্রাহ্মণগণের জাতির মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ পরিচরম্যাক ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতে বিধি বোধ করিতেছেন না। এই জাতীয় উন্নতির যুগে বাধা দিবার কেহ নাই। হিন্দুস্থানী বা উড়িয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের আধিক্যশূন্য আর্থিকত এবং বাঙ্গালী ভাষারের সখ্যা লোভাৎ কম হইবে না, মনে হয়। আমার বিশেষ পরিচিত বর্ণব্রাহ্মণ অর্থাৎ জেলে, ভূইয়ালী ও মাছিয়াদিগের ব্রাহ্মণগণের অনেকেই মোটেই লেখাপড়া জানেন না।

ভট্টব্রাহ্মণ, কামরূপী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণও শিক্ষার বহু নীচে। কাজেই এক পথ্যে সকল ব্রাহ্মণকে কেবলি ভুল হইবে।

গত সেখানে অনেক ত্রুটিও হইয়াছে। নেত্রকোণার হিন্দুদিগের চেয়ে মুসলমানগণ শিক্ষার উন্নত, গণনার এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। ‘প্রবাসী’তে জটিল ভুলোক উহা লিখিয়াছেন।

গণনার সময় অমূল্যত ব্রাহ্মণগণের অনেকেই ভয়ে ত্রুলোকগণ লিখিতে পড়িত জানিলেও, অশিক্ষিতা বহিরা লেখাইয়াছেন।

গণনাকারীদের মধ্যে অনেকেই তথাকথিত শিখিত। কাজেই তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত ঘর পুরন করিয়াছেন এবং মন্ডলের অধিকাংশ বাড়ির ত্রুলোকগণকে অশিক্ষিত পণ্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। এরূপ প্রায়ই ঘটিয়াছে।

বৈদ্য জাতির সংখ্যা কম, কাজেই শিক্ষার তাহার উন্নত সন্দেহ নাই, আর তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় সহায়ত্বতা বাংলার যে-কোন জাতির চেয়ে যে বেশী তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। সারা বাংলার ব্রাহ্মণগণের কোন সভা থাকিলেও শিক্ষার জন্য তাহার কোন চেষ্টা করিয়াছেন কিনা জানি না। এ-বিষয়ে সকল ব্রাহ্মণের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমার সন্দেহ অমূল্যত, শুধু রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের লোকসংখ্যা কত বা তাহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা কত, সঠিক জানিতে পারিলে ‘প্রবাসী’র ‘বিবিধ প্রসঙ্গে’ লিখিয়া আমার উৎসাহক নিবারণ করিবেন।

শ্রী প্রকুমোদন মজুমদার

সম্পাদকীয় মন্তব্য—

পত্রলেখক যে-যে তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন সেদল রিপোর্টে তাহা নাই। হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন জাতি শিক্ষার অগ্রসর এবং কত অগ্রসর, সেদল রিপোর্টেও শিক্ষাবিস্তার রিপোর্টে এইরূপ তথ্য ও আলোচনা থাকাতই আমার তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম। আমার সকল জাতিতেই অগ্রসর দেখিতে চাই। “অগ্রসর”দিককে অহতুত ও “অগ্রসর”দিককে হুতিত করিবার ইচ্ছা আমার নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।

ভূষণ

শ্রীবিষ্ণুশ্বর ভট্টাচার্য্য

রেণেলের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, বর্তমান ফরিদপুর ও যশোহর জেলার অনেকটা স্থান জুড়িয়া সেকালে ছিল ভূষণ। ভূষণ অতি প্রাচীন স্থান, কিন্তু বর্তমান সময়ে উহা নামে মাত্র পধ্যবসিত হইয়াছে। এখানে হিন্দুরাজ্যের রাজত্ব ছিল, মুসলমান কৌজদারের শহর ছিল; হিন্দু ও মুসলমান, পাঠান ও মোগলের বহু বার সম্বর্ধ ঘটিয়াছিল। মুকুন্দরামের ভূষণ, দীতারাম রায়ের ভূষণ এখন খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। ইহাই কালের নিয়ম।

ফরিদপুর নগর হইতে পশ্চিম দিকে প্রায় আঠার মাইল দূরে মধুখালি গ্রাম। এখানে অল্পদিন পূর্বেও পুলিশের একটা আড্ডা ছিল। সাবেক কালের ভূষণ এখানে হইতে প্রায় তিন-চার মাইল। গ্রামা রাস্তা ও মাঠের মধ্য দিয়া কোনমতে সেখানে পৌঁছিতে হয়। যেখানে জনাকীর্ণ নগর ছিল সেখানে এখন ক্ষুদ্র পল্লী। নিকটেই প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ। প্রাচীর ও পরিখার চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বনজঙ্গলের মধ্যে ইষ্টকনির্মিত গৃহও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে এখনও দেখাইয়া দেয়, অমুক স্থানে অপরাধীকে শূলে দেওয়া হইত। সেকালে একদিকে চন্দনা নদী, অন্য দিকে কালীগঙ্গা ভূষণার নৈসর্গিক রক্ষিত্রপে বিদ্যমান ছিল। কালীগঙ্গা এখন মৃত, চন্দনা শুষ্ক। দুর্গের পাদদেশে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা কোনরূপে কালের সর্বগ্রাসী কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আছে। পুলিশ টেশনের নাম এখনও ভূষণ থাকিলেও বহুকাল পূর্বে উহা ভূষণ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিছু কাল ইহার অবস্থিতি ছিল সৈয়দপুর নামক স্থানে, তাহার পর গিয়াছে বোয়ালদারিতে। ভূষণার সন্মুখি এক সময়ে সৈয়দপুরকে গৌরবাধিত করিয়াছিল। এখানে পূর্বে মিউনিসিপ্যালিটি ছিল, বাণিজ্যের শ্রী বিব্রাজ করিত। তাহাও এখন অতীতের কথা।

ভূষণ-মামুদপুর কথাটা খুব প্রচলিত, কিন্তু ভূষণা মধুমতী নদীর পূর্বদিকে, মামুদপুর পশ্চিমে। বোধ হয় মধ্যবর্তী নদী

পূর্বে ক্ষুদ্রকায় ছিল এবং উভয় স্থানের সামাজিক ধোগ থাকায় নামটার উদ্ভব হইয়াছে। এখন ভূষণা ফরিদপুর জেলায়, মামুদপুর যশোহরের মধ্যে।

‘দিগ্বিজয়প্রকাশ’ নামক হিন্দু ভৌগোলিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, খেন্‌কর্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি যশোরেখরীর মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র কঠহারের ‘বজ্রভূষণ’ উপাধি ছিল এবং তিনিই যশোহরের উত্তর ভাগ অধিকার করিয়া তাহার নাম ভূষণ রাখেন। কোন সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না, তবে অবস্থা দৃষ্টে বলিতে হয় বারভূঞার অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে।*

মুসলমান আমলে ভূষণ নগর ছিল সাত্তের পরগণার অন্তর্গত। মোগল শাসনকালে যখন হুবে বাংলা (উড়িষ্যা সমেত) চাক্ষুষটি সরকারে বিভক্ত হয় তখন এই সাত্তেরকে সরকার মামুদাবাদের অন্তর্গত দেখা যায়। সরকার মামুদাবাদ ও সরকার কথোয়াবাদ দুইটি পাশাপাশি সরকার, একের ইতিহাস অন্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আইন-ই-আকবরীতে আমরা কথোয়াবাদকে একটি বিস্তীর্ণ জনপদরূপে দেখিতে পাই। বর্তমান ফরিদপুর জেলার অনেকটা অংশ, যশোহর জেলার থানিকটা এবং বর্তমান বাথরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালি জেলার থানিকটা ইহার অন্তর্গত ছিল। মামুদাবাদ সরকারের মধ্যে বর্তমান ফরিদপুর জেলার পশ্চিমাংশ, যশোহর জেলার অনেকটা এবং নদীয়া জেলার কতকটা ছিল। ইহাতে মহাল ছিল ৮৮টি এবং ইহার রাজস্ব ছিল ১১৬১০২৫৬ দাম। কথোয়াবাদ অপেক্ষা এই সরকার অধিক রাজস্ব যোগাইত, কিন্তু সৈন্ত যোগাইতে হইত কথোয়াবাদকে অনেক বেশী।

* ‘দিগ্বিজয়প্রকাশ’ খুব প্রাচীন বা প্রামাণিক গ্রন্থ না হইলেও প্রাচীন ঘটনাকীর্তির দ্বিতীয় উপর নির্ভর এবং হিন্দুদিগের এই জেগীর গ্রন্থের অজ্ঞান ইচ্ছাকে স্ফুটান করিয়া রাখিয়াছে।

এই দুইটি পাশাপাশি জনপদ নামে মুসলমান-প্রতাপ ঘোষণা করিলেও বহুকাল পর্ষন্ত হিন্দুরাজার প্রভাবাধিত ছিল। ডাঃ নীলেশচন্দ্র সেন বিজয়গুপ্ত-প্রণীত মনসামঙ্গলের কোন পাঠে এক ‘অর্জুন রাজা’র উল্লেখ পাইয়াছেন যাহার ছিল “মুন্সুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সাম”। এই অর্জুন রাজা সম্ভবতঃ পাঠানরাজের আত্মগত্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু মামুদাবাদের হিন্দুরাজা গৌড়ের প্রতাপ দ্বন্দ্ব দেখিলেই মন্তক উন্নত করিতে ক্রটি করিতেন না। আইন-ই-আকবরীতে আমরা পাই, এখানে কেজা ছিল, আশেপাশে নদী ছিল, পূর্বে জয় সত্বেও শের শাহকে আবার এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া জয় করিতে হইয়াছিল। সেই জয়ের সময়ে এখানকার রাজার কতকগুলি হস্তী জঙ্গলে পলায়ন করে এবং তাহার পর জঙ্গলের মধ্যে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। এই রাজার রাজধানী ভূষণায় ছিল বলিয়া অস্বীকৃত হয়। ঠিক কোন সময়ে মামুদাবাদ নামের উৎপত্তি তাহা বলা যায় না, তবে মনে হয় বাংলার পাঠান নৃপতি ফখর শাহ (১৪৮১-৮৭ খৃঃ অব্দ) নামানুসারে ফতেয়াবাদের নাম হইয়াছে আর মামুদাবাদের নামও তাহার নিকটবর্তী কোন সময়ের। শের শাহের আক্রমণের পরবর্তী সময়ের কোন ধারাবাহিক বিবরণ না পাইলেও আমরা বুঝিতে পারি যে হিন্দুরাজাদের প্রভাব প্রবল ছিল—নতুবা মোগল আমলে মামুদাবাদ ও ফতেয়াবাদকে শাসনে আনিতে দিল্লীর বাদশাহকে গলদঘর্ষ হইতে হইত না। আকবরের রাজত্বকালে বাংলা দেশে বরাবর গোলমাল চলিয়াছিল। আকবর-নামার পাণ্ডরা যায়, সর্বদা বিবাদ থাকায় বাংলা দেশের নাম হইয়াছিল ‘বুলদাক’। আকবরালের যুদ্ধের পর মুরাদ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতি ফতেয়াবাদ ও বাকুলা সরকার জয় করেন বলিয়া ইতিহাসে পাণ্ডরা যায়। বাকুলা চন্দ্রবীপে বহুকাল পর্ষন্ত স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল—সুতরাং এই জয়ের অর্থ সম্পূর্ণ খাসমখল নহে, আত্মগত্য-স্বীকার। ইহার পরও পাঠান ও মোগলের সম্বন্ধ বাংলা ও বিহারে ভালভাবেই চলিতে লাগিল। বাদশাহের কর্মচারীদিগের মধ্যেও বিবাদবাতকের অভাব ছিল না। মুরাদ খাঁ ফতেয়াবাদে বিদ্রোহ দমন করিয়া সেখানে অবস্থিত ছিলেন। তিনি যুদ্ধে রাজভক্ত ছিলেন, কিন্তু কার্যতঃ বাদশাহের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থের

চিন্তাই বেশী করিতেন। আকবরনামার পাণ্ডরা যায়, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সে-অঞ্চলের ভূমালিকারী মুকুন্দরাম রায় তাহার পুত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের হত্যাসাধন করেন ও সম্পত্তি অধিকার করিয়া লন। “বারকুৎলা” গ্রন্থে প্রণেতা আনন্দনাথ রায় কিন্তু লিখিয়া গিয়াছেন, “আরাদের সহিত তাহার বিশেষরূপ সখ্যতা থাকায়, মুকুন্দ তাহার পুত্রগণের যথোচিত সহায়তা সাধনে বদ্ধপরিকর হন।” ইহা তিনি কোথায় পাইলেন জানি না। আনন্দনাথ রায় আরও বলেন, “টোডরমল্ল জানিতে পারিলেন যে, মুকুন্দ মোগল পক্ষাবলম্বী হইয়া পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, একত্র নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া ফতেয়াবাদে অত্র কোন মুসলমান শাসনকর্তা নিয়োগ না করিয়া মুকুন্দ রায়কে রাজ্যোপাধি প্রদান ও ঐ সরকারের কতক শাসনভার অর্পণ করিলেন।” “মানসিংহ মধ্য-সময়ে যখন একবার বাকুলা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন তৎসময়ে শাসনকর্তা সায়দ খাঁ, মুকুন্দ রায়কে পঞ্চাঙ্গ করিয়া তৎপদে এক জন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। মুকুন্দ রায় এই আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু কোনও মতে নব শাসনকর্তার হস্তে ফতেয়াবাদ সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। উভয় পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধঘটনার অবতারণা হইল। তেজস্বী বীরবর মুকুন্দ রায় অন্যায়সে সেই যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে সায়দ খাঁ দলবল সহ উপস্থিত হইয়া মুকুন্দ রায়কে পরাস্ত ও হত করেন।” এই সকল কথাও রায়-মহাশয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করেন নাই। মুকুন্দরাম রায় প্রদত্ত ব্রহ্মত্র জমীর দলীলের সন্ধান কালেট্টরীতে পাওয়া গিয়াছে।

আকবরনামার পাই, খাঁ আজিম কোকা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ-দমনে প্রেরিত হইলে (১৫৮২ খ্রীঃাব্দ) তাহার বিরুদ্ধে যে-সকল বিদ্রোহী নেতা সমবেত হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ফতেয়াবাদের কাজীজালা ছিলেন একজন। ইনি অনেক রণভরী লইয়া আসিয়াছিলেন। কামানের গোলায় ইহার মৃত্যু হইলে কালাপাহাড় ইহার স্থলে নৌবিভাগের ভার গ্রহণ করেন।

ইহার কিছুকাল পরে রাজা যানসিংহের উড়িয়া জয়ের

পর আমরা ভূষণায় বিষম গোলযোগের সংবাদ পাই। এই সময়ে, যেরূপেই হউক, ভূষণা চাঁদ রায় ও কৈদার রায়ের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছিল। মুকুন্দরায় সম্ভবতঃ তখন মৃত, তাঁহার পুত্র সত্ৰাজিৎ কি করিতেছিলেন বা কোথায় ছিলেন জানা যায় না। বিদ্রোহী আফগানদেরা লুটপাট করিতে করিতে ভূষণার দিকে অগ্রসর হয়। আবুলফজল এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বোধ হয় চাঁদ রায় ও কৈদার রায়ের সম্বন্ধবিপর্যয় ঘটাইয়াছেন। তাঁহার মতে কৈদার রায় ছিলেন চাঁদ রায়ের পিতা। চাঁদ রায় কৈদার রায়ের পরামর্শে বিদ্রোহী আফগানদিগকে বন্দী করার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কলে তাঁহার নিজেরই প্রাণ গেল। চাঁদ রায় না-কি আত্মত্যাগের জ্ঞান করিয়া পাঠানসদার দেলওয়ার, হুসেমান ও উসমানকে ভূষণা-দুর্গে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেখানে ছলক্রমে দেলওয়ারকে বন্দী করা হইলে হুসেমান তরবারি উন্মুক্ত করিয়া নিকটবর্তী বহু লোককে সমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি দুর্গদ্বার হইতে নিজস্ব হইলে চাঁদ রায় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু উসমান আসিয়া হুসেমানের সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং ঘটনার বিবরণ শুনিয়া পাঠানেরা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। চাঁদ রায়ের নিজের পাঠানসৈন্যও তাঁহার বিরুদ্ধে পাড়াইল। কলে চাঁদ রায় নিহত হইলেন। আফগান-সৈন্য লুটপাট করিতে করিতে অগ্রসর হইলে দুর্গস্থ লোকেরা মনে করিল চাঁদ রায় বৃষ্টি করিতেছেন। তাহার দুর্গদ্বার খুলিয়া দিল, আফগানেরাও সহজেই জয়লাভ করিল। তাহার পর ইশা খাঁর বড়বন্ধু আফগানেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইলে ভূষণা-দুর্গ ও রাজ্য কৈদার রায়ের হস্তে সমর্পিত হইল।

কৈদার রায় এইরূপে আফগানদিগের যোগে ভূষণায় মালিক হইয়া বসিলেন, কিন্তু প্রবল মোগল কর্তৃপক্ষ বেশী দিন এ অবস্থা স্থির থাকিতে দিলেন ন। মানসিংহ শীঘ্রই দুর্জয় সিংহের অধীনে একদল বাহা সৈন্য ভূষণায় প্রেরণ করিলেন (১৫২৬ খৃষ্টাব্দ)। হুসেমান ও কৈদার রায় দুর্গ ত্যাগ করিয়া বৃষ্ণের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। মোগল-সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল, প্রতিদিন বৃষ্টি চলিতে লাগিল। দুর্গস্থ এক কামান ফাটিয়া যাওয়ার হুসেমান ও আরও অনেকে নিহত

হইলেন। কৈদার রায় আহত হইয়া পলায়ন করতঃ ইশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। (আকবরনামা)

সম্ভবতঃ ১৫২৮-২৯ অব্দে মানসিংহের স্থানান্তরে অবস্থানকালে সত্ৰাজিৎ আবার ভূষণায় প্রবল হইয়া পড়েন।

কথিত আছে, চৌভরমল মুকুন্দরামকে ভূষণায় জমিদার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন (১৫৮২ খৃঃ)। ৬শতাব্দীর মিত্র মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের সময় মুকুন্দরায় ও তৎপুত্র সত্ৰাজিৎ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু, তৎপরে অভিব্যক্তি)। সতীশচন্দ্র আরও বলেন, মুকুন্দরায় কায়স্থ রাজা কেশব সিংহের বংশধর। কেশব সিংহ উত্তর-রাঢ় হইতে আসিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে আন্দুল-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। কি হুত্রে মুকুন্দরায় ভূষণায় প্রাধান্য লাভ করেন তাহা স্থির করা কঠিন। তবে তিনি যে সম্রাট আকবরের সময়ে ভূষণা ও নিকটবর্তী ক্ষেত্রচাঁদাবদ অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা সমসাময়িক বিবরণ হইতে বেশ বৃষ্টিতে পায়া যায়। কায়স্থসিংগের দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গ সমাজ উভয়ই তাঁহাকে দাবি করে। ক্ষেত্রচাঁদাবদের বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা। এই কার্যের জন্ত ইহাকে চন্দ্রবীণ অঞ্চল হইতে অনেক দূরীণ কায়স্থ আনাইতে হইয়াছিল।

মুকুন্দরায়ের পুত্র সত্ৰাজিৎ কখনও মোগল-পক্ষের সহায়তা কখনও বিরোধিতা করিয়া বহুকাল ভূষণায় প্রতাপ অবস্থার রাখিয়াছিলেন। সার যদুনাথ সরকার মহাশয় যে আবদুল লতিফের ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন ও বাহারিস্তান নামক পুস্তকের সন্ধান দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, সত্ৰাজিৎ কিছুদিন মোগল বাদশাহের বিরোধিতাচরণ করিয়াছিলেন। সুবেদার ইসলাম খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে ইক্‌তখব্ব নামক এক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। ইহাতে সত্ৰাজিৎ দমনে নাই। তিনি বাদশাহের সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু মোগলেরা নদী পার হইয়া অতিক্রান্ত ভাবে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিল। সত্ৰাজিৎ তখন বস্ততা স্বীকার করিয়া ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। * ইসলাম খাঁ যখন আঠারবাঁকা ও

* এই এসেছে নামক হইতে প্রকাশিত *Journal of Indian History*, Dec. 1932 তে বাহারিস্তানের অবস্থান উল্লিখিত।

ভৈরব = দেব সন্মতলে অবস্থিত আলাইপুর হইতে কুচ করিয়া নগরপুর বা নাজিরপুরের দিকে ঘাইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে কতপুর নামক স্থানে সত্বাজিৎ আসিয়া দেখা করিলেন (১৩০২ খৃঃ অব্দ) এবং স্ববেদারকে আঠারটি হস্তী উপহার দিলেন। দুই পক্ষে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইলে সত্বাজিৎ মোগলপক্ষে বিদ্রোহদমনে মন দিলেন। এই সময়ে যিনি কথেন্দ্রাবাদের অধিকারী হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহার নাম মজলিস্ কুতব। কবি সৈয়দ আলাওলের আত্মপরিচয়ে এই মজলিস্ কুতবের উল্লেখ আছে। হবিবুল্লা নামক এক সেনাপতি বিদ্রোহী মজলিস্ কুতবের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন আর রাঙ্গা সত্বাজিৎ হইলেন এই সেনাপতির সহায়। মজলিস্ কুতব কথেন্দ্রাবাদ-দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া মুশা খাঁর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সাহায্য আসিল কিন্তু মজলিস্ মোগল সৈন্যকে আটটিয়া উঠিতে পারিলেন না। মোগল ঐতিহাসিকের বিবরণ হইতে জানা যায়, এই যুদ্ধে সত্বাজিৎের সৈন্যপত্ন্য ও সাহস মোগলদিগের বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। পাঠানপক্ষীয় লোক পুনঃ পুনঃ দুর্গ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া মোগলপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল, কিন্তু সত্বাজিৎ তাহাদিগের সকল উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অনেক মারামারির পর মজলিস্ মুশা খাঁর সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। অবশেষে তিনি দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

ইহার পর আমরা ভূষণরাজ সত্বাজিৎকে মোগলপক্ষে কুচবিহারের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে ব্যাপৃত দেখিতে পাই। মোগল-স্ববেদার সেধ আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁর আস্থানে তিনি মোগল-সৈন্যের যোগে কোচ-হাজো আক্রমণ করেন। কোচ-হাজো বিজিত হইলে তাঁহার শৌর্ধে খ্রীত স্ববেদার তাঁহাকেই পাণ্ডু ও সৌহাটের থানাদার বা সীমান্তরক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার বহু অস্থির এবং ভূষণার অধিপতিত্বরূপ একটা বিশিষ্ট খাতির ছিল। ইহার ফলে তিনি আসামবাসীদিগের বন্ধুত্ব লাভ করেন এবং কোচ-রাজবংশের সহিতও বনিষ্ঠতা সম্পাদনে সমর্থ হন। সেখ আলাউদ্দিনের পরবর্তী শাসনকর্তার তাঁহাকে অনেক বার ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি সে ডাক গ্রাহ্য করেন না, পূর্বপ্রধামত পোষণ ও পাঠান না। এদিকে তিনি কোচরাজের ভ্রাতা বলিনারাজের সহিত বন্ধুত্ব

লিপ্ত হন এবং মোগল-সেনাপতি আবদার সালামের কর্তৃত্বাধীনে সৈন্য প্রেরিত হইলে সত্বাজিৎের বিধানবাক্যকর্তায় অ'হোম নোবাহিনী কর্তৃক মোগল-সৈন্যের পরাজয় ঘটে। ইহার ফলে সত্বাজিৎ ধুবড়ীতে ধৃত হইয় ঢাকায় প্রেরিত হন এবং এখানে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয় (খৃঃ ১৩৩৬ অব্দে বা তাঁহার নিকটবর্তী সময়ে)।

ইহার পর ভূষণা কিছুকাল মোগল-সেনাপতি সংগ্রাম শাহের 'নাওরা' মহলভূক্ত থাকে। সংগ্রাম পশ্চিমদেশীয় লোক। কেহ বলেন, তাঁহার আদি বাসস্থান ছিল রাজপুতানার (৭) আনন্দনাথ রায়)। কেহ বলেন জম্মুতে (৭) গীতীশচন্দ্র মিত্র)। তিনি পূর্ববঙ্গে নানা স্থানে বিদ্রোহদমন ও দস্যুদলন কার্যে যশ অর্জন করিয়া শেষে ভূষণা অঞ্চলে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তখনও তাঁহাকে সত্বাটের কার্যে আবশ্যিকমত নৌ-সৈন্য যোগাইতে হইত। ঠিক কোন সময়ে তিনি ভূষণায় আধিপত্য প্রাপ্ত হন ঠিক করা কঠিন। তবে তিনি বেশ প্রতাপের সহিতই শাসনকার্য চালাইতেন। বোধ হয় এখানে তাঁহার স্বায়ী ভাবে বাদ করিবার ইচ্ছা ছিল, তাই বৈদ্য-সমাজে পুর-কন্টার বিবাহ দিয়া "হাম বৈদ্য" বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৈদ্যেরা সহজে অজ্ঞাতকুলশীল রাজন্যের সহিত বিবাহসম্বন্ধ আবদ্ধ হন নাই। কুলজ্ঞ গ্রন্থের প্রমাণে বুঝিতে পারা যায়, নবাবগত সামন্তকে সময়ে সময়ে বল-প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। মথুরাপুর গ্রামের স্থবিখ্যাত "দেউল" ইহারই কীৰ্ত্তি। এই দেউল সম্বন্ধে ত্রিহুত গুরুদয় দত্ত মহাশয়ের রূপ য এখন আমরা অনেক কথাই শুনিতেছি।*

সংগ্রাম বা তাঁহার পুত্রের প্রতাপ ভূষণা অঞ্চল হইতে কিরূপে গেল ঠিক জানা যায় না। মনে হয়, প্রায় তাঁহাদের তিরোধানের সময়েই কথেন্দ্রাবাদ হইতে কৌজবাদের আসন স্থানান্তরিত হইয়া ভূষণায় আসে। কথেন্দ্রাবাদের উপর পদ্মাদেবীর অত্যাচার এবং সংগ্রাম শাহ বা তাঁহার পুত্রের ভূসম্পত্তি শাসন ইহার কারণ হইতে পারে।†

* ১৩৪০ চৈত্র সংখ্যার 'প্রবাসী' ব্রতায়।

† আনন্দনাথ রায় তাঁহার কবিতাপুস্তকের ইতিহাসে সত্বাট আওরংজেবের সময়ে বঙ্গদেশে সংগ্রাম শাহের নানা কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আবার কশাঘর কলেঙ্গীর তালিকাতে ১৩২৬ ও ১৩৪১ (১৩৪১P) খৃষ্টাব্দে সংগ্রাম শাহ কর্তৃক ভূষণানের কথাও লিখিয়াছেন। ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর সত্বাট এবং সত্বাজিৎ ভূষণার রাজা। সে সময়ে সংগ্রাম শাহের ভূমিদান কিরূপে সম্ভব হয় P ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে শাজাহান বাদশাহ

ইহার পর আমরা সীতারাম রায়ের পিতা উদয়নারায়ণকে ভূষণার কৌজলারের অধীনে সাজোয়ালরূপে দেখিতে পাই। উদয়নারায়ণ ভূষণা নগরের অদূরে গোপালপুর গ্রামে বাসস্থান স্থির করেন; পরে হরিহরনগর নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। তিনি উত্তরবাটীর কায়স্থকুলসম্ভূত ছিলেন। কাটোয়ার নিকট কোন গ্রামে তিনি দয়ামবী নারী এক ঘোষ-দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। সীতারাম এই বিবাহের ফল।

সীতারাম সৰ্ব্বদে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। তবু, বর্তমান প্রবন্ধে কিছু না-বলিলে ভূষণার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি প্রথম বয়সে কিছু সংস্কৃত, ফার্সি ও উর্দু শিখিয়াছিলেন কিন্তু অল্পশিক্ষায়ই তাঁহার মনোযোগ ছিল অধিক। তাঁহার পিতা ঢাকার রাজদরবারে নিযুক্ত থাকার সময়ে তিনিও সেখানে যাতায়াত করিতেন। পরে উদয়নারায়ণ ভূষণার সাজোয়াল হইয়া আসিলে, তিনিও দহাদমনের কার্যে ভূষণা অঞ্চলে আসিলেন। এই কার্যে সাক্ষ্যলাভ করিয়া সীতারাম নবাবগরকার হইতে জায়গীর ও লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পিতার জায় নবাব সরকারে চাকরি করিয়াই জীবনক্ষেপ করিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার অল্পবিদ্যা নিজের কার্যে ভালমত লাগাইতে তিনি কিছুমাত্র বিধাবোধ করেন নাই। নবাবগকে নিযুক্ত হইয়া করিম খাঁ পাঠানের বিদ্রোহদমনই তাঁহার উন্নতির হৃদয়পাত। সে সময়ে দহাবৃত্তি দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। সীতারাম জায়গীর ও সেই সঙ্গে আরও দহাদমনের ভার পাইলেন। তাঁহার বীর সঙ্গীও অনেক জটিল গেল! কুনিরাম রায় ও রামরূপ বা মেনাহাতী ইহাদের মধ্যে প্রধান। দহাদমনে তিনি ক্রমেই অধিকতর কৃতকার্যতা দেখাইতে লাগিলেন; অল্পকাল বাসস্থান স্থাপন করিলেও সমৃদ্ধ ভূষণা নগরীতে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তাঁহার খ্যাতি বাড়িতে লাগিল ও রাজা উপাধি লাভ হইল। তিনি দক্ষিণ-বাংলা আবাদে আনিবার সনন্দ পাইলেন এবং বর্তমান মাগুরা মহকুমায় অবস্থিত মহম্মদপুর নগর স্থাপন করিলেন। হিন্দুর এই নতুন রাজধানীর মুসলমানী নাম হইল কেন? এ-সম্বন্ধে নানা প্রবাদ আছে। খুব সম্ভব, তখনও তিনি যোগেশ্বর বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, যোগেশ্বর শাসনকর্তাকে সন্তোষ রাখিবার জন্যই নিজ নগরের মুসলমানী নাম

দিয়াছিলেন। তাঁহার অধীন কর্মচারীগণের মধ্যেও যোগেশ্বর মুসলমানের অভাব ছিল না। মুখ্য দুর্গ, হুবুহু মনোরম জলাশয়, হুম্মার দেবমন্দির ইত্যাদি দ্বারা মহম্মদপুর ভূবিত হইয়াছিল। সীতারামের কীৰ্ত্তি অতীতের অনেক বঙ্গাবাত সহ্য করিয়া এখন পর্য্যন্ত দর্শকের চিত্ত বিনোদন করে। নানাস্থান হইতে রাজসরকারে কর্ম ও বাণিজ্যাদি উপলক্ষে লোক আসিয়া মহম্মদপুরকে ক্রমে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। এই সময়ে নানাস্থানে রাজা-প্রজায় অসন্তোষ—রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা—সীতারামকে রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করে। জমিদারীতে বিশৃঙ্খলা?—সীতারাম অমনি শৃঙ্খলার নামে গ্রাস করিতে প্রস্তুত। অত্র জমিদারের প্রজা বিদ্রোহী?—সীতারাম সেখানে সেই প্রজাকে নিজের প্রজায় পরিণত করিতে পশ্চাত্তপদ নহেন। সীতারামের জমিদারী ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এক সময়ে মুহম্মদরাম ও সত্ৰাজিতের প্রত্যাপে ভূষণা অঞ্চল কম্পিত হইত। সীতারাম সত্ৰাজিতের বৃদ্ধ প্রপৌত্রগণকে নিজের এলাকাভুক্ত করিলেন। নলডাঙ্গার রাজা তাঁহার জমিদারীর পূর্বভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

সীতারামের সকল কথা বিস্তৃতরূপে লিখিবার স্থান এ নয়। উত্তরে পদ্মা পর্য্যন্ত অনেক পরগণা—নসিবসাহী, নসরৎসাহী, মহিমসাহী, বেলগাছী প্রভৃতি এবং সম্ভবতঃ পদ্মার উত্তরেও কিছু কিছু তিনি ক্রমে হস্তগত করেন। দক্ষিণেও তাঁহার রাজ্য অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে—কতক গায়ের জোরে, কতক আবাদী সনন্দের বলে। উজানীর রাজাদের অনেক স্থান তিনি অধিকার করিয়া লন।

সীতারাম কেবল রাজ্যবিস্তারই করিতেন না, তিনি নিজের রাজ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনের চেষ্টা করিতেন, পাণ্ডিত্যের সমাদর ও সাহায্য করিতেন, বাণিজ্যের শ্রীতিস্থাপন করিতেন, সমাজসংস্কারেও অমনোযোগী ছিলেন না।

যোগেশ্বর বৈষ্ণবগণের দুর্বলতাই সীতারামের প্রত্যাপ বহনিন অঙ্গুর রাখিয়াছিল। ক্রমে ভূষণার কৌজলারের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল। বারাসিয়া নদীর কূলে এক ক্ষুদ্র হুড়ে কৌজলার আবৃত্তোরূপ নিহত হইলে সীতারাম ভূষণা অধিকার করিলেন। ভূষণার তখন অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি; নামাকরণ হুঙ্গ কাককর্ষা, কাগর, গালা, কামনপত্র, তুলা

ইত্যাদির অল্প ভূষণা বিখ্যাত ছিল। কাগজ ও গালাব কাছ এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। সাইতরের পাটীর তায় স্বল্প পাটী বোধ হয় এখনও অল্প কোথাও প্রস্তুত হয় না। সৈয়দপুরের প্রকাণ্ড পাকী নৌকা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় একটা দর্শনীয় বিষয় ছিল।

আবুতোরাপ নিহত হইলে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বজ্রআলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি ভূষণায় কোজদার হইয়া আসিলেন। নিকটবর্তী জমিদারদিগের উপর সীতারামকে দমন করিবার জন্য আদেশ প্রেরিত হইল। নবাবের জুম্ম—জমিদারেরা সীতারামের উপর বৈকিয়া লাড়াইলেন। সংগ্রাম সিংহ, দয়ারাম প্রভৃতি হিন্দু সৈন্যধাক্কেরা বজ্র আলির সঙ্গে আসিয়া সীতারাম-দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে সীতারাম জয়লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভূষণা-দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। দয়ারাম মহম্মদপুরের দিকে ছুটিলেন। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাঙ্গীর গুপ্তহত্যার কথা এ অঞ্চলে হুপ্রসিদ্ধ। ভূষণায় অবস্থান নিরাপদ নহে দেখিয়া সীতারাম মহম্মদপুরে পলায়নকরতঃ তাঁহার কতক পরিজন স্থানান্তরিত করিলেন। শেষে বৃদ্ধ আহত হইয়া বন্দি হইলেন। মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। কিরূপে মৃত্যু হয় সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

এই উপলক্ষে নাটোরের রামজীবন ও রঘুনন্দন বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হন; দয়ারাম ও জমিদারী লাভ ঘটে।

রঘুনন্দন নবাব-সরকারে কাঞ্চ করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি-শালী হইয়াছিলেন, তাঁহারই প্রভাবে ভূষণা জমিদারী তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত হয়। জমিদারীটি তখন প্রকাণ্ড ছিল। অনেক পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ নবাবের সময় তখন পূর্বতন সরকারগুলির পরিবর্তে তেরটি চাক্কার সৃষ্টি হয় তখন একটি চাক্কা হইয়াছিল ভূষণা। প্রত্যেক চাক্কার একজন করিয়া কোজদার ও তাঁহার অধীন নানা কর্মচারী ছিলেন। সীতারামের পতনের পরও ভূষণায় কোজদার রহিলেন কিন্তু তাঁহার অধীনহ অনেক স্থান নাটোরের জমিদারীভুক্ত হইয়া গেল। রামজীবন তখন ভূষণা জমিদারীর সন্মুখ প্রাপ্ত হন, তখন দিল্লীতে সম্রাট ফারোক্‌শের। সন্মুখ তাঁহারই মোহরাকিত ছিল।

রঘুনন্দন হইতেই নাটোর জমিদারীর অস্তিত্ব। সামান্য

অবস্থা হইতে নিজের প্রতিভাফলে রঘুনন্দন বড় হইয়া উঠেন এবং ভ্রাতা রামজীবনের নামে বিত্তীয় জমিদারী অর্জন করেন। দীর্ঘপাতিয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ প্রতিভাশালী দয়ারাম রায় ছিলেন রঘুনন্দনের দক্ষিণহস্তধরন, আর জমিদারী পরিচালনে সুদক্ষ ছিলেন রামজীবন।

রামজীবন নাটোর জমিদারী বৃদ্ধিই করিয়াছিলেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুকাল দয়ারাম জমিদারীর কাজকর্ম চালান, পরে রামজীবনের পৌত্র রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার উপরই জমিদারীর ভার পড়ে। তখনকার জমিদারী পরিচালনা এখনকার মত ছিল না। জমিদারেরা পুলিশের তত্ত্বাবধান করিতেন, কোজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। রামকান্ত বিষয়কাণ্ড অপেক্ষা ধর্মকাণ্ডেই অধিক অগ্রসারী ছিলেন। অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে জমিদারী তাঁহার পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর হস্তে আসে। রাণী যেমন বিষয়কর্মে, তেমনি দেবার্জনা, দান-খানাদি কাণ্ডে মনোযোগ দিতেন। কিন্তু ভূষণায় জমিদারীকে যে খাজনা যোগাইতে হইত, তাহাতে তাঁহার শ্রায় দানশীলা রমণীর পক্ষে ইহার রক্ষা অনেক সময়েই দুষ্কর হইয়া পড়িত। ইংরেজ শাসনের প্রথম আমলের কাগজপত্রে দেখা যায় ভূষণা জমিদারী রাজস্ব আদায়ের জন্য সময়ে সময়ে ইজারা দেওয়া হইত। তখন ভূষণায় আদালত ছিল এবং ইহা রাজসাহীর স্থপারভাইসরের তত্ত্বাবধানে চলিত। রাজসাহীর স্থপারভাইসর থাকিতেন নাটোরে। তাঁহার উপরে ছিল মুর্শিদাবাদে রাজস্ব-কোলিল। ইংরেজ রাজস্ব আরম্ভের আগদিন পরই (১৭৭০-১৭৭১ খৃষ্টাব্দ) ভূষণা হইতে আদালত উঠিয়া যায়, কিন্তু তখনও রাজসাহীর স্থপারভাইসরের এক সহকারী সাহেব ভূষণায় থাকিতেন। রাণী ভবানীর সময় রাজস্ব আদায়ের জন্য ভূষণায় জমিদারী যে-সকল ইজারাদারের হস্তে দেওয়া হইত তাহাদের মধ্যে নড়াইলের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সরকারী কাগজপত্র হইতে মনে হয় ভূষণায় যে অত্যধিক পরিমাণে কর ধার্য হইয়াছিল তাহা পুনঃ পুনঃ ইজারা বন্দোবস্ত সত্ত্বেও আদায় করা বাইত না। কালেক্টর নিয়োগের ব্যয় ইত্যাদি হওয়ার পর ভূষণায় অল্প একজন আদিষ্ট কালেক্টর থাকিতেন। ক্রমে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভূষণা বশোহর

জ্যোত্স্ন হইল এবং রাণী ভবানীর দস্তক পুত্র সাধক রাজবংশের হাতে থাকিল কেবল রাণী ভবানীকৃত মেঘজ রামকৃষ্ণের সময়ে রাজবংশের লাগে ইহার পরগণাগুলি খণ্ডে খণ্ডে গ্রামগুলি। কালের প্রভাবে সেই প্রাচীন স্থানীয় রাজধানী বিক্রীত হইয়া অল্প অমীমাংসার মধ্যে চলিয়া গেল। নাটোর ইহার দুর্গসমত অঞ্চলে পরিণত হইয়া গেল।

অন্যপূর্বা

ত্রিসীতা দেবী

শীতশেষের প্রভাত, তখনও সূর্যোদয় হয় নাই। গাঢ় কুয়াসার ববনিকার ভিতর দিয়া পল্লীগ্রামের প্রথবাট কিছুই ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না। তবু মানুষকে উঠিয়া ঘরের বাহির হইতে হইয়াছে, কারণ এ শহর নয় যে যত-খুশী বেলা অবধি শুইয়া থাকিলেও চাকর-বাকর ঘরের কাক সাদিয়া, সামনে ধাবার অগ্রসর করিয়া দিবে। তাহা ছাড়া, কথা হইতেছে ঠিক একালের নয়, পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বের। তখন শহরেও বি-চাকরের প্রাচুর্য্য এত ছিল না।

শীত শেষ হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু যাইবার আগে ঘেন মরণ-কামড় বলাইয়া যাইতেছে। তীব্র তীব্র বায়ু ঘেন ছাড়ের ভিতর ফুটা করিয়া দিতেছে, মানুষের হাত-পাও আর তাহার স্পর্শ নাই, ঢালাইতে গেলে চলে না—কাপুনি ধামাইতে চাহিলেও থামে না।

অত ভোরেও দস্তবাঁধে একটি মেয়ে রান করিতে আসিয়াছে। ঘাট তখন জনশূন্য, কিন্তু মেয়েটির তাহাতে কিছু ভয় নাই। ভীষণ শীতের আঘাতে তাহার তরুলতা থাকিয়া থাকিয়া কাপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু মন তাহার সেদিকে নাই। যদি কেহ আসিয়া পড়ে এই ভাবনাতেই সে উৎকণ্ঠিত। থাকিয়া থাকিয়া ঘাটের পথটির দিকে শঙ্কাকুল চোখে তাকাইতেছে, আর তাহার হাত আরও দ্রুততর হইয়া উঠিতেছে। যতবড় একটি বড়া সে লইয়া আসিয়াছে, বাড়িতে জল লইয়া যাইবার জন্য। সেইটাই সে সাদিয়া পরিকার করিতেছে।

কড়া বাফা হইয়া গেল। মেয়েটি জলে সাদিয়া টপ টপ করিয়া পেরিত হই ভুব দিয়া উঠিয়া পড়িল। কেবী সময় লইয়া কান করিয়াছে, বত দিন নয়, হাতের ভিতরটা শুষ্ক

শীতে অবশ হইয়া উঠিতেছে, লোকজন কেহ আসিয়া পড়ে সে ভয়ও আছে। ঘড়াটি টানিয়া লইয়া সে জল ভরিয়া লইল। কিন্তু লিভ বয়ে বাড়ি কেয়া অসম্ভব, সে তাহা হইলে পথেই মারা পড়িবে। কুয়াসার ভিতর দিয়া চকু যথাযথ বিক্ষারিত করিয়া সে দেখিবার চেষ্টা করিল, কোনো মানুষের আগমনের কোনো লক্ষণ দেখিতে পাইল না। তাড়াতাড়ি সঙ্গে আনীত একখানি লাল চওড়া পল্লের শাড়ী পরিয়া ভিন্না শাড়ীখানি সে ছাড়িয়া ফেলিল। কিন্তু শীত কি তাহাতেও বাগ মানিতে চায়? আঁচলটাকে দুই কের দিয়া সে নিজের গায়ে শক্ত করিয়া জড়াইয়া পিতলের ঘড়াটি কোমরে তুলিয়া লইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

কুয়াসার মেয়েটির মুখ ভাল করিয়া দেখা যায় না। তবে বেশী দীর্ঘাকী ও অঙ্গসৌষ্ঠববতী, তাহা বুঝা যায়। তাহার পরিপূর্ণ দেহখানিতে লাভণ্যের কোমর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মুখখানি নিচুই হৃদয়। বিধাতা স্বাভাবিক দেহখানিকে এত সুবন্দা ঢালিয়া নিপুণ ভাবে গড়িয়াছেন, মুখখানিতে তিনি কার্পণ্য করিবেন কেন?

পূর্বাংশে একটুখানি রঙের ছোপ লাসিল। কুয়াসার ববনিকা এইবার হুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, হস্ত তাহার অপহৃত হইবার সময় হইয়া আসিল। মেয়েটির চলা আরও দ্রুততর হইয়া উঠিল। লোকচক্র আড়ালেই কোমরোত বাড়ি পৌছিয়া গেলে সে ঘেন বাচে।

কিন্তু ভাগ্য বিমুখ। প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, ঐ যে তাহারের আঁচলটা দেখা যায়, পাশ দিয়া রাস্তাঘাটের ধূমের কুণ্ডলী গাফাইয়া পাকাইয়া উঠিয়া কুয়াসার রাশিতে মিশিয়া গিয়াছে, আর মিনিট পাঁচ করের পক্ষ-মাত্র।

এমন সময় কে যেন সম্মুখ হইতে বলিয়া উঠিল, “এরই মধ্যে নাওয়া-খাওয়া সেরে এলি গা? খন্ডি ভোদের গভরকে, শীতও লাগে না!”

মেয়েটি চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। মাথা হেঁট করিয়া চলিতেছিল বলিয়া একজন কীণাকী প্রোচা, তসরের খাটো শাড়ী পরিয়া ডিকি মারিতে মারিতে যে প্রায় তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

উত্তর না দিয়া উপায় নাই, অগত্যা সে বলিল, “হ্যা গব্বাজলমাসী, সকাল সকালই এসেছি।” প্রোচা নারী মেয়েটির মায়ের ‘গব্বাজল’, সাতিশর শুচিবাইগ্রস্তা। কখন কি অন্তর্ভুক্তি জিনিস মাড়াইয়া ফেলেন, সেই ভয়ে লাক দিয়া দিয়া চলেন।

গব্বাজল ঠাকুরাণী বলিলেন, “তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তা এত ভাড়া কিসের লা? জন-মনিষি নেই, একলা সোমন্ত মেয়ে ঘাটে এসেছিল কেন? তোর মা কি সঙ্গেও আসতে পারে না?”

মেয়েটি শুকনুখে বলিল, “মায়ের বড় অন্থখ, কদিন বিছানা থেকে উঠতেই পারেনি।”

“ভালা মা-বাণ বাছা তোমার। ইনি শুঠেন ত উনি পড়েন, উনি শুঠেন ত ইনি—এই মরছে, রাম, রাম, রাম—ভোরবেলাই এ কি নরকে পা দিলাম মা! পোড়ারমুখি শতকে খোয়ারিদের ভাত খাওয়া চিরদিনের মত ঘুচে যাক, পাত যেন আর ঘরে পাততে না হয়!” বলিয়া অজ-শিশুর জায় লক্ষ দিতে দিতে প্রোচা নিমেষমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলেন।

মেয়েটি একটু বিম্মিত হইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া দেখিল। আর কিছু নয়, একখানা হেঁড়া শালপাতা উড়িয়া আসিয়া পথের উপরে পড়িয়াছে, তাহাতেই গব্বাজলমাসী এতখানি সন্তুষ্ট হইয়া পলায়ন করিলেন। মনে মনে বলিল, “বাচাই সেন, নইলে কত যে বকবক করত হুড়ী, জার ঠিকানা নাই!”

কলসীটিকে দুচুতবে ককে ঢালিয়া ধরিয়া তরুণী দ্রুতপদে বাকী পথটুকু অভিজ্ঞ করিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

পলকালের মধ্যে একাইবার অজ্ঞ সে বলিয়াছে, যা অন্তর্ভুক্ত সময়, কিন্তু মায়ের অস্থখটা সত্যই তত বেশী কিছু নয়।

পাড়াপাশে বাসেরিকার কালজন্মে না তোলে কে? তিনিও

তাই দিন দুই ভিন জরের প্রকোপে ভুইয়াছিলেন। আজ সকালে জ্বর নাই, উঠিয়া তাই কেবল একটু সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ কয়দিন হতভাগী একলা হাতে খাটিয়া খাটিয়া সারা হইয়া গিয়াছে। ঘরকরণার লমত কাজ ত আছেই, গোয়ালঘরে দুইটি গরু আছে, তাহাদের সেবাও করিতে হয়, তাহার উপর দুইটি রোদীরা সেবা। উষ্মাশক্তি ঘোবাল ত হাপানিতে ভুগিয়া ভুগিয়া ককালসার হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যে আবার কোনো দিন সারিয়া উঠিয়া সাধারণ মানুষের মত চলাফেরা করিতে পারিবেন, সে ভরসা আর মা বা মেয়ে কেহই করে না।

মেয়ের সাদা পাইয়া মা রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, “অম্বা, এলি মা?”

ভিক্ষা কাপড়খানি উঠানের বাশের উপর মেলিয়া দিতে দিতে মেয়ে বলিল, “এই এলাম মা।”

তাহার পর জলের খড়্যাটি তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল, সেটি এক কোণে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, “তুমি সাত-তাড়াতাড়ি উন্ন ধরাতে বললে কেন মা? আমি এসেই ধরাতাম।”

মা বলিলেন, “তা হোক গে, আমি এখন ত ভালই আছি। দুটো দিন ত দাঁতে ফুটো কাটলাম না, আজ সকাল সকাল রেংখে মুখে একটু কিছু দিই। তা যা অকচি, মুখে সব যেন ভেতো হালিষ লাগে।

মেয়ে বলিল, “ম্যালেরিয়া জরের ধারাই এ। ও-বছর দেখলে না আমার কি দশা হ’ল?” শুড় অঘলহুত ভেতো লাগত। হ্যা মা, বাবা উঠেছেন?”

মা বলিলেন, “না বাছা, এই ভোরের দিকে তবে ত একটু সুমলেন। যা ধরগা গিয়াছে সারারাত, সে আঁজ বলবার নয়। এ আর চোখে সর না, কিন্তু ঠাকুর কতদিন যে পাপচোখে এই বাতনা দেখাবেন তা তিনিই জানেন।”

অম্বা বলিল, “সেই শাদা শুধুটা ছুরিগে গিরেই ত এই বিপদ বাধল। আমি বললাম যেমন করে হোক আমি নিয়ে আসি। তা তুমি নিজেকে কেতে পারবে না, আমাকেও কেতে দেবে না, এরকম করলে কি চলে?”

মা বলিলেন, “কোন প্রাণে তোমার কেতে দেব মা? এ গায়ে কি মানুষ আছে? সব শিশাচের বাস। দুর্বলের

উপর অত্যাচার করা ছাড়া এদের আর কিছুই বোধ্যতা নেই। বেশি আজ যদি আমি দুপুরে বেরতে পারি, ত নিয়ে আসব। সে কি এ রাজ্য? সাতপাড়া ভিড়িয়ে তবে ভূষণ সেনের বাড়ি।”

এতক্ষণ কুশাসার পরমা খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। তাহার ভিতর দিয়া এক বলক আলো উঠানে, রাস্তাঘরের দাওয়ায় আদিয়া পড়িল। অম্বা তাড়াতাড়ি উঠানে বাহির হইয়া রোদে পিঠ দিয়া পাড়াইল, স্তম্ভের উত্তাপটুকু সমস্ত দেহ দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল।

এইবার তাহার মুখখানি বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। টিকল নাক, দুর্গাপ্রতিমার মত চীনা বড় বড় চোখ, প্রবালের মত রাঙা ঠোঁট। মোহারা গড়ন, মেহখানি কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মেহের রং উজ্জল শ্যামবর্ণই হইবে, তবে শীতের প্রকোপে খানিকটা রান হইয়া গিয়াছে।

রোদে পাড়াইয়া পাড়াইয়া অম্বা মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, “হাজার ভোরেই উঠি মা, তোমার গম্বাকলের সঙ্গে পারবার স্কে নেই। এই শীতেও বেরিয়েছে।”

মা অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, “তোকে দেখে বললে নাকি কিছু মাগী?”

মেয়ে বলিল, “বলবে আবার না? তা হ'লে ত তার নামই বুঝ। তবে একখান ছেঁড়া শালপাত উড়ে এসে পারের উপর পড়াত্তে, গাল দিতে দিতে হুইনিয় পুকুর-ঘাটে চলে গেল।”

মা আর কিছু বলিলেন না, উঠানে হাঁড়ি চাপাইতে ব্যস্ত ছিলেন বেশ হয়। অম্বা রোদে মেহখানি একটু উত্তপ্ত করিয়া লইয়া পিতার খোঁজে ধীরে ধীরে তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

উমাগতি তখন জাগিয়াছেন, কিন্তু খাট ছাড়িয়া ওঠেন নাই। মেয়েকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বেলা হয়ে গেছে মা?”

অম্বা তাহার মশারিটা গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে বলিল, “তা খানিক হয়েছে বইকি বাবা? বেশ খোঁপ উঠে পড়েছে। তোমার মুখ খোবার পরম জল এনে দেব?”

উমাগতি বলিলেন, “আজ একবার চান করার মনে করছি। দেহটা তত খারাপ নেই, এরকম রোজ হয়ে আর পাকা যায় না।”

অম্বা ব্যস্ত হইয়া বলিল, “না বাবা, আর একটু রুহ হও, তারপর। কাল রাতে তোমার যা কষ্ট গিয়েছে। মা বলছিল আজ ভূষণ সেনের কাছ থেকে ওষুধ এনে দেবে। এই ওষুধটা খেলেই তুমি ভাল থাক।”

উমাগতি বলিলেন, “আচ্ছা, জল দে, মুখটা ত ধুই। কাপড়চোপড়গুলোও ছেড়ে কেলতে হবে।”

অম্বা জল আনিতে চলিয়া গেল। তাহার পর বাট করিয়া জল, দাঁতের মাজন, জিবছোলা সব গুছাইয়া পিতার কাছে রাখিয়া গোয়াল-ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। গোয়ালদেবের ঘোষানী বুড়ী রোজ সকালে আসিয়া পাই দুটি ছুইয়া দিয়া যায়, বেতন-স্বরূপ জ্বাচল ভরিয়া মুড়ি, মুড়িক বা চিড়া লইয়া যায়। পরমার লেনাদেনা পাড়াগায়ে বিশেষ ছিল না তখনকার দিনে। মেয়েদের মধ্যে ত একেবারেই নয়। চিঁড়া, মুড়ি, ধান বা চালের ম্যুলাই তাহার নিজেদের কেনাকাটা বা জনখাটানোর ব্যাপার চুকাইয়া ফেলিতেন।

গরু ছুটিতে দুধ মন্দ দেয় না। মা ও মেয়ে ইহাসের সেবা ও আহারে কোন ক্রটি ঘটতে দেন না, ইহারোও যথাযোগ্য প্রতিদান দেয়। আজও মাপিয়া দেখা গেল সের-চার দুধ হইয়াছে। অম্বা ডাকিয়া বলিল, “মা আজ চার সের দুধ হয়েছে।”

মা রাস্তাঘর হইতে জবাব দিলেন, “সের দুই রাখ ঘরে, বাকিটা ঘোষানীকে দে, বেচে আস্থক।”

ঘোষানীর ঘরাই বা তাঁহাদের একটু-আধটু সাহায্য হয়। সে রোজই প্রায় দুধ বেচিয়া পরমা আনিয়া দেয়, হাটের দিন হাট করিয়া দেয়, অন্য কোনো কাজের দরকার হইলে তাহাও করে। আর কাহাকেও ডাকিতে অম্বার স্বা সাহস করে না, নিজে বাচিয়াও বেহ আসেন না। ঘরে সস্তা কড়া, শত চোঁতেও তাহার তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। তাই নিজেদের কোঁত ও কল্লা লইয়া যথাসাধ্য শোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবেই তাহার চেষ্টা করেন। ঘোষানী বুড়ী অম্বাকে অত্যন্ত ভালবাসে। তাহার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনিলে রান্দার মত গিলিয়া থাইতে যায়। তাহার নিজের একটি মেয়ে ছিল, নাম জাহার রাধা, সে নাকি অম্বারই বন্দী, আর তার মতই সেক্ষিতে ছিল। সে মেয়ে কোন কালে জলে ডুবিয়া মরার সিদ্ধান্তে, কিন্তু আজও ঘোষানী অম্বার দুঃস্বপ্ন মধ্যে

তাহার মুখখানি দেখিতে পার; তাই বাহিনীর মত ভীষণ দেখে অথাকৈ আগলাইয়া বেড়ায়। তাহার দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহে পুরুষের বল, তাহাকে সহজে বাঁচাইতে প্রাণের অতি বকাটে ছেলেও সহসা সাহস করে না।

বোহানী দুধের কেঁড়েটি উঠাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। অথ বাকী দুধটা রান্নাঘরে আনিয়া পিতলের কড়ায় ঢালিয়া দিয়া বলিল, “এইটা আগে জাল দিবে লাও মা, বাবার এতক্ষণে মুখ খোওয়া হয়ে গেল।” মা তাড়াতাড়ি কড়াটা উনানের উপর বসাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দুধ ফোঁস ফোঁস করিয়া উৎলাইয়া উঠিল, অথ শাড়ীর আঁচল দিয়া কড়া ঢাপিয়া দরিয়া সেটাকে নামাইয়া ফেলিল। তাহার মা ধমক দিয়া বলিলেন, “অত সাততাত্তাতি তুই ছুটিল কেন কড়া নামাতে? এতবার বারণ করি, আঁচল দিবে হাড়ি-কড়া ধরিস নে, ধরিস নে, তা কিছুতেই যদি মেয়ে শোনে। একদিন কাপড়ে আগুন লাগিলে একটা কাণ্ড কর আর কি?”

অথ বলিল, “সে হ’লে ত বেশ হয়, তোমরাও বাঁচ, আমিও বাঁচি।” স্নেহের সুরেই কথাটা বলিল বটে, কিন্তু সবটাই যেন স্নেহ নয়। মা অত্যন্ত আহত হইয়া বলিলেন, “তুইও শেষে এমন কথা বলি? কেন রে? আমরা কোনো দিন তোরা অন্যায় করেছি?”

অথ তাড়াতাড়ি মাকে সাধনা দিতে লাগিয়া গেল, “না, না তাই কি আমি বলছি? তুমি বাপু ঠাট্টা বোঝ না।” বলিয়া তাড়াতাড়ি আঁচলের খানিক দুধ বাড়িতে ঢালিয়া তাহা একটি কান-উচু থালায় জলের ভিতর বসাইয়া ঠাণ্ডা করিতে লাগিল। তাহার পর বক্রকৈ একখানি ছোট কাঁপিতে বেলফুলের কুঁড়ির মত একরাশ খই ঢালিয়া লইয়া, দুধের বাটিটিও বামহাতে উঠাইয়া লইয়া উমাগতিকৈ খাইতে দিতে চলিল।

অথার বহন বছর পনেরো বোলা হইবে, দেখিলে তাহার চেয়ে ছোট ত মনে হয়ই না, বয়স বড়ই মনে হয়। পিতামাতার এক সজ্ঞান সে, দেখিতে হুন্দরী। উমাগতি ধনী নহেন, কিন্তু দরিদ্রও নহেন। রোগে জীর্ণ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িবার আগে তাহার ঘরভর, গোলাভরা ধান, গোয়ালভর্তি গরু, এক-বাহতরা পুতুল দেখিয়া সকলে তাহাকে সম্পদ বৃহৎই বলিত। কিন্তু হঠাৎ কোন্‌ সূত্রে যেন বছর চার-পাঁচ আগে

হইতে তাহার সোনার সন্সারে অলসী প্রবেশ করিয়াছে। ঘরভরি জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, হুন্দর ঘোরাযত হয় না। গোলাগুলির কয়েকটি খালিই পড়িয়া থাকে, কারণ তাগাদা নাই বলিয়া ধান আগের মত আদায় হয় না। গরুগুলিও কমিতে কমিতে দুইটিতে আসিয়া পড়াইয়াছে। পুতুলের মাছ চুরি যায় বেশীদূর ভাগ, চোরকে শাসন করিবার কেহ নাই। উমাগতি বন্সরের ভিতর এগারটা মাস ম্যানে রিয়া এবং ইংপানিতে শয়্যাগত হইয়া থাকেন, একটা মাস কোনো মতে চলিয়া কিরিয়া বেড়ান। মা-মেয়েতে কোনোমতে সংসারের বোঝা বহিয়া চলিতেছে, রোগীর সেবাও করিতেছে। অর্থকষ্ট বা অভাব তাহাদের নাই, কারণ তাহাদের প্রয়োজন অতি সামান্যই। অনেক গিয়াও বাহা আছে তাহাতে তাহাদের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। কিন্তু অনোদুখে সবশেষে কাতর, অজানা ভয়ে সদাই সশঙ্কিত। দুইটিরই কারণ অথ। এতবড় অরক্ষণীয়া মেয়ে যাদের পল্লার সুলিয়া আছে, তাহাদের স্বস্তি কোথায়?

অথার বিবাহ হয় না কেন? হুন্দরী মেয়ে, সুস্থ মেয়ে, কোন খুঁৎ নাই। বাপেরও পরমায় অপ্রাচ্য নাই। পল্লীগ্রামে মেয়ের বিবাহ যতখানি খরচপত্র করিয়া লোকে দেয়, তাহা দিবার সক্তি উমাগতির মধ্যেই আছে। তবে অথার বিবাহ হয় না কেন? একটার পর একটা সখ আসে। ঘটা করিয়া মেয়ে দেখান হয়, পাকা-দেখার দিন পড়ে, তাহার পর কেমন করিয়া জানি না সব ব্যাপারটা ফাসিয়া যায়। একবার নয়, দুইবার নয়, এমন কাণ্ড দশ-বার বার ঘটয়া গেল বোধ হয়। অথার জীবনে ঘুণা ধরিয়া গিয়াছে, উমাগতি এবং পারলার বৃকের রক্ত ক্রমে শুকাইয়া উঠিতেছে। মেয়ের বিবাহ কি তাহার শেষ অবধি দিতে পারিবেনই না নাকি? বতদিন কুচক্রী মধু-ভট্টাচার বাঁচিয়া আছে, আর প্রাণের সমাজপতি আছে, ততদিন ত নয়? কিন্তু তাহার আগেই না উমাগতির পরমায় শেষ হইয়া যায়।

তবু দিন কাহারও জন্ত বসিয়া নাই, একটা একটা করিয়া কাটিয়া বাইতেছে। কয়েক দিন উমাগতি একটানা ভুগিয়াছেন, আজ একই ভাল বোধ করিয়া মাত্র কত চিন্তাই যে তাহার মনে আসিয়া ভীড় করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। আজ যদি ভাল থাকেন, হঠাৎ দুসাইতে পারেন, তাহা হইলে কাল এক

জায়গার যাওয়ার চেষ্টা করিবেন। একটি পাত্রের সন্ধান পাইবাহেন, লুকাইয়া সেখানে গিয়া খয়ের লবঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহার পর অত্র কোথাও গিয়া বিবাহটা দিবার চেষ্টা করিবেন। এ-গ্রামে থাকিয়া বিবাহ দিবার সাধ্য তাঁহার নাই, তা এই কয় বৎসরই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এখানে তাঁহার সহায় কেহ নাই, শত্রুই সকলে। অথচ জানে তিনি কখনও কাহারও অপকার করেন নাই, উপকারই করিয়াছেন। যতদিন শরীর সুস্থ ছিল, আটচালাটিতে অবৈতনিক পাঠশালা খুলিয়া গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়াছেন, দরিদ্রকে সাহায্য করিয়াছেন, বিপদের অত্র যথাসাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্তই গ্রামবাসীর মন হইতে নিষ্কর হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। তাহারায় হৃদযন্ত্র, মূৰ্খ, চরিত্রদোষ-দুষ্ট মধু ভট্টাচার্যকে উল্লিঙ্গহকারে প্রণাম করে, তাহার কথায় ওঠে বসে; কিন্তু উমাগতি মরিয়া গেলেও কেহ তাহার দিকে ক্রিয়য়া তাকায় না। বাংলা দেশের পল্লীবাসীর মন এক বিচিত্র জিনিষ।

উমাগতি নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে খাইতে দেরি করিতেছিলেন, অথবা তাড়া দিয়া বলিল, “শীগুণির কঁরে খেয়ে নাও বাবা, দুধ বে জুড়িয়ে হিম হয়ে যাচ্ছে। গরম গরম খেলে একটু ভাল বোধ করতে।”

উমাগতি বলিলেন, “আর ত একটু ভালই আছি মা,”— দুধটা চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিয়া তিনি বাটিটা নামাইয়া রাখিলেন। বলিলেন, “এ ক’দিন তোর বড় ষাটুনি গেছে না মা? তোর মাঘেরও অহুধ হয়ে পড়েছিল, একলা সব করতে হয়েছে।”

অথ। উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল, “ভারি ত কাজ, খাবার লোক ত নগদ আমি। একবেলা রাঁধলেই চলত।”

উমাগতি মান হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “পড়াশুনা কিছুই করতে পারিস নি না?”

অথ। বাটি ও কাঁশি উঠাইতে উঠাইতে বলিল, “না এক’দিন আর হ’ল কই?”

পড়া আর পড়ানো ছিল উমাগতির কাছে নিঃশাস-বান্ধুরই মত প্রয়োজনীয়। পাঠশালাও খুলিয়াছিলেন এই জামিনেই। উহা উঠিয়া বাইরের পর তাঁহার একমাত্র ছাত্রী হইয়াছিল অথ। তাহার শিক্ষকতাই তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

সে বাংলা এক সংকুত উত্তমরূপেই শিখিয়াছে, অক্ষও কিছু কিছু জানে। উমাগতি কানীর টোলে পড়িয়া পণ্ডিত, ইংরেজী প্রথমে মোটেই জানিভেন না, পরে নিজের চেষ্টায় খানিকটা শিখিয়াছিলেন। অতীকেও তাহা শিখাইবার ইচ্ছা তাঁহার আছে, তবে গ্রামবাসীদের ভয়ে হইয়া ওঠে না।

পিছনের পুকুরের ঘাটে গিয়া অথ। কাঁশি, বাটি ও ঘটি মাজিতে বসিল। বাবা, কি শীত! জলে যেন ছুরির মত ধার, হাত দিলে হাত কাটিয়া যায়। শহরে নাকি জলের কল আছে, ঘরের ভিতর বসিয়াই জল পাওয়া যায়, গায়ে তেমননি থাকিলে বেশ হইত।

হঠাৎ ঠিক তাহার সামনেই জলের মধ্যে মত্ত একটা ঢিল আসিয়া পড়িল। হিমশীতল জল ছিটকাইয়া উঠিয়া অথার দেহ সিক্ত করিয়া দিল। অথ। চকিত ভাবে চারি দিকে তাকাইয়া দেখিল। ঐ ত বাঁশঝাড়ের আড়াল দিয়া কে একজন চলিয়া যাইতেছে। লুকাইবার বিশেষ চেষ্টা তাহার নাই, কারণ সে জানে ধরা পড়িলেও তাহাকে শাস্তি দিবার কেহ নাই। অথ। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। এ-সব উৎপাত নুতন নয়, কিন্তু এখনও তাহার সহিয়া যায় নাই। এখনও যে বুকের রক্ত টপকগ করিয়া ফুটিয়া ওঠে, ঐ কাপুরুষ ভীকর দলের কষ্ট নথরে ছিড়িয়া দিতে ইচ্ছা করে! কিন্তু উপায় নাই। বাংলার পল্লীর সহায়হীনা নারী সে, অভ্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিবার কমতা তাহার কোথায়?

বাগন করখানি লইয়া দ্রুতপদে সে বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর সেগুলি নিঃশেষে রান্নাঘরের দাওরায় নামাইয়া রাখিয়া, মাতার অজ্ঞাতেই ঘরে ঢুকিয়া আবার কাপড় ছাড়িয়া ফেলিল। শারদার এমনভেই দুঃখের অন্ত নাই, মড়ার উপর খাড়ার ষা দিয়া আন লাভ কি?

বাড়ির কুঠাই বেখানে অস্থল, সেখানে রান্নাবান্না সর্বদাই সখম্পে সারা হইয়া থাকে, স্বতরাং শারদারও রান্না শেষ হইতে দেরি হইল না। বাওরাদাওরাও কিছুকণের মধ্যেই ঢুকিয়া গেল। অথ। বলিল, “ঐ ভাত ক’টার জল দিয়ে রাখ মা। ওতেই আমার রান্নারে হয়ে যাবে। আবার একটা পেটের জন্তে কে ষটা কণের রাঁধতে বসছে?”

শারদা বলিলেন, “নিতি পাচ খেয়ে দুইও পেবে একটা রোগ বামা। একই ত সন্ধ্যের বড় কলি?”

অম্বা বলিল, “হী ত্য আর না? শীতের দিন, ছুটে পাক খেলেই অমনি আমার অস্থির হয়ে যাবে।” অগত্যা ভাতে জল ঢালিয়া শারদা হাড়ি তুলিয়া দিলেন।

সকালবেলাটা যেমন কুয়াসাক্ষয় ছিল, এখন হইয়াছে তেমনি প্রখর রৌদ্র। শারদা মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, “গুর আমি এই বেলা একটু ভূষণের কাছে হয়ে আসি। তুই ঘরে দোর দিয়ে বোস, তোরা বাবা ঘুম থেকে উঠলে দুখ-সাবুটা দিস।”

অম্বা ঘরের ভিতর বসিয়া ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ পড়িতেছিল, বইখানি হাতে করিয়াই বাহির হইয়া আসিল। তাহার বিশাল চকু দুটি তখন স্বপ্রাক্ষর, ক্ষুদ্র ও নিষ্ঠুর বর্তমানকাল ছাড়িয়া সে অতীতের কোন অপূর্ণ মারামর রাজ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে। বনবাসিনী আশ্রমবালাও সম্রাটের প্রেমের যোগ্য। যেখানে, সেই রাজ্যেই অখার মন তখনকার মত বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

মায়ের কথামত দরজাটা বন্ধ করিয়া বসিয়া সে আবার বইয়ে মন দিল। এমন নিবিষ্ট হইয়া সে পড়িতেছিল যে, বেলা কোথা দিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে সেদিকে তাহার লক্ষ্যমাত্র ছিল না। উমাগতি ডাকাডাকি করায় তাহার চমক ভাঙিল। বইখানা সাবধানে উপড় করিয়া রাখিয়া সে বলিল, “গাড়াও বাবা, তোমার দুখ-সাবুটা গরম করে এনে দিই।”

দুখ সাবু গরম করিয়া রাজাঘরে আবার শিকল তুলিয়া দিয়া সে ফিরিয়া আসিল। দুখের বাটি পিতার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, “তুমি খেয়ে নাও বাবা, তারপর আমাকে ডেকে, আমি বাটি তুলে নিয়ে যাব।”

বিকালের পড়ন্ত রোদ তখন আড়াআড়ি ভাবে দাওয়ার আসিয়া পড়িতেছে। খানিক পরে আবার সেই হিনশীতল রাজি। বতকণ আছে ইহার মধুর উদ্ভাপটুকু উপভোগ করিয়া লওয়া বাক। অম্বা মাছুরটা রৌদ্রের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বইখানি আবার খুলিয়া বলিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার একেবারে অমরকণ্ঠের স্বশাসাগরে ডুবিয়া গেল।

বাহিরের দরজার শিকলটা কন্বন করিয়া উঠিল। অম্বা চকিত হইয়া উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। ওমা রোদ একেবারে উঠানের কোণে গড়াইয়া গিয়াছে, স্বর্গাতের আর কিলক নাই। ছুটিয়া গিয়া দরজাটা খুলিয়া

দিল, বইখানি তখনও তাহার হাতে। বাহিরে তাহার মায়ের সঙ্গে গ্রামের চিকিৎসক ভূষণ সেন পাড়াইয়া। অম্বা লজ্জায় লাল হইয়া তাড়াআড়ি সেখান হইতে সরিয়া আসিল।

শারদা ভূষণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “ওই আমার মেয়ে বাবা। বড় লম্বা, কিন্তু গ্রামের লোকের অভ্যাচারে যা আমার চোখের উপর শুকিয়ে উঠছে। আর আমার বললে আমি পুড়ে মরলে ত সকলেরই ভাল হয়।”

ভূষণ বলিল, “আপনার আমার কথা শুনুন, ভিটার মায়া ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। সেখানে এত অভ্যাচার আপনাদের সহ্য করতে হবে না। আপনাদের সমান অবস্থার মানুষও সেখানে আছে, কাজেই একেবারে সহায়তীন বা বন্ধুহীন আপনারা হবেন না।”

শারদা দীর্ঘবাস কেলিয়া বলিলেন, “হয়ত তাই-ই আছে অদৃষ্টে,”—তিনি যেন বিমনা হইয়াই কিছুক্ষণ পাড়াইয়া রহিলেন। ভূষণ চারি দিকে তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু যে আশায়, তাহা পূর্ণ হইল না। সেই হৃদয় মুখখানির অধিকারিণী কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তখন শারদাকে ডাকিয়া সচেতন করিয়া বলিল, “চলুন যা, ঘোষাল মশাইকে দেখে আসি।”

শারদা বলিলেন, “চল বাবা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। এই গাঁয়ে স্বজাতি যারা আমাদের, তারা এখন রাক্ষসের মূর্তি ধরেছে, মানুষের প্রাণ শুধু তোমার মধ্যেই আছে।” দুই জনে গিয়া উমাগতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অম্বা গিয়া রাজাঘরে লুকাইয়া ছিল। ভূষণ সেনের সঙ্গে সে কথা বলে না, কিন্তু দু-জনে দু-জনকে বিবাহ চেনে। ঘোষানী বুড়ীর মারকতে একের কথা আর একজন শুনিতে পায়। একবার বুঝি সে অম্বার সঙ্কটজ্ঞানের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, “তোমাদের দিদি ঠাকুরণের নাম বললে শরশতী নাম দাও।” সে-কথা আর সকলে ফুলিয়া গিয়াছে, অম্বা ভোলে নাই। নিতুর্ক মধ্যাহ্নে, নিম্নাধীন রাতে, অনেক বার এইভাবে শোনাকথাগুলি মনে করে, আর তাহার বকের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। কিন্তু নিজের মনের ভাব কখনও বুঝিবার চেষ্টা সে করে না, বহা স্বপ্নও অভাবনী, সে চিন্তা সাধ করিয়া কি কেহ ডাকিয়া আনে?

শানিক বাসে আবার সবার দরজা বন্ধ করার শব্দ হইল।
তখন অম্বা রামাবর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,
“উনি বাবাকে ওখু দিয়ে গেলেন মা?”

শারদা বলিলেন, “হ্যাঁ মা, ভাল ক’রে দেখে-ভুলে ওখু
দিয়ে গেল। তা, তুই কি সত্যিই এবেলা রাখি না?”

অম্বা বলিল, “ভারি ত একটা পেট, তার জন্তে
আবার দু-বেলা ইাড়ি চড়ান, তার চেয়ে আমি বইখান।
সেরে ফেলি।”

শারদা মেহের হালি হাসিয়া বলিলেন, “যেমন বাপ তার
তেমন বেটি, দুটিই পড়া পাগলা। তুই কি বেটাছেলে
যে খালি পড়লেই চলেবে? পড়ায় আমাদের দরকার কি, মা?
ঘর-পেরেছালির কাজ যত ভাল ক’রে শিখবে ততই লাভ।”

অম্বা বলিল, “তা কেন মা? জানলাভ করবার অধিকার
ছেলে মেয়ে সকলেরই আছে। ঐ যে কলকাতায় শুনি
আজকাল মেয়েরা ইঙ্কল-কলেজেও পড়ায়, তারা কি
অভ্যাস করে?”

শারদা বলিলেন, “কি জানি মা ভায় কি অভ্যাস। ও-
সব বিচারে আমার কাজ নেই। তা তুই পিদিমগুলো
আগে ঠিক কর, তারপর আবার বই নিয়ে বসিস। ঘোষানী
এখনও আসেনি?”

অম্বা বলিল, “না, তুমি তাকে কত কি কিনে আনতে
করমান করলে, তাই খুঁজে পেতে আনতে দেরি করছে
বোধ হয়।”

শারদা বলিলেন, “একটিক গরু ছইবার সময় যে উৎসে
গেল। নিজেই দেখব না-কি?” বলিতে বলিতে ঘোষানী
আসিয়া আঙ্গিনার চুকিল। শাধার ঝুড়িটা নামাইয়া রাখিয়া
বলিল, “এই আমার লক্ষ্মীদিদি ঠাককণের শাড়ী মা, এই
জোড়াই হাটের সবার সেরা কাপড়।”

অম্বা ব্যস্তভাবে বলিল, “কেন মা তুমি আবার খরচ
ক’রে আমার জন্তে কাপড় কিনতে গেলেন? আর এই রকম
ফুরে কাপড় বুনি আমার বহনী মেয়েতে পরে?”

শারদা বলিলেন, “খাখ ত, মেয়ের ঘেন আর বয়েসের গাছ-
পাখর নেই। ঘোষানী, মা—গরু ছইতে দেরি হয়ে গেল, অম্বা
শিদিমগুলো চুট কর গছিয়ে নে,” বলিয়া ফুরে শাড়ীজোড়া
চুকিয়া গইয়া তিনি ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন।

শীতকালের ক্ষুদ্র দিন দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল।
তুলসীভাগ্য প্রদীপ বেধাইয়া শম্মলনি করিয়া মা ও মেয়ে
আবার ঘরে গিয়া চুকিলেন। রোজ চলিয়া গিয়াছে, সেই
হাড়ে কপ লাগান বাতাল আবার শুরু হইয়াছে, বাহিরে
বসিবার আর জো নাই।

এত শীতেও অম্বার রাতে ঘুম আসিতেছিল না। খাওয়া-
দাওয়া চুকাইয়া পাড়াগাঁয়ের মাহুৰ সকাল সকালই শুইয়া
পড়ে, জাগিয়া থাকিবার কোনো ছুতা তাহাদের নাই। তবু
ঘুম ত ইচ্ছা করিলেই আসে না। মা এখনও শুইতে আসেন
নাই, পাশের ঘরে বাবার সঙ্গে একটানা কি সব পরামর্শ
চলিতেছে। অম্বা কথাগুলি কানে শুনিতেছে না, কিন্তু
কি যে কথা তাহার আর বুঝিতে বাকী নাই। ভগবান,
কতদিনে এই দশার অবসান হইবে? কোন্ পাশে পরিবার-
স্বস্ত তাহারা এমন ভুবনলে পড় হইতেছে? কোনোমতে
একটা বিবাহ হইয়া গেলে অম্বা বাঁচে, সে যাহার সঙ্গে হোক।
মা-বাপের এ যন্ত্রণা আর সে চোখে দেখিতে পারে না।
হঠাৎ যেন বুকের ভিতরটা তাহার বাখার মোচড় দিয়া
উঠিল, সে পাশ করিয়া শুইল।

উমাগতি বোধ করি ভালই ছিলেন, কারণ অত ভোরে
উঠিয়াও অম্বা দেখিল, মা বাবা তাহার আগেই উঠিয়াছেন,
এমন কি বাবার মুখ-হাত শোওয়া হইয়া গিয়াছে। নারিকেল-
নাড়ু ও মৃড়ি সহযোগে তিনি জলযোগ করিতে বসিয়াছেন।
অম্বা বিস্মিত হইয়া বলিল, “বাবা কোথাও বেরবে নাকি?”

উমাগতি বলিলেন, “হ্যাঁ মা, একটু ভিন্ গাঁয়ে যাব”—
বলিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিতে লাগিলেন। তাহার
ভিন্ গাঁয়ে বাওঝার অর্থও অম্বা জানিত, কাজেই চুপ
করিয়া গেল।

খাওয়া শেষ করিয়া উমাগতি উঠিলেন। আপাদমস্তক
শীতবস্ত্রে এমন করিয়া আচ্ছাদিত করিলেন যে, তিনি মাহুৰ
না জন্মুক, তাহাই বুঝিবার আর কাহারও কমতা হইল না।
জুতা পরিয়া ছাতা হাতে করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।
শারদা ডাকিয়া বলিলেন, “সন্ধ্যে বাপাত ঠিক করবে, কিছুতে
দেরি না হয়।”

উমাগতি সন্তোষিতক মাসা নাকিয়া অল্প হইয়া গেলেন।
শারদা তখন মেহের দিকে করিয়া বলিলেন, “চল মা আমার।”

পান সেয়ে আসি। এখনি ত পঞ্চঘাট লোকে ডরে উঠবে।
পাড় গাছা ও জলের ঘড়া জোগাড় করিয়া ছই জনেই পথে
পাহির হইলেন, সদর দরজায় শারদা তালো বন্ধ করিয়া গেলেন।

তাহার পর দিনের কাজ একই চিরন্তন হুজুরিয়ার
লিজে লাগিল, বিয়ায় নাই, বৈচিত্র্য নাই। সন্ধ্যা হইবার
মাগে শারদা ব্যস্ত হইয়া ক্রমাগত ঘর-বাহির করিতে
গিলিলেন, উমাগতি আসেন কি-না। রুগ্ন, দুর্বল মাহুষ
নৈতাঙ্কই দ্বায়ে ঠেকিয়া তাহাকে বাহিরে পাঠাইতে হইয়াছে,
কিন্তু প্রাণ তাহার ছটকট করিতেছে।

বাহা হউক, প্রায় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া
উমাগতি শারদার চিন্তার তখনকার মত অবসান ঘটাইয়া
দিলেন। তাহার হাত হইতে ছাতা, লাঠি লইয়া অথো জিজ্ঞাসা
করিল, “পা ঘোয়ার জন্তে একটু গরম জল দেব, বাবা?”

উমাগতি বলিলেন, “নাও মা।” অথো জল আনিতে
পান্নাঘরে ঢুকিবামাত্র শারদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু করতে
পারলে?”

উমাগতি মুহূর্তের বলিলেন, “ঠিক ত একরকম ক’রে
এলাম। তাদের খাই বড় বেশী, বুঝেছে কি না যে আমাদের
বড় দায়। তা আমি রাজী হয়ে এসেছি।”

শারদা বলিলেন, “বেশ করেছ, আমাদের ত আর ঐ
একটি বই নেই? কোনোমতে দু-হাত এক হয়ে যাক, তারপর
এ পাণপুরী ছেড়ে দু-জনে কাশীবাস করব।” এই সময়
অথো জল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

সেই দিন হইতেই বাড়ির শাস্ত, ধীর, মন্থর গতিটা
বদলাইয়া গেল। ভোরে সন্ধ্যায় চুপি চুপি লোক আসে, কি-
নব পরামর্শ হয়, আবার চলিয়া যায়। জিনিষপত্র আসে
কতরকম, বাসনকোসন, শাড়ী, গহনা। অথাকে কিছুই বুঝাইতে
হয় না, সবই সে বোঝে। অনেক বার সহিয়াছে, আরও কতবার
সহিতে হইবে কে জানে? ভগবান কি চিরদিনই তাহার
বাণ থাকে ক্রোধ দিবেন?

হঠাৎ শীতের রাতে, ঘোর অন্ধকারের ভিতর তাহার।
গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় চলিল। দুইখানি গরুর গাড়ীতে
জিনিষপত্র বোঝাই, একখানিতে তাহার। তিন জন। গাড়ীতে
উঠিবার পর অথো জিজ্ঞাসা করিল, “মা, কোথায় যাচ্ছ?”

শারদা সংক্ষেপে বলিলেন, “জোর আমার বাড়ি।”

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার। আর একটি গ্রামে
প্রবেশ করিল। আমার বাড়ির লোকেরা সবই জানে দেখা
গেল। আজই সকালে গায়ে হলুদ, রাতে বিবাহ। অথার
বুকের ভিতরটা একবার মাত্র বিপুল বেগে ছুলিয়া উঠিল,
তাহার পর অসাড় হইয়া গেল। এ ব্যাথা ত নতুন নয়, সে ত
জানে ইহা তাহার জন্ম জীবনপথে অপেক্ষা করিয়াই আছে?
যাক, বাবা মা ত মুক্তি পাইবেন।

গ্রামেরই জনকতক এয়ে আসিয়া জুটিলেন, বরের বাড়ি
হইতে হলুদ আসিল, কত্নাকে তাহা দিয়া স্নান করান হইয়া
গেল। তখনকার দিনে এত ঘটীর তত্ত্ব ছিল না। তেল হলুদ
ছাড়া অতি সামান্য কিছু জিনিষই আসিত। এক্ষেত্রেও
তাহাই আসিয়াছিল।

অথো একলা একটা ঘরে মাহুর পাতিয়া শুইয়া দুপুরটা
কাটাইয়া দিল। উপবাসক্ৰিষ্ট দেহ, ব্যাথাক্ৰিষ্ট মন লইয়া কখন
যে ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, তাহা নিজেই জানিত
না। বিকালের দিকে কয়েকটি যুবতী ও বালিকা আসিয়া হাসির
কল্লোলেই তাহাকে জাগাইয়া দিল। মহা ঘটা করিয়া সকলে কত্না
সাজাইতে বসিয়া গেল। রক্তাশ্রয়, চন্দনচর্চিতা অথো যেন রূপের
জ্যোতিতে প্রদীপের কণী আলোক স্নান করিয়া দিল। বর
আসিল। শারদা আশা-আশঙ্কাপূর্ণ হৃদয়ে এয়েদের সঙ্গে করিয়া
উঠানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এইবার বর আসিবে, ক্রী-
আচার আরম্ভ হইবে। ওদিকে নির্জন ঘরে অথো অশ্রুহীন শুক
চোখে নক্ষত্র-বিভূষিত আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ বাহর বাড়িতে একটা প্রচণ্ড কোলাহল শোনা
গেল। বর ভিতরে আসিতেছিল, কে একজন লোক তাহার
গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল, এবং চীৎকার করিয়া বলিতে
লাগিল, “চলেছেন ত বিয়ে করতে, কিন্তু স্বাক্ষর বিয়ে
করছেন তা ভাল ক’রে খোঁজ করেছেন? কত্নার নিজের
পিসী বিধবা হবার পর কলকাতায় বিদ্যোদাসগরী মতে আবার
বিবাহ করেছিলেন, তা জানেন?”

সঙ্গে সঙ্গে সভ্যত্ব লোক হৈ হৈ করিয়া উঠিয়া
পড়িল। “কি অশ্রদ্ধা, কি পাপিষ্ঠ! ব্রাহ্মণের জাত মারবার
চেষ্টা!” উমাগতি অভিজ্ঞতের মত চাহিয়া রহিলেন, ভিতর-
বাড়িতে শারদা কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন, বরণচালা
তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

বাহির বাড়ির কোলাহল ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হইয়া আসিল। মারামারি, বকাবকি সব শেষ হইল, বরযাত্রের দল গ্রাম ভাগ করিয়া চলিয়া গেল।

উমাগতির শ্যালক তাঁহাকে নাড়া দিয়া বলিলেন, ‘অমন পাথরের মত বসে থাকলে ত চলবে না। মেয়ের গায়ে হলুদ হয়ে গেছে, বিয়ে আজ রাত্রেই মধ্যে দিতেই হবে, এখনও দুটো লগ্ন আছে।’

উমাগতি শ্রদ্ধাভঙ্গে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘পাত্র কোথায় পাব?’

তাঁহার শ্যালক অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, ‘তা আমি কি জানি? চল খুঁজে দেখা যাক। কানা, খোঁড়া বুড়ো যা হোক, একটা কিছু জোটাতে হবে।’ যন্ত্রমুখের মত উমাগতি তাঁহার পিছন পিছন বাহির হইয়া গেলেন।

শারদাকে সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া ঘরে তুলিয়া লইয়া গেল। অম্বা একবার চাহিয়া দেখিল, কোন কথা বলিল না। তাঁহার বিশাল চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল, যাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে ধীরে ধীরে তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিল। হিমশীতল বায়ু আর্দ্রনাগ করিয়া ফিরিতেছে, বিবাহসভার প্রদীপগুলি এক একটি করিয়া নিবিয়া আসিল। শেষ লগ্নও প্রায় কাটিয়া যায়। এমন সময় উমাগতি ফিরিয়া আসিখা মেয়ের সামনে দাঁড়াইলেন। পাগলের মত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘মরতে পারবি মা?’

অম্বা তাহার বিশাল চোখ দুটি তাঁহার মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, ‘পারব বাবা, চল, আমরা তিন জনেই একসঙ্গে যাই।’ শারদা হাহাকাহ করিয়া কাদিয়া উঠিলেন। ছুটিয়া আসিয়া কন্ডাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, ‘না, না, চল এ পাগলারা ছেড়ে যাই। জগতে কোথাও কি আশ্রয় পাব না?’

তাঁহার ভাইও আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, বলিলেন, ‘তাই ঠাণ্ড। কানী চল যাক, আজ রাত্রেই রক্তনা হও। অন্তর্পুরা মেয়ে নিয়ে গ্রামে যেয়ে না, প্রাণে মারা যাবে।’

যে পক্ষর গাড়ীতে তাঁহার সকলে এ-গ্রামে আসিয়াছিলেন, তাহাতেই আবার উঠিয়া বসিলেন। বাড়ির মেয়েরা অন্ধার

বিবাহসম্বন্ধ খুলিয়া শাশু কাপড় পরাইয়া দিল, অম্বা জিনিষপত্রও গুছাইয়া সব গাড়ীতে তুলিয়া দিল। শারদার ভ্রাতা বলিলেন, ‘আমি ওখানেই জমিজমা ঘরদোর সবের ব্যবস্থা করব, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই।’

গাড়ী ছাড়ে প্রায়, এমন সময় একজন লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। উমাগতির সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কোথায় যাচ্ছেন? গ্রামে যাবেন না। ওরা দুই মলে মিলে আপনাদের ঘরে আগুন দেবার যড়যন্ত্র করছে।’ সে ভূষণ।

অম্বার মুখ তাহার দিকে চাহিয়া একবার ভোরের আকাশের মত অরুণ-রাগ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি অস্ত্র দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

শারদা কাদিয়া বলিলেন, ‘আমরা কানী যাচ্ছি বাবা। ও-গ্রামে জাত যখন ছিল, তখন টিকতে পারিনি, আজ জাত গেছে, এখন কোন সাহসে যাব?’

ভূষণ সেন বলিল, ‘চলুন আমি যাচ্ছি স্টেশন অবধি আপনাদের সঙ্গে। পথে বিপদ ঘটা অসম্ভব নয়।’ গাড়ীগুলি চলিতে আরম্ভ করিল।

গ্রামের সীমানা ছাড়াইবা মাত্র ভূষণ বলিল, ‘কানী যাবেন না, কলকাতায় চলুন।’

উমাগতি বলিলেন, ‘কলকাতায় কে আমাদের আশ্রয় দেবে বাবা?’

ভূষণ বলিল, ‘সেখানে ত আপনার বোন ভগ্নীপতি, তাঁরা রয়েছেন। যে-সমাজ আপনাদের ত্যাগ করল, কেন আর তাকে আঁকড়ে ধাকা? আপনি পণ্ডিত, আপনাকে আর আমি কি বোঝাব?’

উমাগতি বলিলেন, ‘সত্য। আগে এ-কথা ভাবিনি। তাই চল গিবি।’

শারদা কথা বলিলেন না। ভূষণ তাঁহার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, ‘মা, আমি তোমার স্বজাতি নই, কিন্তু আমি মায়াব, পশু নই।’

শারদা তাহার মাথায় হাত দিয়া বীরবে আশীর্বাদ করিলেন, তাঁহার কণ্ঠে ভাষা ছুটি না।

অম্বা একবার ফিরিয়া ভূষণের দিকে তাকাইল, তাহার দুই চোখে অরুণোদয়ের আভাস।

কাপুর স্পেশালে কাশ্মীরের পথে

ত্ৰীহেমেশ্ৰমোহন রায়

ৱাওলপিণ্ডি—১০ই মে। আজ ভোর ৫টায় হৃদীয় পথের যাত্রারস্তুর কথা ছিল, কিন্তু চাপান ইত্যাদি সারিয়া লটবহর পরিতে এবং পথের উপযোগী হালকা জিনিষগত নিজ নিজ মোটরগাড়ীতে শুধাইয়া তুলিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। কাপুর কোম্পানীর নির্দেশমত পনেরখানা মোটরগাড়ী ও তিন-চার খানা লরি ট্রেনের প্রাটেক্ষের শেষভাগে সারি দিয়া দাঁড়াইলে যাত্রীরা নিজ নিজ মালপত্র উগাতে উঠাইতে লাগিলেন। আমরা দলে চারি জন ছিলাম বলিয়া একখানি গাড়ী নিজস্বরূপে পাইলাম। সকলে প্রস্তুত হইয়া নিজ নিজ গাড়ীতে উপবেশন করিলে আমাদের মোটরবাহিনী মন্থর গতিতে প্রাটেক্ষ হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই থামিয়া গেল। ইহার কারণ পরক্ষণেই বোধগম্য হইল বটে, কিন্তু অথবা বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আমরা কিছু অধীর হইয়া পড়িলাম, কারণ আকাশের মেঘচ্ছন্নতা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল এবং সন্ধ্যার পূর্বেই রাওলপিণ্ডি হইতে ১৩৩ মাইল দূরবর্তী উরি নামক স্থানে পৌছিয়া তদ্রূপ পাছশালায় অর্থাৎ ডাকবাংলার রাত্রিযাপনের কথা ছিল। যাহা হউক দেখা গেল এই মোটরবাহিনীর কোটো লইবার উদ্দেশ্যেই কর্তৃপক্ষের আদেশে গাড়ীগুলি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। আলোকচিত্রের উদ্যোগ-আয়োজনে আরও অর্ধঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইল। অতঃপর কোটো-তোলা শেষ হইয়া গেলেই রাত্রিপথে অবতীর্ণ হইয়া বেলা প্রায় ৪টার সমস্ত গাড়ী একযোগে ছুটিল। সে এক অভিনব দৃশ্য, কিন্তু পরক্ষণেই মোটরচালকদের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গেলে আমরা সকলে গৃথক হইয়া পড়িলাম। এই হৃদীয় পথে চালকেরা যাত্রীদের অধিকৃতি অসুখ্যায়ী পাড়ী না চলাইয়া, নক্ষত্রবেগে ছুটাইয়া

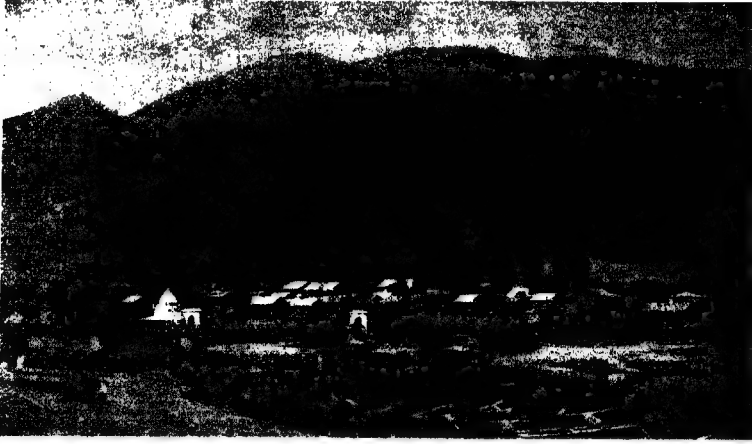
দেয়; এই কারণে পরম রমণীয় দৃশ্যাবলী উপভোগ করিবার অবসর হয় না, আকাক্ষা অতৃপ্ত থাকিয়া যায় এবং মনে হয় এই মোটর-যুগের পূর্ববর্তী কালে টোলা নামক দ্বিস্রু অস্থানই এ-পথের উপযোগী ছিল। তাহাতে তিন-চার দিনে এই হৃদীয় পথ অতিক্রম করিতে হইলেও নয়ন-মনের



মারি শহরের বাজার

পরিতৃপ্তিকর বলিয়া প্রাপ্তি বা ক্রান্তি অস্বভূত হইত না। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে স্থলজিত ডাকবাংলা বিরাজিত বলিয়া বিশ্রামস্থলেরও কোনও ব্যাঘাত ঘটিত না।

সতের মাইল দূরবর্তী টোল গেটে যখন পৌছিলাম তখন আকাশ রীতিমত মেঘচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং আরও আট মাইল অগ্রবর্তী ট্রেট নামক স্থানে পৌছিবার পূর্বেই অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরক্ষণেই ৩,৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত পাইন-বৃক্ষবহুল 'সামলি সেনিটরিয়ার' অতিক্রম করিয়া সাত মাইল অগ্রবর্তী যোরাগলি নামক স্থানে পৌছিবার পূর্বেই বেশ বৃষ্টি নামিল। পথ ক্রমশঃ উচ্চগামী হইয়া পন্থত্রিশ মাইল দূরবর্তী মারি ক্রমারি (Murree Brewery) অতিক্রম করিয়া আরও দুই মাইল অগ্রবর্তী রাওলপিণ্ডি বিভাগের প্রখ্যাত বাস্তুবাস 'মারি' শহরের পাদদেশে (সমুদ্রতট হইতে ৬৫০০ ফুট উচ্চ) 'সানি ব্যাক'



খিলম-ডাউন বারামুলা শহর

(Sunny Bank) নামক স্থানে মোটর পৌঁছিলে আমরা চারি জন নামিষা পড়িলাম এবং কাপুৰ কোম্পানির প্রদত্ত টিকিন ক্যারিয়ার ও ব্ল্যাক্ রকিত আহাৰ্য ও পানীয়ের সম্ভাব্যার্থ খেটর-ষ্ট্যাণ্ডের সংলগ্ন ইম্পিরিয়াল হোটেলের কক্ষে প্রায় এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিয়া বৃষ্টির বেগ কিছু কমিলেই দুই মাইল উর্দ্ধস্থিত মারি শহর দেখিতে পদব্রজে রওনা হইলাম। কারণ এ চড়াই-পথে মোটরে গমনাগমন সম্ভবপর নয়। অবশ্য সঙ্গী মহিলাষয়ের জন্ম দুইটি ভাণ্ডির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অপর পথটক দল এ শহরটি না দেখিয়া ইতঃপূর্বেই কাশ্মীরের পথে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। মারি অনেকটা দার্জিলিং শহরের মত তবে অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু উচ্চতায় বেশী। ইহার সর্বোচ্চ স্থানটি সমুদ্রবক হইতে ৭,৫০০ ফুট। শহরের নানা স্থান হইতে চতুর্দিকের দৃশ্য অতি চমৎকার। উত্তরে হাঙ্গালাগলির পর্বতশৃঙ্গগুলি ও দক্ষিণে রাওলপিন্ডির সমতলক্ষেত্র পর্যন্ত পরিদৃশ্যমান। এ শহরে বহু হোটেল এবং সুসজ্জিত দোকানপাট। ১৮৭৬ সালের পূর্বে এখানে পঞ্জাব সরকারের গ্রীষ্মাবাস ছিল এবং এখনও ইহা উত্তর-ভারতের সামরিক অধ্যক্ষের গ্রীষ্মাবাস রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পঞ্চন প্রদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যক্তি-বর্গেরও সমাগম বেশ আছে। তবে ইদানীং পঞ্জাব হইতে

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পৃথক হওয়ার নাথিয়াগলি (৮,০০০ ফুট) নামক সীমান্ত প্রদেশের গ্রীষ্মাবাসটি ক্রমশঃ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং এ-শহরের প্রয়োজনীয়তা ও আদর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। স্থানীয় ভাটিতে বিয়ার নামক যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহা সমগ্র ভারতে সরবরাহ হইয়া থাকে। প্রায় দুই-তিন ঘণ্টাকাল এখানে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় বখন রওনা হইলাম তখনও বৃষ্টির বিয়াষ নাই। এখন আমাদের পথটি ক্রমশঃ উত্তর-পূর্বাভিমুখে নামিয়া চলিয়াছে। এই মারি শহরের পাদদেশ হইতে বিভক্ত হইয়া একটি মোটরবাহী পথ গোছা উত্তর দিকে ছাঙ্গলাগলি হইয়া ছাঙ্গাগলি নামক অপর একটি স্বাস্থ্যাবাস পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার উচ্চতা ৮,০০০ ফুট এবং পূর্বকথিত নাথিয়াগলি হইতে মাত্র দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবার পরেও মারি পাহাড়ের চূড়াবিশিষ্ট ঘরবাড়ি চিত্রাশিতের ছায় পক্ষাতে দেখা যাইতে লাগিল।

বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। গাড়ীর পর্দা তুলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও ভিতরে ছোট আসিয়া আমাদের ভিজাইয়া দিতে লাগিল। লগেনজ ক্যারিয়ারে রক্ষিত মালপত্রের ত কথাই নাই। দেখিতে দেখিতে মারি হইতে সতের মাইল দূরবর্তী গিরিশঙ্কটপ্রবাহিণী খরস্রোতা

ঝিলম বা পৌরাণিক বিজ্ঞান নদীর তটসংলগ্ন রাস্তায় আরম্ভ হইল। পরপারেই কান্সিয়ার-মহারাজের এক প্রাসাদ উপনীত হইয়া আমাদের গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল। তখন আর চারি পার্শ্বের দৃশ্য বড় একটা দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল এই স্রোতধিনীর আবর্জিত কেনিল তাণ্ডব ও গর্জন গোচরীভূত হইতেছিল। বড় বড় কাঠের তক্তা ও রলা অসংখ্য ভাসিয়া চলিয়াছে। পার্কভ্য চীর, পাইন প্রভৃতি কাঠের ব্যবসায়ীরা এইরূপে কাঠ চিরিয়া নদীর ধারে ধারে আটকাইয়া রাখে এবং বজার সময়ে ভাসাইয়া গরুদের নানা স্থানে চালিত করে; তাহাতে কম খরচে নদীসংলগ্ন বিভিন্ন কাঠগোলায় নিজ নিজ চিহ্নিত মালগুলি পাঠাইয়া থাকে। মোটর ও বৃষ্টির বেগের বিরাম নাই। ক্রমে নিম্নগামী পথে রাওলপিণ্ডি হইতে চৌষটি মাইল দূরে কোহালা নামক ক্ষুদ্র



রাজপথ, শ্রীনগর



দোমেল নামক স্থানে একটি স্থান-সেতুর দৃশ্য

শহরে উপনীত হইলাম। এখানে পাছনিবাস অর্থাৎ ডাকবাংলা পোষ্ট ও তার আপিস এবং সামান্য দোকানপাট ইত্যাদি আছে। শুক (Customs) আপিসের কাছে কখনকাল অভিবাহিত হওয়ার পরেই নদীর উপর হৃদুশ্য সেতুটি পার হইয়া কান্সিয়ার রাজ্যান্তর্গত পথে আমাদের গতি

আরম্ভ হইল। পরপারেই কান্সিয়ার-মহারাজের এক প্রাসাদ বিরাজমান। এই উভয় রাজ্যের সংযোগস্থলটি পরম রমণীয়। ইহার আপেক্ষিক উচ্চতা ১৮০০ ফুট মাত্র, কিন্তু পথের দুই ধারে গগনচূষী শৈলরাজি বিরাজিত। উভয়

রাজ্যের সীমান্তস্থিত এই রাস্তাটি ঝিলম নদীর সহচররূপে চলিয়াছে, কোথায়ও বিচ্ছেদ নাই। ক্রমে আমরা পঁচাশি মাইল দূরবর্তী ঝিলম ও কিষণ-গজার সংযোগস্থলে অবস্থিত অপূর্ব দৃশ্য দোমেল নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানেও পাহাশালা, ডাক ও তার আপিস এবং হাসপাতাল আছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার সদর এন্টাবাদ নামক ছাউনী-শহর হইতে একটি মোটরগমনোপযোগী রাস্তা এখানে আদিয়া মিলিত হইয়াছে। দোমেলের উচ্চতা ২,২০০ ফুট। এখানেও

শুক আপিসে আমাদের ও সন্দের অপর পর্যটক দলের গাড়ী এবং মালবাহী লরি প্রভৃতির ভিড় লাগিয়াছে দেখা গেল। বৃষ্টির বেগ কথঞ্চিৎ কম থাকায় এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল বিলম্ব হওয়ার আমরা চা পান করিয়া লইলাম। দোমেল-সংলগ্ন ঝিলম নদীর উপর স্থান-সেতুর



আমিরাকবল সেতু—জীনগর

পরপারেই কান্দাহার-রাজ্যের অত্যন্ত শহর মুজাকারাবাদ অবস্থিত। বর্ষণজনিত জলবুন্দির সঙ্গে পার্বত্য নদীঘরের গর্জন শুনিতে শুনিতে আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। ক্রমে পাহাড়ের উচ্চতর স্তরে আমাদের গাড়ী উঠিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে আরও চৌদ্দ মাইল অগ্রবর্তী পাহাশালা সমাধিত গাটী নামক স্থানটিও ছাড়াইয়া গেলাম। বৃষ্টির বেগ এখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনে ভাবিলাম কৃষ্ণগেই রাঙলপিণ্ডি হইতে যাত্রারম্ভ করা হইয়াছিল। যারি হইতে রাত্তা ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে চলিয়া দোমেলে হঠাৎ বক্রগামী হইয়া গেল; অতঃপর দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে নদীর গতি ধরিয়া উরি পর্যন্ত চলিল। ক্রমে চিনারী, চাকোঠা নামক স্থানঘর অতিক্রম করিলাম। আমাদের গাড়ী অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়াছে, কারণ সন্ধ্যার পূর্বেই উরি বাংলায় পৌছিতে হইবে নচেৎ সকল পর্যটকের উপযোগী পাহাশালা নিকটে আর নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক শত তেত্রিশ মাইল দূরবর্তী উরি বাংলায় আমাদের গাড়ীর গতিরোধ হইল। দেখিতে দেখিতে অন্যান্য গাড়ীগুলিও প্রায় আসিয়া জুটিল।

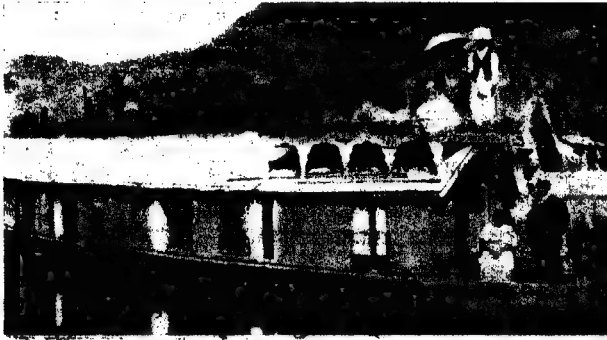
সমুদ্রতট হইতে উরির উচ্চতা চার হাজার পাঁচ শত ফুট, হুতরাং বিলক্ষণ শৈত্য অনুভব করিলাম। তখন সকলেই

বিশ্রামস্থলের জন্য লালায়িত, কিন্তু পাহাশালাটি বৃহৎ হইলেও একযোগে এতগুলি যাত্রীর স্থান সন্ধান হওয়া দুর্ঘট। এই কারণে বিলম্বে আগত কতিপয় সহপাঠক এখানে না নামিয়া ফের মাইল অগ্রবর্তী রামপুর বাংলায় রাজিবাসনোদ্যে রওনা হইয়া গেলেন। আমরা কিন্তু সিন্ধু বসনে আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ছিলাম না, কাজেই মালপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া এই পাহাশালায় একটি কক্ষ দখল করিলাম এবং টিকিন-কারিঘার হইতে কংক্রিট আবাসিক প্রকা উদ্বোধন করিয়া শয়নের ইচ্ছায় বিহানাপত্র কুঠিতেই দেয়া গেল যে, প্রায় সন্ধ্যাই সিন্ধু। তথাপি অপেক্ষাকৃত তরুণ আচ্ছাদনাদির সন্ধ্যাবহার করিবার ইচ্ছায় শয্যা রচনা করিতেই এক বাধা উপস্থিত হইল। কতিপয় মহিলা-যাত্রী বিলম্বে উপস্থিত হওয়ার তাঁহাদের অল্প কোনও ঘরে স্থানলাভের সুবিধা হইল না, হুতরাং আমাদের অধিকৃত কক্ষেই আগমন করিলেন। অগত্যা সঙ্গী মহিলাঘরের সহিত তাঁহাদেরও রাজিবাসনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমরা উভয় ভ্রাতা অপর কোন কক্ষে স্থানসন্ধানের চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহাতে কৃতকাণ্ড না হইয়া জোড় ভ্রাতা বারান্দার শয্যা রচনা করিয়া লইলেন এক আশি বহিষ্কার এক প্রকোষ্ঠে অপর তিন জন যাত্রীরা রাজিবাসের জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখনও বৃষ্টি

বিরাম নাই, এমন কি শিলাবর্ষণও হইতেছিল। সমস্ত শ্রীনগর পৌছান অসম্ভব হইবে, আমাদের পরিচালকেরা রাজি একরূপ অনিচ্ছায় কাটিল। পরস্পরের এইরূপ এইরূপ আশঙ্কা ব্যক্ত করিলেন। স্তব্ধতা মালপত্র বাধিয়া সহ্যহুত্ব ছিল বলিয়াই এই হৃদয়ীর্ণ পর্যটন এত আনন্দের ১৪ই বেলা সাড়ে সাতটায় পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া হইয়াছিল। সকলেই পরস্পরের সাহায্যার্থ বন্ধপরিকর, পুনরায় যাত্রারন্ত করা হইল। উরি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘন সমগ্র শ্বেশাল ট্রেনের যাত্রীবর্গ এক বৃহৎ পরিবারভূক্ত, নিজ নিজ স্বার্থ-বিশ্বত। জীবনে একরূপ অভিজ্ঞতা বোধ হয় দুর্লভ। সহযাত্রীদের একখানি গাড়ী অনেক রাত পর্যন্ত আসিয়া পৌছায় নাই বলিয়া আমরা সকলেই চিন্তাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম; অবশেষে রাজি দ্বিপ্রহরের পর ঐ গাড়ীর যাত্রীরা পৌছিলে জানা গেল আমাদের যাত্রাবাহী একটি লরি পথে বিপন্ন হওয়ায় উহার সাহায্যার্থ তাঁহাদের এত বিলম্ব



পুয়াতন রাজপ্রাসাদ, শ্রীনগর



লেখকের ভাসমান নৌগৃহ

হইয়াছে। এইরূপ চূষণে পরীক্ষাগার হইতে সন্ধ্যা পড়িত জলপ্রবাহে রাস্তা স্থানে স্থানে বেক্রম কাটিয়া ফুটতেছিল তাহাতে যে নির্ঝরে সকলে সন্তুষ্ট স্থানে আসিয়া পৌছিব তাহা মনে হয় নাই।

রাজি প্রভাতের পূর্বেই পুনরায় যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। কারণ এখনও ভেবটি মাইল পথ বাকী আছে, বিশেষতঃ বর্ষণের যখন বিরাম নাই তখন দৈনন্দিন যোগ আরও ঘনাইয়া আসিলে পথের কোনও স্থান যদি ধসিয়া যায় তবে

একটি মনোভোতা স্থান বটে, কিন্তু দুর্দৈববশতঃ চতুর্দিক ঘুরিয়া দেখিবার অবসর পাওয়া গেল না। এই স্থান হইতে একটি রাস্তা দক্ষিণ দিকে কাম্বীরের অগ্রতম উপ-করদ-রাজ্যের রাজধানী পুঙ্ নামক ক্ষুদ্র শহরাভিমুখে গিয়াছে। রওনা হইবার পর কয়েক মাইল পর্যন্ত আমাদের রাস্তার অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়াছে দেখা গেল এবং প্রতি মুহূর্তেই বিপদাশঙ্কা মনে জাগিতে লাগিল, কারণ রুটি ও মোটরের বেগ সমভাবেই চলিয়াছে। উরি হইতে

তের মাইল অগ্রবর্তী রামপুর বাংলা ছাড়াইলাম। তখনও পূর্বাঙ্গের উরি বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন অগ্রগামী পর্যটকদের চার-পাঁচটি গাড়ী গাছশালার ঘারে দণ্ডায়মান। তাঁহারা বোধ হয় তখনও গতরাত্রের অবসাদ কাটাইয়া পথের জন্ত প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। পথিমধ্যে মহারা নামক স্থানে কাম্বীর রাজ্যের বিজলী-কারখানা দৃষ্ট হইল। আরও পনের মাইল ছুটিয়া কিলম-তটস্থ বারামুলা শহরে উপনীত হইলাম। এই স্থান হইতে কাম্বীরের



ডাল-ইদের একাংশ

উপত্যকাভূমি আরম্ভ হইল। এ রাজ্যের জলখানচালিত ব্যবসা-বাণিজ্যের ইহাই কেন্দ্রস্থল। বারামুলায় নীচে আর জলখানের গতি সম্ভবপর নয়, কারণ নদীর ঢাল ক্রমশঃ খরতর ও বিপজ্জনক। বারামুলা হইতে ইসলামাবাদ বা অনন্তনাগ পর্যন্ত সত্তর মাইলের অধিক এই নদীর গতিপথটির সমতা (level) প্রায় সমান বলিয়া তরঙ্গীয় গতিবিধি অব্যাহত। ঐ উভয় স্থানের মধ্যবর্তী শ্রীনগর শহরে গমনোন্মুক পর্যটকেরা অনেকে বারামুলা হইতেই বজরা অর্থাৎ হাউন্স-বোট ভাড়া করিয়া জলপথেই যাত্রা করিয়া থাকেন। অবশ্য যাত্রাদের প্রচুর সময় হাতে নাই তাঁহারা এরূপ নৌবিহারের আনন্দলাভে ভক্তি হন, তাহা বলা বাহুল্য। নানা শ্রেণীর বহু তরঙ্গী এখানকার ঘাটে লাগিয়া আছে দেখিলাম। এ শহরের আপেক্ষিক উচ্চতা প্রায় ৫,২০০ ফুট। এখান হইতেই শকটচারীদের ঝিলম নদীর সঙ্গ ভাগ করিতে হয় এক শ্রীনগরে পৌঁছিয়া পুনরায় ঝিলম ঘটে। বারামুলা হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত ইতস্ততঃ জলাকীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে চাব-আবাদের পর্যাপ্ত পরিচয় পাইয়া এবং যথাস্থা চিরবিস্তৃত কাশ্মীর কুহুমের স্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ অপ্রাবেশে বাংলা দেশে বৃষ্টি স্থানান্তরিত হইল বলিয়া ভ্রম জন্মিতে লাগিল, তবে পরক্ষণেই দিগন্তের সীমাতে হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত উদ্ভূত চূড়াগুলি দৃষ্টিপথে পড়িতেই সে ভ্রম বিদূরিত হইল। আর

এক অদ্ভুত পাদপরাজির সহিত প্রথম পরিচয় ঘটিল—তাহার নাম পপ্‌লার। ইহার বহুলশূন্য শুভ্র কাণ্ডগুলি সরলভাবে গগনমার্গে উঠিয়াছে। এই পাদপের সারি কাশ্মীরের উপত্যকা-বীথিগুলি শোভিত করিয়া রাখিয়াছে। এ-জাতীয় বৃক্ষ ইউরোপ হইতে প্রথমে আমদানী করা হয়, এ প্রদেশের আদিমজাত নহে।

ক্রান্তগতিতে কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর শহরের উপকণ্ঠে আসিয়া পড়িলাম। পাহাড়-পর্বতের পরিবর্তে চতুর্দিকেই খালি বিল ও হরিৎ শোভার প্রাচুর্য দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শহরের মধ্যে আমিরা-কদল নামে ঝিলমের উপর সাতটি সেতুর প্রথমটির উপর আসিয়া পড়িলাম। এই সেতুর দুই দিকেই প্রশস্ত রাজপথ-সংলগ্ন হস্তা ও বিপণিজেলী বিরাজমান। ইহার সম্মুখেই নদীতটে স্বয়ং রাজপ্রাসাদটি প্রথমেই নয়নগোচর হয়। অসংখ্য বজরা ও শিকড় নামক এক প্রকার ডিলী নদীবক্ষে ভাসমান। তন্মধ্যে মহারাজের খাস বজরাগুলি ও খালসা হোটেলের নামাঙ্কিত ভাসমান ভিতল বজরাটি প্রধানতঃ আগন্তকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাহারা উক্ত হোটেলের পাকা বাড়িতে না থাকিয়া জলক্ষে অবস্থানের প্রয়াসী, তাহাদের জন্যই হোটেলওয়ালারা এরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীনগর শহরটি যে এত সুবৃহৎ ও ভয়ঙ্কাল এবং

উহার রাস্তাঘাট এত সুন্দর তাহা আমাদের ধারণাই ছিল না। অবশ্য আলো ও আঁধার প্রায় সর্বত্রই পাশাপাশি বিরাজ করিতে দেখা যায় এবং এখানেও যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই তাহার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বহুভাবে উল্লিখিত হইবে। যাহা হউক, রেলপথ হইতে এতদূরে অবস্থিত এরূপ বহিষ্কৃত শহরের প্রথম দর্শন যে একেবারে চমকপ্রদ তাহাতে অণুমান লব্ধ নাই। যখন ইঠাং এক স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমরা কদলের নিকট আমাদের মোটর কোম্পানীর আপিসে অপর সহযাত্রীদের গাড়ীগুলি আসিয়া না মিলিত হওয়া পর্যন্ত আমাদের তথায় অর্ধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে হইল। তৎপরে আরও দুই মাইল দূরবর্তী শহরের প্রান্ত-সীমাস্থিত ডাল ব্রদ সংযুক্ত প্রণালীর গাশ্বিনল নামক অংশের দিকে আমাদের গাড়ীগুলি চলিতে লাগিল। কারণ সেখানেই জলবন্ধে আমাদের বার দিন আবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নিমেষে নেড়ু হোটেল, পোলো ময়দান, ডাল গেট প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মোটরের গতিরোধ হইল এবং স্থলযান হইতে জলযানে অধিষ্ঠিত হইবার আয়োজনে সকলে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলাম। তখনও বর্ষপের বিরাম নাই, তবে প্রকোপ কমিয়াছে। উপরোক্ত প্রণালীর গাশ্বিনল নামক অংশটি ডাল-ব্রদের প্রায় মোহনায় অবস্থিত। এখানে নানা শ্রেণীর বহু বজরা তাঁরে সংলগ্ন আছে, তন্মধ্যে আমাদের চার জনের উপযুক্ত একটি বজরা পছন্দ করিয়া মালপত্র তাহাতে স্থানান্তরিত করিলাম। সিক্ত বন্দনে তখন আমরা প্রায় কম্পমান; যে পর্য্যটকেরা দলে চার-পাঁচ জনের কম ছিলেন তাহারা সম্পূর্ণ একটি বজরার অধিকারী হইতে পারিলেন না, অপর যাত্রীর সহিত কোন বজরার আংশিক অধিকারী হিসাবে বাসস্থান পাইলেন মাত্র। বজরাগুলি নানা শ্রেণীর আছে। তন্মধ্যে আমাদের বজরাটি অত্যন্ত শ্রেণীর না হইলেও মূল্যবান আনবাবপত্রে সুসজ্জিত পাঁচটি কামরা ও দুই স্নানকক্ষ-বিশিষ্ট ছিল। প্রত্যেক বজরা-সংগঠিত আরও দুটি করিয়া তরণী পাওয়া যায়, উহার একটি পাকশালা (kitchen boat) ও অপরটি শিকান্ডা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শিকান্ডা বলিতে মধ্যস্থলে ছত্রীবিশিষ্ট জলীবোট বা ভিকী বুঝায়। উহাতে যাত্রীরা বেঞ্চামত জলবিহার ও মাছেরা ইত্যন্ত;

গমনাগমন করিয়া থাকে। কারণ মূল বজরাটি তাঁরে লুপ্তলাবক ভাবেই থাকে, সচরাচর গতিশীল নহে। আর পাকশালাটি রন্ধনাদি ও হাঁজি বা মাঝিদের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাদের অল্প বাসস্থান নাই। ইতঃপূর্বে কাঙড়ি নামক জিনিসটির সহিত পরিচিত ছিলাম না। অন্য বজরায় অধিষ্ঠানকালে প্রথমেই উহা পরিলক্ষিত হইল, গলদেশবিলুপ্ত প্রজ্জলিত অন্ধারবিশিষ্ট গেমমণ্ডিত স্তম্ভপাত্র বিশেষ। যখন হিমমুক্ত-এ-প্রদেশ তুষারাজ্যে থাকে তখন ইহাই সর্বদা দরিদ্র কান্দীরীদের বন্ধুলে বিরাজ করে। শ্রীনগর শহরে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার মুসলমান-জাতীয় হাঁজির বাস। ইহাদের ব্যবসায় নৌচালনা এবং সম্পত্তির মধ্যে নিজ নিজ বজরা কিংবা জেঙা। উহারই ভাড়ায় তাহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহার। ধূর্ত এবং ভুলিয়াও সত্য কথা বলিতে চায় না। অনেকে বাবুচির কাজও শিখিয়াছে। ইহাদের রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা কর্মপরায়ণা ও সুশ্রী, কিং তদ্রূপ হুশীলা নহে।

আমাদের প্রায় তিন দিকই গিরিমালা পরিবেষ্টিত। উহাদের উচ্চ চূড়াগুলি ডাল-ব্রদের স্বচ্ছ নীরে প্রতিফলিত হইয়া এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ডাল গেট হইতে এই প্রণালীর মোহনা পর্যন্ত প্রায় দেড় মাইলব্যাপী প্রশস্ত পার্বত্য-ময় বাঁধ-সংযুক্ত রাস্তাটি (Strand) আধুনা দুই বৎসর যাবৎ প্রস্তুত হইয়া ক্যারান বুলভার নামে অভিহিত হইয়াছে এবং রাস্তার অপর পার্শ্বেই প্রাচীন হিন্দুমন্দির-শোভিত শঙ্করাচার্য বা তখত-ই-সুলেমান নামক পাহাড়টি বিরাজমান। ইদানীং এই রাস্তার ধারে সুন্দর সুন্দর বিতল বাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ভাড়া পাওয়া যায়। আহারাধি কোনও প্রকারে সমাধা করিয়া বিশ্রামস্থলের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানপত্র, এমন কি বাস্তবপেটার অভ্যন্তরস্থ পরিধের বস্তাদি পর্যন্ত বুড়ির জলে ভিজিয়া গিয়াছে। বেলা প্রায় দুইটা পর্যন্ত বর্ষণের পর আকাশ মেঘমুক্ত হইলে শ্রীতবস্ত্রাদি বজরার ছায়ে প্রসারিত করিয়া শিকান্ডা সাহায্যে ব্রদবন্ধে বিচরণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এই ব্রদে তরঙ্গ না থাকায় এইরূপ জলবিহারে কোনরূপ বিপদাশঙ্কা নাই। অবশ্য বৃহত্তর উলার-ব্রদের কথা স্মরণ, কারণ উহাতে বাত্যাবিভাঙিত তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।



শান্তিদেবকৃত বোধিচর্যাবতার—প্রজ্ঞাপারমিতা নামক নবম পরিচ্ছদ। প্রথম ভাগ। (গোবিন্দকুমার সংস্কৃত গ্রন্থাবলী—১) শ্রীগোপালদাস চৌধুরী, এম-এ, বি-এল সম্পাদিত। ৩২৯: বিডন রো, কলিকাতা। হইতে শ্রীগোপালকুমার চৌধুরী, এম-এ, বি-এল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১০ আঁটি আনা।

শান্তিদেবকৃত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের নবম পরিচ্ছদের মূল ও বাংলা অনুবাদ এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ-দর্শনের মতবাদ ও হিন্দুদর্শনের সহিত তাহার সম্পর্ক বিস্তৃত ভাবে তুলিকায় আলোচিত হইয়াছে। এই অনুবাদ ও টীকা শ্রীযুক্ত হরিহরানন্দ আরণ্য মহাশয় কর্তৃক লিখিত। অনুবাদকে সঙ্গত আকর্ষক করিবার জন্য স্বাভাবিক ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে। পদ্ধতিগত অনুবাদ গ্রহণের জন্য স্থানে স্থানে বহুদূর মনো অথবা স্বতন্ত্রভাবে টিপসী পদ্ধতির দ্বারা এতদেব তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের সহিত স্বীকার করিতে হইত যে, ইহা সত্য ও ভাষা অনেক স্থলে জটিল ও দুর্বোধ্য হইয়াছে তাহা আর এতটুকু সত্য হইলে সাধারণ পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইত। যাহা হউক, অনুবাদ-এই বাংলা সাহিত্যে এই নতুন অনুবাদগ্রন্থ আমরা দায়ের বরণ করিতেছি। প্রজ্ঞাপারমিতা বৌদ্ধদর্শনে অতি সুপরিচিত বস্তু। নানা গ্রন্থে ইহাও সর্বত্র অতি বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্তিদেবের গ্রন্থে প্রাথমিক ভাবে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে এই বিবরণি আলোচিত হইয়াছে পাঠক ইহা পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন। ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধমাত্রাও নাই। সুতরাং বাহ্যিকের বৌদ্ধধর্ম সর্বত্র কেনও আগ্রহ বা অনুপ্রাণিতা নাই এরূপ সাধারণ পাঠকও গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করবেন, সন্দেহ নাই। সম্পাদক-মহাশয় গ্রন্থের প্রারম্ভে জানাইয়াছেন যে, কতকগুলি পালিগ্রন্থের অনুবাদ তিনি অনুর ভবিষ্যতে প্রচার করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা প্রার্থনা করি তাহার এই সাধু আশা সত্যরূপে সফল হউক এবং চৌধুরী-মহাশয়ের মত সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধাবৃত্তির প্রচেষ্টায় বাংলার অনুবাদ-সাহিত্যে পুষ্টি হইয়া সাধারণ বাংলার জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতে সহায়তা করুক। আমাদের বিশেষ আশংকা এই যে, চৌধুরী-মহাশয়ের প্রস্তুতকৃত অনুবাদ গ্রন্থখানি এক জন প্রাচীন হুশ্রাসিক বাঙালীরা গ্রন্থের অনুবাদের দ্বারা আরম্ভ করা হইল। এতলে ইহা উল্লেখ করা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না যে, মূল গ্রন্থের রচয়িতা শান্তিদেব অনেক পণ্ডিতের মতে বাংলা দেশেরই লোক ছিলেন।

শ্রীচিন্তাহরন চক্রবর্তী

হালিদা হামুম—গোলাম বকরুল হিলালী, এম-এ, বি-এল। এশোরার বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্টোর, কলিকাতা। আঁখিন, ১৩৪-০। মূল্য ১০ আঁটি আনা।

তুরস্কের নবাবগণের পুস্তকের পাশে দাঁড়াইয়া যে-সকল নারী জাতিকে মলিন ও উন্নত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে হালিদা হামুমের নাম সর্বপ্রথম মনোনিবেশ করিবে। তিনি একাধারে শিক্ষক, লেখক, কেরানী, সাহিত্যিক—অত্যন্ত তাহার শক্তি তুরস্কের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাহার চরিত্র হইতে জীর্ণবদিক্রমের আনন্দের দেশের

লোকে অনেক কিছু শিখিতে পারিবে। তিনি যে স্বামী বিবেকানন্দ ও ফরাসী দার্শনিক ওগুস্ত কোঁৎ, এই উভয়ের অনুসারিণী, বৌদ্ধধর্মের করুণা ও মৈত্রীর প্রকাশনা করেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য ইত্তাভুল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, লেখক সে-ও, কল তথা স্বপ্নের ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। হালিদা হামুম ও রচয়িতার মত নারী যে-কোনও দেশের, যে-কোনও জাতির গৌরববহুল। এরূপ পুস্তকের প্রচার বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের তথ্যসংগ্রহ ও সন্নিবেশ মন্দ নহে, তবে স্ত্রীস্বাক্ষর-প্রমাদ কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে এবং তুরস্কের একটি মানচিত্র বিশেষ ভুলগোল-অনর্ভব পাঠকের উপকার হইত। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

রবীন্দ্র স্বপ্ন—মোহাম্মদ আবদুর রবীন্দ্র, বি-
দি গ্রেট ইন্টার লাইব্রেরী। ১৫ কলেজ স্টোর। দাম বাব আঁনা।

বাংলাটি ছোট গল্প। একটি তালিকা হইতে বোঝা গেল, দায় সবগুলিই মুসলমান-পরিচালিত বড় বড় সাহিত্যিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

গল্পগুলি অধিকাংশই খুব সাধারণগোষ্ঠের: মনে কোন একটা দায় বদায় না। দু-পাকো পড়িয়াই আনন্দগুলি গল্পের পরিণতি সম্পন্ন হইয়া ওঠে, তাহাতে আগ্রহ শিথিল হইয়া পড়ে। কোন কোন গল্পের মাঝে, শেষে মর্যাদার অবতারণা করার সাহিত্যিকের আরও গুরু হইয়াছে। ইহার উপর এক আখ জারগার গুরু সাম্প্রদায়িকতার স্বাভাবিক আভা লেখক এ সমস্তর উত্তেজনাশক্তি ছাড়ুন—ইহাই অনুবোধ। ইহাতে মুসলমানেরও শক্তিগুণি হয় না, হিন্দুরও গায়ে ফোঁকা পড়ে না। মাঝে পড়িয়া বইয়ের সার্বজনীনতাটুকু নষ্ট হয় মাত্র।

লেখকের কয়েকটি গল্পে লেখকের হাত সর্বাঙ্গ দিয়াই পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। “জই-যে আই-গাছের তলে” “তুফান”, “খালিফার স্থির নৃদ্ধি” আমাদের ভাল লাগিল।

জাপা, বাধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুধর্ম ও স্পৃহা—শ্রীগোপালকুমার সরকার কবিরাজ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরেকৃষ্ণ বিশ্বাস, ১৮৮ রূপানাম সেন কলিকাতা। মূল্য ১০ আঁনা। ১+১২৭ পৃঃ।

বর্তমান বর্ণ-হিন্দুর ধর্মের অসারতা দেখাইয়া লেখক বলিয়াছেন যে, একমাত্র প্রেম ও ভগবৎভক্তি বিচারের দ্বারা ই সর্বজাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে। প্রাচীনপন্থী হইয়াও তিনি যে উদারতা দেখাইয়াছেন তাহা সকলের জন্য আকর্ষণ করিবে।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

বিলে জঙ্গলে শিকার—কুমুদনাথ চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক এম. বানার্জি। মূল্য এক টাকা।

স্বর্গীয় কে.এন. চৌধুরীর পণ্ডিত নিষ্ঠাধোজন। বর্তমান গ্রন্থখানি তাহার Sports in Jheels & Jungles পুস্তকের স্থলর অনুবাদ।

ইহার ঘটনাবলী যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি শিক্ষাপ্রদ এবং ছবিগুলিও চমককার। গৃহকোণবাসী নিরীহ পাঠক বা অরণ্যপর্বতচরী তরুণ শিকারী, উজ্জরেরই ভাল লাগিবে।

জরীন্ কলম—প্রকাশক, মৌলবী সঈদুল্লাহ হুসাইন, বি-এ, ১২১, সারো লেন, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

একখানি ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য উপক্ৰান্ত। ইহাতে মুন্সীয়ারান পরিচয় না থাকিলেও কয়েক স্থানে সাম্প্রদায়িক রোব কিংবদন্তী প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু মহাজ্ঞানের কঠোর নির্ধাতন কেবল “শত শত মুসলমান পরিবারকেই” ভোগ করিতে হয় না, শত শত অভাবগ্রস্ত হিন্দুপরিবারও তাহার কবলে পতিত হইয়া সর্ব্বশাস্ত হইতেছে। “বাংলার মুসলমানকে ধ্বংসের দিকে” লইয়া যাইবার প্রধান ও একমাত্র কারণ তাহার। আর, মহাজ্ঞান-গণকে সাধারণতঃ নীচতা, জুহুতা প্রভৃতি ঘোষণা-মুদ্রা খেলা গেলোও তাহাদের প্রতীক গ্রন্থের “রায় মহালয়ের” অন্তঃপুরের যে চিত্রখানি অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা অতি জঘন্য। ইহাতে কবির “দরদী” অন্তরের পরিচয় পাওয়া গেল না।

লেখকের ভাবার উপর দখল আছে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলার সজী—শ্রীঅমরনাথ রায় প্রণীত। মূল্য ১৪০ টাকা, ২২ পৃঃ।

আমরা এই ৩২০ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক পাঠ করিয়া অত্যন্ত শ্রীতি ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। পুস্তকের ভূমিকায় রায়সাহেব যোবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই উদ্ধৃত অংশ হইতেই পুস্তকের উপকারিতা সম্যক পরিপূর্ণ হইবে। যোবেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন:—“বর্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে অত্যন্ত মণ্যবিত্ত গৃহস্থ যদি নিজ নিজ বাড়িতে নিজেদের এয়েজেন্সি অনুসারে ভারতরক্ষার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার। যে কেবল আইটামিনপূর্ণ টাটকা ভারতরক্ষার পাইবেন তাহা নহে। তাহাদের দৈনিক বাজার খরচেরও অনেকটা হ্রাস হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনোবী রায়-বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় প্রত্যেক ভাবে দেখাইয়াছেন যে, গ্রামের সকলে যদি আশপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এবং ডোবা, খানা প্রভৃতি ভরাট করিয়া ভারতরক্ষার আবাদ করেন, তাহা হইলে গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং গ্রামখানি শ্রী, সম্পদ ও স্বাস্থ্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। বিনা অভিজ্ঞতার কোন কাজই হুসম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ ভারতরক্ষার উৎসাহীদের জন্য অজস্র অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই বিষয়ে রায়বাহারিক অভিজ্ঞতাই প্রধান।”

গ্রন্থকার নিজে “প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত...খালি গায়ে, খালি গায়ে, হাঁটু পর্যন্ত বন্ধুর পরমা মাটি খোঁড়েন, গাছ লাগান ও বাগানের ক্ষুদ্রাঙ্ক যাক্তর কাজ করেন।” গ্রন্থে তাহার নিজ অভিজ্ঞতা-বদ্ধ জ্ঞান এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এ কারণ আশা করা যায় যে, প্রত্যেক ভক্তবীর এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন। এইরূপ পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

প্রেমের ফাঁদ—শ্রীপুলকবিহারী দত্ত প্রণীত। “শৈব ও শ্রবণকারের খেলা, নাট্যকারের উপক্ৰান্ত।” দাম পাঁচ টাকা।

কুমুদিকা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কবিতার বই। দু-একটি কবিতা মূল নয়। দাম তিন আনা।

বোবার বাঁশী—লেখকের নাম নাই। কবিতার বই। দাম বাসো আনা।

অর্পণ—শ্রীগিরীজানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত কবিতা পুস্তক।

মেহের দাবী—শ্রীনিধিরাজ হালদার প্রণীত একটি উপক্ৰান্ত।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভ্রান্তপথ—বাবীনচোড়া সাহিত্যিক শ্রীগুণদাস হালদার প্রণীত। বাবীন আর্ট বিউরো, কানপুর। পৃ. ২০২। মূল্য দুই টাকা।

আগাগোড়া ভাবা ও বানানের ভুল। কিন্তু জোড়জোড়ের ত্রুটি নাই। নীল কাপড়ের বকবক বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, লেখকের পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি এক প্রকাণ্ড সামান্যতঃ বিশেষণ;—আবার প্রকাশক মহাশয় শাসাইয়াছেন “বাবীনচোড়ার সমস্ত গ্রন্থ ছাপিবার জন্য এই ‘বাবীন আর্ট বিউরো’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।” কিন্তু গ্রন্থের নাম-নির্ব্বাচনে কিংবদন্তী ভরসা হইতেছে—ভ্রান্তপথ। ‘বাবীনচোড়ার’ এই সভ্যসাধনের জন্য হুসী হইলাম। প্রগতিশীল সমাজের যে পরিচয় দিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার মাথানুও কিছু নাই এবং এই সম্পর্কে রচিত যে জঘন্যতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বর্ণনা হয়, তাহা আলোচনা করিবার বস্তু নহে। ‘বক্তব্য’র মধ্যে লেখক বলিতেছেন, “আমি ভুল করেছি বলে আমার গালে একটা চড় মারলেই বন্ধুর কাজ করা হয় না।” বন্ধু হা তেবে কি করিবে?

দক্ষিণ-আফ্রিকা দৌতা-কাহিনী—শ্রীনেত্রপ্রসাদ সর্কাকারী, ২০ হরি লেন, কলিকাতা। পৃ. ১৭৫। দাম বাসো আনা।

অনেককাল হইতে ভারতীয়েরা দক্ষিণ-আফ্রিকার উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আশ্রয় পরিগ্রহের ফলে সে দেশকে বসতিযোগ্য করিয়াছে। এখন ইহাদের বাড়িয়া কলিবার দরকার। বোয়ার ও বেলচর্চের কবলে হতভাগ্যেরা যে নিরাশ্রয় লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকে, ব্যবস্থা-পরিষদ ও খবরের কাগজের কল্যাণে তাহার কতক কতক আমরা মাথো মাথো স্মরিত পাই। কিন্তু অনেক চেষ্টা ও আন্দোলন সত্ত্বেও কল বিশেষ কিছু হইতেছে না, গায়ের হস্ত-জল-করা জমা-জমি আনার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় অনেককেই দেশে ফিরিতে হইবে।

এই সম্পর্কের একটা ভেগুশেনে লেখক এক জন সম্ভব ছিলেন। সমালোচক বইটিতে তিনি তাহার আফ্রিকা-ভ্রমণ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির অজবিত্তর আলোচনা করিয়াছেন। ঐ নিগূহীত উপনিবেশিকদের সম্বন্ধে সাধারণের পরিচয় অত্যন্ত জ্ঞানভাঙ্গা রকমের। লেখকের এই সহজবোধ্য বইখানি এই বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা আনিয়া দিবে। প্রবন্ধমান জাতীয়তার দিনে এই এই অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে; প্রত্যেক দেশবাসীর ইহা পড়িয়া দেখা উচিত। ছবি, ছাপা প্রভৃতির তুলনায় দাম অল্পই হইয়াছে।

ছিন্ন পাঁপড়ী—শ্রীনথ্যোপাল দাস। গুণদাস চট্টোপাধ্যায় এও সম্পদ। ২০০১১। কণ্ডওয়ার্ডস ট্রিট, কলিকাতা। পৃ. ১০০। দাম দেড় টাকা।

গণের বই। মোট পাঁচটির মধ্যে তিনটির বিষয়বস্তু, বাঙালীর ছেলে ইউরোপে পড়িতে গিয়া বিদেশিনীর সঙ্গে রকমারী প্রেম করিতেছে। নৃত্যন আছে, সন্দেহ নাই এবং প্রথম গল্প ‘ব্যথার মালার’ কোন কোন

জায়গায় লেখক সভা) সভাই উচ্চ শির প্রতিভার পরিচয় বিদ্যমান। তবু সমগ্রভাবে কোন গরমই রসাতীর্ণ হইতে পারি নাই। বইটা পড়িলে এই কথাটাই সকলের আগে মনে আসে, লেখক তাঁহার ইউরোপীয় ঠসক, বৃন্দনী ও বিদ্যার বোঝা সহ্য। পরসারা কসিয়া বেড়াইতেছেন, রসাবেশে কোথাও এক দুহুতের জন্ত এতটুকু আত্মবিশ্রুত হইতে পারেন নাই। ঠিক এই কারণেই পাঠকের মনে একবিশু ছাপ পড়ে না। যেখানে-সেখানে অনাবশ্যক ইংরেজী শব্দের ব্যবহারে ভাবার সহজ রূপটি ফুটেতে পারে নাই, যদুচ্ছা দৃষ্টান্ত দিতেছি—“তু জনে নীট বল করলে—কিন্তু সমুখে স্পেশ বুই অর, তাই চেঞ্জের সময় তু জনের গারে গারে ঠোকটুকি হয়ে গেল—”। লক্ষ্য করিতে হইবে, একই বাক্যের মধ্যে আগে “বল” ব্যবহার হইয়াছে,—সম্ভবতঃ তাহাতে জ্ঞাপিত হয় নাই,—তবু পুনরু চেঞ্জ আসিয়াছে। আবার মাঝে মাঝে কথাবার্তার মধ্যে একেবারে ইংরেজী গেট। বাক্যই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে—কিলাতী নারিকার সঙ্গে কথাবার্তা সমস্তই ইংরেজীতে হইয়াছে নিকর। অতএব শত্রু-পাত্রীর মূখের কথাগুলো তর্জনা। সেই তর্জনার মধ্যে এক একটা ইংরেজী বাক্য রাখিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য আর কি থাকিতে পারে, একমাত্র গোয়েটার বাঙালী পাঠকের চমক লাগাইয়া দেওয়া ছাড়া? উপশান্তিও কোথাও কোথাও হাস্যকর। যথা—“আমি এখন মাটির ঢেলে তুমি কর্মকার, তুমি আমার যে ভাবে গড়াবে সেইভাবেই গড়ে উঠবে।” কিন্তু বাংলা দেশে কর্মকারেরা যে লোহা পিটায়, এখনও ভাঙি পড়িতে সক্ষম করে নাই।

কিন্তু এইরূপ অসুস্থ ক্রটি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিদ্যৎ-চমকের মত লেখকের অসাধারণ ক্ষমতার প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্তই এত কথা বলিবার আবশ্যক হইল। আশা করি, পরবর্তী লেখার পাঠকে তাক লাগাইয়া সমস্ত ক্রটিমাংস করিবার এই লোভ কাটাইয়া লেখক পূর্ণশক্তিতে ফুটিয়া উঠিতে পারিবেন।

জাগৃহী—প্রভাবতী দেবী সম্বতী। প্রবর্তক পার্লিশি হাউস; ৩১ বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা। পৃ. ২৪২।

লেখক্য রক্ত হৃদয়ে ও বলিবার একটি মনোময় ভঙ্গির সঙ্গে বইখানি উৎসাহের গিরিমা, পাড়ার ভূমি পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে পাত্র-পাত্রীর মূখের অবস্থা দীর্ঘ বক্তৃতাগুলি ছাড়াই পাঠকের বইটার আনন্দ

করিত এবং গরম আরও জমিয়া উঠিত। আখ্যানভাগের কতকংশে অসুস্থপা দেবার ‘মন্ত্রশক্তি’ সাধারণ ফুটিয়া উঠার সৈদিক দিয়া উৎকট অপোত্তনতা প্রকাশ পাইয়াছে। ছাপা বাণী ভাল।

শনির দর্শন—শ্রীমতীজ্ঞান্য বিদ্যাস। প্রকাশক—শ্রীমতীজ্ঞান্য বিদ্যাস, ৩৬১ হরি বোম স্ট্রিট, কলিকাতা।

নায়ক রাখালের শোচনীয় পরণাম দেখান হইয়াছে। কিন্তু এই ট্রাজেডি যেন পাঠকের অঙ্গ নিকাশন করিবার উদ্দেশ্যে জোর করিয়া আমদানী ঘটনার অবতারণা নাই। কাজেই অঙ্গ ত আসেই না, চরিত্রগুলিও কোন নির্দিষ্ট আকারে মনের মধ্যে ফুটেতে পারে না। তবু ইহার মধ্যে আমরা হৃদয় নীলিয়া, ও নেপাল-চরিত্রের আংশিক সাফল্যের জন্ত লেখককে অভিনন্দন জানাইতেছি। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার প্রথম রচনা; তাহা হইলে ইহার সম্বন্ধে ভবিষ্যতের আশা পোষণ করা যাইতে পারে।

হিন্দুদের পুনরুত্থান—শ্রীমতীলাল রায়। প্রবর্তক পার্লিশি হাউস, ৩১ বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা। পৃ. ১০২।

হিন্দুজাতি সকল ক্ষেত্রেই দিন দিন শিথ হইয়া যাচ্ছে, শক্তি ও বিশ্বাসের বিনা এবং শত্রু-বল অন্যায়ের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ পঙ্গু প্রাপ্ত হইতেছে, সাহিত্য-জীবন লাভ করিয়া বাঁচিবার তীব্র প্রচেষ্টা নাই। বস্তুতঃ তদাইয়া দেখিতে গেলে এ জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভয় হইবার কথা। শ্রীমতী রায় মহাশয় এই বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন এবং কাণ্ডকারী পক্ষ নির্দেশ করিবার তিনি যে একজন অধিকারী ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্য বইখানায় তিনি আশার বাণী শোনাইয়াছেন যে, বাঙালীর দ্বারা হিন্দু নবজাগরণ ঘটতেছে। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রোগের কারণ নির্ণয় করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রকৌশল ভাষায় প্রতিবিধানের পথও অনেকগুলি বলিয়া দিয়াছেন। সকল বিষয়ের মত না মিলিতে পারে, কিন্তু বইখানি এ বিষয়ে চিন্তার খোরাক আনিয়া দিবে এবং আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দিবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীমতীজ্ঞান্য বসু



দুই বন্ধু

ডক্টর শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

১

এক ছিল পরমাত্মস্নেহী মেয়ে, দেখতে ঠিক লক্ষ্মীর মত। তেমনি স্বরূপা, তেমনি স্থিরধোবনা, আর তেমনি বিষম-বদনা। এ তারই জীবনের করুণ অথচ স্বাভাবিক কাহিনী।

স্থান হচ্ছে ব্রাইস্ গাও-এর ব্রাইস্‌বুর্গ শহর। সেটা যেন দক্ষিণ-জার্মানীর “কালো বনের* পরী।” তার একধারে সবুজ গাছপাতা আর ছবির মত ছোট ছোট বাড়িতে ভরা অল্প-পাহাড় এবং অন্যধারে এক ছোট্ট নদী সূর্যের আলোয় ঝিক-মিক করে। এই মনোহর পাহাড় আর এই ছোট্ট নদীর মাঝে যে উপত্যকা সেই স্থানে জার্মানীর নিজস্ব স্থপতিকলার নিকরম রেখাটানা অনেকগুলি অনতিবৃহৎ বাড়ি, মনোরম বাগান, পরিষ্কার রুক্ষ রুক্ষ রাস্তা, মেরীর গীর্জা, স্থবিধাত বিধবিদ্যালয়, বাজার, দোকান, হোটেল, নাচঘর, রেস্তোরাঁ, কাকে ইত্যাদি নিয়ে এই ছোট্ট শহর তৈরি হয়েছে। জার্মান শহরের বিশেষত্ব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিমনিগুলো কারখানা বা অতিকায় অট্টালিকা এর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। পাহাড়ের ওপরে উঠলে সমস্ত “কালো বনের” নৈসর্গিক দৃশ্যের অতুলনীয় সৌন্দর্য প্রাণ মন ভরে দেয়। মনে হয় প্রকৃতি যেন এক আঁচলা জামকে পট করে তার উপরে তুলির ডগা দিয়ে যত রঙের সমাবেশ, যত গিলের নিপুণতা, যত রূপের অল্পভূতি সব ব'লে ব'লে ফুটিয়ে তুলেছে।

এমন কি এই অতুল সৌন্দর্যের ছাপ এই শহরের মেয়েদের ওপরও পড়েছে। মনে হয়, ওর গাছে গাছে যে-সব পাখী গান করে তার সুরের সঙ্গে এর স্বচ্ছন্দ-বিচরণ-শীলা তরুণীদের হাতখুঁচুরিত আলাপের সুর একই তানে বাঁধা, ওর তরু-লতা-ফল-ফুলে যে-সব রঙ কোটে এর তরুণীদের

পোষাক-পরিচ্ছদ ও চক্ গাওর রঙের সঙ্গে যেন তার কত মিল! এই সব হাতখুঁচুরিত স্নেহী মেয়ে স্নেহীশ্রেষ্ঠা ছিল এই সন্তের-আঠার বছরের লক্ষ্মীর মত দেখতে একটি মেয়ে—নাম তার লুইসে।

লুইসের মা ছিল ফুলওয়ালী। তিনি বিধবা। লুইসের বাপ ছিল হার্গবের্গের এক প্রকাণ্ড কারখানার মজুর। লুইসে জন্মাবার অল্প কাল পরেই তার হয়েছিল স্বভূ। শহর থেকে পাহাড়ে ভঁঠার যে রাস্তা, তারই গোড়ায় ছিল তার মার ফুলের দোকান। দোকানের সামনেটায় আগ-গোড়া কাঁচের দেওয়াল। এর এক অংশে ফুলের প্রদর্শনী। সেখানে সকল সময়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্রিসান্থেমাস্, কার্ণেশন্, মেরিগোল্ড, ভায়লেট ইত্যাদি বিবিধ ফুলের তোড়া বা বাসকেট মূল্যবান আধারে সাজানো থাকে। দেওয়ালের মধ্যখানে দোকানে ঢোকান দরজা, তারও সমস্ত পাল্লা কাঁচের। তার ভেতর দিয়ে এবং দরজার অপর পার্শ্বের দেওয়ালের ভেতর দিয়ে দোকানের স্ব-কিছু দেখা যায়। দোকানের ভেতরেও বড় বড় ফুলদানী বা চুবড়িতে ভরা চারদিকে নানা বর্ণের, নানা গন্ধের, নানা সজ্জার ফুল আর পাতা। এরই মাঝে ফুলবাগী হয়ে প্রোইই দাঁড়িয়ে থাকত ও ফুল বেচত এই সৌন্দর্যের রাণী লুইসে।

এ শহরে ফুলের আদর বড় বেশী, কারণ এখানে বাইরের লোক যে আসে তারই প্রাণে জাগে বসন্ত। আর এই ছোট্ট শহরে সবচেয়ে প্রিয় ফুলের দোকান ছিল এটি। বহু ব্যক্তি ওখানে ফুল কিনতে আসত—তার মধ্যে নিভা বৈকালে আসত দুটি তরুণ, তারা ব্রাইস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একটির নাম কাল, অপরটির নাম হান্স। দু-জনে পরম বন্ধু এবং একই “বুর্সেন কোরের” * সভ্য। তারা তার

* কালো বনঃ—দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীর স্থবিধাত অরণ্য, নাম Schwarzwald বা Black-forest। ইহা Badon-এর অন্তর্গত। এর সৌন্দর্য ও এর জলহাওয়াখ্যাতর জন্যে পৃথিবীর সকল স্থানের ধনীরা এখানে বাস্তুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আসেন।

* বুর্সেন কোর জার্মান-ছাত্র-সম্মিলন-বিশেষ। এগুলি মেসোলিমেনের সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে গঠিত। জার্মান জাতীয় জীবনে ইহাদের দান অতি মূল্যবান।

এতই গোড়া সভ্য যে কোরের সনাতন নিয়ম অচুসারে নানা রঙের টাইপওয়ালা টুপি আর ব্যাজ না প'রে কখনও রাস্তায় বার হ'ত না। দু-জনেই জার্মান ছাত্রের নিয়ম ঘাণিহিত পালন করেছে অর্থাৎ ডুএল লড়ে কয়েকটি তরোয়ারের খেঁচার দাগ গালে চিরস্থায়ী ক'রে নিয়েছে। দু-জনে একই অধ্যাপকের দেখানারে 'নাস্তানা'ল' ওকোনোমি অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন করে। দু-জনেই গোড়া হিটলার-ভক্ত। দু-জনেই কাল'মার্কস ও লাসালের নিছক নিমক। দু-জনেই রডবেল্টসের স্তাবক—আর দু-জনেই ছিল একান্তরূপ মুক্ত এই রূপসী লুইসের।

এ ছাড়া আর সব ব্যাপারেই ছিল তাদের চরম বৈষম্য। কাল' ছিল প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশীয়। তার পিতার ব্যারণ পদবী গণ-তন্ত্রের যুগে অর্থহীন হ'লেও তার জমিদারীর কীণ আয়টুকু এখনও তাঁকে আভিজাত্যের গৌরবে মণ্ডিত ক'রে রেখেছে অর্থাৎ তাঁকে খেটে খেতে হয় না। আর হান্সের পিতা হঠাৎ-ধনী—প্রকাণ্ড কারখানাওয়ালা। হ্যার্বের্গ ফ্রাঙ্কফুট ইত্যাদি বহু শহরে তার সসজ্জের কারখানা আছে—এ ছাড়া পেল্লিল, খেলনা, নকল রেশম ইত্যাদি বহু ত্রব্যের কারখানার তিনি মালিক। হ্যার্বের্গের এক গলিতে তিনি বাল্যকালে সসজ্জ বিক্রী করতেন এবং সেই অবস্থ। থেকে নিজ বুদ্ধি, পরিশ্রম ও ভাগ্যগুণে এখন কোটিপতি হয়েছেন।

কালের দেহ ছিপছিপে পাতলা; দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট আড়াই ইঞ্চি। প্রকাণ্ড লম্বা মুখ, প্রকাণ্ড উঁচু নাক, কেউ তাকে সুপুরুষ বলবে না। কিন্তু তার শাস্ত চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি পরম তৃপ্তিদায়ক, দেখলেই মনে হবে এ সেই বীর, সমাহিত-চিন্ত ব্যক্তি যে মনে করে “মননেন সহ যঃ জীবতি সঃ এব জীবতি।” আর হান্স-কে প্রাচীন গ্রীসের নিখুঁত প্রস্তরমূর্তি বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। জার্মানীর মতন দেশেও তার মত অত বলিষ্ঠ যুবক আর অত নিখুঁত পুরুষের রূপ অল্পই দেখা যায়। তার মুখের দীপ্ত আভা দেখলেই মনে হয় ওর মধ্যে কি প্রচণ্ড প্রাণশক্তি!

সামাজিক ব্যাপারে কাল' মনে করে ভ্রমজীবী আর আভিজাত্যের মধ্যে একটা সত্যিকারের মিলন আনা প্রয়োজন। কালের মুখে এই রকম মতব্য শুনে হান্স ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর করে, “রেখে দাও তোমার প্যানপেনানি!

এ কুস্তাগুলোকে নাই দিলেই ওরা চড়ে মাথাঘ—ওদের সব সময়ে শাসনে না রাখলে রকে আছে।” কাল' বলে, “তার পরিণামে যে জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হবে।” হান্স বলে “হ্যাঁ; জাতীয় সঙ্কট আনবে এ কুস্তার দল। কি করবে ওরা? ধর্ষণট? কাজ বন্ধ করলেই শৃঙ্খারগুলোকে সঙ্কীনের খোঁচা মেয়ে কাজ আদায় করবো না।”

প্রবৃত্তির ব্যাপারে হান্স ভালবাসে তীব্রতা ও উজ্জলতা, আর কাল' ভালবাসে স্নিগ্ধতা ও গভীরতা। নাচের আসরে গিয়ে হান্স খোঁজে যত চটকদার হুন্দরী আর আমেরিক জ্যাজ ব্যাণ্ডের উন্নত সুর। তার সঙ্গে সে মত্ত হয়ে নাচেতে ভালবাসে চাল'স্টন, ব্র্যাকবটম্ আর রাফা। কাল' ভালবাসে ইউরোপের নিজস্ব নাচ—‘ভালুতস্’ আর তার সঙ্গে ‘ট্রাউসে’র সুর। যদি ‘মোজার্ট’ বাজলো বা তার সঙ্গে ‘মিহয়েত’ বা ‘পোলকা’ নাচ হ'ল তাহলে তো সে মুগ্ধ। তার মূর্ছনার আনন্দে সে বিভোর হয়ে যায়। হান্স ভালবাসে ‘স্ট্রাম্পেন’ বা কড়া ‘লিকার’। কাল' ভালবাসে বহু পুরাতন ‘রাইন ওয়াইন’। কিন্তু তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি এত বিপরীত হলেও তাদের কোথায় কোন্ মিলনসূত্র ছিল কে জানে, তারা ছিল পরম বন্ধু, আর তারা ছিল এক বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে এই শহরের অস্থিতীয়া হুন্দরী আর কেউ নয়, শুধু এই লুইসে!

প্রতি অপরাহ্নের নির্দিষ্ট সময়ে দুই বন্ধুতে এই ফুলের দোকানের দোরগোড়ায় আসত—আর হান্স খুলত দরজা—শব্দ হ'ত টুং-ং-ং! লুইসেও ঠিক সেই সময়ে অগ্ন সব কাজ ফেলে দোকানে থাকত—কোন দিন তার তুল হ'ত না। শত শত ক্রেতার দরজা খোলার ‘টুং’ শব্দ থেকে এই শব্দটির পার্থক্য সে অল্পভব করত, তাই এই টুং-ং-ং কানে বাজলেই তার অত লালিত্যের উপরেও দুই গণ্ডে নতুন নতুন রঙের ঢেউ খেলে তাকে আরও হুন্দর ক'রে তুলত। ওরা প্রায়ই কিছু কিনত না, শুধু লুইসের সঙ্গে আলাপ করতেই আসত। লুইসেও তা ভাল রকম ব্যস্ত, কিন্তু তবু প্রতিদিন তাদের কাছে দোকানের প্রতি ফুলটি, প্রতি পাতাটির পরিচয় দিত। যতক্ষণ তারা সেখানে থাকত হান্সই লুইসের সঙ্গে কথা বলত। আর কাল' থাকতো চুপ করে, শুধু লুইসে যখন তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করত তখন তার মুখ ফুটত। না হ'লে সে শুধু দেখত এই অনিন্দ্যহুন্দরী লুইসে।

২

সেদিন ছিল রবিবার, মে মাসের প্রারম্ভ। বর্শেন কোরের বসন্তোৎসব অর্থাৎ নাচের দিন। শহরের উপকণ্ঠে “গ্রান থাল” গ্রামের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সৌখীন রেষ্টোরাঁর বৃহত্তম হলটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নাচের আসর করা হয়েছে। বর্শেন কোরের তরুণ সভারা সকলে তো এসেছেই, ঐ শহরের প্রবীণ নিবাসী, কোরের পুরাতন সভারাও এসেছেন, আর এসেছে ঐ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তরুণী কন্যা— ঐ উৎসবের উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হয়ে। এ ছাড়া যে-সব সভ্যের ভ্রমবংশীয়া বাজারী আছে তাদের নিয়ে তো তারা এসেছেই।

হান্স সেদিন লুইসেকে নিমন্ত্রণ করে সেখানে নিয়ে গেল। কাল অবশ্য সজে গেল। লুইসের আবির্ভাব সেখানে দস্তরমত চাকলা সৃষ্টি করলে। প্রথমতঃ সে অত রূপসী বলে, দ্বিতীয়তঃ সে ভ্রমবংশীর মেয়ে নয় বলে, তৃতীয়তঃ সে হান্সের সজে এসেছে বলে। হান্সের প্রচণ্ড খ্যাতি, সে নাকি নারী-রুদ্র জয় করতে অদ্বিতীয় এবং তার অস্ত্র বহু তরুণীর হৃদয় ভেঙেছে। কোরের নিয়ম, তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের সঙ্গে অবাধে নাচে। কোন তরুণ কোন তরুণীকে নাচতে অনুরোধ করলে সে যদি অস্ত্রের কাছে প্রতিশ্রুত না থাকে তো সে-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে সে বাধ্য। কিন্তু পূর্বে দু-একবার হান্সের বাজবীকে নাচে আহ্বান করে বিধম বিপত্তি ঘটেছিল, এমন কি সে ব্যাপার ডুএলে পথান্ত গড়িয়েছিল। হান্সের সঙ্গে ডুএল লড়ার অর্থ অবধারিত পরাজয় নিমন্ত্রণ করা। সুতরাং লুইসের মত হুম্মরীর সঙ্গে একবার নাচা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করলেও বহু তরুণ সে ইচ্ছা দমন করাই প্রেয়ঃ মনে করলে।

নাচ শুরু হ’ল। প্রথমেই বাজল উদ্দাম ‘জ্যাজ্’। বহু যুগলমুষ্টি তার তালে তালে নাচছে। ক্ষিপ্ৰ পদবিক্ষেপে তারা নাচছে ‘চালবট্‌ন’। হান্স ও লুইসেও নাচছে। সুর ও নাচের উল্লাসনায় তারা উৎফুল্ল। তাদের চোখে মুখে হয়েছে কি আনন্দের উজ্জ্বল। তাদের সৌন্দর্যের হয়েছে কি অপূর্ণ বিকাশ। এই যুগল-হুম্মরের আত্মহারা নাচ সকলের নজরে পড়ল। অনেকে নাচ থামিয়ে তাদের দেখলে, অনেকে তাদের সঙ্গে পাক্সা দিয়ে নাচল। শেষে সকলেই গেল খেমে।

বাজনা আরও উদ্দাম হয়ে চলল। তারা আরও উৎফুল্ল হয়ে নাচল। অনেকে- বিমুগ্ধ হয়ে তাদের ‘সোলো’ নাচ দেখলে। বাজনা যখন থেমে গেল, সকলের প্রচণ্ড করতালি-ধ্বনি সেই বৃহৎ নাচ-ঘর প্রতিধ্বনিত করলে। পুলকিত চিত্তে তারা এসে কালের পাশে বসল। হুম্মতোর মিষ্ট-শ্রম-স্নাত মধুর ক্লাস্তি লুইসের হৃদয় মুখে হুম্মরতর করে দিল।

কয়েকটা নাচের পর একটা নাচের মধ্যে হান্স জিজ্ঞাসা করলে, “কেমন লাগছে?” লুইসে প্রফুল্ল মনে বললে, “চমৎকার।”

হান্স—ভারি খুশী হ’লুম।

লুইসে—সত্যি আপনি বড় ভাল নাচেন।

হান্স—ভাল নাচি বলে আমার খ্যাতি আছে বটে।

লুইসে—আগে বুঝি খুবই নাচতেন?

হান্স—নিশ্চয়! বালিন, ম্যানশেন, লাইপ্‌সিগ-ইত্যাদি শহরের শ্রেষ্ঠতম হুম্মরীদের সঙ্গে বহুৎ নেচেছি।

লুইসে—বটে!

হান্স—নিশ্চয়! সে স্বাগণও আমার অনায়াসে জোটে। জানেনই তো আমার পিতা হচ্চেন বিখ্যাত ধনী, তাঁর অহুগ্রহের দ্বন্দ্ব বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লালায়িত।

লুইসে—ও!

হান্স—কিন্তু জানেন আপনার মত হুম্মরী কোথাও দেখিনি! আপনার সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনেই তো এই গৌণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছি।

লুইসে—এ সব বাজে কথা। বড় বড় শহরের সোসাইটি-মহিলাদের সঙ্গে কি আর আমার তুলনা হয়?

হান্স—সত্যি আপনার মত এত হুম্মর শরীরের গঠন, এত হুম্মর চোখ, মুখ, নাক—এত হুম্মর রঙ—এত হুম্মর হাত-পায়ের গড়ন—আর এত হুম্মর চুলের বাহার কোথাও দেখিনি।

লুইসে—ইস! মিথ্যা চাটুবাদ করবেন না।

হান্স—সত্যি বলছি! আপনার প্রয়োজন শুধু একটু আভিজাত্যের কলটুরের স্পর্শ, তাহলেই আপনি জার্মানীর শ্রেষ্ঠ হুম্মরী হবেন।

লুইসে—থামুন, থামুন।

বাজনা গেল খেমে। কিছুক্ষণ পরে আবার নাচ আরম্ভ

হ'ল—এবার হ'ল আধুনিক 'ব্লাকবটম'। এবারও নাচের মধ্যে হান্স কথা আরম্ভ করলে, বললে, "এ নাচটা খুবই নতুন, অনেকে জানে না। দেখুন না সকলে কি বিশ্লেষণ নাচছে।"

লুইসে—কিন্তু আপনি তো এও বেশ নাচেন দেখছি।

হান্স—তা আর হবে না? এর পেছনে কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম করেছি।

লুইসে—এটাও বুঝি বালিনে শিখেছেন?

হান্স—নিশ্চয়, বালিন থেকে মাত্র গত মাসে শিখে এসেছি।

লুইসে—ও!

হান্স—জানেন, এখানেও অনেক মহিলা এই নাচটি আমার সঙ্গে নাচবার জন্যে লালসিত?—সকলেই তো জানে—এ শহরে এ নাচের গুস্তাদ একমাত্র আমি।

লুইসে—সত্যি? তা'হলে তো ঐ সব মহিলাদের ইচ্ছা অপরূপ রাখা ঠিক হচ্ছে না।

হান্স—আমি ঠিক করেছি আজ শুধু আপনার সঙ্গেই নাচব।

লুইসে—বহু ধন্যবাদ! কিন্তু আমি এমন স্বার্থপর নই এবং এত লোকের অভিযোগ কুড়োতেও চাই না।

হান্স—ওহা! আমার পেছনে ছোটো ব'লে গুদের সঙ্গে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নাচতে হবে এমন কিছু খতপত্রে লেখা আছে?

হঠাৎ তাদের নাচ কেমন বেখাপ্পা হয়ে গেল—লুইসের পায়ের ওপর হান্স দিল পা মাড়িয়ে, লুইসে 'উঃ' ব'লে চীৎকার করে উঠলো—তাদের নাচ গেল খেমে। দু-জনে গিয়ে বসলে।

পরের নাচে হান্স জিজ্ঞাসা করলে, "পূর্বে কখনও হুপকবের সঙ্গে নেচেছেন?" লুইসে বললে, "না, এই প্রথম।" হান্স পরম আনন্দপ্রসাদ লাভ করলে। অন্তরে অন্তরে অতি সন্তুষ্ট হ'ল। লুইসের মুখভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরে স্নেহের কণী আভাসটুকু তার বোধগম্য হ'ল না। সে মুখে বললে, "তা কি হয়? আচ্ছা, আমার বন্ধুত্বকে কি মনে করেন—হুপকব?"

লুইসে—কিন্তু কি?

হান্স—হাঃ, হাঃ, আপনার স্নেহটুকু আমি বুঝেছি। কিন্তু কেনে দেখুন গুদ খতাবটি কেমন?

লুইসে—ভাল।

হান্স—বেচারি! অতি ভাল, অতি ভাল। অনেক সময়ে ভাবি, ভগবান ওকে মেয়ে করবেনই ঠিক করেছিলেন, কিন্তু হাত পা মুখ অত লম্বা হয়ে গেল দেখে পুরুষ করে দিলেন! হাঃ, হাঃ, হাঃ!

আবার নাচ বেখাপ্পা হয়ে গেল। লুইসে অকস্মাৎ নাচ থামিয়ে আপন আসনে গিয়ে বসলে। হান্স হ'ল বিম্বিত—এরকম তো কখনও হয় না!

পরের নাচ হ'ল 'ভালতস', বেঞ্চে উঠল, "রোস অফ ইন্ডাস্ট্রেল" সেই হুমধুর হুর। এবার লুইসেকে নিয়ে কাল' গেল আসরের নাচতে। যেতে যেতে লুইসে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি তো আধুনিক নাচ একটাও নাচলেন না?" কাল' বললে, "আমি ও-সব জানি না।"

লুইসে, "ও! আপনি বুঝি ও-সব ভালবাসেন না?"

কাল'—"ঠিক কথা! আমেরিকা হ'তে আমদানী ঐ আফ্রিকানদের নকল নাচে আমি কোন রস পাই না। [তাদের নাচ আরম্ভ হ'ল] কিন্তু এ নাচ কি মনোহর! [দুই তিন পাক ঘোরার পর] এ যে ইউরোপের আপন জিনিষ! [আরও দু-তিন পাক ঘুরে] কি মধুর!!

কাল' নাচতে নাচতে ভাবে বিভোর হ'ল—তার চোখ দুটি জাড়িয়ে এল! লুইসে হ'ল বিমোহিত—আবেগভরে বললে, "সত্যিকারের নৃত্যরসিক আপনিই!"

কাল' বলে—"আপনার সঙ্গে নেচে তা না-হয়ে উপায় আছে?" লুইসে তার উত্তর না দিয়ে বাজনার সঙ্গে হুর মিলিয়ে কিয়দ-কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

বিস্তৃত হু আইনে কাল্‌শে সোয়াগুবে

সোয়াগুবিন্‌ গেএত দান্‌ কোত'।*

কাল' বিমুগ্ধ হয়ে বলে, "কি হৃদয়! জা'খানীর সব সৌন্দর্য আপনার মধ্যে রূপ নিয়েছে!" লুইসে চুপ! সুরের কেমন একটা আমোল, হৃদয়ের কেমন একটা মোলা, নাচের কেমন একটা হিলোল তাকেও বিভোর করে দিয়েছে। আর দুই গাজেল-আখি বুকে এসেছে। কাল' ভাববিজড়িত কণ্ঠে

* "Bist Du eine Falsche Schwalbe Schwalbin geht dann fort!"

তুমি যদি অস্বামী পাখী হও, পক্ষী বাবে উড়ে।

আবার বল, “আমার জীবন ধন, যে তেতরে বাইরে এত
হৃদয়ের তাকে নিয়ে এই স্বপ্ন আর এই নাচের মধুরতা উপভোগ
করতে পেলুম।” এই স্বপ্ন, অত ভাবভরে নাচ, আর অত
কোমল প্রাণের অত মোলায়েম স্ততি! লুইসের অন্তরের
গভীরতম প্রদেশের কোন্ তন্ত্রীতে এক অভূতপূৰ্ব ব্যঙ্গার
হ’ল—লুইসের সারা অঙ্গে এল শিহরণ। তার কোকিল কণ্ঠে
আবার বেজে উঠল গান -

“দু বিস্তু মাইন, উন্ত ইশ্ বিন্ দাইন

উন্ত ভির সিন্ত সোয়াই গেসেলেন্।”*

কাল হ’ল আরও মুক্ত! তার মনে হ’ল এতো শুধু আসরের
গান নয়—এ যেন লুইসের জীবনসঙ্গীত! তারও এল সারা
অঙ্গে শিহরণ!! উভয়ের চোখ উভয়েতে নিবদ্ধ হ’ল—উভয়ে
উভয়ের অন্তঃকল পথান্ত দেখলে,—উভয়ে উভয়কে চিনলে!

এ ব্যাপারটা হান্সের নজর একেবারে এড়ায় নি। সে
মনে মনে অধীর হয়ে প্রতিজ্ঞা করলে, অবিলম্বে লুইসের সঙ্গে
কায়েমী ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। বাজনা শেষ হ’লে কাল ও
লুইসে আচ্ছন্নের মত এসে বসলে। উভয়ের চক্ষু যেন কোন্
রঙীন স্বপ্নের আবরণে অর্দ্ধনিমীলিত! সে স্বপ্নের জাল
বিচ্ছিন্ন করে হান্সের কর্ণশ কণ্ঠ তাদের কর্ণপটে আঘাত
করল, “আশ্চর্য্য! বিংশ শতাব্দীতেও লোকে এই সব নাচে!”
হৃৎজনের কেউ কোন উত্তর দিলে না। এমন কি কালও
এর প্রতিবাদ করলে না! হান্স আরও চকল হয়ে বললে,
“কাল! তোমাকে নিয়ে বাপু কোন ভঙ্গসমাজে যাওয়া চলে
না”—সেই মুহূর্তে আবার সেই ‘জ্যাজের’ উন্নত স্বর সকলকে
বিচলিত করে তুললে, হান্স লাফিয়ে উঠল। আশা
করলে প্রতিবারের মত লুইসে আনন্দে উতলা হয়ে নাচতে
উঠবে। কিন্তু লুইসে চুপ করে রইল—যেন এ উদ্‌গম স্বর
তার কানেই ঢোকে নি, যেন হান্সের লাফিয়ে ওঠা তার
নজরেই পড়ে নি। অগত্যা হান্স বসল, কিন্তু তার চিন্তা
আরও অস্থির হয়ে উঠল। লুইসকে সে বললে, “আপনার
কি হয়েছে?” লুইসে তবু নিরুত্তর! হান্স আরও অধীর হয়ে
ওয়েটারকে ডেকে এক তীর্থ পানীরের হুকুম দিল—দু-গ্রাস!

দু-গ্রাস কড়া লিকার এল হান্স তার একটা লুইসকে দিলে।
লুইসে অবীকৃত হ’ল তা পান করতে। হান্স সম্পূর্ণ বৈধা
হারিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, আপন প্রাচণ্ড অহঙ্কার চূর্ণ করে
এই প্রথম নিজে লুইসকে অহরোধ করলে তার সঙ্গে
নাচতে।

অতরাং লুইসকে যেতে হ’ল নাচের আসরে। নাচ আরম্ভ
ক’রে হান্স জিজ্ঞাসা করলে, “আপনারও ঐ সেকলে নাচ
ভাল লাগে?”

লুইসে—খুব ভাল লাগে!

হান্স—আশ্চর্য্য, আমি এতো হৃদয়ীরা সঙ্গে মিশেছি—
কত জোরপত্তি, জেনারেল, মন্ত্রী প্রভৃতির মধ্যে আমার
বান্ধবী—কিন্তু কাউকে বলতে শুনি নি ভালতস্ ভাল
লাগে।

লুইসে কোন উত্তর দিলে না! তাদের নাচ আবার
বেথাপা হ’তে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ হান্স কেমন
অদ্ভুত স্বরে দ্বিজ্ঞাসা করলে, “তিত্তির সেতে কখনও
গেছেন?—সেখানে গিয়ে কখনও হোটেল খেকেছেন?
জানেন, সেখানকার হোটেল ইউরোপের শুধু কোটিপতি এবং
রাজরাজদারদের থাকবার ক্ষমতা হয়—”

লুইসে শুধু বললে, “না!”

হান্স—তা জানি! সেখানে থাকতে গেলে দৈনিক
অন্ততঃ দুশো মার্ক হোটেল খরচই লাগে!

লুইসে—তাতে আমার কি?

হান্স—তোমার কি?—আমি তোমাকে কালই সেখানে
নিয়ে গিয়ে একমাস থাকব—” লুইসে তৎক্ষণাৎ নাচ থামিয়ে
নিমেষে হান্সের বাহবেষ্টনী হ’তে নিজকে মুক্ত করে বললে,
“আপনি অতি বর্ধর!” তারপরই ক্রতপদে আপন আসনে গিয়ে
বসলে। হান্স প্রথমে একটু বিস্মিত হ’ল। এও সম্ভব? সামান্য
মজুরের মধ্যে তার মত ধনবান রূপবান যুবকের ঐ রকম স্পষ্ট
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে? কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে মনে বললে,
“জ্যাকামি!” অবজার সহিত একই মুহূর্তে হেসে আপন আসনে
গিয়ে বসলে। সে রাত্রে আর তাদের নাচ হ’ল না।

লুইসে বললে, “আমার বড় শ্রদ্ধা ধরেছে! এখনি বাড়ি
যাব।” অগত্যা তাদের নাচের আসর থেকে বিদায় নিতে
হ’ল।

* “Du bist mein und ich bin Dein
Und wir sind zwei Gesellen!”

“তুমি আমার এবং আমি তোঁর—আর আমরা দু-জন দুগল বঁধু!”

৩

নাচের আসর থেকে বার হয়ে রাত্তর এসে কিছুক্ষণ ইটোর পরই তারা ট্রামে উঠল। ট্রাম প্রায় এক মাইল গিয়ে শহরে প্রবেশ করে। ট্রাম তখন একেবারে খালি, কারণ তখনও নাচ ভাঙেনি, ট্রামে আসা পর্যন্ত তাদের মধ্যে একটা কথাও হ'ল না। ট্রামে উঠে লুইসে জানালার ধারে এক আসনে বসলে, হান্স তার পাশে বসলে। লুইসে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে সামনের বেঞ্চে বসলে। হান্স একটু মুচকে হাসলে, ভাবলে, “ইস্! এ চণ্ডের অর্থ যেন বুঝি না!” কার্ল হ'ল পরম বিম্বিত—এ আবার কি? যাই হোক সে হান্সের পাশে বসলে। ট্রাম দিল ছেড়ে। ট্রাম চলতে লাগলো। অনেকক্ষণ সকলে চুপ করে রইল। অকস্মাৎ হান্স জিজ্ঞাসা করলে, “এতক্ষণ ঐ বাজনার পর, ট্রামের কন্সার্টটা কেমন লাগছে মিস লুইসের?” লুইসে কোন উত্তর দিলে না—বাইরের দিকে মুখ কেরালে। কার্ল বললে, “তোমাদের জ্যাজের হট্টগোল আর এই ট্রামের ঝড়ঝড়ানিতে পার্থক্যটা কোথায়?” হান্স হেসে উঠল।

কার্ল—বতই হাস, আমেরিকা থেকে আমদানী এই অসভ্য নাচ ইউরোপের যত ক্ষতি করেছে এমন আর কিছু করে নি।

হান্স—হাঃ, হাঃ, হাঃ—সত্যি নাকি?

লুইসেরও প্রথমটা মনে হয়েছিল, কার্ল হয়ত একটু বাড়িয়ে বলছে, কিন্তু হান্সের এই বিকট হাঃ, হাঃ, হাঃ তাকে এত বিরক্ত করলে যে মুহূর্তে তার কাছে যেন একটা সত্য প্রকাশিত হ'ল, সত্যিই ত এই-সব অ্যামেরিক নাচ কি বিক্রী!

কার্ল—হেসে উড়াবার চেষ্টা করলে আর কি হবে? আমার কথা সত্যি!

হান্স—যেহেতু তুমি এসব নাচ জান না—এর মর্থ বোঝ না—এর রস গ্রহণ করতে পারো না! কিন্তু লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, এমন কি তোমার মোজাট ট্রাউসের বেশ ভিয়েনাও যে এর স্রোতে ভেসে গেল। আসল কথা আর কিছুই নয়—আধুনিকতার সব-কিছু তোমার খারাপ লাগে, কারণ তোমার মন হয়েছে অতি বৃদ্ধ—তুমি থাক মধ্য-বৃদ্ধে।

কার্ল—আমি ইউরোপের বৈশিষ্ট্য ভালবাসি—

হান্স—তা জানি এ ব্যাপারে তুমি রক্ষণশীল, কিন্তু আসল ব্যাপারেই তুমি উদার—অর্থাৎ একেজো।

লুইসে—তার মানে?

কার্ল—থাক—থাক!

হান্স—তার মানে উনি মজুর বেটারদের মাথায় তুলে জাখানীর এত শিল্পের উন্নতি সমস্ত নষ্ট করতে—

কার্ল—কিন্তু হান্স—

হান্স—ইস্—অমনি রাগ! কোদালকে কোদাল বললেই যে রাগে সে একেজো নয় তো—

কার্ল—কিন্তু হান্স—মাতৃষকে অত ঘৃণা করা, বিশেষতঃ যে-সব মাতৃষের কাছে আমরা রুতজ—

হান্স—রুতজ! কিসের জন্তে রুতজ? ঐ রুতজদের আমরা খেতে দিই ব'লে আমাদেরই ওদের কাছে রুতজ থাকতে হবে?—না—

কার্ল—কিন্তু হান্স—

হান্স—ওদের আমাদের কাছে রুতজ থাকা উচিত—কিন্তু ওদের রুতজতা ব'লে কোন জিনিষ আছে? ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর—দেখবে তোমার ভাল-মানুষির সুবিধা নিয়ে তোমারই সর্বনাশ করবে। চাবুক লাগাও দেখবে ফুজুরটির মত তোমার সব কাজ করছে! কি বলেন মিস লুইসে? [লুইসের মুখ বিবর্ণ, কার্লের মুখ লাল হয়ে উঠেছে] হাঃ, হাঃ, হাঃ—সত্যি, সাধু, রুতজতা—ওদের মধ্যে যেন এসবের অস্থি আছে! ওদের কোন মেয়ে যদি সত্যিগিরি ফলায় তো জানবে, সে শুধু দর বাড়াবার ফন্দি—

কার্ল [চীৎকার করে উঠলো]—হান্স থাম!

হান্স—হাঃ, হাঃ, হাঃ! তোমার নারীহুলভ নরম মনে এই সত্যি কথার খোঁচা বুঝি বেজায় আঘাত দিল? কিন্তু আমি তোমাকে এখনি প্রমাণ করে দেব—চাকুর প্রমাণ করে দেব এ কথা কত সত্যি! [লুইসের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে] কি মিস লুইসে আপনারও একথাও সন্দেহ হয়?

এমন সময়ে ট্রাম কণ্ডাক্টর গভীর কণ্ঠে বললে, “আবটাইগেন্” [নেমে যাও]! ট্রাম তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছেতে। ট্রাম থেকে নামতে নামতে কার্লের মনে হ'ল—আজ ঐ কনডাক্টরের গুরুগম্ভীর নাদ “আবটাইগেন্” তাদের যেন একটা আসর বিপদ থেকে উদ্ধার করলে।

তিন জন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চুপ করে হাঁটতে লাগল। তিন জনের প্রাণেই আলোড়ন—কি প্রবল আলোড়ন! অল্প দূরেই লুইসের বাসা। তার বাসার দোর-গোড়ায় এসে লুইসে চাবি বার করে দরজায় লাগিয়েছে—এমন সময়ে হান্স তার অতি নিকটে এসে হুকুম দিলে, ‘লুইসে, দাঁড়াও! তোমাকে একটা কথা শুনতে হবে!’ লুইসের প্রাণে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক জাগল! দরজা খুলতে গিয়ে তার হাত কেঁপে উঠল—তার সমস্ত শরীরে একটা ক্রৌণ কম্পন এল—শুককণ্ঠে সে না বলে থাকতে পারলে না, “কি কথা?” হান্স তার মুখের কাছে মুখ এনে বললে, “দেখ, তোমার এ গ্রাম্যামির অর্থ আমি বুঝি—”

যেন এক বিদ্রোহ-ফুলিঙ্গের আঘাত লুইসেকে নিমেষে শূন্যতন করে দিলে—তৎক্ষণাৎ তার কণিকের ভীতি দূর হ’ল—সে দীপ্ত হয়ে বললে, “আমাকে বুঝি অপমান করতে চান?” পর মুহূর্তেই চাবিতে এক মোচড় দিয়ে দরজা খুলে এবং দরজাকে মাত্র একটু ফাঁক করেছে, হান্স তার হাত চেপে ধরে বললে, “থামো! স্পষ্ট বল কি চাও?” লুইসে বললে, “হাত ছেড়ে দিন!” হান্স বললে, “সোজা বল, কি চাও? ভাল বাড়ি? মোটর গাড়ী? মাসহারা? কত মাসহারা—কত?—এক হাজার?—পাঁচ হাজার? দশ হাজার?—কত? কত?”—বলতে বলতে লুইসের কুহুমকোমল বাহুগুল দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে লুইসেকে বুকের কাছে টেনে আনলে। লুইসে চীৎকার করে উঠল, “ছেড়ে দাও” এবং শরীরের সকল শক্তি দিয়ে তার কবল থেকে নিজকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলো—কিন্তু বুঝা! হান্সের অধর তার গণ্ড স্পর্শ করলে—এমন সময়ে হান্স অস্বভাব করলে তার দুই স্বন্ধে লম্বা লম্বা আঙ্গুলের এক অদ্ভুত চাপ—তার ‘বদন যন্ত্রণা হ’ল—তার দুই চক্ষু যেন অন্ধ হয়ে এল—তার দুই হাত অবশ হয়ে এল। লুইসে তার শিথিল মুষ্টি হাতে নিজকে নিমেষে মুক্ত করে দরজা খুলে কেললে এবং বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে আরম্ভ করলে! ঠিক সেই মুহূর্তে কাঁধের সে চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হান্স বেগে গিয়ে দরজার ওপর পড়ল এবং চীৎকার করে উঠল, “থামো!” কিন্তু লুইসে তখন এত প্রচণ্ড বেগে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সেটা বন্ধ করে দিলে যে, ঐ অতি গুরু দরজার আঘাত সোজা

হান্সের মাথায় লাগল—মাথাখাটার সেই ভীতিগ্রস্ত শব্দ হ’ল “খাড্” এবং পরমুহূর্তে হান্সের মত বলিষ্ঠ পুরুষ দু’রে ছিটকে পড়ে কাতর আর্ন্তনাদ করে উঠলো, ‘ও’!

৪

পরের দিন শহরের ছাত্রসমাজে এই সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে প্রচারিত হ’ল। বেচারী হান্সকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তার সমস্ত মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়েছে। হান্সের প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য শত্রুর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না—তারা এই ব্যাপার নিয়ে একটা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করলে। বেচারী হান্সের নারী-স্বদয়-জয়শক্তির প্রচণ্ড খ্যাতি বিনষ্ট হ’ল।

সঙ্গে সঙ্গে এ-সংবাদও শুধু ছাত্রমহলে নয় সমস্ত শহরে প্রচারিত হ’ল যে এক ব্যারনের ছেলে সামান্য এক মজুরের মেয়েকে বিয়ে করছে। সমস্ত শহরে এ-সংবাদ দস্তুরমত চাকল্য সৃষ্টি করলে। অনেকেই দুর্ভাবনা হ’ল লর্ড-ব্যারনের ছেলেরাও যদি এই কাজ করে, সমাজের কি পরিণাম হবে? ছোট ছোট কাফেতে বাড়ির গিন্নীরা বৈকাল চারটার শকোলাডে* ও কুথেন† খেতে সমবেত হয়ে এই আলোচনা করেন; সন্ধ্যায় ‘ডিনার’ টেবিলে সমবেত হয়ে সকল পরিবারে এরই বিচার চলে; বাজার করতে বার হয়ে প্রতি মাংসের দোকানে, প্রতি সসেজের দোকানে, প্রতি তরিতরকারির দোকানে গিন্নীরা এই ব্যাপার নিয়ে গুরুবিতর্ক করেন;—এমন কি রাজ্যে বিয়ার-হলে সমবেত হয়ে বৃদ্ধেরা লিটারের পর লিটার বিয়ার গুড়ান, তাঁদের বৈকানো পাইপ টানেন আর রাজ্য বারটা-একটা পথ্য উত্তেজিত হয়ে এই প্রসঙ্গ চালান। তরুণদের মধ্যে একদল এই সংবাদ পেয়ে মহা উত্তেজিত হ’ল, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের A. St. A. র‡ যে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দল তারা কালকে সম্বন্ধনা করবার আয়োজন করলে। কিন্তু কালের আপন ‘কোরে’ মহা গুণগোল বাধলো, একদল হিঁস করলে কালকে ‘কোর’ থেকে তাড়াতে, অল্প দলের মত হ’ল কাল ঠিক করেছে।

* শকোলাডে—কোকোজাতীয় পানীয়।

† কুথেন—কেক।

‡ A. St. A.—Allgemeiner Studenten Ausschuss—সাধারণ ছাত্রসমাজ।

কিন্তু যাদের জন্তে এই আন্দোলন, এই কোলাহল, তারা এর কোন সংবাদই রাখে না। পাহাড়ের কোন স্থানর কন্দারে, ক্ষুদ্র শ্রোতস্থানীর কূলে কোন নিভৃত কুঞ্জে, বনান্তের কোন শ্রামল ক্ষেত্রে উভয়ে উভয়েতে নিমগ্ন থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায় আর মনে করে মাত্র এক নিমেষ অতীত হ'ল। এমন কি সৌন্দর্যের ললাম, ঐ কালো বনের যত কোকিলের গান, যত পাখীর কলরব, যত ভেসে-আসা নৈসর্গিক গুঞ্জর, যত পুষ্পের সুবাস তাদের প্রেম-সম্বোধিত চিত্তে কোন বিক্ষেপ আনতে পারে না, হয়ত তাদের অন্তরের অজ্ঞাত ক্ষেত্রে শিহরণ সৃষ্টি করে তাদের প্রেমকে আরও মধুর করে দেয়!

কিন্তু যথাসময়ে এ সংবাদ পৌছল কালের পিতার কাছে। তিনি ছুটে এলেন ফ্রাইবুর্গে জানতে এ-খবর সত্য কি না। কাল তাঁর একমাত্র সন্তান। তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তুচ্ছ রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে তাদের শত শত বৎসরের আভিজাত্য ঘেন সে নষ্ট না করে। তা করলে তার উদ্ধতন সকল পুরুষের অভিশাপ তার মস্তকে পড়বে—সে কখনও সুখী হবে না এই রকম অনেক কিছুই তাকে বোঝান হ'ল, কিন্তু সবই হ'ল বুধা। এমন কি তিনি লুইসেকে দশ সহস্র মুদ্রার লোভ দেখিয়ে এ থেকে নিবৃত্ত হ'তে অতুরোধ করলেন—তার ফলে হ'লেন অপমানিত, কিন্তু কাল রইল অটল! শেষে তাকে ত্যজ্যপুত্র করার ভয় দেখান হ'ল—কাল রইল তবু অটল! কালের একমাত্র যুক্তি আভিজাত্য ও প্রমজীবীর মধ্যে যদি মিলন না হয়, তা হ'লে জাতি যাবে উৎসর—তাকে এ-বিবাহ করতেই হবে!

কালের পিতা শেষে ব্রহ্মান্ন নিক্ষেপ করলেন—তাঁর সমস্ত প্রতিপত্তির প্রভাবে গভর্নমেন্ট কর্তৃক তাদের বিবাহের অনুমতি দান বন্ধ করলেন। গভর্নমেন্টের অজ্ঞাহাত, যেহেতু কাল পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত, সে নিজে উপার্জনক্ষম না হ'লে, বিবাহ করার অনুমতি পেতে পারে না। অগত্যা তাদের বিবাহ গেল অনিশ্চিত কালের জন্তে পেছিয়ে। এমন কি টেট থেকে কালের পড়ার খরচও গেল বন্ধ হয়ে।

পুস্তকের কাঁট ব'লে যে কালের খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল সে হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কশূন্য—অতএব পুস্তকহীন।

সে এখন প্রবল উদ্যমে চাকরির সন্ধান করে—উদ্ভট লুইসেকে বিবাহ করার উপযোগিতা অর্জন করা! শেষে জার্মানীর উত্তর-পূর্ব প্রান্তের শহর ক্যোনিগবের্গে তার একটা কাজ জুটল। ঠিক হ'ল উভয়ে সেখানে যাবে—লুইসে যাবে পালিয়ে। পালানরই প্রয়োজন, কারণ যেদিন সংবাদ এল কাল পিতার ত্যজ্যপুত্র হয়েছে, সেই দিন থেকে লুইসের মা তাকে বিশেষ করে বারণ করেছেন কালের সঙ্গে মিশতে। এমন কি লুইসের ওপর কড়া পাহারা বসেছে, এমন কি লুইসের অন্তস্থানে যাতে তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়ে যায় সে-চেষ্টা তিনি উঠে-পড়ে করছেন। এ-সব বিষয়ে তিনি অত্যন্ত 'প্র্যাকটিকাল'! আর অত 'প্র্যাকটিকাল' বলেই কপর্দকশূন্য অবস্থায় শিশু-কন্তাকে নিয়ে বিধবা হবার পর তিনি আপন চেষ্টায় অত ভাল ফুলের দোকান গড়ে তুলেছেন এবং মেয়েকে ভদ্রোচিত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন!

কিন্তু তরুণ-তরুণীর প্রথম প্রেমের বন্ধা এ বাধা বলীল—ক্রমে অতিক্রম করে। প্রতিদিন অন্ততঃ কয়েক মিনিটের জন্ত তাদের লুকিয়ে দেখা হয়ই—তবে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে একত্রে কাটানো আর ঘণ্টে গুণে না। কাজ পাওয়ার সংবাদ এলে তারা ঠিক করল—আগামী রবিবার সকালে যখন লুইসের নিষ্ঠাবতী মাতা মেরী-গীর্জায় উপাসনা করতে যাবেন—লুইসে আসবে পালিয়ে! এবং উভয়ে তৎক্ষণাত্ ট্রেনে উঠে জার্মানীর অপর প্রান্তে রওনা হবে। তারপর ছুনিয়ার যা হয় হোক—তাদের বয়ে গেল।

নির্দিষ্ট দিন প্রত্যুষে কাল জিনিষপত্র গোছাচ্ছে। গৃহ-কর্ত্ত্রীকে পাঠিয়ে দিল বাজারে তার জন্তে রাস্তার রসদ কিনতে। এমন সময়ে বাহিরের দরজায় আওয়াজ বেজে উঠল—'ক্রি-ডিং'! কাল গিয়ে দরজা খুলতেই দেখে সামনে হান্স। কেন অভিযান না করে, কোন কথা না ব'লে, সোজা তার ঘরের মধ্যে ঢুকে টুপিটা খুলে সোকার ওপর ছুড়ে ফেলে চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে প্রস্থানের তোড়জোড় দেখে বিস্মিত হয়ে হান্স জিজ্ঞাসা করলে, “কোথায় যাওয়া হবে?”

কাল—সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন?

হান্স—কোন প্রয়োজন নেই! তোমার মত কুলাকার

রসাতলে গেলে সমাজের মল্লল বই অমল্লল হবে না ! শুধু জানতে চাই এ কি লুইসেকে সঙ্গে নিয়ে পালাবার বড়যন্ত্র ?

কাল—সে সংবাদেই বা তোমার প্রয়োজন ?

হান্স—তোমার মত লোকের কাছে আমার প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কৈফিয়ত দিতে চাই নে—আমাকে ঠিক করে বল লুইসেও সঙ্গে যাবে কি-না ?

কাল—কোন অধিকারে এ সংবাদ চাও ?

হান্স—শ্রেষ্ঠতম অধিকারে। কাল বৈকালে লুইসেদের সম্মতি পেয়ে আমি হয়েছি লুইসের ভাবী স্বামী !!

কাল—[চমকিত] ললে ?

হান্স—এতে অত চমকাবার কি আছে ? সকলেই কি আশা করে নি লুইসের সঙ্গে আমার সম্পর্কের এই হবে স্বাভাবিক পরিণতি ? তুমিও কি তা জানতে না ? জেনে-ওনে হীন বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি কি একটা বিশ্রী গুণগোল বাধাও নি ?—কিন্তু শোন ! এখানে এসেছি শুধু তোমাকে সাবধান করে দিতে, আবার যেন আমাদের জীবনে উৎপাত সৃষ্টি করে না।

কাল—যেন বজ্রাহত হ'ল ! কিছুকণ তার আর বাক্য-ক্ষরণ হ'ল না। হান্সের মুখে দেখা দিল ক্ষুদ্রচেতা বিজয়ীর সেই অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি, যা পরাজিতকে পরাজয়ের চেয়েও অধিক ব্যথা দেয়। সে-হাসি দেখা মাত্র কালের চমক ভাঙল, সে জিজ্ঞাসা করলে, “লুইসে নিজে রাজী ?”

হান্স—হাঃ, হাঃ, হাঃ ! নিশ্চয় ! আর—

কাল—[চীৎকার পূর্বক] অসম্ভব !

হান্স—অসম্ভব ?—অসম্ভব কেন শুনি ?

কাল—তুমি বললে কাল বৈকালে তাদের সম্মতি পেয়েছে—অথচ কাল রাত্রে লুইসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, সে ত এর বিন্দুবিগর্গ জানেই না, বরং—

হান্স [বাধা দিয়ে]—হোঃ, এই কথা ? লুইসের মা আমাকে বলেছেন, লুইসের মত আছে, তাই যথেষ্ট ! লুইসে যে নিজে সম্মত হবে তা নিঃসন্দেহ—

কাল—অসম্ভব—অসম্ভব !

হান্স—হেঁ হেঁ—অসম্ভব ! তোমার মত গর্দভই ভাবে ছোটলোকের ঐশ্বর্যের পক্ষে কোন কাজ অসম্ভব—

কাল—সাবধান হয়ে কথা বল !

হান্স—আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, চলে বাচ্চ—ভালই হচ্ছে—আপন দূর হ'চ্চ—কিন্তু আমার আর লুইসের জীবনে আর কখনও উঁকি দিও না।

কাল—সে বারণ আমি করছি ! লুইসে কখনও তোমাকে চায় না—

হান্স—তোমার মত কীটের সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। কিন্তু আবার সতর্ক করে দিচ্ছি, আমার অবর্তমানে আমার প্রণয়মুদ্রার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে যথেষ্ট অনর্থ ব্যয়িয়েছ ভাল চাও তো আর এর মধ্যে এস না।

কাল—কোনো দিন সে তোমার প্রণয়মুদ্রা হয় নি। কাল রাত্রেও আমার প্রতি তার গভীর প্রণয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখিনি ! সে আমাকে ভালবাসে—প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—

হান্স—বটে, বটে ! হাসির কথা বটে ! সে আমার প্রণয়মুদ্রা হয়নি, হয়েছে তোমার ? আমি একবার যে-নারীকে পছন্দ করেছি, সে ভালবাসবে অল্প পুরুষকে—তাও আবার তোমার মত লম্বা লম্বা ঠাণ্ডসর্কধ, কদাকার, কপর্দকশূন্য অপদার্থকে ?—হাঃ, হাঃ, হাঃ !—শোন, ইভিগট শোন ! তোমাকে সে শুধু বাদর না চমকে ! ভালবাসার ভাণ করে তোমার মত বুদ্ধিহীন ব্যারণ-পুত্রের কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আদায় করে সে শুধু আমার কাছে নিজের দর বাড়িয়েছে। তুমি না বাধা দিলে, সেই বল-ডানসের রাত্রেই সে আমার অংশায়িনী হ'ত --

কাল—থামো !—তাকে বিবাহ করতে চাও এই প্রত্যাশা নিয়ে ?—

হান্স—প্রত্যাশা ?—হাঃ, হাঃ, হাঃ !—কুলির মেয়েকে আবার প্রত্যাশা ! তোমার বোকামির ভয়ে তার মার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করতে হয়েছে—অকারণ কতকগুলো অর্থব্যয় করতে হচ্ছে—এই যেন যথেষ্ট নয় ! তাকে আবার প্রত্যাশা করতে হবে ?

কাল—তাহ'লে তোমার অভিপ্রায় তাকে বিবাহ করা নয়—তার সর্কনাশ করা—

হান্স—তাই যদি হয়, তাতেই বা কার ক্ষতি ? কৌশল করে একটা ছোটলোকের মেয়ের স্ত্রাকামি যদি ভাঙতে পারি, তাতে লাভ বই লোকসানটা কার ? শোন, বোকা,

শোন! আমাদের জয়গত অপিকার আছে এই-সব ছোট-লোকের মেয়েদের যে উপায়ে হোক উপভোগ কর।—

কাল হান্সের গওদেশে সজোরে চপেটাঘাত করলে। হান্স প্রথমটা গুস্তিত হ'ল, কিন্তু পর মুহূর্তেই তার বজ্র-মুষ্টি কালের মুখে পড়লো! কাল দূরে ছিটকে পড়ল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে, ছুটে এসে হান্সকে উপর্যুপরি ঘৃষি মারতে আরম্ভ করলে। হান্স তাকে জাপটে ধরলে, তারপরই আরম্ভ হ'ল ধ্বস্তাধ্বস্তি। ঘরের যত আসবাব, যত কাঁচের

জিনিষ, ড্রেনি-টেবিলের আয়না, চেয়ারের পায়, আলুমারি কবাট, জানলার সাদৃষি, খাটের ব্যাটন, সোফার কাঁধ, বইয়ের আলুমারি ইত্যাদি সব ভাঙতে আরম্ভ হ'ল। দু-জনে উন্মত্তের মত কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করবার পর কালকে হান্স মেঝের উপর চিৎ করে ক্লেসে দুই হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরলে এবং শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে টিপতে আরম্ভ করলে! এক চাপ—দুই চাপ—তিন চাপ—কালের প্রাণ-বায়ু নির্গত হ'ল!!

জাগ্রত রাখিও মোরে

শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়

জানিতে চাহি না আমি—কত হুগ ধরি
কত ক্লেশে, কি অপার তিমির সঙ্ঘরি
এসেছি এ ধরণীর স্নেহ-স্বপ্ন কোড়ে।
জানিতে চাহি না আজ—কোথা পুন মোরে
যেতে হবে আয়ুশেষে।

আমি শুধু বাচি
হে ঈশ্বর, জাগ্রত রাখিও মোরে। বাঁচি
যেন বাঁচিবার মত চির-অহঙ্কণ।
বিমুগ্ধ না হুগ কত উদাসীন মন
আকর্ষ করিতে পান উদ্বেলিত কূলে
কূলে জীবন-জাহ্নবী-বারি। কোনো কূলে
কত যেন, হে ঈশ্বর, তুলিয়া না যাই
রয়েছি বাঁচিয়া।—

রয়েছি বাঁচিয়া তাই—
বকে আজি জাগে যোর উপধি-উজ্জ্বল;
রয়েছি বাঁচিয়া তাই ধরণী, আকাশ,
আবরণে মোর প্রাণ-বর্ণ-গরিমায়।
তরু-ভূগে, শস্ত-দীর্ঘে মূলি-বৃন্তিকায়,
ব্রততী-বিতানে, পুষ্পে—সর্বটাই 'পরে
বৃষ্টি-সম লক্ষণারে নিরত যে করে
মোর স্নেহ-ভালবাসা। নিখিল গগনে
আমারই মমতা বৃষি পবনে পবনে
স্বমেদুর মেঘ-রূপে হেরি লক্ষ্যবিন্দে
দিকে দিকে নব নব দেশেরে ঝেঁপেছে!

বাঁচিয়া রয়েছি তাই—জল-ধারা প্রায়
অনায়াসে অধোলোকে চিত্ত মোর ধায়
স্তরে স্তরে ভেদিয়া পৃথিবী। স্বর্গবাসী
দেবতার মত চিত্ত সর্ববাসা নাশি
ভ্রমিয়া বেড়ায় স্নেহে জ্যোতিষ্ক-সভায়।
তাই বাচি, হে ঈশ্বর, দিবস নিশায়
এমনি জাগ্রত যেন রহি অহঙ্কণ
এমনি বাঁচিয়া যেন থাকি আমরণ
পূর্ণ প্রাণ লয়ে। দিও হুগ, দিও ব্যথা
অযুত আঘাত হেনো—কহিব না কথা,
করিব না অভিযোগ—শুধু, দেখো হায়
হাসি-অশ্রু-উৎস যোর কত না শুকায়ে!
শুধু দেখো, হে ঈশ্বর, এমনি জাগ্রত
যেন রহি চিরকাল। এমনি নিরত
পরম উল্লাসে চলে জীবন-ভ্রমণ।
তারপর, অকস্মাৎ যে-দিন মরণ
চাঁপিয়া ধরিয় কর অতিদ্রুত করে
আকস্মিকে রক্ত হীন তিমির-জঠরে—
সে-দিনও তোমার পানে আর্জি রাখি মেলি
শুধাব না, হে বিধাতা, দীর্ঘবাস কেলি
এ আকাশ, এ পৃথিবী—চন্দ্র, গ্রহ, তারা,
সাগর, ভূধর, বন—কেহ গো ইহারা
থাকি চলেবে কি-না মোরে অহুসরি
সে-আধার পথে। শুধু এ-মিনতি করি
এমনি জাগ্রত মোরে রেখো অহঙ্কণ
এমনি বাঁচিয়া যেন রহি আমরণ।

অ-সহযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরাতন চিঠি

‘রবীন্দ্রনাথ আমাকে গত ৬ই বৈশাখ এই চিঠিখানি লেখেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।’]

৬

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাঙ্গদেবু

১৯১৬ থেকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকা ও যুরোপে বক্তৃতায় নিযুক্ত ছিলুম। সেট সময় সংবাদপত্রযোগে খবর পাওয়া যেত,—মহাত্মাজী অসহযোগ প্রচার করছেন, একথা স্বীকার করব, আমার সেটা ভালো লাগে নি। তার কারণ, যেমন খিলাফতের লক্ষ্য ভারতবর্ষের বাইরে, অসহযোগের লক্ষ্য প্রায় তাই। ইংরেজরাজের সঙ্গে কোমর বেঁধে সহযোগই চালাই বা অসহযোগই জাগাই, তাতে আমাদের সাধনা কেন্দ্রভ্রষ্ট হয়। ওটা কলহ মাত্র, সেই কলহের পরিণামে সার্থকতা নেই। মহাত্মাজী দেশের লোকের মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, অত বড়ো প্রভাব অপর পক্ষকে তার স্বরে অস্বীকার করবার নওর্থক উদ্দেশ্যে বরচ হয়ে যাচ্ছে, এই কথা কল্পনা করে আমার মন পীড়িত হয়েছিল। সোদিন আমার মনে এই একান্ত কামনা জাগছিল যে মহাত্মাজী নিজের চারদিকে দেশের বিচিত্র শক্তিকে আহ্বান করবেন দেশের বিচিত্র সেবার কাজে। কারণ, দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য পূর্তকার্য বাণিজ্য—এই কঠবাণুলিকে প্রবল বলে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে চালনা করাই স্বার্থ দেশকে লাভ করা, জয় করা। সকলে মিলে কেবল চরকাই হতো কাটায় দেশচিন্তার সম্পূর্ণ উদ্বোধন হ’তে পারেই না। জানি এই সম্বন্ধে বাধার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল—তখন সেই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করা সার্থক হ’ত। এতদিন ধরে সংগ্রাম ত যথেষ্টই হ’ল, দুঃখের তো অভাব নেই। তার পরিবর্তে আজ রক্তহীন সাধা কাগজ পাওয়া গেল। সেই কাগজে শূন্যতা যথেষ্ট কিন্তু রচনা কতটুকু?

সেই সময়ে আমি জগদানন্দকে যে চিঠি লিখেছিলুম আমাদের কোনো প্রাক্তন ছাত্র সেটি কপি করে রেখেছিল। আজ দৈবাৎ সেই কপি আমার হাতে পড়েছে। লেখাটি

আপনার কাছে পাঠালুম। প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে যদি মনে করেন তবে ছাপাবেন। সংক্ষেপে আমার বলবার ছিল এই যে পরের সঙ্গে অসহযোগ নিয়ে আমোদন না করে নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগের জন্তে দেশের বহু শক্তিকে একত্র করতে পারলে তাতে স্বরাজের যে রূপ অভিব্যক্ত হ’ত, সেই রূপটি হ’ত সত্য। ইতি ৬ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যাপক জগদানন্দ রায়কে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের চিঠি

De Duinev
Huizen N. H.

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

হল্যাণ্ডে একটি হৃদয় আয়গায় হৃদয় বাড়ীতে এসেছি। অদূরে সমুদ্র; চারিদিকে বাগান ফলে ফলে জ্বরমা, পাখীর গানে মুখরিত। শরতের সূর্যালোক এই মনোহর জায়গাটির উপর সোনার কাঠি ছুঁয়ে দিয়েছে। যিনি গৃহকর্ত্তী তিনি আন্তরিক প্রস্তুতির সঙ্গে আমাদের বৃত্ত করছেন হৃতাং দেবে মানবে মিলে যখন আমাদের আতিথে নিযুক্ত হয়েছেন তখন ক্রটি কোথাও থাকতে পারে না। প্যারিসে আমরা যার আতিথে ছিলুম তিনিও আমাকে একান্ত স্বস্ত্রে সমাদর করেছেন। তিনি খুব ধনী অথচ আহায়ে বিহারে সম্যাসীর মত। মাছঘের কলাণের জন্তে তাঁর মনে যে সব সঙ্কল্প আছে তাতেই অহরহ তাঁর সমস্ত শক্তি ব্যয় করছেন। এখানকার যারা বড়লোক মাছঘের ইতিহাসকে সমস্ত ভাবী-কালের মধ্যে প্রসারিত করে তাঁরা দেখেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, দেশকালের ক্ষেত্র আমাদের পক্ষে অভ্যস্ত ছোট হয়ে গেছে, এই জন্তে আমাদের শক্তিকে আমরা বড়ো করে ফলাতে পারিনে। শক্তি যেখানে রস পায় না, খাদ্য পায় না, সেখানে মক্কাভূমির গাছপালার মত কেবল প্রচুর কটক বিকাশ করে।

দেশে আজকাল কী সব গণ্ডগোল চলছে দূর থেকে তার অল্প আভাস পাই। আমাদের গুমটের দেশে এ সব গোলমাল ভালো—মনকে তার সর্বাঙ্গ গণ্ডি থেকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু গোলমালেরই আবার নিজের একটা গণ্ডি আছে। অন্ধকার আমাদের পথ ভোলাবার ওস্তাদ বটে কিন্তু আলোয়ার আলোও পথ ভোলায়। দেশব্যাপী গোলমালের মধ্যে যদি সত্যের অভাব ঘটে তা হোলে সে আমাদের ঘূর্ণির মধ্যে ঘুরিয়ে বেড়ায়, কোথাও এগোতে দেয় না। ঘোরো গণ্ডি আমাদের ধরে রাখে, উত্তেজনার গণ্ডি আমাদের ঘুরপাক খাওয়ায়। ছুইয়েরই পরিধি সর্বাঙ্গ। একটা স্থির গণ্ডি, আর একটা চলতি গণ্ডি; একটাতে ঘুম পাড়ায়, আর একটাতে মাথা ঘোরায়। সত্য হচ্ছে পরমা গতি, অর্থাৎ এমন গতি যার প্রত্যেক পদক্ষেপেই সার্থকতা। আর মোহ হচ্ছে সেই গতি যার চলায় সার্থকতা আনে না, কেবল নেশা আনে। একটা হচ্ছে ধনাত্মক গতি, আর একটা হচ্ছে ঋণাত্মক গতি। দেশ জুড়ে যখন তোলাপাড়ার ঘটছে তখন ভালো করেই ভাবতে হবে, এই গতির প্রকৃতি কি। যে জলে স্রোত প্রবল কিন্তু তট অবস্ফূর্ত সে-ই হচ্ছে বহা। বহায় ভাঙে, ভাসিয়ে দেয়, ফসল নষ্ট করে। আমাদের দেশে যে আবেগ এসেছে সে যদি একমাত্র ভাঙনেরই বার্তা নিয়ে আসে তা হোলে অনাবৃষ্টিতে শুক্কনো ভাঙার ক্ষেতে অতিবৃষ্টির অগাধ ক্ষতির মধ্যে ডুবে মরতে হবে। আমার অনুরোধ এই যে, মন যখন কোনোমতে জেগেছে, তখন সেই শুভ অবকাশে মনটাকে কবে কাজে লাগিয়ে দাও, অকাজে লাগিয়ে শক্তির অপব্যয় কোরো না। Non-Co-operation (নন-কো-অপারেশন) অকাজ—তার আবির্ভাব অস্থিমে। শাস্ত্রে বলে কর্ণে দ্বারাই কর্ণ থেকে মুক্তি, নৈকর্ষের দ্বারা নয়; পাল করার দ্বারাই ফুল থেকে মুক্তি, আমার মত ইচ্ছুল ত্যাগ করার দ্বারা নয়। আজ সময় এসেছে নিজের সব কাজ নিজেরা মিলে করতে হবে। সে কাজ কতখানি বাছফল দেবে তা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কাজের উপলক্ষ্যে আমাদের যে মিল সেই মিলই সত্য মিল, সেই সত্য মিলই হচ্ছে চরম লাভ। অ-কাজ করার উপলক্ষ্যে যে মিল সে কখনই সত্য এবং স্থায়ী হোতে পারে না। আহা

শরীরে যে শক্তি আনে সেইটাই শ্রেয়, মনের নেশায় যে শক্তি তার বেগে আপাতত বেশি হোলেও পরিণামে প্রতিক্রিয়ার দিনে তার হিসাব নিকাশ হোতে থাকে। গীতা বলেছেন—যন্নমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভ্রমাত—সত্যের মিলও অল্প যেটুকু দেয় সেও মস্ত বড়, আর ক্রোধের মিল, খিলাফতের মিল, এমন বর দিতে পারে যাকে নিয়ে কোথায় ফেলব ভেবে আশ্বর্য হোতে হবে। মিথ্যা জোড় যখন ভাঙে তখন ভালোয় ভালোয় সরে যায় না, নিজের মধ্যে দমাদম মাথা ঠোকাঠুকি করতে থাকে। এই জন্তে আবার একবার দেশকে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে সমিধ যদি সংগ্রহ হয়ে থাকে তবে সে বঙ্গ করবার জন্যই, দাবানল জ্বালাবার ওন্তে নয়। একদিন আমি স্বদেশী সমাজে যাবলেছিলাম আবার সেই কথাই বলতে চাই। আমরা যে রাগারাগি করছি তার গতি বাইরের দিকে অর্থাৎ অস্ত্র পক্ষের দিকে অর্থাৎ পরে তার কর্তব্য করেছে, কি, না-করেছে, সেইটেই তার মুখ্য লক্ষ্য। ভিক্ষা করবার বেলাতেও সেই লক্ষ্যই প্রবল। আমি বলি আপাতত বাইরের পক্ষকে ভোলো। পরের সঙ্গে অসহকারিতার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দিয়ো না। নিজের লোকের সঙ্গে সহকারিতার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দাও। আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিকাৰ্য্য, বিচার প্রভৃতি সমস্ত কাৰ্য্যভার সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে নেব এই পণ করো। সেজন্তে সমস্ত দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দরকার। গান্ধিজী সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে আমাদের প্রত্যেককে কাজে আহ্বান করুন, অকাজে না। আমাদের কাছ থেকে টাকা আর কাছের খাজনা তলব করুন। আমাদের অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, পথকষ্ট, রোগকষ্ট, সমস্ত নিজেরা দূর করব বলে আমাদের সত্যগ্রহ করান। তার বাছফল আপাতত কী হবে তার হিসাব করবার কোনো দরকার নেই। কিন্তু এই সত্য গ্রহণ ও পালনের ফল গভীর ও স্থায়ী। সনো বুঝা শুভয়া সংযুক্ত। আমাদের লক্ষ্যজনের দরকার আছে, কিন্তু সেই ষোগ শুভবুদ্ধির যোগ, যে বুদ্ধি আমাদের পূণ্যকর্মে নিযুক্ত করে। সেই কল্যাণ কর্ম আমাদের শুভবুদ্ধনে বাঁধে বলেই অন্তত বন্ধন থেকে স্বতই মুক্তি দেয়। আমাদের দেশের অতি লক্ষীছাড়া পলিটিক্‌স্ এই সহজ কথা আমাদের তুলিয়ে দিয়েছে।

বাংলার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

১৩০৬

কল্পদ্দিন পূর্বে বাংলার পুনর্গঠন সম্বন্ধে গভর্ণর সার জন এডামসন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, পুনর্গঠনের যে সকল উপায় সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়—জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সে সকলের অন্ততম।

তাহার এই বক্তৃতার পর জানা গিয়াছে, বর্তমান বৎসরের মধ্যেই পরীক্ষা হিসাবে বাংলায় পাঁচটি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই সব ব্যাঙ্কের পরিচালন-ব্যয় নির্বাহের দস্ত সরকার চল্লিশ হাজার টাকা দিবেন। সম্প্রতি সরকারের এক বিবৃতিতে জানা গিয়াছে, মহম্মদ সিংহ, কুমিল্লা ও পাবনা—এই তিনটি জিলায় তিনটি ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আর দুইটি জিলায় অবশিষ্ট দুইটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই জাতীয় ব্যাঙ্ক নানা শ্রেণীর এবং দেশের অবস্থার উপযোগী করিতে হয়। জাৰ্মানীতেই এইরূপ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার বিশেষ সফল ফলিয়াছিল এবং সেই জন্ত বিলাতের সরকার (কৃষি ও মৎস্য বিভাগ) মিটার কাহিলকে জাৰ্মানীর ব্যবস্থা অধ্যয়ন করিয়া তাহার অধ্যয়নফল প্রদান করিবার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে দেখা যায়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সে-সে জমির উন্নতি-সাধন জন্ত এক কেন্দ্রী “ফণ্ড” প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই তহবিলে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই টাকার অধিকাংশ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সরকারকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় এবং সে-সব সরকারেরই জমির উন্নতি-সাধন জন্ত প্রতিষ্ঠিত “ফণ্ড” আছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক প্রদেশকে সেইরূপ “ফণ্ড” প্রতিষ্ঠার অধিকার প্রদান করিবার জন্ত আইন বিধিৎক হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্যাক্সনীতে, ১৮৮০ ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হেসে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়ায় ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ওলডেনবার্গে এইরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিটার কাহিল বলেন, সেচের ব্যবস্থা করা, জলনিকাশের বন্দোবস্ত করা এবং বাঁধ ও নদীর কুলরক্ষা করাই এইরূপ

ক্মণ গ্রহণের প্রধান কারণ। অধিকাংশ স্থলেই জমির অধিকারীরা জমির খেতর উন্নতিসাধন জন্ত ক্মণ গ্রহণ করেন, সে রূপ উন্নতিতে আয় বর্ধিত হয়। জমির উন্নতিসাধন জন্ত যে ক্মণ লওয়া হয় তাহাকে ব্যক্তিগত ও বন্ধকী ক্মণের মধ্যবর্তী বলা যাইতে পারে। খাতকের নির্ভরযোগ্যতা ও উন্নতি-জনিত জমির মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ বিবেচনা করিয়া ক্মণ প্রদান করা হয়। কৃষিজ লবোয় বিষয় বিবেচনা করিলে খাতকের সুবিধার জন্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয় :—

১। ক্মণের পরিমাণ উপযুক্ত হইবে ;

২। স্বদের হার অধিক হইবে না ;

৩। পরিশোধ জন্ত সক্ষম ভাণ্ডারে ক্রটিমত টাকা দিতে হইবে বটে, কিন্তু ক্মণের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে না। সাধারণতঃ মহাজনরা বা ক্মণদান প্রতিষ্ঠানগুলি এইরূপ সর্ব্ব ক্মণ দান করিতে পারেন না ; কারণ, উন্নতির ফলে জমির মূল্য কিরূপ বর্ধিত হইবে তাহা স্থির করিবার ও জমি-পরিবর্তনের ব্যবস্থা তাহাদিগের থাকে না। মহাজন বা ক্মণদান প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকালব্যাপী ক্রটিতে টাকা লইতে পারেন না। সেই জন্তই এরূপ ক্মণদানের জন্ত স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

জাৰ্মানীর প্রথার আলোচনা করিলে প্রথমই দেখা যায়—বাংলার অবস্থার সহিত সে দেশের অবস্থার বিশেষ প্রভেদ আছে। বাংলায় জমির উন্নতিসাধনের প্রথম প্রয়োজন—পূৰ্ণকৃত ক্মণ পরিশোধ করা। সেই জন্ত বাংলায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ক্মণপরিশোধ-ব্যবহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যত্রয়—

১। জমি বন্ধক রাখিয়া স্থায়ী ও পূৰ্ণকৃত অন্তরূপ ক্মণ পরিশোধ ;

২। জমির ও কৃষিপ্রথার উন্নতিসাধন ;

৩। যে স্থানে আর কিছু জমি কিনিলে কৃষকের পক্ষে

ক্ষেত্রের ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে চাষের সুবিধা হয়, সে স্থানে নতুন জমি ক্রয়।

বাংলার কৃষকের ঋণভার বহননের এবং দুর্ব্বল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত অর্থনীতিক এডাম স্মিথের ‘ওয়েল্থ অব নেশন্স’ গ্রন্থ প্রচারিত হয়। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বাংলার কসল পূর্বেই বন্ধক রাখিয়া কৃষক শতকরা ৪০, ৫০, ও ৬০ টাকা হুদে টাকা ঋণ লয়।

ইহার অল্পদিন পূর্বে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কমিটি অব সার্কিট বাংলায় ঋণ ও হুদে পরিশোধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম করেন—

“পুরাতন ঋণ পরিশোধ অর্থাৎ মহাজনের প্রাপ্য নির্ধারণ সম্বন্ধে এই নিয়ম হইবে যে, একবার মোট টাকা দ্বিগুণ করিবার পর তাহার আর হুদে চলিবে না এবং খাতকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঋণ কিস্তিকল্পী হিসাবে পরিশোধ করা হইবে। তত্ত্বির এতদিন হুদের যে হার চলিয়া আসিয়াছে, তাহা অত্যধিক বলিয়া পূর্নকৃত ঋণের ও ভবিষ্যতে গৃহীত ঋণের হুদের হার নিম্নলিখিতরূপ হইবে—

(ক) আসল একশত টাকার অধিক হইলে, শতকরা মাসিক ৩ টাকা ২ আনা বা টাকার ২ গরসা।

(খ) আসল এক শত টাকার অধিক হইলে, শতকরা মাসিক ২ টাকা। [আসল ও হুদের টাকা দ্বিগুণের সর্ব অল্পসারে শোধ করা হইবে এবং মধ্যবর্তী সময়ে কোন ব্যবহার চক্রবৃদ্ধি হারে হুদে চলিবে না—তাহা আইন-বিশুদ্ধ ও অসমত বলিয়া বিবেচিত হইবে।] দাবীশে যদি দেখা যায়, নিষ্কিষ্ট হার অপেক্ষা উচ্চ হারে হুদে দেওয়া হইয়াছে, তবে হুদের সব টাকা বাজেয়াপ্ত ও খাতকের প্রাপ্ত বলিয়া সেরূপ হুদে কেবল আসল টাকাই আদায় হইবে। যদি কেহ আইনের ব্যতিক্রম চেষ্টা করিয়াছে, প্রতিপন্ন হয়, তবে আসলের অর্ধেক টাকা সরকার ও অর্ধেক খাতকের প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।”

ব্যবহার কঠোরতাতেই বুঝা যায়, মহাজনরা অত্যন্ত অধিক হুদে লইত এবং খাতককে মহাজনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা সরকার কর্তব্য ও প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

হুদের হার যে হ্রাস হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। কোন কোন স্থানে “আখা বাড়ী” হিসাবে যে খাতক দানন করা হয়, তাহার নামেই শতকরা ৫০ টাকা হুদে প্রকাশ। আবার উহাও চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়া যায়। সরকার হুদের হার কমাইবার জন্ত মধ্য মধ্য চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু আইনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের বিধান অতিক্রমের নানা উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছে। যে স্থানে খাতক বিপন্ন ও বর্ণজানশূন্য, সে স্থানে চতুর মহাজনের পক্ষে নানারূপে প্রাপ্যের অতিরিক্ত টাকার জন্ত অথাকৈ দাবী করা হুদাখ্য হয় না।

কম বৎসর পূর্বে যে ব্যক্তি-অমুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার নির্ধারণ—বাংলার কৃষিক্ষণের পরিমাণ—একশত কোটি টাকা। যখন এই হিসাব হয়, তাহার পর যে কম বৎসর গত হইয়াছে, সেই কম বৎসরে ব্যকামন্দ্যাহেতু কৃষিজ পণ্যের মূল্য হ্রাস প্রভৃতি কারণে খাতক যে অনেক স্থলে হুদে দিতে পারে নাই তাহা সকলেই জানেন। সেই জন্ত এই কম বৎসরে এই ঋণের পরিমাণ আরও বাড়িয়াছে।

ইহার জন্ত জমিই অনেক স্থানে দারী; হুতরাং জমি বন্ধক হইতে খালাস করিতে না পারিলে, তাহার উন্নতিসাধনে কৃষকের কোন উপকার হইবে কি-না সন্দেহ এবং তাহাতে তাহার উৎসাহও থাকিতে পারে না।

এই ঋণের ভার হইতে বুঝা যায়, কিছুকাল পূর্বে কৃষককে সাহায্য করিবার জন্ত যে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে আশাহুতরূপ ফল ফলে নাই। না ফলিবার যে অনেক কারণ ছিল ও আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজ সে সকল আশাদিগের আলোচ্য নহে। তবে সেই সব কারণের মধ্যে আমরা প্রধান দুইটির উল্লেখ করিব—প্রচারকর্তৃক অমনোযোগ, সমিতিগুলিকে আবলম্বী করিতে আবশ্যক চেষ্টার অভাব। সমবায়-প্রচার মূল নীতি এদেশের কৃষকের নিকট নতুন নহে। কিন্তু তাহা যে বিশেষী বেশে দেখা দিয়াছিল, তাহাতে কৃষকের পক্ষে তাহাকে আপনার মনে করা অসম্ভব হইয়াছিল। এই নীতি যে তাহাদিগের পরিচিত এবং তাহাতে যে স্বফল ফলে, তাহা কৃষককে বুঝান হয় নাই। সরকারী কর্মচারীরা ভাঙ্গ-বাংলায় বা ধানার গিয়া দুই মিনে কাজ করিলে তাহা কখনও ফলপ্রসূ হয় না—হইতে পারে না। বর্তমানে পল্লীগ্রামে উপযুক্ত লোকের অভাব যে সমিতি গঠনের ভার-প্রাপ্ত কর্মচারীরা উপযুক্তরূপে অল্পভব করেন নাই, তাহা সপ্রকাশ। তাহার প্রতীকারোপায় করা হয় নাই। তাহার পর কাছের ভার সমবায় সমিতির সভ্যদিগের প্রতিনিধিগণকে না দিলে কি হইবে? এই সব সমিতি সরকারের বিভাগের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সরকারের কর্মচারীরা দরিদ্র কৃষকের সামান্য কথা কুলিয়া পাট বিক্রয় সমিতির মত বিরাট প্রতিষ্ঠানগঠনের চেষ্টায় সমবায় সমিতিগুলির সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ সমবায়

নীতি অবলম্বন ব্যতীত পথ নাই। ইত্যং লব্ধ অভিজ্ঞতার
সংশোধন করিতে হইবে।

আমরা জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বিবৃত করিবার
বলিয়াছি, জমি বন্ধক রাখিয়া বা অন্তর্য্য গৃহীর ঋণ
শোধ জন্ম ব্যাঙ্ক হইতে টাকা দেওয়া হইবে। কিন্তু এখন
বলা—কি রূপ টাকা দেওয়া হইবে? কাহারাই বা টাকা
হইতে পারিবে? ঋণগ্রহণ সম্বন্ধে অবশ্য নিয়ম হইয়াছে। সে-
নিয়ম যে বিশেষ সতর্কতার পরিচায়ক তাহাও আমরা দেখিতে
পাইতেছি। বিবৃতিতে দেখা যায়—

(১) কোন সমস্ত ব্যাঙ্ক যে টাকার ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার
১০ গুণ পর্যন্ত টাকা পাইতে পারিবেন। তবে সাধারণতঃ টাকার
পরিমাণ ২ হাজার ৫ শত টাকার অধিক হইবে না এবং সমবার সমিতির
পরিদর্শকের অনুমোদনে তিনি ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পাইতে পারিবেন।

(২) যত দিনের জন্ম ঋণ গৃহীত হইবে, ততদিনে জমি হইতে উৎপন্ন
শস্যের মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ বা জমির মূল্যের অর্দ্ধাংশের অধিক টাকা
কাহাকেও দেওয়া হইবে না।

(৩) যিনি কৃষিক আয় হইতে নিজ প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া
৫০ ও কিম্বা ৩ টাকা দিতে পারিবেন না, তিনি ঋণ পাইবেন না।

(৪) ঋণ কখন ২০ বৎসরের অধিক কালে পরিশোধ্য হইবে না।

(৫) ঋণগ্রহণের দুই জন সদস্য জামিনদার দিতে হইবে।

(৬) জমির উপর ব্যাঙ্কের প্রথম অধিকার থাকিবে।

কিন্তু পূর্বেকৃত ঋণ কি ভাবে পরিশোধ করা হইবে, তাহা
জানা বাইতেছে না। দার জন এণ্ডার্সন বলিয়াছেন—
ঋণ মিটাইবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এ-বিষয়েও বিশেষ
বিবেচনা—ঋণের পরিমাণ কিরূপ? ঋণ যদি পরিশোধযোগ্য
হয়, তবে ব্যবস্থা একরূপ হইবে, তাহা পরিশোধাতীত হইলে
ব্যবস্থা অন্তরূপ না করিলে চলিবে না। বাংলার মোট কৃষি-
ঋণ যদি এক শত হুড়ি কোটি টাকা হয়, তবে তাহা জমি
হইতে পরিশোধ করা সম্ভব কি-না? অথচ ঋণ উপেক্ষা
করাও সম্ভব নহে; মহাজনের স্বার্থ অবজ্ঞা করা যায় না।
যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে কেবল দুই শ্রেণীর কৃষক
বা খাজনালান্ধকারী বা স্বল্প আয়ের লোকই ব্যাঙ্কের টাকার
উপকৃত হইতে পারিবে :—

(১) বাহাদুরী অধিকারী;

(২) বাহাদুরিগের ঋণের পরিমাণ অল্প বলিয়া ব্যাঙ্ক
হইতে টাকা লইয়া পরিশোধ করা বাইবে।

কিন্তু বাংলার অধিকাংশ কৃষক ঋণভারপীড়িত—যতক্ষণ
তাহাদিগের ঋণ মিটাইয়া দিয়া তাহা পরিশোধ করা না হইবে,

ততক্ষণ তাহারা অসহায় ও নিরূপায়। বিশেষ জাঙ্গানী প্রভৃতি
দেশের মত বাংলায় অনেক জমি লইয়া চাষের ব্যবস্থা নাই—
কৃষকরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে চাষ করিয়া কোনরূপে দিনপাত
করে। যিনি পঞ্জাবের কৃষকের অবস্থা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য
করিয়াছেন, সেই মিটার ডালিঁ বলিয়াছেন,—তাহার মনও
তাহার ক্ষেত্রের মত সর্পিণ (“as narrow as the
plots he cultivates.”)

এই অবস্থায় ঋণ মিটাইবার ব্যবস্থা না করিয়াই ব্যাঙ্ক-
প্রতিষ্ঠায় বাংলায় অধিকাংশ কৃষকের—প্রায় সব কৃষকের
উপকার হইবে না। তবে ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া
শিক্ষিত কৃষকরা যদি কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন তবে তাহাতেও
মঙ্গল হইবে। বাহাদুরী বলেন, বাংলায় একসঙ্গে অধিক জমি
পাওয়া যায় না, তাহাবা বাংলার সকল ভাগের বিষয়
অবগত নহেন। কারণ দেখা গিয়াছে নদীয়া, ঝশোহর ও
মুর্শিদাবাদ জিলায় অনেক জমি পতিত আছে এবং সেচের
ব্যবস্থা করিতে পারিলে বীরভূম ও বাঁকুড়া জিলায়ও
উপযুক্ত পরিমাণ জমির অভাব হয় না।

এই জন্য ঋণ মিটাইবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন বিষয়ে
আমরা বাংলা সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।
সে ব্যবস্থা না হইলে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের দ্বারা আশাহরুপ
ফললাভ সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শত কোটির অধিক টাকার ঋণভারে যে পিষ্ট সে মস্তক
উন্নত করিয়া দাঁড়াইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? কেবল
তাহাই নহে—মহাজনের নিকট ও জমিদারের নিকট তাহার
ঋণের প্রকৃত পরিমাণ কি, তাহাও অনেক কৃষক জানে না।
এত দিন যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে তাহার “সর্বোচ্চ ক্ষমতা”
প্রকার জন্য শাসকদিগের সহায়ত্বই যে ছিল না, তাহা
বলা যায় না; কিন্তু সে সহায়ত্বই ব্রহ্মবৃত্ত হয় নাই বলিয়াই
প্রজা তাহাতে উপকৃত হয় নাই। বন্দী প্রজাতির বিষয়ক
আইন শাসকদিগের সহায়ত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু
তাহাতে প্রজা যে আশাহরুপ উপকৃত হইয়াছে, এমন বলা
যায় না। ইংরেজ এদেশে রাজত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার
চেষ্টায় যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” জমিদারের জমিদারের
সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে যে মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ের
উত্তর হইয়াছে, তাহারা শিক্ষিত এবং সজ্জিত—সুতরাং

অজ্ঞ ও দরিদ্র প্রজা তাঁহাদের আইন-অতিক্রম নিবারণ করিতে পারে না। কি ভাবে অনেক জমিদারের সেরেস্তার কাজ হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। ১৯৪ খৃষ্টাব্দে সারণ জিলায় জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সরকার যে বিবৃতি প্রকাশ করেন, তাহাতে লিখিত ছিল—

"Illegal enhancement of rent, oppression by the landlords and consequent discontent among the tenantry were found to be prevalent to a greater or less degree in nearly all parts of the district."

অর্থাৎ জিলায় সকল অংশেই অর বা অধিক পরিমাণে সোজাইনী খাজনাবৃদ্ধি, জমিদারের অত্যাচার ও সেই কারণে প্রজার মনে অসন্তোষ লক্ষিত হইয়াছে।

কোন প্রসিদ্ধ ও দানশীল জমিদারের জমিদারী সম্বন্ধে এই বিবৃতিতে লিখিত হয় :—

"The riyats complained not so much that the rates arbitrarily fixed by the Raj officials were more than they could afford to pay, but the constant changes in the rent rolls had destroyed all sense of security."

অর্থাৎ জমিদারের কর্তৃত্বাধীনা যথেষ্ট খাজনা ধার্য্য করিয়াই ছিলেন; তাহার উপর আবার শোষণ করা প্রভৃতি বার-বার পরিবর্তন করার প্রজার অসন্তোষ ও খাজনা সম্বন্ধে কোন স্থিরতাই ছিল না।

সরকার এই সব ব্যাপারের প্রতিকারকল্পে থাকিবন্ত জরিপ ও বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কখন প্রজার ঋণ পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। বহু দিন পূর্বেই যে প্রজার ঋণভারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণে আমরা কমিটি অব সার্কারের নির্ধারণ উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু সে নির্ধারণও কার্যে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

প্রজাবর্ষ আইনে প্রজাকে সে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যে মহাজনের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, কেহ কেহ বলিবেন—প্রজা যদি তাহার অধিকার রক্ষা না করে, তবে কে তাহার ঋণ তাহা রক্ষা করিতে পারে? কিন্তু তাহার উত্তরে বলিতে হয়, যে-দেশে শিক্ষা অর্থনৈতিক ও বাণ্যাত্মক নহে, সে-দেশে সরকারকে অন্তঃশেষ অপেক্ষা প্রজার স্বার্থরক্ষার অধিক অবহিত হইতে হয়।

সরকার তাহা বুঝিয়াই সমবায় ঋণ দান সমিতি প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর সেই জন্ত আশ্রয়িত জমি-বন্দকী ব-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। যাহাতে এই অল্পটান সাফল্য লাভ করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দেশের লোকের কর্তব্য এত তাহা হইলেই ইহা এক দিকে যেমন স্বাবলম্বী হইতে পারিল, অপর দিকে তেমনই প্রকৃত কৃষকের ঋণ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা হইলে তাহার পক্ষে এই সব ব্যাধ হইতে আবশ্যক অর্থ লইয়া জমির ও চাষের প্রকৃত উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে।

ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহার আভাস আমরা পূর্বে দিয়াছি। কিরূপে ইহার মূলধন সংগৃহীত হইবে, তাহাও জানিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্কের সমস্তদিগকে অংশ বিক্রয় করিয়া প্রথমতঃ মূলধন সংগৃহীত হইবে। যিনি যত টাকার অংশ ক্রয় করিবেন, তাহার দায়িত্ব কখন তাহার অতিরিক্ত হইবে না। লাভ হইলে লাভের টাকার শতকরা ৭২ টাকা সঞ্চয়-ভাণ্ডারে জমা হইবে এবং অবশিষ্ট ২৫ টাকা মাত্র লভ্যাংশ বোনাস বা বৃত্তি প্রভৃতি বাবদে ব্যয়িত হইবে। ব্যাঙ্কে মূলধন হিসাবে যত টাকা সংগৃহীত হইবে তাহার সহিত সঞ্চয়-ভাণ্ডারের তহবিল বোণ করিয়া মোট টাকার বিশ গুণ টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ হিসাবে লইতে পারিবেন। বন্দী কেন্দ্রী সমবায় ব্যাঙ্ক এই টাকা ঋণ দিবেন এবং কেন্দ্রী জমি-বন্দকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত না হইয়া পর্যন্ত সব জমি-বন্দকী ব্যাঙ্ক এই সমবায় ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। ব্যাঙ্ক "ডিবেঞ্চার" করিয়া টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং যত দিনের জন্য "ডিবেঞ্চার" থাকিবে, সরকার তত দিনের জন্য তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। মোট "ডিবেঞ্চার" ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার অধিক হইতে পারিবে না। কেন্দ্রী সমবায় ব্যাঙ্কের এই কাজের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে। যাহাতে গৃহীত ঋণের টাকা যথাযথ ভাবে থাকে, তাহা দেখিবার জন্য সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্টারই প্রথম ট্রাষ্টি থাকিবেন এবং জমি-বন্দকী ব্যাঙ্কগুলি যে বন্দকী দলিলে টাকা ধার দিবে, তাহা তাহার কেন্দ্রী সমবায় ব্যাঙ্কের ও এই ব্যাঙ্ক ট্রাষ্টির বরাবর লিখিয়া দিবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যাহাতে টাকা নষ্ট না হয়, সেই

শিশুসাহিত্য

শ্রীঅনাথনাথ বসু

আমাদের বাংলা ভাষা শিশুসাহিত্যে সযত্ন নহ, একথা বলিলে বোধ করি বিশেষ অত্যাধিক্য করা হয় না। হয়ত পচিশ পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকাদি গ্রন্থের সংখ্যা এখন অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু দেশের অভাবের ও অন্তর দেশের অবস্থার তুলনায় ইহা মোটেই যথেষ্ট নহ। জেনেভার জঁ জ্যাক রুসো ইনস্টিটিউট (Jean Jacques Rousseau Institute) নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। তাহারই এক অংশে বুরো দ্য'দুকাঁসি ও আঁটারশ্যাপিনোয়াল (আন্তর্জাতিক শিক্ষাদপ্তর) নামক দপ্তরের একটি গৃহে পৃথিবীর অনেক দেশের শিশুসাহিত্য সংগৃহীত হইতেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে এই শিশুসাহিত্য-গ্রন্থাগার দেখাইতে দেখাইতে যেখানে ভারতীয় গ্রন্থগুলি রাখা হইয়াছে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, “আপনাদের দেশের বেশী বই আমরা পাই নাই, আপনাদের শিশুসাহিত্যের অবস্থা কেমন?” পাশেই ক্ষুদ্র দেশ চেকোস্লোভাকিয়ার গ্রন্থগুলি রাখা দেখিলাম, সেলেকের দুই-তিন খণ্ড ভরিয়া রহিয়াছে; ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত কয়েকটি মাত্র গ্রন্থ সেখানে দেখিতে পাইলাম। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শিশুসাহিত্যের একটি তালিকা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের গ্রন্থের উত্তরে বলিতে হইল যে, আমাদের দেশে শিশুসাহিত্য বিশেষ পরিপূর্ণ নহে, তবে দেশে যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলিও এখানে আসে নাই। বাহিরের লোকের কাছে বাহাই বলি না কেন, নিজের মনে বুঝি যে আমাদের দেশের সাহিত্যিকগণ এ-দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই; দেশের অভিভাবকগণও শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। একথা উঠিতে পারে যে, আমরা দরিদ্র ক্ষুদ্রাং শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে মেলা চুলভি; কথাটির মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত থাকিলেও কথাটা পুরাপুরি সত্য নহে। যে-দেশে উপভাস গল্পের বইয়ে পুস্তকের বাজারে কণা চলিয়াছে, সে-দেশে অন্যান্য শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রের অভাব ঘটিবে

এ-কথা সত্য নহে। তবে হয়ত দেশের লোককে এ-বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। এই শিক্ষার যে একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আমাদের দেশের সাধারণ অভিভাবক ও শিক্ষকগণ শিশুদের হাতে বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কথামালা তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন, ভাবেন তাঁহাদের কর্তব্যের শেষ হইল; বাকিটুকুর বরাত তাঁহারা টেকস্ট-বুক কমিটির হাতে দেন। টেকস্ট-বুক কমিটির দ্বারা অনুমোদিত শিশুদের উপযোগী বলিয়া বর্ণিত সাধারণ গ্রন্থের স্বরূপ কি, তাহা সেই বইগুলি খুলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়; তাহাদের মধ্যে ভাল গ্রন্থ যে নাই তাহা বলিতেছি না। তবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কোন কোন দারিদ্রবোধপূর্ণ অভিভাবক হয়ত ইহঁদের উপরে বড়জোর একখানা রামায়ণ বা মহাভারত কিনিয়া দেন। যে-যুগে শিশুবোধকই ছিল শিশুদের একমাত্র সাহিত্য, তাহার চেয়ে এ-অবস্থা অনেক উন্নত এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উন্নতিতে আত্মপ্রশাদ লাভ করিবার কিছু নাই। এক হিসাবে শিশুবোধকের যুগও আমাদের দেশের শিশুরা যাহা পাইত, আজ তাহা হইতে বর্তমান কালের শিশুরা বঞ্চিত হইয়াছে। তখনকার দিনের ছড়া ও রূপকথাগুলি ছিল সে-যুগের শিশুসাহিত্যের অঙ্গত্বুক্ত। ছড়াগুলি লোপ পাইতেছে, রূপকথাগুলি আমরা তুলিতে বসিয়াছি; রূপকথা ও ছড়া বলিতে পারেন এমন দিমিয়া ঠাকুরমার সংখ্যা আজ অতি অল্প। অথচ এগুলি শিশুসাহিত্যের অপূর্ণ রসবস্ত। অনেক দিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম কেহ কেহ ছড়াগুলি সংগ্রহ করিতেছেন, সে-সংগ্রহের কি হইল জানি না।* সেগুলি যদি লোপ পাইবার পূর্বে সংগৃহীত হয় তাহা হইলে যে দেশের শিশুরা কৃতজ্ঞ হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* মুদ্রিত বাংলা ছড়ার কবি আছে। কিন্তু তাহা বাক্যের সংগ্রহ নহে।—প্রাচীন সম্পাদক।

তাহা ছাড়া সে-যুগে রামায়ণ মহাভারত সকলেই পাঠ করিত, শিশুরাও মাতৃমুখে রামায়ণকাহিনী ও মহাভারতের উপাখ্যানগুলি শুনিয়া পাঠশালার বর্ণপরিচয় শেষ করিয়াই আমাদের দেশের এই দুইটি অপূর্ণ সাহিত্যগ্রন্থে প্রবেশ-অধিকার লাভ করিত। এক হিসাবে কৃত্তিবাস ও কালীদাস দাসের রচনা পাঠ করিতে প্রকৃত পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না; হুতরাং শিশুরাও ইহা উপভোগ করিতে পারে। কৃত্তিবাস, কালীদাস দাসের ইহাই বিশেষত্ব যে, আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাহাদের মধ্যে আপন আপন চিত্তবিকাশ অহুযায়ী রস লাভ করে। এই সার্কজেনীষ বর্তমান কালের কোন গ্রন্থের আছে কি-না সন্দেহ। বাহা হউক, পঞ্চাশ এক-শ বৎসর পূর্বে সমাজের গঠন ছিল অন্য ধরণের এবং তাহারই সহিত মিলাইয়া শিশুসাহিত্যের প্রচলনও ছিল। তখন শিশুর নিজস্ব অধিকারের কথা কেহ বলিত না, শিশুজীবনকে তখন পরিণত জীবনের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে গ্রহণ করিয়া সেই দুটি হইতে শিশুসাহিত্য সৃষ্ট হইত। এই যুগের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়। তখন অতি অল্প লোকেই লেখাপড়া শিখিত, হুতরাং তখনকার শিশুসাহিত্যের অধিকাংশ লিখিত না হইয়া কথিত আকারেই প্রচার লাভ করিয়াছিল।

তাহার পর অনেক কাল গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন “বর্ণপরিচয়” লিখিলেন তখন শিশুবোধকের উপর কতটা উন্নতি হইল তাহা আমাদের পক্ষে আজ ধারণা করা কঠিন। বিদ্যাসাগর প্রথম শিশুসাহিত্য রচনায় মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির লগয়তা লইলেন, কিন্তু তখন ছিল মনোবিজ্ঞানের শৈশবকাল; তাহার পর মনোবিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু শিশুসাহিত্য-রচনায় তাহার ব্যবহার উন্নতির অঙ্গরূপ হয় নাই। এখনও আমরা পরিণত বয়স্কের দৃষ্টি লইয়া শিশুসাহিত্য রচনা করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই মনোভাব-হইতে মুক্ত ছিলেন না। তবে তখনকার মাসীর কর্কশবক্তার ব্যাপারে শিশুরা কোন শিক্ষা লাভ করুক বা না-করুক, যথেষ্ট আনন্দ যে লাভ করিত এটা নিজেই অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি।

শিশুসাহিত্য-রচনার মাপকাঠি কি? বর্তমান কালের শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে এই মাপকাঠির ঠিক সন্ধান মেলে না; তাহাদের মধ্যে কতকগুলো বৈধ পরিণত বয়স্কের

মাপকাঠি দিয়া লেখা। এগুলির সবচে পূর্বে কিছু বলিয়াছি, পরেও বলিব। মনে পড়িয়া গেল কে এক জন এই শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, জনহীন মরুভূমিতে সন্ধ্যার একান্ত অভাব ঘটিলেও তিনি সেগুলো পড়িবেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বইগুলি দেখিলে মনে হয় শিশুদের আনন্দ দিবার একটা চেষ্টা সেগুলির মধ্যে আছে। কিন্তু সে-চেষ্টার ফল্য কোন চিন্তা ও সন্দেহ নাই। সেইটাই দুঃখের কথা। অল্প ক্ষেত্রেও সাহিত্য-সৃষ্টিচেষ্টায় সৃচিন্তিত ও সংযত চিন্তার প্রয়োজন আছে লভ্য, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক। কারণ বাহাদের হাতে এই গ্রন্থগুলি দিব তাহাদের বিচারশক্তি পরিণত নহে, ভাল-মন্দ বাছিয়া লইবার ক্ষমতা তাহাদের হয় নাই; হুতরাং খারাপ গ্রন্থ তাহাদের যত ক্ষতি করিতে পারে অন্তের বেলায় ততটা পারে না। এইজন্যই শিশু-সাহিত্য-রচনার দায়িত্ব অনেক বেশী। তৃতীয়াংশের সকল লেখকের মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

অনেকে বলেন, শিশুসাহিত্যের মাপকাঠি হওয়া উচিত চরিত্রগঠন, জ্ঞানদান বা এমনই একটা কিছু। সাহিত্যের যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য আনন্দদান সেটাকে স্বীকার করিয়াও তাহাকে তাঁহার গৌণ মনে করেন। হুতরাং তাহাদের রচিত শিশুসাহিত্য নীতি-শিক্ষারই একটি আলাদা সন্সরণে পরিণত হয়। এ যেন চিনি-মাখান হুইনিরের বাড়ি। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহার উদাহরণ আমরা পদে পদে পাই।

এখানে শিশুসাহিত্যের উদ্দেশ্য বিচার করিবার স্থান নাই। আমাদের মতে শিশুসাহিত্যের মুখ্য আদর্শ আনন্দ-দান, শিক্ষা বা চরিত্রগঠন বা জ্ঞানদান নৌ; সেটাকে আনন্দের by-product বা ‘কাউ’-রূপ লওয়াই উচিত এবং শিশুসাহিত্য-রচনায় এই আদর্শ আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকা উচিত। এক জন বলিয়াছিলেন আমরা বাহিরের তথাকথিত বাজে বই পড়িয়া বাহা শিখি তাহার অতি সামান্য অংশই তথাকথিত কাজের বই পড়িয়া পাই। কথাটা অত্যন্ত সত্য। যে-বই আনন্দ দেয় তাহা জীবনে ছাপ রাখিয়া যায়, আর যে বই পড়িতে পড়ে পড়ে কষ্ট ও চেষ্টা করিতে হয়, মনের সমস্ত শক্তি তাহারই মধ্যে নিঃশেষিতপ্রায় হইয়া যায়,

শেখার শক্তি আর থাকে না। মনোবিজ্ঞানও এ-কথার সমর্থন করে।

এ-কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি তপস্তার কথা অস্বীকার করিতেছি। ভাল সাহিত্য চর্চা করিতে তপস্তার প্রয়োজন; শিশুদেরও ভাল সাহিত্যে প্রবেশ-অধিকার দিতে হইবে। কিন্তু যাহা প্রাণ মন দিয়া চাই, যাহা ভালবাসি, যাহার রস কিছু অল্পভব করিতে পারিয়াছি আমরা তাহারই জ্ঞাত তপস্তা করি। সাহিত্যের রসবোধ জাগ্রত হইবার পূর্বেই যদি নীতিশিক্ষার মুখব্যাদান শিশুচিন্তে ভীতির সঞ্চার করে তবে সে শিশুসাহিত্যকে দূর হইতেই নমস্কার জানায়। আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই যে পর-জীবনে লেখাপড়ার চর্চা রাখে, ভাল ভাল বইয়ের সহিত পরিচয় রক্ষা করে, তাহার কারণ শৈশবের এমনই একটা ট্রাজেডি। বর্ণপরিচয়ে বিপত্তির প্রভাব জীবনের ক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়। অথচ কথার্টা আমরা তেমন করিয়া ভাবি না।

ব্যাপারটা মূলে এই যে, যাহাকে লইয়া আমাদের কারবার, তাহার মনের খবর আমরা বিশেষ রাখি না। শিশুসাহিত্য-রচনার একমাত্র মাপকাটি শিশুমনের ক্রমবিকাশ ও সেই ক্রমবিকাশের প্রত্যেক পথায়ের অল্পস্থায়ী প্রয়োজন। যেমন দেহের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তেমনই মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যের প্রয়োজন হয়। দেহ একবার পুষ্ট হইলে তখন খাদ্যের ভেলাভেদের বিশেষ আবশ্যিকতা থাকে না, কিন্তু সে-অবস্থায় পৌছাইবার পূর্বে এ-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার হয়। মনের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। সেইজন্যই এই শ্রেণীর সাহিত্য-রচনার এত সতর্কতা চাই।

এতক্ষণ শিশুসাহিত্য কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি; উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে বোঝা যাইবে ইহার মধ্যে শ্রেণী-ভাগ ও স্তর-ভাগ আছে, মনোবিকাশের ক্রম-অল্পস্থায়ী এই শ্রেণী-ভাগ ও স্তর-ভাগ হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যৌবন-বিকাশ হয় বোল-সভের বৎসর বয়সে; তাহার পূর্বে পর্যন্ত কালকে মোটামুটি তিনটি ভাগে আমরা ভাগ করিতে পারি; পাঁচ-ছয় বৎসর পর্যন্ত অবস্থা শৈশব, পাঁচ-ছয় হইতে এগার-বার বৎসর পর্যন্ত অবস্থা বাল্য ও তাহার পরে যৌবনারম্ভ

পর্যন্ত কালকে কৈশোর বলা যাইতে পারে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই হিসাবে এক-আধ বৎসর কম-বেশী হইতে পারে, তবে মোটামুটি ভাবে এই হিসাব ঠিক বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এ-ক্ষেত্রে এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, এই ভাগ-গুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন নহে, অর্থাৎ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার বিকাশ ক্রমশঃগতিতে হয় বলিয়া তাহাদের কোন একটির সঠিক সীমা ও স্থপরিমিতি সীমা নির্দেশ করিতে পারা যায় না। তবে এ-কথাও ঠিক যে প্রত্যেক অবস্থারই এক একটা বিশেষত্ব আছে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে উভয় অবস্থারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

শৈশবে শিশুর জগৎ একান্তই তাহার আপনাকে লইয়া; তাহার খেলাধুলা সকল কিছুরই কেন্দ্র সে নিজের। সে যখন খেলার সঙ্গী চায় সে তাহার নিজের আনন্দের জন্য, আত্মতৃষ্টি, আত্মঅভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য। ইহাকে স্বার্থপরতা বলিতে পারি, কিন্তু সে স্বার্থপরতা জীবনরক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। পরবর্তীকালে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিলে শিশুচিন্তা এই স্বকৃত স্বার্থপরতা হইতে ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করে, স্বার্থপরতার গণ্ডি ধীরে ধীরে বিস্তৃততর হইয়া পরার্থপরতা দেখা যায়; শিশু সামাজিক জীব হইতে শেখে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিকাশের পথে বহু বাধাবিঘ্ন আসে; একদিকে হয় স্বার্থপরতা রক্ষা করিবার চেষ্টা চলে, না-হয় অসময়ে শিশুকে সামাজিক করিবার, ভদ্র করিবার প্রয়াস দেখা দেয়। তাহাকে নানারূপ নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়; অবিকশিত চিন্তা শিশুর নিকট এই শ্রেণীর শিক্ষার কোন মূল্য নাই; ঐ ঠিক এই বয়সটায় সে নীতিবিধানের উর্দ্ধে।

এই বয়সে মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ অত্যন্ত বিকশিত অর্থাৎ পরবর্তী বয়সে ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিলে যে মানসিক নানাবিধ উপাধিধারা আমরা অর্থ নির্ণয় ও বিচার করি, সেগুলির তখনও সৃষ্টি না হওয়াতে তখন প্রত্যেক অল্পভূতির মূল্য অনেক বেশী হয়। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে মনোজগতের এই ব্যাপারটার মূল্য অনেকখানি। এই জন্যই শিশুসাহিত্যে প্রত্যেক অল্পভূতির খোরাক যথেষ্ট পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিশুসাহিত্যে ভাল ছবি থাকে না; যাহা থাকে তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর শ্রেণীর। অথচ চোখের সাহায্যে শিশু যে-পরিমাণে শিক্ষালাভ করে, অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বোধ করি

ততটা পারে না। ভাল ভাল ছবি-দেওয়া বইয়ের অভাব হওয়াতে অনেক সময়ে স্থলিখিত বইয়ের মূল্য কমিয়া যায়। পাক্ষাত্য দেশে এইভাবে শিক্ষা দিবার যে আয়োজন হইয়াছে তাহা আমাদের দেশে প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন।

পড়িতে গেলে নানা ইঞ্জিরের যে সমবায়ের (co-ordination) প্রয়োজন শৈশবে তাহার একান্ত অভাব; তাই তখন ইঞ্জিরগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে লইয়া তাহাদের বিকাশ চেষ্টা করা প্রয়োজন হয়। চোখের ব্যবহারের কথা কিছু বলিয়াছি। এইবার কানের কথা বলি। এককালে আমাদের দেশে নানারকমের ছড়া প্রচলিত ছিল, শিশুরা সেগুলি শুনিতে, তাহাদের মনের অঙ্গুল্যে তাহার রস আশ্বাদ করিত; ধীরে ধীরে তাহার ভিতর দিয়া কাব্যবোধ ছন্দবোধ জন্মাইত। আমার এই কথাটির মধ্যে কিছু পরিমাণ অতীতি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা যে আংশিকভাবে সত্য এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকাল ছড়াগুলি আমরা হারাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের স্থান অধিকার করিতে পারে এমন কিছুর সৃষ্টি করি নাই। শিশু-কবিতার নামে প্রচলিত কবিতাগুলি নীতিশিক্ষার জন্ত রচিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে ছন্দ নাই, শব্দসঙ্গীত নাই, আছে শুধু নীরস নীতিকথা; সেগুলি শিশুচিন্তকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এক ‘খুমপাড়ানি গান’ বাদ দিলে শিশুদের উপযোগী গান আমাদের দেশে কোনদিনই বেশী ছিল না। অথচ সকল পিতা-মাতাই জানেন শিশুরা ছন্দ ও গান কত ভাল-বাসে। ইহার কোন আয়োজনই কি আমাদের গান-রচয়িতা ও সাহিত্যিকগণ করিতে পারেন না?

শৈশবে ছেলেমেয়েরা গল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা ভালবাসে কি-না সন্দেহ; তাহার। যে-ভ্রণীর গল্প ভালবাসে তাহা অত্যন্ত সরল; তাহার মধ্যে প্রট আছে কি-না চরিত্র-চিত্রণ আছে কি-না সে-বিষয়ে তাহার। দৃষ্টি দেয় না। বোধ করি এই বয়সে কথার একটা মোহ আছে, সেই মোহের জন্তই শিশু ছড়া গান কবিতা গল্প শুনিতে চায়। তাই দেখি একই গল্পের পুনরাবৃত্তিতে শিশুচিন্ত ক্রান্তিবোধ করে না। শিশু যে রূপকথা ভালবাসে সে-ভালবাসাও তখন পরিপূর্ণ লাভ করে না; বাল্যে সে-ভালবাসা পড়াই ভালবাসা হইয়া দাঁড়ায়। তবুও শৈশবে রূপকথার মূল্য অনেকখানি;

কল্পলোকে বিচরণ করার শক্তি শিশুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। তাহারই উপাদান হয় এই রূপকথাগুলি।

যে ভাষা শিশু বলে ও শোনে তাহা ছাড়া যে একটি মনগড়া সাধুভাষা আছে শিশুর পক্ষে তাহা একান্তই অবাঞ্ছনীয়; সুতরাং শিশুর কণ্ঠে তাহা দিবার চেষ্টা অজ্ঞায়। ইহার জন্ত যে মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন শিশুর পক্ষে তাহা কঠিন; তাহাতে যে সময় যায় তাহার মূল্যও কিছু নাই। আর সেই চেষ্টা করিতে গিয়া শিশুর সামান্য শক্তির যে অপব্যয় হয় তাহার ফলে অজ্ঞাত যেখানে তাহার শক্তি-প্রয়োগ স্বাভাবিক-ভাবে প্রয়োজন সেখানে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। সুতরাং শিশুসাহিত্য লিখিতে হইবে তাহাদেরই ভাষায়। পাক্ষাত্য দেশে দেখিয়াছি শিশুদের শব্দসংগ্রহের তালিকা করা হইয়াছে; অর্থাৎ কোন্ বয়সে শিশু কি কি শব্দ ব্যবহার করে বা কোন্ কোন্ শব্দের তাহার প্রয়োজন হয় তাহা স্থির করা হইয়াছে; তাহার পর সেই শব্দগুলি দিয়া শিশুদের উপযোগী গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ফলে সে-সকল গ্রন্থ শিশুরা সহজে পড়িতে পারে, পড়িয়া আনন্দ লাভ করিতে পারে। অথবা অপ্রয়োজনীয় শব্দের ভায়ে শিশুচিন্ত ভারাক্রান্ত হয় না। আমাদের দেশে শিশুরা পড়া আরম্ভ করিয়াই “মানের বই” খোঁজে। শেষ দিব কাহাকে? এ-বিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলা উচিত। বর্ণপরিচয়ে বর্ণবোধের যে প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, তাহা বিকলমূলক (analytical) ও কতকটা ধ্বনি-অনুসারী (phonetic)। ধ্বনির ও কথার এইরূপ বিচার শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক নহে। বর্তমান মনোবিজ্ঞানের মতে এইরূপ বিকলমূলক (analysis) শিক্ষার দ্বিতীয় ধাপ; প্রথম ধাপে আমাদের ইঞ্জিয়ায়ুত্ব সমগ্রভাবে দেখা দেয়, পরে শিক্ষিত জনত্ব হইতে ভাঙিয়া-চূড়িয়া বিশ্লেষণ করিতে শেখে। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ধাপ বর্ণবোধ নহে, কথাবোধ। সুতরাং “বর্ণপরিচয়”ও নুতন করিয়া লেখার সময় হইয়াছে।*

* চল্লিশ বৎসরের অধিক পূর্বে আমি কথাবোধকে প্রথম ধাপ করিয়া সচিব বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ লিখি, এবং তাহা ক্রমশে পড়াইতে হইবে, তাহাও লিখিয়া দিই। এ বই এখনও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শিশুগণকে উহা পড়ান হয় পুরাতন রীতিতে, অর্থাৎ বর্ণবোধকে প্রথম ধাপ করিয়া।—প্রবাসীর সম্পাদক।

মুক্তি

শ্রী আশালতা দেবী

৭

যামিনীর স্বভাবের গতি ছিল অভ্যস্ত বেগবান এবং চঞ্চল। নিজেকে লইয়া স্ফুটাস্ফুট বিপ্লবের কণা, নিজের মনকে টানাহেঁচড়া করিয়া তাহা হইতে চুনিয়া চুনিয়া চিরিয়া চিরিয়া তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা এ-সকল তাহার খাতে সন্ম না। তাহার সমস্তই বিধাহীন, সোজাহাজি। যাহা তাহার ভাল লাগে না, তাহা হইতে পবল বিতৃষ্ণায় সে মুখ কিরাইয়া লয় এবং লইবার সময়ে কোন ছলে কোন মিহি এবং মিষ্ট বাক্য দিয়া তাহা ঢাকিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। আবার ইহার উল্টা দিকেও সে ঠিক এমনি জোরের সঙ্গে চলে। যেখানে তাহার মন আকৃষ্ট হয় সেখানেও এতটুকু রাখিয়া-ঢাকিয়া চলা তাহার অসাধ্য।

সেই সে মবারের প্রায় সপ্তাহখানেক পরে যামিনী বিকালবেলায় চক্রকান্তের লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, নির্মলা দরজার দিকে পিছন কিরাইয়া আলমারী খুলিয়া কি বই বাহির করিতেছে। ঘন কালো চুলের রাশি হাতে, পিঠের উপর, কপোলে সমস্ত জায়গায় অবিস্তৃত হইয়া ছড়ান। পিছনে পায়ের আঙুল পাইয়া সে মুখ কিরাইয়া কহিল, ‘ও, আপনি এসেছেন! বাবা সেই কখন বেরিয়েছেন, তাঁর কোন এক বন্ধু তাঁকে দুপুরের খাওয়ার নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। এবারে তো তাঁর আগার সময় হ’ল। হয়ত এখনি এসে পড়বেন।’

‘আচ্ছা আমি ততক্ষণ বসছি।’

‘হ্যাঁ, একটু বসুন। এই আলমারীটা গোছান শেষ হইলেই আমি চায়ের জল চড়াব। বাবার জন্তে আর পনের মিনিট অপেক্ষা করব। তার পর তিনি না এলেও চা করব, এত অভ্যস্তমত প্রকৃতির লোক। এই যে আলমারীটা দেখছেন এইটে আমি ছ দিন অন্তর গোছাই, আবার যেমনকার তেমনি নোড়রা হয়ে যায়।’

যামিনীর কাছ হইতে কোন উত্তর আসিল না। নির্মলা

আপনার হাতের কাজে মন দিল। হঠাৎ যামিনী কহিল,

“আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?”

“কি কথা?”

“আচ্ছা, আপনার সঙ্গে ব্যবহারে আমি কি কোন দিন কোন অসঙ্গত আচরণ করেছি বা অগ্রায় কিছু?”

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্মলা বলিল, “আপনি কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।

যামিনী নির্মলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “অল্প কেউ হ’লে এইটুকুতেই বুঝত। আপনি ব’লেই পারছেন না। কিন্তু আমিও আর সন্দেহ করব না, আরও স্পষ্ট ক’রে বলছি। ধরুন, আপনার বাবার সামনে আপনার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করি সকল সময়েই আমার তাই করা উচিত। কিন্তু আমি তা পারিনি। আপনি যখন একলা থাকেন তখন আমার ইচ্ছে করে শুধু আপনার দিকেই একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। আর তাই থাকিও। আরও অনেক কিছুই ইচ্ছে করে, অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ ক’রে নিই। কিন্তু আপনার বাবার হুমুখে আপনাকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখিনি। তাই, যদি মনে করেন কোথাও কোনখানে আমার অগ্রায় হচ্ছে তাহলে আমাকে সাবধান ক’রে দিন। আপনার উপর কোন দিক থেকে এতটুকু অগ্রায় করব তা আমি ভাবতেও পারিনি।”

নির্মলা বিম্বা হইয়া যামিনীর দিকে চাহিল। আলমারীর পাল্লাটা তখনও খোলা, কালো চুলে তাহার মুখখানি অর্ধ আবৃত। কি একটা অজানা ভয়ে তাহার গলাটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। তারপরই আর একটু স্পষ্ট করিয়া সে বলিল, “আপনার কথা আমি এখনও খুব স্পষ্ট ক’রে বুঝতে পারছি নে। কি হয়েছে বলুন তা! আপনি যে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন তা অপরেও লক্ষ্য করেছে।”

যামিনীর মনে হইল নির্মলা এমন সহজ গতিতে কুঠাখীন ভাবে কথা বলিতেছে, যেন এ আর কাহারও কথা। অত

কেহ অপর কাহাকেও বলিতেছে। কিন্তু যামিনী ভিতরে ভিতরে লক্ষ্য করিতে হইয়া যাইতেছিল। তথাপি একটা কৌতূহলমিশ্রিত উত্তরও তাহার মনকে নাড়া দিতেছিল। শ্রদ্ধাকণ্ঠে কহিল, “কে দেখেছে? বলুন।”

নিজের সম্বন্ধে আলোচনার লজ্জাবোধ করিয়াও নির্মলা বলিল, “সে-দিন আমার বৌদি এই ধরণের কি বলছিলেন। আমাকে টিপ্পন পরতে অনুরোধ করছিলেন আপনি দেখে খুশী হবেন বলে। আমি তাঁকে বললুম, আপনি কি সর্বদাই আমার মুখের পানে চেয়ে অত লক্ষ্য করে দেখেন আমি কি পরেছি বা না-পরেছি? আমাকে এত করে দেখবার কি যে মানে বুঝতে পারছি না।”

নির্মলা মনটা ভিতরে ভিতরে একটু খুশী হইয়াছিল, কিন্তু তবু কারণটা ঠিক সে ধরিতে পারিতেছিল না।

“এর মানে যে কি হ’তে পারে তা কি সত্যি তুমি বুঝতে পার না? তুমি কি বুঝবে না.....” যামিনী হঠাৎ অত্যন্ত আবেগপূর্ণে কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত ঘরে ঢুকিতেছেন। আলমারীর পাল্লাটা খুলিয়া রাখিয়াই নির্মলা বিমনাচিতে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে হাওয়ার দর্শনযোগ্য হইলেও যামিনীর এতখানি বিচলিত হইবার কারণ কি জ্ঞাত হইল ভাবিয়া নির্মলা বিস্মিত হইতেছিল। স্বন্দর জিনিষ দেখিয়া সে নিজে ত কখনও এমন করে না। আনন্দ ও ভয়মিশ্রিত অনেকা একটা কি অল্পভূতি নির্মলার হৃদয়-দ্বারে আসিয়া উকি দিতে লাগিল। যামিনী চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তবাবু তাহার কোন ভাবান্তর লক্ষ্যের মধ্যেই না আনিয়া কহিলেন, “যামিনী, আমাদের নির্মলের সেই মীনাকরা রিটগ্লাসটা দেখেছ? সেই যে ম্যাজিষ্ট্রেটের জী বাড়িতে গিয়ে তার নাম করে তাদের কলেজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নির্মলের সেক্সপীয়রের আবৃত্তি শুনে তিনি এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাকে তার উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়নি বলে মনটা তাঁর খুঁৎ খুঁৎ করছিল। তাই তাড়াতাড়ি নিজের হাতের বাড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেখবে?...এই আলমারীতেই সেইটে আছে।”

যামিনী বাড়ি দেখিবার ওস্তাদ কিন্তু কৌতূহল না দেখাইয়া কহিল, “আচ্ছা, চন্দ্রকান্ত বাবু, একটা কথা আপনাকে বলব?”

“কি কথা? রোলো আগে বাড়িটা বার করি। কোথায় রাখলুম ঠিক মনে পড়েছে না। নির্মল, ...নির্মলা—”

“থাক, তাঁকে আর ডাকবেন না। তাঁর সম্বন্ধেই কথা, তাঁর অল্পস্বস্থিতিতেই বলতে চাই। আচ্ছা চন্দ্রকান্ত বাবু, সত্যি করে স্বীকার করুন, পাত্র-হিসাবে আমাকে আপনি কেমন মনে করেন?”

“পাত্র!” চন্দ্রকান্ত তখনও বাড়ির খাপটা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, একটু আশ্চর্য্য হইয়া যামিনীর দিকে চাহিলেন। পাত্র সম্বন্ধে কোন কথা যে ভাবা-তাহার প্রয়োজন আছে, আশ্রয় পথান্ত তাহা তাঁহার মনে পড়ে নাই।

“ধরুন আমি যদি নির্মলাকে বিয়ে করতে চাই, আপনি কি তাতে রাগ করবেন?...আপনার কি কোন রকম আপত্তি আছে?”

চন্দ্রকান্ত কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, “নির্মলের বিয়ে! সে-কথা তো এখনও আমি কিছু ভাবিনি।”

যামিনী গভীর ভাবে কহিলেন, “এইবারে ভাবা উচিত।”

চন্দ্রকান্ত তাহার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে অপ্রস্তুতের মত কহিলেন, “ভাবব বইকি। নিশ্চয় ভাবব। ওর বয়স কত হ’ল, এই তুমিই হিসেব করে দেখ না, উনিশ-শো তের সালে জন্ম, এখন আঠারো হ’ল। তাই তো এসব কথা এতদিন খেয়াল করিনি।”

আরও অনেকেই তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সহসা হুপ্তোচ্ছিতের মত যামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আচ্ছা যামিনী, নির্মলার বিয়ের পর আমি তাকে দেখতে পাব ত?”

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া যামিনীর মনটা আর্দ্র হইল। কিন্তু তাহার পরেই তাহার রাগ হইল, নির্মলার বিবাহের কথা উঠিতেই প্রথম প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগিল তাহার স্বপ্ন বা কল্যাণ কামনা নয়, কেবল এখনকার মত তখনও তিনি সর্বদা তাহাকে চোখে দেখিতে পাইবেন কি-না। সে বলিল, “আমার বাবা পশ্চিমের উকীল, আর আমাদের বাড়িও সেখানে। কিন্তু আপনার স্বপ্নই দেখবার ইচ্ছে হবে তাঁকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আপনি সাধারণের চেয়ে এত অল্প রকম চন্দ্রকান্তবাবু! বার সলে মেয়ের বিয়ে দেবেন তাঁর অবস্থা জাতি ভাল—এ সফল

বিচার না করে প্রথম ভাবনা আপনার বিয়ের পরেও তাঁকে দেখতে পাবেন কি-না ?”

চন্দ্রকান্ত নিম্নত্ব হইয়া অন্তমনে বসিয়াছিলেন ; এখন ধীরে ধীরে কহিলেন, “কিন্তু যামিনী, তোমার বিয়ে তোমার বাবা স্থির করবেন। তাঁর যাকে পছন্দ হবে—”

যামিনী উত্তেজিত হইয়া কহিল, “কথনো না। আমার বাবা বিয়ে করবেন না। করব আমি।”

চন্দ্রকান্ত তথাপি মৌন হইয়া রহিলেন।

যামিনী পুনশ্চ কহিল, “তাদের মত করাবার তাঁর আমার। কিন্তু তাঁরা যদি সম্মতি দেন তাহলে বলুন আপনার আপত্তি করবার কিছু নাই।”

চন্দ্রকান্তের মুখ হইতে অস্ট্র স্বরে বাহির হইল, “আমার আর কিসের আপত্তি। নির্মলার বিয়ে হবে সে তো ভাল কথা, গৃহের কথা।”

৮

যামিনীর স্বভাবের গতিশীলতা এমন দ্রুত তাহাকে চালনা করে যে, সে যখন যাহা কামনা করে সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে যতক্ষণ না আপনার করায়ত্ত করিয়া তোলে ততক্ষণ এক নিমেষের অশ্রুও ধামিতে পারে না। অনেক সময় এমনও হয় তাহার একাগ্র বাসনাটাই তাহার কাছে সর্বব্যাপী হইয়া উঠে। যাহাকে পাইবার জন্য এত দুর্দ্দম আকাজ্ঞা সেই আসল বস্তুটাই তখন চেষ্টার উগ্রতার কণ্ঠের জালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিবার ঘো হয়।

নির্মলার ঈষৎ-উদ্ভিন্ন যৌবনের উপর স্নিগ্ধতার, অপরিসীম শুভ্রতার সে কী অনির্বচনীয় জ্যোতি আসিয়া পড়িয়াছিল। সে রূপ পুরুষের মনকে আচ্ছন্ন করে না, নেশার মাতাল করে না, কিন্তু সমস্ত মন অধীর হইয়া উঠে ঐ শুভ্র অচঞ্চল মনের অন্তরালে কী আছে দেখিবার জন্য। হৃদয় লোভাতুর হইয়া উঠে ঐ অনাহত মনে প্রথম বীণার তারটি বকত করিয়া তুলিতে, ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে প্রথম প্রেমের ভারতুর ছায়া ঘনাইয়া তুলিতে।

যামিনী ক্ষিপ্তগতিতে সমস্ত ঠিক করিয়া আনিল। তাহার বড়দাদা নির্মলাকে পূজার ছুটির পরে দেখিতে আসিলেন এবং পছন্দও করিয়া গেলেন। টাকার কথা

তুলিতেই চন্দ্রকান্ত ছল ছল চক্ষে কহিলেন, “আমার মেয়েটি যদি স্বধী হয়, তবে আমার যাহা কিছু আছে তাহাকে দিব।”

বিবাহের ব্যবসাদারী পণ কষাকষির অবজ্ঞা ইহা রীতি নয়। কিন্তু চন্দ্রকান্ত যেমন স্বরে এবং যেমন বাস্পাঙ্গ চোখে কথা বলিলেন, তাহাতে তাহার কথার আন্তরিকতা সখ্যে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। তাহার উপর তাহার পৈতৃক বাড়িটি তেতলা, বেশ বড়। আর নির্মলা যখন যামিনীর দাদার সম্মুখে বসিয়া সেতার বাজাইল তখন অদূরে তাহার ভূতপূর্ব ওস্তাদ বসিয়াছিলেন। তিনি মাথা নাড়িয়া দু-একটা বিভ্রান্তমূঢ়ক কথা বলিলেন এবং ছাত্রীর বিস্তারিত সূচনাতি করিলেন। যামিনীর দাদা বুকিলেন যিনি মেয়েকে বেখুন কলেজে পড়াইতেছেন এবং পদ্মা বরচ করিয়া গান-বাজনা শিখাইয়াছেন তাঁর অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল। তা ছাড়া আজকালকার এ রীতিটাও তিনি জানিতেন, যেখানে কস্তাপক্ষের অবস্থা বেশ ভাল সেখানে হুস্পষ্ট ভাষায় দাবির পরিমাণ জানাইয়া দেওয়ার চেয়ে যদি বলা যায়, “আপনার সাধ্যমত আপনি দিবেন। আপনারাই মেয়ে, তাহাকে যাহা দিতে চান সে আপনারই বিবেচনার উপর নির্ভর করে”, তাহা হইলে ঢের ভাল ফল হয়।’ অতএব তিনিও তাহাই করিলেন।

যামিনীর দাদা বিনোদবাবু পূজার ছুটিতে কলিকাতায় বাড়ি ভাড়া করিয়া সঙ্গীক আসিয়াছিলেন। মেয়ে দেখিয়া ফিরিয়া ঘাইবার পরের দিন যামিনী দ্বিতলের একটি শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া কহিল, “বৌদি, তারপরে দাদা কী বললেন?”

বৌদি হাসি চাপিয়া মুখ গভীর করিয়া কহিলেন, “মন্দ নয়।”

যামিনীর মুখ গভীর হইয়া উঠিল। বৌদি আড়চোখে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, “আর রাগ করিতে হবে না। না গো তোমার দাদা তা বলেনি। বরঞ্চ বলছিল, ‘মেয়েটি বেশ ভাল। ভায়া যখন আমার কাছে এসে বললে, ওই মেয়েকে ছাড়া সাদা পৃথিবীতে সে আর কাউকে বিয়ে করবে না, তখন আমি মনে করেছিলুম ঘোরালো।’ ক’রে কোথাও প্রেমে পড়ে গেছে বুঝি। কিন্তু যেহেতিকে চোখে দেখার পরে বুঝতে পারলুম—না, এ মুখে এমন একটি শান্ত আভা আর লক্ষ্যী আছে, গারে পড়ে প্রেম

করবার মেয়ে এ নয়।' কেমন ঠাকুরপো এইবারে খুশী তো ?"

যামিনী কথা না বলিয়া নতমুখে ডিবেটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

"কিন্তু ভাই একটা কথা আছে।"

যামিনী উৎসুক ভাবে চাহিল।

"মা ব'লে দিয়েছেন আর সব দিকে যতই ভাল হোক ছ-সাত হাজার টাকার গয়না চাই। তার কমে কিছুতেই রাজী হ'তে পারবেন না। ঠিক এই কথাটাই শুনের সামনাসামনি বলতে তোমার দাদার কেমন সঙ্কোচ লাগল। আভাস দিয়েছেন। তুমি বরঞ্চ স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিয়ে।"

"এত গয়না পরবে কে ?"

"তোমার বো।"

"তোমাদের যত গহনা আছে তার অর্ধেকও কি প'র ?"

"ওমা! তাহলে যে গয়নার ভারে নড়তে চড়তে পারব না। সে-সব কিছুকে তোলা আছে।"

"তাহলেই দেখ মেয়েদের বৃত্তিশক্তি এত কম। যে-সব জিনিষ বারো মাস নিম্নকে তোলা থাকে তাই নিয়ে এত জেনাজেনি। তারই উপর নির্ভর করছে জীবনমরণের ব্যাপার।"

"কেন ?"

"খর চন্দ্রকান্ত বাবু যদি অত টাকার গয়না না দিতে পারেন—"

"তাহলে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে মা কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু কেন? শুনেছি ত যে তাঁর অবস্থা খুব ভাল।"

যামিনী তাড়াতাড়ি কহিল, "না না, সে কথা আমি বলছি নে। তিনি হরত দিতে পারবেন। কোন বিশেষ মেয়ের কথা আমি বলছি নে, কিন্তু মেয়েদের হাতে পড়ে যে-দেরই বিয়ের ব্যাপারটা কেমন নির্ভর অতুতগোছের হয়ে পাড়িয়েছে সাধারণ ভাবে আমি সেই কথারই আলোচনা করছি।"

"মেয়েদের হাত কি ?"

"কেন নিরানন্দইটা কেবলে আমি তো দেখেছি ক'রর মায়ের দাবির পরিমাণই আর মিটেতে চায় না। এত ভরি

চাই, তত ভরি চাই, তার বিরাট কদ্বীপ মুখে মুখে দাখিল হয় অন্তঃপুর থেকেই।"

"কে জানে ভাই অত কথা। মূৰ্খ মেয়েমানুষ, তোমাদের মত কথায় কথায় তো আর তর্কের বান ডাকাতে পারি নে, কিন্তু সোজা কথাটা বেশ বুঝতে পারি। সেটা হচ্ছে এই যে, বিয়ে করতে তুমি পাগল হয়ে উঠেছ।"

"প্রায়।" যামিনী হাসিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

২

সমস্ত ঠিকঠাক হইয়া যাইবার পরে যামিনীর মনটা যেন বসন্তবাতাসে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। আর কোনখানে কোন বাধা নাই। যতদূর দৃষ্টি যায় সচ্ছ বাধাহীন নীলাকাশ ব্যাপিয়া আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। মনের আনন্দে সে বৌদিকে লইয়া থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখাইল। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন, বালির ব্রীজ, দক্ষিণ-পূর্বের গঙ্গার দৃশ্য, এমন কি যাদুঘর চিড়িয়াখানাও বাদ দিল না।

আজ দুপুরবেলায় তাঁহাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাইয়া আনিবে স্থির করিয়া সে ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল।

মোটরে চড়িয়া বৌদি শ্মিতহাস্তে কহিলেন, "ঠাকুরপো যে দেখছি এবারে আমার উপর বড় সদয়। কলকাতায় য কিছু দেখবার সমস্তই দেখালে। কিছুই প্রায় আর বাকী নেই।"

"যা দেখবার তাই এখন দেখনি।"

"কি, ওই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল? তা ভাই যতই বল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লোকে হুখ্যাতি করে বটে, কিন্তু—"

"কে বললে তোমাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল? যা দেখনি তা এখনই দেখবে। অত ব্যস্ত কেন? তখন কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে আসল দেখাটাই ছিল বাকী।"

মোটর ততক্ষণে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের কাছে দাঁড়াইয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে তিনি নির্ঝলাকে দেখিলেন। চন্দ্রকান্তের সঙ্গে সে আসিয়াছে। এইটুকু আরোজন যামিনীর আগে হইতে করিয়া রাখা। বাড়ি ফিরিবার সময় বৌদি হাসিয়া কহিলেন, "যা দেখবার তা তো দেখলুম। কিন্তু ভাই ঠাকুরপো, তোমার ভাবনা

যেন একেবারে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। মাটিতে আর পা পড়ছে না।

যামিনী হাসিয়া চুপ করিল।

ইহারই দিন দুই পরে দাদা ও বৌদিকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে গিয়া ফিরিবার পথে ট্রামে আশুবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তিনি চন্দ্রকান্তবাবুর একজন বন্ধু, সাধ্যা আড্ডাতে প্রায়ই হাজির থাকেন। তিনি যামিনীর সঙ্গে নির্দলার বিবাহের কথা শুনিয়াছিলেন। পাত্রী-পক্ষকে যে কোন চেষ্টাই করিতে হয় নাই, যামিনী নিজে উদ্যোগী হইয়া সমস্ত করিয়াছে, বিবাহে পণ লাগিবে না, এসমস্ত কথাই তিনি জানিতেন। ইহাতে মনে তাঁহার একটু সঁধ্যার সঞ্চার হইয়াছিল। মেয়ে তো তাঁহারও আছে, তাহারাও বিবাহযোগ্য, কিন্তু কই তাঁহার বেলায় তো ঠিক এতখানি স্বেচছা যাচিয়া ধরা দেয় না। যামিনীকে দেখিয়া এখার-ওখার দু-পাঁচটা গল্পের পরে তিনি বলিলেন, “আর শুনেচ চন্দ্রের ব্যাপারটা?”

“কী?”

“সে তো বলতে গেলে অনেক কথা। এই যে হারিসন রোডের মোড়েই আমার বাড়ি। চল না এক পেয়লা চা খেয়ে আসবে। (হাতে রিট-ওমারের দিকে চাহিয়া) চারটে কুড়ি। তোমার চা খাওয়ার সময়ও বোধ হয় হ’ল। কোথায় গিয়েছিলে? ..ও, দাদা বৌদি বুঝি পূজার ছুটিতে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলেন। আজ দেশে ফিরে গেলেন, তাই ঠেগনে রাখতে গেছিলে। তা বেশ ভাল। নাওবে?”

তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া যামিনী নামিয়া আশুবাবুর বৈঠকখানায় বসিল। ভূত্বা চা দিয়া গেল। তখন চা-রসের সহিত মিশাইয়া মিশাইয়া স্বদীর্ঘ কৃত্রিমকার জালে গাঁথিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “এই যে সেদিন চন্দ্র কট করে আমার কাছে হাজার তিনেক টাকা ধার চেয়ে বসলো। মেয়ের বিয়ে। আমি তো বলি লোকটার মাথায় ছিট আছে। ভিতরের কথা জানতে আমার কিছু বাকী নেই।”

যামিনী বাধা দিয়া পাশ্চাত্যে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, তাঁর অবস্থা কি ভাল নয়?”

“কোথায় ভাল। সে ওই বাইরে থেকেই দেখতে। বললুম তো লোকটা ওই রকম অ্যাপার্টে-গোছের। বা সন্ধ্যা

ছিল কুলিয়ে-গুছিয়ে রেখে-ঢেকে চলতে পারলে তাতেই কি চলত না? কিন্তু চাল বেশী। দেশার খরচ করবে। গেরস্তর ঘরে মেয়েকে টাকা খরচ করে পান-বাজনা সেখান, কলেজে পড়ান, এ-সব চাল দেবারই বা দরকার কি?”

যামিনী তাঁহার রসাইয়া-তোলা আলোচনার মাঝে আবার বাধা দিয়া কহিল, “আপনি টাকাটা তাঁকে ধার দিলেন?”

“স্কেপেচ! আমি কোথা পাব টাকা? লোকে বাড়িরে বলে বটে বড়লোক, হেন তেন কত কি। কিন্তু লোকে কী না বলে, লোকের কথায় কান দিতে গেলে চলে না। আমার নিজের মেয়েও তো রয়েছে। তাদের বিয়ে দেবার কথাও ভাবতে হবে।”

“তাঁর কি টাকা-কড়ি একেবারেই নেই?”

“তবে তোমাকে খুলেই বলি ভিতরের কথাটা। কোম্পানীর কাগজগুলো তো সবই গেছে। হাজার দুই টাকার অবশিষ্ট ছিল। সে-টাকাটাও গত বছর সিমলা গিয়ে অর্ধেক উড়িয়ে এসেছে। সংসার কি করে চালায় জানিনে। শুনেতে পাই ছেলেগুলো চুশানি করে পড়ার খরচ চালায়। পৈতৃক বাড়ি রয়েছে, কলকাতায় বাড়িভাড়া লাগে না এই যা রক্ষে। এই অবস্থা নিয়েও চালবাজী করতে ছাড়েন না। ব্যাক থেকে টাকা বের করেও মেয়েকে কলেজে পড়ান চাই। আমি টাকা ধার দেব, বল কি বাবাজী! আমি বরঞ্চ পরামর্শ দিয়েছি, যেমন অবস্থা তেমন চল। টাকা ধার করে মেয়েকে গয়না দিতে হবে না। কেন তোমরা তো কোন পণ নিচ্ছ না। তোমার দাদা তো বলেই গেছেন, যেমন অবস্থা সাধ্যমত দেবেন। আমরাই ফাঁকে পড়ে গেলার ভায়া। তোমাদের মত একটা পাত্রটাজ দেখে দাও কষ্ট করে।”

যামিনী কিছু অভ্যস্ততা করিয়া আশুবাবুর কথার মাঝ-খানাই ঝড়ের বেগে সেখান হইতে চলিয়া গিয়া একেবারে রাস্তার আসিয়া পড়িল।

তাঁহার চক্ষুপ্রান্ত সজল হইয়া আসিতেছিল। নির্দলার মান-অপমানের জন্ত এখন হইতেই সে যেন নিজেকে দারী মনে-করিতেছিল। কুক চিত্তে ভাবিতেছিল, লক্ষীর পায়ের আলিঙ্গনরাসের জন্তও আবার চিন্তা করিতে হয়, ছুটিতে হয় বাহু ব্যবসাচারের কাছে টাকা ধার করিতে! সেই রাজিতেই সে মনে মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া গেল। সে

ছোট ছেলে বলিয়া মায়ের অতিশয় আদরের ছিল। মা যখন বাহা কিছু টাকা নিয়ে হইতে জমাইতেন, যামিনীর নামেই তাহা জমাইতেন। বছর আড়াই আগে এমনি তাহার নামে একটা পোষ্টাল সার্টিফিকেট কিনিয়াছিলেন। সেটা হুদে আসলে এখন প্রায় হাজার-দশেক লাড়াইয়াছে। টাকাটার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন বাহির করিয়া লইতে হইবে কিংবা আবার নতুন করিয়া জমা দিতে হইবে। কালই সে জননীর নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে টাকার আবার আড়াই বছরের সর্ব্ব জমা দিতে। যামিনীর পিতা পশ্চিমের বিখ্যাত একজন উকীল। অত্যন্ত ধনবান। তাহার নিজের

নামে জমান টাকা ছাড়াও তাহার জীর হাতে দশ-পাঁচ হাজার টাকা এমন প্রায়ই থাকিত।

পরদিন সকালে উঠিয়াই যামিনী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে গেল এবং টাকার নতুন করিয়া জমা দিবার পরিবর্তে উঠাইয়া লইয়া আসিল। উঠাইয়া লইয়া সারা সকাল ধরিয়া জহরলাল পান্নালালের দোকান, বেঙ্গল স্টোঁস এবং বড় বড় জুয়েলারির দোকানগুলার ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জিনিষ যা কিনিল তাহাতে একটা ট্যান্ডি বোঝাই হইয়া যায়।

ক্রমশঃ

মাস্ত্রাজ শিল্প-প্রদর্শনী

গত মার্চ মাসে মাস্ত্রাজ গভর্ণমেন্ট আর্ট-স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। রঞ্জিত চিত্র, রেখাচিত্র, এবং মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাবৎ পদার্থে গঠিত মৃত্তি, এই তিন প্রকারের সর্ব্বসমেত ২২৪টি চিত্র ও মৃত্তি প্রদর্শিত হয়। প্রদত্ত চিত্রগুলি হইতে বিদ্যালয়ে কিরূপ উচ্চাঙ্গের শিল্পশীলন-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এই বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল।

বর্ণ-বৈচিত্র্য ও অঙ্কন-পারিপাট্যে শ্রীযুক্ত ভেক্টরথনু অঙ্কিত 'পৃথ্বীরাজ' চিত্রখানি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভেক্টরনারায়ণ মৃত্তিকা-ভাস্কর্যে যে 'রাসলীলা'র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন

তাহাতে এক নিপুণ রূপদক্ষ শিল্পীর তুলিকাপাতে লীলায়িত মাধুর্য্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত কুশা রাওয়ের 'অভিলারিকা'র ভাব-সম্পদ ও বর্ণ-মাধুর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার 'মাহুয়ের মাথা' শীর্ষক চিত্রখানি প্রশংসার যোগ্য। সৈয়দ হামেদের 'ভবিষ্যৎকাল' চিত্রখানিতে মুসলমান ভাবধারা পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এস. ভি. এস. রামা রাওয়ের সম্পূর্ণ নতুন ধরণের দৃশ্য-চিত্র 'গোধূলি আলো'র কবিত্বসম্পদ অতুলনীয়।

পরবর্ষে মাস্ত্রাজ গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের শিল্পপ্রদর্শনী যে অল্পরূপ সাক্ষ্য লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।



জ. ক্যামেরা
সৈয়দ হা. মিন

অভিসারিকা
পি, ভি, কুমারগু

মাদ্রাসের মাথা (উদ্-কাট)
পি, ভি, কুমারগু





গোধুলির আলো
এম, ডি, এস, রামারাও



পৃথীরাজ ও সখুজা
এম, ভেকটরখন্



রাসলীলা
ভেকটরখন্



ঐতিহাস



চিত্রে মার্টিন লুথার—

খৃষ্টাব্দের দুইটি প্রধান শাখা—রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট। প্রোটেস্ট্যান্ট শাখার প্রবর্তক মার্টিন লুথার (১৪৮৩—১৫৪৬)। লুথার জার্মানির অধিবাসী। তিনি তৎকালীন হিট্টেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে প্রচলিত ধর্মের প্রতি বীতরাগ হইয়া এক নূতন ধর্ম প্রচার করেন। খৃষ্টান-জগতের অধিনায়ক পোপের কতৃৎ অধীকার করার জন্য তাঁহার প্রচলিত মতবাদের নাম হইল প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম। সে-সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহের রাজারাও ছিলেন প্রধানতঃ পোপের অনুবর্তী। এই হেতু রাজপুরুষগণের হস্তে লুথারকে কম নিষাতিত হইতে হয় নাই। তাঁহার জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাসম্বলিত করেকটি চিত্র এখানে দেওয়া হইল।



মার্টিন লুথার।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি



স্মারনিতে মার্টিন লুথার ও পুলিস





পাঠশালার মাটিন লুথার

দীর্ঘলেজবিশিষ্ট মোরগ—

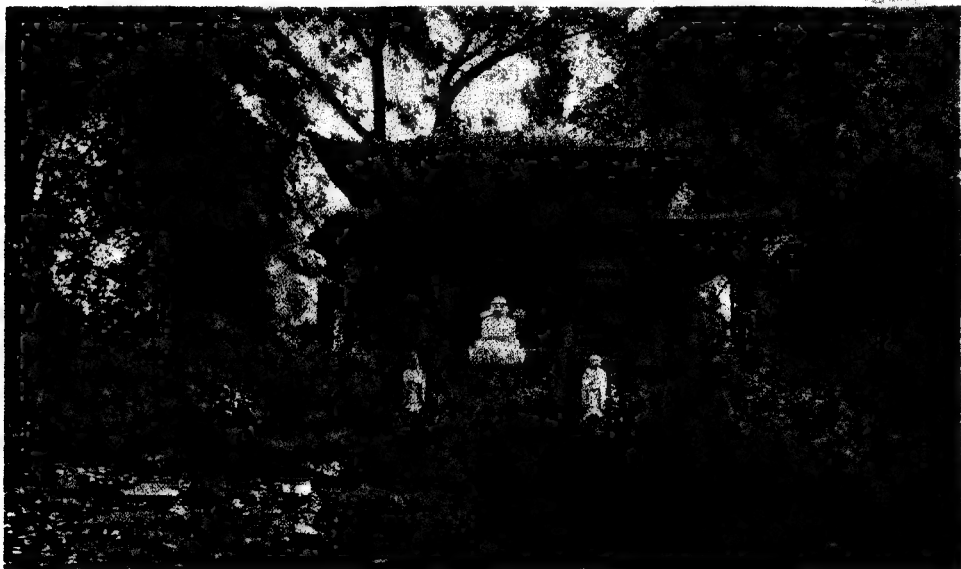
চিহ্নে দীর্ঘ লেজ বিশিষ্ট একট মোরগ দেখা যাইবে। জাপানের ওশিমো-মুরা নামক স্থানে এই মোরগ পাওয়া যায়। ইহার লেজ জাবিশ খুঁট পুয়াস্ত দীর্ঘ হয়। মুরগীর কিন্তু এরকম লেজ থাকে না। যে মোরগের লেজ মত দীর্ঘ তাহার মূল্যও তত বেশী। দীর্ঘতম লেজবিশিষ্ট মোরগের মূল্য চার-পাঁচ হাজার টাকা!

জাপানের আদর্শ উদ্ভান-রচনা—

জাপানীরা সৌন্দর্যের পুজারী। তাহারা যে-সব জিনিষ তৈয়ার করে, তাহাদের নিপুণহস্তে তাহা অক্ষর হইয়া উঠে। তাকুবা, হাপতা, চাক ও কার শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের নৈপুণ্য সকলেরই জানা। জাপানীরা ফুল ভালবাসে, তাই ইহার জন্মভূমি উদ্ভান রচনাতেও তাহাদের অভূত কৃতিত্ব। উদ্ভানে তরু-শস্তা কৃষ্ণবন ও থাকিবেই, উপরন্তু হাপতা তাকুবা ও কার শিল্পের দান। নিদর্শনও ইহাতে স্থান পাইয়া থাকে। এই সকল জিনিষের বর্ণ তরু-শস্তারই মত। এই-সব কারণে জাপানের উদ্ভান বিদেশীর নিকট বড়ই দৃষ্টির লাগে। আবার বড় বড় উদ্ভানের মত সেখানে ছোট ছোট উদ্ভানও রচিত হইয়া থাকে। এই সকল উদ্ভান যে আয়তনে ছোট তাহা নহে, বড় উদ্ভানদের গাছপালা বেঙ্গণ বড়, ছোট উদ্ভানের গাছপালাও সেই আয়তনে ছোট হয়। শিল্পকলার বিশেষত্ব এইরূপ ছোট করিয়া তৈরি। জাপানের উদ্ভান-রচনা এইরূপেই চমৎকার।



দীর্ঘলেজবিশিষ্ট মোরগ



জাপানের রাইসিয়াও জাপানের আদর্শে রচিত উদ্যান

প্রতীচা প্রাচীর অঙ্করণ করে ইহা স্তম্ভিত অভিনব। কিন্তু জাপানের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা প্রতীচাকে হার মানাইয়াছে। ইরানী প্রতীচা জাপানের আদর্শে উদ্যান রচিত হইতেছে। জাপানীর রাইনক্যাণ্ডে ভট্টর ডুইলবার্গ এইরূপ উদ্যান রচনা করিয়াছেন। তিনি সেখানকার একটি বৃহৎ কারখানার পরিচালক। তিনি জাপানে গমন করিয়া সেখানকার উদ্যান-রচনা-কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। উদ্যানের তরু-লতা, ঘর-বাড়ি, তথাগতের মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পত্রয়ের সংস্থান ঠিক যেন জাপান উদ্যানের মত।

আফ্রিকার হাউসা জাতি—

হাউসারা আফ্রিকার আধুনিক অধিবাসী। হনানের পশ্চিমে নাইগেরিয়া প্রভৃতি প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত স্থান তাহাদের আবাসভূমি। হাউসারা মধ্যযুগে খুবই উন্নত ছিল। তাহারা দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহারা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিল। পরে ১৮১০ সনে বৃহলমানদের অধীন হয়।

হাউসারা সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। তাহারা কৃষিকার্য, একারণ অনেকে তাহাদিগকে কাক্রী বলিয়া ভ্রম করে। বস্তুতঃ তাহারা কাক্রী



হাউসা আনোরদের রাজপ্রাসাদের সমুদয় তোরণ



দীর্ঘকার বলিষ্ঠ হাউসা। হাউসারা দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফুট

নহে। প্রাচীন 'ফ্লা' ও আরব জাতির সন্নিহনে ইহাদের উৎপত্তি। হাউসারা শক্তিতে ও বুদ্ধিমত্তায় কাক্রোদের অপেক্ষা উন্নত। দেড় কি দুই মণ জিনিষ লইয়া তাহারা হামেশা চলাফেরা করে ও একদিনের পথ পথান্ত ঘাটতে পারে। তাহারা পরিশ্রমী। মধ্য-আফ্রিকার উষ্ণতার মধ্যেও তাহাদের কাথো বিরতি নাই। কৃষি ও শিল্পই তাহাদের জীবিকা। বস্ত্র-বয়নে ও বস্ত্র-রপনে এবং মাছের, চামড়ার দ্রব্য ও কাচ প্রভৃতি তাহারা হুনিপুণ। নাগোস, টিউনিস, টিপলি, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানে তাহাদিগকে এখনও বাবনা করিতে দেখা যায়।

হাউসাদের আচারও বেশ সমৃদ্ধ। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থায় চলিত আছে তাহাদের মধ্যে হাউসা ভাষায় সর্ব-প্রথম পুস্তক লিখিত হয়। এই ভাষায় শব্দ-সংখ্যা দশ হাজার। দিনের বিভিন্ন অংশের আটটি নাম। এই শব্দের এক-তৃতীয়াংশ আরবী শব্দ হইতে উৎপন্ন। কবিতা ও রাষ্ট্রীয় বিষয়মূলক



হাউসা ও কুকসার যুগ

কয়েকখানি পুস্তকের বক্তাংশ পাওয়া গিয়াছে। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে হাউসারা শিক্ষায়ও বেশ অগ্রসর। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া পাঠশালা আছে। হাউসাদের এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী, এক-তৃতীয়াংশ খ্রীষ্টপন্থক ও অবশিষ্ট দোকেরা একরূপ কোন ধর্মই মানেন না।

হাউসারা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান এবং নিয়ম মানিয়া চলে। তাহারা এখন ইংরেজের প্রভাবে আসিয়াছে। পুলিশ ও সামরিক কাথো তাহারা অত্যন্ত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।



শ্রীমতী পোলা নেত্রী ও শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর—

ভারতীয় নৃত্য উদয়শঙ্কর বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভারতবর্ষে ও ইউরোপের নানা দেশে নৃত্য করিয়া তিনি জনসমাজের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছেন। উদয়শঙ্কর এখন আমেরিকায় নানা প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চে নৃত্যকলা দেখাইতেছেন। শ্রীমতী পোলা নেত্রী চলচ্চিত্রে এক জন বিখ্যাত অভিনেত্রী। নিউইয়র্কে উদয়শঙ্করের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তৎপরে গোট জেমস্ রঙ্গমঞ্চে উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। উদয়শঙ্করের নৃত্য শেষ হইলে শ্রীমতী পোলা নেত্রীর সহিত নৃত্য দেখকে তাহার আলাপ হয়। শ্রীমতী নেত্রী ভারতবর্ষে আগমন করিবেন—উদয়শঙ্করের নিকট এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। উদয়শঙ্করের নৃত্য সবক্ষেত্রে তিনি বলিয়াছেন, “ইহা বাস্তবিকই দর্শনীয়।”

মহিলা-সংবাদ

হরিদ্বারের গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যজিতের সহধর্মিণী শ্রীমতী চন্দ্রাবতী লখনপাল 'জীর্বে কি স্থিতি' নামক পুস্তক লিখিয়া এলাহাবাদের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন হইতে পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত বৎসরে মহিলারা যে-সকল হিন্দী পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে এখানি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্তা বিমলা সান্যাল কানী-আয়ুর্কেন্দ-সম্মিলনীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'আয়ুর্কেন্দ-শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। তিনি সেখানকার সরকারী হাসপাতাল ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্কেন্দ-বিভাগে প্রায় তিন বৎসর কাল ষাণ্ডী-বিদ্যা শিক্ষা করেন। উদয়-পুরের মহারাণাশ্য পারিবারিক চিকিৎসক হিসাবে ও কানীর আয়ুর্কেন্দ হাসপাতালে মহিলা কবিরাজ রূপে কিছুকাল কার্য করিয়া শান্তিপুত্র অটলবিহারী মৈত্র দাতব্য আয়ুর্কেন্দ চিকিৎসা-লয়ের ভার প্রাপ্ত হন। সস্ত্রাতি তিনি স্বাধীনভাবে কলিকাতার চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি মহিলা ছাত্রীদের আয়ুর্কেন্দ পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্তা বিমলা সান্যালের উন্নতি কামনা করি।



শ্রীমতী চন্দ্রাবতী লখনপাল

কাঠ-খোদাই শিল্প

বাংলা দেশে ললিতকলার সবজাগরণের সময় চিত্রাঙ্কন বিষয়ে অনেক নূতন এবং কিছু পুরাতন পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং সংস্কার আরম্ভ হয়। উদ্-কাট (কাঠ-খোদাই) রীতিতে চিত্রাঙ্কন এক সময়ে জনপ্রিয়তা ছিল। আপানী উদ্-কাটের দৃশ্য রেখাপাত এবং বর্ণসংযোগ এখনও ললিতকলাক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বহ ও তাঁহার কৃতী ছাত্র শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চন্দ্রবর্তী এই রীতির নূতন সংস্কার ও অজ্ঞান বিষয়ে গুরুপ্রদর্শক। এই



কশিবাঘরের পরিচয় প্রবাসীর পাঠকদিগের নিকট দেওয়া নিম্নরোজন।

রমেন্দ্রবাহু কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট-স্কুলে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিতেছেন। এই সংখ্যার ঊর্ধ্বার এক ছাত্র শ্রীমান নরেন্দ্রকেশরী রায়ের শিল্প-কোর্সের পরিচয় আমরা দিতেছি। শ্রীমান নরেন্দ্রের হস্তলেখে আলো-ছায়ার বিস্তার এবং রেখাপাতের সৌন্দর্য বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইঁহার কার্য সমাধির পাইবে আশা করা যায়।

ক. চ.

রাধাপুত-নারী
শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়

“মত্তময়ূর” শৈব সন্ন্যাসী

রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় সপ্ত বৎসর পূর্বে মালব ও মহারাষ্ট্র দেশে এক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ছিল, যাহার নাম আজ লোকমুখের বাহিরে চক্ষিয়া গিয়াছে। ঐ সম্প্রদায়ের নাম ছিল “মত্তময়ূর”। নয় শত বৎসর পূর্বে জবলপুর অঞ্চলের হৈহয়-বংশীয় রাজগণ ঐ সম্প্রদায়ের তিন-চার জন সন্ন্যাসীকে নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং উহাদের জন্ত কয়েকটি বিশাল মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ মঠগুলির মধ্যে রেওয়া রাজ্যে দুইটি এবং জবলপুর জেলায় দুইটি এখনও বর্তমান। বহু গ্রাম ও বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ঐ সম্প্রদায়কে দেবোত্তররূপে দান করা হয় এবং ত্রিপুরী রাজ্যের হৈহয়-বংশের রাজত্ব কালের শেষ পধ্যস্ত এই সন্ন্যাসীদিগের বিলম্ব প্রভাব ছিল।

ঐ মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের নামের উল্লেখ সর্বপ্রথমে দক্ষিণা-পথের শিলাহার-বংশীয় রাজা রত্নরাজের তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। বোধাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার খারপটন গ্রামে প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে চারটি তাম্রপত্র পাওয়া যায়। ঐ পত্রগুলির পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে, ২৩০ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমার দিন শিলাহার রাজপুত্র বংশের মাণ্ডলিক রত্নরাজ, মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের কর্করোগী শাখার বায়-সংস্থানের জন্ত তিনটি গ্রাম দান করেন। ঐ দিন খ্রীষ্টীয় ১০০৮ সালের ২২শে মে। মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের পৌরাণিক উৎপত্তি কাহিনীতে কথিত আছে, যে, ভগবান শিব কৈলাসপর্বতে আপন গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। সেই সময় কাঙ্ক্ষিকের বাহন ময়ূর যদি কখনও প্রসন্ন হইয়া কেকা রব করিত তখন ঐ গণসমষ্টি মধ্যে কয়েক জন মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। কেকা রবে দুইটি মাত্র বর আছে—বড়জ ও কোমল অমৃত। ঐ গণলোক কেবল মাত্র ঐ দুইটি আশ্রয় করিয়া নৃত্য করিতেন, যদিও নৃত্যকলা অমুসায়ে উহা অসম্ভব হইয়া যাপার। কথিত আছে যে, ভগবান শিব তাঁহার অমৃতচরদিগের ঐ নৃত্যে প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বর দান

করেন—“তোমরা পৃথিবীতে যাও এবং সেখানে জয়প্রাপ্ত করিয়া মত্তময়ূর নামে প্রসিদ্ধ হও। অষ্টবিশতি শিরতর মধ্যে তোমাদের গণনা হইবে।” কথিত আছে যে, ঐ শিব-গণই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

কোন সময়ে মত্তময়ূর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দক্ষিণ হইতে মালব দেশে আগমন করেন। তাহার অন্তর্গত গোয়ালিন্দরে উপেন্দ্রপুর ও রাণোড় নামক দুইটি স্থানে ইহাদের বড় বড় মঠ বিদ্যমান আছে। রাণোড় মঠের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইহাদের গুরুপরম্পরা ইতিহাস পরে পরে লিখিত হইত। মালবের মত্তময়ূর সম্প্রদায়ে কদম-জাহাবাসী নামক মোহন্তই সর্বপ্রথমে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। উহার পর শঙ্করাচার্যপতি এবং তাঁহার পর তিরবি-পাল রাণোড় মঠের মোহন্ত পদ পাইয়াছিলেন। জবলপুরের চৌষটি বোগিনী মন্দিরের শিলালেখ অনুসারে “তিরবি” দাদশভূজা দুর্গা বা মহিষমর্দিনীর নাম। তিরবিপালের শিষ্য আমরিক ভীর্থনাথ এবং তাঁহার শিষ্য পুরন্দর ছিলেন। মালবরাজ অবন্তিবর্মা শৈবধর্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্ত পুরন্দরকে মালব দেশে আনয়ন করেন। পুরন্দরের নিকট দীক্ষার পর অবন্তিবর্মা উপেন্দ্রপুরে মঠ স্থাপনা করেন। পুরন্দরের শিষ্য কবচশিব এবং তাঁহার শিষ্য সমাশিব ছিলেন। সমাশিবের শিষ্য জনয়েশের শিষ্য বোমশিবের সময়ে রাণোড় বা রণপত্র-পুরের শিলালিপি খোদিত হয়।

পুরন্দরের অন্য শিষ্য চূড়াশিব (বা শিখাশিব) হৈহয়রাজ চেনিচজের (বা দ্বিতীয় যুবরাজদেব) নিমন্ত্রণে চেনিচরাজ্যে আসেন। শিখাশিব নিজ গোলাকী (বা গুর্গকী) মঠে আসীন হইয়া স্বীয় শিষ্য জনরশিবকে রাজা লক্ষণরাজপ্রদত্ত বিলহরীর মঠে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নন্দী-জলপ্রপাততটস্থ বৈদ্যনাথ মহাদেবের মন্দির ও মঠ এই সন্ন্যাসীদিগের অধিকারে ছিল। শিখাশিবের অন্য শিষ্য প্রভাবশিবের গুরুপরম্পরায় গোলাকী ও বৈদ্যনাথ



সুব্রাহ্মণ্যের কঙ্কর নির্মিত শিবমন্দিরের তোরণদ্বার। এখন ইহা ভগ্ন হইতে আনিয়া রেওরা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছে।

এই দুই মঠ লাভ হয়। ইহার শিষ্যের শিষ্য প্রাচীন হৈহয়-রাজ্যে জিন্টি বৃহৎ প্রাচীন নিৰ্মিত মঠ স্থাপন করেন। ইহার মধ্যে রেওরা-রাজ্যের চক্রেহীর মঠ সৰ্ব-
 পুরাতন। রেওরা নগরের উনিশ মাইল দক্ষিণে শোনি-নগরের তটে ভ্রমরশৈল পর্বতের নিয়ে অতি মনোরম স্থানে এই মঠ ও শিবমন্দির বিদ্যমান। রাণোড়ের মঠের দ্বার চক্রেহীর

মঠও দ্বিতল। ইহার সম্মুখে বারোটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত একটি বারাগু আছে। বারাগুর সম্মুখে প্রস্তর-নির্মিত লম্বা চত্বর আছে যাহা সন্ন্যাসীদের বসিবার জন্য নির্মিত হইয়াছিল। বারাগুর পিছনের দেওয়ালে মোহন্ত প্রবেশ-শিবের শিলালিপিতে জানা যায় যে, তিনি কলচুরি চোদি ৭২৪ সংবতে গুরু প্রশান্তশিব নির্মিত শিবমন্দিরের নিকট এই প্রস্তরের মঠ নির্মাণ করেন। বারাগু হইতে এক প্রবেশপথ ভিতরে যায় এবং উত্তর শেষে এক অঙ্গন আছে। এই অঙ্গনের চারিধারে বারাগু এবং ঐ বারাগুর স্থিত ১২-১৪টি দ্বার মন্দিরের বিভিন্ন কক্ষে বাইবার পথ। ঐ কক্ষগুলি দুই প্রকার, প্রথম দেবগৃহ বা গুরুগৃহ, দ্বিতীয় বাসগৃহ। প্রথম শ্রেণীর কক্ষের দ্বারের উপরের চৌকাঠে এক-একটি বা তিন-তিনটি করিয়া দেবমূর্তি আছে, সন্ন্যাসী-বাসকক্ষের চৌকাঠে ঐরূপ কোনও মূর্তি নাই।

গুরুগৃহের চৌকাঠে জটাজুট কোণীনধারী গুরুদেবের মূর্তি আছে। দেবগৃহের চৌকাঠের মূর্তির মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি, হৃদা, ক্রত, বিরূপাক্ষ, নটেশ ও অম্মাভ দেবমূর্তি দেখা যায়, তবে সকল মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।



যুবরাজদেবের রাজকালের হরগৌরী-মূর্তি। উচ্চতা ১২ ফুট



বিশহরি গ্রামে অক্ষয়নাথের ভায়ে প্রশান্তশিব-কর্তৃক নির্মিত শিবমন্দির (খৃঃ সন ১৭১১) এখান ইহা 'কামকন্দলা নদীর মন্দির' নামে খ্যাত

অঙ্গনের দক্ষিণ পার্শ্বে এক বিরাট কক্ষে চারটি ছোট ছোট সমাধিগৃহ আছে। ঐগুলিতে একটি করিয়া দ্বার আছে, কিন্তু জানালা বা অস্ত্র পথ নাই।

মঠের বর্তমান অবস্থায় বুঝা যায় না যে, দ্বিতলে বাইবার পথ কি ছিল। দ্বিতলে দুইটি প্রশস্ত কক্ষের চিহ্ন আছে এবং মনে হয় ঐদুইটি শিক্ষালয় ছিল। কারণ দেবগৃহ বা গুরুগৃহের উপরের তলে সন্ন্যাসীদের শয়ন-ভোজন নিবিদ্ধ এবং আয়তন পরিমাপেও ঐ দুইটি কক্ষ বিশাল। প্রতারাং চন্দ্রহী মঠের দ্বিতলের ঐ কক্ষগুলি ছাত্রদের শিক্ষাগৃহ রূপেই নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।



শোম-দেবীর তটবর্তী চন্দ্রহী গ্রামে শৈবাচাৰ্য্য প্রশান্তশিব কৰ্তৃক নিৰ্মিত মন্তমহুৰ-সম্প্রদায়ের মঠ। (কলচুরি চৈদি নং ৭২৪)

মঠের সম্মুখে এক শিবালয় আছে। ঐরূপ শিবালয় খুব অল্পই দেখা যায় যেহেতু ইহা গোলাকার এবং ইহার শিখরও গোলাকৃতি। কিছুদিন পূর্বে (প্রায় পঁচিশ বৎসর) কানপুর ও কতেপুর জেলার ঐ প্রকার দুইটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়, সেগুলি ইটের তৈরারি এবং তাহাদের নির্মাণের সময় এখনও অনির্দিষ্ট। এগুলির আবিষ্কারের প্রায় দশ-বার বৎসর পরে আমি রেওয়া-রাজ্যের গুর্গী মঠের নিকট ঐরূপ এক মন্দির আবিষ্কার করি। গুর্গী মঠের শিলালিপিতে ঐ মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ আছে। গুর্গী ও চন্দ্রহীর শিলালেখের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ঐ প্রকার মন্দিরনিৰ্মাণ মন্তমহুৰ সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম করেন। নিজের মঠের সম্পর্কে চন্দ্রহীর শিলালিপিতে প্রবোধশিব বলিয়াছেন, “আমি আমার গুরুকৃত হুৱাগারের (মন্দির) সম্মুখে এক মঠ নির্মাণ, সিদ্ধ নামক পুষ্করিণী খনন এবং প্রশান্তশিব কৰ্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক কূপের সংস্কার করাইয়াছি।

রেওয়া নগরের ছয়কোশ পূর্বদিকে, গুর্গীতে ত্রিপুরী রাজ্যের মন্তমহুৰ সম্প্রদায়ের এক বিশাল ‘আখড়া’ ছিল। গুর্গীর সমস্ত পুষ্করিণী ও জলাশয় উহার প্রাচীন কালের

বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। শতবর্ষ পূর্বে এইখানে ছোট একটি পাহাড়ের উপর অতি আশ্চর্যজনক এক তোরণ ছিল। রেওয়া-রাজ্যের বঘেল-বংশীয় রাজগণ সেই তোরণ স্বীয় নগরে লইয়া গিয়া প্রাসাদদ্বাররূপে স্থাপিত করেন। তোরণ লইবার সময় গুর্গীর ঐ পাহাড়ে একটি শিলালেখও পাওয়া যায় এবং ঐ তোরণের সঙ্গে উহাও রেওয়া নগরে আনীত হয়। এখন উহা রাজপ্রাসাদের দরবারগৃহের নীচের দেওয়ালে সংলগ্ন আছে। উহাতে জানা যায় যে, পুন্সেরের প্রশিষ্য প্রভাবশিব হৈহয়-বংশের মহারাজাধিরাজ মুখতুদের পুত্র দ্বিতীয় হুৱরাজদেবের নিয়ন্ত্রণে হৈহয়-রাজ্যে গমন করেন ও মোহন্ত-পদ গ্রহণ করেন। উহার শিষ্য প্রশান্তশিব হুৱরাজদেব নিৰ্মিত কৈলাসশৃঙ্গোপম আকাশস্পর্শী মন্দিরের উত্তরভাগে অল্প এক জুমেকশৃঙ্গোপম মন্দির নির্মাণ করিয়া উমা, শিব, দুর্গা, বড়ানন (কাঙ্কিচের) ও গণপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গুর্গীর পাহাড়ে দুর্গার দুটি অতি বৃহৎ মূর্তি এখনও রহিয়াছে, কিন্তু কাঙ্কিচের বা গণপতির মূর্তিগুলির কোমও সন্ধান পাওয়া যায় না। গুর্গীর শিলালেখে ইহা লিখিত আছে যে, প্রভাবশিব প্রায়ই তীর্থবাস করিতেন এবং বহুবার কানীতে যাইয়া শিবপূজা করিতেন।

শিলালেখের মধ্যের অংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পাঠোদ্ধার অসম্ভব। শেষের অংশে প্রথম স্বব্রাহ্মণদেবের বুদ্ধবাক্য এবং মত্তময়ূর সন্ন্যাসীগণকে গ্রামদানের বিবরণ খোদিত আছে।

গুর্গার ঐ পাহাড়ের আধুনিক নাম গুর্গজ। ইহার চারিদিকে পুরাতন মন্দির ও অট্টালিকার ভগ্নবশেষ আছে। রেওয়া-রাজ্যের বয়েল-ব-শীর রাজগুপ্ত যখন বাঁধোড়গড়ের পুরাতন কেঁচা ছাড়িয়া রেওয়া নগর প্রতিষ্ঠা করেন তখন ঐ সকল প্রাচীন মঠ ও মন্দিরের মালমশলা দ্বারাই নগরের অর্ধেক নির্মিত হয়। ঐ নগরের পুরাতন গৃহমাত্রাই গুর্গার কারুকাৰ্য্যচিত্ত প্রস্তর আজও দেখা যায়। গুর্গার মত্তময়ূর মঠের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ছিল; সেই প্রাচীরে প্রায় দুই তিন মাইল ব্যাপী অংশ আজও বর্তমান। প্রাচীরের পাশে চড়াই উৎরাই দেখিলে মনে হয় যে, প্রাচীরের পয়ে প্রশস্ত পরিখা ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের মঠ ভূগর্গের ধরণে নির্মিত হইত। ষাট বৎসর পূর্বে শ্রুত আলেকজান্ডার কানিংহাম ঐ প্রাচীরের ভিতরের ভূমিখণ্ডে দুই-তিনটি মন্দিরের ভিত্তি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পরে রেওয়া-রাজ্যের লোক তাহাও উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। গুর্গজ টিলার উত্তর-পূর্ব দিকে এক প্রাচীন বিশাল জলাশয়ের তটে চক্রেহীর মন্দিরের জায় একটি মন্দির আছে, কিন্তু তাহার শিখর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই মন্দিরটির গর্ভগৃহও গোলাকার এবং ইহার সম্মুখে আটটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত মণ্ডপ আছে।

মত্তময়ূর সম্প্রদায় মন্দিরনির্মাণের যে রীতি প্রচলন করেন তাহার সহিত চন্দেল (বুন্দেলখণ্ড) এবং পরমার বা মালবীয় মন্দিরনির্মাণ-পদ্ধতিতে অনেক প্রভেদ আছে। চন্দেল-মন্দিরের গর্ভাগারের সম্মুখে একটি বৃহৎ মণ্ডপ এবং গর্ভাগারের অন্তর তিন পার্শ্বে ছোট ছোট “অর্ধমণ্ডপ” নির্মিত হইত। চন্দেল-মন্দিরমণ্ডপের একটি দ্বার থাকে এবং

উহার সম্মুখে একটি অর্ধমণ্ডপ থাকে। গর্ভগৃহের উপর উচ্চতম শিখর (চূড়া) নির্মিত হইত, প্রধান মণ্ডপের চূড়া উহা অপেক্ষা নীচু এবং চারটি অর্ধমণ্ডপের দ্বার সর্বাপেক্ষা নীচু হইত।

চন্দেল এবং মালবীয় রীতির প্রভেদ এই যে, মালবীয় মন্দিরের গর্ভগৃহের তিন পার্শ্বে অর্ধমণ্ডপ স্থাপিত হয় না এবং

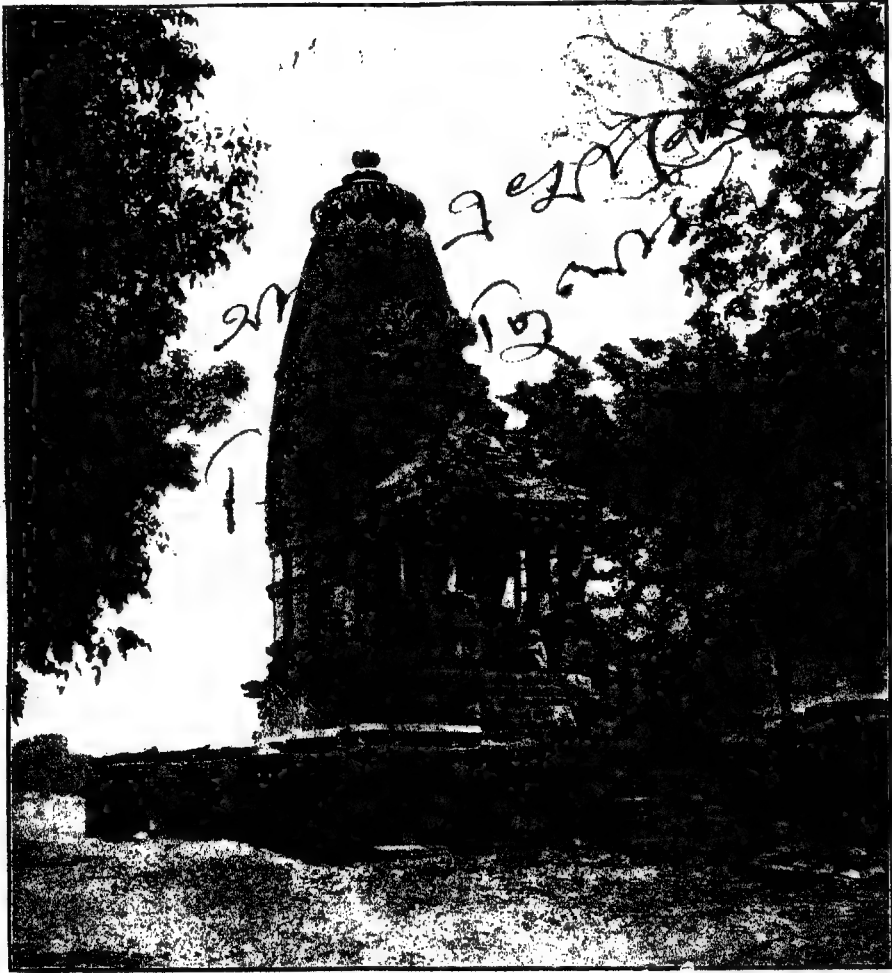


লক্ষণসাগর (খৃঃ সন ১৫০)

কাটনীর নিকটবর্তী বিলহরি গ্রামে রাজা কর্ণদেব দাহরিয়ার প্রাপ্তামহা
রাজা লক্ষণ সাগর কল্পিত প্রতিষ্ঠিত

মণ্ডপ হইতে গর্ভগৃহ প্রদক্ষিণা-পথও থাকে না। মালবীয় মণ্ডপের তিনদিকে দ্বারপথ থাকে এবং প্রধান মণ্ডপের সম্মুখে আট, বায়ো অথবা ষোলটি স্তম্ভবৃত্ত, চতুর্দিক উন্মুক্ত, ছোট মণ্ডপ থাকে। মালবরাজ পরমার-বংশীয় অবনীজনাশ্রয় কবি-বল্লভ ভোজদেব মন্দিরনির্মাণের এই রীতি প্রবর্তন করেন এবং এই পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দির নন্দীদাতা-নদীতটে হোলকর-রাজ্যের অন্তর্গত নেমাওর নগরে এবং রামপুরা-ভানপুরা জেলার অথুনা মৌজায় আছে। নাগিক নগরের চার কোণে পশ্চিমে গিল্লার গ্রামের মন্দির, অহম্মনগর জেলার রতনবাড়ি গ্রামের মন্দির এবং ধামেশ্বর অঞ্চলের বহু মন্দির এই মালবীয় প্রণয় নির্মিত।

মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দিরে প্রধান



চন্দ্রহী গ্রামে শোন নদীর তটবর্তী চৌদ-পাছতিতে নিখিঁত প্রবোধশিবের মন্দির (কলচুরি চৌদি সংখ্য ৬৯৫)

যগুপ বা অর্দ্ধমগুপ জাতীয় কিছুই থাকে না। চন্দ্রহী এবং গুপীর মন্দিরের সম্মুখে এক একটি কুরিমা উল্লুক বারাগু আছে। চন্দ্রহীর বারাগুও অট্টালিকা-রূপে আছে, ইহাতে কলচুরি চৌদি ৭০০ (সন ১৩২) সংবৎসর এক লেখ আছে। এই দিন যকরণধজ নামে এক যোগী মন্দির দর্শন করিতে

আসিয়াছিলেন। ঐ বারাগুর উপবেশনের জন্য উচ্চপ্রস্তরাসন (বেঞ্চ) বর্তমান আছে। কানপুর এবং কতেপুর জেলায় পারোলী তিম্বুলী এবং বহুমায় এই প্রকার গোল মন্দির আছে। পারোলী গ্রামের মন্দির ইটের তৈরি, কিন্তু ইহার এক অংশে শিখর হইতে ভিত্তি পর্যন্ত ধ্বংস হইয়া বাগুমায়

ইহার পোতা পার্শ্বে দ্বার ছিল, বারাণ্ডা ছিল কিনা নিদ্বারণ ক'র অসম্ভব। কতেপুর জেলার তিন্দুলী গ্রামের ঐরূপ মন্দিরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি স্থাপিত আছে। ইহার সম্মুখের বারাণ্ডা এক শত বর্ষ পূর্বে নির্মিত হয়। ঐ জেলার বহু ও কুকারী গ্রামে ঐ প্রকার চারটি মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটিতে এখনও পূজা হয়। যুক্তপ্রদেশের এই সব মন্দিরে প্রাচীন পদ্ধতির বারাণ্ডা দেখিতে পাওয়া যায় না। পারোলী, তিন্দুলী, বহু ও কুকারী মন্দির কোন সময়কার, আজ পর্যন্ত তাহার কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু চম্পেই ও গুর্জার মন্দিরের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে, এই সকল মন্দিরও খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্মিত। ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, মত্তময়ুর সম্প্রদায়ের শৈব সন্ন্যাসিগণ ঐরূপ মন্দির-নির্মাণ-পদ্ধতি যুক্তপ্রদেশেও প্রচলিত করিয়াছিলেন। দ্বিধিজয়ী হৈহয়-বংশীয় মহারাজাধিরাজ কর্ণদেব (খৃঃ সন ১০৪১-৭) কাণ্ডকুজ জয় করিয়া অস্তরাজ-পত্তন বা অস্তর্বেদ অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অধিকার করিয়াছিলেন, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ণদেবের পুত্র যশঃকর্ণদেব অস্তর্বেদের অন্তর্গত করণ্ড গ্রাম নিজ গুরু শৈব মহাযোগী কৃত্তবসকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু গাহভবাল-বংশীয় কনৌজরাজ গোবিন্দচন্দ্র মত্তময়ুর-যোগীদিগের নিকট হইতে এই গ্রাম কাড়িয়া লইয়া ঠকুর বশিষ্ঠ শর্ম্মা (খৃঃ সংবৎ ১১৭৭) দান করেন।

জবলপুর শহর হইতে তের মাইল দক্ষিণে নর্মদার তটবর্তী ভেড়াঘাট গ্রামে একটি প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া যায়, কিন্তু সেই শিলালিপি এখন যুক্ত-রাজ-আমেরিকার 'নিউ হার্ভেন'ে স্থরক্ষিত। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কর্ণদেবের পৌত্র জয়কর্ণদেব মেবারের গুহিল-বংশীয় বিজয়সিংহের কঙ্কর পাণিগ্রহণ করেন। জয়কর্ণদেবের মৃত্যুর পর অহলনদেবী কলচুরি চেদি ১০৭ সংবৎসরে বৈদ্যনাথ নামক মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের খরচ চালাইবার জন্য রাণী অহলনদেবী জাউলীপত্তলাতে নামউত্তী গ্রাম এবং নর্মদার দক্ষিণ তটে মকরপাটক গ্রাম দান করেন। গুজ্জর-দেশীয় পাণ্ডপতাচার্য্য শৈব সন্ন্যাসী কৃত্তবসকে এই দুইটি গ্রামের কর সংগ্রহ করিবার

ভার অর্পণ করা হয়। ইহা হইতে মনে হয় যে, যশঃকর্ণদেবের গুরু কৃত্তবস খৃঃ ১১২০ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কারণ, খৃঃ ১১২০ সনে কনৌজরাজ গোবিন্দচন্দ্র কৃত্তবসের উক্ত দেবোত্তর ভূমি করণ্ড গ্রাম ছিনাইয়া লইয়া অত্র কাহাকেও



গুর্জারমানের গোল শিবমন্দির

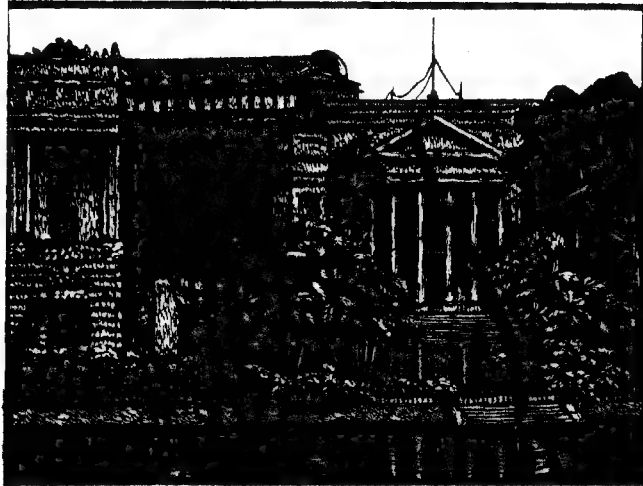
দিয়াছিলেন। অহলনদেবীর পৌত্র হৈহয়-বংশীয় মহারাজাধিরাজ বিজয়সিংহের রাজত্বকালে শৈবাচার্য্য বিদ্যাদেব রাজগুরু ছিলেন। বিজয়সিংহের দেহাবসান হইলে মত্তময়ুর সন্ন্যাসিগণ দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন। তেলিঙ্গানাতে কাকতীয়-বংশীয় রাজকবচের রাজধানী বরঙ্গল এবং একগিলা নগরীতে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে মত্তময়ুর সন্ন্যাসী-বিষেখর শঙ্কু কাকতীয়-রাজ গণপতি এবং চেদি মালব ও চোল-রাজ্যের রাজগুরু ছিলেন। খৃঃ ১২৬১ সনে কাকতীয়-বংশীয় মহারাণী কৃত্তাম্মা উক্ত বিষেখর শঙ্কুকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কতকগুলি গ্রাম প্রদান করেন। উক্ত শিলালিপি অহুসারে বিষেখর শঙ্কু গোড়দেশীয় রাঢ়া মণ্ডলের পূর্বগ্রামে বাস করিতেন। জবলপুর জেলার ভেড়াঘাট ও বিলহরি এলাকায় মত্তময়ুর সন্ন্যাসীদের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

মত্তময়ুর সম্প্রদায়ের শৈব সন্ন্যাসী গৃঢ় শিবতত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। চম্পেই ও গুর্জার শিলালিপি অহুসারে শৈবাচার্য্য প্রশান্তশিব কানীতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। ইহা

কেবল কবির অতিশয়োক্তি নহে, ইহার কিছু-কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। খৃঃ ১২২০ সনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় জিবাকুর হইতে ঈশানশিব-তত্ত্বদেবপদ্ধতি নামক গ্রন্থ (বাহার দ্বিতীয় নাম তত্ত্বপদ্ধতি) প্রকাশ করেন। 'তত্ত্বপদ্ধতি' চারি ভাগে বিভক্ত—'সামান্তপাদ', 'মন্ত্রপাদ', 'ক্রিয়াপাদ' ও 'যোগপাদ'। এই গ্রন্থে ঈশানশিব 'বৌদ্যান-বর্ষসূত্র' 'গৌতমসূত্র' ভোজরাজকৃত তত্ত্বসার টীকা এবং মন্তময়ুর সঙ্গাসী ত্রকশঙ্কু রচিত শিবাগমদীপিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। ভোজরাজের উল্লেখ থাকাতে মনে হয় যে,

তিনি মালবরাজ ১ম ভোজরাজের পরবর্তী। খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীর পর তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। প্রণীত তত্ত্বপদ্ধতি আগমশাস্ত্রে স্বনামবিখ্যাত গ্রন্থ। বর্তমানে তাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের কোন ক্রিয়াই তত্ত্বপদ্ধতির সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে এখনও শৈব বৈষ্ণবাদি অনেক প্রকার সন্ন্যাসী আছেন, কিন্তু অতি বিদ্বান্ ও প্রকৃত শক্তিশালী মন্তময়ুর সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের চিহ্ন—যাত্রা দুই-একটি প্রস্তরখণ্ড ও প্রাচীন গ্রন্থ ছাড়া অস্ত্র কোথাও নাই।



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়

এ কাহিনীটি বোধ হয় নিতাই কবি-কল্পনা,—এর সংজ্ঞা দেখিয়া পোড়াতোটেই এইরূপ একটা তুল ধারণা আসিয়া পড়িতে পারে; তাই বলিয়া রাখি—এর বন্ধন, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র শ্রীমান অভয়পদ, বন্ধু, শ্রীমতী অর্ণিমা রায় এবং এর মেঘদূত—থাক, আপাতত একটু অন্তরালেই থাকুন।

অভয়পদের বৈয়াক্র তাই ভ্রাম্যপদর বয়স চূড়ান্ত-পর্যায়ের কাছাকাছি হইবে, অর্থাৎ তিনি তাহার চেয়ে ন্যূনকল্পে পঁচিশ বৎসরের বড়। বড় রাশভারী পুরুষ। পিতা অবশ্য আরও ঢের বড় ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন বড় ঢিলাঢালা, অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ মানুষটি। তাঁহার বর্তমানে দাদার কড়া শাসনটাকে একটু পাশ কাটাইয়া আসিতে হইত বলিয়া অনেকটা বাচোয়া ছিল,—মানে, তবু কিছু স্বাধীনতা পাওয়া যাইত; এখন তাঁহার মৃত্যুতে সেটুকুও লোপ পাইতে বসিয়াছে।

ভ্রাম্যপদ বলেন—সংসারটা পরীক্ষাগার, হাসিঠাট্টার জায়গা নয়। জাই, সবার হাসিঠাট্টার পথে কড়া চোখের পাহারা বসাইয়া তিনি নিজের অধীনের জীবগুলিকে পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে গভীর ভাবে যোড়াতাল হইয়া গেছেন। মন লাইয়াই অলস কথা, কিন্তু বিপদ এই, যে-মনের গুণ্ডতগুলি খোদ মানুষের নিকট হইতে সব সময় ভাল করিয়া আসিয়া যায় না। তাহার কারণ, হয় মানুষকে সব সময় ইচ্ছাকৃত অবস্থার কেলো যায় না, না হয়, কেলিতে পারিলেও, আত্মগোপনশীল মানুষের চকুরগুলি ছিন্ন করিয়া তত্ত্বগুলি উন্মোচন করাও সময় সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই শুরু নবজা সমাধানের জন্য ভ্রাম্যপদ বাড়ির একধারে নিরিবিলা দেখিয়া—একটি ল্যাবরেটরীর অর্থাৎ বীক্ষণাগার তৈয়ারী করিয়াছেন। সেখানে ব্যাং, টিকুটিকি, গিনিপিপ, খরশোস, বিলাতী ইঁদুর প্রভৃতি যে-সব প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পূর্ব ঘনিষ্ঠ সন্ধ, তাহাদের বাচাবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের প্রয়োজনীয় অবস্থার কেলিয়া, এবং প্রয়োজন শুকতর হইলে চিকিৎসারীক্সিক্সিক্স ভ্রাম্যপদ মানবমনের তত্ত্বাংশি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। লেগুলি বখাবিধি সোটরকে অম্বা হইয়া কটে, তাহার পর মানুষের উপর প্রয়োগ করিয়া তাহাদের রাজাই হয়। ভ্রাম্যপদর বেশীর ভাগ সময়ই এই বীক্ষণাগারে কাটে।

শিতার কুহুর পর কলিকাতার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভ্রাম্যপদ

নিরতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।—কেমন কোন একটা মনবরা ভাব, কিছুতে স্পৃহা নাই, পরীক্ষার ফেল করিল, অত্যন্ত বাধ্য ও সত্যবাদী হইয়া পড়িয়াছে। অনেক পুস্তক উলটাইয়া এ অবস্থার একটা নামও বাহির হইল—*Loss of individuality* অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের নিকোপ।—যেহেতু একেবারে মাথার হাত দিয়া বলিলেন।

পবেষণাগারে পরীক্ষা চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন হিম্মল পাওয়া গেল না। একটা গিনিপিপের খাচা হইতে খাড়ী ছটাকে সরাইয়া দেখা গেল ছানাকুলার তাহাতে মোটেই কোন চুঃখ নাই, বরং খাচের দুইটা বড় বড় অংশীদার স্থানান্তরিত হওয়ার এবং খাচার মধ্যেও চলাফেরা করার খানিকটা সুবিধা হওয়ার তাহাদের ব্যক্তিত্ব বেশ বাড়িয়া গেল বলিয়াই বোধ হইল।—খাচা বাসাইয়া আরও যে-সব পবেষণা করা গেল তাহাতেও এই ধরনের উন্মোচন কলই হইতে লাগিল। তখন খাচাবন্দীদের নিকট হতাশ হইয়া ভ্রাম্যপদ পূর্ববন্দিনীর স্মরণ হইলেন।—শ্রী হেমবন্দী বিনা চিন্তা এবং পবেষণাতেই বলিলেন—“ঠাকুদের কল্যাণেইটা গেলে গুর বিয়ে বিয়ে লাও।”

ভ্রাম্যপদ হাঁ করিয়া শ্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রী বলিলেন—“ওরকম করে চেয়ে রইলে যে ? তুমি তো এই চাও যে ঠাকুরপো একটু অনমনস্ক হোক, মনে একটু কুণ্ঠি আছক ?”

ভ্রাম্যপদ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঘরের মধ্যে খানিকটা পানচুরি করিলেন। একটা শোকার হাতলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—“কিন্তু বিয়ে হলে ভাবনা বাড়ারই কথা তো ?...কি হয় ত্রিক যে মনে পড়তে না।”

শ্রী বলিলেন—“আচ্ছা তো! ত্রিক না মনে পড়লে আবার ভাবনার কথা যে। তা অত কেবী তোমার এততে হবে না, আরিই কিছু কিছু মনে করিয়া দিচ্ছি—যাক সে র গল্পনে বেড়ে গিয়েছিলে,—আবার নিজে আসবার সময় ইষ্টানে তোল হয়ে এনে আবার আসলেন—মনে পড়তে ?”

ভ্রাম্যপদ বলিলেন—“হ্যাঁ, আর তুমি বললে—থাক, ইষ্টানের লোকেদের ওকন বেড়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে কাক নেই...আমার পাটের পাটরি, কি চালের বোরা জেবেছিলে, কে জানে।”

হেমবন্দী জামিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ, তুল হয়েছিল,—চালের বোরার মধ্যে তবুও একটা বস্ত থাকে। তাকুদের

নেহাট ইষ্টিশানে সেই বুড়ী ভিকিরাটাকে গলার মাংসারটা খুলে দিয়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করতে বললে—

শ্যামাপদ কখন হাসিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়তে...”

—“কুটির চোটে চলত গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে পা মুচকে...”

শ্যামাপদ লজ্জিত হইয়া আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। অভয়পদর বিবাহ দেওয়াই সিদ্ধান্ত হইল।

২

অভয়পদ যে-দিন বন্ধু লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল, সেই দিন বিকালে শ্যামাপদ টেরিটিবাঙ্কার হইতে এক জোড়া হাড়গিলা কিনিয়া আনিয়া নিজের ল্যাবরেটোরিয়াং করিলেন। হৈমবতী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন—“এ আবার কি নশু? কি হবে এ-চুটো; চেরাফাড়া করবে তারও তো মাসে দেখিচি না এদের মধ্যে!”

শ্যামাপদ একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—“চোচকীই কোনবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা পাওয়া গেল না, তাই, প্রায় একই জাত বলে এই চুটো...”

হৈমবতী আরও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেন চোচকীই বা কি হ’ত?”

—“কি যে বলে—ওদের দাম্পত্যজীবনটা আদর্শ কি-না... এ-কথা আমি একাই বলিচি না গো, তোমাদের কালিদাসও স্বীকার করে গেছেন—চক্ৰবাকী, চক্ৰবাকী...”

—“কখন, তাঁরপর?”

—“তাই মনে করলুম—অভয়টার বিয়ে হ’ল—এখন কিভাবে চললে ওদের দাম্পত্যজীবনটা আদর্শ হয়ে ওঠে—এক অন্তর জীবনটাকে ভালভাবে প্রভাবাধিত করতে পারে, সে হচ্ছে একটু গবেষণা করা দরকার, তাই...”

হৈমবতী গালে তক্তনীর স্পর্শ করিয়া, চক্ষু বিফারিত করিয়া, বলিলেন—“তাই বাজার থেকে এক জোড়া হাড়গিলা কিনে নিয়ে এলে। অবাক করলে তুমি; এমন সোনার টায় তাই—জাকরবো ঐ ল্যাংগা-এ হাড়গিলের সামিল হ’ল। বাট, বাট, শ্যাপ্যা, একটা আন্ত ছাং গিলে কেলে। দু...হ—

শ্যামাপদ বিস্ময়িত হইয়া বলিলেন—“কি অবস্থা দেখ ত। আরে সামিল হবে কেন? কথা হচ্ছে—দুটো উভর থেকে একই ভাবে কাজ করে, পালক, রোঁয়া—এ-দের স্বপ্নই হোক, আর সেমিধকামিকের মধ্যেই হোক;—যেমন ধরু, বুড়ী গজটাকে হুইবার সময় সে তার বাহুরটার জন্তে খানিকটা দুধ চুরি করে রাখে; সেটা যে-কারণে হয় ঠিক সেই কারণেই তুমিও খাবার পর খুবী জন্তে ওজার জল থেকে খানিকটা...”

হৈমবতী খষক দিয়া উঠিলেন—“আচ্ছা; থামো বাপু; সব থাকে তোমার ভাইকে হাড়গিলে কর দিয়ে, আমার খুবী সব তুলনা দিতে হবে না...”

বিবাহের পর প্রত্যাশিত ভাবান্তরটুকু বেশ পাওয়া গেল। অভয়পদর মনের প্রকৃষ্টতা হৃদে আসলে কিরিয়া আশিরাছে, ওজনও বাড়িরাছে ভালরকমই; কিন্তু পাঠ্য-জীবনের উপর প্রতিক্রিয়াটা কেমন ধেন সম্বোধনক বলিয়া বোধ হইতেছে এবং সত্যবাদী ভাই যে সেটা গোপন করিবার জন্য ধীরে ধীরে উৎকট মিথ্যাবাদী হইয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে তাহারও প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে। হাড়গিলাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে হয় না বলিয়া তাহার নিকট হইতে এ-বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

অবস্থা ক্রমেই সলীন হইয়া উঠিতে লাগিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হাতুড়ি-পেটার কল্যাণে অভয়পদর এত দিন মাথা-মাথা কিংবা পেট-কামড়ানির কোন বলাই ছিল না, এখন ক্রমে ক্রমে এই রোগ দুটির আবির্ভাব হইতে লাগিল। শ্যামাপদ রোগের জন্য ঘোটেই চিন্তিত হইলেন না,—চিন্তিতার কারণ এই যে, অসুখ ঠিক দশটা হইতে চারটা পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং তাহার চেয়েও অধিক চিন্তিতার বিষয় এই যে, কোন রকম ঔষধপত্র সেবন না করিয়া শুধু নব-বধুর সেবার অর্থাৎ উপস্থিতির গুণেই আরোগ্য লাভ হইয়া যায়। ওদিকে তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষার সময় হইয়া আসিতেছে; ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এ একটা সঙ্কট। শ্যামাপদ মহাকাঙ্ক্ষের পড়িলেন এবং অবশেষে এক দিন নেহাৎ অন্তোপায় হইয়া কনিষ্ঠকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও কথটা কি ভাবে পাড়িবেন সে-বিষয়ে মনে মনে একটা ধসড়া তৈয়ার করিতে লাগিলেন।

অভয়পদ প্রবেশ করিলে শ্যামাপদ বলিলেন—“ভেমন কিছু কথা নয়,—ওদিকে কয়েকটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলে তোমার পড়াশুনার কথাটা অনেক দিন একেবারেই জাবতে পারিনি। হ্যাঁ, কেমন প্রিপারেশন হচ্ছে?”

অভয়পদ হাতের আঁঠুটা ঘুয়াইতে ঘুরাইতে ধীরে ধীরে বলিল—“ভালই।”

—“খার্ড ইয়ারের পরীক্ষাটা আবার এসে পড়তে কি-না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।”

অভয়পদ চুপ করিয়া রহিল।

—“এই পরীক্ষাটা বড় শক্ত কি-না, এটা পেরিয়ে গেলেই আদ্য দু-বছর নিশ্চিন্দ।”

অভয়পদ চুপ করিয়া রহিল; দালাও একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—“ইহে, কথা হচ্ছে, কোন রকম ভিস্টারবেশন হচ্ছে না তো?”

অভয়পদ বলিল—“অজ্ঞে না, বরটা বেশ নিরিবিলি থাকে।” শ্যামাপদ মনে মনে বলিলেন—“সেই তো সর্বনাশের

মূল।” একটু মৌন থাকিয়া কহিলেন—“হ্যা, ঐটাই এখন দরকার।—মানে হচ্ছে—বদি এ সত্বেও মনে কর যে এক-আখ জনকে বাইরে সরিয়ে দিবে বাড়িটা আরও হালকা, আরও নিরিবিগল করা দরকার, তো সে ব্যবস্থাও না হয় করা যায়।”

কথাটা জলের মত সহজ, কিন্তু অভিলষিত কল পাওয়া গেল না। অভয়পদ শ্রেক বৃদ্ধিতেই পারিল না, কিন্তু পারিয়াও বৃদ্ধিল না বলা শক্ত। যেন খুব গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া উত্তর করিল—“অজ্ঞে না, পিসীমা পড়ার ঘরে এসে একটু গজর গজর করতেন, তা তিনি তো চলেই গেছেন কান্দী।...”

শ্যামাপদ উত্থাপ্ত হইয়া মনে মনে বলিলেন—“বাচিয়েচেন তোমাদের দু-জনকে।” প্রকাশ্যতঃ এ-প্রসঙ্গটা আর চালাইতে পারিলেন না। ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—“তা যেন হ'ল; কিন্তু তোমার শরীরটার দিকে একটু লক্ষ্য রেখ। তোমার বৌদি বলছিলেন—আজকাল নাকি প্রায় মাথা-ব্যথা করচে ? ওটা ঠিক নয় তো!”

অভয়পদ এ আক্রমণে একটু থতমত খাইয়া গেল, কিন্তু সরলজন্তু-করণ দ্বারা নিশ্চর দাম্পত্যশাস্ত্রের প্যাচোয়া কথা অতশত বোঝে না এই সিদ্ধান্ত করিয়া সহজভাবেই বলিল—“হ্যা, ওমিকে পড়াশোনার একটু চাপ পড়েছিল, তাই দু-এক দিন রাত জেগে...”

শ্যামাপদ অসজ্ঞাবের ভাব দেখাইয়া কহিলেন—“ঐটি তোমাদের বড় অন্যায়। রাত জেগে পড়াশোনা করাটা...” দৃষ্টি নত করিয়া কহিলেন—“তোমার গিরে, যে-কোন কারণেই রাত জাগাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই কতিকর। আচ্ছা, যাও তা হলে; এই সব জিজ্ঞাসা করবার জগ্গেই ডেকেছিলাম। না, রাত-টাট জাগার আর ধার দিয়েও বেও না—”

৩

তাইকে সোজা ভাবে বাগঝানান গেল না। দানব কোন বক্ররীতি অবলম্বন করিলেন কি-না বলা যায় না, তবে হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, হাড়গিলা ছুইটা পৃথক পৃথক পিজরার বন্দী হইয়া অভ্যস্ত চোচাবেচি লাগাইয়াছে—এবং আশ্চর্য বোণাবোণ—ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভয়পদের বৃদ্ধবস্তুর আগিয়া বলিলেন তাঁহার দ্বাণীর শরীর ধারাপ, দিনকতকের জন্ত কজাকে দেখিতে চান।

দৈহিকতীর আপত্তি সত্ত্বেও শ্যামাপদ জ্বাভুজারকে পিজরার পাঠাইয়া দিলেন।

দিনপনের সতর্ক পর্যবেক্ষণের দ্বারা জানা গেল—এই বিজ্ঞানের কলে শুধু গভর্ণমেন্টের ডাকবিভাগ ছই হাতে পরমা গৃহিতছে হাঁপ। রোজ একখানি করিয়া কাঁটরা পোট-আগিপের দ্বাণেশ্বর কীভাবেই লোকাল গ্রীহান অভয়-পদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে হাজির হয়—প্রায়ই একখানি টিকিটে

তাহার ভাড়া কুলার না। যদি খরীদা লওয়া যায় যে, সে-সব পত্রের আধাবাদি ওজনেরও জ্বাধ প্রত্যহ কাঁটরা অভিমুখে দাড়া করে, তাহা হইলে পাটীগণিতের সোজা হিসাবে অতি সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে তারের কলসে, পরীক্ষা, এ-সব দিকে মন দিবার আর একটুও অবসর থাকিই থাকে না। আর একটি উপসর্গ জুটিমাছে,—এতদিন অভয়পদের মাথা-ব্যথা পেট-কামড়ানি ছিল, এখন—কি বিধানে বলা যায় না—সে-সব উপস্রব বধুর শরীরে গিয়া জুটিমাছে। তিন দিন তো এমন অবস্থা গিয়াছে,—কলেজে গাড়ী পাঠাইয়া অভয়পদকে বধুর শয্যাপার্শ্বে হাজির করিতে হইয়াছে। স্বপ্নের বিবর উগ্রভাটা বৈকিণ্য থাকে না, তবে দ্বাণীর তরফ থেকে চিন্তার বিবর এই যে, বহু তাইকে এ-অবস্থার সমস্ত দিনরাত কাঁটার থাকিয়া বাইতে হয়।

এর উপর সে-দিন সকালে দেখা গেল সে হাড়গিলা-বন্দী পিজরার বাহিরে গলা কাড়কাড়ি অর্ধবৃত্ত অবস্থায় দীর্ঘবে পড়িয়া আছে, সে-দিন শ্রামাপদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বৈকালেই গিয়া জ্বাভুকে গৃহে লইয়া আসিলেন এবং পুতুরবাটে নির্জনে বসিয়া ইতিকর্তব্য সহজে গভীর-ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দারুণ সমস্তা—কাছে থাকিলেও বিপদ, দূরে থাকিলে বিপদের উপর বিপদ। ওমিকে পরীক্ষার স্বাস্থ্য আর তিন লগ্নাহ বাকী। অন্ততঃ বহুটি যদি একটু বুদ্ধি তো একটা সুরাহা হইতে পারিত। বুদ্ধি আছে, তবে সন্দেহাবে সেটা এখন যোলজানাই অজ্ঞানে লাগিতেছে। মুকিল এই যে, কিছু বলিতে স্বাভাবিক সন্দেহবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তবুও কনিষ্ঠের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এবং সে ভবিষ্যতের সহিত জ্বাভুকের ভবিষ্যৎ অজ্ঞানভাবে ওড়িত বলিয়া, শ্রামাপদ আর অত অগ্রপশ্চাৎ ভাবিলেন না, দু-দিন পরে একবার জ্বাভুকে জাকিয়া পাঠাইলেন। নিরালিখিতরূপে কথাবাদী হইল—

“আজকাল কেমন আছ মা?”

“ভাল আছি।”

শ্রামাপদ মনে মনে বলিলেন—“তা আমি।”

“হ্যা, কাঁটরাতে বড় সংসারে ছেলেকিঙ্কল গোলমাল বেশী, তাই আমি ভালোম শরীরটা ধবন এক উপরিউপরি ধারাপ হচ্ছে একটু নিরিবিগলিত থাকার জাল। এখানে কোন রকম গোলমাল হচ্ছে না জে ?”

“না।”

“হলেও তুমি এড়িয়ে চলবে, অভয়টার মতন তো আর নও। দেখ না; শাস্ত্রের ওপরআমিন, একটু চাও নেই; খেলা, কুস্তি, এ-ও-তা—এই সব নিরুই কল।”

বধু একটু জ্বাধা নীচু করিল; বোধ হয় অনিশ্চিত এ-ও-তার মধ্যে নিশ্চিত কার্যকেও পাই দেখিতে পাইল।

শ্রামাণ বলিলেন—“এগু জামিনের আর মোটে তিন সপ্তাহ কি না।” একটু ধারিয়া বলিলেন “আর তিন সপ্তাহই বা কোথায়?—এদিকে এই এগারটা দিন, তদিকে সাতটা দিন, এই আঠারটা দিন কুরে আছে। তার মধ্যে আগশেষে দুটো দিন তো বাই দিতে হয়, নয় কি?”

“হু।”

“আর কিছু নয়, এটা গর খাউইয়ার কি না, তাই একটু সাবধান হওয়া; তা তুমি আমি সাবধান হলে কি হবে না?—ওটার কি আর নিজের ঠাক আছে।—লেখতে পাও কি?”

বু মুখ নীচ করিয়া জইনে বামে মাথা নাড়িল—না, কোন ঠাক দেখিতে পার না।

বিবরণির প্রকৃষ্ট ভাল করিয়া মাথার অচুবিট করাইয়া দিয়াছেন বৃত্তিতে পারিয়া শ্রামাণ বলিলেন—“তা হলে বাও না তুমি, শরীরটা কেমন আছে তাই জিগ্যাস করতে ডেকেছিলাম। অল্পকালতর বললে—এখন শ্রেফ বিশ্রাম আর ঘুম,—খুশী একটা মস্তবড় দরকারী জিনিষ কি না...বাও না।”

তিন-চার দিনের পর শ্রামাণ খবর লইয়া দেখিলেন—খুশী যে অত দরকারী জিনিষ তাহা তাহারও জানা ছিল না।—জ্ঞাতব্য সমস্ত দিনটাই ঢুলিয়া ঢুলিয়া, অথচ সুযোগ পাইলে গভীর নিদ্রারই কাটাইতেছে। এদিকে বু আশার পর থেকেই অভয়পদ মালায়্যক রক্ষা নিরিবিতির ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সকালে সন্ধ্যার সমস্ত দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া অমন একমনে পাঠাভাস যে তাহার কোষ্ঠিতে লেখা ছিল এক-কথ পূর্বে কেহ জানিত না। এককথ নিষ্ঠা, শান্তি, নীরবতা দেখা যায় এক ভণু বোগাভাসে অথবা নিদ্রায়।

শ্রামাণদ জী হৈমবতীকে তাকিয়া বলিলেন—“ইয়াগা, এতো বড় কগাসাদেই পড়া গেল এদের নিয়ে,—সমস্ত রাত দুটেতে জেগে কাটায়ে আর সমস্ত দিন ঘুমোবে।”

হৈমবতী মুহু তিরকার করিয়া বলিলেন—“চুপ কর। তোমার কি গুরুকম করে বলা মানার?”

শ্রামাণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“কি গেয়ে! মানার না হ’লে চুপ করে থাকতে হবে? বেশ আশার না মানার তো তুমিই না হয় বল না কেন?”

—“ইস, আমি হস্তরক হ’তে পেলাম ম’লে। তা তিন আঘাত লাগে ভাল।”—বলিয়া, স্নেহ সহ একটু হাসিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গেলেন।

“ও!”—বলিয়া শ্রামাণ খানিকটা একতাকে কাটাইয়া রাখিলেন।—জখমটা—ব্যক্তি, তুমিও এই চাকরের মধ্যে।

এক নতুনস্তর বন্দোবস্ত করিয়া রাখা মির হইল। শ্রামাণদের মধ্যে, বীক্ষণাগার হইতে খানিকটা দূরে, বাড়ি হইতে বিচ্ছিন্ন একটা গুহাটি বর ছিল, প্রয়োজনের অভাবে তাহাতে

কাঠকুটা ভাঙা আলমারপত্র রাখা থাকিত। সেই ঘরটি পরিকার করাইয়া, চুপ কিরাইয়া অভয়পদের পড়িবার এক শয়ন করিবার ঘর নির্মিত হইল।

শ্রামাণ বলিলেন—“আমি বুঝতে পারছিলাম তোমার বাড়ির ভেতর সব বিষয়ে অস্থবিসে হচ্ছে, অথচ তুমি মুখ দুটে বলতেও পার না। এ বাগানের মধ্যে একটোরের দিয়া হ’ল না?”

অভয়পদ মুখটা গোঁজ করিয়া বলিল—“হু।”

“এখানে জোম’কে দোর-জানালা কিছু বন্ধ করতে হবে না; বরং পড়তে পড়তে ক্লাস্তি বোধ করলে, খানিকটা বাগানে এদিক-ওদিক বেড়িয়ে এলে। ফুল তুমি ভালওবাস, আর গুর চেয়ে মন প্রকৃত রাখবার মত কি-ই বা আছে?”

অভয়পদ মুখটা আরও গোঁজ করিয়া, আরও অস্থনালিক হুয়ে বলিল—“হু।”

তাই যেমন সর্বদা বইয়ে-মুখে এক হইয়া বসিয়া থাকে তাহাতে মনে হয় ব্যাবস্থাটা খুব লাগসই হইয়াছে। হইবার কথাই কি না,—নীরব নিথর জায়গাটি যেন কথ মূনির আশ্রম। দান্য নিশ্চিন্ত হইয়া অনেকদিন পরে বীক্ষণাগারে একটু ভাল করিয়া মন দিতে পারিয়াছেন। ছাড়গিয়া দুটারও অল্পকাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পরীক্ষার পরীক্ষার পরিশ্রান্ত হওয়ার দরুনই হোক কিংবা, অদর্শনের হেতু বিশ্বস্তির জন্মই হোক তাহার আর ততটা গোপনযোগ্য হবে না। দিয়া ধার দায়, যদি নেহাৎই তেমন ভেমন হইল তো হৃদ তাতের জালের উপর চকু দারা গোটা কতক ছোবল যাবে। এ-সব যথার্থীতি নোটবইয়ে লিপিবদ্ধ হইতেছে। শ্রামাণদ *Love that defied science* নাম দিয়া মনস্তত্ত্বমূলক একটি নিবন্ধ লিখিতেছেন, কোন বিলাতী কগজে দিবে। নতুন প্রেম বৈজ্ঞানিকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত কিরূপ নিরস্ত্রিত হইল তাহারই গবেষণ-পূর্ণ ইতিহাস। বিজ্ঞানজনগণকে চমৎকৃত করিয়া দিবে বলিয়া আশা করেন।

পড়িবার ঘর থেকে বাড়িটা দেখা যায়, কিন্তু বাড়ির কাছাকাছে দেখা যায় না। সেই জন্ত তেমনই মনে হয় দুইটি টানা টানা ব্যাঙ্গল চোখ এই দিকে অনিশ্চয় চাহিয়া আছে, বই থেকে মুখ তুলিলেই কেন কণিকের জন্ত চোখচোখি হইবে।

ওদিকে টান চোখ দুটিও সর্বদা যেন একটু সজল, ফারা কেনে বেজিতে পার পাশপাশের ঘর কঠিন বইয়ের পাখার ওপর কোথাক একজন নৃহিত হইয়া পড়িয়া থাকে; তাহাকে ওঠার, একটু ‘আলা’ মনে, জিন্দগানে এখান-কই নাই।

—কল্পনামেধী এইটুকু মধ্যমতা করেন।

আর একটু মধ্যমতা করে জিনি।—তেতলার ঘরে বলিয়া

অগ্নিমা নীচের বিচিত্রতায় শ্রুততা দেখিতেছে, কিংবা আকাশের মহাশ্রুততায় কত বিচিত্রতার ছবি আঁকিতেছে—সিঁড়ি ভাঙিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিমি আলিনা উশহিত হইল। অগ্নিমা তাকাতাড়ি সোকা কিংবা চেয়ার হইতে নামিয়া তাহার ঝিকঝিকে কৌকড়া গোমেতরা গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলভাবে প্রশ্ন করে—“কোথার ছিলি এতক্ষণ, পোড়ারমুখী?”

জিমি উঃর দিতে পারে না বলিয়াই তাহার বক্তব্য সম্বন্ধে অগ্নিমার কোন বিধা সম্বন্ধ থাকে না; বলে—“বুঝেচি তুই কার কাছে ছিলি—তোঁর চাইবার ভক্তিতেই বুঝেচি। কি করতে রে?—খুব পড়চে, না?...তুমি বলবে এগজামিন, তুমি বলবে যুটটা দরকার...ছাই এগজামিন, ছাই যুট, ওসব কিছু দরকার নেই; তুই যা, বেরো।”

একটু থাক। দিয়া আবার কোমরটা সঙ্গে সঙ্গে জড়াইয়া ধরে, বলে—“কি দেখলি লা? খুব বুঝ পড়চে?”

জিমি প্রত্যাহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে এই সোহাগটুই প্রবলবেগে ল্যাক আর মাথাটা নাড়িতে থাকে। অগ্নিমা উরসিত হইয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরে, বলে—“পড়চে না, না?—সে আমি জানি; আমার ছেড়ে থাকলে ওর নাকি আবার পড়া হয়। বখন ফেল করে বসবে তখন বড়াকুরের ঢাক হবে।”

জিমির সামনের হাত দুটা তুলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করে—“কি বলিস?”

জিমি জিত বাহির করিয়া প্রবলবেগে মাথা ঢুলায়। অগ্নিমা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলে—“না, তখনও হবে না?—আচ্ছা যা, তোকে আর দৈবজাগিরি কলাতে হবে না, কালামুখী কোথাকার।”

অভয়পদর ঘরে গান্ধী-করা বই খাতায় সোঁদা গন্ধ হঠাৎ চাপা পড়িয়া নববধূর জন্ম কাপড়ের পরিচিত এসেলের বাসী গন্ধর ঘরটা ভরিয়া ওঠে; মুখ কিরাইয়া চুপা উজাসের সহিত বলে—“জিমি বুঝি?” কোথার ছিলি এতক্ষণ?

কোথার এতক্ষণ যে ছিল তাহা জানে বলিয়াই আর উজয়ের প্রবেশজন হয় না; “আর”—বলিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া কাছে টানিয়া লয়। বহুর যত অত আবলভাবল বকে না, মুখের পানে আবেগময় দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে কপালটিতে হাত বুলায়। ওর সমস্ত শরীরটতে অগ্নিমার স্পর্শ মাথান আছে, সর্বাঙ্গ দিয়া ঘেন সেটা মুছিয়া কইতে থাকে।

আবলভাবল অত বেশী বকে না বটে, তবু এক-আধটা কথা বাহির হইয়াই পড়ে, প্রকৃতিল লোকের মুখ দিয়া বাহ্য বাহির হইতেই পারে না। বলে—“কথা কইতে তুই শিখবি নি জিমি?—হুটা কথাও মুখী আমার অগ্নিমার কাছে পৌঁছে দিতে পারিস্...”

একটু থাকিয়া বলে—“দেখ না, তোমার দেশে হুহুরেরা

কত বড় বড় কাজ করচে; কত খুনী আগামী ধরবে মিছে, কত ধবর পৌঁছে মিছে, কত...”

এই ধরণের প্রাত্যহিক কথাবার্তার মধ্যে অভয়পদ এক দিন একটু বেশীক্ষণ ধামিয়া কি একটা জাবিল, তাহার পর বইয়ের গান্ধী ছাড়া উত্তীর্ণা পড়িল, টেবিলের উপর একটা শক্ত নীল হাতার বাগিল ছিল, তাহার বানিকটা ছিড়িয়া লইয়া, তাহার মাঝখানে একটা কাগজের টুকরা বাধিল, তাহার পর হুতাটি জিমির বুকের চারিদিকে বেড় দিয়া বাধিয়া, হুতাটি ও তৎসংলগ্ন কাগজটি তাহার হৃদয় কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে সম্বর্ণপে ঢাকিয়া দিল।

দাদার ভাই প্রতি-গবেষণা লাগাইয়াছে।

কিন্তু হায়, সাফলা-সন্দী নিতান্তই বিমুখ।—পাজরার চারিদিকে হঠাৎ এ-এক নতুন উপদ্রবে জিমি ঘোর আপত্তি লাগাইয়া দিল। উত্তীর্ণা, পড়িয়া, গড়াইয়া এক মহামারি কাণ্ড বাধাইয়া দিল, এবং শেষে ছিড়িবার চেষ্টায় হুতাটর মধ্যে সামনের একটা পা আটকাইয়া বাঁধায়, তিন পায়ে সমস্ত ঘরটা ছুটাছুটি করিতে করিতে পরিজ্ঞাহি চীৎকার শুরু করিয়া দিল।

দাদা বুঝি আসিয়া পড়ে। সমস্ত ঘরটাের একটা ছুরি কি কাঁচি নাই। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অভয়পদ জিমিকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, হুতাটা সাধ্যমত একটু টানিয়া ধরিয়া, দাঁত নিয়াই ছেদন করিয়া দিল। মুক্তির আনন্দে এবং কতকটা বোধ হয় প্রভুর এই হঠাৎ ভাবপরিবর্তনে অনেকটা সন্ধিগ্ধচিত হইয়াও, জিমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

নিরাশ হইয়া অভয়পদ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল;—অক্ষুট ঘরে নিজেকেই বালিল—“একটু ট্রেনিং দিতে পারলে ঠিক চিঠিটা পৌঁছে দিতে পারত, কেউ টেরও পেত না; কিন্তু বা হুতা শুরু করে দিলে।” একটি লীর্থনিঃশ্বাস পড়িল।

কিন্তু হাঁবার হোক প্রেমিকের মন, তার আবার বিরহ-আগিত একটি বিকলতাতেই তাহার উদ্ভাবনীশক্তি লোপ পায় না।

এদিকে একটু হুহাও হইল।—

সমস্ত দিন তর্কে তর্কে থাকিয়া খবর পাওয়া গেল খর-গোসের জোড়া জাতিয়া একটি পঞ্চপ্রাপ্ত হইয়াছে, দাদা কাল সকালে টেরিটিবাটারে যাইবেন। অভয়পদ আন্দাজ করিল অতন্ত: হুতাখানেক লাগিবে। আচ্ছা, বেচারী ধরপোশ। তা ভাল হইয়াছে; দাদার হাত থেকে তে পুরিত্রাণ পাইয়াছে।

ভাষ্যপদর মেটরের আওয়ার বখন ঘুরে মিলাইয়া গেল, অভয়পদ ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়াইল। দুহাঘরের কাছেই ছোট ভাইপোর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রশ্ন করিল—“দাদা কোথায় রে ধনু? উকে আজ সকাল থেকে দেখছি না যে?”

ধলু প্রজ্ঞাপিত উত্তরই দিল—“হানি না হেরে।”

—“তবে তোর মা জানে নিশ্চয়, তাঁকেই জিগ্যেস করে আসি। কোথায় আছে বল দিকনি তোর মা?”

“বড় ঘরে।”

জাতকায়ার সন্ধানে অভয়পদ ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং বাহাতে তিনি সন্ধান না পান সেই উদ্দেশ্যে বড় ঘরের দিকের রাস্তাটা বাদ দিয়া একবারে অগ্নিয়ার ঘরে প্রবেশ করিল। অগ্নিা ছিল।

কোম্বাটার স্তন্যক পরে বিদায় লইয়া অলক্ষিতে বাহিরে আসিলে, হেমবতীর একবারে সামনাসামনি হইয়া গেল। বলিল—“এই যে। দাদা কোথায় জিগ্যেস করব বলে, তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াই সেই থেকে।”

হাসির জ্বল দেখিয়া ধামিয়া গেল। এমন সময় ঘোঁটরের পরিচিত স্বরের আওয়াজ হইল। জাতকায়ার হাসিটাকে গাছটারে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিয়া প্রস্থ করিল—“ওঁকে খুঁজিছিলে খরলে; যদি জিগ্যেস করেন—কেন—কি বলব?”

অভয়পদ কিপ্রগতিতে নিড়ি দিয়া নামিতে নামিতেই ঘুরিয়া আসিল ও মিনতির ভাঙিতে বলিল—“না, খবরদার।... তোমার পায়ে পড়ি বৌদি বাও...”

দাদা আসিয়া দেখিলেন ভাই পড়িবার ঘরে; একবার ডাকিলেন কিন্তু উত্তর না পাওয়ার একাগ্রতায় আর বাধা না দিয়া, না টিগিয়া টিগিয়া ল্যাবরেটরীর পানে চলিয়া গেলেন।

তিন কোম্বাটার ব্যাপী কনকারলে কিছু একটা লাগাত হইয়াছিল নিশ্চয়। সে-দিন কলেজ হইতে কিরিবার সময় অভয়পদ বেশ একটি ভাঙ্গার দেখিয়া পিতলের যুগ্মরু কিনিয়া আনিয়া জিমির গলার ব্যাঙে বুলাইয়া দিল; তরল হুমুর হুমুর আওয়াজে জিমির স্তন্য বাড়িটা মুখরিত করিয়া জুলিল। ভ্রাম্যপদ অভিনবঘটকু অন্ধকার করিলেন, বলিলেন—“কন্দ করনি অভয়, ওদের মিউজিক্যাল সেল টা যদি—কুটরে তোলা হয় তো মানসিক কোন পরিসরভন হয় কিনা পরখ করে দেখবার বিষয়। এ্যানিয়ার্স্ হাইকোলজিতে আমরা একটু নতুন তথ্য দান করতে পারি।

নোটবুকে তারিখটি টুকিয়া দইলেন এক খুব স্নেহভাবে জিমির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লক্ষিলেন। নোটবুকেইট মন্তব্যে মন্তব্যে তারাকান্ত হইয়া উঠিলে পারিল।

বেলা আশ্রয় নষ্ট হইবে। ল্যাবরেটরিতে বিশেষ কোন কাজ নাই, তাহা তিন ভাই এক কলেক্টর হইয়া উঠিতেছে যে তাহাকে চোখে চোখে রাখিবার জন্যও আর পবেষণার অস্থিয়ার মিছামিছি বাগানে বলিয়া থাকিবে হয় না। ভ্রাম্যপদ সাক্ষ্যের জন্য বেশ একটি নির্দিষ্ট আত্মপ্রদায় উপভোগ করিতেছেন এক আশাপাত: উপরের বড় ঘরটিতে নিরালায়

তাহার *Love that defied science* প্রবন্ধটির উপলব্ধার লেখার ব্যাপ্ত হাছেন।

সামনের বারান্দা দিয়া জিমি নিত্যক ব্যস্তমস্তভাবে নীচের দিক হইতে আসিয়া ওদিকে অগ্নিয়ার ঘরের পানে চলিয়া গেল। তাহার বাওয়ার তাহেই মনে হইল সে বিশেষ একটা কাজে লাগিয়া রহিয়াছে—এদিক-ওদিক চাহিবার ফুরসৎ নাই।

শ্যামাপদ কলমটা তুলিয়া লইয়া একটু অন্তর্যনক ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন—সকীতে এই একাগ্রতাত্মিক আনিয়া দিয়াছে... তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সকীত মানবের মনে যে ঐকান্তিকতা জন্মায় পশুর মনেও ঠিক সেই রকমই।

হঠাৎ তাহার মনে হইল যুগ্মরের শব্দটা কেন ছিল না! তিনি কি রচনায় এতই লিপ্ত ছিলেন যে শব্দটা তাহার কানে গেল না,—না; শ্যামাপদ যুগ্মটা তুলিয়া রাখিয়াছে? কেন, খুলিতে গেল কেন? বোধ হয় তাহার পড়াভনার ব্যাঘাত জন্মায়—ব্যাঘাত আর উহাতে কতটুকু হইবে? তবু, যখন খুলিয়া দিয়াছেই তখন না হয় আপাতত: থাক, পরীক্ষাটা হইয়া গেলে আবার পরাইয়া দিলেই চলিবে।... দেখে ব্যাপার!—বৈজ্ঞানিক মেথড জিনিষটাই এই রকম—ঐ অভয়পদের মন বই কেতাৰ থেকে কি রকম উঠিয়া গিয়াছিল, আর আজ বই আর নিজের মাথখানে একটা যুগ্মরের মিহি আওয়াজও আগিতে দিতে সে সাকী নয়।

এই সময় ফুরুরটাকে ফেঁই রকম হস্তমস্ত হইয়া ওদিক হইতে নীচের দিকে চলিয়া বাইতে দেখা গেল। গলায় নতর পড়িতেই দেখিলেন—না, যুগ্মর তো ঠিকই রহিয়াছে।

শিখু দিয়া ডাকিতে জিমি বারান্দাতেই ছুরারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ব্যস্ততার মধ্যে প্রভুর মন রাখিবার জন্য, সন্ধ্য শরীরটাকে রণ বারো সেকেন্ড খুব একচোটে নাড়া দিয়া শ। করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

শ্যামাপদ বলিলেন—“হা রে! আর এত ব্যস্তই বা কেন?”

ধলু ওপরে আসিয়াছিল, একটু ঢাকিয়া বলিলেন—“দেখ তো! ফুরুরটার গলার যুগ্মরের ফটটা বুঝি কি করে আঁটকে গেছে, বাজছে না; বীরে ঠিক করে লাও তো।”

আবার জিমিই বাইতে লাগিলেন। ধলু খানিকক্ষণ পরে কিরিয়া আসিয়া বলিল—“কই, তাকে ছেঁরা বাড়িতে দেখতেই পেলাম না।”

—“যুগ্মর থাকলে এও একটা স্থিতি—সম্মুখে স্টাই করতে পুরা ঘর...তোমার কলকার পড়বার ঘর দেখেচ? বোধ হয়...” এমন সময় জিমি সিঁড়ি ডাকিয়া ওপরে আসিল—সেই ব্যস্তরাজীভাব। ভ্রাম্যপদ বলিলেন—“হরজো, আবার জাকলে আসে না, আ মর। দেখ তো কি হয়েছে যুগ্মরটাকে।”

জিমি ধরা দিতে কিছু আপত্তি করিল, যুগ্মর স্পর্শ

করিতে দিতে আরও আশক্তি করিল।...ঘটর আটকানো নয়; বৃহৎয়ের মধ্যে কি একটা সৌন্দর্য্য পিত্ত আছে। এমনি বাহির করা হুঙ্কার হইয়া উঠিল। ধলু শেষে বৃহৎটাই ব্যাণ্ড হইতে বাহির করিয়া লইল।

ভেতরে আবহমানপান একটা কি,—ভাঙ্কড়া বলিয়া যেন বোধ হয়। বাহির করা মুহূর্ত্ত; নিব দিয়া টানিয়া বাহির করা গেল না। ধলু বলিল—“দাঁড়াও, কাকীয়ার কাছ থেকে মাখার কাঁটা নিয়ে আসি।”—বলিয়া চলিয়া গেল।

ভ্রামাপদ চেষ্টা করিতে করিতে একটা কোণ ধরিলেন, তাহার পর অতি লম্বপথে সমস্তটা টানিয়া বাহির করিলেন,—মিহি পাঁচশেট কাগজের ভাঁজ করা ছোট্ট একটি বাঙিল। তাবিলেন—ব্যাপারখানা কি!

আন্তে আন্তে ভাঁজ খুলিয়া দেখা গেল একটা চিঠি। বেশ দীর্ঘ চিঠি। কাগজটা দীর্ঘ নয় বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধের লেখা মালমসলায় আগাপাতলা ঠাসা। ভ্রামাপদ সসমাটা ভাল করিয়া নাকে বসাইয়া প্রথমেই “প্রাণেশ...” পর্যন্ত পড়িয়াই অর্ধপথে থামিয়া গিয়া ‘ছি-ছি’ করিয়া দামলাইয়া লইলেন। তাহার পর শুটুক বাদ দিয়া চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিলেন

“মধুমাখা চিঠি পেলাম। আর যে পারি না—পারি না—পারি না। পড়ার বন্দীশালায়, পুস্তকপ্রহরীর মধ্যে

আমি বন্দী—ইনস্ট্রুমেন্ট ওলা কেন তাদের নির্ধন অস্ত্র। প্রিয়ে, কি অপরাধে দাদা আমার এ বন্দন করে ‘বাধিকার প্রসন্ন’ করলেন? আমি তো কেন ছিলুম—কই আমি তো তাঁর কাছে তোষা-নিষি চাই-ছি; মাথা-বিধি যদি ছিলেনই তা এমন করে বন্ধিত করলেন কেন?—কি সে আমার দোষ? বোধ হয় আমার ভাল করাই তাঁর উদ্দেশ্য; কিন্তু ওগো আমার অন্তরের অন্তর, প্রাণের প্রাণ, তোমার এই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেই কি তিনি ভাল করার...”

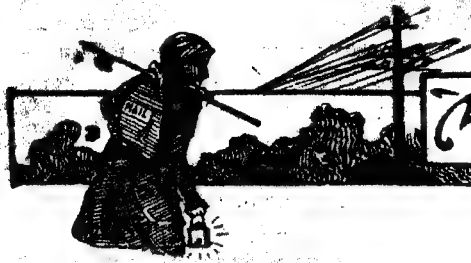
ধলু আসিয়া নালিশের স্বরে বলিল—“বাবা, কাকীয়া কোনমতেই মাখার কাঁটা কি একটা শেকটিপিন্ দিলেন না; কি সে জিদে লোক।...”

ভ্রামাপদ কাগজটা মুঠার মধ্যে মুড়িয়া লইয়া অগ্রমনস্কভাবে প্রেরণ করিলেন—“কেন দিলেন না?”—সঙ্গে সঙ্গে বেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া—বলিলেন—“তা হোক, তোমার মাকে ঈগ’গির একবার ডেকে দাও দিকিন।”

তাহার পর হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—“আর দেখ,—ঐ ফুফুরটাকে ভাল করে ডবল চেন দিয়ে বেঁধে দে—ঐ ওদিককার রেলিঙে আটকে রেখে এস; যেন এ দি—ক না যাড়াতে পারে। তাই তো বলি—এদিক যায় না, ওদিক যায় না, দুদিন থেকে খালি ওপর আর নীচে,—করে কি? ...পাক্জি, মেঘদূত হয়েছে—মেঘদূত!—বার করচি তোমার মেঘদূত হওয়া এবার আমি...”



বালোর পানী
শিল্পী—শ্রীমন্তকেশরী রায়



দেশ-বিদেশের কথা

রবার নিরস্ত্র-চুক্তি—

রবারের উৎপাদক ও রপ্তানি নিরস্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীগণ দীর্ঘ আলোচনার পর একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই চুক্তি আগামী ১লা জুন হইতে ১৯৬৮ সনের ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। চুক্তির প্রধান সর্গগুলি সংক্ষেপে এইরূপ—

(ক) ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদক দেশের রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত ভাবে সীমাবদ্ধ থাকিবে। সংঘাতগুলি হাজার টন হিসাবে।

দেশ	১৯৬৪	১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮
দাম্প	৪.৪	৪.৬	৪.৬৯	৪.৮	৬.৯
ডাচ-লিই ইন্ডিজ	৩.২	৪.০	৪.৪৩	৪.৬	৪.৮
সিংগেল	৭.৭	৭.৯	৮.০	৮.১	৮.২
উত্তর বর্ণিত	১.২	১.৩	১.৪	১.৫	১.৬
সারাবাক	২.৪	২.৮	৩.০	৩.১	৩.২
ডাম	১.৪	১.৪	১.৪	১.৪	১.৪
ভারতবর্ষ	৩.৮	৮.২	৯	৯	৯.২
ব্রহ্ম	৪.১	৪.২	৮	৯	৯.২

(খ) নতুন আবাদ হইতে পারিবে না—তবু পরীকার জন্ম নতুন আবাদ চলিতে পারিবে কিন্তু তাহাও বর্তমান আবাদের শতকরা ১/২ ভাগ অতিক্রম করিবে না; পুনঃ-আবাদ বর্তমান আবাদের শতকরা ২০ ভাগ সীমাবদ্ধ থাকিবে; নতুন আবাদ বাহাতে না হইতে পারে সেই ক্ষেত্রই সকল স্থান হইতে আবাদকারী ব্যবহারযোগ্য কোন বস্তুপাতি ব্যবহার করা হইবে না।

(গ) একটি “রাষ্ট্র-আইন” রবার নিরস্ত্রণ পরিষদ” গঠিত হইবে, চুক্তিতে আবদ্ধ প্রত্যেক দেশের সরকার দুই জন প্রতিনিধি এই পরিষদের সভা নিযুক্ত করিবে। পরিষদের প্রতি ১০০০ টনে এক “ভোট” হইবে। উৎপাদকের শতকরা ১/২ ভাগ রপ্তানি করা হইবে সময় সময় তাহা নিয়ন্ত্রিত করাই এই পরিষদের কার্য হইবে।

(ঘ) এই চুক্তির বিতরণে “খাস” প্রকার আবাদ বন্ধ হইয়া ৩১,০০০ একর পর্যন্ত করিতে পারিবে এবং তাহার রপ্তানি প্রতি বৎসরই একটি নির্দিষ্ট সীমার আনুগত্য থাকিবে।

(ঙ) ইংল্যান্ড হইতে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে যে পরিমাণে রবার রপ্তানি হইয়াছিল তাহাই তাহার চুক্তির আয়োগ্য নিয়ন্ত্রিত, ইংল্যান্ডের কি পরিমাণ রপ্তানি করিবে তাহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(চ) সারাবাক ও ডাম—এই দুই দেশ বাতীত চুক্তিবদ্ধ অপরাপর দেশের সরকারকে রপ্তানির উপর সেন্স বসাইয়া ব্যবহার বন্ধোত্ত করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

(ছ) এই চুক্তি ১৯৬৮ সনের ৩১এ ডিসেম্বর শেষ হইবে, তবে নবগঠিত পরিষদ অন্তরঙ্গ ব্যবস্থা, প্রয়োজন হইলে, স্থগিত করিতে পারিবে।

এই চুক্তির সর্ব বাহাতে সকলেই মানিয়া চলিতে বাধ্য হন, এইজন্য সর্গাধারী আইন করিতে এই দেশসমূহের সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে রবার অতি অল্পই উৎপন্ন হয়; রপ্তানির যে পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ একত্র হইয়াও রপ্তানি স্থানেই অবস্থান করিতেছে। যুদ্ধের পর বাণিজ্যের দুঃস্বাভাব্য বৃত্ত পণ্যের মূল্য কমিয়াছে, যৌবন হয় রবারই তদ্ব্যতীত প্রধান। যুদ্ধের পূর্বে এক পাউন্ড রবারের দাম ছিল ১২২ শিলিং, ১৯০২ সনে ১৫ পেনীতে দর নামিয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ আশা করেন যে, এই চুক্তির ফলে রবার উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ লাভবান হইবেন।

বাংলার পাটের জন্ম চুক্তি অসম্ভব হইল!—

বাংলাদেশে রবার উৎপন্ন হয় না, সুতরাং এই রবার নিরস্ত্রণ শাসনব্যবস্থায় তাহার কোনই সম্পর্ক নাই, যদিও ভারত-শাস্ত্রাজ্যের প্রেক্ষাপটে পক্ষে সম্পর্ক বোধে আছে। এই রবার নিরস্ত্রণ বাঙালীর সকল-বিশেষক আলোচনার যোগ্য এই জন্য যে, রবার ব্যবসায়ীগণ সকলে একমুখী হইতে নছেন, এক জাতির (nationality) নহেন, তবু তাহারা একমুখী হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু বাংলার পাটের সম্পর্কে একমুখী হইতে হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। বাংলার কৃষকগণ দরিদ্র, তাহার রবার উৎপাদকগণের ভার সন্নিবিষ্ট আছে, সুতরাং তাহারায় প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে অসম্ভব কষ্ট। কংগ্রেস এক সময়ে বিজ্ঞাপন প্রচার ও বন্ধুত্বের দ্বারা পাটের চাষ কমানিবার জন্ম কৃষককে উপদেশ দিয়াছিলেন। বাংলা-সরকারও এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন—অথবা রাজনৈতিকভাবে; উদ্ভোদাচাষ হইতে পত্রীতে পত্রীতে জিজ্ঞাসন বিভ্রমণ করা হইয়াছিল। বর্ণপরিচয়ও যে কৃষকগণের নাই, তাহাদের নিকট সর্বত্র উপদেশবাণী-বিভ্রমণ জিন্দা উপস্থান।—এই বিজ্ঞাপনপ্রচারের ফল কি হইল তাহা সকলেই জানেন।

পাট রপ্তানির বর্তমান অবস্থা কি?—

পাট জন্ম কোন দেশে উৎপন্ন হয় না, অথচ এই পাটের ব্যবহার পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই অবিভক্ত আছে। বাংলা হইতে কোন দেশ কত পাট ক্রয় করে নিজেদের তালিকার তাহা বুঝা বাইবে—

(ক) ছাগা (Gunny-bag)

(খ) কাঁচামাল

	১৯৩২	১৯৩৩		১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
	এপ্রিল—নভেম্বর	এপ্রিল—নভেম্বর		জুলাই—নভেম্বর	জুলাই—নভেম্বর
গ্রেট ব্রিটেন	৩৩,০১৫,৪৩৭	২৭,৯৭৩,২১৩	গ্রেট ব্রিটেন (বেল)	২৮৭,৯৯২	৪৫৭,৮৪৮
রাশিয়া	৫,৮৪৭,৪০০	৬৮৩,৫০০	আর্মেনী	৩৮৯,৯২০	৪৩২,০৪৫
নরওয়ে	৫৪৯,০০০	৫১৩,০০০	আন্দ	১২৩,৫৫৭	২১৮,৫১৫
জাপান	১,৬৩৯,০০০	১,৭৮৮,২০০	বেলজিয়াম	৭৭,৪২৫	৯৭,৩৮৫
ফ্রান্স	১,২০৩,৮০০	১,০০২,৫০০	ইটালি	৪৮,৭১৭	১৪৫,৮৭০
বেলজিয়াম	৪,০২৪,২০০	৫,৭৯৩,০০০	মার্কিন	৫৭,২০২	১১৫,৭৮৪
জার্মানি	৫০০,০০২	৪০৭,১৭৫	স্পেন	৮৬,৯১২	৭৩,৩৪৩
গ্রীস	১,৩৭৭,০০০	১,২৭৭,৮০০	পোর্টো নোবো	২৪,৭৪১	১৬,০৬৭
তুরস্ক (ইউরোপ)	১,৭১২,৫৪৩	২,৮৫৮,৭৬২	দক্ষিণ আমেরিকা	২৪,৪০৮	৫০,৪৭৩
" (এসিয়া)	৩,৩২২,৭০৭	৩,৪১২,৮০৬	ইস্পান	৪৬,৩০০	৫০,৫১৪
ইরাক	৫৭৯,৬১৪	৮৬৬,৬০০	চীন	২১,৬০০	২৭,১৯২
সিংহল	৩২৯,০৪৬	৫৩৭,২১৬	জাপান	৩০,৭৭০	২৯,০২৯
স্ট্রেন্দেল্যান্ড	৮,৫১৯,২০০	৯,৩৯১,০১০	আস্ট্রেলিয়া	৩,৫১২	১,৫০৯
যাভা	৬,০৯৭,২০০	৮,০০৬,৪৫০	ওয়েস্ট	১,৬৮৪	২,৫৪৪
গুয়াম	৬,৩৪৬,৭০০	৮,১৭৫,৫০০	হাইড্রেন	৪,৭১৬	১২,৮০৪
ইন্দো-চীন	৫,৮০৯,৭০০	৪,৪৯০,৬০০	অক্স গুরুপীর বন্দর	১০,০৭৪	২৯,৫২৯
ফিলিপিন	৬,৫৭০,২০০	৪,২৪৭,৬০০	মোট	১,৩০৩,২৫৯	১,৭১৪,৩২৬
নেদারল্যান্ড	৮৯০,৩০০	১,৮১৯,০০০			
ফরমোসা	২২১,২০০	৪২০,০০০	(গ) চট—		
হংকং	১৪,৪২০,৫০০	১২,৯১৯,৬০০		১৯৩২	১৯৩৩
চীন	২৭০,০০০	৩৪৩,৫০০	এপ্রিল—নভেম্বর		
জাপান	৪,৫৭৯,৪০০	৪,৫৬২,৪০০	গ্রেট ব্রিটেন	৩৫,২৬০,২১৮	২৬,৬০০,৫৮৫
মিশর	৭,২১৩,১৫০	৯,৮৬৭,৮৫০	সিংহল	১,৪৪৩,১৭১	১,৩৯০,১৯৮
ভারত আফ্রিকা	৪৮৩,০০০	৫১৮,৬০০	হংকং	২৬৪,০০০	১,২৫৫,০০০
ইউনিয়ন অফ দক্ষিণ আফ্রিকা	১০,৮৮০,৭৫৪	১১,৬৮৯,১৫০	চীন	২,৪৯৩,০০০	১,০৬৭,০০০
পার্স গিজ পূর্ব আফ্রিকা	৮,৩৫০,৮২৬	৭,১০৪,৭৫০	ফিলিপাইন	৯,৮৬৪,০০০	৮,৭৪৭,০০০
মরিসাস	২,৫১৪,০০০	৩,২০৫,২০০	মিশর	৪,৪৯১,৫০০	৭,৭৮১,০০০
কেনিয়া, জাম্বিয়ার ও শেখা	১,৫৮৩,১২৩	৩,০২৫,৮০০	দক্ষিণ-আফ্রিকা	৩,৬০০,৩৫০	৪,৮৮১,০০০
ব্রিটিশ হুথান	১,২১৫,৬০০	১,০৬৭,১৫০	কানাডা	৪৭,৭৮০,০২৯	৫৫,৯২২,৪৫২
পূর্ব-আফ্রিকা (অস্ত)	১,৫১৩,১৪৯	২,৮১৫,০২১	মার্কিন	৩৬২,০৩৯,৩২১	৪০৮,৮২৪,৪৬৩
কানাডা	১,৮৮৬,৬০০	৫,৭৫৮,৫০০	উরুগুয়ে	৮,২৫৩,৬৬১	৮,৯৬৫,৫০০
মার্কিন	১০,৮৬৬,৬০০	৬,৫৬৭,০৩৪	আর্জেন্টাইন	১৮৫,৫১১,০০০	১৩৭,৮৯৭,৭৩৩
কিউবা	৬,২০২,৮০০	৭,৫৫৩,৮১৮	পেরু	১৮০,৫০০	১,৮৮৮,০০০
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৬,১১৬,৮৬৭	৬,৯৬১,৮৮৮	অস্ট্রেলিয়া	১৫,৮৭১,৫১৯	১২,১৪১,১৩৪
আর্জেন্টাইন	৬৮৪,৫৫০	৭,০৭৪,২০০	নিউজিল্যান্ড	১,৫৯৩,৪০২	২,৭৪৫,৭১৫
চিলি	৪,১৩৫,৪০০	২,০৬৮,৭৪৯	অস্ত্রা দেশ-মুহ	১৪,০৫৭,২২৪	১৭,৬৩৬,০১৯
পেরু	৪,১০২,০০২	৫,০১৩,২০৩			
অস্ট্রেলিয়া	৮৫,৭৩৮,৯৭৩	৬৪,৩৭৫,৩২৪	মোট গজ	৬৯০,২৭৭,৬৯৫	৭২৭,৭১৪,৮৯৯
নিউজিল্যান্ড	১,৯২০,৯৫৯	৩,১১৩,৪৫০			
হাওয়াই	১০,১৯৫,৫৫৩	৯,৬৮২,০০০			
অস্ত্রা	১৩,১৯৫,৫৫৩	১৬,১৫৫,০০৮			

ভবিষ্যতের আশা ও আশঙ্কা কি—

উদাহরণস্বরূপ জাতি কখন পরম্বাণোপকী থাকিতে চাহে না। বাংলার চাষী কিংবা চটকনওয়ালা কখনও এরূপ আশা করিতে পারেন না যে, কাঁচা পাট কিংবা চটের জন্ত সকল দেশই চিরকাল তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে। আজ নানা দেশে এই সম্পর্কে দুই ভাবে চিন্তা হইতেছে, প্রথম—পাটের পরিবর্তে অল্প কোন

মোট সংখ্যা—

২৮৮,৫২২,৫৫৫

২৮০,৭৫৬,৮৭৭

ওজন—টন

২৮২,৩৩৭

২৭৩,৭৫১

জিনিষ আবিষ্কার, ও দ্বিতীয়—বাংলা হইতে কাঁচা পাট সংগ্রহ করিয়া চট ইত্যাদি প্রস্তুত।

(ক) ডচ ইষ্টইন্ডিজ—পাঁটের ছালার সম্বন্ধে বড় বরিসদার ডাচ ইষ্টইন্ডিজ। এই দেশ হইতে বত চিনি রপ্তানি হয় তাহা ভারতে প্রস্তুত ছালায়ই পাক করা হইত। কিন্তু কতিপয় বৎসর ব্যবৎ পাটের পরিবর্তে অন্য কোন জিনিষে তৈয়ারী ছালা ব্যবহার করা সম্ভবপর কি না সে পরীক্ষা চলিতেছে। প্রথম চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হইয়াছে; সত্য ভাল হয় না বলিয়া সিসল পরিত্যক্ত হইয়াছে। স্নোজেলার দ্বারা কাজ চলিবে এইরূপ স্থির হইয়াছে, তবে তাহাতে খরচ বেশী পড়ে—কি করিয়া কম খরচে সূতা বা চট প্রস্তুত করা যায়, তাহারই গবেষণা চলিতেছে। অর্থাৎ অনুর ভবিষ্যতে পাটের একজন বড় গ্রাহক হাতছাড়া হইবে।

(খ) নিউজিল্যান্ড—বহুবিনের গবেষণার পর, নিউজিল্যান্ডে একটি সুস্থৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—নিউজিল্যান্ডের তিসি বা মসিনা গাছের কাঁশে ছালা প্রস্তুত হইবে। এই ছালা বাজারে বাহির হইলে শুধু নিউজিল্যান্ড নহে, আষ্ট্রেলিয়াও ভারতবর্ষ হইতে পাট বা চট লইবে না। বিদেশের আরও আশঙ্কা এই যে, নিউজিল্যান্ডে এত অধিক তিসি বা মসিনা উৎপন্ন হয় যে, দুনিয়ার বাজারে পাটের এক বড় প্রতিদ্বন্দী উপস্থিত হইল।

(গ) ব্রাজিল—ডাঙা জুট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি বলিয়াছেন যে, ব্রাজিলের সহিত তাহাদের পূর্ব বিবৃত বাধনায় ছিল; এখন সে বেশ হইতে মাল সরবরাহ করিবার জন্য আদেশের বড়ই অভাব। বর্তমানে বাণিজ্যের জগৎ-কোড়া দূরবর্তী ইহার কারণ নহে, কোন কোন জিনিষের জন্য কাগজের আবরণই ব্যবহৃত হইতেছে অর্থাৎ কাগজ পাটকে ব্রাজিলের বাজার হইতে তাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।

(ঘ) পোলাণ্ড—পাঁটের পরিবর্তে শনের দ্বারা কাজ চলে কি-না সে বিষয়ে পরীক্ষা হইতেছে।

(ঙ) ইটালী—এক সময়ে পাটের বাজার বড়ই মন্দা ছিল, কিন্তু পুনরায় কাজ ভালই হইতেছে—

	নবেম্বর	ডিসেম্বর
মাকু ১৯৩২	৫৫.৭	৫৮.৮
১৯৩৩	৭০.৪	৮০.৩
উৎপাদন ১৯৩২	৫০.৩	৫১.৪
১৯৩৩	৬২.০	৭০.৪
কাঁচা মাল আমদানি (কুয়িটালার ব্যতীত)		
১৯৩২	১৬,৩১৪	১৯,১১১
১৯৩৩	২৭,৫৭৮	৩০,১৭৩

(চ) জাপানী—ভারতবর্ষে তৈরি চটের ছালার আমদানি জাপানীতে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩২ সালে ছিল ৩৭৪ টন, ১৯৩৩ সনে নামিয়া হইল ২৮৪ টন। কিন্তু ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জাপানীতে চটের রপ্তানিই কমিয়াছে, পাটের নহে। বরং কাঁচা পাটের রপ্তানি বাড়িয়াছে। ১৯৩২ সালে ৫০,০০০ হইতে ১৯৩৩ সনে ৮৫,০০০ বাড়িয়াছে। ভারত হইতে চট ও ছালা না লইলেও হলান্ড, বেলজিয়াম ও চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রস্তুত চটের আমদানি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। জাপানীতে প্রস্তুত ভারতীয় ক্রেত কমিশনার আছেন। তিসি বাতালী—মিঃ এফ ওয়েলিংটন, সি.এস। তাহার এবং অপরাপর বিশেষজ্ঞদের মতে এই যে—

১। জাপানীতে সকল ছালাই “Veredlungsvorkehr” বা অপরিণত মাল বলিয়া গণ্য হুতরাং তাহার উপর কোন শুক বসানো হয় না। হলান্ড, বেলজিয়াম ও চেকোস্লোভাকিয়াতে বহু কৃষিজাত ত্রাণ জাপানী হইতে রপ্তানি করা হয়। ইহা প্রমাণ করা কঠিন নহে যে, এই সকল বেশ হইতে আমদানী ছালাতেই এই সব দেশের জন্য রপ্তানির মাল প্যাক করা হইয়া থাকে।

২। সিনা শুক ছালা বাইতে পারে বলিয়াই, জাপানী হইতে দেশ চিনি, ময়দা ও সার (fertilizer) রপ্তানির জন্য প্রায় সমস্ত বৈদেশিক ক্রেতাই নিজ নিজ দেশ হইতে ছালা প্রেরণ করেন। জাপানী হইতে ভারতবর্ষে বিট (Beet sugar) আমদানি হইত এবং তাহার জন্য ভারতীয় ছালাই ব্যবহার করা হইত, এখন জাপানী হইতে বিটের রপ্তানি একপ্রকার বন্ধ, হুতরাং ভারতের ছালার ব্যবহারও নাই।

৩। জাপানী হইতে অধিক মাত্রার কৃষিজাত ও শিল্পজাত ত্রাণ আমদানি করা হয় বলিয়া, হলান্ড, বেলজিয়াম ও চেকোস্লোভাকিয়ার সহিত ব্যাকের মারকং লেনদেনের পূর্ব সুবিধা; হলান্ড ও জাপানীর মধ্যে “ক্লিয়ারিং সিস্টেম” (clearing system) প্রবর্তিত হওয়ার পর হলান্ড হইতে ছালা আমদানী বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ছ) জাপান—চট নির্মাণে জাপান নূতন ত্রুতী। সস্তায় মাল বিক্রয় করিতে জাপানীরা শুগার, ভারতবর্ষ হইতে তুলা কিনিয়াই ইহার ভারতে অতি সস্তা দরের কাপড় উপস্থিত করিয়া ভারতীয় কলগুলারাল-দিগকে সম্বৃত্ত করিয়াছিল।

সস্তায় কাঁচা মাল পাইবার জন্য বাংলার চটকলগুলারাল পাটের চাব নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেন নাই; অথচ চটের ছালার দাম বাড়াইবার জন্য নিজেরা যুক্তি করিয়া চট নির্মাণ সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারো দেখিতেছেন যে বাংলার পাট জাপান ও অন্তর্ভুক্ত দেশের কলগুলারাল সস্তায় কিনিয়া লইতেছেন ও বাংলা দেশে প্রস্তুত চটের চেয়েও সস্তায় চট বিক্রয় করিতে উদ্যত এই বাংলা দেশেই—অন্ত স্থানের ত কথাই নাই।

হুতরাং পাটের চাব ও রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রশ্ন নূতন করিয়া আবার উঠিয়াছে।

কাহার স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন?—

বাহার কাঁচা মাল উৎপাদন করেন ও বাহারা ঐ কাঁচামাল হইতে নানাবিধ পণ্য তৈরি করেন তাহাদের স্বার্থ এক নহে। ডচ-পূর্বভারত, নিউজিল্যান্ড, ব্রাজিল বা পোলাণ্ড হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে বাংলার কৃষকগুলের সমুহ বিদেশের আশঙ্কা, কিন্তু জাপানী, ইটালী ও জাপানের সংবাদে বাংলার কৃষকের পক্ষে অভ্যন্ত আশার কথা। জাপানীতে ছালার রপ্তানিই কমিয়াছে, কাঁচা পাটের রপ্তানি বাড়িয়াছে। ইটালীতেও সেই অবস্থা, জাপানও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার পাটের বড় বরিসদার হইয়া উঠিবে অর্থাৎ কাঁচা পাট বিক্রয়ের জন্য কেবল মাত্র ডাঙার দিকে চাহিয়া থাকিবার অবস্থা বাতালী কৃষকের বেশীদিন থাকিবে না। ক্রেতগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইলেই উৎপাদকের মনোভাবের সুযোগ উপস্থিত হয়—বাংলার কৃষক কি সে সুযোগের শুভল লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে?

কিন্তু বাংলার চটকলগুলারাদের স্বার্থে আঘাত পড়িবে; কথা ও দক্ষিণ মুগুণ কিংবা জাপানে বতই মিল স্থাপিত হইবে ততই বাংলার

চট্টের চাহিদা কমিবে। তাহাদের দ্বার্ষিক রক্ষার একমাত্র উপায় পাট রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ।

এই চটকলওয়াদিগণ অবিকারী ইংরাজ, ইহাদের ইতিহাস (১) [ভারতীয় (২)] জটিল এসোসিয়েশন নামক এক সন্ধ্যা আছে। ভারতীয় চটকল সাম্রাজ্য কয়েকটি, বধা—ইলিয়াম, বিডলা, হুস্টনটাদ, আদমজী, রাজা জানকীনাথ। সার ডেবিড ইউল ইংল্যান্ডে উপহাস করিয়া বলিতেন—বৈদেশিক (!) কল (foreign mills)। কিন্তু আজ সত্য সত্যই বৈদেশিক কল দেখা দিয়াছে।

রপ্তানির নিয়ন্ত্রণে কি লাভ হইবে?—

যদি পাটের রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে পাটের দর কিছু হয় ত নামরিক ভাবে বাড়িবে। কিন্তু ইহার পরিণাম কি ভাল হইবে? পাটের পরিবর্তে অন্য জিনিষ আবিষ্কারের যে চেষ্টা নানা দেশে চলিতেছে, তাহার ফলে কি ইহা নাই যে পাট তথা চট ও ছালার ক্ষয় পূর্ব চড়া দাম দিতে এবং সম্ভবিশেষের সুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতাইছিল? ছুনিয়ার বাজারে সপ্তাহের পাট ছাড়িয়া দিয়া ঐ আবিষ্কার চেষ্টাকে পরোক্ষভাবে বাধা দেওয়া কি বাংলার কৃষকের পক্ষে ভাঙ্গী মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন নহে? পাটের দাম কমিয়া গিয়াছে, ইহাই বাংলার কৃষকের প্রাণ মর্মে; এত কম মূল্যেও সমুদায় পাট বিক্রয় হয় না—ইহাই তাহাদের চরম দ্রুত। যদি বাংলার সমুদায় পাট রপ্তানি ইহার প্রযোগ পায় তবে ক্ষতিতেও লাভ দাঁড়াইবে। কমলাজে, অধিক বিনয় প্রকৃত ব্যবসায়ীর আদর্শ। বাংলা একটি ক্ষুদ্র দেশ, তাহারও সব জেলায় পাট হয় না, কয়েকটি জেলার মাত্র হয়। এই বিশাল বিশ্বের বিরাট যোগান দিয়াও বাংলার পাট উৎপাদ থাকিবে—একটি আশঙ্কা নাই।

সুনিয়ন্ত্রিত একটি স্বর্ণালকার সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী ও তাহার সংগ্রামের মধ্যে এক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল; মহাত্মা অলকার জলে ছুড়িলেন—বিতর্ক ধামিরা গেল। আজ পাটের রপ্তানি শুক লইয়া এমন বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, বঙ্গের বিরুদ্ধে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি এই শুক সম্পূর্ণরূপে ঝর হই, তবে শুধু যে এই বিতর্কের অবসান এবং শেষ দূর হইবে তাহা নহে, অবশ্য গতির প্রযোগে ছুনিয়ার বাজারে পাটের চাহিদা বাড়িবে, বাংলার কৃষকগণের স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে।

বড় বিপদ ও তাহার প্রতিকার কি?—

বাংলার কৃষকের পক্ষে আশঙ্কার কথা এই যে, পাটের পরিবর্তে অন্য জিনিষ আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে, ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না। পাটের চাব অথবা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ইহার প্রতিকারের উপায় নহে। পাটের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কি কি কাজ হইতে পারে তাহা আবিষ্কার করিয়া চাহিদা বাড়ানোই একমাত্র প্রতিকার। পাটের রপ্তানি-শুল্ক ত অপাভাষি হইয়া গেল, কিন্তু চাহিদার বৃদ্ধির চেষ্টা কাহার ভাগে? যেরূপে জিনিষ থাকিলেই বাজারে চাহিদা হয় না। এই ক্ষমতা চাই প্রচার, চাই গবেষণা ও পরীক্ষা।

পূর্বে যে ডাঙী সত্তার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে সভাপতি অঙ্গীকারগতক আশার বাণী শুনাইয়াছেন যে, রাষ্ট্রা নিদ্রাণে চট্টের ব্যবহার চলিবে, আমেরিকার বৃদ্ধ রাষ্ট্রো ইহার পরীক্ষা সফল হইয়াছে, ইংলণ্ডেও পরীক্ষা চলিতেছে।—কিন্তু এই পরীক্ষা চলা উচিত ছিল রপ্তানি-শুল্কভাঙ্গী ভারত সরকারের রাজধানী নয় দিল্লীতে, পাটের দেশ বাংলার রাজধানী কলিকাতায়।

সম্রাট *Teer and Bitumen*, পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে যে, চট রেলপথ নির্মাণে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারতবর্ষের রেলওয়ে বোর্ড হইতে এইরূপ প্রস্তাব পাঠিলেই শোভন হইত।

পাট আরও কত প্রয়োজনে লাগিবে পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। দেশের একটি সম্পদকে গলা টিপিয়া মারা জাতির ধনহীনের সহায়ক নহে।

বিদেশে কৃত্তী বাঙালী ছাত্র—

মিঃ বি, পি, ঘোষ বিলাতের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে



মিঃ বি, পি, ঘোষ

ইকন-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করিয়া পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

ওরিয়েন্টাল জীবন-বীমা কোম্পানীর ‘ডায়মণ্ড জুবিলী’ উৎসব—

গত ৫ই মে বোম্বাইয়ের ওরিয়েন্টাল গার্মেন্ট সিকিউরিটি জীবন-বীমা কোম্পানীর ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ার ‘ডায়মণ্ড জুবিলী’ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে জীবন-বীমা কোম্পানীর ইতিহাসে ওরিয়েন্টালের স্থান অতি উচ্চে। ভারতীয় স্বাধিকারমূলক জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে ইহা সর্বপ্রাচীন। ১৮৭৪ সনে বোম্বাইয়ে ওরিয়েন্টাল কোম্পানী স্থাপিত হয় ও কার্য আরম্ভ করে। এখন ইহার কার্য দেশব্যপী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি সহজে ভারতবাসীদের জীবন বীমা করিতে চাহিত না। তাহাদের ধারণা—ভারতবাসীদের জীবন বিদেশীদের দ্বারা নিরাপদ নহে। ওরিয়েন্টাল বীমা কোম্পানী এই ষাট বৎসর ধরিয়া কার্য করিয়া ইহার অসারতা প্রমাণিত করিয়াছে। ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের দ্বারা পরিচালিত বীমা কোম্পানীর মধ্যে ওরিয়েন্টাল শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার কার্যসম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৯০০ সনে ইহার ৩৬,১৯১টি জীবন-বীমা বলবৎ ছিল, তাহার পরিমাণ ছিল ৭,০৪,২৬,২০০ টাকা। ওরিয়েন্টাল জীবন-বীমা কোম্পানীর দ্বারা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ সাহায্য হইবে। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

প্রবাসী বাঙালীর নববর্ষোৎসব—

বাঙালীরা প্রবাসে থাকিয়াও সামাজিক আন্দোলন-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—উহা আশা ও আশ্বাসের কথা। ব্রহ্মবর্ষের বেসিন শহরে 'বেঙ্গল মোস্তাল ফায়ে'র সহায়তায় প্রবাসী বাঙালী বালক-বালিকারা গত ১লা বৈশাখ নববর্ষোৎসব পালন করিয়াছে। উৎসবে

বিভিন্ন পর্বেই সম্পাদনের জন্য দেশী ও বিদেশী লক্ষপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত। সুদীর্ঘশেষ উপস্থিতি দিয়াছেন। পত্রাবের উত্তর রবীন্দ্র-বিরাটপর্ক ও প্রাগ-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিক্টরিনিউজ সভাপর্ক সম্পাদন করিতেছেন। প্রশ্ন উদ্যম আমাদেবে দেশে এই প্রথম, এবং ইহা দেশ জাতীয় অনুষ্ঠান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।



বাম দিক হইতে—শ্রীমতী গুরুন বহু, শ্রীমতী হুবা দাস, শ্রীমতী কল্যাণকণা দেব, শ্রীমতী ইন্দু সান,

শ্রীমতী ইন্দু দাস, শ্রীমতী অশিমা ঘোষ, শ্রীমতী রবি রায়। সমুখে—শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ।

আত্মিক, সঙ্গীত ও নৃত্য বড়ই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। সর্বশেষে বালিকারা 'একলব্য' অভিনয় করে। অভিনয় দেখিয়া উপস্থিত জনগণ মুগ্ধ হন।

মহাভারত-সংস্করণে বাঙালী—

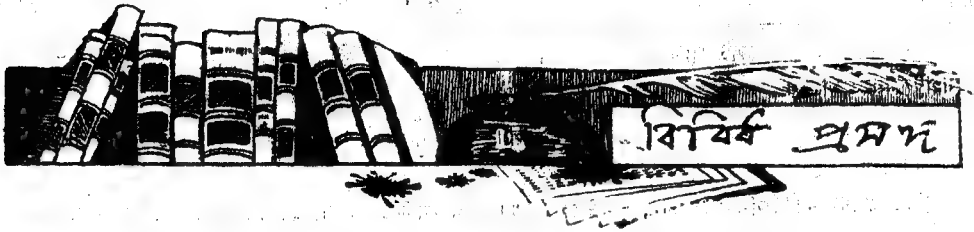
গত দুইগব সংস্কৃত সাহিত্যসেবিত্রপণের অগ্রগণ্য কর্মীর স্তর রামকৃষ্ণ গোস্বামী ভাণ্ডারকরের নামে প্রতিষ্ঠিত পুনর গবেষণা-প্রতিষ্ঠান (Bhandarkar Oriental Institute) বহুবর্ষ যাবৎ সংস্কৃত মহাভারতের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সম্পাদিত করিবার ভার লইয়াছেন। সম্প্রতি এই সংস্করণের আদিপর্ক পুনর উত্তর বিষ্ণু স্বরূপের কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একটি পর্ক নির্ভূত করিয়া সম্পাদন করিতে ছয় বৎসরের উপর সময় লাগিয়াছে, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন পাঠের জ্ঞান পুষ্কলখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া মিলাইতে হইয়াছে। এই বিরাট অনুষ্ঠান দু-এক জন ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব ও বহু সময়সাধ্য বলিয়া দুইটুকু প্রতিষ্ঠান-মহাভারতের

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এই অনুষ্ঠানে বাংলা দেশ হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর হরীশচন্দ্রের মহাশয়কে সম্প্রতি উদ্যোগপর্ক সম্পাদন করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। ডক্টর দে দীর্ঘ এই কাধ্যে যোগদান করিবেন।

রবীন্দ্র-পদক—

"রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাংলার পৌচিহ্ন" নামক প্রবন্ধ-প্রতিবোধিতার, পাটনা ল'কলেজের ছাত্র অমৃত রাধামোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধটি সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনিই এ বৎসর "রবীন্দ্র-স্বর্ণপদক" পুরস্কার পাইলেন।

"রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উৎসবকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্ত দিল্লীর বেঙ্গলী ক্লাব 'রবীন্দ্র-পদক' নাম দিয়া প্রতি বৎসর একটি করিয়া স্বর্ণ-পদক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রবাসের বাঙালী ছাত্র ও ছাত্রীপণের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অমূল্য এই আয়োজনের মধ্যে উল্লেখ্য।



“ভারতী” বরণ-কলমের কারখানা

কয়েক দিন পূর্বে আমরা কুমার গোকুলচন্দ্র লাহা এবং কোম্পানীর ‘ভারতী’ বরণ-কলমের কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহাতে নানা দামের ও নানা রকমের বরণ-কলম ছাড়া পেন্সিল এবং পেনহোল্ডার ও নিব প্রস্তুত হয়। সোনার যে নিবের ডগায় ইরিডিয়াম ধাতুকণা লাগান থাকে, তা ছাড়া বরণ-কলমের অত্র সব অংশই কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া স্থখী ও উৎসাহিত হইলাম। ঐক্লপ নিবও প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু



ভারতী বরণ-কলম কারখানায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখনও বরণ-কলমের কাটতি ভারতবর্ষে এত বেশী হয় নাই, যে, তাহাতে বহুমূল্য যন্ত্রপাতি আনাহিলেও ঐক্লপ নিব বিদেশী নিবের সঙ্গে দামে টক্কর দিতে পারে। পরে উহাও প্রস্তুত হইবে—মূলধনের, যন্ত্রের, কারিগরের অভাব হইবে না; কেবল কাটতি বাড়িলেই সব হইবে। কারিগরের অভাব হইবে না যে বলিতেছি, তাহা বাঙালী কারিগরদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি। কারণ, এই কারখানায় সামান্য ২১১ জন ছাড়া সব কারিগর ও প্রমিক বাঙালী। তাহাদের মধ্যে ইংরেজী-জানা প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়া বুঝও আছে। তাহাদের রোজগার সাধারণ কেবানীদের চেয়ে কম নয়।

এই কারখানায় বরণ-কলম ছাড়া পেন্সিল এবং পেনহোল্ডার ও নিব প্রস্তুত হয় বলিয়াছি। তাহার সমুদয় অংশই কারখানায় প্রস্তুত হইতে দেখিলাম। বরণ-কলমের কালি এবং ক্লিপও এখানে প্রস্তুত হয়।

এই কারখানার অনেকগুলি যন্ত্রও কারখানাতেই বাঙালী কারিগর দ্বারা নির্মিত। উক্তর নরেন্দ্রনাথ লাহা ইহার তত্ত্বাবধায়ক, এবং শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দত্ত বি-এ ও অমরনা-প্রসাদ শীল বি-এ ইহার কার্যাব্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কারখানা দেখিতে আসিয়া ফাউন্টেন পেনের বরণ-কলম নাম দিয়াছেন।

স্থল্য এবং শক্ত রকমের কারিগরীর কাজও বাঙালী কারিগরদের দ্বারা হইতে পারে, এই ধারণা আমাদের আগে হইতেই ছিল। তাহার একটি প্রমাণ এই কারখানায় পাইলাম।

পান্সালাল শীল বিদ্যামন্দির

কলিকাতার বেলগাছিয়া পল্লীস্থিত এই বিদ্যামন্দিরটি কয়েক দিন পূর্বে আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা নিজের জমীতে নিজের বাড়িতে অবস্থিত। শিক্ষাবিশয়ে ইহার বিশেষত্ব এই, যে, এখানে সাধারণ কেতাবী শিক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্যন্ত দেওয়া হয়, অধিকন্তু অনেক রকমের পণ্যাশিল্প এবং কিছু ললিত-কলা শিখান হয়। যে-সব ছাত্র কেবল কারিগরী শিখিতে চায়, তাহাদিগকে সাধারণ শিক্ষার জেগীতে বাইতে হয় না; কিন্তু বাহারা সাধারণ শিক্ষা পায়, তাহাদিগকে কোন দুটি পণ্যাশিল্প শিখিতে হয়। বাহারা কেবল কারিগরী শিখিবে, তাহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর হইলে তাহাদিগকেও লিখনপঠনকর্ম করিয়া দেওয়া ভাল।

এই বিদ্যামন্দিরে কোন ছাত্রকেই বেতন দিতে হয়

না, ইহার ছাত্রবাসেও বারটি ছাত্র বিনাধারে থাকিতে ও আহাৰ করিতে পারে।

কারিগরী-বিভাগে শিক্ষণীয় বিষয় অনেকগুলি। কর্মকার-বিভাগে ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, নকুন, দা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে দেখিলাম। জিনিষগুলি ভাল, দামও বেশী নয়। স্বত্বধরের কাজ, তত্ত্ববায়ের কাজ, চর্মকারের কাজ, দর্জির



পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকগণ ও প্রবাসীর সম্পাদক

কাজ, মণ্ডরীর কেতাব বাধাইয়ের কাজ, প্রভৃতিও শিখান হয়। সকল বিভাগেই আবশ্যক যন্ত্রপাতি আছে। বেতের হুম্বর স্ট-কেস, সাজি, বারকোশ, প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতেছে। এখানে রেখাঙ্কন, চিত্ররঞ্জন ও চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি এবং ফটোগ্রাফীও শিখান হয়। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, যে, এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক ছাত্র নিজের উপার্জন দ্বারা আবলগী হইতে পারিয়াছে। তাহা সম্ভাব্যের বিষয়। আবলগী হইতে পারা চাই। তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তাহাদেরও নিজে কিছু উপার্জন করিতে পারা আবশ্যক। তাহাতে মাছবের নিজের উপর বিশ্বাস ও প্রজ্ঞা বাড়ে।

কারিগরী দ্বারা রোজগার করিয়া বাহাদিগকে খাইতে হইবে, কারিগরী-শিক্ষা কেবল তাহাদেরই আবশ্যক, ইহা একটা ভ্রান্ত ধারণা। হাত-পায়ের দ্বারা নানা রকম কাজ করিতে পারিলে তাহাতে বুদ্ধিবিকাশেরও সাহায্য হয়। এই জন্য কোন-কোন রকম কারিগরী শিক্ষা করা সকল বালক-বালিকারই উচিত। শিক্ষার প্রণালী ভাল হইলে

সাধারণ কেতাবী সমুদয় বিষয় শিখিয়াও কিছু কারিগরী শিখিবার সময় তাহাদের যথেষ্ট হইতে পারে।

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ইহাকে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ত্রমোদিত বিদ্যালয়সকলের তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। ইহার ছাত্রেরা প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে ম্যাট্রিক দিতে পারে। ইহাতে কিছু অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু সুবিধাও আছে। সকল মাছবের, সকল বালক-বালিকার, প্রকৃতি, শক্তি, প্রবৃত্তি এক রকম নয়। সুতরাং একই রকমের শিক্ষা সকলের উপযোগী হইতে পারে না। তত্ত্বিম, শিক্ষাপ্রণালীও নানা প্রকার আছে; তাহার মধ্যে কোনটি সব দিক দিয়া ভাল এবং কোনটি সব দিক দিয়া মন্দ, এরূপ বলা যায় না। শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি সাধনের জন্ত নানাবিধ পরীক্ষণ (experiment) আবশ্যক। যদি সব বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ত্রমোদন লইতে হয়, তাহা হইলে সবগুলাই এক ধাঁচের, সবগুলার শিক্ষিতব্য বিষয় ও পাঠ্যপুস্তক এক রকম, এবং সবগুলার শিক্ষাপ্রণালী একই প্রকার হয়। তাহা হইলে বালক-বালিকাদের প্রকৃতি, শক্তি ও প্রবৃত্তিভেদে শিক্ষার প্রকারভেদ করা যায় না। শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের জন্ত পরীক্ষণও হয় না। এই জন্ত আমাদের বিবেচনায় এমন কতকগুলি বিদ্যালয় থাকা আবশ্যক যেগুলির পরিচালকগণ শিক্ষাদান বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা করেন, কিংবা স্বাধীন চিন্তায় সমর্থ শিক্ষকদের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ। এরূপ বিদ্যালয় ছাত্রদত্ত বেতনে না চলিবার সম্ভাবনা। এই জন্ত তাহার ক্ষতন্ত্র আয় থাকা আবশ্যক। পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরের তাহা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ত্রমোদিত বিদ্যালয় হইতে কোন ভাল ছাত্র বিশেষ পায়দর্শিতার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সরকারী বৃত্তি পায়। অন্ত্রমোদিত বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইলে তাহা পায় না। এই জন্ত বেশ বুদ্ধিমান ছেলেরা অন্ত্রমোদিত বিদ্যালয়ে ভর্তি না হইতে পারে। কিন্তু এরূপ বিদ্যালয় হইতে বিশেষ পায়দর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য কয়েকটা বৃত্তি রাখিলেই ভাল ছাত্র পাওয়া যাইতে পারে। আমরা এই কথা বলায় পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে এত কথা বলিবার কারণ এই যে, এইরূপ বিদ্যালয় আরও হওয়া আবশ্যিক। সম্ভবতঃ বাংলা দেশে ইহাই এই শ্রেণীর একমাত্র বিদ্যালয় নহে।

মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতা আগমন

হিন্দু সমাজের অবনত আতিসমূহের উন্নতিবিধানার্থ এবং তাহাদিগকে মহুষ্যোচিত সামাজিক মর্যাদা দিয় সমাজসেহের সম্পূর্ণ কার্যাক্ষম অঙ্গে পরিণত করিবার জন্ত মহাত্মা গান্ধী চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। কলিকাতায় তাঁহার আগমন তাঁহার ভ্রমণের ঊর্দ্ধ্ব অংশ। প্রবাসী মাসিক কাগজ। দৈনিক কাগজের মত ঠিক তাঁহার আগমনের আগের দিন বা আগমনের দিন তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার সুযোগ আমাদের হইবে না। সেইজন্য আমরা আগে হইতেই সর্বাস্তঃকরণে তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।

হিন্দু সমাজে কয়েক শতাব্দী আগে হইতে যে ভাঙন ধরিয়াছে এবং যাহা এখনও চলিতেছে তাহার একটি প্রধান কারণ অবনতশ্রেণী-সমূহের অবস্থা, তাহাদের নানা মহুষ্যোচিত অধিকার না থাকা, তাহাদের সমুচিত মর্যাদার অভাব, তাহাদের নানা অপমান এবং তাহাদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন। ভারতীয় বৃত্ত মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান আছেন, তাহাদের অধিকাংশ বা তাহাদের পূর্বপুরুষদের অধিকাংশ বিশেষ হইতে আসেন নাই। হিন্দু সমাজের লোকেরা মোহনদী ও খ্রীষ্টিয় ধর্ম অবলম্বন করায় এই দুই ধর্মসম্প্রদায়ের

লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। এই বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হিন্দু সমাজে অবনত শ্রেণীর লোকদের অবস্থা। আমাদের মত যাহারা কোন কোন বিষয়ে সামাজিক বিজ্ঞোহ করিয়াছেন, তাহারাও যে একথা বুঝিয়াছেন ও বলিতেছেন তাহা নহে, যাহারা বিব্রোহ করেন নাই, তাহারাও তাহা বুঝিয়াছেন ও বলিতেছেন, এবং অবনত শ্রেণীসকলের উন্নতির জন্য নানা



মহাত্মা গান্ধী

দিকে চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা মহাত্মা গান্ধীর ভারতীয় কার্যক্ষেত্রে—বিশেষতঃ সমাজসংস্কারক্ষেত্রে—অবতীর্ণ হইবার অনেক পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে

এই কাৰ্য্যক্ষেত্রে তিনিই প্রধান পুরুষ, তিনিই প্রধান কর্মী।

তিনি বাহা করিতেছেন, হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য তাহা একান্ত অবশ্যক। হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনও আছে। মুসলমানদের ও খ্রীষ্টিয়ানদের সমাজের কতকগুলি উৎকর্ষ আছে বটে, কিন্তু হিন্দু সমাজের হিন্দু সংস্কৃতির এবং হিন্দু প্রকৃতির কতকগুলি উৎকর্ষ আছে। হিন্দু সমাজ রক্ষিত না হইলে এই উৎকর্ষগুলির বিস্তারিত হইতে পারে না। তাহা হইলেই কতিগ্রস্ত হইবে। এই সব কুফল নিবারণের জন্য হিন্দু সমাজকে রক্ষা ও জনবহুল এবং শক্তিমান রাখা আবশ্যক।

কিন্তু যদি হিন্দু সমাজকে এইরূপ অবস্থায় উন্নীত করিয়া রক্ষা প্রয়োজন না থাকিত, তাহা হইলেও হিন্দু অবনত জাতি-সমূহের উন্নতি বিধান আবশ্যক হইত। মানবজাতির কোন অংশকেই হীন করিয়া রাখা বা হীন থাকিতে দেওয়া গহিত, অসুচিত, অধর্ম।

এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, যে, মহাত্মা গান্ধী অতি মহৎ কাজ করিতেছেন। তাহার সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। তাহা আমরা আমাদের বাংলা ও ইংরেজী মাসিক-পত্র দুটিতে প্রয়োজন-মত জানাইয়াছি, পরেও আবশ্যক হইলে জানাইব। তাহার সহিত কতিপয় কখন যে পত্রব্যবহার হয়, তাহাতেও আমরা এই মতভেদ গোপন করি না। কিন্তু কাহারও সহিত কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকিলে অত্র যে-সব বিষয়ে ঐক্য আছে, তাহার নিমিত্ত প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব থাকিতে পারে না, এরূপ মনে করা ভুল।

[এই প্রেসদটি ছাপিতে যাইবার পূর্বে কাগজে দেবিলায়, গান্ধীজী এখন বাংলা দেশে আসিবেন না। ইহা দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমাদের আগতলক্ষ্যণ স্পষ্ট রহিল না, বাতিলও হইল না। এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী কিংবা স্বদেশের “গান্ধী অভ্যর্থনাসমিতি” আমাদের উপর হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ!]

প্রমথনাথ বসু

প্রায় আশী বৎসর কলে রচিত হুণ্ডিত ও সুলেখক, ভারতবর্ষ প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনব্যাপী প্রাণী অধ্যয়নী

এবং সমর্থক প্রমথনাথ বসু মহাশয় পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু ছোটনাগপুর নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ কতিগ্রস্ত হইল। ভারতবর্ষের বাহিরে যাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব অহুভব করেন, তাহারাও এই কতি অহুভব করিবেন।

তিনি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, কিন্তু পরে নিজের চেষ্টায় সাহিত্য



পরলোকগত প্রমথনাথ বসু

ও দর্শনেও জ্ঞানবান ও পারদর্শী হইলেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলী ও নানা প্রবন্ধ দ্বারা স্বদেশবাসীদিগকে সেই জ্ঞানের অংশী করিয়া গিয়াছেন।

তিনি গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যান এবং সেখানে প্রধানতঃ ভূতত্ত্ব এবং তাহার সঙ্গে অত্র কোন কোন বিজ্ঞান শিখিয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ব-বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। চাকরী তিনি দক্ষতা ও স্বাধীনচিন্তার সহিত করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় লোক বলিয়াই তাঁহার অধস্তন একজন ইংরেজ কর্মচারীকে তাঁহাকে ডিঙাইয়া উচ্চপদ দেওয়ার তিনি ১৯০৩

সালে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গোকুমহিবানী, বাসামপুর, পাটঙ্গীর ও কালীঘাটিতে তিনি লৌহ আবিষ্কার করেন। তিনিই মিঃ জামশেদজী টাটাকে জামশেদপুরে লোহা ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করিতে প্ররম্ভ দেন, এবং তদনুসারে সেইখানে কারখানা স্থাপিত হয়। ইহা এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রধান এবং পৃথিবীর অত্যন্ত প্রধান লোহা-ইস্পাতের কারখানা।

সরকারী চাকরী ছাড়িয়া দিবার পর তিনি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতত্ত্ববিৎ নিযুক্ত হন এবং তখন গোকুমহিবানীতে লৌহের খনি আবিষ্কার করেন। তাঁহাকে ময়ূরভঞ্জের স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ডক্টরেব এই কার্যে নিযুক্ত করেন। মহারাজা অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। যোগেশ বাবু একদা তাঁহাকে বলেন, “তোমার রাজ্যে কোথায় কি বহুমূল্য সম্পদ আছে, তাহা তুমি জান না; তুমি কিরূপ মহারাজা?” অন্তঃপর বহু মহাশয় ভূতত্ত্ববিদের কার্যে নিযুক্ত হন। গবর্নমেন্টের চাকরীতে থাকিবার সময় তিনি জব্বলপুর ও দাঙ্গিলিঙে কয়লা এবং রায়পুর জেলার গ্র্যানাইট ও অত্যন্ত বনিজ আবিষ্কার করেন।

প্রথমখণ্ড বহু মহাশয় চরিত্রবান, বিনয়ী পুরুষ ছিলেন।

লোহার খনি আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

“Well, to compare small things with great, I discovered them in the sense that Amerigo Vespucci is said to have discovered the continent which is called after him. But, as I have shown in my *Epochs of Civilisation*, for many centuries before him it was well known to the Asiatics, and the Chinese and the Japanese had probably small settlements there. All that Amerigo and Columbus a few years before him did was to bring it to the notice of the Europeans. The iron ores of Mayurbhanj had long been worked by the snailers of the State before I came upon them. All that I did was to make them known to the industrial public.”—*Tisco Review*, April 1933, p. 18.

সংক্ষেপে তাৎপৰ্য্য। বড় জিনিষের সঙ্গে ছোট জিনিষের তুলনা করিলে বলা যায়, যে, আমেরিকো ও কোলম্বুস যে-অর্থে আমেরিকার আবিষ্কারক, আমিও সেই অর্থে গোকুমহিবানী প্রভৃতি স্থানের লোহার বনির আবিষ্কারক। আমার “সভ্যতার যুগাবলী” গ্রন্থে দেখাইয়াছি, যে, তাঁহাদের অনেক শতাব্দী আগে এশিয়াবাসীরা আমেরিকার অভিন্ন অংশত ছিল এবং টেকি ও জাপানীদের যোগে হয় দেখানি ছোট ছোট উপনিবেশ ছিল। আমি ময়ূরভঞ্জের লোহার বনিজিঙ্গির সন্ধান পাইবার অনেক আগে হইতে সেই রাজ্যের লৌহপ্রাক ও সন্ধ্যাকর তথাকার অত্যন্ত বনিজ হইতে লৌহ প্রস্তুত করিত। আমি কেবল আকরতটিকের কারখানা স্থাপনকার্যে প্ররম্ভ করিয়াছিলাম।”

টাটা কোম্পানী জামশেদপুর কারখানার যে প্রস্পেক্টাস বা অল্পসানপত্র বাহির করেন, তাহাতে বহু মহাশয়কে আকরতটিকের আবিষ্কারক না বলিয়া এইরূপ ধারণা জন্মান হয়, যে, সেগুলি স্বর্গীয় জামশেদজী টাটা মহাশয়ের প্ররম্ভিত খনিজ-অবলম্বন চেষ্টাবলীর কল। যথা—

“...the first prospectus of The Tata Iron and Steel Company... created the impression that the discovery... was made in the course of the prospecting operations instituted by the late Mr. J. N. Tata.”

ইহা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় তিনি টাটা কোম্পানীর অত্যন্ত কণ্ঠী মিঃ বি জে পাদনাহকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠির নিম্নমুদ্রিত উক্তরে বহু মহাশয়ের কথাই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। যথা :—

*Navsari Buildings, Bombay,
3rd July, 1907.*

Dear Mr. Bose,

Your statement of facts is perfectly correct, and I shall bear it in mind when we come to the publishing of a final prospectus. In a commercial document one is not always able to reserve place for giving due credit to every one, but it is perfectly fair that the document should not be so worded as to imply that credit elsewhere than where it is due.

তাৎপৰ্য্য। প্রিয় মিঃ বসু, আপনার তথ্যসমূহের বর্ণনা সম্পূর্ণ নিতুল। জামাঘের শেষ প্রস্পেক্টাস বাহির করিবার সময় আমি ইহা মনে রাখিব। ব্যবসাঘটিত দলিলে প্রত্যেককে তাঁহার ভাব্যপ্রাপ্য অংশের দিবার নিমিত্ত জায়গা সব সময় রাখা যায় না; কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ ভ্রান্তমত, যে, দলিলটির বাক্য এরূপ হওয়া উচিত নয় বাহাতে একজনের প্রাপ্য অংশের অন্তরে প্রাপ্য বলিয়া বুঝায়।”

টাটা-কোম্পানী শেষ প্রস্পেক্টাস বাহির করিয়াছিলেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে তাহাতে বহু মহাশয়ের কৃতিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল কিনা, জানি না। কিন্তু ইহা সত্যের বিষয় যে সম্প্রতি জামশেদপুরে কারখানার সাধারণ ম্যানেজার কীনা সাহেবের সভাপতিত্বে যে সর্বসাধারণের সভা হয়, তাহাতে প্রথমখণ্ড বহু মহাশয়ের কৃতিত্ব প্রকাশিত এক তাঁহার স্বত্বিকার্য্য করিবার প্রস্তাব প্রতীত হয়। কীনা সাহেব আমেরিকান। ইহাও যতব্য, যে, জামশেদপুরের কারখানায় বহু মহাশয়ের পুত্রেরা বধ্যোগ্য কর্ত্তে নিযুক্ত আছেন।

আজকাল কেহ বিদ্যালোভ, বাণিজ্য বা দেশভ্রমণের জন্য সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে গেলে, বেশে কিরিয়া আগিবার পর তাঁহাকে প্রারম্ভিত করিতে হয় না। বহু মহাশয়, পঞ্চাশ

বৎসরেরও অধিক পূর্বে যখন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন হুশবহ সমাজ তাঁহাকে প্রারম্ভিত করিতে হলেন। তিনি রাজী হন নাই, প্রারম্ভিত করেন নাই।

দেশে ফিরিয়া আসিবার পর এক রাজকাণ্ডে নিহৃত থাকিবার সময় তাঁহার পোষাক, চালচলন, ও জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল ইংরেজদের মত। কিন্তু পরে তিনি সাহেবিসানা বর্জন করিয়া সাবক বাঙালী ভক্তলোকদের মত থাকিলেন। আদেশিকতার জন্ত, দেশের লোকদের সহিত সংহতি ও সহানুভূতি রক্ষার জন্ত, জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষার নিমিত্ত, তাহা আবশ্যিক। কিন্তু তাহাতে এদেশে আরামও বেশী পাওয়া যায়, এবং স্বাধারকা ও দীর্ঘজীবন-লাভেরও তাহা উপযোগী।

মহাত্মা গান্ধীর ভ্রমণ-রীতির পরিবর্তন

মহাত্মা গান্ধী রেল, টীমারে, মোটরকারে—যখন যে-যানে আবশ্যিক ও সুবিধা হয়, সেই যানে ভ্রমণ করেন। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে বহু স্থানে গিয়া তথাকার লোকদের মধ্যে নিজের মত প্রচার করিবার সুবিধা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জায়গার কর্ম্মদিগকে পরামর্শ দেওয়া ও উৎসাহিত করাও এই প্রকারে সম্ভব হয়।

তিনি এখন এই রীতি কতকটা পরিবর্তন করিবেন। তিনি বলিয়াছেন, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ইটিয়া যাইবেন। ইহাতে সময় বেশী লাগিবে এবং পরিশ্রমও অধিক হইবে। কিন্তু ইহার একটি ভাল দিক, সুবিধার দিকও আছে। ইহাতে সাধারণ লোকদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও ঐক্য, তাঁহার একান্ততা বাড়িবে। তাঁহার সভ্য প্রভাব তাহার বেশী করিয়া অনুভব করিতে পারিবে। ইহা কালসাপেক্ষ বটে। কিন্তু প্রাচীন কালে বুদ্ধদেবের মত উপদেষ্টকেও প্রধানতঃ পদজর্জেই প্রচারকার্য চালাইতে হইয়াছিল; বেল, টীমার, মোটরগাড়ী তখন ছিল না। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বাণীর ও জীবনের প্রভাব কম অনুভূত হইয়া নাই।

পদজর্জে ভ্রমণের যে কারণ মহাত্মা গান্ধী মিলে বলিয়াছেন, তাহা ঐনিক অবস্থার বাহির হইয়াছে।

“সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার প্রত্যাশিত ফল”

বৎসর ১৯৩২-৩৩ সালের সরকারী শাসনবিবরণীতে বৎসর দেশী গবরের কাগজগুলির সাধারণ হ্রস্ব সম্বন্ধীয় অল্পক্ষেত্র এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে :—

“The most noticeable feature of the year was the growing cleavage between the Hindu and Moslem press, and the gradual disappearance of the nationalist section in the latter. The anticipated effects of the Communal Award on the division between the two communities of powers to be transferred by the new constitution mainly contributed to this development.” P. 175.

ভাষ্যার্থ। হিন্দু সংবাদপত্রসমূহ ও মুসলমান সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান মতপার্থক্য বা ছাড়াছাড়ি এবং মুসলমান সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে ইহাতে ভ্রূণভাঙ্গিষ্ট কাগজগুলির ক্রমশঃ অন্তর্ধান এই বৎসরের সর্বাপেক্ষা লক্ষিতব্য বিশেষত্ব। নূতন শাসনবিধিয়ার বে-সব কমতা দেশের লোককে দেওয়া হইবে, তাহা উক্তর সন্ত্রাসীদের মধ্যে কিরূপ ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, প্রধানতঃ তদ্বিষয়ক “সাম্প্রদায়িক মীমাংসা”র প্রত্যাশিত ফলেই এইরূপ পার্শ্বগতি ঘটয়াছে।

উক্ত ইংরেজী শেষ ব্যাকটিতে আছে “গ্যান্টিসিপেটেড এফেক্টস্”। ইংরেজী গ্যান্টিসিপেট শব্দটির মানে পূর্বাভাবোদ্ধ করা, পূর্বসিদ্ধান্ত করা, প্রত্যাশা করা। তাহা হইলে বৎসর শাসন-বিবরণীতে বলা হইতেছে, যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যে সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা করিয়াছেন, তাহার ফল কি হইবে, তাহা আগে হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল, প্রত্যাশা করা হইয়াছিল। সেই ফল হিন্দু ও মুসলমান সাংবাদিকদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান মতানৈক্য এবং মুসলমান সাংবাদপত্র-জগৎ হইতে স্বাভাবিক বা জাতীয়তাবাদী বা ন্যাশন্যালাইট কাগজগুলির ক্রমিক তিরোভাব। এই তিরোভাবের মানে এই হইতে পারে, যে, ন্যাশন্যালাইট মুসলমান কাগজগুলি একটি একটি করিয়া উঠিয়া গিয়াছে, কিংবা বাহারা আগে ন্যাশন্যালাইট ছিল তাহারা ক্রমে ক্রমে সাম্প্রদায়িকভাবগ্রস্ত হইয়াছে। যানে বাহাই হউক, শাসনবিবরণী বলিতেছেন, হিন্দু ও মুসলমান সাংবাদিকদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান মতানৈক্য হইয়াছে, এবং সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার ফল যে এইরূপ হইবে, তাহা প্রত্যাশা করা গিয়াছিল।

সাধারণতঃ সাংবাদিকরা বে-সলের লোক সেই সলের ভাব, চিন্তা, মত প্রকাশ করেন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার ফলে হিন্দু ও মুসলমান গবরের কাগজগুলিয়ারের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, ইহা কাল মানে, ঐ ভাগ-বাটোয়ারার

কলে উত্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভাগবীটোয়ারার কল যে এইরূপ হইবে, সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে, যে, তাহা আগে হইতেই বুঝা গিয়াছিল, প্রত্যাশা করা হইয়াছিল।

“কে বা কাহার। এই প্রত্যাশা করিয়াছিল,” এই প্রশ্ন স্বভাবতই উদ্ভিত্তেছে। কে ইহার উত্তর দিবে? যখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এই ভাগবীটোয়ারা করেন, তখন তিনি কি এই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন? তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন সরকারী কাজ করেন না। হতরাং সাম্প্রদায়িক ভাগবীটোয়ারা ঘোষিত হইবার পূর্বে তিনি তাহাতে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের সম্মতি পাইয়াছিলেন ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, “ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল কি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগবীটোয়ারার ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে?” ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ব্যাপারসমূহে ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা সাধারণতঃ ভারতীয় গবর্নমেন্টের মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে তাহা করা হইয়া থাকিলে প্রশ্ন উঠে, “ভারতীয় গবর্নমেন্ট কি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগবীটোয়ারার ফলে হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ ক্রমবর্ধমান হইবে?”

বঙ্গের আলোচ্য শাসনবিবরণীটি হইতে এই সকল প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না। বরং কোন অস্ববিধাজনক সমালোচনা হইতে আশ্রয়কার জন্য বঙ্গীয় গবর্নমেন্ট রিপোর্টটির উপক্রমণিকায় বলিয়া রাখিয়াছেন :—

“The Report is published under the authority and with the approval of the Government of Bengal but this approval does not necessarily extend to every particular expression of opinion.”

তাহাৎপূর্বে “এই রিপোর্টটি বাংলা-গবর্নমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুত ক্রমতঃ অমুদারে ও তত্বে অমুদারিত অমুদারে প্রকাশিত হইল, কিন্তু এই অমুদারিত রিপোর্টে প্রকাশিত প্রত্যেক মত সম্বন্ধে নিচরই প্রবোদ্ধা, এরূপ বুঝা চলিবে না।”

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের এবং ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সমালোচকেরা কখন কখন বলিয়া থাকেন, যে, উক্ত দুই গবর্নমেন্ট কখন কখন ভৈরবীকি অবলম্বন করেন। কিন্তু তাহার। বরাবরই উক্তর মিত্র আসিয়াছেন, যে, তাহার। তাহা করেন না—তাঁহারা সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যই চান। এই জন্য, এখন ব্রিটিশ ও ভারতীয় প্রধান রাজপুরুষদের বলা

উচিত, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগবীটোয়ারার এইরূপ ফল হইবে, আগে হইতেই তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা।

বঙ্গের গবর্ণরকে বধ করিবার চেষ্টা

সে দিন দার্জিলিংয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে বঙ্গের বর্ডমান গবর্ণর স্তর জন এণ্ডারসনের উপর গুলি নিক্ষেপ হয়। কিন্তু তিনি সৌভাগ্যক্রমে নিহত হনই নাই, আহতও হন নাই। আন্ততঃ্য বলিয়া কয়েক জন বালক ও যুবক ধৃত হইয়াছে।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বঙ্গদেশ হইতে সজ্ঞান এখনও তিরোহিত হয় নাই।

উক্ত বা নিয়মদ্বয় সরকারী লোকমিগকে হত্যা ও হত্যার চেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা বাহা বলিতে পারি, তাহা বহু বৎসর ধরিয়া বার-বার বলিয়াছি। সেই কারণে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। কিন্তু অনাবশ্যক পুনরুক্তিও করিতাম, যদি তাহাতে কোন ফল হইত। কিন্তু অল্প অনেক সম্পাদকের মত আমরা বার-বার নানা কথা বলা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, যে, বিপ্লবেচ্ছু ও সজ্ঞানবাহীদের কোন মতিপরিবর্তন হয় নাই। তাহার কারণ হয়ত এই, যে, আমরা বাহা লিখি তাহা তাহারা পড়ে না, কিংবা পড়িলেও তাহা তাহারা উপেক্ষারই বোধ্য মনে করে।

এরূপ হইবার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, বিপ্লবেচ্ছু ও সজ্ঞানবাহীরা যে বুদ্ধিমার্গ অবলম্বন করিয়া নিজেদের কাজে প্রযুক্ত হয়, আমরা সেই বুদ্ধিমার্গ অবগত না থাকায় তাহা খণ্ডন করিতে পারি না, খণ্ডন করিবার চেষ্টাও করিতে পারি না।

শুধু তর্ক-বুদ্ধির দ্বারা যে সজ্ঞানবাহীদের মতি পরিবর্তিত করিতে পারা যায় নাই, তাহা নহে, শান্তি ও ক্ষমার দ্বারাও পারা যায় নাই। আমাদের তর্ক-বুদ্ধি তাহাদের নিকট না-পৌছিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু অনেক সজ্ঞানিকের ক্রোধ বা দীপান্তর বা অস্ত গুরুতর শাস্তির সংবাদ তাহাদের নিকট নিচরই পৌছে; সজ্ঞান বন্ধনের জন্য যে কঠোরতম আইন প্রণীত হইয়াছে তাহা তাহারা নিচরই জানে; সজ্ঞানিক এবং সজ্ঞানিক বলিয়া সম্বোধনজন্য লোকদের আত্মীয়-বন্ধন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত শ্রেণী, এবং অপরিচিত প্রতি-বেশী পর্যন্ত যে সজ্ঞানিকদের কাজের জন্য নানা দুঃখ ও

কতি সূত্র বলিতে বাধ্য হয়, ইহাও সম্ভাসকেরা নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু ভয়ে বা সম্ভাসনকার্যের সহিত সম্পর্কবিহীন এই সব লোকদের দৃষ্টিতে দৃষ্টিত হইয়া দর্যাবলম্ব সম্ভাসনকার্যে যতি পরিবর্তন হয় নাই, দেখা যাইতেছে।

আমরা যে বার-বার যতিপরিবর্তনের কথা বলিতেছি, তাহার কারণ আছে। গবয়েন্ট খুব বেশী টাকা খরচ করিয়া, খুব বেশী গোয়েন্দা পুলিশ এবং সাধারণ রকী পুলিশ নিযুক্ত করিয়া সম্ভাসনকার্য (acts of terrorism) খুব কমাইয়া ফেলিতে পারেন, এমন কি অনির্দিষ্ট কালের জন্য একটিও গুরুত্ব ঘটনা না ঘটিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভাসনকার্যের যতিপরিবর্তন ও ফলস্বরের পরিবর্তন না হইতেছে ততক্ষণ নিশ্চিত হওয়া চলিবে না; সর্ববিধ সতর্কতার মধ্যেও তাহারা কোন ফাঁক দিয়া কি করিয়া বলিবে, এ উদ্বেগ সর্বদাই থাকিয়া যাইবে।

এই জন্য, এক দিকে যেমন মাছের চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে যাহা আসে এমন সর্ববিধ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, তেমনি যতিপরিবর্তনের উপায় চিন্তাও করিতে হইবে।

কি উদ্দেশ্যে সম্ভাসনকার্য সম্ভাসনকার্যে ব্যাপৃত হয়, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী পরিবর্তন করা যদি তাহাদের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহাদের অস্থিতির সরকারী লোকদের প্রাণবধ বা বধের চেষ্টার দ্বারা তাহা হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের “আপীল”

বিচুদিন হইল অবসরপ্রাপ্ত সিবিলায়ন শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গের পুরকল্পায়ের উদ্দেশ্যে সম্ভাসন চেষ্টা হইতে সকলকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ইংরেজীতে একটি “আপীল” প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি উহা আমাদিগকে গত মার্চ মাসে দেখান। আমরা তখন ঠাহাকে বলিয়াছিলাম, যে, আমাদের যদি ওরূপ কিছু লিখিবার ও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে অনেকটা অন্তরকমে লিখিতাম; কিন্তু ও-বিষয়ে কিছু লিখিয়া দেখিয়াছি কোন কল হয় না, হইবেও না, স্বতন্ত্র ওরূপ কিছু লিখিতে চাই না, কেহ লিখিলে তাহাতে দৃষ্টিভ্রমও করিতে চাই না। এইরূপ আরও অনেক কথা হইয়াছিল। তাহা লেখা অনাবশ্যক। শেষ কল দাঁড়ায়

এই, যে, তিনি সম্ভাসনকার্য নিরসনচেষ্টার আমার সহায়ত্ব-জ্ঞাপক কিছু লেখা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় এবং সেদুপ সহায়ত্বই আমার থাকায়, আমি তাঁহাকে গত ২-শে মার্চ লিখিয়া পাঠাই :-

“Though I think the terrorist mentality as well as terrorist policy and actions can disappear mainly, if not only, as the result of political, politico-economic and economic changes of a radical character, yet on principle as a journalist I have argued against terrorism of all descriptions on various occasions, particularly in my Bengali magazine *Prabasi*. But there is nothing to show that terrorists of any kind have either found my arguments convincing to any appreciable extent or have even considered them. I shall, however, be glad indeed, if Mr. J. N. Gupta's appeal succeeds where my arguments have failed.
March 25, 1934.
Ramananda Chatterjee.”

সম্ভাসনবাদ নিরসনের চেষ্টার সহিত আমার পূর্ব সহায়ত্বই আছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন, কোন কোন কাগজগুলো মনে করিয়াছেন আমি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছি, কেহ বা লিখিয়াছেন আমি তাহার অগ্রতম সমর্থক বা অহুমোদক। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। সম্ভাসনবাদ নিমূল হয় ইহা আমি সর্বান্তঃকরণে চাই। কিন্তু মিঃ গুপ্ত যাহা কিছু লিখিয়াছেন, যে-যে বৃত্তিমার্গের অহুমোদন করিয়াছেন, সবগুলিরই আমি সমর্থন করি, রূপ মনে করা তুল; যাহা কিছু বলা দরকার তিনি সবই বলিয়াছেন, তাহাও আমি মনে করি না। কিন্তু তাহার অনেক কথা সত্য।

উপরে বলিয়াছি, সম্ভাসনবাদ নিরসনের চেষ্টার সহিত আমার সহায়ত্বই আছে। গবয়েন্টের উহার নিরসনের ইচ্ছারও আমি সমর্থক। কিন্তু তদর্থে গবয়েন্টের প্রত্যেকটি চেষ্টা ও উপায়ের সমর্থন করিতে পারি না, কোন কোনটির সমর্থন করি।

সম্ভাসনকার্যের তালিকা

রাষ্ট্রীয় পরিষদের গত মাসের এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণ উক্তের মিঃ হাউসে জলেন, যে, গত ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাংলার সম্ভাসনকার্য ঘটনা মোট ২১০টি হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩১টি খুন, অভ্যুত্থানের চেষ্টা ৩৭টি, ডাকাইতি ৭০টি, ডাকাইতির উদ্যম ৭টি, লুণ্ঠন ৪০টি, লুণ্ঠনের চেষ্টা ১০টি, বোমানিকপ ১০টি, বোমা-কাটান ৫টি, সশস্ত্র লুণ্ঠন কাণ্ড ১টি ও উপরিউক্ত শ্রেণীভুক্ত নহে এমন অভ্যুত্থান ১টি হইয়াছে।

বালেশ্বর রাসপুকুর ও পল্লভাট বাহারী নিহত হইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা ১১০।

ঐ সময়ের মধ্যে অস্ত্রান্ত্র প্রদেশে যে-সব সন্ত্রাসক অত্যাচার হইয়াছে, তাহার মধ্যে সন্ত্রাসে ৬, বোম্বাই ১৭, বিহার ও উড়িষ্যা ১৪, আসামে ১০, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৬, মধ্যপ্রদেশ ৬, ত্রাঙ্ক শুল্ক, যুক্ত-প্রদেশ ৩৬, পঞ্জাবে ২০ এবং দিল্লীতে ৪—মোট ১২২টি হইয়াছে।

বাংলা স্বাভীত অস্ত্রান্ত্র প্রদেশে বহু লোক নিহত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৫ জন রাজপুরুষ এবং অস্ত্রান্ত্র লোকের মধ্যে ২১ জন। আহতের সংখ্যা রাজপুরুষদের মধ্যে ২২ জন এবং অস্ত্রান্ত্র ৩১ জন।

বাংলা দেশে যে এত বেঙ্গী নরহত্যা আদি হইতেছে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু এই দুঃখশ্রুতি যে সমস্তই সন্ত্রাসনবাদীরা করিতেছে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই কাজগুলার সমস্তই করা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নাই। অবশ্য, উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এরূপ কাজ যাহারা করে, তাহাদের শাস্তি হওয়া উচিত, এবং যাহাতে এরূপ দুঃখার্হ নিবারিত হইতে পারে, তাহারও চেষ্টা হওয়া উচিত।

কিন্তু কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে এই সব অপরাধে মানুষ প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহার অন্বেষণ অনাবশ্যক নহে। কারণ ও উদ্দেশ্য না জানিলে প্রতিকার হয় না। উদ্দেশ্য ও কারণ প্রধানতঃ রাজনৈতিক হইলে, প্রতিকারও প্রধানতঃ রাজনৈতিক উপায়ে করা দরকার হইতে পারে। আর যদি কারণ ও উদ্দেশ্য প্রধানতঃ আর্থিক হয়, তাহা হইলে প্রতিকারও প্রধানতঃ অর্থনীতির পথে আবিষ্কার করিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বাংলা দেশেই অধিকাংশ উপদ্রব হইতেছে প্রমাণ হয় বটে, কিন্তু মার্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সার হারি হেগ যে বলিয়াছিলেন, রাজনৈতিক হত্যা বাংলা দেশের একচেটিয়া, তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইতেছে।

এই সব উপদ্রব ভারতবর্ষের অস্ত্র সব অংশের চেয়ে বাংলা দেশে বেশী হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, আধুনিক সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস অস্ত্র সব প্রদেশ হইতে কতকটা ভিন্ন রকমের এবং বাঙালীর স্বভাবও অস্ত্র প্রদেশের ভারতীয়দের স্বভাব হইতে কিছু পৃথক রকমের।

কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নেন্ট ও ভারতীয় নেতারা যদি মনে করিয়া থাকেন, যে, সন্ত্রাসকাজাতীয় মহত্ব কেবল বাংলা দেশেই আছে বা ভারতবর্ষেই আছে, তাহা হইলে ইহা তাঁহাদের একটা মত কুল। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেও সন্ত্রাসকাজ চলিতেছে। আমাদের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এ নয়, যে, যেহেতু অন্যান্য দেশেও ইহা হইতেছে অতএব ইহা নির্দোষ

বা মামুলী, হতরং ইহার কোন প্রতিকার অনাবশ্যক। আমরা যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, সমস্যাটির সম্মুখীন অস্ত্র অনেক দেশের লোককেও হইতে হইতেছে। অতএব সেই সব দেশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এবং মানবজাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা এই সমস্যার সমাধানকল্পে কি পরামর্শ দেন তাহা জানা দরকার। দুঃখ বন্ধ করিবার ও বন্ধ রাখিবার জন্য শাস্তি ও বলপ্রয়োগ কখন কখন আবশ্যক হইতে পারে,—তাহার আলোচনা এখানে করিতেছি না। কিন্তু দুঃখের প্রবৃত্তি বিনষ্ট করিতে হইলে হৃদয়মনের যে পরিবর্তন আবশ্যক তাহা কেবল শাস্তি ও বলপ্রয়োগ দ্বারা হইতে পারে না। তাহার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এবং সামাজিক ব্যবস্থাকে ন্যায় ও মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক।

চরিত্রহীনতার জন্ত পদচ্যুতি

সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি কোন ফুলবধুর সর্বনাশ করায় তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়। বিচারে তাহাকে পঁচিশ হাজার টাকা খেসারত দিতে হয়। এই ব্যক্তিকে সিংহলবাসীরা সভাপতির পদ হইতে তাড়াইয়াছেন, অশ্লীলতা তাহাকে রাজনৈতিক সব কাজ হইতে দূর করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

পারুলেলের মত শক্তিশালী আফ্রিকান নেতাকে চরিত্রহীনতার জন্ত রাজনীতিকক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইতে হইয়াছিল। স্ত্রর চার্লস ডিক্‌ ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের একজন বড় নেতা ছিলেন। চরিত্রহীনতার জন্ত তাঁহাকেও নেতৃত্ব হারাইতে হইয়াছিল।

বর্তমান সময়ে বাংলা দেশ এ-বিষয়ে কোন সংদৃষ্টতা দেখাইবার সাংস ও ক্ষমতা রাখে কি?

বঙ্গের নারীদের উপর অত্যাচার

আমরা বৈশাখের প্রবাসীর বিবিধ প্রেসঙ্গে বলিয়াছিলাম, যে, বঙ্গের ১৯০২-০৩ সালের সরকারী শাসনবিবরণীতে ইহা দেখান উচিত ছিল, যে, ১৯২৬ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত ছয় বৎসরে হিন্দু বদমায়েশদের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান উভয়বিধ কত নারীর উপর অত্যাচার হইয়াছে এবং মুসলমানদের দ্বারা ইহা উভয়বিধ কত নারীর উপর অত্যাচার হইয়াছে।

কিন্তু রিপোর্টে কেবল লেখা আছে মুসলমানরা কত হিন্দু নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং হিন্দুরা কত হিন্দু নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। বাহা হটক, রিপোর্টে বাহা নাই, তাহা মাননীয় রীড সাহেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি প্রস্তাবের উত্তরে একবার বলিয়াছিলেন। সেই উত্তর হইতে গত ১২ই এপ্রিলের 'সঙ্গীতবীণা'তে সংখ্যাগুলি সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। नीচে তাহা উদ্ধৃত হইল।

মুসলমান বর্মান্বয়েদের দ্বারা অত্যাচারিতা নারীদের সংখ্যা।

বৎসর।	হিন্দু নারী।	মুসলমান নারী।	মোট—
১৯২৬	১১৩	৪৮১	৫৯৪
১৯২৭	১২২	৫৭৬	৬৯৮
১৯২৮	১০৪	৪৬০	৫৬৪
১৯২৯	১১৪	৬৭৭	৭৯০
১৯৩০	১০৪	৫৩১	৬৩৫
১৯৩১	১২৪	৫৭৩	৬৯৮

হিন্দু বর্মান্বয়েদের দ্বারা অত্যাচারিতা নারীদের সংখ্যা।

১৯২৬	১৯৪	৯	২০৩
১৯২৭	২০১	৩	২০৪
১৯২৮	১৯৮	১০	২০৮
১৯২৯	২০৬	৮	২১৪
১৯৩০	২৩৪	৬	২৪০
১৯৩১	১৯৭	৩	২০০

মুসলমানদের কাগজ ও মুসলমান নেতাদের দ্বারা এইরূপ কথা প্রচারিত হইয়া থাকে, যে, হিন্দুনারীরহরণাদির এত যে অভিযোগ হয়, তাহার অল্প হিন্দু সমাজের চিরবৈধব্যাদি প্রথাই দায়ী। হিন্দু সমাজের বাহা দোষ ছিল ও আছে, তাহা সংশোধনের জন্য রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় হইতে এ-পর্যন্ত চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মুসলমান সমাজে যে বর্মান্বয়েদের সংখ্যা বেশী এবং তাহার যে অধিকতরসংখ্যক নারীর উপর অত্যাচার করে, এমিকে মুসলমান সম্প্রদায় ও নেতাদের দৃষ্টি পড়িলে এবং তাহার সামাজিক ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিলে শুধু মুসলমান সমাজ নহে, অল্প সব সমাজও উপকৃত হইবে। কেবল হিন্দুর উপর সব দোষ চাপাইয়া চলিলে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্য হইবে না, অবনতিই হইবে।

নারীর উপর অত্যাচার কি বাড়িতেছে না ?

১৯৩২-৩ সাালের বঙ্গীয় শাসনবিধিরণীতে দেখা হইয়াছে, যে, বঙ্গ নারীর উপর অত্যাচার বাড়িতেছে না। কিন্তু আমরা

এ রিপোর্টেই মুদ্রিত সংখ্যাগুলি হইতে বৈশাখের 'প্রবাসী'তে দেখাইয়াছি, যে, এরূপ অত্যাচার বাড়িতেছে। তা ছাড়া, এরূপ অত্যাচার যে বাড়িতেছে, তাহা অল্প একটি সরকারী রিপোর্টে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে, এবং সেই রিপোর্টটিও আধুনিক—তাহার পর এই বিভাগের কোন রিপোর্ট এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। তাহা বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগের আধুনিকতম রিপোর্ট। তাহাতে ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

"The increase of 94 cases under this head is most noticeable, Burdwan, Nadia and Hooghly being the worst contributors with increases of 21, 20 and 17 cases, respectively."

পুলিস-বিভাগের এই রিপোর্টের উপর বাংলা-গবর্নমেন্টের মন্তব্য ("Resolution" এ) লিখিত হইয়াছে :—

"His Excellency in Council notes that cases of offence committed against women under sections 366 and 354, Indian Penal Code, showed an increase of 94 over the figures of the previous year—Burdwan, Nadia and Hooghly being the main contributors." P. 2.

ম্যাডেম মেরিয়া মণ্টেসরীকে আহ্বান

ধবরের কাগজে দেখিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটি শিশুদের শিক্ষার অভিনব প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য ম্যাডেম মেরিয়া মণ্টেসরীকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাহার নিকট হইতে কোন কোন মহিলা যদি সাক্ষাৎভাবে এই প্রণালী শিখিয়া লয়েন, তাহা হইলে ভালই হইবে।

তবে, ইহা সর্বদাই মনন রাখিতে হইবে, যে, কোন দেশের শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষার সরঞ্জাম অল্প কোন দেশে হুবহু নকল করিলে তাহা ফলস্বরূপ হয় না। দেশকালপাত্রভেদে সব প্রণালী ও সরঞ্জামেরই আবশ্যিক-মত পরিবর্তন করিয়া লইতে হয়।

ইহাও মনে রাখা দরকার, যে, যেমন বিজ্ঞানে আধুনিক কালে আমরা প্রথম প্রথম কেবল পাশ্চাত্য জাতিদের ছাত্রই ছিলাম, পরে আমরাও নতুন কিছু আবিষ্কার করিয়া জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছি; শিক্ষাবিজ্ঞানে এবং শিক্ষাদান-বিজ্ঞানেও তেমনি আমাদের শুধু ছাত্রের সঙ্কট না থাকিবা প্রবেশণা দ্বারা নতুন কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনও করিতে হইবে।

প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, যে, ইংরেজ-রাজত্বকালেও ইংরেজরা ভারতবর্ষে হইতে শিক্ষাপ্রণালীর একটি জিনিষ শিখিয়া নিজদেশে দেশে চালাইয়াছিল। জেই ইতিহাস কোম্পানীর রাজত্বকালে ১৮১৪ সালের ৩রা জুন লণ্ডনের কোর্ট অব ডিরেক্টর্স বর্ষের সর্কাজিল গবর্নর জেনার্যালকে যে চিঠি লেখেন, তাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষকেরা যে প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিতেন তাহার উল্লেখ আছে। তাহার পর এই চিঠিতে লিখিত হয় :—

“The mode of instruction that from time immemorial has been practised under these masters has received the highest tribute of praise by its adoption in this country under the direction of the Reverend Dr. Bell, formerly chaplain at Madras, and it is now become the mode by which education is conducted in our national establishments, from a conviction of the facility it affords in the acquisition of language by simplifying the process of instruction.”

তাৎপর্য। “সরগাজীত কাল হইতে এই শিক্ষকেরা যে শিক্ষা-প্রণালী অনুসরণ করিতেন, তাহা যেভাবেও উত্তর বেঙ্গের উপদেশ অনুসারে এই দেশে (অর্থাৎ বিলাতে) প্রবর্তিত হওয়ার কাণ্ডঃ এই প্রণালীর উচ্চতর প্রশংসা করা হইয়াছে; এই প্রণালী অনুসারে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখন শিক্ষা দেওয়া হয়—এই বিশেষ যে তদ্বারা ভাষাশিক্ষা সহজ হয়।”

সমস্ত চিঠিটি মেজর বামনদাস বহু প্রণীত “কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাস” (*History of Education in India under the Rule of the East India Company*) নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভারতের জ্ঞানগৌরবের দিন যখন অতীত হইয়া গিয়াছিল, তখনও ভারতবর্ষে শিক্ষাপ্রণালীতে পান্ডিত্য একটি দেশকে নূতন কিছু দিয়াছিল। এখন আমরা অনেক বিষয়ে উন্নতি করিতেছি। এখন আমরা চেষ্টা করিলে কেবল প্রতীচীর ছাত্র না থাকিয়া হয়ত শিক্ষকও হইতে পারি। আদান ও প্রদান দুইই চলিলে তবে অন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবিকতা দুইই সম্ভব হইতে পারে।

অনুন্নত জাতিদের শিক্ষা ও স্তর

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টা

“বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত জাতিদের উন্নতিবিধানী সমিতি” প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া অনেক জেলায় কাজ করিতেছেন। শ্রীমন্ত বসীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রহলাদ রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইহার কাজের প্রশংসা করিয়াছেন।

অনেক জেলায় ইহার ক্যালার আছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৪৪টি—২টি হাই স্কুল, ৭টি মধ্যইংরেজী, ২০৮টি বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১২৩টি বালিকাদের প্রাথমিক স্কুল এবং ১৪টি নৈশ বিদ্যালয়। তা ছাড়া, ইহার পুস্তকাগার, ম্যাজিক লঠন সংযোগে বক্তৃতা, বয়স্কাউট, সেবা-সমিতি প্রভৃতি আছে। বর্তমানে স্তর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার সভাপতি। সমিতির আর এখন কমিয়া যাওয়ার গত মাসে তিনি একটি কনফারেন্স ডাকেন এবং তাহার নির্দিষ্ট চান্দা ও দান ছাড়া হাজার টাকা দিয়া তাহার কাজ আরম্ভ করেন। সমিতির আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য মহারাজা স্তর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সভাপতিত্বে এই কনফারেন্সে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। কনফারেন্সের সময় অনুন্নত সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীমন্ত হরিদাস মজুমদার দুই শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন।

স্তর রাজেন্দ্রনাথ এই সমিতির জন্য বাহা করেন এবং সেই সংশ্রবে তাহার হৃদয় ও মতামতের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীমন্ত হরিনারায়ণ সেন উহার কাৰ্যালয় ৪০ নং কারবালা ট্যাক লেন (কলিকাতা) হইতে আমাদের গকে লিখিয়াছেন :—

চয় বৎসর পূর্বে দার্জিলিং শহরে উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে স্তর রাজেন্দ্রনাথের সহিত আমি প্রথম সাক্ষাৎ করি। সমিতির কার্যবিবরণ তিনি প্রথমে হস্ত পরলোকগত লর্ড সিংহের নিকট কিছু তুলিয়াছিলেন। সচরাচর তাহার নিকট নানা প্রকার সমিতি অর্থসাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়। আমিও তাহার নিকট অর্থসাহায্যের প্রার্থা হইয়াই উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার অন্তরে এই ইচ্ছাই ছিল, কি করিয়া স্তর রাজেন্দ্রনাথের মত দেশবিখ্যাত স্বামনবজ্ঞ ব্যক্তিকে সমিতির কাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করি। প্রথম সাক্ষাতের পরেই আমার সেই প্রবোধ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমই, তিনি আমাকে কোন অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন না এই কথাই জানাইলেন। এই কথাই উত্তরে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, এই মুহূর্ত্তেই আমি তাহার নিকট অর্থসাহায্যের প্রত্যাশী হইয়া আনি নাই, সমিতির রিপোর্ট ও অন্তঃ কাগজপত্র লিখা আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম তাহা তাঁহাকে পাঠ করিতে অনুরোধ করিলাম। কার্যবিবরণী ভাল করিয়া পাঠ করিলে পর তিনি যদি সন্তুষ্ট হন তবে সাহায্যাদি সংক্ষেপে আমি তাঁহার সঙ্গে পরে কথা বলিব, ইহাই জানাইয়াছিলাম।

ইহার পর তিনি আমাকে কলিকাতার দেখা করিতে বলিলেন। কলিকাতা কিরিয়া দুই সপ্তাহ পর তাহার সঙ্গে পুনরায় দেখা করিতে বাই। দেখা করিয়াই বুঝিতে পারিলাম সমিতির কার্যবিবরণী ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র আমোপাধ্যায় তিনি পাঠ করিয়াছেন। দেখা হওয়ার দ্বারা তিনি পূর্ব আদর করিয়া তাহার নিকট বসাইলেন এবং সমিতি আন্তঃ অঙ্গ ব্যয়ে কি করিয়া এক কৌশল করিল তাহা জানিতে চাহিলেন। যখন তুলিলেন যে এই সমিতি যে-সমস্ত প্রাণে স্কুল স্থাপন করিয়াছেন সেই সকল প্রাণ হইতেই

ধান পাট মুষ্টিৎকা প্রভৃতি দ্বারা সমগ্র সমগ্র টাকা সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তখনই তিনি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, “এই তো কাজ, এই রকম কাজের দ্বারা এই প্রশিক্ষিত সমাজ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।” পরে ধীরে ধীরে তিনি সমিতির সমস্ত ইতিহাস অর্থাৎ কি করিয়া কাজ আরম্ভ হইল, কার্যক্ষেত্র কি ভাবে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইল, কত জন কর্মী কাজ করিতেছেন, যাহাদের মধ্যে সমিতি কাজ করেন তাহাদের সঙ্গে সমিতির কিরূপ সম্বন্ধ—এই সমস্ত সবার জামিয়া সমিতিতে নানাভাবে সাহায্য করিবার জন্য অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আমি সে দিন কোন অর্থ তাঁহার নিকট চাই নাই। কিন্তু তিনি সেদিনই সমিতির আফিসে বার্ষিক ট্যাক্স স্বরূপ ৫০০ পাঁচ শত টাকার এক খানা চেক পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পনের দিন পরেই তিনি পুনরায় ৫০০ পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য করেন এবং প্রতিবৎসর তিনি নিয়মিত ভাবে কখনও ৫০০ টাকা, কখনও হাজার টাকা করিয়া দান করিয়া আসিতেছেন। তিনি কেবল ব্যক্তিগত ভাবে অর্থ-সাহায্য করাই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু এই ছয় বৎসর যাবৎ কি করিয়া সমিতির কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে পারে এবং অর্থের জন্য বাহ্যতে সমিতির কাজের কোন ক্ষতি না হয় সেই নিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিঠিপত্রাদি দ্বারা এবং সময় সময় সভা-সমিতি আহ্বান করিয়া অর্থসংগ্ৰহেও বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তিনি নিয়মিত ভাবে সমিতির কার্যকরী সভায় উপস্থিত হন।

অল্পকাল অল্পসংখ্যার লব্ধ তিনি বাহিরে যাইতে পারেন না বলিয়া সময় সময় তাঁহার আফিসেই কার্যকরী সভা আহ্বান করা হয়। বলিতে কি, তিনি এই সমিতির সভাপতি রূপে ইচ্ছা কত নূতন জীবনীশক্তি প্রদান করিতেছেন এবং কর্মসিদ্ধিতে নানাভাবে উৎসাহিত করিতেছেন। তাঁহার এই সকল সাহায্যের দ্বারা দিয়া আমি তাঁহার অন্তরের যে পরিচয় লাভ করিয়াছি তাহাতে অতিশয় বিমিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। সমিতির কার্যোপলক্ষে তাঁহার নিকট আমাকে প্রায়ই যাইতে হয়। হঠাৎ তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, সমিতি হইতে আমাকে বৃত্তিধর্মসম্পাদনা মাসিক সাহায্য করা হয় তাহাতে পারিবারিক খরচপত্র নির্বাহ হয় কি না—অতি সন্তোষে অথচ সহানুভূতির সহ এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, “It is your first duty to look after your children.” তাঁহার এই উক্তিটির মধ্যে আমি তাঁহার ভিত্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম। এই সময়েই তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম যে তিনি মহামতি পোথলেক বৃত্তি বৎসর পূর্ণন্ত মাসিক সাহায্য করিয়াছেন। তিন-চারি বৎসর পূর্বে আমি একবার গুলবার বাণিতে আক্রান্ত হই। প্রায় ছয় মাস পরে সেদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই, সেদিনের কথা আমি ভুলিতে পারি না। অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত তিনি আমায় রোগ সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কত উপদেশ দিলেন তাহা এখনও অত্যন্ত স্তম্ভকর সহিত স্মরণ করিয়া আসিতেছি। এই প্রকারে তাঁহার জীবনের মহানুভবতার পরিচয় কত ভাবে যে পাইয়াছি তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। নানা কারণে তিনি সর্বদা ব্যস্ত। অথচ আমায়ের বিষয় এই, আমার মতন সামান্য একজন লোক সমিতির কার্যাদির জন্য বখানই তাঁহার নিকট গিয়াছি তখনই সময় দিয়া অতি মনোবোধের সহিত সব কথা গুলিয়া বর্ণনাচিত উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন। দীর্ঘ ছয় বৎসরের মধ্যে একদিনও কোন বিরক্তি বা উদ্ভাবন প্রকাশ করেন নাই, কেবল সহানুভূতি ও সন্তোষভার পরিচয়ই পাইয়াছি। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিত্তার বা কলিলে জনসংস্পর্গে পশ্চিমালী হইবে বা একাংশে রাষ্ট্রভিত্তিক আকাজ্ঞা পূর্ণ হইবে না, বহুবার তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেসবের শিক্ষার বাহ্যতে বহল প্রচার হয় তাহার চেষ্টা করিতে তিনি বারবার ব্যস্তরহেন।

এমন তিনি বার্ষিক্য ক্রমশই চূর্ণল হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও সমিতির সভাপতিরূপে তাঁহার যে কর্তব্য তাহা করিতে কখনও অবহেলা করেন না। দেশের বর্তমান দুর্ভবতার জন্য সমিতির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ায় গত ২৫শে এপ্রিল তারিখে তিনি কলিকাতা শহরের গণ্যমান্য লোকদিগকে আহ্বান করিয়া একটি কনফারেন্স ডাকিয়াছিলেন। কিন্তু তিন দিন পূর্বেই হঠাৎ জাননাগারে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইয়া আফিসে আসিতেও পারিতেছিলেন না। কিন্তু কনফারেন্সের দিন এক ষট পূর্বেই তিনি আফিসে আসিয়া কনফারেন্সের কার্য নির্বাহ করিয়াছেন এবং এই দিনও সমিতিতে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্র

কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ভারতবর্ষে হয়, বিলাতেও হয়। তাছাড়া, রাজস্ব-বিভাগের (Finance Department) এর জন্যও সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ভারতবর্ষে হয়। কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে, যে বাঙালী ছেলেরা এই সব পরীক্ষায় বেশী উত্তীর্ণ হয় না, দু-এক জন হইলেও উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে না। এ বৎসর ভারতবর্ষে যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হয়, তাহার ফল কতক কতক জানা গিয়াছে বলিয়া ধবরের কাগজে দেখিলাম। প্রথম ও চতুর্থ স্থান এলাহাবাদের দু-জন গ্রাজুয়েট এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান মাদ্রাজের দু-জন গ্রাজুয়েট অধিকার করিয়াছেন। অন্তরের ধবর এখনও কিছু জানা যায় নাই।

বাঙালী ছেলেরা যে এই সব পরীক্ষায় বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না, তাহার কারণ অল্পসংখ্যক একটি কমিটি করিতেছেন শুনিতে পাই। তাহাদের বিস্তারিত রিপোর্ট বাহির হইলে তাহাদের মত জানা যাইবে।

বাঙালীদের বিক্ষেপে প্রতিকূল মনোভাব বশতঃ বাঙালী পরীক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার হইতেই পারে না, মনে করি না। কিন্তু এই কারণে অবিচার হইয়াই থাকে, তাহাও ধরিয়া লইতে পারি না। যাহা প্রমাণ করিতে পারা যায় না, এরূপ কিছু কল্পনা বা অনুমান করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া অসুচিত ও অনিষ্টকর। অনুসন্ধানের পথ ও প্রণালী অল্প রকম হওয়া আবশ্যিক।

এই সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা দেশ, জাতির ইহেরজীতে শিক্ষিত। তাহাদের শিক্ষার আরম্ভ ও ভিত্তিপত্তন সাধারণতঃ বঙ্গের ইংরেজী ইন্সকুলিতে হয়। এই

সকল ইচ্ছুলের অধিকাংশের আয় কম, শিক্ষকেরা যথেষ্ট বেতন পান না, অনেক শিক্ষকে গৃহশিক্ষকতা ও অন্ত্র উপায়ে আয় বাড়াইতে হয়। সুতরাং তাঁহারা পূর্ণ শক্তি ও মনোযোগ ইচ্ছুলের কাজে দিতে পারেন না। তা ছাড়া, সাধারণতঃ এই কথাও সত্য, যে, উপযুক্ত বেতন দিতে না পারিলে খুব যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায় না। বছরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ভারতবর্ষে ঐ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দরিদ্রতম বলিলেও চলে। তাঁহারা ইচ্ছুলে ছেলেরদের বেশী বেতন দিতে অসমর্থ, এবং বাংলা-গবর্নমেন্টও অন্ত্র বড় বড় প্রদেশের গবর্নমেন্টের চেয়ে শিক্ষার জন্য ঢের কম টাকা খরচ করেন। বঙ্গে মূলসকলের ভাল শিক্ষক না পাওয়ার ও ভাল শিক্ষা না-হওয়ার এইগুলি এক-একটি কারণ।

আর একটি কারণ, বঙ্গের ইচ্ছুলসমূহে শিক্ষাদান-বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্থাৎ ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের একান্ত অপ্রাচুর্য। ওকালতী, ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারী প্রভৃতি অন্য নানা কাজের মত শিক্ষকতাও সাধারণশিক্ষাপ্রাপ্ত সকল লোকের দ্বারা হুচাক রূপে নিষ্কর্ষিত হয় না। শিক্ষাদানকাণ্ডে ট্রেনিং পান নাই এমন হুশিক্ষকের অভাব অবশ্য নাই। কিন্তু ওকালতী, ডাক্তারী ও এঞ্জিনীয়ারিং পাস না করিয়াও আইনঘটিত, চিকিৎসা-সংক্রান্ত এবং ঘরবাড়িনির্মাণসংক্রান্ত কাজ অনেক ভাল করিয়াছে; তাহাতে যেমন প্রমাণ হয় না, যে, ওকালতী, ডাক্তারী ও এঞ্জিনীয়ারী শিখিবার দরকার নাই, তেমনি ট্রেনিং কলেজে না-পড়া ভাল শিক্ষক অনেক থাকার দ্বারা প্রমাণ হয় না, যে, শিক্ষাদানকাণ্ডে শিখিবার আবশ্যক নাই। শিক্ষণ-বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত ও শিক্ষাদান-বিদ্যায় উপায় উদ্ভাবন আধুনিক সময়ে অনেক হইয়াছে, যাহা জানা শিক্ষকদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বছরের সহিত মাস্ত্রাজের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে, বঙ্গে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক কত কম। বাংলা দেশের নূতন পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্টের ৩৭ পৃষ্ঠায় এই তালিকাটি দেওয়া আছে। ইহা ১৯২৬-২৭ সালের। তাহার পর বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই।

	বাংলা	মাস্ত্রাজ
প্রতি মূলে গড়ে শিক্ষক-সংখ্যা	১২.৮	২০.১
ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক-সংখ্যা	১.৮	১৫.৬
শতকরা কত শিক্ষক ট্রেনিংপ্রাপ্ত	১৪.২	৭৭.৮

এই তালিকাটি হইতে বুঝা যাইবে, বঙ্গে ট্রেনিংপ্রাপ্ত

শিক্ষক নিত্যই কম। সুতরাং মাস্ত্রাজের তুলনার অধিক ইচ্ছুলের শিক্ষা যে নিকট হইবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

বাংলা দেশে ইচ্ছুলের শিক্ষা ধারাপ হইবার আর একটি কারণ, গবর্নমেন্টের ও সরকারী শিশু-বিভাগের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব। সবাই জানেন, বঙ্গে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে শিক্ষার খুবই পচাংপদ। অথচ গবর্নমেন্ট ও শিক্ষা-বিভাগ চান, যে, মুসলমানরা মোট লোক-সংখ্যার বৃত্ত অংশ, শিক্ষা-বিভাগের চাকরীও তাহাদের তত অংশ পাওয়া চাই! যেন নিরক্ষর মুসলমান চাষীরাও সকল রকম মূলপরিদর্শক ও শিক্ষক হইবার যোগ্য। ইংরেজী ইচ্ছুলের সকল শ্রেণীর শিক্ষক এবং সঙ্কল্প রকমের মূলপরিদর্শক সবাই গ্র্যাজুয়েট না হউন, অন্ততঃ কলেজে কিছু পড়িয়াছেন এরূপ শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। বাংলা দেশে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে পড়ে, তাহাদের মধ্যে ১৯২১-২২ সালে শতকরা ১২.৮ জন ছিল মুসলমান, ১৯২৬-২৭ সালে ছিল শতকরা ১৪.২ মুসলমান, এবং ১৯৩১-৩২ সালে ছিল শতকরা ১৩.৩ জন মুসলমান। আমাদের প্রথম বক্তব্য এই, যে, অসঙ্গত সরকারী বিভাগের মত শিক্ষা-বিভাগেও কেবল যোগ্যতমদিগকেই কাজ দেওয়া উচিত জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই, যে, যদি একান্তই কোন ধর্মসম্প্রদায়কে অগ্রগ্রহ দেখাইতে হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাহাদের ছাত্রেরা শতকরা যত জন, কেবল শতকরা ততটি চাকরীই তাহাদিগকে দেওয়া উচিত। এই হিসাবে মুসলমানরা শিক্ষা-বিভাগে যেটামুটি শতকরা ১৪টি চাকরী পাইতে পারে। কিন্তু পূর্বোক্ত পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে দেখিতেছি বঙ্গের শতকরা ৪৬.৮ জন শিক্ষক মুসলমান এবং শতকরা ৪৪.২ জন পরিদর্শক কর্মচারী (inspecting officer) মুসলমান! ইহার লোভা মানে এই, যে, বিস্তর অপেক্ষাকৃত অযোগ্যতর ও অযোগ্যতম মুসলমানকে মুসলমান বলিয়াই শিক্ষক ও পরিদর্শক করা হইয়াছে এবং বিস্তর অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর ও যোগ্যতম হিন্দুকে হিন্দু বলিয়াই কাজ দেওয়া হয় নাই। সুতরাং বঙ্গে যে শিক্ষাদান ভাল করিয়া হয় না, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমরা এক জন প্রাচীন অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছি এক আগেও জানিতাম, মুসলমান পরিদর্শক কর্মচারীরা মূল দেখিতে দিয়া তথায় মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক কম জন ইত্যাদি

সাম্প্রদায়িক বিষয়েই খুব জোর দেন। শিক্ষার উৎকর্ষ বিধান করিবার বস্ত শিক্ষাই তাঁহাদের অধিকাংশের নাই, হুতরাং তাঁহারা সে দিকে কী দৃষ্টি দিবেন?

সাম্প্রদায়িকতা শুধু সরকারী ইস্কুলে আবদ্ধ নহে।

বঙ্গের অধিকাংশ বেসরকারী বিদ্যালয় হিন্দুদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত, কারণ শিক্ষার আগ্রহ তাহাদেরই বেশী। অথচ সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত হিন্দুদের ইস্কুলগুলিতেও মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ ও ম্যানেজিং কমিটিতে মুসলমান সভ্য নিয়োগ করাইবার নিমিত্ত শিক্ষা-বিভাগ জেদ করিতেছেন। যাহারা শিক্ষার বেশী আগ্রহান্বিত, শিক্ষার জন্য ত্যাগস্বীকার বেশী করে, শিক্ষার বেশী অগ্রসর, তাহাদিগকে জোর করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে তাহা দর জায্য স্থান হইতে—শিক্ষকতা হইতে, পরিদর্শকতা হইতে এবং স্কুলপরিচালক সমিতির সভ্য হইতে—কতকটা বঞ্চিত রাখা হইতেছে। হুতরাং বঙ্গে শিক্ষার অবস্থা ধারাপ হওয়া বিচিত্র নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি সহজ করাতোও (প্রমাণ, প্রথম বিভাগেই সবচেয়ে বেশী পাস হয়, যদিও পৃথিবীতে কোন কর্মক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণীর লোক সংখ্যায় বেশী নয়) স্কুল ও কলেজে ভাল শিক্ষা হয় না। আর একটি কারণ প্রধান প্রধান কলেজে ছাত্রবাহুল্য। তাহার দক্ষন প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মন দেওয়া হয় না।

বাংলা দেশের শত শত ছাত্র ও যুবক বিনা বিচারে বন্দী আছে। তাহাদের মধ্যে বেশ বুদ্ধিমান যুবক অনেক আছে। তাহারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিলে হয়ত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা তাহা দিতে পারে না, হয়ত দিতে চায়ও না।

বোধ হয় বাংলা দেশের ছাত্রদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উত্তেজনা এবং নেতাদের দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক কাজে ছাত্র ও অন্ত্র যুবকদিগকে নিয়োগ (অবস্ত্র বিনা বেতনে!) অন্ত্র প্রদেশের চেয়ে বেশী। ইহাও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রদের প্রায়ই পরাজয়ের একটা কারণ হইতে পারে।

আমি জানি না, এই পরীক্ষাগুলি ঐটি প্রতিযোগিতামূলক, না, ইহাও আগে মনোনিবেশ বা নমিনেস্তন হয়। যদি নমিনেস্তন

হয়, তাহা হইলে সার্বজনিক কাজে উৎসাহী অর্থাৎ পবিত্র-স্পিরিটেড অনেক ভাল ছেলে বোধ হয় পরীক্ষা দিতে পারেন।

আজকাল বাঙালী অনেক ছেলে চাকুরী করিতেই চায় না। সেই কারণেও কতক বুদ্ধিমান ছেলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেয় না।

আধুনিক নানাবিধ শিক্ষালাভ ও জ্ঞানলাভ অর্থশাপেক্ষ। বাঙালীদের মধ্যে—বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ভরলোকদের মধ্যে—অর্থকষ্ট বেশী হইয়াছে। এই জন্য তাহাদের ছেলেরা ভাল ভাল পুস্তক ও মাসিকপত্রাদি কিনিয়া পড়িবার সুযোগ ততটা পায় না। যতটা অন্ত্রান্ত্র প্রদেশের ঐ শ্রেণীর ছেলেরা পায়। এটাও বাঙালী ছেলেরদের অকৃত্তিত্বের একটি কারণ হইতে পারে।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসমূহে ভারতবর্ষের ও সমগ্র জগতের 'চলতি' ঘটনা ও সমস্ত্রা এবং আধুনিক ব্যাপারসকল সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা হয়। মৌখিক পরীক্ষায় এই সব বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। এই সকল বিষয়ে ইংরেজী নানা বহি ও সাময়িক-পত্র পড়া দরকার। বাঙালী ছেলেরা অন্ত্রান্য প্রদেশের—যেমন মাস্ত্রাজের—ছেলেরদের চেয়ে ইংরেজী বহি কম পড়ে—বিশেষতঃ গল্প ও উপন্যাস ছাড়া অন্ত্র বহি যাহা জ্ঞানগর্ভ। গল্পের মাসিক ছাড়া অন্ত্র ইংরেজী মাসিকও, জ্ঞানগর্ভ মাসিকও, বাঙালী ছেলেরা কম পড়ে। মজার রিভিউ বাংলা দেশ হইতেই বাহির হয়। ইহার উৎকর্ষ, পৃথিবীর অন্ত্রান্ত্র সমুদ্র মাসিকের তুলনায় উৎকর্ষ, স্ত্র মাইকেল স্ত্রাডগারের মত জানী বিনেদী (যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি ছিলেন) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "It is one of the live periodicals of the world" "ইহা পৃথিবীর জীবন্ত সাময়িক-পত্রগুলির মধ্যে একখানি।" তাহার বহুপূর্বে বিখ্যাত সাংবাদিক ও গ্রন্থকার নেভিলসন সাহেব কলিকাতা-দর্শনকালে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বহু আম'কে একবার বলিয়াছিলেন, "তোমার মজার রিভিউ মাস্ত্রাজীরা গল্পেলের মত করিয়া পড়ে।" কিন্তু ইহার পাঠক বাংলা দেশ অপেক্ষা বহু বাহিরে বেশী, বিশেষতঃ মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ও ছাত্রমূলে। সেদিন

কলিকাতার একজন উকীল কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, একবার একটি সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মৌখিক তেজ-চোদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে সাত-আটটিই এরূপ ছিল যাহার সন্ধে মভার্ণ রিভিউতে প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছিল।

[এ-বিষয়ে আমরা তাঁহার কথা ভুল শুনিয়াছি বা বুঝিয়াছি কিনা তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে চিঠি লিখি। তিনি গত ১১ই মে উত্তর দিয়াছেন :—“* ইংরেজী ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে ভারতবর্ষে গৃহীত আই সি এস পরীক্ষা দেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, viva voce examinationএ অধিকের উপর প্রশ্ন গত মাসের M. R. হইতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; দুইবারই এরূপ প্রশ্ন *Morden Review* হইতে করা হইয়াছিল; তবে একবার প্রশ্ন সব প্রশ্ন M. R. হইতে answer করা যাইত।” M. R. অর্থাৎ মভার্ণ রিভিউ।]

অজ্ঞাত প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশে সিনেমা ও থিয়েটারের আধিক্য লক্ষ্য হয়। ছাত্রদের মধ্যেও অভিনয়ের ধুম কিছু বেশী। ইহাতে যে কিছু অধিক মাত্রায় চিন্তাশক্তি উপস্থিত হয় না, এরূপ বলা যায় না।

ছাত্রেরা রাজনীতির বা অজ্ঞাত সমসাময়িক ব্যাপারের কোনই খবর রাখিবেন না, ইহা আমরা চাই না, আশাও করি না। কিন্তু ইহা অবশ্যই চাই ও আশা করি, যে, যেহেতু তাঁহারা ছাত্র, তাঁহারা বিদ্যার্থী, সেই জন্য ছাত্রের প্রধান কর্তব্য যে বিদ্যা অর্জন, জ্ঞানলাভ, তাহাতেই তাঁহারা বেশী মন দিবেন, সময় দিবেন, শক্তি ব্যয় করিবেন। আমরা কংগ্রেসের বা অন্য কোন রাজনৈতিক কিংবা অজ্ঞাবিদ দলের নেতা নহি বলিয়া ছাত্রেরা যদি আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রাগৈতিহাসিক মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আধুনিক ও অতি-আধুনিক নেতাদের দৃষ্টান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। দেশবদ্ধ চিন্তরঞ্জন দাস, দেশপ্রিয় বতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ব্রীহস্পতি হত্যাকাণ্ডে বহু প্রতীতি নেতারা আশ্রয় লইয়া সমাপ্ত করিয়া পরে কার্যতঃ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন। আমরা তাঁহাদের দৃষ্টান্তের প্রতিই অধিক মন দিতে বলিয়াছি, যাক্যে প্রতি তত মন দিতে বলি নাই এই জন্য, যে, দৃষ্টান্ত বাক্যের চেয়ে বেশী মূল্যবান।

(“Example is more valuable than precept”)

প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার বাড়ালী ছেলেদের অপেক্ষাকৃত কম কৃতকার্যতা উপলব্ধ করিয়া আমরা অনেক কথা লিখিলাম। বাড়ালী ছেলেদিগকে চাকরীর উদ্দেশ্যে কহা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য নহে, বরং শিক্ষার উন্নতি বাহাতে হয় সেই দিকে সকলে মন দেন ইহাই আমরা চাই। তবে ইহাও বলিতে চাই, যে, যখন দেখিতেছি শত শত হাজার হাজার বাড়ালী ছেলে সামান্ত বেতনের চাকরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন বড় চাকরীগুলিতেই বা বাড়ালী ছেলেরা চুবিবেন না কেন? বেসরকারী সার্বজনিক কর্মীদের শেবার উপর ভারতবর্ষের উন্নতি অবনতি, হিতাহিত নির্ভর করে বটে; কিন্তু বুদ্ধিমান চাকরোর যদি স্বদেশহিতময়ী হন, তাহা হইলে তাঁহারাও দেশের হিত অনেকটা করিতে পাবেন। বাড়ালী ছেলেদের মধ্যে যাহারা চাকর্যে হইবেন, তাঁহারা যেন ভারতহিতময়ী চাকর্যে হন।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ

বৈশাখের ‘প্রবাসী’তে আমরা ইহা লিখিয়াছি, যে, স্বাধীন-চিত্ত লোকেরা ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। যে-সবল কংগ্রেসপন্থীর কৌন্সিল প্রবেশে আপত্তি বা বাধা নাই, এবং যাহাদের কৌন্সিলের কাজ করিবার মত যোগ্যতা আছে, তাঁহারা কৌন্সিলে প্রবেশ করিলে ভাল হয়। বৈশাখের কাগজেই বলিয়াছি, তাঁহারা কৌন্সিলে গেলেই যে স্বরাজ লাভ হইবে, এরূপ আশা কম। কিন্তু অল্প দেশহিত বাহা হইতে পারে, তাহা বৈশাখের ‘প্রবাসী’তে লিখিয়াছি। কিন্তু কোন কংগ্রেসওয়ালার যদি মন্ত্রী বা তদ্রূপ অন্য কিছু চাকর্যে হইবার মতলবে কৌন্সিল প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাহা গর্হিত হইবে। কারণ তিনি যদি খুব দূরততঃ কংগ্রেসওয়ালার হন, তাহা হইলে তিনি গবর্নর ও আফগানদের সহিত স্বতানৈক্যবশতঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে দূর হইবেন; আর যদি দূরততঃ না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে গবর্নর-সৈন্য নীতিরই সর্বপ্রথম অঙ্গস্বরূপ করিতে হইবে—তাঁহার কংগ্রেসওয়ালার

টিকিবে না। সুতরাং কংগ্রেসের বদনামের তিনি কারণ হইবেন এবং কংগ্রেসের মতামতাদায়ী দেশহিত তাঁহার দ্বারা হইবে না।

ভারতবর্ষের কমিটিউশন কংগ্রেসের বা উদারনৈতিক দলের দাবি অনুযায়ী বস দিন না হইতেছে, ততদিন ঐ ঐ দলের স্বাধীনচেতা কাহারও মন্ত্রী বা তত্ত্বপ কিছু হওয়া উচিত নয়। কংগ্রেসওয়ালারা স্বরাজী হউন, কিংবা গৌড়া অসহযোগী হউন, তাঁহারা কোন্সিল প্রবেশ করিবেন কি-না, তাহা তাঁহারা ই স্থির করিবেন। সে-বিষয়ে আমাদের কিছু বলা উচিত নয়। আমরা কেবল চাই, যে খুব বেশী-স্বাধীনচিত্ত ও যোগ্য লোক কোন্সিলভুক্তিতে যান।

কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যে কতক লোক যেমন কোন্সিল-প্রবেশের পক্ষপাতী হইয়াছেন ও স্বরাজ্য দলকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিতেছেন, তেমন আর এক দল কোন্সিল প্রবেশের বিরোধীও হইয়াছেন। আগ্রা-অবোধ্য প্রদেশে শেষোক্ত দল খুব প্রবল। কংগ্রেসে আর এক দলেরও প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। তাঁহারা সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতান্ত্রিক দল। এই ভারতীয় সোশ্যালিষ্টদের সহিত ভারতীয় কমিউনিষ্ট বা সাম্যবাদী দলের কোন পার্থক্য আছে কি-না জানি না।

কোন্সিল দলের উৎপত্তি ভাল কি মন্দ, এক কথা বলা যায় না। কিন্তু যদি আদর্শভেদ, লক্ষ্যভেদ, মতভেদ জন্মে, তাহা হইলে তাহা চাপা দিয়া জোড়াভাড়া দিয়া বাহ্য একতা রক্ষা করা ভাল নয়; তাহাতে ফল হয় না, বরং অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র দল বা উপদল গঠিত হইলেও, যে-যে বিষয়ে আদর্শ ও মতে মিল আছে, সেই সব বিষয়ে একযোগে কাজ করা বাঞ্ছনীয়। তাহাতে কাজ বেশী ও ভাল হয় এবং বিবাদে শক্তিকর হয় না।

পার্টনার নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটিতে যদি কোন্সিল-প্রবেশ অঙ্গমোদিত হয়, তাহা হইলে কোন্সিল-প্রবেশার্থীদের তালিকা কংগ্রেসের স্থানীয় বা প্রাদেশিক বোর্ড প্রস্তুত করিবেন, না, স্বরাজ্য-দলের ঐ ঐ বোর্ড করিবেন, তাহা স্থির করিতে হইবে। নির্বাচনসম্বন্ধে জরী হইয়া থাকিবে। কোন্সিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন, কোন্সিলে তাঁহাদের আদর্শের ও কাজের উপর দৃষ্টি রাখিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের বিচ্যুত করিবেন কংগ্রেস কমিটি বা স্বরাজ্য-দলের কমিটি, তাহাও

বিচার্য। রাষ্ট্রীতে স্বরাজ্য-দলের কনকারেন্স যে প্রস্তাব দাখিল হইয়াছে, তদনুযায়ী কাৰ্য্যতালিকাতে কংগ্রেসের প্রায় সব কাজই আছে। স্বরাজ্য-দল যদি সব কাজই করেন, তাহা হইলে নো-চেম্বার বা গৌড়া অসহযোগীরা কি করিবেন?

অনেক কংগ্রেসওয়ালারা কংগ্রেসের একটা পুরা অধিবেশন চাহিতেছেন। তাঁহারা বলেন পুণার ধরোয়া কনকারেন্সের পর কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীবৃদ্ধ মাধব শ্রীহরি আনে ও পরে গান্ধীজী যে সমষ্টিগত নিরুপদ্রব প্রতিক্রিয়া স্বগত করেন, এবং পার্টনার থাকিতে গান্ধীজী যে বয়ঃ একমাত্র সভাপতি হইয়া উঠা “একচেটিয়া” করেন, ইহা সমস্তই অবৈধ, কংগ্রেসের বিধিবিহিত। তাঁহাদের মতে কোন্সিল-প্রবেশও লাহোর কংগ্রেসের স্বাধীনতা ঘোষণার বিরোধী, এবং নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্যরা এত পূর্বে নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নির্বাচনের পর এত নূতন প্রশ্ন ও সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে, যে, এখন তাঁহাদের মত কংগ্রেসওয়ালাদের বর্তমান মত বলিয়া ও তাঁহাদিগকে এখনকার প্রস্রাবলী সম্বন্ধে কংগ্রেসওয়ালাদের মুখপাত্র বলিয়া স্বীকাণ করা যায় না। তাঁহাদের মতে এই এই কারণে পুরা কংগ্রেসের এক অধিবেশন এবং নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির নূতন সভ্য নির্বাচন আবশ্যক।

পার্টনার নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত লিখিত সব বিষয়ের আলোচনা হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইয়া গেলে আবার সম্পাদকেরা, অস্ত্র সাংবাদিকেরা এবং হরেক রকমের খবরু ও সার্বজনিক মন্তব্যেরা (public men) নিজের নিজের মত জাহির করিবেন।

আর একটা বিষয় লইয়া এখন খুব আলোচনা চলিতেছে। তাহা, “বেতপত্র”কে সম্পূর্ণ অস্বীকার কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে ভুলীভাব।

বেতপত্র হুশমন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক
বাটোয়ারা—?

নব-স্বরাজ্যের বলিতেছেন, তাঁহারা বেতপত্রের পুরাপুরি নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান করিবেন, উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবেন—উহা হুশমন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা সম্বন্ধে তাহা বলিতেছেন না। কেহা করিলে বলিতেছেন, বেতপত্র

ত উহাকে ভিত্তি করিয়াই রচিত, উহা বেতপত্রের একটা অঙ্গ, হুতরাং বেতপত্রকে অগ্রাহ্য করিলে উহাকেও অগ্রাহ্য করা হইল। তাই যদি হয়, তাহা হইলে পরিকার ভাষায় বলুন না, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগবীটোআরাও দৃশ্যমন, উহাকেও প্রত্যাখ্যান করিলাম। তাহা তাহার বলিতেছেন না। তাহার কারণও আছে। সাম্প্রদায়িক ভাগবীটোআরাটো মুসলমানদের খুব পিয়ার। তাহাকে দৃশ্যমন বলিলে প্রায় সব মুসলমান ঝিকঝা বসিবে। তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইবে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাগবীটোআরাটিকে দৃশ্যমন না বলিলেই কি ঐ মিলন হইবে? হইবে না। কারণ, অধিকাংশ মুসলমানের দাবি শুধু এ নয়, যে, “ওটাকে দৃশ্যমন বলিও না,” তাহার চায়, বল, যে, “ওটা খুবই জায়া জিনিষ।” অত্মদিকে ওটাকে দৃশ্যমন না বলিলে হিন্দুরা, এমন কি বিস্তর কংগ্রেস-ওলা হিন্দুও, স্বরাজীদের সহিত একমত হইবে না। বস্তুতঃ, ঐ ভাগবীটোআরাটা যে কেবল বঙ্গের ও পঞ্জাবের হিন্দু-দিগকেই লক্ষিত অপমানিত ও হীনকল করিয়াছে তাহা নহে, উহা সমগ্রভারতের হিন্দুদিগকে পদাঘাত করিয়াছে এবং অধিকন্তু উহা স্বাভাষিকতা (ন্যাশনালিজম্) এবং গণতান্ত্রিকতাকেও (ডিমোক্রাসীকেও) অপমানিত, অগ্রাহ্য ও হীনবল করিয়াছে। হুতরাং কংগ্রেস যদি স্বাভাষিক ও গণতান্ত্রিক বলিয়া নিজের পরিচয় বজায় রাখিতে চান, তাহা হইলে প্রত্যেক হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি কংগ্রেস-ওলার ঐ বীটোআরাটা প্রত্যাখ্যান ও অগ্রাহ্য করা উচিত।

আর একটা কথা এই, যে, ঐ বীটোআরা অহুসারে বেতপত্রের একটা মাত্র অংশ, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভাগুলোতে কোন ধর্মাবলম্বীরা কত আসন পাইবে তাহার ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে, ঝট। কিন্তু বেতপত্রে তা ছাড়া আরও অনেক জিনিষ আছে; সেগুলোই উহার অধিক অংশ। সেগুলোতে ভারতবর্ষের লোকদিগকে ক্ষমতা দিবার নামে বন্ধন, এবং অধিকার দিবার নামে অনধিকার দেওয়া হইয়াছে। যদি বরাজীদের বা অন্য কলহাদিও চেষ্টায় ঐ বন্ধন কমে ও মুক্ততা বাড়ে, অনধিকার কমে ও অধিকার বাড়ে, কিন্তু যদি সেই সবে কমে বীটোআরাটা নাকচ না হইয়া বজায় থাকে, তাহা হইলে ফলটা কিরূপ পাড়াইবে? কল এই হইবে, যে, ইন্-কোর-মুসলমানেরা আরও কলহাশালী এবং হিন্দুরা

আরও হীনবল হইবে। হইতে পারে হিন্দুরা দুর্বল, কিন্তু কিসের বানে কি, কিসের কল কি, তাহার তাহা বুঝিতে সমর্থ। এই ভক্ত বখন আগা খান বলিয়াছিলেন, “এস, ভারতীয় বেরাদররা সব, সাম্প্রদায়িক ভাগবীটোআরাটার এখন আলোচনা না করিয়া বেতপত্রের অন্ত দোষগুলো আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা শুধরান যাক্,” তখন হিন্দুরা সবাই না হোক অনেকেই তাহার মতলবটা বুঝিয়াছিল এবং মুসলমান বরাজীদের চা'লও এখন তাহার বুঝিতেছে।

ভারতবর্ষের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ও সকল জাতির ও শ্রেণীর লোকদের মিলন আমরাও চাই। কিন্তু যত দিন কোন কোন সম্প্রদায়ের, জাতির ও শ্রেণীর আত্মগত্যের মূল্য নীলামের সর্বোচ্চ ডাক অহুসারে দিবার ক্ষমতা ইংরেজদের থাকিবে এবং স্বদেশবাসী অজ্ঞাত সম্প্রদায়ের, জাতির ও শ্রেণীর সহযোগিতা ও দেশের স্বাধীনতার পরিবর্তে, সেই মূল্য লইয়া ইংরেজের আত্মগত্য স্বীকার করিতে কোন কোন সম্প্রদায় রাজী থাকিবে, তত দিন এই মিলন হইবে না। এবং, সব সম্প্রদায়ের মিলন জিন্ন স্বরাজ পাওয়া যাইবে না, এই বিশ্বাসে বা এই বিশ্বাসের বাহু তাণে যত দিন আমরা ক্রমাগত সম্প্রদায়বিশেষের দ্বারস্থ হইতে থাকিব, তত দিনও মিলন হইবে না। বখন হিন্দুরা নিজের চেষ্টায়, মুসলমানরা নিজের চেষ্টায়, স্বরাজ্যলাভে প্রয়াসী হইবে, অথচ অন্তের সহিত মিলনেও অনিচ্ছুক হইবে না, তখন মিলন হইতে পারে।

মন্ত্রিত্ব ও শাসন-পরিষদের সভ্যত্ব

বঙ্গের অন্ততম মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব শাসন-পরিষদের সভ্য হইলেন। বোম্বাইয়েও এক জন মন্ত্রী তথাকার শাসন-পরিষদের সভ্য হইয়াছেন। মন্ত্রীদের এইরূপ গড় গ্রহণ বাহনীয় নহে। তাহার প্রজ্ঞাপকের লোক। গবর্নেন্টকে খুশী রাখিলে তবে শাসন-পরিষদের সভ্য হইবার নিয়ম বা রীতি থাকিলে মন্ত্রীরা প্রজ্ঞাপিত অপেক্ষা যথাসাধ্য গবর্নেন্টের অনুজ্ঞাপানিতে বেশী মন দিবে। এইরূপ, হাইকোর্টের কিংবা ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির শাসন-

পরিষদের সভ্য হওয়ার রীতিটাও ভাল নয়। তাহাতে ভিতরে ভিতরে উভয় পক্ষে অধিষ্ঠিত লোকদের মানসিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়, তাহার। গবর্ণমেণ্টকে খুশী রাখিতে চেষ্টা করে।

বঙ্গে আর মন্ত্রী অনাবশ্যক

বঙ্গের এক মন্ত্রী শাসন-পরিষদের সভ্য হইলেন, কিন্তু আরও দু-জন মন্ত্রী আছেন। মন্ত্রীদের কাজ এমন কিছু বেশী নহে, যে, দু-জনের দ্বারাই চলিতে পারে না। অনেক বৎসর পূর্বে একজন ছোটলাট কয়েক জন সেক্রেটারী সাহায্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও আসামের কাজ চালাইতেন। এখন ভার কারগার তিন লার্ট, বহুসংখ্যক মন্ত্রী ও শাসন-পরিষদের সভ্য, এক এক গাদ্দা সেক্রেটারী, এবং অনেক দফতর আরও কিছু হইরাছে। তাহাতে প্রজাদের জান, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, শক্তি, সুখস্বচ্ছন্দ্য কতটুকু বাড়িয়াছে?

তাই বলি আর-মন্ত্রী চাই না। ভাগও ত এখন বেশ আছে—এক-এক জন হিন্দু ও এক-এক জন মুসলমান মন্ত্রী ও শাসন-পরিষদের সভ্য।

শিক্ষা-বিভাগের ভার কে পাইবেন?

বাংলা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা, (“অ আ ক খ”র পড়ুয়া ছাড়া) শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষালয়-প্রতিষ্ঠাতার সংখ্যা, শিক্ষার জন্ত দাতার সংখ্যা, এবং শিক্ষাবিভাগের জন্ত আগ্রহান্বিত ও উৎসাহী লোকের সংখ্যা মুসলমান সমাজের চেয়ে হিন্দু সমাজে ঢের বেশী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসকলের ও শিক্ষা-বিভাগের ব্যয় প্রধানতঃ হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের বেতন হইতে চলে। বঙ্গের রাজস্ব হইতে গবর্ণমেণ্ট যে টাকা শিক্ষা-বিভাগের জন্ত দেন তাহারও অধিকাংশ যে হিন্দুদের দেওয়া, (কারণ, হিন্দুরাই রাজস্বের খুব বেশী অংশ দেয়) তাহা না হয় নাই বলিলাম।

অথচ দেখিতে পাই, শিক্ষামন্ত্রীর কার্যটা যেন মুসলমানের একচেটিয়া হইয়া বসিতেছে। এই ব্যবহার সুদীর্ঘত নীতি কি এই, যে, শিক্ষার জন্ত বাহাদের প্রচুর কম, বাহারা শিক্ষার জন্ত কম আগ্রহীকার করিয়াছে ও করিবে, তাহাদের জন্ত

হইতেই শিক্ষা মন্ত্রী লইতে হইবে? অধিকাংশ হিন্দু-ইচ্ছাপূর্ত্তার ত মুসলমান আছেনই। [ইহা ছাপিতে বাইবার আগে দেখিলাম, তৃতীয় মন্ত্রীর নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত নবাব কারোবী সাহেবকে শিক্ষা-বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ও ত লিখনপঠনক্ষম? তিনি কি হিন্দু বলিয়াই শিক্ষা-বিভাগের ভার পাইলেন না? আমরা বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিতেছি, যে, তিনি এক জন লিখনপঠনক্ষম বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টিয়ান, বা সাঁওতালকে শিক্ষা-মন্ত্রী নিযুক্ত করুন। বঙ্গে কেবল হিন্দু ও মুসলমান বাস করে ও ট্যাক্স দেয় এমন নহে; ইহারও বাস করে ও ট্যাক্স দেয়।]

শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা কোন রকম সাম্প্রদায়িকতা চাই না। কিন্তু যদি হিন্দুদিগকে কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হয়, তাহা হইলে বলি, হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রদত্ত রাজস্বের অংশ হইতে, হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের বেতন হইতে, তাহাদের স্থাপিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে, তাহাদের নির্মাচিত পুস্তকাদির সাহায্যে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অসুমতি দেওয়া হউক। অবশ্য পরিদর্শনের অধিকার ও কমতা গবর্ণমেণ্টের থাকিবে। এখন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৫১ জন ছাত্র মুসলমান হইলে তাহা মন্তব্য বলিয়া গণিত হইতে পারে, এবং তাহাতে হিন্দু ছাত্রদিগকেও বন্দ্য বাংলায় লেখা অপকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হয়। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর ও আপত্তিকর নিয়ম।

বোম্বাইয়ের ধর্ম্মঘট

বোম্বাইয়ের কাগড়ের কলগুলির প্রমিকরা ধর্ম্মঘট করার প্রায় সব কল বন্ধ হইয়াছে। ১০৮০ হাজার প্রমিক বেকার অবস্থায় আছে। ঐ সংখ্যার স্থানবৃত্তি হইতেছে। প্রমিকদের বেতন বাড়ি উচিত, বাসভূমি আদির বন্দোবস্ত ভাল হওয়া উচিত। কিন্তু এ-মেশের গবর্ণমেণ্ট যে-প্রকার লোকদের দ্বারা চালিত। তাহার। ধর্ম্মিক বা ধর্ম্মিকের গা-বেঁসা, প্রমিক বা প্রমিকের গা-বেঁসা নহে। এই জন্ত ধর্ম্মঘট করিয়া প্রমিকরা প্রোহই লাভবান হইবে না। অথচ ধর্ম্মঘট না করিয়াই বা করে কি?

মিলওয়ালারাও ত দেখিতেছেন, যে, তাঁহারা শ্রমিকদিগকে কম বেতন দি।ও, তাহাদের শিক্ষাভাব ও অসজ্জাব এবং তজ্জনিত অকার্য্যত্বপূর্ণতা হেতু, জাপানের সঙ্গে টকর দিতে পারিতেছেন না। নিজেদের লাভ খুব কম রাখিয়া শ্রমিকদিগকে সন্তুষ্ট, কারিগরীতে শিক্ষিত ও স্বস্থ করিয়া দেখুন না তাহাতে বরশিল্পের শ্রী কিরে কিনা? কিরিবার খুবই সম্ভাবনা।

দেশব্যাপী বাড়

আসাম, বাংলা ও বিহারের অনেক স্থানে প্রবল বাড় ও রুটিতে অনেক গৃহ নষ্ট এবং মৃত্যু ও পতন হত ও আহত হইয়াছে। বিপন্ন ও আর্ন্ত সকলের জন্ত দুঃখ অনুভব করিতেছি।

শ্রুর চেন্তুর শঙ্করন্ নায়ায়

শ্রুর চেন্তুর শঙ্করন্ নায়ায় মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর ও ভারতবর্ষের এক জন কৃত্তী পুরুষ ছিলেন। সম্প্রতি ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বাংলা ও বোম্বে মেঘাবী ছাত্র ছিলেন এবং পরে বড় উকিল হইয়া হাইকোর্টের জজ, মাস্ত্রাজের ও ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্য, প্রভৃতি উচ্চপদে তিনি অধিষ্ঠিত হন। তিনি একবার দাবেক কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন।

স্বাধীনতার দ্বারদেশে

ত্রিশ বৎসরের কিছু অধিক কাল আমেরিকার স্বাধীন থাকিয়া ফিলিপাইন্স দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীনতা পাতে যাঁতেছে। তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিবার আইন আমেরিকার কংগ্রেসে পাস হইয়া গিয়াছে। এখন ফিলিপিনোরা ঐ আইনের কয়েকটা শর্তে রাজী হইলেই হয়। তাহারা স্বাধীন হইলে বিনামূল্যে স্বাধীন হওয়ার ইহা একটি দৃষ্টান্ত হইবে।

ইংরেজেরই তৈরি আইন ও কলটিটিউশ্যনের জোরে ডি ভ্যালেরা আমেরিকাকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিতেছেন।

নিজেদের সাহসে এবং ইংলণ্ডের ওয়েস্টমিনস্টার স্ট্যাটুট (Westminster Statute) নামক ঐ আইনের অনুসরণ করিয়া এবং তাহা হইতে ইঙ্গিত পাইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার বোতকারেরা স্বাধীন হইতে বসিয়াছে। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াও এই পথের পথিক হইবে। ইংরাজ সব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ডোমিনিয়ন। এইজন্যই কি ইংরেজরা ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন হইতে দিতে চাহিতেছে না?

অধ্যাপক রামনের অবদানপরম্পরা

পাছে প্রস্তাবিত ইতিহাস একাডেমী অব সায়েন্সের সদর আফিস কলিকাতায় হয় এইজন্য শ্রুর চেন্তুর শঙ্করন্ নায়ায় ঐ নাম দিয়া ইতিমধ্যেই একটা বৈজ্ঞানিক সমিতি বাঙ্গালোরে রে।ষ্ট্রী করিয়া কেলিয়াছেন! * উদ্যোগী পুরুষ বটে! নইলে বাঙালীকে বোকা বানাইয়া তাহাদেরই কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিলেন, আর কোন অধ্যাপক বা বাঙালী ছাত্রকে সেগুলি ব্যবহার করিতে দিলেন না, এবং ছুটি লইয়া বাঙালোর হাইবার সময় সেগুলি সঙ্গেও লইয়া গেলেন! এখন তিনি দয়া করিয়া বলিয়াছেন, আর কলিকাতায় ফিরিবেন না, যন্ত্রগুলিও ফেরত দিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসক বীরদল তাঁহাকে এই প্রকার আচরণ করিতে দিয়াছেন সম্ভবতঃ এইজন্য, যে, তিনি শ্রুর আওতাযে সুযোগাধ্যায় কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁর “সাতগুন মাক।” বাংলায় যে “কর্তার ভৃত” লব্ধ প্রবাদ-বাক্য আছে, তাহা যথার্থ।

বিহারের আক ও বঙ্গের পাট

আক-চাষীদের সুবিধার জন্ত ভারত-সংস্কার-ইন্সুর দাম বাধিয়া দিবার আইন করিয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে

* এই বিশ্বের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-কমিটির অর্গানাইজিং সেক্রেটারী ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও ডক্টর এস. পি. অমরকর সংবাদপত্রে একটা বীর সংগ্রহ ও সভাপতিত্বাভ্যাস করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠের প্রকাশী দ্বীপবার উৎসাহ করিবার সময় তাহা দেখতে পাওয়া উত্তর লব্ধে কিছু লিখিতে পারি।

প্রকাশীর সম্পাদক।

বিহার-স্ববল্লভ আইন-গাথীদের স্থিতি করিয়া দিতেছেন।
এখন গ্রামের কলকলারাকোণে চাষীদিগকে খুব কম দরে
আবক বেচিতে বাধ্য করিতে পারিবে না। বজের পাটচাষীরা
খুব কম দামে পাট বেচিতে বাধ্য হয়। গরয়ে পট পাটের
দর বাড়িয়া দিবার আইন কিন্তু করেন নাই।

চিনির কল বেনীর ভাগ বেশীলোকদের, চটকল বেনীর
ভাগ বিদেশী লোকদের।

সেনহাটির মহিলাদের পুণ্য কীর্তি

সেনহাটির পানীর জলের অল্প রকিত জলাশয়টি আগাছায়
পূর্ণ হওয়াও অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছিল। লোক্যাগ বোর্ডের
স্বাধীনকে পুনঃ পুনঃ বলাতেও তাহার আগাছা তুলাইয়া দেন
নাই। তখন সেনহাট মহিলা-সমিতির ৪০ জন মহিলা সভ্য
কোয়ার বীথিয়া ৪ দিনের পরিভ্রমে জলাশয়টি স্বয়ং সাফ
করিয়াছেন এবং ডিক্রিষ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে উহার জল
বীজাণুমুক্ত করাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ধন্য এই
মহিলারা। এখন ইহাদের কৃপায় আশা করি বাবুদের পৌরুষ ও
স্বভাব্য উৎসাহ হইবে।

এই মহিলাগুলির চিত্র সেনহাটির কোন সার্বজনিক
প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত হওয়া যাহনীয়। 'প্রবাসী'তে উল্লিখিত
ছবি ছাপিতে পাইলে প্রবাসীর পৌরষ বাড়িবে মনে করি।

মাসিক কাগজের সমালোচনা

কোন কোন বাংলা ও ইংরেজী মাসিকে কোন কোন
বাংলা ও ইংরেজী মাসিকপত্রের পরিচয় বা "সমালোচনা"
দেখিতে পাই। অজ্ঞাত মাসিকের প্রতি নেকুনজর ইহাদের
কেন হয় না? খোসামোদ পান না বলিয়া? তাহা হইলে
নাচার।

রবীন্দ্রনাথ ও সিংহল

চীন, জাপান, স্ববল্লভ, শ্যামদেশ প্রভৃতির সহিত প্রাচীন
কালে ভারতীয় সংস্কৃতির যে যোগ ছিল, আধুনিক সময়ে
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই সব দেশে গিয়া তাহা নুতন করিয়া
স্থাপন করেন। তাঁহার সিংহলযাত্রা দ্বারাও ভারতবর্ষের
সহিত সিংহলের প্রাচীন সংস্কৃতি-যোগ পুনরুজ্জীবিত হইবে।

চিত্র-পরিচয়

সমুদ্র-শাসন

রঘুপতি রামচন্দ্র সীতার উদ্ধারকল্পে সাগরতীরে উপনীত
হইয়া বিশাল জলবিধি দ্বারা উত্তীর্ণ হইবেন, তাহা শ্রবণ
করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বিত্তীয়পের পরামর্শে উপবাস
ক্ৰিষ্ট রাখব দীর্ঘকাল কুশ-শরনে সাগরের অপেক্ষা করিতে
লাগিলেন; কিন্তু তাহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ
হইয়া তাহাকে সর্বাঙ্গিত শাস্তি দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন—

"সাগর তব বি আদি অরিজান-বারণ"

উৎসর্গ

জীবন-মেঘতার নেউলে মহিলাগণের অর্ঘ্য দিবার প্রথা
এখন এক স্ববল্লভ ও কলীকাল অনেক প্রাচীন কাল হইতে

চলিয়া আসিতেছে। পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি উপঢ়ার, দীপ-
শিখা লইয়া, নানা বৃত্ত্য সভারে তাহার দেবতার তুল্যবিধানে
বসবান হইতেন। বর্তমান চিত্রে বর্ষ বৈচিত্র্য ও অন্ধন-পরিপাটো
ভাবসম্পদ যথেষ্ট পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ এই
কথাই বলিয়াছেন—

"সন্ধ্যা হলে, সূর্য্যাস্তে, বিজন তব দেউলে,
আগারে দিত প্রবীণ যতনে"—

সুধাতি

এই চিত্রে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে যে অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্যের
স্বষ্টি হয় তাহা দেখান হইয়াছে। ইহাকে বলে 'কলার কন্ট্রাস্ট
স্কিম' (colour contrast scheme)। পরিবর্তনীয় সৃষ্টিতের
আত্মলভ্যতা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

৩০৫-৬, আপনার সাহু দার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে ত্রৈমাসিক দ্বারা দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ হৃদরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৪শ ভাগ

১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪১

৪র্থ সংখ্যা

পাঠিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহিছে হাওয়া উতল বেগে
আকাশ ঢাকা সজল মেঘে
ধ্বনিয়া উঠে কেকা।
করি নি কাজ পরি নি বেশ—
গিয়েছে বেলা বাঁধি নি বেশ,
পড়ি তোমারি লেখা।

ওগো আমারি কবি,—
তোমারে আমি জানি নে কভু,—
তোমার বাণী আঁকিছে তবু
অলস মনে অজানা তব ছবি।
বাদলছায়া হায় গো মরি
বেদনা দিয়ে তুলেছ ভরি’,
নয়ন মম করিছে ছলছল।
হিয়ার মাঝে কী কথা তুমি বলো!

কোথায় কবে আছিলে জাগি,
বিরহ তব কাহার লাগি
কোন্ সে তব প্রিয়া।
ইন্দ্র তুমি, তোমার শচী,
জানি তাহারে তুলেছ রচি’
আপন মায়া দিয়া।

ওগো আমার কবি,—
ছন্দ বুকে যতই বাজে

ততই সেই মূর্তিমাঝে
জানি না কেন আমারে আমি লভি ।
নারীহৃদয় যমুনাতীরে
চিরদিনের সোহাগিনীরে
চিরকালের শুনাও স্তবগান ।
বিনা কারণে ছলিয়া ওঠে প্রাণ ॥

নাই বা তার শুনিলু নাম
কভু তাহারে না দেখিলাম
কিসের কৃতি তায় ।
প্রিয়ারে তব যে নাহি জানে
জানে সে তারে তোমার গানে
আপন চেতনায় ।

ওগো আমার কবি,—
শুদূর তব ফাশুন রাত
রক্তে মোর উঠিল মাতি’
চিন্তে মোর উঠিছে পল্লবি’ ।
জেনেছ যারে তাহারো মাঝে
অজানা যেই সেই বিরাজে
আমিও সেই অজানাদের দলে
তোমার মালা এলো আমার গলে ।

বৃষ্টিভেজা যে ফুলহার
শ্রাবণ সঁঝে তব প্রিয়ার
বেণীটি ছিল ঘেরি’—
গন্ধ তারি স্বপ্ন সম
লাগিছে মনে, যেন সে মম
বিগত জনমেরি ।

ও গো আমার কবি,—
জানো না তুমি যুহু কী তানে
আমারি এই লতাবিতানে
শুনায়েছিলে করুণ ভৈরবী ।
স্বটেনি যাহা আজো কপালে
স্বটেছে যেন সে কোন্ কালে,
আপনভোলা যেন তোমার গীতি
বহিছে তারি গভীর বিস্মৃতি ॥

পুরাণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়

ত্রিগিরীশ্রমশেখর বসু

অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা যে, পুরাণগুলি রূপকথার মত নানা প্রকার অবাস্তব, অসম্ভব ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিবরণে পূর্ণ; পুরাণে বিশ্বাসযোগ্য কোন ব্যাপারের উল্লেখ প্রায় নাই বলিলেই হয়; যদি বা কিছু থাকে তবে তাহা এত অতিরঞ্জিত যে তাহা হইতে সার উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই নুক্তিবাদী আধুনিক পণ্ডিতগণ পুরাণে মনোনিবেশ করন নাই।

অষ্টাদশ মূল পুরাণ ও বহু উপপুরাণ লিখিত হইয়াছে। সকল পুরাণ এক সময়ের নহে। কোনটি প্রাচীন, কোনটি নিত্যন্ত অধীন। একই পুরাণে প্রাচীন ও অধীন অংশ আছে। অধুন-প্রচলিত পুরাণগুলির মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণ সর্বাধিক প্রামাণিক ও প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃতি বিবেচনা করেন। পুরাণে কি কি বিষয়ের আলোচনা থাকে, তাহা বায়ুপুরাণের ৪।১০ শ্লোকে দেখা যাইবে; যথা,

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাপি চ।

বংশোহুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ, সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবরণ, মন্বন্তরের বিবরণ, বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ ও সেই সকল বংশজাত ব্যক্তিগণের বিবরণ পুরাণে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবরণ ও বর্ণনামূলক ও মোক্ষ-প্রতিপাদক আধ্যাত্মিক পুরাণে দেখা যায়। সূত নামক বিশেষ সম্প্রদায়গত ব্যক্তিগণ পুরাণ-বক্তা ছিলেন। বায়ুপুরাণে আছে, “প্রাচীন পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, অমিততেজা দেবতা, ঋষি, রাজা ও অন্যান্য মহাত্মাদিগের বংশবৃত্তান্ত জানিয়া রাখাই সূতের স্বধর্ম” ॥ বায়ু ৩।৩১, ৩২ ॥ হতকে বহুস্থানে সত্যব্রতপরায়ণ বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে।

পুরাকালে ভারতবর্ষ বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যের সভায় এক জন করিয়া মাগধ থাকিতেন।

মাগধগণ নিজ নিজ প্রভু রাজ্যের বংশ-বিবরণ ও কীর্তিকলাপ জানিয়া রাখিতেন। স্টেট হিস্টরিয়ন (State Historian) বলিলে আমরা যাহা বুঝি, মাগধ তাহাই। পূর্ববর্ণিত সূতগণ বিভিন্ন দেশের মাগধগণের নিকট হইতে সমসাময়িক ‘হিস্টরি’ সংগ্রহ করিতেন। কোন মাগধ স্বীয় প্রভু সম্বন্ধে কোন অতুক্তি করিয়া থাকিলে বা প্রভুর কোনও দোষ গোপন করিয়া থাকিলে সূতগণ তাহা সংশোধন করিতেন। এইজন্যই সূতগণকে সত্যব্রতপরায়ণ বলা হইয়াছে। সূতগণ সকল রাজ্যেরই বংশবিবরণাদি জানিতেন। পুরাকালে রাজা ও ঋষিগণ প্রায়ই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন। যজ্ঞে নানা দেশ হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও বিদ্বান ঋষিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। যজ্ঞে সূতগণ আগমন করিয়া নিজ নিজ সংগৃহীত বিবরণ পাঠ করিতেন। এই সূতোক্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা এক শ্রেণীর ঋষির কার্য ছিল। প্রম্পরাপ্রাপ্ত সূত-কাহিনী ঋষিগণ কর্তৃক গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া পুরাণ নামে পরিচিত হইয়াছিল। পুরাণ-সংগ্রহ বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। পুরাণকর্তা ঋষিগণ বিভিন্ন কালে পুরাণকে পরিবর্তিত করিয়াছেন ও বিশেষ বিশেষ ঘটনার মন্বন্তর নির্দেশ করিয়াছেন। মন্বন্তর নির্দেশ ও কাল নির্দেশ একই কথা। মন্বন্তরের সঙ্কেত অতীত আলোচনা করিয়াছি। পুরাণকার ঋষিগণের মতে ভগবতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বার-বার আবর্তিত হইতেছে। অতি অতি দীর্ঘকালে এইরূপ একটি আবর্তন সম্পন্ন হয়। পুরাণকার ঋষি সৃষ্টির আদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রলয়কাল পর্যন্ত বিভিন্ন জাগতিক ঘটনার বিবরণ কাল-নির্দেশ সহকারে লিপিবদ্ধ করিতে চাহেন। এইজন্যই তিনি পুরাণে সৃষ্টি ও প্রলয়কালের অবস্থা আলোচনা করিয়াছেন। পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ বিচার করিলে পুরাণকে হিস্টরি বলিতে কোন বাধা থাকিবে না। পুরাণকার চাহেন যে, তাঁহার

এই ক্রমশঃ নূতন নূতন ঘটনার বিবরণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকুক। কালের কবল হইতে পুরাণকে রক্ষা করিবার জন্য পুরাণকার এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি হিষ্টরি রক্ষার জন্য শিলালিপি, তাম্রলিপি, লোহার সিঁহক, ইম্পিরিয়ল রেকর্ডস ডিপার্টমেন্ট প্রভৃতি কিছুই আশ্রয় লন নাই। তিনি জানিতেন, রাষ্ট্রবিপর্যায় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এ সমস্তই ধ্বংস হইয়া যায়। পুরাণকার পুরাণ-রক্ষার জন্য এক অবিদ্যাবী আশ্রয় খুঁজিয়াছেন। পুরাণকার ঋষি দেখিলেন যে মানবের ধর্মবুদ্ধি চিরন্তন। যতদিন পৃথিবীতে মাছুষ থাকিবে ততদিন সে কোন-না-কোনও ধর্ম আশ্রয় করিবে। সাধারণের ধর্মবুদ্ধি যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে। ধর্মের মূল অলৌকিক। পুরাণকার ঋষি পৌরাণিক বিবরণকে সহজ ভাবে প্রকাশ না করিয়া তাহার কাহিনীর ধর্মবুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দিলেন। ফলে পুরাণে অতিরিক্ত ও অতিপ্রাকৃত প্রস্তাব আসিল এবং পুরাণ ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। পুরাণ শ্রবণ, পঠন, লিখন, মুদ্রণ ও ব্রাহ্মণকে পুরাণদান এখনও সাধারণে মহাশুণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সরলভাবে লিখিত হিষ্টরি রক্ষার জন্য কেবল বিশেষজ্ঞ হিষ্টরিয়নই যত্নবান হইতে পারেন। সমাজে এইরূপ হিষ্টরিয়নের সংখ্যা নগণ্য। অপর পক্ষে, জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত সংস্কৃত বাস্তব পৌরাণিক ভঙ্গীতে লিখিত হিষ্টরি-রূপ ধর্মশাস্ত্র রক্ষার জন্য সমুৎসুক। পুরাণ এখনও বহু প্রচলিত, কিন্তু অনেক জ্যোতিষ প্রভৃতি পুরাতন বিজ্ঞানগ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। পুরাণকার ঋষির অভ্যুজ্ঞিতগুলির প্রকৃত অর্থ সহজেই ধরা পড়ে। পুরাণার্থ-বিস্ফোজ হিষ্টরিয়নের কাছে পুরাণ প্রকৃত হিষ্টরি এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য পুরাতত্ত্ব বলিয়াই বিবেচিত হইবে। পুরাণের প্রামাণিকতা অত্যন্ত আলোচনা করিয়াছি।

আধুনিক হিষ্টরিতে কেবল রাজা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বংশ ও বংশাধরিতাই থাকে এমন নহে। সকল প্রকার প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক ঘটনার বিবরণও হিষ্টরিতে পাওয়া যায়। পুরাণকারও তদ্রূপ অনেক নৈসর্গিক ঘটনার বিবরণ পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুরাণে উল্লিখিত আছে,

চাক্ষুঃ মনস্তর শেষ হইল ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছিল।
মৎস্তাঃ ১০০ ॥ এই জলপ্লাবনের কথা বহু দেশের কিংবদন্তীতে প্রচলিত আছে। পুরাকালে কবে লোক-
ক্ষয়কর ভূমিকম্প হইয়াছিল পুরাণে তাহাও লিখিত আছে।

প্রাকৃতিক ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য পুরাণের একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে। এই হৃত জানা না-থাকিলে বর্ণনা অতিপ্রাকৃত মনে হইবে। পুরাণ সর্বত্র হিন্দুশাস্ত্রানুগামী। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্ব হিন্দুদর্শনকার বিচার করিয়াছেন। পুরাণ সেই দার্শনিক তত্ত্ব ভিত্তি করিয়া নৈসর্গিক ঘটনাসমূহ বিবৃত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র-মতে ব্রহ্মের শক্তিতে উদ্ভাসিত না হইলে জড়জগৎ প্রকাশিত হয় না। জড় ও চৈতন্য বিরুদ্ধবর্মা। চৈতন্যই ব্রহ্ম। জড়ে চৈতন্যশক্তি না থাকিলে জড়জগৎ মানুষের চৈতন্যে প্রতিভাসিত হইতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক জড়পদার্থে চৈতন্যশক্তি বিরাজ করিতেছে স্বীকার করিতে হয়। আধুনিক মনোবিদ্যার ভাষায় ইহা এক প্রকার ‘প্যান-সাইকিজম্’ (panpsychism)। বহু মনোবিৎ বলেন, জড় (material) ও চৈতন্য (mental) প্রকৃতিগত পার্থক্য বর্তমান। অগত্যা ইহাদের মধ্যে একে যে অন্তর্কে প্রভাবিত করিতে পারে এরূপ কল্পনা করিতে পারা যায় না। শরীর খারাপ হইলে মন খারাপ হয় ও মন খারাপ হইলে শরীর খারাপ হয়—এই যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ইহা জড় ও চৈতন্যের পরস্পরাশ্রয় প্রমাণিত করে না। ইহাদের মতে জড়প্রকৃতিজাত শরীর নিজ নিয়মে স্বাধীনভাবে চলিতেছে ও তাহার সহিত চৈতন্যোদ্ভাসিত মনও নিজ পথে চলিয়াছে; ইহাদের পরস্পরের এক সাহচর্য্য ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। একটি লাল ও একটি কাল বলকে যদি একত্রে গড়াইয়া দেওয়া যায় তবে তাহার উভয়ে পাশাপাশি চলিবে, কিন্তু একের গতি অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং কথা বলা চলিবে না। শরীর ও মনও সেইরূপ পাশাপাশি চলিতেছে, কিন্তু একের দ্বারা অন্যে বাস্তবিক প্রভাবিত হইতেছে না। শরীর ও মন পরস্পরে আশ্রিত এই অনুভূতি ভ্রমায়ক; ইহা মায়ামাত্র (illusion)। এই মত মনো-বিদগণের মধ্যে মনোবৈজ্ঞানিক সংস্কারবাদ (psycho-physical parallelism) নামে পরিচিত। পূর্বপক্ষ

বলিষা, মদ জড়পদার্থ, কিন্তু মদ খাইলে মনে ক্ষুধা হয় এবং না-খাইলে সে ক্ষুধা হয় না অতএব অধঃ-বাতিরেক জ্বালাহুযায়ী জড় ও চৈতন্য বাপাশ্রিত মানিতেই হইবে। অগত্যা মদ জড় ও চৈতন্যের পরস্পরের প্রভাব কল্পনাভীত মনে করি, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে জড়পদার্থ মদেও চৈতন্যশক্তি আছে এবং এই জড়শ্রিত চৈতন্যশক্তিই মনকে প্রভাবিত করিতেছে। প্রত্যেক জড়পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ার সমস্ত জড়ে চৈতন্যশক্তি মানিতে হইতেছে। চৈতন্যশক্তি আছে বলিয়াই জড় চৈতন্য প্রভিভাসিত হয়। এতএব জড়শ্রিত চৈতন্যই জড়কে দ্যোতনশীল করিয়াছে। যাহা দ্যোতন করে তাহাই দেবতা। অতএব প্রত্যেক জড়পদার্থে তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা আছে বলা অসম্ভব নহে। ইন্দ্রিয়গণও দ্যোতন-শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে তাহাদিগকেও দেবতা বলা হইয়াছে। ঘণ্টে, পটে দেবতা মানিলেও হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার নামকরণ করেন নাই, কিন্তু সমস্ত প্রধান প্রধান জড়পদার্থের ও প্রাকৃতিক শক্তির দেবতা কল্পিত হইয়াছে। বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, পর্বতের বায়ু, সূর্য্যের বিবধান, চন্দ্রের সোম ইত্যাদি। সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা, স্থিতির বিষ্ণু ও লয়ের রুদ্র। ইহারা সকলেই ব্রহ্মশক্তি; ইহাদের প্রত্যেকের প্রকারভেদ আছে।

শাস্ত্রমতে এই বিধ প্রথমে অতি হৃদয় ‘আকাশ’ময় ছিল; ক্রমে তাহা ঘনীভূত হইতে লাগিল। আকাশময় আবরণের মধ্যে স্থলতর ‘বায়ু’ সৃষ্ট হইল, তদ্বারা ‘তেজ’রূপী পদার্থ জন্মিল, তাহার অভ্যন্তরে ‘জল’ হইল ও জলে স্থলতম ‘ক্ষিত’ পদার্থ উৎপন্ন হইল। এইরূপে এক বিরাট অণু জন্মিল। এই অণুর উপাদান ক্ষিত, অপ, তেজ, মরুৎ ও বোম—অর্থাৎ পঞ্চ মহাত্ম আমাদের পরিচিত মৃত্তিক, জল ইত্যাদি নহে, তবে গুণভারতময়ামুসারে এই সকল পরিচিত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের নামামুযায়ী পঞ্চ মহাত্মত্বের নামকরণ হইয়াছে। পঞ্চমহাত্মজাত অণু প্রথমে সূর্য্যের জ্যোতিঃসম্পন্ন ছিল। এই অণুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতার নাম হিরণ্যগর্ভ। জ্যোতির্ময় অণু হইতে ক্রমে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থল পদার্থসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল ও অণুসমূহে সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ, তারকা ও আমাদের

পৃথিবী সৃষ্ট হইল। মহাত্মত্বগুলি যেসকল ক্রমঃ হৃদয় হইতে স্থল রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ তাহাদের পঞ্চীকৃত সংমিশ্রণে উৎপন্ন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকাশ প্রভৃতি জড়ত্ববাহু হইতে স্থলতর রূপ ধারণ করিল। ক্রমঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও সর্বশেষে জলমধ্যে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। বিশাল জলরাশির মধ্যে পৃথিবী বহুকাল যাবৎ নিমজ্জিত ছিল। এই জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার নাম নারায়ণ। মৎস্য জলের সুপরিচিত প্রাণী, এজন্য ভগবানের প্রথম অবতার মৎস্য-রূপী নারায়ণ। জলময় পৃথিবী বিগুল প্রাকৃতিক বিপর্য্যের ফলে জল হইতে উদ্ধৃত হইল। বিষ্ণুরূপে এই বিপর্য্যের বিবরণ আছে। বিষ্ণু ১০।২৫। যে-শক্তি পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতার নাম বরাহ-রূপী বিষ্ণু। কদম্বলিপ্ত জলোখিত মহাকাশ বরাহের ন্যায় পৃথিবী দেখিতে হইয়াছিল বলিয়া বরাহ অবতার কল্পন। এই উদ্ধারের সময় জলরাশি চতুর্দিকে উৎসিষ্ট হইয়াছিল, মহাবায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল, পৃথিবী ঘন ঘন কম্পিত হইয়াছিল এবং বোর শব্দে জলসমূহ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। তখন ভূপৃষ্ঠে পর্বতাদি বিভাগদৃষ্টিগোচর হইল।

বরাহাবতার কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধারের বিবরণ পড়িলে মনে হয় প্রাচীন পুরাণকারগণ এরূপ কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ব্যাপক ভাবে আদি সৃষ্টিকালে আরোপ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ জল-প্লাবন, আগ্নেয় উৎপাত, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধ্বংসকর প্রাকৃতিক বিপর্য্য হইতে তাঁহারা প্রলয়কালীন অবস্থা অনুমান করিয়াছেন। প্রলয়কাল ব্রহ্মার শয়নকাল। ব্রহ্মাই সৃষ্টির দেবতা। পুরাণে বলা হইয়াছে সে সত্য প্রভৃতি মহর্ষি মহর্লোকে অবস্থিত হইয়া বর্তমান কল্পের পূর্ববর্তী প্রলয়বস্থা দেখিয়াছিলেন। প্রলয়ে মহর্লোক নষ্ট হয় নাই। মহর্লোক অদ্বিতে ভৌম ছিল।

এবং ব্রাহ্মী বায়ুয়ী জ্যোতিঃসম্পন্নঃ ।

দৃষ্টবস্তুরা হস্তে হস্তংকালং মহর্ষয়ঃ । বা ৭।৭৬ ।

অর্থাৎ এইরূপ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মরাজি অতীত হইয়াছে। অন্য মহর্ষিগণ সেই সময় কালক হস্তাবস্থায়

দেখাচ্ছেন। বিষ্ণুপুরাণও বলিয়াছেন যে, প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে মহাবিগ্ণ পলাইয়া জনলোক প্রভৃতিতে আশ্রয় লন। অনেকের মতে জনলোক চীনদেশের প্রাচীন নাম।

পুরাণে প্রলয়কালের বর্ণনা আছে। দৈবমানের চতুর্ভুগ-সহস্র অতীত হইলে নৈমিত্তিক ব্রাহ্ম প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রথমে অত্যন্ত উগ্র শতবর্ষবাণী অনাবৃষ্টি হয়। রুদ্র-রূপী ভগবান সূর্য্যারশ্মিতে অবস্থানপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ যাবতীয় জল পান করিয়া নিঃশেষ করেন। সূর্য্যের সপ্তরশ্মি সপ্তসূর্য্যরূপ ধারণ করে ও ভূমণ্ডল অশেষরূপে দগ্ধ হইতে থাকে। যাবতীয় পদার্থ বিলুপ্ত হইয়া বহুধা কূর্ঘ্যপূর্ব্বক প্রতীয়মান হয়। তৎপরে পাতালবাসী সঙ্কর্ষণায়ক রুদ্র পাতাল হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীতল ভ্রমণ করেন। স্বর্গ প্রভৃতি লোকও দগ্ধ হইয়া যায়। অখিল ভূমণ্ডল এক বৃহৎ ভর্জ্জন কটাহে পরিণত হয়। তৎপরে রুদ্রমুখনিঃস্রাস হইতে বিদ্রাব ও বজ্রধনিবিশিষ্ট ভীষণাকার বিভিন্ন বর্ণের সংবর্ত্তক মেঘসমূহ উৎপন্ন হয় ও অবিশ্রান্ত জলধারা শতবর্ষেরও অধিক কাল বর্ষিত হইতে থাকে। অধি নির্ধীপিত হইলে ভূমণ্ডল জলপ্লাবিত হইয়া যায়। তখন শতবর্ষবাণী প্রচণ্ড বায়ু ওবাহিত হইতে থাকে ও ভগবান নারায়ণরূপে নাগশয্যা শয়ন করেন। এই অবস্থা সহস্র চারি-যুগকাল বর্ত্তমান থাকে। ইহাই ব্রাহ্মরাত্রি। রাত্রি-শেষে ব্রাহ্ম জাগরিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ করেন। বরাহ অবতার তখন জল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। পৃথিবীর পর্ব্বতাদি বিভাগ পরিষ্কৃত হয় ও ব্রাহ্মার বৈকারিক সৃষ্টি বা বিসর্গ আরম্ভ হয়। প্রথমে উদ্ভিদ, তৎপরে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু প্রভৃতি তথ্যাক্যোনী, তৎপরে অশ্বর, তৎপরে দেবতা ও সর্ব্বশেষে মহু-বাণীয়া মানব সৃষ্ট হয়। ইহাই পুরাণোক্ত সৃষ্টিক্রম। সৃষ্টিব্যাপার পূর্ব্বকল্পাহুয়ায়ী প্রাবর্ত্তিত হয়।

প্রতিদিন অহঙ্কণ যে জীবাদি সৃষ্ট হইতেছে তাহার নাম নিত্যসর্গ। জীবের যে স্থিতি বৃদ্ধি তাহা নিত্যস্থিতি, তজ্জন জীবের মৃত্যুতে নিত্য লয় সংঘটিত হইতেছে॥ বিষ্ণু ১।২২।৩৬॥ লোকভুলিতে কথিত আছে এক প্রাণী হইতে অপর প্রাণী সৃষ্ট হইলে জন্মদাতা প্রাণীকে

সৃষ্টিবিষয়ে হরির অবতার বলিয়া জানিবে, সেইরূপ যদি এক প্রাণী অপর প্রাণীকে বধ করে, তবে বধকর্ত্তা প্রাণীকে রুদ্রের অবতার বলিয়া জানিও। মহুয়ের যে যে নিত্য প্রবৃত্তির বশে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সাধিত হয় সেই সকলে সৃষ্টি লয়াদির কর্ত্ত্ব আরোপিত হইয়াছে। এজন্য ইহাদিগকে ব্রাহ্মার নররূপী মানসসন্তান বলা হয়। দক্ষ, মনু প্রভৃতি ব্রাহ্মার মানস-পুত্র। কারণ, এই সকল নামধারী প্রকৃত মহুয়া হইতে এককাল মানব-বংশ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। মহুয়া দক্ষ হইতে বংশ বিস্তার হইয়াছিল বলিয়া দক্ষ প্রজ্ঞান শক্তির দেবতা কল্পিত হইয়াছেন। এজন্য দক্ষ ব্রাহ্মার এক মানস-পুত্র। প্রজ্ঞাসৃষ্টি করেন বলিয়া ইহার প্রজ্ঞাপতি। এখনও বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র প্রজ্ঞাপতিকে প্রণাম জ্ঞাপন করা হয়। মানবী দক্ষকন্যা-গণের নামানুসারে নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছিল এজন্য নক্ষত্রেরাও দক্ষ-সন্তান।

পৌরাণিক অবিষ্টাভ বা অভিমানিদেবতা এবং অবতার-কল্পনার সূত্র মনে রাখিলে পুরাণ-বর্ণিত সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপারকে একেবারেই অতিরিক্ত বা কাল্পনিক মনে হইবে না। বরং দেখা যাইবে যে মেণ্ডলি অনেক স্থলেই বিজ্ঞান-অনুমোদিত। বার-বার সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হইতেছে কিনা আধুনিক বিজ্ঞানী বলিতে পারেন না। কিন্তু পুরাণবর্ণিত সৃষ্টিব্যাপারকে বিজ্ঞান অনুমোদন করিবেন। অন্যত্র ইহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি।

সঙ্কর্ষণায়ক রুদ্র সম্বন্ধে পুরাণ যে-সকল কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত সূত্রাহুয়ায়ী ব্যাখ্যা করিলে তাহাদের প্রকৃত অর্থ ধরা পড়িবে। সঙ্কর্ষণ রুদ্র পাতালবাসী। পাতাল অর্থে ভূ-বিবর বা ভূগর্ভ ও দক্ষিণ দেশ উভয়ই বুঝায়। সাপ পাতালে থাকে, অর্থাৎ সাপ মাটির মধ্যে গর্ত্তে থাকে। মাটির নীচে হইতে যে-জল প্রবাহের ভ্রায় নির্গত হয় তাহা পাতালগঙ্গা। অপর পক্ষে পুরাণ বলেন, পাতালে বহু হৃন্দর নগর ও উপনব প্রভৃতি আছে; পুরাকালে পাতালে বলি রাজ্য ছিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি বলির রাজ্য। বিষ্ণুচালের দক্ষিণে পাতাল। পুরাণের বর্ণনার এক আশ্চর্য্য সূত্র এই যে, কোন শব্দের দুই প্রকার অর্থ থাকিলে উভয় অর্থই গ্রহণীয় এবং দেখা যাইবে যে

উভয়ই সত্য। পাতালে নাগগণ থাকে—ইহার এক অর্থ যাটির নীচে সাপ থাকে, অপর অর্থ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নাগ-জাতির বাস। নাগজাতীয় রাজা সর্পের রাজা বলিয়া পরিচিত। বাহুকি এক জন নাগ-রাজা ছিলেন। ইতিহাসে বাহুকি সর্প বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সর্গর্ষণ সম্বন্ধে বিষ্ণু-পুরাণ বলিতেছে যে—

পাতালসমূহের অধোভাগে বিষ্ণুর যে শেষনাম। তামসী মুষ্টি আছে, যাঁহার গুণাবলী দৈত্য দানবেরাও বর্ণন করিতে পারগ নহে, যিনি অনন্ত নামে সিদ্ধগণ কর্তৃক স্তুত হন, যিনি দেব ও দেবর্ষিগণ পূজিত, তিনি সস্ত্রশির ও নিশ্চল স্বস্তিক ভূবণে শোভিত। তিনি ফণামণিহস্তদ্বারা দিকসমূহ উদ্ভাসিত করিয়া আছেন। জগৎ হিতের জন্ত তিনি সমস্ত অসুরদের নির্বীৰ্য্য করেন। তিনি মদ্যধূমিত-লোচন ও সদা এক কুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি কিরীট ও মালা ধারণ করিয়া অগ্নিবৃক্ক শ্বেত পর্কতের স্তায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার পরিধানে নীলবাস, তিনি মদোদ্ভেদ হইয়া শ্বেতহার ধারণ করায় অন্ন ও গঙ্গাপ্রবাহ দ্বারা অলঙ্কৃত উন্নত কৈলাসগিরির স্তায় শোভমান হইয়াছেন। তাঁহার এক হস্তে লাজল ও অপর হস্তে উত্তম মূল রত্নিরাছে। কাস্তি ও মদিরা দেবী বক্রণী মুষ্টিমতী হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। কল্লাস্তে তাঁহার মুখসমূহ হইতে উজ্জ্বল বিবানল শিখাযুক্ত সর্গর্ষণনামা রক্ত নির্গত হইয়া জগৎত্রয় ভক্ষণ করেন ও তিনি অশেষ ক্ষিতিমাণ্ডল যন্তকে ধারণ করিয়া পাতাল-মূলে অশেষ সুরগগকর্তৃক অচ্চিত হইয়া শেষরূপে অবস্থান করিতেছেন। দেবতাগণও তাঁহার বীৰ্য্য, প্রভাব, স্বরূপ এবং রূপ বর্ণনা করিতে বা জ্ঞানিতে পারেব না। সমস্ত পৃথিবী ইহার ফণামণিশিখায় অরূণ বর্ণ হইয়া কুমুমমালায় স্তায় (যন্তকে) স্তুত আছে, তাঁহার বীৰ্য্য কে বর্ণনা করিতে সমর্থ? অনন্ত যখন মদ্যধূমিত-লোচনে জৃম্মা পরিভাগ করেন তখন সমুদ্র সলিল ও কাননসমূহের সহিত এই ভূমি কম্পিত হয়। গন্ধর্ব্ব, অসুর, সিদ্ধ, কিন্নর, উরগ ও চারণগণ ইহার গুণের অন্ত পান না, সেই হেতু ইহাকে অব্যয় ও অনন্ত বলা হয়। ইহার গাত্রস্থিত নাগবধূগণ কর্তৃক লিপ্ত হরিচন্দন ঝাসাব্যুর দ্বারা উৎক্লিষ্ট হইয়া

দিকসকল স্বেদিত করে, ইহাকে আরাধনা করিয়া পুরাণবিদ গর্গ জ্যোতিঃতত্ত্ব ও সকল নিমিত্ততত্ত্ব (সুভাণ্ডভজ্ঞাপক লক্ষণসমূহ) অবগত হইয়াছিলেন। সেই নাগবরের দ্বারা যন্তকে বিধৃত হইয়া পৃথিবী দেবদেব মামুষ্য সমন্বিত লোকসমূহের মালা ধারণ করিতেছে। ॥বিষ্ণু ২।৫।১৩—২৭॥

বিষ্ণুর তামসী তনু হইতে সর্গর্ষণ উৎপন্ন হন। প্রলয়কারী বলিয়া এই তনু তামসী। ইহাকে শেষ বলা হয়, কারণ প্রলয়কালে ইনি জগৎত্রয় শেষ করেন। ইনি নাগবর কারণ ইনি পাতালসমূহেরও নিম্নে থাকেন, ইনি অতিবীৰ্য্যশালী, ইহার গুণের অন্ত নাই এজন্য ইনি অনন্ত। ইহার অগ্নিময়ী সহস্র ফণা। সেই ফণামণির জ্যোতিতে ইনি পৃথিবীতল অকণালোকে উদ্ভাসিত করিয়া আছেন। ইহার ভীষণ ও চঞ্চল সৌন্দর্য্য; কাস্তি ও মদিরা দেবী ইহার উপাসিকাধর। ইনি নীলবাস ও মদ্যধূমিত-লোচন। ইনি স্বস্তিক বা বজ্র, লাজল ও মূল্য ধারণ করেন। এই সকল বিশেষণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সর্গর্ষণ ভৃগুর্ভস্থ অগ্নি। ভৃগুর্ভের দিকে দিকে ইহা ফণাবিস্তার করিয়া আছে। ঋষিগণ বহুস্থানে ভৃগুর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া এই কল্পনা করিয়াছিলেন মনে হয়। তাঁহাদের মতে এই অগ্নিজাত শক্তিই পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কঠিনস্তর ধারণ করিয়া আছে। পৃথিবীর অভ্যন্তর অগ্নিময়। অভ্যন্তরস্থ অগ্নির জ্বলনে অর্থাৎ ফণার সঙ্কোচন প্রসারণে ভূমিকম্প ও আয়েগিরির উৎপাত উভয়ই হয়—ইহাই পৌরাণিক মত। বাহুকি নাগের দ্বারা পৃথিবী স্তুত হওয়ার ও তাঁহার ফণাকম্পনে ভূমিকম্প হওয়ার ইহাই প্রকৃত অর্থ। আয়েগিরির উৎপাতে যে ভস্মরাশি নির্গত হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় ঋষিগণ তাহা জানিতেন। ভস্মরাশিকে স্বেদিত হরিজ্ঞা বা কপিল বর্ণের হরিচন্দনের রেণুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পদ্মরেণুর নামও হরিচন্দন। ভূকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের আনুষঙ্গিক বজ্রধ্বনি সর্গর্ষণের স্বস্তিক-চিহ্নদ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছে; মৃত্তিকা-বিদারণ ও ধ্বংসশক্তি লাজল ও মূল্য দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতের ঋষিগণ আয়েগিরির

উৎপাত কোথায় দেখিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাণের কোন কথার একাধিক অর্থ থাকিলে তাহার সকলগুলিই গ্রহণীয়। পৌরাণিক বলিয়াছেন, পাতাল-সকলেরও নীচে সঞ্চরণ আছে। সপ্ত পাতালের নিম্নতম প্রদেশের নামও পাতাল। ইহা ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ অংশ। ইহারও দক্ষিণে ঋষিগণ আয়েরগিরি দেখিয়া-ছিলেন। অহুমান হয়, বহু পুরাকাল হইতেই মলয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান জানা ছিল। এই সকল প্রদেশে আয়েরগিরি আছে। বায়ুপুরাণের ৪৮ম অধ্যায়ে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫২ম অধ্যায়ে বোধিও, মলয় প্রভৃতি দ্বীপের অতি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। বর্হিণ দ্বীপবর্ষের অন্তর্গত বহু দ্বীপ আছে বলা হইয়াছে। অঙ্গদ্বীপ, যমদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্কুদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বরাহদ্বীপ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। এই সকল দ্বীপে যেক্ষে প্রভৃতি জাতি বাস করে। আরও বলা হইয়াছে, তত্রস্থ প্রজা

দীর্ঘশ্রবণাঙ্কানা নীলা মেঘসমপ্রভাঃ ।
জাতমাত্রাঃ প্রজান্তর অনীতি পরমাধ্বঃ ॥
শাখাসুগ সঞ্চরণঃ ফলমূলানিন্তথা ॥
গোধর্মাণো হানিদ্ভিষ্টাঃ শৌচাচারবিবর্জিতাঃ ॥
বায়ু । ৪৮ । ৮, ৯ ॥

অর্থাৎ তথায় প্রজা জন্মিবামাত্র দীর্ঘশ্রবণারী, নীলমেঘ-কান্তি ও অনীতিবর্ষ পরমাধুর্গাল হয়। তাহারা বানরের ভায় ফলমূলভোক্ষী, গোধর্মী—অর্থাৎ গম্যাগম্য বিচারহীন ও তাহাদের শৌচাচার বা নিদ্ভিষ্ট আচার-ব্যবহার নাই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও অনুরূপ শ্লোক আছে। কেবল ‘জাতমাত্রাঃ’ স্থানে ‘জানুমাাত্রাঃ’ শব্দ আছে। জানুমাাত্রাঃ অর্থে যাহাদের দেহ-পরিমাণ একজাহ্নু মাত্র। এই বিবরণ যে হুমাাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের ওরাউটায় সঘন্থে লিখিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্হিণ দ্বীপপুঞ্জকে রক্তের ও চন্দ্রনাদির আকর বলা হইয়াছে।

এখন যেমন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন পুরাকালেও বিভিন্ন ঋষি সেইরূপ বিভিন্ন বিজ্ঞান অন্বেষণা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান আয়রণ করিতেন। গর্গ সঞ্চরণের আরাধনা করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্র ও নিমিত্তবিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বলক্ষণ সমূহের জ্ঞানলাভ করেন। আধুনিক ভাষায়

বঙ্গা বায়, গর্গ ভূকম্পবিৎ (seismologist) ছিলেন। পুরাকালে ভারতে নানা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচিত হইত তাহার মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

সঞ্চরণ ধ্বংস-শক্তি বলিয়া রক্ত বা রক্তের অবতার। পুরাণে সঞ্চরণেরও অবতার কল্পিত হইয়াছে। ধুঙ্ক নামক অহুর সঞ্চরণের প্রথম অবতার ও কৃষ্ণভ্রাতা বলদেব, বলরাম বা বলভদ্র সঞ্চরণের দ্বিতীয় অবতার। ধুঙ্ক শব্দ ধূম হইতে নিপন্ন। ধূ ধাতুর অর্থ কম্পন। সঞ্চরণের অবতারের সহিত ধূম ও কম্পনের সম্বন্ধ বিচিত্র নহে। বলরাম ধ্বংসকারী প্রবল যোদ্ধা ছিলেন, হল বা লালল তাঁহার অস্ত্র ছিল। কীর্তি সাদৃশ্যে হলধর বলরাম, হলধর সঞ্চরণের অবতার হইলেন। বলরামের পরবর্তীকালে যে-সকল ভূমিকম্প হইয়াছে তাহাও বলরামের কীর্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। বলরামের বহুকাল পূর্বে এক ভূমিকম্প হয়। ইহার উল্লেখ পুরাণে আছে; এই ভূমিকম্প ধুঙ্ক কীর্তি।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ দ্বিতীয় অধ্যায় ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব মহর্ষি উত্কলের উপকারার্থে একবিংশতি সহস্র পুত্র প্রসূত হইয়া বৈষ্ণব ভেজপ্রভাবে ধুঙ্ক নামক অহুরকে বধ করিয়া ধুঙ্কমার নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার সমস্ত পুত্রগণ ধুঙ্ক-মুখনিঃশ্বাসজনিত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হন কেবল তিন পুত্র অবশিষ্ট থাকে। বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ পড়িয়া সন্দেহ হয় যে কুবলয়াশ্বের ২১০০০ প্রজা বা সেনা ভূমিকম্পে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বায়ুপুরাণে এই ঘটনার বিশদ বিবরণ আছে। বায়ুর অন্তীর্ণীতিতম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, বৃহদশ্ব বাণপ্রস্থ অবলম্বনে উদ্যত হইলে মহর্ষি উত্কল তাঁহাকে বলিলেন “হে ভূপতে, আমার আশ্রয়ের সমীপে এক বালুকাপূর্ণ সমুদ্র অর্থাৎ মরুভূমি আছে; সেখানে দেবতাদিগেরও অবধা মহাকায় মহাবল জেহু ধুঙ্ক নামক মহতনয় শত শত লোক বিনাশের জন্য অন্তর্ভূমিগত হইয়া অর্থাৎ মৃত্তিকানিমে বালুকায় অন্তর্হিত থাকিয়া হৃদাঙ্গণ তপ করিতেছে। সঞ্চরণের শেষে সে যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন সকাননা মণী কম্পিত হয় ও মহান রজ উৎখিত হইয়া আদিত্য পথ অবরোধ করে, তখন

সপ্তাহকালবাণী ভূমিকম্প হইতে থাকে ও প্রাদীপ্ত অগ্নি-
শূলিন্দ্রসং দারুণ ধূম নির্গত হয়।” ধূমের অত্যাচার
বিবরণের জন্য বৃহদশ স্বীয় তনয় কুবলয়াকে আজ্ঞা
দিলেন। কুবলয় ২১০০০ পুত্রসহ তথায় যাইয়া বাণুকর্ণি-
ধন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পশ্চিমদিকাপ্রান্ত
ধূমের মুখ হইতে আল নির্গত হইয়া সকলকে উটাইয়া
ফেলিতে লাগিল এবং মহোদধি চক্রোদয়ে বৈরাগ্য চঞ্চল
হয়, তদ্রূপ প্রবমান জলরাশি প্রবাহিত হইল। তিন জন
বাচীত সমস্ত কুবলয় সন্তান ধূম কর্তৃক বিষ্ট হইয়া গেল।
তখন কুবলয় যোগবলে সেই জলস্রাব অগ্নি নির্বাপিত
করিয়া সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলেন এবং ধূমকে
বিস্তৃত করিলেন। অহুমান হয়, কুবলয় ২১০০০ লোক
লইয়া ভূকম্প-পীড়িত স্থানে উদ্ধারকার্যে বাপূত ছিলেন।
এইজন্যই তিনি বাণুকর্ণি খনন করিতেছিলেন। সেই
সময় পুনরায় ভূকম্প ও তজ্জনিত জলপ্রাবনে সমুদায় ব্যক্তি
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গত বিচারের ভূমিকম্পের মত এই
ভূমিকম্পেও জলরাশি উথিত হইয়াছিল, অধিকন্তু মৃত্তিকা-
গর্ভ হইতে ধূম ও অগ্নি নির্গত হইয়াছিল। পুরাণ পাঠ্য
করিলে অহুমান হয় যে উত্কলের আশ্রয় সিদ্ধদেশে ছিল।
সিদ্ধদেশে অনেক বার প্রলয়ধর ভূমিকম্প হইয়াছে। ত্রীকূলের
মৃত্যুর কিছুকাল পরে নিকটবর্তী দ্বারক নগরী সমুদ্রগর্ভে
চলিয়া যায়। ইহাও ভূমিকম্পের ফল বলিয়া মনে হয়।
১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কচ্ছ প্রদেশের ২০০০ বর্গমাইল পরিমিত
স্থান সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত হয় ও প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ ও দশ
মাইল প্রস্থভূমি দশ ফুট উচ্ছ্রিত হয়। সিদ্ধপ্রদেশ
ভূমিকম্পপ্রবণ। উত্কর বলিয়াছিলেন, সংবৎসরান্তে
ধূম অত্যাচার করে। কুবলয়াদের রাজত্বকাল* ৩৬০০ খ্রীঃ-
পূঃ। অন্তত তারিখের প্রমাণ আলোচনা করিয়াছি।
ইহার পূর্বের কোন ভূমিকম্পের প্রামাণিক লিখিত
বিবরণ পাওয়া যায় না।

পুরাণে কথিত হইয়াছে, একদা বলরাম বৃন্দাবনে

যদিরাপানে বিহ্বল ও ঘর্ষাক্ত হইয়া স্নান করিতে
ইচ্ছুক হইলেন। তিনি যমুনার উদ্দেশে বলিলেন, ‘হে
যমুনে, তুমি এই স্থলে আগমন কর’, কিন্তু বলভদ্রের
মন্ততাপ্রসূত বাক্যের অবমাননা করিয়া নদী যমুনা সেই
স্থানে যাইলেন না। তখন লাক্ষ্মী ক্রুদ্ধ হইয়া লাক্ষ-
গ্রহণ করিলেন এবং তদ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিতে
করিতে বলিলেন—“রে পাপে, তুমি আসিবে না, আসিবে
না বটে? এখন নিজ ইচ্ছায় গমন কর দেখি।” বলভদ্র
কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া নদী বলভদ্র ঘে-বনে ছিলেন তাহা
প্রাণিত করিল। তখন যমুনা মূর্তিমতী হইয়া বলিলেন,
“হে মুলাধু, আমাকে পরিত্যাগ কর।” বলভদ্র তাহাকে
ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর কান্তিদেবী বলভদ্রকে
অবতংসোৎপল এক কুণ্ডল ও দুইটি নীল বস্ত্র দিলেন। তখন
রুতাবতংগ চাকুণ্ডলভূষিত, নীলাবর ও মালাধারী
বলভদ্র কান্তিযুক্ত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥
বিষ্ণু ৫।২৫ ॥ বলভদ্র পূর্ববর্ণিত সঙ্ঘর্ষণের ভ্রায় নীলবাস,
এক কুণ্ডল, মালা, মুগ ও হলধারী। তিনিও যদ্যধ্বজিত-
লোচন। পাছে কেহ বলভদ্রের কাহিনীর প্রকৃত অর্থ না
বুঝিতে পারে এই জন্য পুরাণকার এইসকল ইঙ্গিত
করিলেন। অন্তত পুরাণে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে
বলভদ্র সঙ্ঘর্ষণের অবতার। বুঝা যাইতেছে ভূমিকম্পের
ফলে যমুনার গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই ভূমিকম্পের
পূর্বে বৃন্দাবন যমুনা হইতে বহুদূরে অবস্থিত ছিল।
বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ অষ্টাদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে
যে কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অজুর বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ ও
বলরামকে সঙ্গে লইয়া যথুরায় গিয়াছিলেন। বিমল প্রভাতে
অজুর, কৃষ্ণ ও বলরাম অতি বেগবান অশ্বসমূহযুক্ত
রথারোহণে যাত্রা করিলেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে তাঁহারা
যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নানাদি সারিয়া
পুনরায় রথারোহণ করিলেন। অজুর বায়ুবেগবান অশ্বগণকে
অতি দ্রুত চালাইতে লাগিলেন। অভিস্রাব্যাকে অর্থাৎ
সায়াক্ অতীত হইলে তাঁহারা যথুরা পৌছিলেন।
বেগবান অশ্বযুক্ত রথ ঘণ্টায় সাত আট মাইল যাইতে
পারে। এই হিসাবে বৃন্দাবন হইতে যমুনার দূরত্ব
চল্লিশ মাইল আনুমান্য হয়। যথুরা আরও চল্লিশ

* এই প্রবন্ধে পুরাণোক্ত প্রাচীন ঘটনার যে সকল তারিখ
দিয়াছি তাহার একটিও কালানুগত নহে। পুরাণে যথেষ্ট নির্দেশ
অর্থাৎ কাল-নির্দেশ আছে। এই নির্দেশ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।
অন্তর যথেষ্ট-বহুত প্রমাণ সহকারে বিচার করিয়াছি।

মাইল দূরে। এখন টাক্সার এক খণ্ডার মধ্যেই মথুরা হইতে বৃন্দাবন যাওয়া যায়। অতএব আধুনিক বৃন্দাবন প্রাচীন বৃন্দাবন নহে। যমুনার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় প্রাচীন বৃন্দাবন যমুনগর্ভে গিয়াছিল অসম্ভব হয়। মথুরার নিকটে নূতন বৃন্দাবন স্থাপিত হয়। কবে বৃন্দাবন জলপ্লাবিত হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না। বলরামের জন্মকাল আনুমানিক ১৪৬০ খ্রীঃ-পূঃ। এই ভূমিকম্প বলরামের জীবিতকালে হইয়াছিল কিনা তাহাও নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই, কারণ পরবর্তী কালের ভূমিকম্পও সন্দর্ভগতঃ বলরামের কীর্তি বলিয়াই কথিত হইবে। বলরামের কীর্তি-স্বরূপ আরও একটি ভূমিকম্পের কথা সূরাণে পাওয়া যায়। বিষ্ণুসূরাণ পঞ্চমাংশ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, “পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় অনন্ত, অশ্রমের ধরণীধারী শেষের কীর্তি বলিতেছি শ্রবণ কর।” কুম্ভভঙ্গ্য জাম্ববতী-পুত্র বীর শাষ দুর্ঘোষন-কন্তাকে বলপূর্বক হরণ করেন। তাহাতে কর্ণ দুর্ঘোষন ও অপর কুরুবীরগণ শাষকে ধুন্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। বলভদ্র দুর্ঘোষন প্রভৃতিকে শাষকে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে তাহার বলভদ্রকে কটুবাণে অপমানিত করেন। তখন চলায়ুধ কোপে মত্ত ও আঘুর্ষিত হইয়া পাকি ভাগ (গোডাল) দ্বারা বন্থা তাড়িত করিলেন। মহাত্মা বলভদ্রের পদতল-প্রহারে পৃথ্বী বিদারিত হইল। সকল দিক শব্দে পূরিত করিয়া বলভদ্র বাহুবান্ধোদন করিলেন। মদলোলাকুল কণ্ঠে বলরাম বলিলেন, “কুরুক্লাধীন হস্তিনা-নগরীকে কুরুগণের সহিত উৎপাটিত করিয়া ভাগীরথীমধ্যে নিক্ষেপ করিবা।” মুন্ডায়ুধ বলরাম কর্ণধামুখ লালল হস্তিনাপুরীর প্রাকারে বিস্তৃত করিয়া নগরীকে আকর্ষণ করিলেন। অনন্তর সেই নগরী সঙ্গা আঘুর্ষিত হইতেছে দেখিয়া কৌরবগণ রাধ রাম ক্ষমা কর ক্ষমা কর, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কৌরবগণ শাষকে স্বীয় পত্নীর সহিত প্রত্যাৰ্পণ করিলে বলরাম ক্ষান্ত হইলেন। পরশর বলিলেন, “হে বিজ এই কারণে হস্তিনাপুর অদ্যপি আঘুর্ষিতাকারে লক্ষিত হইয়া থাকে। বলরামের বল ও শৌর্য্যউল্লসকে এই প্রবাদ।”

গত ভূমিকম্পের ফলে বিহারের মতিহারী নামক নগর বিপর্য্যস্ত হয়। পণ্ডিত জহরলাল নেত্রক সংবাদপত্রে লিখিয়া- ছিলেন, মতিহারী শহর ‘twisted’ হইয়া গিয়াছে। পৌরাণিক ভাষায় ইগাই আঘুর্ষিত হওয়া। বলভদ্র হস্তিনাপুরীকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। বাস্তবিকই বৃষ্টিতীরের সাত প্রকৃৎ পরে নিচকুর রাজ্যকালে হস্তিনাপুরী গঙ্গাগর্ভে চলিয়া যায় ॥ বিষ্ণু ৪।২১।৩ ॥ নিচকুর রাজধানী কোশাষীতে লইয়া যান। নিচকুর কাল আনুমানিক ১২৫১ খ্রীঃ-পূঃ। পূর্ববর্তী ভূমিকম্পের ফলে পরবর্তীকালে গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হইয়া হস্তিনাপুরী ধ্বংস হয় কিনা বলা যায় না। পরিক্রান্তের কালে হস্তিনাপুরী আঘুর্ষিত আকারে দৃষ্ট হইত। ভূমিকম্প খ্রীঃ-পূঃ ১৪১৬ অব্দের পূর্বে ঘটয়াছিল। ১৪১৬ খ্রীঃ-পূঃ পরিক্রান্ত-জন্মকাল। কুম্ভভঙ্গ্যের শত বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল পরে দ্বারকা-নগরী সমুদ্রদ্বারা প্লাবিত হয় ॥ বিষ্ণু ৫।৩৭। ১৭, ৫৪ ॥ খ্রীঃপূঃ ৩৬০ অব্দের উল্লিখিত প্রাকৃতিক কাল কুম্ভভঙ্গ্যের ১২৫ বৎসর পরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৩৩৫ খ্রীঃ-পূঃ। গঙ্গা ও যমুনার গতি-পরিবর্তন ও দ্বারকা-প্লাবন বিভিন্নকালের হইলেও হয়ত একই প্রাকৃতিক বিপর্য্যের ফলে ঘটয়াছিল। এ-বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না।

চাক্ষু্য মনুষ্যের পর যে বিপুল জলপ্লাবন হয়, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। মৎস্ত-সূরাণে কথিত হইয়াছে বহুবৎসর অনাবৃষ্টির পর অতিবৃষ্টি হইয়া এই প্লাবন ঘটে। নন্দ্যাতীর প্লাবিত হয় নাই। মনু ও মার্কণ্ডেয় বৌদ্ধ-রোহণে রক্ষা পান। চাক্ষু্য মনুষ্যের ৩৮১৪ খ্রীঃ-পূর্বাব্দে শেষ হয়। তাহার কিছুকাল পরে এই প্লাবন। অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূবিদ্যার (geology) অধ্যাপক ডাক্তার সোল্লাস-এর (Dr. W. J. Sollas) মতে নোয়ার সময়কার প্লাবন সত্য ঘটনা। অধ্যাপক স্টেফেন লান্ডন (Prof. Stephen Landon) প্রত্নতাত্ত্বিক খনন দ্বারা ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। সোল্লাসের মতে মহাপ্লাবন (deluge) ৩২০০ খ্রীঃ-পূঃ পূর্ববর্তী ঘটনা। (Quotation from “The Statesman,” June 30, 1929 by Kumud Ranjan Ray—Evolution of Gita, p. 14.)

বায়ুপূরণে আছে সত্য প্রভৃতি ঋষি কালকে স্থপাবস্থায় দেখিয়াছিলেন ॥ বায়ু ৭। ৭৫ ॥ কালের স্থপাবস্থা ব্রাহ্মরাত্রি। এই সময় পৃথিবী জলপ্লাবিত থাকে। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে আছে, সত্য ঔত্তমি মন্বন্তরে ছিলেন। ঔত্তমি মন্বকাল ৫২৪২ খ্রীঃ-পূঃ হইতে ৪৮৮৫ খ্রীঃ-পূঃ

এই কালের মধ্যেও একবার মহাপ্লাবন ঘটিয়াছিল পুরাণ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

পুরাণে বহু প্রকৃত পুরাতত্ত্ব দৃষ্ট হইয়াছে। মনোযোগ-সহকারে পুরাণগুলি পাঠ করিলে ভারতের প্রাচীন ইষ্টর উদ্ধার হইবে।

লেখকের বিচার

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

অবনী 'ললিত-লাবণ্য' কথা, সিংহাসনের 'বালীগঞ্জে দুলুড়ে বাড়ি' ও সত্যীশের 'অনন্ত তৃষ্ণা' গল্পগুলির পর আমার গল্প তোমাদের তেমন ভাল লাগবে না। আমি না বলব ত, গল্প নয়, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এ-বটনা ঘটেছিল, অর্থাৎ ঘটনা উচিত ছিল।

গত মাসে সত্যীশ চৌধুরীর বাড়িতে ডিনার-খাওয়া তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে। চৌধুরীর কোন ডিনার আমি ভুলতে পারি না, ও লোকটা খাওয়ার আট ওস্তাদের মত আয়ত্ত করেছে। যেমন বর্ণ ও রেখা-ছন্দের সামঞ্জস্যে চিত্রের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়; যেমন বেহালার সঙ্গে পিয়ানোর বা শরদের সঙ্গে বাঁয়াতবলার যথার্থ সঙ্গতে যন্ত্রের সমন্বয়ে জল্লা জমে ওঠে, তেমনি আহাৰ্য্যের সঙ্গে পানীয়ের যথোচিত সম্মিলনেই আহাৰ্য্যের আনন্দ সৃষ্টি হয়; ভোজ্য প্রচুর ও বিচিত্র হলেই হয় না; আহাৰ্য্য নিষ্ঠুরণে চাই সংযম, এবং ডিনারের প্রতি কোর্সের পানীয়ের সঙ্গে পানীয় নির্ধাৰ্য্যে চাই পান-বিলাসীর স্বল্প আভিজাতিক রুচি; চৌধুরীর প্রতি ডিনারে আহাৰ্য্য ও পানীয়ের শুধু বৈচিত্র্য নয়, আনন্দময় একটা পাওয়া যায় বলেই তার ডিনারগুলি এমন উপভোগ্য।

ডিনার খেয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম রাত বারটা বেজে গেছে, কে আমার মোটরে বাড়ি পৌছে দিয়ে গেল, অবনী তুমিই বোধ হয়, হাসছ কেন,—বুঝছি, তুমি বলতে চাও, মোটরে বাড়ি পৌছে না দিয়ে গেলে, একা

বাড়ি ফেরবার মত অবস্থা আমার ছিল না, তা হয়ত সত্যি!

আমার ড্রিং-রুম তোমরা দেখেছ, বাড়ির একতলার প্রায় সমস্ত অংশ জুড়ে, তার পাশে বারান্দা, তারপর দোতলাতে ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি, ড্রিং-রুমে আলো জ্বলছে, এত রাতে ড্রিং-রুমে কে আলো জ্বালাল!

খোলা দরজার পর্দা সরিয়ে দেখি, ঘর লোক-ভর, সব অজানা অদ্ভুত মূর্তি! এত রাতে এত লোক আমার জন্ত প্রতীক্ষা করছে আর গেট খোলবার সময় দরোয়ান একটা কথাও বললে না? ঘরের আলো বড় অপূর্ণ লাগল, এ-আলো কলিকাতা ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর বৈজ্ঞানিক আলো নয়, এ স্থায়ের বা চক্কের আলোও নয়, এ কোন অতীন্দ্রিয় লোকের আলো।

ঘরে প্রবেশ করতেই একটা সোরগোল পড়ে গেল।

—এই যে এতকণে এসেছেন।

—খাওয়া বেশ ভালই হয়েছে দেখছি।

—পান ততোধিক, আমরা এদিকে এক ঘণ্টা ব'সে।

বিস্মিত ভাবে বললুম, ক্ষমা করবেন, আমি কাউকে ঠিক চিনতে পারছি না, কোন জরুরী কেস নাকি, পুলিশ কেস?

সোফাতে একটি ঘোটা লোক বসেছিল, সার্কারের ক্লাউনের মত হা, হা, ক'রে সে অদ্ভুত হেসে উঠল,—ওহে আমাদের চিনতে পারছে না।

নামনের 'লেট'তে এক মধ্যবয়স্ক নারী ব'লে, শুক মুখ, দুঃখ, মূঢ়া, বিচ্ছেদ না থাকত আমিও সে-কথা লিখতুম না, লীর্ণ দেখে, চোখ ছুটি অস্বাভাবিক জলজল করছে। কোণে গদিআটা চেয়ারে এক তরুণ ধুবক, কালো কৌকড়ান চুল, কবির মত স্বপ্নভরা চোখ। রজনীগন্ধা-ভরা ফুলদানির পাশে ঘোলানো-চেয়ারে এক তরুণী, বর্ধমান্ত স্বেতকরবীর মত করুণ হৃন্দর। অপর দিকে এক কিশোরী মত রঙের শাড়ী প'রে শ্রাবণ-জ্যোৎস্নায় অপরাঞ্জিতা। লতার মত মধুর উদাস। আরও অনেক বিচিত্রবেণী বিভিন্ন বয়সের নরনারী। মনে হ'ল, তাদের যেন কোন স্বপ্নে দেখেছি, চেনা হয়েছিল, কিন্তু জানা হয় নি, সব ভুলে গেছি। মোটা লোকটি পরিহাসের হুরে হেসে উঠল,—ভয় নেই, চেয়ারটায় ব'স, 'ভারতী'তে 'ক্লাউন' ব'লে একটি গল্প লিখেছিলে মনে পড়ে ?

—হা, সে ত তিন বছর আগে হবে।

—আমি সেই ক্লাউন, আমার কথাই তুমি লিখে নাম করেছিলে। আমার আসার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এ'রা, বিশেষ ক'রে ইনি, কিছুতেই ছাড়লেন না।

রজনভরা চোখ নাচিয়ে সে লীর্ণা নারীটির দিকে চাইল।

ক্লাউন বলতে লাগল, 'মা' গল্পটা মনে পড়ে, ইনি সেই মা! তোমার গল্পে এ'র সাত বছরের ছেলে টাইফয়েডে মারা যায়, চার বছর ধ'রে ইনি মৃত ছেলের জন্য শোক করছেন, প্রার্থনা করছেন, এখন এসেছেন তোমার কাছে, তাঁর প্রতি কেন এ অবিচার, কেন তাঁর ছেলে মারা যাবে, তুমি ত তাঁর ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে পারতে। আর এ'রা সব তোমার গল্প উপস্থাসের নায়ক-নায়িকা—ওই হচ্ছে বিপুল পাগল কোণে গুম হয়ে ব'সে আছে, ওই তোমার তরুণ কবি রেবন্ত, ওই মাধবী কেশে স্বেতকরবীর মালা জড়িয়েছে, ওই চিরবিরহিণী অপরাঞ্জিতা—এ'রা এসেছেন তোমার বিচার করতে, তুমি তোমার খুশীমত তাঁদের জীবন গড়েছ, ভেঙেছ, কেন তাঁরা এত দুঃখ পাষের চিরদিন, তুমি কি তাঁদের সুখী করতে পারতে না? হা, হা, এবার বড় মুন্সিলে পড়েছ, লেখক।

বাসের হুরে সে উচ্চৈশ্বরে হেসে উঠল, যেন জীবনটা একটা অটুহাস।

ধীরে বললুম,—আমি লেখক রাজ, মানব-সংসারে যদি

দুঃখ, মূঢ়া, বিচ্ছেদ না থাকত আমিও সে-কথা লিখতুম না, আমার কি অপরাধ?

লীর্ণা নারী বাঁধিত স্বরে ব'লে উঠল, কার কি অপরাধ আমি জানি না, বুঝি না, আমি চাই আমার ছেলেকে, আমার মণিককে ফিরিয়ে দাও।

—আমি চাই আমার স্বামীকে, কেন তিনি আমার ত্যাগ ক'রে চলে যাবেন এক যুগিতা নারীর সঙ্গে।

—আমি চাই আমার প্রেমিক, আমার অজিতকে, সে ত সত্যি আমার ভালবাসত, আমার বিবাহ করবে বলেছিল, তুমি কি আমার সুখ-মিলন কথা লিখে তোমার উপন্যাস শেষ করতে পারতে না? কেন তুমি আনলে ইন্সপীকে, অজিত তার রূপ দেখে ভুলে গেল, আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে গেল—আমাদের প্রেম-মিলনপথে তুমি কেন আনলে ইন্সপীকে?

—আর আমি? হৈমন্তীকে আমার মত কে ভালবাসত, কে ভালবাসে, নিজ হাতে তাকে আমি খুন করলুম, হৈমন্তী শরৎ-শেকালির মত পবিত্র নিষ্পাপ, তাকে আমি সন্দেহ করলুম; কেন তুমি শরতকে আনলে আমাদের জীবনে, সে শুধু আমার মতো সন্দেহ ভাগ্যাত, নিজ স্বীকে ভালবাস, অবিখাদিনী, তুমি লেখক শরতের চরিত্র এ'কে পেলে বাহবা, আমি হলুম স্বা-হত্যাকারী!

বললুম,—দেখ তোমরা যদি একে একে তোমাদের কথা বল, তাহলে তোমাদের নান-প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করতে পারি।

লীর্ণা নারী ব'লে উঠলেন, আগে আমার উত্তর দাও, কেন আমার ছেলে মরবে, টাইফয়েড রোগ থেকে ত কত ছেলে সেয়ে ওঠে, তুমি কি গল্পে লিখতে পারতে না আমার ছেলে সেয়ে উঠল?

বললুম, মা, তুমি কি ভাবো, তোমার ছেলের মৃত্যুতে আমার অন্তরের বাধা, তোমার বাধার চেয়ে কিছু কম; তুমি জানো, আমিও তোমারই মত তোমার রূপশিশুর শিয়রে রাতের পর রাত ভয়ব্যাকুল চক্ষে জেগেছি; তুমি জানো, আমিও তোমারই মত তার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছি। মনে পড়ে, যে-রাতে তোমার ছেলের মৃত্যু হয়—সন্ধ্যার ডাক্তার ব'লে গেল, থোকা অনেকটা ভাল আছে, সেই

আশাবর্ণাণী শুনে ভূমিভাবলে রাতে একটু ঘুমোবে, শ্রান্তিতে ভূমি তার শয্যাপার্শ্বে ঘুমিয়ে পড়লে, আমি কিন্তু বিনিদ্র নয়নে জেগে রইলুম। শ্রাবণের মধ্যরাতে আকাশের সব তারা নিবিয়ে বুষ্টি এল, স্বারে দেখলুম কার করাল কক্ষ ছায়া, সে যম। স্বার রোধ ক'রে পঁড়ালুম, বললুম, নিদ্রিত যানের কোল থেকে কখন পুত্রকে ভূমি নিতে পারবে না, আমি যাকে জাগিয়ে দেব। যম বললে,—তুমি বাধা দিও না, সৃষ্টির সত্যকে ভূমি লঙ্ঘন করতে চাও; আমি যম, আমি অযোধ্য শাস্ত্র নিয়ম, আমি আজ্ঞা-বহনকারী ভূতাত্মক, আমার কাছে প্রার্থনা করা বৃথা; যিনি জন্মমৃত্যুর অধিপতি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, কিন্তু সে প্রার্থনাও বৃথা হবে, সৃষ্টিকর্তা নিজ নিয়ম-জালে আপনি বাঁধা পড়েছেন। পারলুম না যমকে বাধা দিতে, নিশীথ রাত্রে তোমার ঘর থেকে সে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেল, তুমি নিদ্রিতা ছিলে, ঝঙ্কাঙ্কু শ্রাবণ নিশীথাকালের মত আমার চোখে অশ্রুর বজা উথলে উঠেছিল। তা যদি না হ'ত তা হ'লে পারতুম কি তোমার সৃষ্টি করতে, তোমার কথা লিখতে কি পারতুম? তোমার মনের বেদনা আমার রেখাঙ্কিত ললাটে আমার শীর্ণ কশোলে; তোমার আশাহীন কালো চোখের দিকে চেয়ে বিশ্বস্ত্রষ্টাকে আমিও রাতের পর রাত প্রশ্ন করেছি; উত্তর পেলুম না, কিন্তু শোকাতুরা মাতার দিবা মুক্তি দেখলুম; তুমি ছিলে চঞ্চলা বালিকা, নিজ স্বার্থকামিনী, সুখাশ্রয়িণী, তুমি বদলে গেলে, নিজ সুখ-সম্পদের দিকে চাইলে না, তুমি হ'লে সেবিকা, পৃথিবীর সব মা-হারা সন্তানদের তুমি বুকে টেনে নিলে; তোমার হৃৎ বেদনা যদি না-জানতুম, তোমার কথা কি লিখতে পারতুম এমন ক'রে।

পুত্র-মৃত্যুপীড়িতা মাতা কোন উত্তর দিল না, দীপ্ত নয়ন হুটি অশ্রুতে অন্ধ হয়ে গেছে।

বিরহিণী অপরাজিতা বললে, অজিতকে ত মৃত্যুতে নিয়ে যারনি, নিয়ে গেল এক ডাইনী, সে মায়াবিনীকে তুমিই ত আমাদের জীবনে আনলে, তোমার গল্প হয়ত বেশ জমল, কিন্তু আমার জীবন হল ব্যর্থ, শূন্য। তুমি তোমার উপন্যাসের একটা উপসংহার লেখ—অজিত বৃদ্ধিতে পেরেছে

ইজ্রাণী মেকী, তার ক্ষণিক রূপের মোহ ভেঙে গেছে, আ—বৃদ্ধকে আমার প্রেম কত সত্য, আমি তার জন্য প্রতীক্ষা করছি, সে আমার কাছে ফিরে আহুক, তোমার উপন্যাসের কি হৃদয়ের শেষ হবে বল দেখি। বললুম,—আমার সমস্তা দেখছ না, অজিতকে তোমরা দু-জনেই ভালবাস, আমি কার সঙ্গে তার মিলন ঘটাই? অজিত যাকে ভালবাসবে, তার সঙ্গে মিলন হওয়া ভাল নয় কি? তোমার সঙ্গে যদি অজিতের বিবাহ দিতুম আজ ইজ্রাণী এসে আমার প্রেম করত, আমাদের মিলন কেন হবে না, আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি? হয়ত তোমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়ে যেত।

—মিথ্যা কথা, ইজ্রাণী কি অজিতকে আমার মত ভালবাসে! ও অজিতের টাকায় ভুলেছে।

—মানলুম, কিন্তু জীবনের বিপুল পথে মানব-দেহ-মনের লোভ মোহ ক্ষুধা বাসনা কামনা জ্বালকে তুমি কোন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করতে পার? আমি দিতে পারি অজিতকে তোমার হাতে, কিন্তু তুমি রাখতে পারবে কি? দীর্ঘ বিচিত্র জীবনপথে কত নবীন। ইজ্রাণী অজিতের ক্ষয়-স্বারে অবাধ করবে, অজিতের ক্ষয় উদাস হবে, তার পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে রাখতে পার, কিন্তু তার প্রেম পাবে কি? চাও তুমি তোমার ব্যর্থ প্রেমের কারাগারে তার অশান্ত বৃদ্ধকে দেহ-মনকে বন্দী ক'রে রাখতে?

—কেন সে আমার ভালবাসবে না? তুমি ত উপন্যাসে লিখতে পার, সে আমার মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসল, তুমি ত তাকে তেমন ক'রে সৃষ্টি করতে পার।

—অজিতকে আমি তোমার প্রেমিকরূপেই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলুম, আমি লিখতে চেয়েছিলুম, সত্যিকার প্রেমিক আজীবন অহরহ স্বামীর কথা, আঁকতে চেয়ে-ছিলুম আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবন। কিন্তু মানুষের মন ত আমার হাতের পুতুল নয়, সে সজীব, সক্রিয়, অগ্নিগর্ভ, পরকৃতগুহাবতীর্ণ। নদীধারার মত সে যে কোন পথে বাবে পুরানো পাড় ভাঙবে, নৃতন তীর গড়বে, তার পথের নির্দেশ কে করতে পারে! সজীব মানুষ যখন আমার উপন্যাসে আসে তাকে ত শৃঙ্খলিত সামাজিক অস্থান-পীড়িত ক'রে আপন ইচ্ছা আদর্শ মত চালাতে পারি না,

বাধা শৃঙ্খল ভেঙে সে তার নিজ যাত্রাপথ ক'রে চলে,
আমি তার পথচলার কাহিনী লিখি।

দোলানো-চেয়ার থেকে দীর্ঘ কক্ষ অক্ষিপন্ন কাঁপিয়ে
মাধবী আমার দিকে চাইল। বললুম, মুষ্টিমতী বেদনার মত
তুমি মুক বসে আছ, মাধবী, তুমিত কিছু বলছ ন',
আমার আশ্রয় হুগতীর বেদনা দিয়ে তোমার সৃষ্টি করেছি,
তুমি আমার প্রেমের কাহিনী জান। শোন, তোমরা
আমার গল্প শোন :

আমি যখন কিশোর ছিলাম, এক কিশোরীকে
ভালবেসেছিলাম, সে ছিল আমার জীবন-রূপকথার রাজকন্যা,
তাকে ঘিরে রচতুম যৌবনস্বপ্ন, জীবন-মায়াজাল। কিন্তু
সে হৃন্দরীর মন ছিল অন্তমনা, সে ভালবাসত আর এক
যুবককে, আনমনা হয়ে সে বসে থাকত আমার পাশে।
জিদ হ'ল জয় করব ওই কিশোরী-চিত্তকে। আমার
প্রেমের সাধনায় সে মুগ্ধ হ'ল, তাকে জয় করলুম; যৌবনে
তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেলুম। তারপর বাহির হলুম
পৃথিবীর বিপণিতে, লক্ষ্মীর ভাঙার লুটে আনতে হবে
প্রিয়ার পদপ্রান্তে; সেখানে স্বর্ণের জন্ত হানাহানি,
কাড়াকাড়ি, স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত, অর্থ-আহরণের
প্রবল সংগ্রামে মেতে গেলুম। প্রথম যৌবনের প্রেম-বিফল
দিনগুলি স্বপ্ন হয়ে গেল, প্রিয়া যখন গান গায় আমার
এস্রাজ বাজাবার সময় হয় না, প্রিয়া যখন ছবি আঁকে, আনার
রং গুলে দেবার অবসর কোথায়।

বাণিজ্য ক'রে আনলুম স্বর্ণ, বাণ্ডে তহবিল উইল
উপুছে। প্রিয়াকে সাফাল্য, কর্ণে মুক্তার ছল, কণ্ঠে হীরার
মালা, অঙ্গুলিতে নীলার অঙ্গুরীয়, কটিতে স্বর্ণময় কাঞ্চী,
পদে মণির নুপুর।

গঙ্গাতীরে তৈরি করলুম বিচিত্র প্রাসাদ প্রিয়ার জন্ত।
আশ্মান দেশ হ'তে এল স্থপতি, ইতালী হ'তে এল বিচিত্র
বর্ণের মর্ম্মরগস্তুর, চৈনিক কারিগর তৈরি করল গবাক্ষ,
পারসিক রীতিতে নিশ্চিত হ'ল স্নানাগার।

প্রাসাদের চারিদিকে রমণীয় উদ্যান, পূর্বদ্বারে অশোক-
বীথিকা, পশ্চিমে তালতমালশ্রেণী, উত্তরে পদ্মদীঘি,
দক্ষিণে নীপবন, করবীকুঞ্জ।

কিন্তু প্রিয়ার মন রইল অনামন, আনমনা হয়ে সে
হৃদয়ে চেয়ে থাকে, প্রেমভূষিত।

সেদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশের বর্ণোৎসবে পৃথিবী রঙীন,
হেনা-হানাহানাকুঞ্জের গন্ধোচ্ছ্বাসে বাতাস মাতাল, নদীর
জল কুলে কুলে ভরা। বিপণি থেকে গৃহে ফিরলুম; চন্দন-
কাষ্ঠের দ্বার খুলে পারস্য কার্পেটমণ্ডিত অরিরোহনী অতিক্রম
ক'রে প্রিয়ার কক্ষের দিকে গেলুম। সে সন্ধ্যায় প্রিয়া প'রেছিল
মাধবী-রঙের শাড়ী, কণ্ঠে ছিল রজনীগন্ধার মালা;
আমাকে দেখে প্রিয়া স্নিতমুখে, চকিত পদে এগিয়ে এল,
স্বৈতপ্রস্তরের গৃহতল দর্পণের মত দীপ্তিময়, পদদ্বয় ফুটে
উঠল রক্তকমলের মত, কিন্তু প্রিয়ার মন ছিল আনমনা,
কাচের মত মন্থণ মেজেতে পা গেল পিছলে, সে মুচ্ছিতা
হয়ে পড়ল, শুভ্র মর্ম্মরে রক্তপঙ্খের পাঁপড়ি ছড়িয়ে লুটিয়ে
পড়ল; সে মুচ্ছা ভাঙল না, অন্তমনা হয়ে আমার গৃহে
চলতে চলতে প্রিয়ার চরণ স্থলিত হ'ল, মৃত্যু এল।

পশ্চিমাকাশের বর্ণোৎসব শেষ হয়ে অন্ধকার এল,
আমার অগণিত অশ্রুবিদ্যুৎ অনন্ত আকাশ ভ'রে জলে উইল।
সে-রাতে বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাকে যদি
পেলুম, কেন তার ভালবাসা পেলুম না, তাকে এমন ক'রে
কেন তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলে? বোবা
আকাশ কোন উত্তর দিল না।

উন্মাদ হয়ে প্রাসাদ ভেঙে দিলাম, প্রিয়ামৃত্যুবেদনা
অহর্নিশি অন্তরে বহন ক'রে মহা উন্মাদনায় দেশ হ'তে
দেশান্তরে ঘুরেছি। জীবনের সেই অপরিদ্রাঘ বেদনা-
সমুদ্র মন্বন ক'রে তুমি এলে মাধবী, তুমি এলে তরুণ কবি
রেবন্ত; তোমরা আনলে নবদৃষ্টি, নববাণী মানবজীবনে,
সংসারের হুংহুং, পৃথিবীর সৌন্দর্য্য নূতন চোখে গভীর
ভাবে দেখলুম। আগে যাদের হৃদয়ের বাধা বুঝিনি,
যাদের তুচ্ছ অবহেলা করেছি, তাদের বীরত্ব, তাদের মহত্ব
দেখলুম, আশ্রয় নবজন্ম হ'ল। তুমি খুন্সী, তুমি স্মৃতিতা,
তুমি পাগল, তুমি ক্লাউন, তোমাদের সঙ্গে অন্তরের
পরিচয় হ'ল, তোমাদের সমবাণী হলুম। তোমাদের
হুংহুং কথ্য লিখেছি, তোমার আশ্রয় সংগ্রাম
বেদনার কাহিনী। প্রিয়াবিরহকাতর আমার অন্তর দিয়ে
যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি, আমি কথাশিলা,

তোমাদের দুঃখে সমবেদনায় কাঁদতে পারি, আমি দার্শনিক নই, মানবজীবনে দুঃখের অর্থ কেমন করে বলব? আমি শুধু বুঝছি, অপক্লপ এই পৃথিবী, মহান এই মানবজীবন।

আমি চুপ করলুম। ঘর-ভরা স্তব্ধতা কাঁপতে লাগল তেল-কুরিয়ে-বাওয়া প্রদীপের শিখার মত। সংসা বিশ-পাগল হাততালি দিয়ে টেটিয়ে বলে উঠল—আমি পারি, আমি পারি বলতে, এস আমার সঙ্গে।

বিশে-পাগল পূবদিকের সবুজ পর্দা সরিয়ে আমার লাইব্রেরীতে যাবার দরজা খুলে দিলে। সবাই চমকে দাঁড়ালুম। লাইব্রেরীতে নটরাজ শিবের একটি মূর্তি আছে দেখেছি, কিন্তু মূর্তিটির দিকে ছুটে গেল, হাতজোড় করে নতজানু হয়ে মূর্তির সামনে বসল।

চোখে চমক লাগল। মনে হ'ল, এ আমার লাইব্রেরী নয়, ভারতীয় কোন গুহামন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখে আমি দাঁড়িয়ে, গর্ভগৃহের অন্ধকারে অগ্নিকাস্তি নটরাজ বিগ্রহ। গৃহের দ্বার শজপদ্মফোঁদিত কারুকার্যময় প্রস্তর-নির্মিত; দ্বারের দক্ষিণে গঙ্গা ও বামে যমুনার লাবণ্যময়ী মূর্তি উৎকীর্ণ, অমৃতমিষামিন্দ্রী রূপ কঠিন প্রস্তর ভেদ করে পদ্মের মত দুটে উঠতে চায়—জ্যোৎস্নাস্তম্ভ গঙ্গা তরুচ্ছায়ায় নকরের ওপর বক্ষিম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, এক হস্তে পূর্ণ জল-কুণ্ড, অপর হস্তে প্রফুটিত পদ্ম; নীলোৎপলবর্ণী যমুনা কৃষ্ণের ওপর দাঁড়িয়ে, তার এক হস্তে চামর, অপর হস্তে নীলোৎপল।

গর্ভগৃহে দশদিকে ঘোড়শ হস্ত প্রসারিত করে অপক্লপ নটরাজমূর্তি—দক্ষিণ হস্তগুলিতে ডমরু বজ্র শূল পাশ টক

দণ্ড সর্প ও অভয়মূর্তি; বাম হস্তগুলিতে অগ্নি খেটক ঘণ্টা কপাল খড়্গ পতাকা শুচিমূর্তি ও গজহস্তভঙ্গী; পিঙ্গল জটাভারে অর্ক ধূতুরা পুষ্প, চন্দ্রা, গঙ্গামূর্তি; কণ্ঠে মুক্তার হার, সর্প-হার, বকুলের মালা; বামস্তম্ভে ব্যাঘ্রচর্ম; কর্ণে কুণ্ডল; হস্তে পদে মণিমাণিক্যবিজড়িত বলয়; অগ্নি-শিখাবেষ্টিত পদ্মের ওপর দক্ষিণ পদ; নৃত্যচঞ্চল বামপদ শূণ্যে স্থাপিত।

বিশে-পাগল অটুহাস্ত করলে—হাঃ হাঃ! পদ্ম-পীঠ ধিরে অগ্নিশিখা নেচে উঠল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল। নটরাজ নৃত্য শুরু করলেন। নৃত্যের তালে তালে হস্তের নানা অস্ত্র দিকে দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। পরম বিষয়ে দেখলুম নানা অস্ত্রের বদলে আমার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা তাঁর অগণিত হস্তে পুস্তিকার মত শোভিত। নটরাজ তাঁর ডমরু ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমার দিকে, যেন তিনি বললেন, আমার ডমরু তুমি বাজাও, আমি তোমার সৃষ্ট নরনারীদের নিয়ে নৃত্যে মাতি। দেখলুম পুত্রশোকাতুর মাতা, চিরবিরহিণী প্রেমিকা, জীবনের হলাহলপায়ী পাগল, সবাই মেতেছে তাঁর হস্তে জন্মমুখা স্বধঃখের নৃত্যের উদ্গাদনায়।

আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত বিসর্পিত গতিতে বিজ্যৎ চমকে গেল। অশনি-গর্জনে চমকে জেগে দেখি সিঁড়ির পাশে বারান্দায় বেতের লম্বা চেয়ারে শুয়ে আছি, আমার চোখেমুখে বৃষ্টির জল অঝোরে ঝরে পড়ছে, বাতাসে অন্ধকার আকাশ হা হা করে উঠল।

তোমরা কি আমার সে-রাতে মোটর থেকে ওই বারান্দায় চেয়ারে শুয়ে দিয়ে গিয়েছিলে?

হুলিয়া সমাজ

ঐনির্মলকুমার বসু

পুরী হইতে দক্ষিণে যেখানে গোদাবরী নদী সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখান পর্য্যন্ত হুলিয়াদের বাস। উড়িয়া ভাষার ইহাদের হুলিয়া বলিলেও ইহাদের প্রকৃত নাম ভিন্ন। ইহাদের মধ্যে একটি জাতির নাম ওয়াডা-বালিজি, অপরের নাম জালারি। আরও দক্ষিণে যে সকল হুলিয়ার মত জাতি বাস করে তাহাদের নাম কালিদী। ওয়াডা-বালিজি এবং জালারিগণের মধ্যে ওয়াডা-বালিজিগণই অপেক্ষাকৃত ধনী। জালারিগণ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও কৃশকায়া। ওয়াডা-বালিজিগণ আগে সমুদ্রে জাহাজের কাজ করিত, এখন দেশী জাহাজের ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা অপরের মত মাছ ধর এবং তাহাদের মেয়েরা শহরে মজুরের কাজ করে। ওয়াডা-বালিজিদের জাতির মধ্যে সর্বপ্রধান বাক্তি হইলেন মান্দাসার রাজা মাইলিপিলি নারায়ণ স্বামী। তিনিও ওয়াডা-বালিজি জাতির লোক, এবং তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে সমস্ত প্রধান ওয়াডা-বালিজি গ্রামে গিয়া গ্রামের কয়েক বংশের জমা ঋগড়-বিবাদ অথবা সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইয়া আসিতে হয়। ওয়াডা-বালিজিদের পক্ষে মান্দাসার রাজাই সুপ্রীম কোর্ট বলা যাইতে পারে, তাহার উপরে আর আপীল নাই।

ওয়াডা-বালিজি অথবা হুলিয়াদের বসতির মধ্যে গজাম জেলায় গোপালপুরের মত পুরীও একটি প্রধান জায়গা। এখানে প্রায় ৫০০ ঘর হুলিয়ার বাস; তাহা ছাড়া জালারি হুলিয়াও কিছু আছে। হুলিয়াদের মধ্যে একটি বংশের বিশেষ আদর আছে। তাহাদের নাম অঙ্ক। এই বংশের লোকের নাম এইরূপ হয়—অঙ্ক করলাম্বা, অঙ্ক রামাইয়া ইত্যাদি। হুলিয়াদের গ্রামে অঙ্ক পলান্দ্র প্রধান দেবী। সেই দেবী নাকি অঙ্ক-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য অঙ্ক-বংশের পুরীতে এত সন্মান আছে।

পুরীর হুলিয়-বস্তির শাসনভার গ্রামের একজন অগ্রণীর হাতে আছে; তাহাকে “উর-পেডা” বলা হয়। তাহার একজন কার্যাব্যক্ষ বা “কারিজি” আছে এবং তদুপরি একজন চাপরাসীও আছে, তাহার নাম “সাম্বিটোডু”। অঙ্ক-বংশের লোকেরা একটি বিশেষ পরিবার হইতে ‘উর-পেডা’কে নির্বাচন করেন। নির্বাচন সিদ্ধ হইলে উর-পেডা মান্দাসার রাজার নিকট হইতে একটি সশ্রুতিপত্র পান। অঙ্ক-বংশের লোকেরা যদি কোন উর-পেডা নির্বাচন করিতে না পারে, তাহা হইলে গ্রামের লোকসাধারণ নির্বাচনের সে ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। উর-পেডা যদি নিজের কাজ ঠিকমত না করেন, তাহা হইলে গ্রামের লোক তাঁহাকে সরাইয়া সেই পদে নূতন লোক বাহাল করিতে পারে; তবে নূতন লোকটি উরপেডার বংশের লোক হওয়া চাই। একবার পুরীতে হইয়াছিলও তাই। শেষে মান্দাসার রাজা পুরীতে আসিলে তাঁহার কাছে অনেক কাকূতি-মিনতি করিয়া, সাধারণের কাছে ক্ষমা চাহিবার পর তবে পুরাতন উর-পেডাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল।

উর-পেডার কাজ আগে হয়ত অনেক বেশী ছিল। কিন্তু অনেকাংশে এখন দণ্ডের ভার ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া যাওয়ায় তাহার কাজ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বিবাহ, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, যথা—গ্রামদেবতার পূজা প্রভৃতিতে যোগ দেওয়াই এখন তাহার প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উর-পেডা, কারিজি এবং সাম্বিটোডুর কাজ আজীবন থাকে। তাহারা মারা গেলে লোকে পুনরায় তাহাদের পদে লোক নির্বাচন করিয়া দেয়।

হুলিয়াদের গ্রামে যে ১৮ শত বরের কথা বলা হইয়াছে গ্রামের সাধারণ কাজে তাহাদের একত্র হইতে দেখা গেলেও বিবাহ সম্পর্কে এই ৫০০ বরের মধ্যে একটি বিচিত্র ভাগ দেখা যায়। হুলিয়াদের বাড়িগুলি ছোট।

সূচরার তাহাতে ছ-তিটি ঘর থাকে। একটি ঘরে স্বামী-স্ত্রী এবং ছোট ছেলেমেয়েরা শোয়, অপরটিতে সংসারের কাজকর্ম এবং রান্নাবান্ন হয়। আর একটি অন্ধকার কুচুরীর মধ্যে দেবতা ও পূর্বাঙ্কুরের বেদী থাকে এবং তাহা চাড়া জাল ও অন্যান্য আবশ্যিক জিনিষপত্রও রাখা হয়। বড় ছেলেরা বাড়ির বাড়িরে বারান্দায় শুইয়া থাকে। একটু বড় হইলেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া যায়, তাহারা স্বতন্ত্র ঘর করিয়া থাকে। বাপ মারা গেলে সকল ভাই বাড়িতে অধিকার পায় বটে, কিন্তু বাড়ি এত ছোট যে, তাহাকে ত ভাগ করা চলে না। তখন বড় ভাই সেই বাড়ি অধিকার করিয়া অন্য ভাইদের অন্তর বাড়ি তৈয়ারী করিয়া দেয় বা যথাসাধ্য তাগের জন্য খরচ জোগাইয়া থাকে।

যাহা হউক, গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন ভাগের কথা বলিতেছিলাম।

পুরী হুলিয়া-বসতিটি সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের জন্য তেরটি ভাগে বিভক্ত। এই সকল বিভাগকে বিরিসি বলে। বিরিসির নিয়ম হইল যে বিরিসির মধ্যে যেকোন ঘরে যদি একটি বিবাহ হয় তাহা হইলে বিরিসির যেন সকলকে সেই বাড়িতে খাটিয়া দিত হয়। বিরিসির অধিপতিগণ একান্তবর্তী পরিবার। বিবাহের করদিন বিবাহ-বাড়িতেই তাহারা খাদ্যদায়, কাজ করে এবং আনন্দ করে।

হুলিয়াদের মধ্যে বিবাহ সূচরার অল্প বয়স হয়। বরের বয়স সতের-আঠার এবং কনের বয়স-তের; ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে কদাচিৎ পাঁচ-ছয় বৎসরের ছেলের সহিত তিন-চার বৎসরের মেয়ের বিবাহ হয়। উপর পক্ষে বরের আঠার-উনিশ এবং কনের পনের-ষোলর বৈধী বয়স বাড়িতে দেওয়া হয় না।

বরের পিতাই প্রথমে কথা পাড়েন। যদি কন্যাপক্ষ রাজি হয় তখন বাগদানের অহুষ্ঠান হয়। সেই দিন একজন ভদ্রলোককে লইয়া বরের পিতা কনকে

গহনা পরাইতে যান। কনের বাড়িতে সকলে বসিলে কনের বাপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে বিবাহে রাজি আছে কি-না। মেয়ে যতই ছোট হউক না কেন, তাহার অহুমতি না লইয়া বাগদান কিছুতেই নিষ্পন্ন



অগ্রিকুণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া বৃত্ত

হইতে পারে না। যদি সে রাজি না হয়, তাহা হইলে কনের পিতা বরপক্ষের কাছে মাপ চান, আর একদিন আসিতে বলেন এবং ইতিমধ্যে কনকে যথাসাধ্য বুঝাইয়া রাজি করিতে চেষ্টা করেন। ইহা হুলিয়া সমাজের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। স্ত্রীলোকদের আপন আনন্দের সমাজের চেয়ে সেখানে আরও উচ্চ, সেইজন্য স্ত্রীলোকের অহুমতি বিনা বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না। যদি অহুমতি ব্যতিক্রম করিয়া বোন পিতা বিবাহ দেন তাহা হইলেও শেষে সে বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়া যাইতে পারে, এমনও দেখা গিয়াছে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

যাহা হউক, কত্তা রাজি হইলে সমবেত ভদ্রলোকদেব সম্মুখে বরের পিতা তাহাকে সম্পূর্ণ দানের গহনা পরাইয়া দেন, এবং তখন কনের মা সমবেত ভদ্রলোকদের হাত-পা জল দিয়া ধুইয়া দেন। ইহাই হইল বাগদানের পক্ষ বরকর্তা তখন সমবেত ভদ্রলোকদের তিন টাকা করিয়া ও কত্তাকর্তা হই টাকা করিয়া প্রণামী দেন। তাহার পর



দুই জন হলিয়া

বরকর্তা মেয়ে লওয়ার খেসারৎ স্বরূপ কস্তাকর্তাকে নয় টাকা দিয়া থাকেন। বাড়ির একজন কাজের লোক চলিয়া যাইতেছে, ইহারই খেসারৎ নয় টাকা; সে টাকাকে কস্তাবিক্রয়ের মূল্য বলিয়া ধরিবার কোন কারণ নাই।

বাগদানের পর নান্যেক অর্থাৎ জ্যোতিষীর সাহায্যে তিথি, লগ্ন ইত্যাদি ঠিক করিয়া বিবাহের দিন ধার্য্য হয়। বিবাহের তিন দিন বরের বাড়িতে বিরিসির সমস্ত লোক এবং উর-পেড়া, কারিজি ও সান্দিটোড়ুর পাত পড়ে। বিবাহ বরের বাড়িতে হয়, কনের বাড়িতে হয় না। কনের বাড়িতে তাহার বিরিসির লোকের জন্ত পাত মাত্র একদিন পড়ে, তাহার বেশী নয়।

যে-রায়ে বিবাহের কাজ আরম্ভ হয় সেদিন উর-পেড়া বরের কস্তিতে একটি হলুদ ও একটি পান হুতা দিয়া বাধিয়া দেন। তাহার পরদিন তব্ব সঙ্গে করিয়া বিরিসির একটি মেয়ে হলুদ বাটা, হলুদ কাপড়, তিলের তেল, কুসুম, নারিকেল, দর্পণ প্রভৃতি লইয়া সান্দিটোড়ু বা গ্রামের চাপরাসীকে সঙ্গে করিয়া কনেকে বাপের বাড়ি হইতে আনিতে যায়। কস্তা খণ্ডরবাড়ির কুসুম ও কাপড় পরিয়া, গায়ে হলুদ মাখিয়া বরের বাড়িতে পৌছায়। বাড়ি হইতে আসিবার সময়ে সে আঁচলে কিছু চাল এবং একটি আস্ত নারিকেল লইয়া আসে। এই অবস্থায় সে বরের বাড়িতে সম্মুখের দরজা দিয়া না ঢুকিয়া খিড়িকি দিয়া প্রবেশ করে।

এইবার বরকস্তার কামান এবং স্নানের জন্ত মেয়ের

দূরে কোনও পুষ্করিণী বা ফুয়া হইতে জল আনিতে যায়। জল আসিলে বর ও কনেকে নারিকেলপাতায়-ছাওয়া শামিয়ানার তলায় পিঁড়িতে বসাইয়া ন্যাপিত নখ কাটিয়া চান করাইয়া দেয়। বর ও কনের বিরিসির মেয়ের উভয়ের গায়ে তেল, হলুদ এবং বিরি কলাই বাটা মাখাইয়া তাহাদের স্নান করাইয়া দেয়। বরকনের সম্মুখে ধান ও উছথল রাখা হয় এবং ভবিষ্যতে কনেকে যে ধান ভানিবে সংসার চালাইতে হইবে এখানে তাহারই ইঙ্গিত করা হয়।

ইহার পর ব্রাহ্মণ আসে। হলিয়ারদের কাজকর্ম শুধু এইখানেই ব্রাহ্মণকে দেখা যায়। মৃত্যুর পর তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব আসে, ব্রাহ্মণ আসে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ না হইলে বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না। ব্রাহ্মণ বর কনেকে পাশাপাশি বসাইয়া একবার বরের হাত কনের হাতের উপর রাখিয়া মগ্ন পড়ে, আবার কনের হাত বরের হাতের উপর রাখিয়া মগ্ন পড়ে। তাহার পর উর-পেড়া অর্থাৎ গ্রামের অগ্রণী বরের মাথায় একটি পাগড়ী বাঁধিয়া দেয় এবং ব্রাহ্মণ বর এবং কনে দুজনের গলায় দুইটি পৈতা পরাইয়া দেয়। বোধ হয় এইভাবে কিছুকণের জন্য বরকনেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অভিষিক্ত করা হয়।

পৈতার পর ব্রাহ্মণ কুশ দিয়া উভয়ের হাত বাঁধিয়া দেয়। সমস্ত ও পূজাদির পর বরের কাপড় ছাড়াইয়া বোড়ার চড়াইয়া উভয়কে গ্রামের মধ্যে একবার ঘুরাইয়া আনা হয়। কনে সামনে বসে, বর পিছনে। কিন্তু কনে বড় হইলে সচরাচর বরের সঙ্গে হাটিয়া যায়। উভয়ে ঘুরিয়া আসিলে

রিকলমণ্ডপে উভয়ক বদাইয়া গাঁটছড়া বাঁধা হয়। দেখিয়া বর খণ্ডরবাড়িতে যায় এবং সেখানে তাহার চিহ্নদার মধ্যে ছুইটি সুপারি ও ছুইটি পরসা থাকে। তাহার বর ও কন্যা উভয়ে আঁচলে চাল লইয়া পরস্পরের মাথার উপর তাহা ছড়াইয়া দেয়।

এইবার বরকনে দেখিবার পালা। উভয় পক্ষের বন্ধু-
দ্বন্দ্ব বরকনের মুখ দর্শন করিয়া কেহ 'এক টাকা', কেহ 'ছুই টাকা', কেহ 'দশ টাকা' দিয়া আশীর্বাদ করিয়া যায়। ইহাতে এত টাকা জমে যে, মাগাগোড়া বিবাহের খরচ ইহাতেই উঠিয়া যায়। কিন্তু সমাজের নিয়ম অনুসারে কে কত দিল তাহার একটু হিসাব রাখিত হয়। তাহার পর তাহার বাড়িতে আবার বিবাহের সময় ঠিক তত টাকা দিয়া সেখানে আশীর্বাদ করিয়া আসিতে হয়। এইভাবে একজন লোক হয়ত দশ

বাড়িতে দশ বৎসরের মধ্যে একশত টাকা দিয়াছে। তাহার সুবিধা হইল, সে আবার নিজের বাড়ির কাজের সময়ে সেই টাকা এবং হয়ত কিছু বেশী টাকা ফেরৎ পায়। লৌকিকতার এই প্রথাটি কতকটা বিবাহ ইমসিও-রেন্সের মত ব্যাপার। ইহার ফলে বিবাহের খরচটা মুল্লিয়াদের কোন দিন গায়ে লাগে না। কেবল দানের গহনাপত্রের খরচটা বরপক্ষকে অন্ত ভাবে যোগাইতে হয়।

যাহা হউক, বিবাহের পরদিন খুব ঘট করিয়া বরকনেকে শহর ঘুরান হয়। ফিরিয়া আসিলে বরের ছোটভাই দাদার ও বৌদির পথ আগলাইয়া দাঁড়ায়। সে নানারকম আপত্তি করে, ঠাট্টা করে, শেষে দাদার কাছে বিবাহ দেওয়ানিবার প্রতিজ্ঞা পাইলে হার ছাড়িয়া দেয়। ঘরে ঢুকিয়া বরকনেকে একটি খড়ার মধ্য হইতে সোনার ও রূপার আংটি খুঁজিতে দেওয়া হয়। যে সোনারটি পাইবে তাহার বরাত ভাল, এবং যে রূপার পাইবে তাহার অপেক্ষাকৃত মন্দ বলিয়া মুল্লিয়াদের বিশ্বাস।

বিবাহের তিনদিন बाद দিয়া একটি ভাল যোগলদ

দেখিয়া বর খণ্ডরবাড়িতে যায় এবং সেখানে তাহার স্ত্রীকে রাখিয়া চলিয়া আসে। কিছু কাল পরে তাহার স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহের সংস্কার হইলে তবে সে তাহাকে ঘরে আনিয়া সংসার করে।

ইহাই হইল মুল্লিয়াদের বিবাহের সাধারণ নিয়ম।



সমুদ্রে বড় জাল ফেলার আগে ভোজ

কিন্তু বিবাহ অথবা তাক্তা স্ত্রীর সহিত মখন বিবাহ হয়, তখন এত ঘটা কোনদিনই করা হয় না। তখন শুধু কয়েকজন ভক্তলোককে সঙ্গে করিয়া কুকুম, বস্ত্রাদি লইয়া বরকর্তা কস্তাকে তাহার পিত্রালয় হইতে লইয়া আসেন, তাহাতেই বিবাহ সিদ্ধ হয়।

মুল্লিয়াদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ আছে। বিচ্ছেদের জন্য জৌশ্চান আইনের মত কোনও দোষ দেখাইবার দরকার হয় না। পরস্পরের মনের মিল নাই, এমন কারণেও বিবাহবিচ্ছেদ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন পক্ষ বিচ্ছেদ চাহিলে পক্ষায়েৎ ডাকিয়া পক্ষায়েতের কি পনের টাকা দিতে হয়, এবং যে পক্ষ বিচ্ছেদ চায় তাহাকে আরও পঞ্চাশ টাকা অপর পক্ষকে খেসারৎ-স্বরূপ দান করিতে হয়। কিন্তু যদি পক্ষায়েতের বিবেচনায় বিচ্ছেদের যথেষ্ট কারণ থাকে, তাহা হইলে কোনও টাকা না-ও লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, স্ত্রী স্বামীর মারধর সহিতে না পারিয়া বিচ্ছেদ চাহিতেছে। তখন হয়ত তাহার সমস্ত জরিমানা মাপ করা হয়। এমন কি তাহার পরসা না থাকিলে পক্ষায়াতী পাওনা পনের টাকা পর্য্যন্ত মফুস করিয়া দেওয়া হয়।



শীতকালে ব্যবহৃত বড় নৌকা

যে সকল ক্ষেত্রে জরিমানা হয়, সেখানেও এককালীন টাকা দিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। অনেক ক্ষেত্রে কিস্তিবন্দীতে টাকা দিবার বাধ্য হইয়া থাকে। এই সকল সুবিধা থাকার জন্য পুরীর হুলিয়া-বস্তিতে প্রতি বৎসর চার-পাঁচটি করিয়া বিবাহবিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ফলে তাহাদের বিবাহিত জীবন যে অসুখী তাহা বলা যায় না। বরং তাহার মোটের উপর বর্গহিন্দুদের চেয়ে সুখে সংসার করে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

হুলিয়াদের মধ্যে বিধ্ব-বিবাহও প্রচলিত আছে। বিধবা স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে স্বামীর পুত্রকন্যা ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হয় এবং যাইবার সময়ে সে পিতৃগৃহ হইতে যে গহনা আনিয়াছিল, শুধু তাহাই লইয়া যাইতে পায়। পুত্র স্বামীর, স্ত্রীর নহে। এই জন্য স্বামী বর্তমানে যদি কোনও স্ত্রীলোক বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায় তাহা হইলে তাহাকেও পুত্রকন্যা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। তবে শিশু থাকিলে সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যায়, এবং বতদিন না শিশু বড় হয়, ততদিন নিজের কাছে রাখিতে পারে। বড় হইলে তাহাকে পূর্বস্বামীর গৃহে পাঠাইয়া দিতে হয় এবং তখন সে পুত্রের পিতার নিকট এতদিনের ভরণ-পোষণের ভাষা মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিবাহবিচ্ছেদ হইলে বা বিধবা অন্তঃ বিবাহ

করিলে তাহার স্বামীর সম্পত্তির উপর সকল অধিকার চলিয়া যায়। বিধবা কিন্তু ইচ্ছা করিলে দেবরের সহিত স্ত্রীরূপে বাস করিতে পারে। এরূপ বিবাহ সমাজে দিক্ হইলেও তাহার যে খুব প্রচলন আছে তাহা মন হয়ে না। দেবরের বিধবা ভ্রাতৃবৎস্র উপর কোনও দাবি নাই। অপরে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে দেবর যে কিছু খেদারং পাইবে তেমন কোনও নিয়ম নাই। যাহা হউক, এরূপ বিবাহ যে হুলিয়াসমাজে প্রচলিত আছে, ঠিক যেখানেই আমাদের উদ্দেশ্য।

বিধবাবিবাহের মত বহুবিবাহের নিয়মও হুলিয়াসমাজে বর্তমান আছে। প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হইলে আইনতঃ হুলিয়ারা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে বটে, কিন্তু তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। তখন একজনকে সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া তবে সে অপর স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। এক সঙ্গে দুই জনের বেশী স্ত্রী থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহাও ঘটনাক্ষেত্রে খুব বিরল বলা যাইতে পারে। কেবল একটি ক্ষেত্রে পুরীতে এইরূপ বিবাহ হইয়াছিল, তাহারই কথা বলিতেছি। তাহা হইতে হুলিয়াসমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ঘটনাটি বেশী দিনের নয় এবং তাহার নামকরণ সকলেই আমার সুপরিচিত। সেইজন্য প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া ঘটনাটি বিবৃত করিতেছি। পলাশী নদী কোনও

একটি বালিকা রামাইয়া নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। রামাইয়ার বিবাহ পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল এবং সে স্ত্রী লইয়া সুখেই সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেছিল। উভয় পরিবারের কর্তাদের মধ্যে কিছু সন্দেহ ছিল না, এমনি কি যথেষ্ট মনোমালিন্য ছিল বলি বাইতে পারে। পলান্দ্রা হুন্দরী এবং ধনীরা সন্তান, সুতরাং তাহার পাত্রের অভাব হয় নাই। কিন্তু সেই যে সে রামাইয়াকে বিবাহ করিবে বলিয়া ধরিয়া বলিল, তাহাকে আর কিছুতেই টলান গেল না। তাহার পিতা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, অনেক তর্কমর্গ করিলেন, শেষে মারধরও করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না।

অবশেষে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া কঠোর অসম্মতি সত্বেও তাহার অন্যত্র বিবাহ দিলেন। কিন্তু পলান্দ্রা কিছুতেই স্বামীর বাড়ি বাইত না। অবশেষে পঞ্চায়েৎ সে-বিবাহ ভাঙিয়া দিতে বাধ্য হইল, পলান্দ্রার পিতা বরপক্ষকে যাবতীয় দানের সামগ্রী ফিরাইয়া দিলেন।

এদিকে পলান্দ্রা বাহাতে রামাইয়ার সঙ্গে দেখা করিতে না পারে, তাহার জন্য তিনি সতত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাকে অন্য গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু সে রহিল না। তখন তিনি রাত্রি, বিশেষ করিয়া আমোদ-উৎসবের রাত্রি, বাড়ির চারিদিকে লাঠি লইয়া পাহারা দিতেন। এমনি ভাবে কিছু দিন গেল। কিন্তু পলান্দ্রা রামাইয়ার বাড়িতে খবর পাঠাইল যে, যদি তাহার বিবাহ না দেওয়া হয় তবে সে জোর করিয়া সেখানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিবে, তাহাতে লোকে বাই বলে বসুক না কেন। গ্রামের লোক অবশেষে রামাইয়ার পিতার দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইল। পলান্দ্রার পিতা ত প্রস্তাব গুলিলেনই না, উপরন্তু ভজলোকদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

ইহাতেও কিছু কিছু হইল না। ইতিমধ্যে রামাইয়ার খণ্ডর স্বামী কন্যার জন্মের দিন আসিতেছে ভাবিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন, আর পাঠাইলেন না। রামাইয়া বহু চেষ্টাতেও স্বামীকে আনিতে না পারিয়া শেষে একদিন সবাক্বে খণ্ডরের বাড়ি গেল। খণ্ডর তাহার নির্দোষিতা শুনিয়াও কিছুতেই

কন্যাকে পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না। উপরন্তু পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাব করিলেন।

রামাইয়ারও ইচ্ছা নাই, তাহার স্বামীও সম্পূর্ণ আপত্তি ;



তেপাকাটি বা তেলা

তবু কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পুরা টাকা দিয়া অনেক করিয়া রামাইয়ার মুখ দিয়া বাহির করা হইল যে সে বিবাহ ভাঙিয়া দিতে প্রস্তুত আছে। বিবাহ ভাঙিয়া গেল, রামাইয়া যথেষ্ট টাকা পাইল, কিন্তু সে সে-সকল কিছু না লইয়া তাহার স্বামীকে দান করিয়া চলিয়া গেল। পুরী বাইতেছে বলিয়া গেল, কিন্তু শেষে তাহার এক বছর পরামর্শে পান্ডবর্তী গ্রামে গিয়া সে কয়েকদিন বাস করিল। সেইখানে থাকিতে থাকিতে অবশেষে একদিন তাহার স্বামী সহিত গোপনে চরের সাহায্যে যড়যন্ত্র করিল। তাহার স্বামী পিতামাতার কাছে শান্তিষ্ঠি ভাবে কয়েকদিন থাকিয়া একদিন ভিন্ন গ্রামে হাটে বাইবার অনুমতি চাহিল। হাটে অবতরণ গেল, কিন্তু হাট হইতে সে স্বামীর সহিত পলায়ন করিল এবং তাহার পর হইতে আর পিত্রালয়ের দিকে যায় নাই।

রামাইয়ার স্বামী পলান্দ্রার প্রেমের কথা সবই জানিত, কিন্তু তাহাতেও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এদিকে পলান্দ্রার জিদ ক্রমশঃ বাড়িয়া বাইতে লাগিল। শেষে বাস্তবিকই একদিন সে রামাইয়ার বাড়ি আসিয়া বাসা বাঁধিবে যখন এমন ভয় দেখাইল, এক গ্রামের লোকজনও তাঁহাকে ধরাধরি করিতে লাগিল, তখন বাধ্য হইয়া তাহার পিতা বিবাহে স্বীকৃত হইলেন।

রামাইয়ার পিতা লোকজন পাঠাইয়া নূতন স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন এবং সেই অবধি উভয়ে একত্র বাস করিতেছে। গতদূর জানি উভয়ের মধ্যে কোন কলহ নাই এবং উভয়ে সুখে বাস করিতেছে।

এরূপ ঘটনা হুলিরা সমাজে বিরল হইলেও উহা হইতে সে সমাজে নারীর স্থান অনেকাংশ বুঝা যায়। পিতামাতার যেমন জোর করিয়া বিবাহ দিবার অধিকার আছে, নারীরও তেমনই সে অধিকার ভাঙিবার ক্ষমতা আছে। সমাজের মর্যাদা রক্ষার দিক পিতামাতার যেমন দৃষ্টি আছে, সামাজিক ঐটি বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের যেমন চেষ্টা আছে, মানুষকে সুখী করিবার, তাহার স্বাধীনতাকে স্বীকার করিবারও তেমন একটা ইচ্ছা সমাজের দিকেও

বর্তমান রহিয়াছে। ইহাতে নারীকে যেমন মর্যাদা দিয়াছে, তেমনই তাহার চরিত্রকে স্বাভাবিক ভাবে পুষ্ট হইবার আরও সুযোগ দিয়াছে।

ইহার সাক্ষ্য কারণ আবিষ্কার করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। হুলিয়ারা মাছ ধরিয়া যাছা রোজগার করে তাহা মদ খাইতে, সখের জিনিষপত্র কিনিতে ও মহাজনের পাওবা মিটাইতে খরচ হইয়া যায়। বাস্তবিক সংসার চালায় মেহেরা। তাহারা মজুরি করে, ইট বহিয়া, বালি বহিয়া ঘরে পয়সা আনে এবং সেই পয়সার সংসারের খরচপত্র চলে। অল্পের জন্য তাহারা স্বামীর উপর নির্ভর করে না। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীনতা সমাজেও যে স্বীকৃত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি?

এই কালো মেঘ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

এই কালো মেঘ ডেকেছিল যোরে
নগরের গৃহপথে ;
ভাল করে চোখে চিনিবার আগে
ফিরে গেছে স্বার হ'তে ।
সঙ্গীসাখীরা ধূলয় ধোঁয়ার
ঘিরে রেখেছিল তারে,—
সহজ কণ্ঠ শুনিতে দেখনি
বিচিত্র চীৎকারে ।

সেই যে ঘিরে এসেছে আমার এ
পল্লীর আউনিয়,
উর্ধ্ব আকাশে সেই পরিচিত
ধ্বনিখানি শোনা যায় ;
এপার-ওপার একশা করিয়া
নীলা নদীটির কূলে
আমল রূপের ছায়াখানি কাঁপে
এলায়িত কালো চুলে ।

বেণুবন-শিরে সজল সমীরে
কিমায় দিনের আলো,
কালো ফলে-ভরা জামের শাখায়
ধনায় বিগুণ কালো ;
বেতসের গারে জাগে রোমাঞ্চ
ছল ছল নদীতীরে,
দুর্ভুজ করে কোলাহল
তৃণপল্ল বিরে ।

সেই চেনা হ্রদ শ্রবণে পশিয়া
মাতারে তুলিল মন,
সেই চেনা রূপ জানাল আবার
রসের নিমন্ত্রণ !
নিমেষের মাঝে পরবাসী হয়ে
ধরবাসী এই মনে
নিরে যেতে চায় অল্প-পাথার
অমরার নন্দনে !

পর্যবেশের ওগো বারিধর,
মিনতি তোমার প্রিয়,
নয়নের সাথে পরাগের পাতে
বিছাও উত্তরীয় ।
ফুটাও হরয়-রস-কদম্ব
ছুটাও গো পরিমল,
উধর স্বরে চিত্তকুহরে
ভুলাও নাগিনী দল ।

চলচকল বলাকার দল—
—শতদলে গাঁথা মালা—
এ কালো বৃকে হারায়ে যেমন
ভুলে বন্ধন-জালা,
তেমনি এ মন ও রস-সায়রে
ভুবিয়া মরিতে চায়,—
ভুবাও তাহারে—বাঁচাও তাহারে—
মিনতি তোমার পাশে

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম-তারিখ

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে-ছবিখানি উৎকৃষ্ট জীবনী আছে, সে-ছবিখানিই বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে নূতন কোন কথা শুধাইবার ভরসা রাখা স্পর্ধার মতই শোনায। তবু আমার মনে হয় মাইকেলের জীবনের খুঁটিখাটি বিষয়ে নূতন আলোকপাত করা এখনও অসম্ভব নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আজ একটি প্রশ্নের উত্থাপন করিব। সে প্রশ্ন—মাইকেলের জন্ম-তারিখ কি?

সকলেই বলেন, মাইকেলের জন্মের তারিখ—২৫এ জানুয়ারি ১৮২৪ (১২ই মাঘ ১২৩০, শনিবার)। শোনা যায়, এই তারিখ তাঁহার কোণ্টী হইতে পাওয়া। কিন্তু চরিতকারদের কেহ এই কোণ্টী স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। মাইকেলের এই জন্ম-তারিখ যে নির্ভুল নহে তাহার ছুটি প্রমাণ দিতেছি।—

(১) মাইকেলের প্রচলিত জন্ম-তারিখ—“২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ (১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার)”। কিন্তু ২৫এ জানুয়ারি হইলে বাংলা তারিখ ১২ই মাঘ শনিবার হয় না,—সে ১৩ই মাঘ রবিবার। ইংরেজী ও বাংলা তারিখের সামঞ্জস্য নাই, সুতরাং এই জন্ম-তারিখের কোথাও না-কোথাও একটা ভুল আছে।

(২) মাইকেল ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজ স্কুলে প্রবেশ করেন—ইহাই সূক্ষ্ম জানা আছে। ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে মাইকেলের জন্ম হইয়া থাকিলে, ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজে প্রবেশকালে তাঁহার বয়সক্রম অন্ততঃ ১৩ বৎসর ছিল। কিন্তু ১৩ বৎসর বয়সে মধুসূদন হিন্দু-কলেজে জুনিয়ার স্কুলে প্রবেশ করিতে পারেন না; কারণ এই বিভাগে ৮ বৎসরের কম এবং ১২ বৎসরের বয়স ছেলেকে প্রবেশ করিতে দিবার নিয়ম ছিল।

senior school. In the former, boys not less than eight, and not more than twelve, are admitted...” (*Asiatic Journal* for Sept. Dec. 1832. Asiatic Intelligencer—Calcutta, pp. 114-115.)

তাহা হইলে মাইকেল নিশ্চয়ই ১৮৩৭ সনের পূর্বে হিন্দু-কলেজের জুনিয়ার স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

তবে মাইকেলের জন্ম-সন কি, এবং কোন সনেই বা তিনি সর্বপ্রথম হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন? এই ছুটি বিষয়ে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।—

(১) মাইকেলের জন্ম-সন ১৮২৪ নহে,—আমার মনে হয় ১৮২৩ হইবে। তিনি ১৮৪৪ সনের নভেম্বর মাসে বিশপ্‌স্ কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২১ বৎসর ছিল। পাদরি লং তাঁহার *Haut-Book*

is divided into a junior and

of Bengal Missions etc (1848) পুস্তকের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়—
যুব সন্তব বিশপ্ কলেজ রেজিষ্টার হইতে—নিম্নাংশ উদ্ধৃত
করিয়াছেন :—

List of the Students connected with Bishop's
College in 1846.

Name.	Date of Admission.	Age. yrs. m.s.	On what Endowment.
* * * udhn Suden Dut * * *	Nov. 1844	21	Lay Student.

স্পষ্ট জাণা যাইতেছে, ১৮৪৪ সনের নভেম্বর মাসে
বিশপ্ কলেজে প্রবেশকালে মাইকেলের বয়স ছিল ২১
বৎসর। ইহা দ্বারা তাঁহার জন্ম-সন ১৮২৩ পাওয়া যাইতেছে।
তাঁহার সমাপ্তি-স্তম্ভেও এই জন্ম-বৎসর খোদিত আছে।

উদ্ধৃত অংশ হইতে আরও একটা সঠিক তারিখ পাওয়া
গেল। আমরা এখা জানিতে পারিলাম যে মাইকেল
বিশপ্ কলেজে প্রবেশ করেন ১৮৪৪ সনের নভেম্বর মাসে—
১৮৪৩ সনে নহে।

(২) প্রচলিত জীবনচরিতগুলির মতে, মাইকেল
১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজের জুনিয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন।
কিন্তু মাইকেল যে ইহার অন্ততঃ চার বৎসর পূর্বে হিন্দু-

কলেজে শিক্ষার্থী ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। ১৮৩৪
সনের ৭ই মার্চ কলিকাতার টাউন-হলে হিন্দু কলেজের
ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ হয়। এই উপলক্ষে মাইকেল
একটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। এই পুরস্কার-বিতরণী
সভার বিবরণ সেকালের সাপ্তাহিক পত্র ‘সমাচার দর্পণে’
পাওয়া যায়। ১৮৩৪ সনের ১২ই মার্চ তারিখের
‘সমাচার দর্পণে’ পাইতেছি :—

মঠ হেনরি ও স্টার

মঠ হেনরি। দ্বিধরচন্দ্র খোশাল।
স্টার। মধুসূদন দত্ত।

জানা গেল, ১৮৩৪ সনের মার্চ মাসে মাইকেল হিন্দু
কলেজে শিক্ষার্থী রূপে ছিলেন। ইহার পূর্বেই—সম্ভবতঃ
১৮৩৩ সনে, তিনি হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন।
পূর্বেই দেখাইয়াছি, মাইকেলের জন্ম-সন ১৮২৩ হওয়া
উচিত। তাহা হইলে তিনি হিন্দু কলেজের জুনিয়ার
স্কুলে আনুমানিক ১০ বৎসর বয়সে প্রবেশ করিয়াছিলেন,
প্রচলিত জীবনীগুলিতে যে ১৩ বৎসর বয়সের কথা আছে
তখন নয়।*

* ১৩৪১/১৪ই আষাঢ় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাইকেল
মধুসূদন দত্তের স্মৃতিসভায় পঠিত।

শ্যামল-রাণী

ক্রীতি-সিঙ্গল মুখোপাধ্যায়

মিষ্টিরদের যেয়ে মুখা আঙ্গ বছর দুই পরে বাপের বাড়ি
আসিল। গিয়াছিল যখন—একা। আঙ্গ পালকি হইতে
নামিল—কোলে নদীর পুকুলের মত একটি শিল। সাত
বছরের ছোট বোন শৈল আঙ্গাদের চোটে হাততালি
দিয়া উঠিল, বলিল,—“দিকিকে ঠিক গুপার-বরের পটের
গণেশ-জগনীর মত দেখতে হয় নি মা?—বোঁটা নতুন
টান্ডান হয়েছে? ...না-গো বোঁদি?”

মুখা মাকে আর ভাস্ককে প্রশংসা করিয়া হাসিয়া
বলিল—“গণেশ-জগনীর মা তবুও বছরের শেষে একবার
ক’রে তাঁর মেয়েকে.....”

আ ভাৱী হইয়া গেল, চোখ ডবডব করিয়া উঠিল,
টোটে হাসি কিন্তু লাগিয়াই রহিল। বাপের বাড়ি
আসার মিশ্র ভক্তি—একটুতেই হাসি ধৌত করিয়া
অঙ্গ উছলিয়া ওঠে।

খোকাকে বুকে লইয়া মা খাইয়া, মা আঁচলে চোখ
দুইটা মুছিয়া বলিলেন—“মা’র ভাস্ক বাছা? ...বা লাভ-
সমুদ্র-তের-নদীর-পারে গিয়েচি...ভাস্ক—ভালছিল মুখা?
ওবা, এটা কি চমৎকার হয়েছে গো! ভালবেসাতে কুই
ঠিক এই রকমটি ছিলি,—বেশ মনে আছে নী না...”

মেয়ের আঁচলের সঙ্গে নতুন মুখোপাধ্যায়ের মুখ...

মিশাইয়া হুখা বলিল—“হুখি ত বলবেই। আমি কিন্তু সময় দস্তি ছিলাম না বাপু, কখনই না। আমার ত নাজেহাল করে দিয়েচে। সামলান কি সোজা?”

ভাঙ্গ ভক্তকণ থোকাকে লইয়াছে। একটু একান্তে ষ্টাট টিপিয়া বলিল—“একটিতেই?”

নন্দ-ভাজের মধ্যে এক ধরনের চোখোচোখি হইয়া গেল।

শৈল থোকার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল—“দাঁও আমার কোলে বৌদি, আমি ত মাসী হই?”

থোকাকে দিয়া বৌদিদি হাসিয়া বলিল—“হ্যাঁ, ফুদে-মাসী।”

হুখাও হাসিয়া উঠিল। ছোট ভাই-পো মস্ত যার পেছনে, আঁচল টানিয়া দিয়া অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, আর পিসীর সহিত পটের গণেশ-জননীর সাদৃশ্য পুঞ্জিয়া হয়রাণ হইতেছিল; হুখা তাহাকে কোলে লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—“হ্যারে থোকা, পিসীকে ভুলে গেলি? ...দেখচ মা ছেলের বেইমানি?—আর এই পিসি এক দণ্ড না হ'লে চলত না।”

মস্ত ছুটিয়া পলাইয়া শৈলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল এবং বাইতে বাইতে শিশুর দিকে চাহিয়া, নিজের মনোগত সমস্তার একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া বলিল—“থোকা ঠিক পটের গণেশের মত মোটা হয়েছে, না মেজপিসী?”

থোকার মাসী চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, যার পানে চাহিয়া ভীতবরে বলিয়া উঠিল—“শুনলে মা?—থোকা নাকি গণেশের মত মোটা হয়েছে!—এই বেশপতিবারের বারবেলা ছেলটাকে খুঁড়লে!—বাট, বাট...”

তাহার রকমখানা দেখিয়া মা, হুখা, বৌদিদি, তিন জনেই হাসিয়া উঠিল।

হুখা বলিল—“রোববারের সকাল একেবারে বেশপতি বারের বারবেলা হ'য়ে গেল! ঠিক সেইরকম গিন্নী আছে শৈলী, না মা?—বরং আরও বেড়েচে।”

বৌদিদি হাসিয়া বলিল—“তোমার আরগা দখল করেছে; বাড়িতে একটি থোকা চাই ত, নইলে গরু, বেরাল, পায়রা—এদের সংসার কে দেখবে বল?”

হুই বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত সেই ঝাপারই ছিল। আজ সে-কথার স্মরণে একটু লজ্জা করিয়া আসিল বটে, কিন্তু

হুখা আগ্রহটাও দমন করিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল—“পায়রাগুলো বিদের ক'রে দিয়েচ নাকি মা? পুনীটার এবারে কণ্টা ছানা হ'ল? আর শ্রামলী?—তার বাছুরটা কেমন হ'ল?...বাক, একটা সাধ মিটেবে এবার, শ্রামলীর দুধ খেয়ে যাব। ভাবতেও কি রকম হয়, না মা?—এই সেদিনকার শ্রামলী, এতটুকু বাছুর, বাড়ি এল—সি'ছর, হলুদ দিয়ে গোরালে তোলা হ'ল, আর আজ তার নিজেরই বাছুর!...”

বৌদিদি যেন ওৎ পাতিয়া নন্দের কথাগুলি শুনিতে-ছিল, এই পর্য্যন্ত আসিলে একটু অর্থপূর্ণ হাস্তের সহিত সংক্ষেপে বলিল—“ওই রকমই ত হয়।”

বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রবেশ করিতে করিতে হুখা আবারে-নাশিশের হুরে বলিল—“দেখচো মা বৌদিকে?”

অলক্ষণ পরেই শব্দরবাড়ির বউমাহুয়ের ভাব আর মাতৃহের গাভীরা যাহ। একটু লাগিয়া ছিল, হুখার দেহ-মন থেকে একেবারে অপসৃত হইয়া গেল। জামা কাপড় ছাড়া, বাস্তবপূর্ণ গোছান সব তুলিয়া সে খুরিয়া খুরিয়া পুনীটাকে প্রথমে তল্লাস করিয়া বাহির করিল, এক আঁজলা চাল উঠানের মাঝখানে ছড়াইয়া দিতেই পায়রাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে নামিয়া বকবকম আওয়াজ করিয়া ভোজের মধ্যে সংস্কৃত-উদগারী পণ্ডিতদের মত এক মহাসমারোহ লাগাইয়া দিল। হুখা তাহাদের সামনে রকে পা ছড়াইয়া বসিয়া পুনীকে কোলে চাপড়াইতে চাপড়াইতে হুর করিয়া ছড়া কাটিতেছিল—

‘সারা ভারত বাড়ি বাড়ি বগীঠাকুর ব'য়ে
একেবারেই হ'ল পুনীর সাতটি ছেলেমেয়ে,
বর দাঁড়াল শাপে গিয়ে, অন্ন দেওয়া ভার...

এমন সময় বোনপোকে পাড়ায় একটু টহল দেওয়াইয়া শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল, পেছনে পেছনে ছুটি বেরালছানা। হুখার কাছে পরিচয় করাইয়া দিল—“পুনীর ছানা; একটি শেরালের পেটে গেছে; তবুও কি একবার ঘুরে দেখে? যুয়ে আঙন মাজের, ঝুঁকে আর আদর ক'রো না, হু-চন্দের বিব। মা-বগী কি দেখে যে ওকে যেন অভঙলি ক'রে।...হ্যাঁ দিদি, এই ছেলে হ'ল তোমার ছুটু?”

খোকার মাখাটা নিজের কাছে চাপিয়া চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল—“এমন ঠাণ্ডা ছেলে এ-তরাটে দেখাক-দিকিন কেউ! বাহা আমার মাসী বলতে অজ্ঞান।”

মা, বৌদিদি, হুখা তিন জনেই হাসিয়া উঠিল। হুখা বলিল—“আচ্ছা মা, পাঁচ মাসের একটা শিশু,—সে ওকে কখন মাসী বললে বল দিকিন?—আবার বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল।”

মা বলিলেন—“মাসী হ’য়ে ও-ই জ্ঞানরহিত হয়েছে—কি যে করবে, কি বলবে...”

শৈল তাহার মাসীকে লইয়া এমন ‘ব্যাবানায়’ অগ্রসৃত হইয়া থোকাকে রকেটবসাইয়া ছুড়-ছুড় করিয়া পলাইতে-ছিল। ছুরারের নিকট হইতে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া স্তম্ভভাবে বলিল—“ও দিদি! শীগির শূন্যকে নামিয়ে থোকাকে কোলে নিয়ে ভাবিসবি হ’য়ে ব’স;—তোমার নই, নই-মা, ও-পাড়ার সতী-পিসি—একপাল সব দেখতে আসে তোমায়—দাও নামিয়ে—দিলে?... ”

হুখা ধীরেহুসে বাট থেকে একমুঠা চাল উঠানে পায়রার ঝাঁকের উপর ছড়াইয়া দিয়া বলিল—“বয়ে গেচে আমার; খণ্ডরবাড়ির ক’নে বউ নাকি?”

গাড়ীতে সমস্ত রাজি জাগার জের,—বিকাল হইয়া গেলেও হুখা অঘোরে নিদ্রা দিতেছিল। শৈল আসিয়া হস্তদস্ত হইয়া তাহাকে ঠেলিয়া উঠাইল—“ও দিদি, শামূলী কিরে এসেচে, তার বাছুর দেখ’সে; কি চমৎকার যে হয়েছে, এ-তরাটে এমন বাছুর কেউ যদি...”

মা ধমক দিয়া উঠিলেন—“না, এ-তরাটে বা-কিছু এক তোদেরই আছে।...দেখ’দিকিন, সমস্ত রাত ঘুমোর নি মেয়েটা, মিচিমিচি এসে তুললে।”

শৈলর মনে দিদির আর খোকার আসার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা তোড় নামিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেটা যেন নিজের বেগেই সব জায়গার খাড়া খাইয়া মরিতেছে। উৎসাহের মুখে মার নিকট ধমক খাইয়া কোয়ারি সজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, দিদির কথার আবার সামলাইয়া উঠিল।—উঠিতে উঠিতে হুখা হাসিয়া বলিল—“তাগিয়া

শৈলী তুললে মা!—সব দেখছিলাম—থোকাকে না দেখে খণ্ডরের যেন কীমরতি দাঁড়িয়ে গেচে; এসে বলচেন—‘এক বছর হ’য়ে গেল বৌমাকে পাঠিয়েচি, কতদিন আর রাখা চলে?’...বাবেনই নিয়ে...তোমরা হাতে ধ’রে কাকুতিমিনতি ক’রে বলচ—‘এই ত মোটে আজ সকালে এসেচে বেইমশাই...কে শোনে?...সেজেগুজে কাঁদতে কাঁদতে বেকচি—এমন সময় শৈলী...”

শৈল চোখ ছুটে বড় বড় করিয়া একেবারে তদগত হইয়া গুণিতেছিল; উল্লাসে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল—“দেখ, কেমন আমি দিদিকে বাঁচিয়ে দিয়েচি; যদি না...”

তাহার পর সবার হাসিতে নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া, একেবারে ছই হাতে মুখ ঢাকিয়া দিদির কোলে মিশিয়া গেল।

হুখা বলিল—“চল, ও’, দেখিগে।”

নামিতেই থোকা জাগিয়া উঠিল। “দেখেচ? ওর টনক নড়ে, কোথাও যদি এক-পা যাবার জো আছে।”—বলিতে বলিতে থোকাকে তুলিয়া লইল, ভাজের দিকে চাহিয়া বলিল—“বৌদি তুমিও এস ভাই।”

“হাতের পাট-টা সরে আসচি, তুমি এগোও।”—বলিয় সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

শামূলী গোয়াল ঘরে তৃপ্তির গাঢ় নিঃশ্বাসের সঙ্গে জাব্বান খাইতেছিল, আর মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া সামনের খোলা জায়গার চঞ্চল, উৎকিষ্যমান বৎসটির পানে চাহিয়া এক-একটা হুখা অথচ গভীর আওয়াজ করিয়া নিজের বাৎসল্য-স্নেহ প্রকাশ করিতেছিল। হুখা সামনে আসিয়া বলিল—“কি লা শামূলী, চিনতে পারিস?...ওমা, কত বড়টা হয়ে গেচে গরুটা।”

“শামূলী নাহা হইতে ষাড়টা বাহির করিয়া জাব্বান চিবাইতে চিবাইতে প্রশ্রবকর্জীর পানে একটু চাহিল, তাহার পর হঠাৎ মুখনাড়া বন্ধ করিয়া দু-পা আগাইয়া আসিয়া হুখার ডান হাতটা হৃদয় টানের সঙ্গে চাটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বুকের নিকট হইতে একটা অব্যক্ত, ভরাট আওয়াজ বাহির হইয়া আসিতে লাগিল এক

প্রবল নিঃশ্বাসে মুখের ওপরের জাব্বার কুটাকাটগুলো
মুখের শাড়ীর উপর উড়িয়া সঁটিরা বাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ জিবের আঁচড় সহ করিয়া হুখা হুড়হুড়িতে
বাড়টা কুঞ্চিত করিয়া বলিল—“ওরে থাম, বাছুর চেটে
তোর যা জিব হয়েছে, আমার এক পরদা চামড়া উঠে
গেল...দেখ কাণ্ড, আবার ধোকাকে চাটতে বার!”

হাসিয়া দু-পা পিছাইয়া গেল। শ্যামলী বাগ্রভাবে
একবার দড়িতে টান দিয়া বাড়টা নাড়িয়া উঠিল, সঙ্গে
সঙ্গে বাহিরে বাছুরটার উপর নব্বুর পড়ায় “ভা!” করিয়া
ডাক দিয়া উঠিল এবং বাছুরটা ছুটিয়া আসিলে কিছুক্ষণ
অগত্বেকদের তুলিয়া, সপ্রেমে তাহার গা-টা ঘন ঘন
একটুট চাটিয়া দিয়া আবার স্থস্থির হইয়া দাঁড়াইল।

হুখা চোখমুখ কোতুকে বোকাই করিয়া বাছুরের
সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যান করিতে বাইতেছিল, দু-একটা কথা
বলিয়া দিদির দিকে চাহিতেই থমকিয়া গেল। দিদি
ডানহাতের তর্জ্জীটা গালে চাপিয়া, নিতান্ত বিষয়ে
ঘাড় কাৎ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; বলিল—“দেখলি শৈলী,
কাণ্ডটা!”

শৈল এমন কিছু কাণ্ড দেখিতে পার নাই বাহাতে
দিদির এতটা ভাবান্তর হইতে পারে। প্রশ্ন করিতে
বাইতেছিল, তাহার পূর্বেই হুখা হুঙ্কারিয়া দিল—
“দেখলি না ঠেকারটা?—চাটতে দিলাম! তাই স্পষ্ট
বুঝিয়ে দিলে—তোমার ধোকা আছে, আমার নেই? এই
দেখ...কেমন ডাকলে, কেমন কোলে টেনে নিয়ে চাটতে
লাগল!...হালা শামলী, গেরস্তকে এতদিনেও একটা
নই-বাছুর দেওয়ার মুরোদ হ’ল! না, উক্টো আমার! সঙ্গে
টেকা দিতে এলি! মূরে আগুন, বাটা-বাছুরের আবার
গুমোর কি লা?—কি কাজে লাগবে? কদিনই বা কাছে
ধরে রাখতে পারবি? আমার এই সোনার টাদের সঙ্গে
তুলনা হ’ল কিনা...”

বৌদিদি আর মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৌদিদি
হাসিয়া বলিল—“কি কথা হচ্ছে? গো পুরনো লইয়ের সঙ্গে?”

দিদির কথাবার্তা শুনিবার পর শৈল শ্যামলীর ব্যবহারে
দিদির চেয়েও ক্রুদ্ধ ও বিষয়াবিত্ত হইয়া গিয়াছিল, বড়
বড় চোখ করিয়া আরক্ত করিল—“বললে শৈলীর বাবে

না মা, দিদির কোলে ধোকাকে বেধে শামলী ঠেকার
ক’রে...”

কোন ফাঁকতালে হঠাৎ ছেলেবেলার হুখা আসিয়া
তাহার মুক সখীর সঙ্গে মুখের আলাপ সমাধিয়া তুলিয়াছিল,
সরমের স্পর্শে আবার অন্তহিত হইয়া গেল। নদীর মধ্যে
হঠাৎ যেন ঝরণার উচ্ছলতা আসিয়া পড়িয়াছিল।...
শৈলকে ধমক দিয়া হুখা বলিল—“হ্যাং, গরুর নাকি
আবার ঠেকার হয়!—পাগলের মত যা তা ব’কিস্ নি
শৈলী।”

শ্যামলীর কাণ্ডের চেয়ে দিদির কাণ্ড আরও দুর্কৌণ্য
বলিয়া বোধ হইল; শৈল অপ্রতিভ হইয়া হঁ। করিয়া দিদির
মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হুখা মাকে কহিল—“বলছিলাম মা, শ্যামলীর শেষে
বাটা-বাছুর হ’ল? ‘নই’ হ’লে নিয়ে যেতাম আমি।
খন্তুর কি ভাল একটা নাকি ওখুর জানেন, খাওয়ালে নাকি
নই-বাছুর হ’তেই হবে...হাস্চ বৌদি, কিন্তু একেবারে নাকি
পরীক্ষিত, নড়চড় হবার জো নেই।”

মাও না হাসিয়া পারলেন না, বলিলেন—“তিন বার
তু’নাকি’ বললি, অথচ নড়চড়ও হবার জো নেই! খন্তুর
তোর ভারি গুণী ত!”

হুখা লজ্জায় ‘ঘাও’—বলিয়া মুখ ফিরাইল।

ভাজ বলিল—“তার চেয়ে তুমি শ্যামলীকে নিয়ে বাও না
ঠাকুরঝি, ঠাকুর-জামায়েরও পণ রক্ষা হয়.....”

হুখা ঘাড় নীচু করিয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইয়া
বলিল—“না বাবু, আমি চললাম, খাণ্ডী-বউয়ে এক-
জোট হ’য়ে আমার পেছনে লাগলেন সব।”

সে একটা আলাদা কাহিনী, বিবাহের সঙ্গে অচ্ছেদ্য
ভাবে জড়ান। যতই বড় হইতেছে তাহার লজ্জাটা হুখাকে
ততই যেন অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

শর্দার বিবাহ-সংক্রান্ত বিল লইয়া সারার দেশটার
সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল; লোকেরা বলিল—
কালাপাহাড় এবার কলম হাতে করিয়া আবির্ভূত
হইয়াছে। সে আজ প্রায় চার-পাঁচ বৎসরের

কথা; সুখা আট পারাইয়া ন'য়ে পড়িবে। ছপুয়ে সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে যখন গ্রামের মাভবরদের মধ্যে আসল ধর্মবিষয় লইয়া হুচ্যা আলোচনা চলিতে থাকে, সে তখন তাহাদের নূতন গোয়াল-বরের শিছনে লিচুগাছের ছায়ায় খেলাঘর পাতিয়া জীবনের মাঝখানে বিচরণ করিতে থাকে। হালদারদের নিমাই হয় কর্তা, সে হয় গিন্নী, ছ-বছরের শিশু শৈল হয় মেয়ে। পুসী বেরালটা তখন বাচ্চা, চারখানা ইটের একটা ছোট্ট ঘরে কাপড়ের পাড়ে বাধা থাকিয়া অসহায় ভাবে বলিয়া থাকে। 'মিউ মিউ' করিয়া শব্দ করিলে সুখা বিব্রত হইয়া বলে—“ওদিকে গরুটা ডেকে ডেকে সারা হ'য়ে গেল, কোন্ দিকটা যে সামলাই...”

লই বউমা হয়। নিমাইয়ের ভাই ননী প্রায়ই অসুখে ভোগে, যেদিন আসিতে পারিল সেদিন সে হয় বাড়ির ছেলে, লই-বোমার বর। দীর্ঘকাল অসুস্থস্থিত থাকিলে লইকে নূতনঘের খাতিরে বিধবা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

আসল সংসারে যে-সব কথা হয় নকলে তাহার প্রতিধ্বনি ওঠে।—সুখা রান্না করিতে করিতে কড়ায় থস্তির ছুই তিনটা ঘা দেয়, উনানের মধ্যে কাঠটা একটু চেলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বলে এবং হাঁটু ছুইটা মুড়িয়া ডাকে—“বলি হাঁগা, শুনচ ?”

নিমাই আসিয়া উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা করে—“কথাটা কি ?”

সুখা তাহার গাফিলতিতে তেলে-বেগুনে জলিয়া যায়; নিজের গৃহিণীত্ব ভুলিয়া বলিয়া ওঠে—“নাঃ, তোমার শিথিরে শিথিরে পেরে উঠলাম না নিমুদা;—বাবার যত হাতে হ'কো কই ?”

ছেলেটা বড় ভুলো-মন, খুঁজিয়া-পাতিয়া হ'কাটা লইয়া আসে। একটা পেপের ড'টার নীচের দিকটা একটু ছেঁদা-করা, মাথায় একটা কল্কে-কুল বসান। একখনা ইট পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া প্রস্থ করে—“কি বলছিলে ?”

“কলহিলাম আমার মাথা আর মুখ;—নাকে তেল দিয়ে লব্দ খুঁচু, সরকার বাছুর যে এদিকে জাতকুল নিয়ে টানাটানি লাগিয়েচে—হি'ছয়ানি যে বেতে কল।

শুনচি নাকি মেয়েদের আর বাইশ বছরের কমে বিয়ে দিতে দেবে না ?”

কর্তা নিমু বলে—“বাইশ না আঠার ?”

“বড় তকাৎ! আজ আঠার, কাল পালটে বাইশ ক'রে দেবে। বলি সুখীটার কথা ভাবচ ?”

“আট বছরের শিশু, ওর কথা আর কি ভাববো ? শুনচি জেলায় এই নিয়ে একটা মিটিন্ হবে; গ্রাম থেকে ডালঘেঁটে পাঠাবার জন্তে তারুণ খুঁড়োর কাছে লোক এসেছিল...”

সুখা আরও গভীর হইয়া বাধা দিয়া বলে—“বাইরের লোক তোমার জাত বাচাবে সেই ভরসায় আছ ? তোমাদের ঘটে কি একটুও বুদ্ধি...”

তাহার কড়া চোখ দেখিয়া নিমাই একটু থতমত খাইয়া যায়; তাহা ভিন্ন নিজেকে একটু হাদা বলিয়া কথাটা তাহাকে সাক্ষাৎভাবে আবারও করে। আমতা আমতা করিয়া একটু নীচু হইয়া বলে—“হ্যাঁ, বুদ্ধি নেই কে বললে ?—খালি ঐ কথা।”

রাগের চোটে সুখা পিড়া ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলে—“তোমার দ্বারা হবে না নিমুদা, তুমি বাড়ি যাও। 'বে মেয়েমানুষের দশ হাত কাপড়ে কাছা ছোটে না, সে আবার বুদ্ধির খোঁটা দেয়’—রেগে এইখানে এই কথাটা বলতে হবে না ? শুনলে না সেদিন বাবা মাকে বললেন ?”

সুখার মুষ্টি দেখিয়া নিমাইয়ের নিজেরই কাছাকোঁচার ঠিক থাকে না। কোন রকমে কাপড়টা সামলাইয়া লইয়া বলে—“আচ্ছা আচ্ছা, কলচি, বোস; তোর মা কিন্তু ও-রকম রেগে কাঁই হ'য়ে ওঠে না সুখী, তা ব'লে দিচ্চি; তোকে নিয়ে ঘর করা বড় শক্ত।”

এই সময় একদিন সুখার ঝাপ রামরতন বয়েমারীর হাট থেকে শ্রামলীকে কিনিয়া আনিলেন। ইহাতে যে শুধু পুসী বেরালটা গাভী হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল তাহাই নয়, খেলাঘরের ঘরকণার পদ্ধতিতেও অনেক পরিবর্তন ঘটিল।

রান্নাবান্না, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা—এসবের

পাট উঠিয়া গিয়াছে; এখন কর্তা গিল্লী, ছেলে বউ সকলে শ্রামলীর পিছনে হররাণ;—কোথায় নথর বাস জন্মাইয়াছে, কোঁচড় ভরিয়া ফুলিয়া আনা; কে কোথায় গাছ কি ডাল কাটিয়াছে, পাতা সংগ্রহ করা; ওদিকে গ্রামে সবার বাগানে যে কি হইয়াছে,—নেউল তাড়ানো, চুনবাগা ছাড়িতে আর কাজ হয় না। নিমাই ত সুখকে ভুট করিবার এমন সুখ নৃযোগ পাইয়া একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে; এতদিন স্থলে যে সময়টা নষ্ট হইত তাহারও বহুলাংশ এখন শ্রামলী-পরিচর্যায় সার্থক হইয়া উঠিতেছে। এই সব করিয়া যে সময়টুকু উদ্ধৃত হয় তাহাতে সুখ সকলকে গো-তব্ব শিক্ষা দেয়।

বলে—“তোমরা যে মনে কর মশাই, ওরা আসল গরু, বুদ্ধিহীন নেই—তা নয়। সব বোঝে—দেখচ না কি রকম ক’রে আমাদের কথা শুনতে?...সত্য যুগে ওরা কথাও কইত...”

ননী বলে—“ওরা ত ভগবতী!”

বাংল্যের মুদ্রহাস্তের সহিত সুখ বলে—“হ্যা ভগবতী, তা বলে কি লক্ষ্মী-সরস্বতীর মা ভগবতী?—তা নয়; ও অন্তরকম ভগবতী। হ্যা, কি যে বলছিলাম—সত্য যুগে ওরা কথাও বলত, তার পর কোন মূর্খের শাপে বোবা হয়ে যায়। অনেক কাম্বাকটির পর মূর্খ বলেন—“আচ্ছা যা, তাদের কোন কষ্ট হবে না—তাদের বুদ্ধি একটু মায়ুষের মাথায় সাঁদ করিয়ে দিচ্ছি—তাদের নিজের জাত যেমন তাদের ইসারা বুঝবে, মায়ুষেও সেইরকম বুঝতে পারবে। কাছে গেলে শ্রামলী যখন তোমার হাত চাটে তখন তোমার ত বুঝতে বাকী থাকে না যে বাস-পাত তুলে আনতে ব’লচে—সে কেমন ক’রে বোঝ মশাই? যখন...”

ভক্তিমান ননী বলে—“আর গরু ত স্বর্গ, ওদের গায়ে তেজিষ কোটি দেবতা থাকেন।”

সুখ বলে—“থাকেনই ত; যুখে বেঙ্গা থাকেন, মাথায় জগন্নাথ থাকেন, স্নাজে কান্তিক থাকেন...”

সই করুণাপরবশ হইয়া বলে—“আহ, কান্তিকের বড় কষ্ট তাই; সবদা স্নাজ ধ’রে ঝুলতে হয়...”

সুখ বলে—“চুপ, ব’লতে নেই।” তাহার পর নিমাইয়ের পানে অর্ধপূর্ণ চুটি হানিয়া বলে—“আর অত দেবতা থাকেন ব’লেই ত গরুর জন্তে চুরিচুরি ক’রলে কোন

দোষ হয় না, বরং পুণ্যই হয়। এই দেখ না, একটা পি’গড়ে মারলেও কত পাপ হয় ত?—কিন্তু মা-কালীর সামনে পাঠা-বলি দিলে কোন দোষ হয় কি?”

বুদ্ধিটা অকাটা; ইচ্ছিতটাও অস্পষ্ট নয়,—কলে নিমাইয়ের গোয়াল হইতে কোঁচড় তরা খোল কুঁড়ো, কলাই হাজির হইয়া শ্রামলীর উদরে প্রবেশ করে। সইও সাধ্যমত গুণ্যসঙ্করে মনোযোগী হইয়া ওঠে।

এদিককার খবর সংক্ষেপত এই—

জেলায় মিটিং হইয়াছিল; হরবিলাস শর্দাকে যথাযোগ্য গালাগালির পর ছেলেদের বিবাহযোগ্য বয়স ঘোল এবং যেয়েদের বারো ধার্যা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে এর তুমুল আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে হরবিলাস শর্দা এবং জেলার উকিল ও অন্যান্য উদ্যোক্তাদের যথাযোগ্য গালাগালির পর ছেলেদের নূনতম বয়স চোদ্দ এবং যেয়েদের দশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ও-পাড়ার তিনকড়ি-খুড়ীর বাড়িতে উৎকট রকমের এক মেয়ে মিটিং বলিয়াছিল, তাহাতে হরবিলাস শর্দা, গবর্ণমেন্ট বাহাদুর, জেলার উকিল এবং সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে বাহাদুর তামাক পোড়ায় সকলকেই একশাটে ‘ভাগাড়ে’ দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের নানারূপ কেছাকাহিনী আলোচনার পর সকলের মনের বোঝা হাক হইলে ধার্যা হইয়াছে যে, ইহাদের পুরাপুরি মতিচ্ছন্ন হইবার পূর্বেই বয়স-নির্ধিষেয়ে গ্রামের সমস্ত অনুচ্চা কস্তাকে পাত্রহা করিয়া জাতকুল বাঁচাইতেই হইবে;—‘তা বর কানা হোক, ধোঁড়া হোক, মুলো হোক, কুঁজো হোক, মস্তুরটা কোনরকমে আউড়ে দিতে পারলেই হ’ল...”

বিধিব্যবহার যথেষ্ট অভাব থাকিলেও ছপুয়ের এই মহিলা-মজলিসই সাধারণত জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে; বিশেষ করিয়া মজলিসের কর্ণধার যদি তিনকড়ি-খুড়ীর যত কেহ থাকেন। পাড়ায় পাড়ায় কস্তা-মহামারী পড়িয়া গেল।

কয়েক দিন পরের কথা। বিকালে সুখ বাগানের এক

কোণে শ্রামলীর গঙ্গা জড়াইয়া আদর করিতেছিল—
“শ্রামলী তুমলী শ্রামলরাণী, তুমি আর কারুর নয়
সোনামণি...”

শ্রামলী তাহার সমস্ত পিঠখানি চাটিয়া-চাটিয়া বোধ
হয় জানাইতেছিল—না, আমি আর কাহারই নয়, একান্ত
তোমারই...

এমন সময় বা আদিয়া বলিয়া উঠিলেন—“দেখ
কাণ্ডখানা! সমস্ত পাড়া তোলপাড় ক’রে ম’রচি, আর
মেয়ে কিনা পীদাড়ের মধ্যে গরুর সঙ্গে সোহাগে বস্তু!...
তোকে না আজকে দেখতে আসবে, সুখী?...গা মাজতে
হবে না, চুল বাঁধতে হবে না?...চ’লে আস নিগ্গার।”

দেখিতে আসিলেন মাঝের পাড়ার দাব-রেজিষ্ট্রারবাবু,
নাম জগবন্ধু রায়। বিদেশী লোক, মেদিনীপুরে বাড়ি,
কার্যোপলক্ষে বলিল হইয়া এখানে বছর দুই-তিন আছেন।
ছেলেটি এখানে খাড়া ক্লাসে পড়ে; বছর তেরো বয়স হইবে।
জগবন্ধুবাবু একটু বাহিরের খবরাখবর রাখেন এবং প্রত্যেক
বিষয়ে যুক্তিতর্কের শেষ সীমানা পর্যন্ত টেলিয়া তুলিয়া
অনুশ্রাবন করেন। ছেলে তাঁহার একটু ছেলেমানুষ,
কিন্তু এর পরেই ত সেই আঁঠার। অনেক জায়গায়
আবার মিটিং করিয়া হাঁকাহাঁকি করিতেছে—ছেলেদের
বয়স করা হোক বাইশ চব্বিশ...এক মিস্ মেয়ো আসিয়াই
এই ব্যাপার;...ইতিমধ্যে যদি আর একটি আসিয়া পড়ে ত
চক্কুর! ছেলেদের বয়স যে কোথায় গিয়া ঠেকিবে
কে জানে? বিবাহ জিনিষটাই থাকিলে হয়; বোধ হয়
বৈদিক বিবাহপদ্ধতি উঠিয়া গিয়া সিভিল ম্যারেজের ধুম
পড়িয়া যাইবে। শেষকালে চল্লিশ বছরের বুড়ো ছেলে
লাভ করিয়া কোর্টে বিবাহট্রের জেটোরীক রিয়! কাহাকে ঘরে
তুলিবে কে বলিতে পারে? এখন একটু ভুলের জন্ত
শেষকালে জাতকুল সব বাক্ আর কি...

মেয়ে খুব পছন্দ। আশীর্বাদও হইয়া গেল এবং খুব
কাছাকাছি একটা দিন স্থির করিয়া জোগাড়-বস্ত্র আরম্ভ
হইয়া গেল।

হুধার মনটা ভাল নাই। যতদূর জানা আছে বিবাহ
জিনিষটা মন্দ নয়, কিন্তু ভাবনার কথা এই যে,
শ্রামলীকে ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। আশীর্বাদের পরদিন

সকালবেলা সুই আসিয়াছিল; হুধার মেজাজের জন্ত
খেলা জমে নাই। বাণ্ডার সময় মুখ ভার করিয়া
বলিয়া গেছে—“আজ্ঞা লো, আমারও একদিন বিয়ে
হবে, তখন দেখে নেব।”

হুধা শ্রামলীর জন্ত মনমরা হইয়া ঘাস হিড়িতেছিল,
নিমাই আসিয়া বলিল—“ওগো শুনচ?”

বাড় বাকাইয়া শ.স.নের ভঙ্গীতে হুধা বলিল—
“তোমার বুদ্ধিহুজি ক’বে হবে নিমুদা!”

নিমাই ভড়কাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—“কেন র্যা?...
আমার আর ওরকম করে ডাকা চলে তোমার?”

নিমাই সব কথা শুনি; শেষের দিকে পাত্রের পরিচয়
পাইয়া উৎক্লেশ হইয়া বলিয়া উঠিল—“চমৎকার হবে...
সে ত হরিহর, আমাদের স্থলে খার্ড ক্লাসে পড়ে,
আমি খুব জানি তাকে। মাইরি বলচি বেশ হবে ভাই।”

হুধা মুখ গভীর করিয়া বলিল—“তোমাদের ত
খুব দৃষ্টি; আমার মনে বে কি হচ্ছে...”

নিমাই কোন রোমান্সের গন্ধ পাইল কি-না সেই
জানে, মাঝখানেই বাস্তবাবে ভিজসা করিল—“কেন
র্যা, সুখী?”

“বাছুরটার কথা ভাবছ? আমি শ্রামলীকে ছেড়ে
ধাকতে পারব? আর আমার ছেড়ে শ্রামলীই বাচবে?”
—কথাটা বলিয়া হুলালের দিকে সুপ্রশ্ন দৃষ্টিতে
চাহিতেই ষ্টোট দুটি কাঁপিয়া উঠিল, চক্কুর মূল ছানির
দু-কোঁটা জল জমিয়া উঠিল। নিমাই হাত দিয়া
হুহাইয়া দিয়া বলিল—“ক’দিমু নি সুখী; খুড়ীমাকে
ব’লব আমি।”

এর পর শান্তভাবে চিন্তা করিয়া দেখা গেল—খুড়ীমাকে
বলাও চলে না, আর ওসব উপায়ে কাজও হইবে না।
ক্রমাগতই দু-জনে পরামর্শ হইতে লাগিল।—বাগানের
ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসিয়া, গোয়াল ঘরের কোণে,
লুণ্ঠার সময় পুকুরবাটের ভাঙা রাণার নীচে।.....
খেলা হয় না; ননী, সুই আমল পায় না; সুই বাইবার
সময় নাক কুঁচকিয়া বলে—“বিয়ের ক’নের ওত বেটা-
ছেলে-মে’স। হুগুতা ভাল নয় লো,—এই শাস্ত্রবাক্য
ব’লে দিলাম.....”

বিবর রাত। পাশাপাশি দুই গ্রামের বরক'নে, বরপক্ষ কচাপক্ষের লোকসঙ্গে বাড়িটা গমগম করিতেছে। উঠানে বিবাহের সন্ধ্যায়, চারিদিক গোল করিয়া বিবাহ-সভা রচনা করা হইয়াছে, হেলুগুড়া ঠাসঠাসি, হইয়া বিবাহ দেখিতেছে।

অমৃত্যুনের মধ্যে পুরোহিত হুগার বাপকে বলিলেন—
“এইবার তুমি যেহের ডান হাতট তুলে ধর, সম্প্রদান করিতে হবে...তুমি হাত পাত ত বাবা, খণ্ডের দান নেবে...কই গো, হাতে জড়াবার মালাগাছটা?...”

হুগার বাপ হুগার হাতটা একটু তুলিয়া বাড়াইয়া ধরিলেন।

বর কিন্তু একটা কাণ্ড করিয়া বসিল।—তাহার হাতটা এতক্ষণ বাহিরেই ছিল, হঠাৎ কাপড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া গোঁজ হইয়া বসিল। সকল বের স্তম্ভিত হইয়া গেল। পুরোহিত পাকা লোক, হাসিয়া বলিলেন—
“হাত বের করো বাবা, লজ্জা কি?—বড় হেলমায্য কি না।...”

সভার মধ্যে থেকেও অমরোণ, উপরোধ, লক্ষ্য, ধমক কিছুই বাকী রহিল না। বর কিন্তু ক্রমাগতই হাতটা কড়া করিয়া নিজের কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। মুগ্ধা রাঙা হইয়া গিয়াছে, ঘাড়টা শুঁজুড়াইয়া বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

“বর বেঁকে ব'সেচে, বর বেঁকে ব'সেচে”—বলিয়া একটা রব চারিদিক ছড়াইয়া পড়িল। বাড়ির ভীড় চাপ বাঁধিয়া উঠিল। জগবন্ধু আগন্তুকদের দেখাশুনায় বাহিরে বাস্ত ছিলেন। ভীড় তেলিয়া আসিয়া হাজির হইলেন, কড়া গলায় বলিলেন—“বাপার কি রে হ'রে? হাত বের কর। খার্ড ক্লাসে পড়ে স্বাধীনচেতা তরুণ হয়েচে?—বটে!...”

পুরোহিত উঠিয়া তাহার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়া বলিলেন—“আপনি একটু ঠাণ্ডা হন—রাগবার সময় নয়। ব্যাপার আমি বুঝি, সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।”

বরের নিকট আসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া প্রশ্ন করিলেন—“কি চাই তোমার বাবা, বল দিকিন আমার?”

কোন উত্তর হইল না। আর একটু অপেক্ষা করিয়া

বলিলেন—“বল, খণ্ডের কাছে ত চাইবেই। আমারও এই রকম পণ ক'র ব'সছিলাম, এতে লজ্জা কি?...সাইকেল চাই?—নগদ টাকা?—হাওয়াই বদুক?...”

বর জড়িত কণ্ঠে কি একটা বলিল।—বেশ ভালরকম বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন—“স্পষ্ট ক'রে বল, কিছু লজ্জা নেই।”

বাড়ির মধ্যে একটা খড়্কে পড়লে আওয়াজটা শোনা যায়। এই নিম্নকতার মধ্যে পুরোহিত-ঠাকুর এক রকম চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—“অঁ, কি ব'ললে—শামলী বাছুর!!”

নিম্নকতা সেই রকমই রহিল, কেহ বেন কথাটা স্বয়ংস্ব করিতে পারে নাই। একটা মুহূর্ত,—তাহার পর জগবন্ধু অগ্রসর হইয়া নাকমুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—
“হারামজাদা! মানুষের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দোব ব'লে নিয়ে এলাম, আর ভদরলোক তোকে এখন নই-বাছুর সম্প্রদান করবেন?...বের কর হাত, নয়ত তুই আছিন কি আমি আছি—করলি বের?”

হরিহর আস্তে আস্তে হাতটা বাহির করিল, মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতেই রহিয়াছে, একটু একটু কাঁপিতেছে। হুগার বাপ ব্যাপারটার আকস্মিকতায় এতক্ষণ বিমুগ্ধভাবে বসিয়াছিলেন, এইবার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, বাম হাতটা হরিহরের পিঠে রাখিয়া নমনে কহিলেন—“ওতো ছোট বাছুর বাবা, তোমায় আমি ভাল একজোড়া বিলিভী গাই-বাছুর কিনে দোব এই হাটেই। নাও হাত ধোল, লক্ষী আমার।...”

জগবন্ধু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন “না, না, ওরকম আঁকারা দেবেন না বেইমশাই, ওতে আমার বদনাম, ছেলে পণ ক'রে দুখ খাবার জন্তে গাইবাছুর নিয়ে যাবে, লোকে বলবে...”

বরপক্ষের একজন রসিক বন্ধু কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—“লোকে বলবে বাপ-বেটার মিলে খণ্ডকে ছুঁতে।”

যাহারা বুঝিল তাহাদের মধ্যে হাসি পড়িয়া গেল। হুগার বাপ একটু লজ্জিত হইলেন। জগবন্ধুর মাধার তাহার নিজস্ব পদ্ধতিতে তর্ক জাগিয়া উঠিতেছিল; বলিলেন—

“একটু থামুন পুরুষশাই, এর গোড়া এইখানেই মেরে দিতে হবে। দিবা এক মতলব বের ক’রেচে ত!— আজ বিয়ে করতে ব’সে পণ, এর পর খন্তরবাড়ি আহারে ব’সে পণ, তারপর বৌমাকে বাড়ি নিয়ে আসবার সময় পণ, প্রত্যেক বারেই খন্তর-শাওড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে এটা-ওটা-সেটা হাতান! আমি কোথায় শঙ্ক-আইন বাঁচাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে গেলাম, ছেলে আমার ভাবছেন—বাঃ, এত খাসা এক রোজগারের পথ বের হ’ল!—কোন মুখা আর লেখাপড়া করে, এই বাবসাই চালান যাক!...বলি, তোকে কে এ হৃদিস বাৎসে দিলে রা? তুই শামলী বাছুরের নামই বা জানলি কেমন ক’রে? বল, তোর বাবসার গোড়াপত্তনই আমি গণেশ ওলটাব...”

বাপের মুঠার মধ্যে সুখার হাতখানিও কাঁপিয়া উঠিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কচি বরবধুর প্রতি দগা-পরবশ হইয়া সুখার বাপ বলিলেন,—থাক বেইমশাই; ছেলেমানুষ একটা কথা ব’লে ফেলেচে...”

জগবন্ধু কড়া-খাতের লোক, নিরস্ত করা গেল না। অনেক বকাবকি জেদাজেদির পর হরিহর মাথা তুলিয়া একবার গুরোহিতের পানে আড়ে চাহিল। তিনি উদ্বেগটা বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখের কাছে কান লইয়া গেলেন, তাহার পর বিশ্বয়ের বোঁকে প্রায় হাতখানেক সরিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন—“সে কি!—ক’নে ব’লেচে!!...নিমাই কি করেছিল?—চিঠি দিয়ে এসেছিল?”

আরও ধমক-ধামক করার পর চিঠিটার সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি যে ছেলেকে টিপিয়া এই পণ করান নাই সর্বসমক্ষে এটা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করাইবার জন্য জগবন্ধু তখনই বাড়িতে লোক ছুটাইলেন। হরিহরের নির্দেশ-মত সে তাহার ভূগোলের পাতার মধ্য হইতে দলিলখানি সংগ্রহ করিয়া আনিল। লেখা আছে—

প্রণাম! বহব নিবেদন মিদং কার্যকাণে। তোমার সহিত আমার বিয়ে ঠিক হইয়াছে। আমি খুব ভাগ্যবান, কিন্তু শামল স্বামীকে ছাড়িয়া থাকতে পারব না। অতএব মহাশয় বিয়ের সময় শামলী চাই বলিয়া বেকে বসবেন। না হইলে আমি আপিম খাইয়া মরিব। আপিম আমার সারির জাঁচলেই বহিত থাকিবে মোটা গেরো তুমি দেখিতে পাইবে। এতে দোস হয় না। নেতাপিসিদের বরও সেদিন একটা স্বার লালচৈম চাই ব’লে বেকে বসেছিল। নিয়ে ছাড়িল। মা বলেন জিনই পুরুষের লক্ষন। এ নিমাই। নিমাই আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। এ চিঠি লিখে দিচ্ছে। আমি অবলা নারি লেখাপড়া জানি না শামলী ছাড়া হইয়া থাকিতে হইত। নিমাই ভয়ঙ্কর বিদ্যান আর খুব ভাল ছেলে তোমাদের ইন্সুলে 6th Class পড়ে। প্রণাম জানিহ।

ইতি

অভাগিনি

Sudha

সুধাময়ী দাসী

‘ভয়ঙ্কর বিদ্যান’টির, হাজার খোঁজাখুঁজি করিয়াও সে-রাত্রে বিয়ে-বাড়িতে কোন সন্ধানই মিলিল না। শাড়ীতে একটি বড়গোছের গেরো পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সুখের বিষয় তাহাতে একটি বড় মার্কেল ভিন্ন অল্প কিছু ‘বহিত’ ছিল না।

ভারি জল

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

শতবর্ষেরও কিছু আগেকার কথা।

রাসায়নিক পকাশ-যাটটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, তামা, সোনা, সীসা পারদ প্রভৃতি। তিনি দেখিলেন বস্তুমাত্রই হয় এই মৌলিক পদার্থ—না-হয় দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের মিলনে উদ্ভূত; একটি মৌলিক পদার্থকে যদি ক্রমাগত ভাঙিতে থাকে যায় ত শেষ অবধি উহা এমন অবস্থায় পৌঁছায় যখন আর উগঠকে ভাঙা চলে না; দৃষ্টির অগোচর অবিভাজ্য এই পদার্থ-কণিকার নাম দিলেন ‘এটম’; মৌলিক পদার্থের এটম-রা প্রায়ই দুইটা করিয়া জোটে বাঁধিয়া থাকে, তাহাদের নাম দওয়া হইল ‘মলিকিউল’; একটি হাইড্রোজেন এটম পরীক্ষা হাঙ্গা, তাহার তুলনায় অক্সিজেন এটমের ওজন নিক্রপিত হইতে লাগিল; হাইড্রোজেনকে এক ধরিলে একটি কার্বন এটমের ওজন দাঁড়াইল ১২, অক্সিজেনের ১৬, এই রকম সব।

চিরদিনই মানবের মন বহর মধ্যে একের সম্বন্ধে হুটিয়াছে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রাউট এই সময় বলিলেন যে পৃথিবীর মূলে আছে একটি এবং কেবল মাত্র একটি মৌলিক পদার্থ, সে হইল এই হাইড্রোজেন; এ যে কার্বন এটম, হাইড্রোজেন এটমের তুলনায় যাহা ১২ গুণ ভারি, তাহা আর কিছু নয় ১২টি হাইড্রোজেন এটম জোট পাকিয়া এ একটি কার্বন এটমে দাঁড়াইয়াছে; সেই রূপ অক্সিজেন এটম প্রভৃতি। কিন্তু গোল বাধিল এ প্রভৃতিদের লইয়া; কার্বন, অক্সিজেন ইহা এক-কথা না-হয় মানিয়া লওয়া গেল, কিন্তু দেখা গেল একটি ক্লোরিন এটমের ওজন হাইড্রোজেন এটমের ঠিক পয়ত্রিশ গুণও নয়, ছত্রিশ গুণও নয়, হাজার মাঝামাঝি। প্রাউট তখন একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডের মূল হইল একটি পুরাতন, আধখানা হাইড্রোজেন এটম। কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। রাসায়নিকের পরীক্ষা স্মৃতির হইতে লাগিল;

দেখা গেল একটি ক্লোরিন এটমের ওজন ঠিক সাড়ে পয়ত্রিশ নয়, পয়ত্রিশ আর এটি জটিল ভগ্নাংশ। আরও অনেক মৌলিক পদার্থের আণবিক ওজনে বড় বড় ভগ্নাংশ দেখা দিল; প্রাউট থামিয়া গেলেন।

এই সময়ই সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাল্টন এটম সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিলেন। একটি মৌলিক পদার্থ ভাঙিয়া যে কোটি কোটি এটম পাওয়া যায় তাহারাই হুবহু এক—আকারে, ওজনে, গুণাবলীতে; কিন্তু এক মৌলিক পদার্থের এটম আর এক মৌলিক পদার্থের এটম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; রাসায়নিক সংযোগ যখন ঘটে তখন এই এটমদের মধ্যেই ঘটনা থাকে। প্রাউটের মত পরিতাপ্ত হইল, কিন্তু শতবর্ষ চলিয়া গেল, ডাল্টনের এই সিদ্ধান্ত অটল ও অটুট রহিল; দেখা গেল, এমন কোন রাসায়নিক মিলন ঘটে না যাহাতে ডাল্টনের এই সব সিদ্ধান্ত ভাঙিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে এই এটম সম্বন্ধে আরও অনেক খবর জানা গেল; থানিকটা মৌলিক পদার্থে কতগুলি এটম আছে, উহাদের প্রত্যেকের ওজন কত এ-সব নির্ণীত হইল।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব অবধি এটম সম্বন্ধে এই ছিল শেষ কথা। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষের দিকে পদার্থের গঠন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের পূর্ব ধারণা যে ভীষণ ধাক্কা খাইল তাহা এক করাসী বৈজ্ঞানিকের কথায় বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। অধ্যাপক জে, জে, টমসন রয়াল সোসাইটির বক্তৃতাগৃহে পদার্থের গঠন সম্বন্ধে নূতন তথ্যের কথা বলিতেছিলেন। বক্তৃতাশেষে সভায় উপস্থিত ঐ করাসী বৈজ্ঞানিক তাহার কোন বক্তৃকে বলেন—ভায়া হে, বিজ্ঞান জ্ঞান না বলে তোমার অবস্থা আমার চেয়ে ঢের ভাল, কারণ তুমি যদি বিজ্ঞান শিখতে চাও ত-গোড়া থেকে আরম্ভ কর সেই চর্চবে; কিন্তু আমাকে একেবারে ঢেলে সাজেতে হবে; এক দফায় বা জানি তা তুলতে হবে, তার পর নতুন করে আরম্ভ।

যে ঘটনাবলী দ্বারা বৈজ্ঞানিকের পূর্ক ধারণার আমূল পরিবর্তন হইল তাহার সাক্ষি বিবরণ এই—

একটি কাঁচের গোলক প্রায় বায়ুশূন্য করিয়া তাহার মধ্যে তড়িৎ চালাইয়া জে, জে, টমসন এই গোলকমধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র কণিকার সন্ধান পাইলেন যাহারা এটম অপেক্ষাও ছোট; এই ক্ষুদ্র কণিকার নাম দেওয়া হইল 'ইলেকট্রন'। বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে এই ইলেকট্রনের গুণন মাপা হইল; দেখা গেল এই ইলেকট্রনের গুণন, সব-চেয়ে হাল্কা যে হাইড্রোজেন এটম, সেই হাইড্রোজেন এটমের ১৮৪০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। একটি সোনার এটম একটি সীসার এটম হইতে পৃথক, কিন্তু দেখা গেল যে এই ইলেকট্রন—তা সে সোনা, সীসা বা যেকোন পদার্থ হইতে আঁহক না কেন—ইহারা ছব্ব এক। এই ইলেকট্রন সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা চলিতে লাগিল, জানা গেল যে প্রতি ইলেকট্রন তড়িৎশূন্য এবং সেই তড়িৎ বিযোগ-তড়িৎ। আরও দেখা গেল যে নানান প্রক্রিয়ায় পদার্থ হইতে ইলেকট্রন বাহির করা যায়; খুব বেশী কিছু নয়, খানিকটা গরম করিলেই পদার্থ হইতে ইলেকট্রন বাহির হইতে থাকে।

সুতরাং দাঁড়াইল এই, পদার্থকে ভাঙিতে ভাঙিতে এটমে পৌঁছান যায়, কিন্তু এটমকে ভাঙা যায় না—ডালটনের এ মত আর টিকিল না; এটম হইতে পাওয়া গেল ইলেকট্রন, এটমের তুলনায় খুব ছোট ও হাল্কা; তাহার পর যেরকমের বাড়ি হটক না কেন ভাঙিলে যেমন পাওয়া যায় একই রকমের কতকগুলি ইট, তেমনি যে-এটমই হটক না কেন, তাকে ভাঙিলে পাওয়া যাইবে একই রকমের ইলেকট্রন। একটা বাড়ি আর একটা বাড়ি হইতে অবশ্য তফাৎ, কারণ ইটের সংখ্যা সমান নয় আর সাজানোর ধারাও পৃথক; সেই রকম একটা এটম আর একটা এটম হইতে পৃথক, কারণ উভয়ের ইলেকট্রনগুলির সংখ্যাও সাজান সমান নয়। কিন্তু একটা সোলের কথা দাঁড়াইল। এটম-রা তড়িৎশূণ্য অথচ এটমের উপাদান ইলেকট্রন হইল বিযোগ-তড়িৎশূন্য। অতএব এটমের মধ্যে আছে আরও কিছু বাহাতে আছে লবণসিমাণ সংযোগ-তড়িৎ। কোথায় কি ভাবে আছে এই সংযোগ-তড়িৎ? জে, জে, টমসন বলিলেন, একখানা কেকের মধ্যে যেমন কিসমিস ছড়াইয়া থাকে সেই রকম

খানিকটা সংযোগ-তড়িৎের মধ্যে বিযোগ-তড়িৎশূন্য ইলেকট্রনরা ছড়াইয়া আছে। জে, জে, টমসনের এ-মত কিছু টিকিল না; শেষ অবধি জয়যুক্ত হইল রদারফোর্ডের সিদ্ধান্ত। রদারফোর্ড বলিলেন যে এই এটম একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎসদৃশ; সূর্যকে বেটন করিয়া যেমন পৃথিবী আদি গ্রহগণ ঘুরিতেছে, তেমনি কেন্দ্রস্থিত সংযোগ-তড়িৎকে বেটন করিয়া ইলেকট্রনরা ঘুরিতেছে। সংযোগ-তড়িৎশূন্য এই কেন্দ্রীয় অংশের নাম দেওয়া হইল প্রোটন। রদারফোর্ডের এই তথ্য নানান দিক দিয়া নানান রকমে যাচাই হইতে লাগিল এবং সব পরীক্ষা হইতে রদারফোর্ডের মতই প্রতিষ্ঠিত হইল। চোখে দেখা যায় না যে ক্ষুদ্র একটি এটম সেই এটমের ভিতরের অনেক খবর বিজ্ঞান টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। সে-সব কথা যাক; এখন বিভিন্ন এটমের গঠন এইরূপ দাঁড়াইল। প্রত্যেক এটমে যতগুলি ইলেকট্রন আছে—নিশ্চয় ততগুলিই প্রোটন আছে, যেহেতু এটম-রা তড়িৎশূন্য। হাইড্রোজেনে আছে এক জোড় ইলেকট্রন-প্রোটন, হিলিয়মে চারি জোড়, অক্সিজেনে ষোল জোড়, এবং সব চেয়ে ভারি যে ইউরেনিয়ম এটম তাহাতে ২৩৮ জোড়। এইরূপ হিসাব যদি হয় ত ঘুরিয়া ফিরিয়া শতাধিক বর্ষের পূর্বের প্রাউটের কথাই ত আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে হাইড্রোজেন এটমের গুণন এক ধরিলে অল্প কোন এটমের আণবিক গুণনে কোন ভ্রাংশ থাকিতে পারে না। থাকিতে পারে না, কিন্তু আছে যে! আগেকার ক্লোরিনের কথাই ধরা বাড়ুক। ক্লোরিনে আছে হয় ৩৫ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটন, না-হয় ৩৬ জোড়, সাড়ে ৩৫ বা পোনে ৩৬ বা কোন ভাঙোচোরা জোড় ত হইতে পারে না; এখন ৩৫ জোড় যদি থাকে ত উহার আণবিক গুণন হইবে ৩৫, আর ৩৬ জোড় থাকিলে গুণন হইবে ৩৬; কিন্তু রাসায়নিক দেখিয়াছেন উহা ৩৫ও নয়, ৩৬ও নয়, ৩৫ আর একটি জটিল ভ্রাংশ। প্রাউট যাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই এখন সেই সমস্যাই ত অমীমাংসিত ভাবে উপস্থিত। কিন্তু এবার একটা মীমাংসা হইল, সুনিশ্চিত ভাবেই হইল। ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরূপ।

মনে করা বাড়ুক একটি কাঁচের গেলেকে খুব অল্প পরিমাণ একটু গ্যাস আছে; সে গ্যাসটার নাম আমরা জানি না।

তবে তাহার প্রতি এটম ৩৫ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটন লইয়া গঠিত; এই গোলকের মাঝখান হইতে একদিকে খুব বেশী ভোল্টের তড়িৎ পাঠান হইতে লাগিল; গোলকস্থিত ঐ গ্যাসের একটি এটমের কথা ভাষা যাউক; উহা হইতে একটি ইলেকট্রন খসিল এবং খসিয়া গোলকের একদিকে ছুটিতে লাগিল। বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত একটি ইলেকট্রন খসিয়া যাওয়ায় ঐ ভাঙা এটম এখন সংযোগ-তড়িৎযুক্ত হইল এবং ইহাও ছুটিতে লাগিল, বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন যে-পথে যাইতেছিল তাহার ঠিক উল্টা পথে; এই পথের ধারে রাখা হইল প্রভূত শক্তি-সম্পন্ন একটি চুম্বক এবং তড়িৎযুক্ত একটি শলাকা। সংযোগ-তড়িৎযুক্ত এটমটি ঝাঁকিয়া গিয়া একধানা আলোকচিত্র কাঁচের উপর পড়িয়া একটি রেখা অঙ্কিত করিল। এই এটমটি যাইতে যাইতে যে ঝাঁকিল সেই ঝাঁকার পরিমাণ নির্ভর করে ঐ চুম্বক এবং তড়িৎের শক্তির উপর—তা ছাড়া ঐ এটমটির গুরুত্বের উপরও; স্মরণ করিয়া রাখা যাউক এই এটমটি একটি ইলেকট্রনবিহীন ৩৫ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটনের সমষ্টি। এইবার ঐ গোলকমধ্যে দেওয়া হইল আর একটি গ্যাস যাহার প্রতি এটমে আছে ৩৬ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটন। এর প্রতি এটমও এক-একটি ইলেকট্রন হারাইয়া ইলেকট্রনের বিপরীত পথে ছুটিতে লাগিল, ছুটিয়া পূর্বকার ঐ চুম্বক ও তড়িৎের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে ঝাঁকিল এবং আলোকচিত্র কাঁচের উপর রেখা আঁকিল—কিন্তু ঠিক আগেকার জায়গায় নয়, একটু তফাতে; কারণ আমাদের মনে রাখিতে হইবে এই ঝাঁকা নির্ভর করে গুরুত্বের উপরে, আর এই এটম গুরুত্ব আগেকার এটম অপেক্ষা ভারি এক জোড়ে। এইবার যদি ঐ গোলকের মধ্যে ৩৭ জোড়ওয়াল ও ৩৬ জোড়ওয়াল এই দুই রকমের এটম মিশাইয়া দিয়া পরীক্ষা করা যায় তাহা হইলে ঐ আলোকচিত্রে আমরা পাইব দুইটি রেখা, একটি ঐ ৩৫এর জন্য অপরটি ৩৬এর জন্য। রেখা দুইটির কালিমা যদি সমান হয় ত বুঝিতে হইবে ঐ দুই রকমের এটম গোলক-মধ্যে সমপরিমাণে ছিল। কালিমা যদি সমান না হয় ত উহার বিভিন্নতা হইতে উহাদের আপেক্ষিক পরিমাণ ঠিক করা যাইতে পারে।

এখন ঐ গোলকমধ্যে বিস্কৃত ক্লোরিন গ্যাস দিয়া দেখা

গেল আলোকচিত্রে দাগ পড়িয়াছে একটি নয়, দুইটি—একটি ৩৫এর জায়গায় এবং অপরটি ৩৬এর জায়গায়। তাহা হইলে ত বলিতে হইবে ঐ বিস্কৃত ক্লোরিন গ্যাস, ডালটনের সময় হইতে যাহার এটমগুলিকে হবহ এক বলিয়া আসিতে-ছিলাম, বাস্তবিক তাহারা ত হবহ এক নয়; রাসায়নিক গুণাবলী তাহাদের সমান হইতে পারে, কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব, গঠনে তাহারা ত একেবারে সমান নয়। একদল আছে তাহারা ৩৫ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটনের সমষ্টি আর একদল ৩৬ জোড়ের। ক্লোরিন একটি মৌলিক পদার্থ, কিন্তু দেখিতেছি মৌলিক পদার্থ হইলেই ত তাহার সব এটম সর্ববিষয়ে সমান নয়। আলোকচিত্রে রেখাগুলোর কালিমার তারতম্য অল্পস্বল্পে কি অল্পপাতে এই দুই জাতীয় এটম আছে তাহার হিসাব করা হইল এবং এই হিসাব হইতে সমস্ত গ্যাসটার যে গড় আণবিক ওজন নিরূপিত হইল, তাহা রাসায়নিকের হৃদয় নিরূপণের সহিত একেবারে মিলিয়া গেল। বহুকালের একটি সমস্তার সমাধান হইল। যে বিভিন্ন দলের এটমকে রাসায়নিক তাহার গুণাবলী দেখিয়া হবহ এক বলিতেছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলা হইল এবং দেখা গেল রাসায়নিক ধর্ম তাহাদের সমান হইলেও গুরুত্ব তাহারা এক নয়। অন্তান্ত মৌলিক পদার্থের উপরও এই পরীক্ষা চলিতে লাগিল, জানা গেল বহু মৌলিক পদার্থ আছে যাহারা দুই বা ততোধিক বিভিন্ন প্রকারের এটম লইয়া গঠিত। পারদের আণবিক ওজন হইল ২০০.৬; দেখা গেল পারদে আছে ৬ রকমের বিভিন্ন এটম; তাহাদের ওজন যথাক্রমে ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০২ এবং ২০৪, যদিও রাসায়নিক গুণাবলীতে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

বিভিন্ন ওজনের এটম বাছাই করা এই যে যন্ত্র, বৈজ্ঞানিক এসটনের হাতে দিন-দিন এই যন্ত্রের উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল; এখন উহা এইরূপ ঠাঁড়াইয়াছে যে ১০০০০ হাজারের এক রকম ও আর এক রকমের এক—এই অল্পপাতেও যদি দুই রকমের এটম থাকে ত তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই যন্ত্রে পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা গেল যে অক্সিজেনেরও দুই জুড়িদার আছে; ১৬

অক্সিজেনের সঙ্গে আছে ১৭ ও ১৮ ওহালা অক্সিজেন, ৮০০০ হাজারটি ১৬ অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া আছে ২টি ১৭ ও ১৮ অক্সিজেন এই অস্থাপাতে।

অক্সিজেনের আণবিক ওজন ১৬ ধরিলে হাইড্রোজেনের দাঁড়ায় ১০০৭৭। অক্সিজেন ঠিক ১৬ গুণ না হইয়া এই যে সামান্য একটু তফাৎ হয় তাহার স্বাভাবিক কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। সে কথা যাক, এখন অক্সিজেনের ১৭, ১৮ জুড়িয়ার বাহির হওয়ায় হাইড্রোজেনের কোন সঙ্গী আছে কিনা খোঁজ পড়িল। খোঁজ মিলিল। দেখা গেল সাধারণ হাইড্রোজেনের সঙ্গে আছে আর এক রকমের হাইড্রোজেন যাহার আণবিক ওজন হইল ২.০১৩৬ এবং ইহার আছে সাড়ে ছয় হাজারে এক, এই অস্থাপাতে। একটি হাইড্রোজেন মলিকিউল অপেক্ষা এই নূতন হাইড্রোজেন ওজনে অল্প কিছু কম। ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা বলিলেন যে নবজাত শিশুর নামকরণ তাহার জনকই করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহার আবিষ্কারক, আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরাই ইহার নাম দিন। তাঁহারা বলিলেন ইহা এখন সমস্ত বৈজ্ঞানিকের সম্পত্তি - তাঁহারা সকলে মিলিয়া ইহার নাম ঠিক করুন। বিভিন্ন নাম আসিতে লাগিল, দেখা যাইতেছে 'নাসৌ মুনির্দস্য যতং ন ভিন্নম্।' যত দিন চূড়ান্ত ভাবে কিছু নিষ্পত্তি না হয় তত দিন ইহা 'ভারি হাইড্রোজেন' নামে আখ্যাত হইতেছে।

সমস্ত জিনিষটার অন্য দিক দিয়া যাচাই হইল। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বর্ণচ্ছত্র বিভিন্ন; এই বর্ণচ্ছত্র দিয়া অনেক সময় অনেক স্বভাবত পদার্থকে চেনা গিয়াছে। আচ্ছা, ৩৫ ক্লোরিন আর ৩৬ ক্লোরিন ইহার ত সমস্ত সমস্তই বিভিন্ন পদার্থ, সুতরাং ইহাদের বর্ণচ্ছত্র ত বিভিন্ন হওয়া উচিত; উচিত হইবে, কিন্তু এই বিভিন্নতা এত অল্প যে বর্ণচ্ছত্র মাপিবার যন্ত্রে ধরা পড়িবার কথা নয়। কিন্তু এই কয়েক বৎসরে এই যন্ত্র এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে ইহাতে অতি অল্প তফাৎও ধরা পড়িতেছে। এই যন্ত্রসাহায্যে এই হাইড্রোজেনের জুড়িয়ারেরও সন্ধান হইল; সাক্ষাৎ মিলিল এবং এই উপায়ে তাহার যে আণবিক ওজন নিরূপিত হইল তাহা পূর্বকালের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া গেল।

দেখা যখন মিলিল তখন বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া

দ্বারা এই ভারি হাইড্রোজেনকে তফাৎ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল; তরল হাইড্রোজেন লইয়া পরীক্ষা হইতে লাগিল এবং শেষ অবধি সফলতা আসিল। এই ভারি হাইড্রোজেনকে অক্সিজেনের সহিত মিশাইয়া পাওয়া গেল যে জল, সাধারণ জলের সঙ্গে তাহা মিলিল না, আর মিলিবার কথাও নয়। দেখা গেল এই ভারি জল জমে সেটিগ্রাডের ০°তে নয় - ৩.৮°এ, বাষ্পে পরিণত হয় ১০১.৪২°এ এবং ইহার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী হয় ৪°এ নয় ১১.৬°এ। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদিগের চেষ্টায় এই 'ভারি জল' এখন এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে যে ইহা লইয়া এখন সহজেই বিভিন্ন রাসায়নিক ও অন্তর্বিধ পরীক্ষা করিবার উপায় হইয়াছে; প্রচুর মানে অবশ্য ঘড়া ঘড়া নয়, একসঙ্গে ২০২৫ গি, গি, সংগৃহীত হইতেছে। উদ্ভিদসঙ্গে ও প্রাণী-দেহে এই ভারি জলের ক্রিয়া কিরূপ তাহা লইয়া নানাবিধ প্ৰবেষণ চলিতেছে এবং সাধারণ হাইড্রোজেনযুক্ত যৌগিক পদার্থে এই ভারি হাইড্রোজেন আসিলে তাহাদের গঠন গুণাবলী কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা লইয়া আলোচনা শুরু হইয়াছে। রসায়নশাস্ত্রে এই ভারি হাইড্রোজেন এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

পদার্থবিজ্ঞানেও ইহা এক অমূল্য সম্পদরূপে দেখা দিয়াছে। কিছু দিন হইতে এটমকে ভাঙিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে রদারফোর্ড প্রথম নাইট্রোজেন এটমকে ভাঙিলেন; ভাঙিলেন রেডিয়ম হইতে নির্গত আলফা-রশ্মির সাহায্যে। কিন্তু পৃথিবীতে রেডিয়ম আছেই বা কতটুকু এবং তাহা হইতে আলফা-রশ্মি বাহির হইতেছেই বা কি পরিমাণে? সুতরাং পদার্থকে ভাঙিতে হইলে যদি শুধু আলফা-রশ্মির উপর নির্ভর করিতে হয় ত এই ভাঙার পরিমাণ কতটুকুই বা হইবে! আলফা-রশ্মি ব্যতীত অন্য কোন প্রচণ্ড শক্তি দিয়া এই ভাঙনক্রিয়া সম্পাদন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। দুই বৎসর পূর্বে ক্যাডমিয়াম ল্যাবরেটরিতে ককক্রকট ও ওয়ালটন প্রোটনকে খুব বেশী ভোল্টের তড়িৎ দ্বারা শক্তিশালী করিয়া লিথিয়ামকে ভাঙিলেন। এর পর প্রোটন ছাড়িয়া লাগান হইল নিউট্রন; শেষ অবধি দেখা গেল যে এই ভারি হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরী, আর এই ভারি হাইড্রোজেন স্ফ্রাপ্য না

হইলেও একেবারে দুঃস্থাপ্য নয়। সুতরাং পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারেও এই ভারি হাইড্রোজেনের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

স্বর্ধের অভ্যন্তরে হিলিয়ম নামক একটি নতুন গ্যাসের যখন সন্ধান পাওয়া যায় তখন কি কেহ ভাবিয়াছিল যে এই হিলিয়মই উডোজাহাজকে নিরাপদ করিবে? পোলাণ্ডবাসী একটি মহিলা যখন রেডিয়মের অধেষণে বাহির হন তখন এই রেডিয়ম যে ক্যানসারের চিকিৎসায় লাগিতে পারে এ-কথা কি কাহারও মনে আসিয়াছিল? রয়াল ইন্সটিটিউশনে রাসায়নিক বিশ্লেষণ লইয়া যখন ডেভি পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন কেহ বলিয়াও আনেন নাই যে এই পরীক্ষাই প্রচুর পরিমাণে সস্তায় বিভিন্ন ধাতু পাইবার সূচনা করিয়া দিতেছে। ব্যাঙ লইয়া গ্যালভানির পরীক্ষা ত জগতে তড়িৎপ্রবাহ আনয়ন করিতেছে। আজ রেডিও যে জগৎ জুড়িয়া নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, ম্যাক্সওয়েলের কতকগুলি 'ইকোয়েশন' ত তাহার মূলে! হয়ত একদিন এই ভারি হাইড্রোজেন, ভারি জল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের এক অজ্ঞাত দিকের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়া মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে।

কিন্তু এসব কিছুই যদি না-ও করে তাহাতেই বা কি? মিলিক্যান যখন বার-বার আলোকের বেগ মাপিতেছিলেন তখন তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন ইহাতে লাভটা কি? মিলিক্যান বলেন আমি ইহাতে বড়ই আনন্দ পাই। নব

আবিষ্কারের এই আনন্দই বৈজ্ঞানিকের পরম ঈশিত—এই তাহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এই আবিষ্কার যদি জগৎবাসীর কাছে আসে ভালই, না আসিলে বৈজ্ঞানিক মুহূর্ত্তমান হইয়া পড়ে না। কিন্তু ইহাতে কি শুধু আবিষ্কারকেরই আনন্দ? এ-আনন্দে জগৎবাসীও যে যোগদান করে! আজ যদি বৈজ্ঞানিক জানিতে পারেন যে চন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়ম আছে তাহা হইলে পৃথিবীতে নিশ্চয় পেট্রোলিয়মের দাম কমিবে না, কিন্তু জনসাধারণের অবগতির জন্ত, তাহার শিক্ষার জন্ত, তাহার আনন্দের জন্ত, সংবাদপত্র বড় বড় অক্ষরে এ-সংবাদ ছাপিবে। আইনটাইন যখন বলিলেন যে এই আকাশ সমাকার নয়, বক্রাকার তখন পৃথিবীর অল্প লোকই ইহার মানে বুঝিল, ইহাতে বাজারে কোম্পানীর কাগজের দর এবং শেরারের ভিভিডেও ধেমস ছিল তেমনি রহিল কিন্তু জগৎবাসীর মন আলোড়িত হইল। আলোকের প্রকৃতি তরঙ্গ না কণিকা এ-কথা অবৈজ্ঞানিকও জানিতে চাহে, অথচ কাহার কি আসিয়া যায় 'এই তথ্য লাভে?

কোন এক মনীষী শিক্ষা কথাটার এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। শৈশবে যে কোতূহল জাগরুক হয় তাহার ক্রমপরিণতি ও তাহার অমুশীলন হইল শিক্ষা। এই কোতূহল যত দিন মানবজাতির চিত্তে জাগরুক রহিবে তত দিন বিজ্ঞানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং সভ্যতার পথে মানব দিন-দিন অগ্রসর হইবে।



দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

জ্যাঠামশায়দের বাড়ি আরও বছর দুই কেটে গেল এই ভাবেই। যত বছর কেটে যায়, এদের এখানে থাকা আমার পক্ষে বেশী কঠিন হয়ে পড়তে লাগল। আমার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জিনিষ আমি বুঝতে পারি আজকাল, আগে আগে অত বুঝতাম না। এ-বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠছিল এই জন্যে যে, আমি চেষ্টা করেও জ্যাঠাইমাদের ধর্ম ও আচারের সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পেরে উঠলাম না।

এরা খুব ঘটা ক'রে ঘেঁটা ধর্ম বলে আচরণ করেন, আমার মনের সঙ্গে সেটা ত আদৌ মেলে না—আমি মনে যা বলে, বাইরে তাই করি—কিন্তু গুঁরা তাতে চটেন। গুঁদের ধর্মের ঘেঁটা আমার ভাল লাগে—সেটাকে গুঁরা ধর্ম বলেন না।

কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েছে এই, আগে ভাবতাম শুধু জ্যাঠাইমাদের বাড়িতেই বুঝি এই রকম, এখন বয়স বাড়বার সঙ্গে বুঝতে পেরেছি—এ গ্রামের অধিকাংশই এই রকম—জ্যাঠাইমাদের একটু বেশী মাত্র।

এতেই আমার সন্দেহ হ'ল বোধহয় আমার মধ্যেই কোন দোষ আছে, যার ফলে আমি এদের দিষ্টা নিতে পারছি নে। ভাবলাম আমার যে ভাল লাগে না, সে বোধ হয় আমি বুঝতে পারিনে বলেই—হয়ত চা-বাগানে থাকার দরুন গুঁদের ধর্ম আমরা শেখবার সুযোগ পাই নি, যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছি, সেটাই এখন ভাল লাগে।

ম্যাট্রিক পাস ক'রে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হলাম। জ্যাঠামশায়দের গ্রাম আটঘরার নবীন চৌধুরী—মায় বড় ছেলে ননী ভাণ্ডারী কুটম্বল খেলত এবং যে প্রাচীরের বাধাবিহীন

না মনে বাবার সংস্কারের সময়ে দলবল জুটিয়ে এনেছিল—তারই ভগ্নপতির বাড়ি অর্থাৎ নবীন চৌধুরীর বড় মেয়ে শৈলবালার স্বস্তরবাড়ি শ্রীরামপুরে। নবীর জোগাড়যন্ত্রে তাদের স্বস্তরবাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হ'ল।

এসে দেখি এদেরও বেশ বড় সংসার, অনেক লোক। শৈলদিদির স্বামীরা ছ' ভাই, তার মধ্যে চার ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, আর একটি আমার বয়সী, কাষ্ট ইয়ারেই ভর্তি হ'ল আমার সঙ্গে। সকলের ছোট ভাই স্থলে পড়ে। শৈলদিদি বাড়ির বড়বো, আমি তাঁর দেশের লোক, সবাই আমাকে খুব আদরযত্ন করলে। এখানে কিছুদিন থাকবার পরে বুঝলাম যে, সংসারে সবাই জ্যাঠামশায়দের বাড়ির ছাঁচে গড়া নয়। চা-বাগান থেকে এসে বাংলা দেশ সত্ত্বকে যে একটা হীন ধারণা আমার হয়েছিল, সেটা এখানে দু-চার মাস থাকতে থাকতে চলে গেল। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম যে এ-বাড়ির মেয়েরা কেউ কারও বড়-একটা অধীন নয়। কোন এক জনকে সকলের ভয় ক'রে চলতে হয় না বা কোন এক জনের কথায় সকলকে উঠতে বসতে হয় না।

আমি থাকি বাইরের একটা ঘরে, কিন্তু অন্তরীনেই আমি বাড়ির ছেলে হয়ে পড়লাম। শৈলদিদি খুব ভাল, আমাকে ভাইয়ের মত দেখে। কিন্তু এত বড় সংসারের কাজকর্ম নিয়ে সে বড় ব্যস্ত থাকে—সব সময় দেখাশোনা করতে পারে না। শৈলদিদির বয়স আমার মেজকাঁকীয়ার চেয়ে কিছু ছোট হবে—তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মা। আটঘরার থাকতে খুব বেশী আলাপ ছিল না, দু-একবার জ্যাঠামশায়দের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে এসেছিল, তারপর ননী কথাটা পাড়তেই তখনি রাগী হয়ে যায় আমার এখানে রাগবার সম্বন্ধে। শৈলদিদির স্বামী তার কোন কথা কেমনে পারে না।

বাড়ির সকলের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে সর্বত্র বাই—জ্যাঠামশায়দের বাড়ির মত এটা ছ'য়ে না,

ওটা ছুঁয়ো না কেউ করে না। সব ঘরে যাই, সব বিছানাতেই বসি—সবাই আদরযত্ন করে, পছন্দ করে। এখন বয়েস হয়েছে বুঝতে পেরেচি আটঘরায় যতটা বাঁধাবাঁধি, এসব শহর-বাজারে অত নেই এদের। কষ্ট হয় মার জন্তে, সীতার জন্তে—ভারা এখনও জ্যাঠাইমার কঠিন শাসনের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে ক্রীতদাসীর মত উদয়াস্ত খাটচে। দাদার জন্তেও কষ্ট হয়। সে লেখাপড়া শিখলে না—চাকুরী করবে সংসারের হুংখুচুবে বলে—কিন্তু চাকুরী পায় না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আজ বারো টাকা মাইনের চাকুরী করে, কাল জবাব হয়ে যায়, আবার আর এক জারগায় বোল টাকা মাইনের চাকরি জোটায। এত সামান্য মাইনেতে বিশেষে খেতে পড়ে কোন মাসে পাঁচ টাকা, কোন মাসে তিন টাকার বেশী মাকে পাঠাতে পারে না, তাতে কি হুংখুচুবে? অথচ না শিখলে লেখাপড়া, না করতে পারলে কিছু।

কলেজের ছুটির পরে গঙ্গার ধারে একখানা বেঞ্চির ওপর বসে এইসব কথাই ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে ভয়ানক ইচ্ছে হয় আবার একবার চা-বাগানের দিকে যাই, আর একবার হিমালয় দেখি। কতকাল রডোডেণ্ডুন ফুল দেখি নি, পাইন-বন দেখি নি, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখি নি—সে রকম শীত আর পাইনি কোনদিন,—এদের সবাইকে দেখাতে ইচ্ছে হয় সে দেশ। জুলে যখন প্রবন্ধ লিখতে দিত, আমি হিমালয় নিয়ে লিপিতাম—আমার লেখা সকলের চেয়ে ভাল হ’ত—কারণ বাল্যের অপ্র-মাখানো সে ওক পাইনের বন, ঝর্ণা, তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা, কুয়াশা, যেখ আমার কাছে পুরনো হবে না কোন দিন, তাদের কথা লিখতে গেলে নতুনতর ভাব ও ভাষা কোথা থেকে এসে জোটে, মনে হয় আরও লিখি, এখনও সব বলা হয় নি। লেখা অপরে ভাল বললেও আমার মন তৃপ্ত হ’ত না, মনে হ’ত যা দেখেছি তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আঁকতে পারলাম না—অপরে ভাল বললে কি হবে, তারা ত আর দেখেনি?

ওপারে বারাকপুরের সাধা বাড়িগুলো যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। ঠিক যেন চা-যোগের আড়ালে ম্যানেজার সাহেবের কুঠী—লাল টালির ছাদ থাকলেই একেবারে চা-বাগান। ওই দিকে চেয়েই ত রোজ বিকেলে আমার মনে হয় বাল্যের চা-বাগানের সেই দিনগুলো।

বাড়ি ফিরে গেলাম সন্ধ্যার পরে। চাকরকে ডেকে বললাম, “লুটু আলো দিয়ে যা।” আলো দেওয়ার পরে ইঠাৎ আমার নজরে পড়ল দেওয়ালের পায়ের আমার দুটো প্রিয় ছবি, পর্কতে উপদেশানরত খৃষ্ট, আর একটা সাধু জন,—নোনা ধ’রে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ছবি দুটো সরিয়ে পুঁতচি এমন সময়ে ভবেশ এল। ভবেশ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, খুব বুদ্ধিমান ছেলে, স্কলারশিপ নিয়ে পাস করেছে—প্রথম দিনেই কলেজে এর সূত্র আলাপ হয়। ভবেশ এসেই বললে—ও কি হচ্ছে? নোনা ধ’রে যাচ্ছিল? ভালই হচ্ছিল—ও-সব ছবি রেখে লাভ ঘরে?

ভবেশের দৈনন্দিন কাজ রোজ এসে আমার কাছে খুঁটান ধর্মের নিদ্রা করা। আমাকে ও খুঁটান ধর্মের কবল থেকে উদ্ধার করে নাকি হিন্দু করবেই। আজও সে আরম্ভ করলে, বাইবেলটা নিতান্ত বাজে, আজগুবি গল্প। খুঁটান ইউরোপ এই সেদিনও রক্তে সারা ছুনিয়া ভ’লিয়ে দিলে গ্রেট ওয়ারে। কিসে তুমি ভুলেচ? রোজ যাও পিকারিং সাহেবের কাছে ধর্মের উপদেশ নিতে। ওরা ত তোমাকে খুঁটান করতে পারলে বাঁচে। তা ছাড়া আজ হিন্দুদের বলবুদ্ধি করা আমাদের সবারই কর্তব্য—এটা কি তোমার মনে হয় না?

আমি বললাম—তুমি ভুল বুঝে ভবেশ, তোমাকে এক দিনও বোঝাতে পারলাম না যে আমি খুঁটান নই; খুঁটান ধর্ম কি জিনিষ আমি জানি নে—জানবার কোঁড়ুল হয় তাই পিকারিং সাহেবের কাছে জ্ঞানতে যাই। আমি যীশুখৃষ্টের ভক্ত, তাঁকে আমি মহাপুরুষ ব’লে মনে করি। তাঁর কথা আমার মনেতে ভাল লাগে। তাঁর জীবন আমাকে মুগ্ধ করে। এতে বোধ কিসের আমি ত বৃষ্টি নে।

—ও বটে! বুদ্ধ, চৈতন্য, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ এরা সব ভেসে গেলেন—যীশুখৃষ্ট হ’ল তোমার দেবতা! এরা কিসে ছোট তোমার যীশুর কাছে জিজ্ঞেস করি?

—কে বলেচে তাঁরা ছোট? ছোট কি বড় সে কথা উঠচে ত না এখানে? আমি তাঁদের কথা বেশী জানি নে। যতটুকু জানি তাতে তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এও ত হয় কেউ এক জনকে বেশী ভালবাসে, আর এক জনকে কম ভালবাসে?

—তুমি যতই রোযাও-জিতেন, আমার ও ভাল লাগে না।

দেশের মাটির সঙ্গে যোগ নেই ওর। তোমার মত চমৎকার ছেলে যে কেন বিপথে পা দিলে, ভেবে ঠিক করতে পারি নে। তোমার লজ্জা করে না একথা বলতে যে, তুমি রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের কথা কিছু জান না, তাঁদের কথা জানতে আগ্রহও দেখাও না, অথচ রোজ যাও বীণথুঃটির বিষয় শুনতে? একশো বার বলবো তুমি বিপথে পা দিয়ে দাঁড়িয়েচ। কই, একদিন গীতা পড়েচ? অথচ গম্ভীর পড়তে যাও পিকারিঙের কাছে—তোমাকে বন্ধু বলি তাই কষ্ট হয়, নইলে তুমি উচ্ছন্ন যাও না, আমি বলতে যাব কেন?

ভবেশ চলে গেলে আমার মনে হ'ল ও যা ব'লে গেল তা জ্যাঠাইমা আমাকে যা বলতেন তার সঙ্গে মূলতঃ এক। ভবেশ আমাকে স্নেহ করে ব'লে হৃদয়হীন ভাবায় বলে নি জ্যাঠাইমার মত। কিন্তু আমি যা করছি তা যে খুব ভাল কাজ নয় একথা ভবেশ বলেচ।

অনেক রাত পৃথক কথাটা ভাবলাম। হিন্দুর ছেলের পক্ষে বীণথুঃটিকে ভক্তি করাও পাপ। শ্রীরামপুরে এসে আমার একটা হুবিধে হয়েছে এখানে থুঃথুঃয়ের অনেক বই আছে, থিওলজির কলেজ রয়েছে, পিকারিঙের কাছে যাই ও সব সম্বন্ধ জানতে। পিকারিং আমাকে খুঁটান হ'তে বলেচ। কিন্তু খুঁটান ধর্মের অমুষ্ঠানের দিকটা এখানে এসে দেখেছি, তার দিকে আমার মন আকৃষ্ট হয় নি। কিন্তু থুঃটিকে আমি ভক্তি করি, থুঃটের কথা বলতে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে। এতে দোষ আছে কিছু? মহাপুরুষের কি দেশ-বিদেশ আছে?

রাজে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি আর সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েচে—ছোট বউ অর্থাৎ শৈলদিদির ছোট কায়ের রান্নার পালা ছিল এবেলা—তিনি হাঁড়িকুড়ি নিয়ে বসে আছেন। আমি খেতে বসলাম কিন্তু কেমন অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল—শৈলদিদির এই ছোট-জাকে আমি কি জানি কেন পছন্দ করিনে। মেজ বউ, সেজ বউকে যেমন মেজদি, সেজদি ব'লে ডাকি—ছোটবউকে আমি এপর্যন্ত কোন কিছু ব'লে ডাকি নি। অথচ তিনি আমার সামনে ঘেরোন বা আমার সঙ্গে কথা বলেন। ছোটবউয়ের বয়স আমার সমান হবে, এই সন্তেরো আঠাঠো—আমি যদিও 'আপনি' বলে কথা বলি। বাড়ির সব মেয়েরা ও বোয়েরা জানে যে ছোটবউয়ের সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব নেই।

কেন আমি তাঁকে ছোটদিদি ব'লে ডাকি নে, শৈলদি আমার এ নিয়ে কতবার বলেচে। কিন্তু আমার যা ভাল লাগে না, তা আমি কখনও করিনে।

সেদিন এক ব্যাপার হয়েছে। খেয়ে উঠে অভ্যাসমত পান চেয়েছি—কাউকে বিশেষ করে সন্ধান ক'রে নয়, যেন দেয়ালকে বলচি এই ভাবে। ছোটবউ আধ-ঘোমটা দিয়ে এসে পান আমার হাতে দিতে গেলেন—আমার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হ'ল, কেন জানি নে, অস্ত্র কাঁধের বেলা আমার ত এমন অস্বস্তি বোধ হয় না? পান দেবার সময় তাঁর আঙ্গুলটা আমার হাতে সামান্য ঠেকে গেল—আমি তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলাম। আমার সারা গা কেমন শিউরে উঠল, লজ্জা ও অস্বস্তিতে মনে হ'ল পান আর কখনও এমন ভাবে চাইব না। মেজদি কি শৈলদির কাছে গিয়ে চেয়ে নেবো।

সেই দিন থেকে ছোট বউকে আমি এড়িয়ে চলি।

২

মাস-কতক কেটে গেল। শীত পড়ে গিয়েচে।

আমি দোতলার ছাদে একটা নিরিবিলি জায়গায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে জামিতির জাঁক কষ'ছি।

সেজদি হাসতে হাসতে ছাদে এসে বললেন—জিহু এস তোমায় গুণা ডাকছে। আমি বললুম—কে ডাকচে সেজদি? সেজদির মুখ দেখে মনে হ'ল একটা কি মজা আছে। উৎসাহ ও কৌতূহলের সঙ্গে পেছনে পেছনে গেলাম। দোতলার গুদিকের বারান্দাতে সব মেয়েরা জড়ো হয়ে হাসাহাসি করচে। আমার সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল, বললে—এস ঘরের মধ্যে। তাদের পেছনে ঘরে ঢুকতেই সেজদি বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই লেপটা তোলা ত দেখি কেমন বাহাদুরি? বিছানামাটার উপর আগাগোড়া লেপ-ঢাকা কে এক জন শুয়ে আছে লেপ মুড়ি দিয়ে। সবাই বললে—তোলা ত লেপটা!

আমিও হাসিমুখে বললাম—কি বলুন না সেজদি, কি হয়েছে কি?

ভাবলুম বোধ হয় শৈলদির ছোট দেওর অজ্ঞানকে এরা একটা কিছু সাজিয়েচে বা ঐ রকম কিছু। তাড়াতাড়ি লেপটা টেনে নিয়েই চমকে উঠলাম। লেপের তলায় ছোট বোঁঠাকরণ যুখে হাসি টিপে চোখ বুজে শুয়ে!

সবাই থিল্ থিল্ করে হেসে উঠল। আমি লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়ে গেলাম। বা রে, এ কি কাণ্ড ওদের? কেন আমার নিয়ে এ রকম করা? তা ছাড়া—হিঃ—না ওকি কাণ্ড? ছোট বৌঠাকুরাণে স্বচ্ছায় এ বড়ঘরের মধ্যে আছেন নিশ্চয়। আমার আরও রাগ হ'ল তাঁর ওপরে।

এর দিন দুই পরে আমি আমার নিজের ঘরে একা বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ ছোট বৌঠাকুরাণেকে দোরের কাছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম—তিনি আমার ঘরে কখনও আসেন নি এ-পর্যন্ত। কিন্তু তিনি যেমনি এলেন, তেমনি চলে গেলেন, একটুও দাঁড়ালেন না। বাবার আগে ঘরের মধ্যে কি একটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলেন।

আমি বিম্মিত হয়ে তুলে দেখলাম একখানা ভাঁজকরা ছোট কাগজ—একখানা চিঠি! ছোট চিঠি, দু-কথায়—

সেদিন যা ক'রে ফেলিচি সেজ্ঞা আপনার কাছে মাপ চাই। আমি নিজের ইচ্ছেতে কিছু করি নি। দলে পড়ে করেচি। কদিন ধরে ভাবিচি আপনার কাছে মাপ চাইব—কিন্তু লজ্জায় পারি নি। আমি জানি আপনার মন অনেক বড়, আপনি ক্ষমা করবেন।

পত্রে কোনো নাম নেই। আমি সেখানা বার-বার পড়লাম—তারপর টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললাম—কিন্তু টুকরোগুলো ফেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে আমার একটা ছোট মণিবাগ ছিল, তার মধ্যে রেখে দিলাম।

সেদিন থেকে আমার কি হ'ল, আমি একা থাকলেই ছোট বৌঠাকুরাণের কথা ভাবি। কিছুতেই মন থেকে আমি তার চিন্তা তাড়াতে পারি নে। দু-পাঁচ দিন ক'রে সপ্তাহখানেক কেটে গেল। আমি বাড়ির মধ্যে তেমন আর যাই নে—অত্যন্ত ভয়, পাছে একা আছি এমন অবস্থায় ছোট বৌঠাকুরাণের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে। ছোটবোয়ের রান্নার পালার দিন আমি সকাল সকাল খেয়ে নি, যখন অনেক লোক রান্নাঘরে থাকে। যা যখন দরকার হয়, শৈলদি কি সেজদির কাছে চাই—ওদের গলা না শুনতে পেলো বাড়ির মধ্যে যেতে সাহস হয় না।

সেজদি একদিন বল্চেন—জিভু, তুমি কলেজ থেকে এসে খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি? বিকেলে ত বাড়ির মধ্যে থাকই না, আসই না। কোথা থেকে খেয়ে আসি? আমি জানি বিকেলের চা খাবার প্রায়ই ছোটবৌ

তৈরি করেন—আর সে সময় বড়-একটা কেউ সেখানে থাকে না। যে ঘর খেয়ে চলে যায়। ইচ্ছা ক'রেই বিকেলে চা খেতে যাই নে।

পরশা যেদিন থাকে, টেবনের নোকান থেকে খেয়ে আসি।

শীত কেটে গেল, বসন্ত যায়-যায়। আমার ঘরে জানালায় ধারে বসে পড়চি, হঠাৎ জানালায় পাশের দরজা দিয়ে ছোট বৌঠাকুরাণে কোথা থেকে বেড়িয়ে এসে বাড়ি ঢুক্চেন, সঙ্গে শৈলদির ছেলে কালো। তিনি আমার দেখতে পাননি। আমি অপলকে ধানিকন্ধ চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তাঁকে যেন নতুনরূপে দেখলাম—আরও কত বার দেখেচি, কিন্তু আজ দেখে মনে হ'ল এ চোখে আর কখনও দেখিনি তাঁকে। তাঁর কপালের অমন স্নানর গড়ন, পাশের দিক থেকে তাঁর মুখ যে হুত্মী দেখায়, ভুরু ও চোখের অমন ভঙ্গি—এ সব আগে ত লক্ষ্য করি নি? যখন কেউ দেখে না, তখন তাঁর মুখের কি অদ্ভুত ধরণের ভাব হয়! তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতেই আমার চমক ভাঙলো। বই খুলে রেখে দিলাম—পড়ায় আর মন বসল না, সম্পূর্ণ অন্তমনস্ক হয়ে গেলাম। কি একটা কষ্ট হতে লাগল বুকের মধ্যে—যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসচে। মনে হ'ল আর চুপ করে বসে থাকতে পারব না, এক্ষুনি ছুটে মুক্ত বাতাসে বেরুতে হবে। সেই রাতে আমি তাকে চিঠি লিখতে বসলাম—চিঠি লিখে ছিড়ে ফেললাম, আবার লিখে আবার ছিড়লাম। সেইদিন থেকে তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে চিঠি লেখা যেন আমার কলেজের টাকের সামিল হয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু লিখি আর ছিড়ে ফেলি। দিন-পনের পরে ঠিক করলাম, আজ চিঠি দেবই। সেদিন বেলা দেড়টার মধ্যে কলেজ থেকে কিরে এলাম—গ্রীষ্মের ছপুর, বাড়ির সবাই ঘুমুচে। আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম, সিঁড়ির পাশেই দোতলায় তাঁর ঘর, তিনি ঘরে বসে সেলাই করছিলেন—আমি শাহস ক'রে ঘরে ঢুকে চিঠি দিতে পারলাম না, চলে আসছিলাম, এমন সময় তিনি মুখ তুলেই আমার দেখতে পেলেন, আমি লজ্জায় ও ভয়ে অভিভূত হয়ে সেখান থেকে সরে গেলাম, ছুটে নীচে চলে এলাম—পত্র দেওয়া হ'ল না, সাহসই হ'ল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়লাম লক্ষ্যহীন ভাবে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অনেক দূরে বাড়ি যখন ফিরি, রাত

তখন বারোটা। বাড়িতে আখার সেদিন লক্ষ্মীপূজা ছিল। খেতে গিয়ে দেখি রামাঘরের সামনের খান্দায় আমার খাবার টাকা আছে, শৈলদি ঢুলচেন রামাঘরের চৌকাঠে বসে। মনে মনে অহুতাপ হ'ল, সারা বিকেল ষাটুনির পরে শৈলদি বোচারী কোথায় একটু ঘুমবে, আর আমি কি-না এ-ভাবে বসিয়ে রেখেছি!

আমায় দেখে শৈলদি বললে—বেশ, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কথার উত্তর দিতে গেলে মুন্সিল, চুপচাপ খেতে বসলাম। শৈলদি বললে—না খেয়ে ঢুল ঢুল ক'রে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গিয়েছে। চা খেতেও আসিস নে বাড়ির মধ্যে, কালোকে দিমে বাইরের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিলেও পাওয়া যায় না—থাকিস কোথায়?

খানিকক্ষণ পরে পাতের দিকে চেয়ে বললে—ও কি ভাল ক'রে ভাত মাখ। ঐ ক'টি খেয়ে মাল্লুঘ বাঁচে ত? তোরা এখন ছেলেকামাছুঘ, খাবার বয়েস। লুচি আছে ভোগের, লোবো? পায়ের তুই ভালবাসিস, এক বাটি পায়ের আলাদা করা আছে। কই মাছের মুড়া ফেল্‌লি কেন, চুষে চুষে খা। আহা, কি ছিরি হচ্ছে চেহারার!

পরদিন কিসের ছুটি। আমি দোতলার ছাদে কালোকে ডাকতে গিয়েছি তার প্রাইভেট টিউটার নীচে পড়াতে এসেচে ব'লে। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে। ও-ঘরে উঠেই আমি একে বারে ছোটবোঁঠাক্কণের সামনে পড়ে গেলাম। তাঁর কোলে মেজদির দেড় বছরের খুকী মিন্টু—সে খুব ফুটফুটে ক'র্স। ব'লে বাড়ির সকলের প্রিয়, সবাই তাকে কোলে পাবার জন্তে ব্যগ্র। ছোটবোঁঠাক্কণ হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন খুকীকে কোলে ক'রে। আমি বিস্মিত হ'লাম, কপালে ঘাম দেখা দিল। খুকী আমায় চেনে, সে আমার কোলে বাঁপিয়ে আসতে চায়। ছোটবোঁঠাক্কণ আমার আরও কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন—খুকীকে আমার কোলে দিলেন। তাঁর পায়ের আঙুল আমার পায়ের আঙুলে ঠেকল। আমি তখন লাল হয়ে উঠেছি, শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। কেউ কোন দিকে নেই।

ছোটবোঁঠাক্কণ সম্পূর্ণ অল্পজ্ঞানিত ভাবে হর নীচু

ক'রে বললেন—আপনি আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন আজকাল? আমার ওপর রাগ এখনও যায় নি?

আমি অতি কষ্টে বললাম—রাগ করব কেন?

—তবে সেদিন ও-ঘরে এলেন, আমার সঙ্গে কথা বললেন না ত? চলে গেলেন কেন? মরীয়া হ'লে বললাম—আপনাকে সেদিন চিঠি দোবো। ব'লে এসেছিলাম, কিন্তু পাছে কিছু মনে করেন, সেজন্তে দেওয়া হয় নি। পাছে কিছু মনে করেন ভেবেই বাড়ির মধ্যে আসি নি। তিনি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর মুহূর্তের বললেন—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে লেখাপড়া করুন। কেন ও-রকম করেন? আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন? ওতে আমার মনে ভারি কষ্ট হয়। যেমন আসতেন, তেমনি আসবেন বলুন? আমায় ভাবনার মধ্যে ফেলবেন না ওরকম।

আমার শরীরে যেন নতুন ধরণের অহুত্বের বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেখানে আর দাঁড়াতে পারলাম না—মুখে যা এল, একটা জবাব দিয়ে নীচে নেমে এলাম। সারারাত ঘুমতে আর পারিনি। আমার জন্তে এক জন ভাবে—এ চিন্তার বাস্তবতা আমার জীবনে একেবারে নতুন! নতুন! নতুন! নেশার মত এ অহুত্ব আমার সারা দেহ-মন অভিভূত ক'রে তুলে।

কি অপূর্ণ ধরণের আনন্দ-বেদনায় মাথানো দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস! দিন রাতে সব সময়ই আমার ওই এক চিন্তা। নির্জনে কাটাই, কিছু ভাল লাগে না, অথচ ধীর চিন্তা শব্দনন্দননে সর্বদাই করি, তাঁর সামনে পাছে পড়ি এই ভয়ে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করি। লেখাপড়া, খাওয়া, ঘুম সব গেল।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি ছোট বোঁঠাক্কণের হ'ল অস্থখ। অস্থখ ক্রমে বাড়িবাড়ি ধরণের হ'ল। চাতরা থেকে যত্ন ডাক্তার দেখতে এল। তাঁর বাপের বাড়ি থেকে লোকজন এসে পড়ল—বাড়িহুত্ব লোকের মুখে উৎসর্গের চিহ্ন। আমি ডাক্তার ডাকা, ওষুধ খানা, এসব করি বাড়ির ছেলেরদের সঙ্গে, কিন্তু একদিনও রোগীর ঘরে যেতে পারলাম না—কিছুতেই না। একদিন ঘরের দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম—কিন্তু চৌকাঠের ওপারে যাই নি।

ক্রমে তিনি সেয়ে উঠলেন। একদিন আমার ‘চরনিকা’ খানা তিনি চেয়ে পাঠালেন—দিন দুই পরে কালো বই কিরিয়ে দিয়ে গেল। চার-পাঁচ দিন পরে ‘চরনিকা’ খানা কি জন্তে খুলতে গিয়েচি, তার মধ্যে একখানা চিঠি, ছোটবোঠাকরুণের হাতের লেখা।

নাম নেই কাকুর। লেখা আছে—

আবার অরুণের সময় সবাই এল, আপনি এলেন না কেন? আমি কত আশা করেছিলাম যে আপনি দেখতে আসবেন, জানেন তা? আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল। কেন যে আবার সেয়ে উঠলাম! অরুণ থেকে উঠে মন ও শরীর ভেঙে গেছে। কালোর মধ্যে শুনেচি, আপনি আপনার দেবতার ছবি খরে টাঙিয়ে রেখেচেন, শুনেচি বীণাধরের ছবি, তিনি হিন্দুর দেবতা নন—কিন্তু আপনি ঝাঁকে ভক্তি করেন—আমি তাঁকে অবহেলা করতে পারি নে। আমার জন্তে তার কাছে প্রার্থনা করবেন! আর একটা কথা—একটিবার দেখতে কি আদর্শেন না।

বীণাধরের ছবির দিকে চাইলাম। সস্ত্রীতি একখানা বুকেব ছবি, আর একখানা চৈতন্তের ছবিও এনে টাঙিয়ে ছিলাম। রোগশীর্ণা পত্রলেখিকার করুণ আকৃতি গুঁদের চরণে পৌঁছে দেবার তার আমার ওপর পড়েচে। কিন্তু আমি কি পারব? অহুকম্পায় মমতায় আমার মন তখন ভরে উঠেচে। যে প্রার্থনা গুঁদের কাছে জানালাম, তা ভাষাহীন, বাক্যহীন। আমি এ-ছাড়া আর কিছু করতে পারি নে। নামনে হঠাৎ যেতে পারব না তাঁর। এ-বাড়িতেও আর বেশীদিন থাকা হবে না আমার। চলে যাব এখান থেকে।

টেটে পরীক্ষা দিয়েই আটঘরার পালাবো, ঠিক করলাম। সেখানে যাইনি অনেক দিন। মা চিঠি লিখেছেন, দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েচেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে হয় না শুধু জ্যাঠাইমাদের ব্যবহারের জন্তে। গেলেই মায়ের হৃৎখ দেখতে হবে। দাদা এক বাতাসার কারখানায় চাকরি পেয়েচে, ঘাসে কিছু টাকা অতিকষ্টে পাঠায়। সীতা বড় হয়ে উঠল—তারই বা কি করা যায়?—দাদা একাই বা কি করবে!

পিকারিং সাহেব আমার হাতে গীতা দেখে একদিন বললে—তুমি এসব পড় নাকি? বাইবেল কি তোমার সকল আধ্যাত্মিক অভাব পূর্ণ করে না?

আমি বললাম—পড়ে দেখতে দোষ আছে সাহেব? তা হাড়া আমি শু শুটান নই, আমি এখনও হিন্দু।

—হু-নৌকোতে পা দেওয়া যায় না, মাই বয়। তুমি শুটান ধর্মে দীক্ষিত হও—নম্রতা তুমি বাইবেল পড় কেন?

—সাহেব, যদি বলি ইংরাজী ভাষা ভাল করে শেখবার জন্যে?

পিকারিং সাহেব হো হো করে হেসে উঠল। বললে—তোমার আত্মার পরিজ্ঞান তার চেয়েও বেশী দরকারী। বীণতে বিশ্বাস না করলে আত্মার জ্ঞান নেই। তিনি আমাদের সকলের পাপের তার নিজে নিজে ক্রুশের নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। বীণের ধর্মে দীক্ষিত হও, তোমার পাপ তাঁর রক্তে ধুয়ে যাবে। এস, আমার সঙ্গে গান কর।

তারপর সাহেব নিজেই গান ধরল—

Nothing but the Blood of Jesus
Oh, Precious is the flow,
That can make me white as snow,
No other Fount I know,
Nothing but the Blood of Jesus.

পিকারিং সাহেবকে আমার খুব ভাল লাগে। খুব সরল, ধর্মপ্রাণ লোক। স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ দশ-বারো বছর, আর বিয়ে করেনি,—টেবিলের ওপর নিকেলের ক্রেমে ঝাঁধানো স্ত্রীর ফটো সর্বদা থাকে। মাঝে মাঝে আমার জিগ্যেস করে—আমার স্ত্রী দেখতে কেমন ছিল, ভাল না? ফটো দেখে মিসেস পিকারিংকে জন্মের মনে হয়নি আমার, তবুও বলি খুব চমৎকার।

পিকারিং সাহেবের ধর্মমত আমার কাছে কিন্তু অহুদার ঠেকে—কিছুদিন এদের সঙ্গে থেকে আমার মনে হয়েচে জ্যাঠাইমারা যেমন গোড়া হিন্দু—খৃষ্টানদের মধ্যেও তেমনি গোড়া খৃষ্টান আছে। এরা নিজের ধর্মটি ছাড়া আর কাকুর ধর্ম ভাল দেখে না। এদেরও সমাজে সংকীর্ণতা আছে—এদেরও আচার আছে—বিশেষতঃ একটি নির্দিষ্ট ধরণে ঈশ্বরের উপাসনা না করলে উপাসনা বার্থ হ’ল এদের মতে। একখানা কি বইয়ে একবার অনন্ত নরকের গল্প পড়লাম। শেষবিচারের দিন পর্যন্ত পাপীরা সেই অনন্ত নরকের অনন্ত আগুনের মধ্যে জলবে পুড়বে, খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার আগেই যদি কোন শিশু মারা যায়—তাদের আত্মাও যাবে অনন্ত নরকে। এসব কথা প্রথমে যেদিন শুনেছিলাম, আমাকে ভয়ানক ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর মনে হ’ল কেন বীণা কি এতই নিষ্ঠুর? তিনি পরিজ্ঞানের দেহতা, তিনি সকল পাপীকেই কেন পরিজ্ঞান করবেন না? যে তাঁকে জানে, যে তাঁকে না-জানে—সবাইকে

সমান চোখে তিনি কেন না দেখবেন? তাঁর কাছে খুঁটান ও অখুঁটানে প্রভেদ থাকবে কেন? বরং যে অজ্ঞানান্ধ তাঁর প্রতি তাঁর অসুস্থতা বেশী হবে—আমার মনের সঙ্গে এই খুঁটের ছবি খাপ খায়। তিনি প্রেমময় মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁর কাছেও ধর্মের দলাদলি থাকে কখনও? যে দেশের, যে ধর্মের, যে জাতির হোক, তিনি সবাই—যে তাঁকে জানে, তিনি তার, যে না-জানে, তিনি তারও।

এক দিন গঙ্গার ধারে বেকির ওপর বসে জনকতক লোক গল্প করতে সুনাম বরানগরে কুঠিঘাটের কাছে একটা বাগান-বাড়িতে এক জন বড় সাধু এসেছেন, সবাই দেখতে যাচ্ছে। দু-এক দিনের মধ্যে একটা ছুটি পড়ল, বেলুড় নেমে গঙ্গাপার হয়ে কুঠিঘাটের বাগান-বাড়িতে খোঁজ ক'রে বার করলাম। বাগান-বাড়িতে লোকে লোকারণা, সকলেই সাধুজীর শিষ্য, মেয়েরাও আছে। ফটকের কাছে একজন দাড়িওয়ালা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ফটকের কাছে গিয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য বলতেই লোকটা দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে—ভাই, এস এস, তোমাকে নেওয়ার জুড়ই আমি এখানে যে দাঁড়িয়ে আছি! আমি পছন্দ করিনে যে কেউ আমার গলা জড়িয়ে ধরে—আমি ভয়ভাবে গলা ছাড়িয়ে নিলাম। লোকটা আমার বাগানের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। ঝাঁকির রোষকে একদল মেয়ে ব'সে একরাশ তরকারী কুটছে—একটা বড় গামলায় প্রায় দশ সের ময়লা মাখা হচ্ছে,—যেদিকে চাই, ষাওয়ার আয়োজন।

—সাধুর দেখা পাবো এখন?

—তিনি এখন ধ্যান করছেন। তাঁর প্রধান শিষ্য জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ও-ঘরে আছেন, চল ভাই তোমার নিয়ে যাই।

কথা বলচি এমন সময় এক জন ভক্তলোক এলেন, সঙ্গে একটি মাইলা—ফটকের কাছে তাঁরা মোটর থেকে নামলেন। এক জন বালক-শিষ্যকে ভক্তলোকটি কি জিগ্যাস করলেন—সে তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এল আমার সঙ্গে দাড়িওয়ালা লোকটির কাছে। ভক্তলোকটি তাকে বললেন—স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেচি, তিনি কোথায়?

—কোথা থেকে আসছেন আপনারা?

—ভবানীপুর, এলগিন রোড থেকে। আমার নাম বিনয়কৃষ্ণ মল্লিক—

দাড়িওয়ালা লোকটির শরীরের ইকুপ কজা যেন সব ঢিলে হয়ে গেল হঠাৎ—সে তিন ভাগে ভেঙে হাত কচলে বললে—আজ্ঞে আছেন, আছেন, বুঝতে পেরেচি, আছেন। এই নির্দি দিয়ে আছেন—আছেন মালম্হী—

আমি বিস্মিত হ'লাম। এই যে বললে সাধুজী ধ্যানে বসেচেন—তবে ওঁরা গেলেন যে! লোকটি ওঁদের ওপরে দিয়ে আবার নেমে এল। আমার একটা হলঘরে নিয়ে গেল। সেখানে জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে। জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর পরনে গেলুয়া আলখেল্লা, রং ফর্সা—আমার সঙ্গে বেশ ব্যবহার করলেন। তিনি আপিসের কাজে দেড়শো টাকা মাইনে পেতেন—ছেড়ে স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেচেন। স্বামিজী বলতেন তিনি তিনটে মহাদেশ উদ্ধার করবেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেই বেরিয়ে পড়বেন সে উদ্দেশ্যে। স্বামিজীর দেওয়া মন্ত্রজপ ক'রে তিনি অদ্ভুত ফল পেয়েছেন নিজে—এই সব গল্প সমবেত দর্শকদের কাছে করছিলেন। আমি কৌতূহলের সঙ্গে জিগ্যাস করলাম—কি ফল পেয়েছেন মন্ত্রের? তিনি বললেন—মন্ত্র জপ করতে করতে মনে হয় যেন কোথায় পাহাড়ের উপরে বসে আছি। স্বামিজী বলেন এ-একটা উচ্চ অবস্থা। আমি আরও আগ্রহের সুরে বললাম—আর কিছু দেখেন? তিনি বললেন জ্যোতির্দর্শন হয় মাঝে মাঝে।

—সে কি রকম?

—তুই ভূকর মাঝখানে একটা আগুনের শিখার মত দীপ্তি দেখতে পাই।

আমি হতভাল হ'লাম। আমি নিজে ত কত কি দেখি! এরা ত সে-সব কিছু দেখে ব'লে মনে হয় না! এরা আর কতটুকু দেখেচে তা হ'লে? পাহাড়ের ওপর বসে আছি এই দেখলেই বা কি হ'ল? ভূকর মধ্যে আগুনের শিখা দেখলেই বা কি?

সুনাম বোলা ছাঁটার পরে স্বামিজীর দেখা পাওয়া বাবে। পাশের একটা ঘরে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। আরও এক জন বৃদ্ধ সেখানে ছিলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন—দেখ ত বাবা—এই তোমরাও ত ছেলে। আর আমার

হতচ্ছাড়া ছেলেটা পালিয়ে এসে বাড়ি থেকে এই সন্নিসির দলে যোগ দিয়েছে। এখানে ত এই খাওয়া, এই থাকা। যাত্রার দলের মত এক ঘরে একশো লোক শোয়। ছেলেটা হাঁড়ির হাল হয়েছে—আগে একবার ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম—তা যায় নি। এবার আমি আসছি শুনে কোথায় পালিয়েছে হতভাগা। আহা, কোথায় থাকে, কি হচ্ছে—ওদিকে বাড়িতে ওর মা অরুণ ছেড়েছে। ওই সন্নিসির দলই তাকে সরিয়ে রেগেছে কোথায়। আজ তিন দিন এখানে বসে আছি—তা ছোড়া এল না। এরা তলায় তলায় তাকে খবর দিচ্ছে। আবার আমার ওপর এদের রাগ কি? বলচে—ছেলে তোমার মুক্তির পথে গিয়েছে, বিষয়ের কীট হয়ে আছে তুমি, আবার ছেলেটাকে কেন তার মধ্যে ঢোকাবে? শোন কথা। ওদের এখানে বিনি পয়সায় চাকর হাতছাড়া হয়ে যায় তা হ'লে যে! আমার এই মারে ত এই মারে। দু-বেলা অপমান করছে।

—কোথা থেকে আপনার ছেলে এদের দলে এল?

—এই সন্নিসির দল গেছল আমাদের মাদারিপুরে। খুব কীর্জন করে, ভিক্ষে করে, শিষ্য-সেবক তৈরি করে বেড়ালে কদিন! সেখান থেকে ছেলেটাকে ফুসলে নিয়ে এসেছে। পয়সা হাতে থাকত আমার ত ব্যাটারী খাতির করত। এখানে থেতে দেয় না; ওই বাজারের হোটেল থেকে খেয়ে আসি। একটু এই দালানটাতে রাত্রে শুয়ে থাকি, তাও দু-বেলা বলচে—বেরো এখান থেকে। ছোড়াটা ফিরে আসবে, সেই আশায় আছি।

স্বামিজীর সঙ্গে দেখা হ'ল না।

সন্ধ্যার পরে ষীমারে পার হয়ে বেলুড়ে এলাম; মনে কত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম ওবেলা। মাহুঘের সঙ্গে মাহুঘের ব্যবহার যেখানে ভাল নয়, সেই জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গোপীনাথ জিউএর পূজোর সময় যা দেখেছি, হীক ঠাকুরের প্রতি তাদের ব্যবহার যা দেখেছি—সেই সব একই যেন।

দিন দুই পরে ছোট বউটাকরণের বাপের বাড়ি থেকে

বড় ভাই তাঁকে নিতে এল। আমার সঙ্গে দশ-পনের দিন দেখা হয়নি, ভালমুখ যাবার সময় একবার দেখা করবই। দুপুরের পরে ঘোড়ার গাড়ীতে জিনিষপত্র ওঠানো হচ্ছে, আমি নিজের ঘরে জানলা দিয়ে দেখছি আর ভাবছি ওঠবার সময় গাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়াব, না ওপরে গিয়ে দেখা করে আসব?

পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখি ছোটবৌটাকরণ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে, রোগশীর্ণ মুখ, হাতায় লাল পাড়-বসানো ব্লাউজ গায়ে, পরণে লালপাড় শাড়ী। আমি খতমত খেয়ে বললাম—আপনি! আহুন, এই টুলটাতে—

তিনি যত্ন, সহজ স্বরে বললেন—খুব ত এলেন দেখা করতে।

—আমি এখনি যাচ্ছিলাম, আপনি এলেন, তাই নইলে— ছোটবৌটাকরণ স্নান হেসে বললেন—না, নিজেই এলাম। আর আপনার সঙ্গে কি দেখা হবে? আপনি ত পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবেন। বি-এ পড়বেন না?

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম—ঠিক নেই, এখানে হয়ত আর আসব না।

তিনি বললেন—কেন আর এখানে আসবেন না?

আমি কোন কথা বললাম না। দু-জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে যত্ন অমৃষোগের স্বরে বললেন—আপনার মত ছেলে যদি কখনও দেখেছি! আগে যদি জানতাম তবে সেবার আপনাকে নিয়ে যে ওরা ঠাট্টা করেছিল, আমি তার মধ্যে দাঁড়ই? এখন সে-কথা মনে হ'লে লজ্জায় ইচ্ছে হয় গলায় বঁটি দিয়ে মরি।

তারপর গভীর স্নেহের স্বরে বললেন—না, ওসব পাগলামি করে না, আসবেন এখানে, কেন আসবেন না, ছিঃ—

দরজার কাছে গিয়ে বললেন—না এলে বুঝবো আমার খুব ঘেন্না করেন, তাই এলেন না।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সমাজ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

সাহিত্য-বিষয়ক যে সমস্যাগুলি নিয়ে আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনসমাজের মধ্যে তর্ক জন্মে উঠেছে, তার ভিত্তরকার সবচেয়ে বড় কয়েকটি প্রশ্ন এই—

(১) সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের কোনরূপ সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত কি না? উচিত হ'লে সে যোগ সাহিত্যকে সমাজের মুখোপেক্ষী করবে অথবা সমাজকে সাহিত্যের মুখোপেক্ষী ক'রে রাখবে? সাহিত্য সমাজের অগ্রগামী না অন্তর্গামী?

(২) নিছক আনন্দ পাওয়া ও দেওয়ার কাজে নিযুক্ত আর্ট বা লালিতকলা হিসাবে সাহিত্যের পার্থিব প্রয়োজন-নিরপেক্ষ কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও নিজস্ব মানদণ্ড থাকা সম্ভব এবং উচিত কিনা? সম্ভব বা উচিত হ'লে সে অস্তিত্ব ও তার মানদণ্ডের স্বরূপ কি?

(৩) সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কল্যাণ-বুদ্ধিকে জাগ্রত ক'রে অকল্যাণ-বুদ্ধিকে চেকাবার চেষ্টা করলে তাতে সাহিত্যের প্রতি অবিচার করা হয় কি না?

(৪) সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে সংসাহিত্য সৃষ্টির জন্য কোন পথে সাধনার প্রয়োজন?

এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা খুব সহজ নয় এবং অল্প কথায় সম্ভবও নয়। বড় বড় পণ্ডিত কবি এবং সাহিত্যিক এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পিঁড়িয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন ক'রে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আমার বুদ্ধিতে আমি এই প্রশ্নগুলির ধারণা সমাধান করতে পেরেছি কেবল সেইটুকুই বলব।

প্রথম প্রশ্ন, সাহিত্য ও সমাজের কোনরূপ যোগ আছে বা থাকা উচিত কি না এবং থাকলে সে যোগের স্বরূপ কি? সাহিত্য এবং সমাজ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় সত্য এই যে, এরা সর্বদেশকালেই পরস্পর পরস্পরের মুখোপেক্ষী, আবার উভয়ের স্বাভাবিক চিরদিনই সম্পৃক্ত। সাহিত্য যেমন মানুষকে সজাগ করে তোলার জন্য আনন্দ পরিবেশনের যন্ত্র নয়, বরং সে কেবল সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ

নিয়ন্ত্রণের জন্য রচিত কঠোর নীতি-উপদেশের সমষ্টিও নয়। সাহিত্যের মধ্যে এই দুই দিকই আছে, আবার সাহিত্য এই দুইয়েরই উপরে। এক কথায় সাহিত্যের বহিরঙ্গ হচ্ছে হৃন্দর এবং তার অন্তরঙ্গ হচ্ছে সত্য ও কল্যাণ। “সত্যঃ শিবং হৃন্দরং” কথাটি যেমন ব্রহ্মের সম্বন্ধে খাটে তেমনই সাহিত্য সম্বন্ধেও খাটে। সাহিত্য সমাজকে আনন্দ দেবে, তার কল্যাণ করবে, তার নিজের কাছে নিজেকে সত্য হ'তে শেখাবে, যেন সে তার দেশের বিশিষ্ট ধারা রক্ষা করে, কালের উপযোগী সংস্কারকে গ্রহণ ক'রে হৃন্দর ও স্থপী হয়ে উঠতে পারে। ইহাই সাহিত্যের চিরন্তন ধর্ম। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের এই যোগ থাকার প্রধান এবং প্রথম কারণ মানুষই সাহিত্য সৃষ্টি করে এবং মানুষ সামাজিক জীব। বিভিন্ন দেশের মানুষের সমাজে বিভিন্ন সংস্কার ও বিভিন্ন রীতিনীতি আছে, সুতরাং তার প্রভাব বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের বহিমুখিতে পরস্পর থেকে কিছু-না-কিছু পার্থক্য এনে দিয়েছে। এই জন্ত সাহিত্যের বহিরঙ্গের কোন শাস্ত্র রূপ বা শাস্ত্র মানদণ্ডও থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এক অথও মানবজাতির হৃদয় থেকে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য উদ্ভূত হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য আছে। প্রত্যেক দেশের রসপিপাসু মানুষই অন্য দেশের মানুষের সৃষ্ট সাহিত্য উপভোগ করতে পারবে এবং পারবে, বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের অন্তরগত সাদৃশ্যই তার কারণ। সাহিত্য-স্রষ্টা যে কেমন ক'রে দেশকালের ব্যবধান ছাড়িয়ে জগতে আনন্দ পরিবেশন ক'রে বেড়ান, তার সাফল্য ভারতের স্বাধীনসমাজে সেক্সপীয়ার, শেলি, গ্যোটে, রোমান্স র'ল্লা প্রভৃতির সমাদর এবং ইউরোপ আমেরিকার স্বাধীনসমাজে কালিদাস রবীন্দ্রনাথের পূজা। এর কারণ প্রতিভাশালী কবি সর্বদেশের মানবজাতিকে আনন্দ দিতে সমর্থ এবং সাহিত্যের এমন একটা শাস্ত্র আন্তরঙ্গ তার রচনার ক্ষেত্রে তুলেছেন যেটা দেশকাল এমন কি পাজেরও অতীত।

বিজ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ বতই ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটবর্তী হচ্ছে, যতই তাদের মেলোমেশার ফলে সামাজিক রীতিনীতি অনেকটা এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে আসছে, ততই সাহিত্যের আন্তর ও বহিমুক্তির একটা শাখত রূপ স্থির করার চেষ্টা বিভিন্ন দেশে চলছে। বিভিন্ন দেশের বাহুরূপ কোন দিন একটা বীধাধারা নিয়মে বিচার্য হবে কি না বলা শক্ত, কিন্তু তার আন্তর রূপ সর্বদেশে সর্বকালে একই ছিল, আছে এবং পৃথিবীর মানুষ যদি আত্মবাহী হ'তে প্রস্তুত না হয় তাহলে থাকবে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই আন্তর রূপ হচ্ছে মানুষের বৃহত্তর সত্তার প্রতি প্রত্যেক মানুষের ক্ষুদ্রতর সত্তার কল্যাণবুদ্ধির দ্বারা নিম্নিত্ত স্বস্থ রসাতলভূতি। তাই বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের বহিঃপ্রকাশের ভাষা সাহিত্যিকের রুচি ও রচনাপ্রণালী ভেদে বাহুতঃ বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হলেও আন্তরিক তাদের অনৈক্য নেই। তাদের সমাজনিরপেক্ষ নিম্নস্থ স্বতর অস্তিত্ব না থাকলেও তাদের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারের একটা শাখত মানদণ্ড আছে। সাহিত্য একদিক দিয়ে সমাজের প্রতিচ্ছবি হলেও সে তার হুবহু নকল বা ফটোগ্রাফ নয়। অগ্রান্ত ললিতকলার মত সে প্রকৃতির সঙ্গে স্তম্ভ মানুষের মনকে মিলিখে দক্ষ শিল্পীর হাতের আঁকা ছবি, যাতে বহির্জগৎ বা এক্ষেত্রে সমাজের প্রতিচ্ছবিটার উপরে সাহিত্যশ্রষ্টার শিক্ষা নীকা রুচি প্রবৃত্তি এমন কি তাঁর দেশকালের প্রভাবও খুব স্বস্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে।

একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দশ জনের চোখে ঠিক একরকম হয়ে প্রতিভাত হয় না। একই বিষয়বস্তু নিয়ে যেমন পাঁচ জন শিল্পী পাঁচ রকম বিভিন্ন ছবি আঁকতে পারেন, তেমনি একটি সামাজিক চিত্রই বিভিন্ন সাহিত্য-শ্রষ্টার হাতে বিভিন্ন রূপ পেয়ে থাকে। এ-সমক্ষে বীধাধারা কোন নিয়ম করা যায় না এবং প্রয়োজনও নেই; কারণ কোন স্বকুমার শিল্পই এক্ষেত্রে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেবল একটি গোড়ার কথা মনে রাখা দরকার। সাহিত্যিক সমাজবদ্ধ মানুষের জন্ত যে আনন্দ-লোক স্বজন করবেন, তাহা যেন বৃগপৎ তাদের পক্ষে কল্যাণ-লোক এবং সত্যলোক হয়। কবির নিরঙ্কুশ হবার অধিকার বৃগে বৃগে দাবি করেছেন এবং পেয়েছেন, কিন্তু কেবল তাঁদেরই দাবি সমাজ কেনেছে, বীরা কাব্য সৃষ্টি করতে গিয়ে সমাজের

কল্যাণকে বিসর্জন দেননি, বীরা সমাজকে যেন নিয়ে স্থপথে পরিচালনা করেছেন। সংঘের দ্বারাই স্বাধীনতার অধিকার লাভ করা যায়। সমস্ত তর্ক বিচারের উপরে আমাদেরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ তার সৃষ্ট সাহিত্যের চেয়ে বড়। যে কল্পনার বিলাস মানুষকে তার প্রতিদিনের হীনতার দীনতার ক্লেদকর্দম থেকে, তার স্বার্থসংঘাতের নির্মম রণক্ষেত্র থেকে উর্দ্ধে তুলে নিয়ে বিমলতা দান করে, শান্তস্নিগ্ধ সরস করে, তার মূল্য খুব বেশী; কিন্তু তা ব'লে সে-আনন্দ যদি মাতালের মত্ততা-প্রসৃত স্বখমাত্র-হয়, সাহিত্য যদি সমাজের মাধ্যম ব'লে তারই মূলচ্ছেদের জন্য কুঠারাঘাত করতে চেষ্টা করে—মানুষকে তার স্থপরিচালনায় বড় না করে, তার স্বাভাবিক পশুত্বকে জাগিয়ে তুলে নৈতিক অধঃপাতের পথে তাকে ঠেলে দেয়, তবে তাকে বাধা দেওয়ার এবং নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার সমাজের থাকে উচিত। নিরঙ্কুশ কবি বনের পাখীর মত মহত্বসমাজের বহির্ভাগে বাস করলে বোধ হয় কিছু বলবার থাকে না; কিন্তু তাঁর রচনার প্রভাব যদি সুপ্রভাব হয় তবে নিজনবাস থেকে জনপদে এসে দেশকালের ব্যবধান ছাড়িয়ে সে যে সমাজের ক্ষতি করবে না এমন কথা জোর ক'রে বলা শক্ত।

এর পর প্রশ্ন আছে, সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সাহিত্যের প্রতি অবিচার কি না? সাহিত্যিক যদি তাঁর রচনার সৌন্দর্যের হানি না ক'রে সমাজের অকল্যাণ-বৃত্তিকে রোধ করার এবং কল্যাণবৃত্তিকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস করেন এবং সেই কার্যে সফল হন, তবে তাঁর রচনা সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সাংকর্ষ হয়। সাহিত্য বৈ-রসলোক স্বজন করবে তাতে সকল রসেরই স্থান আছে; কিন্তু যথোপযুক্ত স্থানে প্রত্যেক রসকে স্থান দিতে হবে। রসসৃষ্টির উৎসবকে সাহিত্যিকের মন যেন বীভৎস রসকে শাস্ত বা কদম্ব রসের উর্দ্ধে স্থান না দেয়, আদি রসের আদিয় বর্ধরতা যেন তার মাধুর্যকে অতিক্রম ক'রে অশোভন না হয়ে ওঠে। আমরা যখন বাসগৃহের পরিকল্পনা করি তখন ময়লা-ফেলার জায়গাগুলিকে যতটা সম্ভব লোকলোচনের অন্তরালে রাখবার ও ফুলবাগানটিকে যতটা সম্ভব লোকচক্ষের সামনে ধরবার ব্যবস্থা করি। তার কারণ এই যে, জীবনের যে-সব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে

মানুষ অজ্ঞান্য জীবজন্তুর সঙ্গে সমান, মানুষের সহজাত স্বকৃতির জ্ঞান ব্যবহারিক জগতেও সেই সব প্রয়োজনের ক্ষেত্রগুলিকে অত্র মানুষের চোখে পড়তে দিতে কুণ্ঠিত হয়। সুতরাং শিল্প বা সাহিত্যের উন্নতির লোকে সেগুলির অবিকল প্রতিক্রিয়া খুব স্পষ্ট করে তুলতে মানুষের কুণ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। পূর্বেই বলেছি, সাহিত্য সমাজের একটা অবিকল প্রতিচ্ছবি নহে, তাহা বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্ন আদর্শ অনুযায়ী রচিত সমাজের স্থলমুখ এবং স্থলমুখের রূপমূর্তি। তাই সাহিত্য সমাজকে ছব্বহ নকল করার চেষ্টার বার-বার পথভ্রান্ত হয়েচে। এক শ্রেণীর সাহিত্যিক জোরগলায় বলছেন, সাহিত্য সমাজের অবিকল প্রতিক্রিয়া, সমাজে ভালমন্দ যেখানে যা যেমন ঘটচে সাহিত্যেও ঠিক তেমনই তার প্রতিচ্ছবি না থাকলে সাহিত্য একদেশদর্শী হয়ে ওঠে, তার সৌন্দর্যের ত্রুটি এবং বিস্তারে বাধা থেকে যায়। এক্ষেত্রে বলবার কথা এই যে, আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত সর্বদেশের সাহিত্যিকই নিজ নিজ দেশের সাহিত্যে সমাজের ভালমন্দ চুটে দিকের চবিই দেখিয়েছেন, তবে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অবশ্য শেষপর্যন্ত ভালটাকে উজ্জলবর্ণে চিত্রিত করে গেছেন। ভারতীয় সাহিত্যের আদিকবি বাঙ্গালীক উজ্জ্বলতার যে-চিত্র রাবণের ভিতর দিয়ে দেখিয়েছেন, তা কোন দেশের কোনও বাস্তব উজ্জ্বল চরিত্রের চাইতে উজ্জ্বলতার বিশেষ কম যায় না। কিন্তু রামায়ণ শব্দে বাঙ্গালীর রাবণ-চরিত্র জীবনে অনুকরণ করতে বোধ হয় কেহই ইচ্ছুক হয় না, কারণ শিল্পীর রচনা-কৌশলে রামায়ণে কল্যাণের রূপ অকল্যাণের রূপকে পরাভূত করে ফুটে উঠেছে।

আর একটা কথা, সমাজের ছব্বহ নকল সাহিত্যে অঙ্কন করার শক্তিই বা ক-জন সাহিত্যিকের থাকতে পারে বা আছে। সমস্ত সমাজের সর্বক্ষেত্রে একই সময়ে চোখ রেখে সাহিত্যসৃষ্টি করাই কি সহজ কথা! অল্পজ্ঞ অক্ষম শিল্পীর অঙ্কনের হস্তিনশনের মত সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের রূপ দেখে অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে সমস্ত দেহটার সঙ্গে তাদের সঙ্ঘ না জেনে (অঙ্করা যেমন তর্ক তুলেছিল হস্তি দড়ির মত, না ধামের মত, না কুলার মত, তেমনই) একই সমাজের বাস্তব চিত্র আঁকতে গিয়ে কেহ একে নীরল নীতিকথার সাহিত্য, আবার কেহ বা তাকে বস্তি-সাহিত্য করে

তোলেন। দক্ষ শিল্পী চক্ষুমান ব্যক্তির মত এককালে সমাজের সর্বক্ষেত্র দেখতে পান এবং সেই জন্তই তাঁর হাত দিয়ে সমাজের যে-রূপ সাহিত্যে ফুটে ওঠে তার মধ্যে রাম রাবণ সীতা সুপ্ননাথ সকলেরই স্থান আছে। অধিকন্তু সামঞ্জস্য রক্ষার জন্ত কবির সৌন্দর্যজ্ঞান ও কল্যাণবুদ্ধির স্পর্শ আছে। এইখানেই বড় সাহিত্যিকের ও ছোট সাহিত্যিকের রচনার প্রভেদ।

এর পর সাহিত্যসাধনার পথ সম্বন্ধে দু-এক কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ এই পথের নির্দেশ দিতে গিয়ে শিল্প-সাধনার অন্তরের কথা বলেছেন, ‘দেখ, দেখ, দেখ’—প্রকৃতি ও সমাজকে সত্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করা সাহিত্যিকের প্রথম প্রয়োজন, তার বর্ণশিক্ষা ও ব্যাকরণ-জ্ঞান না-থাকলে সে যেমন বাহিরের দিক দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করতে কোন দিনই সক্ষম হবে না, তেমনই অন্তরের দিক দিয়ে যে নিজে দেখেনি সে পরকে দেখাতে কোন দিনই সক্ষম হবে না। এক্ষেত্রে আরও একটা কথা জানবার আছে, আমরা যে কেবল বর্তমানকে দেখব তা নয়, আমরা অতীত ও বর্তমানকে এককালে দেখবার সাধনা করব। অতীতের সাহিত্যস্রষ্টারা যা রেখে গেছেন তা আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি, আমাদের যাত্রাপথের অবশ্যপ্রয়োজনীয় পাথর—তা যেন আমরা ভুলে না যাই। এ-কথা যেন যুহুর্ন্তের জন্তও না ভুলি যে মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতা সম্ভব হয়েছে মানুষ জন্মমাত্র তার পূর্বপুরুষদের যুগযুগ-সঞ্চিত জ্ঞান অতীতের উত্তরাধিকার-স্বরূপ পেয়েচে বলে। নূতনত্বের মোহে আমরা তুচ্ছ জিনিষটাকে নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে বড় জিনিষটাকে ভুলে যাই, কল্পির ভাষায় মাথাটা সহজাত বলে তার মূল্য বুঝি না, পাগড়ীটা সংগৃহীত বলে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে তাকে সম্মান দিই। কিন্তু চিরদিন ঘরে বসে পৈত্রিক সম্পত্তি খরচ করলে যেমন দৈন্ত আসে এবং বিনাশ আসে, তেমনই চিরদিন পূর্বতন লেখকদের ভাব ও ভাষার চর্কিতচর্কণ করলেও সাহিত্যের দৈন্ত ও অধঃপতন অনিবার্য। পৈত্রিক সম্পত্তিকে কারবারে খাটাতে হবে, বর্তমানের সঙ্গে অতীতের ধোঁগসাধন করতে হবে। এই নিজের উপার্জন প্রকৃতিকে এবং সমাজকে ভালবাসে নিজের চোখে দেখে তার কাছ থেকে রূপ রপের

দৈনন্দিন সংগ্রহ। এই সংগ্রহের অভাবে রাজার ঐশ্বর্যও কুরিয়ে যায়, অতীতের সাহিত্যিক মহিমা বর্তমানের সাহিত্যকে বাচিয়ে রাখতে কোনমতেই সক্ষম হয় না। সাহিত্যের বাইরের দিকটার কথা বলতে গিয়ে বর্তমান যুগের কোন বিখ্যাত শিল্পাচার্যের শিল্প সন্দেহ ব্যবহৃত একটি উপমা দিব। অন্যতম হুসুমার শিল্পহিসাবে সাহিত্য সন্দেহও তাঁহার কথাটি থাকে। “সাহিত্য একটি সাত ঘোড়ার রথ, রথী যদি দক্ষ সারথির হাতে রাখ দিতে পারেন, তবে ঘোড়াগুলি পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে নির্দিষ্ট পথে রথকে নিয়ে যায়।” হুসুমত পরিচালনা, ভাবের ঐশ্বর্য, রচনার সৌষ্ঠব, শব্দ-নির্বাচনে হুসুমার জ্ঞান, ব্যাকরণবোধ, উপযুক্ত স্থানে চলবার এবং থামবার মাত্রাজ্ঞান এবং সমস্ত রচনাকে উজ্জীবিত করবার উপযোগী রসবোধ এই ধরনের সাতটি ঘোড়া যে-সাহিত্যিক সংঘ-রশ্মির দ্বারা আয়ত্তের মধ্যে রেখে চালাতে পারেন, তিনিই উচুদের সাহিত্যশ্রষ্টা। না হ'লে অক্ষম।

সারথির হাতে পড়ে বিজোহী ঘোড়াগুলি যেমন রথটাকে শেষে খানায় কেলে বা বিপথে নিয়ে যায়, তেমনই অক্ষম সাহিত্যিকের হাতে ও রচনার মধ্যে পরিকল্পনার অসামঞ্জস্যের সঙ্গে ভাষার ঐশ্বর্য, ব্যাকরণজ্ঞানের আধিক্যের সঙ্গে রসবোধের অভাব, ভাবের গভীরতার সঙ্গে ভাষার দৈন্ত অনবরত বিরোধ করতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত কুসাহিত্য সৃষ্টি হয়। সাহিত্যরথীর লক্ষ্য হবে এই সাত ঘোড়ার রথকে সমাজের প্রতি কল্যাণবৃদ্ধি রূপ দক্ষ সারথির দ্বারা চালনা করা। প্রত্যেক সংসাহিত্যশ্রষ্টার ভিতরের এবং বাহিরের দিক দিয়ে ইহাই সাধনার আদর্শ। এই আদর্শ টিক থাকলে সাহিত্যিকের ক্ষমতা অল্পব্যয়ী সাহিত্যে ফ্রুটি-বিচ্যুতির আধিক্য বা অল্পতা থাকলেও এবং সাহিত্য সর্বক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট হতে না পারলেও তাহা হুসুমতি হবে এবং পথভ্রষ্ট না হওয়ায় তার ভবিষ্যৎ সন্দেহে আশা করবার কারণ থাকবে।

আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[১]

একটা ব্যক্তিগত কথা দিয়া প্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেছি। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৯শে তারিখে বিলাতে পদার্পণ করি, জাহাজ হইতে নামিয়া ঐ দিন লণ্ডনে পহছি। ২রা অক্টোবর প্রথম ব্রিটিশ-মিউজিয়ম দেখিতে যাই, সেদিন কিন্তু ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। তারপরে দুই একবার মিউজিয়মে গিয়াছিলাম—মিউজিয়মে রক্ষিত কতকগুলি বিশ্ব-বিশ্রুত শিল্প-দ্রব্য দেখিয়া আদি—যেমন, Elgin Marbles নামে স্থপরিচিত আথেন্স-নগরীর পার্থেনন মন্দিরের খোদিত চিত্র ও মূর্তির সংগ্রহ; আমাদের ভারতবর্ষের অমরাবতীর ভাস্কর্য; প্রাচীন মিসর ও আসিরিয়ার ভাস্কর্য; ইত্যাদি। তার পরে ১৪ই তারিখে আবার ব্রিটিশ-মিউজিয়মে যাই; ঐ দিনটা আমার কাছে একটা স্মরণীয় দিন বলিয়া মনে হয়। ইউরোপে অবস্থানকালে

কতকগুলি বিভিন্ন দেশ ও কালের শিল্প সন্দেহ, কেবল বার-বার দেখার ফলেই, আমার মন সচেত হইয়া উঠে; আগে যে জিনিসের কথা জানিতাম না, আমার নিকট হাজার কোনও মূল্য ছিল না, কেবল ভ্রমোভূয় দর্শনের ফলে সেই সব জিনিস আমার কাছে স্বরূপে আকর্ষণকর বস্তু হইয়াছে—মানবের সৌন্দর্য-সৃষ্টির বিচিত্রতা ও দেশ-কাল-পাত্র বশে এই বিচিত্র সৌন্দর্য-সৃষ্টির অবস্থাবিভা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই সব জিনিসের মধ্যে উল্লেখ করিতে পারা যায়—গ্রীসের স্থপ্রাচীন হেলেনীয় যুগের ভাস্কর্য ও ঘট-চিত্র; বিলাতীয় ভাস্কর্য ও mosaic অর্থাৎ রত্নীন কাচের টুকরা সাজাইয়া তৈয়ারী ভিত্তি-চিত্র; “গথিক” ভাস্কর্য; ইতালীর প্রাগ-রাসকল যুগের চিত্রকলা; প্রাচীন চীনা ভাস্কর্য; ইত্যাদি। ১৪ই অক্টোবর ব্রিটিশ-মিউজিয়মের Ethnological Gallery

অর্থাৎ আদিম-সংস্কৃতিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কক্ষগুলিতে ঘুরিতে ঘুরিতে, বড় বড় কাচের আলমারীর মধ্যে রক্ষিত নানা বর্বর ও অর্ধ-বর্বর জাতির আদিম উচ্ছৃঙ্খল কলনা ও তাহাদের অশিক্ষিত-পটু হস্ত হইতে উদ্ভূত অস্ফুট ও কিস্তৃতকিমাকার বস্তু দেখিতে

বা অতিপ্রাকৃতিক ভঙ্গি যুগটিতে আসিয়া গিয়াছে, কখন দুইটা যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহা হইতে উহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মাথায় একটা চূড়াকৃতি শিরস্ত্রাণ পরিহিত—খুব সম্ভব সেটা বেতের তৈয়ারী অথবা প্রবাল-নির্মিত টুপী; গলায়



১০। পক্ষী-শিকার
বেনিন্—ব্রঙ্কে ঢালা পাটা



২। বেনিন্ হইতে আনীত ব্রঙ্কে ঢালা কঙ্কার
মুখ। বেনিন্, আদিম-সংস্কৃতি-তত্ত্ব
সম্পর্কীয় সংগ্রহ-শালা।

দেখিতে, পশ্চিম-আফ্রিকা হইতে আনীত নিগ্রো-সংস্কৃতি জাত শ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে, হঠাৎ একটা ধাতুতে-ঢালা নিগ্রো মেয়ের মুখ দেখিয়া থমকিয় দাঁড়াইলাম। (চিত্র [১] ও [২])।

মুখখানা প্রতিমার মুখের ধাঁজে, নুসুণ্ডের মত চারিদিকে ঢালা, চিত্রাকার নহে। আঙ্গুরে স্বাভাবিক মানুষের মাথায় বস্তু হইবে। শিল্পী পুতুলেরি স্বাভাবিক অস্বকৃতি করে নাই, বা করিতে পারে নাই,—কতকটা অপ্রাকৃতিক

প্রবালের বগী। কণ্ঠেই মৃৎটির পরিণমাপ্তি। আজকালকার শিল্পীদের পাকা হাতের তুলনায়, এই রূপ-কল্পটিতে একটু ভাবুকতার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই অশিক্ষিত-পটুকে, মৃৎটির গঠনের ভঙ্গিতে, প্রকৃতিকে যোল আনা একম অস্বকরণের অভাবকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে—ইহাদের সম্পূর্ণতা দিয়া মৃৎটিকে শ্রেষ্ঠ শিল্পের আসনে উন্নীত করিয়াছে,—সার্থকভাবে ও সরলভাবে মৃৎটিতে

নিগ্রোর জাতিগত বৈশিষ্ট্যটুকুকে শিল্প-কর্জক ফুটিয়ে তুলে। ইহাতে শিল্পীর সত্যদর্শন এবং সত্য বস্তুর প্রদর্শন উভয়ই প্রমাণিত হয়। তদতিরিক্ত, শিল্পী যে প্রকারে একটা ঈশদ-বিষাদ-মণ্ডিত ভাব মুখমণ্ডলে আনিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাহার ভাবকতা এবং ভাবপ্রকাশে ক্ষমতা দেখা যায়—তিনি মুখ-



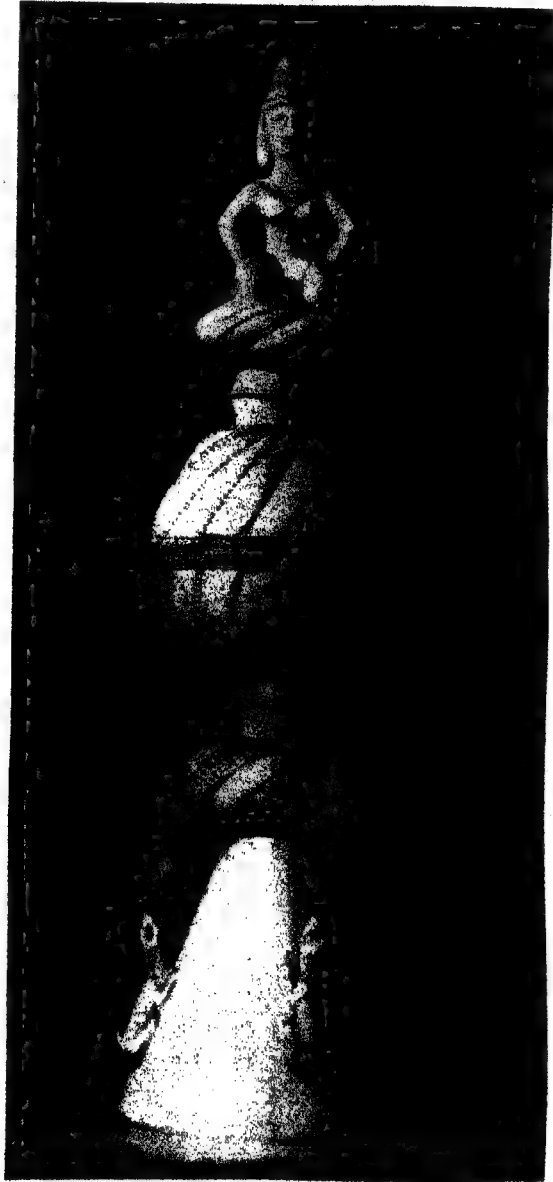
১। বেনিন্ হইতে আনীত ব্রঞ্জ ঢালা

নিগ্রো কস্তার মুখ

[ব্রিটিশ-মিউজিয়াম]

খানিতে এমন একটা কিছু আনিয়া দিয়াছেন, যাহার দ্বারা আমাদের আদর্শ-মতে মুখটা হৃদয় না হইলেও ইহাতে একটা আকর্ষণী শক্তি আনিয়া গিয়াছে।

এই খাত্ত-মুণ্ডটা দেখিয়াই চমকিত হইলাম—এ জিনিস পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে কি করিয়া আসিল? বিবরণী হইতে জানিলাম, ইহা “বেনিন্ হইতে আনীত ব্রঞ্জ-খাত্তে প্রস্তুত তরুণীর



১৩। বেনিন—হাতীর ধাতের কোটা

উপরে কস্তা-মুষ্টি, নীচে সর্প ও বাগদ

মুণ্ড।” আশে-পাশে আরও দুই তিনটি অল্পরূপ মুণ্ড ও অল্প মূর্তি আছে। বেনিন্ কোথায়, তাহা তখন জানিতাম না—পশ্চিম-আফ্রিকার কোথাও, এইটুকু মাত্র মিউজিয়মের লেবেল হইতেই বুঝিলাম। অল্প আলমারীতে দেখিলাম, এই বেনিন্ হইতে আনীত অল্প বহু শিল্প-দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। ঢালাই-করা ত্রজের পাটা বা ফসকের গায়ে নানা bas-relief বা নীচু কারিয়া গড়া চিত্র—নিগ্রো বোদ্ধা, অল্পচর-পরিত্রুত নিগ্রো রাজা, বোড়সওয়ার, কস্তা, এবং কুমীর ও মাহ প্রভৃতি জন্তু; বড় বড় অথও হাতীর দাঁত, তাহার গায়ে নক্ষায় কাটা নানা বোদ্ধার ছবি, শিকারীর ছবি খোদাই করা; ছোট ছোট হাতীর দাঁতের পুতুল; ত্রজের ঢালাই করা সুগের আকারে বড় বড় অলঙ্কারময়

এই শিল্প-সম্ভার দেখিয়া, আফ্রিকার—বিশেষতঃ পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের সম্বন্ধে আমার চোখ যেন খুলিয়া গেল আফ্রিকার অল্প অঞ্চলের শিল্পেরও নিদর্শন কিছু কিছু দেখিলাম—সব চেয়ে ভাল লাগিল কতকগুলি কাঠের মূর্তি।



৭। অল্পপৃষ্ঠে বেনিন্-রাজ



৮। বেনিন্ বোদ্ধা

বেনিন্ শিল্প—ত্রজের ঢালাই পাটা



৯। নিগ্রো মেয়ে—আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্র

পায়, লেঙুলির উপরে খোদাই-করা অথও হাতীর দাঁত খাড়া করিয়া রাখা হইত; কাঠে খোদাই মূর্তি নিমোড়ার মত কাঠে ভৈরবী খোদাই করা বসিবার আসন।

ব্রিটিশ-মিউজিয়মের দোতলায় Ethnological Gallery, একতলায় ব্রিটিশ-মিউজিয়ম গ্রন্থশালার পাঠাগার। নীচে পাঠাগারে আসিয়া, প্রথমেই মিউজিয়মের পুস্তক-প্রকাশ বিভাগ হইতে প্রকাশিত বেনিন্ হইতে আনীত সংগ্রহের বিবরণ গ্রন্থখানি আনাইয়া লইয়া পড়িতে লাগিলাম। পরে ক্রমে ক্রমে এ-বই ও-বই ঘাটিয়া আফ্রিকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ নিগ্রোদের একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া গেল।

এই ভাবে ভাঙ্গখা-শিল্পের—রূপ-কণ্ঠের—মারফৎ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে পরিচয়ের স্বত্বপাত হইল, আফ্রিকার কালো-মানুষদের সম্বন্ধে মনে মনে একটা আকর্ষণ, একটা অহুকম্পা, এমন কি একটা প্রীতির ভাবও অল্পভব করিতে লাগিলাম। “বহুধৈব হুচুকম্”—শিল্পের প্রসাদে এই ভাব আগরিত হইয়া, আফ্রিকার কালো-মানুষদের সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসু করিয়া দিল; ইহা একটা খুব বড় লাভ বলিয়াই আমি মনে করি।

যে দুই বৎসর লওনে কাটাই, তাহার মধ্যে চার মাস বাদে বাকী সমস্ত সময় ৩২ নং বেডফোর্ড প্লেস-এ, ব্রিটিশ-

মিউজিয়মের খুব কাছে, এক ওয়াই-এম-সী-এ ছাত্রাবাসে বাস করি। এই ছাত্রাবাসটিতে পঞ্চাশ জন ছেলে ছিল, তাদের মধ্যে আমি আর পরে একটা তামিল ছেলে, মাত্র আমরা দুই জন ভারতীয় ছিলাম; বাকী আটচল্লিশ জনের মধ্যে তিরিশ জন ব্রিটিশ, অর্থাৎ ইংরেজ, স্কট, ওয়েলশ, আইরীশ ছিল, এবং আঠার জন ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ছেলে। এই ছাত্রাবাসটা বেশ আন্তর্জাতিক স্থান হইয়া

সংস্কৃতি বিষয়ে জানিবার-শুনিবার ও পড়া-শুনা করিবার ঝোঁক হইয়াছে,—সুতরাং এই নিগ্রোটির সঙ্গে পরিচিত হওয়াতে আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু দুই চারিটা বিষয় ছাড়া



১০। ফরাসী শিল্পী এডারিস্ত-মঁ শেয়ার রচিত নিগ্রো যুবকের মূখ—ব্রঙ্কো টালা কাঠের বেলীর উপর

উঠিয়াছিল। কাছেই গিল্ডফোর্ড ষ্ট্রাট-এ অস্বরূপ আর একটা ওয়াই-এম-সী-এ ছাত্রাবাস ছিল—সেখানে দুই এক জন নিগ্রো ছাত্র বাস করিত। এইরূপ একটা নিগ্রো ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমাদের বেজফোর্ড প্রেস্-এর ছাত্রাবাস, আর গিল্ডফোর্ড ষ্ট্রাট-এর ছাত্রাবাস, উভয় স্থান হইতে জন ছয় মিলিয়া ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে আমরা একবার লণ্ডনের বাহিরে সারা দিনের জন্ত পল্লীভ্রমণে গিয়াছিলাম। ছয় জনের মধ্যে তিন জন ইংরেজ, এক জন সুইস, এক জন নিগ্রো, এবং আমি ভারতবাসী। নিগ্রো শিল্পের বিষয়ে ও নিগ্রোদের



১২। বেনিন—হাতের দাঁতের কৌটা

(টাকনীর মাথায় ইউরোপীয় জাহাজ, পাশায় ইউরোপীয় নিপাহী)

ইহার নিকট হইতে ইহাদের জাতির ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু খবর পাইলাম না।

ছেলেটির বাড়ী পশ্চিম-আফ্রিকার Nigeria নাই-

গিরিয়া দেশের বন্দর ও অন্ততম প্রধান নগর Lagos লেগস-এ। জাতি ও ভাষায় Yoruba য়োরুবা-জাতীয় নিগ্রো। লেগস-এর পূর্বে, সমুদ্রতীর হইতে একটু অভ্যন্তরে, বেনিন-নগরী। বেনিন-এর লোকদের Bini বিনি বলে, ইহার

তাহাদের এক দেবতা আছে, সেই দেবতার প্রতি সম্মান-জ্ঞাপক এই নাম—ইহার অর্থ “ইফে বা ইফার দান।” সে আমাকে আরও জানাইল, যে য়োরুবা জাতির মধ্যে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এখন মুসলমান, তিন ভাগের এক ভাগ



৫। পূর্ব-আফ্রিকার কিছু-জাতীয়া কলা।
ইংরেজ শিল্পী শ্রীমতী ডোরা ব্লক রচিত ব্রঞ্জ মূখ



১৪। য়োরুবা-দেশ—ইফে নগরীতে প্রাপ্ত মূর্তির মূখ

য়োরুবা হইতে পৃথক্ ভাষা বলে, তবে ইহারা ও য়োরুবারা অনেকটা একই জাতির শাখা। এই কথা শুনিয়া ইহার নিকট হইতে ইহার স্বজাতীয় লোকদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। আমার নিগ্রো বন্ধুটির নামটা ছিল N. A. Fadipe—এন, এ—এই দুইটা অক্ষর কোন্ কোন্ নামের আদ্য অক্ষর তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, তবে যতদূর মনে হইতেছে, এ দুইটা ইউরোপীয় বা খ্রীষ্টান নাম। Fadipe ফাডিপে ধর্ম্মে খ্রীষ্টান, তাই সে বড়-একটা নিজের জাতির পূর্ব-কথা সম্বন্ধে খোঁজ রাখিত না। য়োরুবারা সংখ্যায় কত, বেনিন-এর লোকদের সঙ্গে তাহাদের পার্থক্যই বা কোথা, সে সব কথা কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার নাম “ফাডিপে” শব্দের অর্থ কি তাহা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল যে এই নামটা একটা heathen বা তাহাদের আদিম ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নাম—Ifé ইফে বা Ifa ইফা নামে

খ্রীষ্টান এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ heathen বা আদিম-ধর্ম্মাবলম্বী। এই ধর্ম্মের দেবতাদের জন্ত বিভিন্ন গ্রামে রীতিমত ঠাকুর-ঘর আছে, পুরোহিত আছে, পূজা হয়। ইংরেজী-শিক্ষিত হইয়াও অনেকে পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই।

ইহার অধিক ফাডিপের কাছে জানিতে পারি নাই। ইফে দেবতা কে, তাহার শক্তি কি, সে বিষয়ে ফাডিপে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিল না। পরে John Wyndham সম্বলিত Myths of Ife (প্রকাশক Erskine Macdonald Ltd., London, 1921) নামক বই হইতে য়োরুবাদের দেবতাবাদ সম্বন্ধে কিছু খবর পাই, এবং এই বিষয়ে অন্ত বই দেখিবারও সুযোগ হয়। ফাডিপের বয়স কম, তাহার উপর মিশ-কালে চেহারায় নিগ্রো বলিয়া, একটু কিছু-কিছু করিয়া তাহাকে চলিতে হইত—আমার অতি কদম্ভ ভাবে সে বলিয়াছিল,

“আপনারা সভ্য জাতি, গায়ের রঙও আপনাদের ফসল, আমাদের অসুবিধা ও অপমান আপনারা বুঝিবেন না।”

ইহার পরে আর একজন য়োকবা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাঁহার নিকট হইতে য়োকবা এবং পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের সংস্কৃতি ও মনোভাব, সামাজিক রীতিনীতি ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক খবর পাই। তাহাতে এই জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আমার আরও অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। সে প্রসঙ্গ পরে করা যাইতে পারে।

মোটের উপরে, ব্রিটিশ-মিউজিয়মে বেনিন্ এর শিল্প-দ্রব্য দেখার পরে, এবং এই দুই জন য়োকবা ও পরে এক জন জুলুজাতীয় আফ্রিকানের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পরে, নিগ্রো জাতির সম্বন্ধে যে কৌতূহলের উদ্বেক হয়, তাহার ফলে পৃথিবীর এক বিশাল ভূভাগ যে জাতিদ্বারা অধ্যুষিত, নানা বিষয়ে যে জাতির স্বাতন্ত্র্য আছে, সেই নিগ্রো জাতিকে



৬। বেনিন—নিগ্রো য়োকবের মুখ
জন্মে ঢাকা

পরিবার স্বযোগ ঘটাইয়াছিল, তাহাদের শিল্প ও অস্ত্র কৃতিত্বের জন্ত তাহাদের প্রাণ্য মর্যাদা দিয়া, মনে মনে আমি বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছি।

[২]

আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার রূপ-রসিকগণের নিকটে একটা craze—যেন একটা পাগল-করা বিষয় হইয়া দাঁড়ইয়াছে। ইউরোপ ও



৩। লোম্বাদো হইতে আনীত—কাঠের মূর্তির অংশ

আমেরিকার অনেক কৃতী শিল্পী ও শিল্প-রসিক, বাহারা প্রাচীন মিসরী, গ্রীক, রোমান, গথিক, রেনেসাঁস প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের এবং যুগের শ্রেষ্ঠ রূপ-রচনার গুণাগুণের সহিত নব-দর্পণবৎ পরিচিত, হালের ইউরোপীয় শিল্পে বাহা তাঁহারা পাইতেছেন না এমন একটা উপভোগ্য বস তাঁহারা নিগ্রো শিল্পে পাইতেছেন। ইউরোপের আধুনিক শিল্প, মুখ্যতঃ গ্রীক ও রেনেসাঁস-যুগে পুনরুজ্জীবিত গ্রীক শিল্পের আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সব বিধয়ে ইউরোপে উন্নতি হইতেছে, কিন্তু সেদিন পর্যন্ত ইউরোপ শিল্প-বিষয়ে গ্রীক

রোমান ও ইতালিয়ান, বড় জোর বিজ্ঞানীনিয় ও গথিক যুগের কথাকে চরম কথা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল; গ্রীক-রোমান-ইতালিয়ান চোখ ছাড়া অল্প চোখেও যে রূপময় জগৎকে দেখা যায়, অল্প হাতেও যে তুলি টানা যায় বা ছেনী দিয়া কাটা



১১। পৌড়শ শতকের পোস্তাকে
ইউরোপীয় যোদ্ধা
ব্রজ পাটী—বেনিন

যায়, সে ধারণা ইউরোপের ছিল না। অথচ শিল্প-বিষয়ে ক্রমিক গ্রীক-রোমান-রেনেসাঁস যুগের পিষ্ট-পেয়ণ ও অন্ধ অহু করণের ফলে, ভিতরে ভিতরে ইউরোপের আত্মা গুমরিয়া মরিতেছিল। ঊনবিংশ-শতকের মধ্য-ভাগ হইতেই গ্রীক-রেনেসাঁস শিল্প-ধারার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া আসিতে আরম্ভ করিল—ফ্রান্স-দেশে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াও গ্রীক-রেনেসাঁস শিল্পের জাতি বাচাইয়াই হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ইউরোপের বাহিরের জগতের শিল্পের খবর ইউরোপের কাছে পৌঁছিল—ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদের মাঝামাঝি জাপানী শিল্পের সৌন্দর্য ইউরোপের শিল্প-রসিকদের মোহিত করিয়া দিল, এবং পরে চীনা ও মুসলমান শিল্পের (ও কিছু পরে চীনা সাহিত্যের) বাণীও ইউরোপের চোখে (ও কানে) পৌঁছিল; এবং বিংশ-শতকের প্রারম্ভ দশক হইতেই ভারতের তথা বৃহত্তর-ভারতের শিল্পের সার্থকতা ও সৌন্দর্য, ইহার গুণীভূততা ও অন্তর্গুণিতা ইউরোপকে আকৃষ্ট করিল।

এই-সব শিল্প-জগৎ কিন্তু হুসভা মানবের শিল্প-জগৎ। এই সব জগতের শিল্পের পিছনে শত শত বর্ষের চিন্তা ও সাধনা এবং চর্চা ও পটুতা আছে। এগুলি আসিয়া ইউরোপের চিন্তাকে মথিত করিল বটে, কিন্তু তাহাকে মূলোৎখাত করিল না—কারণ এইসকল শিল্প-জগতের সহিত ইউরোপের বিভিন্ন শিল্প-ধারাও একটা স্বাভাৱ্য, একটা সাধন্য আছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের চীনা বুদ্ধমূর্তি, গথিক যুগের ইউরোপীয় খ্রীষ্টান দেবমূর্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়; মহাশলিপুত্রের ভাস্কর্যের হৃদয় ও শক্তি-বাক্যক সৌন্দর্য দেখিয়া মিসর ও গ্রীসের শ্রেষ্ঠ শিল্পের কথা মনে আসে; অজ্ঞাতার চর্চা ও প্রাচীন ইতালিয়ান ভিত্তি-চিত্র—উভয়কে মিলাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়।

বার্থ অহু করণ ও গতানুগতিকতায় গাহারা অন্ধত্ব অহুভব করিতেছিলেন এমন বহু ইউরোপীয় শিল্পী, বাহিরের



১২। তিন কস্তা
ব্রজ পাটী—বেনিন

শিল্পের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের অধুনাতন মৃতপ্রায় গ্রীক-রেনেসাঁস শিল্প-ধারার বিরুদ্ধে বিরোধো ঘোষণা করিলেন। প্রাচীন মনোভাব এবং প্রাচীন পদ্ধতিকে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া, গোড়া হইতে নূতন ভাবে শিল্প-গঠনের প্রয়াস করিলেন।

ইংরাজী ফলে আধুনিক শিল্পে Futurism, Cubism প্রভৃতি নতুন তত্ত্বের ও ধারার প্রবর্তন। এই ভাঙ্গনের ও নতুন সৃষ্টির কার্যে তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহস ও অনুপ্রাণনা পাইলেন, আফ্রিকার নিগ্রোদের (তথা ওশেনিয়ার দীপপুঞ্জের এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের) মৌলিক ও আদিম শিল্প হইতে; - বিশেষ করিয়া আফ্রিকার ভাস্কর্য শিল্প হইতে—মধ্য আফ্রিকার ও পশ্চিম-আফ্রিকার কাঠের মূর্তি ও মুখস হইতে এবং পশ্চিম-আফ্রিকার খাতুমূর্তি ও অস্ত্র শিল্প হইতে।

এই শিল্পে যে জগতের বাণী ইউরোপের কাছে আসিল, যে ভাব-ধারার সন্ধান ইউরোপ পাইল, তাহা একেবারে নতুন, এবং প্রচলিত সমস্ত শিল্প-সংস্কারের মূলোচ্ছেদকারী। কতক-গুলি মৌলিক বিষয়ে এই শিল্প-জগতের সহিত ইউরোপীয় শিল্প-জগতের এবং ইউরোপ কর্তৃক নবাবিস্কৃত এশিয়ার হুম্বা জাতিগণের শিল্প-জগতের সাদৃশ্য নাই। তীর্থ আধাতে এই শিল্প ইউরোপের শ্রাস্ত ও নিভ্রাতুর শিল্প চেতনাকে যেন উজ্জীবিত করিতে চাহিতেছে। এই নবীন সৃষ্টিভাৱের ফলে, আধুনিক ইউরোপীয় তথা সার্কভোম শিল্প কোন্ পথে চলিবে, কি ভাবে প্রভাবান্বিত হইবে, তাহার বিচার করার সময় এখনও আসে নাই।

নিগ্রো শিল্প হইতে ইউরোপ একটা কিছু পাইয়াছে, নিশ্চয়ই; তাহা না হইলে, ইহার এতটা আলোচনা হইত না, নিগ্রো শিল্পের চিত্র ও ইহার পরিচয় লইয়া এত বই প্রকাশিত হইত না। এই সব বইয়ের উদ্দেশ্য যাত্রা ethnological বা আদিম-সংস্কৃতি-তত্ত্ব লইয়া নহে—ইহাদের উদ্দেশ্য, দৌন্দর্য্য-তত্ত্ব বিষয়ক। এখন, নিগ্রো শিল্পে ইউরোপ কি পাইয়াছে, বা ইহা হইতে কি পাইবার প্রয়াস করিতেছে—ইহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউতে পারে।

এই শিল্পে ইউরোপ পাইয়াছে, সভ্যতার সহস্র কৃত্রিমতা হইতে মুক্ত আদিম মনের পরিচয়। আধুনিক ইউরোপ সংস্কারের দাস; - বিশেষ করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প। একটা বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাস লইয়া নিগ্রো প্রতিমা-নির্মাতা অপটু হস্তে তাহার মনের মধ্যে নিহিত আদর্শ বা ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। শিক্ষা বা পরম্পরাগত রীতির স্থান এখানে নাই; মানসনেত্রে দেখা কল্পনা, এবং কতকটা নিয়ন্ত্রিত

ও কতকটা অনিয়ন্ত্রিত হাতের গতি—এই দুইয়ে মিলিয়া রূপ-সৃষ্টি করিল। কোন কোন স্থলে এই দুইয়ে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই; যেখানে পারিয়াছে, সেখানেই স্বার্থ শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। পারক আর নাই পারক, মোট কথা, এই শিল্প রচনার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেছে, সারল্য ও নিকপটতা। এখানে চটক দেখাইবার প্রয়াস মোটেই নাই, অথবা বাহার প্রতি সভ্যতার দরদ নাই তাহাকে রূপ দিয়া তাহার প্রতি দরদ দেখাইবার ভাণ নাই। এই নিকপটতা-গুণই বোধ হয় আধুনিক ইউরোপের শিল্পে বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত; এবং সেই জগুই এই আদিম ও শিশুচিত নিকপটতা ইহার একটা প্রধান আকর্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই শিল্পে ইউরোপ যে plastic quality বা রূপ দোতনার ভক্তি পাইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ-রূপে নতুন,—ইউরোপের শিল্প-চেতনায় তাহা অপূর্ণ। নিগ্রো শিল্প মূর্ত্যঃ মূর্তির শিল্প, ইহা চিত্রের শিল্প নহে। ছুতার ও কুমার, কামার ও কাঁসারী,—ইহারা ইহল ইহার শিল্পী, পটুয়ার স্থান ইহাতে নাই। নিগ্রো শিল্প-রীতিতে রচিত মূর্তির পরিকল্পনার এবং গঠনের আধার বা প্রাণ হইতেছে—ইহার নিরেট বস্তুত্ব। ইউরোপীয় ভাস্কর্য-মতে রচিত মূর্তির পরিকল্পনার আধার এই যে, ইহাকে সামনে হইতে চিত্রবৎ দেখিতে হইবে। এইরূপ একটা উদ্দেশ্য হুম্বা জাতিগণের মধ্যে সৃষ্ট মূর্তি-শিল্পে যেন অন্তর্নিহিত আছে - ভাস্কর্য সমতল ক্ষেত্রের পটভূমিকার সমক্ষে চিত্রবৎ দণ্ডায়মান। হুম্বা জাতিসমূহের মধ্যে ভাস্কর্য যে ভাবে সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়, তাহার জন্যই এই প্রকার চিত্র-রীতিই ইহা ছিল ভাস্কর্যের আদিম আধার বা প্রেরণা। দেবমূর্তিকে মন্দিরের দেওয়ালের দিকে পিছন করিয়া রাখা হইত—দেওয়াল যেন background বা পটভূমিকা, মূর্তি চিত্রবৎ স্থাপিত। মিসরীয়, গ্রীক, ভারতীয়, গথিক প্রভৃতি ভাস্কর্যে in the round মূর্তি পরে গঠিত হইলেও, এই বিভিন্ন সভ্য দেশের ও কালের ভাস্কর্য-রীতির একই মূল প্রেরণা—ভিত্তি-গায়ে স্থাপিত করিয়া রাখিবার জগুই মূর্তি-নির্মাণ। নিগ্রো শিল্প এ বিষয়ে, মূর্তি বা বস্তুর বাস্তব অবস্থান সম্বন্ধে, আরও অনেকটা বেশী সচেতন। সভ্যতার মূর্তি বা বস্তু যেমন in the round থাকে, অর্থাৎ ঘুরিয়া চারি দিক হইতে দেখিবার

জ্ঞাত যেমন ইহার অবস্থান, নিগ্ৰো শিল্প তদনুসারে সৃষ্ট দুই-চারিটা রেখা টানিয়া মানুষের খড়ের বা মুণ্ডের ছবি আঁকা যায়, সেই ছবির মধ্যেই ভাস্কর্যের বা প্রতিমা-শিল্পের বীজ উপলব্ধ থাকে। আবার একটা বড় কল বা গোলক, গাছের গুঁড়ি অথবা cylinder অর্থাৎ সমবর্ত্তুল বস্তু দ্বারাও মানুষের মুণ্ডের বা দেহের স্ফোতনা হইতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতি নিগ্ৰো ভাস্কর্যের অন্তর্নিহিত পদ্ধতি। এই solid, in the round অর্থাৎ যাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে পারা যায় এমন plastic quality অর্থাৎ রূপ-স্ফোতনার গুণ থাকায়, নিগ্ৰো ভাস্কর্যের জাতি, সভ্য জাতির ভাস্কর্যের জাতি হইতে স্বতন্ত্র। ইউরোপীয় শিল্পবিদগণ এইখানে একটা নূতন জিনিস পাইয়াছেন, এবং ইহাকে আশ্রয় করিয়া, নূতন ভাবে রূপ-সৃষ্টিতে, প্রতিমা-গঠনে লাগিয়া গিয়াছেন।

নিগ্ৰো ভাস্কর্যের তৃতীয় লক্ষণীয় গুণ—ইহার ছন্দোময়ত্ব। মানব-দেহের আদর্শ কল্পনা করিয়া, মানবদেহাঙ্কুরী অস্তিমানব মূর্তি অথবা দেবমূর্তি সৃষ্টি করা যায়; হুসভা জাতিগুলির প্রতিমা-ভাস্কর্য এই লক্ষণাক্রান্ত। আবার অস্তিমানব বা দেবতার কল্পনা বজ্জন করিয়া, কেবল মানব-দেহের যথার্থ অঙ্কুরণ করিয়াও প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করা যায়; হুসভা জাতির ভাস্কর্যে এইরূপ realistic বা বাস্তবাত্মক রীতিও সাধারণ। এতদ্ভিন্ন, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লোচন-গ্রাহ্য রূপের উচ্চাচলকে আশ্রয় করিয়া একটা যে ছন্দ আছে, মাত্র সেই ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সেই ছন্দকেই প্রাধান্য দিয়া, মূর্তি সৃজন করা যায়। নিগ্ৰো শিল্পে প্রাকৃতিক বস্তুর যথার্থ অঙ্কুরণের চেষ্টাও আছে। তবে মুখ্যতঃ ইহার প্রেরণা—বস্তুর বাহ্য বা রূপ-গত ছন্দকে আকারে ধরিবার চেষ্টা,—প্রতিকৃতিকে নহে; অথবা, প্রতিকৃতিকে আধার করিয়া কল্পিত আদর্শকে রূপের দ্বারা ধরিবার চেষ্টার মধ্যে ইহার রসসৃষ্টির উৎস নিহিত নহে; বরঞ্চ, বাহ্য সৌম্য ও ছন্দোগতিকই প্রাধান্য দিয়া, সেই সৌম্যকেই দৃষ্টি-গোচর করাইয়া ইহার অন্তর্নিহিত ছন্দটিকে রূপে প্রকট করা এই শিল্পের উদ্দেশ্য। অতএব, বাস্তবের আধারেরই উপরে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর দর্শন সম্পন্ন উপরে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত প্রাচীন হুসভা জাতির শিল্পের মত, নিগ্ৰো শিল্প কল্পনাত্মক অথবা কল্পনাবাহী বস্তু-অঙ্কুরিত নহে।

নিগ্ৰো ভাস্কর্য নিগ্ৰো জাতির প্রাচীন ধর্ম ও দেবতা-বাদের বাহন—অতএব ইহা উদ্দেশ্যমূলক শিল্প; এই জ্ঞাত অনেকের কাছে ইহার একটা বিশেষ সার্থকতা ও মূল্য আছে—সে সার্থকতা বা মূল্য আমাদের আজকালকার বহু উদ্দেশ্যহীন শিল্প-প্রচেষ্টার মধ্যে নাই। দেব-মূর্তি বা দেব-প্রতীক, মৃতের মূর্তি, মৃগ, মাতৃ-মূর্তি বা কুমারী-মূর্তি—এ সমস্তই বাস্তব রূপের অন্তর্নিহিত ছন্দকে প্রকট করিয়া দেয়, এগুলিকে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতীক-স্বরূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা মাত্র।

নিগ্ৰো শিল্প সংক্ষেপে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ইহা আদিম অরণ্যবাসী জাতির শিল্প। হুসভা নগরবাসী জাতির শিল্পে যে-সকল বিরাট জিনিস পাই, সে রূপ জিনিস ইহাতে নাই। উচ্চকোটির বাস্তব-শিল্প নিগ্ৰোদের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই—বিরাট বিশাল দেবায়তন ও অগ্নি ইয়ারত ইহাদের মধ্যে নাই। রাজারাজি মারির বা কাদের দেওয়াল, খড়ে বা পাঁতাঘর ছাওয়া চালা ঘরে বাস করিত। একমাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকার Rhodesia-তে Zimbabwe জিহাংগো এ শুষ্ক পথে বিশাল দেওয়াল ও অগ্নি ইয়ারত পাওয়া যায়, সেগুলি হয় তো অতি প্রাচীন কালে বাণ্টু-জাতীয় নিগ্ৰোরা তৈয়ারী করিয়াছিল; কিন্তু নিগ্ৰো বাস্তব-শিল্পে, Zimbabwe ও তদ্রূপ সন্নিকটবর্তী স্ত্রী দুই-একটা জায়গার বাস্তব-রীতি একক ও অধিতীয় বস্তু। ছবি আঁকার রীতিও উহাদের মধ্যে জন্মলাভ করে নাই। বড় বড় মূর্তিও অজ্ঞাত। যে প্রকারের শিল্প ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাকে Major Arts অর্থাৎ উচ্চকোটির শিল্প বলা চলে না, তাহা Minor Arts and Crafts অর্থাৎ লঘুশিল্প ও কারুশিল্পের প্যাংগেই পড়ে। ভাস্কর্যে আবার নিগ্ৰোদের মধ্যে পাথর ব্যবহার হইত না—অথবা খুব কম হইত, মাত্র দুই-চারিটা প্রাচীন পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে; কাঠ, খাত্ত, মাটি, হাতীর দাঁত—এইগুলিই প্রধান উপাদান ছিল।

নিগ্ৰো শিল্পের বহু নিদর্শন ও চিত্র দেখিয়াছি। ইহার মধ্যে সবগুলিই আমার ভাল লাগে না; অনেকগুলি বুঝি না, ধারণাই লাগে—দুই-চারিটা প্রবন্ধ বা বই পড়িয়াও এইরূপ কতকগুলি মূর্তি বা মূখ্যের মধ্যে রসের কোনও হৃদিস পাই না। তবে মোটামুটি, ইহার একটা আকর্ষণ অস্বাভাবিক। প্রাচীন মিসরীয় ভাস্কর্য, খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রীক ভাস্কর্য,

মহাবলিপুত্রের ভাস্কর্য, চীনা প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রাচীন চীনা ও জাপানী বৌদ্ধমূর্তি, রাজপুত্র চিত্রকলা, মিসরের ও সিরিয়ার মসজিদ, বিজ্ঞানসৌন্দর্য ও গণিক গির্জা—এ সব প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি; সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো ভাস্কর্যকেও ফেলিতে পারি না; এবং নিগ্রো শিল্পের কতকগুলি মূর্তিকে অল্প জ্ঞাতির শ্রেষ্ঠ শিল্পের পাশে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইব না। তবে সাধারণতঃ আমার নিজের কাছে নিগ্রো জাতিঃ—নিগ্রো সংস্কৃতির—নিগ্রোদের মধ্যে উদ্ভূত ভাব-জগতের—নিগ্রোদের জীবনের মধ্যে বিদ্যমান স্থল ও দুঃখের, প্রেম ও বিরোধের, ভয় ও আনন্দের প্রতীক হিসাবেই নিগ্রো শিল্প ভাল লাগে—ইহার আভাস্তরীণ শিল্প-প্রেরণা এবং গঠন-রীতি সব সময়ে আমার রস-গ্রহণের কারণ হয় না; ইহার মানবিকতাই আমার কাছে ইহার প্রধান গুণ বলিয়া লাগে।

[৩]

নিগ্রো শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ দিবার যোগ্যতা আমার নাই—শিল্প-সমালোচক নহি, কেবল ভাল লাগে বলিয়াই একটু দিগ্‌দর্শন করাইবার চুঃসাহস করিতেছি। কতকগুলি আপাত-রমণীয় মূর্তি চিত্র দেখাইব মাত্র; ইহাদের সৌন্দর্য বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বেশী টীকা-টিঙ্গনই অনাবশ্যক। যে সকল মূর্তি দেখিলেই সাধারণ শিল্প-রসিক ব্যক্তিমাত্রকেই আকৃষ্ট করিবে, এই প্রকারের সহজবোধ্য ভাস্কর্য ও অল্প শিল্প-জ্ঞানের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আবশ্যক; প্রথম দর্শনেই যাহা কিছু ত-কিমাকার বা কুংসিত মনে হইবে, যাহা অত্যন্ত প্রচণ্ডভাবে আমাদের শিল্প-চেতনা ও কচিতে আঘাত দিবে (কিন্তু যাহার মধ্যে সত্যসত্যই গুণ আছে)—এইরূপ শিল্প-জ্ঞা, প্রথম সহাস্ত্রভূতি উদ্বেকের পরে দেখাই শ্রেয়ঃ; আলোচ্য শিল্প-রীতিতে একটু প্রবেশলাভ হইলে, পরে এইরূপ নিদর্শন বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

যে যে দেশ-কাল-পাত্র ধরিয়া নিগ্রোদের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং উঠিতেছিল, সেই সেই দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে কতকগুলি অবশ্য-জ্ঞাতব্য কথা বলিব।

সমগ্র আফ্রিকা-খণ্ডে মোটামুটি পাঁচটা মূল জাতির বাস ছিল, ইহাদেরই মিশ্রণে মাজকালকার আফ্রিকার নানা জাতির উদ্ভব। এই পাঁচটা মূল জাতি হইতেছে—

১। হামীয় জাতি (Hamites)।

২। শেমীয় জাতি (Semites)।

৩। নিগ্রো—[ক] বিস্তৃত নিগ্রো বা হুদানী; [খ] বাণ্টু (Bantu) নিগ্রো।

৪। নিগ্রোবটু (Negrito) বা বামন জাতি (Pygmies)।

৫। বুশমান (Bushman) ও হটেন্টট (Hot-tentot) জাতি।

হামীয় জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে উত্তর-আফ্রিকায় ও পূর্ব-আফ্রিকায় বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইহারা খেত জাতিরই শাখা—নিগ্রো হইতে ইহারা একেবারে পৃথক—ইহারা দীর্ঘ নাসিকায়ুক্ত, লম্বকেশ, নিগ্রোদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ও সুব্যবস্থ। প্রাচীন মিসরের হুসডা অধিগণিগণ এই হামীয় জাতিরই শাখা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে হামীয়গণ উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকায় অবস্থিত আপনাদের আদিম বাসভূমি হইতে মধ্য- ও দক্ষিণ-আফ্রিকায় নামিয়া আসিয়াছে, এবং মধ্য- ও দক্ষিণ-আফ্রিকার নিগ্রোদের জয় করিয়া তাহাদের উপরে রাজ্য হইয়া বসিয়াছে, রক্তের সংমিশ্রণ করিয়া বহু স্থানে নতুন নতুন হামীয়-নিগ্রো মিশ্র জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা নিজেরা এখন শেমীয় জাতির (আরবদের) চাপে বিপন্ন। মুসলমান ধর্ম-প্রচারের ফলে আরবেরা একতাবদ্ধ হইল, এবং দ্বিধিক্রয় করিতে বাহির হইল। মুসলমান আরবেরা মিসরের প্রাচীন ও হুসডা জাতিকে জয় করিল—অতি দীর্ঘ সমস্ত উত্তর-আফ্রিকা জয় করিয়া ফেলিল। শেমীয়দের ভাষা ও হামীয়দের ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাম্য আছে—পণ্ডিতদের মতে, উভয় শ্রেণীর ভাষার মূল এক। শেমীয় জাতি খেত জাতির অন্তর্ভুক্ত, ইহারা প্রাচীন জাতি, বাবিলন আদিরিয়া সিরিয়া প্রভৃতি দেশে ইহারা বড় বড় সভ্যতার পত্তন করে। কিছু পরিমাণ শেমীয়, দেড় হাজার বৎসরের অধিক হইল, আরব দেশ হইতে আসিয়া আফ্রিকার আবিসিনিয়া অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়,—এইরূপে আফ্রিকায় শেমীয়দের প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটে। ইতিপূর্বে সিরিয়া হইতে শেমীয়েরা আসিয়া মিসর আক্রমণ করিত, মিসরে উপনিবেশ স্থাপন করিত, কিন্তু ইহারা প্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই; আফ্রিকায় আসিয়া শেমীয়েরা নিজেদের ভাষা ভুলিয়া যাইত, হামীয়দের সঙ্গে মিশিয়া

যাইত। পরে উত্তর-আফ্রিকার হামীয় জাতি আরবদের অধীন হইল, মুসলমান হইল,—হামীয় ভাষাও ধীরে ধীরে আরব ভাষার চাপে পড়িয়া বিনুশ হইতে লাগিল। এখন মিশরের লোকেরা প্রায় সব আরব-ভাষী হইয়া গিয়াছে। আরবেরা দাস-ব্যবসায়ে রত ছিল, ইহারা ক্রীতদাস ধরিয়া আনিবার জন্য মধ্য-আফ্রিকা পর্যন্ত ধাওয়া করিত। ইহাদের দ্বারা নিগ্রোদের মধ্যেও ইসলাম ধর্মের প্রচার হইয়াছে। মোটের উপর, শেষীয় আরবদের আফ্রিকায় আগমন হাজার বারশ' বছরের অধিক নহে, এবং এই শেষীয় জাতির আগমনে হামীয়দের ও নিগ্রোদের জাতীয় সংস্কৃতি প্রায় সর্বত্রই বিশেষভাবে সঙ্কুচিত ও খর্ব হইয়াছে।

নিগ্রো জাতিই আফ্রিকার বিশিষ্ট জাতি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, হামীয়দের সঙ্গে নিগ্রোদের বহুস্থলে খুবই মিশ্রণ ঘটিয়াছিল; ফলে সেই সব স্থলে নূতন মিশ্র জাতির উদ্ভব হইয়াছে—এই সকল জাতিতে এখন নিগ্রো বৈশিষ্ট্য কম বিদ্যমান। ফরাসী অধিকৃত স্থানের Pul, Ful, Peul (পুল, ফুল বা পোল্) জাতি এই রূপ একটি মিশ্র জাতি। ইহাদিগকে পৃথক্ ধরা উচিত।

নিগ্রোরা দুইটা বর্ণে বা শ্রেণীতে পড়ে [ক] বিস্তৃত নিগ্রো; ইহাদের বাস পশ্চিম-আফ্রিকায়—আটলান্টিক-সমুদ্রের অংশ গিনি-উপসাগরের উত্তরে ও সাহারা মরুর দক্ষিণে যে ভূভাগ, সেই ভূভাগে; মোটামুটি—Senegal সেনেগাল, Gambia গাম্বিয়া ও Niger নিগের বা নাইগার—এই তিনটা নদীর দ্বারা ঘেঁষা দেশে, এবং উত্তর-মধ্য-আফ্রিকার কতক অংশে। বিস্তৃত নিগ্রোদের মধ্যে আদি নিগ্রো রূপটুকু অবিমিশ্র ভাবে বিদ্যমান। নানা ভাষা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু এই-সব ভাষার মধ্যে একটা প্রকৃতি-গত মিল আছে। [খ] আফ্রিকার উপদ্বীপীয় অংশে, আটলান্টিক-সমুদ্রের পূর্বে ও ভারত-সমুদ্রের পশ্চিমে লবমান যে

অংশ, সেই অংশে বাণ্টু-নিগ্রোদের বাস। এই বাণ্টু-নিগ্রোদের ভাষা, স্থানীয় বা বিস্তৃত নিগ্রোদের ভাষা হইতে পৃথক্, ইহাদের সংস্কৃতিও পৃথক্; ইহারা বিস্তৃত নিগ্রোর সহিত অতি প্রাচীনকালে সংঘটিত অল্প-বিস্তর হামীয়দের মিশ্রণের ফল। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া মধ্য-আফ্রিকায় হামীয়েরা ধীরে ধীরে নিগ্রোদের সঙ্গে রক্ত-মিশ্রণ করিতেছিল; তাহার ফলে দুই জাতির লক্ষণাক্রান্ত, রক্তে নিগ্রোর প্রাধান্যবৃত্ত কিন্তু সংস্কৃতিতে বেশীর ভাগ হামীয় প্রভাব পুঁই, একটি বিশিষ্ট মিশ্র হামীয় নিগ্রো জাতির সৃষ্টি হয়। মধ্য-আফ্রিকায় এই হামীয় মিশ্রণের ফলে, নিগ্রোর প্রকৃতি ও বাহ্যরূপ আমূল পরিবর্তিত হইল না। অনেকটা বজায় রহিল,—ইহারা একেবারে নূতন একটি মিশ্রজাতি হইল না, কিন্তু বিকৃত হইয়া একটু অল্প ধরণের নিগ্রো হইল; এইরূপ হামীয় প্রভাবে বিকৃত, ভাষায় পৃথক্‌কৃত নিগ্রোদের “বাণ্টু” খণ্ডা দেওয়া হইয়াছে।

নিগ্রোবাণ্টু (Negrito) জাতি বামন আকারের, ইহাদের উল্লেখযোগ্য কোনও সংস্কৃতি নাই। বৃশমান ও হট্টোটগণ



একই মূল জাতির দুই বিভিন্ন শাখা, ইহার পীতকায়, নিগ্রোদিগের হইতে ইহার সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। প্রাচীনকালে বৃশমান ও হট্টেট জাতি পর্শতগুহার গায়ে মাতৃষ ও নানা পশুর বেশ প্রাপবন্ত চিত্র আঁকিত; উপস্থিতকালে ইহার ক্ষয়িক্ষ, ধনসোমুখ জাতি; এখন ইহাদের কোনও শিল্প নাই।

নিগ্রো শিল্প মুখ্যতঃ বিস্তৃত নিগ্রোদের মধ্যে এবং বাণ্টু-নিগ্রোদের কতকগুলি শাখার মধ্যে—যে সব শাখা বিস্তৃত নিগ্রোদের সান্নিধ্যে বাস করে,—বেলজিয়ান কঙ্গো, ফরাসী বিদ্যুৎ-বৃত্তাধিকৃত আফ্রিকায় (French Equatorial Africa) ও কামেরুনে, সেই সব শাখার মধ্যে—উদ্ধৃত হইয়াছিল। বাণ্টু-নিগ্রোরা তিনটা প্রধান বিভাগে পড়ে—(১) পশ্চিমী—ইহার মধ্যে কঙ্গো দেশের বাণ্টু উপজাতিরা পড়ে, ইহারাই প্রধান শিল্পশ্রষ্টা; (২) পূর্বী—ইহাদের মধ্যে “বাগা” ও “হুআহিনি” জাতিদ্বয় প্রধান, শিল্প-বিষয়ে ইহাদের তেমন কৃতিত্ব নাই; এবং (৩) দক্ষিণী—জুলু, বেরুমানা, সোআঙ্গী প্রভৃতি জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত; শিল্প বিবয়ে ইহারাও বিশেষ কৃতি নহে। মোটামুটি, গিনি-উপসাগরের উত্তরে ও পূর্বে আফ্রিকার যে অংশ পড়ে, সেই অংশেই নিগ্রো শিল্পের চরম বিকাশ হইয়াছিল; Ivory Coast (Cote d'Ivoire), Gold Coast, Togoland, Dahomey, Southern Nigeria, Kamerun, Spanish Rio Muni, French Equatorial Africa-র দক্ষিণ ভাগ ও Belgian Congo - মোটামুটি এই কম দেশের নিগ্রোরাই (বিস্তৃত নিগ্রো ও বাণ্টু) সভ্যতার শিল্প সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে; অল্প স্থানের নিগ্রোগণ—যথা, ইংরেজাধিকৃত স্যুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়া (Kenia), মোসাম্বিক বা পোর্চুগীস পূর্ব-আফ্রিকা, তাংগানিকা (Tanganyika), রোডেসিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকার সংযুক্ত রাষ্ট্র, ডামারালান্ড ও নামাকোয়ালান্ড এবং আঙ্গোলা বা পোর্চুগীস পশ্চিম-আফ্রিকার বাণ্টু-নিগ্রোগণ তথা বৃশমান ও হট্টেটগণ—ইহারা কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। গিনি-উপসাগরের উত্তরে সমুদ্রতীরবর্তী যে কয়েকটা দেশের নাম করা হইল—Ivory Coast, Gold Coast, Togoland, Dahomey ও Nigeria-র দক্ষিণ অঞ্চল—সে কয়টা দেশেই নিগ্রো সংস্কৃতি সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি ও স্বাভাবিক রক্ষা করিয়া

আদিতে পারিয়াছে—সেখানে উত্তর হইতে মুসলমান প্রভাব ততটা আদিতে পারে নাই। গিনি-উপসাগরের তটবর্তী এই কয়টা দেশের উত্তরে যে নিগ্রোরা থাকে—French Upper Soudan-এ, Senegal ও Niger Colony তে এবং British Northern Nigeria-তে—তাহারা বিশেষভাবে হামীয় ও আরব মুসলমানদের প্রভাবে পড়িয়াছে, কাজেই তাহাদের উল্লেখযোগ্য জাতীয় শিল্প আর কিছুই নাই।

যে যে স্থলে নিগ্রোদের মধ্যে শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, সেই স্থলগুলি অরণ্য-সম্বল। আদিম অরণ্যের মধ্যে খানিকটা করিয়া জমি সাফ করিয়া ছোট বড় বহু গ্রাম; অধিবাসীরা অল্প-স্বল্প চাষ করে—কলা, সীম জাতীয় কড়াই, নারিকেল, চীনাবাদাম, এবং তালজাতীয় একপ্রকার গাছ, বাহার ফল হইতে খাদ্য-তৈল বাহির করে; এবং পোর্চুগীসদের দ্বারা আমদানী করা ফসল—ভুট্টা, yam বা চুপডু-আলু ও manioc বা সামু-জাতীয় শ্বেতসার; এবং ইহারা জঙ্গলে শিকার করে। ইহারা মাথাবার বা গোপালক জাতি নহে, স্থিতিশীল কৃষক ও শিকারী জাতি। এই স্থিতিশীলতা—এক জায়গার মাটি ধরিয়া বসিয়া থাকা—শিল্প-বিষয়ে ইহাদের সাফল্যের অগ্রতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

বিস্তৃত নিগ্রোদের ও তাহাদের প্রতিবেশী কতকগুলি বাণ্টুদের রূপ-শিল্পেরই জয়জয়কার; শিল্পমধ্যে, অল্প নিগ্রোরা কেবল দেবতা-বাদে বা আমাদের হিতোপদেশ পদ্ধতি গ্রহণ মত পশুবিষয়ক উপাখ্যান-রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনকে প্রণিয়ত্ব করিয়া রাখা বিষয়ে, এবং সব রকমের শিল্প বিষয়ে, বিস্তৃত নিগ্রোরাই অগ্রণী। আফ্রিকা হইতে যে সব নিগ্রো ক্রীতদাস আমেরিকায় নীত হয়, তাহারা প্রায় সকলেই বিস্তৃত নিগ্রো বংশীয় ছিল; গিনি-উপসাগরের উত্তরের দেশ হইতেই তাহারা গৃহীত হয়। আমেরিকায় উহার ইংরেজী (অথবা স্পেনী বা ফরাসী) ভাষী হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের নিগ্রোদের মধ্যে এখন সাহিত্য (অথবা ইংরেজী ভাষায়) গড়িয়া উঠিতেছে; হেট্টে-দীপের কতক অংশে নিগ্রো ফরাসী বলে, ফরাসীতেও তাহারা সাহিত্য রচনা করিতেছে। সঙ্গীতে এই নিগ্রোরা আধুনিক সভ্য জগৎকে দুই একটা নতুন জিনিস দান করিয়াছে—Jazz Music-কে

যতই নিন্দা করা যাউক, উহার একটা আকর্ষণী শক্তি স্বপ্নভা ইউরোপকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, এবং এই Jazz বাদ্য, আমেরিকায় নূতন অবস্থা-গতিক পরিবর্তিত নিগ্রোদেরই সৃষ্টি। আফ্রিকায় নিগ্রোদের বাদ্যের মধ্যে ছিল কেবলমাত্র কাঠের গুঁড়ি ফাঁপা করিয়া তৈয়ারী ঢোল; এই ঢোল খালি নাচের জন্য বাজান হইত;—দূরে সংবাদ পাঠাইবার জন্যও ঢোল বাজাইত, ঢোলের বিভিন্ন বুলি টেলিগ্রাফের টকা-টরের মত কাজ করিত। Jazz band-এর মুখ্য প্রয়োগও নচের জন্য। নিগ্রোদের চরিত্রে একটা গভীর বিশ্বাসের ও আত্মসমর্পণের এবং সেই সঙ্গে বিশ্বাসের ভাবও দেখা যায়। আমেরিকায় এই ধর্ম-বিশ্বাস ও বিশ্বাসময়

সেই ভাবটা, কৃতদাস অবস্থায় বহু অত্যাচার সহ্য করায় নিগ্রোদের মধ্যে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। আমেরিকার নিগ্রোরা খ্রীষ্টান হইয়াছে, ধর্ম-সঙ্গীতে ও করণসামগ্রিক সঙ্গীতেও কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, আফ্রিকা হইতে যে সকল পশু-বিষয়ক আখ্যান উহার লইয়া গিয়াছিল, সেগুলি আমেরিকায় সংগৃহীত হইয়া, “নিগ্রোদের হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্র” গ্রন্থ-স্বরূপ বিদ্যমান। এই সব বিষয়, বিশুদ্ধ নিগ্রোদের প্রকৃতিতে বা স্বপ্ন মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক।*

* আগামী সংখ্যায় সমাপ্য। এই সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্রাবলীর বর্ণনা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ্য অংশে থাকিবে।

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাহূষণ

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা বলিতে হইলে নানা কথারই আলোচনা আসিয়া পড়ে, ব্যাপারও বিরাট হইয়া উঠে। প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ের অবতারণা না করিলে বিষয়টিও পরিষ্কৃত হয় না। কাজেই সর্বপ্রথমে দিগ্‌দর্শন হিসাবে বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। পরে মূল বিষয়ের সূচনা করিব।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই যে মানবজাতি বিভক্ত হইয়া গিয়াছে তাহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। আখ্যা, নিগ্রো, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিভাগের পশ্চাতে নৃতত্ত্বও বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের প্রভাবের সংস্কৃতি (culture) ও সভ্যতার (civilization) বৈশিষ্ট্যও অস্বীকার করা যায় না। ভৌগোলিক সংস্থানের ফলে দীর্ঘ যুগ যাপন করিয়া বিভিন্ন খণ্ড পণ্ড মানব-সমাজে এক একটি সংস্কৃতি—তথা সভ্যতা বিশিষ্ট সত্তা বা ব্যক্তিত্ব লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই মানব-সমাজের আকৃতির বৈশিষ্ট্য যেমন অস্বীকার করা সম্ভব নয়, তেমনি তাহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও অবশ্য স্বীকার্য।

আবার সকল মনুষ্যের মধ্যে এমন একটি সাধারণ বস্তু আছে যাহা মানুষকে অন্য সকল জীব হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে; তাহা মানব-মনের সর্বসাধারণত্ব। আর ইহাই বিদ্যমানবতার নিদানভূত।

একটা জাতিকে সাধারণ মনুষ্যজাতি হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষ নামে যে অভিহিত করি তাহার নীতি হইতেছে এই যে, সকল মনুষ্যসমাজ হইতে এক একটি বিশেষ অংশ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ খণ্ডে প্রাচীন কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। ফলে, এক একটি বিশেষ অংশের অনুষ্ঠান ও ধর্মের স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাই এক একটি জাতির ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য বা সংস্কৃতি। এই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বহু ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে পরস্পরের ঐক্য ও সাধারণত্ব অনুভূত রহিয়া গিয়াছে। এক জাতি যাহা ভাবিয়াছে, অন্য জাতিও হয়তো সেই একই ভাবনা করিয়াছে; এক জাতির সমস্তা হয়তো অন্য জাতির সমস্তার সঙ্গে অনেকাংশে মেলে, তাহার সমাধানও হয়তো অদ্বিতীয় নয়; কিন্তু একটি জাতির চিন্তার ধারা এবং সমাধানের ধারায় অপূর্ব

থাকিবেই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল দেশেই আছে, অথচ তজ্জন্য পরিচ্ছন্ন, আবাস, আহার ইত্যাদি পৃথিবী জুড়িয়া এক নয়। ইহাদের পার্থক্য অসামান্য। দেশ-কাল-পাত্র এই সমস্তার রূপের বিশেষ হের-ফের হইয়াছে। চিন্তার ক্ষেত্রে ইহা আরও বেশী সত্য। বিভিন্ন দেশের প্রাণ হইয়াছে বিভিন্ন—সমাধানও বিভিন্ন। বাহ্য জীবনের বৈচিত্র্য অপেক্ষা অন্তর্জীবনের বৈষম্য এত অধিক তীব্র যে কল্পনাই করা যায় না, তাই অন্তর্জীবনের এই বৈষম্য বা ব্যক্তিত্বের প্রভাবই একটি বিশেষ জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি টিকিয়া থাকিতে পারে।

পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা নূতন সভ্যতার মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার কোন কোন রেশ আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ মন্তব্যের নিকট তাহার প্রাত্যহিক জীবনে ঈজিপ্ট, বাবিলোনিয়া, আসিরিয়া বা মধ্য-সভ্যতা মৃত। এমন কি গ্রীস-রোমও যেন প্রাণহারা হইয়াছে। ইহাদের সভ্যতা মালুমের প্রতিদিনকার জীবনে মরিয়া গিয়াছে। আজ অতীতের বন্ধের কঙ্কাল—পত্তর দেখি, দেখিয়া বিস্মিত হই, উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করি—সে-প্রশংসা এমন কি কবের অঁকারও পাইতে পারে, তাহা কোন শিল্পীর অল্পপ্রেরণাও ধোঁগাইতে পারে, কিন্তু মালুমের জীবনে তাহার স্থান ও সার্থকতা কোথায়?

সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মাত্র একটি বাঁচিয়া আছে। সেই অদ্বিতীয় গৌরবের স্থান ভারতীয় সভ্যতার। (চৈনিক সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝি তাহা ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট পরিণতি, অন্য দেশে, অন্য জাতির সংমিশ্রণে এক বিচিত্র রূপ।)

অত্র দেশে অত্র যে সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল তন্মধ্যে এমন প্রেরণা ছিল না, এমন গভীরতা ছিল না যাহার ব্যাপকতা এত বেশী। সে-সকল সভ্যতার সমস্তা ছিল সাময়িক, তাহাদের চিন্তা বর্তমানকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেখানে পরের সভ্যতা নূতন কথা লইয়া আসিয়াছে, পরের চিন্তা নূতন আলোক লইয়া আসিয়াছে, সেই নূতন বাণীকে বাধা দিবার মত শক্তি পুরাতনের ছিল না। সে সমস্ত পুরাতন সভ্যতা ছিল মাত্র পাথরের—ইটের সভ্যতা—সেনাবাহিনীর

সভ্যতা। বাহ্য জীবনের বহু প্রয়োজনের, স্থখ-স্বাস্থ্যের, আরামের বন্দোবস্ত তাহারা করিয়াছেন, কিন্তু অন্তর্জীবনের গূঢ় সমস্তার-সত্যকার জীবন-সমস্তার কোন বাণী সে সকল সভ্যতায় নাই। প্রাণহীন এরকম বস্তু-সভ্যতা ঠাচিতে পারে না। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণম্পন্দন ছিল বলিয়াই সে বাঁচিয়াছে। ইহাকে ‘আধ্যাত্মিক’ বলিয়া কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত অধরপ্রান্তে একটি বিক্রপের হাসি হাসিয়াছেন। ইহার বস্তু-সভ্যতার অংশ কতটা তাহা এখানে বিচার্য নয়। কিন্তু এ-টুকু বুঝিতে হইবে যে, ইহা বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়াই বাঁচিয়াছে। মাত্র এই সভ্যতারই আত্মা আছে—তাই সে মরে নাই।

ভারতের চিন্তা পৃথিবীর বস্তুতেই নিশেষ হইয়া যায় নাই। বস্তুর আশ্রয় যাহা, বস্তুর অতীত যাহা তাহারই সন্ধান সে পাইয়াছে। ভারত রূপের মধ্যে অক্ষরের সাধনা করিয়াছে। নম্বর ভঙ্গুরকে অতিক্রম করিয়া ভারতের সাধনা হইতেছে শাশ্বত নীতির। এই জগতের প্রাণের সন্ধান তাহার যাত্রা। অমৃতের পথ পাইয়া সে চলিয়াছে। ভারতে জীবন অতি দীর্ঘ সাধনা—অবিদ্যা হইতে মুক্তির সাধনা, বিদ্যার আবির্ভাবের সাধনা।

ভরতবর্ষে লেখা-পড়া ও সংস্কৃতি কোন দিন এক বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সংস্কৃতি ভারতের অন্তরের বস্তু, অক্ষর-পরিচয়ে সাহিত্য-জ্ঞান কোন দিন তাহার জ্ঞাপক ছিল না। এ-দেশে বিদ্যা বখনও academic ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বিদ্যা তাহার অন্তরের সামগ্রী। দর্শনও কোনদিন বৃষ্টির পরিচয়জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই—ইহা ছিল ভারতবাসীর প্রাণস্বরূপ। দর্শন ও ধর্ম কোন সময়ে এদেশে দুটি পৃথক বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ধর্মের গোড়ার কথাটি হইয়াছে সর্ববস্তুর মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ; সর্ববস্তু একটি অখণ্ড পূর্ণত্বের প্রকাশ মাত্র। তাহার macrocosm ও microcosm সর্ববিদ্যাই ধর্মের মধ্যে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চতুষষ্টি শিল্পকলাও ধর্মের বাহন হইয়াছে। শিল্পকলা গ্রন্থেরও তাই নাম হইয়াছে—শাস্ত্র। ধর্মের মত ব্যাপক শব্দ ভারতীয় ভাষায় আর নাই। ধর্ম সকলের মধ্যে অম্লহৃত রহিয়াছে সকলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে বলিয়া এ-দেশে কোন বিদ্যা watertight compartment-এর মত হয় নাই। সর্ববিদ্যার শেষবাণী ধর্ম; তাহাদের মধ্যে

কোন বিষয় ঘটে নাই। প্রাচীন যুগে ধর্ম ভিন্ন তাই এদেশে কাণ হয় নাই, স্থাপত্য হয় নাই, শিল্প-সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের শিল্পে বিদেশীরা বস্তুত্বের অভাব বোধ করেন। সত্য বটে, বাস্তবের সঙ্গে আমাদের শিল্প মেলে না। কিন্তু সাধনার দিক দিয়া দেখিলে কোন গোলযোগ থাকে না। ভারতের সাধনা concrete-এর মধ্য দিয়া abstract-এর; রূপের মধ্য দিয়া অরূপের। লিঙ্গপূজার মধ্য আমরা ইহারই সাক্ষাৎ পাই; মূর্তিপূজায় অবিকল নিছক মনুষ্যমূর্তি যে দেখি না তাহারও ব্যাখ্যা ইহাই। এখানে abstractকে মূর্তি দিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা concrete-এর ছবজ নকল হইতে পারে না।

অতি প্রাচীন যুগেই আমরা পরিত্রাজকদের কথা শুনিতে পাই। চির-পথিক তাঁহারা; দেশদেশান্তরে বিরামহীন যাত্রার ত্রত তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের সাধনার ফল তাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। দরিদ্রতম রূষকের কুটীরেও তাঁহাদের গতি—রাজ-অতিথিও তাঁহারা। তাই প্রাচীন যুগে গ্রামে গ্রামে এই পরিত্রাজকদের জন্ত কুটাহনশালার অস্তিত্ব। গ্রামবাসীরাও কুটাহনশালার গর্ভে গোরব বোধ করিয়াছে। যেখানে ইহাদের বিচার সভা বসিত সেখানে ইহারা গ্রামবাসীদের উপদেশ দিতেন। রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে কি সাহায্য করিয়াছে তাহা আজও নিরূপিত হয় নাই। প্রতি-ভারতবাসীর মধ্যে ইহারা প্রাণসঙ্গার করিয়াছে। ভারতের অষ্টাদশ পুরাণ-কথা ভারতের মর্ম্ম-কথা হইয়াছে।

অতি প্রাচীন যুগে আমরা যাত্রা ও কথকতার পরিচয় পাই। এ-গুলি যে কত বড় শিক্ষার বাহন তাহা আজও ঠিক বোঝা হয় নাই। নিরক্ষর রূষকের মুখে কত অজানা সাধক কবির যে-গান আজও শুনা যায় তাহা দর্শনের গভীরতম মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা। চর্য্যাচর্য্য, দেহতত্ত্ব, বাউল, ভাসান, মঙ্গল-গান প্রভৃতি সঙ্গীত এ-যুগেও কত শত বৎসর ধরিয়া নিরক্ষরদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ভারতের বারততও সেই প্রাচীন সংস্কৃতি বহন করিয়া আসিয়াছে। শিক্ষা ও লেখা-পড়া এক বস্তু নয়—একথাটা যদি একবার উপলব্ধি করিতে পারি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমাদের নিরক্ষর গ্রাম-বাসীদের মত শিক্ষিত গ্রামবাসী পৃথিবীতে আর নাই।

ভারতবর্ষে আর্থীদের কেমন করিয়া দেখা পাওয়া গেল সে-প্রশ্নের সম্পূর্ণ সম্ভাব্যজনক মীমাংসা আজও হয় নাই। তবে আদিম যুগের কয়েকটি আর্থ দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় হ্রদর বোঘাসকুই-শিলালিপিতে, তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে এবং বাবিলনের কাসাইটদের দলীলপত্রে। কসাইটরা হিমালয়ের (সিমলিয়ার) উত্তরে করিয়াছে। মিতানীদের সহিতও আর্থীদের সম্পর্ক ভারতবর্ষে আর্থ-গমনের পূর্বে হইয়াছিল, একথা এখন আর বলা চলে না। তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে সংস্কৃত নাম অক্ষর রহিয়াছে। বোঘাসকুই-লিপিতে সংস্কৃত সংখ্যা আছে, বৈদিক শব্দের সহিত ইহার শব্দের মিল আছে। ভারতবর্ষের সহিত এশিয়া-মাই-নরের সাক্ষাৎ সম্পর্ক। এই দূরদেশে হিন্দু দেবতার। শাস্তি-দেবতারূপে দেখা দিয়াছেন। শাস্তির বণী লইয়াই ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়। শাস্তিই ভারতের সনাতন বাণী—শাস্তিই ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ প্রতীক। সে-যুগের অপর সকল সভ্যতার আন্তর্জাতিক পরিচয় গ্রহণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই—সে-পরিচয় তাহাদের লুপ্তনে। সে-লুপ্ত হয় ব্যবসাজলে, নয় প্রকাশ্য সৈন্যবলে। সে-দিনও ইজিপ্ট, তৃতীয় খুটমোসিসের বিখ্যাত জয়গীতি হুমুভিদ্বারা ঘোষণা করিতেছিল, এথেনিসনবা ক্রীট দখল করিতেছিল এবং ফিনীসিয়ার এই প্রাচীন যুগে বাণিজ্যক্ষেত্রে পৃথিবী লুপ্তন করিয়া প্রথম আদিবিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছিল। আদিরমির অস্ত্রেরা জাগিতেছিল।

মোহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত হুমেরীয় সভ্যতার একটা সহজ ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে। মার্শাল (A.S.I., A.R. 1923-24) বলিয়াছেন, সিন্ধু-উপত্যকার যে-সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার উৎপত্তি, অস্তিত্ব ও পরিণতি ঐ-স্থানেই হইয়াছে। নীলনদীর তীরে ফারওয়াদের সভ্যতার মত উহা ঐস্থানের একান্ত সম্প্রতি। আর মেসোপটেমিয়ায় হুমেরীয় সভ্যতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে বেশ ধারণা করিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষের অক্ষপ্রদেশই ঐ সভ্যতার আদি ভূমি, এবং বাবিলন, আদিরমিয়া ও পশ্চিম-এশিয়ার সাধারণ সংস্কৃতি পরে সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়া বহুমূল হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির আদিভূমি অংশের

ইতিহাস অজ্ঞও লিখিত হয় নাই; কিন্তু ইহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার তাহা অস্বীকার করা যায় না। দ্রাবিড়ী রক্তের মত সেই সংস্কৃতি আধাসংস্কৃতির সহিত বেমালাম মিশিয়া গিয়াছে। লিঙ্গপূজা, নাগপূজা, বৃক্ষপূজা, মাতৃকাপূজা প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভিন্ন অল্প ব্যাখ্যায় এই সংস্কৃতিতে স্থান পাইতে পারে না। যজ্ঞস্থলে প্রতিমাপূজার ব্যাখ্যা দ্রাবিড়ীয় বলিয়া সম্ভব হয়।

বেলুচিস্তানের দ্রাবিড়ী গ্রাহ্যি ভাষা অনেক ব্যাপারেরই মূচনা করে। আবার দ্রাবিড়ীও পূর্বে নেগ্রিটো-সম্পর্কও প্রমাণিত হইতেছে।

বৈদিক যুগ হইতেই ইরাণের সহিত ভারতের সন্ধ। অশোকের সময় ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইরাণ-সম্পর্কের অকাটা নিদর্শন পাওয়া যায়। মৈত্রী-বাণী-প্রচারক এই অশোক প্রথম প্রচার করিলেন—পৃথিবীবাসী সকলেই ভ্রাতা। ইহাপেক্ষা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বাণী আর নাই। তিনি পৃথিবী-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র এই বাণী পৌছাইয়া দিবার জন্য। তাই সেই বিজয়ের তিনি নাম দিয়াছিলেন ‘ধর্মবিজয়’। তিনি চাহিয়াছিলেন বিশ্বের কল্যাণ। তিনি বলিয়াছিলেন—ধর্মের দ্বারা মানুষের অস্তঃকরণ জয়ই একমাত্র জয়।

আর এই যুগেই রোম পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় রোমক সভ্যতার পরিচয় দিতেছিল।

খৃষ্টপূর্ব শতকে প্রবলপ্রাচ্য মেনেন্দরকে একাগ্র ও ঐকান্তিক বৌদ্ধরূপে দেখি, বৈষ্ণব ভাগবতরূপে হেলিওডোরসের পরিচয় পাই। চীনে বৌদ্ধ-প্রচারক মেনে, আর তথাকথিত গান্ধার শিল্পে গ্রীক সংস্কৃতির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই যুগের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়—ভারতবর্ষ সকলকে গ্রহণ করিয়াছে; কত

অজানাকে স্থান দিয়াছে। এমন সময় গিয়াছে যখন ভারতে পর-সংস্কৃতির একটা রাসায়নিক সংমিশ্রণ চলিয়া ছিল। ইজিপ্ট, এশিয়া-মাইনর, পারস্ত সকলের সহিতই ভারতের কোলাহুলি। তারপর পরের যুগে দলে দলে অসভ্য বর্বর আসিয়া ভারতের ছায়া হানা দিয়াছে। তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হয় নাই। ভারতবর্ষ শক, হন, মোঙ্গল, গহলব, চীন সকলকেই গ্রহণ করিল। ভারতের অপূর্ণ সবল সংস্কৃতিকে ইহারা নষ্ট করিতে পারে নাই, ভারতের আত্মপ্রভাব তাহারা গর্ভিত হিন্দু হইয়া গেল। ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অংশ ইহাদেরই কীষ্টি—রাজপুতরূপে। দ্রাবিড়ী অঙ্গ সন্ধান গোতমীপুত্র শাতকর্ণি নিজেকে এক-ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব করিলেন, চতুর্বর্ষের সংমিশ্রণ বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া শিলালিপিতে অঙ্কিত করিলেন; শক উসভলাত, রুদ্রনামা হিন্দুধর্মের প্রতিপালক হইলেন। সংস্কৃতির এমন বিরাট রাসায়নিক সংমিশ্রণ পৃথিবীর ইতিহাসে বড় ঘটে নাই। ভারতের উদারনীতিতে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্বন্ধ সকল দেশেরই হইয়াছে। আর ইহার পরেই ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপকরণ জুটতে আরম্ভ হইল। বৃহত্তর ভারতের মূচনা দেখা গেল। চীনে তো বহু পূর্বেই বৌদ্ধ ভিক্ষু গিয়াছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা বেজায় বাড়িয়া উঠিল। ভারতীয় নাবিকে ভারতীয় দীপপুঞ্জ ছাইয়া গেল। বৌদ্ধ ভিক্ষু পৌছিল, ব্রাহ্মণও পৌছিল। এ-সব ঘটিল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষে। অক্ষগণিত্তান পার হইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু মধ্য-এশিয়া ছাইয়া ফেলিল। চীন পার হইয়া তাহারা জাপানে দেখা দিল। ভারতের প্রতিবেশী তিব্বত, সেও বৌদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইল।

সাধনা

শ্রীসতীশ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

কলিকাতা হইতে তার আসিল, পাটের দর কিছু চড়িয়াছে এবং আরও কিছু চড়িবারই সম্ভাবনা। হাজার-তিরিশেক মণ 'গড়সড়ে' তাড়াতাড়ি কিনিয়া রাখা আবশ্যক।

তার পাইয়া রতিরাম পেরিওয়াল গৌকে একবার আরাম-সূচক 'তা' দিয়া লইল। মনের আনন্দ চোখ ও মুখের কোণে ফুটিয়া উঠিল।

সত্যি কথা বলিতে কি, এষারের বাজার বড় মন্দা যাইতেছে। শুধু এবারই বা কেন, গত আড়াই-তিন বৎসর যাবৎ পাটে লোকসান ছাড়া আর লাভ নাই;—কাহারও নাই; না চাবার, না ব্যাপারার। হালের খবরে দেখা যাইতেছে, আমেরিকা আবার কিছু মাল খরিদ করিতেছে; কলিকাতার মিলের অবস্থা ঠিক কিছু বুঝা যাইতেছে না বটে, তবে সে খবরও ভালর দিকেই। আর 'কাটকা'র শেষ খবরও আশাপ্রদ।

রতিরাম ঘড়ির দিকে চাহিল। পাঁচটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকি। কাল বদরগঞ্জের হাট। বদরগঞ্জ এখান হইতে ত্রিশ মাইল; ছোট লাইনের গাড়ীতে বুলকিনগর ষ্টেশনে নামিয়া তিন মাইল গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। বদরগঞ্জ এলিকের মধ্যে বিখ্যাত পাটের বাজার; আমানী অনেক। আর ঘাওর-আসা সেখানে ত নিতাই আছে।

পাঁচটা বিশ মিনিটে ছোট লাইনের একখানা গাড়ী ছাড়ে, আর বুলকিনগর পৌছায় সন্ধ্যায়। সেখানে গরুর গাড়ী অনেক—প্রায় সবই রতিরামের জানাশুনা। আর বদরগঞ্জে থাকিবার জায়গারও অভাব নাই; চুড়ামণজীর ওখানে বন্দোবস্ত সবই ভাল; একই দেশের—নোহর রিয়াসতের লোক ত!

রতিরাম ঠিক করিল, সন্ধ্যার গাড়ীতে ঘাওর যাই শ্রেয়। কলিকাতার টাটকা খবর সকাল সাতটার পূর্বে বদরগঞ্জে না পৌছিয়াই সম্ভাবনা। সন্ধ্যা-সকাল সতর্ক করিয়া ফেলিতে পারিলেই ভাল।

কিনিতে পারিলে লাভ অনিবার্য; তিরানকুইতে আর দুই পরসী নয় কমাইয়া দিবে। তবে সঙ্গে কিছু খুচরা টাকা থাকিবে আর সময় রাত্রিকাল। তা ওখানকার পথবাট ত সবই জানাশুনা। আর গাড়োয়ানও সব পরিচিত। অত ভয়-ভাবনা করিলে কি কাজ-কারবার চল?

ঘাইবার সময় আর বড় নাই, তবে এ-লাইনের গাড়ী সর্বদাই বিলম্ব করিয়া আসে ও ছাড়ে এই যা ভরসা। স্কালের বাসি পুরি ছিল—তাড়াতাড়ি সে তাহারই দুইটা অর্দ্ধশতাব্দী-রক্ষিত আচারের সহযোগে গলাধঃকরণ করিয়া এককোটা জল ঢকঢক করিয়া গিলিয়া ফেলিল। তাহার পর ছোট একটুকু বিছানা ও দুইখানা কাপড় বগলদ্বা করিয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল। তখনও গাড়ী ছাড়িতে পাঁচ মিনিট বাকি।

রতিরামের মনিব কলিকাতায় থাকে। পূর্বে সে এই মনিবের চাকরি করিত; সম্ভ্রান্তি বছর-চারেক যাবৎ মনিব তাহাকে হিস্যায় লইয়াছে। মূলধন তাহার কিছুই নাই—সে খাটিয়া মূলধন জোগায়।

রতিরামের বয়স বিমার্লিশ। পরনের কাপড়খানা সম্ভবতঃ মাস-দুই যাবৎ সাক করিবার ফুরফুরে হয় নাই; সেখানার রং এখন ধূসর গৈরিক হইতে তাম্রাটে কালো হইয়া গিয়াছে। পায়ে জাপান-নির্মিত পাঁচ সিকা দামের রবারের জুতা—পায়ে লম্বা গরম কোট। মাথার পাগড়ীটি গাঢ় কমলা রঙের। দাড়ি আজ দিন-পাঁচেক যাবৎ কাটা হয় নাই, কিন্তু পাট কেনাবেচার বাজারে তাহাতে কিছু আসে যায় না।

গাড়ী যথারীতি দেরি করিয়া ছাড়িল। রতিরাম তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় বসিয়া বিড়ি ধরাইয়া ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিল।

পাশে বসিয়া একজন বাঙালী ভ্রমলোক খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। রতিরামের মনটা আজ অত্যন্ত প্রফুল্ল; সহবাসীর সহিত কথা বলিবার জন্য সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোক একমনে পড়িয়া যাইতেছিলেন। বিধাতরে
রত্নরাম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—সমাচারে
কোই খবর আছে বাবুজী ?

রত্নরাম বাংলা বলে।

ভদ্রলোক মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন—কিসের খবর ?
রত্নরাম বিশেষ কোন খবরের প্রত্যাশায় ছিল না, আর
এক পাটের খবর ছাড়া বহির্জগতের কোনো কথাও তাহার
জানা ছিল না ; বলিল—পাটুয়াখা কেয়া হাল ?

ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্য হইলেন কি না বুঝা গেল না, তবে
আশ্চর্য্য হইবার কোন লক্ষণ তাহার মুখেচোখে দেখা গেল না
বটে। হয়ত এ-শ্রেণীর জীব হইতে এই প্রশ্ন ছাড়া অজ্ঞ
কিছু প্রত্যাশা তিনি করেন নাই। বলিলেন—পাটের খবর
ত কিছু জানি না, তবে পঞ্জাবের দিকে খুব বেশী ভূমিকম্প
হইয়াছে।

রত্নরাম বলিল—তুইডোলা ? কাঁহা হোয়েছে ?

—পঞ্জাবের দিকে ; সব খবর ত এখনও বাহির হয়
নাই।

রত্নরাম বলিল—হামারা তো খবর মিলে নাই।

ভদ্রলোকটি বলিলেন—আজই খবর বাহির হইয়াছে ;
আজিকার কাগজ পড়িয়াছেন ?

রত্নরাম মাথা নাড়িয়া বলিল—নেহি।

শুধু আজিকার কেন, কোনোও দিনের কাগজই সে পড়ে
না ; তাহার ঘরের পাশে বাঙালী পানওয়ালার নিকট হইতে
সে শুধু পাটের বাজারের খবরটুকু পড়াইয়া নেয়। খবরের
কাগজওয়ালার সহিত তাহার বন্দোবস্ত আছে ; একজ্ঞ তাহাকে
সে মাসে চারি আনা পরা। দেয়—অবস্তা কাগজখানা তাহাকে
তখনই ফিরাইয়া দিতে হয়।

রত্নরাম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর
বলিল—কেখনা লোকসান হোয়েছে ? কন্সটা আদমী মরা ?

—সে খবর ত এখনও বাহির হয় নাই।

ভদ্রলোক আবার কাগজে মন মিলেন। মিনিট-দুই পরে
আবার রত্নরামের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন সে অর্থহীন
দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। বলিলেন—আপনার
ঘর কোথায় ?

—নোহর বিকানীর রিয়াসৎ।

—বালবাচ্চ। কোথায় আছে ?

—ঘরমে—ওতো পাঞ্জাবকা নজদিগই আছে।

—তা চিঠিপত্র পান ত ?

—হী, মাহিনামে একটো। রূপেরা ভেজ দেই, আওর
কুপনমে সমাচার লিখ্ দিই—আজ চার বছর ঘর নেহি গিয়া।

ভদ্রলোক কথা বলিলেন না। রত্নরামও চুপ করিয়া
জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল।

লাইনের দুই ধারে বন ; শিশু, শাল, আম ও বাঁশ—
ঘনায়মান সন্ধ্যার আবছায়া গায়ে মাথিয়া একান্তে দাঁড়াইয়া
আছে। মাঠ হইতে রাখালেরা গরু লইয়া গিয়াছে—দুই
একটি এখনও দলছাড়া হইয়া এ-দিকে ও-দিকে ঘোপের পাশে
খাল্যসংগ্রহে ব্যস্ত। মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুতীর ;
বাঁশ ও বাখারির আচ্ছ-দেওয়া অঙ্গন ; সে বেড়ার উপরে
লতার ঝাড় ; কি লতা তা বুঝা যায় না।

গাড়ী ষ্টেশনে দাঁড়াইল। ছোট ষ্টেশন। ষ্টেশন-ঘরের
পাশেই ছোট ছোট ঘর—বোধ হয় কুলীদের। রত্নরাম চাহিয়া
রহিল। একটা ঘরের কোণে বাহিরে দাঁড়াইয়া একটি
মেয়ে—বছর-কুড়ির ; কোলে তাহার বছরখানেকের একটি
শিশু—বোধ হয় তাহারই মেয়ে। ষ্টেশনের আলো আসিয়া
তাহাদের মুখে পড়িয়াছে। রত্নরামের মনে হইল, শিশুটি
যেন দেখিতে অনেকটা তাহার নিজের মেয়েরই মত।
তাহাকে বছরখানেকের দেখিয়া সে ঘর হইতে আসিয়াছে—
তখন তাহাকে সে ‘বুড়ী’ বলিয়া ডাকিত। আজ চারি
বৎসর সে তাহাকে দেখে নাই।

রত্নরামের মনে পড়িল, মেয়েটার চুল ছিল কৌকড়ানো,
রংটা বেশ ফর্সা ; বেশ গোলগাল মাংসল চেহারা। নরম
নরম ছুটি গাল—চুমো খাইলেই কিচ্ করিয়া হাসিয়া উঠিত
আর কোলে আসিতে চাহিত।

ঘর হইতে কে তারি গলায় ডাকিল,—মুন্নি। মা বা
মেয়ে কেহই উত্তর দিল না। কালো রঙের কাপড় ও সেই
রঙেরই কোর্টা গায় দিয়া বীর্ঘাবয়ব এক মুষ্টি বাহির হইয়া
আসিল। মা হাসিয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিল—মেয়ে
নবাবগড়ের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল।

গাড়ী আবার চলিল।

মাঘের শুক্লাচতুর্থী। চন্দ্র উঠিয়া পড়িয়াছে। ঘোঁস

ও কুয়াশায় মিলিয়া চারিদিকে ত্রিশতর স্বর্ণ রচনা করিয়াছে। দুয়ের বাশের কাড়কে চন্দ্রালোকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। পাশেই একটা মেঠো রাস্তার উপরে একসারি গরুর গাড়ী—হয়ত ঘণ্টা বাজাইয়া চলিয়াছে। শব্দটা শোনা যায় না। একটু দূরের এক গৃহ-অঙ্গনে জীর্ণ-করাবৃত্তা কে একজন খড়ের আলানি দিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সে আলোকে তাহার দেহ ও খাদ্যসামগ্রী স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

রতিরামের মন এই গাঢ় কুয়াশা ও দূরত্ব উপেক্ষা করিয়া হৃদয় বিকানীর রিসাসতে চলিয়া গিয়াছে।

দারুণ এ অর্থনৈশা। বছর-দশেক পূর্বে তাহার অর্থ ছিল না সত্য, কিন্তু তৃপ্তি ছিল। মনিবের চাকরি করিত, সারাদিন কাজ করিয়া রাত্রি দশটায় ঘরে কিরিয়া আসিত; জীবন আদরে সমস্ত দিবসের ক্লান্তি মুছিয়া যাইত। ছেলে-পিলে ছোট ছোট—কেহ পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, কেহ কোলে উঠিতে চেষ্টা পাইত। দিবসের শত-শতশ্রম চিন্তা বেন তাহার একটি নিমেষেই অন্তর্হিত হইয়া যাইত।

আর আজ? কোথায় সে, আর কোথায় তাহার সেই মেহের ধনগুলি? অর্থের মোহ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে; এই চারি বৎসরের মধ্যে অল্প কোনও চিন্তা তাহার মাথায় আসে নাই। ভারিতে গেলেই মাথায় গোল পাকাইয়া উঠে, ‘ব্যাজ’ ‘কাটকা’ ‘সাকুরা’, ‘রকম’। অর্থ কিছু হইয়াছে সত্য, কিন্তু শাস্তি কি সে পাইয়াছে?

এই চারি বৎসরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও সেই হৃৎকের দিনগুলির কথা মনে হয় নাই। একবারও ভাল করিয়া ছেলে, মেয়ে বা তাহাদের মনের কথা সে মনে করে নাই। দিন গিয়াছে, রাত্রি আসিয়াছে—সে করিয়াছে পাটের হিসাব—সে স্বপ্ন দেখিয়াছে বাজারের ধারদ-বিক্রীর ইতিহাস। মাসের শেষে জীবন নামে টাকা পাঠাইয়াছে—রূপনে খরচের হিসাব লিখিয়া জীকে বার-বার হিসাবী হইবার জন্য সাবধান করিয়াছে;—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। সেটা একটা একঘেয়ে ইতিহাস মাত্র।

একবার তাহার জর হইয়াছিল। ম্যালেরিয়া—ভুলিয়াছিল সে আট দিন। রোগশয্যার পড়িয়া বহুবার তাহার জীবন কথা মনে হইয়াছিল। মাথার ব্যথার অস্থির

হইয়া মনে হইত, কেহ যদি মাথাটা একটু টিপিয়া দিত। কিন্তু একটা জরুরি খবর ছিল; ভাল করিয়া সারিয়া উঠিতে না-উঠিতেই তাহাকে বাহিরে যাইতে হয়। হাঁ, লাভ হইয়াছিল বটে—তিনশো টাকা। এ-সব দুর্কলতা থাকিলে কি কাজকারবার চলে?

রতিরাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দীর্ঘনিশ্বাসটি বোধ হয় একটু জোরেই পড়িয়াছিল। বাঙালী সহযাত্রীটি একটু চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, ভূমিকম্পের খবর শুনিয়া হয়ত বেচারী একটু ঘাবড়াইয়া গিয়া থাকিবে—হাজার হউক মাহুকের মন ত। বলিলেন—আপনার কোনো ভয় নাই, আপনাদের দেশে ত কিছু হয় নাই।

রতিরাম ভূমিকম্পের কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। বলিল, নেহি—ভয় কোই নেই আছে।

ভূমিকম্প তাহাকে চকল করে নাই—করিয়াছিল হুইটি প্রসারিত ক্ষুদ্র হস্তের স্বপ্ন। কিন্তু রতিরাম স্বপ্ন দেখিলেও বৈশীকণ দেখে না—স্বপ্নের মূল্য তাহার কাছে নাই; থাকিলে কি আর কাজকারবার চলে?

সুরিয়া বসিয়া সে প্রশ্ন করিল—ও কেতাব মে কেয়া লেখা আছে বাবুজী?

ভক্তলোক তখন একখানা মোটা বই পড়িতেছিলেন। বলিলেন—এটা কবিতার বই।

রতিরাম তাহার স্বভাবহীন উচ্চারণে বলিল—ক্যা?

—কবিতার বই, রামায়ণ পড়িয়াছেন? রামায়ণের মত।

—পড়েনছে ক্যা হোতা হ্যার?

—কি আর হইবে? দিল্লী আজ্ঞা লাগে।

রতিরাম বলিল—হঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, ইস্কা কিম্ব কতো আছে?

—তিন টাকা।

—বুটমুট—ফুল। আপনি তো বড় লিখাপড়াওরান। আদবি আছেন। আপনি কেননা রূপেয়াকা আলেম নিয়াছেন?

ভক্তলোক হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—লেখাপড়া কি আর টাকার করে মাগা যায়?

—কেমন হোবে না? বি-এ পাস হোনেছে—চৌদ্দ মাই। রতিরাম জানিত, পাশেই সব গাড়োয়ানদের বাড়ি—বরষ; পড়তা মাহিনা বিশো রূপের করকে—সাড়ে তিন সে ইঁকাইকি আরম্ভ করিল।

ভুলোক আবার হাসিলেন।

রতিরাম দমিল না। বলিল—আপ কেমনা কামাতা এক মাহিনামে?

ভুলোক বলিলেন, তিনি এখন প্রায় বেকার। অর্থোপার্জন এখন পর্যন্তও বিশেষ কিছু ঘটয়া উঠে নাই।

রতিরাম আবার গৌকে আরামস্থচক তা দিয়া লইল। বলিল, আমার আলেম তো দেড় রূপেরা—চার মাহিনা পাঠশালমে গয়া—বাস্ খতম। মাড়োয়ারীকা লেড়কা—মাহিনামে শো রূপের। তো কামাতেই হোবে।

এ-দৃশের যবনিকা পড়িল। পরের ষ্টেশনে ভুলোক কেতাব-হস্তে নামিয়া গেলেন। রতিরাম তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া একটা আশ্চর্যের তার নিঃশ্বাস ফেলিল। ভারি ত বাবু, কেতাবে কি লেখা থাকিবে? দিল্ আচ্ছা লাগে? খাইতে জোটে না দিল্ আচ্ছা করিয়া কি হইবে? স্বপ্ন দেখিলে চলে না—স্বপ্ন দুর্লভতা মাত্র। তাহার মোহে পড়িলে রতিরামকে এতদিন পথে বসিতে হইত। সে সাধনায় বসিয়াছে—বিস্তৃত আছেই। তাহাতে তুলিলে আর সিদ্ধিলাভ ঘটবে না। যাউক না দেশ উৎসব,—অভিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প—সকলে মিলিয়া চারিদিক হইতে জগতকে গ্রাস করুক না—কি আসে যায়? শুধু পাটের বাজারে হুজু না পৌঁছিলেই হয়।

তথাপি মাঝে মাঝে মনটা যেন তজ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। দুরাস্তের স্বপ্নের মত চোখের সম্মুখে দুইটি ক্ষুদ্র নিচোল শিশুহস্ত আসিয়া দেখা দেয়, কি গভীর সে আহ্বান—কি শক্তিমান তাহার আকর্ষণ, রতিরামকেও কখনও কখনও অগম্যমন্ড করিয়া তোলে।

যথারীতি বিলম্ব করিয়া রাজি সাড়ে নয়টার সময় গাড়ী বলাকিনগর পৌছিল। শীতাজ্বর রাজি সহসা ষ্টেশনের ইঁকাইকি ডাকাডাকিতে যেন প্রাণবান হইয়া উঠিল। রতিরাম তাহার বিছানার পুটলি-হস্তে নামিয়া আসিল।

বরষগঞ্জ বাইবার জন্ত গরুর গাড়ী এখানে সর্বদাই মিলে সত্য, কিন্তু এক রাজি পর্যন্ত আর কোনো গাড়োয়ান বসিয়া

গাড়ীর জোগাড় হইয়াছে। নৌা গাড়োয়ান ডেকারামের গাড়ী, কিন্তু ডেকারামের জর আসিয়াছে—বাইবে তাহার বোল বৎসরের পুত্র বিষণ। রতিরাম প্রস্তুত হইল।

নিশ্চিন্তি রাজি! চারিদিকে নিশ্চিন্ততা—সেই অশ্বও নিশ্চিন্ততা ভঙ্গ করিয়া একটা অবাঞ্ছিত শব্দ করিতে করিতে গাড়ী চলিয়াছে। দুই পাশে কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটার। চন্দ্র চলিয়া পড়িয়াছে। বাঁশের ঝাড়ের ফাঁক দিয়া চন্দ্রের সেই তজ্রাচ্ছন্ন মুক্তি দেখা যাইতেছে। কোথাও ঘরের পার্শ্বে দুই-একটি কুকুর এদিক হইতে ওদিকে যাতায়াত করিতেছে। পথের পার্শ্বে ঝোপ, তাহার ওধারে শস্তক্ষেত্র; কি শস্ত বুঝা যায় না।

রতিরামের কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। সন্ধ্যে কিছু টাকা আছে; মাইলখানেক ত ব্যতির মধ্য দিয়া চলিতে পারা যাইবে, তারপরই ত মাঠ—প্রায় দেড় মাইল বাপী। তারপর মেচি নদী, তারও ওপারে বদরগঞ্জ। রতিরাম ভাবিল, জাগিয়া থাকিতে হইবে।

গাড়ী চলিয়াছে। বিষণ মাঝে মাঝে গরুর লাজ নাড়িয়া দিয়া তাহার সহিত যে পশুটির অত্যন্ত নিকট-সম্বন্ধ আছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া জানাইতেছে। আর মাঝে মাঝে দুই-একটা গানের পদ অশ্লীল ভাষায় আবৃত্তি করিতেছে।

রতিরাম কথা কহিল। বলিল, কি রে বিষণ তোর সানি হইয়াছে?

বিষণ বলিল—না, মহাজন। সকল মাড়োয়ারীকেই তাহার মহাজন বলিয়া কথা বলে।

—তব্ রূপেরাছে কেহা কোরবি?

বিষণ বলিল—সে টাকা পাইলে বাপকে একটা কয়ল কিনিয়া দিবে; বেচারার স্নেহে বড় কাপে। আর থাকি কিছু থাকিলে তাহার ছোট ভাই ‘মনিয়ার’ জন্ত একটা ছোট আরশি কিনিয়া দিবে—বেশনটি সে-বার সে বদরগঞ্জের মেলায় দেখিয়া আসিয়াছে।

রতিরামের মনে পড়িল, তাহার ছোটছেলেটি একবার একখানা ছোট আরশি কিনিবার জন্ত জেদ ধরিয়াছিল। সে

কিনিতে দেখে নাই; বলিয়াছিল, কজল। এ সবের দরকার নাই। আজ আবার তাহার কথা মনে পড়িল, সকল ছোট ছেলেরই কি আরশি কিনিবার সখ হয়? জাকিল, শীতের রাত্রে বিষণ চলিয়াছে; গাড়ী আট আনার ঠিক হইয়াছে সভ্য, কিন্তু ভালয় ভালয় পৌঁছিতে পারিলে সে তাহাকে আরও দু-পয়সা বকশিস দিবে—ভাবিতে ভাবিতে রতিরাম উনার হইয়া উঠিল।

মনটা আবার একটাকৈ বিকানীর রিয়াসতে চলিয়া গিয়াছে। এমনই করিয়াই কি চলিবে? চলিবে বইকি? তাহার চোখের সম্মুখেই ত ঘনশ্যামদাস দশ বৎসরের মধ্যে লাগেয়া রূপেয়া উপার্জন করিয়া ফেলিয়াছে—একটা ধর্মশালাও করিয়া দিয়াছে। গভর্ণমেন্টের খেতাব পাইয়াছে রায়-বাহাদুর। লক্ষী মতলব করিলে কি না হয়? তাহারও কি হইবে না? আসিবে—তাহারও আসিবে—সবই ভাগ্যের খেলা। নসিবে থাকিলে লাগিয়া যাইবে; শুধু ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে হয়।

আর কতদিন? নসিব একবার খুলিয়া গেলেই রতিরাম একদম গদীমান হইয়া বলিবে। লোকে বলিবে, রতিরাম পেরিওয়াল লাখপতি। না-হয়, কিছু দানধর্মও করা যাইবে। তাহার কাছে কোথায় তুচ্ছ ছেলেপলে লইয়া লসার করা; কুটির পয়সা জুটিলে, শাকচকড়ির পয়সা জোটে না।

ভাবিতে ভাবিতে রতিরামের তস্রা আসিয়া পড়িল। স্বপ্নে সে দেখিতে থাকিল, স্বয়ং লছমীজী তাহাকে দর্শন দিয়াছেন। তিনি তাহাকে বর মাগিতে বলিতেছেন। সে এই বর প্রার্থনা করিতেছে যেন বদরগঞ্জের বাজারে পাট খরিদ করিবার পরই কলিকাতার বাজার-দর মণ-প্রতি তিন টাকা বাড়িয়া যায়।

সহসা তস্রা টুটিয়া আসে। জাগিয়া বসিয়া রতিরাম ভাবিল, সে কি বৈকুণ্ঠ। এই সামান্য বর সে প্রার্থনা করে? ভাবিতে ভাবিতে আবার তস্রা আসিয়া পড়িল।

বন্তি ছাড়িয়া গাড়ী মাঠে পড়িয়াছে। প্রকৃতি যেন শীতান্ত; নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। উত্তরের বাতাস মাঝে মাঝে কন্দন আনিয়া দিতেছে—চারিদিকে উন্মুক্ত শব্দশ্রবণ। রাস্তার পাশে পাশে কোথাও বাঁশের কোথাও আয়ের ঝাড়;

তাহার মধ্য হইতে কখনও দুই একটা বাতুড় কিচমিচ করিয়া উঠিতেছে—কখনও দুই-একটা শিয়াল পাশ কাটাইয়া ঘোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতেছে। চন্দ্র যান চোখে নিয়ের কুয়াশার পানে তাকাইয়া বিলায়-বেদনা জানাইতেছে। এই নিশ্চিন্তি রাত্রে শুধু দুইটি শীতান্ত ভাবাহীন প্রাণীর বোঝার পরিসমাপ্তি নাই। তাহার চলিয়াছে—কতদূর যাইতে হইবে জানে না—নিরুদ্দেশে—অসহায়, ক্লান্ত।

ক্রমে গাড়ী নদীর ধারে আসিয়া পড়িল। নদীর নাম ‘মেচি’—বুটিশ-ভারত ও নেপালের সীমারেখা। এদিকে বিহার প্রদেশ, অত্মদিকে মোরং। ‘মেচি’ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার যোগস্বজ রচনা করিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে।

শীতের পাহাড়ী নদী; স্থানে স্থানে শুষ্ক শ্রোতাবেগবিক্ষিপ্ত—জল তাহার হিমশীতল। গাড়ী কতদূর তাহার শুষ্ক বক্ষদেশের পাশ দিয়া চলিল। সিক্ত বালুকা; জলের বক্ষ ঈষৎ আন্দোলিত হইলে যে-আকার ধারণ করে বালুর বক্ষও সেই আকার ধারণ করিয়া আছে। কোথাও অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে আধপ্রতিফলিত বালুকণা চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছে। ওপাকের বন দেখা যাইতেছে—কুয়াশার গাত্রাবাস পরিয়া শুষ্ক, নিশ্চল। আকাশে তারা অগণ্য, তবে অমাবস্তার আকাশে যত দেখা যায় তত নয়।

বালুজটের পাশ কাটাইয়া গাড়ী নদীর বৃকে পড়িল। জল বেশী নয়, কোথাও হাঁটু, কোথাও কোমর। ওপাড়ের কাছ ঘেঁষিয়া শুধু কোমরজল। বালুর বৃকের উপর দিয়া তদ্বতন করিয়া জলের শ্রোত চলিয়াছে; হিমশীতল তাহার স্পর্শ; স্পর্শমাত্র অবশ করিয়া আনে। শ্রোত অসম্ভব রকমের। জল অগভীর কিন্তু অভ্যন্ত স্বচ্ছ। বালুর বৃক পরিকার রূপে দেখা যায়।

চলিতে চলিতে সহসা গুরু ছুটি দাঁড়াইয়া গেল। বিষণ তাহার সনাতন পন্থা অহুসরণ করিয়া দেখিল তাহার পর বস্তির দ্বারা আঘাতের পর আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি বলদবৃগল একান্ত অনড় অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। অগ্রসর হইবার জন্ত তাহার আগ্রাণ চেষ্টা করিল সভ্য, কিন্তু তাহাতে কোনো ফলোদয় হইল না।

বিষণ জলে নাষিয়া পড়িল। হিমশীতল জলের স্পর্শ তাহাকে অবশ করিয়া কেবল তথাপি হাতড়াইয়া দেখিল,

সর্বনাশ উপস্থিত। বলদহরের পা ক্রমশঃ বালুতে ডুবিয়া যাইতেছে—গাড়ীর চাকা ক্রমশঃ বসিয়া যাইতেছে। জল সেখানে বেশী নয়, যাত্রা হাঁটুর উপরে কিন্তু যেরূপ দ্রুত গতিতে গাড়ী ও বলদ বসিয়া যাইতেছে তাহাতে কিছুক্ষণ এরূপ ভাবে থাকিলে যে উভয়েরই একেবারে বালুকা-সমাধি হইয়া যাইবে তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। চাহিয়া দেখিল, সে ‘লিক্’ তুলিয়া তুলপথে জলের বুকে নামিয়াছে। বিষণ প্রমাদ গণিল।

সে চৈচাইয়া উঠিল,—মহাজন, ও মহাজন। রত্নিরাম স্বপ্ন দেখিতেছিল। সহসা বিষণের চীৎকারে খড়কড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াই তাহার সমস্ত কথাটা মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িয়া গেল, সে রাত্রিকালে একক রওনা হইয়াছে আর সঙ্গে আছে দুই শত টাকা বিছানার বাগিলে বাঁধা। সঙ্গে সঙ্গে বাগিলে তাহার হাত পড়িল তাহার মনে কোনো সন্দেহই হইল না যে সত্য সত্যই সে এবার ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে।

তড়াক করিয়া উঠিয়া বিছানার বাগিল বগলে লইয়া সে জলে নামিয়া দৌড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নামিবার পর আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। রত্নিরাম ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। একে শীতের নিদারুণ বাতাস, তাহার উপর এহেন অবস্থা; রত্নিরাম কাঁপিতেছিল। বিষণ প্রায় কাছে আসিয়া বলিল—এ কি মহাজন তুমিও কি ধসনায় পড়িয়া গেলে নাকি?

রত্নিরাম আকুল হইয়াছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধি একেবারে হারায় নাই। ধসনায় পড়ার অর্থ সে জানিত, এখনও তাহার যথেষ্ট বোধগম্য হইল। এই সর্বগ্রাসী পাহাড়ী নদীর বালুকা-সমাধির কথা তাহার অবদিত ছিল না—ক্ষুধিত বালুকা, চিরন্তন জলস্রোতে তাহার তৃষ্ণা মিটে না—রক্তের ত্বা তাহার অপরিণীম, অনন্ত।

রত্নিরাম কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—বাবা বিষণ, সব হুঁ দে দেখগা—রক্ষা করো বাবা।

বিষণ অস্থিসন্ধি জানিত। বলিল—পাড়াও মহাজন, দেখি কি করা যায়।

রত্নিরামের পায়ের চারিদিকে ক্রমশঃ বালু জমিয়া উঠিতেছে; অসহ্য শৈত্যে পায়ের চেতনা একেবারে লুপ্ত

হইতে চলিয়াছে। রত্নিরাম ডুকরিয়া কাঁদিয়া বলিল,—বিষণা, মো হাজার রূপেরা দেগা। অসহ্য শৈত্য তাহার আসন্ন বিপদকেও ছাপাইয়া উঠিতেছিল।

বিষণ সাহায্য করিল। ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়; দুই-চারি মিনিট ধতাত্তির পর রত্নিরাম বালুকাগর্ভ হইতে মুক্তিস্নাত করিল।

বিষণ বলিল—মহাজন, বলদ ধরিয়া টানিয়া তুলিতে হইবে, নহিলে উহাদের মরণ অনিবার্য।

রত্নিরাম বলিল—সে কি ক’রে হোবে, দু আদমীতে কি হোবে? অণ্ডর আদমী দেখি। বলিয়া সে আন্তে আন্তে এপারের দিকে অগ্রসর হইল।

বিষণ আবার চাকা ধরিয়া রথকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলদযুগলের গাত্রে আঘাতের পর আঘাত পড়িতে লাগিল—সহস্র প্রকার ভাষায় সে পশুযুগলকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সমস্তই বুধা। আর্ন্ত পশুযুগল একবার করণ নেত্রে বিষণের দিকে চাহিয়া পরস্পরেই ওপারের দিকে চাহিতেছিল। শক্তিশূন্য, শীতর্ন্ত পশু, ভাষাহীন মুখে আপনার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে দেখিয়া যেন ক্রমশঃ ভীত হইয়া পড়িতেছিল।

এই সংজ্ঞাহীন রজনীর অশুও নিশ্চরতা, এই অনন্ত বিস্তৃত মাঠের অস্পষ্ট চন্দ্রালোকের অবিচ্ছিন্ন রূপ কুয়াশার আবরণ পড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে বিষণকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল। বিষণ জোর করিয়া ভাবিতেছিল, রত্নিরাম এই আসিল বলিয়া। ভয় কি?

বিষণ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। পশুযুগলের ভীত, চকিত দৃষ্টি, নিরে বরক-শীতল জলের স্পর্শ, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি, তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ক্রমে তাহার পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল; বালুকাগর্ভ হইতে পা তুলিতে হীতিমত্ত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল—সে গাড়ীর উপর বসিল। বসিয়া বলদযুগলের গায়ে তাহার স্নেহহস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ভাষাহীন পশু তাহাদের আসন্ন বিপদের কথা বুঝিতে পারিয়াছে; আর্ন্তদৃষ্টিতে নিম্নত মালিকের দিকে চাহিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে—বিষণ কাঁদিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ গাড়ী আরও নীচে ধসিয়া গেল; বলদহরের পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত আসিয়া প্রায় জল ছুঁইল, শীতর্ন্ত পশুর কম্পন লাগিয়া

গেল। বিষণ ভাবিতে লাগিল, লোকজন হইয়া রত্নিরাম এখনও আসিয়া পড়িল না, নিশ্চয় শীঘ্র আসিবে।

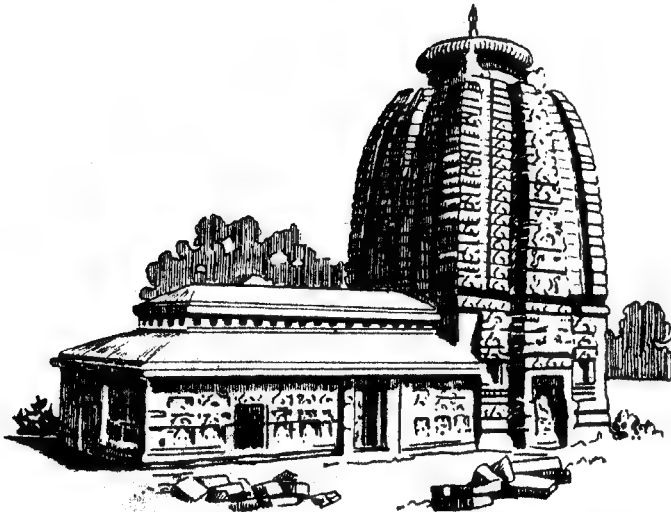
রত্নিরাম ভীরে উঠিয়া একটা বিড়ি ধরাইল। ভাবিল, ভারি ভ বলদ—বিশ রূপেয়াতে তিন জোড়া মিলে—তাহার জন্য কি দুই শত টাকা ফেলিয়া দৌড়াইয়া যাওয়া যায়? দৌড়াইয়া গেলে লোকজন সংগ্রহ করিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসা যায় বটে, কিন্তু টাকাটা কোথায় রাখা যায়—খুচরা টাকা ও পরমা; বাণ্ডিলটা আধ মণ ভারি হইয়াছে যে! আস্তে আস্তে যাওয়াই ভাল—আর এত রাত্রে লোকজনই বা কোথায়?

অর্দ্ধ মণ ভারি বহিয়া রত্নিরাম যখন ধীরে ধীরে পল্লীর দিকে চলিতেছিল তখন মেচির গর্ভের বালুকারাশি ভেদ করিয়া দুইটি আর্ন্ত পশু ক্রমশঃ অনন্তের পথে অগ্রসর হইতেছিল। গাড়ীর উপর আর বসা যায় না—বিষণ গাড়ী ছাড়িয়া রত্নিরামের পথ চাহিয়া জলে দাঁড়াইয়া! বলদ দুটি মাত্র নাক জাগাইয়া রহিয়াছে—এখনও আসিতে পারিলে হয়।

বিষণ শুক হইয়াই ছিল, এখন নিশ্চল নিশ্পন্দ হইয়া গিয়াছে—কখনও বলদের দিকে, কখনও রত্নিরামের পথের দিকে চাহিতেছে। মেচির স্রোত বহিয়া চলিয়াছে—ধরধার, শব্দ নাই, স্পর্শ তাহার হিমলীতল। স্বচ্ছ জলের মধ্য দিয়া সর্বগ্রাসী বালুকা দেখা যাইতেছে। চন্দ্র ডুবিয়া যাইতেছে; এ-পারের ক্ষেত ও ও-পারের বন যেন সমস্ত একাকার হইয়া আসিতেছে।

ক্রমে আরও নীচে—আর্ন্ত পশু এবার উল্লনেজে আকাশমুখী হইয়া রহিয়াছে। বিষণ রত্নিরামের পথ চাহিয়া; হঠাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, চতুর্থীর চন্দ্র কখন লাল হইয়া একটা একচক্ষু বিরাট দৈত্যের মত দেখা দিয়াছে—এ-পারের একটা পত্রহীন বৃক্ষ যেন খলখল করিয়া হাসিতেছে, ও-পারের বন যেন জ্বলুটি করিয়া বিথকে গিলিতে আসিতেছে।

বিষণ আবার চন্দ্রের দিকে চাহিল; একচক্ষু দানব তাহার সর্বগ্রাসী চিরক্ষুণ্ণিত রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া যেন নিম্নের আর্ন্ত পশুদ্বয়কে গ্রাস করিতেছে—সমস্ত জলটা রাঙিয়া গিয়াছে। এমন কুৎসিত ও বিভৎস দৃশ্য সে জীবনে দেখে নাই!



শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

✓হা ধাতু হইতে তি ঠ তি, ডা ধাতু হইতে জি ড তি,
 ✓পা ধাতু হইতে পি ব তি । কিন্তু কিরূপে এই সব হইল ?
 ব্যাকরণে বলা হইয়াছে ✓হা-প্রভৃতির স্থানে তি ঠ্ প্রভৃতি
 আদেশ হয় । ইহা ঠিক উত্তর নহে । কিরূপে ইহা হইল
 তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইবে । ইহার উত্তর খুই সোজা, তথাপি
 সমগ্র পাণিনি পড়িলেও ছাত্রেরা সাধারণত বলিতে পারিবে না
 যে, ✓হা প্রভৃতির অভ্যাস বা স্বিভ হওয়ার এক্ষণ পক্ষ হইয়াছে ।
 তুলনীয়—✓হা হইতে সনন্তে তি ঠা স তি, ✓ডা হইতে
 জি ডা স তি, ইত্যাদি ।

বৈদিক ভাষায় চ নি ক হ ৭ ইত্যাদি ক্রিয়াপদ,
এবং গুরু ক জ, ষ ক জ, বি ক জ, ইত্যাদি শব্দ পাওয়া

যায়। এইরূপ হরি শ্চ অ্র শব্দ বৈদিক ও সৌকিক সংস্কৃতে আছে। এই সমস্ত পদই মূল $\sqrt{চ}$ ম্ হইতে উৎপন্ন। ইহারই শকার-লোপে পরে $\sqrt{চ}$ ম্ হইয়াছে। কিন্তু বৈয়াকরণেরা হরি চ অ্র হইতে হরি শ্চ অ্র হইয়াছে বলিয়া উভয় শব্দের মধ্যে শকার-আগমের বিধান করিয়াছেন। ইহা করিবার আবশ্যিকতা ছিল না। মূলত শ্চ অ্র হইতেই আমাদের চ অ্র হইয়াছে।

প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে। চ অ্র মাঃ (চ অ্র ম স্) ও চ অ্র পর্ষায় শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু বস্তুত ইহাদের অর্থে কিছু ভেদ আছে। চ অ্র শব্দের বৌগিক বা আক্ষরিক অর্থ 'উজ্জল', 'দীপ্তিমান'; কারণ শ্চ ম্ অথবা চ ম্ ধাতুর অর্থ 'দীপ্তি পাওয়া'। উহার 'আলোচিত করা' অর্থ গৌণ। মাঃ (ম স্) শব্দের অর্থ 'চন্দ্র, চাঁদ'। পূর্বে চন্দ্রের প্রত্যক্ষ উদয়াগ্ন দেখিয়া কাল মাণা হইত বলিয়া উহার নাম হইয়াছিল মাঃ (ম স্, $\sqrt{ম}$ স্ অথবা $\sqrt{মা}$ ধাতু হইতে), অতএব চ অ্র মাঃ শব্দের পূর্বে মূল অর্থ ছিল 'উজ্জল চ অ্র'। পরে বিশেষণবাচক শব্দের অর্থটি লুপ্ত হওয়ায় কেবল 'চাঁদ' মাত্র বুঝাইতে এই শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। মাঃ অর্থাৎ চন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ থাকায় চৈত্রাদি মাসকে মা স বলা হয়।

শাব্দিকেরা তদ্ধিত প্রত্যয়-প্রকরণে বলিয়াছেন যে, ই ঠ প্রভৃতি প্রত্যয়ের ধোণে প্র শ শ্য স্থানে ঞ, বৃ ড স্থানে জা, বৃ ব ন্ ও অ র স্থানে ক ন, হূল স্থানে হ ব, দূ র স্থানে দ ব, ইত্যাদি আদেশ হইয়া থাকে, এবং এইরূপ যথাক্রমে এই সমস্ত পদ হয় :—
শ্রে ঠ, জো ঠ, ক নি ঠ, হ বি ঠ, দ বি ঠ, ইত্যাদি।
কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভব হয়? কি প্রকারে প্র শ শ্য প্রভৃতির স্থানে ঞ-প্রভৃতি হইতে পারে? বস্তুত ই ঠ প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় নহে, কং প্রত্যয়; আর ঞ-প্রভৃতিও প্র শ শ্য-প্রভৃতি হইতে নহে, $\sqrt{শ্রি}$ -প্রভৃতি ধাতু হইতেই এই সমস্ত পদ হইয়াছে। $\sqrt{শ্রি}$ হইতে শ্রে ঠ, $\sqrt{জা}$ হইতে জো ঠ, $\sqrt{ক}$ ন্ (যাহা হইতে ক জা) ক নি ঠ, $\sqrt{হু}$ (যাহা হইতে হূল, অ বি র) হইতে হ বি ঠ, $\sqrt{দু}$ ধাতু (যাহা হইতে দূ র, দূত) হইতে দ বি ঠ; ইত্যাদি।

উ চ ও নী চ শব্দ সুপ্রসিদ্ধ। ইহাদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে "উচ্চম্ উচ্চিনোভে; 'অন্যোভোঃ পীতি' (পাণিনি, ৩. ২. ১০১) অ প্রত্যয়ঃ", অর্থাৎ উৎ উৎপন্ন পূর্বক $\sqrt{চ}$ ি ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয়ের ধোণে উ চ শব্দ হইয়াছে। আর নী চ শব্দের নির্কচন যেথান হইয়াছে— "নিরুটাম্ ঙ্গ লক্ষ্মী চিনোতি;" অর্থাৎ যে নিরুট লক্ষ্মীকে লক্ষ্য করে সে নী চ। ইহার ব্যুৎপত্তি নি (= নিরুট) + ঙ্গ (= লক্ষ্মী) + চি + 'অ।' এই নির্কচন অতিকষ্টকল্পিত। এইরূপ কত শত আছে বলিয়া শেষ করা যায় ন। উৎপাদি প্রত্যয়ের মধ্যে প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তিসমূহের অনেকগুলি এইরূপ অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। পাণিতেও এইরূপ নির্কচন অত্যন্ত বেশী। যাহাই হউক, আলোচ্য শব্দ দুইটি কিরূপে হইয়াছে আমরা আলোচনা করিয়া দেখি। সংস্কৃতে অ ব চ শব্দ আছে, যেমন উ চা ব চ শব্দের মধ্যে। অ ব চ ও নী চ অর্থত একই। অ ব অর্থাৎ অধোদিকে যাহা গমন করে ($\sqrt{অ}$ চ্ অথবা $\sqrt{অ}$ ধ্ ধাতু) তাহা অ ব চ। অ চ্ ধাতুর আকারের লোপ হওয়ায় (কেন লোপ হইয়াছে পরে একটু বলিতে চেষ্টা করিব) অ বা চ না হইয়া অ ব চ। 'দক্ষিণ দিক' অর্থে অ বা চ্, ও অ বা চী শব্দও আছে। যেমন অ ব উপসর্গ-পূর্বক অ চ্ ধাতু হইতে অ ব চ, ঠিক তেমনি উৎ উপসর্গ-পূর্বক $\sqrt{অ}$ চ্ ধাতু প্রথমে উৎ চ (অরণীয় উৎ চ, উৎ নী চী 'উত্তর দিক'), তাহার পর অ চ্ ধাতুর অকারের লোপ হওয়ায় উ চ। ইহার আক্ষরিক অর্থ 'যাহা উপরের দিকে যায়।' সংস্কৃত উ চা ব চ শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'উচ্চ-নীচ', গৌণভাবে 'বিবিধ' অর্থে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যেমন অ ব-পূর্বক $\sqrt{অ}$ চ্ ধাতু হইতে অ ব চ, সেইরূপ নি-পূর্বক $\sqrt{অ}$ চ্ হইতে নী চ। অরণীয় না ক্। নি + অ চ্ হইতে অকারের লোপে নি চ ইহাই হইবার কথা, মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত তাহা না হইয়া নী চ ইহাই হইবে। কারণ মূলত নি অ চ এখানে তিনটি অক্ষর (syllable) থাকে, তিনটি অক্ষরে তিনটি যাত্রা। এখন অকারের লোপ হইলে

১। "উচ্চবসন্তর বা 'কর্ণমাদিত্যোঃ" (পা. ৬. ২. ১২৭)। ইহাও সম্ভবপর।

২। অবাচ্ অথো বা অক্ষতীতি অ ব চ ম্।

মথের একটি মাত্রা কমিয়া যায়, কিন্তু ভাষার প্রকৃতি (genius) এই স্বাভাবিক যে-কোনোভাবে হউক বজায় রাখিতে চাহে। তাই আলোচ্য স্থলে নি উপপদের ইকারকে দীর্ঘ করিয়া অর্থাৎ নি-কে নী করিয়া দিয়া তাহা রক্ষা করা হইয়াছে; নি অ এখানে দুই মাত্রা ছিল, নী এখানেও সেই দুই মাত্রা থাকিল। উ দ চ হইতে উ চ হইয়াছে বলিয়াছি। উ দ চ শব্দেও মূলত তিন অক্ষরে তিন মাত্রা ছিল, পরে অকারটা লোপ হওয়ার একটি মাত্রারও লোপ হইল, পদটি হইয়া গেল উ চ। এখানে পরে সংস্কৃত বর্ণ থাকায়, পূর্ববর্তী উকারে প্রথমে মূলত এক মাত্রা থাকিলেও এখন গুরু বলিয়া তাহাতে দুই মাত্রা হইয়া গেল, এবং মোটের উপর মথের দুই মাত্রা রক্ষিত হইল। মাত্রাকে ঠিক রাখিতে হইয়াছে বলিয়াই দি+অ প হইতে দী প, প্র+তি+অ প হইতে প্রতী প, অ হ+অ প হইতে অ ন প, ইত্যাদি অনেক; সর্বত্রই ইয় হইয়াছে দীর্ঘ।

পূর্বনির্দিষ্ট অকারের লোপ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলি। √ অ স্ হইতে অ স্তি, স্তঃ, স স্তি এই সব পদ হয়। এখানে দেখা যাইতেছে প্রথম পদটিতে ধাতুর অকার আছে, কিন্তু শেষের দুইটিতে ইহা নাই। কেন এরূপ হয়, ইহার কারণ কি? ইহাই কারণ যে, উদাত্ত ও অমুদাত্ত এই দুই স্বরের মধ্যে উদাত্ত অমুদাত্ত হইতে প্রবল। বহু স্থলেই প্রবল দুর্বলকে পরাভব করিয়া থাকে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রবল স্বরও এইরূপ দুর্বল স্বরকে পরাভব করে। পরাকৃত স্বর টকিতে না পারিয়া তিরোহিত হইয়া যায়। আলোচ্য স্থলে অ স্-তি এই পদে ধাতুর স্বর অর্থাৎ অ সের অকার উদাত্ত, আর প্রত্যয়ের স্বর অর্থাৎ তি, ইহার ইকার অমুদাত্ত। ধাতুস্বর অকার উদাত্ত এবং এই অমুদাত্তই প্রবল হওয়ার ইহা ঠিক রহিয়াছে, লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু স্তঃ ও স স্তি এই দুই পদে প্রত্যয়ের অর্থাৎ ত স্ ইহার অকার, ও অ স্তি ইহারও অকার উদাত্ত, এই অমুদাত্ত ইহারই প্রবল। ইহারাই প্রবল হওয়ার অমুদাত্ত ধাতুস্বর অর্থাৎ অ সের অকার দুর্বল, এবং এই দুর্বল হেতু তাহা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট সকারটি উপায়ান্তর না থাকায় প্রত্যয়-স্বরকে আশ্রয় করিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, সাধারণত একটি পদে একটিমাত্র স্বর উদাত্ত হয়। এই √ অ স্ ধাতুর উত্তর অ ন্ (শত্) প্রত্যয়ে স ন্

পদ হয়। এখানেও প্রত্যয়-স্বর অর্থাৎ অ সের অকার উদাত্ত, তাই ইহাই প্রবল, এবং ধাতু-স্বর অ সের অকার অমুদাত্ত, এবং তজ্জন্ম দুর্বল, দুর্বল হেতু পরাকৃত হইয়া, ইহা লুপ্ত হইয়াছে।

√ হ ন্ হইতে হ স্তি। এই পদে ধাতুর অর্থাৎ হ নের অকার উদাত্ত, তাই ইহা ঠিক আছে। কিন্তু উহারই অপর রূপ (প্রথম পুরুষ, বহু বচনে) স স্তি। এখানে প্রত্যয়-স্বর অ স্তির অকার উদাত্ত, তাই তাহা প্রবল বলিয়া ঠিক আছে, কিন্তু ধাতুস্বর হ নের অকার অমুদাত্ত বলিয়া দুর্বল হওয়ার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হ ন্ ধাতুর পূর্বরূপ ছিল ঘ ন্, প্রথম পুরুষের বহু বচনে সেই অমুদাত্ত হ স্তি না দেখিয়া আমরা স স্তি দেখিতে পাই। হ ন্ ধাতু হইতে জ ঘা ন প্রভৃতি হওয়ারও ইহাই কারণ। এই সব পদে হ নের পূর্ব রূপ দেখা যাইতেছে। পরে ঘ হানে হ হইয়াছে।

√ চি ৎ হইতে চে ত তি পদ হয়, কিন্তু √ তু দ্ হইতে তু ত তি, তো দ তি নহে। ইহার একমাত্র ইহাই কারণ যে, ভূদ্বিগণীয় ধাতুর এইরূপ স্থলে ধাতুস্বর উদাত্ত এবং তজ্জন্মই তাহার গুণ হয়; আর ভূদ্বিগণীয় ধাতুর বিকরণ স্বর উদাত্ত হয়, এবং সেই অমুদাত্ত ধাতুস্বরের গুণ হইবার কারণ থাকে না। ভূদ্বিগণের বিকরণ স্বর হইতেছে অকার (তু দ্—অ—তি, এখানে অকার বিকরণ)। অকারের গুণ হয় না। উদাত্তাদি স্বর হেতু রূপভেদ থাকাতাই ভূ দি ও তু দা দি নামে দুইটি গণ করিতে হইয়াছে।

√ ব চ্ ধাতু হইতে ব চ স্ ও উ ক্ত এই দুই পদই আমরা পাই, কিন্তু একটিতে বকার ঠিকই আছে, অপরটিতে তাহা উকাররূপে পরিণত হইয়াছে। এখানেও সেই একই কারণ, ব চ্—অ স্ এখানে ধাতুস্বর ব চের অকার উদাত্ত, তাই তাহার প্রাবল্য হেতু বকার অবিকৃত তাবৈ আছে। কিন্তু ব চ্—ত=উ ক্ত, এখানে প্রত্যয়-স্বর তকারের অকার উদাত্ত, এবং তজ্জন্ম প্রবল, আর ধাতুস্বর ব চের অকার অমুদাত্ত বলিয়া দুর্বল, তাহাতেই ভূদ্বিগণীয় বকার বিকৃত হইয়া উকার হইয়া পড়িয়াছে।

দে বী শব্দের প্রথমার এক বচনে দে বী, ইহার অন্য স্বরটি উ দাত্ত, তাই তাহা ঠিকই আছে। কিন্তু সন্ধ্যোবনের এক বচনের রূপ দে বি, শেষের স্বর দীর্ঘ না থাকিয়া ইয়

হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, সম্বোধনে শব্দটির প্রথম স্বর, এখানে একার, উদ্ভাভ হয়, শেষের স্বরটি হয় অস্বাভাবিক। তাই প্রথম স্বরটি অবিকল থাকে, কিন্তু শেষের স্বরটি বিকল হইয়া, হ্রস্ব হইয়া পড়ে।

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত মধুরতর। অস্বভাবই ইহার পরম প্রমাণ। রাজশেখর বলিয়াছেন, সংস্কৃতবন্ধ কঠোর, প্রাকৃত-বন্ধ হ্রস্বস্বর; পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে ভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতেরও মধ্যে সেই ভেদ। বাকগতি বলিয়াছেন, নব-নব অর্থের দর্শন, আর সন্নিবেশশিশির বন্ধনসম্পাদ এই সব সৃষ্টিকাল হইতে নিবিড়ভাবে প্রাকৃতই পাওয়া যায়। তা বাহাই হউক, এই অজ্ঞাই যে সংস্কৃত-অস্বভাবগনকারীকে প্রাকৃত আলোচনা করিতে হইবে তাহা এখানে বলা হইতেছে না। ইহাও বলা হইতেছে না যে, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য আলোচনার জন্য পালি-প্রাকৃত পড়িতে হইবে। পালি-প্রাকৃত না জানিলে সংস্কৃতে প্রযুক্ত অনেক কথাই অর্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না, এবং সেই জন্য অনেক স্থানে বিকৃত বা ভুল অর্থ করিয়া ফেলা হয়। সেই জন্য উহা আলোচনা করা আবশ্যিক। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক :—

পূর্বে পঞ্চ শব্দের কথা তুলিয়াছি। উহাই লইয়া আর একটু আলোচনা করি। ‘লেজ’ অর্থে পুচ্ছ শব্দ বৈদিক ভাষাতেও চলিত আছে। ইহার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনে পণ্ডিতগণকে ব্যাকুল হইতে দেখা যায়। কিন্তু একটু প্রাকৃতের জ্ঞান থাকিলে সহজেই বুঝা যায় যে, ইহা প্রাকৃতের ধ্বনিতত্ত্ব-অনুসারে পঞ্চ শব্দ হইতে হইয়াছে। সংস্কৃত পঞ্চি ম প্রাকৃতে বা ভাব্য পচ্ছি ম। এখানে চ যেমন ছ হইয়াছে, আলোচ্য স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। বলা হইয়াছে—

“পুচ্ছঃ পশ্চাৎপ্রদেশঃ তাল্ লাঙ্ লে পুচ্ছমিত্যে।”

অর্থাৎ পুংলিঙ্গে পুচ্ছ শব্দের অর্থ ‘পশ্চাৎ প্রদেশ,’ আর স্ত্রীবাচিনে তাহার অর্থ ‘লেজ’। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পুচ্ছ শব্দের অর্থ প্রথমে ‘পশ্চাৎ প্রদেশ’ হইল, পরে পশ্চাৎ প্রদেশে স্থিত ‘লেজ’ অর্থ হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, পঞ্চ শব্দের পকারে অকার, কিন্তু পুচ্ছ শব্দের পকারে উকার, কিঞ্চিৎ ইহা হইতে পারে? ইহার উত্তর এইরূপে দিতে পারা যায়। আলোচ্য স্থলে পকার ওষ্ঠ

বলিয়া তৎসংলগ্ন স্বর কণ্ঠ হইলেও ওষ্ঠরূপে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ পকারের প্রভাবে অকার উকার হইয়াছে। যেমন √ স্ব ধাতু হইতে সু মূর্ধা, √ পৃ ধাতু হইতে পূ মূর্ধা; এখানে মকার ও পকার ওষ্ঠ বলিয়া অকার বা ঙ্কারের স্থানে ওষ্ঠ স্বর উকার বা উকার হইয়াছে। আবার কৃ ধাতু হইতে চি কী বা, এখানে চকার তালব্য বলিয়া তৎসংলগ্ন ঙ্কার তালব্য স্বর অর্থাৎ ইকার হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, পূর্ববর্তী ধ্বনি যেমন কখনো কখনো পরবর্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করে, সেইরূপ পরবর্তীও ধ্বনি কখনো কখনো পূর্ববর্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করে।

‘শিখণ্ড’ অর্থে সংস্কৃতে পিচ্ছ শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু বস্তুত ইহা সংস্কৃত নহে, প্রাকৃত। ইহা পঞ্চ শব্দ হইতে হইয়াছে। সংস্কৃতের ক্ষ প্রাকৃতে তিন আকারে দেখা যায়; (১) খ (অথবা ক্খ), যথা, সং. ভ ক্ষণ, প্রা. ভ ক্খণ; (২) ছ (অথবা জ্ছ), যথা, সং. কৃ ক্ষি, প্রা. কৃ জ্ছি; (৩) ব (অথবা জ্ব), যথা, সং. কাম, প্রা. বা ম। এই নিয়মে পঞ্চ শব্দের প্রাকৃতে দুইটি রূপ দেখা যায়, পচ্ছ ও প ক্খ। পচ্ছ হইতে পিচ্ছ। পরবর্তী জ্ছ তালব্য হওয়ায় তাহার পূর্ববর্তী অকার কণ্ঠ হইলেও তালব্য ইকারের রূপে পরিণত হইয়াছে। আবার পিচ্ছ হইতে প্রাকৃতে যাদৃ জ্ছিক সা হু না সি কী ক রণে (Spontaneous Nazalization) নিয়মে (পরে দেখুন) পিং ছ (অথবা পিহ) শব্দও হইয়া থাকে। আর প ক্খ হইতে পূর্বোক্ত নিয়মে পুং খ অথবা পু ঞ্ছ হয় এবং ইহাও সংস্কৃতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা (রঘুবংশ, ২.৩১)—

“সক্তাঙ্গুলিঃ সারক পু ঞ্ছ এব
চিত্রার্পিতারজ্জ ইবাব তদে।”

ইত্যাদি অনেক। ইহা হইতে তাৎপর্যে ও বাঙলায় সাধারণত প্রচলিত পু ঞ্ছা হু পু ঞ্ছ শব্দের অর্থ বস্তুত কি তাহা বুঝা যাইবে। উক্ত সংস্কৃত বাক্যটিতে প্রযুক্ত ‘সারক-পু ঞ্ছ’ শব্দটির অর্থ বাণের নীচের দিকে বা মূলে বাঁধা পাখীর পালক। একটি পালকের পর আর একটি পালক, তাহার পর আর একটি পালক, এইরূপ যেমন পালকগুলি বাঁধা হয়, তেমনি একটির পর একটি, তাহার পর আর একটি এইরূপ ধারাবাহিক ভাবে কোনো বস্তুর বিভিন্ন অংশকে অঙ্গস্বরূপ

করিয়া বিচার করাকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করা বলি।

পূর্বে বা দৃষ্টি ক সাহু নাসিকী করণের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ভাষার প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সংস্কৃত বর্ণ-স্থলে যদি পূর্বের বর্ণটির লোপ হয় তবে বহু স্থলে ঐ লুপ্ত বর্ণের পূর্ববর্তী অক্ষরটি সাহুনাসিক হইয়া যায়। কেন হয় ইহা বলা শক্ত। এই সাহুনাসিক করাকেই বা দৃষ্টি ক সাহু নাসিকী করণ বলা হয়। সং. অ. ক্, প্রা. অ. ক্ থি। এখানে ককারের লোপ ও তাহার পূর্ববর্তী অক্ষর (যাহা নিজের গুরুমাত্রাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য আকার হইয়া যায় তাহা) সাহুনাসিক হওয়ার বাংলায় অ. ক্ থি হইতে আঁ থি হইয়াছে। এই নিয়মেই মূল ল ক গ হইতে প্রা. ল চ্চ গ, ইহা হইতে লা হন। কিন্তু ইহা সংস্কৃতে খুবই চলে; যেমন, মৃ গ লা হন ‘চন্দ্ৰ’। এইরূপ মার্জ ন হইতে মঞ্জ ন, এবং তাহা হইতে মঞ্জ ন। কবিরাজ মহাশয়দের দস্ত মঞ্জ নে র মঞ্জ ন সংস্কৃত নহে। এইরূপেই ক্রমশঃ সং. গর্জ ন > প্রা. গঞ্জ ন; সং. ক র্ত্ত ক > প্রা. ক র্ত্ত ক; ইত্যাদি অনেক, অনেক।

সংস্কৃতে বিকট শব্দের প্রয়োগ ঋষেদ হইতেই দেখা যায়। কিন্তু ইহা একেবারে খাটি সংস্কৃত নহে। মূল বিকৃত হইতে প্রাকৃতের প্রভাবে বিকট এই শব্দ হইয়াছে। এখানে ঋকার মূর্ছনা বলিয়া তাহার সংসর্গ ও প্রভাবে দন্ত্য তকার মূর্ছনা টকারে পরিণত হইয়াছে। ঋষেদে বিকৃত ও বিকট এই দুই পদই পাওয়া যায়। পরবর্তী শাস্ত্রিকেরা বিকট পদের বার্থ সমাধান করিতে না পারায় এবং ল ক ট, উৎ ক ট ইত্যাদি বহু পদ দেখিয়া যত্নসহ √ক ট ধাতু কল্পনা করিয়াছেন। এইরূপেই বস্তুত মূল সংস্কৃত ভূত (√ভূ+ত) হইতে ভট, আর বস্তুত উদ্ভূত হইতেছে উত্তট। উদ্ভূত শব্দের অর্থ ‘উদ্ধৃত’ (√ভূ ধাতুর অর্থ ‘ধারণ’ ও ‘পোষণ’, এখানে ‘ধারণ’)। তাই উত্তট কবিতার আসল অর্থ ‘উদ্ধৃত (quoted) কবিতা।’ ব্যাকরণে √ভট নামে একটি স্বতন্ত্র ধাতু কল্পিত হইয়াছে।

√প ত্ ধাতুই তকার স্থানে টকার হওয়ায় প ট আকার ধারণ করিয়াছে। উৎপাতয়তি আর উৎপাটয়তি বস্তুত একই।

√পি য্ + ত হইতে পি ট, প্রা. পি ট ঠ, ইহা হইতে ক্রমশঃ পীড়। ইহাই নামধাতুরূপে গৃহীত হয়। তাহা হইতে পীড়য়তি, পীড়ক, পীড়িত প্রভৃতি পদ হইয়াছে।

সংস্কৃতে মনোরথ শব্দ খুবই প্রচলিত। কিন্তু ইহার ব্যুৎপত্তি কি? শাস্ত্রিকেরা বলিবেন “মন এব রথোহুত। মনো রথ ইব বা।” এখানে যেমন-তেমন করিয়া শব্দ-সম্মিলনটা দেখান হইয়াছে, যথাকৃত অর্থের দিকে কোনো লক্ষ্য রাখা হয় নাই। মূলতঃ প্রথমে ছিল মনোর্থ (= মনো হর্থ)। ইহার আক্ষরিক অর্থ মনের প্রার্থনীয় বিষয়। যেমন, দর্শন হইতে দর্শন, তর্পণ হইতে তর্পণ, ইত্যাদি অরভক্তি হেতু বিপ্রকর্ষণে উৎপন্ন, সেইরূপ মনোর্থ হইতে মনোরথ শব্দও উৎপন্ন হইয়াছে।

গে হ শব্দ সংস্কৃতে আছে, বৈদিক ভাষাতেও ইহার প্রয়োগ আছে। কিন্তু বস্তুত ইহা প্রাকৃত। √গ্র হ (< মূল √গ্র ভ্) হইতে গ্র হ > *গ্রে হ > গে হ। ঋকধনে-কখনো রে হইয়া উচ্চারিত হয়। যজুর্বেদের এক শিকার অনুসরণে ক্রফো হ সি উচ্চারিত হয় ক্রেফো হ সি। পালি-প্রাকৃতেও এইরূপ আছে। এই নিয়মে গ্র হ হয় *গ্রে হ। পরে প্রাকৃতে রক্ষার লোপ হয় বলিয়া গে হ হইতে গে হ।

সংস্কৃতে ক দ দ্ব, ক দ র্থ, ক দু য ইত্যাদি শব্দ আছে। বৈদ্যকরণেরা বলিবেন, এই সকল স্থলে দু শব্দ স্থানে ক দ আদেশ হইয়াছে (পাণিনি ৬.৩.১০১)। কিন্তু ইহার কোনো প্রমাণ নাই। এইরূপ কাপু ক য, কাপ থ, ইত্যাদি স্থলে তাঁহাদের মতে ক শব্দ স্থানে কা আদেশ হইয়াছে। কিন্তু ইহাও কল্পনামাত্র।

যেমন ব দ্, ত দ্, এ ত দ্, অস্ত দ্ (তুলনীয় অস্ত দী য়, ক্লীবলিঙ্গের এক বচনে অস্ত দ্), ম দ্ (তুলনীয় ম দী য়), অ দ্ (তুলনীয় অ দী য়), ভ ব দ্, ইত্যাদি সর্কনাম দকারান্ত, তেমনি প্রসিদ্ধ কি ম্ শব্দেরই অর্থে দকারান্ত ক দ শব্দ।

‘সে কি কথা?’ ইহা বলিলে অনেক সময়ে আমরা বুঝি যে, সে কুৎসিত বা নির্দিক্ত কথা। এখানে কি শব্দে (বা সংস্কৃত কি ম্ শব্দে) নির্দা প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য, সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগ অনেক; যেমন, ভাববি লিখিয়াছেন—

“স কিসেবা সাধু ন শান্তি বোধিষং

হিতায় যঃ সংস্কৃতে স কিংপ্রভুঃ।”

কুংসিত বা নিম্নিত অর্থে প্রযুক্ত এই ক দ শব্দের পর অল্প প্রতীতি শব্দ যোগ করিয়া ক দ য় প্রতীতি হইয়াছে।

য দ + দ শ হইতে যা দ শ, ত দ + দ শ হইতে তা দ শ, ম দ + দ শ হইতে মা দ শ, ইত্যাদি। এই সমস্ত স্থলে য দ প্রতীতির দকারের লোপে যা প্রতীতি। সেইরূপ ক দ + পু ক য, ক দ + প থ, ইত্যাদি স্থলেও দকারের লোপে ক দ স্থলে কা হয়, এবং এইরূপে কা পু ক য, কা প থ, ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে।

ক দা শব্দ সুপ্রসিদ্ধ। ইহা এই ক দ হইতেই তৃতীয়ার এক বচনে হইয়াছে, যেমন ত দ হইতে ত দা, য দ হইতে য দা, ইত্যাদি।

নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সংস্কৃতে ক চিৎ শব্দের প্রয়োগ হয়। “কচিৎ কামপ্রবেদনে”। যেমন, কালিদাস যে য দ তে লিখিয়াছেন—“কচিদ ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে,” ‘হে রসিকে, তুমি স্বামীকে স্মরণ করিতেছ তো?’ এই ক চিৎ শব্দও ক দ + চিৎ হইতে। কি য় শব্দের উত্তর চিৎ ও চন প্রত্যয় সুপ্রসিদ্ধ, যেমন, কি কিৎ, কি কন ইত্যাদি।

য দ, ত দ ইত্যাদি সর্বনাম হইতে য ঐষ, য ঐষাৎ, য ত্ত, ইত্যাদি, ও ত ঐষ, ত ঐষাৎ, ত ত্ত ইত্যাদি পদ হয়। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে য দ ও ত দ ইহাদের দকারটি লুপ্ত হয়, আর কেবল যথাক্রমে য ও ত অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে স্থানে-স্থানে ক দ শব্দের দকারের লোপে কেবল মাত্র ক থাকে। এবং এইরূপেই ‘ঈষদ্ উক’ অর্থে কো ক পদ হইয়াছে, ক (<ক দ) + উক। পূর্বের স্তায় এখানেও ক দ শব্দ নিম্না প্রকাশ করে। কো ক শব্দের মূল অর্থ ‘কুংসিত উক’, ‘এটা কি উক? অর্থাৎ ধারাপ উক’। ইহা হইতেই ক্রমশ ‘ঈষদ্ উক’ অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়াছে।

সংস্কৃতে ই দ য় এই রূপটি সাধারণত ক্রীতবলিভে প্রথমার এক বচনে দেখা যায়। অত্র ইহার মূল রূপ অ; যেমন, অ-ঐষ, অ-ঐষাৎ, অ-ত, ইত্যাদি। পূর্বে যেরূপ দকারান্ত সর্বনামের

কথা বলা হইয়াছে—ও অশোচনা করা হইয়াছে তদুৎসারে এখানেও স্পষ্টত সর্বনামটি মূলে হইতেছে অ দ এবং ইহা হইতেই অ। এই অ দ হইতেই ধা প্রত্যয়ের যোগে অ দা। এই পদটি সংস্কৃতে দেখা যায়। ইহার বহু প্রয়োগ আছে। ইহার মূল অর্থ ‘এই প্রকারে’, পরে ‘নিশ্চিত’ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

সংস্কৃতে দ ত্ত পদ √ দা + ত হইতে, এখানে √ দা খাতুর বিহীন হয়, অর্থাৎ দ দ + ত হইয়া দ ত্ত হয়। আ উপসর্গ থাকিলে ইহা হইতে যেমন আ দ ত্ত, তেমনি আ ত্ত এই পদও হয়। এইরূপ প্র দ ত্ত, প্র ত্ত; অ ব দ ত্ত, অ ব ত্ত; ইত্যাদি। আ ত্ত, প্র ত্ত, অ ব ত্ত, ইত্যাদি পদ নিষ্পন্ন করিবার জন্য ব্যাকরণে বলা হয় (পাণিনি, ৭. ৪. ৪৭) যে, √ দা-স্থানে ত হয়। ইহা কিরূপে হয় তাহা বলা হয় নাই। বস্তুত প্র দ ত্ত হইতেই প্রাকৃতের প্রভাবে প্র ত্ত হইয়াছে। প্রাকৃতে পদের মধ্যে দুই স্বরের মধ্যবর্তী ক, গ, চ, জ, ত, দ ইত্যাদির লোপ হয়। পূর্বে ইহা একটু উল্লেখ করিয়াছি। এই নিয়মে প্র দ ত্ত > প্র অ ত্ত > প্র ত্ত। এখানে মধ্যবর্তী অকারের লোপ প্রাকৃতের সন্ধি অতুসারে। অল্প পদগুলিও এইরূপে হইয়াছে। দুই স্বরের মধ্যবর্তী ককারাদির লোপের জন্য তুলনীয় বৈদিক প্রয়োগ প্র উ গ < প্র য় গ।

সংস্কৃতের আ য় ত্ত শব্দ সকলেরই জানা। ইহা কিরূপে হইল? বৈদ্যাকরণেরা বলেন আ + √ যৎ + ত হইতে। কিন্তু ইহাতে কোনো প্রকারে শব্দটির সমাধান হয়, তাহার অর্থ হয় কি? উপসর্গের যোগে খাতুর অর্থ ভিন্ন হইয়া যায়, ইহা এরূপ স্থলে অতিদুর্লভ বৃত্তি। বস্তুত মূল আ দ ত্ত হইতে প্রাকৃতের প্রভাবে ইহা হইয়াছে; আ দ ত্ত > আ অ ত্ত > আ য় ত্ত। শেষোক্ত পদটিতে দকার হইয়াছে দ-প্রতি অতুসারে। এ সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু বলিয়াছি। এইরূপে আ য় ত্ত শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘গৃহীত’ অর্থাৎ বাহ্যিক গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা হইতেই ক্রমশ তাহার অর্থ গীতাইয়াছে ‘অধীন’। প র য় ত্ত বলিতে যে পদের দ্বারা ‘গৃহীত’, পরে যেমন ঢালাই তেমনি চলে’।

৩। ত্রৈতীয়া শ্রী নিকে ত ম প ত্রিকা (বিতীয় খণ্ডের, প্র বা সী, ১৩৪১, আশাঢ় (পাণিনি ব্যাকরণ ও সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভা ব)।

পূজারিণী

ঐশ্বর্যলতা চৌধুরী

বহু বৎসর পূর্বে, একটি তরুণ জাপানী চিত্রকর পদযাত্রে কিয়োটো হাটে ইয়োডো যাইতেছিল। পথটি অতি বন্ধুর, সমস্তটাই পূর্বতের উপর দিয়া যাইতে হয়। তখনকার দিনে পথঘাট অধিকাংশই এত বিপৎসঙ্কুল ছিল যে জাপানে একটা প্রবাসের উদ্ভব হইয়াছিল (“আত্মরে ছেলেকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাকে ভ্রমণে পাঠাও।”) কিন্তু পথ যেমনই হউক, দেশটার চেহারা এখনকার মতই ছিল। এখনকার মতই বড় বড় সিঁড়ার ও ঝাউগাছের বন ও বাঁশের ঝাড় ছিল, খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট বাড়ি ছিল, ধানের ক্ষেতে এখনকার মতই খড়ের টুপী পরিমাণ কৃষকেরা কাদায় দাঁড়াইয়া কাজ করিত। পথের ধারে বনের মধ্যে, এখনকার মতই বড় বড় বৃক্ষমূর্তির প্রশান্ত হাসি দেখা যাইত এবং নদীর ঘাটে, উলঙ্গ গ্রাম্য শিশু একইভাবে নৃত্য করিত।

এই চিত্রকরটি কিন্তু আত্মরে ছেলে ছিল না, সে ইহারই ভিতর বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছে এবং পথ চলার সব রকম কষ্ট সহ্য করিতেই সে ভাল ভাবে অভ্যস্ত। কিন্তু এইবার ভ্রমণে বাহির হইয়া, এক দিন সন্ধ্যার সময় সে এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে রাত্রে আশ্রয় বা আহার সংগ্রহ করিবার কোনে সম্ভাবনা দেখা গেল না। স্থানটি একেবারে বনভূমি, মনুষ্যের বাসের চিহ্নমাত্র নাই। যুবক বুঝিতে পারিল, পথ সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সে-দিন আবার কৃষ্ণপঙ্কের রাত্রি, চারিদিকের ঝাউবনের ঘন ছায়া অন্ধকারকে গভীরতর করিয়া তুলিয়াছে। ঝাউবনের ভিতর বাতাসের মর্দরধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। চিত্রকর শ্রান্তদেহে চলিতে লাগিল, যদি কোনো নদী দেখিতে পায় এই আশায়। তাহার ভীত ধর্ম্মিা চলিলে কোন-না-কোন গ্রামে সে পৌছিতে পারিবে। পথে একটা নদী সে দেখিল বটে, কিন্তু উহাও

কিছুদূর গিয়া একটা জলপ্রপাতে পরিণত হইয়া বাসের ভিতর নামিয়া যাইতেছে দেখা গেল। যুবক ব্যথা হইয়া আবার ফিরিল। চারিদিক ভাল করিয়া দেখিবার জন্য একটা চূড়ায় আরোহণ করিল, যদি সেখান হইতে মনুষ্যের বাসের কোনো চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু চতুর্দিকে উদ্ভূত পর্বত-শ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

রাত্রিটা তাহাকে উন্মুক্ত আকাশের তলায়ই কাটাতে হইবে বলিয়া সে যখন স্থির করিয়াছে, তখন হঠাৎ পাহাড়ের একপাশে, নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিল, ক্ষীণ একটি আলোর রেখা দেখা যাইতেছে। বোধ হয় কোনো মনুষ্যের বাসভূমি হইতেই ঐ আলো আসিতেছে, ভাবিয়া যুবক তাড়াতাড়ি সেই দিকটার নামিতে আরম্ভ করিল এবং কিছুদূর যাইবার পরই ছোট একটি কুটারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কুটারের দ্বার বন্ধ, কিন্তু কপাটের একটি কাটলের ভিতর দিয়া ঐ আলোকরশ্মি বাহিরে বিকীর্ণ হইতেছিল। যুবক ধীরে ধীরে দরজায় আঘাত করিল।

প্রথমবার আঘাতের কলে কোনই উত্তর পাওয়া গেল না। যুবক ব্যথা হইয়া বার বার ডাকিতে লাগিল এবং দরজায় আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে কে একজন প্রশ্ন করিল যে আগন্তুক কি চায়। কষ্টস্বরূপ অতি মধুর এবং যুবক আশ্চর্য হইল এই শুনিয়া যে, নারীটি রাজধানীর শুভভাষায় কথা বলিতেছে। উত্তরে সে বলিল সে একজন ছাত্র, ইয়োডো যাইতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে রাত্রে কিছু খাদ্য ও নিদ্রা যাইবার একটু স্থান প্রার্থনা করিতেছে। আর এখানে তাহা লাভ করা যদি একেবারেই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে নিকটবর্তী কোনো গ্রামের পথ ঘেন তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয়। তাহার সঙ্গে টাকা আছে, সে পথপ্রদর্শককে বেতনও দিতে পারিবে।

ভিতর হইতে নারীটি তাহাকে আরও কতকগুলি প্রশ্ন করিল; এমন স্থানেও যে কোনো পথিক আসিয়া

জুড়িতে পারে, তাহাতে মহিলাটি কেন অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছিল। বুকের সরল উত্তর শুনিয়া গৃহস্থামিনীর সম্মেহ দূর হইল বোধ হয়, সে বলিল, “আপনি অপেক্ষা করুন, আমি দরজা খুলিতেছি, এই ভীষণ রাত্রে আপনার পক্ষে কোনো গ্রাম খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। পথও অতিশয় বিপৎসকুল।”

কিছু পরেই দরজাটা খুলিয়া গেল এবং একটা কাগজের লঠন হাতে করিয়া একটি নারীমূর্তি দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লঠনটা সে এমন ভাবে উচু করিয়া ধরিয়াছিল যাহাতে সব আলোটা বুকের মুখে পড়ে এবং তাহার নিজের মুখখানা অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। নীরবে কয়েক মুহূর্ত চিত্রকরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রমণী বলিল, “আপনি অপেক্ষা করুন, আমি জল লইয়া আসিতেছি।” সে তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর হইতে জলের পাত্র ও তোয়ালে লইয়া আসিয়া বুকের পায়ের ধুলামাটি ধুইয়া ফেলিতে অল্পরোধ করিল। বুক নিজের পায়ের জুতা খুলিয়া পা ধুইল এবং তাহার পর গৃহস্থামিনীর সঙ্গে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। একখানিই মাত্র ঘর, পিছন দিকে শুধু একটি ছোট রান্নাঘর আছে। তরুণী তাহাকে বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিল এবং হাত পা গরম করিবার জন্য অগ্নিপাত্র লইয়া আসিল।

চিত্রকর এইবার গৃহস্থামিনীর দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল। তাহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া বুক একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তরুণী তাহার চেয়ে দুই-চার বৎসরের বড় হইতে পারে, কিন্তু তখনও সে পূর্ণযৌবনা। দেহে কৃষ্ণবর্ণের কস্তা নয় তাহা তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। তরুণী অতি হৃদয়বৃত্তি কণ্ঠে বলিল, “আমি এখন একলাই আছি এবং এখানে অতিথি-অভ্যাগতকে কখনও নিমন্ত্রণ করি না। কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে পথ চলিতে চেষ্টা করিলে আপনি বিপদে পড়িবেন। কিছু দূরে কয়েক ঘর কৃষক বাস করে, কিন্তু কেহ দেখাইয়া না দিলে আপনি কখনও তাহাদের ঘর খুঁজিয়া পাইবেন না। এইখানেই ভোর হওয়া পর্যন্ত থাকুন। আপনার হস্ত অস্থিহীন হইবে, কিন্তু উপায় নাই। আপনাকে ঘুমাইবার জন্য বিছানা দিতে পারিব এবং খাদ্যও কিছু দিব, কারণ

আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত হইয়াছেন। ঘরে চাল এবং সামান্য শাকসব্জী ভিন্ন কিছু নাই, আপনি কিছু মনে করিবেন না।”

বুকের তখন ক্ষুধার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে, বাহা হউক, কিছু পাইলেই সে বাচিয়া যায়। তরুণী ভিতরে গিয়া উঠুন জালিয়া, অল্প সময়ের মধ্যেই ভাত এবং কিছু শাক-সব্জীর তরকারি প্রস্তুত করিয়া আনিল এবং সমস্ত তাহাকে পরিবেশন করিল। বুক যতক্ষণ আহার করিল, ততক্ষণ সে প্রায় নীরবেই বসিয়া রহিল। বুকও কয়েকবার প্রশ্ন করিয়া যখন ‘হাঁ’ বা ‘না’ ভিন্ন অল্প কোনো উত্তর পাইল না, তখন অপ্রস্তুত হইয়া চূপ করিয়া গেল।

সে বসিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ঘরখানি পরিষ্কার তক্ তক্ করিতেছে, দে-সকল বাসনে তাহাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলিও অকৃত্রিম। ঘরখানিতে মূল্যবান আসবাব কিছু নাই, কিন্তু যা দুই-একটি সামান্য জিনিষ আছে তাহা দেখিতে অতি হৃদয়। দেওয়ালের গায়ে কাপড়চোপড় রাখিবার ও জিনিষ-পত্র রাখিবার যে আলমারীগুলি রহিয়াছে তাহার সম্মুখের পর্দাগুলি শাখা কাগজ মাত্র দিয়া প্রস্তুত। কিন্তু সেই কাগজের উপর আশ্চর্য্য হৃদয় ভাবে ফুল, পাতা, পর্বত, নদী, আকাশ, তারকা প্রভৃতির ছবি আঁকা। ঘরের এক কোণে একটি নীচ বেদী, তাহার উপর একটি ‘বৃহস্পতি’। উহার গালায় কাজ করা ছোট দরজা দুটি খোলা, ভিতরে একটি স্তম্ভাকার দেখা যায়, উহার দুই ধারে পুষ্পের অর্ঘ্য এবং সম্মুখে একটি প্রদীপ জলিতেছে। এই বেদীটির উপরের দেওয়ালে একটি অপূর্ণ হৃদয় চিত্র ঝোলান। চিত্রটি দয়াদেবীর, তাহার মাথায় চন্দ্রকলা, মুকুটের মত শোভা পাইতেছে।

বুকের খাওয়া শেষ হইতেই তরুণী বলিল, “আমি আপনাকে আরাম্যলব্ধ শয্যা দিতে পারিব না এবং মশারীটাও কাগজের তৈরি, তবু এই দুইটিই গ্রহণ করিয়া আপনি বিশ্রাম করুন। শয্যাটা আমারই, কিন্তু আজ রাত্রে আমার অনেক কাজ আছে, ঘুমাইবার সময় আমি পাইব না।”

বুক বুঝিল যে, এই অপূর্ণ হৃদয়ী তরুণী কোনো অজ্ঞাত কারণে একাকী এই বনে বাস করিতেছে। সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের শয্যাটি অতিথিকে দান করিতেছে, রাত্রে কাজ থাকার কথাটা ছুতামাত্র। বুক প্রবল আপত্তি করিয়া

বলিল যে তরুণীর এতখানি স্বার্থভাগ্য করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই, তাহাকে মাটিতে বিছানা করিয়া দিলে সে স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারিবে, এবং দুই-চারিটা মশায় কামড়াইলে তাহার কিছুই আশিয়া যাইবে না। কিন্তু তরুণী বড় বোনের মত জেদ করিতে লাগিল, যুবককে তাহার কথা শুনিতেই হইবে। তাহার বাস্তবিকই রাত্রে কাঙ্গা আছে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র সে সে-টি করিবার জন্ত ছুটি চায়। যুবককে অগত্যা হাল ছাড়িয়া দিতে হইল। ঘর মাত্র একখানি। তরুণী বিছানা করিয়া, কাগজের মশারীট টাঙাইয়া দিল এবং একটি কাঠের বালিশ আনিয়া দিল। তাহার পর পাতলা কাঠের একটি লম্বা দাঁড়-করান পর্দা আনিয়া সে বেদীর সম্মুখে রাখিয়া বেদীটি আড়াল করিয়া দিল। যুবক বুঝিল যে, তরুণী এখন একাকী থাকিতে চায়। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে শয়ন করিতে যাইতে হইল। তরুণীকে এতখানি কষ্ট দিতে যে সে বাধ্য হইল, ইহাতে তাহার মনটা ভারী হইয়া রহিল।

কিন্তু মন ভারী থাকা সত্ত্বেও খানিক পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল, বিছানাটি এমনই আরামদায়ক ছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে সে ঠঠাং চমকাইয়া জাগিয়া উঠিল। তারি একটা অদ্ভুত শব্দ হইতেছে। উহা মাঝুয়ের পায়েই শব্দ। কিন্তু পায়ে হাটিলে যে-রকম শব্দ হয়, সে-রকম নয়। উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া, অত্যন্ত দ্রুতভাবে কেহ যদি পা ফেলে তাহা হইলে যে-প্রকার শব্দ হয়, ইহাও সেইরূপ। যুবকের ভয় হইল, হয়ত বা ঘরে চোর প্রবেশ করিয়াছে। ভয়টা নিজের জন্ত নয়, কারণ তাহার কাছে এমন কিছুই ছিল না বাহা চোরে চুরি করিতে পারে। কিন্তু দয়্যাবতী তরুণীর জন্ত তাহার ভয় করিতে লাগিল। কাগজের মশারীটার দুই ধারে গুটুকরা নেই জানালার মত করিয়া বসান, যুবক তাহার ভিতর দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কাঠের পর্দাটা মাঝে পড়াতে ওপাশে যে কি হইতেছে তাহা সে একেবারেই দেখিতে পাইল না। একবার ভাবিল যে, চাঁৎকার করিয়া উঠিবে, কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিল ব্যাপারটা আসলে কি তাহা না জানিয়া, নিজের উপস্থিতিটা জানাইয়া কোনো লাভ হইবে না। শব্দটা একই ভাবে চলিতেছে ক্রমেই যেন বেশী করিয়া রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। যুবক স্থির করিল

তরুণীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা সে করিবেই, তাহাতে প্রাণ যায়, সেও স্বীকার। কাপড়চোপড় আটগা বাধিয়া সে ধীরে ধীরে কাগজের মশারীট তুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কাঠের পর্দার পাশে গিয়া সে উকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। যে-দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল, তাহাতে তাহার বিশ্বাসের সীমা রহিল না।

সেই বেদীর সামনে উজ্জল মহার্ঘ বস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তরুণী একাকী নৃত্য করিতেছে। তাহার পোষাকটি মন্দিরের নর্তকীর পোষাক, যদিও এত মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিতে যুবক কোনো নর্তকীকে দেখে নাই। এই সুন্দর সাজে সজ্জিতা হইয়া তাহাকে অলৌকিক সৌন্দর্যশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু যুবককে তাহার নৃত্য যেন তাহার রূপ অপেক্ষাও অধিক অভিভূত করিয়া ফেলিল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত তাহার মনে একটা ভয়ের ভাব জাগিয়া উঠিল। কে এই যুবতী? ডাকিনী বা কুহকিনী নয় ত? কিন্তু দয়্যাবতীর চিত্র, আর যে বৌদ্ধপূজাবাদীর সম্মুখে তরুণী নৃত্য করিতেছিল, এই দুইটি জিনিষ যুবকের সন্দেহ দূর করিয়া দিল, এমন কি এরূপ সন্দেহ করার জন্তই তাহার রীতিমত লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তরুণীর এই নৃত্য কেহ দেখে তাহা যে তাহার অভিপ্রেত ছিল না, তাহাও যুবক বুঝিতে পারিল। সে তরুণীর গৃহে অতিথি, তাহার উচিত এখনই মশারীর ভিতরে ফিরিয়া যাওয়া, কিন্তু সে যেন ময়মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যুবক বিশ্বাসের সহিত অমুভব করিতে লাগিল যে, এরূপ অপূর্ণ নৃত্য ইতিপূর্বে সে কখনও দেখে নাই। যতই দেখিতে লাগিল, তরুণীর নৃত্যলীলা তাহাকে ততই মোহিত করিয়া ফেলিতে লাগিল। ইহাও তরুণী খামিয়া গেল এবং নর্তকীর পরিচ্ছদ উন্মোচন করিবার জন্ত ফিরিতেই যুবককে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত চমকাইয়া উঠিল।

যুবক নিজের ক্রটির জন্ত ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল। সে বলিল, পায়ে শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় সে ভয় পাইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। ভয় নিজের জন্ত নয়, এই নির্জ্ঞান বনবাদিনী তরুণীর জন্তই। যাহা সে দেখিয়াছে তাহা যে কি বিশ্বাসের তাহাও সে বলিতে ভুলিল না। সে বলিল, “আপনি আমার কৌতূহল মার্জনা করিবেন, কিন্তু আমি জানিতে চাই যে আপনি কে এবং কিরূপে আপনি

এই আশ্চর্য্য নৃত্যপদ্ধতি শিখিয়াছেন। আমি রাজধানীর সকল বিখ্যাত নটীদেরই দেখিয়াছি, কিন্তু আপনার মত নৃত্য করিতে তাহাদের মধ্যে একজনও পারে না। একবার আপনার দিকে চোখ পড়ার পর, আমি আর চোখ ফিরাইতে পারি নাই।”

প্রথমে তরুণীকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বোধ হইতেছিল, কিন্তু যুবকের কথা শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহার মূখের ভাব বদলাইয়া গেল। দৈব হাসিয়া সে যুবকের সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহার পর বলিল, “আমি আপনার উপর রাগ করি নাই। কিন্তু আপনি যে আমার নৃত্য দেখিয়া ফেলিলেন, ইহাতে আমি দুঃখিত। একাকিনী ঐ ভাবে আমাকে নাচিতে দেখিয়া হয়ত আপনি আমাকে পাগল মনে করিয়াছেন, আমাকে এখন নিজের পরিচয় আপনার কাছে দিতেই হইবে।”

তরুণী আপনার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। যুবক কিশোর বয়সে এই যুবতীর নাম শুনিয়াছে বলিয়া এখন তাহার মনে পড়িল। সে তখন রাজধানীর সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তকী, তাহার পায়ে রাজার ঐশ্বর্য্য গড়াগড়ি যাইত, তাহার রূপেরও তুলনা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন এই সকলের মায়া কাটাইয়া সে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, কেহ আর তাহার সন্ধান পাইল না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যুবকও অদৃশ্য হইল। সে তাহার প্রাণী। যুবকের ধনসম্পত্তি কিছু ছিল না, তরুণীর যাহা সঙ্গে ছিল তাহাই সম্বল করিয়া তাহারা পর্ব্বতের উপরে পর্ব্বতটীরে স্থখে বাস করিতে লাগিল। দু-জনে দু-জনকে ভিন্ন আর কিছু জানিত না। যুবক তরুণীকে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিত। তাহার নৃত্য দেখাই যুবকের জীবনের সবচেয়ে গভীর আনন্দের বিষয় ছিল। সন্ধ্যা হইলেই সে নিজে কোন একটি প্রিয় সুর বাজাইতে বসিত, আর যুবতী এই সুরের তালে নৃত্য করিত। কিন্তু হঠাৎ শীতকালে অসুস্থ হইয়া পড়িয়া যুবক মারা গেল, তাহার প্রাণিনিরী প্রাণঢালা সেবাও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন হইতে তাহার স্মৃতি অবলম্বন করিয়া, তাহারই পূজা করিয়া তরুণী বাঁচিয়া আছে। দিনের বেলা তাহার স্মৃতিবলকের সম্মুখে সে পুষ্প ও দীপের অর্ঘ্য সাজায়, স্নাত্রে তাহার সম্মুখে পূর্ব্বের মতই নৃত্য করে। শ্রান্ত অতিথিকে আগাইয়া দেওয়ার তাহার কোনই ইচ্ছা ছিল না,

সেই জন্ত সে যথাসম্ভব দেরি করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু অতি লঘু ভাবে পদক্ষেপ করাতেও যে যুবক চিত্রকরের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার জন্ত তরুণী ক্রমাভিকা করিল।

তাহার পর তরুণী চা প্রস্তুত করিয়া আনিল। যুবক তাহার সহিত চা পান করিবার পর, তরুণীর অস্থান-বিনয়ে বাধ্য হইয়া আবার শয্যায়া ফিরিয়া গেল এবং অবিলম্বেই আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া তাহার ক্ষুধাবোধ হইতে লাগিল। তরুণীও তাহার জন্ত খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। খাবার রাত্রেই মত অতি সাধারণ। ক্ষুধা থাকে সবেও যুবকের পেট ভরিয়া থাকিতে সন্ধ্যা বোধ হইতে লাগিল, সে ভাবিল হয়ত তরুণী নিজের জন্ত কিছুই রাখে নাই। যাত্রা করিবার সময় সে তরুণীকে আহ্বানের মূল্যবরূপ কিছু অর্থ দিতে গেল, কিন্তু তরুণী কোনমতেই তাহা লইতে সম্মত হইল না। সে বলিল, “আমি আপনাকে যাহা খাইতে দিয়াছি, তাহা এত সামান্য যে, তাহার মূল্য বলিতে কিছু নাই এবং অর্থলোভের আশায় আমি উহা দিই নাই, আতিথ্যার্থ রক্ষা করিবার জন্তই দিয়াছি। আপনার যাহা অভাব-অসুবিধা হইয়াছে, তাহা তুলিয়া গিয়া শুধু আমার সেবার আগ্রহটুকু যদি মনে রাখেন তাহা হইলেই আমি দণ্ড হইব।”

অর্থ দিবার জন্য যুবক আর একবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বার-বার এ-বিষয়ে জেদ করাতে তরুণী ক্রোধ পাইতেছে দেখিয়া সে নিরস্ত হইল, এবং মূখের কথায যথাসম্ভব নিজের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, তাহার কাছে বিদায় লইয়া সে আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার মন যেন এখানই আটক পড়িয়াছিল, পা নড়িতে চাহিতেছিল না, কারণ যুবতীর রূপ ও গুণ সত্যই তাহাকে অতিশয় মোহিত করিয়াছিল। তাহাকে কোন্ পথে যাইতে হইবে, তরুণী তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিল, এবং যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল পাড়াইয়া দেখিল। ঘটনাক্রমে হাটিয়া, যুবক একটি স্থপরিচিত পথে আসিয়া পৌঁছিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যুবতীকে সে নিজের নামটাও বলিয়া আসে নাই। পরক্ষণেই ভাবিল “বলিয়াই বা কি হইত? চিরকালই হয়ত আমি এইরূপ দরিক থাকিব।”

২

বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কত নিয়ম-কানূনের পরিবর্তন হইয়াছে, চিত্রকরও এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু শুধু বৃদ্ধই হন নাই, অতিশয় খ্যাতিপ্রাপ্তিপত্তিও লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আশ্চর্য্য অকনকশালতায় নোহিত হইয়া বহু রাজপুত্র তাঁহাকে যাচিয়া অর্থ-সম্পত্তি দান করিয়াছেন। চিত্রকর এখন ধনী ব্যক্তি, রাজধানীর একটি অতি সুন্দর অট্টালিকায় তিনি বাস করেন। জাপানের নানা অংশ হইতে দলে দলে তরুণ চিত্রকর আসিয়া তাঁহার কাছে শিক্ষালাভ করিতেছে। তাহারাই তাঁহার সঙ্গেই বাস করে, সর্ব বিষয়ে তাঁহার পরিচর্যা করে। চিত্রকরের নাম দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

একদিন একটি বৃদ্ধা নারী তাঁহার গৃহের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। ভৃত্যেরা তাহার হীন বেশভূষা এবং দীন ভাব দেখিয়া তাহাকে সাধারণ ভিক্ষুক বলিয়া স্থির করিল এবং অতি কর্কশভাবে তাহাকে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। জীলোকটি বলিল, “আমি কেন আসিয়াছি, তাহা কেবলমাত্র তোমাদের প্রভুর নিকটে বলিতে পারি।” ভৃত্যগণ ভাবিল জীলোকটি পাগল, সুতরাং চিত্রকর এখানে নাই, কবে ফিরিবেন জানি না, বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

কিন্তু জীলোকটি রোজই আসিতে লাগিল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া চলিল, তবু তাহার আসার বিরাম নাই। ভৃত্যেরা প্রতিবারেই তাহাকে এক একটা মিথ্যা কথা বলিয়া বিদায় দেয়, “আজ চিত্রকর অস্থ্য,” বা “আজ তিনি বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।” তবু জীলোকটি রোজই আসে, হেঁড়া কাপড়ে জড়ান একটি পুটলি সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে।

চিত্রকরের পরিচারকগণ অবশেষে ক্লান্ত হইয়া স্থির করিল, প্রভুর কাছে ইহার কথা বলিয়া দেওয়াই ভাল। তাহারাই তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, “বাহিরের দরজার সামনে একটি বৃদ্ধা অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকে দেখিলে ভিহারিণী বলিয়াই বোধ হয়। সে প্রায় দুই মাস ধরিয়া সমানে আসিতেছে এবং আসিবার কারণ আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বলিতে সে অনিচ্ছুক। আমরা তাহাকে পাগল

মনে করিয়া বহুবার ফিরাইয়া দিয়াছি। তবু সে আসে দেখিয়া এ-কথা আপনাকে জানাইলাম। উহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা অহুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।”

চিত্রকর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “এ-কথা আমাকে পূর্বে জানাও নাই কেন?” এই বলিয়া তিনি নিজেই বাহির হইয়া গিয়া অতি সদয়ভাবে সেই জীলোকটিকে সম্ভাষণ করিলেন। তিনি নিজেও যে এককালে অতি দরিদ্র ছিলেন, সে-কথা তুলিয়া যান নাই। তিনি জীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে তাঁহার নিকট কি ভিক্ষা চায়।

জীলোকটি বলিল, তাহার খাদ্য বা অর্থের কোনো প্রয়োজন নাই, চিত্রকরের নিকট তাহার শুধু এই ভিক্ষা যে, তিনি যেন তাহার জন্ত একটি ছবি আঁকিয়া দেন। চিত্রকর কিছু বিস্মিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি জীলোকটিকে তাঁহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। সে তাঁহার পিছন পিছন আসিল এবং ঘরের ভিতর নতজানু হইয়া সন্দের পুটলিটি খুলিতে আরম্ভ করিল। খোলা হইবার পর চিত্রকর দেখিলেন ভিতরে একটি পুরাতন নর্ত্তকীর পোষাক রহিয়াছে, উহা এখন ছিন্ন ও বিবর্ণ বটে, কিন্তু দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এককালে উহা খুবই উজ্জ্বল ও সুন্দর ছিল।

বৃদ্ধা যখন এক-একটি করিয়া পোষাকের অংশগুলি বাহির করিতেছিল, চিত্রকরের মনের ভিতর তখন একটা আন্দোলন চলিতেছিল। কি যেন তিনি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, অথচ পারিতেছিলেন না। হঠাৎ তাঁহার সব কথা মনে পড়িল। তিনি মানসচক্ষে সেই পর্কতের উপরের ক্ষুদ্র কুটারটি দেখিতে পাইলেন, যেখানে তিনি অতি সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন। সেই ছোট ঘরখানি, সেই কাগজের মশারী, সেই পুজার বেদী, সেই গভীর রাত্রে তরুণীর একাকী নৃত্য, সকলই তাঁহার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিল। তিনি বিস্মিতা বৃদ্ধার সম্মুখে আত্মমি নত হইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, “আপনাকে যে আমি এক মুহূর্তের জন্তও তুলিয়াছিলাম, আমার সে অপরাধ আপনি ক্ষমা করিবেন। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল আপনাতে আমাতে দেখা, তাই এরূপ ভুল সম্ভব হইয়াছে। এখন আপনাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনি

নিজের গৃহে আমাকে অতি সাদরে স্থান দিয়াছিলেন, নিজের শয্যাটি পর্যন্ত আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আপনার নৃত্য আমি দেখিয়াছিলাম, আপনার কাহিনীও শুনিয়াছিলাম। আপনার নামটি আমি ভুলি নাই।”

তাঁহার কথা শুনি অতিশয় বিস্মিতা ও সন্তোষিত হইয়া পড়িল। সে প্রথমে কিছুতেই উত্তর দিতে পারিল না, কারণ বার্ককা ও দুঃখ-মারিত্রের পীড়নে তাহার স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চিত্রকর সদয়কণ্ঠে আরও অনেক কথা বলাতে, এবং তাহার পূর্ব বাসস্থানের বর্ণনা দেওয়াতে, তাহারও বিগত দিনের সকল কথা মনে পড়িল এবং সে সজল চক্ষে বলিল, “ভগবানই আমাকে পথ দেখাইয়া এখানে আনিয়াছেন। কিন্তু আপনার পবিত্র পদধূলি যখন আমার ক্ষুদ্র কুটারে পড়িয়াছিল, তখন আমি এখনকার মত ছিলাম না। প্রভু বৃদ্ধের রূপাতেই কেবল আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন।”

তাঁহার পর সে নিজের দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল। চিত্রকর চলিয়া যাইবার পর, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে এবং বাধ্য হইয়া কুটার-খানি বিক্রয় করিয়া, তাহাকে আবার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। রাজধানীতে তাহার নাম পর্যন্ত সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। নিজের কুটারটি ছাড়িয়া আসিতে তাহার মনে অত্যন্তই ব্যথা লাগিয়াছিল, কিন্তু বার্ককা ও দুর্বলতাবশতঃ সে যখন বেদীর সম্মুখে নৃত্য করিবার ক্ষমতাও হারাইয়া বসিল, তখন তাহার আর মনে বেদনার সীমা রহিল না। প্রিয়তমের আশ্রয় সহিত তাহার ঘেন, নৃতন করিয়া বিচ্ছেদ ঘটিল। সে এখন নর্তকীর বেশে এবং নৃত্যের ভঙ্গীতে নিজের একটি চিত্র অঙ্কিত করাইতে চায়, উহা সে বেদীর সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিবে। যাহাতে তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাহার জন্ত সে ক্রমাগত প্রার্থনা করিয়াছে। সে সাধারণ কোনো চিত্রকরের নিকট না গিয়া স্বয়ং চিত্রকররাজের নিকট এই কারণেই আসিয়াছে যেন চিত্রটি অতি সুন্দর হয়। নিজের নর্তকীর পোষাকটিও সে লইয়া আসিয়াছে এই আশায় যে, তিনি ইহার সাহায্যে ছবিটি অঙ্কিতে পারিবেন।

চিত্রকর তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আপনি

যেদুপ চিত্র চান, তাহা আমি অতি আনন্দের সহিতই অঙ্কিয়া দিব। আজ আমি ব্যস্ত, একটি কাজ আমাকে অন্যত্র মধ্যে অবশ্যই শেষ করিতে হইবে। কিন্তু কাল যদি আপনি আসেন, আমার সাহায্যত যত্ন করিয়া আমি ছবিখানা অঙ্কিয়া দিব।”

স্রীলোকটি বলিল, “কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় কথা আপনাকে বলা উচিত, বলিতে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। আপনার পরিশ্রমের আমি কোনো মূল্য দিতে পারিব না, কারণ এই নর্তকীর পোষাকটি ভিন্ন আমার নিকটে আর কিছু নাই। এইটি মাত্র আপনাকে আমি দিতে পারি। এখন ছিন্ন ও বিবর্ণ, যদিও এককালে উহা অতি মূল্যবান ছিল। তবুও আশা করি, মহাশয় অগ্রগ্রহ করিয়া এটি গ্রহণ করিবেন, কারণ পুরাণ জিনিষ হিসাবে ইহার একটা মূল্য আছে। আজকালকার নর্তকীরা এই ধরণের পোষাক আর পরে না।”

চিত্রকর বলিলেন, “এ-বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আপনার স্বর্ণের অলমাত্রও যে শোধ করিতে পারিব, ইহাতেই আমি অত্যন্ত সুখী। কাল আমি অবশ্যই আপনার চিত্র অঙ্কিতে আরম্ভ করিব।” স্রীলোকটি তিন বার তাহার সম্মুখে আভূমি প্রণতা হইয়া বলিল, “আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার আরও কিছু বলিবার আছে। আমাকে এখন যেরূপ দেখিতেছেন এই ভাবেই অঙ্কিত করিবেন, ইহা আমি চাই না। আপনি প্রথম আমাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেই ভাবেই অঙ্কিত করিবেন, ইহাই আমি চাই।”

চিত্রকর বলিলেন, “আমার স্মরণ আছে, আপনি অপূর্ণ সুন্দরী ছিলেন।”

স্রীলোকটি ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থে আর একবার চিত্রকরকে প্রণাম করিল, তাহার পর বলিল, “আমি যাহা কিছুই জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সবই তাহা হইলে হইতে পারিবে। আপনার যখন আমার পূর্বকালের আকৃতি স্মরণ আছে, অগ্রগ্রহ করিয়া আমাকে সেই ভাবেই অঙ্কিত করিবেন। দয়া করিয়া আমাকে আবার তারুণ্য ও সৌন্দর্য ফিরাইয়া দিবেন, তাহা হইলেই আমি সেই পরলোকবাসী আত্মাকে আনন্দ দিতে পারিব। তাহারই জন্ত আমি ইহা ভিক্ষা

করিতেছি। তিনি আপনার অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া আমার সকল ক্রটি মার্জনা করিবেন।”

চিত্রকর তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি কাল আসিবেন। আপনাকে তরুণী স্তম্ভীরী নর্তকীরূপেই আমি চিত্রিত করিব। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীর চিত্র আঁকিতে হইলে আমি যতখানি যত্ন সহকারে আঁকি এত চিত্রখানি তাহা অপেক্ষাও যত্নে আঁকিব। আপনি কোনো দ্বিধা না করিয়া কাল আসিবেন।”

বৃদ্ধা তাহার পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শুভ্র কোমল রেশমের উপর চিত্রকর তাহার ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। চিত্রকরের ছাত্ররা বৃদ্ধার যে মূর্তি দেখিতেছিল, চিত্রে কিন্তু সে মূর্তি ফুটিল না। ছবিতে তাহার আকৃতি, সে পক্ষিণীর মত উজ্জ্বল নয়না, দেহের গঠন তাহার পল্লবিনী লতার মত, স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ সে অস্পর্শীয় মত মোহিনী। চিত্রকরের মাথাগুলির স্পর্শে তাহার লুপ্ত রূপযৌবন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ছবিখানি শেষ হইবার পর চিত্রকর উহাতে নিজের নাম মোহর করিয়া দিলেন এবং পুরু রেশমের উপর ছবিখানিকে বসাইয়া, উপরে ও নীচে সিঁতার কাঠ ও হৃদিস্থ যন্ত্র করিয়া দিলেন। টাঙাইবার জন্ত পাকান রেশমের দড়ি লাগাইয়া দিতেও ভুলিলেন না। একটি শাদা কাঠের বাস্তু করিয়া ছবিখানি তিনি বৃদ্ধাকে উপহার দিলেন। তাহাকে কিছু অর্থ দিবারও ইচ্ছা তাঁহার ছিল, কিন্তু অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও বৃদ্ধা অর্থ লইতে সম্মত হইল না। সে সজলচক্ষে কেবলই বলিতে লাগিল, “আপনি বিশ্বাস করুন, অর্থে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। এই ছবিখানির জন্যই শুধু এতদিন আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছি। আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, এ-জীবনে আমার আর কোনো কামনা নাই। এইরূপ নিষ্কামচিত্রে আমি যদি মরিতে পারি, তাহা হইলে নির্দোষ লাভ করা আমার পক্ষে সহজ হইবে। শুধু এই ভাবিয়াই আমি স্থপিত হইতেছি যে, এই ছিন্ন পোষাকটি ভিন্ন আমার আর আপনাকে দিবার কিছুই নাই। আপনি অগ্রহ করিয়া এইটিই গ্রহণ করুন। আপনার ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখের হয়, তাহার জন্ত আমি প্রভুর নিকট

নিত্য প্রার্থনা করিব। আপনি যে দয়া করিলেন, তাহার তুলনা নাই।”

চিত্রকর হাস্ত করিয়া বলিলেন, “আমি কিই বা করিতে পারিয়াছি? কিছুই নয়। তবে এই পোষাকটি গ্রহণ করিলে আপনি যদি তুষ্ট হন, তাহা হইলে আমি উহা গ্রহণ করিতেছি। ইহাতে পূর্বকালের অনেক মধুর স্মৃতি আমার মনে পুনর্বার জাগরুক হইবে। আপনি কোথায় বাস করেন, আমাকে বলুন। তাহা হইলে আমি গিয়া ছবিটি টাঙান হইলে দেখিয়া আসিতে পারি।” চিত্রকরের একথা জিজ্ঞাসা করিবার ভিতর উদ্দেশ্য ছিল, বৃদ্ধার বাসস্থান জানিতে পারিলে তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিতেন।

বৃদ্ধা কিন্তু কোনোক্রমেই নিজের বাসস্থানের সন্ধান দিল না। বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে শুধু বলিল যে, তাহার বাসস্থান অতি দীনহীন, চিত্রকরের স্নায়ু সন্ধান্ত ব্যক্তির সেখানে পদধূলি দেওয়া উচিত নয়। তাহার পর তাহাকে আরও নানাভাবে ধন্বাদ দিয়া জীলোকটি চিত্রখানি লইয়া চলিয়া গেল।

চিত্রকর নিজের একজন ছাত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি উহার অনুসরণ কর, এবং সে কোথায় বাস করে তাহা আমাকে আসিয়া জানাও। তুমি এমনভাবে যাইবে যে, বৃদ্ধা যেন জানিতে না পারে।” ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

বহুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল, “মহাশয়, আমি ঐ জীলোকটির পিছন পিছন যাইতে যাইতে শহর অতিক্রম করিয়া নদীর ধারে উপস্থিত হইলাম। দেখানে অপরাধীদিগকে বধ করা হয়, সেই মশানের নিকট এক অতি ভয় জীর্ণ কুটারে ঐ জীলোক বাস করে। স্থানটি অতি জঘন্য, ডাকিনীর বাসস্থান হইবার উপযুক্ত।”

চিত্রকর বলিলেন, “স্থানটি যত জঘন্য হউক, তুমি কাল আমাকে ঐ স্থানে লইয়া যাইবে, কারণ আমি ঐচিরা থাকিতে ঐ জীলোকটির অন্ন-বস্ত্রের অভাব বাহাতে না ঘটে তাহা আমাকে দেখিতে হইবে।”

সকলে বিস্মিত হইতেছে দেখিয়া চিত্রকর সেই তরুণী

নর্তকীর কাহিনী বিবৃত করিলেন। তখন সকলেই বুঝিল যে, তাঁহার আচরণ কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

তাঁহার পর দিন সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে, চিত্রকর ও তাঁহার ছাত্র নগর ছাড়িয়া সেই নদীর ধারের ভয়াবহ স্থানটিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা সমাজভাঙিতদিগের বাসভূমি।

হুটারের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া, তাঁহারা বারকয়েক দরজার উপর টোকা মারিয়া সন্বেদ করিলেন। কোনো সাড়া না পাইয়া দরজা ঠেলিতেই ভিতর হইতে উহা খুলিয়া গেল। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে বহুদিন পূর্ব্বেকার হুটার-প্রবেশের দৃশ্যটি অতি উজ্জ্বলভাবে ভাসিয়া উঠিল।

ভিতরে ঢুকিয়া তিনি দেখিলেন বৃদ্ধার জীর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহ মাটির উপর পড়িয়া আছে। কাঠের একটা তাকের উপর তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট 'ব্যুৎসদান'টি বিরাজ করিতেছে, তাহার ভিতর সেই স্মৃতিফলকটি এখনও বিদ্যমান।

তখনকার মত এখনও সেটির সম্মুখে প্রদীপ জলিতেছে। কিন্তু দম্যদেবীর ছবিটি আর নাই, তাহার পরিবর্তে তাঁহার অঙ্কিত নর্তকীর চিত্রটি দেওয়ালের গায়ে টাঙান। ঘরখানির ভিতর আর বিশেষ কিছু নাই, শুধু একটি সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদ, দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র।

চিত্রকর দুই-তিন বার নর্তকীর নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পাইলেন না।

হঠাৎ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধা বাঁচিয়া নাই। তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া তাঁহার বোধ হইল, বৃদ্ধার মুখে যেন পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য ও তাকবোয় আভাস ফিরিয়া আসিয়াছে, মুখে জরার ও দারিদ্র্যের বলিরেখাগুলি অনেকটাই যেন মুছিয়া গিয়াছে। তাঁহার অপেক্ষাও মহান কোনো চিত্রকরের তুলির গুণে ইহা ঘটিয়াছে বুঝিয়া তিনি সসম্মানে মস্তক নত করিলেন।*

* লাফাকাডিও হান্ হইতে।



অমিতাভ বুদ্ধ
শিল্পী—শ্রীশ্রী বাসুদেব

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালী

অধ্যাপক শ্রীদেবব্রত ~~স্বর্গদেব~~ এম-

১

প্রধানতঃ উদরারের সংস্থানের অল্প বাঙালী বহু পূর্বে ইতেই জয়ভূমির স্ফামল ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া দেশ-দশান্তরে গমন করিয়া আসিতেছেন। বর্তমান কালে পশ্চিমে বলুচিস্থান, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, উত্তরে কাশ্মীর এবং দক্ষিণে ত্রিবাকুড়, এই সীমানার মধ্যে প্রায় সকল স্থানেই বাঙালী দখিতে পাওয়া যায়। সংখ্যার ন্যূনত্বকিই একমাত্র পার্থক্য। ব্রহ্মদেশ হইতে গিয়া পশ্চিমোত্তর ভারতে যাহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদের সখ্যে নানারূপ সংবাদাদি সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তন্নিম্ন, স্বাস্থ্যলাভ, তীর্থদর্শন প্রভৃতি ব্যাপদেশে প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক বাঙালী এসকল প্রদেশে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এই কারণে ঐ সকল স্থানের বাঙালীদের সখ্যে জ্ঞান ব্রহ্মদেশবাসী বাঙালীদের ভালই আছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশগণের অপর প্রাস্তবৃত্তি বিস্তৃত ভূখণ্ডে যে কত ব্রহ্মসন্তান গমন করিয়াছেন, তাহার সঠিক সংবাদ কম জন রাখিয়া থাকেন? অথচ ব্রহ্মদেশবাসী বাঙালীদের সখ্যে এত বিষয় জানিবার আছে যে, তাহা স্বদেশে অবস্থান করিয়া সহজে কেহ অনুমান করিতে পারেন না।

প্রধানতঃ চাকুরী লইয়াই শিক্ষিত ভ্রমসন্তানগণ ঐ প্রদেশে গমন করিয়াছেন। কিন্তু অ-শিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত বহু বাঙালী (হিন্দু ও মুসলমান) ও যে অর্থোপার্জন করিবার জন্য গমন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে ঐ দেশেই ভূমির অধিকারী হইয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন, এসকল বিষয় অনেকেই অবগত নহেন। ব্রহ্মদেশে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানগণ যে কত বিভিন্ন রূপ কার্যদ্বারা অর্থোপার্জন করিতেছেন, তাহা সম্যক্রূপে অবগত হইলে সকলেই বিস্মিত হইবেন। প্রত্যুত ব্রহ্মদেশের বাহিরে অল্প যে-সকল স্থানে বাঙালী গমন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আর কোন একস্থানে এত অধিকসংখ্যক বাঙালী

এত অধিক প্রকারের কার্যদ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেছেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসখ্যে এ যাবৎ বিস্তারিত ও সুশৃঙ্খলভাবে কোন আলোচনা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকাদিতে দুই-একজন ভ্রমণকারীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা আদৌ যথেষ্ট নহে অথচ এখন হইতেই যদি বিশেষ ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও তাহা রক্ষা করার চেষ্টা না হয়, তবে বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে না। এই কার্য কোন এক জনের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। তবে এইটুকুমাত্র ভরসা, যে, বিংশতি বর্ষের অধিক কাল ব্রহ্মদেশে বাস করিয়া যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা দ্বারা কার্য আরম্ভ করিলে আরও অনেকে উৎসাহাঘ্রিত হইয়া কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন।

ব্রহ্মদেশে শিক্ষিত, অ-শিক্ষিত, হিন্দু ও মুসলমান ভেদে বাঙালীগণ যে কতপ্রকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই কৌতূহলোদ্দীপক। উচ্চ স্তরে হাইকোর্টের বিচারপতি হইতে নিম্ন স্তরে সাধারণ নৌকার নাবি, ধোবা, নাপিত প্রভৃতি সকল প্রকার লোকই ব্রহ্মদেশের বাঙালীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চাকুরী, ওকালতী, চিকিৎসা, ঠিকাদারী কাজ, সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রকার কাজই বাঙালীরা যথেষ্ট পরিমাণে করিতেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ সাধারণভাবে বাঙালীরা কি কি কার্য দ্বারা-কিভাবে অর্থোপার্জন করিতেছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

প্রথমে চাকুরীজীবী বাঙালীদের কথাই বলা যাক—কারণ বাঙালীর ঐটিই প্রধান উপজীবিকা। ব্রহ্মদেশবাসী বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে সাড়ে পনের আনাই চাকুরীজীবী। সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীতে একাধিক সহস্র বাঙালী ব্রহ্মদেশের

নানাস্থানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই রেঙ্গুন হইতে অতি দূরবর্তী স্থানে আত্মীয়বন্ধুস্বজনবিহীন অবস্থায় বাস করিতে হয়। এমন অনেক স্থানও আছে যেখানে যাইতে হইলে রেঙ্গুন হইতেও চারি-পাঁচ দিন সময় লাগে। সেই সকল স্থানের অর্ধ-সভ্য অধিবাসীরাই প্রধানতঃ তাঁহাদের প্রতিবেশী। খুব বেশী হইলে তথায় ভারতবর্ষেরই অল্প প্রদেশবাসী দু-একটি লোক হয়ত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বাঙালীর মুখ-দর্শনই অতি দুর্লভ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত ক্রীপূর-পরিবার লইয়াও বাস করেন। এই সকল ক্ষুদ্র পার্শ্বতা অথবা অরণ্যসম্মুলস্থাননিবাসী বঙ্গসন্তানদের বিষয় কয় জন অবগত আছেন? তাঁহাদিগকে যেরূপ স্থানে ও অবস্থায় বাস করিতে হয় তাহা সকলেরই সহানুভূতি উদ্রেক করে। বস্তুতঃ ব্রহ্মদেশের এমন একটিও বিশিষ্ট শহর নাই যেখানে অন্ততঃ এক জন বাঙালীও নাই। সরকারী কার্যে নিযুক্ত বাঙালীদের মধ্যে অনেকে খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইদানীংও রেঙ্গুনে সরকারী দপ্তরখানায় এতাদিক বাঙালী খুব উচ্চপদে নিযুক্ত রহিয়াছেন। গত দুই বৎসরের মধ্যে এইরূপ অনেক বাঙালী বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব যোগ্যতার সহিত কার্য করিয়া রাজসন্মান লাভান্তে অবসংগ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানেও চিকিৎসা-বিভাগে সিভিল-সার্জনের পদে, পূর্ত্ত বিভাগে এন্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের পদে, শিক্ষা-বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ অধ্যাপক-পদে অনেকে যোগ্যতার সহিত কার্য করিতেছেন। তন্মিন্ন অপেক্ষাকৃত নিম্নপদেও বহু বাঙালী ব্রহ্মদেশের নানাস্থানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি খুব বেশী নাই। চাকুরীক্ষেত্রে মুসলমানরা অপেক্ষাকৃত পশ্চাত্তপদ হইলেও অজ্ঞান বিষয়ে, বিশেষতঃ ব্যবসায়শিক্ষাক্ষেত্রে, তাঁহাদের অবস্থা হিন্দুদের অপেক্ষা ভাল। শিক্ষা-বিভাগে পূর্কোক্ত কয়েক জন অধ্যাপক ভিন্ন বহু বাঙালী উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের কার্য করিতেছেন। পূর্ক এইরূপ শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। বর্তমানে নতুন কার্যে বাঙালী নিযুক্ত হওয়া বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়। পুরাতন ষাঁহারার রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও অনেকের ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক নহে। দুইটি উচ্চবিদ্যালয়ে মাত্র দুই জন বাঙালী প্রধান শিক্ষকের পদে

অধিষ্ঠিত আছেন। ব্রহ্মদেশের কোন উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ বাঙালীর পক্ষে একান্তই দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। তৎসঙ্গেও যে দুই জন মাত্র ঐরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন তজ্জগৎ বাঙালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। রেঙ্গুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলিতে পূর্ক অনেক বাঙালী অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের অনেককেই চলিয়া আসিতে হইয়াছে এবং একাধিক ব্যক্তিকে অনায়মরূপে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে। বর্তমানে ষাঁহারার আছেন তাঁহাদের ভবিষ্যৎও যে বিগদশূন্য তাহা জোরের সহিত বলা যায় না।

সকল প্রকার চাকুরীতেই ভারতবাসীদের, বিশেষভাবে বাঙালীর, প্রবেশলাভ দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। রেঙ্গুনে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে পূর্ত্ত ও চিকিৎসা বিভাগে স্থায়ী ভাবে সহজে কোন বাঙালীকে লওয়া হয় না। সাধারণ কের গীর কার্যে ষাঁহারার নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের পুত্রেরা যে ভবিষ্যতে ঐদেশে কোনরূপ কার্যালভ ক্রিতে সমর্থ হইবে তাহা বলা কঠিন। বস্তুতঃ এখন হইতেই ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের সম্মানগণের ভবিষ্যৎ গুরুতর চিন্তার কারণ হইয়া উঠিতেছে।

চাকুরী ভিন্ন অপর এক ক্ষেত্রে বাঙালীরা ব্রহ্মদেশের সর্বত্রই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাহা আইন-ব্যবসায়। ব্রহ্মদেশে প্রায় প্রত্যেক জেলার সদরে অথবা মহকুমায় বাঙালী ব্যবহারজীবী আছেন। রেঙ্গুন শারেই প্রায় এক শত বাঙালী ব্যবহারজীবী রহিয়াছেন। সর্বত্রই ইহার নিম্ন ক্ষমতাবলে এই কার্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। মফস্বলের অধিকাংশ স্থলে বাঙালী ব্যবহার-জীবীরাই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন সরকারী উকীলের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বস্তুতঃ বাঙালী আইনব্যবসায়ীরা ব্রহ্মদেশে সর্বত্র—বিশেষভাবে মফস্বলে—আইন-ব্যবসায়ের একটি উচ্চ মান (standard) স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই বিষয়ে ভারতবর্ষের অজ্ঞান প্রদেশের লোকেরা বাঙালীদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। এই সকল আইনজীবীর অনেকেই প্রথমে ব্রহ্মদেশের

মানা স্থানে অতি সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত বনে ব্রহ্মদেশের বিশেষ বিশেষ আইনবিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং ততোধিক কঠিন ব্রহ্মভাষা শিক্ষা করিয়া ও তৎসংস্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন-ব্যবসায় প্রারম্ভ করেন এবং নিজ নিজ ক্ষমতাবলে অতি উচ্চস্থান অধিকার করেন। অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এই আইনব্যবসায়ী বাঙালীদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

র্তমানে রেজুন হাইকোর্টে এক জন বাঙালী বিচারপতি আছেন। পূর্বে এই আইনব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলে পূর্বোক্ত পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলেই চলিত। কিন্তু র্তমানে বিদেশী—অর্থাৎ ভারতবাসী-ব্যবহারজীবীদের অব্যাহত প্রতিরোধ করিবার জন্য এই নিয়ম করা হইয়াছে, যে, ব্যবসায়-প্রার্থীকে তৎদেশের বাসিন্দারূপে (domiciled) পরিগণিত হইতে হইবে। ইহার জন্য কারণ দর্শাইয়া আবেদন করা আবশ্যক। চিকিৎসা-বিভাগে যে-সকল বাঙালী স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিতেছেন, তাহারা প্রায় সকলেই রেজুনে অবস্থান করেন। মফস্বলে বেশী বাঙালী চিকিৎসক এখনও গমন করেন নাই।

এই সকল ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুরাই অগ্রবর্তী। বাঙালী মুসলমান ব্যবহারজীবী বা চিকিৎসকের সংখ্যা স্খিমেয়। কিন্তু অল্পাংশ সাধারণ ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে মুসলমানরা হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অগ্রবর্তী। রেজুন শহরে স্বর্গীয় শশিভূষণ নিমোগৌ মহাশয়ই একমাত্র প্রতিষ্ঠাপন হিন্দুব্যবসায়ী ছিলেন। ঢাকানিবাসী স্বর্গীয় রমচন্দ্র দত্ত মহাশয় এককালে ঠিকাদারী কাজ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তন্নিম্ন স্বর্গীয় শিবপদ শাস প্রমুখ আরও অনেক বাঙালী হিন্দু ব্রহ্মদেশের মানা স্থানে ঐ শ্রেণীর কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় বাঙালী হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানরাই বেশী অগ্রবর্তী। রাজার কাজ, দস্তারীর কাজ প্রভৃতি মুসলমানদের একচেটিয়া পরিবারগুলি ছাড়াও নানারূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় বহু মুসলমান নিযুক্ত আছেন। ইরাবতী ফ্লোটিল কোম্পানীর মহাজের থালানী প্রায় সকলেই বাংলার মুসলমান। তন্নিম্ন রেজুনে এবং অন্যান্য দু-তিন জায়গায় খের-মাঝির কাজেও চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী জিলাগুলির মুসলমানরাই প্রধানতঃ নিযুক্ত আছেন। কারিগর, মিস্ত্রী প্রভৃতির কাজেও বাঙালী মুসলমানই বেশী। তন্নিম্ন প্রতিবৎসর ধানকাটার সময় বাংলা দেশ হইতে বহু লোক, প্রধানতঃ মুসলমান, ব্রহ্মদেশে যান করিয়া থাকেন। তাহারা বৎসরের মধ্যে কয়েক দশ মাত্র ঐ দেশে অবস্থান করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জনাতে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপ কার্যের জন্য অবশ্য

যাত্রাজ ও উড়িয়া হইতেও অনেক লোক গমন করিয়া থাকেন। পূর্বে দুখ-বিজ্ঞার কাজ প্রধানতঃ বাঙালীদের হাতেই ছিল। এই সকল দুখব্যবসায়ী যে সকলেই জাতিতে গোপ ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু ক্রমে এই ব্যবসায়টি বাঙালীদের হস্ত হইতে হিন্দুস্থানীদের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। তবে এক বিষয়ে বাঙালী হিন্দুরা এখনও ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্বত্রই বিশেষ তৎপরতার সহিত কারবার চালাইতেছেন—তাহা নাগিতের ব্যবসায়। ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্বত্রই যথেষ্টসংখ্যক বাঙালী নাগিত দেখিতে পাওয়া যায়। রেজুন শহরে বাঙালী নাগিতরাই কুলীন। মফস্বলের অনেক স্থলে তাহারা চুল কাটিবার দোকান করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। এই সকল কৌরকার প্রধানতঃ চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলারাই অধিবাসী এবং সকলেই জাতিতে পরামানিক নহে।

মফস্বলের অনেক স্থলে নিম্নশ্রেণীর বাঙালীরা—হিন্দু ও মুসলমান—কৃষিকার্য করিয়া বিশেষ সচ্ছলতার সহিত বসবাস করিতেছেন। ইহারা একরূপ ব্রহ্মদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের মধ্যেও হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী। হিন্দু কৃষিজীবীরা সাধারণতঃ নিম্নরক্ষের ইরাবতী নদীর ব-দীপে কয়েকটি জেলাতেই বাস করে। মুসলমানেরা বহুদূরবর্তী পার্শ্বতঃ স্থানেও বসতি স্থাপন করিয়াছে। এই সকল কৃষক প্রধানতঃ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, জিপুরা এবং ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী। মুসলমানদিগের অনেকেরই ব্রহ্মদেশীয়া নারীর সহিত বিবাহ হইয়াছে।

গত ১৯৩১ বৃষ্টাব্দের লোকগণনা অনুসারে ব্রহ্মদেশে ৩৭৮,০০০ জন বাঙালী ছিল। এই লোক-গণনা ব্যাপারে একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বাঙালী ভিন্ন চট্টগ্রামবাসী (Chittagonians) বলিয়া একটি ভিন্ন শ্রেণীর বরাবরই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। উপরে যে সংখ্যা দেওয়া হইল তাহা বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা। কিন্তু ঐ লোক-গণনার বিভিন্ন স্থানে হিসাবে বাঙালী ও চট্টগ্রামবাসী বলিয়া দুইটি পৃথক শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ অসুসন্ধান করা আবশ্যক এবং ভবিষ্যতে বাহাতে আর এইরূপ অদ্ভুত শ্রেণী-বিভাগ না হয় তাহার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক। এই বিষয়ে চট্টগ্রামবাসীদিগেরই প্রধান ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। তবে এই সংশ্লেষে একটি কথা বলা আবশ্যক হইবে না। ব্রহ্মদেশের সর্বত্রই বাঙালী ভিন্ন অল্প সম্প্রদায়ের লোকেরা চট্টগ্রামী বলিয়া একটি বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। চট্টগ্রামীরা যে অন্য বাঙালী হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে পারে না, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও সাক্ষ্যলাভে সমর্থ হই নাই।

প্রাচীন ভারতে বাসগৃহের দিও নির্বাচন ও সংস্থাপন ব্যবস্থা

অধ্যাপক শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য, এম্-এ, পিএইচ-ডি (লাইডেন), ডি-লিট (লন্ডন), আই-ই-এস

কৌটলীয় অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থকর্তা চাণক্যের নামে বাসগৃহের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সহজে একটি প্রয়োজনীয় কথা প্রচলিত আছে। ধনী, শ্রোত্রিয়, রাজা, নদী ও বৈদ্য যে-স্থানে দুলভ সে-স্থানে বাসগৃহ নির্মাণ করা অস্বাভাবিক। সেরূপ স্থান যে লোকবসতির অল্পপুষ্ট তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ গ্রাম বা নগর এরূপ স্থানেই প্রায় সর্বত্র ও সর্বকালে নির্মিত হইয়াছে যেখানে এই পঞ্চবিধ স্থিতি নানাদিক পরিমাণে বর্তমান ছিল। ধনী লোকের অভাবে গ্রাম বা নগর সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে না। ধর্ম্মযাজক না থাকিলে লোকের ধর্ম্মাচরণ অসম্ভব হয়। রাজা বা রাজপ্রতিনিধি না থাকিলে লোকের শান্তিরক্ষাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। নদীর দ্বারা পানীয় জলের ব্যবস্থা, ভূমির উর্বরতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতের স্থিতি বৃদ্ধিতে হইবে। নদীমাতৃক দেশ বা স্থান এই সকল কারণেই সভ্য লোক মাত্রেই অতীর্ণিত। বৈদ্য বা চিকিৎসকের বর্তমানে ঔষধপথ্যাদি দ্বারা রোগাদির উপশম ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা বৃদ্ধিতে হইবে।

মৌর্য্য-বংশের সংস্থাপক মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী ও দক্ষিণ-হস্ত রূপে চাণক্য পণ্ডিত পরিচিত। মৌর্য্য-সাম্রাজ্য ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা বাহা মহাবীর আলেকজান্ডার ও সেলেউকাস নিকটোরে প্রভৃতির বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু চাণক্য পণ্ডিতই যে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে গ্রাম নগর সংস্থাপন-করিয়াছিলেন তাহা নহে। বৈদিক যুগেও সমৃদ্ধ গ্রাম নগর ছিল তাহারও বিবাসযোগ্য প্রমাণ আছে। তাহারও সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদাড়োতে এবং পঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে প্রসিদ্ধ গ্রাম নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্ততরাং এই বিষয়ে বৌদ্ধ যুগ বা রামায়ণ মহাভারতের কাল বা পৌরাণিক কালের উল্লেখ করা নিশ্চয়োজন।

বাসস্থান-বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের ব্যবস্থা হইতেও বিশদ ও বিস্তারিত বিবরণ মানসারাদি শিল্পশাস্ত্রের মূলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এস্থলে আলোচ্য বিষয় নহে। এই পঞ্চবিধ স্থিতি লোকবসতির পক্ষে অপরিহার্য্য। বিশেষ প্রয়োজন বস্তুতঃ অল্প পারিপার্শ্বিক অবস্থারও বিবেচনা করা হইত। বৌদ্ধগ্রন্থ চূহবঙ্গের (৬, ৪, ৮) ব্যবস্থা অনুসারে আগ্রহ বা বিশ্রামাগার এমন স্থানে নির্মিত হইত বাহা কোলাহলপূর্ণ নগর হইতে বেশী দূরেও নহে, বেশী নিকটেও নহে। তাহা নগর নগরীর এরূপ উপকণ্ঠে হওয়া চাই যেখানে

সহজে যাতায়াতের স্থিতি আছে অথচ দিনের বেলায় জন-সমূহপূর্ণ নহে এবং রাজ্যে লোকের কোলাহলে শান্তি ও বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় না, অথবা নির্জনতাহেতু কোন ভয়ের কারণ থাকে না।

চূহবঙ্গ (৬, ৪, ১০) ও মহাবঙ্গের (৩, ৫, ২) বর্ণনা অনুসারে সাধারণ বাসগৃহে এবং উপাসকের আশ্রমাগারে নানা প্রকারের প্রকোষ্ঠ থাকিত। সাধারণ বাসগৃহে প্রয়োজনানুসারে শয়নাগার, বিশ্রামাগার, ভোজনাগার, অগ্নিস্থানযুক্ত আশ্রমাগার, দ্রব্যসংস্থাপনাগার, স্নানাগার, বস্ত্রপরিবর্তনগৃহ, পুরীষগৃহ, কুপগৃহ, পুষ্করিণী ও খোলা মণ্ডপ থাকা প্রয়োজন। তথাকথিত আশ্রমাগারেও যথাযথ শয়ন-কক্ষ, অশ্বশালা, শিখরযুক্ত গৃহ, ভূগর্ভস্থ গৃহ, উপাসনা-মন্দির, দ্রব্যাগার, ভোজনাগার, বিপনি, উচ্চকক্ষ, পাকগৃহ, উত্তাপ প্রাপ্তির জন্য অগ্নিগৃহ, পুরীষগৃহ, ভ্রমণাগার, কুপগৃহ, স্নাতোক্ষ স্নানের জন্য যজ্ঞগৃহ, পদ্মযুক্ত পুষ্করিণী ও মণ্ডপাদি থাকিত।

শিল্পশাস্ত্র, পৌরাণ এবং আগমাদি শাস্ত্র হইতে কোন প্রয়োজনের কোন কোন গৃহ বাস্তবিকভাবে কোন কোন স্থানে থাকা প্রয়োজন তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থপরিবারের জন্য চতুঃসাল ঘোড়শকক্ষযুক্ত গৃহ অর্বাচীন কালের বাস্তবিকভাবে যুগে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাস্তবতঃ (পৃ. ১) নামক এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এই ঘোড়শ কক্ষের সংস্থাপন বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে ভৈশা বা উত্তর-পূর্বে কোণে (১) দেবগৃহ; পূর্বে (২) সর্ববস্ত্র গৃহ, (৩) স্নানগৃহ (৪) দধিমহন গৃহ; অগ্নি বা দক্ষিণ-পূর্বে কোণে (৫) রন্ধনগৃহ; দক্ষিণে (৬) বৃত্তগৃহ, (৭) শৈলগৃহ ও (৮) পুরীষগৃহ; নৈঋত বা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে (৯) শাস্ত্রগৃহ; পশ্চিমে (১০) বিদ্যাভ্যাস-গৃহ, (১১) ভোজনগৃহ ও (১২) রোদনগৃহ; বায়ু বা পশ্চিম-উত্তর কোণে (১৩) ধাতুগৃহ; উত্তরে (১৪) সংভোগ-গৃহ, (১৫) দ্রব্যগৃহ ও (১৬) ঔষধগৃহ থাকিবে। গৃহবাস্তবিকপ্রদীপ নামক অপর পুস্তিকাও সংক্ষেপে এই ঘোড়শকক্ষযুক্ত বাস্তবিকগৃহের বর্ণনা করিয়াছে। *

এই বিবরণ হইতে ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, এই প্রণালীর গৃহ উত্তরমুখী, কেননা পূর্ব-দক্ষিণ ও পূর্বে যে-

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকের 'শিল্পশাস্ত্রীয় অভিধান' পৃ. ৬১২-৬১৪ এবং মানসার শিল্পশাস্ত্রের মূল পৃ. ৩২-৪৬, ২৭৪-২৭৬ এবং ইয়েরী অনুবাদ পৃ. ৬০-৬৮, ৪২৩-৪৩১ উল্লেখ্য।

সকল কক্ষ অবস্থিত তাহারা সাধারণ বাসগৃহ নহে। উত্তরমুখী গৃহ উত্তর-ভারতের পক্ষে উপযোগী যেখানে উত্তরস্থ হিমালয় পর্বত হইতে স্বাস্থ্যকর বায়ু প্রবাহিত হয়।

বাস্তব্রবন্ধ (২, ২৫, ২৬) নামক অল্প এক পুস্তিকার ব্যবস্থা অম্বুসারে পূর্বে (১) স্নানগৃহ; অগ্নিকোণে (২) পচনালয়; দক্ষিণে (৩) শয়নাগার; নৈঋতে (৪) শাস্ত্র-মন্দির; পশ্চিমে (৫) ভোজনাগার; বায়ুকোণে (৬) পুস্ত্র-মন্দির; উত্তরে (৭) ভাণ্ডকোষ; এবং ঈশানকোণে (৮) দেবমন্দির থাকা উচিত।

এই রীতির গৃহ ক্ষুদ্র পরিবারের উপযোগী, সম্ভবতঃ দক্ষিণমুখী এবং দক্ষিণ বা পূর্ব ভারতের যে যে স্থলে দক্ষিণ হইতে মলয়মুক্ত বা সমুদ্রের হাওয়া প্রবাহিত হয় সে-সকল স্থলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

শিল্পশাস্ত্র-সারসংগ্রহ (২, ২৪-২৮) নামক অপর এক সংগ্রাহকের নামহীন ক্ষুদ্র পুস্তিকার নির্দেশ অম্বুসারে ঈশান কোণে (১) দেবতাগৃহ; পূর্বে (২) স্নানমন্দির; অগ্নিকোণে (৩) পাকসদন; উত্তরে (৪) ভ্রম্যাগার; অগ্নিকোণ ও পূর্বদিকের মধ্যে (৫) দধিমহন-মন্দির; অগ্নিকোণ ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে (৬) আভ্যাগৃহ; দক্ষিণ ও নৈঋত কোণের মধ্যে (৭) পুরীষতাগ-মন্দির; নৈঋত কোণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যে (৮) বিদ্যাভাস-মন্দির; পশ্চিম ও বায়ুকোণের মধ্যে (৯) রোদনগৃহ; বায়ুকোণ ও উত্তর দিকের মধ্যে (১০) রতি (শয়ন) গৃহ; উত্তর ও ঈশান কোণের মধ্যে (১১) ঔষধার্থ-গৃহ; এবং নুপতির জন্য বিশেষভাবে নৈঋত কোণে (১২) স্তৃতিকাগৃহ নির্মাণ করা উচিত।

এই সংগ্রহ-পুস্তকের নিয়মাম্বুসারে বাসগৃহের কক্ষ-সংখ্যা, এমন কি নুপতির পক্ষেও, দ্বাদশমাত্র হইলেই চলিতে পারে। মূলগ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ নাই বলিয়া এই সংগ্রহ-পুস্তিকার প্রামাণ্যের অভাব। ইহারও ব্যবস্থা উত্তরমুখী বাসগৃহের এবং সম্ভবতঃ উত্তর-ভারতবর্ষের স্থানবিশেষের উপযোগী।

মন্ত্রপুত্রাণের (অধ্যায় ২৫৬, শ্লোক ৩৩-৩৬) ব্যবস্থা অম্বুসারেও ঈশান কোণে (১) দেবতাগার; ও (২) শাস্ত্রগৃহ; অগ্নিকোণে (৩) মহানস এবং তাহার উত্তরপার্শ্বে (৪) জলস্থান; নৈঋত কোণে (৫) গৃহোপস্করণ স্থাপনের কক্ষ; গৃহগভীর বাহিরে (৬) বন্ধ (ব বধ) কক্ষ ও (৭) স্নানমণ্ডপ; বায়ুকোণে (৮) ধনভান্ডগৃহ; এবং তাহারই বহির্দেশে (৯) কর্মশালা হওয়া উচিত। এই পুত্রাণের ব্যবস্থা অম্বুসারে এক্ষণ বাস্তবিশেষ গৃহভর্তার শুভাবহন করে।

এই ক্ষুদ্র বাসগৃহের 'শাস্ত্রগৃহ' সম্ভবতঃ 'শয়নাগার' অর্থে বুঝিতে হইবে, যেহেতু তাদৃশ অপরিসীম কক্ষের উল্লেখ অত্র নাই। সম্ভবতঃ পাঠের ত্রুটিবশতঃ শয়নাগার উত্তর দিকে স্থাপিত এই কথার স্মৃতি উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ প্রধান চতুর্দিকস্থ কক্ষগুলি এই তালিকায় বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

এই অসম্পূর্ণ তালিকা হইতেও বাস্তবগৃহ উত্তরমুখী বলিয়াই মনে হয়।

অগ্নিপুত্রাণ (অধ্যায় ১০৬, শ্লোক ১-১২, ১৮-২০) বিশেষভাবে নগরস্থ বাসগৃহ এবং চতুঃসাল, দ্বিসাল, ত্রিসাল ও একসাল গৃহের উল্লেখ করিয়াছে। নগরে স্থানসঙ্কোচবশতঃ সর্বত্র মধ্যে প্রাঙ্গণযুক্ত চতুর্দিক আবৃত কক্ষসমূহের ব্যবস্থা অসম্ভব বা অনভীপ্সিত বলিয়া আলোক ও বায়ুপ্রবাহের সুবিধার জন্য এক দিক, দুই দিক, এমন কি চারি দিক খোলা বাসগৃহেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পুত্রাণের নির্দেশ অম্বুসারে পূর্বে (১) ত্রীগৃহ, অগ্নিকোণে (২) মহানস, দক্ষিণে (৩) শয়নাগার, নৈঋতকোণে (৪) আয়ু-আশ্রয়, পশ্চিমে (৫) ভোজনাগার, বায়ুকোণে (৬) ধাতাগার, উত্তরে (৭) ভ্রম্যসংস্থানকক্ষ, এবং ঈশানকোণে (৮) দেবতাগৃহ নির্মাণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থাও ক্ষুদ্র পরিবারেরই উপযোগী। এই পুত্রাণও দক্ষিণ বা পূর্ব ভারতের কোন স্থান লক্ষ্য করিয়া এক্ষণ ব্যবস্থা দিয়াছে যে, স্থলবিশেষে দক্ষিণের বায়ু দক্ষিণমুখী গৃহের দক্ষিণ দিকস্থ শয়নাগার প্রভৃতির পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক।

কামিকাগমের (অধ্যায় ৩৫, শ্লোক ১৭৭-১৯১) নির্দেশ অম্বুসারে পূর্বে (১) ভোজনস্থান, অগ্নিকোণে (২) মহানস, দক্ষিণে (৩) শয়নস্থান, নৈঋত কোণে (৪) আয়ুধালয়, তাহারই নিকটে (৫) মৈত্রস্থান, পশ্চিমে (৬) উদকালয়, বায়ুকোণে (৭) গোষ্ঠাগার, উত্তরে (৮) ধনালয়, ঈশান কোণে (৯) নিতানৈমিত্তিক পূজার জন্য যোগমণ্ডপ, প্রাণ-উদক দিকে (১০) কাজি ও লবণের স্থান, অন্তরীক ও সবিত কোষ্ঠে† যথাক্রমে (১১) চুল্লী ও (১২) উলুগলী স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অগ্রপ্রাশন বা ভোজনাগার আধা, ইন্দ্র, অগ্নি বা সবিত কোষ্ঠেও হইতে পারে। বিবস্ত্র কোষ্ঠে (১৩) শ্রবণাগার; মৈত্রকোষ্ঠে (১৪) বিবাদকক্ষ; ইন্দ্রজয়, বায়ু কিংবা সোমকোষ্ঠে (১৫) ক্ষৌত্রের আগার; বিতথ, উপালয়, পিতৃ, দৌবারিক, স্ত্রীবা বা পুণ্ডপদন্ত কোষ্ঠে (১৬) প্রোহতিগৃহ; অপবৎসকোষ্ঠ (১৭) কোষাগার; আপকক্ষে (১৮) কুণ্ড; মহেন্দ্রকোষ্ঠে (১৯) অক্কেল; মহদীর কোষ্ঠে (২০) পেঘণী; সেই সেই স্থানে (২১) অবিষ্টাগার এবং (২২) উপস্বরভূমিও হইতে পারে; দ্বারের দক্ষিণে (২৩) বাহনাগার; বক্রকক্ষে (২৪) স্নানশালা, অক্ষকক্ষে (২৫) ধাত্যবাস; ইন্দ্ররাজকোষ্ঠে (২৬) ঔষধালয়।

† সাধারণতঃ অষ্ট দিক সুপরিচিত হইলেও গ্রাম নগরে গৃহনির্মাণের এবং বাসগৃহের কক্ষবিশেষের যথার্থ স্থানে সংস্থাপনার জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যতিরিক্ত নকসার এবং নকসার মধ্যস্থ জমি ১০২৪ পদ বা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হইত যাহা ইন্দ্র সবিত্ প্রভৃতি দিকপাল বা দেবতাবিশেষের নামে প্রাচলিত। বিস্তারিত বিষয়ের জন্য লেখকের সম্পাদিত ও ইংরেজীতে অনূদিত মানসার শিল্পশাস্ত্রের পঞ্চবিভাগ নামক সপ্তম অধ্যায় এবং তত্তৎ চিত্রসমূহ মানসার শিল্পশাস্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে উল্লিখ্য।

পক্ষান্তরে মিত্রাবাস মিত্রকোষ্ঠে, এবং উলুখলস্থান রোগকোষ্ঠে, কোশগেহ ভূধরকোষ্ঠে, যুত (দধিমহন) ও ঐশ্বালায় নাগকোষ্ঠে হইতে পারে।

ক্রমাক্রমে জয়ন্ত, অপবৎস, পর্জন্ত বা শিবকোষ্ঠে (২৭) বিহের প্রভৌবদিস্থান, (২৮) কুপ ও (২৯) দেবগৃহ, এবং স্বক্ষ, ডল্লট, বা সোমকক্ষে (৩০) আস্থানমণ্ডপ হওয়া উচিত।

উত্তর-ভারতের পুরাণসমূহের অত্মকরণে রচিত দক্ষিণ-ভারতের আগমসমূহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংগ্রহ-পুস্তক। পুরাণের ন্যায় আগমেও তাত্‌কালীন লোকের জ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রায় সকল বিষয়ের অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে। বস্তুতঃ এই কামিকাগমের ৭৫ অধ্যায়ের মধ্যে ৬০ অধ্যায়ই বাস্তববিবরণ ও মৃত্তিনির্মাণ-ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। স্থানান্তরে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পৌরাণিক, আগমিক ও কুহ কুহ্ম দ্বিত্রিশত সংখ্যক বাস্তববিষয়ক গ্রন্থ শিল্পশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ মানসার-মূলক।* এই সকল সংগ্রহ-গ্রন্থের বিবরণের অল্পবিস্তর বিভিন্নতা স্থানীয় প্রয়োজনজনিত। মূলগ্রন্থ মানসার শিল্প-শাস্ত্রে সর্ব প্রদেশ ও স্থানের উপযোগী হয় এরূপ সমালোচনা ও নির্দেশ প্রায় সকল প্রান্তত বিষয়েরই করা হইয়াছে। সকল বিষয়ের উল্লেখ এখানে অসম্ভব ও নিম্নপ্রয়োজন। কামিকাগম চতুর্দিক ও চতুর্কোণের অন্তরিক্ত যে সকল দিকপালের কোষ্ঠের ঘটনাক্রমে এখানে উল্লেখ করিয়াছে তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ 'পদবিজ্ঞান' নামক মানসার শিল্প-শাস্ত্রের এক সুবহুৎ অধ্যায় দেওয়া হইয়াছে।† তাহা এই কুহ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে নগর, গ্রাম ও গৃহাদির জন্ত নানা পরীক্ষার দ্বারা কোন স্থান মনোনীত হইলে তাহা প্রয়োজন অত্মসারে একপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০২৪ পদ বা প্রকোষ্ঠে বিভাগ করা যাইতে পারে। এই প্রকোষ্ঠসমূহ দিকপাল-সংজ্ঞক দেবতার নামে পরিচিত। মনোনীত স্থানের বিশেষ কোন স্থান যেখানে বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নির্দিষ্ট হইতে পারে তাহা দিকপালের প্রকোষ্ঠের উল্লেখ করিয়া সঠিকভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে।

কামিকাগমের নির্দেশ অত্মসারে একাধিক প্রকোষ্ঠেও বিশেষ কোন কক্ষ স্থাপিত হইতে পারে। বস্তুতঃ মূলগ্রন্থ মানসার শিল্পশাস্ত্রে হইতেই সাক্ষাৎভাবে অত্মকরণ করিবার ফলে কামিকাগম ও উপরিউক্ত বাস্তবশাস্ত্রের পুস্তিকা-সমূহের মধ্যে এই প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে। এই সকল কুহ পুস্তিকা বিশেষ কোন স্থানের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্ত রচিত হইয়াছিল। সেজন্ত এ-সকল পুস্তকে একাধিক স্থানে বিশেষ কোন

কক্ষ নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা প্রদান করা হয় নাই। আগম নামক গ্রন্থসমূহ পুরাণের দ্বারা অধিকতর প্রামাণিক হওয়ার অভিপ্রায়ে মানসার শিল্পশাস্ত্রের অত্মকরণে একাধিক স্থানে একই কক্ষ নির্দেশ করিয়াছে। কিন্তু মানসার শিল্পশাস্ত্রে উপাহরণস্বরূপ বাহা বাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহারই আংশিক বিবরণ কামিকাদি আগম প্রয়োজন অত্মসারে পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ রাজহর্ম্যের যে সাধারণ বিবরণ মানসার শিল্পশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ আগম পুরাণ বা কুহতর বাস্তবগ্রন্থসমূহে নাই।

রাজহর্ম্য নয় শ্রেণীর রাজ্যার উপযোগী। এই নববিধ রাজহর্ম্য সংস্থাপনে পরম্পরের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। সম্রাটাদির অভিক্রি, অবস্থা ও প্রয়োজন অত্মসারে নিম্নে উক্ত রাজহর্ম্যের সাধারণ সংস্থাপন পরিবর্তন করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহা মানসার শিল্পশাস্ত্রে (অধ্যায় ৪০, শ্লোক ১৫৫) বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যার বলা হইয়াছে।

সার্কভৌম বা চক্রবর্তী, মহারাজ, নরেন্দ্র, পাঞ্চিক, পট্টধর, মণ্ডলেশ, পট্টভাজ, গ্রাহারক ও অন্তর্গাহ এই নয় শ্রেণীর রাজহর্ম্যবর্গের বাসোপযোগী নববিধ রাজহর্ম্য এক হইতে সপ্ত প্রকার বা পরিবেষ্টনীতে বিভক্ত। এই প্রত্যেক গণ্ডী প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অন্তর্মণ্ডল, অন্তর্নিহার, মধ্যমহার, প্রাকার ও মহামধ্যাদি নামে পরিচিত। এই সকল মণ্ডলের সিংহদ্বার বা গোপুর মধ্যাক্রমে দ্বারশোভা, দ্বারশালা, দ্বারপ্রাসাদ, দ্বারহর্ম্য, ও মহাগোপুর নামে বর্ণিত এবং এক হইতে সপ্তদশতলযুক্ত।* এই মণ্ডলের প্রত্যেকটিতে এক হইতে দ্বাদশতলযুক্ত গৃহ সাধারণতঃ মধ্যে চতুর্দশাল প্রণালীতে সংস্থাপিত হইলে এক হইতে দশশালা নামক শ্রেণীতে বিভিন্ন আকারে সুসজ্জিত হইতে পারে।† রাজহর্ম্যের মণ্ডল, শালা ও তলসংখ্যা রাজহর্ম্যবর্গের শ্রেণী অত্মসারে। সাধারণতঃ মধ্যভাগে ত্রুক্ষীণে রাজমন্দির-নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। প্রধান রাজহর্ম্য ইন্দ্র, বরুণ, যম বা পুষ্পমন্দির প্রকোষ্ঠে নির্মাণ করা উচিত। এই প্রধান হর্ম্যের চতুর্দশার্ধে রাজমহিষী, রাজকুমারী, প্রভৃতির জন্ত গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা আছে। স্নানাগার, বস্ত্রপরিবর্তন-গৃহ, শয়নকক্ষ, আস্থানমণ্ডপ, ভোজনগৃহ, রন্ধনশালা প্রভৃতি এবং পরিচারক, পরিচারিকাদির বাসস্থান ও পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি সুবিধামত সংস্থাপন করিতে হয়। অন্তঃপুরের পরম মণ্ডলীতে রাজকুমার, রাজপুত্রোহিত, রাজমহী প্রভৃতির জন্ত মধ্যোপযুক্ত প্রাসাদ

* বিস্তারিত বিবরণের জন্ত পূর্বোক্ত 'ভারতীয় বাস্তবশাস্ত্রের পৃ. ৫১-৫০ এক দিকপাল শিল্পশাস্ত্রের মূল ও ইংরেজী অনুবাদের অধ্যায় ৩১, ৩২, এবং পঞ্চম খণ্ডে চিত্রাবলী দ্রষ্টব্য।

† বিস্তারিত বিবরণের জন্ত মানসার শিল্পশাস্ত্রের অধ্যায় ৩৫ এক চিত্রাবলী (পঞ্চম খণ্ডে) দ্রষ্টব্য।

* লেখকের 'ভারতীয় বাস্তবশাস্ত্র' নামক গ্রন্থের পৃ. ৪২-১০২, ১১০-১০৩, ১০১-১০৪ দ্রষ্টব্য।

† সিকা ২ দ্রষ্টব্য।

নির্দিষ্ট করা উচিত। তৎপরস্থ মণ্ডলীতে রাজপরিষৎ, পরিষদের সভা ও কক্ষচারীসমূহের গৃহনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। চতুর্থ মণ্ডলীতে বৃদ্ধবিশ্রামাদি কার্যনির্বাহের জন্য যথোপযুক্ত প্রাসাদাদি সংস্থাপিত হওয়া উচিত। প্রমোদোদ্যান, পুষ্পোদ্যান, হ্রদ ও দীর্ঘিকাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ মানসার শিল্পশাস্ত্র (অধ্যায় ৪০, পৃ ১১৭-২২১) হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যে, আস্থানমণ্ডপ, রাজদর্শনপ্রাসাদ যম, সোম, বায়ু বা নৈঋত প্রকোষ্ঠে নির্মাণ করা উচিত। বায়ুকোণে পুষ্করিণী, নাগপ্রকোষ্ঠের বামভাগের দক্ষিণে আরামদেহ বা বিশ্রামাগার নির্মাণ করা উচিত। সেই আরামদেহ হইতেই আরম্ভ করিয়া মৃগা ও ভল্লট প্রকোষ্ঠে পুষ্পোদ্যান স্থাপন করা হয়। তৎসংলগ্ন প্রদেশ হইতেই নৃত্যাগার ও নৃত্যালয় বাসস্থান নির্মাণ করা হয়। তৃতীয় মণ্ডলের বীথির অংশবিশেষে রহস্যবাসমণ্ডপ করিতে হয় এবং ঈশ বা বিতথ প্রকোষ্ঠে রজমণ্ডপের স্থান হওয়া উচিত (পৃ ১৪৭, ১৫২)। বহিমণ্ডলের সিংহদ্বার পার্শ্বের দক্ষিণ দিকে ব্যাঘ্রাদি জন্তুর আলয় এবং দৌবারিক পদে ময়ূরালয় করিতে হয় (পৃ ১৪৪-১৪৫)। তৎপার্শ্বে মেঘশালা, এবং সত্যক-প্রকোষ্ঠে বানরালয়, সোম-প্রকোষ্ঠে (উত্তর) হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশান কোণ পর্যন্ত প্রদেশে বাজিশালা, যম (দক্ষিণ) হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত প্রদেশে গজশালা, তথা হইতে নৈঋতান্ত প্রদেশে কুকুটালয় এবং বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃগা প্রকোষ্ঠান্ত প্রদেশে হরিণ ও মৃগ বা অস্ত্র পশুর জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা যাইতে পারে (পৃ ১২৮-১৩২)। কৃত্রিম বৃক্ষ পরিদর্শন করিবার জন্য বারপার্শ্বে উচ্চ মঞ্চ নির্মাণ করা উচিত (পৃ ১৪৮-১৫০)। বারসম্মিকটস্থ কোন সর্জনদর্শনযোগ্য স্থানে প্রাণদণ্ডের জন্য গুলকম্প স্থান নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রাচীরের দূরদেশে ভূশ বা অন্তরীক প্রকোষ্ঠে কারাগার স্থান। বহিমণ্ডলের দূরদেশে অশ্বশান ও সমাধি প্রভৃতির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। তৎসংলগ্ন প্রদেশে দেবতা-বিশেষের মন্দিরও স্থাপন করা উচিত।

নানাবিধ রাজপ্রাসাদের সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও

সংস্থাপন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রভৃতির যথাযথ ব্যাখ্যা বিশদভাবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমালোচিত হইবার স্থান ও অবসর নাই। ক্ষুদ্র পরিবারাগার, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আবাস এবং ধনশালী ব্যক্তি ও রাজকুলবর্গের প্রাসাদ-নির্মাণে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রকার আলোক, বায়ুসঞ্চালন ও অপর স্বাস্থ্যরক্ষা উপযোগী বিষয়সমূহ সমভাবেই রক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছেন। বর্তমান নগর, নগরী, পুর, বন্দর ও পত্তনাদি, এমন কি গ্রামস্থ গৃহাদির সংস্থাপন দেখিয়া কাহারও পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বের সময় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাসগৃহ-সংস্থাপনের ব্যবস্থা ছিল বাহার ফলে লোকের স্বথ সুবিধা ও স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারিত। হিন্দুরাজত্বের নাশ ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে হিন্দু শাস্ত্রাদির নির্দেশ গ্রীসীয়, শকীয় ও তুগাদির আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠান, মোগল ও বর্তমান ইউরোপীয়, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজদিগর ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপনের ফলে বিজিত হিন্দু একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দেশীয় বিজেতার স্থানীয় রীতিনীতি ও শাস্ত্রাদির নির্দেশ ভারতবর্ষে গৃহাদি নির্মাণ বিষয়ে সংমিশ্রিত হওয়ার ফলে আমাদের বর্তমান বাসগৃহ কোন দেশ বা আবহাওয়ারই উপযোগী নহে। গ্রীষ্মপ্রধান মিশর বা গ্রীষ্মদেশীয় গৃহ-প্রণালীর উপর শীতপ্রধান মধ্য-এশিয়ার শকীয়াদি রীতি ভারতের নগর ও গ্রামস্থ গৃহ নির্মাণে প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাহারই উপর পাঠান ও মোগলদিগের স্ব-স্ব দেশীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। পিণ্ডের উপরে বিস্ফোটকের মত পাঠান ও মোগলের ঈদৃশ পরিবর্তিত ভারতীয় নগর, গ্রাম ও গৃহাদিতে পূর্ব, দক্ষিণ, মধ্য, উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের বিজেতাদিগের স্থানীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণবশতঃ কোন দেশেরই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বম্বে, লঙ্কো, কান্ধী, কলিকাতা, কটক, পুরী ও মাদ্রাজ প্রভৃতি নগরের গৃহাদির সংস্থাপন-ব্যবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বোম্বাইয়ের স্থলবিশেষের গৃহ সম্পূর্ণ ইউরোপীয় সমুদ্রতীরস্থ গৃহের পদ্ধতি ধারণ করে, যদিও আবহাওয়া শীতগ্রীষ্মাদিভেদে বোম্বাই ও ইউরোপীয় নগরের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। দিল্লী, মিরাত, আগ্রা, লঙ্কো, এমন কি কান্ধী ও কলিকাতারই স্থানবিশেষ, যে কেবলই ‘মোগলপুরা’ বা ‘পাঠান-

পল্লী' নামে পরিচিত তাহা নহে। সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশ ও অবস্থা সত্ত্বেও সে-সে স্থানে আজ পর্যন্ত পাঠান ও মোগল দেশ ও সভ্যতারই উপযোগী গৃহাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্নদেশীয় পদ্ধতির দ্বারা ভারতবর্ষে নির্মিত গৃহাদি আমাদের পক্ষে নানা বিষয়ে অনিষ্টকর। তাহার সম্যক সমালোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। একটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা হইবে। দিও নির্ণয় বা বাসগৃহের সম্মুখ ভাগের যথোপযুক্ত দিক-নিরীক্ষণ বাসগৃহের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য। রোমক শিল্পী বিটুভিয়াস খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ইতালীয় নগরাদির দিও নির্ণয়-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে প্রথমতঃ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কেন না, পাশ্চাত্য প্রমাণ না পাইলে আমরা আমাদের শাস্ত্রাদির ব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

'সমুদ্রতীরস্থ নগর ও গ্রামাদি দক্ষিণমুখী বা পশ্চিমমুখী হইলে লোকের স্বাস্থ্যের হানি হইবে, কেননা এরূপ স্থান গ্রীষ্মকালের গ্রীষ্মকালেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং মধ্যাহ্নকাল এরূপ উত্তপ্ত হইবে যে, লোকের দেহ দগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। পশ্চিমমুখী নগরী যুগোনিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে, মধ্যাহ্নে তীব্র উষ্ণ হইবে এবং অপরাহ্নে উত্তাপাধিক্যে দগ্ধ হইয়া যাইবে। সেজন্য এরূপ ক্রমবদ্ধিত ও অত্যধিক উষ্ণ বায়ু পরিবর্তন বশতঃ যে-সকল স্থানের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানি হইবে।'

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের নগর উপকণ্ঠে অবস্থিত দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী বাংলা নামক গৃহবাসীদের চরিত্রা স্বরণ করিয়াই যেন বিটুভিয়াস এরূপ নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

বিটুভিয়াস নগর ও গৃহাদির দিও নির্ণয়-বিষয়ে চিকিৎসক প্রভৃতির মতও উদ্ধৃত করিয়াছেন। উত্তরমুখী, ঈশানকোণ-মুখী ও পূর্বমুখী গ্রাম, নগর ও গৃহাদি স্থলবিশেষে স্যাং-স্যাংত স্থানেও নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা তিনি দিয়াছেন। কেননা জলনিষ্কাশ প্রভৃতি উপায়ে এরূপ স্থলস্থ গ্রাম-নগরাদির স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব, কিন্তু দিও নিরীক্ষণের ক্ষতি কোন প্রকারেরই প্রতিকারসাপেক্ষ নহে। গৃহাদির সংস্থাপন বিষয়েও বিটুভিয়াস ব্যবস্থা দিয়াছেন।

'সমুদ্রতীরস্থ গ্রাম নগরাদির বিপণিস্থান কক্ষসমূহ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যে-সকল গ্রাম নগর ভূমধ্যস্থ তাহাদের বিপণিস্থান কেন্দ্রস্থানেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। নগরের অধিকাংশ দেবতা জুপিটার, জুনো ও মিনার্তা প্রভৃতির মন্দির নগরাদির সর্বস্থান হইতে দূর হইতে পারে এরূপ আদিষ্ট উক্তহানে করিতে হয়। মার্করার মন্দির বিপণি-

স্থানস্থ। ইসিস ও সেরাপিস মন্দির সর্বসাধারণের সম্মেলনোপযোগী উদ্যানাদিতে, এবং আপলো, ও বেকাসের মন্দির রক্তমন্দির সন্নিকটে হওয়া উচিত। মন্দির বা ত্রীড়ারান যে-সকল গ্রাম নগরে নাই সেই সেই স্থানে হারকিউলিসের মন্দির মার্কাস বা মণ্ডলীর নিকটে করিতে হয়। জিনাসের মন্দির সিংহদ্বার নিকটে এবং মার্সের মন্দির নগরাদির বহির্ভাগের উপকণ্ঠে প্রদেশে করিতে হয়। নিরিসের মন্দির নগরের বহির্ভাগস্থ এরূপ নির্জন স্থানে হওয়া আবশ্যক যেখানে লোক সাধারণতঃ পূজা বাতীত অল্প কারণে গমনাগমন করে না।'

মানসার শিল্পশাস্ত্রের ব্যবস্থা অম্বুসারেও আশানকালিকা, বসন্তরোগ-উপশমকারিণী শীতলাদেবী প্রভৃতির মন্দির নগর ও গ্রাম প্রভৃতির বহির্ভাগে দূরস্থ নির্জন স্থানে নির্মাণ করিতে হয়।

বিটুভিয়াসের ব্যবস্থা অম্বুসারেও চাগকোর উপদেশরূপে পরিচিত পঞ্চলক্ষণহীন স্থান গ্রামনগরাদি বাসস্থানের উপযোগী নহে। গ্রাম নগরাদি সংস্থাপনের পূর্বে মনোনীত স্থানের বায়ুর বিশুদ্ধতা, খাদ্যাদ্যাদির প্রচুর সরবরাহ, নদী, সমুদ্র ও পথাদি দ্বারা যাতায়াতের ও বাণিজ্যাদির সুবিধা এবং ধনী ও রাজপুরুষাদির উপস্থিতি দ্বারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিটুভিয়াসও দিয়াছেন।*

এরূপ পাশ্চাত্য প্রমাণ দ্বারা যদিও আমাদের শাস্ত্রাদির অম্বুশাসন সমপ্রমাণ করিতে পারা যায়, তথাপি লোকের আর্থিক অবস্থা এবং মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা ও কুশাসনের ফলে নগরাদির পল্লীসংস্থাপনে এমন কি বিনা বায়ের বায়ুর বিশুদ্ধতার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয় না। অত্যন্ত পরিহাস ও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বড় বড় প্রাচীন নগর-নগরীর টাউন ইমপ্রুভমেন্ট (নগরসংস্কারক) নামক শাসক-মণ্ডলী দ্বারা ইলাহাবাদ প্রভৃতি নগরে শহরের আবর্জনা ও পুরীষাদির দ্বারা পরিপূরিত গর্তসমূহকে সমতল করিয়া তাহারই উপর নূতন পল্লী সংস্থাপিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, তাদৃশ পল্লীতে বায়ুর বিশুদ্ধতা কখনও হইতে পারে না, ঔষধাদির সংমিশ্রণে ও কালক্রমে ময়লা মাটির সহিত মিশিয়া গেলেও তত্ত্ব স্থানের বায়ু সদাসর্বদাই পুতিগন্ধ-মিশ্রিত হইয়া অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের হানি অজ্ঞাতভাবে

* বিশেষ বিবরণের জন্য বিটুভিয়াস প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত ব্যবহার সমালোচনা লেখকের 'ভারতীয় বাস্তবশাস্ত্র' নামক গ্রন্থের অধ্যায় ৪ পৃ. ১৪২-১৪৩, ১৪৬-১৪৭, এবং অধ্যায় ২, পৃ. ৩৬-৪০ ত্রুটিয়া।
মানসার শিল্পশাস্ত্রের অধ্যায় ৩, ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ৪৭, মূল পৃ. ৬-২৮, ৩২-৫৬, ২৭৪-২৭৯ এবং ইংরেজী অম্বুসার পৃ. ১১-২৭, ৬৩-৮৮, ৪২৩-৪৩১ ত্রুটিয়া।

করিতে থাকিবে। আমাদের তথাকথিত ট্রাষ্ট বা বিশ্বাস-ভাজনতা এবং মিউনিসিপাল বোর্ড দ্বারা নগর-রক্ষকতা বস্তুতঃ এরূপ ভাবেই সম্পাদিত হইয়া গিয়া যমুনা সরস্বতী সম্বন্ধে ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যকর প্রাচীন তীর্থরাজ প্রয়াগ নগরের মোগলদিগের দ্বারা পরিবর্তিত ফকিরাবাদ বা এলাহাবাদের ইমপ্রুভমেন্ট বা উন্নতি জগতে হুমত্যা ব্রিটিশ আমলেও নির্বিকারে হইয়া আসিতেছে। আমাদের বর্তমান রাজস্বশক্তি যে নগর-সংস্থাপন বা তাহাদের প্রকৃত সংস্কার বা উন্নতিবিধান না বৃদ্ধিতে পারে তাহা নহে। কিন্তু স্থানীয় লোকের প্রকৃত স্বাস্থ্যবিধান অর্থক্লান্ততার দোহাই দিয়া হইতে পারে না। 'রাজকর্মচারী'সমূহ ও 'পলিক' লোকেরা তাদৃশ পুষ্টিগন্ধময় স্থানে বাস করে না। তাহাদের জ্ঞাত সিভিল লাইন, মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর পল্লী-সমূহ রিজার্ভ থাকে। এমন কি নগর-নগরীর তন্তুপল্লী-সমূহের বিপণি প্রভৃতিতে পূর্ণাঙ্গিত খাদ্যাদ্যমগ্রীর সরবরাহ পথান্ত হইতে পারে না। কুণ্ডাদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোকে সেরূপ পল্লীর নিজগৃহেও স্থলবিশেষে বাস করিবার অসম্মতি পায় না। নগরশাসক ও সংস্কারকদিগের এরূপ বিশ্বাসভাজনতা রক্ষার ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নগরস্থ বাসগৃহের স্বাস্থ্যহীনতা অবগ্যস্তাবী। লোকগণনায় দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা হাজারে পাঁচ-ছয় শত। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গণনা করিয়া হিসাব রক্ষা করিলে খুব সম্ভব দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নগরের অধিকতর স্বাস্থ্যকর পল্লীসমূহের অধিবাসীদিগের বা তাহাদের শিশুসন্তানগণের অকাল মৃত্যুর সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে।

বিস্তৃতিভাবে সমালোচনার অবসর অভাবেও সম্ভবতঃ পাঠকের পক্ষে এই কথা বুঝা শক্ত হইবে না যে, নগর-সংস্থাপনে, নগরস্থ পল্লী, বাঁধিকাদি ও বাসগৃহ নির্মাণে বৈজ্ঞানিক রীতি ও শাস্ত্রের অনুশাসন প্রায় কোথাও প্রতিপালিত হইতে পারে নাই এবং তাহার ফলে নগর ও গ্রামের অধিবাসীদেরও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারিতেছে না। বাসগৃহের কক্ষসমূহের সংস্থাপনে ও সরঞ্জামাদির মৌলিক ক্রটিবশতঃ আমরা কিরূপে কক্ষের পথে দিনের পর দিন অগ্রসর হইতেছি তাহা দ্রুত অনেকের বোধগম্য নহে।

গ্রাম, নগর ও বাসগৃহের সমুখ ভাগ নির্বাচন বিষয়ে বায়ু ও উত্তাপাদির উপযোগিতা সম্বন্ধে পূর্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। বাসগৃহের যে-সকল কক্ষে অধিবাসীর অধিকাংশ সময় যাপন করে সে-সকল কক্ষে বাহাতে বিস্তৃত বায়ু, সুস্থের কিরণ, আলোক ও উত্তাপ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা মানসারাদি শিল্পশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শয়ন-মন্দিরের কোন দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে নিদ্রিতাবস্থায়ও বিস্তৃত বায়ু ও উত্তাপের উপকারিতা পাওয়া যাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। সেজন্য বাসগৃহের দ্বার, গবাক্ষ ও অন্তর্দ্বার বিষয়ে মানসার শিল্পশাস্ত্র বিশেষভাবে ব্যবস্থা করিয়াছে। এমন কি রন্ধনশালার ধূম, মলমূত্র ত্যাগের স্থানের পুষ্টিগন্ধ বাহাতে বাসকক্ষসমূহে প্রবেশ করিতে না পারে সে বন্দোবস্ত মানসার শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার বাসগৃহেই অগ্ন্যাগার ও গৃহপালিত পশু-পক্ষীর স্থানও এমন ভাবে করা হইয়াছে বাহাতে অধিবাসী-দিগের বিশ্রামাদির ব্যাঘাত না হয়। উপরিউক্ত বাসগৃহের কক্ষসমূহেব তালিকা হইতে ইহাও লক্ষিত হইয়া থাকিবে যে পারিবারিক দেবতা-গৃহ বা নিত্যানৈমিত্তিক উপাসনার মন্দির গৃহের সর্বোৎকৃষ্ট কক্ষে স্থাপিত হইত। ইহা ধর্মগ্রাণ হিন্দুর পক্ষে স্বাভাবিক। উদরসর্ব্বম্ব পাস্তাত্য লোকের বাস-গৃহের সর্বোৎকৃষ্ট কক্ষে ভোজনাগার স্থাপিত হয়, তাহাও স্বাভাবিক।

এই স্বাস্থ্যানুকূল শাস্ত্রীয় অনুশাসন দ্বারা আমাদের বর্তমান বাসগৃহের কক্ষসমূহের সংস্থাপন-রীতি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বস্তুতঃ সন্দ্বাদ উপস্থিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, নগর, গ্রাম ও গৃহাদির দিগ্‌নির্বাচন বা সমুখ ভাগ নির্দেশ বিষয়ে রাজনৈতিক কারণ বা বিভিন্নদেশীয় বিজ্ঞেতাদের রাজ্য ও কুটি বিভিন্নদের উপর দৃঢ়ভাবে সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে পারে নাই। তাহার পর মুসলমানদিগের রাজত্বকালে ধনসম্পত্তি ও স্বত্বী রূপসী জীলোকের রক্ষার জন্ত দ্বার,

* গুরুত্ব মানসার শিল্পশাস্ত্রের অধ্যায় ৩০, ৩১, ৩২; মূল পৃ. ২১৯-২২০, ২৪৫-২৭০, অনুবাদ পৃ. ৩৩৬-৩৩৭, ৪১০-৪২২, এবং শিল্প-শাস্ত্রীয় অভিধানের দ্বার ও গবাক্ষ প্রভৃতি।

গবাক ও প্রাচীরাদি বিষয়ে অসুস্থস্পষ্ট করিয়া বাসগৃহ কেবল শহরে নহে গ্রামেও নির্মিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে-সকল স্থানে মুসলমান রাজপুরুষদের যাতায়াত অধিক পরিমাণে ছিল, সে-সকল স্থানের গ্রামসমূহ কারাগার-বিশেষ, গ্রাম ও নগর পঞ্জীস্থ বাসগৃহসমূহে দ্বার, গবাক ও অগ্নিদ্বার একান্ত অভাব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পর ধনসম্পত্তি ও স্ত্রীলোকের রক্ষা অনেক পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়া থাকিলেও বিস্তৃত শাস্ত্রাঙ্কশাসন, বহু শতাব্দীর অভ্যাস, লোকের অর্থের অনটন এবং অল্পভাবে পাশ্চাত্য রীতিনীতি অনুকরণবশতঃ বাসগৃহের সংস্কার বা কোনরূপ উন্নতিবিধানের আবশ্যকতা ঘোষণা করা হয় নাই। অল্প পাশ্চাত্য অনুকরণের একটা উদাহরণ অনেকের পক্ষে রুচিকর না হইলেও এখানে দেওয়া প্রয়োজন। ‘কমোড’ নামক পায়খানা ব্যতীত আমাদের ‘আপার’ সংজ্ঞক শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকের মলত্যাগ করা অসম্ভব বা অস্বাধীনক। কিন্তু ‘কমোড’ প্রথমতঃ জাহাজাদিতে ব্যবহৃত ‘ওয়াটার-ক্লোজট’ নামক নির্দোষ যন্ত্রবিশেষের অনিষ্টকর অনুকরণ। জলপ্রাবন হেতু ‘ওয়াটার-ক্লোজট’ হইতে বায়ু দূষিত না করিয়া ত্যাগমাত্রই ময়লা দূরীকৃত হয়। শুধু ‘কমোড’ হইতে সেরূপ হইতে পারে না। পাশ্চাত্য নগর-নগরীর যে-যে স্থানে ক্লাশিং বা জলপ্রবাহদ্বারা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ময়লা দূরীকৃত হইয়া যায়, সে-সকল স্থানেই ‘ওয়াটার-ক্লোজট’ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ পাশ্চাত্য রাজপুরুষেরা জলসঞ্চালনহীন ভারতের নগর গ্রামেও কমোডের প্রচলন আরম্ভ করিয়া দুর্ভাগ্য লোকদ্বারা মলমূত্র দূরীকরণের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের অনুকরণে আমাদের ‘আপার’ সংজ্ঞক লোকদের মধ্যে অনেকেই শয়নাগারের সম্বন্ধিত একই কক্ষ স্নানাগার ও ঈদৃশ মলমূত্র ত্যাগের ‘কমোড’ সংস্থাপন করে, বাহাতে অর্থানটন বা ব্যয়-সঞ্চোচের ইচ্ছাবশতঃ মেথরের বিরল আগমন হেতু

পূর্ণাবৃত্ত সঙ্কীর্ণত মলমূত্রের উপরেই বারংবার মলমূত্রত্যাগ করা হয় এবং স্নানকার্য্য সমাপ্ত করিয়া দেহের আন্তরিক ও বাহ্যিক মল দূর করা হয়। তদ্বারা কেবল শয়নমন্দির নহে, অপর কক্ষসমূহ এবং সমগ্র বাসগৃহেরই বায়ু দূষিত করিয়া, আমাদের অনুকরণ-ভ্রমের পরিভূতি করা হয়। হিউমিডিটি বা বায়ুতে জলকণার স্রাব ঈদৃশ বাসগৃহের বায়ুর মলকণা মাপিবার যন্ত্র থাকিলে বুঝিতে পারা যাইত মূহুর্তে মূহুর্তে নিঃশ্বাসের সহিত কি পরিমাণ মলমূত্র আমরা প্রকৃতপক্ষে গলাধঃকরণ করি।

আহার ও পরিধেয়াদি বিষয়েও আমাদের ঈদৃশ মূঢ়তার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় বাসগৃহের দিগ্‌নির্দেশ ও সংস্থাপন বিষয়ে প্রথমতঃ আমাদের অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে যে-যে স্থানে বা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব সে-সে স্থলেও কোনরূপ সংস্কার বা উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। আর্থিক কারণে আমাদের যথোপযুক্ত অন্নবস্ত্রাদির সংস্থান হইতে পারিতেছে না। অজ্ঞতাবশতঃ বাসগৃহ সম্বন্ধে কোনরূপে মাথা শুদ্ধিবার স্থান ব্যতীত অধিক কিছুই আকাজক্ষ্যমাত্রই আমাদের নাই। বিস্তৃত জল আলোক ও বাতাস যাহা আমাদের অজ্ঞতা না থাকিলে একরূপ বিনাব্যয়েই পাওয়া যাইতে পারে তাহাও পাওয়া যাইতেছে না। এই অজ্ঞতা, অলসতা বা অনিচ্ছার অবশুষ্ঠাবী ফল লোকের স্বাস্থ্য ও বলহীনতা।

এরূপ অজ্ঞতা দূর করিবার অভিপ্রায়ে ইতালীর মিলান প্রভৃতি নগরে প্রতিবৎসরই বিজ্ঞান-দর্শন বাসগৃহ-সমূহের অধুনিক উৎকর্ষ সম্বলিত প্রদর্শনী হয় এবং অধিবাসীদিগকে উৎকৃষ্ট প্রণালীর বাসগৃহ-নির্মাণে সরকারী সাহায্য ও পারিতোষিক প্রভৃতির দ্বারা প্ররোচিত করা হয়। এই বিষয়ে আমাদের দেশনায়ক ও শাসনকর্ত্তৃদিগের মনোযোগ সফলতরে প্রার্থনা করা যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

Butterton Vicarage,
Newcastle,
Staffordshire.

ও

কল্যাণীয়েষু,

লগনের গোলমালের পর কিছুদিনের জন্তে পাড়াগাঁয়ে একজন পাদ্রির বাড়িতে আতিথা গ্রহণ করেছি। জায়গাটি ফুলের। চারিদিকে পৃথিবীর জয় ঘন একেবারে শ্রামলতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—এমন ঘন সুসুজ আমি কখনো দেখিনি—এ ঘন অন্তলম্পর্শ বর্ণের গভীরতা—চোখ ঘেন ডুবে গিয়ে কোথাও আর খঁই পায় না।

যাদের বাড়িতে আতিথা গ্রহণ করেছি তারা মাহুঘ যেমন ভালো তেমনই তাদের গৃহস্থালীটি মধুর—চারিদিকের লোকের সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটি কল্যাণে ভরা। বস্তু থেকে আরম্ভ করে পশু এবং মাহুঘ পর্যন্ত কোথাও তাদের নিরলস যত্নের লেশমাত্র বিচ্ছেদ নেই। এই যে নিজের জীবনকে এবং জীবনের চারিদিককে একান্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করা এটা আমার ভারি ভাল লাগে। কারণ পৃথিবীতে ছোট বড় যারই সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঘটে তার কোনোটিকেই উপেক্ষা করা নিজেরই আত্মাকে উপেক্ষা করা, নিজের শক্তিকে অপমান করা। নিজের প্রতি অশ্রদ্ধার দ্বারাই আমরা পৃথিবীর সর্বত্র অশ্রদ্ধা বিস্তার করে সমস্তকে শ্রীহীন করে তুলি এবং নিজেকে তোলাবার জন্যে মনে করি এটাই আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ। আমাদের বোলপুর আশ্রমে ঘরে বাহিরে যে অযত্ন পরিদৃশ্যমান হয়ে আছে, তার দ্বারা আমাদের যে গভীর একটা তামসিকতা প্রকাশ পাচ্ছে সে কথা মনে পড়লে বার বার আমার নিজের প্রতি হিকার জন্মে—আবিঃ যখন আমাদের জীবনের মধ্যে আবিস্কৃত হবেন তখন আমাদের ঘরদ্বার আসন বসন সমস্তই তাঁর সংবাদ জানাতে থাকবে—কোথাও কিছুমাত্র কুশ্রীতা থাকবে না।

রোটেনষ্টাইনের যে একটি চিঠি পেয়েছি সেটি এই সঙ্গে পাঠাই। এর থেকে বুঝতে পারবে আমার লেখাগুলিকে এরা সাহিত্যের বিষয় করে রাখেন নি, জীবনের বিষয় করে গ্রহণ করেছেন—সেইটেই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে আনন্দের কারণ হয়ে উঠেছে। চিঠিখানি হারিয়ে না

যেমন আদরের সঙ্গে তিনি এটি লিখেছেন তেমনি আদরের সঙ্গে আমি এটিকে রক্ষা করতে ইচ্ছে করি* ইতি ৬ই আগস্ট ১৯১২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

কল্যাণীয়েষু,

অজিত, মনে করেছিলুম এ-সপ্তাহে তোমাদের কিছু লিখে পাঠাব কিন্তু এখানকার লোকের ভিড়ের যাক্সানে কলম চালানো দুঃসাধ্য। সময়ের অভাব বলে নয় কিন্তু মনটা বেশ স্থির হয়ে বসতে চাচ্ছে না। ব্রজি সিংহাসনে না চড়ে আমি সামান্য কিছুও লিখতে পারিনে—সেখান থেকে নামলেই আমার রাখালী ধরা পড়ে। আমার ভিতরকার একটা মন আছে তারই হাতে যখন সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়ে বসি তখনই আমার লেখা এগোয়—আমার বাইরেকার মাহুঘটা একেবারে কোন কাজের নয়। সে কিছু বোঝেও না, কিছু বলতেও পারে না—সে একটা অশিক্ষিত অক্ষম অজ্ঞ মাহুঘ—সে সামান্য বা কিছু শিখেছে সে কেবলমাত্র সেই অন্য মাহুঘটার সঙ্গে থেকে। সেই জন্যই কোনো কাজের মত কাজ করতে গেলে আমার এত অবকাশের দরকার হয়। আমি এক এক বার ভাবি কবিমাত্রকেই কি এমনি জুড়ি হাঁকিয়ে চলতে হয়—না, এই সার্কাসের কসরৎ কেবল আমারই ভাগ্যে ঘটেছে? মোটের উপর দেখা যায় সব দেবতারই বাহনগুলো জন্তু—কারো বা গরু, কারো বা ঘোষ, কারো বা যেথ—আমার ভিতরকার দেবতারও বাহনটা একটা চতুষ্পদ বিশেষ—সে কেবল গুঁতো খেয়ে চলে এবং শব্দ করে গর্জন করে—না পারে বুঝতে, না পারে বোঝাতে। আমার মনে হয় অস্তিত্বজ্ঞানের সঙ্গে নাইট্রোজেনের মত বোধের সঙ্গে অবোধতার, দেবতার সঙ্গে পশুর জুড়ি মেলানোর প্রয়োজন আছে—ওতে আক্ষেপ করবার কারণ নেই। দুঃখের বিষয় দেবতার দর্শন পেতে সাধনার দরকার হয় আর বাহনটা আপনি-ই চার পা তুলে দেখা দেয়। ইতি ১৫ই আষাঢ় ১৩৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* চিঠিখানি কোথাও হরত রক্ষিত আছে কিন্তু আগাত্ত অজ্ঞাত-
বাসে। রবীন্দ্রনাথ

মীনাবাজার

ত্রিকালিকারজন কামুনগো, এম-এ, পি.এইচ-ডি

বাহার আশ্রা-হুর্গ দেখিয়াছেন মুসলমান পাণ্ডারা মিশরই তাঁহাদিগকে আকবর বাদশার মীনাবাজারে না লইয়া গিয়া ছাড়ে না ; সম্ভবতঃ এই বাজার সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা নানারকম সরস গল্পও শু্যাইয়া থাকে। আমিও এই জ্ঞানগা অস্ততঃ পাঁচ-ছয় বার দেখিয়াছি। এই স্থানে দাঁড়াই লই টড-বর্ণিত খুশরোজের কথা স্মরণে পড়ে। যমুনা-তীরে যোগলের নব-বন্দাবন এই অগ্রবাহ হুর্গেই নওরোজের উৎসবে রূপের হাট বসিত ;—যেখানে দ্বিতীয়ার ছিলেন পার্শ্বিক ও অপর্য্যবস্তর একমাত্র ক্রেতা—আমন্ত্রিত রাজপুত নারীর সতীত্বপহারক স্থপিত দৃশ্য। এই মীনাবাজার হইতে একদিন বিকানীর-রাজ রায়সিংহের পত্নী সম্রাট-প্রদত্ত হীরা-জহরতের কসর-পসরা মাথায় লইয়া ফিরিয়াছিলেন। এইখানেই রায়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীর ও কবি পুখুরীজের স্ত্রীর প্রতি লালসালোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া আকবর একবার বিদগ্ধ পড়িয়াছিলেন। সেদিন বিখ্যাত সম্রাটের জ্বর সতীর তেজোদৃশ্য চাহনি ও শাবিত ছুরিকার সম্মুখে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তিনি শপথ করিলেন কেন শিশোদির রাজপুত বীর উপর ভবিষ্যতে কুদৃষ্টি করিবে না। বাহারা পরাজিত হইয়া সম্রাটের বশতাগ্ৰীকার করিতেন, তাঁহাদিগকে নাকি এই মীনাবাজারে কুলস্রী পাঠাইতে হইত। এজন্য বুদ্ধিপতি রাও হুজুরন এবং সম্রাট আকবরের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, উহাতে অন্যান্য শর্তের মধ্যে ইহাও লিখিত ছিল, হাড়া-বংশীয়েরা কোন দিন যোগলকে কন্যাদান করিবে না, কিংবা নওরোজের উৎসবে ত্রীলোকদিগকে পাঠাইবে না।*

আকবর বাদশা ব্রজভাষার কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার নামের ভণিতাবৃত্ত, কয়েক ছত্র হিন্দী কবিতা পাণ্ডারা গিয়াছে। সংগ্রহকার—“মিশ্রবন্ধু”—টিপ্পনী

* Tod's *Rajasthan*, i. 318, 319 ; ii. 452. *Vamsa-shaskar* in Hindi, p. 2264.

করিয়াছেন। এইগুলি “সম্ভবতঃ” মীনাবাজারে বলাৎ গৃহীত কোন মুসলমান অবস্থা-বিশেষের বর্ণন।* অনিয়াছি বৃন্দাবনে গেলে নাকি ভক্ত বৈষ্ণব অশ্রু-নদী প্রবাহিত করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। বাহাদের ইতিহাসের বাতিক আছে, প্রথমবার দিল্লী, আগ্রা, সারনাথ, তক্ষশীলা গেলে তাঁহাদের ঠিক এই দশা না হইলেও কিঞ্চিৎ ভাবান্তর উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক কবি হইয়া উঠে, অর্থাৎ তাঁহার বিচার-বুদ্ধি লোপ পায় ; যুগ-যুগান্ত ধরিয়া প্রবহমান স্মৃতির উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস প্রাণ আকুল করিয়া তোলে ; ভাবের উদ্বেল তরঙ্গ জ্ঞানের বেলাতুর্নি অতিক্রম করিয়া অধীত বিদ্যাকে মুহূর্তের জন্য তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু আশ্রা-হুর্গের এই নিতান্ত অপরিণত স্থানে বোধ হয় মীনা-বাজার বসিত না ; বসিলেও উহার মধ্যে এতখানি কাব্য কিংবা রোমান্সের অবকাশ ছিল না। পুরাতন কবি বিচারের কটীপাথরে শাণাইতে গিয়া জ্ঞান হইল জনশ্রুতি-প্রভারিত মহাশ্মা টুউ ইতিহাসের মরুপ্রান্তরে অজ্ঞাতসারে যে-সমস্ত মনোরম যুগতৃষ্ণিকার সৃষ্টি করিয়াছেন, খুশরোজের বাজার বা মীনাবাজার উহারই অন্যতম।

প্রথম কথা, মীনাবাজার নামটির উৎপত্তি কোথায়? আকবরের সময়াময়িক ঐতিহাসিক কবায়ুনী নওরোজের উৎসবকে নওরোজ-ই-জলজলীক এবং বাজারকে দোকানাগ-ই-নওরোজী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; কোথাও মীনাবাজারের নামগন্ধ নাই। দরবারি ঐতিহাসিক নিজাম-উদ্দীন আহমদের ‘তবকাৎ-ই-আকবরী’† গ্রন্থে নওরোজকে নওরোজ-ই-হুলতানী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ; মীনাবাজার শব্দটি কোন স্থানে ব্যবহার হয় নাই। আবুল-

* *Misrabandhu Vinode* in Hindi, i. 284.

† *Budayuni*, Pers. text, ii. 321, 338, 342, 355, 365, 390.

‡ *Tabaqat-i-Akbari*, Pers. text, Nowalkishore Press, pp. 353, 354, 365, 371.

ফজলের 'আকবরনামা'তেও* মীনাবাজারের কোন উল্লেখ নাই। জে.ই.ই.ট পাক্ষীর এবং কয়েক জন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আকবরের সময় এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও মীনাবাজার কিংবা তৎসম্বন্ধে কোন বাজারী গল্প লিখিয়া যান নাই। আবুল-ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'র স্মার সৈয়দ আহমদ কৃত সংস্করণে† আইন-ই-খুশরোজের পাশে ছোট অক্ষরে লেখা আছে—ইয়ানে মীনাবাজার। ব্রহ্মমান সাহেবও 'আইন-ই-আকবরী'র ইংরেজী অনুবাদে লিখিয়াছেন—“Khushroz, or Day of Fancy Bazaars.”‡ কিন্তু যেখানে মূলগ্রন্থে 'মীনাবাজার' শব্দ নাই সে-স্থলেও তিনি অনুবাদে 'Fancy Bazar' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শুধু এ-স্থানে নয়; বদায়ুনী হইতে উদ্ধৃতঃশের অনুবাদে—যেখানে মূলে দোকানাহা-ই-নওরোজী লেখা আছে, তাহার অনুবাদ করিয়াছেন “Stalls of the Fancy Bazar.”** ইহাতে সন্দেহ হয়, 'আইন-ই-আকবরী'র মূল পাঠে মীনাবাজার শব্দ ছিল না এবং আকবরের সময় খুশরোজের বাজারকে মীনাবাজার বলা হইত না। আগ্রা-ভূর্গের অধরসিং দরওয়াজা ও ফতেপুর-সিক্রির ঘোষদাসী-মহলের মত ইহাও লোকপ্রচলিত মিথ্যা নাম। বাহাউউক মীনাবাজার শব্দটি আকবরের সময় অপ্রচলিত ছিল প্রমাণিত হইলও বাদশার কলঙ্ক ভণ্ডন হয় না। উড়, সাহেব আকবর-চরিতের উপর যে কুৎসার মীনাকারী করিয়াছেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা বিচার করা যাক। রাঠোর রায়সিংহের‡ পত্নীর সহিত বাদশার ব্যভিচার ও পুথীজাজের স্ত্রীকে কবলিত করিবার চেষ্টা

সম্পূর্ণ কাল্পনিক জনশ্রুতি; মহারাণা প্রতাপের কাছে লিখিত পুথীজাজের উদীপনাময়ী কবিতা-লিপির ভ্রায় সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। 'মিশ্রবন্ধ-বিনোদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত পদগুলি আকবরের রচনা হইতেই পারে না।

সাহি অকবর বাদশী বাহ অচিত্ত গহী
চলি ভীতর ভোনে;
হন্দরী ঘারহি দীট লগারকে ভাগিবে কে,
ভ্রম পাবত গোণে।

কেমনা “সাহি অকবর” শব্দকে ভণিতা ধরিলে 'গ্রহণ করা' ক্রিয়ার কর্তৃই থাকে না। “অকবর শাহ হঠাৎ ললনার বাহু গ্রহণ করিয়া ভিতর ভবন, অর্থাৎ অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। হুন্দরী ঘারদেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া পলায়নের চিন্তা করিল; কিন্তু তখন সময় ছিল না।”

অবিকৃত চিত্রে স্বকৃত ছন্দ লিপিবদ্ধ করা সম্প্রতি ক্যাশন হইয়াছে। আধুনিক তরুণের সাহস আকবর বাদশার নিশ্চয়ই ছিল না।

মীনাবাজার সম্পর্কে টডের দ্বিতীয় প্রমাণ—রাও হুরজন হাড়ার সহিত আকবরের সন্ধি—বাহাতে অন্যান্য সন্ধির মধ্যে ছিল মীনাবাজারে তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা পুরস্ক্রীণকে পাঠাইবেন না। এই সন্ধি হইয়াছিল, ১৭৬ হিজরীতে* যখন হুরজন রনখাজোর দুর্গ সমর্পণ করিয়া আকবরের বশত স্বীকার করেন। কিন্তু নওরোজ-উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল ১১০ হিজরীতে। অর্থাৎ নওরোজ আরম্ভ হইবার ১৪ বৎসর পূর্বে রাও হুরজন কি মীনাবাজারের কোলেছারী দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়া এই সন্ধি আকবরের নিকট হইতে লিখাইয়া লইয়াছিলেন?

আকবরের সপক্ষে ওকালতী করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তিনি যে জিতেজয় নিঃশঙ্ক চরিত্র ছিলেন একথা আবুল-ফজল ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে কিনা সন্দেহ। অকবর বাদশারও বয়সকালে চরিত্র-দোষ ছিল। তাঁহার চরেরা দিল্লী ও আগ্রার সম্রাট মুসলমান পরিবারের হুন্দরী স্ত্রী-কন্যাদের খবর আনিত। আগ্রার তিনি এক শেখজীর (বদাৎ) এক হুন্দরী সখব পুত্রবধূকে

* *Akbarnama*, Eng. trans. Boveridge, pp. 557, 589, 644, 739, 789, 807, 871, 929, 1177.

† Text, p. 153.

‡ *Ain-i-Akbari*, Eng. trans. p. 276.

** *Ibid.*, *Ain-i-Akbari*, p. 204.

§ আকবর রায়সিংহের ভগ্নীকে (১৭৮ হি:) বিবাহ করিয়া ছিলেন। রায়সিংহ তাঁহার অধীন লোকদের বিদ্রোহে অজিগোপ গোপা দেওয়ার দণ্ডে তিনি সম্রাটের বিরাজভঞ্জন হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ণত তাঁহার দরবারে প্রবেশ নিষেধ ছিল।

(Boveridge's *Akbarnama*, pp. 1068-69.

* Badayuni, Eng. trans., Lowe, ii. 111.

আকাজক করিয়াছিলেন। যেচারা স্বামী বিবির আঁচলে তিন তালুক বাঁধিয়া দিয়া মনের দুখে বিদ্যাচল পার হইয়া গেল। সামাজিক নিন্দা ও অপবাদের ভয়ে শেখজী নীলবর্ণ শূণ্যালের জায় অন্তান্ত লোকেরও নাক-কান কাটাঁইবার জন্য বাদশাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যেন তিনি দিল্লীতেও নাগরিকদিগের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করেন। একদিন দিল্লীর বাহিরে বেগম-সাহেবার মাস্তাসার কাছে বেড়াইবার সময় আকবর গুপ্তঘাতকের হাত হইতে * ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। অবস্থা বুঝিয়া তিনি সেদিন হইতে বদ-খোলা ছাড়িলেন। আকবর নাকি তাঁহার পীর সলীম চিশতীর অন্তরমহলে সরাসরি ঢুকিয়া পড়িতেন। ইহাতে শেখজীর পুত্রেরা বাদশার কাছে নালিশ করিয়াছিল, বাদশা এভাবে ঘাতঘাত করতে স্ত্রীরা তাহাদের প্রতি উদাসীন হইয়াছে। কিন্তু একবার কোন ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় বার তাহার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ হইলে যদি বিনাবিচারে সাজা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তবে আইনের মর্যাদা রক্ষা হয় না। পাকা ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ মীনাবাজার সম্পর্কে যোনাফানন করিয়া আকবরের প্রতি সূচিয়ার না করুন, অন্ততঃ টডের মত অবিচার করেন নাই। যে-সময় আকবর দীন-ই-ইলাহী ও নওরোজ উৎসব প্রচার করেন তখন তাঁহার ধর্মে মতি হইয়াছিল, বৎসরের পরিমাণে তিনি তখন বিগতযৌবন, হুতরাং শেষ-বয়সে তিনি হুম্মরী ধরিবার জন্য মীনাবাজারের মত যে একটি বাদশাহী কাঁদ পাতিয়াছিলেন, একথা সহজে বিশ্বাস হয় না। তবে অবশ্য রাজচরিত্র সূচিচারিত্রের জায় দুজের। বয়সের অজুহাত রাজা-বাদশার পক্ষে খাটে না; কেননা কালিদাস বলিয়াছেন, “বিশেষাণাং ন খলু বয়ঃ যৌবনা-দত্তমতি।”

আকবর বাদশার মীনাবাজার আগ্রা কিংবা কতেপুর-সিক্রির বাদশাহী মহলের কোন অংশে বসিত, ইহা সন্ধ্যাক্ত করিতে যাওয়া যে কথা, গড়মান্দারগের মাঠে কোন ভয় শিব-মন্দিরে জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার

প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করার চেষ্টাও সেইরূপ। নওরোজ সমসাময়িক ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে আকবরের চরিত্রের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই। আকবরের কুৎসা-রটনার পঞ্চমুখ যোলা বদায়ুনীও উদ্-বর্ণিত খুশরোজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব; ভয়ে নয়, সত্যের খাতিরে।

এইবার নওরোজ অহুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিব।

সম্রাট আকবর ও আবুল-ফজল প্রমুখ সংস্কারপন্থী মুসলমানগণের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা ছিল, হজরত রহুল-আজার প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মের পরমায়ু হাজার বৎসর পূর্ণ হইলেই, হয় উহা বাতিল হইবে, না-হয় যুগ্মযায়ী নূতন রূপ ধারণ করিবে।

কোরান-শরীফ অবতীর্ণ [নাজেল] হওয়ার তারিখ হইতে এই এক হাজার বৎসর শেষ হইয়াছিল ৯৯০ হিজরীতে। ঐ বৎসরেই নব যুগের ও নব ধর্মের “জগৎগুরু” আকবর বাদশা তাঁহার দীন-ই-ইলাহী প্রচার করেন। প্রাকৃতজ্ঞানের পক্ষে পরব্রহ্ম বা অল-হকের উপাসনা ও উপলব্ধি প্রায় অসম্ভব। এজন্য তিনি তেজোব্রহ্মের প্রতীক সূর্য্য ও অম্বর উপাসনাই দীন-ই-ইলাহীর বহিঃরূপ বা কর্ণকণ্ড রূপে প্রবর্তিত করিলেন। দীন-ই-ইলাহী বস্তুতপক্ষে প্রাচ্যের ধর্মে ও সমাজে সহস্র বৎসরের বহুমূল সেমেটিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সনাতন আর্ধ্য ও ইরাণীয় সভ্যতার প্রথম প্রতিক্রিয়া—যাহা নূতন মস্তিষ্কে পারস্ত ও তুরকে সম্প্রতি দেখা দিয়াছে। ৯৯০ হিজরীর পরে ইসলাম হিন্দুস্থানের একমাত্র রাজকীয় ধর্ম রহিল না। ইহার সঙ্গে ইসলামী চান্দ্রমাস, হিজরী সাল রাজাহুশাসনে অপ্রচলিত হইয়া গেল। ইহার পরিবর্তে আসিল সৌর মাস, ইলাহি সাল এবং ছই মুসলমানী জন্মের পরিবর্তে প্রাচীন পারস্যের বার মাসের তের জন্ম।

যেবরাশিতে সূর্য্যের সঞ্জেমণের দিন ছিল ইলাহি বৎসরের নওরোজ বা New Year's Day. নওরোজ হইতে আরম্ভ হইয়া উনিশ দিন পর্য্যন্ত সায়াঙ্কো সার্কজনীন অখণ্ড মহোৎসব অহুষ্ঠিত হইত। প্রথম মাসের প্রথম দিনে নওরোজ এবং উনিশ তারিখেই—যেদিন দিবারাজি

সমান হইয়া হুখের উত্তরায়ণ (vernal equinox) আরম্ভ হইত অর্থাৎ (রোজ-ই-শরক)—এই দুই দিনে সর্কাপেক্ষা বেশী জাঁকজমক হইত।

১১০ হিজরীর নওরোজ (১১ই মার্চ, ১৫৮২ খৃঃ) উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল আকবরের নবনির্মিত রাজধানী ফতেপুর-সিক্রিতে। আগ্রা-হুর্গে কোন বৎসর খুশরোজের বাজার আসৌ বসিয়াছিল কিনা সন্দেহ। কোন ইতিহাসে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে আজকাল নতুন ও পুরাতন দিল্লীর যত আগ্রা ও ফতেপুর আকবরের সময় প্রায় এক শহর ছিল। নওরোজের সময় আগ্রা ও ফতেপুর শহরের দোকানপাট উৎসবের সজ্জায় ও রাজে নানা বর্ণের আলোকমালার সুশোভিত হইত।

প্রথম বৎসর ১৮ দিন বাপী (১১ই মার্চ ১৫৮২—২৯ শে মার্চ ১৫৮২) নওরোজের উৎসব-মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল ফতেপুর-সিক্রির দেওয়ান-ই-আমের ময়দানের চতুর্পার্শ্বস্থ দুর্গপ্রাচীর-সংলগ্ন ১২০টি বারান্দায়। সম্রাট উৎসব-মণ্ডপের সাজসজ্জা ও ভাষাবাহনের ভার আমীরগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট এক-এক দিন এক-এক জন আমীরের ‘ষ্টলে’ অতিথি হইতেন। সেদিনকার বাদশাহী ভোজের চার পড়িত সেই আমীরের উপর। নওরোজের বাজার সপ্তাহে একদিন সর্কাপাখারণের জন্য খোলা থাকিত।

স্ত্রীলোকেরা নওরোজের উৎসব-মণ্ডপে প্রথমবার আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন দুই বৎসর পরে তৃতীয় নওরোজের সময়। এইবার ফতেপুর-সিক্রি হইতে চার মাইল দূরে হামিদ বাহুর উদ্যানে এই উৎসব অস্থাপিত হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম নয়দিন নওরোজের বাজার সর্কাপাখারণের জন্য খোলা ছিল। তাহার পরে পুরুষদের যাওয়া-আসা নিষিদ্ধ হইল। [যদুম-রা মানা আমদ] সম্রাটের মা হামিদ বাহু, পিসি ওলবদন বেগম ও বাদশাহী মহলের অন্তঃস্থ বেগম ও আমীরদের পরিবার উৎসব-মণ্ডপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে প্রায় এক লক্ষ টাকার নজর ও খেলাৎ দেওয়া হইয়াছিল। বরাযুনী বলেন, এই সময়ে বেগমেরা তাঁহাদের ছেলেমেয়ের সন্ধি স্থির করিতেন।

নওরোজের প্রথম তিন চারি বৎসরের মোটামুটি বিবরণ আমরা সমালময়িক ইতিহাসে দেখিতে পাই। ইহার পরে

শুধু নওরোজের উল্লেখমাত্র আছে। কিন্তু খুশরোজ কিংবা মীনাবাজার সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে “মিহির জ্ঞান” নামক এক উৎসবের কথা একোয়াভাইভা (Rudolfo Aquaviva)

নামক জেজুইট পাদ্রী লিখিয়া গিয়াছেন, যথা—

“A new Easter has been introduced called *Merjan* on which it is commanded that chiefs be dressed out in state and listen to music and dances. The Muhammadans were very much scandalized and would not imitate the observers of the feast.”*

মীনাবাজার বা খুশরোজের বাজার কখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না।

মীনাবাজার বা খুশরোজের বাজার নওরোজ উৎসবের তৃতীয় দিন এবং প্রত্যেক মাসিক ঈদের তৃতীয় দিনে বসিত। ঐ সম্বন্ধে একমাত্র সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায় আবুল-ফজলের ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে। উহার ব্রহ্মযান কৃত ইংরেজী অনুবাদের কিয়দংশ—

“On the third feast-day of every month, His Majesty holds a large assembly for the purpose of enquiring into many wonderful things in this world. The *merchants of the age* are eager to attend and lay out articles from all countries. The people of His Majesty's harem come, and the women of other men also are invited, and buying and selling is quite general. His Majesty uses such days to select any articles he wishes to buy, or to fix prices of things..... After the Fancy-bazar for women bazars for men are held. His Majesty watches transactions.....bazar people on such occasions, may lay their grievances before His Majesty without being prevented by the mace-bearers...”†

উল্লিখিত অনুবাদে কোন স্ত্রী-দোকানদার বা দোকানদারের স্ত্রীর কথা নাই। তবে কি অসুস্থ্যস্পনা বেগমেরা বেপদ? ইহা পুরুষ-দোকানদারগণের নিকট হইতে জিনিষ কিনিতেন? ইহা অতি অসম্ভব বাপার।

ভাবরাজ্যে আকবর বাদশা সেকালের তুলনায়

* J. A. S. B., 1896; paper by E. D. MacLagan, p. 57.

† ব্রহ্মযান সাহেবের অনুবাদে ভুল ধরা আমাদের পক্ষে দুঃস্থ। হইলেও এখানে কিঞ্চিৎ গোলমাল হইয়াছে। “আইন-ই-আকবরী”র লক্ষ্য-সংকরণে আছে,—*Saudagar-i-saman bar faras-i-garam bazari nashnad*. ইহার অর্থ অর্থ, জমানার (সময়ের) বাজার গরম হইয়া উঠে। যদি ক্রিয়াপদে একবচন না থাকিয়া বচন থাকিত তবে ব্রহ্মযান সাহেবের অর্থ হইত কোন বচনে টকিত। এ হলে তার সৈয়দ আহমদ কৃত সংকরণের পাঠই শুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। উক্ত পাঠে ক্রিয়া ও বচন আছে। তাহার পাঠ *Saudagar-saman* অর্থাৎ স্ত্রী-ব্যবসায়ীরা। ব্রাউটাইন সাহেবের অনুবাদ “সওদাগরগণের” গ্রীক—বাছা উড় গ্রহণ করিয়াছেন—শুদ্ধ নয়।

কামাল পাশা কিংবা আমাছল্লার মত অভিজাত-আধুনিক হইলেও স্ত্রীলোকের পক্ষ ও স্বাধীনতা বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্মতনপন্থী মুসলমান। তাহা না হইলে স্ত্রী-পুরুষের জন্ত বিভিন্ন সময়ে মেলার ব্যবস্থা থাকিত না। তবে এহলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আকবরের কতপুরুষ-মিত্রিত দারজিলিং কিংবা স্ত্রী-রাজ্য ছিল না; স্ত্রী-সোকানদার হঠাৎ আমদানী হইত কোথা হইতে? শুনিয়াছি রামপুর-রাজ্যের ভূতপূর্ব নবাব বাহাদুর রামপুর প্রাসাদে মীনাবাজার বসাইতেন। সমস্ত ভারতবর্ষের সওদাগর এই বাজারে মাল পাঠাইত। প্রত্যেক জিনিয়ের সহিত নাম লেখা থাকিত। সওদাগরেরা বড়ী স্ত্রীলোকদিগকে

নিজেদের হাঙ্গামে প্রতিনিধি রূপে বসাইয়া দিত। বসন্তের মীনাবাজারে বাসন্তী রং কিংবা যে ক্ষতুতে বাজার বসিত সে ক্ষতুর অনুযায়ী গোলাপী বা জাকরাণী রঙের কাপড় পরিয়া সকলকে এই বাজারে যাইতে হইত। রাজ্য-পিতৃস্বানীদ—হুতরাং রাজার কাছে পক্ষীর আবশ্যক নাই। সেজন্য নবাব বাহাদুর ছাড়া অন্য পুরুষ মেয়েদের মেলায় যাইতে পারিত না। হুতর আকবরী মীনাবাজারে রামপুরের মীনাবাজারের মত ব্যবহারই ছিল। আকবরের মীনাবাজার সম্বন্ধে কুৎসার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকিলেও মনুষ্য-চরিত্র একটি ব্যাপারে অপরিবর্তিত রহিয়াছে—“বধা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুহে হর্ষনো জনঃ।”

বিধবার সম্ভা

ঈশাঙ্ক দেবী

শমীজ বসিল,—“সংসারের এত খরচপত্র সামলে ওঠাই দার। এর উপর নতুন একটা ভার বাড়ি পড়িলে কি ক’রে পেয়ে উঠব বুঝতে পারছি না।”

উর্খিলা হাঁটু নাড়া দিয়া কোলের খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে বসিল, “যে কাজ করতেই হবে, তা খুসী মনে করাই ভাল; তা নিয়ে অত মনমরা হয়ে থাকলে ত চলবে না। এ তোমারই কাজ, সকলের আগে তোমাকেই এগিয়ে বেতে হবে।”

লম্বা চিঠিখানা আগাগোড়া আর একবার পড়িয়া অক্লান্ত করিয়া শমীজ বসিল, “বাপের বাড়িতেই বরং কিছুদিন থাকুন। আমার এখানেও খরচ, সেখানেও খরচ, তোমার হাঙ্গামা না বাড়িয়ে আমি তোলা-টাকাটাই না-হর সেখানে পাঠিয়ে দেব।”

নম্রাকাটা কাঁথার তলার দুই পাশে দুইটা পাশ-বালিশ ওড়িয়া দিয়া ছেলেকে ধীরে ধীরে কাৎ করিয়া শোয়াইয়া উর্খিলা চাপা গলাতেই বসিল, “না, না, না, ও-সব কাজ নেই। টানাটানির সংসার থেকে আমরা

অতগুলো করুকরে টাকা দার ক’রে পাঠাব আর সাত-ভুতে খেয়ে উড়িয়ে দেবে, সে আমি কিছুতেই সহিতে পারব না। তুমি কি মনে কর কেবি ছবির পেটে অর্ধেকও যাবে? সব ওই হা-বরে হাঙ্গরের গুটির ভোগে লাগবে। বাপ-মাই যখন নেই, তখন আবার বাপের বাড়ি কিসের? এ আমরা ছুটিতে হেলেপিলে নিয়ে বেশ থাকব। তোমাকে তার জন্ত কিছু ভাবতে হবে না।”

অসমাপ্ত দিবানিত্রা ফেলিয়া চিঠিখানা হাতে করিয়া উঠিয়া শমীজ বসিল—“বাই-ভবো, তাই লিখে দি গিয়ে। কিছু দিন ত বাপু, তারপর যেমন হাঁড়ার পবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।”

উর্খিলাও বাহিরের বারান্দায় আসিয়া হাঁড়াইল। শরৎকালের অপরাহ্নে অর্ধেক আকাশ ছড়িয়া রৌদ্র ঝলমল করিতেছে, কিন্তু পূর্ব কোণে বর্ষাশ্রুধ ধূমল মেঘ ছলিয়া ছলিয়া উঠিতেছে, যেন উর্খিলারই অশ্রু-হাসিভরা মনের ছায়া। তাহার একলার সংসারে

এতদিন পরে বালাসখী আসিয়া তাহারই হৃৎস্থের সখী হইবে, মনের কোণে সঞ্চিত বত কথা তাহার কানে ঢালিয়া দিয়া কি আনন্দে ছই জনে তাহার রস-উপভোগ করিবে ভাবিয়া উর্খিলার সখীহীন মন আপনি হাসিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মনের একটা কোণে অশ্রু যে লম্বাট হইয়া আছে আজ ছই মাস ধরিয়া। সখীকে দেখিয়া সে-অশ্রু কি উর্খিলা সংবরণ করিতে পারিবে?

সাঁওতাল পরগণার জলহীন বাগুতটে শৈশবে যখন তাহার ছই সখীতে খেলা করিত, শুক বাগুময় নদীগর্ভ পার হইয়া ওপারে শালবন, ধানক্ষেত ও কাঁকুরে চিপি পাহাড়ে প্রজাপতির মত লঘু মন লইয়া চঞ্চল চরণে ছুটিয়া বেড়াইত, তখনকার অনাবিল ভালবাসা লোকে বলে সংসারে টিকে না। কিন্তু দৈবগুণে কিশোর বয়সে সে যখন বালাসখী জয়ন্তীরই সেবরের বধু হইয়া আসিয়া আবার এক-বাড়িতেই উঠিল তখনও সখীতে সখীতে গলাগলি ভাব ও পার্কিত স্বপ্নার মত উচ্ছল কলহাসি কিছুমাত্র কমিল না। নবান্বাদিত প্রণয়ের গল্প তাহাদের সম্বার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিয়া তুলিল। ছ-জনে ছ-জনকে সাজাইয়া তৃপ্তি পাইত না, পরদিন প্রসাধনের প্রাশংস। শুনিয়া শুনিয়া পুরাতন হইতে চাহিত না।

ভাবুর লক্ষ্যে চলিয়া গেলেন চাকরি লইয়া, কাজেই জয়ন্তীকও উর্খিলার আশ। ছাড়িতে হইল। তারপর জয়ন্তীর ছুটি ছেলেমেয়ে কেবি আর ছবি, উর্খিলার ছুটি ছেলে ঋণ ও দীর্ঘ হইয়াছে। ছেলেমেয়ে ও সংসারের ঝগটে সখীদের প্রত্যাহ দীর্ঘ পত্রবিনিময় ক্রমে মাসে একবার আসিয়া ঠাঁড়াইয়াছে, যান অভিমান ভালবাসার গল্পের স্থান ছাড়িয়াছে ছেলেমেয়ের সন্ধি কাশি হাচি। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর জন্ত ক্লান্ত ও কখন অকস্মাৎ ধামিয়া গিয়াছে; কিন্তু উর্খিলা মনের ভিতর চাহিয়া দেখিল ভালবাসার উজ্জ্বল না। থাকিলেও ষ্টান ভেমনি সজোর আছে।

আজ একদিন পরে সখী আসিবে, কিন্তু এ যে তাহার সে ষাধিসোহাগিনী গরবিনী সখী নয়, এ সর্গভাগিনী ভিখারিনী। ছই মাস হইল তাহার পাখিৰ জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ তারের আজ তাহাদের দীর্ঘ

প্রতীকার অসম্ভব হইবে। উর্খিলা কিন্তু হৃৎস্থের ভিতরেও হৃৎস্থের মধুর স্পর্শচুকুর আশা ছাড়িতে পারিতেছে না। তাহাদের ভালবাসা ত এক দিনের নয়। এই সম্পর্ক হইবার পূর্বে তাহারা দু-জনে ত শুণু পরস্পরের ছিল। জীবনে এতবড় রূপান্তরের পরেও জয়ন্তীর কঠোর ব্রহ্মচারিনী মূর্তির অন্তরালে শৈশবের সেই স্নেহ-উৎস আবার ঝুঁজিয়া পাইবে উর্খিলার মন বার-বার এই কথা বলিতেছিল।

পুরানো একটা বাগানের মাঝখানে ছোট ছইতলা বাড়ি। একতলায় রান ভাঁড়ার ফাকর-বাকর ইত্যাদির স্থান সংকুলান করিয়া বাকী আছে শুণু একটি কাজচলা-গোছের বৈকথানা। উপরের তিনখানি ঘরেই সংসারের আর সমস্ত দাবি মিটাইতে হয়। সাত বৎসর আগে পূর্ব-দক্ষিণ ছই দিক খোলা বে-বরখানিতে বড়বৌ থাকিতেন, তিনি বিদেশে চলিয়া যাইবার পরও উর্খিলা তাহা দখল করে নাই, সে আপনার পশ্চিম দিকের ঘরেই এত কাল ছিল। তবে সংসার বাড়িয়াছে, কাজেই ছেলেদের দুধের ডুলী, স্নানের গামলা, ষ্টোভ, লৈলাগাড়ী, মোলনা ইত্যাদি একে একে সেই ঘরে ভীড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মাঝের ঘরখানা ভিতর হইতে বন্ধ হয় না; কাজেই তাহা উর্খিলা পাড়ার মেয়েদের বসিবার জন্ত সাজাইয়া রাখিয়াছিল। নিজের হাতের গদি, তাকিয়া, পদ্ম, চাকা ইত্যাদিতে তাহার সৌন্দর্য্য বথ সম্ভব বাড়াইবার চেষ্টায় গৃহকর্তার বিন্দুমাত্র ক্রটি ছিল না। অতি-প্রয়োজনীয় কোনো নিত্যান্ত গদ্যময় জিনিষকে সে সহজে এ-ঘরের কিসীমানায় আসিতে দিত না। এমন কি মেহগনির বুক-কেসটাও সে পাশের ঘরেই রাখিয়া দিয়াছিল। কিন্তু জয়ন্তী যে তাহার পূর্ব নিবাসে ফিরিয়া আসিতেছে এখন আর অন্য কথা তাবিলে চলিবে না।

পরদিন সকালেই ভোলা ও মোক্ষমা মিলিয়া ঘরের জিনিষপত্র সরাইতে লাগিয়া গেল। সখীকে আপিলে যাইবার আগে গলার টাইটা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—
“পূব দিকের ঘরখানা বদলে নিলে হ’ত না? দিনরাত্তির এদিক বন্ধ থাকবে, পুয়ের আলো হাওয়া আর তোষার কপালে জুটবে না।”

উর্শিলা জয়ন্তীর খাটের উপর হইতে ছেলেদের ছোট তোবক ও ছেঁড়া লেপের বোকা সরাইতেছিল। সে বলিল—“তা হোক, আট বছর পশ্চিমের ঘরে যদি বেঁচে থাকি ত পরেও টিকে থাকব।”

মোকদ্দা বি ঘোমটার ভিতর হইতে বলিল,—“মা, গরম কাপড়ের বাল্কাটাগুলো এই ঘরেই থাক না ; ও ত আর রাত-দিন নাড়ানাড়ি হবে না। তোমার ঘরে রাখলে মিথো ঘর-জোড়া হয়ে থাকবে।”

উর্শিলা বিরক্ত মুখে বলিল—“দেখ্, তিনি বাড়ির বড়-বোঁ, আমার চেয়ে তাঁর মান বেশী, সর্বদা একথা বুঝে চলি।”

উর্শিলার সাধের ডুইং-কম অসংখ্য জিনিষে বোঝাই হইয়া উঠিল। দক্ষিণের বারান্দায় দুই দিকে পরদা দিয়া কয়েকটা চেয়ার ও টেবিল গোল করিয়া আপাততঃ সেইখানেই সাজাইয়া রাখা হইল। শয়ীজ বসিয়াছে, পরে বারান্দায় কাচ লাগাইয়া দিলে দামী জিনিষপত্রও অনায়াসে রাখা চলিবে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে জয়ন্তীর গাড়ী আসিয়া বাগানের দুই সারি নারিকেল গাছের ভিতর ঢুকিল। উর্শিলা ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল ছেলেমেয়েদের কোলে তুলিয়া লইতে। সাত ও পাঁচ বছরের ছবি ও কেবি দুইটি আথকোটা গোলাপের মত মুখ জানালার কাছে বাড়াইয়া বসিয়াছিল। এ-ঘরবাড়ি সবই তাহাদের অজানা, তাহাদের বড় বড় চোখে বিষয়ের সীমা ছিল না। উর্শিলা দুই হাতে দুই জনকে জড়াইয়া ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল। জয়ন্তীর দিকে তাকাইয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া প্রণাম করিয়া দেখিল শুভ্র অবগুণ্ঠনে জয়ন্তীর মুখ চাঞ্চা, চোখের পাতা পর্যন্ত দেখা যায় না। উর্শিলা বুকিতে পারিতেছিল না, সাহস করিয়া তাহার হাতখানা ধরিবে কি-না। কত দিনের পর দিন যে হাতে হাত দিয়া অক্লান্ত আনন্দের স্রোতে তাহার ভাসিয়াছে, এ যেন সেই চিরপরিচিত স্নেহস্পর্শমাখা হাত নর। একটা মানুষ সংসার হইতে বিদায় লইয়াছে, তাহাতে আর একটা মানুষ যে এমন আগাগোড়া বদলাইয়া বাইতে পারে কে জানিত? উর্শিলা ভীতভাবে বলিল,—“দিদি,

মুখ তুলে চাও। আমাদের দিকে কি তাকাবে না?” জয়ন্তী মুখের ঘোমটা সরাইয়া উর্শিলার মুখের দিকে চাহিল। উর্শিলা কখন প্রশ্নাম করিয়াছে, এতক্ষণে জয়ন্তী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শিরশ্চূষন করিল। টপ্, টপ্, করিয়া দুই কোঁটা জল উর্শিলার কপালের উপর পড়িল।

কিন্তু শুধু হাত দু-খানা নয়, এ সমস্ত মানুষটাই যেন নূতন। আট বৎসর আগে যে ক্ষীণকায়া কিশোরী বধু বাল্যলীলার মাঝখানেই সবে যৌবন স্বপ্ন দেখিতে হুক করিয়াছিল তাহার কৈশোর যেন আজ ইতিহাসের কথা। ঝিল্লকের বকের মত কোমল গোলাপী রঙের মুখখানি আজ প্রখর যৌবন দীপ্তিতে জল্ জল্ করিতেছে, যেন বিজলী প্রদীপের উপরের শুভ্র কাচের ফাটস। ক্ষীণ দেহ নিটোল হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, কোথাও এতটুকু অপূর্ণতা নাই। বিগত দিনের সে আনন্দ-উজ্জ্বল চপল চোখের দৃষ্টি বেদনায় গভীর হইয়া উঠিয়াছে। অশ্রুজলে খুইয়া আঁখিপল্লব ঘনকন্ধ্য কাজলের মত দেখায়, চোখের কোণের চিত্তরেখাগুলি চোখ হটিকে যেন আরও আয়ত করিয়া তুলিয়াছে। মর্ম্মরশ্মির রেখাহীন ললাটের উপর অন্ধকার-সমুদ্রের চেউয়ের মত ঘনকুঞ্চিত কালো চুল। পশ্চিমে থাকিয়া লম্বাভেও যেন সে মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। কে বলিবে ব্রাহ্মণের বরের হুম্মরী বধু জয়ন্তী এ, এ যেন লক্ষ্মীএর কোন্ নবাবের বেগম রঙীন পেশোয়াজ, জরির কাঁচুলি, আলম্যানি ওড়না ও হুম্মা আন্তর মেহেদির রং ছাড়িয়া অকস্মাৎ বাঙালীর বিধবা সাজিয়া আসিয়াছে। আধুনিক উপমা দিলে বলিতে হয় র্যালা-বাটারের ভিনাস মূর্ছির ভিতর কে যেন বিছাতের আলো জালিয়া দিয়া উপরে শুভ্র ওড়না জড়াইয়া দিয়াছে। বেশ-পরিবর্তনের সময় বাঁ-হাতের বড় নীলার আংটিটা কেবল সে খুলিতে তুলিয়া গিয়াছিল। বিধবা বড়বোঁয়ের অঙ্গে একমাত্র অলঙ্কার ঐটি। ছেলেপিলের মা, কিন্তু ভব্ গলার একছড়া সূর্য হারও নাই। সাদা সেমিঝের উপর ক্রাসডাল্লার সাদা মুতি পরিয়া সে যখন বাড়ির বারান্দায় নামিয়া পাড়াইল, সমস্ত বাড়িটা যেন তাহার রূপে আলো হইয়া উঠিল।

মাঝখানে কে না বাইতেই জয়ন্তী তাহার গাড়ীখোর

খোলসটা ফেলিয়া দিল। উশ্মিলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সমস্ত দিন হাসিমুখে কাটানোই তাহার আজন্মের অভ্যাস, জয়ন্তীর ভয়ে এই ক'দিন সে একবারও হাসে নাই। চিরকালের অনেক অভ্যাস তাহার ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। বিকালবেলা চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া রচীন শাড়ী ও কক্করের টিপ পরা তাহার অনেক দিনের সপ্নের অভ্যাস। কিন্তু জয়ন্তী আসিয়া পর্যন্ত সকালের মোটা কাপড়েরই সে নারী দিন কাটাইতেছে। জয়ন্তী বলিল—“হ্যাঁ রে উশ্মি, চুল বাঁধা নেই, কাপড় ছাড়া নেই, এই বরষে ওকি সং হয়ে উঠেছিল?”

উশ্মিলা বলিল—“তোমার ভাই এত রূপ, তুমি অমনি যোগিনী হয়ে থাকবে আর আমি কি বলে পেচামুখের দাবার বাহার করে বেড়াব?”

জয়ন্তী তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—“আ গেল না, আমাতে আর তোতে! আমার পোড়া রূপে ত এখন বড়ো ছেলে দিলেই সব শাস্তি হয়। তোকে তাই বলে অমনি ধাওড়ের মত ঘুরতে দিলাম আর কি? যা লাগির কিত কঁটা নিয়ে আর, আসি দেখে দিচ্ছি চুল।”

জয়ন্তী নিজহাতে উশ্মিলাকে সাজাইয়া গুছাইয়া কপালে কক্করের টিপ দিয়া দিল। উশ্মিলা হাসিয়া বলিল—“তোমার মতন এমন করে সাজাতে চুল বাঁধতে আমি আর কউকে দেখিনি ভাই। ভগবান কি-না তোমারই সাজায় বাদ মাখলেন। তোমার ছুটি হাতে ধরি ভাই এমন কালো বেশমের মত চুলগুলোর অবত্ব করো না, আমি একটু গেঁথে দি। দেখে আমার চোখ ছটো সার্থক হোক, তাতে ত কোনো পাপ নেই।”

জয়ন্তী হাসিয়া মাথার কাপড়টা খুলিয়া দিল, কিন্তু কথার কোনো জবাব দিল না। উশ্মিলা সেই সুদীর্ঘ কালো চুলে অনভ্যস্ত হাতে বথাসাধা পরিপাটি করিয়া বেণী বাধিয়া বাড়ের কাছে শিথিল কবরী ছলাইয়া দিল। বাগান হইতে চারিটি রজনীগন্ধা ফুল আনিয়া ধোঁপায় গুঁজিয়া দিতেই জয়ন্তী “দূর লক্ষ্মীছাড়ী” বলিয়া তাহার পিঠে একটা প্রচণ্ড চড় দিল। উশ্মিলা তাহার-ই হাত ধরিয়া বলিল—“হার আর ধর, ফুল কিন্তু ফেলুতে দেব না। পরন্তীর মত রূপে সাধা ফুল কেমন দেখায় জান না ত?”

শমীজ্ঞ আপিসের কাজ সারিয়া সবে বাড়ি ফিরিতেছিল। ঘরে পা দিয়াই এমন প্রসাধনের ঘট দেখিয়া বলিল—“বাবা, কার মন ভোলাতে তোমাদের এত সাজসজ্জা লেগে গেছে?”

জয়ন্তী বলিল—“কার আবার? তুমি খেটেখুটে আপিস থেকে এসে দেখবে বৌ রান্নাঘরের কালী মেখে বেড়াচ্ছে, তাই তোমার হৃন্দরী বৌকে একটু সাজিয়ে দিচ্ছিলাম। সাহেবদের হাড়িমুপের পর এই হৃন্দর মুখখানা কেমন লাগছে?”

উশ্মিলা অত্যন্ত আপত্তি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—“আহা হৃন্দরী না বান্দরী! দিদি যেন কি? হ্যাঁগা, সত্যি করে বল দেখি, দিদি আবার চেয়ে হাজারগুণে হৃন্দরী নয়! চুলটা একটু বেঁধে দিতেই যেন হচ্ছে যেন নুরজাহান বেগম।”

শমীজ্ঞ একটু হাসিয়া বলিল, “ও-সব তুলনামূলক সমালোচনা করবার আমার সাহস নেই বাপু! শেখকালে কোন্ ব্রাহ্মণীর কোপানলে পড়ব কে জানে?”

মুখে বাহাই বলুক শমীজ্ঞের সপ্রশংস রূপমুগ্ধদৃষ্টি জয়ন্তীর মুখের উপর চকিতের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বধু-বেশে জয়ন্তীকে প্রতিদিনই সে দেখিয়াছে, কিন্তু জয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গে যে এমন অশিশিখর মত রূপ বিস্কুরিত হইয়া পড়ে তাহা ত সে কোনো দিন দেখে নাই। রাত্রে উশ্মিলাকে শমীজ্ঞ বলিল—“বৌদি ছেলেবেলা ত এত হৃন্দর ছিল না। বিধবা হয়ে সত্যিই রূপ হয়েছে যেন নুরজাহান বেগম। কিন্তু বেচারীর ভাগালিপি বিধাতা এমন লিখলেন যে কেন?”

পরের দিন বিকালে চুল বাঁধবার সময় উশ্মিলা জয়ন্তীর হাত হুথান। ধরিয়া বলিল—“অমি ত ভাই ঘরের লোক, আমার কাছে ভয় করবার কিছু নেই। এমন হাত হুথানায় হু-গাছা চুড়ি পরলে কি হয়? পর না ভাই লক্ষ্মীটি, কে আর দেখতে আসছে?”

জয়ন্তী বলিল—“হাজার লোকের হাআর কথা শুনতে হবে ত? হু-গাছা চুড়ির জন্তে অত সুইতে পারব না।”

উশ্মিলা বলিল—“আর কোন লোক কিছু বলবে না। শুধু তোমার দেওর বলবে। কাল বলছিল নুরজাহান

বেগম; এর পর উর্ধ্বশী কি তিলোত্তমা কিছু একটা বলবে। চল না একবার তাকে দেখিয়ে আনি।”

জয়ন্তী তাহার গালে একটা চড় দিয়া বলিল, “চূপ কর পেড়ারমুখী, বিংবা মানুষের ওসব ঠাট্টাতামাসা শুন্তে নেই।”

উর্ধ্বশী কিছু বলিল না, শুধু নিজের হাত হইতে দুইগাছা চুড়ি খুলিয়া জয়ন্তীকে পরাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া শেষে উর্ধ্বশীর হাত ধরিয়া টানিয়া জয়ন্তী বলিল, “একটা জিনিষ দেখবি আর।”

আপনার ঘরে গিয়া একটা মোড়ার উপর বসিয়া বড় ষ্টিল টাকটা খুলিতে খুলিতে জয়ন্তী বলিল, “গত বছর ঠর পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়ছিল, আর ছেল-মেয়েছটো একটু বড় হয়েছে বলে দাইটাকে জবাব দিয়েছিলাম। আগে মোটে কিছু বাচাতে পরতাম না সংসারের প্রস থেকে। গত বছর তাই সাত শ’ টাকা বাচিয়েছিলাম। ছেলবেলা ত দেখছি দুই ভাই, ভাল গয়না শাড়ী কখনও পরিনি। কিন্তু মনে মনে সখটা চিরকালই ছিল। মনে করেছিলাম এর পর ফি-বছরে কিছু কিছু করাব।”

জয়ন্তী বাস্তবের ডালটা তুলিয়া পাতলা কাপড় জড়ানো একটা পুলিন্দা এবং ছোট একটা পিতলের চৌকে কোটা বাহির করিল। পাতলা কাপড়খানা সরাইয়া বাহির করিল ঘননীল রেশমের উপর ছোট ছোট জরির চৌখুপি করা একখানি শাড়ী, আর লাল ও সোনালী রেশমে টানা-পড়েন দেওয়া ঝলঝলে একখানা সোনারসী, শাড়ীটা নাড়িতে চাড়িতে দুইদিক হইতে দুইটা রং ঠিকরিয়া পড়।

উর্ধ্বশী হাতে করিয়া সমস্ত কাপড় দুখানা তুলিয়া মুখ দুটিতে চাহিয়া বলিল, “বাঃ কিঃ চমৎকার!” জয়ন্তী বলিল “দুশো টাকা দিয়ে দুখানা কিঃ নেছিলাম, কিন্তু একদিনও পরিনি।”

উর্ধ্বশীর মুখে উত্তর যোগাইল না। খানিক ভাবিয়া বলিল, “বড় হয়ে ছবি পরবে এখন। মার কাপড় ত মেয়েই পর।”

জয়ন্তী বলিল, “তাই ত বেধে দিলাম। নইলে কখনই ঘেঁষিন কাপড়ের পাড় হিঁফে খান পরিয়ে দিলে সেদিন

ইচ্ছা করছিল সবগুলো আঙনের মধ্যে ফেলে দি মাশ্বাণ্ডী বলেছিলেন চুলগুলোও কেটে ফেলতে।”

উর্ধ্বশী নীরবে পিতলের কোটাটা নাড়িতে লাগিল। জয়ন্তী খুলিয়া দেখাইল দশগাছা মুক্তা-বসানো চুড়ি। “চার-শ’ টাকা দিয়ে গড়িয়েছিলাম। প্রত্যেকটি মুক্তা সমান দেখেছিলাম।”

উর্ধ্বশী বলিল, “হ্যাঁ, চমৎকার, এমন মিটোল যেন জলে টলটল করছে।”

জয়ন্তী বলিল, “আমার চোখের জলের ফোঁটা। সাকরাবাড়ি থেকে চুড়িগুলো যখন এল তরকারি কুটছিল। উনি পরিয়ে দিতে চাইলেন তখন পরিনি। তারপর সেই বে অস্থে পড়লেন আর ওকথা ভাববারও সময় রইল না। এখন এগুলো দেখলে চোখ জাল করে।”

জয়ন্তী চুড়িগুলি নীল কাগজে জড়াইয়া কোটার বন্ধ করিয়া রাখিল। উর্ধ্বশী আর একবার বলিল, “তোমার মেয়ে রয়েছে, হুং কি ভাই? মেয়েকে পরিয়ে সাব মিটিও।” জয়ন্তী ঝবৎ করিয়া বাস্কাটা বন্ধ করিয়া দিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ দির মুক্তার মত জলবিদু গড়াইয়া পড়িল।

শমীন্দ্র ও উর্ধ্বশী অল্প পাড়ার বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। বাঙালীর বাড়ির ব্যাপার, খাওয়া-দাওয়া সারিতেই রাত বারোটা বাজিয়া গিয়াছিল, ফিরিতে ফিরিতে প্রায় একটা হইল। বাড়িতে টুকিবার পথে বাগানের নারিকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়া জয়ন্তীর ঘরের আলো দেখা যাইতেছিল। উর্ধ্বশী বিস্মিত হইয়া বলিল, “বাঃ, এত রাত্রে দিদির ঘরে আলো কেন? ছেলপিলের অস্থ-বস্থ হ’ল না কি?”

দু-জনে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিল। ঘরের ভিতর হাটা-চলার শব্দ স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছিল।

শমীন্দ্র বলিল, “দেখ না ঘরে গিয়ে কি হয়েছে।”

উর্ধ্বশী দরজার কাছে গিয়া দেখিল দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। সে কি ভাবিয়া খড়খড়ির একটা পাখী তুলিয়া ধরিল। বিশ্রয়ে তাহার চোখ ঠিকরাইয়া পড়িতে

ছিল। সে দেখিল জয়ন্তী তাহার বাক্স-প্যাটর। সমস্ত খুলিয়া ঘরঘর ছড়াইয়াছে, নানা রকম রঙের হুন্দর কাপড় ও গহনা বিছানার উপর ছড়ান। জয়ন্তী নিজে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পরণে সেই জরির চৌখুপি বননীর রেশমের শাড়ী, দুই হাতে দশ গাছ। মুক্তার চুড়ি, গলায় বিবাহের সাতলহরী। সখা অবস্থায় ছোটখাট আর বা দুই-চারিটা অলঙ্কার সে পরিত, সমস্তই আজ আবার পরিয়াছে। মুম্বিম্বয়ে সে নিজের প্রতিবিশ্বের দিক তাকাইয়া আছে, তাহার অধরে স্মিতহাস্তের পিছনে বেদনার রেখা ফুটিয়াছে।

শমীন্দ্র বলিল, “কি হয়েছে? একেবারে যে জমে গেলে! নড়ছ না কেন, পায়ে কি শিকড় গজিয়েছে?”

উষ্ণিলা চোখ ফিরাইয়া স্বামীকে ইসারা করিয়া ডাকিল, “দেখ বাও।” শমীন্দ্র দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিল। কিন্তু শমীন্দ্রর গলার আওয়াজ পাইয়াই জয়ন্তী খুঁট করিয়া ঘরের বাতি মিলাইয়া দিল।

শমীন্দ্র ও উষ্ণিলা নিজেদের ঘরে চলিয়া গেল।

উষ্ণিলা গায়ের গহনাগুলো খুলিয়া খুলিয়া ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে বলিল, “কি ব্যাপার বল ত! কিছু বুঝতে পারছি না। ছপুর রাত্রে গয়না কাপড় প’রে আয়নার সামনে এত সাজগোজ করবার মানে কি?”

শমীন্দ্র বলিল, “যানোটা ঠিক বুঝতে পারছি না আমিও। কিন্তু রূপ যদি কাকুর থাকে ত সে তোমার দিদির। অম্পরীরা কি এর চেয়েও হুন্দরী হয়?”

উষ্ণিলা স্বামীকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, “অম্পরীদের নজর ত আমার কারবার নেই, কি ক’রে বলব বল! তবে তুমি ত দেখছি একেবারে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ।”

শমীন্দ্র তাহার নাকের ডগাটা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, “তাই বুঝি ভয়ে এক সেকেণ্ডের বেশী দেখতে দিলে না।”

উষ্ণিলা বলিল, “বাহ’, দিদিই ত আলো নিবিড় দিলে। বাই বল, দিদি কিন্তু বড় অসুস্থ মায়াব। স্বামীর নাম শুনুলই তার দু-তোখ জলে ভরে ওঠে অথচ এই সামান্ত গয়না কাপড়গুলোর ওপর কি ক’রে ওর এত

লোভ? কাল আমাকে নতুন কাপড় গয়নাগুলো

দেখাছিল, বলল যে একদিনও সেগুলো পরনি। হয়ত খুব পরতে ইচ্ছে করে তাই লুকিয়ে প’রে। কি ক’রে পারল কে জানে?”

শমীন্দ্র বলিল, “কেন, তোমার সুখ-দিদি ত সর্বদা এক-গা গয়না প’রে বেড়ান। তাঁর কি শোক নেই বলতে চাও?”

উষ্ণিলা স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—“ছিঃ, কি বে তুমি? বা মুখে আসবে তাই বলবে। স্ত্রীদি এয়োস্ত্রী গাহ্ম, ভগবান ছেলেপিলে কেড়ে নিয়েছেন, কি করবে বল?”

শমীন্দ্র বলিল—“স্বামীকে কি তোমরা সন্তানের চেয়ে বেশী ভালবাস?”

উষ্ণিলা হাসিয়া বলিল—“তোমার বুঝি শোনবার সব হয়েছে? তা যতই বড়শি ফেল, তোমাকে বাবু রুণু দীহুর চাইতে বেশী ভালবাসতে পারব না। কিন্তু তবুও ত স্বামীই স্ত্রীলোকের সব।”

শমীন্দ্র উষ্ণিলার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—“উঃ কি নিদারুণ যুক্তি!”

শমীন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িলেও উষ্ণিলার চোখে ঘুম আসিল না। সারারাত্রিই তাহার জয়ন্তীর কথা ভাবিয়া কাটিয়া গেল। জয়ন্তীকে কোন্ হুন্দর শৈশব হইতে সে চেনে। তাহাকে ত এমন মনে হয় নাই। সে হিন্দুঘরের মেয়ে, আজন্ম হিন্দুঘরের মত চালচলনে অভ্যস্ত; তারপর বিবাহের পর স্বামীকেও ত সে কম ভালবাসিত না। তাহার মনে পড়ে জয়ন্তীর বিবাহের পর উষ্ণিলা জয়ন্তীর স্বামীর উপর কি বিধম চটা ছিল। কতদিন দুই সপ্তিতে এই লইয়া তুমুল কলহ হইয়া বাইত। কিশোরী উষ্ণিলা বলিত—“ওঃ ভারি ত তোমার দু-দেবের বর, তার জন্তে চিরকালের বন্ধুকেও ভুলে গেলে। দু-দুই কথা বলবার সময় পাও না।” জয়ন্তী বিশ্বের মত হাসিয়া উষ্ণিলাকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু দুই-দশ মিনিট পরেই ছল করিয়া স্বামীর সন্ধানে পলায়ন করিত। আর এতদিন পরেই বা কোন কম ছিল? এই ত আট বৎসরের মধ্যে উষ্ণিলা

কতবার লিখিয়াছে একবারটি তাহার কাছে আসিতে, কিন্তু জয়ন্তীর এক জবাব—না ভাই, ওক একলা ফেলে যেতে পারব না।' বাপের বাড়িও এত দিনের ভিতর মাত্র একবার গিয়াছিল। আজকালকার সাহেবী চালে বিধবাও সখবার মত সাজসজ্জা করিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু তাই যদি হইবে তবে সে সর্বদা ধুতি পাড়ের কাপড়ও পরে না কেন একথানা? সামান্য ঠাট্টা-তামাসাতেও চট্টয়া অস্থির হয় কেন? এ এক হৈয়ালী।

উখিলা সকালবেলাই জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ ভাই, তোমার কাছে বড়াকুরের ছবি নেই?” জয়ন্তী বিস্মিত হইয়া বলিল—“থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই আছে।”

উখিলা বলিল—“কই দাও না দেখি একথানা, বড় ক'রে বাধিয়ে আনব। তোমার ঘরে টাঙিয়ে রাখবে এখন।”

জয়ন্তী কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—“কি হবে আর ঘরে টাঙিয়ে, ওসব আমার ভাল লাগবে না।”

উখিলা এরকম উত্তর মোটেই আশা করে নাই, সে একেবারেই হতভম্ব হইয়া গেল। কোন কথা ন বলিয়া সেখান হইতে পলাইল। তাহার বুদ্ধিতে কুলাইতেছিল না। জয়ন্তীর হইল কি? গভীর রাত্রে নির্জন গৃহে বাসক সজ্জার মত সাজসজ্জা আবার স্বামীর ছবির প্রতি এমন ঔদাসীন্ধ্য! এই সব হুই-তিন মাস বিধবা হইয়াছে, এখনও সিঁধির সিঁধরের চিহ্ন, হাতের লোহার কলঙ্ক মিলাইয়া যায় নাই বলিলেই চলে, ইহারই মধ্যে কি সে স্বামীকে এমন করিয়া ভুলিতে চাহে যে তাহার একটা ছবিও ঘরে রাখিবে না? কি জানি? মানুষ হয়ত মানুষকে কোনোদিনই চিনিবে না। বিবাত্তা প্রতি মানুষের মনের সম্মুখে যে পর্দা ঝুলাইয়া দিয়াছেন গভীর প্রীতির অন্তর্গত তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ভ্রম গেল তাহাও মিথ্যা। জয়ন্তীকে সে ভুল বুঝিয়াছে। এই সদাশ্রদ্ধাচারিণীর মন চঞ্চল হইয়াছে। কি জানি কবে সে আবার কি করিয়া বলিবে? বেদনায় উখিলার বুকের ভিতরটা টুন্ টুন্ করিয়া উঠিল। জয়ন্তীকে সে আশা প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাকে যদি

কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে তবে তাহা দেখিবার আগে উখিলার মরণই মঙ্গল। উখিলা ছেনেমাছুরের মত মনে মনে যত জাগ্রত দেবতার নিকট মানসিক করিতে লাগিল, “ঠাকুর, ইহার শুভমতি দাও, আমি ষোড়শোপচারে তোমার পূজা দিব।”

জয়ন্তীকে চোখে চোখে রাখাই উখিলার কাজ হইয়া উঠিল। তাহার চালচলনে বিশেষ যে কোনো পরিবর্তন ধরা যায় তাহা নয়। আগেরই মতন নিজের ও উখিলার ছেলেমেয়েদের সেবাবদ্ধে তাহার দিন কাটিয়া যায়। বিকালে শমীন্দ্র আসিলে তাহাকে আদরবদ্ধ করিয়া খাওয়ানো, তাহার সহিত হাসিগল্প করা, ইহাও তাহার নিত্য কণ্ঠপদ্ধতির ভিতর। এই বৈধিকে উখিলাও প্রত্যহই যোগ দেয়। কিন্তু এক একদিন গল্প বখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, শমীন্দ্রের কথায় জয়ন্তী হাসিয়া বুটাইয়া পড়িতেছে তখন উখিলা অকস্মাৎ ভীষণ গভীর হইয়া উঠে। আনন্দ-সঙ্গীতের তাল কাটিয়া যায়, শমীন্দ্র অন্য কথা পাড়িয়া আবার গল্প কাঁদিতে চেষ্টা করে। উখিলা রাগ করিয়া বল—“বুড়ে বরসে সুরক্ষণ হা হা তিহি আমার ভাল লাগে না।” জয়ন্তী হয়ত বলে—“চল ভাইউখি আমার বাগানের গাছে জল দিই গে।” বাগানের গাছে জল পড়ে বটে, কিন্তু ছই সখীর এক জনেরও মুখ কোটে না। তাহারা আগাগোড়াই নীরবে কাজ করিয়া আবার নীরবে আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যায়। জয়ন্তী সাজি ভরিয়া দুল তুলিয়া অদেক উখিলাকে দেয় অদেক নিজে রাখে। উখিলা হাত পাতিয়া দুল গ্রহণ করে বটে, কিন্তু আগের মত সে মিষ্ট হাসির পুরস্কার দিতে পারে না। তাহাদের ছই জনের মাঝখানে যে অকুরন্ত হাসি ও কথার স্রোত এতদিন বহিতেছিল, পরস্পরের চোখে চোখ পড়িতেই বিভ্রাৎপ্রবাহের মত বাহা গতিশীল হইয়া উঠিত, আজ তাহার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পাথরের মত বাধা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিছুতেই তাহাকে ছই সখী অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। জয়ন্তীও সেই রাত্রি হইতে উখিলার মনের নূতন ধারা চিনিয়া লইয়াছে, কাজেই সে ও কোনো কথা পাড়িতে সাহস করে না।

গভীর রাত্রে উখিলার খুম ভাঙিয়া যায়, কতদিন সে তজ্রালস চক্রে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া শুনিয়াছে জয়ন্তীর

ঘর হইতে খুঁটখাট আওয়াজ আসিতেছে। একবার আসা আসল আবার নিবিয়া যায়। অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া ছই-এক দিন সে দেখিয়া আসিয়াছে জয়ন্তী আপনার দেবদুল্লভ রূপকে প্রসাধনে অপরূপ করিয়া তুলিতেছে, তাহার বিপুল কবরীতে পুষ্পমালা, বর্ণান্নাত তরুর মত তাহার সতেজ ফুলের দেহাটী বেড়িয়া বিচিত্র বর্ণের সুরভিত শাড়ী। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার উপায় ছিল না, ঘরের আলো নিমেষে নিবিয়া গাইত। নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া শমীন্দ্রের ঘুম ভাঙাইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িতে হইত; কারণ এই লুকাইয়া দেখাশোনার ব্যাপার শমীন্দ্র মোটেই ভালবাসিত না। উন্মিল্লা কিছু বলিতে গেলেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিত।

তবু একদিন সাহস করিয়া উন্মিল্লা বলিল, “দেখ, দিদির মতিগতি ভাল ব’লে বোধ হচ্ছে না। এর একটা উপায় ত করতে হবে। শেখকালে কোথা থেকে কোথায় গড়াবে কে বলতে পারে? তার চাইতে বরং একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা ভাল।”

শমীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, “কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই। তোমার সম্পর্কে বড়, বয়সে বড় তাও কি ভুলে গেলে? ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ের মা সে, সেটাও ত ভাবতে হবে। গোয়েন্দাগিরি রেখে রাজে ঘুমের দিকে ঘন দিও ত। আমি না-হয় ওর অন্ত্র খাবার ব্যবস্থা করব।”

উন্মিল্লা বলিল, “অত আর দরদ দেখাতে হবে না তোমাকে। আমার চেয়েও কি তুমি ওর বেশী হিতৈষী নাকি?”

কথাটা বলিয়াই উন্মিল্লার মনে হইল কি জানি হয়ত হাজার ভিতরও কিছু অর্থ আছে। হয়ত শমীন্দ্রই জয়ন্তীকে এখন বেশী ভালবাসে। যে-শমীন্দ্রের মন তাহার নিকট কাচের মত স্বচ্ছ ছিল সেও কি মনের গহনে কোনো অন্তরাল রচনা করিতে শুরু করিয়াছে? সংসারে সকল অসম্ভবই সম্ভব হয়। জয়ন্তীর ভুবনমোহন সৌন্দর্য্যে শমীন্দ্রের আকর্ষণিত হওয়া কি এতই অসম্ভব? একথা কল্পনা করিতেও উন্মিল্লার মস্তিষ্কের শিরশূল হিঁড়িয়া আসিতেছিল, শুণ্ডপিণ্ডের গতি যেন থামিয়া গাইতে-

ছিল। তবু তাহার মনে হইল, কি জানি নাটকে-নভেলে এতদিন বাহা পড়িয়া নানা মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, আজ হয়ত তাহার দুরদৃষ্টে তাহাই জীবন্তরূপে দেখা দিল। যে স্বামীীর প্রেম তাহার কাছে নিঃশ্বাস-বায়ুর মত সহজ সত্য ও প্রয়োজনীয় ছিল তাহার সম্বন্ধে এমন সন্দেহ যে সে কোনোদিন করিতে পারিবে, একথাই সে ইতিপূর্বে কখনও ভাবে নাই। আবার অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, সংসারে এত মাহুয় থাকিতে জয়ন্তীই নায়িকার ভূমিকায় দেখা দিল। ঘরিরার দিন একমাত্র বাহার হাতে ধন মান সকল সঁপিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিবে এতদিন ভাবিয়া আসিয়াছিল, সেই কি-না বাচিয়া থাকিতেই সকলের আগে তাহার সকল ধন মান হরণ করিতে বলিল। না, না, উন্মিল্লা কিছুতেই এ-সন্দেহকে মনে স্থান দিবে না। একি? সে কি পাগল হইতে বসিয়াছে যে এমন সব অসম্ভব স্বপ্নকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছে। একথা লইয়া শমীন্দ্রের সহিত আর কোনো কথা তুলিবে না ভাবিয়া উন্মিল্লা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। একটু আগে আশ্বিনের পাগল। ঝোড়ো বাতাস বাগানের সারি সারি নারিকেল গাছের পাতার খুঁটি প্রচণ্ড বেগে নাড়িয়া ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করিতে করিতে নীরব হইয়া গিয়াছে। ঘন ধূলার অবগুণ্ঠন থসিয়া নিম্নল নীল আকাশ দেখা দিয়াছে। উন্মিল্লা জানালা দিয়া পথের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন প্রচণ্ড ঝড়ের সময় শমীন্দ্র না-জানি কোথায় ছিল! এখনও ত তাহার দেখা নাই। উন্মিল্লার ব্যাকুল মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বাড়ি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ জয়ন্তীর জানালা দিয়া এক ঝলক বৈহতিক আলো বাগানের পথের উপর পড়িল। উন্মিল্লা সেদিকে চাহিয়া দেখিতে না দেখিতে আলোটা নিবিয়া গেল। কিন্তু কার যেন মুহূ গলার আওয়াজ। কে যেন ঘরের ভিতর কথা কহিতেছে। উন্মিল্লা কান পাতিয়া শুনিল, জয়ন্তীর গলারই ত স্বর। এত রাজে কাহার সহিত সে কথা কহিতেছে? ছেলেরা ত কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এত ছেলেভুলানো কথা নয়। উন্মিল্লা আপনার ঘর

ছাড়িয়া যাওয়ার পরের শেষ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।
ঐ ত জয়ন্তীর সুস্পষ্ট সানন্দ কণ্ঠের বীণার মূহুঃ শব্দবরের মত
শোনা যাইতেছে। জয়ন্তী বলিতেছে, “এক কাছ
তুমি রয়েছ তবু তোমাকে তেমন করে কাছে পাবার ত
যো নেই। সব জায়গাতেই যে নিষেধ। সেই রাত্রির
গভীর অন্ধকারে ছাড়া তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলবার
যো নেই। কিন্তু তোমার কাছে মনের সব কথা না বলে
আমি কি বাচতে পারি?” জয়ন্তীর কণ্ঠের অশ্রুতে
কঁদু হইয়া আসিল। উখিলা শিহরিয়া উঠিল। কে
সে যে এত কাছে থাকিয়াও কাছে নাই। উখিলা আর
ভাবিতে পারে না। আর সে শুনিতে চাহে না কোনো
কথা।

আবার জয়ন্তীর কণ্ঠেরে আনন্দ জাগিয়া উঠিল, “তুমি
না বলছিলে নীল শাড়ী আর মুক্তার চুড়িতে আমাকে
অপ্সরীর মত দেখায়, এখন দেখ দিকি এই আঙন রঙের
শাড়ী আর লাল ছল ছুটিতে কেমন মানিয়েছে? না, তুমি
দেখবে না, কথা বলবে না? কেন কিসের ভয় এত?”

কিসের ভয় তাহা উখিলা জানে। কথা कहিলেই
ত উখিলা চিনিয়া ফেলিবে তাহার সেই চিরপরিচিত
কণ্ঠের। না কথা কহে ত ভালই, সন্দেহ এমন পরিপূর্ণ
রূপে সত্যে পরিণত হইলে উখিলা বাচিবে কি লইয়া?
উখিলা ঘরে ফিরিয়া যাইতে গেল, কিন্তু তাহার পা নড়িল
না। সে শুনিল জয়ন্তী আবার বলিতেছে, “দিনের বেলা
মানুষ জগতের যে নিয়ম আমাকে পালন করায়, তা
আমাকে মেনে চলেতেই হয়। কিন্তু সে যে কত বড় মিথ্যা
তা আমি জানি আর তুমি জান। তাই রাজে আমার
এসবার আমি নিজের মত করে সত্যরূপে গড়ে তুলি।
তুমি যে মনুর হাতিতে ঘর আলো করে তোলা ওতেই
আমার সকল দুঃখবেদনা ধুই হয়ে ওঠে।”

উখিলা ছুটিয়া গেল জয়ন্তীর দরজার কাছে, দরজা
খাড়া দিয়া সে দেখিবে কার এত মনুর হাতি। কিন্তু তাহার
সদয়ে শিকার বলিল। একাজ সে কি করিয়া করিবে?
অবশেষে কাঁদিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুটাইয়া পড়িল।
কতকণ বে সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়াছিল মনে নাই।
চোখ তুলিয়া এখন চাহিল দেখিল সমুখে দাঁড়াইয়া শমীজ।

শমীজ তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, “কি হয়েছে
উখি, কাঁদছ কেন?”

উখিলা চোখের অশ্রু মুছিয়া বলিল, “তোমাকেও
তা বলে দিতে হবে? তুমি এত বড় দুঃখ আমাকে দেবার
আগে কেন আমার এখান থেকে বিদায় দিলে না? আমি
অনায়াসে চলে যেতাম, কোনো কথা বলতাম না। স্বামী
হয়ে আমার এ মর্যাদাটুকু তুমি রাখতে পারলে না?
শমীজের চোখমুখ আগুনের মত লাল হইয়া উঠিল। সে
বলিল, “উখিলা, তুমি কি বলছ তা তোমার হাঁস আছে
কি? তুমি পাগল?”

উখিলা বলিল, “হ্যাঁ, পাগল ত আমাকে এখন হতেই
হবে। আমি নিজের কানে সব শুনেছি তোমাদের
কথা।”

শমীজ গজিয়া উঠিল, “আমাকে কি কথা তুমি বলতে
শুনেছ, যা তোমার সামনে আমি না বলতে পারি?”

উখিলা বলিল, “তোমাকে বলতে শুনব কেন? তুমি
যে কত বড় বুদ্ধিমান তাকি আমি জানি না। যে পাগল
হয়ে বুদ্ধিগুণি হারিয়েছে একেবারে তাকেই বলতে
শুনেছি।”

শমীজ গানের চাদের জামা রাখিয়া শয়নের আয়োজন
করিতে যাইতেছিল, উখিলার কথায় খর ছাড়িয়া ছিটকাইয়া
বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার রাত্রিতে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া
সে বাহির হইয়া গেল কিনা উখিলা তাহাও দেখিল
না। আসিবার সময় শমীজ নিঃশব্দে ঘরের দরজা
বন্ধ করিয়াছিল, বাইবার বেলা কত পবনের মত বেগে
দুঃপাশে দুইটা দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।
সমস্ত বাড়িটা ঘন কপিয়া উঠিল। জয়ন্তী ভীতস্রস্ত
ভাবে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার
পরণে লাল কালো ফুলতোলা ঢাকাই গুলবাহার শাড়ী।
সে কথা তুলিয়াই সে উখিলার খোল। দরজার ভিতর ঢুকিয়া
পড়িল। উখিলা তখন জানালার ধারে একটা টুলে
বসিয়া আছে, জানালার ক্রেমের উপর হাতে মাথা রাখিয়া।
জাগিয়া কি ঘুমাইয়া বোঝা যায় না। তখনও যে বিহ্বল
কেহ শোয় নাই ঘরে ঢুকিলেই বোঝা যায়। জয়ন্তী
ডাকিল, “উখি, এত রাজে এখানে চুপ করে বসে যে?”

ঠাকুরপো কোথায় গেল? তোরা আজ ঘুমবি না? কি একটা আওয়াজ পেয়ে আমি ছুটে এলাম।” উর্শ্বলা মুখ তুলিয়া একবার শূন্যদৃষ্ট জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকাইল।

জয়ন্তী বলিল, “কি হয়েছে? বলবি না?”

উর্শ্বলা রূটি হঠাৎ কঠোর হইয়া উঠিল, সে বলিল— “নিজের দিক তাকিয়ে বুঝতে পারছ না, কি হয়েছে? কেন যে ও-বেশ ছেড়ে বেরোবার কথাও ভুলে গিয়েছ তাকি আমি জানি না? তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। আমার কাছে আর ও-মুখ দেখিও না।”

উর্শ্বলা কাঁদিয়া ফেলিল। জয়ন্তীও চোখের জল সঞ্চরণ করিতে পারিল না। সে কি বলিতে গিয়া চূপ করিয়া গেল। উর্শ্বলা বলিল, “তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাস্তাম ব’লে তে,মার ও সর্বস্বের চোবোর দিকে তাকাতো না পেরে ছুটে চুড়ি পরিয়া দিতে কি চুলটা বেধে দিতে যেতাম ব’লে এমনি করে তার শোধ নিচ্ছ? চিরকালের সঙ্গকে এমনি করে শেষ করছ?”

সামান্যনয়ে জয়ন্তী বলিল,— “উর্শ্বা, তোর মুখে একথা আমার শুনতে হ’ল শেষে! তোকে আমি এর উত্তর কি দেব, ভগবান করুন, একথা তোকে যেন কখনও বুঝতে না হয়।”

পরদিন অনেক বেলায় ঘরের বাহির হইয়া উর্শ্বলা দেখিল জয়ন্তী বাড়ি নাই।

বাপের বাড়ি হইতে জয়ন্তী উর্শ্বলাকে চিঠি লিখিয়াছে—

“উর্শ্বা, তোকে যদি প্রথম দিন থেকে মার পেটের বোনের মত না দেখতাম, সন্তানের মত না ভালবাস্তাম, তাহলে আজ আর তোকে এক-কয় ছত্র লিখতে পারতাম না।

তোকে আমার বড় হুখের দিবে বহুদিন পরে পেয়ে বুকটা জুড়িয়ে গিয়েছিল। যাকে হারিয়ে আমি পৃথিবীটাকে স্থায়ী বাইরে বিধাতার একটা উপহাস মনে করতাম, তাকে ফিরে পাবার পথ তুই আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলি, কিন্তু তুই জানতিস না। এ বিধবার তপস্তার পথ নয়, বললে কেউ বিশ্বাসও হয়ত করবে না। কিন্তু তুই করবি মনে করে তোকেই একদিন বলব ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার কপাল মন্দ, সে হুখের বলা আজ আমার অপমানের কৈফিয়ৎ হয়ে দাঁড়াল।

স্বামী ত চলে গেলেন। তারপর যখন হিতৈষীরা সবাই মিলে আমার শিখির সিঁদুর মুছে, শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে, হাতের চুড়ি ভেঙে আমাকে তিথারী সাজিয়ে ছেড়ে দিলে তখন আমার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু চৈতন্য হ’ল ক’দিন পরে নিজের দিক তাকিয়ে মনে হ’ল এত আমি নয়। কোথায় গেল সেই জয়ন্তী বার প্রতিটি শাড়ীর পাড় তার স্বামীর রুচি অঁকা ছিল, বার প্রাতে ক’ অলংকার ছিল স্বামীর জমাট ভালবাসা, বার সিঁখির সিঁদুর কতদিন স্বামী স্বহস্তে এঁকে দিয়েছে? সে মরে গেছে হারিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সে স্বামী যেন একবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে ধূসার থেকে মুছে গেছে।

তোর কাছে যখন এলাম তখন পাথর হয়ে গিয়েছি। কিন্তু তুই ত পাথরে প্রাণ জাগিয়ে দিলি। বে-চুলের গোছা মাস-শাওড়ী মুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেম তাকে তুই আবার যত্ন করে বেঁধে ফুল দিয়ে দিয়েছিলি মনে আছে? মনে পড়ে গেল ছু-মাপ আগে এলোখোঁপায় ফুল কে দিয়ে দিয়েছিল। আবার যেন ঠিক তোর পাশে এসে দাঁড়িয়ে সেই-ই হেসে উঠিল। আচারে নিয়মে নিবেধে যাকে একবারে হারিয়ে ফেলেছিলাম, ঐ ছুটি ফুলের স্মৃতির মধ্যে সে জীবন্ত হয়ে উঠল।

আমার এ-হাত ছুপনাকে আমি ত চিন্তেই পারতাম না। তুই তোর সোনার চুড়ি পরিয়া চিনিয়ে দিলি। এই হাতেই বারো বৎসর স্বামীর সেবা করছি। চুড়ি ছ-গাছা প’রে তারা যেন খুঁজে আনল তাদের এত কালের পরিচিত বন্ধকে।

ফুলের সঙ্গে যে দেখা দিয়েছিল ক্রমে সে প্রত্যাহের সাক্ষী হয়ে উঠল, আমার সকল অপূর্ণ সাধ-আল্লাহ, আমার সকল কল্পনার হৃথ যাক ষঠন করে পূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছিল একদিন, তাকেই ঘিরে আবার তারা পূর্ণ হয়ে উঠল এবার। আমার পাছে সজ্জায় প্রসাধনে সেই যে আমার শরীর মন পূর্ণ করে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাকি তুই বিশ্বাস করবি?

স্বামীকে ত ভালবাসিন, ভেবে দেখ, দিকি, তোর কোন সাধ-আল্লাহ, কোন হৃথ-সৌভাগ্যটা তাকে ঘিরে নেই? সবতেই ত তোর সে মিশে রয়েছে।

সে কি শুধু তার শরীরটুকু? তোর সমস্ত জীবন জোড়া হয়ে উঠছে সে, আপনার শরীরের চেয়ে সে অনেক বড়।

আমার এতদিনের যে অভ্যস্ত জীবন তাকে নিশ্চুল করে বাদ দিয়ে নূতন একটা জড় ছবি আর মাল। মনের মধ্যে তাকে কোথাও ঝুঁজে পাই না। ছবি কেবল মনে পড়িয়ে দেয় সে হারিয়ে গেছে। আমি যে সেই হারানটাই ভুলে

থাকতে চাই। আমার সকল স্মৃতি সকল আবেষ্টনে যদি সে জীবন্ত হয়ে থাকে তবে আমার আচারের ক্রটি হ'লে কি আমাকে পরে পাগল মনে করলেও গ্রাহ্য করব না।

আর কি লিখব? থাকরপোকে স্থখী করিস্। তুই স্থখে থাক।

তোর দিদি জয়ন্তী

জার্মানীর একটি বিদ্যালয়

শ্রী অনাথনাথ বসু

জার্মানীর বিখ্যাত ব্ল্যাক ফরেস্ট (Schwarzwald)-এর উত্তরাংশ ওডেনভাল্ড (Odenwald) বা ওডেনের বন নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি ব্ল্যাক ফরেস্টেরই মত নয়নাভিরাম। রাইন উপত্যকার পূর্বদিকে ছোট বড় পাহাড়ের শ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। তাহারই পায়ের কাছে সমতলক্ষেত্রের উপর দিয়া রাইন নদী বহিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের দেহ ও চূড়াগুলি ওকু বীচ ও পাইনে ঢাকা। হেমন্তে যখন গাছের পাতাগুলিতে রং করে তখন সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম হয় আবার শীতকালে বন্য বরফ পড়িয়া চারিদিক সাদা হইয়া যায় তখন সে সৌন্দর্য্য আর এক রূপ ধারণ করে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ও গায়ের উপর গাছের আড়ালে ছোটবড় গ্রাম। জার্মানীর গ্রাম অঞ্চলে বাড়িগুলি প্রায়ই লাল টালি দিয়া তৈয়ারি; সবুজ পাতার কাঁকে দূর হইতে সেগুলি বড় হৃন্দর দেখায়।

এইখানেই একটি পাহাড়ের গায়ে যুরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে সুপরিচিত ওডেনভাল্ড স্কুল (Odenwaldschule) প্রতিষ্ঠিত। এরূপ হৃন্দর প্রাকৃতিক অবস্থান আমি খুব কম বিদ্যালয়েরই দেখিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্বে এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষয়িত্রী যখন শান্তিনিকেতনে আসেন তখন তাঁহার কাছে ইহার কথা শুনি ও ছবি

দেখি। তখন হইতেই বিদ্যালয়টি দেখিবার আগ্রহ ছিল। যুরোপে গিয়া সেট আগ্রহ মিটাইবার সুযোগ পাইলাম। ১৯৩১ সালে আমি প্রথম ওডেনভাল্ড স্কুলে যাই; তাহার পর তুই বৎসরে কয়েকবার সেখানে গিয়াছি এবং বিদ্যালয়টি ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

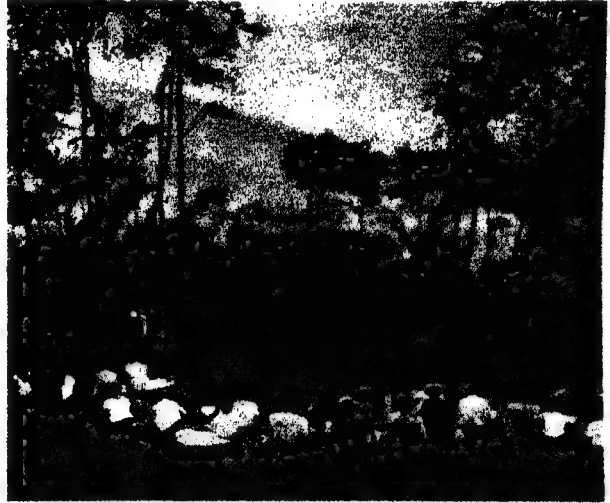
প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্বে, ১৯১০ সালে পল গেগেব তাঁহার পত্নীর সহায়তায় ও সহযোগিতায় ওডেনভাল্ড বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যুরোপে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং ইহার প্রতিষ্ঠার সহিত সেখানকার শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে যে অভিনব আন্দোলন দেখা দিয়াছে তাহার ঘনিষ্ঠ বোগ রহিয়াছে। সুতরাং সেই আন্দোলনের কথা সংক্ষেপে বলি; তাহা হইলে এই বিদ্যালয়ের আদর্শ ও কার্যক্রম বোঝা সহজ হইবে।

এই আন্দোলন নিউ স্কুল মুভমেন্ট (New School Movement) নামে পরিচিত। ১৮৮৯ সালে সেসিল রেডি (Cecil Reddie) ইহার প্রবর্তন করেন। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর প্রতিবাদ করিয়া অভিনব শিক্ষাপ্রণালী সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য। তখন ইংলণ্ডে যে শিক্ষাপদ্ধতি চলিতেছিল, আমাদের দেশে আজও তাহার একটি অক্ষরণ চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং একহিষাবে তাহার

সহিত আমাদের কিছু পরিচয় আছে। সেজন্য তাহার পরে এই আদর্শে পরিচালিত আরও কয়েকটি বিদ্যালয় ক্রটিগুলি আলোচনা না করিলেও চলিতে পারে। শিক্ষার জার্মানীতে স্থাপিত হয়।

এই নবীন আদর্শের মধ্যে কয়েকটি মূলকথা আছে; যীর্ষে যীর্ষে লিংসের লান্ড-এরৎসিহৎসহাইমের আদর্শও (১) শিশুর স্বাধীনতা, (২) ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর কিছুপরিমাণ রূপান্তর গ্রহণ করে এবং তাহার ফলে

বিকাশ; (৩) মানুষের বিচিত্র চিন্তাবৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অহুশীলনের জন্ত সমগ্রতর শিক্ষার পরিকল্পনা। ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্ত স্বাধীনতার প্রয়োজন; এবং সেজন্য মানসিক বৃত্তিগুলির সর্বোচ্চ অহুশীলন দরকার। প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিশেষ আয়োজন ছিল না। সেখানে লেখাপড়ার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার এই নূতন আদর্শ অবলম্বনে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আবটসহোম (Abbotsholme) নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পদিনেই তাহার কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ডেমোলিন্স (Eduard Demolins) ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে



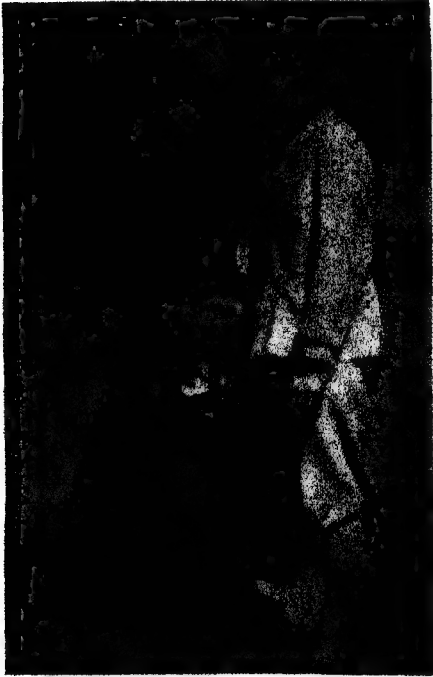
খোলা জায়গায় অভিনয়ের দৃশ্য

প্যারিসের অনতিদূরে একোলা দে রোস্ (Ecole des Roches) নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জার্মানীতেও এই আন্দোলনের চেউ আসিয়া পৌঁছায়। সেখানে এই আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক হারমান লিৎস্ (Hermann Lietz)। তিনি কিছুকাল আবটসহোমে রেডির সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যে-শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেন সেগুলি লান্ডএরৎসিহৎসহাইমে (Land-Erziehungsheime) নামে পরিচিত। এই শব্দটির অর্থ গল্পীঅঞ্চলে স্থিত শিক্ষানিকেতন। নামটির মধ্যেই বিদ্যালয়ের দুইটি আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা বিদ্যালয় নহে নিকেতন (Heim); এবং গল্পীঅঞ্চলের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। লিৎস ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইলসেনবার্গে প্রথম লান্ড-এরৎসিহৎসহাইমে প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার

জার্মানীতে আর এক শ্রেণীর বিদ্যালয় দেখা দেয়। এগুলি ফ্রাই হ্যাল গেমাইণ্ডেন (Freie Schulgemeinden) অর্থাৎ স্বনিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়-সমাজ নামে পরিচিত। এই নূতন আদর্শের প্রচারক ছিলেন গুস্তাভ ভিনেকেন (Gustav Wyneken) ও পল গেহেব (Paul Geheeb)। গেহেব কিছুদিন লিংসের সংকর্মা ছিলেন; কিন্তু কয়েকটি কারণে তাঁহার সহিত মতভেদ হওয়ায় গেহেবকে লিংসের বিদ্যালয় ছাড়িতে হয়। তখন তিনি ও ভিনেকেন মিলিয়া ভিকার্সডর্ফে (Wickersdorf) প্রথম ফ্রাই হ্যাল গেমাইণ্ডেন প্রতিষ্ঠা করেন।

রেডির মূল আদর্শে বিদ্যালয়ের সামাজিক দিকটা বিশেষ ছুটিয়া ওঠে নাই। লান্ড-এরৎসিহৎসহাইমের আদর্শে সেই ভাবটি প্রথম দেখা দেয়, কিন্তু ফ্রাই হ্যাল গেমাইণ্ডেনের আদর্শেই তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়। বিদ্যালয় যে শুধু

বিদ্যালয়েরই কেন্দ্র নহে, ইহা যে একটি বিশেষভাবে সমাজ, বাহিরের বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতর সংস্কৃত প্রতিচ্ছবি এইটাই হাল গেমাইণ্ডের কেন্দ্রীভূত তত্ত্ব। ভিনেকেন এই তত্ত্বটি স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কলে বিদ্যালয়ের



স্বাভাবিক ও পল গেহেব

যে আমূল রূপান্তর দরকার ছিল, ততদূর পর্যন্ত করিতে তিনি সক্ষম ছিলেন না। গেহেব মনে করিতেন যে বিদ্যালয়সমাজকে ঠিক সমাজেই পরিণত করিতে হইলে সেখানে সহশিক্ষার প্রবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ভিনেকেন সহশিক্ষার বিশ্বাস করিতেন না। তাহা ছাড়া ক্রাই হাল গেমাইণ্ডে বলিতে যতখানি স্বাধীনতা বোঝায় তিনি ছেলেদের ততখানি স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সকল কারণে গেহেবকে শেষে ভিকার্সডর্ক ছাড়িয়া অল্পত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইল।

তাহার কলে ১৯১০ সালে ওডেনভাল্ড হালে প্রতিষ্ঠিত হইল। আকারে-প্রকারে সেটা সাধারণ বিদ্যালয় হইতে এতই স্বতন্ত্র যে, প্রথম দেখিলে সেটাকে বিদ্যালয় বলিয়া মনে করা শক্ত হয়। এ যেন একটা গৃহ পরিবার, পাহাড়ের গায়ে কুটির রচনা করিয়া বাস করিতেছে। সাধারণতঃ বিদ্যালয় বলিতে আমরা একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার কথা ভাবি; এখানে সেরকম কিছুই নাই। ছেলেমেয়েরা সত্যি বিভিন্ন বাড়িতে অধ্যাপকদের সতিত



ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের একটি দৃশ্য

বাস করে। অদূরে উপত্যকার গ্রামের গৃহগুলি যেমন এগুলিও তেমনি, তবে অপেক্ষাকৃত বড়। প্রত্যেক গৃহেরই এক একটি নাম আছে; যে-সকল মনীষীর চিন্তার দ্বারা বিদ্যালয়ের আদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাদের নামে গৃহগুলির নামকরণ করা হইয়াছে। স্টেটো, গোটে

শালার, হার্ডার, হুম্বোল্ট ও পেটলৎসি এই কয়েকজনের নামে বিভিন্ন গৃহগুলি পরিচিত।

শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোন বিদ্যালয়গুহ নাই; যেখানে ছেলেমেয়েরা বাস করে সেইখানেই কয়েকটি বর আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে; সেইখানেই পড়ান হয়। ঘরগুলির আসবাবপত্রও সাধারণ বিদ্যালয়ের মত নহে। দেখিলে মনে হয় কোন গৃহস্থের লেখাপড়া করিবার ঘর।

বিদ্যালয়ে তিন চতুর্থে কুড়ি-একশ পর্য্যন্ত সকল বয়সের ছেলেমেয়েই দেখিলাম।

বিদ্যালয়ের সকল কার্যেই ছেলেমেয়েরা সাহায্য করে। ঘর পরিষ্কার করা, পথঘাটগুলি টিক রাখা, রন্ধন করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি সকল কাজেই ছেলেমেয়েরা

নির্যতভাবে যোগ দেয়। এগুলিকে তাহার বিদ্যালয় শিক্ষারই অঙ্গ বলিয়া মনে করে। বিদ্যালয়ের বাগানে



অধ্যাপনারত পল গেহেব

ছেলেমেয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সকলেই কাজ করেন। একস্থানে পাহাড়ের উপরে অনেকখানি মাটি সমতল করিয়া খেলার জমি তৈয়ারি করা হইয়াছে। শুনিলাম

ছেলেমেয়েরা মিলিয়াই এটি করিয়াছে। আমি যখন সেখানে ছিলাম তখন ছেলেমেয়েরা উন্মুক্ত স্থানে একটি বঙ্গমঞ্চ (open-air stage) তৈয়ারি করিতেছে। মাঝে মাঝে আমিও তাহাদের কাজে যোগ দিতাম। ছেলে-



পাহাড় ও জঙ্গল কাটিয়াছারেরা খেলার জায়গা করিতেছে

মেয়েরা শিক্ষকদের সহিত কাজ করিতে অভ্যস্ত; তাহার সহজেই আমাকে তাহাদের দলে লইয়াছিল এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ মিটারবেটার (mitarbeiter) অর্থাৎ সহকারী নামে পরিচিত। এ নামের সাধকতা সেখানে সর্বত্র দেখিয়াছি। শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে সেখানে বৈষম্য জন্মাতার সম্পর্ক দেখিলাম অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও চূর্ণ। মোটের উপর এখানে শিক্ষায়, কর্মে, চেষ্টায়, আচারে, বাব্বারের সর্বত্রই বিদ্যালয়ের সমাজ-রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যুরোপে ও আমেরিকায় অনেক বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে সে আদর্শ যতদূর আচরিত হইয়াছে অল্প কোথাও ততখানি দেখি নাই। ছেলেমেয়েরা একই গৃহে পাশাপাশি কক্ষে বাস করিতেছে, একসঙ্গে লেখাপড়া কাজকর্ম আনন্দ উৎসব করিতেছে, একত্রে বেড়াইতে বাইতেছে, অবশ্যে মেলামেশা করিতেছে; তাহাদের মনে বিদ্বেষের দ্বিধা বা কুণ্ঠার ভাব নাই;

শিক্ষকেরাও এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদার। ছাত্রছাত্রীদের উপর তাঁহাদের বিশেষ করিয়া গেহেবের, অগাধ বিশ্বাস। সহ-শিক্ষার ব্যাপারে অনেক সময়ে দুইটি জিনিষ দেখা যায়; কর্তৃপক্ষগণ দ্রুত বাহ্যতঃ সহশিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন



যজ্ঞাগারে একটি বালক কাজ করিতেছে

কিন্তু তাঁহাদের মনে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই থাকায়, তাঁহারা অত্যধিক মাত্রায় ছেলেমেয়েদের উপর নজর রাখেন।

কলে ছেলেমেয়েদের মনেও বিশ্বাস ও সাহসের অভাব হয়; তাহারা ভাবে, দ্রুত ইহার মধ্যে জুগুপ্সার কিছু আছে। এই ভাবে এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যেখানে সহশিক্ষা চলিতে পারে না। এটিকে যদি সহজ ভাবে লওয়া যায় তাহা হইলেই ব্যাপারটাও সহজ হইয়া ওঠে। অবশ্য আমি নজর রাখার আগন্তিকি করি না; কিন্তু সে চেষ্টা প্রজন্ম রাখিতে হইবে, তাহাকে সীমা লঙ্ঘন করিতে

দিলে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সহশিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি ব্যাপারও ঘটে। অনেক সময়ে একত্রে লেখাপড়া করাকেই সহশিক্ষা বলা হয়। কিন্তু শিক্ষা শুধু লেখা-

পড়ারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, মূলতঃ তাহার সম্পর্ক আচারের সঙ্গে; বিদ্যা সেই আচারনিয়ন্ত্রণের সাধন মাত্র; সেইজন্য উদারতা অর্থে বিদ্যালয়ে চলাফেরা, আনন্দ উৎসব করা, নানা সামাজিক অমৃষ্ঠানে যোগদান করা সকলই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সহশিক্ষায় যদি তাহার আয়োজন না থাকে তাহা হইলে সেরূপ শিক্ষাকে সহশিক্ষা নামে অভিহিত করা অন্তায়।

সহশিক্ষার সহিত স্বাধীনতার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীনতা-বিকাশের যথেষ্ট আয়োজন আছে। স্বাধীনতার মূল কথা দায়িত্ব ও অধিকার; যে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে শিখিল না, তাহার পক্ষে স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই; অধিকার দায়িত্বেরই অন্তরূপ। অধিকার পাইতে হইলে দায়িত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং দায়িত্বগ্রহণ করিলেই তবে অধিকার লাভ করা যায়। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ের কার্যপরিচালনায় ছেলেমেয়েরা কতখানি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া লইয়াছে তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল কার্য হুচার-



ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়

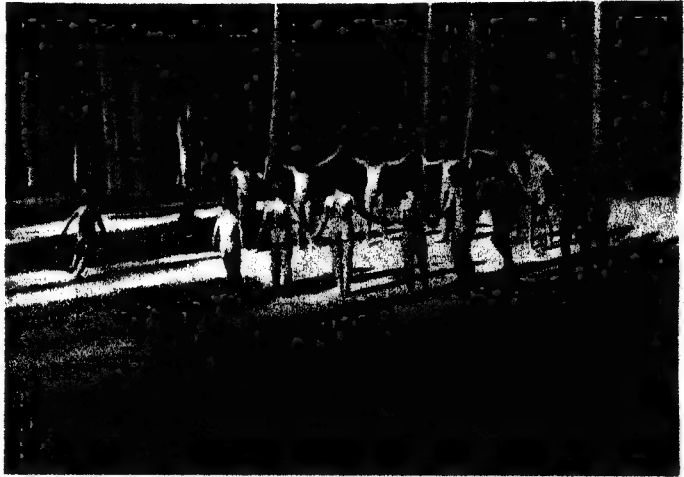
রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য ছেলেদের যত্নসী আছে; তাহা হাল গোমাইও নামে অভিহিত; ছাত্রছাত্রীরাই তাহার একজন নেতা নির্বাচন করে। সেই যত্নসী নিয়মিত

বৈঠক হয়, সেখানে সকলেই উপস্থিত থাকেন। বিদ্যালয় সঞ্চালক সকল কথাই সেখানে আলোচিত হয়।

তাহা ছাড়া প্রত্যেক গৃহে কয়েক জন বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক রূপে থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অধ্যাপকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভার লইয়া বিভিন্ন গৃহে তাহাদের মধ্যে বাস করিতেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে গেহেবের মনে হয় যে, সর্বস্বর্ণ শিক্ষকগণের এরূপ তত্ত্বাবধান ছেলে মেয়েদের স্বাধীনতা ক্ষুর করে এবং ফলে তাহাদের দায়িত্ব-বোধ কমিয়া যায়, ফলতঃ শিক্ষকগণকে দূরে থাকিতে হইবে। তাহার পর হইতে যদিচ শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বাস করিতেছেন তবু তাঁহারা তাহাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীতে সাক্ষাৎ ভাবে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না। সে-ভার সম্পূর্ণরূপে স্থানল গোমাইণ্ডে এবং ছাত্র-অভিভাবক-গণের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ছাত্র-অভিভাবকগণ প্রায়ই একত্র হইয়া তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সে আলোচনায় পরামর্শদাতা রূপে গেহেব বা তাঁহার স্ত্রী উপস্থিত থাকেন এবং কার্য্যপরিচালনায় সহায়তা করেন।

গেহেব শুধু বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে অনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও তিনি এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ওডেন্সভাল্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষার এক নূতন প্রণালীর পরিচয় পাইলাম। মাসে মাসে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এক একটা কোর্সের ব্যবস্থা আছে; শিক্ষকগণ সে মাসে নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। ছেলে-

মেয়েরা তাহাদের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুযায়ী তাহারই মধ্যে কয়েকটা বিষয় বাছিয়া লয়। তাহাদের নির্বাচনে শিক্ষকগণ সহায়তা করেন কিন্তু এ-বিষয়ে ছাত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। উদাহরণ দিই; মনে করুন অক্টোবর মাসে



ছেলেদের ব্যায়াম ও খেলা

জীববিজ্ঞান, অঙ্ক, ইংরেজী ও ইতিহাস এই চারটি বিষয়ে পড়ান হইবে। একজন ছাত্র হয়ত ইতিহাসের পাঠ্য অনেকখানি শেষ করিয়াছে; সে এরূপ ব্যবস্থায় এ মাসে ইতিহাস না পড়িয়া সে-সময়ে অল্প কিছু আলোচনা করিতে পারে। এই কোর্সগুলি এমন ভাবে ব্যবস্থা করা হয় যে, সারা বৎসরেই সকল বিষয়ে যতটুকু পড়ান প্রয়োজন, ততখানি বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে পড়াইয়া শেষ করা হয়। একটানা ভাবে সারা বৎসর ধরিয়া কোন বিষয় পড়ান হয় না। ফলে একজন ছাত্র ক্রটি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় বাছিয়া পড়িতে পড়িতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত পড়াই শেষ করে কিন্তু কোন সময়ে বাহিরে শিক্ষকের চাপ বোধ করে না।

এই বিদ্যালয়ে নানারূপ হাতের কাজকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। ছুতারের কাজ, লোহার কাজ, ঘরের কাজ, চিত্রাঙ্কণ, মাটির কাজ, বই বাধাই প্রভৃতি

নানা রকম ব্যবস্থা আছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাহার যেমন রুচি সে তেমন কাজ শিখিয়া লয়। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ছাপাখানায় ছেলেমেয়েরাই কাজ করে। তাহাদের একটি মাসিক পত্র আছে; তাহা পরিচালনার ভারও ছেলেমেয়েদেরই উপর। বাগানের কথা পূর্বেই বলিয়াছি; যুরোপের সকল দেশেই দেখিয়াছি, সেখানকার



বিদ্যালয়ের তিনটি শিশু

লোক ফুল ভালবাসে। অতি দরিদ্র কৃষকও বাড়ির পাশে ছোট ফুলগাছ রাখে। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ের বাগানে ছেলেমেয়েরা নানারকম ফুলের চাষ করে; তাহা ছাড়া তরিতরকারি শাকসব্জী চাষের ব্যবস্থাও আছে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ফলবাগানে প্রচুর ফল হয়। সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের (এবং তাহার চেয়ে বেশী ভক্ষণের) ভারও ছেলেমেয়েরা কিছু পরিমাণে লইয়াছে।

মানুষ সৃষ্টি করিতে চায়; অতি ছোট শিশুর মধ্যেও এই আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ বিদ্যালয়ে মানুষের সেই স্বাভাবিক সৃজনীকৃত্তির বিকাশের কোন আয়োজনই নাই। লেখাপড়ার মধ্যে অন্ততঃ বিদ্যালয়-জীবনে কতটুকুই আত্মপ্রকাশ করা চলে। সেইজন্যই বাহাতে এই সৃষ্টির বিকাশের সহায়তা হয়, এরূপ প্রচুর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গেহেব ও তাঁহার সহকর্মীগণ শিক্ষার এই তথ্যটি উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিয়াছেন।

শিক্ষাকে সমগ্রভাবে দেখিলে তাহার মধ্যে খেলার ও আনন্দ-উৎসবের আয়োজন রাখিতে হয়। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে খেলার ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে; কিন্তু ইংলণ্ডে

যেমন সে ব্যবস্থা অনেক সময়ে মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, এখানে তেমন হয় নাই। বাগানে, রঙ্গমঞ্চনির্মাণে, ও অন্তান্ত ভাবে ছেলেমেয়েরা একত্রে মিলিয়া যে-সকল কাজ করে, সেগুলিকেও খেলার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। এরূপ কাজের মধ্যেও খেলার ভাবটি আসিয়া পড়িয়াছে। ফলে ছেলেমেয়েরা আপনার আনন্দে কাজ করে।

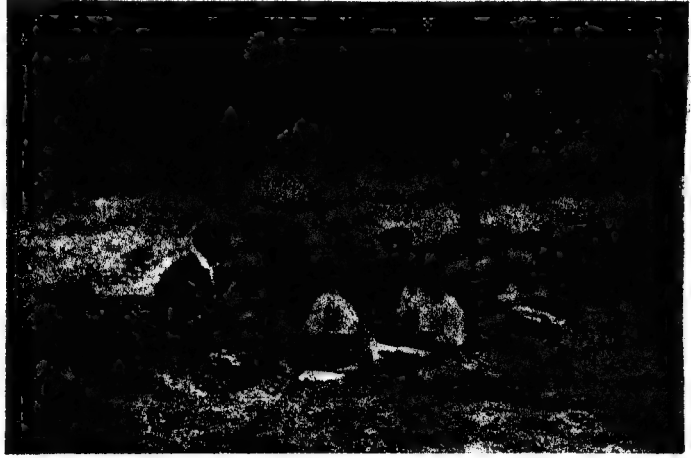
বিদ্যালয়ে নানারূপ আনন্দ-উৎসবের আয়োজন আছে। বৎসরের মধ্যে একটি বিশেষ দিন আছে যখন বিদ্যালয়ের সকলে নানারূপ ছদ্মবেশ করিয়া নির্মল আমোদ-কৌতুক করে। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে অভিনয়ের ব্যবস্থাও আছে। কখনও বা তাহার স্তম্ভ গৃহের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করা হয়, কখনও প্রকৃতির সুন্দর বক্ষে উন্মুক্ত স্থানে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আমি থাকিতে ছেলেমেয়েরা একদিন এইভাবে শেক্সপীয়রের একটি নাট্য অভিনয় করিল। খৃষ্ট-জন্মোৎসবের সময় প্রতিবৎসর ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে সকলে মিলিয়া খৃষ্টের জন্মকাহিনীর বা জীবনের কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া অভিনয় করেন। গত বৎসরের অভিনয়ের একটি ছবি এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল।

জার্মান জাতি গান ভালবাসে। বিদ্যালয়ে প্রায়ই গানের মজলিস বসে ও সকলেই তাহাতে যোগদান করে। যুরোপে ছই রকম গান প্রচলিত আছে, এক রকম ক্লাসিক গান, অপর অপেক্ষাকৃত তরলপ্রকৃতির সাধারণ চলিত গান। জার্মানীতে ক্লাসিক সঙ্গীতেরই আদর বেশী। এই বিদ্যালয়েও সেই শ্রেণীর গানেরই ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যালয়ের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রণালী একান্ত সহজ ও সরল। ছেলেমেয়েরা ও শিক্ষকগণ সকলেই খুব সাধারণ পোষাক পরিয়া থাকেন। দিনের অধিকাংশ সময়েই তাঁহারা খোলা হাওয়ার কাটান। তাহাদের খেলাধুলা, বাগায়, এমন কি পড়াশুনাও অনেক সময়েই উন্মুক্ত স্থানেই চলে। বিদ্যালয়ের চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর। প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের প্রতিদ্বন্দ্ব্ব্বই পরিচয় হইতেছে। জীবন গঠনের দিক দিয়া এরূপ পরিচয়ের মূল্য কম নহে।

জার্মান ছেলেমেয়েরা বেড়াইতে খুব ভালবাসে। সে-

দেশের ভাণ্ডারফোগেল (wandervogel)-এর কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ছুটির সময় ছেলেমেয়েরা দল বাধিয়া বাহির হইয়া পড়ে, সঙ্গে হয়ত কিছু আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিয়া লয়; তাহার পর কয়েক দিন গান গাহিয়া, খেলা করিয়া, পল্লীঅঞ্চলে বা পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কাজে মন দেয়। ইহাকে সেখানে ভাণ্ডারং (wandern) বলা হয়। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে এইরূপ ভাণ্ডারঙের ব্যবস্থা আছে। একবার প্রায় ত্রিশ জন ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিকটস্থ পাহাড় অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিল। আমাদের দলে নয় বৎসরের বালিকা ছইতে প্রাণী পর্যন্ত সকলেই ছিল। সকলের পিঠে একটি কুস্তাক বা ঝুলি; তাহাতে



একটি ক্লাস

কয়েকটি কাপড় জামা, কিছু খাবার ও রাত্রে শুইবার জন্ত থলি। যেখানে বেড়াইতে যাইতেছিলাম সেখানে মাঝে মাঝে চটি আছে; রাত্রে সেইখানেই আশ্রয় লইতে হয়। বিছানা ত সব সময়ে পাওয়া যায় না, তাই এইরূপ শুইবার থলির ব্যবস্থা। কয়েক দিন পাহাড়ে পাহাড়ে খুব ঘুরিলাম; ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিল; কিন্তু শ্রমও কম হয় নাই। ফিরিয়া ছই-এক দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে হইল। আমরা যখন ভাণ্ডারঙে গেলাম তখন বিদ্যালয়ের আর এক দল অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেমেয়ে, দুই গ্রামে কৃষকদের আঙুরের ফসল কাটিবার সাহায্য করিতে গেল। চাষীরা এরূপ সাহায্য সাগ্রহে লয়। ছেলেমেয়েরা তাহাদের সঙ্গে মাঠে একত্রে পরিশ্রম করে; কোন কোন দিন দশ-বার ঘণ্টা পর্যন্ত খাটিতে হয়। কিন্তু তাহাতেই তাহাদের আনন্দ। এই সময়ে যখন সকলে দলে দলে ভাণ্ডারঙে বাহির হয়, ছই-এক দল ছেলে এইভাবে কোন পল্লীতে গিয়া কাজ করে।

জাতীয় জীবন ও চরিত্রগঠনে এরূপ ব্যবস্থার মূল্য কতখানি তাহা উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে।

এখানে একটি মন্ডর ব্যবস্থা দেখিলাম। বিদ্যালয়ের সকলেই একত্রে ভোজন করে। ভোজনের পূর্বে কিছু-

ক্ষণের জন্ত শিক্ষকগণ একত্র সমবেত হইয়া ছাত্রদের সম্বন্ধে আলোচ্য কিছু থাকিলে আলোচনা করেন। ভোজনের পরেও সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সকলকে পাঁচ মিনিট কাল উপস্থিত থাকিতে হয়। ভোজনান্তের পূর্বে পাওলাস কোন গ্রন্থ হইতে ছই-এক লাইন পড়িয়া শোনান। খৃষ্টানদের মধ্যে এই সময়ে নিবেদন করিবার বা গ্রেস্ (grace) বলিবার প্রথা আছে। এখানে সেই প্রথাই এই রূপে ধারণ করিয়াছে। ভোজনের ব্যবস্থা খুবই সাধারণ, কিন্তু পুষ্টিকর। অন্তান্ত বিদ্যালয়ে এরূপ আড়ম্বর আছে এখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না।

এখানকার আর একটি ব্যবস্থা আমার বড় ভাল লাগিল। প্রতি রবিবার প্রাতে সেখানে উপাসনার ব্যবস্থা আছে। এই উপাসনা আন্ডাক্ট (andacht) নামে অভিহিত হয়। ইহার প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। বাহ্যিক সাধারণভাবে উপাসনা করিতে চাহে তাহারা নিকটস্থ গ্রামের ভজনালয়ে যায়, কিন্তু এরূপ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা

কম। অধিকাংশই আনডাক্টে যোগ দেয়। সেখানে উপাসনার কোন ধরাবাধা পদ্ধতিই নাই, এমন কি গোড়া যতে সেটাকে উপাসনা বলা চলে কি-না সন্দেহ। কোনদিন হয়ত সেখানে শুধু সঙ্গীতই হইল, কোনদিন গেহেব (তিনি বিদ্যালয়ে পাওলাসু (Paulus) নামে পরিচিত) কোন পুস্তক হইতে কিছু পড়িয়া শোনাইলেন। এক্ষণে গ্রন্থ সকল সময়ে যে ধর্মগ্রন্থ হয় তাহা নহে। একদিন দেখি, তিনি টলষ্টয়ের তেইশটি গল্পের একটি গল্প পড়িতেছেন। আর একদিন দেখিলাম, তিনি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রাণীদের একটি গল্প পড়িয়া শোনাইলেন।

গেহেব আদর্শবাদী, বিশ্বপ্রেমিক। তিনি শান্তিবাদী, যুদ্ধে বিশ্বাস করেন না। ভারতীয় সভ্যতার প্রতি,

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা। গেহেব মনে করেন বিশ্বের দুঃখ দূর করিতে হইলে সমাজকে নতুন ভাবে নুতন আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে; সেই সমাজগঠনের মূলকথা স্বাধীনতা ও সহযোগিতা। ভারীকালের উপযোগী স্বাধীনচিত্ত, চলিষ্ণুমন, বলিষ্ঠদেহ মানুষ গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষার নতুন আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষার সেই আদর্শকেই তিনি ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে রূপ দিতে চেষ্টা করিতেছেন।

সংবাদ পাইলাম জার্মানীর বর্তমান গবর্ণমেণ্টের সহিত যতের মিল না হওয়ার পল গেহেবকে ওডেনভাল্ডও ছাড়িতে হইয়াছে।

তত্ত্বের সাধনা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

যারণ, উচ্চাটন, বলীকরণ প্রভৃতি ঘটকর্ম ও মদ্য মাংস মৎস্য প্রভৃতি পঞ্চ 'ম'কার—এই সকলের জন্য তাত্ত্বিক-ধর্ম আধুনিক যুগে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতসমাজে বিশেষ ভাবে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান কালে ঐতিহাসিক অহুসন্ধিৎসা জাগরণের ফলে ভারতের প্রাচীন সর্গাধিগ সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হইলেও তত্ত্বসাহিত্যের অহুসীলন নিরতিশয় মন্দীভূত। তাহার কারণ একদিকে এই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা, অন্যদিকে তত্ত্বশাস্ত্রের স্বাভাবিক দুর্বোধ্যতা। বস্তুতঃ কিছুদিন পূর্বেও তত্ত্বশাস্ত্র আলোচনা করা যেন একটা লজ্জার বিষয় ও কুকর্টির পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। তত্ত্বশাস্ত্র ও তাত্ত্বিক আচারের বিলোপ অনেক চিন্তাশীল মনীষীরও কাছ্য ছিল। তত্ত্বশাস্ত্রের নিম্নার অনেকে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তত্ত্ব ছদ্মবেশী কামশাস্ত্র—হুঁসিতি প্রচারের জন্যই এই শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল—এইরূপ নানী কথা তত্ত্ব সম্বন্ধে অবাধে প্রচার করা হইত।

সমগ্র তত্ত্বশাস্ত্র হৃদয়ভাবে আলোচনা করিয়া কেহ এই জাতীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন এক্ষণে বলিতে পারা যায় না। বিশাল তত্ত্বশাস্ত্রের আংশিক আলোচনা এবং কতকগুলি তাত্ত্বিক আচারের আপাতদৃষ্টিতে বিচারের ফলেই এই সব মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। একদেশদর্শী না হইয়া এবং পূর্ক হইতেই কোন বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ না করিয়া যে-কেহ ধৈর্য্যসহকারে তত্ত্বশাস্ত্রের আলোচনা করিলেই পূর্বোন্নিধিত মতবাদের অসারতা, অন্ততঃ অতিরঞ্জন, স্বতঃই প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য তত্ত্ব নামে যাহা কিছু চলিতেছে এবং তত্ত্বের নামে যে-কোনরূপ আচারই অহুসীত হউক না কেন, তাহা সকলই ভাল—তত্ত্বের অভিব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকগণও এক্ষণে কথ্য বলিবেন না। তত্ত্ব নামে প্রচলিত সমস্ত গ্রন্থেরই প্রামাণিকতা কোনও তাত্ত্বিক আচার্যই স্বীকার করেন না। তত্ত্বের নাম দিয়া অনেকে নানা সময়ে যে-সমস্ত কুৎসিত আচরণ করিয়া থাকেন তাহারও কেহ প্রশংসা করেন

না। প্রামাণিক গ্রন্থের মধ্যেও কালক্রমে অনেক অপ্রামাণিক অংশ প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহা ছাড়া হিন্দুর সর্বপ্রকার অস্থানীয় ন্যায় তাত্ত্বিক অস্থানীয়ও অধিকারভেদ নির্দিষ্ট আছে। সকল আচার সকলের পক্ষে বিহিত নহে। অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান কোনও আচার সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য বিহিত হইলে তাহারই জন্য সমস্ত শাস্ত্রকে অসঙ্গত বলা চলে না। তত্ত্ব আলোচনার সময় এই সমস্ত গোড়ার কথা ভুলিলে চলিবে না। এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি না দিয়া তত্ত্ব আলোচনা করিলে পদে পদে বিতৃষ্ণা জাগিতে পারে—ভালমন্দের বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া চিত্ত সংশয়াকুল হইয়া উঠিতে পারে।

অবশ্য তত্ত্বগ্রন্থের প্রামাণ্য সন্দেহে তাত্ত্বিকাত্ম্যগণের মধ্যে যে প্রবল মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অনেক সময় সাধারণ পাঠকের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। এক সম্প্রদায়ের অনুবর্তী লোক আর এক সম্প্রদায়ের গ্রন্থকে অপ্রামাণিক ও দুষ্ট প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। একই গ্রন্থ এইরূপে এক দলের মতে প্রামাণিক ও বিশুদ্ধ এবং অন্য দলের মতে অপ্রামাণিক ও দুষ্ট। তবে প্রকৃতপক্ষে ও সর্বসম্মতি-ক্রমে অপ্রামাণিক গ্রন্থগুলিকে বাছিয়া পুথক করিয়া লওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়—একটু অহুর্শলন করিলেই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে।

এইরূপে তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তত্ত্বের কতকগুলি এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা আমাদের উপেক্ষার বিষয় নহে। তত্ত্বোক্ত উপাসনা-পদ্ধতি দার্শনিকতার দ্বারা অহুপ্রাপিত। উপাসনা ও উপাসকের—ব্রহ্ম ও জীবের এক্যাহুত্বের সহায়তা করা এই উপাসনাপদ্ধতির অন্ততম প্রধান লক্ষ্য। এই বিষয়গণ ভগবানের অভিব্যক্তিমাত্র—এই জগতের সমস্ত পদার্থ, বিশেষতঃ মানব-শরীর, দৈবী শক্তিতে পরিপূর্ণ এইরূপ ধারণা উপাসকের ক্ষম্রে বদ্ধমূল

করিবার জন্যই তাত্ত্বিক উপাসনার ন্যাস ও অন্তর্বাগাবির বিধান করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নিরর্থক শব্দ-সমষ্টি বলিয়া যে তাত্ত্বিক যন্ত্রগুলিকে আধুনিক পণ্ডিতগণ উপহাস করিয়া থাকেন সেই যন্ত্রগুলিরও এইরূপ দার্শনিক ব্যাখ্যা তাত্ত্বিকসমাজে প্রচলিত আছে। সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, শব্দরাশিকে তাত্ত্বিকগণ বড় প্রকার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। শব্দই দেবতার স্বরূপ—শব্দই ব্রহ্ম—এই তাঁহাদের মত। বস্তুতঃ তাত্ত্বিক উপাসনার প্রতি অঙ্গই এইরূপ দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাত্ত্বিক দর্শনও একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সম্প্রদায়। সংখ্যা দর্শনে যেরূপ কতকগুলি তত্ত্ব আছে, তাত্ত্বিক দর্শনেও সেইরূপ বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা আছে। বেদান্তাদি দর্শনের সহিত ইহার সম্পর্কও বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। মনে হয়, বেদান্তের সহিতই ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; বেদান্তের অমৈতবাদ তত্ত্বের প্রতিপদে প্রকার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর হইবে না। পুথ্য প্রবন্ধে স্বতন্ত্রভাবে সে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

তত্ত্বের উপর সাধারণের যে বিরূপ উচ্ছাস তত্ত্বোপাসনার উল্লিখিত বা তজ্জাতীয় বিধানসমূহের জন্য নহে। জনসাধারণের রুচিবিগর্হিত কতকগুলি গ্রন্থ আচার তত্ত্বের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে সর্বসম্মত নীতিমার্গের পরিপন্থী বলিয়া মনে হওয়া মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। যে-শাস্ত্রে পক্ষ ‘ম’কারের নির্বাণ উপভোগের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—যে-শাস্ত্রে যারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি পরের অনিষ্টসাধক ঘটকত্বের বিধান রহিয়াছে, সে শাস্ত্রের প্রতি সাধারণের একটা অবজ্ঞার ভাব উৎপন্ন হওয়া আমাদের বিচিত্র নহে। তবে গ্রন্থ অবজ্ঞা পোষণ করার পূর্বে এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাগুলি ধীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সমস্ত আচারের যতই দোষ থাকুক না কেন, এসম্বন্ধে নানা গ্রন্থে যে-সকল বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা হীনতার পরিপোষক নহে, জনসাধারণকে অসংপথে পরিচালিত করাও তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। পক্ষান্তরে, এইগুলির মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক

১। এ সম্বন্ধে ‘হরপ্রসাদ সর্বেশ্বর লেখদাস’ প্রকাশিত ‘নিম্নলিখিত ‘তত্ত্বের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য’ শীর্ষক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা ছিল শাস্ত্রকারদিগের প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য এই জাতীয় আচারের মধ্য দিয়া সাধনার পথে একটুও অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর কিনা সে বিষয়ে মনে স্বতই সংশয় জাগরিত হয়। অথচ, ঈদৃশ আচার কেবল তদ্রূপশাস্ত্রেই যে বিহিত তাহা নহে। বিভিন্ন দেশে আদিম ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বা ইতোচ্ছবিক তত্ত্ব-জনক আচারের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ত দেশের কথা জানি না তবে তত্ত্বের এই ক্ষুণ্ণসিত আচারের অমূল্য প্রকৃত সাধকও একান্ত ছল্লভ নহেন। বাম-ক্ষেপা সর্গানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষের মহত্ব সম্বন্ধে কেহ সন্দেহান নহেন—অথচ তাঁহারা এই সমস্ত আচারের মধ্যে অন্ততঃ কোন কোনটির অনুসরণ করিতেন। শক্তির উপাসক যাহারা, তাঁহারা ভোগের মধ্য দিয়াই যোগের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন—একথাও তদ্রূপশাস্ত্রে স্পষ্টই পাওয়া যায় (উদাহরণস্বরূপ যোগশ্রীমদে তু ভোগশ্চ যোগশ্চ করহ্ণ এব)। তাই বলা হইয়াছে, ‘বৈবস্বত পতনং দ্রব্যমুক্তি-তত্ত্বের সাধনঃ’ অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ সাধারণতঃ মানুষের অধঃপতন আনয়ন করে, তদ্রূপশাস্ত্রের মতে, তাহারা (স্থলবিশেষে) মুক্তি প্রদান করে। অতএব, তত্ত্বের এই পথের রহস্য যোগীদিগেরও অগম্য (কৌলো মার্গঃ পরমগম্যনো যোগিনামপম্যনঃ)।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া প্রসিদ্ধ মৃত্তবিন্দু পণ্ডিত হার্ট-ল্যান্ড (Hertland) তাঁহার Sex-worship নামক গ্রন্থে (Encyclopaedia of Religion and Ethics গ্রন্থে প্রকাশিত) এই বিচারগুলিকে উপেক্ষা না করিয়া ইহাদের সশ্রদ্ধ আলোচনার যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যে বাহাই বলা না কেন, আমাদের সম্মুখে বিটিতে চাহে না—বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কি করিয়া অন্তর্য সর্গসম্বন্ধিত্বের দ্বারা বালিয়া পরিচিত এই সমস্ত আচার মানুষের কোনরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারে।

তবে এই আচারগুলি যে অসহৃদে প্রচারিত হয় হয় নাই তাহার ইঙ্গিত তত্ত্বের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে। ভোগবহুল এই সমস্ত তাত্ত্বিক আচারের অবশ্যস্বার্থী পরিণতি উচ্ছলতা এবং বাসনে,

তাত্ত্বিক আচার্যাগণ একথা বিশেষভাবেই বুঝিতেন। তাই এ পরিণতি বাহাতে উপস্থিত না হয় একান্ত তাঁহারা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অসংযম বা উচ্ছলতা প্রবেশলাভ করিলে এই আচারগুলি উন্নতির দিকে না লইয়া অবনতির পথে নিক্ষেপিত হয়। একথা তাঁহারা স্পষ্ট উল্লেখ করিতে অসম্মত হইতেন না। অর্থলোভে, কামবশতঃ অথবা মুখলোভে যে-সকল লোক এই সমস্ত আচারে যোগদান করেন তাঁহাদিগকে যৌবন নরকে গমন করিতে হয়।^১ শুদ্ধমাত্র ভোগলিপ্সার বিনি মত্তপান করিবেন তাঁহার জন্ত কঠোর প্রাশস্তিক্তর ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। উত্তপ্ত মস্তকের দ্বারা যদি তাঁহার মুখ দগ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবেই তিনি শুদ্ধ হইবেন, অতথা নহে।^২ ভাগবতপুরাণকার বলিয়াছেন—যদাদি-ব্যবহারের প্রবৃত্তি লোকের মধ্যে স্বতই বর্তমান। ধর্মলাভের জন্ত নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহারের বিধান করিয়া শাস্ত্রকারেরা সেই উচ্ছল প্রবৃত্তিকে কতকটা নিয়মিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।^৩

কিন্তু একথাও স্থির যে, যে-উদ্দেশ্যেই ভোগমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করা হউক না কেন, ভোগলালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই থাকে এবং ইহা মানুষকে সমস্ত উচ্চ লক্ষ্য হইতে দ্রষ্ট করে। তাই তাত্ত্বিক আচার্যাগণ সাধারণ সাধকের জন্ত এই ভোগমার্গের বিধান করেন নাই, চরম সাধকের জন্তই এই চরম মার্গের বিধান। বোধ হয় চরম সাধক লোভমোহাদি রিপূর হস্ত হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারেন তাহারই পরীক্ষার জন্ত—

- ১। অর্থাৎ কামতো বাপি সৌখ্যাদপি চ বো নরঃ।
লিপ্সোনিরতো মস্ত্রী যৌবনং নরকং ব্রজেৎ।

—তত্ত্বসার (কুলচার-প্রকাশ)

এই প্রসঙ্গে গন্ধর্ব তত্ত্বের ৩৭৭ পটলের উক্তিগুলিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য

- ২। হর্যাপাদে কামরূতে জলন্তীং তাং বিনিষ্কিপেৎ।
মুখে তত্রা বিনির্দেহে ততঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।

—কুলাচর ২।১২৯

- ৩। লোকে ব্যবসায়মিবমজসেবা নিত্যাত্ম জ্ঞানো হি তত্র চোদনা।
ব্যবহিতস্তেহু বিবাহবন্ধহর্যাপাদেহোহ্যং নিরুত্তিরিষ্টা।

—ভাগবতপুরাণ ১১।৫।১১

সর্বপ্রকার বিকারের মধ্যেও যিনি আবিষ্কৃত তিনিই প্রকৃত সাধক—প্রকৃত বীর—এই সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ বীভৎস সাধনপ্রণালীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। যিনি এই সাধনপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহস করিতেন, তাঁহাকে বলা হইত বীর; কারণ, অনন্তসাধারণ শক্তির অবিকারী না হইলে কেহ এ-পথের পথিক হইতে পারে না। যে মদ্য দেবতাগণেরও মস্তান্তর আনয়ন করে সেই মদ্য বাহ্যকে বিকৃত করে না তিনিই প্রকৃত তান্ত্রিক।^১ এ-পথে যে প্রতি পদে বিপদ ও পতনের সম্ভাবনা, সুতরাং সাধারণের পক্ষে এ-পথ অবলম্বন করা যে শ্রেয়স্কর নহে সেদিকে তান্ত্রিক আচার্য্যগণ বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রকৃত অবিকারী ছাড়া—কুলমার্গের অমুখ্যগণ বাস্তবিক আর কেহই এ পথ অবলম্বন করিবেন না—ইহাই হইল সাধারণ নির্দেশ। উপবৃত্ত গুরুর নিকট হইতে এই সাধনপদ্ধতির গুচ রহস্য ও ক্রম না জানিয়া যে-বাস্তি নিজেকেই ইহার সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে কৃতকাৰ্য্যতা লাভ করিতে ত পারেই না, পক্ষান্তরে শুধু হাতে সাঁতার দিয়া অপর সমুদ্র পার হইতে গেলে বেঙ্গল উপহাসাস্পদ হইতে হয় সেইরূপ হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে।^২ খড়্গধারার উপর দিয়া গমন করা, বাঘের গলা জড়াইয়া ধরা, সাপ ধরিয়া রাখা প্রভৃতি সমস্ত দুষ্কর কার্য্য অপেক্ষা দুষ্কর—একরূপ অসাধ্য—এই সাধনপথ।^৩ সুতরাং সাধারণের পক্ষে এ-পথ অবলম্বন করা আর্য্যো বিধেয় নহে। শাস্ত্রের এই সকল স্পষ্ট উক্তি অনুধাবন করিলে কাহারও মনে কি এরূপ সন্দেহ জাগিতে পারে যে সাধারণকে অসৎ পথে প্ররোচিত করিবার জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি?

তারপর, তত্ত্বের এই সমস্ত আপত্তিজনক আচার সকল

সম্প্রদায়ের জন্য বিহিত নহে এবং কোন কোন সম্প্রদায় এই সমস্ত আচারের রূপক ও আধ্যাত্মিক অর্থ কল্পনা করিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে সকল আপত্তির মূল উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্বশ্রাব্যবাদি গ্রন্থের মতে এই সমস্ত আচার ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের স্বাভাবিক নৈতিক উৎকর্ষই বোধ হয় এইরূপ নিষেধের নিদান। বিভিন্ন নিম্নজাতির নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্যই বোধ হয় মূলতঃ এই সব আচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নানা দেবতার মধ্যে তান্দ্রার উপাসনার এই জাতীয় আচার বা বামাচার অবশ্য-পালনীয় এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু নিম্ন গাত্রের কৃষির দান প্রভৃতি কার্য্য আবার এই উপাসনারও এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে শাক্তদিগের মধ্যে এই সকল আচারের একচ্ছত্র আধিপত্য, তাহাদেরও সকল সম্প্রদায় ইহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। কাপালিক, ক্ষপণক, দিগম্বর প্রভৃতি কোল সম্প্রদায়ের আচার তান্ত্রিকাচার্য্য লক্ষ্মীধর তাহার আনন্দলহরীর টীকায় বিশেষভাবে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সময়চারের অমুখ্য। সময়মতে এবং পূর্বকৌল-মতে আস্তর যাগ বা মানসপূজারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনরূপ স্তবকারজনক আচার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। অনেক স্থলে এই সমস্ত আচারের রূপক অর্থ তাহার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সময়মতে তান্ত্রিক পূজার বাহ্যিক অমুষ্ঠান একেবারেই আদৃত হয় নাই। লক্ষ্মীধর বলিয়াছেন—সময়মতে যগের পুরস্কার নাই, জপ নাই, বাহ্য হোম নাই, বাহ্য পূজা নাই; এই মতে স্বয়ংকমল-মধ্যেই সমস্ত পূজার অমুষ্ঠান করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, মানস ধ্যানই এই পূজার প্রধান অঙ্গ এবং ইহা যে অতি উচ্চ অঙ্গের উপাসনা ও সকল উপাসনার আদর্শভূত তাহা সর্ববাদিসম্মত। তত্ত্বের অনতিপরিচিত পরানন্দমতাবলম্বিগণের সাধনপদ্ধতির মধ্যেও অনেক উচ্চস্তরের বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তান্ত্রিক উপাসনা হইলেও ইহাতে হিংসা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই সম্প্রদায়ের মতবাদগুলি বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

- ১। অহো পীঠং হস্তাধ্ব্যং মোহয়েন্নিদ্রানশপি।
তত্ত্বচ্যং কৌলিকঃ পীঠাং বিকারং নাশুয়াতু যঃ।
মহ্যাত্মক পুরো ভূম্যং স ভক্তঃ স চ কৌলিকঃ।
পরানন্দমত (বরোদা) পৃঃ ১৬

- ২। কুলধর্মরক্ষানন্ যঃ সংসারাত্যাক্ষিচ্ছতি।
পাশাধারমপারং সঃ পাশিত্যং তর্জু মিচ্ছতি—

- ৩। কৃপাধারাগমনাৎ ব্যাহ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজধারায়ামুদমশক্যং কুলবর্জনম্।

কুলার্ণব ২।৪৭

—কুলার্ণব ২।

তাত্ত্বিক আচারের যে আধ্যাত্মিক অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাও উল্লিখিত উৎকৃষ্ট সাধনপদ্ধতির প্রতিকূল নহে। যজ্ঞ, যাগ প্রভৃতি পক্ষ ‘য’কারেরই এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। তবে এক এক শব্দের নানারূপ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। নির্বিকার, নিরঞ্জন যে পরমব্রহ্ম তাঁহার পূর্ণনিঃশব্দ জ্ঞানকেই যজ্ঞ বলে।^১ যে কর্ম দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা হয় তাহারই নাম যাগ।^২ ইড়া ও পিজলা নাড়ীর মধ্যস্থিত বাক্যকে যিনি নিরুদ্ধ করিতে পারেন তিনিই যজ্ঞসাধক।^৩ এই সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অসাধু পদার্থকে সাধুভাবে দেখাইবার একটা ব্যর্থ চেষ্টামাত্র মনে হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মধ্যে জ্ঞান ও যোগমার্গের যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা তত্ত্ববিরোধী নহে। সুক্ষী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ যাহাই হউক না কেন, অনেকেই সেই নির্দেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন না বা করিতে পারিতেন না। তাত্ত্বিক আচারের অহুষ্ঠানপ্রসঙ্গে বা এই অহুষ্ঠানের ব্যপদেশে অনেকে উচ্ছ্বসিত হইতেন—যজ্ঞ-যাগাদির অথবা বহুল ব্যবহারে লিপ্ত হইতেন এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া বিরক্তির ভাজন হইতেন। তারপর, অনেক তত্ত্বগ্রন্থে নানারূপ অতিকুৎসিত অহুষ্ঠানের উল্লেখিত প্রশংসা যে জঙ্করে জঙ্করে সত্য নহে—উহা যে অর্থবাদমাত্র; এই সব অহুষ্ঠানেই যে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, অনভিজ্ঞ সাধারণে তাহা বুঝিতে পারিত না। লোকে ভাবিত—যজ্ঞাদিসেবন তাত্ত্বিক উপাসনার একটা

অপরিহার্য্য অঙ্গ। এক দল অসাধু চরিত্রের লোক এইরূপ মতবাদ যে প্রচার করে নাই তাহাও বলা যায় না। প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক গ্রন্থের মধ্যে এই জাতীয় কথা প্রক্ষিপ্ত করা অথবা এই সব মতবাদ তত্ত্বাকারে রচিত গ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রচার করা খুবই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় এক অনেকে এরূপ করিতেন বলিয়াও আশঙ্কা হয়। যজ্ঞতঃ, কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে এ-জাতীয় ব্যাপারের উল্লেখও যে না-পাওয়া যায় এমন নহে। কুলার্ণবে বলা হইয়াছে—সম্প্রদায়বঞ্জিত ও গুরুপদেশরহিত অনেকে নিজবুদ্ধি অনুসারে কৌলখণ্ডের কল্পনা করিয়া থাকেন।^৪

যামুনাচার্য্য তাঁহার আগমপ্রামাণ্য নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন^৫—আজও পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ তাত্ত্বিকতার ভাণ করিয়া তত্ত্ববিরোধী বস্তুসমূহ প্রচার করিয়া থাকেন। এই সব কারণেই বোধ হয় তত্ত্ব উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে অতি নীচ ও কুৎসিত বিষয়সমূহের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে, লক্ষ্মীধর, ভাস্করাচার্য্য প্রমুখ শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিকচার্য্যগণকর্তৃক একবাক্যে নিষিদ্ধ এই সমস্ত বিষয়ের জন্ত সমস্ত তত্ত্বশাস্ত্রকে দেবী সাবাস্ত না করিয়া তত্ত্বের প্রকৃত রহস্য উন্মোচনের জন্ত তত্ত্বসাহিত্যের বহুল প্রচার ও হুনিয়গ্রিত, সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা হওয়া দরকার। এই সমালোচনার ফলে প্রতিক্রমের প্রকৃত স্বরূপ ও সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে ইহার আপেক্ষিক অবস্থান নির্ণীত হইবে—তত্ত্বের নিগূঢ় তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু তত্ত্বসাহিত্য বিশাল—ব্যাপকভাবে সম্ভব প্রচেষ্টা ব্যতীত এ-কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আশার বিষয়, কোন কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-বিশেষের দৃষ্টি-এ-বিধে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং অপাংক্ত্যে তত্ত্বশাস্ত্রের আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে।

১। যজ্ঞতঃ পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।

তমিন্ প্রথমমং জ্ঞানং তদন্তঃ পরিকীর্তিতম্ ॥ (বিজয়তত্ত্ব)

২। যাগং সনোতি হি যঃ কর্ম তত্সং পরিকীর্তিতম্।

য চ কার্যপ্রতীকত্বং যোগিত্বাংসমুচ্যতে ॥ (বিজয়তত্ত্ব)

৩। পদাযমুনয়োমধ্যে যজ্ঞো যৌ চরতঃ সগা।

তৌ যজ্ঞো ভক্রেদ যন্ত স ভবেৎ যজ্ঞ সাধকঃ ॥ (আগমদার)

৪। বহবঃ কৌলিকং ধর্মং মিথ্যাচার্য্যবিদ্বৎকাঃ।

স্ববুদ্ধা কলয়ন্তীষং পারমার্থ্যবিশিষ্টতাঃ। কুলার্ণবঃ ২।১১৬

৫। অভ্যবেশি হি বৃহত্ত্বং কেতিদাসমিকচ্ছলাঃ।

অনাগমিকসেবার্ণং ব্যাচক্ষণা বিচক্ষণাঃ ॥ (হু. ৪)

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

(১১)

“না যা হয়েছে তা ফেরাবার যো নেই বটে—” চন্দ্রকান্ত দেখিলেন বিয়ের পাত্রের উপর খুঁকিয়া পড়িয়া হুশীলা অনায়াসে বলিয়া যাইতেছেন, “এখন নেই, কিন্তু যখন হাত ছিল তখন এ-সব কথা তোমার আগাগোড়া একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল বইকি। আশীর্বাদ হয়ে গেছে, এখন আর কি করবে? তাই বলে মন খারাপ করে থেকেও কোন লাভ নেই। হয়ত আমরা যা মনে করছি তা হবে না, ভালই হবে। অদৃষ্টের কথা কে বলতে পারে? আর মেয়েমানুষের সমস্তটাই যে অদৃষ্টের কাছে বাধা দেওয়া। তুমি আমি ভেবে আর কি করতে পারি বল?”

হুশীলা কোন এক হৃদ্রবর্তী অজানা অদৃষ্টের হাতে সকল ভার সঁপিয়া দিয়া শান্ত মনে গৃহস্থালীর কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু চন্দ্রকান্ত পারিলেন না মনকে শান্ত করিতে। তখন যাহার চিন্তায় তাঁহার মন ভরিয়াছিল, তাঁহার অধীর ক্ষয়, উৎসুক দৃষ্টি তাহাকেই যেন খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। নির্মলা নিকটে কোথাও ছিল না, বাহিরের ঘরেও তাহার দেখা মিলিল না। রাত অনেক হইয়াছে, সে তবে বোধ হয় শয়ন করিয়াছে মনে করিয়া চন্দ্রকান্ত একটা চেয়ারে বসিয়া চুপচাপ নিজের মনে হুশীলার কথাগুলি আর একবার উন্টাইয়া-পাটাইয়া দেখিতে লাগিলেন। কাষ্ঠিকের মাঝামাঝি, তেমন সময়েও বন্ধঘরে তাঁহার কেমন গরম গরম করিতে লাগিল। ছাদের খোলা হাওয়ার শয়নের আগে প্রত্যেক দিন তিনি খানিকটা করিয়া বেড়ান। আজ ছাদে আসিয়া দেখিতে পাইলেন ছাদের একপ্রান্তে আলিসায় তর দিয়া সাদা শাল গায়ে জড়াইয়া নির্মলা অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার ঝাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে তাহার পিছনে গিয়া তাহার মাথায় একটি হাত রাখিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হৃ-জনেই চুপ করিয়া থাকিলেন। তাহার পরে নির্মলা আন্তে আন্তে কহিল, “আমি বুঝতে পারছি কয়েক দিন থেকে তুমি মনে মনে কি যেন ভাবচ। মনে তোমার একটা ভার লেগেই রয়েছে। তুমি কিছুতেই স্থির হ’তে পারছ না। কিন্তু কেন তোমার এ ভাবনা বাবা? তুমি ভাল বুঝে আমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করবে তাতেই আমার ভাল হবে। আমার তাতে কোন মন্দ হ’তে পারে না। কেন একি তুমি বিশ্বাস কর না? কিন্তু আমি যে খুব বিশ্বাস করি। আমি ত এর চেয়ে অল্প রকম ভাবতেই পারিনে।” চন্দ্রকান্তের মনের ভার এক মুহূর্তে লঘু হইয়া গেল। চুপি চুপি কহিলেন, “এ কি তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ মা?”

নির্মলা বলিল, “তাই ত আমার বিশ্বাস।”

(১২)

বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পরের দিন নির্মলা কলিকাতা হইতে স্বামীর সঙ্গে স্বত্তরবাড়ি আসিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা কখনও না ভাবিয়া, এ-বিয়ের কোন আলোচনাতোও কখনও না যোগ দিয়া একবারেই সে বিবাহ করিয়াছে। এ নূতন জীবন তাহার সম্পূর্ণ অজানা।

আজ ফুলসজ্জা।

ঘরের মধ্যে আলো জলিতেছে, ঘামিনীর বৌদ্ধিদিরা পালকের গায়ে মল্লিকা খুঁই গোলাপের শালা গাঁথিয়া দোলাইয়া দিয়াছেন। টেবিলে ফুল, বিছানায় ফুল, টিপায়ে ফুলঝানিতে করিয়া ফুল। সমস্ত ঘর সুন্দর, সুসজ্জিত, সুরভিত। পালকের উপর বিছানাতে একটি রূপার রেকাবিতে করিয়া হুই গাছি বেলফুলের গ’ড়ে মালা রহিয়াছে।

আলোকে উজ্জ্বল এবং ফুলভারে আচ্ছন্ন এই কক্ষে একটি মর্মল-মোড়া চেয়ারে নিম্নলিখিত বসিয়া আছে। ঘরে আপাততঃ কেহ নাই। একটুকু পূর্বেও বামিনীর বোন এবং বৌদিদিরা ছিলেন, এখন তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন বামিনীকে ডাকিয়া দিতে।

নিম্নলিখিত একা বসিয়া থোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। জানালা দিয়া বামিনীদের হৃদয়িত বাগানের একপ্রান্তে গাছপালার অন্তরালে শীত-শীর্ণ গঙ্গার একটুখানি রক্ততারা দেখা যাইতেছে। আকাশে সবেমাত্র দু-একটি তারা উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যার বাতাস মশারির একপ্রান্তে কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে। নিম্নলিখিত সন্ধ্যার ঠিক এই হৃদয়িত অস্ত্রমণা হইয়া গিয়াছে। বাহিরে বাগানের ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না, শীর্ণ নদীরেখা—এসমস্তই কেন মনমুগ্ধ অপরিচিত জগৎ হইতে চোখের সম্মুখে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা হৃদয় কিস্ত হৃদয়ে প্রবেশপথ পায় নাই। তাহার নবজীবনের ঠিক আরম্ভেই সে কেমন একরকম শিথিল ক্লান্ত অবসাদ অনুভব করিতেছে। কিস্ত কেন? সে প্রশ্নও সে নিজেই অনেকবার করিয়াছে, উত্তর পায় নাই। এই ত সেদিন সে বাবাকে বলিয়াছিল, তিনি যাহা করিতেছেন তাহাতে তাহার ভালই হইবে। সেদিন মনের মধ্যে যে আশ্বাস যে পরম নির্ভর সে পাইয়াছিল সে কি ইহারই মধ্যে ফুরাইয়া গেল? কিস্ত আসল এ অবসাদের কারণ বাহিরের কোন ঘটনায় ছিল না, ছিল তাহার মনে। কাব্য উপন্যাসে প্রেমের কথা সে অনেক পড়িয়াছিল; জীবনে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই বলিয়া প্রেম যে সে একেবারেই বৃদ্ধিত না তাহা নহে। কিস্ত তাহার বিকাশোন্মুখ মন বিবাহের একেবারে অজানা রাজ্যে আসিয়া পড়িয়া এক মুহূর্তে স্বামী ও দাম্পত্যের বৃষ্টিয়া লইবার মত প্রস্তুত ছিল না। যে বামিনী বহু দিনের পূর্বরোগের সাধনায় তাহার প্রিয়তম হইয়া উঠিতে পারিত সে একেবারে স্বামী হইয়া আসিয়া নিম্নলিখিত প্রেমকে কুসুম-হুঁতুরির মত ধীরে ধীরে জাগিবার সময় দিল না। সংসার ও স্বামীর প্রতি কর্তব্যই তাহার মনে প্রথম দেখা দিল। কর্তব্যের বোঝা ও ভর মনকে অবসর করিয়া তুলিল।

খণ্ডরবাড়িত আসিয়া নিম্নলিখিত দেবিল মন্তবড় বাড়ি আর তাহার চেয়েও বড় পরিবার। জাহেরা, ননদেরা তাঁহাদের ছেলেরা, দাসীপরিজন, আশ্রিত-আশ্রিত, কুটুম্ব সমস্ত মিলাইয়া একটা বিরাট সংসার। খণ্ডরবাড়িতে তাহার সমসাময়িক কোন অভাব ঘটিল না। যদিও বয়স তাহার আঠারো, কিস্ত গঠনে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং তরী হওয়ায় তাহাকে বয়সের চেয়ে ছোট দেখাইত। আর তাহার মুখে ছিল এমন একটি সুকুমার কচি লাগণা... যাহা তরুণীর নয়—একান্তই বালিকার। শাণ্ডীর মনে ধরিয়াছে তাহার রূপ, আর তাহার চেয়েও বেশী মনে ধরিয়াছে তাহার বাবার দেওয়া একরাশি দামী জামা কাপড় এবং একরাশ অলঙ্কার। অল্পসে সমস্ত অলঙ্কার চন্দ্রকান্ত দেন নাই। বামিনী কিনিয়া তাঁহার কাছে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিল, তিনি কন্ডার সঙ্গে দিয়াছেন মাত্র। কিস্ত এত কথা এবাড়ির কেহ জানে না। সে সকল বধূর পিতার দেওয়া বলিয়াই লোকে জানে।

সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া নিম্নলিখিত শাণ্ডী প্রীত হইয়াছেন। মুখে না হউক মনে-মনেও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে তাঁহার অল্প সব বধূদের বেলায় তিনি এত পান নাই।

আরও যে-সংজ্ঞা-মনদ আছে তাঁহারা এই হৃদয়ী তরী তরুণী বধূকে দেখিয়া খুশী হইয়া হাসি তামাসা করিতেছেন। তাঁহারাও খুশী, কারণ কলেজে-পড়া বিদ্যায় বড় মেয়ে হইলেও নিম্নলিখিত অত্যন্ত বাধ্য। তাঁহারা মনে করিয়া ছিলেন আই-এ পাস-করা খাড়া ইয়ারে পড়িতে পড়িতে বিবাহ হওয়া মেয়ে বেশ করি বোমটা খুলিয়া বিহুনীর নীচে লম্বা রেশমের ফুল ঝুলাইয়া পায়ে সিঁপার পরিয়া ফটু কুঁ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, হাতের ভ্যানিটি বাগ হইতে ফণ ফণে এক পোচ পাউডার মাখিবে, চট্ করিয়া ছোট আয়নাটা বাহির করিয়া হাত দিয়া লামনের চুল কান চাকিয়া নামাইয়া লইবে। কিস্ত তাঁহাদের সে মনগড়া মেয়ের সহিত নিম্নলিখিত এতটুকু সাদৃশ্য ছিল না। সে বড় লক্ষ্মীমেয়ে। বড়বৌদিদি পাত কটিয়া চুলগুলি নামাইয়া বেমন করিয়া ঝাঁপটখানি পরাইয়া দিয়াছিলেন তেমনি পরিয়া আছে। সুব ফুটিয়া কিছু আপত্তি করে নাই। কিস্ত একটু বেন

বেগী শান্ত। নির্মলার মধ্যে কেমন বেন একটা প্রাণহীন জড়তা। কলর পুতুলর মত যে যা বলিতেছে তাই করিতেছে, কিন্তু তাহার মন যেন এস-বর মধ্যে নাই। এই সাংসারিক জগৎ তাহার একেবারে অনভ্যন্ত। এই সকল সাধারণ কথাবার্তা, সংজ্ঞা আনন্দ, তুচ্ছ বিষয় লইয়া আমোদ-আলাদা, মাতামাতি, এসবতে সে কিছুতেই যোগ দিতে পারিতেছে না। ছোট নন্দ মালতী যখন তাহার চুলের গোঁহা ধরিয়া টানিয়া দিয়া আদর করিয়া কহিল, “বল না বৌ ভাই, কথা বল না। ... নাঃ, আমার বৌ বড় চালাক। একেবারে ঝিমুর মত বসে রয়েছে, কিছুই ফাঁস করবে না, এই ওর পণ। নয় লো, ঠিক ধরেছি কি-না বল।” তাহার পরই হু-হাতে কণ্ঠ বেঁটন করিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিল, “বল না ভাই, তোর বর কাল রাত্রিতে তোকে কি বলেছিল? আমার মাথা খসে বল। আমি কারকে বলব না।” জীবনের যে-পক্ষের সহিত আপ্যাকে খাপ খাওয়াতেই তাহার সময় লাগিতছিল, তাহা লইয়া এই কৌতুহল ও হাঙ্গরিহাস দেখিয়া নির্মলা হঠাৎ প্রবল বিতৃষ্ণা শিহরিয়া উঠিল। এমনি একটা তরল রসে গদগদ আবহাওয়ার স্পর্শে তাহার সমস্ত চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। বাগদেব বুকের কোন প্রকার অসুখ থাকে তাহাদের উঁচু পাহাড়ে জায়গার হাওয়ায় নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ হয়, অস্বস্তি লাগে। নির্মলা এতদিন পর্যন্ত আপনার নিঃসঙ্গ মন লইয়া জ্ঞানের এবং ভাবরাজ্যের যে সুহৃৎম গিরিশিখরে বাস করিত সেখান হইতে হঠাৎ নিজেকে সংসারের সাধারণ মনের অতি কোমল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিচ্যুত দেখিয়া ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

ছায়ার বন্ধ করিবার শব্দ হইল। যামিনী ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া পালঙ্কের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইল। নির্মলা নিজের চিন্তায় এত তন্ময় যে দরজা খোলা এবং বন্ধের সেইটুকু শব্দ শুনিতে পাইল না। তাহার শুদ্ধ অন্তমনস্ক মুখের দিকে যামিনী একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিল। সে-মুখের অবিকারিণী এখন কোথায় কতদূরে কোন জগতে চলিয়া গিয়াছে, সে-জগতে কি যামিনীর স্থান নাই? চাহিয়া চাহিয়া তাহার একটা নিঃশ্বাস পড়িল। সামনে যে বসিয়া

আছে, এতদিন কেবল কাটিয়াছে তাহাকে কি করিয়া পাইবে, কেমন করিয়া জগতের সকল বাণক কাটিয়া তাহাকে একবারে আপ্যার করিয়া নিজের জীবনের সংসার করিয়া লইবে সেই চিন্তায়। আজ প্রথম সেই অবসর আসিল যখন বাহিরের বাণর কথা আর ভাবিতে হইবে না—যখন কেবল জলভতমাকে মৌনতার অবগুণ্ঠন হইতে বাহির করিয়া তাহার ক্ষয়স্পর্শ পাওয়ার অপেক্ষা।

যামিনী একটা ছোট চৌকি তাহার কাছে টানিয়া আনিয়া বসিল। তাহার একট হাত আপন হাতে তুলিয়া লইয়া উল্লে কণ্ঠ ডাকিল, “নির্মলা!”

নির্মলার মন একটু নরম হইল। যামিনীর কণ্ঠস্বরে কিছু একটা তাহার ভাল লাগিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া মুখ নামাইয়া লইল। যামিনী অধীর হইয়া আবার ডাকিল, “নির্মলা!”

নির্মলার ভাল লাগা যামিনীর অধৈর্য্যে আহত হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে বলিল, “কেন ডাকচেন? কিছু বলবেন?”

কিন্তু কিছু বলিবার জন্ত তে যামিনী ডাকে নাই। প্রেমের যে অকারণ চাকল্যে নাম ধরিয়া ডাকিবার আবেগ সেই আবেগেই সে ডাকিয়াছিল, কোন প্রয়োজনে নয়। ভাবিয়াছিল সাড়া পাইবে, যেমন করিয়া বসন্ত আসিয়া কানে কানে ডাকিলে তরুণব সাদা দেয়, অকারণ আনন্দে নবকিশলয়ে মর্ম্মরসমি জাগিয়া উঠে—তেমনি করিয়া কাহারও কাছে সাড়া পাইবে ভাবিয়াছিল। নির্মলার মনে যে রং ধরিবার উপক্রম হইতেছিল আপ্যার অধীর আগ্রহে যামিনী তাহা দেখিবার অবসর পায় নাই। কিন্তু নির্মলা যখন প্রশ্ন করিয়া বসিল, “কেন ডাকচেন?” তখন তাহার একটা উত্তর দেওয়া চাই। তাই তাহার আঙুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল,— “তুমি কেবলই বাবার কথা ভাব, আমার কথা একবারও ভাব না, নয় নীলা?”

“না। তা কেন?” নির্মলার বাবার প্রতি ভাল-বাসার মূল্য যে বোঝে না, তাহার কাছে আপ্যার মন-কণ্ঠ স্বীকার করিতে সে চাহিল না।

“কিন্তু আমি মনে করেছিলুম বাবার জন্তে প্রথম

প্রথম তোমার ভারি কষ্ট হবে। পরের বাড়ি মন ত কেমন করবেই।”

যামিনী নিশ্চলার মুখে একটা অন্ততঃ সমস্ত ভাল-বাসার কথাও শুনিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বাবার প্রতি ভালবাসার খোঁটা বার-বার শুনিয়া অভিমান করিয়া নিশ্চল বলিল,—“না, আমি কষ্ট হ’তে দেব না।”

“কেন গো? নিজের উপর এত জুলুম কেন?” যামিনী স্নেহে একটু চাট্টা করিয়া বলিল।

“না না, কষ্ট হ’লে চলবে কেন? এখন থেকে আপনার সঙ্গেই যে আমাকে থাকতে হবে। যত খাটাই খাই, তার জন্তে মনে মনে আমাকে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে।”

খুব কর্তব্যের কথা, স্থিরবুদ্ধির কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন হইতে যামিনী যাহা আশা করিয়া ফিরিতেছিল তাহা কিছুতেই পাইতেছে না। যেখানে যে হুরটি আসিয়া লাগিলে সমস্তই অনির্বচনীয় সমস্তই মধুর হইয়া উঠে, তাহা যেন কিছুতেই ঠিক জায়গায় লাগিতেছে না। নিশ্চলা যদি তাহার কথার উত্তরে বলিত, “হ্যাঁ, আমার বাবার জন্তে খুব মন কেমন করছে, সর্বদাই তাঁকে মনে পড়ে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে,” তাহা হইলে যামিনী সেই শোক-কাতরাকে আপনার বিশাল বক্ষে টানিয়া লইত, যেমন করিয়া পারে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে প্রফুল্লিত, আনন্দিত করিয়া তুলিত। বাহাকে ভালবাসে তাহার ক্ষেদনা দূর করিবার চেষ্টায় যে আনন্দ সেই বিপুল আনন্দ সে পাইত, তাহার বাখার ব্যথিত হইয়া সে নিশ্চলার আরও কাছাকাছি আসিত। কিন্তু তেমন কোন হাওয়া বহিল না। নিশ্চলা যে বাবার প্রতি ভালবাসার উল্লেখটা খোঁটা মনে করিল তাহাও সে বুঝিল না। কতদিন হইতে সে ভাবিতেছে কবে নিশ্চলাকে পাইবে, এই পাওয়ার পথে যত বাধা, সে-সব বাধার সহিত কতদিন ধরিয়া সে যুদ্ধ করিয়াছে। কত বিনীত রাতি মশারির ভিতর এ-পাশ ও-পাশ করিয়া কাটাইয়াছে এই বাধা দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে। এখন সে-সমস্ত ভাবনা-চিন্তা উপায় নির্ধারণের পালা শেষ হইয়াছে। অকস্মাৎ একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা, একটা উগ্র কাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির পর

মনে যেটুকু অবসাদ আসে সেইটুকু লইয়া সে নিশ্চলার কাছে আসিয়াছিল। মনে আশা ছিল যেহয়নী মাধুর্যময়ী নারী এমন করিয়া নিজেকে ধরা দিবে বাহাতে বসন্তের এক হিল্লোলে যেমন সমস্ত তরুণবয়স্ক মগ্ন হইয়া উঠে, তাহার রূপিপায় হৃদয় তেগনি ঝড় হইয়া উঠিবে। কিন্তু নিশ্চলা যে এখনও ঘুমাইয়া আছে; তাহাকে রূপকথার রাজকন্তার মত সোনার কাঠির অতি মৃদু স্পর্শে জাগাইতে হইবে—একথা যামিনী বুঝিত না।

নিশ্চলার আরও কাছে সরিয়া গিয়া সে তাহার খোঁপায় জড়ান মালতী ফুলের মালাটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে নাড়িয়া চাড়িয়া, আদর করিয়া, উচ্ছ্বসিত প্রেমে আচ্ছন্ন করিয়া এই শুভ হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রটিকে একাশু তাহার বলিয়া কাছে টানিয়া লইতে সে একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। কিন্তু নিশ্চলা চুপ করিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার মন সাড়া দিতে চায়, কি যেন তাহার ভাল লাগে। কিন্তু কোথায় যেন একটা ভয়, একটা বিতৃষ্ণা তাহাকে কঠোর করিয়া তুলিতেছিল। সন্ধ্যার আলো ক্রমশঃ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া আসিল। যামিনী উঠিয়া ইলেকট্রিক আলোটা নিবাইয়া দিতেই জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া নিঃশব্দ নারীমূর্তির উপর পড়িল। নিশ্চলা দৃষ্টি ফিরাইয়া যামিনীর দিকে চাহিল। সেই দুটি চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যামিনী এক সময়ে হঠাৎ নিশ্চলার হাতখানি টানিয়া লইয়া তাহাতেই মুখ লুকাইয়া কদম্বের ডাকিল, “নিশ্চলা, নিশ্চলা, নিশ্চলা...”

(১৩)

নিশ্চলা যদি সহজেই ধরা দিত, হয়ত যামিনী এত অশান্ত, এত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত না। সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মত বিবাহের পর প্রথম প্রথম দাম্পত্যনীতির সংঘ-সীমা লম্বাচ্ছে কিছু বাড়িবাড়ি করিয়া তাহার পরে স্বভাবের সহজ নিয়মে আপনি ধামিয়া যাইত। কিন্তু নিশ্চলার মনে যে একটি অনাসক্তির হুর, একটা বিচ্ছিন্নতার ভাব রহিয়াছে, তাহাতেই বাধা পাইয়া যামিনীর প্রতিহত আবেগ বিগুণ বেগে তাহার দিকে ধাবিত হইল।



ছই বোন
শ্রীদীপেন্দ্র কল দেববন্দ্য

প্রবাসী পেন, কলিকাতা

তাহার শেখ ল'পরীক্ষার আর মোটে-মাস ছুই বেশি। তাহার খাঁতাই একদিন মুহূর্ত্তপূর্ণা করিয়া বলিলেন,—
“হ্যারে বামিনী, বড়বোমারের কাছে গুনতে পাই তুই আজকাল মোটেই মন দিয়ে পড়াশোনা করিস নে। এবারে ত বিরের গোলযোগ চুকছে, এবারে কলকাতার ফিরে যা। গিয়ে পড়াশোনায় মন দে।”

বামিনী নতমুখে নিরুত্তরে ছিল। তেমনি করিয়াই থাকিল। কিছু বলিল না। তাহার মা আরও দুই-একবার জিজ্ঞাসা করিয়া বলার অবশেষে কহিল, “আচ্ছা, সে-দেখা বাবে।”

বড়বোমাদিকে ডাকিয়া কহিল, “তুমি বুঝি আমার নামে মা'র কাছে লাগিয়েছ?”

বোমাদি অবাক হইয়া গালে হাত রাখিয়া কহিলেন, “ওমা, সে কি কথা ঠাকুরপো! তবে তোমার দাদা কাল আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, যে, তোমার পরীক্ষা এগিয়ে এল, তুমিকবে কলকাতা বাবে আমাদের কাছে কিছু বলেছ কিনা? তার উত্তরে আমি বললুম, সে এখন কলকাতা বাবে কি, বোঁ নিরে যে মহা ব্যস্ত। এই ত ব্যাপার।”

বামিনী রাগ করিয়া কহিল, “আমার বোকে নিরে আমি যদি ব্যস্ত হই, তোমাদের তাতে কিএসে যায়?”

বোমাদি মুচকি হাসিয়া কহিলেন, “হ্যাঁ, তোমারই স্বীকৃতি ভাই। ভয় নেই, সে-সম্মুখে কেউ কোনো আপত্তি করবে না।”

বামিনী আরও রাগিয়া কহিল, “তানা কলক, কিন্তু আমি যদি কলকাতা যাই, জেন-বোকে হুকু নিরে বাব সঙ্গে ক'রে। একজনা যাব না।”

“ঠাকুরপো, তুমি হাসালে দেখচি। বেশ তো হু-জমেই একসঙ্গে বেয়ো, একসঙ্গে কলেজে পড়বে।” বোমাদি মুখে মঞ্চল দিয়া হাত নিবারণ করিতে করিতে ক্রম প্রস্থান করিলেন। যথাসময়ে কথাটা লালস্বারে যথাসময়ে হুড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তখনই তখনই বামিনী হাদের উপর উত্তেজিত ভাবে পারচারি করিতে করিতে আলিশার মু'দ্রিয়া ডাকিল, “বোদি, ও বোদি, আর একবার তনে বাঙ।” ডাক-বাক্যে ব্যস্ত হইয়া তিনি আবার ছাদে অবস্থিত।

“কি?”
“একবার নির্মলাকে আমার কাছে ডেকে দাও।”

“কখন?”

“এখনই।”

“মাগ কর তাই, এখন সে-আমি পারব না। সেখানে যা ব'লে আছেন, সেজবো ঠাকুরের খাবার করছে, নির্মলা সেইখানে ব'লে লুচি বেলে দিচ্ছে। সেখানে গিয়ে আমি কি ক'রে বেহারার মত বলি, ওলো, তোর বর ডাকছে শীগু'রী। ছুটে যা।”

“দেখ বোদি, তোমাদের এই সেকেন্দ্রে রসিকতাগুলো কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারিনে। আমার এক এক সময় ভয় হয় তোমাদের সংস্পর্শে নির্মলার নিশ্চয় দস্তর-মত কট হচ্ছে।”

বোমাদি ক্রুদ্ধমুখে অধর সংশন করিলেন। রাগে, অপমানে, ঈর্ষায় তাহার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। তথাপি সে-ভাবে গোপন করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিলেন, “তা তোমার সন্দেহ হয় ত মিছে নয় ঠাকুরপো। আমার মূর্খ, লেখাপড়া জানিনে, ইভর স্বভাবের। আমাদের সঙ্গে থাকতে গুঁর কট হবে বইকি।”

বামিনী জোর দিয়া বলিল,—“না বোদি, তুমি ওকে ডেকে দাও। স্বামী তার নিজের স্বীকৃতি ডাকচে, এর মধ্যে লজ্জা পাবার বিষয়টা আছে কোন্‌খানে? তা ছাড়া তোমরা ওকে দিয়ে কাজই বা করাও কেন? তোমরা জান না ও তার বাবার কাছে এতদিন কি নির্মলা আবেষ্টনের মাঝে কত স্বাচ্ছন্দ্যে মাহুয হয়েছে। ও কি পারবে সহজে তোমাদের এই সংস্পর্শ, এই-সব কথাবার্তা।”

বোমাদি আর সহিতে না পারিয়া ক্রমপক্ষে গল্লেশ্বর দরজা দিয়া চলিয়া গেলেন। বামিনী ছাদে অনেকক্ষণ অবধি অপেক্ষা করিয়াও আর না পাইল তাহার দেখা, না পাইল নির্মলার। তখন সে বিরক্ত হইয়াই অধীর চিত্তে নিজেই নীচে নামিয়া গেল। অন্ধরের অভিনায় তখন যেরূপের বৈকালিক কাজের কীড় লাগিয়াছে। বস্তুর কাছারি হইতে বিরিয়াজেন। কুখ্য ক্ষিপ্তহৃদে জনখাবার লাজাইতেছে, কেহ চা করিতেছে। তাহার হাতে-পায়ে জলদিয়া তোয়ালে দিয়া মুছিয়া লইয়া বেজবো একটি হাত-

পাখা দিয়া তাঁহাকে মুহু মুহু বাতাস করিতেছে। নির্মলা নতমুখে বসিয়া লুটি বেসিতেছিল। অনন্তান্ত হাতে কিছুই পরিপাটি করিয়া হইতেছে না। তবু নিঃশব্দে যথাশাখ্য চেষ্টা করিতেছিল। কলিকাতার এ-সময়টা সে ছাদে পাখচারি করিয়া বেড়াইত, স্পেলার কিংবা বার্সে। লইয়া পড়িত। বেথানটা বৃষ্টিতে পারিত না। পিতা আসিয়া বলিয়া দিতেন। কলিকাতার অহঙ্কল স্নান সূর্যাস্তের সময় নির্জন আকাশের তম্বার শিতাপূত্রীর মাধে একটি অখণ্ড ভাবলোক সজ্জিত হইয়া উঠিত। আজও হয়ত তেমনি নিঃশব্দ দীপ্তির সমারোহে সূর্যাস্ত হইতেছে, ঘোমটার আড়াল হইতে নির্মলা চাহিয়া দেখিল দিবসের শেষ রক্তিম ছটা আলিনার প্রান্তে সজ্জনা গাছটার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে ঘরকন্নার এই বাঁধনের মাধে এই হটগোল কোলাহলের মধ্যে অবগুষ্ঠনে বদ্ধ হইয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু কষ্টের কথা বলিলেই চাপিয়া রাখিয়াছে, কাহাকেও বলে নাই। কাহাকে বলিবে? সবাই তাহার অপরিচিত। বামিনীও এখন তাহার কাছে অপরিচিত।

অন্তঃপুরের এই ঘরকন্নার কাজের মাধখানে বেথানে টুকরা টুকরা হাসি গল্প নিন্দা ঠোট-বাকান, হাতের চুড়ি-বালার রিনি ঠিনি আওয়াজ সব মিলিয়া জড়াইয়া সৃষ্ট হইয়াছে একটা মুহুযমুহু শব্দ, সেখানে বামিনী হঠাৎ ঝড়ের মত অপ্রত্যাশিত রূপে গিয়া হাজির হইল। একেবারে কর্মনিরস্তা নির্মলার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “ছাদে চল। কথা আছে।”

নির্মলার মাথা হইতে অবগুষ্ঠন খুলিয়া গেল। বিম্বিত দৃষ্টিতে বামিনীর দিকে চাহিয়া সেই একঘর গুরুত্ববোধের সামনেই সে প্রশ্ন করিল, “কেন?”

নির্বোধ তরুণীর এই অসম্বোধ প্রশ্নের পরিবর্তে তখনই সজ্জার ঘরিয়া গিয়া মাথার আবার অবগুষ্ঠন খুলিয়া দিবার কথাটাও মনে রহিল না। জায়েরা মুখ টেপটিপ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বামিনী পুনর্বার প্রকল বেগে তাহার হস্ত আকর্ষণ করিয়া কহিল, “চল, বিশেষ ঘরকন্নার আছে।”

জগদী বেলুন শাড়িয়া বহিল। হাতের কাছ ফেলিয়া

বু উঠিয়া উপরে গেল। শান্তকী মুখ গভীর করিয়া থাকিলেন। অনেকে ঠোট বাকিয়া আড়ালে একটু হাসিয়া লইল।

উপরে বামিনীর শয়নঘর-সজ্জার ছাদে সামনা-সামনি দু-খানি চেয়ার পাতি ছিল। চারিপাশে টব সাজান। চাকরে পাশে একটি ছোট টেবিল রাখিয়া তাহার উপর শুভ্র আন্তরণ বিছাইয়া দিয়া গিয়াছে। মালী আসিয়া প্রকাণ্ড দুইটা গোলাপ ও ক্রীসান্থীমায়ের তোড়া রাখিয়া গেল। আয়োজন সুসম্পূর্ণ। সজ্জার রক্তরাগ পশ্চিম দিগন্তে তখনও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। নির্মলাকে ছাদে আনিয়া বামিনী চেয়ারে বসাইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নির্মলা বলিল, “আমাকে ডেকেছেন কেন?”

কেন ডাকিয়াছে আজও তাহার উত্তর বামিনীর জানা নাই। তাই প্রত্যুত্তরে সে কেবল ভাবাহীন নীরব ব্যাকুলতার নির্মলার বাঁ-হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইল। ময়দা মাথিতে গিয়া নির্মলার নীলার আঁচের পাখরের খাঁজে ময়দা লাগিয়াছিল, কুম্ভমহুমুয়ার হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া ঐটুকুতে নজর পড়িতেই বামিনীর সমস্ত মন বাথায় ভরিয়া উঠিল। কিছুই না, এইটুকু মাঝে একটুখানি বাাপার, কিন্তু তাহাতেই যেন খোঁচা খাইয়া তাহার বকের সমস্ত স্নেহ এক করুণা উবেলিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে উজ্জ্বলিত হইয়া ভাবিতেছিল, একে? ইহাকে আমি কোথা হইতে আনিলাম? এমন হৃদয় হৃকোষল জ্বরখানি, ইহাকে আমি কেমন করিয়া রক্ষা করিব? সংসারের হুল হস্তাবলোপ হইতে তাহাকে যেমন করিয়া পারি আমি বুঝে সরাইয়া রাখিবই। সে যেন কোনদিন মর না করে যে তাহার স্নিগ্ধ জীবনজন্মে হইতে আমি তাহাকে লোভের বশে তুলিয়া আনিয়াছি। বামিনীর সমস্ত মন নির্মলার জন্য কিছু একটা কহিতে, কোন একটা দুঃস্বপ্ন ভাগবীকার, কোন একটা কঠিনতম পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

নির্মলা বিম্বিত হইয়া হৃদের তোড়ার দিকে তাকাইয়া ছিল। তাহার মাথী তোড়াটা খুলিয়া সে-সমস্ত হুল অঙ্গলি ভরিয়া তাহার আঁচলের উপর রাশিকত

করিয়া চাশিয়া দিল। তাহার পর কহিল, “এ সময়ে তুমি কলকাতায় কি করতে নীলা? আমি প্রায়ই দেখেছি এ সময়টাতে তুমি আর তোমার বাবা হু-কনে মিলে কোন একটি বই পড়তে কিবা সেই বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে। এখানেও তাই কর না কেন? তোমার সঙ্গে মিলে পড়তে আমারও ভাল লাগবে। ভাল বই কি একলা পড়ে সুখ হয়?” বামিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘর হইতে রবীন্দ্রনাথের পূরবী আর মহুয়া লইয়া আসিল। কিরিয়া আসিয়া বইয়ের পাতা উন্টাইত উন্টাইতে কহিল, “কিন্তু একটা কথা সে ভুলে গেছি, নির্মল। তুমি ত বিকেলে বরাবর চা খাও। এখন নীচে নিশ্চয়ই খেয়ে আসনি। বৌদিরা খান না ব’লে নীচে তোমারও বোধ হয় খাওয়া হয়নি। আগে চা খাও, তার পর পড়বা।”

চাকরকে ডাকিয়া বামিনী চ-পেয়ালা চা আনিতে বলিল।

চা আসিল। ফলের গন্ধ ছুটিতে লাগিল। মহুয়া পড়া চলিতে লাগিল, পশ্চিম আকাশ হইতে সোনালী আভা আসিয়া নির্মলার চুলে, সোনার ছায়ে পড়িয়া কিছুক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই বামিনীর মন ভরিল না। সে যাহা চায় কিছুতেই তাহার ধরাইয়া পাইল না। এত করিয়াও নির্মলার জন্যে সে ঠিকমত স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, তাহার এমনি বোধ হইতে লাগিল। সে পাগল হইয়া বাইবে! একটা রুদ্ধ লোহার দরজার সামনে দাঁড়াইয়া সে তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও যেন তাহা খুলিতে পারিতেছে না। এমনি একটা পরাভবের স্থান, নিরাশার উদ্ভঙ্গনা ভিতরে ভিতরে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

হঠাৎ এক সময়ে পড়া থামাইয়া বলিল, “কই, তুমি শুন না ত নির্মল! তোমার ভাল লাগছে না?”

নির্মল চমকিয়া উঠিল, “কেন শুনছি বইকি।

বেশ ত। কিন্তু তাহার সেই চমকটা এতই সুন্দর যে বামিনী একটু রুদ্ধ হয়ে বলিল, “না, শুনছি না। মনও মিচু না। তোমার একেবারেই ভাল লাগছে না। কিন্তু কেন? আমি তোমার বাবার মত পড়ি না ব’লে? আর এটা কলকাতা নয় ব’লে?” বই ফেলিয়া দিয়া চটখুতা কট্ কট্ করিতে করিতে সে সেখান হইতে চলিয়া গেল। আবার তখনই কিরিয়া আসিয়া পিছন হইতে নির্মলার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, “আমার উপর রাগ করলে?”

“না।” কিন্তু নির্মলার চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল।

“ভাল ক’রে কথা বল নির্মল। আমাকে ব’কে স্বকে, আমার উপর রাগ কর, অভিমান কর। আমাকে কটু কথা ব’ল, কিন্তু শুধু ‘হ’ আর ‘না’ দিয়ে কথা সেরে দিও না—” বলিতে বলিতে তাহার একটা হাত টানিয়া লইয়া বকের উপর রাখিয়া কহিল, “না, না, ও জিনিষ আমার সহ্য হয় না। দেখতে পাচ্ছ না, বুঝতে পারছ না নির্মল, ওতে বুক আমার ভেঙে যাচ্ছে। তার চেয়ে তুমি আমাকে কাঁদাও, খুব গভীর ব্যথা দাও, কিন্তু নিতুন, এমন ক’রে নিঃশব্দ যুগা দিও না।”

নির্মল অবাক হইয়া গেল। একবার হাতটা ছাড়াইয়া লইবারও চেষ্টা করিল, পারিল না। বামিনী আরও দৃঢ় বলে তাহা চাপিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণার তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এই চর্দমনীর আবেগে, তাহার স্বামীর এই গদগদ তরলতায় সে যেন মরমে মরিয়া গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও তাহার ঐশ্বর্যশালিনী নারী-প্রকৃতি এই ধূলার লুটাইয়া পড়া আত্মরের প্রেম-নিবেদনে মরমে মরিয়া গিয়া সমগ্রমে অন্তর্দিকে সুখ ফিরাইল। কিন্তু হায়, এ যে তাহার প্রেমেরই জাগরণ তাহা বামিনী বুঝিল না। নির্মলা আপনার অজান্তসারে আজ কল-লোকের প্রেমের অসুস্থানে কিরিতে আরম্ভ করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

ম্যাডাম কুরী

আচার্য্যী প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও স্রীমতীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডি-এসসি

ম্যাডাম কুরীর নাম বিজ্ঞানজগতে সকলেরই সুপরিচিত। সাধারণতঃ বিজ্ঞান-বিভাগে নারীর দান সামান্য। বুদ্ধি-বৃত্তির অপকর্ষতাই যে ইহার কারণ, এমন নহে—সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার বিজ্ঞানচর্চার সম্পর্কে আনিবার সুযোগ পান না। সুযোগ ও সুবিধা ঘটিলে মহিলারাও যে কত কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন, ম্যাডাম কুরীর জীবনী আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কুরী তাঁহার জীবনকালের অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই বিজ্ঞানজগতে এক অভিনব আবিষ্কার করিয়া এক নতুন ধারা খুলিয়া দিয়াছেন।

পোলাণ্ড দেশের ওয়ার্স নগরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর ম্যাডাম কুরীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ডক্টর স্ক্রোডাউস্কী অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। অল্প বয়সে মাতার মৃত্যু হওয়ার কুরী তাঁহার পিতার তত্ত্বাবধানে বাল্যকালে প্রতিপালিত হন। একটু বয়স হইলে তিনি তাঁহার পিতার ল্যাবরেটরীতে কাজ শিখিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, বাল্যকালে ম্যাডাম কুরী তাঁহার পিতার নিকটে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির মূল কারণ হইয়াছিল।

পোলাণ্ড দেশের যে-অংশে ডক্টর স্ক্রোডাউস্কী বাস করিতেন তাহা রুশিয়া দেশের অন্তর্গত ছিল। রুশিয়ার কায়ের অভ্যুত্থানে প্রলীড়িত হইয়া অনেকে কায়ের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিত এবং ম্যাডাম কুরী দেশ-শ্রেমিক পিতার আদর্শে অসুপ্রাণিত হইয়া এই প্রতী-ভুক্ত হন। শীঘ্রই একটি বিপ্লবীর দল গড়িয়া উঠিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রুশিয়ার পুলিশ এই রাষ্ট্রবিপ্লব-পন্থীদের সন্ধান পায়। এই ঘটনার পরে মেরী

স্ক্রোডাউস্কীর পক্ষে পোলাণ্ডে নিরাপদে কালযাপন করা বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। তিনি একাকী রিক্তহস্তে প্যারীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা কম ছিল এবং অর্থের অনটনহেতু মেরী স্ক্রোডাউস্কী নিত্যন্ত দরিদ্র ভাবে কালযাপন করিতে থাকেন। অল্পমসয়া তখন তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল এবং দৈনিক খরচ দশ সেট যোগাড় করিবার জন্য তাঁহাকে সোর্বনের ল্যাবরেটরীতে শিশি বোতল প্রভৃতি পরিষ্কার করার কার্য্য করিতে হইত। ঘরে আগুন দিবার জন্য অর্থাভাবে তাঁহাকে নিজের কয়লা বহন করিতে হইত এবং দিনের পর দিন তিনি কেবল স্টাট ও দুধ খাইয়াই জীবননির্ব্বাহ করিতেন। মাংস ব্রাণ্ডী প্রভৃতির স্বাদ প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

এই সময়ে সোর্বনের ল্যাবরেটরীর পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগের অধ্যক্ষ গেব্রিয়েল লিপম্যান এবং হেনরী পৌয়াকারের সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ হয়। তাঁহার অবস্থা শুনিয়া এবং কার্য্যকুশলতা দেখিয়া লিপম্যান ও পৌয়াকারে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন এবং পেরী কুরী নামক একটি মেথাবী ছাত্রের সহকারী রূপে কার্য্য করিবার আদেশ দেন। একত্র কার্য্য করিবার কালে পেরী কুরী এবং মেরী স্ক্রোডাউস্কী উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পবিত্র সূত্রে আবদ্ধ হন। উভয়েই বিজ্ঞান-সেবতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন এবং আজীবন পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন।

এই সময়ে পরমানব্দ্য রাস্যাপারসকল খরিস্কিত হইতেছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম কুকস্‌ বেণ্ডাইসেন যে শূন্য কাচনলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক ধার হইতে (negative pole)

* বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল মেরী স্ক্রোডাউস্কী।

একপ্রকার আশ্চর্য্য রশ্মি বাহির হয়। তিনি উহার নাম দিলেন বিয়োগ-রশ্মি (cathode rays.)

এই নূতন রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয় করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নানা প্রকার পরীক্ষা ও তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্তর জে. জে. টমসন্ এই সমস্যার সমাধান করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, এই রশ্মিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাভাজিত কণার সমষ্টিমাত্র। এই কণাভাজিত কণা অথবা ইলেকট্রনের ওজন একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর চুই সহস্র ভাগের একাংশ মাত্র। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক উইল্‌হেল্ম রন্টজেনের এক-রে আবিষ্কারের কথা আসিয়া পড়ে। তিনি দেখাইলেন যে, বিয়োগ-রশ্মি কোনও বস্তুর উপর পতিত হইলে ঐ বস্তু হইতে এক অপূর্ণ রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি ধাতু, পাথর কিংবা কাঠের আবরণ অনায়াসে ভেদ করিতে পারে। এই রশ্মি মহুবা চন্দ্র ও মাংস ভেদ করিয়া অস্থিতে বাধা পায়। হুতরাং এই রশ্মির সাহায্যে ফটোগ্রাফ তুলিলে মহুবার শরীরের অস্থিতে কোথাও কোন বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়াছে কিনা সহজেই ধরিতে পারা যায়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরেল (Becquerel) এক নূতন রশ্মি আবিষ্কার করিলেন। নানা প্রকার প্রফুরণশীল (Phosphorescent) পদার্থের প্রকৃতি পরীক্ষাকালীন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ইউরেনিয়াম এবং উহার যৌগিক পদার্থসমূহ হইতে এক প্রকার রশ্মি নির্গত হয়, যাহা রজনরশ্মির অথবা এক-রের সমগুণবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, এই সকল রশ্মি বায়ু অথবা অন্য কোনও বাষ্পের ভিতর প্রবেশ করিলে উক্ত বাষ্পকে তড়িৎ-পরিবাহক করে। আবিষ্কার নাম অহুসারে এই নূতন রশ্মির নাম হইল বেকেরেল রশ্মি।

বেকেরেলের প্রণালী অহুসরণ করিয়া ম্যাডাম কুরী এই নূতন রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি দেখিলেন যে, ইউরেনিয়াম ব্যতীত অন্য এক প্রকার পদার্থ হইতেও উক্ত প্রকার রশ্মি নির্গত হয়। ম্যাডাম কুরী এই নূতন পদার্থের নাম দিলেন থোরিয়াম। এই সকল

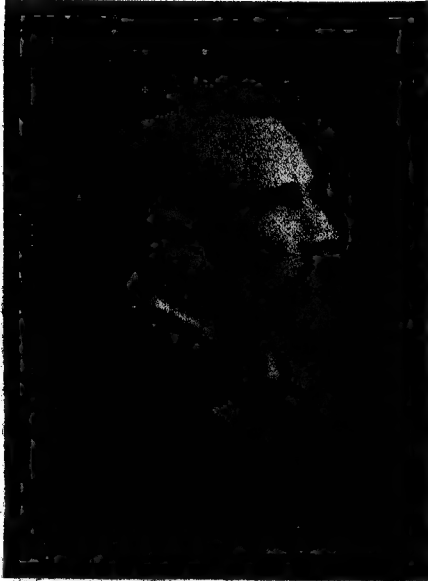
গবেষণা-ফলস্বে ম্যাডাম কুরী লক্ষ্য করিলেন যে, পিত্ত্রের নামক ইউরেনিয়ামসংযুক্ত ধনিজ পদার্থ হইতে যে-রশ্মি নির্গত হয় তাহা বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম হইতে নির্গত রশ্মি অপেক্ষা চার-পাঁচ গুণ অধিক শক্তিশালী। ম্যাডাম কুরী অহুমান করিলেন যে পিত্ত্রের মধ্যে



ম্যাডাম কুরী

ইউরেনিয়াম ব্যতীত নিশ্চয়ই এমন অন্য জিনিষ আছে যাহা ইউরেনিয়াম হইতে অধিকতর শক্তিশালী রশ্মি নির্গত করিতে পারে। এ-পর্যন্ত ম্যাডাম কুরীর কোনও সহকারী ছিল না। এক্ষণে তাঁহার স্বামী অধ্যাপক পেরী কুরী তাঁহার সঙ্গে একত্রে এই অজ্ঞাত বস্তুর অহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রধান অন্তরায় হইল যে, পিত্ত্রের মধ্যে এই অজ্ঞাত বস্তুর পরিমাণ অত্যন্ত কম। কাজেই তাঁহাবিশেষে প্রচুর পরিমাণ পিত্ত্র লইয়া কার্য আরম্ভ করিতে হইল। এই কার্যের জন্য অস্ট্রীয় গবর্নমেন্ট বোহেমিয়া দেশের অন্তর্গত ইউরেনিয়ামের ধনি হইতে কুরীদ্বয়কে এক টন পিত্ত্র উপহার দিলেন। সাধারণতঃ পিত্ত্রের মধ্যে নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। হুতরাং উহা হইতে

তাঁহাদের অভীক্ষিত বস্তুর সন্ধান পাওয়া অতীব আশাস-
সাধ্য ব্যাপার। এক টন অর্থাৎ ২৭ মণ পিচব্লেণ্ড হইতে
১ গ্রাম ওজনের ৬০০ শত ভাগের এক ভাগ অতি শক্তিশালী
অন্তঃজ্যোতির্ময় পদার্থ পাওয়া যায়। ম্যাডাম কুরী



মেরী কুরী

ইহার নাম দিলেন রেডিয়াম। দীর্ঘ বারো বৎসরব্যাপী
অক্লান্ত পরিশ্রমসংকারে পরীক্ষা করিবার পর তিনি ১৯১০
খৃষ্টাব্দে বিসুদ্ধে রেডিয়াম ধাতু প্রাপ্ত হইলেন। এখানে
বলা আবশ্যক যে, রেডিয়াম আবিষ্কার করিবার পূর্বে
তিনি স্বতঃজ্যোতির্ময় আরও একটি মৌলিক পদার্থের
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্বদেশের স্বজিৎকর্ম উক্ত
বস্তুর নাম দিয়াছিলেন,—পোলোনিয়াম।

এই প্রসঙ্গে রেডিয়াম সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত বিবরণ
দেওয়া অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। ক্যাসিমীর ও কডকগুলি
চর্মরোগ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় রেডিয়াম-
চিকিৎসা। রেডিয়াম একটি তীব্র শক্তিশালী জ্যোতির্ময়
পদার্থ। হৃদয় হইতে আলোক-বিস্কৃত হইয় বলিয়াই এই

আলোক বিকীর্ণ হয় আমাদের চক্ষে তাহা ধরা পড়ে না।
অথচ এই আলোক স্বর্ঘ্যের আলোক অপেক্ষা বহুগুণ
শক্তিশালী। স্বর্ঘ্যের আলোক আমাদের চামড়া তেজ
করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু রেডিয়াম হইতে
নির্গত আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইলে শরীরের অন্তঃস্থিত
প্রত্যেকটি অংশ-বিশেষ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। নষ্টজেন
কর্ষক আবিষ্কৃত এক্স-রে'র বিবরণ পূর্বেই দেওয়া
হইয়াছে। এই রেডিয়াম হইতে যে আলোক বিকীর্ণ হয়
তাহা এক্স-রে'রই অমূরূপ। মাত্র এক গ্রাম ওজনের
রেডিয়াম হইতে এই জ্যোতির্ময় যে শক্তি নির্গত হয়
তাহা এক গ্রাম ওজনের কয়লা হইতে প্রাপ্ত তাপশক্তির
দশ লক্ষ গুণেরও অধিক।

রেডিয়াম যে কেবল মানুষের উপকারে আসিয়াছে,
এমন নহে। বিজ্ঞানজগতে ইহা যে কত গভীর রসত্ত্বের
উদ্ঘাটন করিয়াছে, তাহার ইংিতা নাই।

বলা বাহুল্য, ম্যাডাম কুরীর আবিষ্কার বিজ্ঞান-
জগতের একটি নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। ম্যাডাম
কুরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্তান্ত দেশে বহু
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এই স্বতঃজ্যোতির্ময় (Radioactive)
পদার্থসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন।
তন্মধ্যে রাডারফোর্ড, সডি, রামসে ও বোল্টউড-এর
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর চতুর্দিক হইতে
ম্যাডাম কুরী অভিনবিত হইতে লাগিলেন। ১৯০০
খৃষ্টাব্দে কুরীসহ ও বেকেরেল একত্রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান
'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম কুরী অতি উচ্চ সম্মানের
সহিত প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-অফ-সাইন্স উপাধি
প্রাপ্ত হন। বোধ হয় জগতের ইতিহাসে বিভিন্ন বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ডক্টর-অফ-সাইন্স উপাধির সমস্ত বে-সকল
মৌলিক গবেষণা দাখিল হইয়াছে ম্যাডাম কুরীর গবেষণা
তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আরেনিয়াম কৃত দ্রব্যীভূত পদার্থের
তাড়িত বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় গবেষণা দ্বিতীয় স্থান অধিকার
করে বলা বাহ্যে পারে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দেই ম্যাডাম কুরী
ও তাঁহার স্বামী লর্ড কেম্‌ডিনের আমন্ত্রণে লণ্ডনে উপস্থিত

রেডিয়াম সন্ধানের এক কল্পনা দেন এবং কুরীর রয়াল সোসাইটির ডেক্স অফিসার প্রাপ্ত হন। পর-বৎসর ম্যাডাম কুরী সোর্বনের ল্যাবরেটরীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এক মোটর-অ্যাকসিডেন্টের অধ্যাপক পেরী কুরী মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই আকস্মিক বিপদে ম্যাডাম কুরী অত্যন্ত শোকাভিত্ততা হইয়া পড়েন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য এতদূর খারাপ হইয়া পড়ে যে তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবর্গ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর ধীরে ধীরে সুস্থিতি লাভ করেন। স্বাস্থ্যলাভ করিবার পর তিনি পুনরায় বিজ্ঞানের সেবার নিজেকে নিযুক্ত করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম কুরী দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানজগতের ইতিহাসে একই ব্যক্তি ইহার পূর্বে আর কখনও দুইবার নোবেল পুরস্কার পান নাই। ম্যাডাম কুরীর পরে অধ্যাপক আইনস্টাইন দুইবার নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর ম্যাডাম কুরী দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার পাইলেন সেই বৎসর ফ্রেন্স ইন্সটিটিউটের সভা তালিকা ভুল করিতে ম্যাডাম কুরীর নাম উল্লেখিত হয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, উক্ত সভার পুরস্কার সভ্যেরা ম্যাডাম কুরীর নাম সভা-তালিকাভুক্ত করিয়া লইতে রাজি হইলেন না। তাঁহার এই যুক্তি দেখাইলেন যে এ-পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক এ-সভার সভ্য হয় নাই এবং এ-নিয়ম এখনও ব্যতিক্রম হইবে না। বলা বাহুল্য, ইহাতে ম্যাডাম কুরীর গম্মানের কোনও হাল হয় নাই—পক্ষান্তরে ফ্রেন্স ইন্সটিটিউটেরই গম্মানের লাঘব হইয়াছে।

পেরী কুরীর আকস্মিক মৃত্যুর পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম কুরী সোর্বনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই বৎসর তিনি পোলোনিয়াম সন্ধানের এক কল্পনা দেন তাহা তদ্বিচার জন্ত লণ্ডন হইতে লর্ড কেলভিন, ডক্টর উইলিয়াম রামসে, ডক্টর অলিভার লজ প্রমুখ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ প্যারীতে উপস্থিত করেন। বিগত বহুবছর আরও দুইবার কিছু পূর্বে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় সভ্য-জ্যোতিষের পদার্থসমূহের গবেষণার জন্য 'রেডিয়াম

ইন্সটিটিউট' নামে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ম্যাডাম কুরী করাসী গবর্নমেন্ট কর্তৃক উহার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই গবেষণাগার দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার একটি অংশের নাম 'কুরী ল্যাবরেটরী', অপর



পরীক্ষাগারে ম্যাডাম কুরী

অংশের নাম 'পাস্তুর ল্যাবরেটরী'। কুরী ল্যাবরেটরীতে স্বতঃজ্যোতিষের পদার্থসমূহ সন্ধানের গবেষণা হয় এবং পাস্তুর ল্যাবরেটরীতে এই পদার্থগুলি কি উপায়ে চিকিৎসাকার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে তদ্বিষয়ে গবেষণা হয়। ফরাসী সামরিক হাসপাতাল বলিতে, রেডিয়াম সন্ধানের ব্যবহারী চিকিৎসা ব্যাপারে উক্ত গবেষণাগার হইতে সাহায্য আসে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ম্যাডাম কুরী এই ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হতাশ্রমে কার্য নিরীহ করিয়া গিয়াছেন।

আইরিন (Irene) ও ইভ (Eve) নামে ম্যাডাম কুরীর দুই কন্যা বর্তমান। ম্যাডাম কুরী তাঁহার সহস্র কাজের মধ্যেও কন্যাদিগের প্রতি যত্ন লইতে ক্রটি করিতেন না। কন্যাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহাৰাদি

নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি নিজে আজীবন সাদাসিধা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। বিলাসিতা কখনও তাঁহাকে তিলমাত্র আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

এই মহারানী মহিলার দুহাতে বিজ্ঞান-জগতের বিশেষতঃ কনাসী-জাতির যে বিরাট কৃতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবে না।

মাদাম ক্যুরি

ডক্টর জি.শিশিরকুমার মিত্র, ডি-এসসি

১৯২২ সালের কেমব্রিজী মাস। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আমরা কয়েক জন প্যারিসে রয়েছি। প্যারিসের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়—সর্বনে (Sorbonne) নোঙল দেখা গেল যে, মাদাম ক্যুরি ‘আইসোটোপ’ (isotope) প্রকৃতি বস্তু হইবেন। অনেক দিগ হইতেই এই বিশিষ্টা মহিলাকে দেখার ইচ্ছা ছিল, হুতরাং নির্দিষ্ট দিনে বস্তু—কলকিঞ্জি স্যাক্সিবিরেটোরে উপস্থিত হওয়া গেল। স্যালারি প্রোভার পূর্ণ। পুরুষ ও মহিলা ছাত্রছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ও অনেক সম্ভ্রান্ত নরনারী বহুস্তার বোগ দিতে উপস্থিত হয়েছেন। মাদাম ক্যুরি কক্ষে প্রবেশ করতই প্রোভারগুলি বগায়মান হয়ে তাঁকে সন্মিলন করলেন। বক্তৃতা শুরু হ’ল। মন্তিরিকার ও প্রাঞ্জল ভাবের মাদাম ক্যুরি তাঁর বক্তব্য বলতে লাগলেন। তাঁর কাছে তাঁর কন্যা ইরেন (Irene) দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আবশ্যকমত মাতাকে পরীক্ষণে সাহায্য করছেন, ও ব্র্যাকবোর্ড তুলে নামিয়ে বা পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। কর্মজীবনের দশবাদের মুখে কর্মরত প্রৌড়া মাতার কাহাকে মাতৃত্ব এই দুবতী কতার সমালম আবাসের কাছে বড় প্রতিকর লাগল।

প্রায় এক বৎসর পরে মাদাম ক্যুরির সঙ্গে আর একই বসিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। প্রায় তিন মাস তাঁর গবেষণাগার ‘এক্সিকুটু হাউস’ (Institut du Radium) গবেষণা করার ক্ষমত প্রবেশ করেছিলেন। মাদাম ক্যুরির অকুলসী বৈজ্ঞানিক কীর্তি

—রেডিয়ামের আবিষ্কারের—স্মরণার্থে এই গবেষণাগার করাসী গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে রেডিয়াম সঞ্চয় নানা রূপ গবেষণা হয়। দেশ-বিদেশ হ’তে বহু গবেষণাকারী ছাত্রছাত্রী এখানে সমবেত হয়েছেন। একটা বিশেষত্ব এই যে, প্যারিসের অন্তান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চাইতে এখানে মহিলা কর্মীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। সম্ভ্রতি এই গবেষণাগার হ’তে মাদাম ক্যুরির কন্যা ইরেন ও তাঁহার স্বামী জোলিও (Joliot) নিউট্রন (Neutron) আবিষ্কার করে বশরী হয়েছেন। হুম্ম জড়কণাদের মধ্যে নিউট্রন অস্ততম; পার্থক্য এই যে, অস্তান্ত হুম্ম জড়কণা—বেবন বিদ্যুতিন (electron), পজিট্রন (positron) বা প্রোটন (proton)—প্রত্যেকটিই ধন- বা ঋণ- বিদ্যুতাস্রিত; নিউট্রন সেরকম বিদ্যুতাস্রিত নয়। ফলে নিউট্রন কঠিন জিনিষের মধ্য দিয়ে অনেক দূর ছুটে যেতে পারে।

ক্যুরি-বংশতি কর্তৃক ১৮৯৮ সালে রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম ধাতুর আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগতের এক বৃহত্তরকারী ঘটনা। কি অধ্যাপকের ফলে পিচব্লেন্ড হ’তে ইহার রেডিয়াম নিষ্কাশন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা সাধারণকে বোঝান শক্ত। রেডিয়ামের এক আকর্ষণীয় বস্তু এই যে, এর থেকে অনবরত তেজ বিকিরণ করে,—রেডিয়ামের মধ্যে যেমন অক্লান্ত তেজের ভাণ্ডার আছে,—তবে এর ধন,—বাস করলেও হয় নাই। কোন উত্তম বস্তু তেজ বিকিরণ করে পীড়িত হয়—তাঁর তেজের ভাণ্ডার নিশ্চয় হয়ে যায়, কিন্তু রেডিয়ামে ধেন তা হয় না। এক

কণা রেডিয়াম থেকে এত তেজ বের হয় যে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সেই তেজ রেডিয়াম-কণার সমান পরিমাণ জনকে হুটন্ত অবস্থায় আনতে পারে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে তাপবিকীরণের অন্ত রেডিয়ামের কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এই তেজের উৎস কোথায়? বৈজ্ঞানিক বলেন যে, রেডিয়ামের এক একটা পরমাণু যাকে যাকে বিদীর্ণ হচ্ছে—কেন হচ্ছে তার কারণ জানা নাই। আর, এইভাবে বিদীর্ণ হওয়ার উপর মানুষের কোনও হাত নাই। মানুষ তার আয়েতাহীন কোনও শক্তির প্রয়োগে এই বিদীর্ণ হওয়া নিবারণ করতে বা বাড়াতে পারে না। রেডিয়াম ধাতুর পরমাণু এই রূপে বিদীর্ণ হয়ে অন্ত ধাতুর পরমাণুতে পরিণত হয় আর সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর দ্বন্দ্ববাহিত শক্তি তেজরূপে বিকীর্ণ হয়। রেডিয়াম থেকে যে-তেজ বের হয় তা তিন জাতীয়। প্রথম—আল্ফা কণা (হিলিয়াম পরমাণুর বাহিরের বৈজ্ঞানিক আকর্ষণ বাদ দিলে ভিতরে যে-অংশ থাকে তাকে আল্ফা কণা বলে), দ্বিতীয়—বিহাতিন বা electron, তৃতীয়—গামা রশ্মি (একত্রে জাতীয়)। এক কণা রেডিয়ামে অসংখ্য পরমাণু

আছে, হুতরাং যাকে যাকে এক একটা পরমাণু ভাঙলেও রেডিয়াম-কণার আতান্তরীণ শক্তির অপচয় অতি ধীরে ধীরে হয়। তেজবিকীরণ শক্তি অর্থেই হ'তে প্রায় দেড় হাজার বৎসর লাগে।

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে রেডিয়াম আবিষ্কারের পর রেডিও গ্যাকটিভ গুণ বিশিষ্ট আরও কয়েকটি ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে। এইগুলির গুণ অনুশীলন করতে গিয়ে অণু পরমাণুর গঠনের অনেক রহস্য আমরা জানতে পেরছি। এমন কি, ইচ্ছামত একটা পরমাণুকে ভেঙে আর একটা পরমাণুতে রূপান্তরিত কর—তাও এই রেডিও গ্যাকটিভ জাতীয় ধাতুর সাহায্যে হয়েছে। পারাকে সোনাতে পরিণত করার চেষ্টা আদিম যুগ হ'তে বাহ্য করছে—কখনও সফলকাম হয় নি। কিন্তু উপরোক্ত ভাবে পরমাণু ভাঙা-গড়ার কথা ভাবলে মনে হয় যে পারাকে সোনা করা বৃথি অসম্ভব নয়। বাহ্য বে শ্রেণীর কাম করলে “অমর” আধা লাভ করার যোগ্য হয় যদিও জ্বালির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সেই শ্রেণীর। বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জাতীয়তা-প্রীতি

তিনরেন্দ্রনাথ বসু

দরিদ্র কৃষিজীবীর কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াও, নানা সঙ্কটের বলেই স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ধনে-মানে-জ্ঞানে দেশের ও সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত সত্যাহরণ, সাহস, দৃঢ়চিত্ততা, অনাহরণ ও দেশস্বর্গে বন্ধনহীনতা। আন্তরিকতায়, সহিত্বতার ও একাগ্রতার ডাক্তার সরকার সকলের আদর্শ ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও উদ্যমশীলতার তিনি বাঙালীর সুখ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা মহেন্দ্রলালের অকুলনীর কীৰ্ত্তি। তিনিই ভারত সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার

প্রথম পথপ্রদর্শক। অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে ডাক্তার সরকারই এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এদন্ত লোকে তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ভারতীয় অবতার বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। মহেন্দ্রলালের কীৰ্ত্তি ও গুণাবলির কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এখানে কেবল বেশভূয়ার জাতীয়তা রক্ষার একান্ত পক্ষপাতী মহেন্দ্রলালের সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

অদেহী আন্দোলনের কল্যাণে ও মহাত্মা গান্ধীর ভাষণের প্রভাবে, পাশ্চাত্য বেশভূয়ার মোহ শিক্ত ভারতবাসীর

মধ্যে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু সস্তর-পাঁচতর বৎসর পূর্বে দেশের অবস্থা একেবারে অন্তরূপ ছিল। তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষাগ্রাপ্ত দেশবাসী পাশ্চাত্য বেশভূষাকেই আদর্শ মনে করিতেন। অনেক স্থলে এদেশবাসীর বেশভূষা সভ্যজনেচিত বলিয়াই বিবেচিত হইত না। মহেন্দ্র লাল তখনকার দিনের সর্বোচ্চ সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া, বিজ্ঞান-শিক্ষার্থে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ লাভ করেন। পরে তথা হইতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায় উচ্চতম উপাধি—এম্‌ডি লাভ করিয়া কলিকাতায় অবতীর্ণ হন। কালে তিনি সর্বপ্রধান চিকিৎসকরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই বাতীক্রম থাকিলেও, ইউরোপীয় পোষাকই চিকিৎসা-ব্যবসায়ী সাধারণ পোষাক ছিল, এবং সেই আছে। কিন্তু মহেন্দ্রলাল গোড়া হইতেই নিজের জাতীয় পোষাকে অহরহ ছিলেন। ধান ধুতি, সাদা জামা ও সাদা চাদর এবং চটিভূতা—এই তাঁহার বেশভূষা ছিল। পোষাকে আড়ম্বর তিনি আরো পছন্দ করিতেন না। বিদেশীর পোষাক পরিধান তিনি জাতীয়তার পরিপন্থী বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার জীবনের অঙ্গ অঙ্গ হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মহেন্দ্রলাল ১৮৭০ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ অব্দে নব-নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে যখন ‘কনভোকেশন’ হয়, তখন সাধারণ পোষাক ছাড়িয়া কিছুতকিমাংকার গাউন ইত্যাদি পরিতে অনিচ্ছুক থাকায়, তাহাতে যোগদান করেন নাই। এ-সম্বন্ধে তাঁহার ডায়েরীতে (১২ই মার্চ ১৮৭৩) লিখিয়াছেন—

Convocation day of the Calcutta University at the

now University building. Lord Northbrook presides. No mind to attend. Can't put on fantastic dress.

“নবনির্মিত বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে, লর্ড নর্থব্রুক সভাপতিত্ব করিবেন। যোগদান করিবেন কিনা। লর্ড নর্থব্রুক সভাপতিত্ব করিবেন। যোগ দিতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু তকিমাকার পোষাক পরিতে পারি না।”

1873 31 Days 10 WEDNESDAY 10th March

Honored the L^d Governor with my company on board the ship in the afternoon! This is the first time I appeared before our Governor, having all along resisted the temptation of being a great man of that description on the ground of dress. I put on trousers and Chapkan & a paper & thus my resolution of year - of a whole life time broke down at last and I have lost my caste as it were. I appeared from the conversation we had with the L^d Governor that I could appear with my ordinary dress, even with my slippers. At the opportunity I have thus lost, at the important of friends, of passing my friends dress. I do not regret my much for changing my dress.

ডাক্তার সরকারের ডায়েরির এক পৃষ্ঠা

পর বৎসরেও তিনি ঐ কারণে ‘কনভোকেশনে’ যোগদান করেন নাই। তাঁহার ডায়েরীতে (২০শে মার্চ ১৮৭৪) লিখিত রহিয়াছে—

To-morrow is the Convocation of the Senate of the Calcutta University. Vice-Chancellor E. C. Bayley will preside. Sent a copy of my pamphlet on the Science Association with a letter to Mr. Bayley.

“আগামী কল্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের কনভোকেশন। তাইস-চান্সেলর ই.সি.বেলি সভাপতিত্ব করিবেন। স্যারেল এসোসিয়েশন সম্বন্ধে আমার লিখিত পুস্তিকা একখণ্ড ও একখানি পত্র সিন্টার বেলির নিকট পাঠাইয়াছি।”

তিনি যে কনভোকেশনে যান নাই, তাহা পরের তারিখেই ডায়েরীতে লেখা আছে।

মহেন্দ্রলাল ১৮৬০ অব্দে এল-এম-এস পাস করিয়াই চিকিৎসা-ব্যবসার আরম্ভ করেন। ১৮৭৩ অব্দে এম-ডি পাস করার তাঁহার খ্যাতি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি ১৮৭৫ অব্দের পূর্বে কখনও যুতিচাদর পরিচাণ করিয়া অস্ত্র পোষাক পরিধান করেন নাই, ছোট লাটসাহেবের একটি পার্টিতে যোগদান করিতে, ১৮৭৫ অব্দে ১০ই মার্চ তারিখে নিজের সাধারণ পোষাক পরিচাণ করিয়া মহেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম পায়জামা ও চাপকান পরিধান করেন। এজন্য তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রলাল তাঁহার এই প্রথম বেশপরিবর্তনের বিবরণটি কৌতুকের সহিত আরম্ভ করিয়া অহুশোচনায় শেষ করিয়াছেন। তিনি ডায়েরীতে (১০ই মার্চ ১৮৭৫) লিখিয়াছেন—

Honored the Lt-Governor with my company on board the Rhotas in the afternoon! This is the first time I appeared before our Governor, having all along resisted the temptation of becoming a great man of that description on the ground of dress. I put on trousers and chapkan & a pagri & thus my resolution of years—of a whole lifetime broke down at last and I have lost my caste as it were. It appeared from the conversation we had with the Lt-Governor that I could appear with my ordinary dress, even with my slippers. What an opportunity. I have thus lost, at the importunity of friends, of passing my simple dress. Kristo Dass rebuked me much for changing my dress.

“অপরূপে ‘রোটার’ উপর আমার সম্মান করিয়া ছোটলাট সাহেবকে সম্মানিত করিয়াছি! পোষাক-পরিচ্ছদের কারণেই তথাকথিত বড়লোক হওয়ার প্রলোভন এতদিন সম্বরণ করিয়া, আমাদের লাটসাহেবের সম্মুখে আমি এই প্রথম উপস্থিত হইয়াছি। আমি পায়জামা, চাপকান ও একটি পাগড়ী পরিয়া, আমার বহু বৎসরের—জীবনব্যাপী দৃঢ়তা পরিশেষে ভঙ্গ করিয়াছি এবং মনে হইতেছে আমি যেন জাতিচ্যুত হইয়াছি। ছোটলাট সাহেবের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হইয়াছে, তাহাতে মুগ্ধিত পারিয়াছি যে, আমি সাধারণ পোষাকে, এমন কি চটি জুতা পরিয়াও হাবির হইতে পারি। কতদূর প্রবোধ। বহুবাবস্বতের আশ্রয়প্রাপ্তি আমায় সাদানিধা পোষাক পরিবর্তনে, এইরূপে আমার পরাজয় ঘটিল। আমার পোষাক পরিবর্তনের জন্য কৃকদাস! আমার বিশেষ ভৎসনা করিয়াছেন।”

উপর উক্ত লেখা হইতেই ডাক্তার সরকারের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝা যায়।

পরে মহেন্দ্রলালকে কর্তব্যসাধনের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্থলবিশেষে পায়জামা ও চোগা-চাপকান পরিধান করিতে হইয়াছে। তিনি ১৮৭৭ অব্দে কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাগিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং জীবনের

প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত অতি নিষ্ঠার সহিত বিচারকার্য্য হসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্রলাল ১৮৮৭ অব্দে প্রথম বেঙ্গল কাউন্সিলের সমস্ত নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৩ অব্দে চতুর্থ বার পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। বিচার-বিভাগে ও ব্যবস্থাপক সভা



বঙ্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম-ডি, ডি-এল, সি-আই-ই

প্রভৃতির কার্য্যে তিনি ৭৭ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু কখনও স্বার্থসিদ্ধি বা অর্থলোভে নিজ জাতীয়তা বলি দিতে স্বীকৃত হন নাই। এ-বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন লোকেরা অনেক সময় বাৎসরিক বৃত্তি দিয়া পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিতেন। দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় শ্রেণীর মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারত-গভর্নমেন্টের তাৎকালিক এক জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী পারিবারিক চিকিৎসক রূপে ডাক্তার সরকারকে নিযুক্ত করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি যে উপযুক্ত বৃত্তি দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে মহেন্দ্রলাল কার্য্যগ্রহণে সম্মত ছিলেন। সাহেবের এক জন প্রতিনিধি আসিয়া মহেন্দ্রলালকে অহরোধ জানান যে, ডাক্তার যেন দ্বিতীয় পরিবার ইঞ্জার পরিয়া তাঁহার আবাসে গমন করেন। মহে

* “রোটার”—রোটারী টীমার। ছোটলাট—সার রিচার্ড টেম্পল।

† কৃকদাস—হুগ্ৰসিদ্ধ কৃকদাস পাল।

এই কথা শুনিরা ভৎক্ষণাৎ ঘৃণের উপর উত্তর দেন, "Not on those terms even if you give me Rupees twenty thousand a year"—“মামাকে বৎসরে বিশ হাজার টাকা দিলেও এই সন্তে রাজি নহি।” বাঙালীর যাহা-কিছু স্বাভাবিক অবশিষ্ট রহিয়াছে ধুতি চাদরে। যেদিন বাঙালী ধুতিচাদর পরিত্যাগ করিবে, সেদিন বাঙালীর স্বাভাবিকতাও অন্তর্হিত

হইবে। ডাক্তার সরকারের অস্বাভাবিক বোধ হয় এইরূপ ছিল।

বাঙালীষের পরিচায়ক সঙ্গত বিষয়ে সর্বতোভাবে আসক্তিই বাঙালীর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রেম। মহেন্দ্রলাল নিজ জীবনে জাতীয়তা রক্ষা করিবার যেটুকু অবসর পাইয়াছিলেন, তাহা অতি সম্মানসহকারে ও প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

৫৮৮-মহিলা-সংবাদ

শত ২রা জুন শ্রীমতী প্রকৃতি দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। ত্রিংশিষ্ট, গম্ভীর কাল, জেসো পেটিং, হুচীশিল, মীনার কাল, চামড়ার উপর অলঙ্করণ শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা

ও আয়োদ্য-প্রদোষের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এবারকার উৎসবের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী বিশিনী জাগাসিয়া উচ্চস্থান অধিকার করিয়া একটি কাপ লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী জাগাসিয়ার বয়স মাত্র বার বৎসর।



শ্রীমতী প্রকৃতি দেবী

অর্জন করিয়াছিলেন। ‘প্রবাসী’ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পত্রিকায় তাঁহার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতি, রাজবালা-নারী-মঙ্গল-সমিতি, নারী-শিক্ষা-সমিতি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। শ্রীমতী প্রকৃতি দেবী আইন-বাবসুরী শ্রীবুদ্ধ বহীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী।

কলিকাতা শ্রীবুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে করাতীর নাট্য ও সাংস্কৃতিক সমিতি প্রতিবৎসর হুতা শিল্প



শ্রীমতী বিশিনী জাগাসিয়া

খুলনার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামের পানীর জলের জন্ত রক্ষিত জলাশয়টি আগাছার পূর্ণ হওয়ার লোকের অস্বাভাবিক হইয়াছিল। লোকাল বোর্ডে আবেদন করা সত্ত্বেও ইহার আগাছা তুলিয়া লওয়া হয় নাই। উক্ত গ্রামের প্রায় চল্লিশ জন মহিলা স্বতঃপ্রযুক্ত হইয়া গুরুশিখার আগাছা পরিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের নমস্কার।

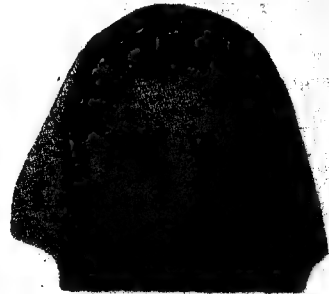
বশোহরের স্বাধা-কর্মচারী ডাক্তার মহোদয় সেনের পত্নী শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী সেন বশোহর মিউনিসিপ্যালিটির



সেনহাটার মহিলা-সমিতির সভ্যরা পুস্তক পরিষ্কার করিতেছেন

এক জন কমিশনার মনোনীত হইয়াছেন। গবর্ণমেন্টের এই মনোনয়ন উত্তম হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচনে তথাকার উকীল ফৌলবী আবদুল সালামের পক্ষী শ্রীমতী আমিনা খাতুন এক জন কমিশনার নির্বাচিত হন। এখন আর এক জন মহিলা কমিশনার হওয়ার উদ্দেশ্যে মিলিয়া অনেক জরুরি কাজ করিতে পারিবেন। শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী সেন দুই বৎসরের জন্য বশোহর জেলের বেশরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বাড়িতে পড়িয়া এ-বৎসর আই-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ছটি কন্ডা আছে। বয়স আর পঁচিশ বৎসর।

উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয় হইয়াছেন। প্রথম বিভাগে কেহ উত্তীর্ণ হন নাই।



মিল্লার ডাক্তার জানদাকাত সেন মহাশয়ের দৌহিত্রী শ্রীমতী কল্যাণী বেবী আই-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার পর বিবাহিত হন। তাঁহার পরও তিনি কিন্তু বিদ্যার্জন ছাড়িয়া নেন নাই। তিনি এই বৎসর মির্জা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এক

বিলাত-প্রবাসিনী হাবপুরের নবাবের
বেগম সাহেবা। ইহার বিষয়
বিবিসি এসএস উল্লেখ।

বহির্জগৎ

জার্মানীর নাৎসি-দলে অন্তর্বিপ্লব

হিটলার একদা দত্ত করে বলেছিলেন যে নাৎসি-রাষ্ট্র এক হাজার বছর স্থায়ী হবে। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস! গত ৩০এ জুন রাতি ছোট্ট সময় ডাকে ওয়েস্টফালিয়ার এক শেবার ক্যাম্প থেকে ছুটে যেতে হয় নাৎসিদের প্রধান আড্ডা মুসিকে তাঁর ক্ষমতা নষ্ট করার জন্য বড়বস্ত্র সন্ধান করতে। দৈনিক খবরের কাগজ-



ডক্টর পল গোয়েবলস্

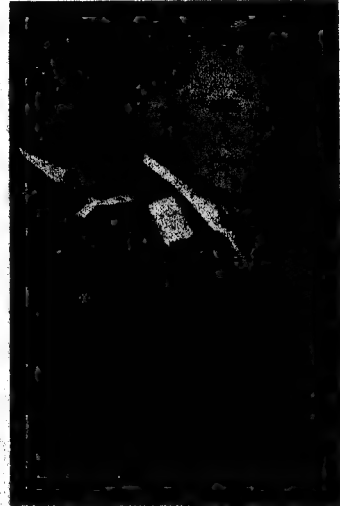
ওলিতে হিটলারের এই নতুনতর ইত্যাকারের বাউফলার কথা অনেকের পক্ষেই পড়েছে। এই বড়বস্ত্রের পিছনে কি কারণ বর্তমান সে সবকে হু-একটি কথা-রলা সন্ধান।

বীরা জার্মানীর আত্মসম্মতি অবস্থা অনুধাবন করেছেন তাঁরা। এইরূপ গোপন্যের সম্বন্ধেই আশা করছিলেন। হিটলার-প্যাপে-হর্নবুর্গ নজিরওলে এত ভিন্ন প্রকার সত্যসত্য সন্নিবিষ্ট হয়েছিল যে, ইহা কেবল মাওরা অবশ্যস্বাবী। গত বৎসর জুন মাসে হর্নবুর্গ বিদায় দেয়। এবার প্যাপেনের ও আরও অনেকের প্রত্যাশা। গত জুনের শেষাংশে জাইন-চানসেলার কন প্যাপেন মার্কসের এক সৌর সঙ্কটের নাৎসি উগ্রগণ্যদের সন্মিলনে চলে। বলা বাহুল্য, ডক্টর পল গোয়েবলস্ এই সঙ্কটের একাংশ নিষেধাজ্ঞা দেয়। শুধু তাই নয়, বাঁশের কোনও ক্ষমতায় সংজ্ঞা কিন তাহারও অসম্ভব লগ্ন্য হয়। এতে বোঝা যায়, হিটলার ও তাঁর অচ্যুতেরা নিজের বিবর্তে কোনও বড়বস্ত্রের আত্মসম্মতি পেয়েছিলেন। তারপর ৩০এ জুন হিটলার স্ট্রিকা-হাইলার-মার্ক ক্যাপ্টেন রোজেনের শরণস্বত্ব গ্রহণ করেন। রোজেন তাঁর নিজস্ব কর্মচারীত্ব সমেত মৃত হয়। সেই সবসঙ্গে জার্মানীর ভূতপূর্ব চ্যান্সেলার জেনারাল হুট কন রাইনার সশস্ত্র সহিত হয় এবং বাঁশ ও রাইনসে স্ট্রিকা-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত অনেক নেতা এগুয়ার।

হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হের হাইনেল ও হের আর্নট (দুইজনই তাঁদের দলপতি) এবং হের এগার ট্রান্সের। এঁরা সকলেই পরে নিহত



হিটলার, হিওনবুর্গ ও গোয়েরিং



গোয়েরিং

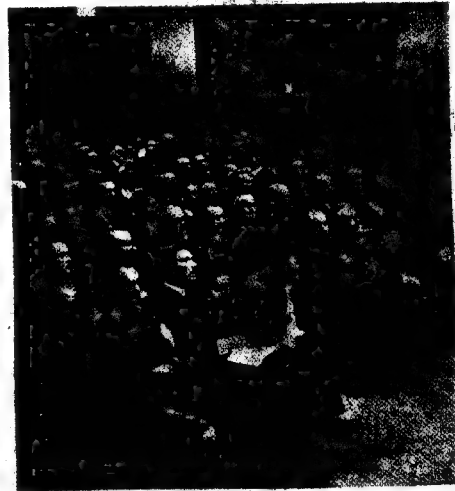


শোভামার্চ চিঁচোল, গোয়েরিং, রোয়েন ও লুভাঙ্ক নেতৃত্ব

হয়েছেন। এই ঘটনায় মোট দুই শত সাতাশ জনের প্রাণ গেছে। জার্মানী তথা জগত এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডে শূন্য হইয়াছে।

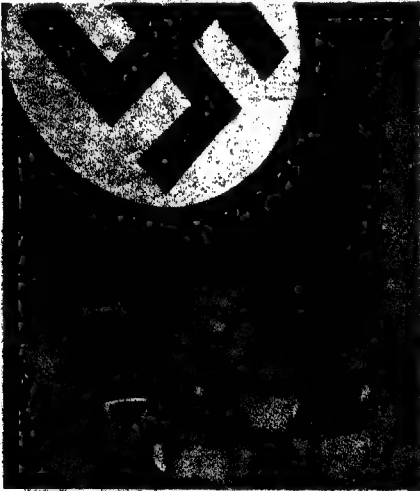
এই ঘটনার সম্যক আলোচনা করতে হলে নাৎসি আন্দোলনের কথা বলিতে হয়। নাৎসি আন্দোলন গত যুদ্ধের একটি বিশেষ ফল। যার যুদ্ধ সাধারণ সেনানীরাপে প্রাণ বিয়েছিল ও টোকে যাদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল তাদের এই দুঃখ-ভোগের জন্ত দারী ছিলেন জার্মানীর বৃহৎ কারখানাওয়ালারা—যারা অতি লাভের আশায় দেশের অনেক অনিষ্ট সাধন করেছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ইহুদীসম্প্রদায়ের ভুক্ত। নাৎসি আন্দোলনের জন্ম হয় এই ধনী সম্প্রদায়কে অবসাদিত করবার জন্ত ও জার্মানীর জাতীয় গৌরব কিরিয়ে আনবার জন্য। যুদ্ধোত্তর সময়ের মধ্যে ছিল দুটি জিনিস—প্রথম, আকুতাৰ; দ্বিতীয়, নিয়মাহরণতা—যাঃ নেতৃত্বের প্রধান অবলম্বন। নাৎসিদের মধ্যেও প্রধান লক্ষ্য করবার জিনিস এই দুটি। হিটলার উন্নতির পথে চলতে গিয়ে নেতৃত্বের (যা তাঁর কাছে অধু ব্যক্তিগত অনুশাসন নয়, প্রভুত্বও) হুল অবলম্বনটি খুব ভাল করে মনে রেখেছেন, কিন্তু যে-কথাটি সামান্যতম লক্ষ্য তা ক্রমশঃ ভুলতে বসেছেন। অবশ্য এর কারণ আছে। নাৎসি দল গড়ে তুলবার জন্ত এ পর্যন্ত অনেক টাঁকার দরকার হয়েছে, আর সে ব্যয়ভার বহন করেছেন প্রধানতঃ ধনী, কলকারখানাওয়ালারা। মার্কসপন্থীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে অনেক বিখ্যাত লোককে দলভুক্ত করতে হয়েছে। কলে নাৎসিদের জিততে দুই দলের যত্ন হয়েছে। একটি জাতীয় সোশ্যালিস্ট কর্মক্ষেত্র (National Socialist Workers' Party of Germany); ইহারা সমাজতন্ত্রের দলবাদীদের উপর বেশী জোর দেয়, অণুদল এইগুলি অসহ্যর চক্রে দেখে। তবুও এই সিরে হিটলার দলবদ্ধতা ইহাদের পর খুব বেশী বিরোধের যত্ন করেনি, কারণ

নাৎসি দলের কার্যক্রম অপরিবর্তনীয়। কিন্তু হিটলার ১৯৩৩, ৩-এ জানুয়ারি হগেনবুর্গ ও পাপেন গ্রন্থ মন্ত্রবিশেষী লোকদের



বিপ্লবন সভার নাৎসি-দলের নেতৃত্ব। হিটলার, পাপেন, গোয়েরিং, ডট্টর বিক-অভূতি সমূহ উপবিষ্ট

নিজে মনিসভা গঠন করা অবধি নাঃসিন্ধুভুক্ত সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর ভাল রেখে চলা শক্ত হয়ে পড়ায়। আসলে তখন থেকে হিটলার প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠীনার পড়েছেন। একদিকে, খাইসেন প্রমুখ খনীদের কাছে তিনি অজীকারবদ্ধ টাকা নিয়ে, এবং হিওন-বুর্গ ও পাপেন প্রভৃতির সংসর্গে পড়ে তাঁর কাধের স্বাধীনতা খসিঁত, অপর দিকে বিশাল ষটিকা-বাহিনীর উৎসাহ-উদ্বীপনার বাধা দিতে নারাজ। এখানে বলা দরকার, ষটিকা-বাহিনীর দ্বারা কর্ণধার তাঁরা হর বিশ্ববিদ্যালয়ে সজ্ঞ-শিক্ষিত, নয় মজুরদল হইতে উদ্ভূত। এই ষটিকা-বাহিনীর উৎসাহে হিটলার-আগে স্বাক্ষরে অবশ্য বাধা দিয়ে এসেছেন, এবং এজগ্জ ইহুদের-ভিতরে প্রভূত ক্রোতের স্রষ্টি হয়। কিন্তু যখন অল্পদিন আগে তাঁরা থবর গেল- যে, হিটলার ক্লাসের সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ সমস্তায় সীমাসে। কর্তৃত্ব-পিরে তাঁদের দল ভেঙে ফেলতে স্বাক্ষর করেছেন তখন অসম্ভাব্য চেপে রাখা শক্ত হ'ল, কাজেই বড়বয়স হুক হ'ল হিটলারের অপ্রতিহত ক্রমতা। নাশ করবার জগ্জে। কন রাইসার একজন জবরদস্ত শোক। সেনানীমণ্ডলে এর প্রভূত প্রভাব। নাৎসি বড়বয়সকারী তাঁর সাহায্য মেন। এমন কি শোন! যাচ্ছে এককটি বিদেশী শক্তির সঙ্গেও

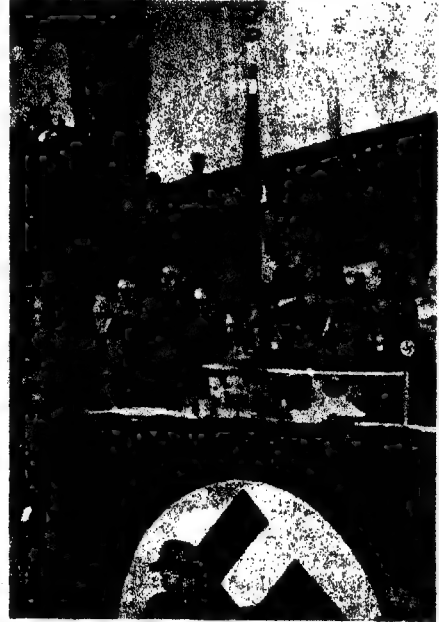


ডট্টর গোয়েবলস্ বৃত্তান্ত করিতেছেন

এই বড়বয়সকারী নলের বোগসংকলন হয়েছিল। বা হোক, হিটলার থব জোর করেই বিবোধ দর করতেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক পুরাতন শত্রু নাশ করেছেন। জাতি, তের-কার-বিলি স্বাক্ষরকার প্রথম মন্ত্রীরা ১৯২৩ সনে হিটলারের প্রথম উচ্চতম বন্দন করেন; প্রথম ট্রাসের-বিনি ১৯৩২ সালের শেষে রাইসারের সঙ্গে সন্ধি করে হিটলারকে অতিক্রম করতে উদাত হয়েছিলেন। অনেকের মত করেন, কন পাপেনও এই ব্যাপারে সঙ্গিত। কিন্তু তা ভুল বলেই মনে হয়। তাঁর মারবুর্গের বৃত্তান্ত তাঁর পুরাতন বড়বয়সকারী পরিচয় দেয়, তাঁর মধ্যে হিটলারের বিক্রে কোন আকর্ষণ ছিল না। সে বা হোক, হিটলার স্বাক্ষরিত কন মনে রেখেই

হোক বা হিওনবুর্গের দ্বারা। অদৃষ্টক হয়েই হোক তাঁকে প্রাণে মারেন নি। পাপেন অগম্যনিত হতে আর মনিসভার থাকবেন না বলেই মনে হয়।

এই ব্যাপারের এইখানেই বনিকাগাত হ'ল মনে করা ভুল হবে। লণ্ডন ডেলি টেলিগ্রাফের বালিদহ প্রতিনিধি বলেছেন তিনি ষটিকা-



জার্মান জাতীয়তাবাদীদের সড়র উদ্বোধন।
হিটলার সড়র উদ্বোধন করিতেছেন

বাহিনী বৈদগ্ধিক কমিটি দ্বারা প্রকাশিত এক অবৈধ কাগজ দেখেছেন। তাতে এই মর্মে লিখিত হয়েছে, “আমাদের নেতারা হত হলেও বিদ্রোহের কার্য পুরানমে চলাছে। বৃত নেতারা ষটিকা-বাহিনীর আর্দ্র সমাক উপলব্ধি করেছিলেন। হিটলার স্বাক্ষরকারী ধনিকদের জড়নক হয়ে পড়েছেন।”

অবিখ্যাতের পড়ে কি আছে বলা কঠিন। ডট্টর গোয়েবলস্ বলেছেন—অজ্ঞবিল্লির পুরাপুরি দমিত হয়েছে। রম্ভটারের সংবাদদাতা সিন্ধি বলেন,—বাহির হ'তে জার্মানীয় অবস্থা থুবুই শান্ত কল বোধ হবে, কিন্তু জনসাধারণের মনে একটা অশান্তির ছাড়া বইছে। এর প্রধান কারণ—ষটিকা-বাহিনীর-তিন লক্ষ সশস্ত্র সেনানীর তেতরে অস্ত্রত; আধাঅবিধ এক মাসের ছুটির পরে সৈন্য মনে কিরে বাবে না।

এরা যদি পূর্ণোচ্চমে হিটলারের কলজা স্ট করবার-কোটা করে? টোল হেলুম বলের (অকসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও সজ কর্তারীদের দ্বারা গঠিত) অনেকই এই আশ্বাসদে সোদনন করেন, আর কম্যুনিষ্ট ও সোশ্যালিস্টরা

কি এ ধারণা অসম্ভব করবে? হিটলারের পেছনে উর-ম্রাক শাউস দল ও জার্মান-সেনাদল আছে। এখানে প্রশ্ন শুধু এই যে, সমগ্র জার্মানিতে সেড্‌ বৃহত্তর এই অসাময়িক অত্যাচারের পরও কি কারও হিটলারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে ধাঁড়াবার শক্তি আছে? তবে অত্রাহাম লিঙ্কলনের কথাও কেউ অস্বীকার করবে না যে “Public sentiment is everything. With public sentiment, nothing can fail. Without it, nothing can succeed.” অর্থাৎ জনসাধারণের আন্তরিক ইচ্ছায় সকল কার্য সাধিত হয়ে থাকে। সাধারণের ইচ্ছায় সকলই সকল হয়, বিনা ইচ্ছায় সকলই বিফল হয়।

শ্রীকরণা মিত্র

কৃষি-বিপ্লব

কৃষি ও কৃষকের দুর্দশা এখন জগন্মায়ু। আমাদের দেশে পাট ও ধানের দর কি রকম বেমে গিয়েছে সে কথা সকলেই জানেন, কৈনবা তার ফল এই কৃষিপ্রধান দেশের প্রত্যেক লোকেরই জোগ করতে হচ্ছে। এ অবস্থা এখন সকল দেশেরই। তবে অন্য দেশে প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা চলেছে, এদেশে সুখের কথাই এবং হা-ভতালে বতটা হয়, তাই হচ্ছে!

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গম এবং কার্পাস চাষীর প্রধান আয়কর কসল। গমের অল্পই। প্রায় তিন-চার বৎসর নাবৎ অভাবই সঙ্গী হ'য়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রায় ত্রি-কোটি মণ গম-অভাব। এই কসলের বোনা ও কাটর জন্য ১৯৩১ সালেই ১৮,০০০ হাক্টার, বহর এবং ৬০,০০০ ট্রাক্টর মোটর ব্যবহার করা হয়।

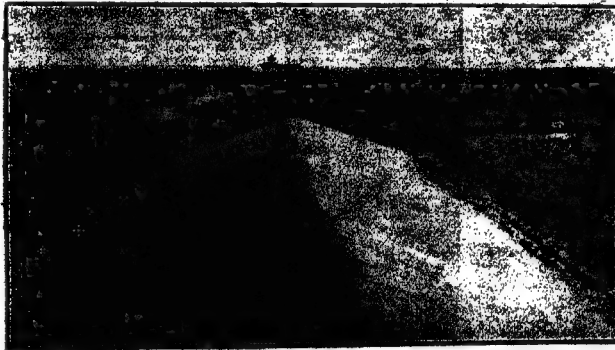
শত দিগে দুকরকে পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে গম মাটির মধ্যে ঢেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ হিসাবে যুক্তরাজ্যের গমের কসল ৭০ কোটি মণের



ক্যালিফোর্নিয়ায় গমের পাহাড়ের দৃশ্য

কাছাকাছি পাড়াত। নুতন যন্ত্রপাতি এবং নুতন জমির আধারের ফলে সেই কসল ২০ কোটি মণের উপর চলে গিয়েছে। এদিকে পৃথিবীর যে-সব দেশে যথেষ্ট শস্ত জন্মায় না, সেই দেশগুলিতে



আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিবিপ্লব। ৪০০০ মণ গম চাহিদার অভাবে মাটি ফেলে দেওয়া হয়েছে

ওদেশে চাষীর ক্ষেত বিশাল, কর্ণবল ও বেশী, সেইজন্য লাঙ্গল চালান থেকে কসল কাটা পর্যন্ত প্রায় প্রতি পদেই যত্নের ব্যবহার চলে। কিন্তু এই বিপ্লবটি আন্তর্জাতিক কৃষা হলে সেহে চাহিদার অভাবে, কৈনবা গমের দামে চাহিদার প্রভাব পোষায়। ফলে সে দেশে মানুষের খাদ্য-

ব্যয়িকার বাড়তির ফলে অর্থভাব হয়েছে। কাজেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইত্যাদি গম রপ্তানিকারক দেশে পরিদায় ও চাহিদার অভাব চলেছে।

কার্পাসের ব্যাপারও একই প্রকার। কসল ১ কোটি ২০ লক্ষ গণি

থেকে বেড়ে ১ কোটি ৬০ লক্ষ গাট পার হয়ে গেছে (১৯৩১)। কলে দাম ক্রমে নেমে গিয়ে ১৯০৫ সালের দামের কাছে (৬.৭৫ সেন্ট প্রতি পাউণ্ড) গিয়েছে।

আমাদের দেশে, পাট, গম, চাউল, চা, তৈলবীজ, এসকলেই

বৃত্তরাষ্ট্রে প্রথমে রাষ্ট্রের তরফ থেকে অতিরিক্ত কসল নির্দিষ্ট দামে কেনার ব্যবস্থা হয় এবং সেই কসল বিশেষ বেচার ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু ইহার কলে চাষীর উপকার কণিকমাত্র হয়েছিল। কেননা একটা কসল রাষ্ট্রকে বেচে কিছু লাভ করে পরের কসল বেচ



সোভিয়েট বৃত্তরাষ্ট্রে নতুন প্রকার যন্ত্র সাহায্যে গম কাটা

বিশ্বের অর্থাভাবের ছায়া পড়েছে। এই কসলগুলির মধ্যে একমাত্র চা বোধ হয় অতিমাত্রায় অক্ষান হচ্ছে। অন্যগুলিতে বিশ্বের চাহিদার অভাব চলছে।

সময় রাষ্ট্রই প্রতিযোগী হয়ে পড়ায়। হওয়াং কসলের পরিমাণ আগে থেকে নির্দেশ করে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকেনা। কিন্তু নির্দেশ করা এক কথা এবং অসংখ্য চাষীকে সে-নির্দেশ মানিয়ে



সোভিয়েট বৃত্তরাষ্ট্রে। "নতুন" চাষীর দল মাঠে চলেছে

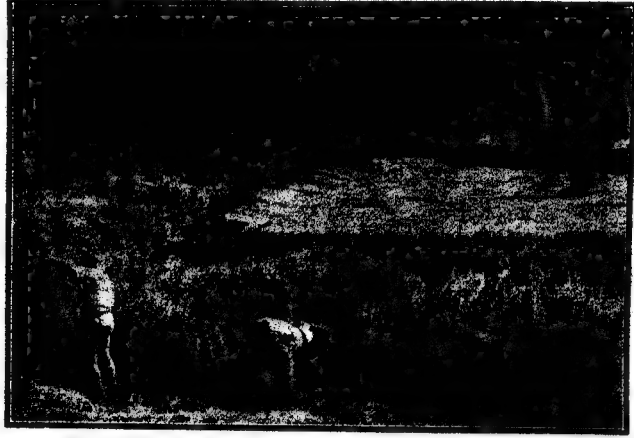
দামের দেশের রবার, জাতার ইলু ও চা, সোভিয়েট বৃত্তরাষ্ট্রে দম ও তিসি—সবই এইরকমে চাহিদার অভাব অনুভব হচ্ছে। প্রতিকারের জন্য আমেরিকার বৃত্তরাষ্ট্রে একইরকম সোভিয়েট বৃত্তরাষ্ট্রে সমস্ত রাষ্ট্রপতিই কেনা-বেচার সিদ্ধি পিড়িয়েছে, আমেরিকার

লণ্ডন, আর এক কথা। কাথাত: ওদেশের কৃষিকর্মজার সরাসরি এখনও হয় নাই।

সোভিয়েট বৃত্তরাষ্ট্রে ই ব্যবস্থাই হয়েছে, এবং সেখানে সরকারের সভাবনা বেশী। কেননা এখন ওখানে জাবান করা জমি আর সমস্তই

ব্যক্তিগত অধিকারচ্যুত হইবে রাষ্ট্র-অধিকারভুক্ত হইবে দাঁড়াচ্ছে। রাষ্ট্রের জমি রাষ্ট্রের নির্দেশমত চাষ করা হচ্ছে; কমলও রাষ্ট্রেরই অধিকারে, কাজেই কেনাবেচাও রাষ্ট্রই করছে। এই ব্যবহার কল চাষী এখন পেটভাতা হিসাবেই খাটছে। তবে তার যেমন নিজস্ব বলতেও

সালের পূর্বে ওখানকার সমস্ত জমিই এদেশের মত ছোট ছোট অংশে প্রজাবদ্ধ ছিল। বৃড়ি-গচিশ থেকে আশী-নব্বই বিঘা প্রমাণের ছোটবড় কেতেই সমস্ত দেশের কলল জড়াত। ভূতপূর্ব রথ সাম্রাজ্যের আমলের বিরাট জমিদারী সবই কৃষাণদের ভূমি-



জাপানে ধান কাটা

বিশেষ কিছুই থাকছে না, তেমনি ধার বলতেও কিছুই নাই বল! চলে। তৃষ্ণার কল টুকরা টুকরা করে বিলি হয়ে গিয়েছিল। এইরকম এবং আধুনিক জগতের যে-প্রকার অবস্থা তাতে সোভিয়েটের

গণও খণ্ড আলবাধা জমিতে না চলে নতুন প্রথায়ে যন্ত্রে চাষ, না হয়



সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। বসে গম আইড়িয়ে ছাড়ান (নতুন প্রথা)

রাষ্ট্র-অধিকারবদ্ধ জমীকেই জব্বী বলতে হবে—কেননা এখন কৃষক শ্রমের অর্থ বাড়িয়েছে কপিস্ট ব্যক্তি।

সোভিয়েটের এই নতুন ব্যবহার চাষেরও ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯২৮

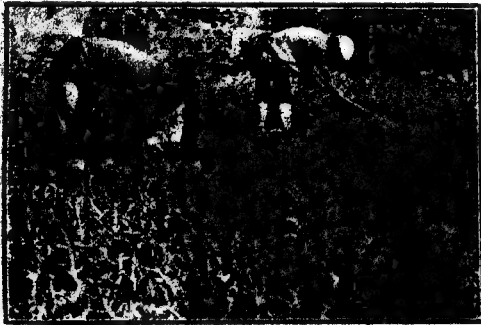
ব্যবস্থা তাহে উপযুক্ত কলল জড়ান। ইতরাং চাষী নিজের ইচ্ছা ও বিচার মত ভালমন্দ সব জমিতেই আরকর কললের চেষ্টা দেখত এবং নতুন রাস বয়ট-পৌরান না হ'লে কতিপয় বাণীসত



সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। কৃষকের কাজে উটের ব্যবহার

হরে গড়ত। চাষও হ'ত ষোড়া, বলদ, বা উটের সাহায্যে, নিড়ান ও কাটা হ'ত হাতে। এই কারণে যথাসময়ে কলন ও সংগ্রহ না হওয়াতেও ক্ষতি হ'ত।

এখন গকাশ-ঘাট হাজার হতে ছয়-সাত লক্ষ বিধা প্রমাণ



জাপান। শাকসবজীর ক্ষেত



সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। ষোড়ার ব্যবহার।



সোভিয়েট রাষ্ট্রের উদ্ভবেগিজানে কার্গানের কলন তোলা



জাপান। শাকসজীর ক্ষেত।

এক একটি বিশাল ক্ষেত, হাজার হাজার ট্রাক্টর, হাউস্টার ইত্যাদি যন্ত্রে (সর্বশুদ্ধ প্রায় দু-লক্ষ ট্রাক্টর এই কাজে এখন নিযুক্ত) চাষ, নিড়ান ও কাটা ইত্যাদি চলেছে। যে-জমিতে যে-ফসলের বতটা জমালে লাভ হওয়া সম্ভব তাই হচ্ছে। কৃষকও এমন অন্ততঃপক্ষে কণের ভাবনা থেকে মুক্ত।

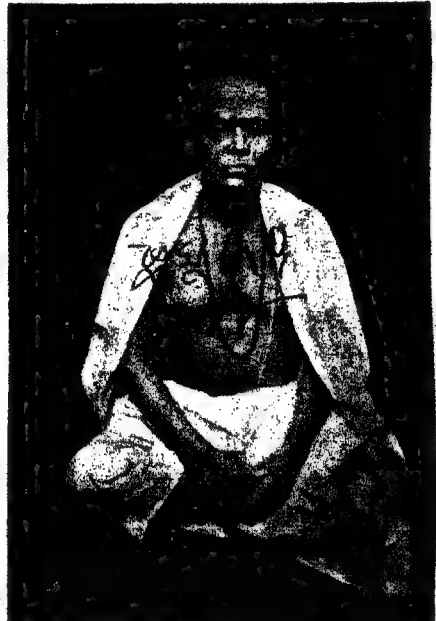
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই ব্যাপারের প্রতিকারের প্রধান চেষ্টা চলেছে “পরম্পরের কাপড় কাচা” প্রথায়। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের কৃষিপ্রধান অংশগুলি যাতে বাণিজ্যপ্রধান অংশগুলি থেকেই পাত্রব্য দেয় এবং বিনিময়ে শস্ত দেয় এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করে বিদেশীর প্রতিযোগিতা বাধা করার চেষ্টা চলেছে। ব্রিটিশ দীপপুঞ্জে বা সামান্য কৃষিকার্য্য চলে, তাকে বাচিয়ে রাখাও বিশেষ দরকার, কেননা যুদ্ধ অবসার ইত্যাদিতে যন্ত্রের কলসই একমাত্র সহায়। হস্তরাং সেখানকার কৃষকদের প্রধান খাদ্য কলসের জন্ত নির্দিষ্ট অতুপাতে “বোনাস” দেওয়াও হচ্ছে।

বিশ্ব যুদ্ধে প্রাচীন প্রথার চাপ আধুনিক দেশ সকলের মধ্যে একমাত্র জাপানেই ভাল চলেছে। তাহার কারণ জাপানী কৃষকের অসাধারণ নৈপুণ্য এবং পরিভ্রমের ক্ষমতা। পণ্য উৎপাদনে জাপানী কলকারখানা বেক্সল দক্ষ, চাষে ওখানকার কৃষকও সেইরূপ হিসাবী ও কুশলী। বস্তুতঃ জাপানী চাষী ঐ অর্থকর দেশে যেটুকু উর্বর জমি আছে তার কাছ থেকে শেখ ছটাক পর্যন্ত শস্ত ও শাকসজী আদার ক’রে স্বদেশকে খাদ্যশক্তির বিষয়ে অনেকটা স্বাধীন করে রেখেছে।

আমাদের এসেপের ব্যবস্থার কথা? এখন পর্যন্ত প্রধানতঃ কথা-মাত্রই হয়ে গেছে।

কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচ্চপতি

কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচ্চপতি মহাশয় সম্রাতি পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার মহিমময় জীবনের কাব্যবলীর আলোচনা, বিবিধ প্রসঙ্গে জটিল।



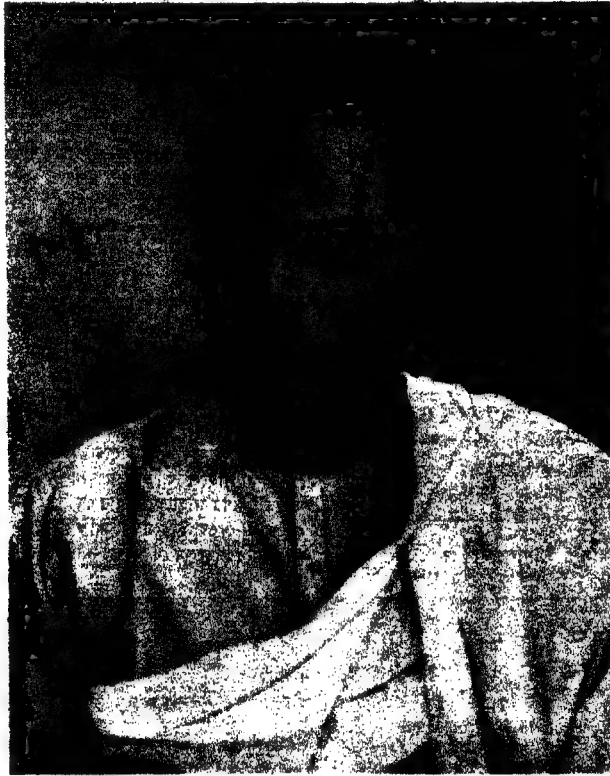
পরলোকগত কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচ্চপতি



দেশ-বিদেশের কথা

A large, grainy, black and white photograph of a group of people, possibly a choir or a large group portrait, with a small inset portrait in the top left corner. The main image shows a group of people, mostly men, standing in rows. The inset in the top left shows a close-up of a man's face. The overall quality is poor, with high contrast and significant noise.

সত ৩১ জুলাই শ্রীযুক্ত বলিদীর্ঘন সরকার ১৯৩৪-৩৫ সনের জন্ম
কলিকাতা কর্পোরেশনের যোগ-পথে মিস্ট্রি হইয়াছেন।



মেম্বর জীবন্ত নন্দিনীকর সরকার।

নির্বাচন প্রতি বছর এপ্রিল মাসে হইয়া থাকে। এবারকার ব্যতিক্রমের কারণ, কর্পোরেশনের সভ্যদের মধ্যে মেম্বর-নির্বাচন সম্পর্কে ঘোরতর গড়গোলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এক দলের ইচ্ছা, এবার একজন মুসলমান মেম্বর পদে অধিষ্ঠিত হন। অপর দল জীবন্ত নন্দিনীকর সরকারকেই মেম্বর করিতে বঙ্গপরিষদের ছিলেন। সে বাহা হউক, সর্বশেষে সরকার-মহাশয়ই এ-বৎসরের জন্য মেম্বর নির্বাচিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। সরকার-মহাশয় একজন কুতী পুরুষ। অতি সামান্য অবস্থা হইতে বীর কর্মশক্তি বলে লক্ষণটি হইয়াছেন। বীরা-ব্যবসারে সাক্ষ্য লাভ করিয়া তিনি বাঙালীর সুখোচ্ছল করিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্বে নিখিল-ভারত বাণিজ্য-সমিতি-সভ্যলীর (Indian Federation of Chambers of Commerce) সভাপতি পদেও বৃত্ত হইয়াছিলেন।

বাঙালী কৃষকটক—

বাঙালী সাইকেল কৃষকটক জীবন্ত রামলাথ বিহাল কৃষকটকের

উল্লেখ্য ১৯৩১ সনের ৭ই জুলাই সিঙ্গাপুর হইতে জগদীশ্বর হইয়া বধ্যক্রমে মালয়, শাম, ইন্ডোচীন, চীন, কোরিয়া, ও জাপান যান। তথা হইতে কানাডায় যান। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি অর্থ না থাকায় কানাডা পূর্ববর্তী ডাহাকে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়া পুনরায় সাংহাই এ কেরত পাঠান; এইরূপে তিনি সাংহাই হইতে কিলিগাইন, বালী, জাভা ও তম্বুজা হইয়া আবার সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং সেখান হইতে বর্মা হইয়া মণিপুর ও আসামের দূরগম পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইয়াছেন। যেহেতু হইতে জ্ঞানান শৈলেন্দ্রনাথ দে নামক এক অসামান্য বীর বৃষক এপার্যন্ত তাঁহার সঙ্গী হইয়াছেন। জীবন্ত বিহাল সর্বদা এ পর্বত আর জিপ সহজে হাইল পর্বত করিয়াছেন। এবার হইতে তিনি কখনো পশ্চিমাভিমুখে অমনর হইয়া ইউরোপ হইবেন, এবং সেখানে লন্ডন হইতে আমেরিকা ভ্রমণ সমাধা করিয়া বৎসর-তিনেকের মধ্যে কয়েক প্রত্যাবর্তন করিবেন।



শ্রীমতী বিদ্যা ও শ্রীমতী প্রমীলা দে

বিদেশ

দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় দল—

ভারতবাসী এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাভাসী ভারতবাসীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় রাখিতে হইলে উভয়কেই উভয় দেশে দর্শন ও ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ তথ্য আহরণ করিয়া শিক্ষালাভ করা উচিত। বার-চৌদ্দ বৎসর পূর্বে দক্ষিণ-আফ্রিকার খেলোয়াড় দল ভারত দর্শন করিয়া ছিলেন। স্মৃতি ভারতীয় খেলোয়াড় দল দক্ষিণ-আফ্রিকা দ্বারা করিয়া এই দল ভারতবাসী দলের উপনীত হন। সেইদিন প্রাতে বহু ভারতবাসী তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিবার জন্ত তীয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বন্দরের কর্তৃপক্ষ পূর্ব হইতেই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে দক্ষিণ-আফ্রিকার তীয়ে অবতরণ করিতে দিবার জন্ত যে-সকল সাধারণ আইন-কানুন আছে, ভারতীয় খেলোয়াড় দলের উপর সেই সাধারণ নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না। তদনুসারে তীরস্থিত ভারতবাসীগণ তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছেন, বোধ হয় এই বিশিষ্ট দর্শকদলকে তখনই অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে। বন্দরের হেল্প অফিসার আদেশ দিবা মাত্রই তীরস্থিত ইউরোপীয়গণ তাহাদের বহুবাহুব আকর্ষণ-বন্দনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত জাহাজের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু ভারতীয়গণ 'রিলিজ অর্ডার' (Release order) পাইলেন না, তাহার তীয়ে অগম্য করিতে লাগিলেন। 'পাস' না পাইলে অতিথি-অভ্যাগতগণকে আগম্য করিবার জন্ত ভারতীয়গণের জাহাজে উঠিবার কোনও অধিকার নাই। এই পাস দেওয়া-না-দেওয়া ইন্দিগ্রেড অফিসারের উপর নির্ভর করে। সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে 'দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় ফুটবল দল'টির



দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় দল

জন্তুঃ বিশিষ্ট কায়ক জন সভ্যকে জাহাজে অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উঠিতে দেওয়া হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারত সরকারের এজেন্টের সেক্রেটারী মিঃ বজ্রমানকে জাহাজের নিকে গমন করিবার দেখিরা সকল কণিকের জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু শীঘ্র তাহাদের সে আশা দূরভূত হইল। তাহারা পূর্বের দ্বারা উৎসাহিত তাঁর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইউরোপীয়ানগণ ধীরে ধীরে জাহাজ হইতে নামিয়া গেলেন; তখন ভারতীয় ও দেশীয় মজুরগণকে জাহাজে বাইতে দেওয়া হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মিঃ এ. ক্রিষ্টাক'র (দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবল ক্লাবের সভাপতি), মিঃ কল্লিও ইংই (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি), মিঃ সিং (ক্লাবের মাননীয়) এবং মহাস্বাক্ষর পূর্ব মিঃ এম. গান্ধী ('ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পাবক সম্পাদক) প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জাহাজে উঠিতে দেওয়া হইল না। ইহারা লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভারতীয় পাঁচটমল এ-সুন্ড 'বিচলিত না হইয়া সহ্যস্তে বরণ করিয়া লষ্টলেন। কেননা ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। স্বদেশীয়গণের এই ঘোরতর দুর্দশা শুচক দেখিবার পর আর কোনও জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে কিরূপে স্বভাবের নয়—সাই তাহারা এই বাণীকে তুল্য করিবার জন্য হস্তঃসর অবতারণা করিয়া কেহ বলিলেন, 'যদি আমার একটি মজুরের বাজা থাকতো'! কেহ বলিলেন, 'যদি আমার চামড়া সাদা হত' ইত্যাদি। দীর্ঘকাল পরে তাহারা নীরে অবতরণ করিলেন; তখনও তাহাদের লগেজ পরীক্ষা করা হয় নাই। মাননীয় একা শুক আপিসের কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিতে গেলেন; কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হইল না। ভারতীয় খেলোয়াড় দলের সকলক শুক আপিসে বাইতে হইল। অতঃপর প্রত্যেক লগেজগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিবার পর প্রায় দুপুর বেলা এই কার্য সম্পন্ন হইল।

হুতরাং দেখা বাইতেছে, বন্দর কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার এই বিশিষ্ট অতিথি-রক্তর জন্য প্রতিক্রিয়া দেওয়া স্বত্ত্বও কোনও প্রকার যোগ্য-হরিয়া দান করেন নাই। ইহা নিতান্ত দুর্গা ও লজ্জার কথা; ইহা খেলোয়াড় দলের স্বভাবজাত উদার ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষেরা এ বিষয়ের কোনও প্রতিকার করিবার ব্যবস্থা কি করিতে পারেন না?

অতঃপর জালদস প্রান্তে মিঃ পি. আর. পাখারের গৃহে তাহান্নিককে মহা সমারোহে লস্টা বাওয়া হয়। এই সমারোহে অতিথি-বৃন্দকে আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের সুবন্দ 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' এই জন-সম্পাদকীক শুভ তাহান্নিককে সাদর সম্বাদনা জানাইয়াছেন—

"We extend to our distinguished visitors a very cordial welcome on behalf of Indians in South Africa and wish that their visit to this country will not mean the more playing of soccer but that it will draw the minds of their brethren living in this far off land more towards their motherland and her great ancient culture and thus act as a silken cord that will bind S. A. and India in mutual love and affection."

অর্থাৎ "দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীগণের পক্ষে আমরা আপনাবিগলক সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি; শুধু ফুটবল এই পর্বট নয় মূল উদ্দেশ্য নহে—ইহা দ্বারা দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসীগণের মনের উভাদের জয়ভূমি ও জয়ভূমির আবহমানকালের প্রাচীন স্মৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, সাগর-বিচ্ছিন্ন দুই মহাদেশের অধিবাসিগণকে সৌহার্দ্যের শৃঙ্খলার দ্বারা আবদ্ধ করক।"

২২ জুন শনিবার প্রিন্সটন পর্ব মিনিটের সময় ডারবানে 'কিউরিস কাউন্টেনে' নাটাল সম্মিলিত দলের সহিত প্রথম খেলা হয়। নাটাল, ট্রান্সভাল, ইটেলওন, পোর্ট এলিজাবেথ, কেপটাউন, কিবুলী দলের সহিত এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার সম্মিলিত দলের সহিত (Test Match) প্রিন্সটন খেলা হইবে। তাহারা একটি যোহানসবার্গে ও অপর, দুইটি ডারবানে হইবে হিরোভূত হয়। নিম্নলিখিত ভ্রম্যমহাদেশগণ দলে যোগদান করিয়াছেন—

প্রমুখকুমার সুখাপাখ্যার (ম্যানজার), শিরীষ চক্রবর্তী, নয়েন শুহ, অমির গাঙ্গুলী, সত্য মজুমদার, সত্য চৌধুরী, মন্থক বক্ত (কাপ্টেন), করণ ভট্টাচার্য, প্রভাস কল্যাপাখ্যার, অবিল আমের, নাসিম, মোর হোসেন, মহম্মদ হোসেন, রমনা, লক্ষ্মীনারায়ণ এবং মিঃ এন. ঘোষ। নিম্নে সংক্ষেপে ১০ই জুলাই পর্যন্ত মোট খেলার ফলাফল দেওয়া হইল—ভারতীয় দলের সহিত

- ১। নাটাল দলের খেলায়—৬ গোলে জয় (ডারবানে)
- ২। " " " —২ " পরাজয় (মেরিটবার্গে)
- ৩। ট্রান্সভাল " " —৬ " জয় (যোহানসবার্গে)
- ৪। " " " —৫ " " (প্রিটোরিয়ায়)
- ৫। দক্ষিণ-আফ্রিকার মিলিত দলের
অর্থাৎ প্রথম টেস্টে—২ গোলে " (যোহানসবার্গে)
- ৬। ইটেলওন দলের খেলায়—২ " " (কেপটাউনে)
- ৭। পূর্বপ্রা দক্ষিণ দলের খেলায়—৫ " " (পোর্ট এলিজাবেথে)
- ৮। পশ্চিম " " —২ " " (কেপটাউনে)
- ৯। দক্ষিণ আফ্রিকার দলের " —৩ " " (")

মীরা কহে বিনা প্রেম সে...

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

নব্বাঁশে শ্রীচৈতন্য যে-সময়ে প্রেমবর্ষ প্রচার করিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময়ে মীরাবাই যেখানে গাছিলেন, 'বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলাল'। মহাপ্রভুর সে প্রেম-বস্তার 'শাক্তিপুর ডুব ডুব নদে ভেসে যায়।' মীরার মধুর কীর্তনোৎসবে যোরা এক অভূতপূর্ব আনন্দের তুফান বহিরা-ছিল। রাজপুত্রেরা প্রায় লক্ষসহি শিব-এর্থাবলসী। ভগবান একলিঙ্গজী রাজপুত্রার অধিনায়ী দেবত। উদা-পুরের মহারাণা পৃথিবীতে একলিঙ্গজীর প্রতিনিধি। তাঁহার প্রাণারের নাম কোণ্ট শিববিনাস, কোনটি শত্ননিরাস। বহিগণ যখন মহারাণার জগদান করে, তখন তাহা শিবস্ত্রোত্রের স্তায় শোনা। এক সময়ে রাজপুত্রেরা যে যোরা বৈষ্ণব-বিষয়ী ছিল, ইহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। সময়ে সময়ে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী বৈষ্ণবগণকে অত্যন্ত বিবর্তন করিত। বৈষ্ণব বহুবিধ প্রতিবন্ধিগণের এই অত্যাচার সূচ্য করিয়া বাইত। একবার তাহারও লাঠি-শক্তি লইয়া যখন রাজপুত্রের তড়া করিল, সেই হইতে রাজপুত্রেরা কিছু ঠাণ্ডা হইল। কিন্তু ইহা পরবর্তী ঘটনা। মীরাবাই যখন মধুর হরিণামে রাজপুত্রার উদার ভূমিতে প্রেমের ডেউ বহাইতছিল, তাহার হৃদয় কিছু পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ স্যাতন বৃন্দাবনের লুপ্ততীর উদ্ধার করিয়াছিলেন, হুতরাই ইংদগিক সৎসামিক বলা বাইত পারে। শ্রীকৃষ্ণ গোদামীর সহিত মীরাবাইয়ের সাক্ষাতের কিংবদন্তী লিখিয়া করিবার হেতু নাই। অথচ মীরাবাই যে কৃষ্ণ-প্রেম ইহাদের বিকট হইতে পাইয়াছিলেন এতদও মনে হইল। প্রবাদ হইতে বস্তুর জাতিতে পারা যায়, তাহাতে উভয়ের মিলনে রূপগোদামীর নাকি অধিকতর উপকৃত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে আসিবার পূর্বেই মীরার জ্ঞান-কমল ভগবৎ প্রেমারূপাগে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।* বস্ততঃ এই অলৌকিক ভগবৎ-প্রেমই তাঁহার রাজপুত্রার বাস ভাগ করিবার কারণ। মীরা সদাই কৃষ্ণ-প্রেমে ভূমিগা থাকিত, বৈষ্ণব সাধু প্রভৃতির সহিত ভগ্ন হইয়া কীর্তন গাণিতেন, ইহাই তাঁহার অপরোধ। এই অপরোধে তিনি চিত্তোত্তর রাজপ্রাসাদ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। এ অপরোধ সাব্যস্ত হইক বা অপরোধ হইক, ঘটনাটি যে অতি বিচিত্র সে-সন্দেহ লক্ষ্য নাই।

* গানপতি অসম্ভব অসুস্থ নিমিত্ত।

বাধে প্রবৃত্ত হইল শ্রীকৃষ্ণ চিত।—ভক্তদাস।

মীরা যেরতা-রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অপরাধ রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া কত শত রাজকুমার তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য লাস্যিত হইয়া-ছিলেন। পরিণেবে চিত্তোত্তরের রাণা কুন্ত তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। এই প্রবাদ অবশ্য সত্য নহে। মীরার মধুর সঙ্গীতের খ্যাতি শুনিয়া আকবর বাদশাহ তানসেনকে লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন এবং দশ লক্ষ টাকার মোতীরা মালা তাঁহার ঠাকুরের গলায় দিয়াছিলেন, এ-প্রবাদও সত্য হইতে পারে না। প্রথমতঃ, রাণা কুন্ত ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ও আকবরের মধ্যে প্রায় ১৩০ বৎসরের ব্যবধান। হুতরাং মীরা রাণা কুন্তের মণিষী হইলে আকবরের সময় পর্যন্ত তাঁহার বাচিয়া থাকা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণগোদামীর সঙ্গ যদি মীরার সাক্ষাতকার সম্বন্ধীয় প্রবাদ সত্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে রাণা কুন্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়া বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে করা বাইত পারে না। রূপগোদামীর চৈতন্তর সন্ন্যাসগ্রহণের কয়েক বৎসর পরে বৃন্দাবনে বাস করিয়া-ছিলেন। চৈতন্ত চারণ বৎসর অর্থাৎ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি যখন গোড়ো প্রত্যাবর্তন করেন, তখন রামকলিতে তাঁহার সহিত রূপ-স্নাতনের সাক্ষাৎ হয় এবং তাহারও কিছুকাল পরে রূপ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রমাণে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। রাণা কুন্তের মৃত্যু হয় ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বের পর। সে সময়ে মীরার বয়স পঞ্চাশ বৎসর ধরিলে, রূপের সহিত বৃন্দাবনে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভবপর নহে। রূপগোদামীর সহিত সাক্ষাতকালে মীরা যে অতি বৃদ্ধা ছিলেন, এতদও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মনে হয় মীরাবাই সে সময়ে রূপলাবণ্য ও হৃৎকর্তার অধিকারিণী ছিলেন।

+ Todd's Annals of Rajasthan, p. 230.

‡ বাইজার গানপতি আকবর সাহা।

পাতলা শুনিতে মনে করিল উৎসাহ।

তানসেন সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেণে।

বাইজীর গৃহে গেলা হইয়া উদাসে।—ভক্তদাস।

§ বৃন্দাবনে রিয়া বাই আদর্শে মগন।

বাহা হইল শ্রীকৃষ্ণ-গোদামীর-বরণ।—ভক্তদাস।

মীরা রাণা কুম্ভের পত্নী না-হইলেও তিনি যে চিতোরের কোনও রাজকুমারের বধু হইয়াছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং রাজার ললন, রাজার কুলবধু, রাজস্থানের ললামতৃত মীর অক্ষয় প্রভৃতি আশ্রয় হইয়া উঠিলেন, ইহা অসাধারণ ঘটনা। রাজস্থানের বীর রাজপুত্র শৈব ছিলেন; শিব যুদ্ধের দেবতা; ডমরু তাঁহার বাহা, ডমরুর সেই বোর বাঘারবে শূলপাশি শঙ্খ সংহার করিতে ব্যস্ত, এই মূর্তিই তাঁহার ধ্যান করিতে। হঠাৎ শাস্তিপ্রিয় প্রেমের দেবতা কিশোর রাখাল বালক রণছেড়জী কেমন করিয়া এই রজপুত্রবালার ক্ষয় সিংহাসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।* মীরর দেবতার নাম রণছেড় জর্জৎ যুদ্ধ হইতে গিবি পলায়নপর। রাজপুত্রানর স্যস্ত শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার এই পলায়নপর দেবতাটির বিরুদ্ধে। তথাপি এই রণছেড়জী রজপুত্র ক্ষয় অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহাকে অবসর্য করিয়া স্বর্গ হইতে প্রেমের মঙ্গলিনী আনিয়া রজস্থানের মঙ্গলমুখিত বহাইয়াছিলেন মীর। একদিন মেঘারের রজপথে, আরাবলীর পর্বত-শিখর, ভীমা নদীর কূলে কূলে মীরর সঙ্গীতের লরী ছুটিয়াছিল। তাহা না হইলে মীরর রণছেড়জীর মন্দির চিতোরের চূর্ণান্তরে সগৌরব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। মীরা যে চিতোরের কোনও রাজকুমারের অঙ্গলক্ষী হইয়াছিলেন, তাহাও এই ঘটনা হইতে অনুমান করিতে পারা যায়। আজিও চিতোরের গিরিহর্গ রণছেড়জীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। আজিও সেই মন্দির রণছেড়জীর সঙ্গ মীরর মূর্তিও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কতখানি আবেশ থাকিল ভক্তির পত্রকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য অর্চন করা যায়, তাহা আমরা চিন্তা করিল বিস্মিত হই। রাজপুত্র বীররা এই প্রেমধর্ম-প্রচারিনী রমণীর পদতলে আত্মসমর্পণ করিতে বিধা করে নাই। বহুদিব পূর্বে একদিন অপরারে রণছেড়জীর মন্দির-সোপানে ঈড়িয়া এই কবাই তালিত্ছিলাম। মাধব-মিহির প্রসঙ্গ ভক্তির প্রাণ করিয়া এই চিন্তাই করিতেছিলাম যে বিধাতার কীর্ত্তনবিধানে রাজপুত্রানর কর্তার কর্তব্য কেহ এই প্রেমমীর আবির্ভাব হইল!

প্রেম নহিলে যে ভগবানকে লাভ করা যায় না ইহা ভারতবর্ষে নুতন কথা নহে।

* The religion of the martial Rajput, and the rites of war, the god of battle, are little analogous to those of the "peace" Hindus, the followers of the pastoral divinity, the worshippers of kine, and fondlers on fruits, herbs and water. The Rajput delights in blood; his offerings to the god of battle are sanguinary, blood and wine. Todd, Vol. I, page 57.

ন সাধরতি মাং যোগো ই সাংখ্যং বর্ষ উক্তব।

ন বাধ্যতপস্কালো যথা তত্ত্বিন্যোক্তিতা ৮৭

ঐক্যগত—একদিন।

কিন্তু বাংলার প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু যেমন করিয়া এই তত্ত্ব একদিন ব্যাঙালীকে বুঝাইয়াছিলেন, এমন করিয়া আর কেহ বুঝার নাই। মীরবাঈও রাজস্থানে এই বাণী যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এমন হৃদয় এমন মধুর করিয়া আর কেহ বলে নাই। মীরর গানে এই প্রেমের বাণী বড় হৃদয় ছুটিয়াছে—

নিত নাহেনে সে হরি মিলে ত

জলজন্তু হোই।

কল মূল থাকে হরি মিলে ত

বাহাড় বাঘরাজ।

তিরঙ্গ-তরুণকে হরি মিলে ত

বহৎ সুদী অঙ্গ।

গী ছোড়কে হরি মিলে ত

বহৎ রহে তার খোলা।

দুখ পিকে হরি মিলে ত

বহৎ বৎস বালা।

মীরা কহে বিলা প্রেম সে

না মিলে নন্দলালা।

মীরর অনেক কবিতার এই একই ভণিতা আছে। সব কবিতার মধ্যেই একটি স্বচ্ছ প্রেমের তবাহ দেখিভ পাওয়া যায়। উপরের কবিতাটিও প্রচলিত লোকসঙ্গীত সরিয়া। তাহার স্থলে প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায়; কাহারও উপর কটক-আঁছে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবের একটি দোহাও চলিত আছে—

ভুলসী পি ধনে হরি মিলে ত

মায় শি বে কুলা আউর বাড়।

পাশল পুজনে হরি মিলে ত

মায় পুজ পাহাড়।

এই দোহাটি কবীরর বলিয়া কথিত আছে। মীরাও কবিতাটির সঙ্গে সরস্বতীর একটি দোহাও বিশেষ সাদৃশ্য আছে। দোহাও প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন গ্রন্থ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যক্ষশর বলেন পঞ্জীয় ৮। ৯। ১০। ১১। ১২ শব্দে এই সঙ্কলনই লেখা হইয়াছিল বলা যায়। (বৌদ্ধগন ও দোহা) ১১ ধর্মীতাহা হই, তবে মীরর বহুপূর্বে সরস্বতীর ইহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। সরস্বতীর বলিতেছেন যে বৌদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসীরা নয় হইয়া বেড়ার, কেহ কেহ তাহান্নিকে দেখিয়া যবে করে যে তাগার বৃত্ত পুজ।

* জ্ঞানবর্ষে বোধগর্ভে কহে কুল বন।

কুল বন যেহু এক প্রেমভক্তির।—১৫তম চরিতাবৃত্ত

—আদিলীলা।

জই পদ্মা বিম্ব হোই মুক্তি তা ইতি

(যদি নরদগিরে মুক্তি হয়, তাহা হইলে—)

তা স্তনহ শিখালহ ইতি

(কুকুর শূণালের মুক্তি হয় না কেন ?)

পিচ্ছী গহণে দিঠি মৌকথ ইতি

(ঋতুপুষ্প গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হইত—যেমন কপণকের অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা করে—)

তা করিম তুঙ্গহ ইতি

(তাহা হইলে ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা যে সকল হস্তী অথ সাজাইয়া দেওয়া হয়, তাহাদের মুক্তি হইবে না কেন ?)

উবর্ত্ত ভোম্বে হোই জাগ ইতি

(উল্লিত ভোজন করিল যদি জ্ঞান হইত, তাহা হইলে হস্তী, অথ ইত্যাদিরও হইত; কারণ তাহারাও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা লতাদি খুঁটরা খাইয়া জীবন ধারণ করে)

সুরাক্ষপাদ ধর্মের ঋহিরাবরণ অর্থাৎ আচার প্রক্ৰিয়া প্রভৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ক্ষপাকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু সংজ্ঞাপরী সংজ্ঞা-মত বর্তীত অত্র কোনও ধর্ম-মতকেই মুক্তির উপায় বলিয়া স্বীকার করিত না। সেইজন্য সংজ্ঞায়পদ্ধিকায় সুরাক্ষপাদ শ্লোকের সহিত বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ অমূলক। কেমনা প্রথমে যদি বা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ মুখ হইত হইয়া থাকেন তব তখনই না-হয় তাঁহাকে প্রশ্নন বলিয়া মাত্র করা হইত। এখন ব্রাহ্মণও যেভাবে হয়, অন্ত লোকও ত সেই ভাবেই হয়। সংস্কারে বা বেদপাঠে যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে অত্র লোকের সংস্কার হইলে এবং সে বেদ পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ হইবে না কেন? হোম করিলে যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে অত্র লোকে হোম কক্ষক না। কিন্তু অগ্নিতে বিচালিলে কেবল ধোঁয়ায় চক্ষুর পীড়া জন্মে মাত্র! অনেকে গায়ে ছাই মাখে, যখায় জটা রাখে, প্রদীপ জালিয়া বসিয়া থাকে, ধরের জ্ঞান কোণে বসিয়া ঘণ্টা বাজায়, চোখ ভিটি টি করে, কানে ফিস ফিস করে (কয়েকি খুসখুসই জববদ্বী) অর্থাৎ পরচর্চা করে—এই সকল লোক কেবল লোককে কান্ধি দেয়। (লোকন্ত কুহনয়)

মীরার উদ্দেশ্য ছিল প্রেমের প্রাণান্ত স্থাপন করা। প্রেমকে বড় করিতে হইলে আর সকল পদার্থকেই উপেক্ষা করিতে হইবে। কর্তব্যবাক্য গোষ্ঠ্যমীও এই কথাই বলিয়াছেন :—

কুকবিবক্ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।

যার আশে তৃপ্তুল চারি পুরুষার্থ

পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দাত্ম-সিদ্ধি।

মৌকখি আনন্দ যার নহে এক বিলুপ্ত।

রূপ-প্রেমের নিকট যৌকও তুচ্ছ। প্রেমিক যৌক কামনা করে না। দীর্ঘমান (যৌক) ন গৃহস্থি বিনা মৎসেবং জবাঃ। কিন্তু প্রেমের এই উচ্চ ধারণা মীরা কোথা হইত পাইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। মহাপ্রভুর পূর্বে চণ্ডীদাস প্রেমের বিজ্ঞান-বৈজ্ঞানী বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের অমর কাব্যগ্রন্থ পান করিয়া মহাপ্রভু প্রেমের মন্ত্র প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মীরা কি চণ্ডীদাসের কোনও সংবাদ রাখিতেন?

পূর্বে সংজ্ঞায়দের দোহার সহিত মীরার সঙ্গীতের যে মিল দেখা গেল, তাহা কি আকস্মিক? একই রকমের ভাব বিভিন্ন কবির মধ্যে প্রসূরিত হইত দেখা যায়। তাহা হইত এক জন যে অপরের নিকট গুণী, গ্রন্থ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে এই যে মীরাকে সহজিয়ার তাহাদের জিহ্বার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করে। ‘মীরা কাইয়ের করচা’ বলিয়া বটতলার বে পুত্তিকা পাওয়া যায়, তাহা সহজিয়ার দ্বারা প্রচারিত বলিয়া মনে হয়। ঐ করচার রূপ-গোষ্ঠ্যমী মীরার নিকট শিক্ষা লাভ করিতেছেন এই কথা আছে। ঐ করচার আধুনিক গ্রন্থকর্তা মীরার নামে এই যে বইখানি চলিয়াছেন, তাহাতে ‘তি নাহনে হরি মিল’ কবিতাটি উদ্ধার করিতে ভুলেন নাই।

বাহা হউক, প্রেমের যে বীজ বঙ্গদেশে উগ্ঠ হইয়াছিল, তাহা বঙ্গের বাহিরে কি করিয়া ছড়াইয়া পড়িল ইহা ভবিষ্যৎ বিবরণ। মৃদঙ্গ গোকুলে বসিয়া এই প্রেমের কবিতা লিখিয়া পুণি ভরিয়াছিলেন। রজতানার মল্লমিতে বঙ্গলার পয়তল কেমন করিয়া ফুটিল? ইহাদেরও পূর্বে বিদ্যাপতি মিথিলার বসিয়া বাঙালীর অমরাগ-রক্ত ডুবা ইয়া প্রেমের চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন নাকি?



ভারতে রাষ্ট্রনীতি

ভারতবর্ষের লোকেরা যে পরিমাণে জাগিয়া উঠিতেছে এবং যাহা যতটা নিজের ভাগ্যনিষ্ঠা হইতে পারে ততটা, নিজের দেশে নিজের ভাগ্যনিষ্ঠা হইতে চাহিতেছে, সেই পরিমাণে তাহাদের স্বারাজ্যলাভচেষ্টা বা বাহ্যতেরও সূত্ৰ হইতেছে। ইংরেজ জাতির প্রভুত্ব যত দিন সমষ্টিগত ভাবে আপত্তি উৎপাদিত হয় নাই, যত দিন উহার জাঘাত, অন্ততঃ মৌখিক, অস্বীকৃত হয় নাই, তত দিন ইংরেজের নিরপেক্ষ থাকা সম্ভবপর ও সম্ভব ছিল। কিন্তু উহাতে আপত্তি যত প্রবল হইতেছে, স্বারাজ্যলাভের ইচ্ছা যত বাড়িতেছে, ইংরেজের ততই এমন কতকগুলি লোকের প্রয়োজন বাড়িতেছে যাহারা নানাবিধ সুবিধার বিনিময়ে ইংরেজের প্রভুত্ব মানিয়া লইবে, ইংরেজের প্রভুত্ব আপত্তিকারীদের সঙ্গে যোগ দিবে না, এবং আগে যোগ দিয়া থাকিলে তাহা ছাড়িয়া দিবে। এই জ্ঞাত, কোনও সভ্য দেশের আধুনিক মূল শাসনবিধিব্যবস্থার যেরূপ শ্রেণীগত সম্প্রদায়গত স্বার্থের পার্থক্য স্বীকৃত বা সূত্ৰ হয় নাই, ভারতবর্ষে তাহা হইতেছে। অন্ততঃ কতকগুলি লোককে হাতে রাখিবার প্রয়োজন ইহার কারণ।

আমরা যতই এক হইতে চাহিব, ততই অমনেকর কারণ স্টিত থাকিবে, ইহা বড় অবসাদজনক বটে; কিন্তু ইহাতে নিঃস্বাস, নিরাশ বা অবসর হওয়া উচিত নহে। ইহা বেঁটবট, তাহা আমাদের জানা উচিত ছিল এবং এখনও উচিত। যত বাধাই বড়ুক, স্বারাজ্যলাভচেষ্টা আমরা ছাড়িব না। কিন্তু সেই চেষ্টার অঙ্গ ও আয়োজন স্বল্প, “একতা চাই,” “একতা চাই” মুখে বলিলে এবং জোড়াতাড়ি দিয়া একতা স্থাপনের চেষ্টা করিলে, ইংরেজ শ্রেণীনিষেধ ও সম্প্রদায়নিষেধকে বে-বে রকম সুবিধা দিতেছে আমরা তদপেক্ষা বেশী দিবার অস্বীকার

করিল, একতা আসিবে না, স্বারাজ্যও আসিবে না। সাম্প্রদায়িকতা আমরা ইংরেজের দেখাদেখি যতই মানিয়া লইব, উহা ততই বাড়িয়া চলিবে। আগুন ধী চলিলে যেমন উহার শিখা বাড়িবে, সাম্প্রদায়িকতাকে সাক্ষাৎ বা পরাক্ষ সাধ দিলেও বা উহা ক প্রভা দিলেও উহা তত বাড়িবে। যেমন, সরকার মুসলমানদিগের জন্য শতকরা ২৫টা চাকরীর নিশ্চিত বরাদ্দ করার স্তর মুহম্মদ ইফ্বাল বলিতেছেন, মুসলমানদিগকে নিশ্চিত শতকরা ৩৩টা দেওয়া উচিত এবং অধিকন্তু মুসলমান চাকরীদের পদোন্নতি হওয়া উচিত, অর্থাৎ অমুসলমান বেশীদিনের চাকরোদিগকে ডিঙাইয়া মুসলমান অল্পদিনের চাকরোদের বেতনবৃদ্ধি ও পদোন্নতি হওয়া চাই। এই কারণে সাম্প্রদায়িকতা বরাবর সম্পূর্ণ অস্বীকার করা আবশ্যক। অন্ততঃ খুব ছোট একটি দলও যদি থাকে যাহার সভ্যেরা কোন প্রকার শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত আলাদা স্বার্থ সুবিধার ব্যবস্থা চাহিবে না মানিবে না, তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর।

সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির চেষ্টা যতই হউক না কেন, প্রকৃত দেশপ্রেমিতাদিগকে এতদূর নানা হিতকর অমূল্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, যাহার উপকার সকল ধর্মের ও সকল শ্রেণীর লোক পাইতে পারে। ইহার মানে এমন যে, ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের জন্যই অভিপ্রেত কোন মঙ্গলকার্য্য করিতে হইবে না। তাহাও করিতে হইবে। কারণ, এমন অনেক অস্বীকার প্রথা আছে, এমন কুসংস্কার আছে, এমন অকল্যাণ আছে, যাহা সম্প্রদায়বিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের আবশ্যক। তৎসমুদয়েরও বিনাশ আবশ্যক।

যাহারা অস্তায়রূপে অস্বপ্নীত হইতেছে মনে হইবে,

তাহাদের প্রতি দ্বন্দ্ব। ও অসহ্যর ভাব মনে উঠিতে দেওয়া উচিত নয়—উঠিলে তাহা দমন করা কর্তব্য।

ব্যবস্থাপক সভা প্রতি প্রতিনিম্নলিখিত প্রতিপাদনে সকল ধর্ম জাতি ও শ্রেণীরই প্রতিনিধি বলিয়া প্রত্যেক সভা মনোনীত হন না বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে তাহার দেশহিতৈষী—এবং দেশহিতৈষী সকলেরই হওয়া উচিত—তাঁহাদিগকে অমুভব করিতে হইবে, যে, তাঁহারা সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি। হিন্দুকে হিন্দু অহিন্দু সকলের জন্ত, মুসলমানকে মুসলমান অমুসলমান সকলের জন্ত, খ্রীষ্টিয়ানকে খ্রীষ্টিয়ান অ-খ্রীষ্টিয়ান সকলের জন্ত, শিখকে শিখ অশিখ সকলের জন্ত খাটিতে হইবে। প্রদেশ হিসাবেও কোমণ্ড প্রদেশের প্রতিনিধিদিগকে কেবল নিজ প্রদেশের জন্ত খাটিল চলিবে না, সকল প্রদেশের জন্ত খাটিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেকের নিজ শ্রেণী সম্প্রদায় ও প্রদেশের জ্ঞান যত বেশী জন্ত সকলের তত বেশী হইবার কথা নয়। কিন্তু সকলেই সব প্রদেশের হিতসাধনচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে পারেন।

জাতীয় একত্বাধিপনের ইহাই একটি প্রকৃত ও প্রধান পক্ষ।

সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব

ইংরেজ মুসলমান ভারতীয়দের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-দিহির সুবিধা করিয়া দেওয়ার এবং একবার সাম্প্রদায়িক সুবিধার স্বাদ পাইয়া তাহার জন্ত তাহাদের লালসা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলায়, অমুসলমানেরা মুসলমানদিগকেই অনেক সময় প্রধানতঃ দ্রষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ভুল। তাহা বৃদ্ধি হবার জন্ত অমুসলমানেরা কিছু ইতিহাসের উল্লেখ আবশ্যক।

যে-সব দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় উপসম্প্রদায় আছে তাহাদের মধ্যে সর্বত্রই সম্ভাব্য অসম্ভাব আছে। জরত্বর্যও ছিল ও আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এখন রুই নীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সব ব্যাপারে বে-শ্রমের সাম্প্রদায়িকতা দেখা যায়, তাহার উদ্ভব হয় লর্ড মিন্টোর আমলে। এ কল্যাণের কাছে আগা র্থ প্রমুখ মুসলমানেরা স্বতন্ত্র ও বিশেষ সুবিধা দাবী

করিত গিয়াছিল। বটে; কিন্তু গিয়াছিল সরকারী হুকুম বা ইঙ্গিত। সরকারী হুকুম বা ইঙ্গিতে তাহার গিয়াছিল বলিয়াই বে তাহাদের কোন দোষ ছিল না, এমন নয়। তাহাদের এই দোষ ছিল, যে, তাহার সমগ্র নেতৃবৃন্দের অর্থাৎ মহাজাতির পক্ষে অনিষ্টকর এক পরিণামে নিজেদের পক্ষেও অনিষ্টকর দাবী সম্প্রদায়গত স্বার্থান্বেষিত করিয়াছিলেন। যে প্রবৃত্তি করে ও যে প্রবৃত্তি হয়, উভয় পক্ষই দোষী।

বঙ্গের অঙ্গ ক্ষেত্রের পর প্রবল আন্দোলন হয়। তখনিত অসন্তোষ বাংলা দেশেই আবদ্ধ ছিল না। এই অসন্তোষ বন্দীভূত করিবার জন্ত, গবর্ণমেন্ট দেশের লোকদিগকে কিছু অধিকার দিতে ছন এইরূপ যাহাতে মনে হয় এতদ কিছু করা আবশ্যক মনে করেন। যে ব্যবস্থা হয় তাহা মর্লীমিন্টো শাসনবিধিসংস্কার (Morley-Minto Reforms) নামে পরিচিত। এই সময় মিন্টো ভেদীতি-প্রয়োগ করেন। জন্ত সব সভা দেশে যেমন সকল ধর্মের ও শ্রেণীর লোকদের সাধারণ প্রতিনিধিদের নির্বাচন একত্র হয় এবং তৎকালে জাতীয়তা গুটি হয়, তিনি সেসব কিছু হইত না। দিয়া-মুসলমানদিগকে বিশেষ কিছু, স্বতন্ত্র কিছু চাহিতে পরোক ভাবে উৎসাহিত করেন। তাহারই ফলে আগা র্থ। প্রমুখ মুসলমানেরা তাহার কাছে যান। এই জন্ত মৌলানা মোহাম্মদ আলী জব্বারের সভাপতিত্বে তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, যে, আমরা র্থ। এই বে দরবার করিয়াছিলেন, তাহা কমান্ড পারফরম্যান্স (“command performance”) অর্থাৎ উহা উপর-ওরালার হুকুম করা হইয়াছিল। ভারতসচিব লর্ড মর্লীর ভাবনামতের দ্বিতীয় ভলুমের ৩২৫ পৃষ্ঠা হইতে নীচ উদ্ধৃত বাক্য ছটি মৌলানা সাহেবের উক্তি সম্বন্ধ করে।

“I won't follow you again into our Mahometan dispute. Only I respectfully remind you once more that it was your early speech about their extra claims that first started the M. (Mahometan) here.”

তাহারপর “আমাদের মুসলমান সবকী কল্যাণ আমি পুনরায় আপনাদের অনুরোধ করি না। আমি কেবল আপনাকে সন্মানস্বার্থে আর একবার স্মরণ করাই দিতেছি, যে, মুসলমানের অতিরিক্ত দাবী সব ক আপনাদের প্রাথমিক বক্তৃতা মুসলমান ধর্মোপাসক সমাজ ও পক্ষেই আছে।”

ভারত-গবর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত একটি সরকারী রিপোর্টেও ইহার প্রমাণ আছে। যথা, ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কমিটির রিপোর্টের (Report of the Indian Central Committee) ১১তম পৃষ্ঠায় আছে—

"58. It was at the time of the Morley-Minto Reforms that the claim for communal electorates was advanced by the Muhammadans, inspired by certain officials."

তৎপূর্বা। "মর্লী-মিণ্টো শাসনবিধি সংস্থারের সময়ই সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর জন্ম দাবী, কোন কোন সরকারী কর্মচারীর প্ররোচনায়, মুসলমানেরা করিয়াছিল।"

এ রিপোর্টের ১১৭ পৃষ্ঠায় আছে—

"It is often said that we must adhere to the promise made by Lord Minto's Government to the Muhammadan Deputation that waited on him in 1907-08. We will not bring forward the fact, which is now established beyond doubt, that there was no spontaneous demand by the Muslims at that time for separate electorates, but it was only put forward by them at the instigation of an official whose name is now well known."

তৎপূর্বা। "কখন কখন বলা হয়, যে, ১৯০৭-৮ সাল যে মুসলমান প্রতিনিধিসমষ্টি লর্ড মিন্টোর নিকট দরবার করে, তাহাদিগকে তৎকালীন গবর্নমেন্ট যে অঙ্গীকার করেন, তাহা রক্ষা করিতে হইবে। আমরা বর্ধমানে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত এই তথ্যটি উপস্থাপিত করিতে চাই না, যে, তৎকালীন স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর জন্ম কোন দাবী মুসলমানেরা স্বতঃপ্রযুক্ত হইয়া করেন নাই, কিন্তু তাহারা অথবা হাবনিত এক জন রাজপুত্রের প্ররোচনায় এই দাবী করিয়াছিলেন।"

লর্ড মিন্টোর গবর্নমেন্টের এই "অঙ্গীকার" ("promise")

স্বত্বক এ রিপোর্টেরই ১১৭ পৃষ্ঠায় আছে—

"The promise made by the Government *ex parte* without having heard what the Hindus had to say cannot be pressed against the Hindus if it works injustice and for various reasons is not in the public interest but is harmful in its results."

তৎপূর্বা। "হিন্দুদের কি বলিবার ছিল তাহা না শুনিয়া গবর্নমেন্ট যে একতরফা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে যদি হিন্দুদের প্রতি অবিচার হয় এবং নানা কারণে যদি তাহা স্বস্বসাধারণের হিতকর না হইয়া ক্ষণকালকর্ম হয়, তাহা হইলে তাহা হিন্দুদের বিরুদ্ধে অযুক্ত হইতে পারে না।"

অনেক আগেকার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বোষণ-পত্রে অঙ্গীকার ছিল, যে, ধর্ম বা জাতির জন্য কাহাকেও অহুগ্ৰীভ, নিগৃহীত বা অহুবিধাগ্রস্ত করা হইবে না। সে অঙ্গীকারটার কি হইল?

মুসলমানেরা যে স্বতঃপ্রযুক্ত হইয়া স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচন আদি চান নাই, তাহার আরও প্রমাণ আছে। পঞ্জাবের বাব্বাপক সভার অন্ততম সভ্য থাকা কালে রাজা নরেন্দ্রনাথের একটি প্রস্তাবের

উত্তর তৎকালীন অন্ততম মন্ত্রী বানানী মালিক কেবোজ থানু নু বলেন—

"But it is not possible to trace any single representation of any particular organized body of Muslims as being the main factor responsible for the introduction of the particular constitution (separate electorates) eventually decided on."

তৎপূর্বা। "বিশেষ কোন একটি মুসলমানসমষ্টি বা সমিতির কোনও একটি আবেদনের সম্মান পাওয়া সম্ভব নহে বাহা পরিণামে-নির্ধারিত বিধিব্যবস্থার (অর্থাৎ স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর) প্রবর্তনের জন্ম প্রধানতঃ দায়ী।"

স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচনের নিন্দা কোন কোন সরকারী রিপোর্ট পর্যন্ত, যেমন মস্টেণ্ড-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টে, আছে। কিন্তু তাহা থাকিলে কি হয়? কর্তৃদেহ নিন্দাস্ত কার্যতঃ উহারই পক্ষে হইয়া আসিতেছে। কারণ তাহারা নাকি "অঙ্গীকার" করিয়া ফেলিয়াছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বোষণ-পত্রে—বাহাতে সকল প্রকার প্রতিদ্বন্দ্ব্য ববহারের প্রতিশ্রুতি আছে এবং যে প্রতিশ্রুতির বাপদেশে ভারতীয়দিগের শত্রু ডোমনিয়নগুলার ঔপনিবেশিকদিগকে পর্যন্ত ভারত ভারতীয়দের সমান অধিকার দিতে ভারতসত্তি বর্ধন করের ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট বাধ্য—সেই বোষণ-পত্রে অঙ্গীকার নয়?

সরকারী রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর নিন্দা থাকা সত্ত্বেও যখন উহা কায়েম আছে, তখন ই রেজের লেখা ইতিহাসেও তাহা আছে বলিয়া যে উহা উঠিয়া যাইবে এমন আশা করা ছুরাশা। তথাপি মাস দুই আগে প্রকাশিত ইংরেজের লেগ ও ম্যাকমিলান কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত একখান ভারতেতিহাসে কি আছে দেখাঃ—

"The Muslims specifically demanded separate electorates, and the Hindu leaders conceded the principle in the 'Lucknow Pact' of 1916. Their effect was wholly bad. It is not only that they have led Indians to organise along sectarian lines, for this was probably inevitable and caste grouping occurs even within the Hindu constituencies, but the system throws up the worst type of pugnacious fanatic, who loves 'to prove his doctrines orthodox by apostolic blows and knocks.' The feeling that great changes were going to take place and the prospect of some actual transfer of responsibility and control over appointments, have combined to rouse all the meaner political passions, especially in those provinces, like Bengal and the Punjab, where the two communities are nearly equal in number. Middle class unemployment and a family system which elevates nepotism into something like a virtue, have also helped to embitter the politico-religious struggle. A further and very grave disadvantage of the communal electorate is

that an alteration in the parties can only occur through wholesale proselytism or through differences in the birth-rate. And both are stirred to new missionary enterprise, when the reward is not only a soul but also a permanent addition to one's voting strength. The activities of the Arya Samaj amongst the poor Muslims and of the various Mohammedan bodies amongst the lower caste Hindus, have caused the greatest bitterness. The politicians get all the support they need from an irresponsible press, while ill-feeling amongst the educated classes is kept alive by scurrilities like the *Rangita Rasul*. — *Rise and Fulfilment of British Rule in India: by Edward Thompson and C. T. Garratt.*

তাহা পূর্ণ। “মুসলমানেরা” বিশিষ্ট নির্বাচন দ্বারা স্বতন্ত্র নির্বাচক-মণ্ডলী চায়েরা ছিল, এবং হিন্দুদেরা ১৯১৬ সালের “লক্ষী চুক্তি” দ্বারা স্বতন্ত্র নির্বাচন নীতি মানিয়া লয়েন। [‘লক্ষী চুক্তি’তে স্বতন্ত্র নির্বাচন ছিল বটে, কিন্তু শাসনবিধি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত একটি দাবীও ছিল। সেই দাবী পূরণের স্বীকার করিল ভারতীয়দের হাতে হিঁদ্র প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আনিত। কিন্তু পূরণের সেই দাবী সম্বলিত সমুদয় ‘চুক্তি’ গ্রহণ না করিয়া কেবল নিজেদের পক্ষে হবিধাজনক স্বতন্ত্র নির্বাচনবিষয়ক অংশটিই লইয়াছেন। তাহার সপক্ষে, বাহা হউক, অন্ততঃ এটিটুকু বলিবার আছে, যে, তাহা হিন্দু-মুসলমান উভয়ই স্বীকৃত চুক্তি, কিন্তু ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত উত্তম সাম্প্রদায়িক স্বীকৃত সিদ্ধান্ত নহে। হিন্দুরা ও শিবরী উভয় বিরোধী এবং স্বাভাবিক (“nationalist”) মুসলমানের উভয় নিন্দা করিয়াছেন। বাহার বিরোধী সকল সাম্প্রদায়িক মধ্যে আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত হিন্দু-মুসলমানের স্বীকৃত চুক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ অধিকার করিত পারেন। এইজন্য পুনরায় হিন্দু-মুসলমানের স্বীকৃত কোন চুক্তি না-হওয়া পর্যন্ত লক্ষী চুক্তিই বজায় থাকুক সম্ভব। কিন্তু ক্ষমতাবাহী লোকেরা নিজেদের হবিধার বিরোধী চুক্তি কেবল নিন্দা? প্রবাসীর সম্পাদক:]

স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর ফল সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। তাহা যে ভারতীয়দিগকে কেবল ‘ধর্মসাম্প্রদায়িক’ অমূল্য দলবদ্ধ করাইয়াছে তাহা নহে—ইহা হয়ত অনিবার্য ছিল, কারণ কোন কোন হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যেই এক ‘একতা’ (unity) আলাদা দল বা ধর্ম—কিন্তু এই প্রথাগত প্রভাব এরূপ অধমতম লড়াইবাজ ধর্মোদ্ধার লোক প্রাধান্য পায় বাহারা নিজেদের মতকে ‘ধর্মমূল্যবান’ প্রমাণ করিবার জন্য বিপক্ষে ‘শাসনবিহিত’ প্রচার দিতে ভালবাসে। নানা বৃহৎ পরিবর্তন হইতে বাইতরে এইজন্য অনুভূতি এবং কিছু দারিদ্র্য এবং চাকরিতে নিরোগের উপর কড়ম্ব দেশের লোকদের হাতে আসিবার সম্ভাবনা, এই দুইই মিলিত হইয়া যত সব রাজনৈতিক নীতি প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে—বিশেষতঃ সেই সব প্রদেশে যেখানে পঞ্চাব ও বঙ্গের মত দুই সাম্প্রদায়িক সংখ্যায় প্রায় সমান সমান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বেকার অবস্থা এবং বে পরিবারিক প্রথা স্বজনপোষণক প্রায় এতটা সন্নিগত মত উচ্চ আসন দিয়া তাহা ধার্মিক ও রাজনৈতিক স্বপক্ষে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর আর একটা এবং গুরুতর অসুবিধা এই, যে, দলগুলির জনসাধারণ পরিবর্তন কেবল দলকে দল ধর্মোদ্ধার এবং জাতের হারের পার্থক্য দ্বারা ইচ্ছিতে পারে এবং উভয় পক্ষই নিজ নিজ ধর্ম অন্য দলের লোককে দীক্ষিত করিতে চাহে। উভয়ে উত্তেজিত হইতেছে, যেহেতু তাহার পূর্বসূরী নিজ দল কেবল এক একটি আকারে যোগ নহে অধিকন্তু নিজেদের ভোট-বলও ইচ্ছিতে হইতেছে। সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে আধা-সমাজের

এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে নানা মুসলমান সমিতির কায্যকলাপে পূর্ব বর্ণী তিক্ততার উত্তর হইয়াছে। দারিদ্র্যের সংবাদ সমুদয় হইতে রাজনৈতিক পাণ্ডার যত আশঙ্কিত তত সমর্থন লাভ করে, এবং ‘রসিলা রহস্য’-এর মত কুসংস্কৃতি বহির দ্বারা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জাগ্রত থাকে।”

বাংলা, পটাব, নিম্নদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে হিন্দু-মুসলমানী অপহরণ এবং পৈশ্যোক্ত ভীতি প্রকাশ বে হিন্দু বালকও অপহৃত হয়, তাহারও উদ্দেশ্য অংশতঃ অনেক স্থলে নিজ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি।

ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহই দারিদ্র্য-মিত। এক চোটেই করিয়াছে কিনা, অযোগ্য স্বজনদিগের পোষণ ভারতীয় লোক-মাজেই কিংবা কেবল ভারতীয়েরাই করে কিনা, ‘রসিলা রহস্য’-এর লেখক ও সমাধাই এক মাত্র দোষী কিনা, তাহার আলোচনায় এখানে অনাবশ্যক। কিন্তু অধুনিকতন ভারতীয়-ইতিহাস-লেখক দু-জন ইংরেজ সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধির স্বতন্ত্র নির্বাচনের যে-যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহার সত্যতা স্বীকার করিতেই হইবে।

কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা

বোম্বাইর কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি হোয়াইট পেপার বা খেতাব অগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার গ্রহণও করেন নাই, বর্জনও করেন নাই। কমিটির যে প্রস্তাবটি হইতে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার কোন কোন অংশের সত্তি অন্ত কোন কোন অংশের সত্যতা নাই, বরং বিরোধ আছে।

সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা যে স্বাভাবিকতর ও গণতান্ত্রিকতর সম্পূর্ণ বিপরীত ইহা সুবিদিত। কমিটির প্রস্তাবটি তও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি যে কমিটি তাহা বর্জন করেন নাই, তাহার উদ্দেশ্য অবশ্য ভাল। অধিকাংশ মুসলমান ভোটার তাই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের পক্ষে। সুতরাং কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে মত দিল ব-বহাপক সভার প্রবেশার্থী কংগ্রেসদলভুক্ত মুসলমানেরা ভোট খুবই কম পাইবেন, ফলে বাবহাপক সভার চুক্তিতে পারিবেন না। তাহা হইলে ব-বহাপক সভার কংগ্রেস-পক্ষীয় সভ্যের সংখ্যা বর্ধিত বেশী হইবে না। সুতরাং

করিয়া ইন্ড-ভারতীয়দিগকে চাকরী দেওয়াতেই রেল প্রভৃতি বিভাগে তাহাদের এত বাহুল্য ঘটিয়াছে। সরকারী যে অবিচারে তাহা ঘটিয়াছে সরকার সেই অবিচারের ফলকেই হেতু করিয়া অবিচারটা স্থায়ী করিতে চাহিতেছেন!

সরকারী ওকালতীর ঠিক সমতুল্য একটা যুক্তি আমরা দেখাইতেছি। সরকারী অধিকাংশ বিভাগে হিন্দু ভদ্রলোকরা অধিকাংশ চাকরী করিয়া আসিতেছে। এমন বিস্তর হিন্দু পরিবার আছে বাহারা পুরুষাচরণে সরকারীচাকরীজীবী। অযোগ্যতার জন্ত তাহাদের বংশধরেরা যদি চাকরী না পায়, তাহাতে হুঃখ নাই—তাহা ত হওয়াই উচিত। কিন্তু যোগ্যতা থাকিতেও তাহারা হিন্দু বলিয়াই শতকরা প্রায় অর্দ্ধেক চাকরী হইতে নিশ্চিত বঞ্চিত হইবে, ইহাতে কি “ভারোল্লেট্ ডিমোকেশন্ অব দি ইকনমিক্ ট্রান্সফার অব্ দি কমুনিটি” অর্থাৎ তাহাদের সমাজের অর্থনৈতিক প্রচণ্ড ভাঙচুর ঘটিবে না?

চাকরীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরায় সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি

কতকগুলি চাকরী বিশেষ কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের বা বংশের লোককে দিতেই হইবে, এরকম ব্যবস্থায় যোগ্যতারের পরিবর্তে অযোগ্যতার অনেক লোকের কাজ পাওয়া অনিবার্য, ইহা অতি সহজবোধ্য। ইহাতে যে দেশে অসন্তোষ অশান্তি বাড়িবে, জাতীয় একতা বিনষ্ট হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু অজ্ঞ গুরুতর ক্ষতিও আছে।

যোগ্যতম লোকদের কাজ পাইবার দাবী সর্বাগ্রে বিবেচিত ও গ্রাহ্য হইবে, এইরূপ নিয়ম অমুহুত হইলে দেশের সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিদ্বার চর্চ্চা বাড়িবে, নানাবিধ নৈপুণ্য লাভ করিবার চেষ্টা বাড়িবে, দৈহিক ও মানসিক শক্তি বাড়াইবার প্রয়াস বৃদ্ধি পায়। তাহাতে সমগ্র জাতি (nation) উপকৃত হয়। ইহার বিপরীত নীতি অমুহুত হইলে উক্ত উপকার ত হয়ই না, নানাদিকে ঔদাসীন্য আলস্য আদি দোষ বাড়িতে থাকে।

রাষ্ট্রের ক্ষতিও খুব হয়। সম্প্রদায় ও বংশ অনুসারে অনুগ্রহের রীতির অবশুজ্ঞাবী ফলে অনেক অযোগ্য লোক রাজকার্যে নিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রের কোন বিভাগেরই কাজ ভাল করিয়া চলিবে না। তাহাতে বিশৃঙ্খলা, অপরাধ-বৃদ্ধি, রোগবৃদ্ধি, কৃষি শিল্পবাণিজ্যের ক্ষতি এবং রাজস্বহাস ঘটিবে।

অনুগৃহীত সম্প্রদায়ের ক্ষতিলাভ

সামরিক সব চাকরী ছাড়িয়া দিয়া (কারণ সরকারী বাঁটোআরা অসামরিক চাকরী সম্পর্কেই হইয়াছে) ব্রিটিশ-ভারতে পুলিশের কাজ করে ২২৪৯৯৬ জন এবং অন্ত সরকারী চাকরী (“service of the State”) করে ৩৫২৫৬৩ জন—মোট ৫৭৭৫৫৯ জন সরকারী চাকরী করে। সরকারী চাকরীর যে বাঁটোআরা বাহির হইয়াছে, তাহা ভারত-গবন্মেণ্টের অধীনস্থ চাকরীসমূহ সম্বন্ধে, প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট সমূহের অধীনস্থ চাকরীসমূহ সম্বন্ধে নহে। আমরা উপরে যে সংখ্যা দিলাম, তাহা ভারত ও প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট-সমূহের সব চাকরীর সমষ্টি। শুধু ভারত-গবন্মেণ্টের হস্তস্থিত চাকরী-সকলের আলাদা সংখ্যা পাই নাই। ভারত-গবন্মেণ্ট যেরূপ নতুন ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রাদেশিক সব গবন্মেণ্টও নিশ্চয়ই অচিরে সেই রূপ কিছু করিবেন। সুতরাং আমরা সেপ্লস রিপোর্ট হইতে উপরে যে সংখ্যা দিয়াছি, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই কিছু আলোচনা করি।

৫৭৭৫৫৯ট চাকরীর সিকি মুসলমানেরা পাইলে ১৪৪৩৮৯ট চাকরী তাহারা সমুদয় ব্রিটিশ-ভারতে পাইবেন। সেপ্লস রিপোর্টে পুলিশের লোকদের পরিবারের গড় বৃহৎ ৩.৭ জন এবং অন্ত চাকরীদের ৩.৯ জন দেওয়া হইয়াছে, গড় ৩.৮। প্রত্যেক মুসলমান সরকারী চাকরীর পরিবারে, চাকর্যেকেও ধরিয়া, ৪+১ = ৫ জন মানুষ আছে ধরা যাউক। তাহা হইলে ১৪৪৩৮৯ট চাকরীতে আবালবৃদ্ধবনিতা ৭২১৯৪৫ জন মুসলমান শাক্ষাৎভাবে প্রতিপালিত ও লাভ-বান্ হইবে। ব্রিটিশ-ভারতে মোট মুসলমান লোকসংখ্যা ৬,৭০,২০,৪৪৩। ইহা হইতে ৯৭,২১,৯৪৫ জন বাদ দিলে যে ৬,৬২,৯৮,৪৯৮ মুসলমান বাকী থাকে, তাহারা গবন্মেণ্টের

নূতন চাকরী-বাটোআরা হইতে সাক্ষাৎ ভাবে লাভবান হইব না। কিন্তু সরকারী কৰ্মে সাহুগ্রহণিয়োগনীতি প্রবর্তিত হওয়ায় রাষ্ট্রের শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি শিল্পবাণিজ্য বিচার শাসন রেল ডাক টেলিগ্রাফ আদি সব বিভাগের কাজ যে নিকটভাবে পরিচালিত হইবে এবং সমাজে দৈনিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় যে তাঁ'টি পড়িবে, তাহার দরুন ও মুসলমান ভারতীয়দেরই মত অকলাণ ও ক্ষতির ভাগী ঐ প্রায় সাত কোটি মুসলমানও ই ব।

বলিয়াছি, যে, অধিকাংশ মুসলমান সাক্ষাৎভাবে গবর্নমেন্টের চাকরী-বাটোআরা দ্বারা লাভবান হইব না। পরোক্ষভাবে লাভবান হইব কি? বাংলা দেশের অভিজ্ঞতা অন্ত সব প্রদেশে খাটে কি মা জাণি না। কিন্তু অন্ততঃ বাংলা দেশে দেখিতেছি, লোকসংখ্যা ও সম্পত্তির তুল্য ঐ বঙ্গের মুসলমানের, সকল সম্প্রদায়ের জন্ত দূরে থাক, নিজ সম্প্রদায়ের জন্তও বিদ্যালয় কলেজ খুব কম স্থাপন করিয়াছেন, বিখ-বিদ্যালয়ে খুব সামান্য বৃত্তি পুরস্কার পদক দিয়াছেন, অন্তবিধ কলাগণকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা কার্য্য সম্পাদন খুব সামান্যই করিয়াছেন এবং ছুঁড়িক্কেল্লাবনাদিতে বিপন্ন মুসলমান দরও সাহায্যার্থ অর্থ, শক্তি ও সময় সামান্যই দিয়াছেন। সুতরাং ইহা বলিলে অত্যন্ত হইবে না, যে, গবর্নমেন্টের এই নূতন বাটোআরা অন্ত সব সম্প্রদায়ের মত বিরাট মুসলমান সমাজেরও প্রভূত অকলাণ ও ক্ষতিই করিবে। উগর দ্বারা বিশাল মুসলম নসমষ্টির তুলনায় অল্পপংখক মুসলমানেরই আর্থিক বৃদ্ধি হইবে। তাহার ও তাগদের সমশ্রমীহ চাকরীর উন্নয়ন ও মসীতীবী হইতে অভিল্যাবী মুসলমান বা মুখর হইয়া বাটোআরাটার প্রশংসা করিতেছে। কিন্তু বিরাট মুসলমান জনগণ যদি ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিত এবং যদি তাহাদের প্রকৃত প্রতিশিষ্টাভা ও ধবরের কণ্ঠ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আনন্দিত হইত না, বরং জাতীয় একতা ও স্বরাজ্যলাভের পথে এই নূতন কণ্টক রোপিত হওয়ায় তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া ইহার প্রতিবাদই করিত।

মুসলমানদের মধ্যে টি প্রতিযোগিতা চাই

শতকরা ২৫টি চাকরী মুসলমানদিগকে দিবার জন্য যদি

গবর্নমেন্ট মুসলমানদেরই মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সেগুলি যোগ্যতম মুসলমানদিগকে দেন, তাহা হইলে মঙ্গল ভাল হইবে, কেবলমাত্র “জোচ্ছব্য”-গিরিতে যোগ্যতম মুসলমানেরাই তাহা পাইবেন না।

চাকরী-বাটোআরা ও স্বাভাবিকদের কর্তব্য

বাহার আগে হইতেই নিজেদের আদর্শ অনুসারে সরকারী চাকরী হইতে নিবৃত্ত আছেন বা থাকিবেন বলিয়া সংগ করিয়াছেন, তাহাদিগকে এখ নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বাহাদের আদর্শ সরকারী চাকরী করার বিরূত নহে, চাকরী-বাটোআরার দক্ষতা তাহাদের সরকারী চাকরীর প্রতি বিমুগ্ধ ইবার কোন কারণ নাই, গবর্নমেন্ট বাহাদিগকে অহুগ্রহ করিতেছেন তাহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা বা অসন্তোষ পোষণ করিবারও কোন কারণ নাই।

সরকারী চাকরীর হুটা দিক আছে। এক উর্জিত, দ্বিতীয় দেশের হিত; কারণ আদর্শ অনুসারে কাজ করিতে পারিলে সরকারী সকল বিভাগের চাকরীর দ্বারা দেশের হিত করা যায়—অবশ্য দেশকে স্বাধীন করিবার সাক্ষাৎ চেষ্টা ছাড়া অত্রিধ হিত। এই জন্ত সরকারী চাকরীর অবিরোধী হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি চাকরীপ্রার্থীর প্রতিযোগিতার উৎকর্ষ প্রদর্শন দ্বারা এবং কেবল সেই উপায়েই চাকরী পাইবার চেষ্টা করিতে পারেন।

দেশ সবার ও এনোপার্কনের প্রকৃষ্ট উপায় ও ক্ষেত্র কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদি স্বাধীন বৃত্তিত সকলের জন্য পড়িয়াই আছে।

চাকরী-বাটোআরা ও শিক্ষার উন্নতি

মুদ্রয় সরকারী উচ্চ কাজেও কেবল ভারতীয়দিগকেই নিযুক্ত করা হউক, ভারতীয় নেতাদের এই মন্তব্য দাবীর উত্তরে গবর্নমেন্ট বহুবার বলিয়াছেন, সেরূপ সব কাজের জন্য যথেষ্টপংখক যথেষ্ট যোগ্য ভারতীয় পাওয়া যায় না। ইহার সরল অর্থ এই, যে, ভারতীয়েরা শিক্ষার আরও বেশী উন্নত ও অগ্রসর হইল ঐ সব কাজ সম্ভবই পাইবে। জিজ্ঞাস্য এই, চাকরী-বাটোআরা কি শিক্ষাবিষয়ে এই উন্নতি ও অগ্রগতির অহুকুল না প্রতিফল? নিকটই প্রতিকূল। কারণ, এই বাটোআরা মুসলমানদিগকে

সি.তিহি, “শিক্ষায় তোমরা যত অগ্রগতিই হও না কেন, শতকরা ২৫টি কাজ তোমরা পাইবেই”; হিন্দুদিগকে ইহা বলিতেছে, “তোমরা শিক্ষায় যত উন্নতিই হও না কেন, গারুরী সমুদয় বা কতকগুলি বিভাগে শতকরা ৪২½ টি গারুরী তোমরা পাইবেই না।”

চারুরী-বাঁটোআরা করা এখন ভারত-

গবন্মেণ্টের অধিকার-বহির্ভূত

প্রথম তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে নিযুক্ত একটি দল-কমিটির উপর ভবিষ্যৎ শাসনবিধি অনুসারে সব রকম গারুরী ত নিয়োগাদি বিষয় আলোচনা করিবার ভার দেওয়া হয়। সেই দল-কমিটি প্রস্তুতি করে, যে, কার্যনির্বাহের উৎকর্ষের ক্ষতি না করিয়া এবং আবশ্যিক যোগ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাহ্যে ত সব প্রস্তাবের লোক যথাযোগ্য রূপে গারুরী পায় তাহার ব্যবস্থা পত্রিক সার্ভিস কমিশন-সমূহ দ্বারা করাইতে হইবে। এই প্রস্তুতি এখন প্যালেমেন্টের স্পেসিফিক কমিটির বিচারার্থীন আছে। উক্ত কমিটি রিপোর্ট করিল তাহা প্যালেমেন্টে বিবেচিত হইবে। প্যালেমেন্টের দ্বারা বাহির হইলে তবে গবন্মেণ্ট কিছু করিতে অধিকারী। প্যালেমেন্টের কোন কমিটির বিচারার্থীন কোন বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার ভারতগণ ও ভারত-গবন্মেণ্টের আছে কি? নিশ্চয়ই নাই।

পুনায় মহাত্মাজীর প্রতি (?) বোম্বা নিক্ষেপ

মহাত্মা গান্ধী পুনায় যখন অভিনন্দন-সভায় যাইতে ছলেন, তখন তিনি নিশ্চয় ভবন পৌছিবার আগে খায় একটি মোটরকে লক্ষ্য করিয়া একটা বোম্বা নিক্ষেপিল। এই মোটরে তিনি ছিলেন না। অস্ত্র ঝাঁহার দলেন তাঁহার আহত হন, কিন্তু দৌড়াগত্রেমে ক' মারা পড়েন নাই। প্রথমেই খবর রটে, যে, গান্ধীজীকে লক্ষ্য করিয়া বোম্বা ছোঁড়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহার চেহারা এত সুপরিচিত যে ভয় করিয়া অস্ত্র ছোঁড়িত বোম্বা নিক্ষেপ সম্ভবপর নহে বলিয়া বোম্বা তাহারই উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে।

তথাকথিত সনাতনীরা মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে রিতেছে, বৈদ্যনাথে তাহার তাঁহার গাড়ীর উপর গাঠি মারিয়াছিল, অন্তর্য তাঁহাকে কক্ষ-তাকা দেখাইয়া মানিত করিতেছে, ইত্যাদি কারণে সন্দেহ হইয়াছে,

যে, পুনায় বোম্বা কোন সনাতনী বা সনাতনীদের নিবৃত্ত কোন চর ছুড়িয়াছিল। কিন্তু যত ক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত দোষী ধরা না পড়িতেছে, ও তাহার দোষ নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাহারও বা কোন দলের উপর দোষ আরোপ করা স্তায়সঙ্গত হইবে না। এমনও হইতে পারে, যে, সনাতনীদের গান্ধীবিরোধী প্রচেষ্টার সুযোগে, লোকে তাহাদিগকেই দোষী করিবে ভাবিয়া, অস্ত্র কোন কুচক্রী পক্ষ এই কান্ড করাইয়াছে।

বাহা হউক, যে বা যাহারা এই দুষ্কার্য্য করিয়া থাকুক, সাধারণ ভাবে দুই-একটি কথা বলা যাইতে পারে।

হিন্দু শাস্ত্রে, বৌদ্ধ শাস্ত্রে এবং খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্রে এই উপদেশ আছে, যে, জ্ঞানকে অজ্ঞান দ্বারা, ধর্মকে প্রীতির দ্বারা, অকল্যাণকে কল্যাণ দ্বারা জয় করিতে হইবে। সুতরাং মহাত্মাজী যদি জ্ঞানমূলক বিষয়মূলক বলপ্রয়োগসাপেক্ষ কিছু করিতেন, তাহা হইলেও তাহার বিপরীত শাস্ত্রিক অহিংস উপায়েই তাহার বিরোধিতা করা উচিত হইত। কিন্তু তিনি অহিংস উপায়ই অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে অহিংস উপায়ই অবলম্বন আরও যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার সহিত যাহারা যুদ্ধ করিতে চান, তাহারা তর্ক-যুদ্ধ করুন এবং তদতিরিক্ত সেবা-যুদ্ধ করুন। তিনি হরিজনদিগের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। সনাতনীরা যে-সকল শাস্ত্র মানে, তাহাতেও সকল জীবের কল্যাণ করিবার উপদেশ আছে। অতএব সনাতনীরা হরিজনকল্যাণকর্মে মহাত্মাজীকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করুন।

মহাত্মাজী স্নেহ স্বাগত

মহাত্মাজীর বাংলা দেশে আগমন উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাইতেছি। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য ও হরিজনদিগের মানবোচিত সকল অধিকার ও হৃদয় লাভের জন্য যে দুই প্রচেষ্টা প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সাহায্য আছে।

গান্ধীজীর আবার উপবাসের সঙ্কল্প

আজমীরে পণ্ডিত লালনাথ নামক একজন সনাতনীর দেহে হস্তক্ষেপ আঘাতবাদি হওয়ার মহাত্মাজী মনে করিয়াছেন, যে, হরিজন আন্দোলনের মধ্যে হিংসার ভাব আসিবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি সাত দিন উপবাস করিতে সংকল্প করিয়াছেন।

ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ইহাতে আমাদের দুঃখবোধ ও আশঙ্কা হইতেছে।

পণ্ডিত লালনাথের অভিযোগ সত্য বলিয়া মনে করিয়া গান্ধীজী এই সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতানা হরিজন-বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ চৌধুরী তদন্তের ফলে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, ঐ অভিযোগ মিথ্যা।

কলিকাতার মেয়র নির্বাচন

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার দ্বারা মেয়র নির্বাচনঘটিত অশোভন দৃশ্য ও প্রহসনের যবনিকাপাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। মেয়র অসীম ক্ষমতাসালী একাধিপতি (dictator) নহেন। হতরাং তিনি ইচ্ছা করিলেও বেশী কিছু করিতে পারেন না। তাহার উপর নলিনীরঞ্জন বাবু ক্রটিস্থ দেখাইবার জন্য এক বৎসরের পরিবর্তে কেবল নয় মাস সময় পাইবেন। তাহাপি তাঁহার মত কণ্ঠিত ও আর্থিক আয়ব্যয় সম্পূর্ণ ব্যাপার পরিচালনে হৃদয় ব্যক্তি হইত নয় মাসেও কিছু হুশুখলা স্থাপন করিতে এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটির আদর্শক কিয়ৎপরিমাণে আরও অধিক বাস্তবে পরিণত করিতে পারিবেন। তাহা পারিলে তাঁহার নির্বাচন ঠিক হইয়াছে প্রমাণিত হইবে। তবে যদি আইন মেয়রকে কোন কার্যকরী ক্ষমতা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন মেয়রের কাছেই কিছু প্রত্যাশ করা উচিত নয়।

বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের অস্থায়ী পদোন্নতি

বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় যে অল্প সময়ের জন্যও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা কিঞ্চিৎ সন্তোষের বিষয়। কিন্তু তাঁহার মত সুযোগ্য ব্যক্তি যে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হইতে পারিলেন না, ইহা তদপেক্ষা অসন্তোষের বিষয়।

প্রাচীন ভারতে বাসস্থান নির্মাণ পদ্ধতি

এই মাসের প্রবাসীতে প্রাচীন ভারতে বাসস্থান নির্মাণ বিষয়ে অধ্যাপক প্রসন্নকুমার আচার্য্য যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে বুঝা যায়, পুরাকালে এদেশে রাজারাজড় ও সাধারণ লোকদের প্রাত্যহিক জীবনে কিরূপ বৈচিত্র্য ছিল এবং তাহাদের বাসগৃহ তাহার কিরূপ উপযোগী ছিল। এই রূপ বৈচিত্র্য সভ্যতার একটি লক্ষণ।

প্রাচীন ভারতীয় স্থাপতিরা বিজ্ঞানানুমোদিত ভাবে কত দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, তাহারও কিছু পরিচয় এই প্রবন্ধে আছে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের বিশেষ পরিচয় পাইতে হইলে দুই-চারিটা “নব্য-প্রাচীন” দরজা জানালা ও কীর্ণিমুখ দেখা যথেষ্ট নহে। আচার্য্য মহাশয়ের ঢীকা ভূমিকা ও ইংরেজী অনুবাদ সম্বলিত “মানসারে”র পাঁচ ভূম্যে সমাপ্ত মূল্যবান সচিত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। তাহা অক্সফোর্ড যুনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

আসামে ও বঙ্গে জলপ্লাবন

আসামে ও বঙ্গে অনেক জেলায় বন্যা হওয়ায় বহু লক্ষ লোক বিপন্ন ও নিরাশ্রয় হইয়াছে। অনেক শত লোকের প্রাণ গিয়াছে। গবাদি পশু এবং অল্প সম্পত্তির নাশও প্রভূত হইয়াছে। যে-সকল সভা সমিতি বিপন্নদের দুঃখ মোচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্বসাধারণের নিকট হইতে সর্ববিধ সাহায্য পাইলে তাঁহাদের চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইবে।

আমরা শোকাক্ত ও বিপন্নদের স্তু ব্যথিত।

বিদেশভ্রমণ দ্বারা শিক্ষার্থী

বিদেশভ্রমণ দ্বারা শিক্ষালাভার্থ একদল ভারতীয় ছাত্র পূর্বে বিদেশ যাত্রা করিয়াছিল। তাহার পর এক দল ভারতীয় ছাত্রী গিয়াছে। গত ১১ই জুন দ্বিতীয় দল ছাত্র ইউরোপ গিয়াছে। এই সমুদয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাঙালী কেহ নাই। সম্ভবতঃ আর্থিক অভাব ইহার একটি কারণ। যে-সকল বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীর টাকার কুলাইবে, তাঁহাদের কিন্তু বিদেশ দেখিয়া আসা উচিত।

হিন্দু বিধবাদের প্রতি সমাজের কর্তব্য

বোম্বাইয়ের অল্পতম হিন্দু নেতা শ্রীযুক্ত মুহম্মদ রাও জরাকর সম্প্রতি বলিয়াছেন, যে, তিনি যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, “ভারতে প্রত্যহ গড়ে মিশ্র জন হিন্দু বিধবা মূলমান ধর্মে দীক্ষিত হইতেছে। গত পনের দিনে বোম্বাই প্রদেশের ১১ জন হিন্দু মহিলার অপহরণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই অবস্থার বিধবাদের জন্য বহু আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।”

হিন্দু বিধবারা ধর্মাস্তর গ্রহণ করুন বা না-করুন, তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি একান্ত আবশ্যক। আশ্রম স্থাপন, শিক্ষার দ্বারা তাঁহাদিগকে স্বাবলম্বী করা, এ সবই আংশিক উপায় বটে; কিন্তু প্রধান উপায় তাঁহাদিগের সংস্কারের সহিত

বিবাহ দেওয়া। বালবিবাহের বিবাহ দেওয়া মহা পুণ্যের কাজ। ইহা খুব উৎসাহের সহিত চালান উচিত। অনেক অন্তঃপুরে সখা ও বিবাহের উপর জঘন্য অত্যাচার হয়। ইহার দমন ও নিবারণ চাই।

কগজে দেবিলাম, কলিকাতার বিবাবিবাহসংহারক সমিতি ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩৩ পর্যন্ত কয় বৎসরে ৪২৯৬টি বিবাহের বিবাহ দিরাছেন। ইহা ভাল, কিন্তু ইহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক বিবাহের বিবাহ হওয়া আবশ্যক। বর্তমানে সমিতির সন্ধানে ৩৫০ জন পাত্র ও ১৭০ জন বিধবা পাত্রী আছে।

নারীহরণ সম্বন্ধে ভাই পরমানন্দ

সম্প্রতি ভাই পরমানন্দ বলিয়াছেন—

“যে পর্যন্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মসন্মানবোধ জাগ্রত না হয় এবং যে-পর্যন্ত হিন্দু সমাজ গুণ্ডার কবল হইতে হিন্দু বালিকাদিগকে রক্ষা করিবার মত শক্তি অর্জন না করে, তত দিন হিন্দু বালিকাদিগকে পরদার আড়ালে রাখা ও অশিক্ষিত রাখা উচিত।”

ভাই পরমানন্দের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু তাঁহার পরামর্শ গ্রহণীয় নহে। যে-সকল পুরুষ নারীরক্ষার জন্য প্রাণপণ করে না, তাহারামূষ নামের যোগ্য নয়। সে-সকল পুরুষের দরজা ভাঙিয়া বাড়ির ভিতর হইতেও গুণ্ডারা নারীহরণ করিতে পারে এবং কোন কোন স্থলে করেও অবশ্য, অপমৃত্যু প্রত্যেক নারীর আত্মীয়েরাই যে কাপুরুষ তাহা নহে। অনেক সময় তাঁহাদের অসুপস্থিতির সময় নারী অপকৃত্য হন এবং কখন কখন তাঁহাদিগকে আঘাত দ্বারা অসমর্থ করিয়া নারী হরণ করা হয়।

নারীহরণ অধিকাংশ স্থলে পল্লীগ্রামে হয়। পল্লীগ্রামে কি মেয়েদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব?

পুরুষদের পৌরুষ জাগ্রত করা এবং তাঁহাদের দেহমনের শক্তি বৃদ্ধি করা যেমন আবশ্যক, নারীদেরও দেহমনের শক্তি বৃদ্ধি সেইরূপ আবশ্যক। তাঁহারা ত জড়সম্পত্তিবৎ কিছু নহেন। তাঁহাদেরও আত্মরক্ষার সামর্থ্য জন্মান ও বাড়ান দরকার। ইহা নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক শিক্ষা-সাপেক্ষ। বালিকা ও নারীদিগকে অশিক্ষিতা রাখিলে নারীহরণ কমিবে, এ বড় অজুত কথা। যত বালিকা ও নারী অপকৃত্য হন, তাহার সমস্ত বা অধিকাংশ কি শিক্ষিতা?

বঙ্গীয় মহিলাদের কৌশল

বঙ্গীয় মহিলাদের কৌশল বঙ্গীয় অল্লী সিনেমাটিভ ও সিনেমার অল্লী বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সাফল্য কামনা করি।

বেথুন কলেজ ও বঙ্গ নারীশিক্ষা

বাংলা দেশে নারীদিগকে কতকটা উচ্চশিক্ষা দিবার ইচ্ছা যে ক্রমশঃ বাড়িতেছে, তাহা ছেলেদের অনেক কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে বুঝা যায়। অথচ গবন্মেণ্ট নারীশিক্ষায় কোন উৎসাহ দেখাইতেছেন না, ইহা বড় পরিতাপের বিষয়—বদিও আন্দোলনের বিষয় নহে। আমেরিকার মত দেশে, যেখানে অবরোধপ্রথা নাই, সেখানেও মেয়েদের জন্য আলাদা কলেজ অনেক আছে, আবার ছাত্রছাত্রীর একই প্রতিষ্ঠানে পড়িবার ব্যবস্থাও বহু স্থানে আছে। তাহার কারণ, মেয়েদের কোন কোন প্রকার শিক্ষা কেবলমাত্র ছাত্রীদের জন্যই অভিপ্রেত কলেজেই হইতে পারে। আমাদের দেশে ত শুধু মেয়েদের জন্য অভিপ্রেত বিদ্যামন্দির আরও দরকার। সেই জন্য, ছেলেদের কলেজে মেয়েদের শিক্ষালাভের বিন্দুমাত্রও বিরোধিতা না করিয়া, আমরা গবন্মেণ্টকে এবং দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বেথুন কলেজের উপযোগিতা ও উপকারিতা অধিক পরিমাণে বাড়াইতে অনুরোধ করিতেছি।

ঢাকাতে যে সামান্য বন্দোবস্ত আছে, তাহা ছাড়িয়া দিলে, বেথুন কলেজ বঙ্গের একমাত্র সরকারী মহিলা-কলেজ। অথচ ছাত্রের বিষয়, আমরা শুনিলাম, ইহার ছাত্রী-নিবাসে ১ম ও ৩য় বার্ষিক ছাত্রীদের জন্য মোটে ৮ জনের জায়গা আছে। কলেজের ক্লাস-কক্ষাদির ব্যবস্থাও নিকট ও অপ্রচুর। বেথুন কলেজের সম্মিলিত ক্রাইষ্ট চার্চ স্কুলের জায়গা ও বাড়ি গবন্মেণ্ট অনেক বৎসর হইল তিন লক্ষ টাকা দিয়া কিনিয়া রাখিয়াছেন—তাহার প্রকাশিত উদ্দেশ্য বেথুন কলেজের বিস্তৃতিসাধন। কিন্তু এ-পর্যন্ত ত কিছুই করা হইল না। তবে কি পাদ্রি সাহেবদিগকে তিন লাখ টাকা পাওয়াইয়া দিবার জন্য উহা কেনা হইয়াছিল? কলেজের পশ্চাৎ দিকেও ত বড় একটা গালি জায়গা কলেজের আছে। তাহাতেই বা ঘরবাড়ী নির্মিত কেন হইতেছে না?

সেনহাটী মহিলা-সমিতির সংকার্য

সেনহাটীর মহিলা-সমিতির একটি পুঙ্খ পরিষ্কার করিবার যে ছবি অন্তর প্রকাশিত হইল, তাহার জন্য আমরা উহার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা দাসগুপ্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

নিখিল ভারত নারীসম্মেলনের কলিকাতা

শাখা

নিখিল ভারত নারীসম্মেলনের কলিকাতা শাখার ছটি প্রস্তাব বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। প্রথমটি সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মহিলা মহলানবীশ উদ্ঘাপিত করেন। যথা—

নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের কলিকাতা শাখা তাঁহাদের এলাকার মধ্যে হিন্দুনারী উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করিবেন; এবং সে-বিষয়ে একটি বেসরকারী কমিশন বসাইবার জন্য আবেদন-আন্দোলন করিবেন, বাহাতে সে আইন ক্রমে সংশোধিত হইয়া স্ত্রীসম্পত্তি ও সমদণী হয়, সে-বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, সমর্থন করেন শ্রীমতী হেমলতা মিত্র ও পোষকতা করেন শ্রীমতী কুমুদিনী বসু। তাহা এই

নারীস্বত্বের পাপ বাংলা দেশের ব্যাপ্ত হওয়ার এই লক্ষ্যকর কলক অপমানের নিমিত্ত নিখিল-ভারত নারীসম্মেলনের কলিকাতা শাখার যথাযথ চেষ্টা করা কর্তব্য।

জাপানে, ভারতবর্ষে ও রুশিয়ায় শিক্ষাবিস্তার

ভারতবর্ষের উদ্বেজনভোগী ইংরেজ শিক্ষাক্ষমতারীরা বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট লিখিয়া লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করেন। বিশ্বাস হয় বটে, কিন্তু সেটা উল্টা রকমের। আমরা ভাবি, এই যে অকিঞ্চিৎকর কৃতিত্ব এবং অতিবিশাল অকৃতিত্ব, ইহা তাঁহারা কোন্ লক্ষ্যের লোকচক্ষুর গোচর করেন!

আমরা কিছুদিন আগে দেখাইয়াছিলাম, জাপানে শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই পাইতেছে মোট লোকসংখ্যার শতকরা কুড়ি জন এবং তথাকার শতকর প্রায় ৯৯ জন লিখনপঠনক্ষম। ভারতবর্ষে সর্ববিধ শিক্ষা মোট লোকসংখ্যার শতকর মাত্র জন কোন্ প্রদেশে পাইতেছে দেখুন। সংখ্যাগুলি সম্প্রতি প্রকাশিত ভারত-গবর্নমেন্টের শিক্ষা-কমিশনার শ্রী জর্জ এণ্ডার্সনের লেখা ১৯২৭-৩২ পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট হইতে গৃহীত। মাল্লাজ ৬.২৫, বোম্বাই ৬.১১, বাংলা ৫.৫৫, আগ্রা-অযোধ্যা ৩.১৩, পূর্বাঞ্চল ৫.৬১, ব্রহ্মদেশ ৪.২৮, বিহার-উড়িষ্যা ২.৯০, মধ্যপ্রদেশ ২.৯৬, আরাম ৪.৩২, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৩.৬০। ভারতবর্ষে লিখনপঠনক্ষম শতকরা আট জন এবং নিরক্ষর শতকরা ৯২ বিরানব্বই জন।

রুশিয়া ও ভারতবর্ষ শিক্ষার বিস্তার কিরূপ হইতেছে দেখুন।

বর্তমান বৎসর গ্রিক শিত জোসেফ ষ্টালিন প্রণীত সোভিয়েট ইউনিয়নের অবস্থা ("The State of the Soviet Union") নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, যে, ১৯৩০ সালের শেষে শতকরা ৬৭ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল, ১৯৩৩ সালের শেষে হইয়াছে শতকরা ৯০ জন। ১৯২৯ সালে সকল রকম স্কুল শিক্ষা পাইত ১৪৩৫৮০০০ জন ছাত্রছাত্রী, ১৯৩৩ সালে পাইত ২৬৪১৯০০০। তা ছাড়া, স্কুলে বাইবার আগেকার শিক্ষা ("Pre-school education") ১৯২৯ সালে ৮,০৮,০০০টি শিশু পাইত, ১৯৩৩ সালে পাইত ৫২,১৭,০০০টি শিশু। ভারতবর্ষে

উহার তুলনার শিক্ষার "ক্রম" গতি কিরূপ দেখুন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ হইতে পাঠশালা পর্যন্ত সর্ববিধ বিদ্যালয়সমূহে ব্রিটিশ-ভারতে ১৯২৭ সালে পড়িত ১১১৫৭৪৯৬ এবং ১৯৩২ সালে পড়িত ১২৭৬৬৫৩৭। মনে রাখিতে হইবে, সোভিয়েট রুশিয়ার লোকসংখ্যা ১৬১০০৬২০০, ও উহার বিস্তার জাতির নিজের কোন বর্ণমালা ও সাহিত্য এ-যাবৎ ছিল না; এবং হুসভা বহুবিস্তৃত সাহিত্য-বিশিষ্ট ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যা ২৭১৫২৬৯৩৩। অর্থাৎ ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যা রুশিয়ার প্রায় দ্বিগুণ, কিন্তু রুশিয়ার শুধু স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর ও বয়সের সব ছাত্রছাত্রীর দ্বিগুণের অনেক বেশী।

জার্মেনীতে অশান্তি ও হত্যাকাণ্ড

জার্মেনীর অনিয়ন্ত্রিতক্ষমতাবিশিষ্ট একাধিপতি গিটলারের বিরুদ্ধে ভিতর ভিতর অসন্তোষ বাড়িতেছিল এবং তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য গোপনে যড়যন্ত্র চলি তছিল, বোধ হয়। সেই জন্য তিনি তাঁহার বিরোধী বিস্তর লোককে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের প্রাণবধ করিয়াছেন। এতদপেক্ষাশূন্য ভিত্তির উপর কোন্ দেশের স্বাধীনতা ও শ্রী প্রতিষ্ঠিত থাকিত পারে না। এবং বস্তুতঃ এখন জার্মেনী বিদগ্ধ কোন জাতি বা ব্যক্তির অধীন না হইলও স্বাধীনও নহে, কিন্তু একজন যথেষ্টচারীর অধীন।

চীনা তুর্কিস্থানে চীনাধিকার পুনঃস্থাপিত

সংবাদ আসিয়াছে, যে, কাশ্মীর অফগানিস্থান ও রুশিয়ার সীমা পর্যন্ত কাশগড় ও ইয়ারকন্দ প্রভৃতি চীনা তুর্কিস্থানের সব অঞ্চল তুঙ্গানরা পুনরায় দখল করিয়াছে। অসামরিক চীনা গবর্নর সাগাংগো তাগার ইগা করিতে পারিয়াছে। এই প্রকারে চীনা তুর্কিস্থানের অধিকাংশ চীন-গবর্নমেন্ট পুনরায় দখল করিয়াছে এবং বিজাতীয় মুসলমানেরা পলায়ন করিয়াছে। চীনকে টুকরা টুকরা করিবার চেষ্টা এক দিকে যেমন জাপান করিতেছে, অন্য দিকে তেমনি মুসলমান অধিবাসীদিগকে বিজাতীয় করিয়াও যুৎসরতায় ভোগাইয় একটি ইউরাসীয়া শক্তি চীনা তুর্কিস্থানকে চীন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

গুজরাটের ও মেদিনীপুরের কৃষক

অহিংস আইনজ্ঞান আন্দোলন প্রচেষ্টার বোগ দেওয়ার কয় বৎসর গুজরাটের কৃষকদের খুব কতি হইয় থাকায় টাক তুলিয়া তাগার কর্তৃপক্ষ করিবার চেষ্টা বোম্বাইয়ে হইতেছে। মরায় গান্ধী এই চেষ্টার পূর্ণাঙ্গাণকতা করিতেছেন। মেদিনীপুরের কৃষকেরাও সমতুল্য কারণে

সম্মতিক হুঁশ ভোগ করিয়াছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের ক্ষতিপূরণের কোন চেষ্টা হইতেছে বলিয়া অবগত নহি।

ভারতবর্ষ বিদেশী চাল

ধানের জমী ভারতবর্ষে অনেক আছে, চালও অনেক হয়। তথাপি শাখা ও ইণ্ডীয়া হইতে খুব সস্তা দরে ভারতে চাল আমদানী হইতছে। জাপানী চালও কিছু দিন খুব সস্তা দরে এ দেশ বিক্রী হইতছিল। এখন হয় কি ব জানিনা। ভারতের বাজার দখল করিবর জন্য হাত এই সব দেশের রাজস্বজিনের সাহায্যে তথাকার চাল এ দেশ সস্তা নীত ও বিক্রীত হয়। ভারত-গবন্মেণ্ট প্রতিকারের চিন্তা করিতেছা। হরত বিদেশী চালের উপর শুল্ক বসিবে। কিন্তু শুধু এই উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। ভারতের সব খাণ্ডানের জমীর উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইয়া এখনই অধিকতর ধাতু উৎপন্ন করিয়া চাল খুব সস্তা করাইতে পারে।

বিনা বিচারে স্থায়ী ভাবে বন্দী রাখিবর ফন্দি

এ অস্থায়ী আইনের বলে বিনা বিচারে বন্দী অনেক বাঙালী যুবক ক অজমীর দেওনী জেল চালাব দিয়া আটক রাখা হইতছে, তাহাকে স্থায়ী আইন পরিগত করিবার উদ্দেশ্যে অরট্রুমচিব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে একটি বিল পেশ করিবন। আইটে যখন হইয়াছিল, তখন তা বৎসরের জন্য করা হইতছে বন হইয়াছিল। সেক্ষেত্রে কে ধার রহিল? অবশ্য, গবন্মেণ্টের পক্ষে ইহা বল হইতে পারে, যে, গবন্মেণ্টে হেবিল্য, যে, তা বৎসরে বাংলা দেশ ঠাণ্ডা হইবন, এবং ভবিষ্যতেও হইবার আশা নাই, তাই স্থায়ী আইন চাই। তাহা সত্য হইলে, এতাদৃশ একটি স্থায়ী আইন প্রণয়নের চেষ্টা করিয়া গবন্মেণ্ট ব্রিটিশ শাসনকে খুব উচ্চ গাটিকিট দিতেছা।

সারদা আইনকে ফাঁকি দেওয়া

বঙ্গদ্বার সারদা আইনকে ফাঁকি দিয়া ১৪ বছরের কম বয়সের মেয়ের বিবাহ দিতে চায়, তাহারা ফরাসী চন্দননগরে গিয়া বিবাহ দেয়। মাজাজ প্রেসিডেন্সীর কোকানোড শহরের নিকটবর্তী রানাম নামক ফরাসী অধিকৃত স্থানে সারদা আইনকে ফাঁকি দিয়া গত ১লা জুলাই ৫ হইতে ১০ বৎসরের মেয়েদের সতি ১৫ হইতে ১৮ বৎসরের ছেলের ২০ টা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অনেকে রাজপুতানার গিয়া এবং মাজাজ প্রেসিডেন্সীর বাল্যবিবাহপ্রতির লোকেরা নিষাঘের রাজ্যে গিয়া বাল্যবিবাহ দেয়। সারদা আইন নশোষণ করিয়া এইরূপ সব বিবাহও দণ্ডনীয় করা উচিত।

বঙ্গে অবাঙালী এঞ্জিনীয়ার

কর্মপ্রার্থী খুব যোগা বাঙালী এঞ্জিনীয়ার অনেক থাকে। সবেও আগ বরিশালে মুলমানপ্রধান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড একজন পত্রাবী মুসলমান এঞ্জিনীয়ারকে চাকরী দিা হিলে। সম্প্রতি পাবনার মুসলমানপ্রধান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডও ঠিকু সেই অবস্থার আর এক জন পত্রাবী মুলমানকে চাকরী দিয়াছেন। এই সকল মুসলমান বাঙালীর বঙ্গপ্রীতি ত নাহি-ই, অধিকতর মুসলমান বাঙালীর সব সঙ্গিত স্বার্থও তাঁহার ভুলিয়া যায়। মুসলমান বাঙালীর হুঁশঝোচনে অস্ত বাঙালীরাই অগ্রসর হয়, পত্রাবী মুসলমানরা হয় না।

কলিকাতায় মাছ যাগান

কলিকাতার মৎস্যালী লোকদের জন্য বৎসর ১১,২০,০০০ মণ মাছের দরকার। কিন্তু ইহার অর্ধেক মাছও কলিকাতায় আসে না, এবং বাহা আসে তাহার অধিকাংশ আমদানি হয় বাংলার বাহির হইতে। মধ্য পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে মাছের অভাব বহি, প্রাচুর্য ই আছে। বাঙালী যুবকেরা দল বাহিয়া তাহা আমদানি করুন না? অবশ্য তাহার বর্তমান মাছ-বিক্রীর বাজার-গুলিতে আমল পাইবন না—সেগুলি সেই সব পাইকারদের দখলে যাহারা মাছের ব্যবসায় এক চট্টা করিয়া ধনী হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু যুবকেরা উদ্যোগী হইলে বাড়িতে বাড়িতে মাছ সরবরাহ করিতে পারেন।

জমীদারদের সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বেকার যুবকদের জন্য কিছু করিবন ভাবিতেছেন, শুনা যায়। তাহাদের অনেকের জমীদারী মৎস্যবহল নানা অঞ্চলে। তাহারা এই ব্যবসায়ে যুবকদিগকে প্রবৃত্ত করিয়া সাহায্য করুন না?

কায়স্থদের ভাল প্রস্তাবগুলির অনুযায়ী

কাজ চাই

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ কায়স্থসম্মেলনের অধিবেশনে অনেকগুলি ভাল প্রস্তাব ধাৰ্য হইয়াছে। কিন্তু তদনুযায়ী কাজ না হইলে সেগুলির কোন মূল্য নাই। বঙ্গ ভাল কথা বার-বার বলিয়া কাজে কিছু না করিলে তাহাতে ক্ষতিই হয়। যে-যে বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, নীচে তাহার কয়েকটি উল্লিখিত হইল।

বিবাহে পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন এবং পূজাপার্কণ ও বিবাহাদিতে যায়বাহলা নিবারণ।

অসুশাস্তা দূরীকরণ, বিধবাবিবাহ, স্বদেশী পিল্লের ব্যবহার, বারাম ও বিভিন্ন প্রদেশীয় নান্যশ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিবাহ প্রচলন।

ছুত্বদের দ্বারা নিষিদ্ধিতা হিন্দু নারীদের পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা। নারীনিগ্রহ নিবারণ কাজ পত্রীগ্রহে কায়স্থদের দ্বারা কমিটি গঠন।

কায়স্থ যুবকদের সমর বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্ত উৎসাহিত করা এবং স্থানলোকদের ব্যায়াম চর্চায় জন্ত বন্দোবস্ত করা।

উপনিবেশস্থাপন না দ্বীপচালান?

দক্ষিণ-আফ্রিকার চুক্তিবদ্ধ, দাম্পত্য ভারতীয় শ্রমিকদিগকে খাটাইয়া তথাকার খেতকারের নিজেদের কাজ উদ্ধার করিয়াছে। ভারতীয়েরা এখন সেখানে বাণিজ্যাদি ক্ষেত্রে খেতকারদের সহিত প্রতিযোগিতা করে। এই জন্ত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া দরকার। তাহাদের সামাজিক নানা লাঞ্ছনা সেখানে আছে, আইন করিয়া তাহাদিগকে নানা অসুবিধায় ফেলা হইয়াছে, বাহারা ভারতবর্ষে আসিতে চায় তাহাদিগকে আসিতে ও এখানে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করিতে আর্থিক সাহায্যের বন্দোবস্তও খেতকারদের গবর্নমেন্ট করিয়াছে। তথাপি ভারতীয়দের অবিকাংশ (দক্ষিণ-আফ্রিকাই বাহাদের জন্মভূমি) সে দেশ ছাড়িয়া আসিতে চায় না। তাই তথাকার ভারতীয়দের জন্ত—এবং এদেশের ভারতীয়দের জন্তও বটে—দক্ষিণ-আফ্রিকার খেতরা “দয়া” করিয়া ভারতীয়দিগকে উপনিবেশ স্থাপনের সন্ধান দিতেছেন। বোর্নিও দ্বীপের ব্রিটিশাধিকৃত অংশ, ব্রিটিশ গিয়ানা এবং নিউ-গিনিতে ভাবনীয়দিগকে উপনিবেশ স্থাপনা করিতে বলা হইতেছে। যেমন আইনামুসারে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে জোর করিয়া আশ্রমানে পাঠান হয়, জোর করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দিগকেও পরে ঐ তিনটি ভূখণ্ডে সেইরূপ পাঠান হইবে কি না বলা যায় না। কিন্তু কাগাপুলি স্বাস্থ্যকর ও ইংল্যান্ডের জন্ত লোভনীয় নহে—তাহা হইলে ত ইউরোপীয়েরাই তথায় বসবাস করিত। ভারতীয়েরা যদি স্বাধীন হইত এবং নিজ শক্তিতে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন পূর্বক তাহা নিজ অবিকারে রাখিতে পারিত, তাহা হইলে উপনিবেশ নামটা ব্যবহার করা সার্থক হইত। কিন্তু এখন যে-যে দেশকে ভারতীয় উপনিবেশ বলা ও করা হইবে, তাহা তাহার নিজেদের শ্রম, নৈপুণ্য ও প্রাণ দিয়া সভ্য জনের বাসোপযোগী করিবার পর খেতকারেরা আবার তাহাদিগকে যে সেগান হইতে তাড়াইয়া দিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বরং ইংহাই খুব সম্ভব, যে, তাড়াইয়া দিবে।

অতএব, প্রস্তাবটা বাস্তবিক উপনিবেশ স্থাপনের নহে, দ্বীপচালান বা দ্বীপান্তর করিবার ষড়যন্ত্র।

আসামে জন্মের হার ও জন্মনিয়োগ

সম্প্রতি আসামের ব্যবস্থাপক সভায় এক জন সভ্য প্রশ্ন করেন, আসামের দরিদ্র ও যক্ষ্মাক্রান্ত লোকদের মধ্যে জন্মের হার কত বাড়িয়াছে, অতএব গবর্নমেন্ট জন্মনিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন কি না। সরকারপক্ষ হইতে ইহার উত্তরে বলা হয়, ভারতবর্ষের নয়টি প্রদেশের

মধ্যে জন্মের হারে আসাম সপ্তমস্থানীয়, সুতরাং অতিরিক্ত জন্মহার এখনও আসামের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়া নাই; তাহা হইলেও, গবর্নমেন্ট আইন দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ না করিয়া প্রচার-কার্য দ্বারা তাহা করিবেন।

কিন্তু আসামে তাহারই বা কি প্রয়োজন? সেখানে বহুবিস্তৃত ভূমি পড়িয়া আছে, আরণ্য ও ধনিজ সম্পত্তিতে আসাম প্রাধান্যশালী। গবর্নমেন্ট চাষবাস ও নানা শিল্পকার্য দ্বারা আসামের লোকদিগকে সন্তোষিত হইবার সাহায্য করুন না? জন্মের হার কমাইবার চেষ্টা না করিয়া মৃত্যুর হার কমাইবার চেষ্টা করুন। আসামে এখনও লক্ষ লক্ষ লোকের স্থান সন্ধান হইতে পারে। বসতির ঘনতা বৃদ্ধি প্রতি বর্গমাইলে ৬৪৬, বিহার-উড়িষ্যা ৪৫৪, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ১৭৭, মাদ্রাজে ৩২৮, পঞ্জাবে ২৩৮, আগ্রা-অবোধায় ৪৫৬, কিন্তু আসামে ১৫৭।

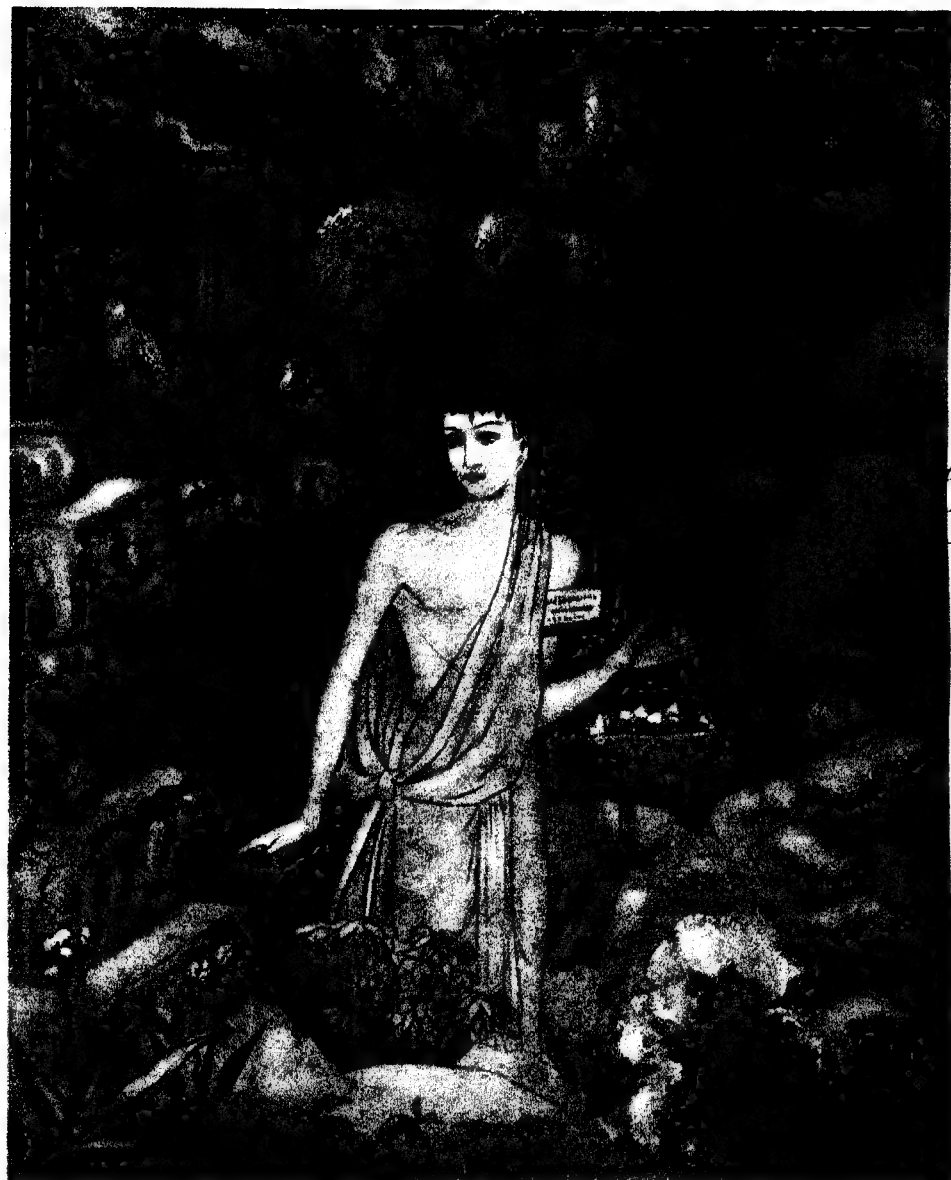
কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের আমরা পক্ষপাতী নহি। কেন, তাহার আলোচনার স্থান ইহা নহে। “সভা” জগৎও এ-বিষয়ে একমত নহে। ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ইকনমিক্সের এপ্রিল সংখ্যায় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের প্রবন্ধের ৫৮৭-৫৯৮ পৃষ্ঠা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তাহাতে পাঠক লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থকদের কিছু উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। বহুসন্তানবত্তী নারীদের উদ্দেশ্যে অত্যধিক মহিলাবানাক সিটিকাইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু যুগ্ম সন্তানের জননী বাহারা তাহার। সম্মানেরই যোগ্য।

মৃত্যুচক্র বহুর নূতন পুস্তক

মৃত্যুচক্র বাবু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি পুস্তক লিখিতেছেন। তাহা দ্বিপ্রকাশিত হইবে। তাহার আমেরিকান ও ফরাসী সংস্করণও বাহির হইবে। ভারতবর্ষে প্রকাশিত বহিতে অনেক সত্য কথা সন্নিবেশ আইন-বিরুদ্ধ। ইংলেণ্ডে প্রকাশিত বহিতে সত্যের প্রকাশে তত বেশী বাধা না থাকিলেও, মনে রাখিতে হইবে, যে, উক্ত সাপ্তাহিকের ইণ্ডিয়া ইউ বণ্ডেল তথায় প্রকাশিত হইবার বন্দোবস্ত হইবার পর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। আমেরিকায় ও ফ্রান্সে প্রকাশিত সংস্করণে সত্য কথা বাদ দিবার প্রয়োজন না হইতে পারে।

চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা

চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটিতে অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে দেখিয়া প্রীত হইলাম, যে, ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা এবং উপরের ক্লাসগুলিতে সংখ্যা বাড়িতেছে। বালকদের সংখ্যা ১৯০০, ১৯২৭, এবং ১৯৩২ সালে যথাক্রমে ২৮৪, ৬৬৩, এবং ২৬৬৬ ছিল। বালিকাদের সংখ্যা ১৯১০ সালে ২১ হইতে ১৯৩২ সালে ১৩৮৭ হইয়াছিল। সংখ্যাগুলি মিউনিসিপালিটির প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রছাত্রীদের।



বিদ্যার্থী
শ্রীশ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

ପ୍ରକାଶକ: ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ, କଲିକତା

প্রবাসী

“সত্য শিবম্ হৃদরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৪শ ভাগ

১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৪১

৬ষ্ঠ সংখ্যা

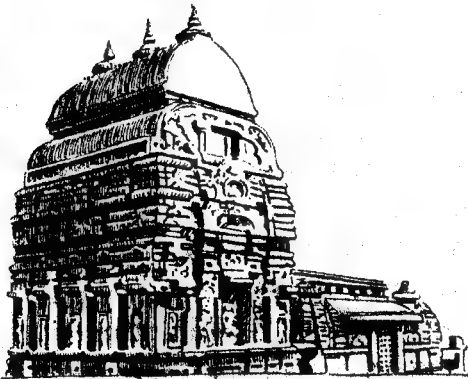
যক্ষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে যক্ষ তোমার প্রেম ছিল বন্ধ কোরকের মতো,
একান্তে প্রেমসী তব সঙ্গে যবে ছিল অনিয়ত
সঙ্কীর্ণ ঘরের কোণে, আপন বেষ্টনে তুমি যবে
বন্ধ রেখেছিলে তারে হৃ-জনের নির্জন উৎসবে
সংসারের নিভৃত সীমায়, আবণের মেঘজাল
কৃপণের মতো যথা শশাঙ্কের রচে অন্তরাল,
আপনার আলিঙ্গনে আপনি হারিয়ে ফেলে তারে,
সম্পূর্ণ মহিমা তার দেখিতে পায় না একেবারে
অন্ধ মোহাবেশে। বর তুমি পেলে যবে প্রভুশাপে,
সামীপ্যের বন্ধ ছিল হ'ল, বিরহের হৃৎথতাপে
প্রেম হ'ল পূর্ণ বিকশিত : জানিল সে আপনারে
বিশ্বধরিত্রীর মাঝে। নির্বাধে তাহার চান্নিধারে
সাক্ষ্য-অর্থা করে দান বৃষ্টিজলে সিক্ত বনশুধী
গন্ধের অঞ্জলি ; নীপনিকুঞ্জের জানালো আকৃতি
রেণুভারে মস্তুর পবন। উঠে গেল যবনিকা
আন্ধবিশ্বতির, দেখা দিল দিকে দিগন্তরে লিখা

উদার বর্ষার বাণী, যাত্রামাত্র বিশ্বপথিকের
 মেঘধ্বজে আঁকা, দিব্য-প্রাঙ্গণ হ'তে নির্ভীকের
 শূণ্যপথে অভিসার। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
 দীক্ষা পেলে অশ্রুধৌত সৌম্য বিবাদের ; নিত্য রাসে
 আপনি করিলে সৃষ্টি রূপসীর অপূর্ব মুরতি
 অস্বহীন গরিমায় কান্তিময়ী। এক দিন ছিল সেই সতী
 গৃহের সজ্জনী, তারে বসাইলে ছন্দশ্রাববে
 অলোক আলোকদীপ্ত অলকার অমর গৌরবে
 অনন্তের আনন্দ-মন্দিরে। প্রেম তব ছিল বাক্যহীন,
 আজ সে পেয়েছে তার ভাষা, আজ তার রাত্রিদিন
 সঙ্গীত-তরঙ্গে আন্দোলিত। তুমি আজ হ'লে কবি,
 মুক্ত তব দৃষ্টিপটে উদ্ধারিত নিখিলের ছবি
 শ্যামমেঘে স্নিগ্ধচ্ছায়া। বক্ষ ছাড়ি' মর্মে অধ্যাসীনা
 প্রিয়া তব ধ্যানোদ্ভবা লয়ে তার বিরহের বীণা।
 অপরূপ রূপে রচি বিচ্ছেদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
 তোমার প্রেমের সৃষ্টি উৎসর্গ করিলে বিশ্বজনে ॥

দাঞ্জিঃ
 ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১



ঝাড়খণ্ডে কবীর ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির প্রভাব

শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন

কবীর সারাজীবনের বাণীতে ও সাধনায় আঘাত করিয়া গিয়াছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। সাম্প্রদায়িকতার অর্থ ধর্মের নামে দল বাধিয়া মানুষের সঙ্গে মানুষের চিরন্তন ভেদ ও বিরোধ চালাইয়া যাওয়া। ইহা ছিল কবীরের অসহ্য। কিন্তু মানুষের এমনই দূরদৃষ্ট যে তখনই কোনো মহাপুরুষ এই ভেদ দূর করিতে গিয়াছেন তখনই তাঁহার নামেই পরে এই সাম্প্রদায়িকতা আরও কঠিন হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

কবীরের মৃত্যুর পর একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার ভক্ত শিষ্যরা আসিয়া ধরিলেন কবীরের পুত্র কমালকে। কমাল কহিলেন, আমার পিতা চিরদিন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই গেলেন যুদ্ধ করিয়া। তাঁহার নামেই যদি সম্প্রদায় স্থাপন করি তবে তা আমার পক্ষে পিতৃহত্যাই করা হইবে। তাই কবীরের ভক্তের দল কহিলেন—“কমালই কবীরের বংশ ডুবাইল।”

ধর্মের সব সঙ্গীর্ণ দলাদলি না মানিলেও কবীর মানিতেন যে মানবচিত্তের ভাব, ক্ষয় হইতে ক্ষয়ে সঞ্চারিত হয়। চিন্তা হইতে চিন্তে ভাবের রং লাগে।

জড়জগতে দেখা যায় প্রত্যেক জবাই থাকে তাহার আপন আপন বিশেষ স্থান জুড়িয়া। তাহার মধ্যে মজা দ্রবের ঠাই হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ভাব-জগতে দেখা যায় ইহার বিপরীত। যে-চিন্তে মত বেশী তাবের স্থান, সেখানেই তত সহজে নতুন নতুন ভাবের ঘটে সমাগম। তাই দাঙ্গা বলিয়াছেন—

রসহী মৈ রস বরবই যার কোটি অনন্ত।

(পরচা অংশ, ১১২)

—রসের মধ্যেই রসের বর্ণন হয় অনন্ত কোটি ধারায়।

প্রেম ও ভাবের ক্ষেত্রে এই কথা সত্য হইলেও অনেক সময়ে দেখা যায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই কথা খাটে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ দর্শনাদি সব শাস্ত্রের কঠিন প্রাচীর এমন করিয়া গড়িয়া তোলে যে সেখানে নতুন জ্ঞানের প্রবেশ প্রায় হ্রস্বাধা হইয়া উঠে। জ্ঞানের জগতেও কি জড়-

জগতের মত ঠেকাইয়া রাখাই বিধি? ভাব-জগতের মত সেখানে কি সহজে স্বীকার করার কোন উপায় নাই? তাই যেন বড় হুংধে কবীর কহিলেন—

কালী কমড়িয়া পর রঙ্গ নাহি চটে।

—কালো কবলের উপর আর নতুন রং ধরে না।

কথিত আছে মৃত্যুর পূর্বে কবীর কালী ত্যাগ করিয়া মগহরে গিয়া বাস করেন। কে নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিল, “কালী মুক্তি-ক্ষেত্র। যাহাই কর না কেন, এখানে মরিলে মুক্তি হইবেই। তাই তুমি নির্ভয়ে ধর্মের বিরুদ্ধতা করিতেছ।” কবীর বলিলেন, “এই রূপ মুক্তি আমি বিশ্বাস করি না। আমি আমার হৃচ্ছামত কোথাও গিয়া আপন সাধনায় মুক্তি অর্জন করিব।” ইহাই কবীরের মগহর-যাত্রার কারণ। কিন্তু কালীর জ্ঞানী ও শাস্ত্রপন্থীদের বিরুদ্ধতার সঙ্গে কি ইহার কিছুই সম্পর্ক নাই?

কালীতে জ্ঞানই প্রধান কথা হইলেও সেখানে ভাব যে একবারে ছিল না এ-কথা অসম্ভব। তাই কালীর চিন্তেও ক্রমেই কবীরের ভাবের রং ধরিতেছিল। যদিও পণ্ডিতেরা শাস্ত্র ও দর্শনাদির কঠিন প্রাচীর তুলিয়া সর্বভাবে সাবধান ছিলেন, যেন এই রং না লাগে।

কবীরের বিরোধানের পর কমাল বধন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে অসম্মত হইলেন, তখন প্রধানতঃ তাঁহার হুই শিষ্য তাঁহার ভাবকে আশ্রয় করিয়া সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিলেন। হুরত গোপাল বসিলেন কালীতে কবীর চৌড়ার, ধর্মদাস গেলেন ঝাড়খণ্ডে।

হুরত গোপাল কালীতে প্রভাব যতটা বিস্তার করিলেন তাহার অপেক্ষা বেশী নিজেই প্রভাবাবিত হইয়া পড়িলেন। কালীর কালো কবলের উপর নতুন রং ধরিতে চাহিল না, বরং দেখা গেল যে বড়দর্শনাদির সঙ্গে কবীর চিরদিন যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ক্রমে তাহারই পতাকাতলে হুরত গোপালী দল আশ্রয় খুঁজিতেছে। গুরু বাহা ছিল

নিম্নিত, অম্ববর্তীগণের তাইহাই হইয়া উঠিল বস্তুত! কালো কব্জলের রংই বরং চাহিল ফিরিয়া লাগিতে!

যাক, ধর্মদাস এই বিপদ এড়াইলেন ঝাড়খণ্ডে গিয়া। তাই আজ দেখা যায় হরত গোপালী সম্প্রদায়ে ভক্ত-সংখ্যা খুবই কম,—এক লক্ষের বেশী হইবে না। কিন্তু ধর্মদাসী শাখার ভক্ত-সংখ্যা নাকি ৪০ লক্ষ।

ধর্মদাস ছিলেন জাতিতে বাগিরা, বাঁধোগড় নগরে তাঁহার বাস। তাঁহার পিতা ছিলেন এক জন মহাধনী, অষ্টাদশ লক্ষপতি। বালককাল হইতেই ধর্মদাস ধর্মপ্রাণ ও সদাচারী। যদিও তিনি পণ্ডিতদের তর্ক ও যুক্তির হুজু ভাল ভাল করিয়া বুঝিতেন না, তবু তিনি সনাতন পথেরই পথিক ছিলেন। তিনি কবীরের প্রাণস্পর্শি সরল প্রবল বাণী শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন ও তাঁহার কাছে দীক্ষা চাহিলেন। কবীর কহিলেন, “প্রতীক্ষা কর।” উভয়ের আবার মথুরাতে দেখা হইলে ধর্মদাস তাঁহাকে অন্তরের কয়েকটি গভীর সংশয়ের কথা বলিলেন। কবীর তাহা খণ্ডন করিলে ধর্মদাস আবার দীক্ষা চাহিলেন। তবু কবীর কহিলেন, “প্রতীক্ষা কর।” আবার উভয়ের দেখা হইল কাশীতে এবং বাঁধোগড়ে।

ধর্মদাসের স্ত্রীর নাম ছিল আমিন। তাঁহার ভয় ছিল সাধুর শিষ্য হইলে হরত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর সম্পর্ক থাকিবে না। কিন্তু তিনিও যখন দেখিলেন কবীর গৃহস্থ হইয়াই সাধনার পক্ষপাতী তখন তিনিও কবীরের উপদেশে আকৃষ্ট হইলেন। আমিনের সঙ্গে কবীরের পত্নী লোহের বিশেষ প্রীতি ও যোগ ঘটয়াছিল।

কাশীতে রহিলেন হরত গোপাল। তাঁহার অম্ববর্তীরা কাশীর অন্তান্ত সম্প্রদায়ী সাধুর মত থাকেন অবিবাহিত। গুরু তিরোধানের পর শিষ্যদের মধ্যে কেহ গুরুর গদীতে বসেন। ধর্মদাসের ধারাতে ব্যবস্থা অল্প রকম। তাঁহার ধারাতে ইহাই নিয়ম যে, গুরুকে বিবাহ করিতেই হইবে এবং তাঁহার পুত্রই পিতার আসনে বসিবেন। তাই এই গদীকে বলে “বংশ গদী।” কবীর নাকি অশীর্ষাদ করিয়াছিলেন এইভাবে বিয়াল্লিশ জন গুরু হইবার পর এই কবীর অবসান হইবে। এই মর্মে “আগম সংদেশ” একখানি গ্রন্থ ভারত-পথিক যুগলানন্দী প্রকাশও করিয়াছেন। কারণ কয়েক

বৎসর পূর্বে ইহাদের শেষ গুরু দয়ানাম সাহিব অপূত্রক অবস্থায় মারা যান। যুগলানন্দের নাকি ইচ্ছা ছিল তিনি গুরু হন। কিন্তু বংশ-গুরু ছাড়া গুরু হয় না বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা সফল হয় নাই। “আগম সংদেশ” গ্রন্থখানি সকলে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকারও করেন না।

অনেকেই মনে করেন ধর্মদাসজী বাঁধোগড়ের এক ঐশ্বর্যশালী বণিকের ঘরে ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন, আর ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে ধর্মদাস রীতিমত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। রিওর্গী রাজগৃহে যে বীজক আছে তাহা নাকি ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মদাসকর্তৃক লিখিত।

বাল্যকালে ও যৌবনে ধর্মদাস দেবদ্বিজের শাশু পুরোহিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। গভীর শ্রদ্ধার সহিত তিনি মুষ্টি শিলা প্রভৃতি পূজা করিতেন। ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের দলে তিনি অহর্নিশ পরিবৃত থাকিতেন।

ক্রমে তিনি কবীরের দেখা পাইলেন ও তাঁহার বাণী শুনিলেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে কবীরের উপদেশ এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল যে, তখনই তিনি কবীরের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কবীর তিন বার তাহাকে নিরুত্তর করিয়া পরে তাহাকে দীক্ষা দিতে বাধ্য হইলেন।

“অমরত্বনিধান” গ্রন্থে কবীর ও ধর্মদাসের কথাবার্তা চমৎকার ভাবে লিখিত আছে।

“ধর্মদাস ছিলেন রাম ও কৃষ্ণ মন্ত্রণে নিরত, তীর্থব্রতে দৃঢ়চৈতন্যময় যখন তিনি ভার্য্যপ্রসঙ্গে গেলেন তখন হইল তাঁহার কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ।”

রাম কৃষ্ণ কো হুমিরে, তীর্থব্রত দৃঢ় চৈতন্য
মথুরা পরসত জগ গয়ে তে কবীর সো ভেট।

কবীর কহিলেন,—

ধর্মদাস তুমি হৌ বড় জ্ঞানী।
পরম ভক্ত ভক্তি মৈ জানী।
তুমি সা ভক্ত ন দেখোঁ আন।
ধর্ম তুমহারি করন দ্বান।
করন দিসা সে তুমি চলি আরে।
কৈহী কহী কহী মন লায়ে।
কাশী ভক্তি আরো দিও লায়ে।
সো কিত বসে কোন সে ঠাঁয়ে।
পুহত মন সে হুখ জনি মানো।
করতা আমি পুরুষ পরিচানো।

কা ভে মাল্য তিলক কে দীনহে ।
কা ভে তারুধ বয়ত কে কীনহে ।
কা ভে হনত ভাগবত গাঁতা ।
চিন্তা মিটা ন মন কে জাতা ॥

জ্যেতি কর্কা সে উপজে, সোবসে কোনে দেস ।

তাহি চিনহ পরিচয় কহো, ছোড় সকল ভ্রম ভেসে ॥

“হে ধর্মদাস, তুমি মহাজ্ঞানী, তুমি পরম ভক্ত; তোমার ভক্তি আমি বুঝি। তোমার মত ভক্ত আর ত দেখি না। কিন্তু তোমার ধর্মের আশ্রয়স্থান কোথায়? কোন্ নিক হইতে তুমি আসিয়াছ চলিয়া? বাইবেই বা তুমি কোথায়? কোথায় লইয়া গেলে তোমার মন? চিন্তা দিয়া কাঁধকে তুমি কর ভক্তি? তিনি কোথায় করেন বাস, কোথায় তাহার ঠাই?”

এই সব যে পুছিলাম তাহাতে যেন মনের মধ্যে ছুংখ করিও না, আদি পুরুষ জারি কর্কা কে লও চিনিয়া। তিলকমালা ধারণ করিলেই বা কি, তীর্থব্রত আচরণ করিলেই বা কি, ভাগবত গীতা শুনিলেই বা কি? মনকে জয় না করিলে চিন্তা কেন মিটিবে?

যে কর্কা হইতে উপজিলে তিনি করেন কোথায় অবস্থিতি? তাহাকে চিনিয়া তাহার সঙ্গে কর পরিচয়, ছাড়িয়া দেও সকল ভ্রম সকল ভেসে।”

তুনি ধর্মদাস অচংভো ভরুট ।

এসো বচন কাহ না কহেউ ।

“এই কথা শুনিয়া ধর্মদাস শুজিত হইয়া গেলেন। এমন কথা আর কেহই ত কহেন নাই।”

ধর্মদাস কহিলেন,—

পারত্রক সেত্ৰী চিত লাঙ্গ ।

সীতা রাম জপৌ অথ দাই ॥

বিয়থা বচন ন হুনেী না কহউ ।

প্রেম ভক্তি মে নিস গিন রহউ ॥

যোহে সকা কছু নাই । সেত্ৰী জী রঘুনাথ ।

জগৎলাল জিন উধারিয়া সো হরি মেয়ে সাধ ॥

“চিত্র একাধ করিয়া পরত্রক করি সেবা, পরত্রক সাতারামের নামই করি জপ। বুধা বচন আমি না শুনি না বলি, প্রেমভক্তির মধ্যে নিমিষিনি করি বাস।

আমার ত কোন শকা নাই; জীৱঘৃনাথকে করি সেবা। জগৎ প্রজ্ঞানকে বিনি করিলেন উদ্ধার, সেই হরি আমার সাথে সাধে।”

কবীর কহিলেন,

ধর্মদাস হুতু বচন হমারা ।

তুম জনি হোহ কাশ কে চায়া ।

কাহে ন হরতি করে ষট মাহা ।

চীনহ চানহ, বুড়ো ভর দাহী ॥

“হে ধর্মদাস, বচন আমার পোনা, তুমি যেন কখনও কালের কবলিত না হও। অন্তর্যের মধ্যেই কেন না প্রেম কর? (সায় সত্য) চিনিয়া লও, চিনিয়া লও; ভবসাগরে যে ডুবিতে বসিয়াহ!”

কবীর আবার কহিলেন,—

জান বুট্ট সে চিহুট বাণী ।

পাখণ্ডে পাহর পাখণ্ডে পানী ।

করতা পাখণ্ডে কবহ ম হোয় ।

কহে মনসব দুখী বিবোর ।

“জানবুট্টর দ্বারা বাণী (সায় সত্য) লও চিনিয়া। এই যে পূজা কর পাখণ্ড তাহা বুট্টা। পূজা কর যে তীর্থের জল তাহা বুট্টা। কহা কি কখনও বুট্টা হইতে পারেন? এই মোঁকাতৈ সকল দুনিয়া দিল সব পৌয়াইয়া।”

ধর্মদাস এই সব শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন—

ধর্মদাস নসুটি রয়ে ।

“জীবন্ত সেই মহাপুরুষের কথার কোনো উত্তর ধর্মদাস দিলেন না।”

জিংহে উত্তর নহি দান্হ ।

তুংখে ধর্মদাস আহাঁর নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। তখন কবীর বুঝাইয়া কহিলেন—

হরি না মিলে অল্পক ছাড়ে ।

হরি না মিলে ডগরহী মাড়ে ।

হরি না মিলে ঘরবার ভিয়াগে ।

হরি না মিলে নিহ বাসর জাগে ॥

“অল্প ছাড়িলেই কিছু হরি মেলে না, কোনো একটা বিশেষ পথ আশ্রয় করিয়া চলিলেই হরি মেলে না, ঘর-দুয়ার ত্যাগ করিলেই হরি মেলে না, নিশি-বাসর জাগিলেই হরি মেলে না।”

দয়া ধরম জই বসে সরায়া ।

তই ধোজিলে কইহে কবীরা ॥

“যেখানে মানবের মধ্যে দয়া ধরম বাস করে সেখানে কর খোঁজ। এত কথাই কহেন কবীর।”

ধর্মদাস সেখানে সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসব করিলেন। মন তৃপ্ত হইল না। কান্ধী আসিয়া পণ্ডিত জ্ঞানী সকলের কাছে আশ্রয় খুঁজিলেন। কোথাও যেন আশ্রয় মিলিল না। তখন আবার কান্ধীতে কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন অভ্যন্তরীণ কবীরের উপদেশবাণী। কেহই তাহার তল পায় না।—

খাং কবার কা কোই নহি পায়ে ।

ধর্মদাস মনে মনে কহিলেন, “প্রথম ত ইহাকে মথুরাতেই দেখিয়াছিলাম, তখন ত অনেক তর্কই করিয়াছিলাম। বাহা উনি বলিয়াছেন সবই ত সত্য সত্য উপদেশ, তাহাতেই ত মন আবার ইনি লইলেন হরিয়া।”

পিরথম মোহি মথুরা মিলে বহু বাদ হয় কীনহ ।

নাচ নাচ সব উন কই মন হমার হয় লান্হ ॥

ধর্মদাস ও কবীরের মধ্যে এই সব আলোচন সংস্কার।

“অমরুখনিদানে” তাহা সবিতারে বর্ণিত আছে।

কবীরের সঙ্গে ধর্মদাসের সাক্ষাতে যে পরমানন্দ তাহা ধর্মদাসের নিজের ভাবাতেই দেখা বাউক—

আজ মেয়ে সতত্তর আয়ে মিহমান ।

তন মন হিররা করেী কুস্তবান ॥ (বিহহ এম জংগ)

“আজ সুগুরু আসিয়াছেন অতিথি। তম্ব মন জীবন আজ করিলাম উৎসর্গ।”

আজ বড় আনন্দের কা

সবুত্তর আয়ে মোয় বাম হো ।

হিরো ধরমন মন লুভারো

বুজো বচন অমোল হো ।

করেন ও “চৌকা” প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থটানে মৃতদের প্রতি কর্তব্য পূর্ণ করেন। কবীরপন্থী ওরাওঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের বাহিরের ওরাওঁদের সঙ্গেও বিবাহাদি সম্বন্ধ করেন। ইহারা তাঁহাদের “মজ্জা” অর্থাৎ মদ্যপ ওরাওঁ বজান। মজ্জা-ধরের কল্যাণ আসিলে তাহাকে দীক্ষিত করিয়া লন। সে কল্যাণ তখন শুদ্ধাচার মানিয়া চলেন। মজ্জা-ধরে কল্যাণে দিলে পিতামাতা তাঁহার হাতে খান না।

এই কবীরপন্থের প্রভাবে ঝাড়খণ্ডে এই সব জাতির মধ্যে এমন একটি নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে যে পরে মুণ্ডাদের মধ্যে বীরশ্রী ভগত ও ওরাওঁদের মধ্যে বিখ্যাত টানা ভগতের উপদেশ সম্ভব হইয়াছে। রাঁচী জেলায় বাথরা থানার বাটকুরী গ্রামে এক নারীও ধর্ম্মশুকের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

টানা ভক্তদের কথা অতিশয় চমৎকার। এ-বিষয়ে প্রক্বেয় শরৎ চন্দ্র রায় মহাশয় বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন। ঝাড়খণ্ডের লানিবার ইচ্ছা তাঁহারা তাঁহার ওরাওঁ ধর্ম্ম ও সামাজিক গ্রন্থ (Oraon Religion and Customs) নামক ইংরেজী গ্রন্থখানির মধ্যে তাহা পাইবেন।

এই ঝাড়খণ্ডে যে শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে তাহারওঁ মূলে কতকটা কবীরপন্থী প্রভাব।

সেই কথা, সেখা ঘাইতেছে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম ভাগে বিলাসপুরেরওঁ পশ্চিমে কবীরের আদর্শ ও ধর্ম্ম শ্রীধর ধর্ম্মদাস সাধনা ও প্রচার করিতে থাকেন। সেখান হইতে তাহা ক্রমে পূর্ব দিকে প্রসারিত হইতে থাকে।

ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পর অর্থাৎ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি মহাপ্রভু চৈতন্যের সংস্পর্শে রাঁচীর দক্ষিণ-পশ্চিমে বৃহৎ প্রভৃতি মঠ স্থাপিত হয়। পরে মানভূম প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া গোড়ীর বৈষ্ণবেরা ঝাড়খণ্ডে ভক্তিসাধনা প্রচার করিতে থাকেন। তাই ঝাড়খণ্ডে রাঁচীর কাছাকাছি এখনও সেখানকার আসিম অধিবাসী ভক্তদের মুখে বাংলা কীর্তন শুনা যায়। প্রথমে মনে হয় গানগুলি মুক্তি সেই দেশীর ভাষায়। একটু স্থির হইয়া শুনিতে গেলে বুঝা যায় সেই সব গানের পদ বাংলা।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি আর্যবর্ষ ও লানবর্ষীদের

অনুবর্তী রামানন্দী বৈষ্ণবের দল ঝাড়খণ্ডে আসিয়া মঠ ও আখড়া স্থাপন করেন। রামানন্দীরা প্রায়ই গয়া ও পালামৌ পথে আসেন। শেরশাহী রাজপথের দুই দিকে চট্টি বা অতিথিশালায় ভার লইয়া অনেক বৈষ্ণবী ঝাড়খণ্ডের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। ইহারা অনেকে রাম-উপাসনা প্রচার করেন।

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর কাশী হইতে শৈব-সাপুত্রা দুই-এক জন করিয়া ঝাড়খণ্ডে আসিতে থাকেন। তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম দিয়া ঝাড়খণ্ডের সরল অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করেন। সেই সমস্ত শিষ্যদের নাম “নেমহা” অর্থাৎ নিয়মধারী।

কাশী হইতে আগত শৈব-সাপুত্রদের মধ্যে ত্রিগোচন ও ভীমদেব ছিলেন তান্ত্রিক সাধনাতেওঁ প্রবীণ। তাঁহাদের পরে আসেন বীরভদ্র ও বামদেব। তাঁহাদের শিষ্যরা অনেকে ঝাড়খণ্ডেই বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি এক জন স্থানীয় অধিবাসীকে তাঁহাদের শৈবমতে দীক্ষা দেন। এই ওরাওঁ শিষ্যের নাম শুক্ল রাবিলেন, “ভৈরব”। এই ভৈরব ভগতের বাড়ি রাঁচী থানার অধীন তুখাপুরী গ্রামে। ভৈরবের পুত্র কুক ভগতওঁ শৈব ও তান্ত্রিক সাধনায় প্রবীণ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ভৈরব ও কুক ভগতের সন্তান এমন বিস্তৃত হইল যে, ছোটনাগপুরের রাজা দেউনাথ শাহী ও তাঁহার পন্থী ইহাদের শরণাগত হইলেন। ইহাদের শিষ্যরা এখন অনেক স্থানে বসবাস করিয়া নামে শিবশিলা পূজা করেন। সেই শিবকে এখানে “ভুইকে” ডি শিব বলে। “ভুইকে” ডি ভগতের জটা রাখেন ও অনেক নিয়ম শাসন করেন। তাঁহাদের অলৌকিক শক্তিওঁ হয়।

উত্তর-পশ্চিম গোহুলের ও বৃন্দাবনের গোলাইরাওঁ কেহ কেহ এই ঝাড়খণ্ডে কতকগুলি প্রচার করিয়াছেন। যে-সব ওরাওঁ ইহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা মন্ত্র মাংস পরিত্যাগ করিতে যায়। গোলাইরা বাংসাহারী ওরাওঁদের গো-দান করাইয়া শুদ্ধ করিয়া তবে দীক্ষা দেন। এই সব দীক্ষিত বৈষ্ণবেরা রথযাত্রা সম্বন্ধী প্রভৃতি তিথি পালন করেন। তাঁহারা ওরাওঁ ভাষাতে ভক্তি ও প্রেমের গানওঁ করেন।

পীতাম্বরের কস্তা নারায়ণী সাধারণ গৃহস্থঘরে জন্মিয়াছিল। মা'র কোলে উপরি-উপরি তিন কস্তার শুভাগমনের পর এই চতুর্থীর আবির্ভাব হওয়াতে নারায়ণীর অদৃষ্টে আদর-বৃত্ত বিশেষ জোটে নাই। তিন বোনের ছাড়া ছেঁড়া জামা-কাপড় তালি দিয়া পরিয়াই তাহার শৈশবটা কাটিয়া গিয়াছিল। নুতন শাড়ী জামা দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে চোখে দেখে নাই। এমন কি পূজার সময়ও তাহাকে একথানা নুতন কাপড় বাবা কিনিয়া দিতে পারিতেন না। মা ধরিয়া বসিলে বলিতেন, “সেজ্জকীর গতবারের জরিপেড়ে কাপড়খানা যে ছোট হয়ে যাচ্ছে, ওটা পরবে কে শুনি? ওখানা কি পরয়া দিয়ে কিনতে হয় নি? বছর বছর যে মেয়ে বিয়েচ্ছ ত তার আগাগোড়াটাই কি লোকসানের মামুলা? একটা কিছু খরচ বাঁচাও। ছেলে হ'লে মুক্তি ত কিনে দিতেই হ'ত। মেয়েই যখন হ'ল, ওই এক কাপড়ে পর-পর চার জনের চালাতে হবে, বত দিন না ছিঁড়ে যায়।”

মা চোখের জল মুছিয়া বছরের পর বছর মেয়েকে পুরানো কাপড়ই পরাইতেন। কেবল বিজয়া দশমীর দিন চাহিয়া-চিঙিয়া জায়ের কাছ হইতে একথানা নুতন কাপড় আনিয়া নারায়ণীকে একবারটি পরাইতেন। মা হইয়া মেয়েকে এই শুভদিনে পুরানো কাপড় কি করিয়া পরাইবেন? কিন্তু নারায়ণীর চিরদিন মনে ছিল যে ভাসানের পর যখন ঘুমে কাতর হইয়া সে শয্যা গ্রহণ করিতে আসিত, মা তখন ধীরে ধীরে নুতন কাপড়খানি খুলিয়া লইয়া সমুদ্রে পাট করিয়া বাজ্ঞে ভুলিতেন। পরদিন আর সে কাপড় দেখা বাইত না। আবার সেই দিগিরের পরিত্যক্ত ছেঁড়া কাপড়।

কাপড়ে না হয় হিসাব করিয়া চলা সহজ; কিন্তু পেটের ক্ষুধার ত হিসাব চলে না। তবু নারায়ণী বড় হইবার পর তাহার কাঁধা হৃদয়ের বরত কি মাহের বরত

বাড়াইতে রাজি হইলেন না। যেদিন নারায়ণী মাতৃস্বস্ত ছাড়িয়া গরুর দুধ খাইতে শুরু করিল সেই দিন হইতেই তাহার বালিকা সেজ্জির হৃদয়ের পাট উঠিয়া গেল, যদিও সে বেচারীর বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর। সেজ্জ গুলী আদামণি খাইত মাড় ভাত—নারায়ণী পাইল তাহার হৃদয়ের অংশ। মেয়েরা আর একটু বড় হইল, কিন্তু সেজ্জকী কি নারায়ণী তাহার জন্তই মাছ বরাদ্দ হইল না; কাজেই তাহা রা মাছ খাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাকে মাছ ছাড়িতে হইল। মা'র দুই বেলার দুইখানা মাছ মেয়েরা দুই জনে একবেলা খাইত। মা বাসীর অমঙ্গলের ভয়ে মাহের তেল ও কাঁটা দিয়া আলুর খোয়ার চচ্চড়ি রান্নিয়া ভাত খাইবার ব্যবস্থা করিতেন।

শিশু বালিকা মাহেরই পুতুলখেলার সখ আছে; নারায়ণীর বে ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কে তাহাকে পুতুল কিনিয়া দিবে? মা ছেঁড়া কাপড়কে সলিঙ্গার মত পাকাইয়া তাহাই দুই পাট করিয়া মেয়েদের পুতুল গড়িয়া দিতেন। কালি দিয়া স্নাকড়ার গারে চোখ-মুখ আঁকিয়া দিলে মেয়েদের আনন্দ ধরিত না।

যদি চিরকালই এই ভাবে কাটিয়া বাইত, হয়ত নারায়ণী বড় বয়সে আপনার শৈশবের লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া বাইত; হয়ত মনে করিত তিন সন্তানের পরে জন্মাইলে কোনো শিশুর ভাগ্যেই আদর-অভ্যর্থনা বিধাতা লিখেন না। কিন্তু তাহা হইল না। নারায়ণীকে চেতনা দিতে বিধাতা তাহার কাঁটার কোলে আবার আর একটি শিশু পাঠাইয়া দিলেন। এবার আর কস্তা নয়, পিতামহীজার বহুকালের কামনার ধন কন্যধর গুল। চারি সন্তানের পর জন্মাইলেও তাহার অভ্যর্থনা হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বাকিতে হলখুল পড়িয়া গেছে, পাকের শব্দে কোনোদিকে কান পাতা যায় না। আত্মীয়-স্বজন দানদাসী লকলের দূখে হাসি। সবলেই বলিষ্ঠ হচ্ছে, “এত দিনে বিধাতা যখন তুলে চাইলেন।” এমন কি অননুষ্ঠান নারায়ণীকেও আজ পাঁচ জনে

কোলে করিয়া আদর করিয়া বলিতেছে, “বাকু, নারায়ণী তোর পর ভাল। তুই ত খোকা ভাইকে ডেকে আনবি।”

নারায়ণী আদর পাইয়া খুশী হইল বটে; কিন্তু তাহার তখন পাঁচ বৎসর বয়স; এই আদরের কারণ বৃদ্ধিতে তাহার বেশী দিন ঘেরি হইল না, এবং আদরটা বে কত ক্ষণ স্থায়ী তাহাও সে অচিরেই বুঝিয়া গেল।

এবার পূজার খোকার নূতন ছুতা জামা কাপড় আসিল। নারায়ণী বলিল, “মা, আমাকে ত তুমি কখনো একটা নূতন কাপড় দাও না। ঐ একরকমি ছেলেরা কাপড়ই কোনো দিন পরে না, ওকে দিতে পার নূতন ধুতি, আর আমার বেশা সব ছেঁড়া! আমি আর তোমার ভালবাসব না, যাও!”

হাসিয়া মা বলিলেন, “ও ব্যাটাছেলে কি না, মেয়েদের কাপড় আর ও পরবে না, তাই ধুতি দিতে হ’ল।”

পূজার হুরে নারায়ণী বলিল, “আহা, ধুতি কই আনবি! ও ত লাল কাপড়। অমন ত সেজদির ছিল, ওকে কেন দিলে না সেটা?”

মা বলিলেন, “সরুপাড় হ’লে ধুতি বলে।”

নারায়ণী মুখ নীচু করিয়া চূপ করিয়া রহিল, কিন্তু মায়ের কথা বিলম্বজ্ঞ বিখাল করিল না। সেই দিন কইকেই সে লক্ষ্য করিতে সক্ষম করিল যে, খোকা চাহিতে শিখিবার আগেই অঘাতিত ভাবে কত খেলনা কাপড় পাইতেছে এবং সে হাজার চাহিয়াও বড়বোনদের ভিল্লার দান হইয়া কাপড় ও ভাঙা খেলনা লইয়াই দিন কাটাতে বাধ্য হইতেছে।

তাহার বড় ছই বোনের গলার সরু এক-একটা সোনার হার ছিল বলিয়া সে ও সেজখুকী আন্না প্রায়ই এক ছড়া হারের জন্ত কল্লাকাটি করিত; কত দিন দিবিদের সঙ্গে এই হার লইয়া দারাদারি হইয়া গিয়াছে; পরস্পরের মধ্যে আচড়ে চার বোনের মুখ একেবারে রক্তাক্ত হইয়া বাইত। কিন্তু তবু তাহাদের ছোট ছই বোনকে মা কোমোদিন হার পড়াইয়া দিলেন না, অথবা বাবা টাকা ব্যয় করিলেন না।

কিন্তু এমিকে খোকার অসুস্থতার পড়িল পূজার পরেই। আন্নার মিল লজ্জার খেলা করিতে করিতে

নারায়ণী দেখিল ভাকরা নীল কাগজে মোড়া এক ছড়া মিছেহার ও এক জোড়া কুপাকের বালা বৈঠকখানা ঘরে বাবার হাতে দিয়া গেল। বাবা খুশিয়া দেখিয়া আবার মুড়িয়া-মুড়িয়া মাকে গিয়া দিলেন।

সেজখুকী আন্নাশিশি ও নারায়ণী মহানন্দে কলরব করিয়া ছুটিয়া মায়ের কাছে গেল, এই বৃদ্ধি এতদিন পরে তাহাদের জন্ত গহনা আসিল। মা ত বলিয়াছিলেন, “আর একটু বড় হ’লে পাবি।” এখন ত তাহারা মন্তবড় হইয়াছে! আন্না বলিল, “মা, আমি হারটা নেব, বালাটা নারায়ণীকে দিও।”

নারায়ণী আমাকে ঠেলিয়া মায়ের কোল হইতে সরাইয়া দিয়া বলিল—“হ্যাঁ, তা বইকি? আমি এত দিন ধরে হার হার করে আশুচি আর আজকে উনি এলেন বালাটা নারায়ণীকে দিতে! কিছুতেই আমি বালা নেব না।”

তাহাদের থামাইয়া মা বলিলেন, “কাল খোকার ভাতটা হয়ে বাকু তারপর দিন তোদের হার বালা ভাগ করে দেব এখন। আজ মিথো ঝগড়া করিস নে বাছা!” নারায়ণী তাহার ক্ষুদ্র হাতের তর্জনী নাড়িয়া বলিল—“ও বুঝেচি, ওগুলো খোকারই রইল, আমাদের শুধু একটু পরতে দেব। আমি সব বুঝতে পারি।”

আন্না বলিল, “আমি জানি গো জানি, ভদ্র বলেচে—তোরা মেয়ের উপর মেয়ে, তোদের আবার গয়না কাপড় কেন? ব্যাটাছেলেদেরই গয়না দিতে হয়, না মা?”

নারায়ণী মাকে-মুখ একটা খাঁচা দিয়া বলিল, “মা, তুমি কি ছুই! ছেলেরা গয়না চায় না, পরে না, খোকা ত গয়না দেখলেই চিবোড়, তবু তুমি ছেলেকেই গয়না দেবে। আর মেয়েরা গয়না পরে বলে তুমি কিংসে ক’রে আমাদের দেবে না। আমরা তোমার কেউ নই বৃদ্ধি?”

মা বলিলেন—“মা গো মা, কোথার দাব গো, ছ-বছর বয়সের এমন পাকা পাকা কথা!”

পিতা পীতাকর বলিলেন—“হবে না? হাজার হোক যেমন-মুখ ত! কথার জোরেই হুনিয়া জম করতে হ’বে। কীভাবেই আশীর্বাদ পটুকের কথা লক্ষ্যত কবিরাত্ত বলে গেছেন।”

নারায়ণী পিতার গুরুগম্ভীর কথার একটোও দৃষ্টি

বুলি না। কিন্তু একথা বেশ বুলি যে, তাহার ন্যায় দাবিটা পিতৃস্বাক্ষর কাছের অন্তর আশ্রয় ছাড়া আর কোনো নাই পাইবে না। খোকার সঙ্গের সব।

খোকার অগ্রপ্রাণন হইয়া গেল। কাকা, জ্যাঠা মাসি, পিসি সকলেই নারায়ণীর লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে খোকার সোনারপার অলঙ্কার পরাইলেন। নারায়ণী আজ আর কাঁদিলও না, চাহিলও না কিছু। পরদিন মা যখন খোকার পায়ে মল ও গলার হার খুলিয়া লইয়া আদর করিয়া তাহাকে পরাইতে আলিলেন, নারায়ণী রাগ করিয়া ছুইটা গহনাই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার টানের চোটে হারটা ছিঁড়িয়া হইল দুই টুকরা, আর আছাড় খাইয়া মলের চারটা যুগ্ম গেল ছিটকাইয়া পড়িয়া। মা রাগের মাধ্যম তাহাকে ধরিয়া খুব ছুই-তার খা দিলেন। পিঠে তাহার মায়ের পাঁচ আঙুলের দাগ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তবু নারায়ণী চোখে জল দেখা গেল না। সে কেবল বলিল, “খোকার বেলা গয়না, আর আমার বেলা মেরে মেরে হাড়ভাঙা। তুমি নিশ্চয় আমার সৎমা।” সারা দিনরাত্রি নারায়ণীর মুখে কেহ অন্ন তুলিতে পারিল না। সে মুখ শুষ্কিয়া নীরবে শুইয়া রহিল।

শিশু নারায়ণী সত্যগ্রহণ করে নাই, কাজেই ক্ষুধার তাড়নায় দ্বিতীয় দিন মা-বোনের পাঁচ-কুড়ানো অন্ন তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইল। ক্ষুধা শিশুর অভিমানের কোনো মূল্য কেহ দিল না। খোকার আদর ও থুঁকীদের অনাদরে কোনোই পরিবর্তন হইল না।

২

সে পুরাকালের কথা, তখন বৎসরের পরে কত সন্তান বড় কেউ করিত না। হুজুরা চকুর্বা কতাই হইলেও নারায়ণীর বিবাহের সম্বন্ধ খুঁজিতে পীতাম্বরকে অত্যন্ত পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি শুরু করিতে হইল। বড় মার বিকল হইয়া বাবা ঘরে ফিরেন, তত ব্যর্থই মা মেরেকে ঘোঁটা দিয়া বলেন, “কেল এসেছিলাম বাবা, তিন মেরের পিঠে গরীবের বহু জন্মে ? ঘরে ঘরে পাহারে খিল পাহার পেল, ভেবে ভেবে মাথার চুল সব শালা হয়ে গেল, তবু মেরের কল হুইল না।”

নারায়ণীর মুখের জোর এখনও ছেলেবেলার মতই ছিল। তাছাড়া সত্য কথা বলিতে কি, বৎসর বয়সে ত আর তাহার শৈশব মুদ্রাইয়া যায় নাই ? সে হাসিয়া বলিত, “কে বলেছিল তোমাদের আমার বিয়ের ভাঙনা ভাবতে ? আঁতুড়-বরে তুমি থাকিবে মেরে কেলেতে পার নি ?”

মা গালে হাত দিয়া বলিলেন—“যদি পাকা মেরে বাছা তুই! দেখি পরের বরে গিরে অমনি কটকট, ক’রে কথার ছল কোটা স্নে, তাহলে শাকুড়ী-ননক উঠুন-কাঁদার মুখ ঘষে দেবে।”

নারায়ণী ঠোঁট উল্টাইয়া তুড়ি দিয়া বলিল, “তোমরা বড় আদরে রেখেচ, তার আবার শাকুড়ী-ননকের ভয় দেখাচ্চ! এখানেও পরের পাত কুড়িয়ে থাকি, ছেঁড়া কাপড় পরি, সেখানেও তাই করব।”

মা বলিলেন, “হুঁখী মায়ের পেটে জন্মেছিল বাছা, হুঁখটাই কেবল বুঝি। মায়ের প্রাণটা ত দেখতে শিখলি না। যে থেকে তোরা খেতে শিখেনি নিজের মুখের প্রাণ যে তাদের মুখে ছুঁবেলা তুলে দিচ্ছি, তা আজ বুঝি না, মেরের মা হ’লে বুঝি। আশীর্বাদ করি ধন-দৌলতে তোর ঘর ভরে যাক, তবু মেরের মা হ’লে বুঝি মায়ের ভালবাসাটা কি।”

মায়ের প্রথম আশীর্বাদ শীঘ্রই ফলিল; তিন মেরের চেয়ে নারায়ণীর সম্বন্ধই ভাল আসিল। খুড়ী জ্যেষ্ঠী কখনো “বাই বল, পোড়া বিধাতারও ত কিছু দরমাসা আছে। মেরের এমন রঙের চটক, এমন মুখের কাঁট, গরীবের ঘরে জন্মেছে তাই না গোবর-কালি মেখেই দিন কাটতে। এতদিনে বিধাতা মুখ তুলে চাইলেন, এবার দেখো, খেয়ে মেখে মেরে আমাদের পদ্মফুলের মত বহু জন্মে ক’রে থাকবে।”

মা বলিলেন, “তোমরা তাই আশীর্বাদ কর, তাই। নারায়ণী আমার বড় হুঁখের ধন, একটি মিনের জন্মেই থাকে আমার হাতে তুলে কিছু দিতে পারি নি, মা হয়ে কোনো আদর-সোহাগ করি নি। নিজের বরে মা আমার রাগী হয়ে থাক, দেখেই আমার চোখ জুড়াবে।”

বড় বয়ে মেরে যাঁতেছে, তাহারা কিছুই বাণি করে নাই। তবু আজ আর পীতাম্বর তাহার চকুর্বা

কত্না হইয়া দম্ভানোর অপরাধ নইলেন না। আজ
মেরের অন্ত নুতন রাঙা চেলি, সোনার চুঙ্কি, আবাণ্যের
দ্রিঙ্গিত হার, সিঁথিগাটি, মল, কুব্জকা—নানা গহনা আসিল।
গৃহস্থের ঘরের মতই অলঙ্কার হাফা অলঙ্কার, তবু নারায়ণীর
চক্ষে ইহাই ত আশাদিনের প্রার্থ্যা। জীবনে এত অলঙ্কার
সে স্পর্শ করে নাই কোনোদিন।

এত দিনের অভিমানে ভুলিয়া আজ নারায়ণীর কচি মুখে
মধুর হাসি ফুটিয়াছে। রক্তাঙ্করে দেবীপ্রতিমার মত
সাজিয়া মারের কোল হইতে নারায়ণী শব্দব্যাড়ি চলিয়া
গেল। যে-গৃহে দুঃখের অন্ন খাইয়া সে মাহু হইয়াছিল,
সেখান হইতে পরগৃহে বাইতে এই শিশুর বসেও যে বৃকের
প্রত্যেকটি শিরায় টান পড়িবে বিবাহের সময় বস্ত্র-অলঙ্কার
পছন্দ আর নারায়ণী তাহা ভাবে নাই। কিন্তু
কত্না-খিদারের বেলা আলীকাদ করিয়া বাপ জ্যাঠা মা
সকলে বধূর শব্দের হাতে তাহার পুষ্পকলির মত সুন্দর
হাতবাঁদি বার-বার সঁপিরা দিলেন, মা আগতপ্রায় অল্প
কোনোক্রমে সামলাইয়া বলিলেন, “বাবা, দুঃখিনীর
মেরে তোমাকেই চিরকালের মত সঁপে দিলাম। দুঃখের
বাহা ও, কোনো অপরাধ যদি করে, তোমার আপনার বলে
ক্ষমা করো। আদর কখনও পায় নি জীবনে, আদরের
বহু কণ করে মারের দুঃখ ভুলিয়ে দিও বাছাকে।”

তখন নারায়ণী মারের বৃকের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া
দুঃখ শিশুর মত কঁদিতে হুঙ্কার করিল। এই চিরঅনান্দতা
বালিকাও অজানার তরে মার কোলের আশ্রয়টুকু বার-বার
আছড়াইয়া ধরিতে লাগিল। তাহার এই একটি দিনের
দুঃখের হাসি আজই চোখের জলে নান হইয়া গেল।
নুতন গহনা-কাপড়গুলি খুলিয়া দিলে যদি আর শব্দ-
বাড়ি না-বাইতে হইত, তাহা হইলে কিনা বাক্যব্রত
এখনই সে সমস্ত খুলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু
সে গাঁটছড়ার বাধা পড়িয়াছে, আর যে উপায় নাই, তাহা
এই কচি বসেও বুঝিয়াছিল। মার অন্তরের ভালবাসা
ও বাহিরের অনাদরের স্বভিটুকু সলল করিয়া পরিবের মেরে
নারায়ণী ওনার ঘরের বধু হইয়া চলিয়া গেল। সংসারে
শান্তি নাই, দুই দিন না-বাইতেই নারায়ণী আপন গৃহ-
সংসার বুঝিয়া গেল।

৩
দশ বৎসর বসেই নারায়ণীর প্রতি পিতৃকর্তব্য পীতাম্বর
শেষ করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের সময়ের শ-পাঁচ টাকা
এবং জন্মবার সময় গোটা-দশ এই হইল নারায়ণীর দশ
বৎসরব্যাপী জীবনে তাহার পিতার মোট খরচ। কারণ
তখনকার কালে কস্তার বিবাহে পণ এখনকার মত হাজারের
নামুতা পড়িত না, কুড়ির নামুতা পড়াই রেওয়ারাজ ছিল।
মেরেমের বিবাহে গায়ে ইউরোপীয় প্রথায় হীরার কিংবা
অভাবপক্ষে মুক্তার গহনা দেওয়ার তখন প্রয়োজন হইত
না, আটপোরে রূপার এবং পোষাকী ছই-একখানা সোনার
গহনা হইলেই পরিবারের মানসম্মত অনারসে বজার
থাকিত। নকল হীরা ও নকল মুক্তার ব্যবসা করিয়া
অবাঙালী ব্যবসাদারেরা বাঙালীর কষ্টা, জঁত টাকাগুলি
লুট করিতেও পারিত না।

সে বাহাই হটুক, পীতাম্বরের কুলপান্ন পুত্র কিন্তু
তাঁহাকে এত অল্পে নিস্তার দিল না। সে পুরুষহুঁলে,
তাহার কাপড়, জামা, জুতা, মোজা, ছাতা, বই, খাতা সকল
কিছুর খরচ ত ছিলই, তরুণের পাঠশালা সাজ হইতেই
আসিল জেলা-স্থলের খরচ। একমাত্র পুত্রকে মুগ্ধ
করিয়া রাখা ত চলে না?

পুত্র বিচ্ছুরণ সেকালের এটো-পাল করিতেই পীতাম্বর
বলিলেন, “জমিদারী সেরেস্তার একটা কাজ খালি
আছে; বাবু বলছিলেন, বারো টাকা মাইনে, বিকুকে
বসিয়ে দিতে।”

চট্টা বিকু মাথা নাড়া দিয়া বলিল, “হ্যাঁ, বারো
টাকা মাইনের কাজ করব কইকি! তোমাদের মতন
চিরকাল হন আর লম্বাগোলা দিয়ে ভাত খাবার লখ
অম্মার নেই। বেঁচে যদি থাকতে হয় মাছবের মত খেয়ে-
প’রে বাঁচব, নয়ত বেদিকে ছুঁচোষ বাঁচ চলে বাব।”

মা বলিলেন, “বাট বাট, অমন কথা বলে না। বাবা,
তুমি আমার আঁধার ঘরের আশিক, বাপ-মারের কোল-
জোড়া করে থাক, তোমাকে বারো টাকা মাইনের
কাজ করতে হবে না।”

পাল ফুলাইয়া আঁধার ঘরের বালিক বলিলেন, “বাপ-
মারের কোলে বসে থাকলে ত আর চারটে ছোঁচ-পা খেরোবে

না। আমার ক'রে খেতে হবে, আমাকে কলকাতার কলেজে ভর্তি ক'রে দাও।”

পীতাম্বর মহাবিপদে পড়িলেন। তাঁহার সামান্য আয়। বাড়িটা গল্পবাহুর, ধানচাল আছে বলিয়া আর বাগানের তরকারি ও পুকুরের মাছে ভাত খাওয়া চলিয়া যায় বলিয়া ধারকর্জ করিতে হয় না। কিন্তু যদি প্রতি মাসে ছেলের কলেজের মাইনে ও বাসা-খরচ জোগাইতে হয়, তাহা হইলে সেইখানেই ত মাসে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ টাকা খরচ। এমন করিলে ঘরের ঘটিবাটিও যে বাঁধা পড়িয়া যাইবে।

পীতাম্বর বলিলেন—“ও সব বাপু, তোমার এ গরিব বাপের দ্বারা হবে না। গাঁয়ে থেকে কিছু করতে হয় কর, নয়ত আমাকে আর দ্বিতীয় কথাটি ব'লো না।”

বিষ্ণু বলিল—“যেখ তাই হবে। এর পর তোমাদের যদি কোনো কারণে আপশোব করতে হয় ত তার জন্তে আমাকে দায়ী ক'রো না।”

মা বিষ্ণুরণকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কাদিতে কাদিত বলিলেন—“বাছা, হুখিনী মাকে এমন ক'রে কথার দাগ কেন দিচ্চিস মিথো? তুই আমার সাতটা নয় পাঁচটা নয়, অনেক দেবতার দোর-ধরা একটা মাত্র ছেলে; তোর বাবা যদি তোকে কলেজের খরচা নাই দেয়, আমিই আমার গয়নাগাটি বেচে খরচ যোগাব। তুই যা পড়তে চাস পড়, ওর জন্তে মনে কোনো হুখ রাখিস নে।”

ছেলেরই হাতে মা গলার হার খুলিয়া দিলেন। বিজ্ঞী করিয়া দেড়শত টাকা বিষ্ণুরণ মাকে আনিয়া দিল। মা বলিলেন, “হা রে, হার ত গড়াতেই দেড়শ টাকা লেগেছিল কি না মনে পড়ে না। বেচতেও কি অত কখনও পাওয়া যায়?”

বিষ্ণুরণ হাত নাড়িয়া বলিল, “কি জানি মা, সোনার দর বোধ হয় তখনকার চেয়ে এখন বেশী। জুহাড়া তোমার স্নিনিষটা এত ভাল আছে, যে, ঘরোয়া খন্দের সেবেই লুকে নিরেতে, নিজি কোন দিকে খুঁকেচে তা অত দেখেনি।”

মা বলিলেন, “তুই মোকের কাছ থেকে ঠকিরে টাকা

নিম্ন নি ভ, বাবা? তাই'লে কিন্তু বড় অর্থ হ'বে। অর্থের টাকা কখনও হুফল দেয় না, সে টাকায় কেনা বিদ্যা সব বুখা যায়।”

বিষ্ণুরণ বিরক্ত হইয়া বলিল, “না, না, তোমার অত ভাবতে হবে না, আমি ঠিক টাকাই এনেচি।”

মা বলিলেন, “তোর মুখের কথাই সত্যি হোক বাবা। এখন এই টাকাতে কিছু তোকে অন্তত ছ-মাস চালাতে হবে। তার মধ্যে আমি আর কিছু দিতে পারব না।”

ছ-মাস পরে গৃহিণীর হাতের ককণজোড়াও বিষ্ণুর হাত দিয়াই বিজ্ঞী হইয়া গেল। বৎসর দুই ধরিয়া গৃহিণী এমন করিয়া খরচ চালাইয়া একেবারে নিঃশেষ হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণু কিন্তু পরীক্ষার ভাল পাস করিল, এই একটা মন্ত সাফল্য।

গৃহিণী স্বামীর হাতে ধরিয়া বলিলেন, “দেখ, যে-বয়সে মানুষ স্বামীর কাছে পাঁচটা গয়না কাপড় আবার ক'রে চায়, সেই ছেলেবয়সে তোমার কাছে কখনও কিছু চাই নি; আজ বুড়ো বয়সে একটা স্নিনিষ চাইব, তুমি কিন্তু না বলতে পাবে না।”

পীতাম্বর বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বীর দিকে তাকাইলেন, শেষে কি গৃহিণী পাগল হইয়া গেলেন? নাতি-নাতিবীর দিঘিনা হইয়া এত দিনে আবার নুতন কি সখ প্রাপ্তে জাগিল? ভয়ে ভয়ে বলিলেন—“কি চাই বল। যদি সাধ্যো কুলোয়, না বলব না। তোমার সব গয়নাই ছেলেটা খেয়েচে জানি, কিন্তু সে-সব দিতে ত আমি বার-বার বারণ করেছিলাম।”

গৃহিণী বলিলেন, “গয়না আমি চাই না। কিন্তু ছেলেটা ভাল পাস করেছে, তুমি ওকে পড়াবে আর ক-বছর, আমার মাথার হাত দিয়ে এই কথা বল। ছেলে ডাক্তার হ'তে চায়।”

পীতাম্বর আশুতা-আশুতা করিয়া বলিলেন, “মাথার হাত-টাত আবার কেন? আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব ওকে পড়াতে। সেজন্তে বেশী ভেবে না। তবে ডাক্তারী পড়ার খরচ একটা ভালুক কেনার সমান এ বুঝ রেখো।”

পীতাম্বর চেষ্টা করিলেন বলিলেন, কিন্তু নিজের রোজগারের সামান্য করটা টাকা হইতে পড়ার খরচ জোগাইবার ইচ্ছা কিংবা শক্তি কোনটাই তাঁহার ছিলনা।

নানা ভাবনার চিন্তায় তিনি বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারী পড়াইবার খরচ ত সামান্য নয়, তাহার উপর সর্বকনিষ্ঠ কস্তা কাত্যায়নীর এখনও বিবাহ হয় নাই। আর সব মেয়েদের দশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এ-মেয়ের তের বৎসর চলিতেছে, তবু আজ পর্যন্ত বিবাহের কোনো ফ্রোগাড়ই হইল না।

সকাল-সন্ধ্যা তিনি হুঁকা-হাতে অন্তমনস্ক ভাবে দাওয়ার বসিয়া থাকেন, কলিকার আশুন নিবিসা যায়, তবু তাঁহার হুঁস থাকে না। কোনো রকমে একবার দুপুর বেলা জমিদারী কাছারীতে হাজির দিয়া আসেন। দিন-পনের এমন একটানা চিন্তাতেই কাটিয়া গেল।

গৃহিণী চিন্তিত মুখ করিয়া বলেন, “হ্যাঁ গা, ভেবে ভেবে কি গাঙ্গল হবে নাকি?”

কর্ত্তা বলিল, “কি করি বল? এত একটা বোঝা নয়, এ যে ছোটো বোঝা। মেয়েটাকে বাড়ি থেকে না নামিয়ে ছেলের জন্তে ত কিছুই করতে পারব না দেখুটি।”

৪

কাত্যায়নীর বিবাহ দূর গ্রামে ঠিক হইয়াছে। পীতাম্বর বলিলেন, “তিন দিনের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলতে হবে। বেশী আয়োজন করবার সময় নেই। এর বিয়েটা হয়ে গেলে তবে ছেলের পড়াশুনোর ভাবনা শুরু করব। তাড়াহাড়ি না সেয়ে ফেললে কলেজ খুলে যাবে।”

মা বলিলেন, “এত তাড়াহাড়ি হুড়োহুড়ির মধ্যে ভিনিকপন কখনও হয়? গয়না কাপড় করতেও ত দু-দিন সময় লাগবে।”

পীতাম্বর বলিলেন, “ও-সব, কিছু দিতে হবে না। তাদের অবস্থা ভাল, গরিব মানুষের গলা টিপে তারা কিছু নিতে চায় না। শুধু শাখা শাড়ী পরিবে যেসেট বান করলেই হবে।”

বাবার কথা শুনিয়া কাত্যায়নীর মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার তের বৎসর বয়স হইয়াছে, কাকেই সখী শাখী সকলেরই তাহার আগে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যাবৎ বেকারই অবস্থা হউক, বিবাহের দিনে মেয়েকে লোকে বস্ত্র-অলঙ্কারে বখাওয়া সাধারণ নেক, চিরকাল

কাত্যায়নীর তাহা দেখিয়া আসিয়াছে। আর তাহার বিবাহের বেলা তাহার এত দিনের সকল সাথ অশূর্ণ রাখিয়া বাবা শুধু শাখা পরাইয়া তাহার বিবাহ দিবে?

কাত্যায়নীর মাকে কিছু বলিতে পারিল না, দিদিকে গিয়া বলিল—“দিদি ভাই, তুমি মাকে গিয়ে বল, আমার বিয়ের কাজ নেই। আমি অমনি থাকব, বাপের বাড়ির দাসীগিরি করেই দিন কাটিয়ে দেব।”

নারায়ণী তাহার ফোলা গালদুটি টিপিয়া দিয়া বলিল, “কেন রে কাতু, বিয়ের নামেই এমন যোবনে যোগিনী মাঝবার ইচ্ছে হ’ল কেন তোর? কার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, কে কি বলেচে তোকে?”

কাত্যায়নীর ঠোঁট দুলাইয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, “বলবে আবার কে? দাদার পড়ার বেলা মা গায়ের সব গয়না বেচতে পারলেন, আর আমার বিয়ের বেলা শুধু শাখা শাড়ী! কেন, এত হেনস্থা কিসের জন্তে? বাবা কি মেয়ের জন্তে দু-শ টাকাও খরচ করতে পারেন না? ধান ভেনে চাল ঝেড়ে বাসন মেজে বাবার যা খরচ বাচিয়েছি এত বছর, তাতেও দু-শ টাকার গয়না হয়।”

নারায়ণী বলিল, “কাকে আর শোনান্দিছ ভাই? ওসব আমি তোর চেয়ে অনেক আগেই জেনেছি। ছেলেবেলা বাপ-মায়ের ‘ছেলে ছেলে’ বাতিকের চোটে মনে একটি দিন হুখ পাই নি। তবে তোর মতন একেবারে শুড়াবোটা ক’রে আমার বিয়ে হয় নি, এটা সত্য। তা কি আর করবি দিদি? আমি ছিলাম চার নম্বর, তুই যে আবার পাঁচ নম্বর। এখন ও দিয়ে রাগারাগি করিস নে, তোর হাতের চুড়ি আমি বেশ এখন। গড়াবার সময় হবে না, আমারই চুড়ি পরিবে বেশ, বেশি বেশ নকুন। তা ছাড়া বর ত শুধি টাকাওয়ারা, বিয়ের পর বাড়ি নিয়ে গিয়ে গা ভরে গয়না দেবে বলচে।”

কাত্যায়নীর আর কিছু বলিল না, কিন্তু নারায়ণী মাকে গিয়া বলিল, “মা, বয়ের যদি টাকা-পয়সা আছে, তবে গায়ে-হাটুয়ের জুতোও ত দু-একখানা গরম দিতে পারত, তাহলে আর কাঁটিটার অন্ধ হিঙ্গ ক’রে দিয়ে দিতে হ’ত না। শুধু কানে মূল আর পায়ে বল দিয়ে মেয়ের বিয়ে হয়, এ বাপু কখনও দেখি নি।”

সব চোখে জাঁচল দিয়া বলিলেন, “কি করব বল মা, সবই আমার কপাল! নইল আমার গয়নাগুলো বিক্রিয়ে যায়? হেলে যে শহরে বাবু হবেন, মেয়ের জন্তে কিছু রাখব আমার সাথি কি? তবু ত উনি শাখা শাড়ী দিয়ে সারহিছেন, আমি ফুল আর মল না দিয়ে ছাড়লাম না। সোনা-রূপো না হ’লে কখনও কস্তাদান শুদ্ধ হয়? বিয়েই অন্তত খেঁচে যাযে যে। আর বরের বাড়ির ত সবই আজগুবি। দু-দিনের মধ্যে বিয়ে চাই, নিজেরদের সব আছে, অথচ তাঁদের নাকি বিয়ের আগে কনেকে কিছু দেওয়া বারণ। ওদের কি না-কি দোষ হয়।”

নারায়ণী তুড়ি দিয়া বলিল, “দোষ না কচু! বা বুঝি, তাদের আধ পয়সারও মুরাদ নেই। বাবাকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটি নিয়ে যাচ্ছে। বাবাও ভাবচেন—নিখরচার মেয়ের বিয়ে, এমন বর পেলে ছাড়ব কেন? আর সবাইকে বা হোক ক’রে দু-তিন-শ টাকাও জিনিষ দিতে হয়েছিল। অবিশি কিছু না দিত পারেন, না দিন, কিন্তু একেবারে ভিথিরী কি আকাট মুখুর সঙ্গে যেন মেয়েটার বিয়ে না যেন, একথা এখনও বাবাকে বুঝিয়ে বোলা। সে সময় আছে।”

নারায়ণীর কথা শুনিয়া পীতাম্বর বলিলেন, “না গো না, তুমি মেয়েদের বুঝিয়ে ব’লা সে ছেলের বাড়ির বাপান ধাম চাল সব আছে। তা ছাড়া বাপ-পিতামহ টাকাকড়িও কিছু রেখে গেছেন। হাব’রের ঘরে আমি মেয়ে দিচ্ছি না। তোমাদের ভর নেই।”

বিবাহের আয়োজন বাড়ির মেয়েরা দেখান করিয়া পাত্রে নিজেরাই করিত লাগিল। পীতাম্বর কানের ফুল ও পাতের বস্ত্র ছাড়া মগন পয়সা দিয়া কিছু কিনিলেন না। বড়বোন কামারখানী পাড়ার পাত্রে গৃহস্থের বধূ, কোনোরকম একখানা দুপ্পা চেলির কাপড় আনিল। মেজবোন বিনোদিনী বলিল, “একা গয়না দিতে পারি এমন কমতা ত ভাই আশঙ্ক্য নেই। তবু আমি, তুই যদি ভাই কিছু দিস, আর মাও কিছু ব্যয় করে, তবে তিন জনে মিলে তিন ডরি কিং একটা বড় কড়ি হার জরানো দেখে পারে।”

আরায়ণী মেজবোনের বড় কড়ি-চুরা দিয়া ধান বিক্রী করিয়া গোটা কড়ক টাকা করিয়াছিল, তাহা হইতেই

এক ডরি সোনার দাঁড়ি দিল। মার কানে এক ডরির ছটা ফুল ছিল, তাহাই খুলিয়া দিলেন। সব ফিন্‌কিনে এক গাছা দড়ি হার হইল। সেকালে মেয়েদের চক্ষে এত সুরু হার যেন অলকারের নামে পরিহাস। তবু কি কবা যায়? একেবারে শুধু গলার মেয়েকে বাহির করিতে যাবোন কাহারও ইচ্ছা করিল না।

বাড়িত রতুনটোঁকি বসিল না, আলোর মালা হুলিল না, উঠানে ভিড়ান বসিল না, পাড়ার পাড়ার নিমন্ত্রণ হইল না, শুধু পাড়ার দুই-চার জন ভাল র’খিরে মেয়েকে যোগাড় করিয়া নমঃ নমঃ করিয়া বরযাত্রীর আহ্বানের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ময়রা-বাড়ি হইতে এক বাঁক দই ও এক বাঁক বোঁদে আনাইয়া মিঠারের কাজ সারা হইল।

সন্ধ্যাবেলা উঠানে গ্রামের বারোয়ারীর তালি-দেওয়া একটা লাল চাঁদোয়া টাঙাইয়া এবং একটি ময়লা সতরঞ্চি পাতিয়া বিবাহ-সভা সাজানো হইল। তাহারই উপর কে একটা পুরানো গালিচার আসন পাতিয়া মিল বরের বসিবার জন্ত।

সামান্য অলকার ও চেলী পরিয়া একটা দুই আনা দামের কাজলতলা হাতে করিয়া কাতারানী শিড়ির উপর বসিয়া থিমা হইতছিল। বিয়ে-বাড়িতে এতটা গোলমাশও নাই যে, তাহার ঘুমের ব্যাবাত ঘটাইতে পারে। হাত পাড়ার ছেলেরা ছুটিয়া আসিয়া বর দিল, “বরের শাকী দেখা যাচ্ছে রে, আলো ধনু, আলো ধনু; এখনি বর এসে পড়বে।” ছোটো তেল-জাকড়ার মশাল ও ছোটো-তিনটে লঠম আনিয়া সভার সম্মুখে খুঁটি পুঁতিয়া উঁচু করিয়া রাখা হইল, মেয়েরা তিন-চারটা শাক একসঙ্গে বাজাইয়া কোনোরকমে বিয়ে-বাড়ির মান রাখিতে চেষ্টা করিল। কস্তাপক্ষের পোষাক-পরিচ্ছদের ঘটীর মধ্যে নারায়ণীর ছর বংশের পুর নিয়ন্ত্রনের লাটিনের পোষাক এবং তিন বংশের নিয়ন্ত্রকতা কল্যাণীর এক গা গহনা। কামারখানের দুই জনকে সভা জাঁকাইতে সকলের আগে বসানো হইল।

মার জন-পড়িশ-খিণ বরযাত্রী শইয়া বর আসিয়া পড়িল। অল্প হইলেও বিয়ে-বাড়িতে বত সেরে পূর্ব ছিল সকলেই বর দেখিতে তীক্ষ্ণ করিয়া ছুটিয়া আসিল। তিন গ্রামের অনেক বর, নু-জানি কেমন চেহার, কেমন

ধরণ-ধারণ! ছোট মেয়েরা পুরুষদেরও ঠেলিয়া আগে গিয়া হাজির হইল।

বরের মামা, মেসো প্রভৃতি দুই-তিন জন ভজলোক একসঙ্গে বরকে নামাইতে অগ্রসর হইলেন। কস্তাপকের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া বলিল, “ওকি মশায়, আপনারা কেন? আমাদের বাড়ি বর এসেচে, আমরা নামিয়ে নিচ্ছি, আপনারা সন্ধান।”

বরের মামা বলিলেন, “না না, অত লোক-লোকিকতার দরকার কি? আপনারাও যা, আমরাও তা, নিলামই বা আমরা নামিয়ে! ওতে কিছু দোষ নেই।”

বিক্রচরণ বলিল, “না দেখুন, বিয়ের একটা নিয়ম ত আছে। বা চিরকাল হয়ে আসচে, আজ তার অন্তথা কেন হবে? আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন।”

বিক্রমী সদলে অগ্রসর হইতেই বরের মামা শশবাস্ত হইয়া হাসিলেন, “দেখো, দেখো, রাতে-ভিতে অন্ধকারে ছেলেকে কেন কেলে দিও না। সাবধানে নামিও।”

বিক্র বলিল, “কেন মশাই, আমরা কি কানা না খোঁড়া বে বরকে কেলে দেব?”

অগস্তা মামা চুপ করিলেন। বর নামাইতে গিয়া একটা ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল, “ওরে, তোদের করি বে খোঁড়া দেখচি, পা এগোতে পারে না।”

পীতাম্বর বলিলেন, “চুপ কর। অথবা বেরাষপি করো না।”

কিন্তু সত্য সত্যই বরকে অনেক কষ্ট করিয়া নামাইতে হইল। সকলেই দারুণ কৌতূহলের সঙ্গে প্রস্থ করিতে লাগিল, “কি হয়েছে, কি হয়েছে? বর পা বাড়াতে ভয় পায় কেন? কোনো চোট, লেগেচে কি?”

রাগিয়া মামা বলিলেন, “কিছু না, কিছু না, পা ঠিক আছে। ক-দিন আগে চোখ উঠেছিল, তাই অন্ধকারে ভাল চাঁহর করতে পারচে না। তোষাদের ত এমন ঘিরে-বাড়ি বে একটু জোর আলোও নেই!”

মেরেহন্দে মহা চাকলা পড়িয়া গেল, “আমো আবার নেই! কই কি সত্তর বছরের বে এই অন্ধকারে দেখতে পারি?”

নারায়ণী বিরক্ত হুখ করিয়া নাকে বলিল, “না ও চোখ-

ওঠা-টোটা কিছু নয়। আমি বলছি নিশ্চর বরের চোখ কানা, নইলে আগে থেকে মামা অত ব্যস্ত হয়ে ঢাক-ঢাক শুক-শুক করত না। আমি নিজে বাম, সামনে গিয়ে দেখে আসব, বর চোখে দেখতে পায় কি না।”

মা চোখে আঁচল দিয়া কান্না শুরু করিলেন, “ওরে আমার কাঁড়, তোর কপালে মা শেষে এই ছিল!”

নারায়ণী গলা উঁচু করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “কানা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কত লাখ টাকা বাঁচালে, বাবা? নিজের মেয়ের উপরও একটু মারাই হ’ল না? ওই ত তোমার শেষ, আর ত কেউ জালাবে না।”

মা বলিলেন, “ওরে বাছা, ধাম আর গোলমাল বাধাস নে। মেয়েটার অদৃষ্টে যা আছে তা ত হবেই। এর পর আর লখভ্রষ্ট ক’রে জাতজন্ম খোয়াস নে।”

নারায়ণী বলিল, “অদৃষ্ট অদৃষ্ট ক’রো না মা। বেশ জান যে তোমরাই ওর অদৃষ্ট। তই-বাবা, বলুন দেখি জেনে-শুনে কানা ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন নি।”

পীতাম্বর অন্তস্ত মিহি-হুয়ে বলিলেন, “হ্যাঁ, চোখ একটু ধরাপ তা শুনেইছিলাম, কিন্তু তখন ত দেখে বুঝতে পারি নি যে একেবারে এত কম দেখে।”

পীতাম্বর কি বলিলেন না-শুনিতে পাইলেও বরের মামা আনন্দে বলিলেন, “আপনি মশায় সমস্তই জানতেন। দেনে-তুনেই মেয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন; আমরা কাউকে ঠকাই নি। এখন এরকম বলা অত্যন্ত অস্তায়।”

নারায়ণী স্ত্রীজাতির লজ্জাধর ভূমিরা পিতার হইয়া জবাব দিল, “ঠকান বা নাই ঠকান, ওছেলের সঙ্গে বিয়ে আমরা বেব মা। আপনারা বর ভুলে নিয়ে বান বিয়ে আমরা ভেঙে মিলাই। স্তায়-অস্তায় বুঝি না।”

মা ছুটরা ভাঁহার হুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, “ওরে কি বলতে কি বলচিস, কিছু কি হ’ল নেই তোর? বর ভুলে গিয়ে গেলে জাতি বাবে কি ওদের, না আমাদের? ও শোড়াকপালীকে দিয়ে তখন আমি কি করব?”

নারায়ণী বলিল, “তোমাদের ধোপা-নাগিত সব কি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে আমাদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে পারছিলেন না!”

বরযাত্রীর দলের একটা ছেলে চীৎকার করিয়া বলিল, “ধোপা-নাগিত বন্ধ হবে কেন, রাত্রাবরে হাঁড়ি চড়া বোধ হয় বন্ধ হয়েছিল। হাজার টাকার রফা হয়েছে, তা বুঝি কর্তা বাড়ি এসে বলেন নি। আগাম পাচ-শ এখনও টাকাকে হাত দিলে দেখা যায়। এখন বিয়ে দেব না বললে শুধু কি ক্ষতি যাবে, মাথাও যাবে সঙ্গে সঙ্গে।”

সভা জুড়িয়া হড়াহড়ি চেঁচামেচি পড়িয়া গেল।

লণ্ডনের আলোকলা কাহারা আছাড় দিয়া ভাঙিয়া দিল। অন্ধকারে অন্ধ-বর ও ঘরের ভিতর অশ্রুস্রবী ক’লে নীরবে বসিয়া রহিল। বাকী স্ত্রীপুরুষ যে যেখানে ছিল সকলেই উত্তেজিত হইয়া চেঁচামেচি করিতে লাগিল। অস্পষ্ট আলোতে মুখ দেখা যায় না বলিয়া গলার দর সকলেরই সপ্তম চড়িতে লাগিল। কস্তাপক্ষীরেরাও এখন পীতাম্বরকে হিঁকার দিতে ছাড়িল না, “শেষে টাকার লোভে মেয়ে বেচা, ছিঃ!”

বরের বামা আশ্চর্য করিতেছেন, “আমাদের টাকা কিরিয়ে দিল, আমরা বর তুলে নিয়ে যাই। কনের বাড়ি এসে এখন অপমান আমরা সহ করব না।”

নারায়ণী তখন একেবারে সভার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে। ছেলেকের ডাকিয়া সে বলিতেছে, “তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ সেই ভাই, যে, আমার বোনটার জাত রক্ষা করতে পারে?”

কেহ জবাব দিল না, কেহ কাছে আসিল না।

নারায়ণী কহিল, “আমি কত দিন খেতে পার, কাঁচু আর কাঁচুর বরের ভক্ত হইব অরের অভাব হবে না, এ আমি স্বশ্রমাকী ক’রে বলছি, শুধু কি আমার ঘোমের দ্বিগুণ আদর হবে না? বেশ আমি ছেলেকের মা, মিথ্যা বড়াই করবার সাহস আমার নেই।”

এমের একটা হঠাৎ শিকড়াকুতীন বালক আসিয়া নারায়ণীর কাছে হাঁড়ি দিল। নারায়ণী তাহার হাত ধরিয়া

বসাইয়া অন্তঃপুরে কাত্যারনীকে আনিতে চলিল। অশ্রুধারায় কাত্যারনীর বুক তখন ভাসিয়া বাইতেছে।

অন্ধ বরের দলগুলোর এমিকে বিপুল কোলাহল করিয়া কিরবার উত্তোষ করিতেছে। পীতাম্বর কম্পিত হস্তে বরের মাঝার হাতে টাকা গণিয়া দিতেছেন। আর সকলে চীৎকার করিতেছে, “ওরে ছোটলোকের বাড়ি বিয়ের লব্ধ ক’রে মানসন্ত্রম সব গেল।” কেহ বলিতেছে, “মেয়েবেচা বাম্বনের আবার জ’ক দেখ। পদ্মলোচন বর চাই।” কেহ বলিতেছে, “একেবারে জোচ্ছোর, সব জেনে-শুনে টাকা নিয়ে এখন আবার সাধু সাজা হচ্ছে।”

অর্ধ অন্ধকারে ভাঙা সভার মহা কলরবের মধ্যে সজলনয়না কাত্যারনীর বিবাহ হইয়া গেল।

পীতাম্বর নারায়ণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, “কাকু গতি ত মা, তুমিই করলে, এখন ছেলেকটারও একটা ব্যবস্থা তুমি ছাড়া আর কে করবে? তোমাদের বিরক্ত করব না বলছি এ-সবছটা করেছিলাম, ছেলেকটার খরচ ওরাই চালিয়ে যিত। তা আমার কপালে সবই মন্দ হ’ল। এখন তুমি ছাড়া আর কার ভরসা করব মা?”

নারায়ণী বলিল, “বাবা ছেলের গুণ মেয়েটাকে বলি দিচ্ছিল—আর এখন ও-ছেলের কথা তুলো না।”

পীতাম্বর বলিলেন, “তোমারও ত মা ছেলেমেয়ে আছে। দেখুবি বড় হ’লে নিরঞ্জনর আগে কল্যাণীকে বসাতে পারবি না। মেয়েসন্তান হাজারই হোক পর বইত নয়। তার লাখ টাকা থাকলেও বাপ ভিথিরা। নিজের মেয়ে ইতেই এ-স্তান তোর হবে এই আশীর্বাদ আমি করছি।”

নারায়ণী বলিল, “আমিও বাবা, তোমার পারে হাতি দিয়ে বলছি আমার ছেলেতে মেয়েতে কোন প্রভেদ নেই এ আমি তোমাদের দেখাব।”

সে বলিতে পারিল না, “তোমার ছেলের সঙ্গে মুখে কালি বাখছিলে, তাগিদ এই মেয়ে ছিল ভাই রক্ষে করল।”

বিকু শুধু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, “বাবা, মার গরনা-ওলো বেশী দাম দিয়ে ছোটটাই কিনেছিল। নইলে ও মরালোনা কে অত দাম দিয়ে নিত?”

বাংলা-সাহিত্যে 'মহাকাব্য'

ঐপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ

১

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে লইয়া বাঁহারা আলোচনা করেন, মাঝে মাঝে তাঁহাদের নিকটে একটা মন্তব্য শোনা যায়,— বাংলা-সাহিত্যে মহাকাব্য রচিত হইল না, ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের কথা ও অসম্ভবতার পরিচয়। গীতিকাব্যে খণ্ডকাব্যে কবিত্বপ্রণয় রাত্তাণী জগতের দরবারে নিজের একটা বিশেষ স্থান গড়িয়া লইয়াছে, এবং বাঙালীর এই স্বাভাবিক কবিত্বপ্রণয়তা তাহাকে ভারতীয় অন্তান্ত জাতির নিকট যৌথ ও গুণের অদ্বুত সংমিশ্রণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে; কিন্তু কাব্য ছাড়াইয়া মহাকাব্য পর্য্যন্ত সে উঠিতে পারে নাই, বাঙালী সমাজেও এইরূপ অভিযোগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বাংলার উপর যথেষ্ট পড়িয়াছে, সাহিত্যের রূপের উপর, তাবের উপর একটা ছাগ রাখিয়াছে, তাহা সহজে মুছিবার নয়। গীতিকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অবিসংবাদিত; বর্তমান যুগের ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে সাংক্ৰান্তভাবে পাশ্চাত্য প্রভাব বন্ধে ধারণ করিতেছে। “কিন্তু সে সব লঘুসাহিত্য, খানিকটা চাপল্যমাত্র-প্রণোদিত; মহাকাব্যের মহাভাব তাহাতে কোথাও নাই।” পাশ্চাত্য ‘এপিক’ কি তবে সমরমার মূলসিক কবিত্বের রাত্তাণী দেখকের কোনও কাজে আসে নাই? পাশ্চাত্য প্রভাবে পুষ্ট বাংলা-সাহিত্যে মহাকাব্যের বা পাশ্চাত্য এপিকের ছাপ কই?

২

আমাদের দেশে প্রাচীন আলংকারিকেরা মহাকাব্যের গঠন সম্বন্ধে খানিকটা ধরা-বাঁধা নিয়ম রচনা করিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ-ভাবা-বারবিলাসিনী-ভূজঙ্গ সাহিত্য-দর্পণকার বিদ্যনাথ কবিরাজের মতে—

মূলকথো মহাকাব্যঃ তরেকো নায়কঃ স্যাম্।

সংখ্যো অত্রিংশো বাপি বীরোদাত্তব্যবিত্তঃ।

একবংশতরঃ ভূপা কুলজা বহুবোহপি বা।
শূন্যবীরশাস্ত্রানামেকোহিনী রস ইযাতে।
অল্লসি সর্কোহপি রসঃ সর্কো নাটকসম্বন্ধঃ।
ইতিহাসোক্তবাং বৃত্তনকথ্য সঙ্কল্যাত্রয়ম্।
চম্পারভক্ত বর্ণাঃ স্যু ভেবেকং চ কলং ভবেৎ ॥
আদ্যো নমস্ক্রিয়াণীক্য বস্তুনির্দেশ এব বা।
কচিদ্ভিন্দ্য বলাদীনাম সত্যং চ গুণবর্ণনম্।
একবৃত্তময়ৈঃ পটভরবসাদে হস্তবৃত্তিকৈঃ ॥
নাতিঘরঃ নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাবিকা ইহ।
নানাবৃত্তময়ঃ কাপি সর্গঃ কন্দন দুলাতে ॥
সর্গান্তে ভাবিসংসা কথায়াঃ হৃদয়ং ভবেৎ।
সম্যাহুয়োশুরজনীপ্রদোষদ্ব্যস্তবাসনাঃ।
সন্তোঃগরিপ্রলভৌ চ দুনিবর্গপুয়াধরঃ।
রপপ্রয়াণো গয়ম-মস্ত-পুত্রোদয়াদয়ঃ।
বর্ণনয়া বব্যোদ্যায় সাঙ্গোপাঙ্গা অমী দশ।
কবেবৃত্ত্য বা স্যাম্। নায়কভেদতরসা বা।
নামাসা সর্গোপায়েরকথ্যঃ সর্গনাম ভু ॥

বহু সর্গ লইয়া মহাকাব্য রচিত হয়, তাহার মধ্যে প্রধান এবং দেবতাসম্ভাব্য নায়ক থাকিলে এক জন, তিনি সখ্যশস্কৃত, ক্ষত্রিয়, এবং বীরোদাত্তগুণযুক্ত। কাব্যের নায়ক হইলে প্রধান কোন বংশের রাজা, অথবা সংকুলোৎপন্ন বহু ভূপাল; এবং অঙ্গী বা প্রধান রস হইবে শূন্য, বীর, শান্ত ইহাদের মধ্যে একটি রস, অস্ত সকল রস হইবে তাহার অঙ্গ সাজ। ইহার মধ্যে নাটকের পঞ্চসন্ধি বিরাজিত থাকিবে, এক ইতিহাসের, অথবা সঙ্কলন লইয়া, কোনও ব্যাপার আশ্রয় করিয়া ইহার রচনা হইবে। ইহার নামমাত্র থাকিবে চতুর্দশ এবং কাব্য তাহার একটি কল্প প্রসব করিবে। নবম্বার, আশীর্কান বা সঙ্কল্যাজগ—ইহাদের মধ্যে কোন একটি দিয়া ইহার আরম্ভ হইবে; কোথাও থাকিবে রক্তের নিন্দা কোথাও বা সঙ্কলনের গুণবর্ণনা। এক এক সর্গে একই বৃত্ত থাকিবে, শুধু সর্গান্তে এক-পদবর্তন করিবে। সর্গভিনি পুষ্ট ছোটও হইবে না, বহু-বহু হইবে না, সংখ্যার আটত্রি বৈধী হইবে। কোথাও কোথাও এক সর্গের মধ্যেই নানা বৃত্তের অবতারণা।

এক সর্গের শেষে পর সর্গের কথা নির্দেশ করিয়া দিতে হইবে। লক্ষ্য, স্বর্গ, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, সন্ধ্যা, বিপ্রলম্ব, মূনি, স্বর্গ, নগর, অধর, রণপ্রাণ, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রের জন্ম—এই সকল সবিতরে বর্ণনা করিতে হইবে। সর্গের নামকরণ হইবে কবি, তাঁহার ছন্দ, তাঁহার নায়ক বা অন্ত কাহারও নামে, অথবা সর্গস্থিত কোন উপাদেয় কথা অনুসারে সর্গের নাম হইবে।

কোন বিশেষ সাহিত্যকে সংজ্ঞা দিয়া বর্ণনা করিয়া ঠিক বোঝান যায় না, সাহিত্যের রস তো নিত্যই সঞ্চারবেশ, ভবু ভিন্ন ভিন্ন রীতির পার্থক্য বুঝাইতে গেলে এইরূপ সংজ্ঞা বা বর্ণনা ভিন্ন উপায় নাই। অবশ্য কাব্যতঃ এই সংজ্ঞা সর্বত্র রক্ষিত হইত না, বিষয়-গোরবে ক্রীড়-দেবের গীতগোবিন্দও মহাকাব্য। বাহা হউক, কোতুহলী পাঠক অধীত পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সহিত ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশ মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

৩

ইউরোপীয় 'এপিক' কথাটার মূলও 'বৃত্ত' বা 'ব্যাপার' রহিয়াছে; উপাখ্যান এরূপ কাব্যের প্রাণ। 'ইপ্‌স্' শব্দটার অর্থ গল্প, এপিক কথাটার অর্থ 'গল্প-সম্বন্ধীয়'। গভীরভাবে গুছাইয়া যে-কোন উপাখ্যান গল্প করা হয় তাহারই নাম এপিক। ইহার পিছনে যে শুধু বীর-রসের ভাব রহিয়াছে তাহা নয়, প্রাচীন গ্রীসে ব্যক্তিগত অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও স্বার্থের অস্থায়ী আদর্শও প্রচুর ছিল। হোমারের পূর্বেও গ্রীসে এপিক ছিল, তবে সেই সকল এপিক-রচয়িতা কবিদের নাম পাওয়া যায় না। খ্রীঃ-পূঃ সপ্তম শতকে এক জন স্ত্রী মহাকবি ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। তিনি কবিত্বপ্রতিভার হোমারের সমকক্ষ ছিলেন এরূপ মন্তব্যও শুনিতে পাওয়া যায়। তর্জিল খ্রীঃ-পূঃ ৩০ অব্দে তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই মধ্যে মূলগত এপিক-প্রবৃত্তি বা মহাকাব্যের প্রেরণা ছিল। মধ্যযুগে এই প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু লুইসি পুথি, বইহার্দ্দে, অ্যারিওটো ও ট্যালো প্রভৃতি কবিশ্রম মূল এপিক আদর্শে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের পরে খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে

ইংরেজ কবি মিল্টনের জারিভাষ। হোমার-ভক্তিরেব কবি মিল্টনের মনেও এপিকের গভীর বুদ্ধি বিদ্যমান ছিল; অনন্ত আকাশ, মহাপুত্র, অপরিণীত যৌবন,—তাঁহার কল্পনার রঙ্গভূমি। এপিকের উদার আদর্শ লেখকের সমুখে জাজ্জল্যমান থাকা উচিত; নতুবা শুদ্ধগভীর শব্দ বা শব্দের কারণভূত ভাব কি করিয়া সূত্র হইবে?

ইউরোপীয় এপিকের মধ্যে মোটামুটি তিনটি উপাদান লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তাহার ভাবাধার, তাহার শব্দ-সম্পদ, তাহার শব্দের বাধুনি। এপিকের পক্ষে তিনটিই অপরিহার্য, একটিকেও বাদ দিলে চলে না। প্রথমতঃ, এপিকের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা চাই, নাটকের প্রাণ যে ঘটনা তাহা থাকা চাই; আরিস্তোতল বলিয়া গিয়াছেন, নাটকীয় গুণ সঙ্গে সঙ্গে না থাকিলে এপিক উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কথার বাধুনি থাকা চাই, বাছিয়া বাছিয়া শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, বাহাতে ধ্বনিতেই মনের মধ্যে একটা গভীর উদ্ভাত ভাব জাগিতে পারে; কীট্‌স্ যেমন শব্দ-বন্ধনকে প্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, এপিক কবিও তেমনি দেখেন। কাব্য ত শুধু ভাবের সমষ্টিমাত্র নহে, ভাব না-হয় তাহার প্রাণ হইল, কিন্তু সে প্রাণের উপবৃত্ত দেহ করিতে হইবে, এমন দেহ করিতে হইবে বাহাতে প্রাণের হুম্বা, শক্তি, মাধুর্য্য সকলই অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে ভাবাধার, শব্দসম্পদ ও শব্দবিভাস—এই তিনটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কবিরা মহাকাব্য রচনা করেন। এই তিনটির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি আপনাই উন্নত হইবে।

৪

বর্তমান যুগে বাংলা-সাহিত্যে যে-সব কাব্য স্মিতচিত্ত হইয়াছে তাহাদের উপর প্রাচীন ইউরোপ ও প্রাচীন ভারত উভয়েরই প্রভাব কাজ করিয়াছে, একথা বলা যায়। ইংরেজী ১৮৬৩ সালে পরার হুন্সে ইসলামভের বাংলা অনুবাদ হয়। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, জবীনচন্দ্র এই কবিক্রিত বাংলা-সাহিত্যে এপিকের স্বাভিমান করিয়া গিয়াছেন। বখাজনে ইহাদের কাকুরল্যারীতির আলোচনা করিব।

মধুসূদন তাঁহার বাংলা কাব্যের মধ্যে 'তিলাত্তমাসত্তব'ই

সর্বপ্রথমে রচনা করেন। এই কালের মধ্যে তাঁহার ধারণা, উচ্চ ঠিক ঠিক এপিক নয়, তবু বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাকর হুন্সে রচিত ‘খণ্ড এপিক’। তাহার পরে মেঘনাদবধ; এখানে রাম-রাবণ ও ইরাজিৎয়ের চরিত্রই ছিল তাঁহার প্রধান উপজীব্য; ইহাকেও তিনি ‘খণ্ড এপিক বা epicaling বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।*

পৌরাণিক চরিত্র আশ্রয় করিয়া ইউরোপীয় এপিকের আদর্শে তিনি সেই চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইউরোপীয় মহাকাব্যদের মধ্যে তাঁহার আদর্শ ছিলেন মিল্টন, হোমার নহেন। তাই বলিয়া কি তিনি অন্য কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই? মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গে “কোনু দেব মোহের শৃঙ্খলে” ইত্যাদি কথা মেঘের কথা ইগিরাড চতুর্থ ভাগ হইতে, রত্নির পরিকল্পনা অ্যাক্রোমিতে হইতে, প্রেমীলা-চরিত্র ট্যাসোর মহাকাব্য বেকশালেম-উজারের চতুর্থ সর্গ হইতে, নশরথের নরকর্ণন ভক্তিরঙ্গের মহাকাব্য হইতে অন্তর্ভুক্ত গৃহীত। তিলোত্তমা-সত্ত্ব লিখিতে গিয়া কবির মনে বিদ্রোহভাব তেমন ধরা জাগে নাই, কিন্তু মেঘনাদবধ আরম্ভ করিয়া তিনি যেন প্রাচীন ভারতীয় কাব্যাদর্শ হইতে নিজের দূরব বোধ করিতে লাগিলেন। যে-দেশে সাহিত্য-রচনার নিয়ম বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে,—“রাশাদিকং প্রবর্তিতব্যম্, ন তু রাবণাদিবং”—সেখানে বন্ধুর নিকট সাহিত্যের আদর্শ সন্ধে লিখিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন, Ravan inspires me with enthusiasm; he is a Grand Fellow; মহুহন নিজে যেমন বিদ্রোহী ছিলেন, তেমন বিদ্রোহকে ভাল করিয়া বুঝিতেও পারিতেন।

মেঘনাদবধের পর মহুহন খণ্ডকাব্যাদি লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মনে বরাবরই এপিক লিখিবার একটা আগ্রহ ছিল, মেঘনাদবধে তাঁহার শুধু হাত পাকাইবার উপায় মাজ। অগ্রশেষে যে সন্দেশ বা বণ্ডকার্য লিখিয়া তাঁহাকে মিল কাটাতে হইবে, সে-চিত্তা তাঁহার অলঙ্কার ছিল। তাঁহার বন্ধু রাজনারায়ণ বাবু সিংহল-বিজয় লইয়া মহাকাব্য রচনা করিবার অন্ত পূর্বকই তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন;

* “Let me write a few Epicals and then acquire a proper style.”—যোগেশ্বর বসু-কৃত জীবনী, ১৯৩৭ পৃ: ১।

কারণ মেঘনাদবধের ভিত্তি ছিল রামায়ণ-কথা, তাহা পৌরাণিক কাহিনী, সুতরাং রাজনারায়ণ বাবুর মতে তাহার ঐতিহাসিকতা কিছুই ছিল না। সিংহল-বিজয় মহাকাব্যে বাঙালীর জাতীয়তার সূত্র মিলিবে, ঘটনাও বাঙালীর অতীত জাতীয় গৌরবের নিদর্শন, এবং তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তিও আছে,—অন্ততঃ রাজনারায়ণ বাবু তাহাই মনে করিয়াছিলেন; মহুহনও পরে এক সময়ে সিংহল-বিজয় লইয়া মহাকাব্য রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকালের আদ্বানে তাঁহাকে সঙ্গারের কর্তব্য হইতে অসময়ে অবসর লইতে হইল।

রঙ্গলাল (১৮২৬-৮৭) কিন্তু মাইকেলের মত মিল্টনের মহাকাব্যে আকৃষ্ট হন নাই। তিনি বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে আত্মবান ছিলেন; বাংলা কাব্যে যে নিত্য অকিঞ্চিৎকর নহে তাঁহার Defence of Bengali Poetry তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরিনী উপাখ্যান রচিত হয়; তাহাতে “আধুনিক রুচি” মানিয়া চলিবার ইচ্ছা স্বীকার করা হইয়াছে। বিমুক্ত ইংরেজী রুচিকে তিনি কাজ করেন নাই, বরং কল্পদেবীতে (১৮৬২) কবির Lay of the Last Minstrel-এর ছায়া পড়িয়াছে। শূরহৃদয়ীতেও (১৮৬৮) ফট-বাইরণের প্রভাব দেখা যায়। সাত সর্গে সমাপ্ত কাশীকাবেরী শুধু ‘ঐতিহাসিক কাব্য’, কিন্তু কুমারসংহব ‘মহাকাব্যের সাত সর্গ তিনি অমুবাণ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট অংশ হইতে ছাড়াই করিয়া কয়েকটি স্লোকের অমুবাণ করেন, তাহা পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে। পুরাণ ভাগ করিয়া আধুনিক ইতিহাস হইতে উপাখ্যান কেন তিনি গ্রহণ করিলেন, তাহার কৈফিয়ৎ তিনি পরিনী উপাখ্যানের ভূমিকাতেই দিয়াছেন।* প্রাচ্য ও পাকাত্য আদর্শ

* “পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লোকের কণ্ঠে ধলিলেই হয়, বিশেষতঃ ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক কল্পনা প্রকাশিত অমূল্যতম কল্পনাবিধি সুকল্পিতের তুল্য নহে এবং একদেখিয়া অসমর্যে বিদ্যা-বুদ্ধির বাহব মহাত্মবাদের মতে তৎসর্ব অমূল্য-বস্তুিত কাব্যগ্রন্থে ভারতবর্ষীয় সুকল্পিতের অত্যুৎকর্ষ প্রাপ্তি করা কর্তব্য নহে।—স্বদেশীয় লোকের পরিসংখ্যিকভাবে পঞ্চবার্ষিকী লোকের জাত চিত্রকল্প এবং তৎসংক্রান্ত অসংসার প্রবৃত্তি প্রকাশ হয়, এই বিশেষভাবে উপরিউত উপাখ্যান প্রাক-ঐতিহাসিক অবলম্বন পূর্বক এবং কর্তব্য হইতে হইল।”

তাহার মধ্যে কৃষ্ণও বিদ্যমান; এক দিকে তিনি লৌকিক সাহিত্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রাচীন ও মধ্য যুগের ধর্মসাহিত্য নয়, অন্য দিকে আবার তিনি প্রাচীনকালীন অল্পপ্রাসের বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—“দিল্লীর দোঁদুও দর্প দীপ্ত দল দিশি।” রত্নলাল মহাকাব্য রচনা করেন নাই, কিন্তু তাহার কবিতা পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণ করিয়াছে, এবং তিনি মহাকাব্য-রচনার পথে চলিয়াছেন, ইতিহাসের ঘটনা ও সজ্জনের জীবনকথা আশ্রয় করিয়া বাছিয়া বাছিয়া শব্দপ্রয়োগ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাহার রচনার সংক্ষিপ্ত আকার ভুলিয়া গেলে মহাকাব্যের সঙ্গে এক পর্যায়ে তাহাকে ফেলা বাইত।

মাইকেলের পর হেমচন্দ্র (১৮৩৮-১৯০৩) মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ব্রজসংহারের প্রথম ভাগ প্রকাশিত করেন। দুই ভাগে ইহার সর্ব-সংখ্যা চব্বিশ। কাব্যকে কবি যে রূপ দিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য-যেঁহা, সন্দেহ নাই। সর্বের সংখ্যা অর্থাৎ কাব্যের দৈর্ঘ্য লইয়া আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যাইবে। প্রথম সর্গে বর্ণিত অমর-মন্ত্রণাসভা মিলুটনের অমর-সভারই অনুরূপ; হাদেশে সরস্বতীর আহ্বান,—ইহাতে হেমচন্দ্র মিলুটনের ও তদনুগামী মাইকেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন; ত্রয়োদশে, যে সোনার আপেল স্বর্গের দেবীদের মধ্যেও স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার অবতারণা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শচীহরণ, টাসোর কাব্যে সক্রোনিয়াকে অপহরণ করার ভাষা লইয়াই লিখিত, এবং হেমচন্দ্রের নিরতিশেবী গ্রীক “কেট”—এক প্রতীক্ষার। ব্রজসংহারের অন্তর্মিহিত ভাবও অতি গভীর;—বীরবাহু, ছায়াময়ী, অশ্বাকানন,—ইহার মৌলিক হউক আর অনুবাদ হউক, কাব্য মাত্র, কিন্তু ব্রজসংহার, মহাকাব্য।

যে বৎসর ব্রজসংহারের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, সেই ১৮৭৫ অব্দেই নবীনচন্দ্র (১৮৪৬-১৯২৯) পলাশীর যুদ্ধ রচনা করেন। ক্লিয়ার্স সীজার, রিচার্ড দি থার্ড ও প্যারডাইজ লট, চাইল্ড হারল্ড,—শেক্সপীরার, মিল্টন, বাইরন,—ইহাদের ছাড়া পলাশীর যুদ্ধে রহিয়া গিয়াছে। তাহা তির নবীনচন্দ্র রৈরভক, কুলকেন্দ্র ও প্রভাস এই তিন ভায়ে কলকবিতা রচনা করিয়া হিন্দু জাতীয়তার

যে কাকসর ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে রসিক বাঙালী পাঠকের এপিক-পাঠ করিবার সূহা চরিত্র হইবার কথা ছিল। ঐক্য-চরিত্রের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য লীলা যথাক্রমে ইহাদের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যজ্ঞিত্যের সমাবেশে আর্থা-অনার্থা-সম্মর্ষের এক মহান ইতিহাস, ব্রাহ্মণ-দ্রাবিড় সভ্যতার বিরোধের বাস্তব নিহিত রহিয়াছে; সে ইতিহাসের গভীর স্রবৎ, তাহার দৃষ্টি উদার। ইউরোপীয় মহাকাব্যে যে বিশালতার ভাব রহিয়াছে সেই বিশালতা, কাব্যজ্ঞিত্যে সম্পূর্ণ এই মহাকাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে। ভারতীয় সভ্যতার এক অত্যাশ্চর্য যুগের আনন্দ, সঙ্গত ও হৃৎ কবি মনস্তক্ষে দেখিয়াছিলেন, এবং অতীতের বাহা সর্বাঙ্গিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সে যুগের দার্শনিক চিত্র তাহার লেখনীর সাহায্যে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছিলেন। কবি নিজে পাশ্চাত্য ভাবের কঠোর সমালোচক ছিলেন; সে কঠোরতা এত দূর ছিল যে বঙ্কিমের উপন্যাসে ভারতীয় আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, বঙ্কিম-সাহিত্যে আদর্শ চরিত্রের একান্ত অসম্ভাব, তাহাও বলিতে তিনি স্মৃতিত হন নাই। তিনি নিজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় দৃষ্টির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং এইরূপ চেষ্টার অগ্রগতি না হইলেও যথাসাধ্য দুই দিকের আলোকে পথ চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ ভাবে নূতন সাহিত্যের আদি যুগে মহাকাব্যিগণ এপিকের আদর্শ কাব্য রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং যথাসম্ভব সিদ্ধিলাভও করিয়া গিয়াছেন।

৫

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের পর নানাবিধ-বিহগ-কাকলীমুখর বাংলার বিশাল সাহিত্যোদ্যানে এপিকের কি আর সৃষ্টি হয় নাই? বাংলার কাব্যকুন্ডে এপিক সম্বন্ধে কি গভীর নীরবতাই বিরাজ করিয়াছে? আজও বাংলার প্রধান গুরু তাহার সাহিত্য, তাহার প্রধান আশ্রয় কাকলীসাহিত্য। তবে কেন এই এপিক-কীর্তি, এই মহাকাব্যে বিরাগ? যিনি আমাদের কবিসম্রাট তিনি নিজেই যে, এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ স্বকণ্ঠে, জীবনযাত্রার প্রথম দুইভাগে মহাকাব্যের কথা সাহিত্য-সাধনা হইতে বাদ

দিয়াছেন। কশিকার তিনি বলিয়াছেন, মহাকাব্য রচনা করিবার কথা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল,—

আমি নাথ'ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—

এমন সময় তাঁহার মনসী ফুল্লরী আসিয়া বিরোধের সূচনা করিল, কবি তাঁহার অপূর্ণ জীবন্ত ছন্দে সে অন্তর্বিবোধের কথা বলিয়া গিয়াছেন,—

কেল কখন তোমার কীকল
কিহিগীতে
কলনাট কেল কাট
হাকার গীতে!
মহাকাব্য সেই অত্যা
হুণ্টনার
পারের কাছে জড়িয়ে আছে
কপার কপার।
আমি নাথ'ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে।

মহাকাব্যের বিধিনিষেদ সবই তাঁহার জানা ছিল, তবু প্রেমের কথায় তাঁহার প্রাণ ভরিয়া গেল, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা দিবিবার আর অবসর রহিল না।

হার রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
কর্ম মত!
পূরণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ
কেল খণ্ড তোমার চণ্ড
মরদ-খণ্ড!
য়েল হার দিবা হার
প্রেমের প্রাণ
বিলের কেল ভাবী-কেলে
কীকল-কাপ।
হার রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
কর্ম মত।

উপস্থল রচনা করিতে সিরাত রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ঐতিহাসিক ঘটনা আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু 'ভাবী-কেলে কীকল-কাপ' তাঁহাকে বেশী বিদ বধিয়া রাখিতে পারিল না—তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনার স্থান আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মানব-জন্মের গুণতম রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে থাকিলেন, মানবজন্মের রহস্যলোক তাঁহাকে আকর্ষিত করিল,—

মহাকাব্য বা এপিক তাঁহাকে পছন্দ না, কবির বাসরীতে গীতিকাব্য অপূর্ণ শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিল।

৬

বাংলা-সাহিত্যের এই সকল দশবর্ষী কবির কথা ছাড়িয়া দিলে আরও বহু কবির কথা আমরা জানিতে পারি; তাঁহারা প্রধানতঃ মদ্রুহন নবীনচন্দ্রের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন, কেহ বা নবীনচন্দ্রের আদর্শে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে, রচনা করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে Paradise Lost-এরও বাংলায় অনুবাদ হইয়াছিল—'ত্রিদিব-চ্যুতি' মহাকাব্যের পুণ্ড্র-সন্ধান পর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। গৌরীভার রাখালদাস সেন ভট্টের Lay of the Last Minstrel-কে 'শেষবর্ষীর গান' নাম দিয়া অনুবাদ করেন; মুলের সহিত এই অনুবাদ প্রাতি চরণে মিলাইয়া দেখিতে পারা যায়।

দশবর্ষ সে পথ বাতাস গীতল,
প্রাচীর ছুঁয়া গারক ভায়;
লোল গণেশ হুস্তল ধবল,
ছিল ভাগ্যবান প্রকাশ পায়।
একমাত্র বীণা তাঁহার সখল,
রয়েছে অদাখ শিত্তর করে,
একমাত্র তিনি গারক কেবল
জীবিত আছে গীতের তরে।

কিছা অন্তঃ,—

আছে কি মানব কেহ হেন দুহুতি,
আগুনারে নিজে বেই রলেসি কখন,
এই দেশ, এই মোর দেশ, হুঁমতি,
অন্তরে জ্বল যায় আলেনি তখন,
গৃহস্থে পদ হবে করে সন্ধান,
হুঁমতি বহন করিয়া জ্ঞান?

... ..

দেখিতে বহুশি চণ্ড মেদুরেল কেমন,
বাও, মেখ দিয়া এরে কোহুদী উলসে,
কেননা প্রথমরাশি হুঁমতি কিরণ,
সেবার ইহার বত মোহন সবে,
কাল হরে শোভে বত খিলান খবর,
ভক্তক হুঁ হর কিনা-বালাল।

ইংরেজী মুলের সহিত বাংলা অনুবাদের ত্রুটি-ত্রুটি মিল আছে; বাংলায় অনুবাদের নিষ্ঠা, বৈদ্য ও ইংরেজী কাব্যানুবাদের পরিচয় অনুবাদের পাই, বসিও পাঠককে ইহা বলিয়া দিতে হইবে না যে ইহা মহাকাব্য নহে।

মেঘনাদবধ কাব্যের অনুসরণ অথবা অনুকরণে করেছিলেন কাব্য রচিত হয়। এই জন কবি তাহার পরিশিষ্ট পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছেন; এক জনের নাম রাজকৃষ্ণ সুভদ্রা, এবং তাঁহার সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়া কেহ এত দূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে ইহার কাব্য বাংলা ভাষার বিশেষীয় যুদ্ধকৌশল কবির মেঘনাদবধকেও পরাস্ত করিয়াছে। প্রথম সর্গ হইতে কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিলে পাঠক ইহার ছন্দের ধরণ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিবেন :—

পুত্রের সংকার করি দশানন বলী,
উত্তরিল মণিময় ভবনে কাণ্ডর,
নৃত্যময় রাজ্যলার হেরিলা চৌদিকে,
অধোমুখে ধরাসনে তাজি দীপধার,
কপাল বিভ্রাস করি করতলে, যেন,
মুষ্টিমান শোক আসি ধরাভালে, ধরি
রক্ত রূপ বসিয়াছে বর্ণ ললাধামে।

ইত্যাদি

আর একখানি পরিশিষ্টের নাম 'দশাননবধ মহাকাব্য'। ১৩০০ সনে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় কিন্তু প্রচার হয় না, সুভদ্রা ১৩১০ সনে সাহিত্যসভা হইতে ইহা যখন পুনরায় প্রকাশিত হয় তখন ইহার কাব্যভাঃ দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছিল। মেঘনাদবধের পরিশিষ্ট হইলেও ইহা অনেকটা প্রোচা আদর্শে রচিত। ইহা দশ সর্গে সম্পূর্ণ, এবং বথারীতি মজলাচরণ করিয়া অঙ্গুর হইয়াছে। কবি ছন্দোনির্মাণে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, নিজে ২১ প্রকার ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার রচিত গীতিকল্পে (বর্ণনাদিতে এই ছন্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন) প্রথম সর্গের স্থচনা করিয়াছেন :—

চমকি বিশ্ব মনবার্ণা-পূর্ণা-নুপ রজনী-রাজ্য অবলম্ব,
উপিত জনপাণি-কলক-সক'গরি গগি মন্বলিবর্গে।
দীপ্তরসিচর সৈন্যনিচর (বিদ্যমুখাধি বিনিলে)
অশিল হতকর-পতিত-রজনিকর-বোদ্ধ-মিকর উডুৎলে

ইত্যাদি

আর একখানি বাংলা মহাকাব্যের নাম 'উল্লেখযোগ্য'; বিনোদপুরবাসী পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি নিবাস্ত-কব্যবধ নামে সমুদ্র সর্গে এক মহাকাব্য রচনা করেন, তাহাকে তিনি "An Epio" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রকাশকাল ৩০ আশ্বিন, ১৭৯১ শকাব্দ। রচনা কিছু সংকত মহাকাব্যের লক্ষণগুলোই হইয়াছে। মেঘনাদ-

বধ প্রথম প্রকাশিত হইলে যখন নব্যাদপদে তাহার দুইলাই প্রশংসা হয়, মহেশচন্দ্র তখন তাহার প্রতিবাদ করেন এবং 'সোমপ্রকাশে' লেখেন যে নব্য মহাশয় নূতন ভাষা 'আবিষ্কৃত করিয়াছেন' এবং মেঘনাদবধ কাব্যে মলকার-শাস্ত্রমতে দোষও বহুতর। মহাভারতের জনপদাভ্যন্তরিত নিবাস্তকব্যবধ পণ্ডিতমহাশয়-রচিত এই অভিনব মহাকাব্যের মূল; উর্ধ্বলীর অভিশাপ যে অশী বীররসের পরিপন্থী বলিয়া বজ্রিত হইল, প্রেধকার তাহা জানাইয়াছেন। "নব্যপ্রোচা" তাঁহার আদৌ মনঃপূত ছিল না, তাহা উৎসর্গ-পত্রের কথার বিবৃত করিয়াছেন; "নব্যপ্রোচাসূত্রে প্রেধ-খানি কাহারও নামে উৎসর্গ করা আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু তাহিয়া হির করিতে পারিলাম না যে, প্রেধের কোন অংশ আমি উৎসর্গ করিব। প্রেধের বহু তো আমারই থাকিবে।" এই মুক্তি আমাদের নিকট অভিনব চৈকিবে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনোভাবের পরিচয় পাই। কবি সরস্বতীকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন এবং মলকারশাস্ত্রাসূত্রে সর্গান্তে ছন্দ পরিবর্তন করিয়াছেন। কবির ছন্দোনিপুণ্যের পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত পদ্যাংশ হইতে পাওয়া যাইবে :—

এ হেম বচন তুমি পুনরপি কাকনি
প্রণমি পুরন্দর পদযুগলান্তে,
বিষাঘহ-হত-সহিত হরিবদুত
গশিল গিয়া স্তত বিদ্যা নিশান্তে।
সমরসাজ সব পরিহারি পাণ্ডব
সৌখল্যল বসি কোমল তলে।
শান্তি করিল হত হইয়া অভিরত
বহুসনে রণ-বিঘরক জলে ॥

৭

বিশ শতাব্দীতেও বাংলা-সাহিত্যে যে উৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচিত হইতে পারে তাহা করিকৃষ্ণ বোগীক্রনাথ বহু প্রমাণ করিয়া দিলেন। বোগীক্রনাথ ইতিপূর্বে রাইকেল মনুসমন রতের ভীকী রচনা করিয়া ব্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, জীবনের সারাছে তিনি পর-পর 'পৃথীরাজ' ও 'শিবাজী' নামে দুইটি মহাকাব্য রচনা করেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য, অধেশপ্রেমিক হিন্দুকে তাহার সমাজের পতন ও উদ্ধারের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া, আশা,—যদি কোন হিন্দু "জাতীর অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান ও প্রতি-

বিধানের উপায় অবলম্বনে” প্রকৃত হন। বিধর-নির্বাচনে ও কাব্য-রচনার কবির ঐতিহাসিক জ্ঞান ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় এইরূপে পাওয়া যাইতেছে। আর মহাকাব্যের স্বীকৃতরূপ যে মহাভারত, তাহাও আভাসে আভাসে পড়িতে গেলে ক্রমেই পরিস্ফুট হয়। “কৌতুক শক্তি নহে নিরস্ত্রী বিশ্বের”—ইহা তিনি অন্তরে বিকাশ করেন। পৃথিবীর প্রাচীনে তিনি মহাশূন্যে কম্পহীন স্পন্দহীন প্রমাণিত বোঝে সন্ত মহাকবি মহাপ্রভুর যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা কল্পনার পরম উৎকর্ষ সূচিত করিতেছে। কবি সর্গে সর্গে হৃদয়ের বৈচিত্র্য আনিতে চাহিয়াছেন, এবং হৃদ্য বাহ্যে তারুণ্যসূচী হয়, সে-দিকেও তাঁহার দৃষ্টি আছে। স্বর্গোপেক্ষা হ্রষ্টব্য এই যে, কবি আশাবাদী; মিল্টন যেমন মামব্রাডোর চরম সুক্তির কথা বলিয়াছেন, যোগীন্দ্রনাথও তেমনি আদ্য হিন্দু জাতির নিকট ভবিষ্যতে সুক্তির কথা বলিয়াছেন,—তবে প্রায়শ্চিত্ত চাই, সে প্রায়শ্চিত্তের জন্য পশ্চিমে যে বনাইয়া আসিয়াছে, কাটিকা আসিতেছে। তাহা, তাব, বন্ধার—সকল বিষয়ে যোগীন্দ্রনাথ মহাকবির আসনে বসিবার যোগ্য, এবং তাঁহার জাতীয়তা শুধু কপিকের পুত্র নহে, তাহা দীর্ঘদিন অমৃতবর ফলে ভাবধন হইয়া অন্তরে বিরাজ করিতেছে,—

ত্রিংশ বর্ষকাল, সেবি!

দামচিহ্ন তব

রাখিয়াছি চোকে চোকে;

পুর্বেছি গোপনে;

জানে না অপর কেহ,

কিন্তু জানে তুমি।

নিবাজী রচিত হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। ইহা কুড়ি সর্গে বিভক্ত; প্রাচীনে কবি সমস্ত কাব্যটির মূর বাধিয়া দিয়াছেন,—সহাদ্রিশিখরে গভীর রক্তস্রোতে পুষ্পশয্যে সন্ত চিরজীবীর অন্ততম ভার্য্য, গৌরীশঙ্করের পুত্র

করিতেছেন, হিন্দুর পুত্র যৌবন পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু অশরীরী বাধী নৈতিক বিধানের প্রতি অক্লি-সঙ্কেতে হিন্দুর পুনরুদ্ধারের কথা সঙ্কেতে জানাইতেছেন,—আর নুতন যুগের স্বাধীন দুটিগাছে বৃদ্ধ ভৈরবী ব্রাহ্মণের মুখে,—

মহেশ-স্বজাতি-রক্ষা সর্বধর্মোত্তম।

৮

যোগীন্দ্রনাথের মহাকাব্য বর্তমান শতাব্দীর অমূল্য সম্পদ হইলেও পাঠকসমাজে ইহার তেমন আদর সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না কেন, তাহার কারণ চিন্তা করিলে রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদীর কথা মনে হয়,— “মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অক্লি-স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও কিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী এ-কালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বৃষ্টি একেবারে চলিয়া গিয়াছে।” আমাদের সমাজে পিরামিডের দিন চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই মুখে তাহার প্রশংসা করি, কিন্তু অন্তরে তাহার সাড়া পাই না। এখানে মহাকাব্যের মধ্যে অক্লি-স্বাভাবিকতা মহাপ্রভুর হোমরকেই ধরা হইয়াছে। আমরা যে-সকল মহাকাব্যের প্রধানতঃ আলোচনা করিলাম, তাহাদের বাধ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের সঙ্কেতে এই মন্তব্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তিকে নানা প্রকারে ফুটাইয়া তোলা, আর সমস্ত সমাজের মূখপাত্র হইয়া কবি হইয়া তাহার আদর্শ স্পষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য করিয়া ধরা,— এই দুইয়ে প্রভেদ রহিয়াছে, এবং এই প্রভেদের জন্যই আমরা বর্তমান যুগে মহাকাব্যের প্রশংসা করি, কিন্তু আদর করি না।

অবোধ

শ্রীশশধর রায়, এম-এ, বি-এল

সকলেই হবোধ নহে, মানবসমাজে অবোধ অনেক আছে। অবোধগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :— প্রথম শ্রেণীর অবোধগণের প্রকৃত বয়স বাহাই হউক, তাহারা বুদ্ধিতে, বিশেষতঃ আত্মরক্ষা করিবার শক্তিতে, দুই বৎসর অথবা তাহার কম বয়সের শিশুর ত্যায়। ইহাদিগকে প্রায় জড় বলিলেই হয়। আমেরিকার এই প্রথম শ্রেণীর অবোধগণকে ইডিট (Idiot) নাম দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণ সাত বৎসর অথবা তাহার কম বয়সের বালকের ত্যায়। ইহাদিগকে ইম্বেসিল (Imbecile) নাম দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর অবোধগণ বার বৎসর অথবা তাহার কম বয়সের বালকের ত্যায়। ইহাদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে মোরন (Moron)। অনেক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর অবোধগণের কথা ভাল করিয়া ফুটে না। ইহারা সমাজ কারণে রাগে, ক্রোধে এবং প্রায়শঃ আহার বেগী করে। ইহাদিগের মলমূত্র ত্যাগের স্থান অস্থান বিবসনা নাই, লজ্জার ভাব হয় নাই, ভয় কিছু হইয়াছে, বিশেষ নহে। ইহাদিগকে কিছুই শিক্ষা দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণকে হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া যায়, যদিও অত্যন্ত কঠিন। যে-সকল হাতের কাজে বুদ্ধি খাটাইত হয় না, শুধু নকল করিলেই চলে সেই সকল হাতের কাজ প্রায়শঃ শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে অনেক সময় লাগে। ইহাদিগের মতের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। ইহারা সকল কথাই বলিতে পারে এবং ইহাদিগকে একটু পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর অবোধগণকে মোটামুটি ভালই লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া যায়, এমন-কি ইহাদিগের দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণকে শিক্ষা দেওয়ার কার্য ভালই চলিতে পারে, কারণ ইহাদিগের ধৈর্য খুব বেগী।

তিন শ্রেণীর অবোধগণই মনে শিশুর ত্যায়। দেখে ও বসে বসে বড়ই হউক না কেন ইহাদিগের মন বয়সের অমুরূপ

বাড়ে না। দেখে বাড়ে, মন বাড়ে না। সচরাচর যে-সকল ধর্ম্মীকার ব্যক্তিগণকে মানব বলা হয়, তাহারা বেহে বাতক না, কিন্তু মনে বাড়ে। তাহাদিগের মন অনেক কেরে বয়সের অমুরূপই হইয়া থাকে।

গত আশ্মান-যুদ্ধে আমেরিকা যখন বোম্ব দিয়াছিল তখন সৈনিক-বিভাগে ভর্তি করিয়া লইবার সময় যে-সকল ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাহাতে জানা গিয়াছিল যে, সতের লক্ষ পরীক্ষার মধ্যে শতকরা পঁয়তাল্লিশটি তৃতীয় শ্রেণীর অবোধ ছিল। অর্থাৎ সতের লক্ষ লোকের মধ্যে ৭,৬৫,০০০ হাজার লোক বুদ্ধিতে এবং আত্মরক্ষা-শক্তিতে বার বৎসর বয়স্ক বালক অপেক্ষা অধিক উন্নত ছিল না। এই সকল ব্যক্তি কথাবার্তার আচার-ব্যবহারে সাধারণ লোকের মতই ছিল; তাহারা অবোধ বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল না। দশ জনের মতই আমেরিকার যখন এই প্রকার অবোধ তখন এতদেশে উহা অপেক্ষাও অমূহুরত অবোধ মনে করা বাইতে পারে। আমরা যে অর্ধেকের অধিক লোক দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালকের প্রকৃতির ত্যায় তাহা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, কোন কোন কবি ও উপন্যাস-লেখকগণ, কোন কোন নাট্যকার ও সিনেমা ও টকী প্রদর্শকগণ উত্তমরূপেই জানেন। কবি কুন্তিবাস বসন ও তাহার লেখা বিবরে নানারূপ হাতকর ভঙ্গী লিখিয়া লোক-চরিত্রের অভিজ্ঞতা এত দূর দেখাইয়াছেন যে, তাহার গ্রন্থ আজি আমাদের ঘরে ঘরে। কালীদাস দাসের মহাভারত অপেক্ষা কুন্তিবাসী রামায়ণের কণ্ঠস্থি অনেক অধিক। বিজ্ঞাপনদাতাগণ প্রায় সকলেই সংবাদ-পত্রে অথবা পথে পথে বেরূপ চ ও ভঙ্গী করিয়া বিজ্ঞাপন দেয় তাহাতে বুঝা যায় যে, তাহারাও আমাদের মতই বার বৎসর বয়সের অধিক বয়স মনে করেন না।

মোটামুটি সঙ্গত-অসঙ্গত কাহোর জ্ঞান পিতা মাতা দ্রাভা অথবা অস্তের সহিত আচার-ব্যবহারে হুনীতি, হুনীতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম বার বৎসর বয়স্ক বালক একরূপ

শিখিয়া উঠে। সে যে-পরিবারে ও যে-সমাজে প্রতিপালিত হয় তারূপ হইয়াই গড়িয়া উঠে। এই বয়সের পরে সাধারণ বালকগণ অধিক কর্মকুশলতা শিক্ষা করিয়া থাকে, সত্য। কিন্তু বার-তের বৎসরের মধ্যেই বয়োবৃদ্ধগণের ভাব ও কর্ম অমূকরণ করতঃ বালকগণ অধিক শিক্ষা করে। তৎপরে উল্লিখিত বিষয়ে তাহাদের আর অধিক শিক্ষা করিবার থাকে না।* এ-কথা শুনিতে কিছু আশ্চর্যবিত হইতে হয়। কিন্তু কথা সত্য।

আমরা দেখিলাম মানবসমাজের কমবেশী প্রায় অর্দ্ধাংশ ব্যক্তি বালক-প্রকৃতি, বৎসর গণিলে তাঁহাদিগের বয়স বাহাই হউক। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ অনেকেই এইরূপ। তাঁহারা কবি হইলে এবং কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক হইলেও বালকের ভাই কিছু অস্থিরমতি এবং বালা-স্বভাবাবদ্ধ হইয়া থাকেন।

এইরূপ হইবার কারণ কি? পূর্বে ইহার অনেক কারণ অনুমান করা হইত, কিন্তু এক্ষণে প্রধান প্রধান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, অবোধগণ দুর্বলমনা; তাহাদিগের মস্তিষ্কের কোন কোন কেন্দ্র দুর্বল অর্থাৎ বয়সের অরূপ পুষ্টিপ্রাপ্ত হয় না। এইরূপ হইবার প্রধান কারণ বংশাশ্রুত। দুর্বলমনা অবোধগণের দুই-তৃতীয়াংশ বংশাশ্রুতের ফল। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সম্ভবতঃ শিশুকালে কোন কঠিন পীড়ার পীড়িত হইয়াছিল অথবা কোন দৈবদ্রষ্ট্যের [অর্থাৎ হঠাৎ উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া বাগুয়া কিংবা অন্ত কোন অজ্ঞাত কারণে] এইরূপ হইয়া থাকিবে। এইরূপ অজ্ঞাত কারণমধ্যে পিতামাতার অতিরিক্ত মর্যাদা অথবা উপরোক্ত পীড়ার পীড়িত হওয়ারূপে ধরা বাইতে পারে না। এই দুইটি এখন আর অপত্যের অবোধ অবস্থার কারণ বলিয়া গণ্য হয় না।

মানব বংশাশ্রুত ও বেটনীর ফল। ডাক্তারের সময়

* We have had time before 13 to take over the standardized sentiments of our elders, to learn all that they know, to accept their views of religion, politics, manners, general proprieties and respectabilities. The common run of mankind can, however, be taught tricks as time goes on and acquire special expertness. But a great part of our childish conceptions retain a permanent hold on us.—*Ecce, Brit.* 14 Edition. Vol. 5, Article "Civilization."

বাহাই বিবেচিত হইয়া থাকুক, পণ্ডিতবর তাইজমানের (Wiseman-এর) সময় হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, বেটনীর ফল বংশাশ্রুত হয় না। ভূমির্ভূ হইবার পর হইতে জাতকের দেহে ও মনে বাহিরের ক্রিয়ার ফলে যত প্রতিক্রিয়াই হয় তাহাকে বেটনীর ফল বলা যায়। বেটনী বলিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝা যায়। জাতক জীবিতকালমধ্যে দেহে ও মনে যে প্রতিক্রিয়া প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বাহ্য লাভ করে বা অর্জন করে, তাহা বংশাশ্রুত হয় না। আমেরিকার অল্পসংখ্যক জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যতীত দীর্ঘস্থানীয় জীবতত্ত্ববিদগণ এই মত এক্ষণে অঙ্গীকার করিতেছেন। সোপাঙ্কিত লক্ষণ-সকল বংশাশ্রুত নহে, ইহাই এ-মতের স্থূল কথা।

বংশাশ্রুত পুংকীট* ও স্ত্রী-ভিষের† সংমিশ্রণের ফল। জরায়ু-মধ্যে পুংকীট ও স্ত্রী-ভিষের মিশ্রণ-সময়ে জন্মের দেহে ও মনে যে উপকরণ সঞ্চিত হইল জাতক সমস্ত আয়ুষ্কালমধ্যে তদতিরিক্ত এমন কিছুই পাইতে পারে না বাহা তাহার পুত্র-পৌত্রাদিতে সংক্রমিত হইবে, এবং এই উপকরণ হইতে কিছু বাদ দেওয়াও অসম্ভব। ভ্রূণ-তত্ত্বের আলোচনার পণ্ডিতগণ এ-কথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুংকীট ও স্ত্রী-ভিষের কেন্দ্রবিদ্যুৎ মধ্যে যে-সকল বক্র আঁশ‡ থাকে তদ্ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ পদার্থই বংশাশ্রুতের নিয়ামক। কিন্তু এ-সকল কথা আর বিশেষ ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই।

মস্তিষ্ক একটি যন্ত্র নহে। বহু যন্ত্রের সম্মিলনে মস্তিষ্ক গঠিত হয়। মস্তিষ্কের যে অংশ যে ক্রিয়া করে সেই অংশে এই ক্রিয়া নিপন্ন হইবার উপযোগী কেন্দ্র আছে। যথা—দৃষ্টিকেন্দ্র, শ্রবণকেন্দ্র, বুদ্ধিকেন্দ্র** প্রভৃতি। এই কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ঘূর্ণকর্ণ ত্তরে নিহিত থাকে। কোন একটি কেন্দ্রের ক্রিয়া নষ্ট অথবা মন্দ হইয়া গেলেও অন্ত কেন্দ্রের ক্রিয়া উত্তম থাকিতে পারে। মস্তিষ্ক পদার্থই জীবাত্মার বাহ্য বিকাশের যন্ত্র। মৃত্যুর মস্তিষ্কের যে কেন্দ্র নষ্ট অথবা মন্দ হইয়া যায়, সেই কেন্দ্রের উপযোগী কর্ম সম্বন্ধেই

* Spermatosoon.

† Ovary

‡ Nucleus

§ Chromosome.

** Glen-kinaesthetic centre.

ব্যক্তি অবোধের জায় প্রতীকমান হইতে পারে, অল্প কেন্দ্রের কর্ম সম্বন্ধে নহে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রথম শ্রেণীর অবোধগণের প্রায় সকল কেন্দ্রেরই ক্রিয়া অকৃত্রিম মন্দ হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও কম্পেন্সের সবল থাকিতে পারে, যদিও জ্ঞানেন্দ্রিয় জড়বৎ হইয়া যায়। মস্তিষ্কের প্রান্তিক কেন্দ্রের সহিত তত্ত্বাবোধী স্নায়ু-তন্ত্রের যোগে কতিপয় কম্পেন্সের পেশীমণ্ডল সংযুক্ত থাকে এবং তাহাতেই স্নায়ুর ক্রিয়ামুসারে পেশী ক্রিয়াবান হয়। এই হেতু পক্ষ কম্পেন্সের স্ব-স্ব উপযুক্ত স্নায়ু-তন্ত্র অধীন। সুতরাং স্নায়ু-তন্ত্র জড়বৎ হেতু পক্ষ কম্পেন্সেরই জড়বৎ প্রাপ্ত হয়। প্রথম শ্রেণীর অবোধগণের এই ভাব।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রসকল এত দূর নিষ্ক্রিয় নহে। তাহাদিগের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রই কতিপয় স্নায়ু কর্মঠ। তৃতীয় শ্রেণীর অবোধ আমরা প্রায় সকলেই। আমাদিগের সকল মস্তিষ্ক-কেন্দ্রই কর্মঠ। কিন্তু বার-বের বৎসর বয়সের মধ্যেই উহাদিগের প্রতিক্রিয়া জ্ঞান সম্বন্ধে প্রায় শেষ হইয়া আসে; যদিও কর্মকুশলতা সম্বন্ধে তাহাদিগের ক্রিয়া গড় পঞ্চাশ-পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত সবল থাকে। তৎপর অনেক ক্ষেত্রেই হুর্ললতা আসিয়া পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণের মধ্যে একরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে লিখিতে বা পড়িতে শিবিবার যোগ্যতা নাই; কিন্তু গত এক শত বৎসরের মধ্যে কোন্ মাসের কোন্ তারিখে কি বার ছিল তাহা মুখে মুখে শুদ্ধরূপে বলিয়া দিতে পারে। কেহ-বা সহস্র বা অসুত সংখ্যক রাশিকে একরূপ রাশি দিয়া গুণন করিলে গুণফল কি হইবে তাহা অতি কম সময়মধ্যে মুখে মুখে বলিয়া দিতে পারে; অল্পে কাগজ-কলম লইয়াও তত কম সময়ে বলিতে পারে না।*

প্রথম শ্রেণীর অবোধকে আমরা মানুষের মধ্যে গণ্য করিতে পারি না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধকে আমরা অত্যন্ত বেদুখ বলি। তৃতীয় শ্রেণীর অবোধদিগকে

প্রথমে চেনা যায় না; কারণ তাহারা বশ জনের মতই। কিছু দিন দেখিবার পর তাহাদিগকে বোকা বলিয়া চেনা যায়। তিন শ্রেণীর অবোধই প্রধানতঃ বংশাশ্রুতসের ফল। একথা পূর্বেও বলিয়াছি। যদি বর এবং কত্তা কিংবা বর এবং কত্তার বংশ অযোগ্য অথবা অতি-অযোগ্য হয় তবে তাহাদিগের অপত্য কম-কম্পী অবোধ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যে-বংশে কৃত্তী ব্যক্তি জন্মেই নাই, যে-বংশের ব্যক্তিকে স্বগ্রামের লোকেরাও যোগ্য বলিয়া মনে করে না, যে-বংশের লোক পুঁথিগত শিক্ষা অথবা কোন প্রকার কর্মশিক্ষার কিংবা কর্মকুশলতার স্বগ্রামেও কখনও প্রশংসা লাভ করে নাই তেমন বংশের বর অথবা কত্তা হইতে পর বংশ গঠিত করিতে গেলে সেই পর বংশে কেহ নুনানিধি অবোধ হইবেই। অতি-যোগ্য ও কৃত্তী বংশের সহিত উপরে লিখিত অযোগ্য বংশের উচ্চাধিক সংমিশ্রণে অপত্য জাত হইলেও একল কলিতে প্রায় সর্বদাই দেখা যায়। আর যদি ছুই বংশই উপরের লিখিত অর্থে অযোগ্য হয়, তবে ঐ দুই বংশজাত ব্যক্তির যৌন-সংমিশ্রণে প্রথম শ্রেণীর অবোধ জন্মিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। আমি ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। কিন্তু নাম উল্লেখ করা সম্ভব হইবে না। আমি একটি ক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্তও দেখিয়াছি। পিতা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কৃত্তী, মাতাও বুদ্ধিমতী, কিন্তু ভরানক নিষ্টুর। ইহাদিগের অপত্য সকলেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কৃত্তী; কিন্তু একটি পুত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধ অর্থাৎ অত্যন্ত বেদুখ হইয়াছিল।

যাহা হউক, ব্যক্তির উন্নতি করিতে গেলে, সুতরাং সমাজকে উন্নত করিতে হইলে যোগ্য বংশ হইতেই বরকত্তা বাছিয়া লইয়া বিবাহ দিতে হয়। নচেৎ অল্প পন্থা নাই। আমাদিগের জায় যে-সমাজে বিবাহক্ষেত্রে অত্যন্ত সর্বাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং যোগ্য বংশের বরকত্তা বাছিয়া লইবার অবসর ও সুবিধা নাই, সে-সমাজকে উন্নত করিবারও পন্থা নাই। বর্ত পিত্ত বিবাহক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায় ততই আমাদিগের সমাজ।*

* Thus an imbecile who had not learned to read or write was able to give accurately the day of the week for any date in the past century. Another was able to multiply mentally four or six place numbers in less time than most normal persons could do with pencil and paper. *Ency. Brit.* 14th Edition, Vol. 21, 489.

* এই প্রবন্ধে গন্দন (Endocrine Secretion) বাজাতের বে-
ভাবে ব্যক্তির বিভিন্ন হ্রস্প্রবৃত্তি 'কমে' তাহার উন্নয়ন করিবার না;
পূর্বে পত্রাঙ্কে তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম।

শ্রোত-বদল

ঐপারুল দেবী

অন্নদা লেখে ভাল। ছোট গল্প লেখার তার হাত বেশ পাকা। সেই আই-এ ক্লাস থেকেই সে ছোট গল্প লিখে আসছে, এখন চাকরিতে ঢুকলে ছোট গল্প লেখার তার লেখনীর মুক্ত ধারা বাধা পায় নি। ‘বিজলী’ মাসিক-পত্রিকার সম্পাদক মাসের প্রথম সপ্তাহ যেতে-না-যেতেই অন্নদাকে ভাগান্না পাঠান লেখা পাঠাবার জন্য। আগে আগে চার পরসার খামে করে ভাগান্নার পত্র আসত, সম্প্রতি হান্ডলির পাঁচ পরসার দাম হওয়াতে পোটকার্ডই আসে। অল্প এক মাসিক-পত্রে ‘বিজলীর’ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল,—“এ-মাসে বিজলীতে যে-সকল গল্প কবিতা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমালোচনা করিতে গেলে কেবল নিদ্রাই করিতে হয়, অতএব সে অগ্রিয় কাঁদাই না করাই ভাল। ভাগ্যে অন্নদা বাবুর ‘চোখের জল’ গল্পটি ছিল, তাই বিজলী এবারকার মত তরফা গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় দেখিতেছি পত্রিকার নামটি সার্থক বিদ্যাহিষ্টেন। হন অঙ্ককারের মধ্যে পাঠক যখন নিশাহারা হইয়া যায়, তখন ‘চোখের জল’ গল্পটির পাতারূপ আকাশে একবার অপিকের জন্য বিজলী-প্রভা চমকাইতে দেখিয়া চোখ একটু আলো দেখিয়া বাঁচে—অবশ্য তাহার পরেই আবার নিমিত্ত অঙ্ককার।”

অন্নদা সমালোচনা পড়ে বোমকে ডেকে শোনায়; বললে, “দেখচি, কি লিখচে?” বোমটি হাসিমুখে বললে, “সত্যি দাদা, তোমার ‘চোখের জল’ গল্পটা পড়ে চোখের জল না-কেলে থাকি! বার না, এক জল হয়েছে। তা আর ভাল বলবে না?”

অন্নদার লেখনী ‘চোখের জল’ থেকে ‘বিদ্যাসের রাজি’—‘বিদ্যাসের রাজি’ থেকে ‘মৃত্যুপারে’তে অন্নদার হয়ে চলতে থাকে। বিজলীর সম্পাদক মহাশয় সেবককে উৎসাহিত করে তিনি লেখেন, পারিশ্রমিক থেকে ক্ষতি করেন না। মাঝে মাঝে করণ-কর্যা পাঠিকাল্পত্রাদির নিকট হতেও

অভিনন্দন-পত্র আসে—“আপনার বিবাদপূর্ণ লেখা পড়ে মনে হয়, না-জানি আপনার গভীর ক্ষয়ের মাঝে কত ব্যথাই লুকান আছে। আপনার সেই গভীর হৃৎখণ্ড আপনার লেখনীর হৃৎ হৃৎ পরিষ্কৃত। এই অপরিচিতার সহানুভূতি অগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।” অন্নদা উত্তরে লেখে, “আপনার করুণাপূর্ণ সহনরতার আমি ধন্য হইয়াছি। এ পৃথিবীর মধ্যে হৃৎখণ্ড কেবল চিরস্থায়ী, নিম্নের জীবনে আমি তাহা অত্যন্ত সত্য বলিয়া জানিয়াছি। সুখ, হাসি, আনন্দ সকলই দু-দিনের—কিন্তু অনাদি কাল হইতে যে মৃত্যুশোক ও বিচ্ছেদ-ব্যথার চোখের জলে এ বিরহী পৃথিবী ভাসিয়া গেল, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার সেই প্রাণের ব্যথাই যদি নিজের মর্ষ দিয়া অনুভব না-করিতে পারিলাম, তাহা হইলে বুখাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি—” ইত্যাদি ইত্যাদি। পৃথিবীর সকল হৃৎখণ্ড ও শোকের কাহিনী অপকে শোনাবার তার থাকে নিরে অন্নদা একটা মহা আনন্দপ্রসার লাভ করে।

সে-মাসে অন্নদার অর হয়েছিল, সময়-মত গল্প পাঠান হয় নি। সম্পাদকের ভাগান্নার পর ভাগান্নার পত্র বোমটি দাদাকে তার অরের মধ্যেই পড়ে শোনার। মা বলতেন, “হ্যাঁ রে, কিসের এত চিঠি? ছেলেটা ক-দিন অরে যেবে, এখন কেন ওসব দিস ওকে?” বোমটি মাকে বুঝিয়ে বলত, “দাদার লেখা না হ’লে কাগজখানা যে চলে না আর। বেশের এই অবস্থায় একখানা মাসিক-পত্র চন্দান রক্ত সহন কথা নয়—এই সেদিন কাগজে যেখান ‘রাখী’ উঠে গেল; আবার কাল শুনি ‘সেবা’ হ’লে মাসিক-পত্রটাও না-কি উঠে বাচে। ‘বিজলী’ কাগজখানা এই দাদার লেখার জন্তেই টিকে আছে—তাইই বোমকে না-জানির কি করি? পরের দিকেও ত থাকতে হয়।”

মা অতপত বোমেন না—রেনে বলেন, “বেবে দে

বাছা তোমের বিজলী-কিভলী। মাখার কটে ছেলেরা খুন হচ্ছে, তার উপর বিনরাত এই লেখা আর লেখা— অর সারবে কি ক'রে? কাগজ উঠে গেল ত বয়েই গেল। কাগজ নিয়ে ত বাড়িতে খজা দেব না।”

অন্নদা বললে, “হুনি, তুই ঐ চেয়ারটা খাটের কাছে টেনে বোস, দরজাটা ভেজিয়ে দে। লিখে নে, আমি বলি। থাকে ভাই বলিস নে কিছু, বকবেন। দেখচিসই ত একটা কাগজের তার আমার হাতে, কি ক'রে চুপ ক'রে থাকি বল? না ত বোঝেন না এসব।”

‘হুখে সাধনা’ নাম দিয়ে গল্প শুরু হয়ে গেল। গল্পের শেষের দিকটা লিখতে লিখতে হুনীতির চোখের পাতা ভিলে আসে। সে চোখ মুছে হেসে বললে, “দাদা তুমি বড় হুখের কথা লিখতে ভালবাস কিন্তু। একটাও গল্প কি বাপু হুখে-সুজেনে শেষ করতে নেই?”

অন্নদা বললে, “জানিস্‌নে, Sweetest songs are those that tell of saddest thoughts?”

অর সারল। গল্প-লেখা অবাধেই চলছিল; ভাই লিখত বোনকে পড়ে শোনাত, বোন চোখের জল আঁচিলে মুছে হেসে বলত, ‘কি হুম্মর লিখেচ দাদা।’ দাদা হাসিমুখে গল্পটা বিজলীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিত। ঠিক সময়ে গল্পটি ছাপার অক্ষরে কাগজে বাহির হ'ত— নানা দিক থেকে নানা রকম চিঠিপত্র আসত—কোনও গোল ছিল না। গোল বাধালে বৌ এসে।

অন্নদার বিয়ে অনেক দিন হয়েছে। কিন্তু এত দিন তার বিবাহের যুগ চলছিল। গল্পের বিবাহের যুগের সমস্তটা কালই বৌটি ছিল বাপের বাড়ি। ছোট মেয়ে, অন্নদার বাপ বললেন, “আহা থাক কিছু দিন বাপ-মার কাছে। এ-বর তো চিরদিনই করবে—তাড়া কি?” কিন্তু এবার বৌ এল। এখনও ছোটই আছে। নাম লীলা। নুতন খুন্সরবাড়ি এসে মাঝে মাঝে কাদে, জিজ্ঞাসা করলে গাল ফুলিয়ে বল, “মার জন্ত আর টুলুর জন্ত বন কেমন করছে।”

বৌ বাপের বাড়ির জন্ত কারাকানি করছে শুনে অন্নদার মনটা খুব এসজ হয়ে উঠল না সত্য, কিন্তু সে তাবুক নাহক, কনকে যোঝালে—তা হোক এই ত

ভাল। যে-মেরে আজকের বাস, আজন্ম-পরিচিত লীলাপ ভাই-বোনকে ছেড়ে এসে হু-দিনে তাদের ভুলে বাস, নুতন গৃহকে আপনার ক'রে মনের মধ্যে নিতে বাপের হু-দিনও লাগে না, তাদের মনের গভীরতা কোথায়? হু-দিনে যারা বাপের বাড়ির মেহ ভুলতে পারে, আবার হু-দিনে যে তারা খুন্সরবাড়ির মাদিও ভুলবে এ আর আশ্চর্য্য কি? তার চেয়ে এই ভাল। লীলার ক্ষয় আছে, ক্ষয়ে করণা আছে, করণায় গভীরতা আছে। হালকা মন অন্নদা ভালবাসে না।

হুনীতিকে ডেকে পুরানো ‘বিজলীর তাড়া’ বাহির ক'রে তার হাতে দিয়ে অন্নদা বললে, “হুনি, এগুলো দিস তোর বৌদিকে পড়তে। তার মনে খুব মাঝ— আমার লেখাগুলো বেছে দিস, পড়ে তার ভাল লাগবে নিশ্চয়।”

বিকালে আপিস থেকে এসে জলধাবার খেয়ে এ-মাসের বিজলীর জন্ত লেখা সন্ধ্যা শেষ করা গল্পটার আর একবার অন্নদা চোখ বুলাচ্ছে, এমন সময়ে হুনীতি ঘরে ঢুকে বললে, “দাদা, বৌদি তোমার ‘চোখের জল’ আর ‘মৃত্যুপারে’ গল্প দুটো পড়ে এমন বান-ডাকানো কান্না কাঁদছিল যে কি বলব। বাবা কান্না শুনে এ-বরে এসে রেগে কত বকলেন তোমাকে—তুমি ত ছিলে না—শোন নি। সব বিজলীগুলো নিয়ে গিরে কোথায় চাষি বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছেন নিজের ঘরে। বৌদিকে সার্কলি দেখাতে নিয়ে গেছেন এখন। এমন মেয়ে বাবা, তখনও হু'পিরে হু'পিরে কাঁদছিল।”

অন্নদার মনটা ধড়াস ক'রে উঠল। শুকনুখে জিজ্ঞাসা করলে, “কি বলছিলেন রে বাবা?” হুনীতি বললে, “বললেন, ছ-বছর ধরে আপিসে প্রোমোশন বন্ধ, সেদিকে ছেলের খেয়াল নেই, এদিকে এই সব ছাই-পাশ-বস্ত বিহেটরী গল্প লেখা হচ্ছে। ভারী লিখিয়ে হয়ে উঠেছে মেঘতে পাচ্ছি। তা বা লেখে নিজেই কেন পড়ে ব'সে। মেয়েটা একেই কেঁসে সারা, কোথায় ছেলোমারবকে একটু ভুলিয়ে রাখবে তা না এই-সব চোখের জল রে মৃত্যুপারে রে এর বাড়ে এসে চাপাল!—এই সব কত কি। বৌদি বোরী অভ্যন্ত যোকে না দাদা, তুমি কেন

ওকে ও-সব গল্পেতে দিতে গেলে? শান্তি কি সবাই রাখে?”

জন্মে এক বেশী কল্যাণ, কল্যাণ আবার এক বেশী রকম গভীরতা অন্নদার ভাল লাগল কিনা ঠিক বলা যায় না। রাগে নতুন লেখা ‘মনের ব্যথা’ গল্পটা হাতে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল; শীলকে নিজে পড়ে শুনিতে তাকে ভাল ক’রে বুঝিয়ে দেবে যে ব্যথার ‘টাচ্’ না থাকলে গল্প কখনও ভাল হয় না।

শীলা হয়ে এলে অন্নদা তাকে বড় ক’রে খাটে বসিয়ে নিজে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। পকেট থেকে লেখা কাগজগুলো বার ক’রে জিজ্ঞাসা করলে, শীলা একটা গল্প জ্ঞানবে? শীলা ঘাড় নেড়ে জানাল জ্ঞানবে।

অন্নদা বললে, “কিন্তু তুমি আজ শুনলাম বিজলীতে লেখা আন্নার গল্প প’ড়ে নাকি বড় কৈঁছেছ? আবার এখন কীভাবে না ত?”

শীলা কথার উত্তর দেওয়া বোধ করি আবশ্যক বিবেচনা করলে না। কিন্তু অন্নদা থামে না, কেবলই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, “কি শীলা কীভাবে না ত? বল না, কীভাবে না ত?”

শেষটা শীলা উত্তর দিলে, “হুংখের কথা শুনলেই আমার বড় কান্না পায় যে। আমি কি করব, চোখের জল সামলাতে পারি না।”

অন্নদা সামান্য হুঁ করে বললে, “হুংখের কথার কান্না আসে সে ত ভাল কথাই শীলা। বার ভাল লেখক তারা সকলেই হুংখের কথা লেখে, আর বার ভাল পাঠক, তারা সকলেই হুংখের কথা প’ড়ে কাঁদে, কিন্তু তাই ব’লে কি এমন কান্না কাঁদতে হয় যে ঘরে লোক জড় হয়ে বার? হিঃ!” শীলা চুপ করেই রইল। ভাব রেখে মনে হ’ল যে বৃষ্টি আবার কীভাবে কথাই ভাবচে।

অন্নদা বুঝিয়ে বললে, “আমি এই রকম কল্যাণ গল্প ভাল লিখতে পারি ব’লে সব কাগজে যে-কোনো লেখকের কত প্রশংসা করে। হাসিকোটকের লেখা হ’ল যেখানে যেখানে—বাসের মন গভীর, তার কখনও ও-রকম হাসিকা লেখা লিখে আনন্দ পায় না। তুমি কি চাও না

যে আমি এক জন ভাল লেখক ব’লে লোকসমাজে আদর পাই?”

শীলা ঘাড়টি নেড়ে বললে, “হ্যাঁ।”

উৎসাহিত হয়ে অন্নদা বললে, “আচ্ছা, তাহ’লে এই গল্পটা প’ড়ে তোমাকে শোনাই, কেমন? লেখবে একটি মেয়ে মনের ব্যথা মনে রেখে রেখে দেবে আর সহ করতে না পেরে কি রকম ক’রে আত্মহত্যা ক’রে হুংখের হাড় এড়াল। পরের হুংখ নিজের জ্বর দিয়ে বৃষ্টি তবে এসব লেখা লিখতে হয় শীলা, এ বড় শক্ত জিনিষ। তুমি বড় হ’লে বুঝবে সব। এখন গল্পটা পড়ি, শোন। মন দিয়ে মেয়েটির মনের ব্যথা বুঝতে চেষ্টা কর, কিন্তু কেঁদো না, কেমন?”

শীলার কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

অন্নদা পড়তে লাগল—মলিনা গরিবের মেয়ে; উদয়াস্ত সংসারের খাটুনি খাটে। মা-বাপ পয়সার অভাবে মেয়ের বিবাহ দিতে পারে না। সেজ্ঞ তার মেয়েকেই দোখী মনে করে, নানা কষ্ট কথা শোনার। মেয়েটি ভাল খেতে পায় না, পরতে পায় না, একটু ভাল কথাও কান্নার কাছে শুনতে পায় না। শেষে একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হ’ল। মলিনা অনেক আশা করছিল এইবার তার বাপ-মায়ের তার কমবে, তার নিজেরও হয়ত হুংখ খুঁচবে। সমস্ত দিনের অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যে, কষ্টের মধ্যে, অভাবের মধ্যে সে ঐ আশাহীক মনে আঁকড়ে ধরে দিন কাটাত। এমন সময়ে হঠাৎ সে ধর পেল যে, সেই ছেলেটির তারই এক বছর মজা বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। সে মেয়েটি সকল দিক দিয়েই মলিনার চেয়ে ভাল পাঞ্জী, তাই ছেলেটি এখানে বিয়ে করবে না ব’লে পাঠিয়েছে। একখানা ক্ষুদ্র চিঠিতে নিজের কুহ ও অনাদৃত জীবনের পরিসমাপ্তির কারণ অত্যন্ত কল্যাণ ভাবে মা-বাপকে জানিয়ে মলিনা বিব খেয়েছে—এইখানেই গল্পেরও পরিসমাপ্তি।

কিন্তু শেষ অবধি অন্নদার আর এগোন হ’ল না। মলিনার হুংখে শীলার এখন থেকেই গ্রাণ কাঁদছিল, তবু কোনও রকমে চুপ ক’রে নিজেকে সামলে ছিল এতকণ। কিন্তু যেন মলিনা চিঠি আরও কয়েকে, “না জগদীশ্বরি আমি কেবলই তোমাদের জন্যে জিহাদি—” শীলার কান আর ব্যথা

মানিল না; সে আচলে মুখ ঢেকে হুপিবে কেঁরে উঠল। অন্নদা দেখা কেনে চোরার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, “জারে চুপ, চুপ, চুপ। ও লীলা, ও কি করত? মা-বাবা এই পাশের ঘরে—খাম খাম, ছিঃ! এ যে গল্প—এ যে মিথ্যা—বানান কথা। কীদছ কেন? ও লীলা—”

লীলা কীদতে কীদতে বললে, “তুমি মলিনাকে বিব খাওয়ালে কেন? শুধু শুধু একটা প্রাণ নষ্ট করা। কেন তুমি ত ইচ্ছা করলেই ওর সঙ্গে সেই ছেলোটোর বিয়ে দিয়ে দিতে পারতে। তুমি বড় নিষ্ঠুর—তোমার কেবল সকলের মনে কষ্ট দিতেই ভাল লাগে—হ্যাঁ, আমি বুঝেছি। তোমার মায়ী নেই মোটে—!”

লীলা কীদতই লাগল। অন্নদা দ্রুতভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি যে করবে ভেবে পেলেন না। পাশের ঘরেই মা-বাবার গলা শোনা যাচ্ছে—হুপু-একবার বহুনির পালা হয়ে গেছে, আবার যদি বাবার কানে এখন এই কান্না যায় তাহলে এই বুড়ো বয়েসে ঘোঁরের সামনে বাপের কাছে মার খাওয়া কপালে থাকা কিছু বিচিত্র নয়। অন্নদা লীলার পাশে বসে পড়ে অভ্যস্ত সন্তানার ঘরে বললে, “না, না, লীলা তুমি বুঝতে পারচ না। আচ্ছা, সে তোমার আমি আর এক দিন এমন ভাল করে বুঝিয়ে দেব, তুমি এখন চুপ কর লক্ষ্মীটি। বাবা কান্নাকাটি মোটে ভালবাসেন না, জানই ত—এই পাশের ঘরে রয়েচেন, এখনই শুভতে পাবেন। কেঁদো না ছিঃ! একটা গল্প শুনে এত কান্না! বড় দুঃখিল বাহালে তুমি। শেখ কি তোমার পায়ে ধরতে হবে।”

পাশের ঘরে খণ্ডর-মহাশয়ের উপস্থিতির কথা জেনেও লীলার মনে কোনরূপ ভাবান্তর হ’ল না। স্বামী বখন সভাই পারে হাত ধিল সে সমানে কোঁপাতে কোঁপাতে ভাঙা গলার বললে, “তুমি ও-গল্প বললে হাও। মলিনার লীলার এই ছেলোটোর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। তা হলেই ত সব হুথের হুই—কেমন খাসা গল্পটি হয়। ও মরামরি কান্নাকাটি আমি মোটে সইতে পারি নে। তুমি ও-সব হিঁড়ে কেন, ও-রকম গল্প আর কখনও শিখো না।”

লীলার কোঁপাশি-কিছুতে খামে না দেখে নিরুপায় হয়ে অন্নদা কাপড়গুলো তুলে নিয়ে বললে, “আচ্ছা

বাপু আচ্ছা, দিচ্ছি সব কেটে; এখন দয়া করে খাম তুমি লীলা। মরবে না মলিনা—হবে তাইলে? বাপ রে, বাপ রে, ভাল লোককে দেখা পড়ে পোরাতে এসেছিলাম!—এই নাও, এই দেখ, কেটে দিয়েছি, হ’ল?”

লীলা চোখ মুছ বললে, “বেশ করেচ। এ-রকম হুথ-কটের কথা আর লিখবে না ত?”

অন্নদা বললে, “অবুঝ হয়ে না লীলা। এটা না-হয় তোমার কষ্ট হবে ব’লে বললে দিচ্ছি, কিন্তু তিরকাল আমি এই রকম কল্প ধরপেরই গল্প লিখে আসছি—এইতেই আমার নাম—এ-রকম গল্প লিখে আমি কত প্রাণসাপত্ত পেরেছি, তোমার এক দিন দেখাও সব। এখন একেবারে হঠাৎ লেখার ধারা বদলাব কি করে? এটা দেখ, এই কেটে দিয়েছি—মলিনার বিয়ে দিয়ে দেব আবার, তাইলে খুশী ত?”

লীলার গলা আবার কান্নায় ভেঙে এল—“এত করে বলছি, তবু শুনবে না? অল্প লোককে কষ্ট দিয়ে বিয়ে বত নাম কেনা—কি হবে এমন নাম নিয়ে? তোমার কি দরমায়ী নেই একটুও? নাম বড়, না মাহুয বড়?”

কান্নার শব্দ আবার পাশের ঘরে শৌছবার উপক্রম দেখে অন্নদা হতাশ হয়ে বললে, “আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি আর কেঁদো না লীলা, খাম। এবার না-হয় আর কটের কথা লিখব না। ‘হুথ-বছকে’ বাস করিতে লাগিল’ ব’লে গল্প শেষ করে দেব সব, তুমি চুপ করলে এখন বাঁচি—বাপ রে, এমন জেলী মেয়েও ত দেখি নি কোথাও। যা ধরবে তাই, আর না হলেই চীৎকার কান্না। ভাল বিপদেই পড়েছি। আমার বন্দান সব গেল।”

সেই থেকে অন্নদার শ্রোত ফিরেচে। অপরিচিত সন্দেহা পাঠিকার কাছ থেকে চিঠি এসেচে, “আপনার গভীর জ্ঞানের অন্তলক্ষ্যী হুথের আভ্যকারের মধ্যে কণে কণে যে বিস্ময়ী-চমকের স্তার আনন্দের আভা আজকাল দেখা যায়, তাহা হইতে মনে হয় আপনি এত দিনে বুঝি এ-গুণিবার হুথের খনির সম্মান খুঁজিয়া পাইয়াছেন।”

বাবার বহুনি ও লীলার কান্নার ভয়ে কত হুথ বে তাকে হুথের খনির সম্মান করিতে হয়েছে তা অন্নদাই বোঝে।

মাক্ত্রিক জগৎ

শ্রীমুকুন্দরঞ্জন দাশ, এম-এ, পিএইচ-ডি

কোন জ্যোৎস্নার রজনীতে আকাশের দিকে দুটিপাত করিলে সমগ্র আকাশকে অসংখ্য জ্যোতিষ্কপাখিচিহ্ন অতি বিস্তীর্ণ একখানি চিত্রপটের ন্যায় দেখা যায়। যেসকল জ্যোতিষ্কপাখি আকাশকে ব্যাণ্ড করিয়া বহিরাছে, তাহাদিগকে 'নক্ষত্র' বা 'তারা' কহে। নক্ষত্রপদের আলোক অতি ক্ষীণ; যখন আকাশে চন্দ্র উদ্ভিত হয়, তখন তাহার আলোকে পৃথিবী আলোকিত হয়, কিন্তু চন্দ্রের অভাবে অসংখ্য তারা একত্র মিলিত হইয়াও পৃথিবীকে তাহার শতাংশের একাংশ আলোকিত করিতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে তারাসকল চন্দ্র অপেক্ষা অল্প উজ্জ্বল নহে। উহার বহু দূর অবস্থিত বলিয়া উহাদের আলোক ক্ষীণ দেখার এবং অত্র কোন তীক্ষ্ণ আলোকের নিকট উপস্থিত হইল উহাদিগকে একেবারেই দেখা যায় না; এই কারণে দিব্যভাণে সূর্যের আলোকে আকাশে কোনও তারাক দৃষ্ট হয় না। অন্ধকার রাত্রিতে যত তারা দেখিতে পাওয়া যায়, জ্যোৎস্নার রজনীতে তত দেখা যায় না; তাহার কারণ তারার আলোকের তুলনার চন্দ্রের আলোক তীক্ষ্ণতর।) বৎসরের মধ্যে কোন কোন সময়ে সন্ধ্যাকালে একটি তারাগ্রহকে পশ্চিমাকাশে সর্বাপেক্ষা অধিক দীপ্তমান দেখা যায়, ইহাকে 'সন্ধ্যাতারা' কহে। ইহার দীপ্তি সকল সময়ে সমান থাকে না; যখন তাহা অত্যন্ত প্রখর হয়, তখন উহাকে সূর্য্য অস্ত বাইবার বহু পূর্বে যুক্ত নেত্রে দেখা গিয়া থাকে। আবার কোন কোন সময়ে একটি উজ্জ্বল তারাকে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে দীপ্তি পাইতে দেখা যায়, ইহাকে 'সূর্য্যোদয়' বা 'প্রভাতী-তারা' কহে। কিন্তু আসলে 'সূর্য্যোদয়' ও 'সন্ধ্যাতারা' উভয়েই এক। উহার গতিবশতঃ উহা সূর্য্যের নিকটে থাকিয়া কখনও সূর্য্যের অগ্রবর্তী হয় এবং কখনও সূর্য্যের পশ্চাৎগামী থাকিয়া যায়। যখন সূর্য্যের অগ্রগামী হয়, তখন উহা সূর্য্যের পূর্বে উদিত হয়, এই সময়ে

উহা 'প্রভাতী-তারা' বলিয়া অভিহিত হয়। কখন কখন প্রভাতী-তারাকে সূর্য্যোদয়ের কিকিৎ কাল পরেও আকাশে দেখা যায়। পূর্বাংশে ও অপরাহ্নে সূর্য্যের তেজ মধ্যাহ্নের তার প্রখর নয় বলিয়া, সূর্য্যোদয়ের পরে ও সূর্য্যাস্তের পূর্বে কিছু কাল সূর্য্যালোকের আপেক্ষিক ক্ষীণতা হেতু 'সূর্য্যোদয়' দিবালোকেও দেখা বাইতে পারে।

সকল নক্ষত্র সমান উজ্জ্বল দৃষ্ট হয় না। গগনমণ্ডলে সাধারণ চক্ষুদ্বারা মোটামুটি ৫০০০ নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দূরবীক্ষণ-সাহায্যে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা আকাশের তারাদিগকে উজ্জ্বলতা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।) সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারাকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়; তাৎপক্ষ্য কম উজ্জ্বল তারাকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়; ইহা অপেক্ষা কম উজ্জ্বল তারাকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়; এই প্রকারে কম কম উজ্জ্বল তারাকে অধিকতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাধারণতঃ যত তারা যুক্ত নেত্রে দেখা যায়, তাহাদিগকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। উত্তর-এবং হইতে বিষুববৃত্তের ৩৫ অংশ দক্ষিণ পর্যন্ত যে শ্রেণীর বস্তুগুলি তারা সাধারণতঃ যুক্ত নেত্রে দেখা যায়, তাহার শ্রেণী-বিভাগ এইরূপ—

প্রথম শ্রেণী	২০টি নক্ষত্র
দ্বিতীয় শ্রেণী	৩৫টি নক্ষত্র
তৃতীয় শ্রেণী	১২০টি নক্ষত্র
চতুর্থ শ্রেণী	৪২৫টি নক্ষত্র
পঞ্চম শ্রেণী	১১০০টি নক্ষত্র
ষষ্ঠ শ্রেণী	৩২০০টি নক্ষত্র
সেপ্টিমারী	৫০০০টি নক্ষত্র

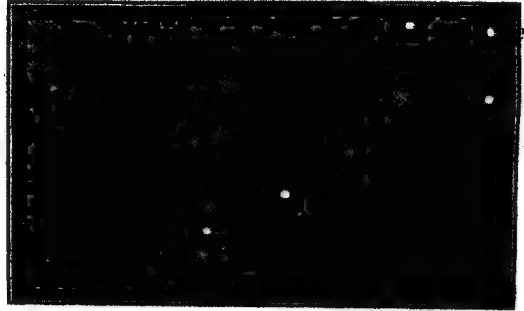
(দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-সহকারে করিলে আকাশে ইহা অপেক্ষা

অধিকসংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, এবং তাহাদিগের শ্রেণী-বিভাগও হইয়া থাকে। এই শ্রেণীবিভাগ অনেকটা ইচ্ছাকৃত, কারণ এক শ্রেণীর নক্ষত্রেরাও আকারে ও বর্ণে বিভিন্ন। আবার সকল মানুষের দৃষ্টিশক্তিও সমান নহে, কাহারও দৃষ্টিশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে তাহারা সপ্তম, অষ্টম এমন কি দ্বাদশ শ্রেণীর নক্ষত্র পর্য্যন্ত মুক্ত নেত্রে দেখিতে পায়। অপর পক্ষে এমন লোকও আছে, যাহাদের দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ যে তাহারা পঞ্চম শ্রেণীর নক্ষত্র দেখিতেও চক্ষুর পীড়া অনুভব করে।

আকাশে এমন নয়টি নক্ষত্র আছে যাহারা ঔজ্জ্বল্যে অপর সকল নক্ষত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু পরস্পরের তুলনায় উহাদের দীপ্তি এত বিসদৃশ যে, তাহাদিগকে কিছুতেই একশ্রেণীভুক্ত করা যায় না, এই কারণে জ্যোতির্বিদগণ ইহাদিগের কোন শ্রেণীবিভাগ না করিয়া, ইহাদিগের নাম ‘বিশিষ্ট তারা’ রাখিয়াছেন। ‘কালপুরুষ’ (Orion) নামে একটি নক্ষত্রমণ্ডল আছে, তাহার পশ্চাৎপদপ্রান্তে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়, ইহা ‘বিশিষ্ট নক্ষত্র’দিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহার নাম ‘লুক্ক’ (Sirius)। হিন্দুদিগের কেল ও পুরাণে কালপুরুষের ছইটি কুকুরের উল্লেখ আছে, এই নক্ষত্র তাহাদিগের অন্ততর বলিয়া পরিচিত। ইউরোপীয় জ্যোতিষেও ইহাকে ‘কুকুর-তারা’ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

যে-যে সময়ে জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রচলন যে-যে দেশে হইয়াছে, সেই সময়ে সেই-সেই দেশে নক্ষত্রের তালিকা ও তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য-মতে সর্বপ্রথম নক্ষত্র-সারণী টলেমির (K. Ptolemaios, আনুমানিক ১৪০ খ্রি:) ‘আলমাজেস্ট’ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। আলমাজেস্টের নক্ষত্রগুলি টলেমির গুরু হিপার্কসের (Hipparchus, ১৮০-১০০ খ্রি-পূ) দ্বারা লক্ষিত হইয়াছিল। হিপার্কসের নক্ষত্রাদি লক্ষনের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, পুরাকালের নক্ষত্রগুলি ঠিক ঠিক স্থানে আছে না সরিয়া গিয়াছে, তাহা সম্যক অবগত হওয়া এবং তাহার পরবর্তী জ্যোতির্বিদদেরাও যেন

তাহাদিগের সময়ে নক্ষত্রসকল কি রকম স্থান অবস্থিত আছে তাহা জানিতে পারেন। হিপার্কসের তালিকার ১০৮০ নক্ষত্র দেওয়া আছে। আলমাজেস্ট পুস্তকে ১০৩০টি নক্ষত্রের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরের



কাসিওপিয়া, স্বাতি ও গেভাসদ

নক্ষত্র-সারণী বাহা আমরা জানি, তাহা উলুবোগের (Ulu Beg) দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইনি তাতার-রাজ তৈমুরলঙ্গের পুত্র। ১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রাহুক্ত হইয়াছিলেন। এই তালিকার নক্ষত্র প্রায় টলেমির নক্ষত্রের সহিত মিলিয়া যায়। এই উলুবোগ সময়কালে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নক্ষত্রের অবস্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ১০১৯টি নক্ষত্রের অবস্থান ইহার সারণীতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পরে টাইকোব্রাহী (Tycho Brahe, ১৫৪৬-১৬০১ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা ১০০৫টি নক্ষত্রের স্থান ঠিক স্থানভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। আধুনিক সময়ে নক্ষত্র-সারণী দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যে-সকল নক্ষত্রের অবস্থান (বিবৃৎশ ও ক্রান্তি) যতদূর পারা যায় সঠিক নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা প্রথম প্রকার সারণীর অন্তর্ভুক্ত; আর যে-সকল নক্ষত্রের অবস্থান অনেকটা কাছাকাছি স্থানে দেওয়া আছে, যাহার দ্বারা নক্ষত্রকে যথাসম্ভব চিনিতে পারা যায়, তাহার দ্বিতীয় প্রকার সারণীর অন্তর্গত। প্রথম প্রকার সারণীতে কুড়ি হাজার নক্ষত্র দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাদিগের অবস্থান অনেকটা সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগে এক হাজ নক্ষত্র দেওয়া

হইয়াছে এবং ইহাদিগের অবস্থান যথাসম্ভব নিভুলভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগের নক্ষত্রের মধ্যে আর্জিল্যান্ডারের (Argelander, ১৭৯৯-১৮৭৫ খ্রীঃ)



কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ

তালিকাই সর্বপ্রধান। উত্তর-ঋতু হইতে বিষুবংশের দুই অংশ দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে-সকল নক্ষত্র আছে তাহাদিগের মধ্যে নবম শ্রেণীর পর্য্যন্ত নক্ষত্র দেওয়া আছে। দক্ষিণ-ঋতুর নিকটস্থ দক্ষিণ-মেরুর নক্ষত্র সম্প্রতি গোল্ড লাঙ্কেবের দ্বারা (Dr. Gould) দক্ষিণ-আমেরিকার কর্ডোবার দৃষ্ট হইয়াছিল।

আকাশে নক্ষত্রদিগকে চিনিয়া লইবার জন্য তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে বিভক্ত করা হইয়াছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কিংবা কোন প্রাণীশেষের আকারে এই সকল মণ্ডল কল্পনা করিয়া, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা—সপ্তর্ষিমণ্ডল, সাতভাই, কালপুরুষ, মিতুন, মেঘ, কর্কট, সিংহ, ধনুঃ, কৃত্ত প্রভৃতি। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম তিনটি মণ্ডল সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত। অপর কয়েকটিকে—পুঞ্জ পুঞ্জ বিভক্ত করিয়া ‘রাশি’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আকাশের নক্ষত্রগুলি গগনমণ্ডলে সমভাবে বিক্ষিপ্ত নাই। যেন স্থানে স্থানে একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই পুঞ্জীভূত নক্ষত্রগুলিকেই এক এক ‘রাশি’ কহে। পুরাকালে লোকেরা এই নক্ষত্রগুলিকে জীবজন্তুর আকারের ছায় কল্পনা করিয়া ইহাদিগের নামকরণ করিয়াছিল, যথা—বৃষের চক্ষু (The eye of the Bull), বৃহৎ খচ্ছের পুচ্ছ, গুরুরণের দক্ষিণ হৃদ প্রভৃতি। আরবরা প্রত্যেক উজ্জ্বল নক্ষত্রের এক একটি নাম দিয়াছিল, অথবা গ্রীকদের নিকট হইতে এই নাম গ্রহণ করিয়াছিল, যথা—সিরিয়স (Sirius),

আর্কটুউরস্ (Arcturus), প্রোসিয়ন্ (Procyon), আল্দিবারান্ (Aldebaran) ইত্যাদি। আরও স্থানে স্থানে অনেকগুলি নক্ষত্র এক কাছাকাছি এবং ঐক্যপভাবে মিলিয়া থাকিতে দেখা যায় যে, তাহাদিগকে নক্ষত্রপুঞ্জ বলা হইয়া থাকে, যেমন, কৃত্তিকা-নক্ষত্র। সাধারণ লোকেরা ইহা অনুমান করিতে পারে যে, কোন এক মণ্ডলে পরস্পরের নিকটবর্তী যে-সকল নক্ষত্র দেখা যায় তাহারা বৃক্ষি ঐক্যপ সম্বন্ধভাবে একটি মণ্ডলাকারে অবস্থিত; বাস্তবিকপক্ষে এই অনুমান অমূলক। কারণ প্রত্যেক মণ্ডলে যে-সকল নক্ষত্র সংস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা পরস্পর হইতে বহু দূরে বিচ্ছিন্নভাবে বিশাল আকাশে অবস্থান করিতেছে। আমাদিগের নেত্র হইতে এই সকল নক্ষত্রে দৃষ্টিরেখা টানিলে তাহাদিগের মধ্যবর্তী কোণ (angle) যত সংকীর্ণ হইবে এই নক্ষত্রগুলিকে ততই পরস্পরের নিকটবর্তী দেখাইবে। যেমন, কোন বহুকোশবাপী হুদীর্ঘ সরল পথের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া উহার অপর প্রান্তের দিকে নেত্র স্থাপিত করিয়া ক্রোশাদিক দূরে অবস্থিত এক জন মানুষ ও তাহা হইতে আর এক ক্রোশ দূরবর্তী অপর এক জন মানুষকে দেখিলে দূরত্ববশতঃ কেবল যে তাহারা ক্ষুদ্রাকার দেখাইবে তাহা নহে, পরন্তু তাহাদিগের পরস্পরের দূরত্বও অসুভব করা যাইবে না, মনে হইবে যেন তাহারা পরস্পরের নিকটে অবস্থিত রহিয়াছে। নক্ষত্রদিগকেও মুক্ত নেত্রে সেইরূপ কাছাকাছি দেখায় বলিয়া তাহাদিগের দৃষ্ট অবস্থান হইতে মণ্ডল কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই সকল মণ্ডল সম্পূর্ণরূপেই মনুষ্যকল্পিত। পরস্পরের তুলনার নক্ষত্রদিগের কোন গতি সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না, এই কারণে তাহাদিগকে ‘স্থির নক্ষত্র’ বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগের দূরত্ব এত অধিক যে, বহু শত বৎসর অধ্যবসায়ের সহিত স্বক্ৰান্তিস্বরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা না করিলে তাহাদিগের কোন স্বকীয় গতি আবিষ্কৃত হইতে পারে না। নক্ষত্রদিগের দূরত্বের তুলনার স্বর্ঘ্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অতি অকিকিৎকার; কোন নক্ষত্র হইতে যদি স্বর্ঘ্য ও পৃথিবীকে বৃগপৎ দৃষ্টিগোচর করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে, পৃথিবী যেন স্বকীয় গায়ে আর সংলগ্ন রহিয়াছে।

সম্প্রতি 'আলোক-দূরত্ব' পরিমাপ করিবার নিয়ম উদ্ভাবিত হইয়াছে; ফুকা (Foucault) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় প্রমাণিত হইয়াছে যে আলোক গতিশীল এবং উহার বেগ সেকেন্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল। আমরা যখন একটা আলোক দেখি, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ আলোকাধার হইতে আলোক একটা পথে সঞ্চরণ করিয়া আমাদের নেত্রে প্রবেশ করিতেছে। যতক্ষণ না এইরূপ ঘটতেছে, ততক্ষণ আমাদের চক্ষু ঐ আলোকের ও আলোকাধারের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। গতিমাত্রই সময়সাপেক্ষ, অতএব আলোক-রশ্মিরও চলিতে সময় লাগিতেছে। প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,০০০

মাইল রশ্মির বেগ এইরূপ মানিয়া লইয়া গণনা করিলে দেখা যায় যে, সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে প্রায় ৮ মিনিটের কিঞ্চিৎমান সময় অতিবাহিত হয়, অর্থাৎ কোনও মুহূর্তে আমরা সূর্যকে ঠিক যে-স্থানে দেখিতে পাই, সূর্য তাহার প্রায় ৮ মিনিট পূর্বে ঐ স্থানে অবস্থিত ছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে পৃথিবীর কক্ষবাসের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক পৌছিতে ১৬ মিনিটের অধিক ও ১৭ মিনিটের কিঞ্চিৎ কম সময় লাগিয়া থাকে। ইহাকে গণনার ভিত্তি ধরিয়া ইহার সহিত তুলনায় কোন নক্ষত্র হইতে আলোক আসিতে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহার দ্বারা ঐ নক্ষত্রের দূরত্বের পরিমাপ হয় এবং ঐ দূরত্বকে সাধারণতঃ আলোক-দূরত্ব বলা হয়। যে-সকল নক্ষত্র মুক্ত নেত্রে দেখা যায় তাহাদিগের আলোক পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, সৌরজগতের সর্কীপেক্ষা নিকটবর্তী যে নক্ষত্র, তাহা হইতে এই জগতে আলোক আসিয়া পৌছিতে প্রায় ৪৫ বৎসর অতিবাহিত হয়। কোন কোন নক্ষত্র হইতে আলোক আসিতে প্রায় বিশ, ত্রিশ, এমন কি পঞ্চাশ বর্ষ পর্যন্ত অতিবাহিত হয়। আকাশে সর্কীপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র 'সূর্য' (Sirius) হইতে সৌরজগতে আলোক আসিতে প্রায় ৬২ বৎসর ব্যয়িত হইয়া থাকে এবং যে নক্ষত্রে 'ঋতারা' রহিয়াছে, উহা হইতে সৌরজগতে আলোক আসিতে প্রায় ৪৬২ বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং আলোক-দূরত্ব গণনা করিলে

সহজেই বুঝা যায় যে, নাস্ত্রিক জগৎ কত দূর বিস্তৃত এবং উহার বিস্তৃতির তুলনায় সৌরজগৎ কত ক্ষুদ্র, আর ইহাও অহমান করা যায় যে নাস্ত্রিক জগৎ যেমন বিশাল, তেমন নক্ষত্রগণও আমাদেরিগের সূর্য্যাপেক্ষা বহু গুণ বৃহৎ। এই



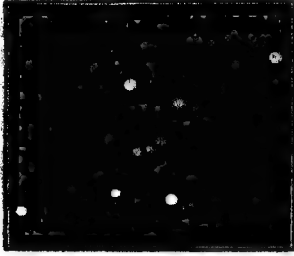
ঋতারা ও কাসিওপিয়া নক্ষত্রদ্বয়

যে ছোটবড় নানা শ্রেণীর নক্ষত্র দেখা যায়, তাহাদিগের আপেক্ষিক আকারের পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। অনেক নক্ষত্র আকারে বৃহত্তর হইয়াও দূরত্বের অধিকাবশতঃ ক্ষুদ্রতর দেখা যায়। বাস্তবিকপক্ষে নক্ষত্রজগতের সীমা নির্ধারণ করা এখনও পর্যন্ত মানুষের সাধ্যাতীত রহিয়া গিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আকাশের মধ্যে মধ্যে নক্ষত্র-গুলি পৃষ্ঠীভূত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং সেই ধারণায় উহাদিগের আকার, নাম ইত্যাদি কল্পনা করা হইয়াছে। এই একত্রস্থিত নক্ষত্রগুলিকে নক্ষত্ররাশি বলা হইয়াছে। এই নক্ষত্ররাশিদিগের নামকরণ কি প্রকারে হইল এবং কখন, কোথায় ও কি অভিপ্রায়ে এই নাম দেওয়া হইল তাহা জানিবার বাসনা স্বতঃই মনে জাগে। কিন্তু উহার সম্ভাব্যজনক উত্তর এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া বিচার করিলে আমাদেরিগের জিজ্ঞাস্ত বিষয়-গুলির উত্তর অনেকটা পাইতে পারা যায়। প্রথম, জনশ্রুতি (folk-lore); দ্বিতীয়, লিপিবদ্ধ প্রমাণ (documentary evidence); তৃতীয়, আসিরিয়া দেশে এই সম্বন্ধে কি মূল প্রমাণ পাওয়া যায়, ইউক্রেটজ্ উপত্যকার সম্প্রতি যে স্মৃতিমন্দির বা ধোমিত প্রস্তরাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে বাহা জানা যায়; চতুর্থ, নক্ষত্ররাশির নিজেদের মধ্যেই কি প্রমাণ পাওয়া যায়।

সূর্য ও চন্দ্রের স্তায় আকাশের অধিকাংশ নক্ষত্র

প্রতিদিন পূর্বদিকে উদ্ভিত হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। বসন্ত, তাহার বে দল বঁধিয়া এইরূপ ভাবে পৃথিবীকে বেঁধন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এমন নহে; পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্তনই ইহার কারণ। কিন্তু



পূর্ব, কালপূর্ব, যোহিগী

আকাশের উত্তর-ভাগে পৃথিবীর ক্ষিতিক হইতে কিছুদূরে একটি নক্ষত্র দেখা যায়, তাহার কখনও উদয়াস্ত ঘটে না বলিয়া মনে হয়, উহা নিয়ত একস্থানে থাকে; ইহাকে 'ঋতারা' বলা হয়। যেমন কেহ নিজে নিজে ঘুরিবার সময় তাহার মাথার উপরস্থিত কোনও দ্রব্যের দিকে তাকাইলে দেখিতে পায় যে, সে বস্তু দ্রুতবেগেই ঘুরিতে থাকুক না কেন, সেই দ্রব্যটিকে আদৌ ঘুরিতে দেখা যায় না; সেইরূপ ঋতারাও ঘুরিতে দেখা যায় না বলিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পৃথিবী ঐ ঋতারার দিকে মাথা রাখিয়া ঘুরিতেছে। ইহার নিকটে যে-সকল নক্ষত্র আছে তাহাদিগের উদয়াস্ত ঘটতে দেখা যায় না; তাহার এক অহোরাত্রে একবার ঋতারাও প্রদক্ষিণ করিয়া চলে, এই কারণে ইহাদিগকে 'ঋতর-তারা' (circumpolar stars) বলা হয়। ঋতর-তারাদিগের মধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডল (The Great Bear or the Dipper) সর্বাধিক বিখ্যাত। সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারাই অতি সহজে চিনিয়া লওয়া যায় এবং ঋতরার জ্ঞান না থাকিলে এই মণ্ডলের সাহায্যেই ঋতরার সন্ধান জানিতে পারা যায়।

(আকাশে নক্ষত্রাংশির সহিত পরিচয় নিয়মিত উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে। প্রথমে, উত্তর-ঋতর নক্ষত্রগুলি দেখিতে হয়। দেখিবার সময়ে প্রথমেই

সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা চাই। এই সপ্তর্ষিকে ঋক্ষ (The Great Bear or the Dipper) বলা হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে ঋক্ষ ও পূর্নহ নক্ষত্র যোগ করিয়া যে সরল রেখা হইবে, তাহা পুচ্ছের যে-দিকে উন্নতদিক সেই দিকে বর্দ্ধিত করিলে যে উত্তর নক্ষত্রে আসিয়া মিলিত হইবে, সেই নক্ষত্রই ঋতারা (Pole Star)। এই মণ্ডলটি দিগ্‌নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কারণ ঋতর-নক্ষত্র জানিতে পারিলে উত্তর দিক জানা গেল এবং অল্প দিক্‌গুলিও জানিবার অসুবিধা রহিল না। এই মণ্ডলটির একটি চিত্র প্রদর্শিত হইল; ইহাতে তারকাংশ যোগ করিয়া রেখা টানিলে দেখা যায় যে, ঐ রেখা ঋতর-নক্ষত্রে আসিয়া মিলিয়াছে।

ইহার পর লঘুসপ্তর্ষি (The Little Bear) বা ছোট ঋক্ষ দেখিতে হয়; এই ছোট ঋক্ষের পুচ্ছের শেষের তারা ঋতর-নক্ষত্র। পরে কাসিওপিয়া দেখিতে হয়; ইহাকে লেডি ইন্‌ দি চেয়ার (Lady in the chair) বলা হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে ঠিক W অক্ষরের জায়। পাশ্চাত্য পৌরাণিক মতে সিম্বিসের (ঐহাও একটি নক্ষত্রাংশি) রাণী কাসিওপিয়া; আকাশে ইনি যেন একটি প্রকাণ্ড সিংহাসনে বসিয়া হুকুমজারি করিতেছেন। পরে পার্সিয়াস (Perseus), সিম্বিস, কামোলোপার্ড, দিহ, ড্রেকো (দৈত্য) ও লাস্টা (টিকটিকি) দেখিতে হয়। কতকগুলি নক্ষত্রাংশি কয়েকটি বিভিন্ন সময়ে দেখিবার সুবিধা হয়। ২১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রি, ২১ জানুয়ারি রাত্রি দশটা, ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত্রি আটটা ও ২১শে মার্চ সন্ধ্যা ছয়টার সিগনাস (রাজহংস), সিম্বিস, কাসিওপিয়া, পার্সিয়াস, অরীক্স (সারথি), বুধ, মিতুন, কালপূর্ব, কেনিস্‌ মাইনর (ছোট কুকুর), কেনিস্‌ মেজর (বড় কুকুর), আর্গো নেভিস (আর্গো জাহাজ) ও কর্কট নক্ষত্রাংশি দেখিতে হয়। কালপূর্ব এখন প্রায় মাধ্যাহ্নিকে স্থিত। ইহাতে প্রথম শ্রেণীর দুইটি নক্ষত্র ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চারিটি নক্ষত্র আছে, মধ্যে তিনটি নক্ষত্র এক রেখায় অবস্থিত; এই ত্রয়ের তিনটি নক্ষত্রকে ইয়ুজিথাস অর্থাৎ বোকার কটদেশ (belt) বলা হইয়া থাকে; প্রথম শ্রেণীর একটি নক্ষত্রকে আর্ক্স-নক্ষত্র (Betelgeuse) নামে অভিহিত করা হয়,

দ্বিতীয় উজ্জ্বল নক্ষত্রটিকে Regal আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথমটি বোদ্ধার ক্ষমতার দিকে, আর দ্বিতীয়টি বোদ্ধার পায়ের দিকে। কেনিস্ মাইনর নক্ষত্র রাশিতে প্রোসিয়ন্ (প্রাণ) উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কেনিস্ মেজরে সিরিয়াস্ (লুন্ধক) নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই সর্কাপেক্সা উজ্জ্বল নক্ষত্র। সুব রাশিতে ক্লডিকা-নক্ষত্র (Pleiades) অবস্থিত, ইহাকে সাত-ভাই চম্পা কহে। আবার ২১শে মার্চ মধ্যরাত্ৰিতে, ২০শে এপ্রিল ১০টা রাত্ৰিতে, ও ২১শে মে ৮টা রাত্ৰিতে কন্ডা, তুলা, বৃশ্চিক, কোমা বেরেনিসী (রাণী বেরেনিসীর কেশদ্বার), বৃজ (ভজ্জক পাল), কেনিস্ ভেনাটিসি (শিকারী কুকুর), করোণা বোরিয়ালিস্ (উত্তর দিকের মুকুট) দেখিতে হয়। আর ২১শে জুন মধ্যরাত্ৰিতে, ২১শে জুলাই রাত্ৰি ১০টার সময়ে ও ২১শে আগষ্ট রাত্ৰি ৮টার সময়ে সিগনস্, লায়রা (বীণা), ভালেইউসা (শূগল), সাগিটা (ধনু), আকুইলা (ঈগল), বৃশ্চিক, ধনু, মকর, হারকিউলিস্, ড্রেকো (দৈত্য) দেখিতে হয়। আর ২১শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্ৰিতে, ২১শে অক্টোবর ১০টা রাত্ৰির সময়ে, ২০শে নবেম্বর ৮টা রাত্ৰে ও ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টার কাসিওপিয়া, সিক্রিস্, সিয়স্, লায়রা, আকুইলা, পার্সিফুস্, অরীজা, পেজাসস্ (Flying Horse), এণ্ড্রোমিডা (স্নাত্তি), সেটুস্ (ছোয়েল্ মৎস্ত) দেখিতে হয়।

আকাশে নক্ষত্রদিগের গঠনে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন নক্ষত্রের অবয়ব নৃংঘের মত জমাট বাঁধিতেছে, কিন্তু কোন নক্ষত্র আবার এখন পর্য্যন্ত বাষ্পাকারে অবস্থিতি করিতেছে। এইরূপ প্রাকৃতিক বিভিন্নতা অনুসারে নক্ষত্রদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা যায়। দূরবীক্ষণের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির উপরই নক্ষত্রদিগের এই জাতি-নির্ধারন নির্ভর করিয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল নক্ষত্রই এক-একটি আলোক-বিন্দুরূপে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু তীক্ষ্ণশক্তি দূরবীক্ষণেও এখন কোন নক্ষত্র একটি পরিষ্কৃত বিন্দুরূপে দৃষ্ট হয় না এবং অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ভূমিশাখার মত দৃষ্টিগোচর হয়, তখনই উহার বাষ্পীয় অবয়ব উপলব্ধি করা যায়। এমন নক্ষত্রও

দেখা গিয়াছে। তাহা ঠিক আলোক-বিন্দুরূপে নয়নগোচর না হইয়া একখণ্ড ক্ষুদ্র বৃত্ত মেঘের স্তায় প্রাতিভাত হয়; ইহাদিগকে ‘নক্ষত্র’ না বলিয়া ‘নীহারিকা’ বলা হইয়া থাকে। অনেকে অসম্মান করেন যে, উহাদের গঠনকার্য্য



সপ্তর্ষি নক্ষত্রপুঞ্জ

এখনও শেষ হয় নাই, ইহারা এখনও অসম্বদ্ধ বাষ্পকণারূপে অবস্থিত এবং ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া অবশেষে এককালে নক্ষত্রে পরিণত হইবে। আকাশে কোন-কোন স্থানে আবার এমন এক-একটি নক্ষত্র দেখা যায় যাহাকে সাধারণতঃ নীহারিকার মত দেখায়; কিন্তু বিশেষ তীক্ষ্ণশক্তি দূরবীক্ষণের দ্বারা নেত্রগোচর করিলে দেখা যায় যে, তাহা বাস্তবিক অনেকগুলি নক্ষত্রের সমষ্টি মাত্র। মনে হয়, যেন বহুসংখ্যক নক্ষত্র একটি সঙ্ঘীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া পরস্পরের নিকট ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে, ইহাদিগকে ‘নক্ষত্র-স্তুপ’ (star clusters) বলা হইয়া থাকে। ইহারা প্রকৃতই পরস্পর সন্নিবিষ্ট বলিয়া অথবা ইহাদের দৃষ্টিরেখা প্রায় এক দিকে স্থাপিত বলিয়া এইরূপ স্তুপাকৃতি দেখা যায় কি না, তাহা সকল সময়ে স্থির করা সম্ভবপর নহে। হয়ত অনেক-স্থলেই নক্ষত্র-স্তুপ আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এইরূপ অসম্মান যুক্তিসঙ্গত বা সত্য প্রতীপন্ন হইবে না। ক্লডিকা-নক্ষত্রটি (Pleiades) মুক্ত নেত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উহাতে ছয়টি নক্ষত্র রহিয়াছে, কিন্তু দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে উহাতে পঞ্চাশটির উপর নক্ষত্র রহিয়াছে দেখা যায়। পার্সিফুস-নক্ষত্র আর একটি দৃষ্টান্ত, দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের প্রয়োগে দেখা যায় ইহাতে বহুসংখ্যক নক্ষত্র ঘনসন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, উহা একটি চমৎকার দৃষ্ট।

ইহা ভিন্ন আকাশে বৃক্ষ নক্ষত্র বা যমক নক্ষত্র (double stars), তিস্র, চতুরস্র প্রভৃতি বহুবক্ষিক নক্ষত্র (multiple stars), পরিবর্তক নক্ষত্র বা বহুরূপী নক্ষত্র (variable stars) দৃষ্টিগোচর হয়। আকাশে এমন কতকগুলি নক্ষত্র আছে যাহাদিগকে মুক্ত নেত্রে দেখিলে একটি নক্ষত্র মনে হয়, কিন্তু তীক্ষ্ণশক্তি দূরবীক্ষণ-সাহায্যে উহার দ্বিখণ্ড হইয়া দুইটি নক্ষত্ররূপে প্রকাশ পায়। বহুকালের পর্যবেক্ষণে এইরূপ নক্ষত্রের আকৃতি সপ্রমাণ হইয়াছে, ইহাদিগকে বৃক্ষ বা যমক নক্ষত্র বলা হয়। উইলিয়ম হর্শেল প্রথমে এই প্রকার নক্ষত্রের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং পঁচিশ বৎসর পর্যবেক্ষণের পর ইহাদের যমকত্ব সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিদর্শন-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লুব্ধক (Sirius) নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রটির একটি ক্ষীণ সহচর এবং সপ্তর্ষিদিগের মধ্যে এক জনের একটি অতি ক্ষীণ সহচর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আকাশে কয়েকটি নক্ষত্র এমন আছে যে, ইহাদিগকে বিশ্লেষণ করিলে তিন বা তদধিক সংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্ট হয় এবং তাহারা যে তাহাদিগের মধ্যবর্তী কোন নির্দিষ্ট বিন্দুকে বেটন করিয়া চলিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রতীপন্ন হয় যে, উহার বৃক্ষ বা যমক নক্ষত্রের ভ্রায় কেবলমাত্র দ্বিখণ্ড না হইয়া বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের আকর্ষণে পরিক্রমণ করিতেছে; ইহাদিগকে বহুবক্ষিক বলা হইয়া থাকে। নিদর্শন-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লাইরা (বীণা) নক্ষত্রটিতে চারিটি নক্ষত্র পরিলক্ষিত হইয়াছে,—তিনটি শুভ্রাভি, আর একটি

লোহিতাকার; আবার কালপুষ্পের অন্তর্গত একটি নক্ষত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া উহাতে ছয়টি নক্ষত্র দেখা গিয়াছে। আকাশে আরও এক প্রকার নক্ষত্র আছে, তাহাদের উজ্জ্বল্য স্থির নহে; ইহাদিগকে বহুরূপী বা পরিবর্তক নক্ষত্র নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির নির্দিষ্ট সময়ানুসারে উজ্জ্বল্যের পরিবর্তন হয়। এই শ্রেণীর নক্ষত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত দুই প্রকারই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—মিরা (Mira=আশ্চর্য্য) ও আলগল (Algol)। মিরা-শ্রেণীর নক্ষত্রের উজ্জ্বল্য-পরিবর্তনের কাল ৩১ দিন। এই সময়ের মধ্যে উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র হইতে একবারে ষষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্রে পরিণত হয়, তারপর প্রায় পাঁচ মাসকাল উহা একেবারে অদৃশ্য হয় এবং পরে আবার ক্রমশঃ পূর্বাবস্থায় উপনীত হয়। আলগল-শ্রেণীর নক্ষত্রের উজ্জ্বল্য-পরিবর্তনের মোট সময় দুই দিন, কুড়ি ঘণ্টা, আটচল্লিশ মিনিট, পঞ্চাশ সেকেন্ড; এই সময়ের মধ্যে পাসিফুস নক্ষত্ররাশির আলগল-নক্ষত্র দুই দিন ১৩ ঘণ্টার জন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র থাকে, তার পর সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে ইহা ক্রমশঃ চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্রে পরিণত হয়, কুড়ি মিনিট চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্র থাকিয়া ইহা পুনরায় ক্রমশঃ উহার পূর্বের উজ্জ্বল্য লাভ করে এবং সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র হইয়া যায়।

নাক্ষত্রিক জগতের পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা অতি চিত্তাকর্ষক এবং দূরবীক্ষণের সাহায্যে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, নাক্ষত্রিক জগৎ সৌরজগতের তুলনায় কত বিশাল ও কত অদ্ভুত।

দৃষ্টি-প্রদীপ

ত্রিবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৩

এই ঘটনার পরে আমার ভয় হ'ল আমার সেই রোগ আবার আরম্ভ হবে। ও যখন আসে তখন উপরি-উপরি অনেক বার হয়—তার পর দিনকতকের জন্তে আবার একেবারেই বন্ধ থাকে। এই বার বেশী ক'রে লুফ হ'লে আমার চাকুরী যুচে যাবে—সীতার কোন কিনারাই করতে পারব না।

মেজবাবু হিসেবের খাতা লেখার কাজ দিলেন নবীন-মুহুরীকে। তার ফলে আমার কাজ বেজায় বেড়ে গেল—ঘুরে ঘুরে এঁদের কাজে খিদিরপুর, বরানগর, কাশীঘাট করতে হয়—আর দিনের মধ্যে সত্তের বার দোকানে বাজারে যেতে হয় চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার নির্দিষ্ট সময় নেই, দিনে রাতে শুধু ছুটোছুটি কাজ। এই দোকানের হিসেব নবীন-মুহুরীকে বুঝিয়ে দেওয়া একটা ঝগড়া—রোজ সে আমাকে অপমান করে ছুতোয়-নাভায়, আমার কথা বিশ্বাস করে না, চাকরদের জিজ্ঞেস করে আড়ালে সত্যি সত্যি কি দার জিনিষটা এনেচি। সীতার মুখ মনে ক'রে সবই সহ্য ক'রে থাকি।

কার্ত্তিক মাসে ওঁদের দেশের সেই মহোৎসব হবে—আমাদের সকলকে দেশে পাঠানো হ'ল। আমি অনেক আগে থেকেই শুনে আসছি—অত্যন্ত কোভুল দেব ওঁদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাভিমান কি রকম। এখানে এঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি, বাগান, দীঘি, এঁরাই বড় জমিদার। তবে বছরে এই একবার ছাড়া আর দেশে আসেন না। কুজ-নায়েব স্বাকী দশ মাস দেশে মালিক।

খুব বড় কাঁকা মাঠে মেলা বসেচে—এখানকার মেলায়ই বেশী। অনেকগুলো খাবারের দোকান, খানার দোকান, মাছের দোকান।

একটা বড় বটগাছের তলাটা বাধানো, সেটাই না-কি পীঠস্থান। লোকে এসে সেইখানে পূজা দেয়—আর বটগাছটার ডালে ও বুরিতে ইট বাঁধা ও লাল নীল নেকড়া বাঁধা। লোকে মানত করবার সময় ওই সব গাছের গায়ে বেঁধে রেখে যায়, মানত শোধ দেওয়ার সময় এসে খুলে দিয়ে পূজা দেয়। বটতলায় সারি সারি লোক ধর্ণা দিয়ে শুয়ে আছে, মেয়েদের ও পুরুষদের ধর্ণা দেওয়ার জায়গা আলাদা আলাদা।

বড়বাবু ও মেজবাবুতে মোহান্তের গদীতে বসেন—কর্ত্তী নীলাধর রায় আসেন নি, তাঁর শরীর সুস্থ নয়। এঁদের বেদীর ওপরে আশপাশে তাকিয়া, ফুল দিয়ে সাজানো, সামনে ঝঞ্ঝকে প্রকাণ্ড রূপোর থালাতে দিন-রাত প্রণামী পড়চে। দুটো থালা আছে—একটাতে মোহান্তের নজর, আর একটাতে মানত শোধ ও পূজার প্রণামী।

নবীন-মুহুরী বেটারাম ও আমার কাজ হচ্ছে এই সব টাকাকড়ির হিসেব রাখা। এর আবার নানা রকম রেট বাঁধা আছে, যেমন—পাঁচ সিকের মানত থাকলে গদীর নজর এক টাকা, তিন টাকার মানতে দু-টাকা ইত্যাদি। কেউ কম না দেয় সেটা মুহুরীদের দেখে নিতে হবে, কারণ মোহান্তরা টাকাকড়ির সম্বন্ধে কথা বলবেন না।

কাজের ফাঁকে আমি বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম চারি ধারে, সবারই সঙ্গে মিশে এদের ধর্ম্মভরসা। ভাল ক'রে বুঝবার আগ্রহে বাদের ভাল লাগে তাদেরই নানা কথা জিজ্ঞাসা করি, আলাপ ক'রে তাদের জীবনটা বুঝবার চেষ্টা করি।

কি অদ্ভুত ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। কতদূর থেকে যে লোক এসেচে পোটলাপটুনি বেঁধে, ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়েও এসেচে অনেকে। এখানে থাকবার জায়গা নেই, কড় একটা মাঠে লোকে

এখানে-ওখানে এই কার্তিক মাসের হিমে চট, সতরজি, হোগলা, মাছুর গে বা সংগ্রহ করতে পেরেচে তাই দিয়ে থাকবার জায়গা তৈরি ক'রে ভারি তলায় আছে—কেউবা আছে শুধু গাছতলাতে। যে যেখানে পারে, মাটি খুঁড়ে কি মাটির ঢেলা দিয়ে উঠুন বানিয়ে রাখা করচে। একটা সন্নে-গাছতলায় এক বুড়ী রাখা করছিল—সে একাই এসেচে ছগলী জেলার কোন গাঁ থেকে। তার এক নাতি ছগলীর এক উকিলের বাসার চাকর, তার ছুটি নৌ, বুড়ী প্রতিবছর একা আসে।

আমায় বললে—বড় জাগ্রত! ঠাকুর গো বটতলার গোসাই। মোর মালুসি গাছে কাঁটাল মোটে ধরতো নি, জালি পড়ে আর খসে খসে যায়। তাই বন্ বাবার খানে কাঁটাল দিয়ে আসবো, হে ঠাকুর কাঁটাল ঘেন হয়। বললে না—পেত্যয় যাবে ছোট-বড়র এ-বছর সতেরো গণ্ডা এঁচড় ধরেচে গোসাইয়ের কিসুপায়।

আর এক জায়গায় খেজুরডালের কুঁড়েতে একটি বৌ ব'সে র'খিচে। আর তার স্বামী কুঁড়ের বাইরে ব'সে খোল বাজিয়ে গান করচে। কাছে ঘেঁতেই বসতে বললে। তারা জাতে কৈবর্ত, বাড়ি খুল্লা দেলায়, পুরুষটির বয়েস বছর চল্লিশ হবে। তাদের ছোট একটি ছেলে মায়ের কাছে ব'সে আছে, ভারি মাথার চুল দিতে এসেচে।

পুরুষটির নাম নিমচাঁদ মণ্ডল। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই বড় ভক্ত। নিমচাঁদ আমার হাতে একখানা বই দিয়ে বল ল—পড়ে শোনও তো বাবু, দু-জনা দিয়ে মেলা থেকে কাল কেনলায় একখানা। বইখানার নাম 'বটতলার কীর্তন'। স্থানীয় ঠাকুরের মাছাত্ম্যচক তাতে অনেকগুলো ছড়া। বটতলার গোসাই ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এখানে এসে আস্তানা বেঁধেচেন, কলিরাজ ভয়ে তাঁর সঙ্গে এই সন্ধি করলে যে বটতলার হাওয়া যত দূর যাবে তত দূর পর্যন্ত কলির অধিকার থাকবে না। বটতলার গোসাই পানীর মুক্তিদাতা, সর্বজীবের আশ্রয়, সাক্ষাৎ শ্রীহরির একাংশ অবতার।

কলিতে নতুন রূপ ওদ মন গিয়া
বটতলে স্থিতি হৈল ভক্তবল নিয়া
কেনে কহে কলিরাজ, এ বড় বিশ্বাস কাজ
মোর লগা কি হবে গোসাই

ঠাকুর কহিলা হেসে, মনে না করিহ ক্রোশ
ধান ত্যজি কোথাও না বাই।
জীলাম হবল সনে হেথার আসিব
বটতলে স্থানবন স্থিতি করি নিব।

নিমচাঁদ শুনতে শুনতে ভক্তিগদ্যগদ্যকণ্ঠে বললে—আহা! আহা! বাবার কত শীলখেলা!

তার খ্রীও কুঁড়ের দোরগোড়ার এসে বসে শুনচে। মানে বুঝলাম এরা নিজেরা পড়তে পারে না, বইপড়া শোনার আনন্দ এদের কাছে বড় নতুন, তা আবার ধীরে ওরা ভক্ত, সেই বটতলার গোসাই সম্বন্ধে বই।

নিমচাঁদ বললে—আচ্ছা, বটতলার হাওয়া কত দূর যায় দা-ঠাকুর?

—কেন বল তো?

—এই যে বৃক্ষে কলির অধিকার নেই ওর মধ্য, ত কত দূর তাই শুধুচি।

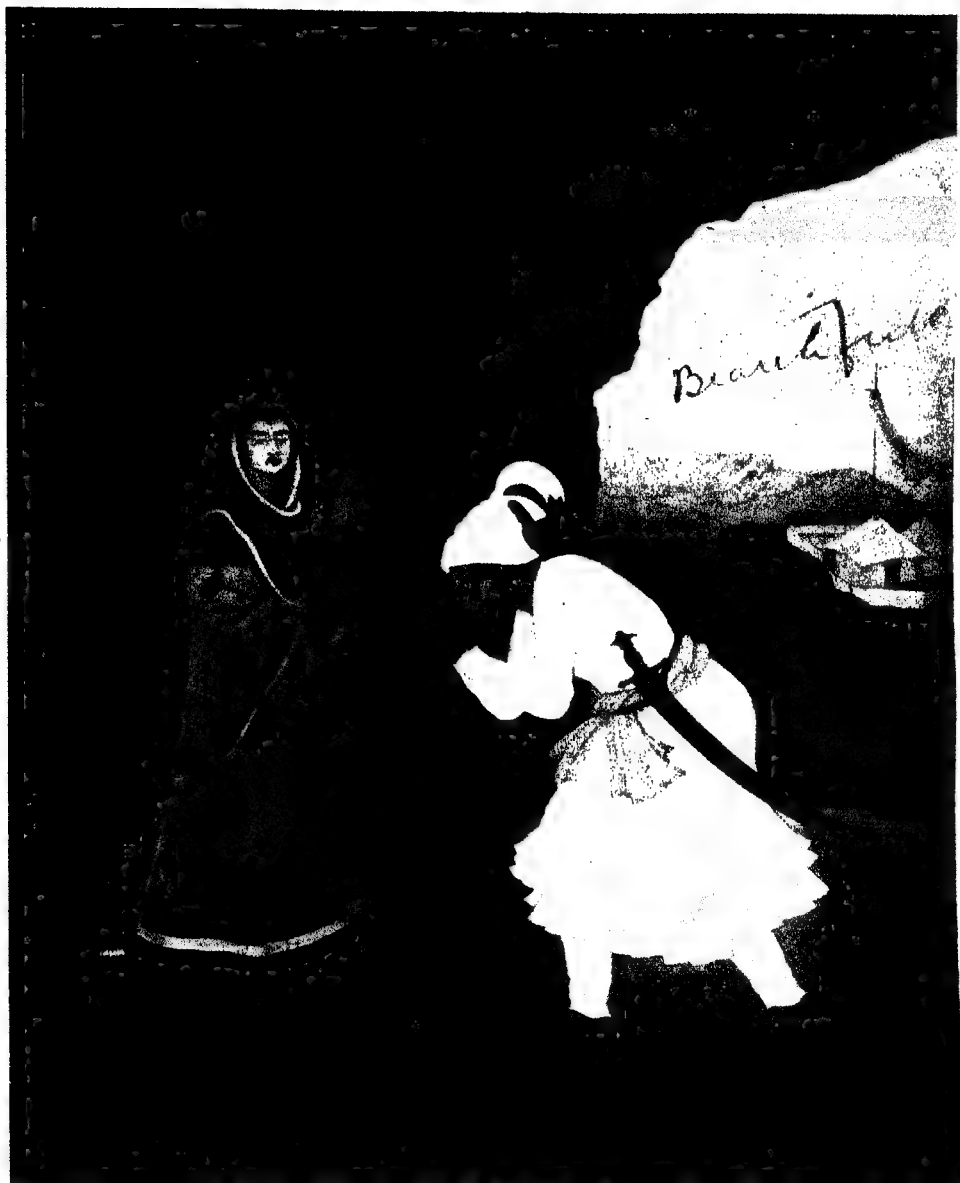
—কত দূর আর, ধর আধ কোশ বড়জোর—

নিমচাঁদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কি ভেবে বললে—কি করবো দা-ঠাকুর, দেশে লাঙল-গরু ক'রে ফেলেচি, কুড়ো-হুই জমিতে এবার বাগুন কইয়ে রেখে এসেচি—নয়ত এ বাবার ধান ত বিন্ধাবন, আপনি পড়লেন—এ স্বগুণে ছেড়ে বিলির মোঘের মত বিলি কিরে বাই দা-ঠাকুর? কি বলিষ রে তুই, সরে আয় না এদিকে, দা-ঠাকুরকে লজ্জা কি, উনি তো ছেলোমানুষ।

নিমচাঁদের খ্রী গলার হরকে খুব সংযত ও মিষ্টি ক'রে অপরিচিত পুরুষ-মাহুয়ের সামনে কথা বলতে গেলে মেরে বেমন সরে কথা বলে, তেমনি ভাবে বললে—হ্যাঁ ঠিক তো। বাবার চরণের তলা ছেড়ে কোথাও কি যেতে ইচ্ছে করে?

নিমচাঁদ বললে—হু-মণ কোটা ছিল ঘরে, তা বিক্রী ক'রে চল বাবার খানে বাবার ছিচরণ দর্শন ব আসি আর অমনি গঙ্গা-কেন্দ্রটাও সারবো। টাকা বোগাবেন, সেজন্তে তাহিলে। ওরে শোন, কাল তুই ধরা দিবি সকালে, আজ রাতে তাতে চল দিয়ে দিস—

জিগেস ক'রে জাম্বুলায় ছেলের অনুধেয় অর্থে দেবার ইচ্ছে আছে ওদের।



শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনী

ঐশ্বর্য ভট্টাচার্য গোল্ডেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নিমটাদের বৌ বললে—বুধলেন দাদাঠাকুর, খোকার মামা ওর মুখ দেখে তিনটে টাকা দিলে খোকার হাতে। তখন পরসার বড় কষ্ট যাচ্ছে, কোষ্ঠী তখন জলে, কাচলি তো পরসার ঘরে আসবে? তো বলি না, এ টাকা খরচ করা হবে না। এ রইল তোলা বাবার থানের জন্তি। মোহন্ত-বাবার গদীতে দিয়ে আসব।

সেই দিন বিকালে নিমটাদ ও তার বৌ পূজা দিতে এল গদীতে। নবীন-মুহুরী তাদের কাছে রেট-মত প্রণামী ও পূজার খরচ আদায় করলে অবিশ্যি—তা ছাড়া নিমটাদের বৌ নিজের হাতে সেই তিনটে টাকা বড়বাবুর সামনের রূপোর থালায় রেখে দিয়ে বড়বাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে কোলের খোকার মাথায় মুখে দিয়ে দিলে।

তার পর সে একবার চোখ তুলে মোহন্তদের দিকে চাইলে এবং এদের ঐশ্বর্যের খটাতাই সম্ভব অবাক হয়ে গেল—দুর্জিহীন চোখে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে টাকা-পরমাতে পরিপূর্ণ স্বকৃষ্ণকে রূপোর আলোটার দিকে বার-কতক চাইলে, রঙীন শালু ও গীদাফুলের মালায় মোড়া থামগুলোর দিকে চাইলে—জীবনে এই প্রথম সে গোঁসাইয়ের থানে এসেচে, সব দেখে-শুনে লোকের ভিড়ে, মোহন্ত মহারাজের আড়ম্বরে, অনবরত বর্ণগরত প্রণামীর স্বম্বমানি আওরাজে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কতক দগ হা ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, বাইরে থেকে ক্রমাক্ত লোক ঢুকচে, তাকে ক্রমশঃ ঠেলে একধারে সরিয়ে দিচ্ছে, তবুও সে দাঁড়িয়েই আছে।

ওকে কে এক জন ঠেলা দিয়ে এগিয়ে আসতে গেল, আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারি নি। ওর মুখচোখের মুগ্ধ ভক্তিতত্ত্ব দৃষ্টি আশ্রয় ও মুগ্ধ করেছে—এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আমার জীবনের, এই বাজে শালুর বাহার দার লোকের হৈ চৈ আর মেজবাবু, বড়বাবুর চমমামণ্ডিত দার্ভিক মুখ দেখে এত ভাব ও ভক্তি আসে!—যে ঠেলা দিয়ে এদিকে আসছিল, আমি তাকে ধমক দিলাম। তার পর ওর চমক ভাঙতে ফিরে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে একটি বুকা এল, তার বয়েল অনেক হয়েছে, বয়েসে গলার ঘর কঁপে গিয়েচে, হাত কাঁপচে, সে তার আঁচল থেকে একটি আঙুলি খুলে থালায় দিতে গেল। নবীন-মুহুরী বললে—রও গো, রাখ—আঙুলি কিসের?

বুড়ী বললে—এই-ই ২১-কুর-র মা-ন-ত শো-ধে-র পে-র-গা-দী—

নবীন-মুহুরী বললে—পাঁচ সিকের কমে ভোগের পূজা নেই—পাঁচ সিকেতে এক টাকা গদীর নজর—

বুড়ী শুন্তে পায় না, বললে—কত?

নবীন আঙুল দেখিয়ে চৈচিয়ে বললে—এক টাকা—

বুড়ী বললে—আর নে-ই-ই, মা-হ-র কি-নে-শা-অ ছ-আ-না-র, আর—

নবীন-মুহুরী আঙুলি ফেরৎ দিয়ে বললে—নিরে যাও, হবে না। আর আট আনা নিয়ে এস—

বড়বাবু একটা কথাও বললেন না। বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল এবং ঘণ্টাখানেক পরে সিকিজে, ছআনিতে, পরমাতে একটা টাকা নিয়ে এসে প্রণামীর থালায় রাখলে।

ওরা চলে গেলে আমার মনে হ'ল এই সরল, পরম বিশ্বাসী পল্লীবধু, এই বুকা ওদের কষ্টাজিত অর্থ কাকে দিয়ে গেল—মেজবাবুকে বড়বাবুকে? এই এত লোক এখানে এসেচে, এরা সবাই চাবী গরিব গৃহস্থ, কি বিশ্বাসে এখানে এসেচে জানি নে—কিন্তু অন্নান বদনে খুন্সীর সঙ্গে এদের টাকা দিয়ে যাচ্ছে কেন? এই টাকার কলকাতার ওদের স্বীরা গহনা পরবেন, মোটর চড়বেন, থিয়েটার দেখবেন, ওরা মাংসা করবেন, বড়মানুষী সাহেবিয়ানা করবেন—ছোটবাবু বন্ধুবান্ধব নিয়ে গানবাজনার মজলিসে চপ-কাটলেট্ ওড়াবেন, সেই জন্তে?

পরদিন সকালে দেখলাম নিমটাদের স্ত্রী পুকুরে স্নান ক'রে সারাপথ সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করতে করতে ধুলোকাদা-মাথা গায়ে বটতলার ধর্ণা দিতে চলেচে—আর নিমটাদ ছেলে কোলে নিয়ে ছলছল চোখে তার পাশে পাশে চলেচে।

সেই দিন রায়ে শুন্লাম মেসার কলেরা দেখা দিয়েচে। পরদিন দুপুরবেলা দেখি বটতলার সামনের মাঠটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েচে, অনেকেই পাশিয়েচে। নিমটাদের কুঁড়েঘরের কাছে এসে দেখি নিমটাদের স্ত্রী বসে—আমার দেখে কঁদে উঠল। নিমটাদের কলেরা হয়েছে কাল রায়ে—মেসার যারা ভদারক করে, তারা ওকে কোথায় নাকি নিয়ে যেতে

চেয়েচে, মাঠের ওদিকে কোঁথায়। আমি ঘরে ঢুকে দেখি নিমটাঁদের গুয়ে হট্‌ফট্‌ করচে, খুব ঘামচে।

নিমটাঁদের স্ত্রী কেঁদে বললে—কি করি দাদাঠাকুর, হাতে শুধু বাবার ভাড়াটা আছে—কি করি কোথা থেকে—

মেজবাবকে কথাটা বললাম গিয়ে। তিনি বললেন—লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওকে সিগ্রিগেশন্ ক্যাম্পে নিয়ে যাও—মেলার ডাক্তার আছে সে দেখে—

নিমটাঁদের বৌ-এর কি কান্না ওকে নিয়ে বাবার সময়। আমরা বোঝালুম অনেক। ডাক্তার ইন্জেক্সন দিলে। মাঠের মধ্যে মজুর দিয়ে সিগ্রিগেশন্ ক্যাম্প করা হয়েছে—অতি নোংরা বন্দোবস্ত। সেখান সেবাশ্রমচার কোনো ব্যবস্থাই নেই। ভাবলুম চাকুরী যায় যাবে, ওকে বাঁচিয়ে তুলব, অন্ততঃ বিনা তদারকে ওকে মরতে দেবো না। সারারাত জেগে রোগীকে দেখাশুনো করলুম একা। সিগ্রিগেশন্ ক্যাম্পে আরও চারটি রোগী এল—তিনটে সন্ধ্যার মধ্যেই মর গেল। মেলার ডাক্তার অবিজ্ঞ নিয়ম-মত দেখলে। এদের পরশা নিয়ে যারা বড়-মাস্তুল, তারা চোখে এসে দেখেও গেল না কাউকে। রাত্রিটা কোনো রকমে কাটিয়ে বেলা উঠলে নিমটাঁদও মারা গেল। সে এক অতি ক্লেশ ব্যাপার! ও'দর দেশের লোক খুঁজে বার ক'রে নিমটাঁদের সংস্কারের ব্যবস্থা করা গেল। নিমটাঁদের স্ত্রীর দিকে আমি আর চাইতে পারি নে—বটতলার ধর্ণা দেওয়ার দিন থেকে সেই যে সে উপবাস ক'রে আছে, গোলমালে আর তার খাওয়াই হয় নি। ক্লান্ত চুল একমাথা, সেই ধুলিসুস্রিত কাপড়—খবর পেয়ে সে ধর্ণা ফেলে বটতলা থেকে উঠে এসেচে—চোখ কেঁদে কেঁদে লাল হয়েছে, যেন পাগলীর মত দৃষ্টি চোখে। এখন আর সে কাঁদে না, শুধু কাঁঠের মত বসে আছে, কথাও বলে না, কোন দিকে চায়ও না।

মেজবাবকে বলাতে তিনি ওকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার খরচ ছুটাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু সে আমি যথেষ্ট বললাম ও অনুমোদন করলাম বলে। আরও কত যাত্রী এ-রকম মরে গেল—বা তাদের কি ব্যবস্থা হ'ল এ-সব দেখবার দায়িত্ব এদেরই তো। ওরাই রইল নিরীকার ভাবে বসে। আমার

কাছে কিছু ছিল, বাবার সময় নিমটাঁদের স্ত্রীর হাতে দিলাম। চোখের কল রাখতে পারি নে, যখন সে চলে গেল।

দিন-গ্রই পরে রাতে বসে আমি ও নবীন-মুহুরী হিসেব মেলাচ্ছি মেলার বেনা-পাওনার। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কার্তিকের সংক্রান্তিতে পরশু মেলা শেষ হ'য় গিয়েচে, বেশ শীত আজ রাতে।

এমন সময় হঠাৎ আমার কি হ'ল বলতে পারিনে—দেখতে দেখতে নবীন-মুহুরী, মেলার আঁটচালা ঘর সব যেন মিলিয়ে গেল। আমি যেন এক বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়েছি—অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সীতার বিবাহ-সভা। জ্যাঠামশায় কলসাস্পন্দান করতে বসেচেন, খুব বেশী লোকজনের নিমন্ত্রণ হয় নি, বরপক্ষেও বরযাত্র বেশী নেই। দাদাকেও দেখলুম—দাদা ব'সে ময়না চাসচে।... আরও সব কি কি... বধা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন সবটা দেখছি—পানিকটা স্পষ্ট, পানিকটা অস্পষ্ট।

চমক ভাঙলে দেখি নবীন-মুহুরী আমার মাথায় জল দিচ্ছে। বললে—কি হয়েছে তোমার, মাঝে মাঝে ফিট্‌ হ'ল না-কি?

আমি চোখ মুছে বললুম—না। ও কিছু না—

আমার তখন কথা বলতে ভাল লাগ্‌চে না। সীতার বিবাহ নিশ্চয়ই হচ্ছে, আজ এখনি হচ্ছে। আমি ওকে বড় ভালবাসি—আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে জ্যাঠামশায় ওর বিবাহ দিতে পারবেন না। আমি সব দেখেছি।

নবীন-মুহুরীকে বললাম—তুমি আমাকে ছুটি দাঁও আজ, শরীরটা ভাল নেই, একটু শোব।

পরদিন বড়বাবুর চাকর কলকাতা থেকে এল। মায়ের একখানা চিঠি কলকাতার ঠিকানায় এসে পড়েছিল, মায়ের জবানি, জ্যাঠামশায়ের লেখা আসলে। ২রা অগ্রহায়ণ সীতার বিয়ে, সেই জ্যাঠামশায়ের ঠিক-করা পাত্রের সঙ্গেই। তিনি কথা দিয়েছেন, কথা খোয়াতে পারেন না। বিশেষ, অত বড় মেয়ে ঘরে রেখে পুঁচ জনের কথা সহ করতে প্রস্তুত নন। আমরা কোন কালে কি করব তার আশায় তিনি কতকাল বসে থাকেন—ইত্যাদি।

ষোড়শী সীতা! ওর সাবান-মাখা, চুলবাঁধা, মিখে

সৌধীনতার অক্ষম চেষ্টা মনে পড়ল। কত ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে এক কাশ কিছু গ্রাহ্য করিনি! বেশ দেখতে পেলাম ওর ঘন কাশ চুলের সিঁতিগাটি ব্যর্থ হয়ে গেল—ওর শুভ্র, নিষ্পাপ জীবন নিয়ে সবাই ছিনমিনি খেললে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

এখান থেকে কলকাতা যাবার সময় হয়ে এল। বিকলে আমি বটতলার পুকুরের ঘাটে বসে মাছ-ধরা দেখছি, নবীন-মুহুরী এসে বললে—তোমার ডাকচেন মেজবাবু। ওর মুখ দেখে আমার মনে হ'ল শুক্লতর একটা কিছু ঘটেচে কিংবা ও-ই আমার নামে কি লাগিয়েচে। নবীন-মুহুরী এ-রকম বার-কয়েক আমার নামে লাগিয়েচে এর আগেও। কারণ তার চুরির বেজায় অহুবিধে ঘটচে আমি থাকার দরুণ।

মেজবাবু চেয়ারে বসে, কুঞ্জ-নায়েবও সেখানে ঝাড়িয়ে।

মেজবাবু আমাকে মাহুয বলেই কোনো দিন ভাবেন নি। এ-পর্যন্ত আমিও পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়েই চলে এসেছি। লোকটার মুখের উগ্র দান্তিকতা আমাকে ওর নামে যেতে উৎসাহিত করে না। আমায় দেখে বললেন—শোনো এমিকে। কলকাতায় গিয়ে তুমি অভ জায়গায় ঢাকুরীর চেষ্টা করবে। তোমাকে এক মাসের নোটিল দিলাম।

—কেন, কি হয়েছে?

—তোমার মাথা ভাল না, এ আমিও জানি, নবীনও দেখেচে বল্চে। হিসেব-পত্তে প্রায়ই গোলমাল হয়। এ-রকম লোক দিয়ে আমার কাজ চলবে না। ষ্টেটের কাজ তো ছেলেবেলা নয়?

নবীন এবার আমার স্তনিরেই বললে—এই তো সেদিন আমার নামেই হিসেব বেলাতে বেলাতে দুগিরোগের মত হয়ে গেল—আমি তো ভয়েই অস্থির—

মেজবাবুকে বিদান ব'লে আমি সন্তানের চোখেও দেখতাম। বললাম—দেখুন, তা নয়। আপনি তো সব বোঝেন, আপনাকে বলছি। মাঝে মাঝে আমার কেমন একটা অস্থির হয় শরীরের ও মনের, সেটা ব'লে বোঝাতে

পারি নে—কিন্তু তখন এমন সব জিনিস দেখি, সহজ অবস্থায় তা দেখা যায় না। ছেলেবেলার আরও অনেক দেখতুম, এখন কমে গিয়েচে। তখন বুঝতাম না, মনে ভর হ'ত, ভাবতাম এ-সব মিথ্যা, আমার বুদ্ধি কি রোগ হয়েছে। কিন্তু এখন বুঝেছি ওর মধ্যে সত্যি আছে অনেক।

মেজবাবু কৌতুক ও বিদ্রূপ মিশ্রিত হাসি-মুখে আমার কথা শুন্ছিলেন—কথা শেষ হ'লে তিনি কুঞ্জ-নায়েবের দিকে চেয়ে হাসলেন। নবীন-মুহুরীর দিকে চাইলেন না, কারণ সে অনেক কম দরের মাহুয। ষ্টেটের নায়েবের সঙ্গে তবুও দৃষ্টি-বিনিময় করা চলে। আমার দিকে চেয়ে বললেন—কত দূর পড়াশুনা করেচ তুমি?

—আই-এ পাস করেছিলাম শ্রীরামপুর কলেজ থেকে—

—তাহ'লে তোমায় বোঝানো আমার সুস্থিল হবে।

মোটের ওপর ও-সব কিছু না। নিউরোটিক ধারা—নিউরোটিক বোঝা? বাদের মায়ু হুর্দল তাদের ওই রকম হয়। রোগই বইকি, ও এক রকম রোগ—

আমি বললাম—মিথো নয় যে তা আমি জানি। আমি নিজের জীবনে অনেক বার দেখেছি—ও-সব সত্যি হয়েছে। তবে কেন হয় এইটেই জানি নে, সেইজন্যেই আপনাকে জিজ্ঞাস্য করেছি। আমি সেন্ট ক্রাফ্‌লিস অফ্‌ আসিসির লাইফ-এ পড়েছি তিনিও এ-রকম দেখতেন—

মেজবাবু ব্যঙ্গের হুয়ে বললেন—তুমি তাহ'লে সেন্ট হয়ে গিয়েচ দেখছি? পাগল কি আর গাছে কলে?

নবীন ও কুঞ্জ দু-জনেই মেজবাবুর প্রতি সন্তান বজায় রেখে মুখে কাণড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

আমি নানা দিক থেকে ঘোঁচা খেয়ে মরীয়া হয়ে উঠলাম। বললাম—আর শুধু ওই দেখি যে তা নয়, অনেক সময় মরে গিয়েচে এমন মাহুযের আত্মার সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের দেখতে পেয়েছি।

নবীন-মুহুরীর বুদ্ধিহীন মুখে একটা অকৃত ধরনের অবিশ্বাস ও ব্যঙ্গের ছাপ কুটে উঠল, কিন্তু নিজের বুদ্ধির ওপর তার যোষ হয় বিশেষ আত্মা না থাকাতো সে মেজবাবুর মুখের দিকে চাইলে। মেজবাবু এমন ভাব দেখালেন যে, এ বন্ধ উদ্ভাবের সঙ্গে আর কথা ব'লে লাভ কি আছে! তিনি কুঞ্জ-নায়েবের দিকে এভাবে চাইলেন যে একে আর

এখানে কেন? পাগলামি চড়ে বসলেই একটা কি করে কেল্বে একুনি!

আমি আরও মরীয়া হয়ে বললাম—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন তাতে বে-জিনিষ সত্যি তা মিথ্যে হয়ে যাবে না। আমার মনে হয় আপনি আমার কথা বুঝতেও পারেন নি। যার নিজের অভিজ্ঞতা না হয়েছে, সে এসব বুঝতে পারে না, একথা এতদিনে আমি বুঝি। খুব বেশী লেখাপড়া শিখলেই বা খুব বুদ্ধি থাকলেই যে বোঝা যায়, তা নয়। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে বলি, আমি ধোঁবরটাতে থাকি, ওর ওপাশে যে ছোট্ট বাড়িটা আছে, ভাঙা রোয়াক, যার সামনে—ওখানে আমি এক জন বুড়োমায়ের অস্তিত্ব অহুভব করতে পেরেচি—কি করে পেরেচি, সে আমি নিজেই জানি নে—খুব ভয়ঙ্কর খেতেন, বয়েস অনেক হয়েছিল, খুব রাগী লোক ছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন কি বেঁচে আছেন তা আমি জানি নে। ওই জায়গাটার গেলেই এই ধরণের লোকের কথা আমার মনে হয়। বসুন তো ওখানে কেউ ছিলেন একরকম?

কুঞ্জ-নারায়ণের সঙ্গে মেজবাবুর অর্থসূচক দুটি-বিনিময় হ'ল। মেজবাবু স্নেহের সঙ্গে বললেন—তোমাকে যতটা সম্পদ ভেবেছিলাম, তুমি তা নও দেখচি। তোমার মধ্যে ভগ্নামিও বেশ আছে—তুমি বলতে চাও তুমি এত দিন এখানে এসেছ, তুমি কারও কাছে শোন নি ওখানে কে থাকতো?

—আপনি বিশ্বাস করুন আমি তা শুনি নি। কে আমায় বলতে আপনি খোঁজ নিনু?

—ওখানে আমাদের আগেকার নারের ছিল, ওটা তার কোয়ার্টার ছিল, সে বছর-চারেক আগে মারা গিয়েছে, শোন নি এ কথা?

—না আমি শুনি নি। আরও কথা বলি শুধু, আপনার ছেলে হওয়ার আগের দিন কলকাতার আপিসে আপনাকে কি বলেছিলেন মনে আছে? বলেছিলেন একটা খোঁকা পাড়িয়ে আছে—বরফা খুলে মেজবোরাগী এসে তাকে নিয়ে গেলেন—এ কথা বলেছিলেন কি না? মনে করে দেখুন।

—হ্যাঁ আমার খুব মনে আছে। সেও তুমি জানতে না যে আমার খ্রী আসন্নপ্রসবী ছিল? যদি আমি বলি তুমি একটা বেশ ভাল চলেছিলে—বে কোনো একটা সন্তান তো হ'তই—তুমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিলে, দৈবাৎ লেগে গিয়েছিল। শার্লটানরা ওরকম বুদ্ধিরূপী করে—আমি কি বিশ্বাস করি ওসব ভেবেচ?

—বুদ্ধিরূপী কিসের বলুন? আমি কি তার জন্তে আপনার কাছে কিছু চেয়েছিলুম? বা আর কোনাধিন সে-কথার কোনো উল্লেখ করেছিলুম? আমি জানি আমার এ একটা ক্ষমতা—ছেলেবেলায় দার্জিলিংয়ের চা-বাগানে আমরা ছিলাম, তখন থেকে আমার এক্ষমতা আছে। কিন্তু এ দেখিয়ে আমি কখনও টাকা-রোজগারের চেষ্টা তো করিনি কারোর কাছে? বরং বলিই নে—

মেজবাবু অসহিষ্ণুভাবে বললেন—অল্ ফিদলষ্টক্—মনের ব্যাপার তুমি কিছু জানো না। তোমাকে বোঝাবার উপায়ও আমার নেই। ইট প্লেজ্ কুইয়ার্ টিক্স্ উইথ্ অস্—যদি ধরে নিই তুমি মিণোবাদী নও—ইট মে বি এ সেল্ফ্ ডিলিউডেড্ ফুল্ এবং আমার মনে হয় তুমি তাই-ই। আর কিছু নয়। যাও এখন—

আমি চলে এলাম। নবীন-মুহুরী আমার পিছু পিছু এসে বললে—তোমার সাহস আছে বলতে হবে—মেজবাবুর সঙ্গে অমন ক'রে তর্ক আজ পর্যন্ত কেউ করে নি। না! বা হোক, তোমার সাহস আছে। আমার তো ভয় হচ্ছিল এই বুঝি মেজবাবু রেগে ওঠেন—

আমি জানি নবীনই আমার নামে লাগিয়েছিল, কিন্তু এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করার প্রবৃত্তি আমার হ'ল না। কেবল একটা কথা ওকে বললাম। দেখ, নবীন-মা, চাকুরীর ভয় আমি অঁর করি নে। যে-জন্তে চাকুরী করছিলাম, সে কাজ মিটে গিয়েছে। এখন আমার চাকুরী করলেও হয়, না-করলেও হয়। তেবো না, আমি নিজেই শীগগির চলে যাবো তাই।

ক-দিন ধরে একটা কথা ভাবছিলাম। এই যে একতলো পাড়ারগে পরিব চাষীলোক এখানে পুরো দিকে এসেছিল—এরা সবলেই দুর্ধ, ভগবানকে এরা সে ভাবে আবে না, এরা চেনে বটভারি বোঁরাইকে। কে

বটতলার গৌসাই? হয়ত এক জন ভক্ত বৈষ্ণব, গ্রাম্য লোক, বহুর-পকাশ আগে থাকত ওই বটতলার। সেই থেকে লৌকিক প্রবাহ এবং বোধ হয় মেজবাবুদের অর্থ-গৃহুতা ছোটোতে মিলে বটতলাটাকে করেছে পরম তীর্থস্থান। কোথার ভগবান, কোথার প্রতিবশ? ঐতিহাসিক অবতারের দল—এই বিপুল জনসম্মত তাঁদের সন্ধানই রাখে না হয়ত। এদের এ কি ধর্ম? ধর্মের নামে ছেলেখেলা।

কিন্তু নিমচাঁদকে দেখেচি। তার সরল ভক্তি, তাদের ভাগ্য। তার ক্রীত চোখে যে অপূর্ণ্য ভাবনুটি, যা সকল ধর্মবিধাসের উৎসমুখ—এসব কি মূলহীন, ভিত্তিহীন জলজ শেঙলার মত মিথ্যার মহাসমুদ্রে ভাসমান? এরকম কত নিমচাঁদ এসেছিল মেলায়। জাগ্রাইমাদের আচারের শেকলে আঁটপুটে বাঁধা ঐশ্বর্যের ঘটা দেখানো দেবর্চনার চেয়ে, এ আমার ভাল লেগেচে। ঘুহড়ির সেই বঞ্জীমন্দিরের মত।

কোন দেবতার কাছে নিমচাঁদের তিনটে টাকার ভোগ অর্থা গিয়ে পৌঁছুলো? জীবনের শেখনিখোসের সঙ্গে পরম ভাগ্যে সে যা নিবেদন করলে?

আর একটা কথা বুঝেচি। কাউকে কোনো কথা বলে বুঝিয়ে বিশ্বাস করানো যায় না। মনের ধর্ম মেজবাবু আমায় কি দেখাবেন, আমি এটুকু স্নেহেচি নিজের জীবনে মাহাত্ম্যের মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না সে জিনিষকে, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের। আমি যা নিজের চোখে কতবার দেখেছি, বাস্তব বলে জানি—বরে-বাইরে সব লোক বললে ও মিথ্যে। পণ্ডিত ও মুর্থ এখানে সমান—ধরাছোঁয়ার গভীর গীমানা পার হয়ে কান্ডের মন অনন্ত অজানার দিকে পাড়ি দিতে চায় না। যা সত্যি, তা কি মিথ্যা হয়ে যাবে?

২

কলকাতায় কীরে এলাম বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে। জামাইকে বিয়ের রাতে বেধি আটনি গাড়ী ফৌজুক বেওয়া হ'ল—বিবাহ-সম্বন্ধের সেরাপ বাঁধতে ও ফুল দিয়ে সাজাতেই ব্যস্ত হ'ল আট-শ টাকা। বিয়ের পরে ফুলশয্যার তব্ব সাজাতে আট-শ জন লোক হিমশিম

খেয়ে গেল। ছোটবাবুর বড়বাবুদের এক দিন পৃথক ভোজ হ'ল, সেদিন সন্ধ্যের থিরেটোরে হাজার টাকা গেল এক রাজে। তবুও তৌ সুনাম এ তেমন কিছু নয়—এরা পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ জমিদার মাত্র, খুব বড়মাহুদী করবে কোথা থেকে।

ফুলশয্যার তব্ব সাজাতে খুব খাটুনি হ'ল। দু-মণ দই, আধ মণ কীর, এক মণ সাজি, লরি-বোঝাই তির-তরকারী, চল্লিশখানা সাজানো খালায় নানা ধরণের তব্বের জিনিষ—সব বন্দোবস্ত ক'রে তব্ব বার ক'রে স্নি-চাকরের সারি সাজাতে ও তাদের রঙনা করাত—সে এক রাজহুস্বরের যন্ত্রের ব্যাপার।

ওদের রঙীন কাপড়-পর্য স্নি-চাকরের লম্বা সারির দিকে চেয়ে মন হ'ল এই বড়মাহুদীর খরচের দক্ষণ নিমচাঁদের ক্রী তিনটে টাকা দিয়েচে। অথচ এই হিমকাঁ অগ্রহায়ণ মাসের রাতে হয়ত সে অনাথা বিধবার খেজুর-ডালের ঝাঁপে শীত আটকাচ্ছে না, সেই বে বুড়ী যার গলা কাঁপছিল, তার সেই ধার-করে দেওয়া আঁট আঁনা পরসী এর মধ্যে আছে। ধর্মের নামে এরা নিয়েচে, ওরা খেচ্ছার হাসিমুখে দিয়েচে।

সব মিথ্যে। ধর্মের নামে এরা করেছে বোর অধর্ম ও অবিচারের প্রতিষ্ঠা। বটতলার গৌসাই এদের কাছে ভোগ পেয়ে এদের বড়মাহুদ্য ক'রে দি'রচে, লক্ষ গরিব লোককে মেরে—জ্যাঠামশায়দের গৃহদেবতা যেমন তাদের বড় ক'রে রেখেছিল, মাকে, সীতাকে ও ভুবনের মাকে করেছিল ওদের ক্রীতদাসী।

সত্যিকার ধর্ম কোথায় আছে? কি ভীষণ মোহ, অনাচার ও মিথ্যার কুহকে ঢাকা পড়ে গেছে দেবতার সভরূপ সেদিন, যেদিন থেকে এরা স্বপ্নের স্বপ্নকে ভুলে অর্থহীন অসুস্থানকে ধর্মের আসন বসিয়েচে।

দাদার একখানা চিঠি পেয়ে অবাক হ'য়ে গেলাম। দাদা বেখানে কাজ করে, সেখানে এক গরিব ব্রাহ্মণের একটি মাত্র মেয়ে ছিল, ওখানকার সবাই মিলে ধরে-পাক্কে সে গটির সঙ্গে দাদার বিয়ে দিয়েচে। দাদা নিজস্ব ভালামাহুদ, বে যা বলে করও কথা হেঁসতে তো পার নয়? কাউক জানানো হয় নি, পাছে কেউ বাধা দেয়, তারাই জানাতে

যে নি। এক্ষিকে জ্যাঠামশায়ের ভয়ে বাড়িতে বৌ নিয়ে যেতে সাহস করত না, আমার লিখে দে সে ষড়্বিধনে পড়েছে, এমন সে কি করবে? চিঠির বাকী অংশটা নব-বয়স্ক রূপান্তরের উচ্ছ্বাসিত স্থখ্যক্তিতে ভর্তি।

“...জিতু, আমার বড় মনে কষ্ট, বিয়ের সময় তোকে খবর দিতে পারি নি, তুই একবার অবিশ্রি অবিশ্রি আসবি, তোর বউদিদির বড় ইচ্ছে তুই একবার আসিস। মায়ের সবকিছু কি করি আমার লিখবি। সেখানে তোর বৌদিদিকে নিয়ে যেতে আমার সাহসে কুলোর না। ওরা ঠিক কুলীন ব্রাহ্মণ নয়, আমাদের স্ববরও নয়, অত্যন্ত গরিব, আমি বিয়ে না করলে যেমতে পার হবে না সবাই বললে, তাই বিয়ে করেচি। কিন্তু তোর বৌদিদি বড় ভাল মেয়ে, ওকে যদি জ্যাঠামশায় ঘরে নিতে না চান কি অপমান করেন, সে আমার সহ হবে না।...”

পত্র পড়ে বিশ্বয় ও আনন্দ দুই-ই হ’ল। দাদা সংলাপে ষড় একা ছিল, ছেলেবেলা থেকে আমাদের জন্তে খাটতে, জীবনটাই নষ্ট করলে সেজন্তে, অথচ ওর দ্বারা না হ’ল বিশেষ কোনো উপকার মায়ের ও সীতার, না হ’ল ওর নিজের। ভালই হয়েছে, ওর মত মেহপ্রবণ ত্যাকী ছেলে যে একটি আশ্রয়দীপ পেয়েছে, ভালবাসবার ও ভালবাসা পাবার পাত্র পেয়েছে, এতে ওর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলাম। কত রাজে শুয়ে শুয়ে দাদার হৃৎথের কথা ভেবেচি!

সাকে কাছে নিয়ে আসতে পড় লিখে দিলাম দাদাকে। জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে রাববার আর দরকার নেই। আমি স্নিগ্ধগিরিই গিয়ে দেখা করবো।

মায় মাসের প্রথম আমি রাকুরী ছেড়ে দিয়ে ঘেরিয়ে পড়লাম। মনে কেনন একটি উদ্বল ভাব, কিসের একটি আদ্য পিপাসা। আমার মনের মতো বা খাশ খায় না, কত আমার লক্ষ্য নয়। ছেলেবেলা থেকে আমি যে অসুস্থ অসুস্থের স্বর-বার সমুদ্রীন হয়েচি, অথচ থাকে কখনও ঠিকঠিক, বুকি মি—তার সঙ্গে যে-এক খাশ খায় না, সেও আমার ধর্ম নয়।

অথচ চারিদিকে মেঘনি সবাই ভাই। তারা সৌন্দর্যকে

চেনে না, সত্যকে ভালবাসে না, কল্পনা এদের এক পক্ষ, যে-খোঁটার বন্ধ হয়ে থাকল খাচে গন্ধ মড—তার বাইরে উজ্জ্বল নীলাকাশের দেবতার বে-স্বাধি বিপুল ও অপরিমের এরা তাকে চেনে না।

বহরখানেক ঘুরে বেড়ানুম নানা জায়গায়। কত বার ভেবেচি একটা চাকুরী দেখে নেবো, কিন্তু শুধু ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কিছু ভাল লাগতো না। যেখানে শুভ্রতাম কোনো নতুন ধর্মসম্রদায় আছে, কি সাধু-সন্ন্যাসী আছে, সেখানে যেন আমার বেড়েই হবে, এমন হয়েছিল। কালনার পথে গন্ধার ধারে এক দিন সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কাছেই একটা ছোট গ্রাম, চাষী কৈবর্তদের বাস। ওখানেই আশ্রয় নেবো ভাবলাম। পরিকার-পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর, বেশ নিকোনো-পুছোনো, উঠোন পর্যন্ত এমন পরিষ্কার যে সিঁচুর পড়লে উঠিরে নেওয়া যায়। সন্ধ্যার ঘরেই ধানের ছোটবড় গোলা, বাড়ির সামনে পিছনে ক্ষেত-খামার। ক্ষেতের বেড়ায় মটরশুঁটির ঝাড়ে শাদা গোলাপী ফুল ফুটে সিঁটি হুগছে সন্ধ্যার অন্ধকার ভরিয়ে রেখেছে।

একজন লোক গোয়াল-ঘরে গরু বাঁধছিল; তাকে বললাম—এখানে থাকবার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে? সে বললে—কোথেকে আসা হচ্ছে? আপনারা? ব্রাহ্মণ শুনে নমস্কার ক’রে বললে—ওই দিকে একটু এগিয়ে যান—আমাদের অধিকারী-মশাই থাকেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর ওখানে বিদ্যা থাকবার জায়গা আছে।

একটু দূরে গিয়ে অধিকারীর ঘর। উঠানের এক পাশে একটা লেবুগাছ। বড় আঁটশা ঘর, উঁচু মাটির দাওয়া। একটা ছোট ছেলে বললে, অধিকারী বাড়ি নেই, হলুদপুকুরে কীর্তনের বায়না নিয়ে গাইতে গিয়েছে—কাল আসবে।

আমি চলে বাড়ি এমন সময়ে একটি মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে বললে—চলে কেন বাবেন? পায়ের তুলো নিয়েচেন যদি রাতে এখানে থাকুন বা কেনে?

কথার মধ্যে রাড় বেশের টান। যেমতে তার পর এসে দাওয়ার ঠাঁড়াল, ঘরো সাতাল-আঁটাল হবে, রং ফর্সা, হাতের টেমির আঁখোর কপালের উজ্জ্বল দেখা থাকে।

যেহেঁটা দাঁড়ায় একটা মাহুর বিছিরে দিয়ে দিলে, এক ঘটি জল নিয়ে এল। আমি হাত-পা ধুয়ে হুহু করে বললে মেহেঁটা বললে—রাগার কি ধোণাড় ক'রে দেব ঠাকুর?

আমি বললাম—আপনারা যা র'খবেন, তাই ধাবো।

রাগে দাঁড়ায় শুয়ে রইলাম। পরদিন হুপুরের পরে অধিকারী-মশাই এল। পেছনে জন-তিনেক লোক, এক জনের পিঠে একটা খোল বাঁধ। তামাক খেতে খেতে আমার পরিচয় নিলে, খুব খুশী হ'ল আমি এসেছি বলে।

বিকলে উচ্চ-পর্যায়ী লোকটির সঙ্গে কি নিয়ে তার বগড়া বেধে গেল। স্ত্রীলোকটি বলচে শুনলাম—অমন বদি করবি মিলে, তবে আমি বলরামপুরে চলে যাব। কে তোর মুখনাড়ার ধার ধারে? একটা পেট চলে যাবে রে, সেজন্তে তোর তোয়াক্কা রাখি ভেবেচিলি তুই!

আশুনে জল পড়ার মত অধিকারীর রাগ একদম শান্ত হয়ে গেল। রাগে ওদের উঠানে প্রকাণ্ড কীর্ণনের আসর বসল। রাত তিনটে পর্য্যন্ত কীর্ণন হ'ল। আসরস্থদ্ধ সবাই হাত তুলে নাচতে শুরু করলে হঠাৎ। চ-তিন ঘণ্টা উজ্জ্বল নৃত্যের পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ার দরুণই হোক বা বেশী রাত হওয়ার জন্তেই হোক, তারা কীর্ণন বন্ধ করলে।

আমি যেতে চাই, ওরা—বিশেষ ক'রে সেই স্ত্রীলোকটি—আমার যেতে দেয় না। কি যত্ন বে করলে! আর একটা দেখলাম অধিকারী-কেও সেবা করে ঠিক ক্রীতদাসীর মত—মুখে এদিকে যখন-তখন যা-তা শুনিতে দেয়, তার সুখের কাছে ঈর্ষাবার সাধি নেই অধিকারীর।

বাবার সময় মেহেঁটা দিবি করিয়ে নিলে যে আমি আবার আসবো। বললে—তুমি তো ছেলোমাহুব, যখন খুশী আসবে। মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাবে। তোমাদের খাওয়ার কত হচ্ছে এখানে—মাছ মিলে না, মাংস মিলে না। বেশেব মালে এস, আম বিরে চুখ দিয়ে খাওয়ারো।

কি মুগ্ধর যে লাগল ওর ক্ষেহ!

আমার সেই দর্শনের কদম্বটী ক্রমেই ঘেন-চলে যাচ্ছে। এই লীধ এক বছরের মধ্যে মাত্র একটা বার জিনিবটী ঘটেছিল।

বাপারটা ঘেন স্বপ্নের মত। তারই ফলে আটবরায়

ফিরে আসতে হচ্ছে। সেদিন হুপুরের পরে একটা প্রামা ডাক্তারের ভিসপেন্সারী-ঘরে বেকিতে শুয়ে বিশ্রাম করছি—ডাক্তারবাবু দ্রুতিতে মাহিবা, সর্বনাশ কর্মকথা বলতে ও জনতে ভালবাসে ক'লে আমার ছাড়তে চাইত না, সব সময় কেবল ঘাস ঘাস ক'রে ওই সব কথা পেড়ে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলছিল—আমি ধর্মের কথা বলতেও ভালবাসি না, জনতেও ভালবাসি না—ভাবছি শুয়ে শুয়ে কাল সকালে এর এখান থেকে চলে যাব—এমন সময় একটু তজ্রামত এল। তজ্রাঘোরে মনে হ'ল আমি একটা ছোট্ট ঘরের-কুণ্ডলি থেকে বোনানী ভেঙে কার হাতে দিচ্ছি, যার হাতে দিচ্ছি সে তার রোগজীর্ণ হাত অতিকটে একটু ক'রে তুলে বোনানী নিচ্ছে, আমি বেন ভাল দেখতে পাচ্ছি নে ঘরটার মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা—বারকতক এই রকম বোনানী দেওয়া-নেওয়ার পরে মনে হ'ল রোগীর মুখ আর আমার মায়ের মুখ এক। তজ্রা ভেঙে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সেই দিনই সেখান থেকে আঠারো মাইল হৈটে এসে ফুলসরা ঘাটে ঈমার ধ'রে পরদিন বেলা দশটার কলকাতা পৌঁছলাম। মায়ের নিশ্চয়ই কোনো অনুখ করেছে, আটবরা যেতেই হবে।

শেয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে একটা লোকান থেকে আঙুর কিনে নেবো ভালোম, পকেটেও বেশী পরস্য নেই। পরস্য গুণটি দাঁড়িয়ে, এমন সময় দূর থেকে মেয়েদের বিশ্রাম-ঘরের সামনে দণ্ডায়মানা একটি নারীমূর্তির দিকে চেয়ে আমার মনে হ'ল ঈর্ষানোর ভঙ্গিটা আমার পরিচিত। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারলাম না—আঙুর কিনতে চলে গেলাম। ফিরবার সময় দেখি ট্যাক্সি ঠ্যাঙের কাছে একটি পচিশ-ছাবিশ বছরের যুবকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শ্রীরামপুরের ছোটবো-চাকর। আমি কাছে যেতেই বোঁঠাকরুণ চমকে উঠলেন প্রায়। বললেন—আপনি! কোথেকে আসছেন! এমন চেহারা!

আমি বললাম—আপনি কি একটু আগে মেয়েদের ওরেটিং-রুমের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন?

—হ্যাঁ, এই যে আমরা এখন এলাম এই যোগবাদীর গাড়ীতে—আমরা শ্রীরামপুরে যাচ্ছি। ইনি মেজদা—এঁকে দেখেন নি কখনও?

যুবকটি আমার বলল—আপনি তা হ'লে একটু
ইাড়নি দয়া করে—আমি একটা ট্যান্ডি ডেকে নিয়ে আসি—
এখানে দরে বসে না—

সে চলে গেল। ছোটবোঁঠাকরুণ বললেন—মাগো,
কি কালীমূর্তি চেহারা হয়েছে! বড়দি বলছিল আপনি
নাকি কোথার চলে গিয়েছিলেন, বোজ নেই—সত্যি?

—নিতান্ত নিখোঁজ কি করে বলি! তবে সম্ভ্রান্ত
বেশে বাচ্চি।

ছোটবোঁঠাকরুণ হাসিমুখে চুপ করে রইলেন একটু,
তার পর বললেন—আপনার মত লোক যদি কখনও
দেখেছি। আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। জানেন, আপনি
চলে আসবার পরে বড়দির কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে
অনেক কথা জিজ্ঞাস্য করে করে শুনেছি। তখন কি
অন্ত জানতাম? বড়দি বাপের বাড়ি গিয়েচে আখিন
মাসে—আপনার সঙ্গে দেখা হবে'খন। আচ্ছা, আর
শ্রীরামপুরে গেলেন না কেন? এত করে বললাম,
রাখলেন না কথা? আমার ওপর রাগ এখনও যায় নি
বুঝি!

—রাগ কিসের? আপনি কি সত্যি ভাবেন আমি
আপনার ওপর রাগ করেছিলাম? ছোটবোঁঠাকরুণ
নতমুখে চুপ করে রইলেন।

—বলুন!

ছোটবোঁঠাকরুণ নতমুখেই বললেন—ও কথা যাক।
আপনি এরকম করে বেড়াচ্ছেন কেন? পড়াশুনা
আর করলেন না কেন?

—সে সব অনেক কথা। সময় পাই তো বলব
এক দিন।

—আমুন না আজ আমাদের সঙ্গে শ্রীরামপুরে?
দিনকতক থেকে যান, কি চেহারা হয়ে গিয়েচে আপনার!
সত্যি, আমুন আজ।

—না, আজ নয়, দেশে বাচ্চি, খুব সম্ভব মায়ের বড়
অমুখ—

ছোটবোঁঠাকরুণ বিষয়ের হুঁরে বললেন—কই, সে
কথা তো এতক্ষণ বলেন নি! সম্ভব জানে কি, চিঠি
পেরেচেন তো, কি অমুখ!

একটু হেসে বললাম—না চিঠি পাই নি। আমার
ঠিকানা কেউ জানতো না। অথ দেখেছি—

ছোটবোঁঠাকরুণ একটু চুপ করে থেকে মুহু শান্ত হুঁরে
বললেন—আমি জানি। তখন জানতাম না আপনাকে,
তখন তো বয়সও আমার কম ছিল। বড়দি তার পর
বলেছিল। একটা কথা রাখবেন? চিঠি দেবেন একখানা?
অন্ততঃ একখানা লিখে খবর জানাবেন?...

ছোটবোঁঠাকরুণ আগের চেয়ে সামান্য একটু ষোটা
হয়েছেন; আর চোখে সে বালিকামূলত তরল ও চপল লুটি
নেই, মুখের ভাব আগের চেয়ে গভীর। আমি হেসে
বললাম—আমি চিঠি না দিলেও, শৈলদির কাছ থেকেই
তো জানতে পারবেন খবর—

এই সময় ঊঁর মেজদাদা ট্যান্ডিতে চড়ে এসে হাজির
হ'লেন। আমি বিদায় নিলাম।

ক্রমশঃ

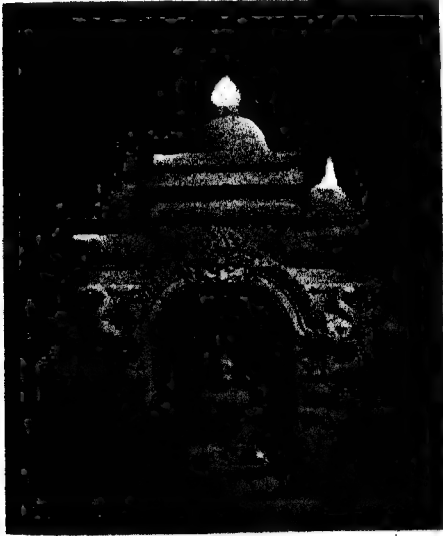


বাংলার মৃৎশিল্প ও কুম্ভকার জাতি

ক্রী—

বাংলার মৃৎশিল্প আজ নূতন নহে—বহু যুগ হইতে বঙ্গদেশীয় মৃৎশিল্পিগণ নানা প্রকারের মৃৎময়-মূর্তি, নানা প্রকারের দেবদেবী গঠন করিয়া বাঙালীর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন যুগেও এই মৃৎশিল্পে চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আমাদের বাংলার মাটি মাটি নয়,—সোনা; আমাদের দেশে পূর্বে এরূপ বৃহদাকার মৃৎপাত্র নিশ্চিত হইত, বাহা দুই তিন মণ তরল পদার্থ ধারণ করিত। মাটির বাসন এরূপ মজবুত হইত বাহা বহুদিন বাবৎ উত্তাপ সহ্য করিয়াও ভাঙিত না। মোটের উপর বাংলার অভাব বাংলার মাটিতেই মোচন হইত—বিদেশী

মন্দিরগাত্রে যুগ-যুগান্ত যজ্ঞ-যুষ্টির আবাতে সহ্য করিয়াও অক্ষুর রহিয়াছে। এখনও প্রাচীন গোড়ে এবং বাকুড়া ও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এমন অনেক ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন হুবহু মন্দির দেখা যায় বাহার অস্তিত্ব অংশ ভাঙিয়া পড়িলেও



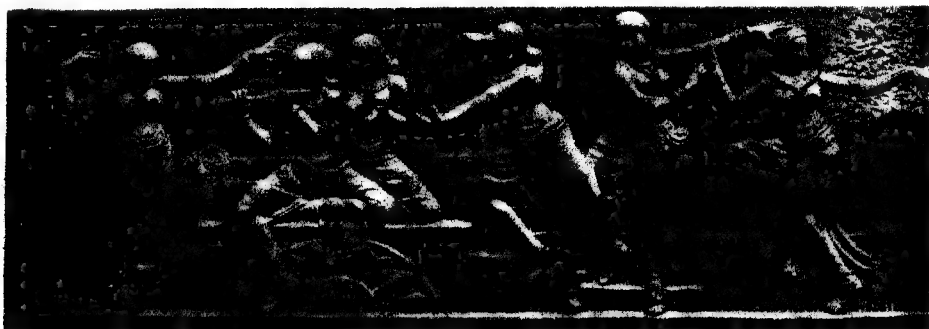
হাশতা-শিল্পের নিদর্শন ও বৃহৎ-মূর্তি

এলুমিনিয়মের বাসন আমদানী করিয়া এরূপ বেকার-সমতা উৎপাদনের প্রয়োজন হইত না। বাংলার মাটিতে বাঙালী কারিগর কত প্রকার শিল্পকৌশল দেখাইয়া লোককে তৃপ্তি করিত, বাহার নমুনা এখনও কোন কোন প্রাচীন



রইনকোসড পদ্ধতিতে নিশ্চিত বসনা-মূর্তি

মৃৎময়মূর্তি-সমৃদ্ধি টালিগুলি অক্ষুর অবস্থায় রহিয়া বাংলার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। প্রাচীন মৃৎশিল্পিগণের মধ্যে নদীয়ার কুম্ভকারগণই চিরপ্রসিদ্ধ। এই বঙ্গদেশীয় কুম্ভকার-গণ বহু প্রাচীন যুগ হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলিয়া



ଉତ୍ତମ-ମୂର୍ତ୍ତି



ଉତ୍ତମ-ମୂର୍ତ୍ତି



ଉତ୍ତମ-ମୂର୍ତ୍ତି

পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। কথিত আছে, স্বয়ং মহাদেব মঙ্গলঘণ্টের প্রয়োজন হওয়ায়, তাঁহার জটা হইতে রুদ্র-পালকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সেই অবধি হিন্দু ধর্মের প্রত্যেক কার্যেই ইঁহার বংশধরগণ সংশ্লিষ্ট। ইঁহার ব্রাহ্মণের ন্যায় সমস্ত দেবদেবীর ধ্যান, রূপ, গঠন ইত্যাদির জন্য শাস্ত্র-অভিজ্ঞ ছিলেন এবং শাস্ত্রানুযায়ী দেবদেবীর মূর্তি গঠন করিয়া হিন্দু ধর্মের অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কুমারটুলীস্থ শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল মহাশয় ও তাঁহার সহকর্মীগণ নদীয়ার মৃৎশিল্পী। বিশেষ ব্যাপকভাবে দেশবাসীর নিকট পরিচিত না হইলেও কার্য-কলাপে ইঁহারা ক্রমেই প্রীতিভাজন হইয়া উঠিতেছেন। হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিগুলি যাহাতে ধ্যানসম্মত হয় এবং তৎসঙ্গে প্রাচীন শিল্পকলাপদ্ধতি বজায় থাকে সে-বিষয়ে ইঁহারা বিশেষরূপ সচেতন: ইতিপূর্বে সরস্বতী-মূর্তি গঠন করিয়া তাহার সম্যক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রাচীনকলাশিল্পী ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রাচীন স্থাপত্যকলার অন্তর্গত নানা রূপ খোদিত মূর্তির অনুকরণে আধুনিক পদ্ধতিতে (concrete) নানারূপ মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া শিল্পনৈপুণ্য দেখাইতেছেন। কলিকাতা গ্রামবাজারে 'চিত্রা' রঙ্গমঞ্চের উপরিস্থ ইন্দ্রসভা তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এবং কলিকাতা নগরীতে যে-কয়েকটি অটালিকা প্রাচীন

পদ্ধতিতে সম্প্রতি নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ কার্যকার্য ইঁহাদেরই সৃষ্ট। শুনিলাম ইঁহারা জাপান, জার্মানী ইত্যাদি দেশ হইতে আনীত বহু উন্নত ধরনের



দক্ষ মূর্তিকা নিৰ্ম্মিত গণেশ-মূর্তি

নানারূপ আর্দশের (মডেলের) অনুকরণে সচেতন হইয়াছেন, যথা—'পেপার পাল্পের' রিলিফ ম্যাপ, সেলুলয়েড ও কাঁচের ভঁড়া দ্বারা প্রস্তুত নানারূপ পুতুল ইত্যাদি।



লুই পাস্তুর ও তাঁহার গবেষণা

আচার্য্য শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রী সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি-এসসি

৩

জেনার কর্তৃক প্রবর্তিত ঢীকা লইবার প্রণালী প্রচারিত হইবার প্রায় এক শতাব্দী পরে পাস্তুর পরীক্ষাগারে ঢীকা লইবার সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন।* জেনারের আবিষ্কারের সহিত পাস্তুরের আবিষ্কারের প্রধান পার্থক্য এই যে, জেনারের পদ্ধতি অনুসারে ঢীকা দেওয়ার জীবাণুগুলি কোনও জীবন্ত প্রাণীর শরীরের মধ্যে কালচার করিতে হয়, কিন্তু পাস্তুর কর্তৃক প্রবর্তিত প্রণালী দ্বারা জীবাণুগুলি কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে কাচের পাত্রের মধ্যে প্রস্তুত করা সম্ভব।

পাস্তুরের এই আবিষ্কারের সহিত কতকগুলি তত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। প্রথমতঃ বেশ বোঝা গেল যে, উপযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা কোনও রোগের জীবাণুগুলির তীব্রতা ইচ্ছামত কমান সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এই যে এই মন্দিভূত জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইবার পরে প্রাণীর শরীরে সাময়িকভাবে যে সামান্য প্রকারের রোগ উৎপন্ন হয় তাহা ঐ প্রাণীকে ভবিষ্যতে উক্ত শ্রেণীর তীব্র জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। যে জীবাণুর দ্বারা ঢীকা দেওয়া হইয়াছে তাহা ক্রমান্বয়ে যত তীব্র এবং যত বেশী টটকা হয় উহার উপকারিতাও তত অধিক। পাস্তুর পরে দেখাইয়াছিলেন যে, বিভিন্ন প্রকারের জীবাণু প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিভিন্ন রকমের।

য়ান্থ্রাক্স (Anthrax) রোগে তখন ফরাসী দেশের গৃহপালিত গবাদি পশুদিগের মধ্যে শতকরা ১০টি মারা যাইতেছিল। চিকেন্ কলেরার (chicken cholera) জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধীয় পরীক্ষার জয়লাভ করিয়া পাস্তুর য়ান্থ্রাক্স রোগের (গোবদন্তের প্রকার-ভেদ) প্রকৃতি-নির্ণয়ের জন্য নূতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ

করিলেন। তিনি য়ান্থ্রাক্সের জীবাণুগুলিকে (Bacillus anthracis) কালচার করিলেন এবং উহা নানাপ্রকার জীবজন্তুর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে ঢীকাতত্ত্বের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে এক নূতন পথ নির্দেশ করিয়া দিল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, যদি পঁচিশটি মেঘশাবকের শরীরে য়ান্থ্রাক্স রোগের মন্দিভূত জীবাণু (attenuated virus or vaccine) দ্বারা ঢীকা দেওয়া যায় এবং কিছুকাল পরে ঐ পঁচিশটি মেঘশাবকের শরীরে এবং তৎসঙ্গে 'ঢীকা লয় নাই' এরূপ ২৫টি মেঘশাবকের শরীরে অতি তীব্র য়ান্থ্রাক্স রোগের জীবাণু প্রবেশ করান হয়, তাহা হইলে প্রথম পঁচিশটি ভেড়া—বাহাদের ঢীকা দেওয়া হইয়াছিল—তাঁহারা বাচিয়া থাকিবে, কিন্তু শেথোক পঁচিশটি মেঘশাবক—বাহা দর ঢীকা দেওয়া হয় নাই—তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

পাস্তুরের সহযোগী ও ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশেষ বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাস্তুর ইহাতে আশাহত হন নাই। সত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকায় তিনি স্থির করিলেন যে, সর্বসাধারণের সমক্ষে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীকে জয়যুক্ত করিতে হইবে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই যে পুইয়ি ল্য ফোর্ (Pouilly le Fort)-এর কৃষিক্ষেত্রে তাঁহার বিপক্ষবাদী বহুসংখ্যক কৃষক, চিকিৎসক ও পশুবৈদ্যের সম্মুখে তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিপন্ন করিবার জন্য সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার বিপক্ষবাদীরা তাঁহাকে অবিশ্বাসের ভয় প্রদর্শন এবং অসংখ্য বিক্রপবাণী বর্ষণ করিতে জরত করে নাই। সেই দিন পঁচিশটি মেঘশাবককে একটি মন্দিভূত জীবাণুর কালচার দ্বারা ঢীকা দেওয়া হইল। বারো দিন পর্যন্ত ঐ মেঘশাবকগুলি ভাল থাকিবার পর ১৭ই মে তারিখে তাঁহাদের শরীরে পুনরায় আরও তীব্র জীবাণু

* সর্বপ্রথমে কৃষ্ণচন্দ্রাবকদিগের বিষটিকা রোগের প্রতিকার-স্বরূপ তিনি এই প্রণালী ব্যবহার করেন।

প্রবেশ করান হইল। পূর্বের প্রতিবেদক ঢাকা না দেখিয়া হইলে দ্বিতীয় বারের ঢাকার তীব্র জীবাণু দ্বারা অন্ততঃ অর্ধেক মেঘশাবক মারা বাহিত। কিন্তু পাস্তুর পূর্বে মন্দীভূত জীবাণু দ্বারা ঢাকা দেওয়া হয় নাই, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে মেঘশাবকগুলির শরীরে মন্দীভূত জীবাণু থাকার দরুণ উহাদের তীব্র জীবাণুগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়—এবং সেই জন্ত পরে শক্তিশালী জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেও কোনও অপকার বা অনিষ্ট হইবে না। সকলেই শঙ্কিত চিত্তে উক্ত কলাফলের জন্ত উদগ্রীব হইয়া রহিলেন। এক পক্ষ কাল অতীত হইল, কিন্তু একটি মেঘশাবকও অসুস্থ হইল না। চারি দিকে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ৩১শে মে তারিখে শেখবার ঢাকা দেওয়ার জন্ত পুনরায় সকলে সমবেত হইলেন। পাস্তুরের বিরুদ্ধবাদিগণের ভিতরে অনেকেই তাঁহাকে সন্দেহ করিতেন। সেই সময়ে কেহ কেহ বলিলেন যে, পাস্তুর তীব্র জীবাণুর বদলে মন্দীভূত জীবাণু ব্যবহার করিতেছেন এবং যে স্থলে মন্দীভূত জীবাণু দেওয়ার কথা সেই স্থলে তিনি তীব্র জীবাণু ব্যবহার করিতেছেন। পরীক্ষাফলে কেহ কেহ জীবাণু রাখিবার পাত্রটিকে ‘ব্যাংকাইয়া’ দিলেন। কিন্তু পাস্তুর তাহাদের এই বিজ্ঞপ ও কটুক্তিতে তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার এই-রূপ দৃঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া ক্রমে অনেক শত্রুপক্ষীয় লোক তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিলেন। অবশেষে এই পরীক্ষার শেষ ফল দেখিবার জন্ত সর্বসম্মতিক্রমে ২রা জুন দিন নির্দিষ্ট হইল।

নির্দিষ্ট তারিখে সকলে একত্র হইয়া কলাফল



‘প্যাস্‌ জ্য ব্রতই’ নামক স্থানে আন্তর্জাতিক টাকার সাহায্যে নির্মিত পাস্তুরের মূর্তি

বাইশটি গতায় হইয়াছে, হইট মুহূর্তপ্রায় এবং বাকী একটি অসুস্থ, তবে মৃতপ্রায় নহে; আর যে পচিশটি মেঘশাবককে প্রথমে মন্দীভূত জীবাণু দিয়া পরে তীব্র জীবাণু দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সুস্থ। কেহ কেহ বা পরস্পরের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় বাস্তব

এই ফল দেখিয়া উপস্থিত সকলেই সম্মুখে এবং উৎসাহ সহকারে পাস্তুরকে অভিনন্দিত করিল। সত্যের ক্ষয় এবং অসত্যের পরাজয় ঘটিল।

পাস্তুর কর্তৃক প্রবর্তিত য়ানথ্রাক্স রোগের চিকিৎসা-প্রণালী ফরাসী দেশের কি প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে তাহা ফরাসী গভর্ণমেন্টের ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 'রিপোর্ট' হইতে জানা যায়। ইহাতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাস্তুরের প্রণালী দ্বারা গবাদি পশুদিগের য়ানথ্রাক্স রোগের চিকিৎসা করার ফলাফল লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ৩,৪০০,০০০ ভেড়ার মধ্যে মাত্র শতকরা একটি এবং ৪৩৮,০০০ গবাদি পশুদিগের ভিতরে হাজারের মধ্যে একটিরও কম য়ানথ্রাক্স রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইখানে বলা প্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পাস্তুরের এই আবিষ্কারের ফলে উক্ত দশ বৎসরে ফরাসী দেশের মোট দুই লক্ষ আশী হাজার পাউণ্ড (প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা) লাভ হইয়াছিল।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যেমন কৃত্রিম উপায়ে রোগের জীবাণুগুলি মন্দীভূত করা হয় সেইরূপ কোন কৃত্রিম উপায় দ্বারা রোগের জীবাণুগুলিকে তীব্রতর করা সম্ভব কিনা? ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পাস্তুর এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে য়ানথ্রাক্স রোগের জীবাণুগুলির তীব্রতা নষ্ট করিবার পরে নবজাত কোমলাঙ্গ ইঁদুরের দেহের মধ্যে এই মৃতপ্রায় জীবাণু সঞ্চারিত করিলে জীবাণুগুলি অধিকতর সতেজ হইয়া উঠে। তখন এই নবজাত ইঁদুরের রক্ত একটি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক ইঁদুরের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং ক্রমান্বয়ে খরগোশ, ভেড়া এবং পরিশেষে গরু অথবা অশ্বের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে জীবাণুগুলির তীব্রতা ও তেজ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। নানাপ্রকার রোগের জীবাণুকে এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে তীব্র হইতে তীব্রতর করার পদ্ধতি জীবাণুতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে।

জীবাণু-তত্ত্ব-বিষয়ে উপরি উক্ত আবিষ্কার পাস্তুরের এক অতুল কীর্তি। পাস্তুর তাহার সমস্ত জীবনে যদি কেবলমাত্র এই একটি বিষয়ে গবেষণা করিয়া যাইতেন

তাহা হইলেও তিনি পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু পাস্তুরের প্রতিভা বহুশাখামুখী। তাহার প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতের এক একটি শুভ-স্বরূপ।

পাস্তুরের জীবাণু-সম্বন্ধীয় গবেষণা ও আবিষ্কার পৃথিবীতে যে কি মহৎপকার সাধন করিয়াছে আধুনিক যাদুদ্রব্য রক্ষণপ্রণালী তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। জীবাণুতত্ত্ববিদ পাস্তুর দেখাইয়াছেন যে, কোনও প্রকার আহাৰ্য্য দ্রব্য যে দীর্ঘ হইয়া যায় তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে, যে, যতই সময় যায় ততই পচনকার্য্যে সহায়ক জীবাণুগুলি ক্রমে আহাৰ্য্য দ্রব্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জলীয় বাষ্প ও উষ্ণতা—এই উভয়বিধ অবস্থা এই জীবাণুগুলির পোষণের ও বর্দ্ধনের পক্ষে অমুকুল। দশ হইতে চল্লিশ সেণ্টিগ্রেড্ ডিগ্রির উত্তাপের মধ্যে এই জীবাণুগুলি বাচিয়া থাকিতে পারে। ৬৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলেই জীবাণুগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকেই জানেন যে, সাধারণ অবস্থায় কোনও পাত্রের মধ্যে দুগ্ধ বেশী ক্ষণ রাখিয়া দিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, ব্যাসিলাস্ এসিডি ল্যাক্টিসি (*Bacillus acidi lactici*) নামক এক প্রকার জীবাণু দুধের মধ্যে সংখ্যায় ও আকৃতিতে ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু দশ সেণ্টিগ্রেড্ ডিগ্রির উত্তাপের কমে ইহার আদৌ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয় না। পনের ডিগ্রির উত্তাপের সময় হইতে ইহার ধীরে ধীরে হ্রাস (lactic acid) প্রস্তুত করিতে থাকে এবং ৩৫ হইতে ৪০ ডিগ্রির মধ্যে এই জীবাণুগুলি সর্বাধিক ক্ষমতাশালী হয়। ৪৬ ডিগ্রির উত্তাপের উপরে এই জীবাণুগুলির শক্তি একেবারে কমিয়া যায়। সুতরাং যদি আহাৰ্য্য দ্রব্যকে অল্পক্ষণের জন্য ১০০ ডিগ্রির উত্তাপে গরম করা যায় এবং তাহার পরে একরূপভাবে রক্ষিত করা হয় বাহাতে কোনও জীবাণু এই আহাৰ্য্য দ্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে চিরকালের জন্য এই আহাৰ্য্য দ্রব্যকে অবিকৃত ও সুখাদ্য অবস্থায় রাখা যাইতে পারে। আহাৰ্য্য দ্রব্যকে সংরক্ষিত রাখিবার এই প্রণালী ইংরেজী কথায় 'sterilization' বলে। এই প্রণালী প্রধানতঃ

টিনের কোটা করিয়া নানা প্রকার ফল ও খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আহার্য দ্রব্যকে অবিকৃত ও হুত্বা অবস্থায় সংরক্ষিত রাখিবার দ্বিতীয় প্রথাকে ইংরেজী ভাষায় pasteurization বলে। এই প্রণালী অনুসারে আহার্য দ্রব্যকে ৬৫ হইতে ৭০ ডিগ্রিতে দ্বিগুণ মিনিট প্রায় গরম করিতে হয়। ইহাতে আসল জীবাণু সমস্তই বিনষ্ট হইবে এবং এই সকল অশুদ্ধি বড় জীবাণু হইতে জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি (spores) মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। তাহার ফলে গাঁজন (fermentation) ও পচন (decomposition) প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে এবং নূতন জীবাণু আহার্য দ্রব্যের মধ্যে ঢুকিয়া বদ্ধিত না হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা শেযোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি অকুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত গাঁজন বা পচন প্রক্রিয়া দ্বারা আহার্য দ্রব্য নষ্ট হইবে না। র্যানথাক্স, টিটেনাস ও সহস্রবতঃ অতিসার উদ্ভ্রাময় (epidemic diarrhoea) ব্যতীত সকল প্রকার ব্যাধির জীবাণুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু উৎপন্ন করে না। সুতরাং উপরি উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার বিনষ্ট হইবে। ব্রাণ্ডি প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য, বিশেষতঃ দুগ্ধ রক্ষণার্থে, এই প্রণালী সকল দেশেই ব্যবহার করা হয়। এই প্রণালী দ্বারা রক্ষিত দুগ্ধ ব্যবহার করিলে ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে অজীর্ণতা অথবা রক্ত রোগের সংস্কার হইবার সম্ভাবনা কম।

আহার্য দ্রব্য সংরক্ষণের আরও একটি প্রণালী আছে। ১০ সেন্টিগ্রেড্ ডিগ্রির নীচে আহার্য দ্রব্যকে রাখিলে জীবাণুগুলি সংখ্যায় ও আকৃতিতে বাড়িতে পারে না এবং উত্তাপ আরও বেশী না-বাড়া পর্য্যন্ত জীবাণুর প্রক্রিয়া সম্ভব হইবে না। এই প্রণালী সাধারণতঃ মংস্য ও মাংসের পচন নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে দূর-দূরান্তর হইতে নানা প্রকার মংস্য বরফের সাহায্যে ঠাণ্ডা করিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করা হয়। বরফ দেওয়া মাছ ও মাংস টাটকা মাছ ও মাংসের মতই পুষ্টিকর ও সুপাচ্য। ইউরোপে এক স্থান হইতে অল্প স্থানে দুধ সরবরাহ করিবার সময় এই প্রণালী বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

এইখানে বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না যে, উপরি উক্ত তিন প্রকার প্রণালী ব্যতীত নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া আহার্য দ্রব্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এই উদ্দেশ্যে লবণের ব্যবহার বহুকাল হইতেই চলিয়া



সোঁরবাণে পাস্তুরের মূর্তি

আসিতেছে। মংস, মাংস, মাখন, পনির প্রভৃতি আহার্য দ্রব্য রক্ষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে লবণ ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থলে লবণ ও সোঁরা (saltpetre) একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। অনেক সময়ে সোঁরাগা, বোরিক এসিড ও ক্যামালডিহাইড্ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুধ, মাখন, মাছ ও মাংসের তৈরি নানা প্রকারের আহার্য দ্রব্য ও ঘনীভূত দুধ (condensed milk) এই উপায়েই সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক দেশ হইতে অল্প দেশে প্রেরিত হইতে পারে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পান্ডুর জলাতক রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন। কিন্তু এই জীবাণু অত্যন্ত বিবাক্ত বলিয়া ইহা লইয়া কাজ করা বিপজ্জনক, তত্স্থপরি আরও একটি বিশেষ অন্তরায় এই যে এই বিষ প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করাইবার পরে রোগ প্রকাশ হইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। পান্ডুরের সময়ে লোকের ধারণা ছিল যে লালাশ্রাবের সহিত এই জীবাণু নিঃসৃত হয়, কিন্তু পান্ডুর দেখাইলেন যে, এই জীবাণু মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে অধিষ্ঠান করে। তিনি প্রমাণ করিলেন, যে-কুকুর জলাতক রোগে মরিয়াছে তাহার ঘাড়ের শিরদণ্ড (Medulla Oblongata) লইয়া অল্প প্রাণীর দেহে ঢুকাইলে সেই প্রাণীতে এই রোগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাতেও আশাশূন্যরূপ বল হইল না, কারণ ইহাতেও দেখা গেল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও এই রোগ প্রকাশিত হয় না। পান্ডুর স্থির করিলেন, এই জীবাণু দেহের অল্প কোন স্থানের পরিবর্তে যদি মাথার ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে অবশ্যই এই রোগ প্রকাশিত হইবে, কিন্তু ইহাতে পণ্ডটির অত্যন্ত যত্নণা হইবে ভাবিয়া তিনি নিজ হাতে এ-কার্যটি করিতে পারিলেন না। এক দিন তিনি পরীক্ষাগার হইতে বাহির হইয়া গেলে তাহার সহকারী রাউক্স (Roux) এই কার্য সাধন করিলেন। এই প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত জন্তুর শরীরে রোগ অনিবার্য প্রকাশিত হয়, এবং রোগ প্রকাশ হইতে কখনও বিশ দিনের বেশী লাগে না। পরে পান্ডুর বিভিন্ন প্রকার শক্তিসম্পন্ন জলাতকের জীবাণু প্রস্তুত করিয়া কুকুরের দেহে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এই মন্দীভূত জীবাণু ইহার শরীরে প্রবেশ করাইবার পর ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে কোন অপকার হয় না; কিছু দিন পরে তিনি আরও দেখিলেন যে, ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের পরেও উক্ত জীবাণু আত্ম কুকুরের দেহে প্রবেশ করাইয়া দিলে আর কোনও অপকার হয় না।

প্রায় এক বৎসর ধরিয়া পান্ডুর পণ্ডদেহের শরীরে এইরূপ পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু মহামার্যেহের উপর পরীক্ষা করিবার সাহস তাহার হইল না; অবশেষে ঘটনাক্রমে তাহার এক সুযোগ মিলিয়া গেল। যোশেফ মাইটার

নামে বৎসর-নয়কের একটি ছেলেকে পাগলা কুকুরে দংশন করিয়া তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। ঐ বালকটির মাতা বালকটিকে লইয়া ভাল্পিয়া (Vulpian) নামক একটি বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকটে চিকিৎসাধর্ম উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিলেন



রাপাল বালক ও পাগলা কুকুর

যে ইহার কোনও চিকিৎসা নাই—তবে পান্ডুরের প্রবর্তিত মতে চিকিৎসা করিলে বালকটি বাচিলেও বাচিতে পারে। কিন্তু পান্ডুর ইহাতেও বিধা বোধ করিতেছিলেন। অবশেষে তাহাদের একান্ত অনুরোধে উপরি উক্ত জীবাণু দ্বারা চিকিৎসা করিতে স্বীকৃত হইলেন। দুই তিন দিন তাহার শরীরে জীবাণু প্রবেশ করাইবার পর বালকটির ক্ষতস্থান শুকাইতে আরম্ভ করিল এবং সে উঠিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু হৃদিতার পান্ডুরের নিদ্রা হইত না। কারণ যতই প্রবিষ্ট জীবাণুসমূহ তীব্র হইতে

তীব্রতর হইতে লাগিল—পান্তররের ভয়ও তত বাড়িতে লাগিল। অবশেষে বালকটিকে যো দিন সর্বাপেক্ষা তীব্র জীবাণুর দ্বারা চীকা দেওয়া হইল সেদিন রাত্রিতে পান্তররের চক্ষুতে আর নিদ্রা আসিল না। সমস্ত রাত্রি তিনি ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটািলেন। কেবলই মনে ভয় হইতে লাগিল—যদি কলা প্রত্যুষে গিয়া দেখি যে ছেলেটি জলাভক্ষ রোগের দারুণ আকার চীৎকার করিতেছে, তবে কি করিব? কিন্তু ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হুশিয়ার অবসান হইল। গিয়া দেখিলেন যে, ছেলেটি দিবা নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা ঘাইতেছে। বহুদিন পরে পান্তররও সুখে নিদ্রা গেলেন।

অনতিকাল মধ্যে এই অভিনব চিকিৎসা-প্রণালীর ব্যাতি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল এবং ছয় মাসের মধ্যে ৩৫০টি রোগী এই প্রণালী দ্বারা চিকিৎসিত হইল। তন্মধ্যে কোন-একটি রোগী কুরুর-দংশনের সাঁইত্রিশ দিন পরে চিকিৎসার্থ আসিয়াছিল বলিয়া রোগের হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পায় নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৬৭১টি রোগীর মধ্যে মাত্র পঁচিশটি মৃত্যুরূপে পতিত হয়। এই চিকিৎসার

আশাতীত সাফল্য দর্শনে ফরাসী দেশের বিজ্ঞান সমিতি (Academie des Sciences) দ্বারা গঠিত এক কমিটি প্যারী শহরে পান্তরের ইনস্টিটিউট (Pasteur Institute) স্থাপন করিবার জন্য চীফা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এক বিরাট গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহার নাম দিলেন ‘পান্তরর ইনস্টিটিউট’। এই বিজ্ঞান-সমিতির উদ্দেশ্য হইল জলাভক্ষ রোগের চিকিৎসা করা এবং সেই প্রসঙ্গে অন্যান্য বহুপ্রকার রোগের জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে সেপ্টেম্বর অসংখ্য নরনারীর আলীকর্ষাদ মাথায় লইয়া পান্তরর মহাপ্রাধান্য করেন।

পান্তরর শত শত সহযোগী বৈজ্ঞানিক ও ছাত্রকে সভার সন্মানে অহুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। আজ পৃথিবীর সকল দেশেই পান্তরর ইনস্টিটিউটের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সহস্র সহস্র রোগীকে নীরোগ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পান্তরর মানবজাতির যে মহত্বপূর্ণ করিয়া যে প্রভাব বিস্তার করিয়া গেলেন তাহা প্রবল পরাক্রান্ত শত শত সম্রাট, সেনাপতি বা রাজনৈতিকের প্রভাবের তুলনার সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

প্রান্তর-লক্ষ্মী

প্রীআন্তরোব সান্যাল, বি-এ

কে দিয়েছে তারে পরায়ে আদরে

গোধূম-ঘবের শাড়ী?

সবুজ আঁচল কাঁপে হাঁড়িয়া লেগে,

প্রাণ লয় মোর কাড়ি!

দেহের উজ্জল রংচুক কিবা—

নয় যে ফুলের কান্ধন বিভা!

মরি মরি আঁহা রূপের বিধার—

নিখিলের মনোহারী!

তিসির কুহু নর নয় কত,

পান্নার খাঁটি ছল,

পুত্রধূলর ঐ মেঘধর—

কুণ্ডিত কালে চুল।

হিজলের তরু সে যে অহুখন,

আলতার রাগে রাঙার চরণ,

খেজুর-রসের মদির গন্ধে

আঁখি ছুটি চুলু চুল।

যৌবন বৃষ্টি দিয়েছে তাহার

বৃকের ছয়াতে ধোল,

এ কি মধুরিমা! শুধু স্তামলিমা—

সবুজের হিল্লোল!

অপরূপ রূপ! প্রকৃতির হিয়া,

নিবিড় পুলকে উঠেছে নাচিয়া,

তার সনে যেন পরাণ আমার

হ'ল আজ উত্তরোল।

জয়, না পরাজয় ?

ঐক্যমূল্যচন্দ্র বোষ

ছেলেবেলা হইতে তাহার ডাকনাম ছিল উকা—
স্বভাবটাও ছিল তেমনি। যেখানে-সেখানে যখন-তখন
চুটোচুটি করিয়া বেড়াইত।

অপরূপ সুন্দরী সে—পাড়ারপায়ে ঘনবিন্যস্ত বনজঙ্গলের
মধ্যে যখন সে প্রজাপতির পিছনে তাড়া করিয়া বেড়াইত,
তখন তার দিকে চাহিলে চোখ কিরানো বাইত না।

তার বাবা ছিলেন বড় গরিব—অখাতনামা কোন-
একটা মহকুলা কোর্টের সামান্য উকিল। পৈতৃক বাড়িটা
বাঁকাতে কোন রকমে মাঝা শুঁজিবার ঠাই ছিল। কিন্তু
মন তাঁর তেজস্বী ছিল। তিনি কোন দিন তাঁর অর্থকষ্টের
কথা বলিয়া কাঁহারও সহানুভূতি উদ্দেশ্যে করিবার চেষ্টা
করেন নাই।

কিন্তু ভগবান তাঁকে সাহায্য করিতে কার্পণ্য করেন নাই।
উকার বয়স যখন আট বছর, তখন গ্রামের প্রাজ্ঞ জমিদার
অকিনাশ বাবু তাঁর ছেলে, অচলেশের সঙ্গে উকার বিবাহের
প্রস্তাব করেন; বাগদান হইয়া যায়। উকা তখন বিবাহ
কি মন্থিত জানি না, কিন্তু বিয়ে যে বাজী-বাজনার সঙ্গে
একটা মজার কিনিব এই ভাবিয়া সে তারি আনন্দ
পাইত। গ্রামের অন্তত লোকে তখন দরাজ হইয়া
বসিল, “বড়লোক কি আর গরিবের সঙ্গে লব্ধ করে ?
হু—একটা বছর বেতে-আঁবেতেই এ মতলব বললে বাবে।”

কিন্তু দুই-একটা বছর বাইতে-না-বাইতেই অবস্থা
কল্যাণী গেল। আকস্মিক একটা রোগে অকিনাশ বাবু মারা
গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বালক অচলেশেরও গ্রহবৈগুণ্য আরম্ভ
হইল। পার্শ্ববর্তী গ্রাম মনোহরপুরের চৌহুরীরা অকিনাশ
বাবুর পুরাতন কর্মচারীদের সহায়তার অনতিজ্ঞ বালকের
হাত হইতে সবই আত্মসাৎ করিয়া গুলিলেন। এদিকে
উকার বাবা উপাশঙ্কর বাবুরও পলার-প্রতিপত্তি হইতে
আরম্ভ হইল।

সে আজ অনেক দিনের কথা। উপাশঙ্কর বাবু এখন
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রেসিডেন্সি উকিল। উকা এখন
বড়লোকের মেয়ে। সে এখন নব্যভয়ের ভট্টাচার্যী। সর্বত্র
বড়লোকের সমাজে মেলা-মেশা—গন্ধমাসন। পুরাতনের
কথা সে বড়-একটা মান করে না—সর্ববিধে বাহ্যার
নব্যভয়ে বীকিত ধনীসমাজের অঙ্গসামিনী।

পুরাতনের একটা জিনিষ তাহাকে এখনও আঁকড়াইয়া
আছে—সে অচলেশ। বালাবয়সে তাহার বিবাহের

বাগদানের কথা তাহার মনে ছিল। তাই সে মনে মনে
ভাবিত বিবাহ করিতে হইলে অচলেশকেই সে বিবাহ
করিবে।

অচলেশ পুরাতনতরী হইলেও উকাকে বাস্তবিকই
ভালবাসিত। তাহার কারণ বোধ হয় তাহার আবার
অজ্ঞিত সংস্কার, উকার আনন্দময়ী প্রকৃতি, সর্বোপরি
তাহার নীলাচল স্বচ্ছ সরল গতি। উকা নিজের মনোভাব
কোন দিনই তাহার কাছে গোপন করে নাই। তাই বোধ
হয় আশাসলভ্য বস্তুর দিকে অচলেশ আরও আকৃষ্ট হইয়া
পড়িত; মনে মনে ভাবিত নিজের ভালবাসা দিয়া সে
উকাকে জয় করিবে।

অচলেশের নিরাড়ম্বর প্রাণের তেজস্বিতা, নিরহকার
সরলতা উকার ভালই লাগিত। কিন্তু তাহার পুরাতনের
প্রতি শ্রদ্ধা সে মোটেই পছন্দ করিত না। সর্বোপরি
অচলেশের হাসিমুখে সৈন্তবরণ তাহার কাছে অসহ
লাগিত। সর্বপ্রকার উচ্চাশাকে বিদ্যার দিয়া, শাস্ত
নির্জিকারভাবে মীন জীবনধারণ—ইহাতে বাহাজুরী কি ?

এক দিন সে অচলেশকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছিল—গরিব
লোককে সে কোন দিন বিবাহ করিবে না। অচলেশ যদি
তাঁহাকে মধ্যম ভালবাসে তাহা হইলে সে যেন প্রথমে
বড় হইবার চেষ্টা করে।

উত্তরে অচলেশ শুধু হাসিয়াছিল; বলিয়াছিল, “উকা,
অর্থে লোক কোন দিনই বড় হয় না। বড় হয় মনের
সম্পদে।”

উকা রাগিয়া উঠিয়া জবাব দিয়াছিল, “কিন্তু হাত-পা
থাকতেও যে অক্ষম, মাছুষ হওয়া তার পক্ষে বিড়ম্বনা। আর
যে নিজের জিনিষ পরে কেড়ে নিয়ে গেলেও রক্ষা করবার
চেষ্টা না-করে, সে একটা কাপুরুষ।”

অচলেশ উকার রোষবহি তেমনি প্রশান্তভাবে সহিয়া
বলিয়াছিল, “ঠিক বলেছ উকা, কিন্তু একের রোষে যে
অস্ত্রে কষ্ট পায় তা আমি চাই না। বিনি আমাদের
সম্পত্তি নিরেছিলা, তিনি আর এখন ভীষিত নেই।
বাক্স আছে, তবু এসব তাঁদের নিজের জিনিষ মনে
ক’রে পদম শাস্তিতে আছে। সে পুরনো বিষয় খুঁচিয়ে
কুলে কেন সে বেচারাঁদের আবার বিচার করি ?”

উকা কোনমতেই অচলেশের সাহস সহিতে পারে নাই।
বলিয়াছিল, “কিন্তু আমি হ’লে কোনদিনই ক্ষিপ্ত হই

থাকতে পারতাম না। আপনার ভালমাহুবি আপনাকেই থাক। শুধু আমার একবার বস্তু ত কে সে যে আপনার সমস্ত সম্পত্তি নষ্টে নিয়েছে ?”

অচলেশ জবাব দিয়াছিল, “সে কথায় আর প্ররোজন কি, উক্য ? আমি যে সে সম্পত্তি, সেই ঐশ্বর্য, এখন আর চাই না, এই কি ভোনার পক্ষে যথেষ্ট নয় ?”

উক্য দারুণ রোবে মুখ ঝাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

তাই অচলেশ উক্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সে ধীর, চিন্তাশীল,—নিরুপদ্রব শান্তিতে থাকিতে চায়। উক্য এখনও ঘূর্ণিহাওয়ার মত প্রবলোচ্ছ্বাসে ছুটিয়া বেড়ায়। অচলেশ দৈন্যের মধ্যে অপৌরুষ্য দেখিতে পায় না, উক্যর কাছে দারিদ্র্য একটা মহাপাপ। অচলেশ সমস্ত পুরাতনের মধ্যে দোষ, আর সমস্ত নূতনের মধ্যে গুণ দেখিতে পায় না। উক্যর কাছে প্রত্যেক পরিবর্তন, নূতন, কেবল কল্যাণের মুষ্টি।

এহেন উক্যর উপর অচলেশ প্রভুত্বের দাবি করে না, বহুভাটা তাহার সঙ্গে চলে মাত্র।

অচলেশ এম-এ পাস করিয়াছে। সে এখন কি-একটা বিষয়ে রিসার্চ করে ও কলিকাতার কোন-একটা কলেজে নামমাত্র বেতনে অধ্যাপনার কার্য্য করে। সম্রাতি তাহার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পাইবার একটা সুযোগ আশিয়াছিল। উক্য তাহাকে সে পদ গ্রহণ করিতে অনেক অহুরোধও করিয়াছিল। কিন্তু সে কাজ তাহার পোষাইবে না বলিয়া অচলেশ তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহা শব্দই উক্য তাহাকে ঠাট্টা করিয়াছে—শেষে বিরক্তও হইয়াছে। কিন্তু উক্যর বিরক্তি অচলেশকে টলাইতে পারে নাই।

দিনের পর দিন সে কলেজে যায়, কন্ঠান্তে জলযোগ দিয়া খেদিতে বাহির হয়। আবার কিরিয়া আসিয়া নিজের নিরুত্ত কোণটিতে পড়াশুনা করিতে বসে।

এইরূপ একবেশে দৈনন্দিন জীবনে সে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু হঠাৎ এক দিন তাহার প্রাণে নূতন সাজা আসিয়া পড়িল। প্রতিদিনের মত সেদিনও কলেজের পথে বাইতে বাইতে অকস্মাৎ নূতন আত্মবুকুলের সৌরভ তাহার শাসনকে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিল অমূরে সেওয়ারের দ্বারে লাক্ষ্মত আত্মশাবার চুতবুকুল সুরচিত হইয়াছে। মনে পড়িয়া গেল আত্ম কাক্সন হাস—এব বসন্তের আগমন-সংকেত। তাহার সমস্ত ইচ্ছার বেন আত্ম-বুকুলের সৌরভের ভিতর দিয়া বসন্তের আহ্বান অহুত্ব করিল। শিরায় শিরায় রক্ত অহুত্বিত বেন চুতবুকুলীর সহিত মিশিয়া গিয়া বালকী নৌকাকে কিনীল হইয়া গেল।

আজ বেন প্রাণ আর একাকী থাকিতে চায় না, এত অসীম আনন্দ উপভোগ করিবার এক জন সাথী চায়।

তাই সে কোন রকমে দু-এক ঘণ্টা কলেজে থাকিয়া বাহির হইয়া পড়িল উক্যর কাছে।

বিপ্রহরের রৌদ্র ঝাঁপা করিতেছে—শিচুঢালা রাস্তা রৌদ্রতাপে গলিয়া উঠিয়াছে—সেদিকে তাহার জ্ঞপন নাই। তাহার মনে হইল, ধনী আনন্দ-লাগে মন করিয়া উঠিয়া হাসিতেছে। জনবিরল রাস্তার দু-এক জন বাহাকে দেখিল, ইচ্ছা হইল তাহার কাছে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে আনন্দের খবর দেয়। বড় রাস্তার মানুষের আসিয়া দেখিল, একখানা ট্রাম চলিয়া বাইতেছে। কোন রকম ছুটিয়া গিয়া ট্রাম ধরিয়া বেশিয়া এক লক্ষে ভিতরে প্রবেশ করিল।

আলিপরের অভিজাত পল্লীর নির্জনতার মাঝে উক্যের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বৃহৎ সদরবারের কটকের পার্শ্বে জমাদার লহমন সিং আহারের পর খাটীয়া পাতিয়া বসিয়া ‘খেনি’ ডলিতেছিল। লহমন সিং অনেক দিনের পুরানো চাকর—অচলেশকে দেখিয়া সে সমস্তই উঠিয়া দাঁড়াইল। অচলেশ নিকটে আসিয়া কটকের পার্শ্বে বিলম্বিত একটি ক্ষুদ্র বাক্সের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জানিতে পারিল, উক্য বাড়িতে নাই। লহমন সিং তাহার দৃষ্টি অহুসরণ করিয়া বলিল,—দিবিশি, আরও কয়েক জন সাহাব, যেমনসাহেবের সঙ্গে বণ্টাখাসেক হ’ল বাইরে গেছেন। সন্ধ্যার আগে চা খেতে কিংবদন্ত। দাদাবাবু কি তত ক্ষণ বসবেন ? উক্যর অহুপস্থিতি তাহার মন রিক্ততার ভরিয়া দিয়াছিল। তাই সে লহমন সিংকে অন্ত কথা না বলিয়া শুধু “না, লহমন, আমি আর বসব না” বলিয়া যেমনই আসিয়াছিল, তেমনই বাহির হইয়া গেল।

বৃহত্তের মধ্যে জগতের সমস্ত আনন্দ তাহার চোখে নিস্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বিপ্রহরের কতগুলো বালকী নৌকায় তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইল, এত আগ্রহ এত আনন্দ সব বার্থ সব শূন্য। অন্তরনে ঘুরিতে ঘুরিতে সে মরশীমে আসিয়া পৌছিল। একখান-ওখানো বসিয়া, এদিক-সেদিক চলিয়া কার্জন-পার্ক ছাড়াইয়া গিয়া ইডেন উদ্যানের ছায়ানীতল এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

বিপ্রহর গড়াইয়া আসিয়াছে—সূর্য্যদেব পশ্চিমাশানে হেলিয়া পড়িয়াছেন। বৃক্ষপত্র বৃহৎ বৃহৎ কাঁপিতেছে—নীতল জলকণাবাহী সর্ষীর নদী হইতে আসিয়া মাঝে মাঝে বন্ধ বন্ধ বহিরা বাইতেছে। অমূরে মদীপর্বে শীতাবের বঙ্গীকনি মাঝে মাঝে বিরাট মৈত্রেয় হুকারের মত শুনা হইতেছে।

অচলেশের কোন দিকে সজ্ঞা নাই—বেন সে কাগিয়া বস দেখিতেছে। মনে হইতেছে জীবন তাহার উদ্বেগহীন নিরর্থক—তাঁহার কেহ নাই, কেহ তাহাকে চায় না। উক্য

কর্তব্যবোধে তাহার সহিত আলাপ করে মাত্র—তাহাকে ভালবাসে না।

কত ক্ষণ সে এমনই অভিভূতের মত বসিয়া রহিল, নিজেই তাহা জানে না। হঠাৎ একটা ঘটনা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে দেখিল, কিয়দূরে—অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে—যেখানে সপাকৃতি কৃত্রিম জলপ্রাচীরী ব্রহ্মসৈন্য দাঁড়ায়, কাককার্য্যখচিত প্যাগোডার পাদমূল খোঁজ করিয়া বাইতেছে সেখানে দুই জন নরনারী ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিছু ক্ষণ পরে দুইটি গোরা সৈনিক পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাগ্‌বিত্তা আরম্ভ করিল। তর্কবিতর্কের শেষ হইল হাতাহাতিতে।

ব্যাপার সুবিধানকর নয় বুঝিয়া অচলেশ বখন তাঁহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে তখন পুরুষটিকে অক্ষম করিয়া বীরপুরুষের স্ত্রীলোকটির দিকে ধাবমান হইতেছিল। স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিয়া উঠিল, পুরুষটি “help, help” বলিয়া বৃথালাশা শক্তিতে সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঠিক এইনি সময় অচলেশের বজ্রমুষ্টি সন্মুখে এক জনের নাসিকার উপর পড়িল। অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া দারুণ ব্যথা পাইয়া সে বসিয়া পড়িল। আর এক জন তত ক্ষণে ব্যাপার বুঝিয়া অচলেশের দিকে ছুটিয়া আসিল। ইতিমধ্যে দু-এক জন করিয়া লোক আসিয়া জমিতেছিল। গোরা দুইটি অবস্থা বুঝিয়া উপস্থিত পড়িয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাহার দিকে একবার রক্তচক্ষে চাহিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে প্রস্থান করিল। চারি দিক হইতে অজস্র প্রশংসার বাক্য অচলেশের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল—ভদ্রলোকটি গভীর রক্তজ্ঞতায় তাহাকে অভ্যাহা ধরিলেন। বিশম্বৃত্ত রমণী ডাগর ছলছল চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অচলেশ বখন তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া বাইতে চাহে তখন তাঁহারা কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চান না। ভদ্রলোক কেবলই বলিতে থাকেন, “আপনি আমার পরম বড়, ডাই; আপনি আজ আমার কনমান বন্ধা করেছেন।” বিপর ভাব কাটিয়া গেলে রমণী হাসিয়া বাসীকে বলেন, “দেখ, সাহেবীরানার কলেই তোমার আজ পরম শিক্ষা হ’ল। আর দাঁড়ার রসে ভিজিয়ে—সাহেব সাজবে, বীরপুরুষ?” পরে অচলেশের দিকে চাহিয়া বলেন, “আমি আসবার আগেই ঠিক বলেছিলাম—দু-এক জন জরুরীকারোয়ান সঙ্গে নিয়ে এস—তাঁরা উনি চান—বন্দে কয়েক টা উনি চান সাহেব-সেহের মত বেড়াতে। ভাগ্যে আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলেন—নইলে কি হ’ত বন্দু ভো?”

প্রশংসার অচলেশের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—সে এখন কোনমতে পলাইতে পারিলে হইত। কিন্তু উপকৃত্তরা

একবারে নাছোড়বান্দা। শেষে যখন কোনমতেই তাঁহার অচলেশকে ধরিয়া লইয়া বাইতে পারিলেন না, তখন তাহাকে তাঁহাদের নিজেদের নাম ও ঠিকানার কার্ড মিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে কাল অপরূহে সে নিশ্চয়ই তাঁহাদের বাড়ি বাইবে।

অচলেশের মন তখনও স্থির হয় নাই। মন বলিতেছে, সব শূন্য, সব ব্যর্থ; পরক্ষণেই অন্তরের তৃপ্তি বলিতেছে, না, না, আশ্বপরতায় যুথ নাই, আশ্বদানেই আনন্দ, নিজেকে বিলাইয়া দেওয়াই চরম সার্থকতা। অনেক ক্ষণ পরে অচলেশের মনের ঝটিকা শান্ত হইয়া আসিল। আর সে উদ্ধাকে নিজের জন্ত বিরক্ত করিবে না—তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া কষ্ট দিবে না। তাহাকে সুখী করিবার জন্ত সে নিজের দাবি ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত আছে।

* * *

মনোহরপুরের নবীন ভূম্যধিকারী শ্রামলবিকাশ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে বালিগঞ্জের সৌখীন পল্লীতে বাস করিতেছেন। তিনি অকৃতদার,—তবে বদ্ধমূল্যে তিনি এক জন অধিতীয় মহিলা-মনোরঞ্জক (ladies’ man) বলিয়া খ্যাত; এবং বিলাতে কয়দিনে তিনি কয়টি মহিলার মস্তক চর্চণ করিয়া ছিলেন, এ-বিষয়েও তাঁহার সময় সময় গভীর গবেষণা করিয়া থাকেন। বাড়িতে আশ্বীরের মধ্যে তাঁহার একমাত্র ভগিনী সুশীলা ও ভগিনীপতি হরেশ থাকেন। মিঃ হরেশ রায় কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। তিনি ব্যারিষ্টারী-শিক্ষা মানসে কোনরকমে বাপমায়ের বাস ভাঙিয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কিন্তু পরে অর্থভাবের দরুণ দারুণ মনোকাটে বোম্বাই হইতেই ফিরিতে হয়। তিনি শ্রামলবিকাশের উচ্চ আদর্শের আদর্শ অম্বুতরণ। একত্র থাকিয়া আহা-বিহারে, শরনে-সপনে শ্রামলবিকাশের লাহেবীরানার উৎকট আদর্শ তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন। দু-একবারই বড় ইচ্ছা—সুশীলাকে মনের মত করিয়া তোলেন। কিন্তু সে কিছুতেই সম্ভব-সাহেব হইতে রাজী হয় না।

তখন শ্রামলবিকাশ বর ছাড়িয়া বেশকিছু সুশিক্ষিত করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ভারতের ঘরে ঘরে সুস্তির বাতাস বহিবে—নরনারী বহিছা আলাপ-আচরণ করিবে, বিলাতী অম্বুতরণে প্রতি গৃহে আনন্দ-বৃদ্ধের উৎসব বহিবে, যুগ-যুগান্তে স্বাধীন প্রেমের যুথ আশ্বাদন করিবে! এই না হইলে জীবন?

শ্রামলবিকাশ কে-কখনও এমনি বিধিভয়ে বাহির হইরাহিন, সেই সময় হঠাৎ একদিন উদ্ধার সঙ্গে দেখা।

ব্যারাকপুরের রেলের পর উদ্ধা বাড়ি কিরিতাইল। একা সে মোটির লইয়া পনের বেগে চলিয়াছে।

গতিবেগে তাহার আনন্দ—ক্রমশঃ সে মোটরের গতি বন্ধিত করিয়া দিল। খানিক ক্ষণ পরে পিছন ফিরিয়া দেখে একটা মোটর তাহার অনুসরণ করিতেছে। পরাজিত হইবার পাত্রী উদ্ধা নয়—সে গতিশক্তি আরও বর্ধিত করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল অনুসরণকারীও দ্রুততর বেগে আসিতেছে। উদ্ধা আরও দ্রুত চলিল।

হঠাৎ পায়ের নীচে ভীম রবে যেন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল—ব্রাউকার ধাক্কা মৈত্রেয় সহসা প্রচণ্ড ভাবে টল-মল করিয়া উঠিল—উদ্ধা ব্যস্ত, টায়ার ফাটিয়াছে। এক মুহূর্ত সে চকু মুদ্রিত করিল—কিন্তু পরক্ষণেই অতি ক্ষিপ্ত, কৌশলী চালকের মত দ্রুত হস্তে মোটরের গতিবেগ কমাইয়া দিল। ভগবানের কৃপায়ই হোক, কিংবা নিজের ক্ষমতাতেই হোক, সে-যাত্রা উদ্ধা রক্ষা পাইয়া গেল।

তত ক্ষণে অনুসরণকারীর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। তাড়াহাড়ি নামিয়া শ্রামলবিকাশ উদ্ধার কাছে গিয়া বলিল, “উঃ, আপনার সাহসকে ধন্যবাদ; আমি পুরুষ হয়েও আপনার কাছে হেরে গেছি। আশ্চর্য—আপনার একটুও ভয় হ’ল না?—ভাগ্যে গাড়ীটা খুব ভাল, আর আপনার মত মূর্খক চালনা, সেইজন্যই যা ওটোর নি! কিন্তু তা না-হ’লে কি হ’ত মনে করুন ত?”

হাসিয়া উদ্ধা বলিল, “মনে আর করবো কি? মরতেই যদি হ’ত, তো এই ভেবে মরতাম যে আমি জয় ক’রে মরোছি—সেইটাই আমার আনন্দ—সেই আনন্দই আমার জীবন।”

আনন্দে শ্রামলবিকাশ লাকাইয়া উঠিয়া বলিল, “ব্রেভো! এত দিনে একটা মানুষ পেলাম! এত দিন আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম। দয়া ক’রে কিছু যদি মনে না করেন ত আমি আমার কার্ড আপনাকে দিচ্ছি—আপনিও যদি আমাকে আপনার সঙ্গে সময়-মত দেখা করতে অহমতি দেন—”

সেই দিন থেকে উদ্ধার সঙ্গে শ্রামলবিকাশের আলাপ।

জনবিরল বাগিচায় রাস্তা বহিরা অচলেশ প্রায় গোখুলি-বেলায় পূর্বদিনের কথামত উপকূলের ঘারে উপস্থিত হইল। কোঁরা লম্বা সেলাম করিয়া রূপার ট্রেতে হুরেশ রায়ের নামাঙ্কিত কার্ডখানাই লইয়া গেল। অচলেশ নিজের নামের কার্ড রাখে না—বিশেষতঃ হাঁহার কার্ড এখন হাঁহার কাছে কেবল পাঠাইলে নিজের আর কোন পরিচয়ের দরকার হইবে না, এই ভাবিয়া অচলেশ এইরূপ কার্ড করিয়া।

হুশীলার পক্ষাৎ পক্ষাৎ হুরেশ ড্রিং-কনের প্রবেশ-দ্বারে তাহাকে অগ্রসর করিলেন। কিন্তু হুরেশজিত ককের ভিতরে আসিয়া অচলেশ একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল—

সদুখে উপবিষ্ট উদ্ধাকে দেখিয়া। উদ্ধাও তাহাকে দেখিয়া প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেল; কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই সে উঠিয়া হাঁড়িয়া হাসিমুখে অচলেশকে স্বাগত করিয়া বলিল, “কি আশ্চর্য!—আপনিই কালকের ‘হিরো’? আপনার পেটে এত বিদ্যে, তা তো জানতাম না?”

অচলেশ খানিক ধামিয়া উত্তর দিল, “বিদ্যে তো আর দেখিয়ে বেড়াবার দরকার হয় না? সময়-মত কাজে লাগাতে পারলেই হ’ল।”

হুশীলা আগাইয়া আসিয়া বলিল, “এই যে, আপনার দেখছি গুর সঙ্গে আগে থেকেই চেনা-স্তনা আছে?”

অচলেশ শুধু বলিল, “হা”।

উদ্ধা কিন্তু সেখানেই ধামিল না। বলিল, “চেনা-স্তনা আন্ধকের নয়; অনেক দিনের। কিন্তু উনি যে কি, আশ্চর্য তা বুঝলাম না। এতদিন আমি জানতাম উনি নেহাৎ নিরীহ, গোবোকারী; কিন্তু আজ দেখছি আবার adventurous-ও বটে! এ আমার কাছে একটা নতুন আশ্চর্য্য!”

হুশীলা বলিল, “বাক, কথা কাটাকাটি পরে হবে। আহুন, আগে দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।”

শ্রামলবিকাশের সঙ্গে অচলেশের পরিচয় হইল। “ইনিই আমাদের উদ্ধারকর্তা—মিটার—” অচলেশ একটা নমস্কার করিয়া হাসিয়া কহিল, “মিটার-টিটার নই। পুরো বাঙালী—শ্রীঅচলেশ রায়, পিতা ৭অবিনাশ রায়; পৈতৃক নিবাস—মাধবগঞ্জ; আপাততঃ—নং বীডন ট্রাট।”

হঠাৎ শ্রামলবিকাশের মুখের ভাবান্তর হইল। “কিন্তু হাসি-ঠাট্টার মধ্যে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না।

হুশীলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—“কেমন দাদা? এখন কেমন জন্ম? কি ক’রে পরিচয় দিতে হয়, শুনুলে? কই, আর যে কথা বলছ না?” বলিয়া হুশীলা দাদার পরিচয় দিল—“ইনি শ্রীশ্রামলবিকাশ চৌধুরী, পিতা ৭নিমাইদাস চৌধুরী, মনোহরপুরের নতুন কমিশনার। নতুন বিলাত-কেরৎ ব্যারিষ্টার।”

অচলেশ হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিল।

হুশীলা বলিয়া উঠিল, “বা, রে, আপনি আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। ছেলেবেলায় আপনার বাবার নামও শুনেছি। অথচ এত দিন আপনাকেই জানি না?”

অচলেশ বলিল, “আমাকে জানবেন কোথা থেকে—আমি কি আর দানবার মত লোক? বাবা হযত নাম-করা লোক ছিলেন, তাই তাঁর নাম শুনেছিলেন।”

অচলেশ ও হুশীলার কথাই রাখা দিয়া উদ্ধা সকৌতুকে বলিয়া উঠিল, “হাঃ, আপনি বেশ ভ, নিসেন্স রায়?—আমরা যে এতগুলো লোক ব’সে ররেচি, আমাদের সঙ্গে

কথাই কইচেন না? আজ দেখি, অচলেশ বাবুর সঙ্গেই মেতে গেছেন?”

হুশীলা সন্দেহে বলিল, “হ্যাঁ, এতদিন পরে এক জন দেশের লোকের মুখ দেখলাম, দুটো কথা বলব না?”

উদ্ধা তেমনি কৌতুকভরা হাতে বলিল, “আমি ভাবলাম বুঝি কতজ্ঞতার আবেগে এত কথা বলছেন। তা আমরাও ত দেশের লোক, আমাদের সঙ্গেই বলুন না?”

—কি, আপনি দেশের লোক?

পলকের ক্ষণ পুরাতনের ছবি উদ্ধার মানসপট ভাসিয়া উঠিল। পরিহাস-ভরল হাসি অকস্মাৎ থামিয়া গেল; বলিল, “হ্যাঁ, উনি আর আমি ত এক গাঁয়েরই লোক।”

গ্রামশিক্ষা ও মূর্খের একসঙ্গে সোজা হইয়া উঠিলেন। উদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া গ্রামশিক্ষা বলিলেন “কি, আপনারা এক গাঁয়ের লোক? আপনি যে কোনদিন পাড়াগাঁয়ে থাকতে পারতেন, এ ত আমি ধারণাও করতে পারি না?”

বাস্তবিক আজকার এই উদ্ধাকে ছেলেবেলার সেই কদামণ্ডিত উদ্ধা বলিয়া চিনিবার কোন উপায় ছিল না। সে এখন মহানগরীর সর্বস্বত্ব্য কাজের অগ্রণী—আধুনিক শিক্ষিতা নারীসমাজের হালকাশয়ের প্রবর্তিকা।

অচলেশের সহিত উদ্ধার বড়-একটা দেখা হইবার সুযোগ হয় না। দৈবাৎ কোনদিন দেখা হইয়া গেলেও তাহাকে একাকী পার না। উদ্ধা তাহার হস্তখলিত হইতেছে—এই রকম একটা কথা মাঝে মাঝে অচলেশের মনে হয়। তাহার দৈন্ত, তাহার প্রতি উদ্ধার আচার-ব্যবহার আজকাল যেন একটা গোপন কাঁটার মত প্রায়ই তাহাকে বিধিত থাকে।

দু-এক দিন প্রকাতজ্ঞায়ে সে উদ্ধার সহিত আলাপ করিতে গিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মনে হয়, যেন সে এখন অচলেশের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে চায়। অচলেশের অভিমানস্বরূপ লম্ব প্রতিবারেই বিরক্তিত হুগার বলিয়া উঠে, “না, আর না, এখন আর উদ্ধার ছাড়া বাড়ানো উচিত নয়; সে বাহ্য করিতে চায়, করিতে দাও।” কিন্তু পর-সমুদ্রে আবালোর হৃদয় অধিকারের সংস্কার মনের কোণে উঁকি মারে।

সেদিন অচলেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উদ্ধার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু বাহিরের ঘরে আসিয়া যে তাহাকে সন্ধান করিল সে হুশীলা। একটা ছোট্ট মনকার করিয়া সহাত হুশীলা বলিল, “এই যে অচলেশবাবু, আশুপদ, হুঁস। সেদিনের পর তো আর আপনার দেখাই পাইনি?”

প্রতিবন্ধক করিয়া অচলেশ বলিল; “কি কথা বলি না।”

তাহার দুটি অমূল্য করিয়া হুশীলা কহিল, “কিন্তু আপনি যার খোঁজে এসেছেন, অচলেশবাবু, তিনি তো এখন এখানে নেই? তাঁরা তো সবাই নাটকের রিহার্সেলে গেছেন। তাঁদের ডেকে পাঠাব কি?”

অচলেশ মুহূর্ত্ত হাসিয়া বলিল, “না, আর ডাকবার দরকার নেই। তাঁদের না-দাস্য পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো। কিন্তু আমি কার খোঁজে এসেছি, আপনি জানলেন কি করে?” হাসিয়া হুশীলা কহিল, “সে কথা কি আর জানবার দরকার হয়? তারা যে আপনাকেই আপনাকে জানিয়ে দেয়?”

একটু বিধাতরে অচলেশ বলিল, “হ্যাঁ, তাহলে এর মধ্যে এ-সব কথা আপনারদের মধ্যে আলোচনা হয়ে গেছে?”

হুশীলা উত্তর দিল, “হ্যাঁ, সে তো অনেক দিন আগেই হ’য়ে গেছে।—উদ্ধা তো সবই বলেছেন? সেইজন্যই তো দাদার সঙ্গে কোন কথা এখনও ঠিক হয় নি?”

বিস্ত্রস্তভাবে অচলেশ বলিল, “আমিই তাহ’লে শুভকাজের প্রতিবন্ধক? কিন্তু আমি তো তাঁকে কোন বাধা দিই নি—কোন কথাতেও তাঁকে আবদ্ধ করিনি।”

হুশীলা বলিল, “ঠিক কথা; কিন্তু এখনও হয়ত তিনি নিজের মনের কাছে জবাবদিহি করতে পারেন নি—হয়ত বিবেক এখনও তাঁকে স্নায়ু স্নায়ু খোঁচা দেয়।”

অচলেশ বাহা তুমিতে আসিয়াছিল, আজ স্পষ্টভাবে সে-কথা তুমিতে পাইল। কণেক সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। হার রে, দুর্বল মানুষের মন। মনের মধ্যে যে-সময়ে অহর্নিশ গোপন আক্রমণ করিতেছে, আজ তাহার স্পষ্ট প্রকাশে সে কল্পবাক্য হইয়া রহিল।

ব্যথা পাইয়া হুশীলা বলিল, “বড় দুঃখ পেয়েছেন, অচলেশবাবু? আমার বড় দুর্ভাগ্য যে আমার কাছ থেকে আপনাকে একথা শুনতে হ’ল। কিন্তু আপনি এ-সব জানেন, কি জানেন না, তবে আমি নিজেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো, ভেবেছিল। সময় থাকতে আপনাকে সাবধান করে দেবার ইচ্ছাও ছিল।”

অচলেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, “না, আমাকে সাবধান করার দরকার নেই। কারও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ আমি চাই নে। এখন আমি চললাম। তিনি এলে বলুন, তাঁর ইচ্ছার অমুখারী কাজ যেন তিনি করেন—আমি সেটা সর্বাঙ্গতঃ সমর্থন করবো। তাঁর ওপরে আমার কোন রকম দ্বিধা আছে, এ কোন দ্বিধা বলে না করেন।”

অচলেশের অচলেশকে বাধা দিয়া হুশীলা কহিল, “এই নিয়ে চলতে থাকুন, অচলেশবাবু—আপনার

এত দিনের পরিচয়, তাঁর যুগের একটা কথা না-শুনে কি করে বাধেন ? তিনি যদি একটা ভুলই করতে দান—হীরে কেলে আঁচলে কাট বাধেন তাহলে কি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন না ?

—এ কি কথা বলছেন আপনি ?

—বল্ছি ঠিক কথাই। থাকে নিয়ে কথা হচ্ছে, তিনি আমার বড় ভাই, আমার পুত্র, তাঁকে আমি জানি। কিন্তু যেখানে এক জন নারীর সমস্ত জীবন নির্ভর করছে, সেখানে তিনি বড় বড় পুত্রাই হ'ন, তাঁর সম্বন্ধে সত্য বলাই উচিত। এ-সব কথা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গও আমাদের মধ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি আর একটু বসুন। উক্তাও আপনাকে সমস্ত কথা বলবেন বলছিলেন—তিনি তো গোপন করতে চান না ?

অচলেশ একটু শুক হাসিয়া বলিল, “তাই তো এত দিন আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম—উক্তার স্বভাবে তো গোপনতা নেই ?”

“কি গোপনতা দেখলেন তবে আজ ?” বলিয়া উক্তা হুশীলা ও অচলেশের সম্মুখে আসিয়া পড়িল।

পলকের জন্ত অচলেশের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, বলিল, “তা কি তুমি জান না ?”

—হাঁ, কতকটা আশ্চর্য্য করছি। কিন্তু আমি তো তারও কাছে সমস্ত কথা বলতে বাধ্য নই ?

—তা আমি জানি। সেইজন্যই আমি এঁকে বলছিলাম তোমার বলতে যে আমি তোমার উপর কোন দিন কোন দাবি করি নি, আর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ না কর, এই আমার ইচ্ছা।

প্রেমের হাসি হাসিয়া উক্তা বলিল, “উপদেশের জন্ত অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার অসাক্ষাতে আমার কোন গোপন কথা নিয়ে কেউ আলোচনা করে।”

নির্ধিকার শব্দ অচলেশ এত দিনে সহসা ধপ করিয়া গিয়া উঠিল; বলিল, “কি কাছে তোমার কোন কথা গোপন হ'ল, উক্তা ?—এঁর কাছে তো নয় ? তবে আমার কাছেই আজ তোমার সব কথা গোপন হয়েছে ?”

যুগের কথা লুফিয়া উক্তা পান্টা জবাব দিল—“যদি বলি তাই ?”

অচলেশ মেরুদণ্ডে হইয়া বলিয়া উঠিল, “কিন্তু সেদিন আমার কাছে তোমার কোন কথা গোপন ছিল, উক্তা, যেদিন তোমার পিতা আমার হাতে তোমার নংপে দিয়েছিলেন ? যেদিন গভীর হৃৎকল্লভের সঙ্গে তিনি আমার বকে লুফিয়ে ধরেছিলেন ? তার পরে অনেক বদলে গিয়েছে—তোমার বক্তৃতা বদলেছে—আমার আগে বড়লোক হয়ে তার পরে তোমার বিয়ে করতে চাইতে বলেছে ; সবই খেতেছি, বুঝেছি—কিন্তু তখনও তুমি তোমার

কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না ? আজ হু-বিন নতুন বন্ধু পেয়ে সবই ভুলে গেছে ?”

বন্ধুর দিয়া উক্তা বলিল, “তাই বুধি নির্জনে নতুন বন্ধুনার কাছে পুরানো বন্ধুদের বাহাদুরী করছিলেন ?”

অচলেশ গম্ভীরা উঠিয়া বলিল, “উক্তা,—চুপ ! আর কোন কথা নয়। আমি চললাম। প্রার্থনা করি শ্রামল-বিকাশকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হও।”

অচলেশ চলিয়া গেল। তাহার গমনপথের দিকে উক্তা কক্ষদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মনে হইল হঠাৎ কি যেন হইয়া গেল ! বাহা নিকটতম, চির আপনার, তাহাই যেন আজ দূরে—চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইচ্ছা হইল একবার ডাক ছাড়িয়া ধান্দে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রামলবিকাশের মোটরের হর্ণ তাহার কানে প্রবেশ করিল। আজ পুরাতনের বিদায়, নূতনের আদ্বান !

মাস-কয়েক কাটিয়া গিয়াছে। শ্রামলবিকাশের সহিত উক্তার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহাদের ইহাঙ্কে আনন্দে উৎফুল্ল হইবার কথা, তাহাদের মুখে বিশেষ আনন্দের আভাস দেখা যায় না। উক্তা যেন সর্ব্বদাই উন্নয়ন, শ্রামলবিকাশ চিন্তাময়। হুশীলারও যেন হুয়ে দূরে সরিয়া বাইবার ভাব। অথচ মুখে কেহ কিছুই প্রকাশ করে না।

হুশীলা যেন ইহাদের কাছে আর একটা রহস্য। সে উক্তাকে আর কোন কথা বলে নাই বটে, কিন্তু সে যে তাহাদের বিবাহ বিশেষ অমুয়োদন করিতেছে না, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। কিছু দিন পরে উক্তার অসাক্ষাতে শ্রামলবিকাশের সহিত তাহার মস্ত একটা বোঝাপড়া হইয়া গেল।

শ্রামলবিকাশ স্থির থাকিতে না পারিয়া এক দিন হুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, তোমার ব্যাপারখানা কি, বল দেখি ?”

—কেন, কি দেখলে ?

—সর্ব্বদাই একটা আড়োআড়ি, ছাড়াছাড়ি ভাব, কি যেন মনের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে চলছিল ?

—এ আর আজ তোমার নতুন ক'রে কি কলব দান ? তোমার তো কোনদিন কোন কথা লুকোই নি ?

—ওঃ, আজও তোর সে ভাব গেল না ? কেন, আমাদের এ-বিষয়ে তুমি ধারাপটী কি দেখনি, বল দেখি ?

হুশীলা কথা কহিল। স্থির স্মৃতিতে নেড়ে শ্রামল-বিকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, “দাদা, এই আমার শেষ অমরোষ রাক্ষ। উক্তাকে তুমি বিয়ে ক'রে না।”

—কেন ?

—এতে তোমরা দুজনই অসুখী হবে।

—তার কারণ ?

—তার কারণ—উক্কা শুধু উত্তেজনার বশেই তোমার বিয়ে করছে। আর সত্য কথা বলছি, মাক্, করো দাদা, তুমি উক্কার উপযুক্ত নয়।

শ্রামলবিকাশ রোববলি দমন করিয়া একটু হাসিল, বলিল, “কিসে আমার এমন অসুপযুক্ত দেখছি ?”

—তোমার জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে—আমার তো কিছুই অজানা নেই দাদা ? নৃতনত্ব, পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে কি কাজই না এত দিন করেছে ? শুধু বিদেশে নয়, এখানেও তো বড় কম করো নি ?—তোমার সারাজীবন যে মিথ্যার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ? আমার খালি ভয় হয় যে কোন্‌দিন তোমার ছদ্মবেশের মুখোশ খুলে গিয়ে আসল রূপ বেরিয়ে পড়বে—সেদিন আর অপমানের অন্ত রইবে না।

বিকৃত স্বরে শ্রামলবিকাশ বলিল, “বটে ?”

হুশীলা বলিয়া বাইতে লাগিল, “তার চাইতে তোমার পারে ধরে বলছি, দাদা, তাকে ছেড়ে দাও। এর চাইতে অনেক ভাল হুমকী মেয়ে তুমি পাবে—কিন্তু এসেয়ে তোমার জন্ত নয়। এর মনোভাব, তোমার আচার-ব্যবহার, ছ-খিনে তোমাদের জীবন বিষয় করে তুলবে। এর সঙ্গে মিশতে দাও তাকে, যে এর জন্ত সৃষ্ট হয়েছিল—যে আকাশের মত নির্মল, স্বচ্ছ, অসীম।”

—কে সে ?

—যে তার লাম্বালোর বাগদস্ত—ওই চিরদরিজ্ঞ অচলেশ। ভগবান জানেন, কেন আমার মনে হচ্ছে, তার ওপর আমরা বড় অবিচার করছি। তাকে আমরা সর্বস্বত্বারা করে ফেলছি।

এবার শ্রামলবিকাশ ধৈর্যহারা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “কি, আবার অচলেশের হয়ে ওকালতী করতে এসেছ ? বার খাও, তারই ঘর পোড়াও ! জান, এখনও তুমি আমার আশ্রয়ে আছ। এসব বলতে হয়ত বাইরে গিয়ে বল, আমার ঘরে নয়।”

হুশীলা কঁদিয়া ফেলিল, বলিল, “তুমি, দাদা, আজ আমার এমন কথা বললে ? কেন তোমার এসব বললাম, বুঝলে না ?”

হুঃখে, অভিমানে হুশীলা চলিয়া গেল।

শ্রামলবিকাশের সখিৎ কিরিল তখন, বখন পাড়ী ডাকাইয়া আনিয়া জিনিসপত্র তুলিয়া দিয়া দাবীর সহিত হুশীলা ঘাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিয়া তাহার পারে প্রবেশ করিল, বলিল, “মনের হুঃখে অনেক কথা বলে ফেলিয়াছি দাদা, আমার মাপ করো।”

শ্রামলবিকাশ তাহার পানে চাহিয়া বলিল, “কি হয়, হুশী, তুমি বাচ্ছ কোথায় ?”

হুশীলা নিরন্তর রহিল।

শ্রামলবিকাশ তাহার হাত দুখানা চাপিয়া বলিল, “ছোট বোনটি আমার, এবারকার মত দাদার দোষগুলো ক্ষমা কর দিদি।”

ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া হুশীলা বলিল, “দাদা, দোষ কারও একলার নয়, সবই আমাদের অদৃষ্টের। তবে আমাদের যে আর একসঙ্গে থাকা হ’তে পারে না, এটা ঠিক।”

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া শ্রামলবিকাশ বলিল, “বুঝেছি, তোর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। কিন্তু এটা দু-দিন পরে করলে হ’ত না ? আজই তোরা আমার একলা ফেলে গেলি ?” হরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, “কি হে, হরেশ, তুমিও কি এর সঙ্গে পাগল হ’য়ে গেলে ? আমার হ’য়ে দুটো কথাই বল না ?”

মিঃ হরেশ রায় কি বলিলেন ঠিক করিতে না পারিয়া শুধু মাথা চুলকাহিতে লাগিলেন।

এবার হুশীলা হাসিয়া ফেলিল, শ্রামলবিকাশের পানে চাহিয়া বলিল, “আমরা কি তোমার ফেলে বাচ্ছি, দাদা ? তবে মনটা একটু খারাপ হয়েছে, তাই ভাবছি কয়েকটা দিন একটু ঘুরে আসি।”

—তবে এসব কান্দকর্ম করবে কে ?

—কিসের ? বিয়ের ? তোমাদের তো সাহেব, মেমসাহেবের বিয়ে, দাদা, এতে আর কাজকর্মের কিসের দরকার হবে ? বিয়ের সময়-সময় থবর দিও। দেখানোই থাকি না কেন, তখন এলেই তো হ’ল ?”

দাদার পদগুলি লইয়া হুশীলা ও হরেশ কাছির হইয়া গেল।

উক্কা বখন শ্রামলবিকাশকে হুশীলাদের চলিয়া বাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন শ্রামলবিকাশ বলিল, “তাহারা দিন-কয়েকের জন্য বেড়াতে গেছে।”

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বখন তাহারা কিরিল না, তখন উক্কা একটু সন্দিগ্ধ হইয়া প্যামলকে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, সত্যি করে বল তো, কেন তারা চলে গেল ?”

উক্কার নজরে ভীত হইয়া শ্রামলবিকাশ ধানিকটা অর্জলতা না বলিয়া পারিল না; বলিল, “সত্যিই তারা বেড়াতে বাচ্ছে বলে গেল। কিন্তু তার আগে তার সঙ্গে আমার একটু কল্যা হইয়াছিল।”

—কি নিয়ে ?

—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে, অথচ এখনও আমি তোমার কাছে একটা সত্য গোপন করছি এই নিয়ে।

—কি সত্য গোপন করছো, আর কেনই বা করছো তাই ?

—কিছুই তোমার কাছে গোপন করার ইচ্ছে ছিল না, উদ্ধা; নাইও।” বলিয়া একটু থামিয়া শ্যামল-বিকাশ পুনরায় বলিল, “এ-সব কথা অনেক দিন আগে থেকেই তোমায় বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু একটা সন্কেচ, তেমন একটা লজ্জা, সর্বস্বাই আমার বাধ দিত। এত দিন সে-কথা বলতে পারি নি বলে আমার ক্ষমা করা, উদ্ধা।”

একটু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উদ্ধা বলিল, “এখন বল।”

শ্যামলবিকাশ একটা ঢোক গিলিয়া আরম্ভ করিল, “দেখ, আমি যখন বিলাত যাই, তখন আমার প্রথম যৌবন, পৃথিবীকে আমি সেই সর্বপ্রথম হৃদয়ের চোখে দেখছি। সে-সময় প্রথম প্রেমের নেশায় আমি এক ইংরেজ বাণিককে ভালবেসেছিলাম।”

—তার পর?

—আমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা সব ঠিকঠাক হয়েছিল। কিন্তু বিয়ে হবার আগেই বাবা সে-কথা জানতে পেরে প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। তার ফলে তাকে পরিত্যাগ করে আমাদের ভারতবর্ষে ফিরে আসতে হয়—বিয়ে হয় নি।

—বেশ বীরপুরুষ তো?—তোমরা সবাই দেখছি এক ছাঁচে গড়া?

—আমার সে অসহায় অবস্থার দিনকার দুর্দলতা মাপ করে উদ্ধা। কিন্তু তার পরে খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে, তাকে বিয়ে না-করে আমি ভালই করেছি। এক জন ইংরেজ যুবককে বিয়ে করে সে এখন হুবেই আছে। উদ্ধা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল—কথা কহিল না। মনের গোপন কোণে তাহার কি কোন সন্দেহ জাগিয়া উঠিতেছিল? হয়ত সমস্ত সত্য এখনও সে জানে নাই।

উদ্ধাকে নিরন্তর মেথিয়া শ্যামলবিকাশ পুনরায় কহিল, “আমার দেই একটাবারের দুর্দলতা মাপ করে, উদ্ধা; যা হয়েছে, ভালর জন্তই হয়েছে। তার সঙ্গে বিয়ে হ’লে তো আর তোমার পেতেম না। আর আমার মনে কোন মলা নেই, গোপনতা নেই। সব ধুরে পুছে কেলে এখন আমি তোমারই মিলনপ্রতীক্ষার বসে আছি—আমার সব কথাই তোমায় বলেছি, উদ্ধা।”

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্যামলবিকাশের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া উদ্ধা বলিল, “তোমার সব কথাই বলেছ? আর তো কোন কথা গোপন নেই?”

দৃঢ়স্বরে শ্যামলবিকাশ বলিল, “না, কিছু গোপন নেই; আমার কুমি বিশ্বাস করতে পার, উদ্ধা।”

উদ্ধা হাসিল, “বেশ, বীকারোক্তির পুরস্কার-স্বরূপ তোমার একটাবারের দুর্দলতা মার্জনা করে নিলাম।

কিন্তু দেখো, আর যেন অসত্য, গোপনতা, কিছু তোমার মধ্যে না থাকে; আবার যেন কোন দুর্দলতা না আসে।”

হুশীলা ও হরেশ এখানে-সেখানে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখি তাহার মনোহরপুরে গিয়াছে—শ্যামলবিকাশ এসংবার পাইরাছে। সে একটু চিন্তিত হইল। মনোহরপুরে হুশীলার পিতৃস্বত্ব একখানা বাড়ি ও আশপাশের ছ-চারখানা গাঁয়ে কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে। সে-সব এতাবৎকাল শ্যামলবিকাশই রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছে।

কিন্তু শ্যামলবিকাশের চিন্তা চরমে পরিণত হইল তখন, যখন তাহার কাছে সংবাদ আসিল যে, হুশীলা তাহার ওকালতনামা (Power of Attorney) খারিজ করিয়াছে। কেন এ চিরপ্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইল? হুশীলা চায় কি? দাক্ষিণ হস্তিকৃত্য, সংশয়ে শ্যামলবিকাশের মুখ মসীময় হইয়া উঠিল।

দু-এক দিন পরে হঠাৎ একখানা প্রকাণ্ড সোটিরকার এক দিন অচলেশের জরাজীর্ণ দ্বারের সম্মুখে থামিল। অচলেশ শ্যামলবিকাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রথমে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

শ্যামলবিকাশের মুখ স্নান—কপালে চিন্তার রেখা। ছোট একটা নমস্কার করিয়া সে একটা গোলাপী রঙের খাম অচলেশের হাতে দিয়া বলিল, “আমি নিজেই আমার বিয়ের নিষ্পত্তি করতে এসেছি, অচলেশবাবু, আশা করি আপনি আস্বেন—কোন বিবাদ-বিসম্বাদ মনে রাখবেন না।”

অচলেশ বলিল, “না, বিবাদ-বিসম্বাদ আর কি—ভবে আমি ভেবেছিলাম, আপনাদের কাছে আমার আর না-বাওয়াই ভাল।”

অতি আগ্রহে শ্যামলবিকাশ বলিল, “না, সে কি হয়, সে কি একটা কথা? আর আপনি যে আমাদের কি, তা কি আমরা জানি না?”

উত্তরে অচলেশ শুধু মাথা নাড়িল।

শ্যামলবিকাশ বলিয়া বাইত লাগিল, “আজ বিশেষ করে আপনার একটা ব্যক্তিগত চাইতে এসেছি। কসল, আপনি আমার কথা রাখবেন?”

অচলেশ বলিল, “সত্য হ’লে রাখবো না কেন?”

শ্যামলবিকাশ মুহূর্তের কি যেন বলিল।

তার পর শ্যামলবিকাশ অচলেশের হাত-হাথান চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “বুন, তাহ’লে এসব কথা মূলাকরেও উদ্ধার কাছে বলবেন না? হুশীলা অল্পকাল সন্দেহ করেছে বোধ হয়, কিন্তু সমস্ত কথা জানে না।”

একই খামিরা শ্রামলবিকাশ অচলেশের মুখপানে চাহিয়া অচলেশ কোন কথা কহিল না। শ্রামলবিকাশ পুনরাবৃত্তি বলিল, “হুশীলা বোধ হয় সমস্ত না জানলে কোন কথা বলবে না; বললেও উদ্ধা তুলবে না। কিন্তু আপনার মুখ থেকে কোন কথা শুধলেই উদ্ধা বেকে দাঁড়াবে। আপনি তো জানেন, সে ষড়্ অতিমানিনী, জেদী ধরনের মেয়ে। বলুন, আপনি কোন কথা বলবেন না—আমার জীবনের প্রধান সুখশান্তি নষ্ট করবেন না?”

অচলেশ তড়িত হইয়া গেল। তাহার বুকের মধ্যে যেন সহস্র হাতুড়ি একসঙ্গে বাধিতে লাগিল। কণেক শ্রামলবিকাশের মুখপানে চাহিয়া ভাবিল—লোকটা বলে কি? কাহার কাছে এ-কথা বলিতেছে, কি পরিমাণে আত্মত্যাগ তাহার কাছে চাহিতেছে সে কি জানে না? অথবা এই হরত তাহার প্রকৃতি—হরত তাহার আত্ম-সুখের কাছে অপরের ক্ষয় কিছুই নয়। বাই হোক, উদ্ধাকে সে তো বলিয়াছে, তাহার উপর কোন দাবি রাখে না—আর এত বিন পূরে সে কি স্থপিত স্বার্থের জন্ত এমন কর্মরোচিত কাজ করিবে?

অচলেশের নীরবতার শ্রামলবিকাশ ধৈর্য্যাহারা হইয়া পড়িল—তাহার হাত ছুঁনা আবার সঙ্গেই চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “কি, আমার কি এই দয়ালু করবেন না?”

অচলেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইল; বলিল, “কোন দরকার কথা নয়, শ্রামলবিকাশ! আমি ত উদ্ধাকে অস্ত্র কিছুই জোরে কোন দিনই আপনার করতে চাই নি?”

শ্রামলবিকাশ তথাপি বলিল, “তাহ’লে উদ্ধাকে এর কোন কথাই বলবেন না, প্রতিজ্ঞা করুন।”

অচলেশের সঙ্কল্পে সীমা উত্তীর্ণ হইল; বলিল, “ভুলোকেদের কথাই প্রতিজ্ঞা—এর বাড়া আর কিছু বলতে পারি না।”

* * *

কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ শ্রামলবিকাশ এত শীঘ্র বিবাহের দিন স্থির করার উদ্ধা তাহাকে অস্বাভাবিক করিল। হাসিয়া শ্রামলবিকাশ বলিল, “এটা তোমাদের জন্ত একটা ‘সারপ্রাইজ’। আরও তোমার জন্ত কত কি করবো, ঠিক করেছি, তার তুমি কি জান?”

নবীনব্দের নেশার উদ্ধা নাচিয়া উঠিল, বলিল, “বশেই না একবার?”

খাড়া নাড়িয়া শ্রামলবিকাশ বলিল, “উহ; তা বলবো কেন?—তা’হলে আর সবাই কি হ’ল? সমস্ত বুকে সব বসুন্ডে হয়ে ছো?”

তারপরে কয়েকটা দিন বে কেমন্ করিয়া কাটিয়া গেল, উদ্ধা ভাবী জানে না। সর্বদাই চুটাইটি, হাত-

পরিহাসের ভিত্তর দিয়া হ হ করিয়া দিনভলা চলির গেল। হুশীলা এখনও আসে নাই—বাহা-বিপত্তি ঘটাইবার কেহ নাই। শ্রামলবিকাশের মুখেও হাসি ফুটিয়াছে। উদ্ধাকে লইয়া যেকোন যেকোন ঘুরিয়া সে প্রায় কাপড়-চোপড় অলঙ্কারপক্ষে লাখখানেক টাকা খরচ করিয়া ফেলিল। এত টাকা খরচ করাতে উদ্ধা কৃত্রিম অস্বাভাবিক করিল। সহাস্যে শ্রামলবিকাশ তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, “বেশ করছি গো, বেশ করছি; আমার টাকা আমি খরচ ক’রে যদি তোমার মনের মত সাজাই, তাতে তোমার বলবার কি আছে?”

উদ্ধা কৃত্রিম রোমে সজ্জভঙ্গে শ্রামলবিকাশের পৃষ্ঠদেশে ছোট্ট একটা কিল মারিল।

সম্পূর্ণভাবে বিধা ত্যাগ করিয়া উদ্ধা এখন আপনাকে শ্রামলবিকাশের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। আর অচলেশ?—হ্যাঁ, অচলেশ বলিয়া কেহ ছিল বইকি! মাঝে মাঝে তাহার কথা মনে হয় বইকি! তাহাকে লইয়া শ্রামলবিকাশ তাহার সহিত মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করে! উদ্ধা অভিমান করিলে শ্রামলবিকাশ তাহাকে খেঁচা দেয়—

“কি গো, অচলেশ-বিরহিণী!”

ক্রকুটি করিয়া উদ্ধা বলে, “ও আবার কি কথা?”

তরল হাসি হাসিয়া শ্রামলবিকাশ জবাব দেয়, “কেন, ঠিক কথাই বলেছি ত? তুমি ত অচলেশেরই?”

পরিহাসের হুরে উদ্ধা বলে, “তাই যদি বোঝো, তবে পরব অপহরণ কর কেন? আমি কিন্তু ও-জিনিষটা একদমই সহিতে পারি না, তুমি বাই বল না কেন!”

শ্রামলবিকাশের বুকটা ছাঁচ করিয়া গুটে!

উদ্ধা ভাবে,—আহা, যেটার! সে বড় কষ্টে আছে, না? কিন্তু উদ্ধা নিকুপার, তাহার জন্ত কি করিবে? মন ত তাহাকে চায় না? হ্যাঁ সত্যই কি তাই? উদ্ধাত একটা নীকশাস উদ্ধা চাপিয়া বায়। আহা কি কষ্টেই না সে আছে? কিন্তু তাহার কষ্ট সে নিজেই বোঝে না—এমন অপদার্থ, অক্লম সে! বাই হোক, উদ্ধা তাহার জন্ত বখালাবা চেষ্টা করিবে। শ্রামলবিকাশকে বলিয়া তাহার ভাল একটা কাজকর্মের সংস্থান করিয়া দিবে—নিজে একটি হুন্দরী ঘরে দেখিয়া তাহার বিবাহ দিবে।

আজ উদ্ধার বিবাহ! অচলেশ গোলাপী রঙের ধামধানা একবার গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল; তারপর অতিসম্পূর্ণ সেটা বুকপকেটে রাখিল। বরাবর হায়ে উঠিয়া আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কি তাহার হইয়াছে—কি তাহার স্মিহা—সে তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিল না। সর্বদ্বারা হইবেও নাহব কি এমন উদাস, আপনহারা হইয়া বসিয়া র?

সন্ধ্যাৰ সন্ধ্যা সন্ধ্যা তাহাৰ মনে পড়িল, এখন হঠাৎ
কিবাৰ বিবাহ হইতেছে। সে কি কৰিবে, বাইবে কি ?
কিবাৰ ভাবিল, না, বাইব না। পরকণ্ঠেই মনে হইল,
১ গেলে উক্কা তাহাকে কাপুৰ মনে কৰিবে;
২ চিন্তা অচলেশের অসহ। না, উক্কা দেখুক, অচলেশ
পাপুৰ নয়।

অচলেশ প্রস্তুত হইয়া ঘৰদেখে গাঁড়াইয়াছে, এমন সময়
কপিওন আসিয়া তাহাৰ হাতে একখানা পত্ৰ দিয়া গেল।
তাহাৰ উপৰকাৰ হাতের লেখা সম্পূর্ণ অপরিচিত। পত্ৰ
দািয়াছে, তাহাৰ কলেজের ঠিকানা, সেখান হইতে ঘুরিয়া
হই-এক দিন পরে তাহাৰ ঘৰে পৌছিয়াছে। খাম খুলিয়া
দেখিল, চিঠি লিখিয়াছে—হুশীলা। হুশীলা
লিখিয়াছে যে সে অচলেশের ঠিকানা জানে না বলিয়া এত
দিন চিঠি লেখে নাই। সম্প্রতি তাহাৰ কলেজের নাম মনে
ডায় সেই ঠিকানাতেই সে চিঠি দিতেছে। অগত্যা কুশল-
প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করার পরে হুশীলা লিখিয়াছে যে, সে
এক দিন পরে নিঃসন্দেহে জানিয়াছে তাহাদের প্রায় সমস্ত
সম্পত্তিই অচলেশের। হুশীলার দুৰ্ভাগ্যক্রমে তার পিতাই
স-সম্পত্তির অপহাৰক। হুশীলাও সে-সম্পত্তির কতক
দংশ পাইয়াছে। কিন্তু হুশীলা তাহাৰ পিতাৰ, তাহাৰ
পত্নীৰ এ কলম অপনোদন কৰিবে। অন্ততঃ তাহাৰ
মংশ অচলেশের যে-সম্পত্তি আছে তাহা তাহাকে ফিরাইয়া
দিবে। তাই সে সমস্ত দলিলপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিতেছে।
সম্পত্তি দলিল ফিৰিয়া পাইলে অচলেশ বৃত্তিতে পাৰিবে যে,
স-সম্পত্তি একবাৰ কোটে দাখিল কৰিলেই সম্পত্তি যে
অচলেশের তাহা নিঃসংশয়িতৰূপে প্রমাণিত হইবে।

অচলেশকে যেন একসঙ্গে সহস্র বৃত্তিক দংশন কৰিল।
১ ভগবান, এ কি কৰিলে ? আজ নিরাশাৰ ঘাৰে গাঁড়াইয়া
এ আলোক কেন, দয়াময় ? সবই তো চলিয়া গিয়াছে,
তবে এখন আর এ প্রলোভন কেন ? আপনা হইতে যদি
দিলে, তবে সময় থাকিতে একবাৰ দিলে না কেন ?
অচলেশ উন্নতের মত হাসিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গেই সে চমকিয়া উঠিল। একি, কি কৰিতেছে
স, পাগল হইয়া গেল নাকি ? সে অচলেশ, অচলেশই
হইবে। ভগবান বস, হাঁও, সে দুৰ্লভতা ভয় কৰিবে।
কিন্তু আজ নয়—আজ আর তাহাৰ কাছে বাওঁয়া হইবে না।
কি জানি, আদিত্য তো নান্দ্য—যদি কিছু ক'রে বসি ?

আত্মলিপিকাল বৰবেশে বিবাহসভায় আসিয়াছে। মুখে
তাহাৰ হাসি খেলিয়া গেলোও সে যেন বহুত ডায়ে এক-
একবাৰ এমিক-ওমিক চাহিতেছে। যাহাৰা তাহাৰ নিত্য
দত্তক, তাহাৰেই সঙ্গে একটা কি জলব শোনা যাইতেছে।
—সে বাই হোক, সংবাদটা তখন জয়ধ্বজের সঙ্গেই বহিয়া

গেল। কেহ সেই কথা প্রকাশ কৰিয়া কিবাৰে সময়
গুণগোল কৰিতে দিল না।

নিৰ্কিয়ে শুভকাৰী সম্পন্ন হইয়া গেল।

পরদিন—তখনও অন্ধশোণয় হয় নাই। নিশান্তের শীতল
বাতাসে রাজকিঙ্গাগরপল্লিট অচলেশের চোখে সন্ধ্যাত্ত একটু
জ্বলা আসিয়াছে। এমন সময় বৃদ্ধ লছমন সিং আসিয়া
অতি সন্তপ্ণে তাহাৰ উপাধান-নিম্নে কি একটা জিনিষ
রাখিয়া দিল।

অচলেশের তত্ত্বা কাটিয়া গেল ; সে উঠিয়া বসিল। সঙ্গে
সঙ্গে যেন সানাইয়ের বিদ্যারাগিণী তাহাৰ কানে প্রবেশ
কৰিল—মনে পড়িল, আজ উক্কাৰ নূতন জীবনের প্রথম
প্রভাত।

লছমন সিং ঘাৰপ্রান্তে অপেক্ষা কৰিতেছিল। অচলেশ
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কৰিল, “কে, রে ?”

—দাদাবাবু আমি, লছমন।

—কি হয়েছে, রে, লছমন ?

লছমন সরিয়া আসিয়া মুহূৰ্ত্তে বসিল, “দিমিণি একটো
চিঠি ভেজা। হামু হুঁয়ে পর রাখ দিয়া। আপু কাঙ্
কাহে নেহি কা রহা, দাদাবাবু ? দিমিণি রোগনে লাগা।”

অচলেশ আশ্চৰ্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা কৰিল, “কেন, রে ?”

—মালুম নেহি, দাদা ! সাদি-ভদি হো বাসেনে, হাম
রাত দো বাজে খোড়া কাম্কা ওয়াতে ছাদে পর গিয়া ; দেখা
দিমিণি এক কোণামে খোড়া রহা। লগিজমে গিয়ে হাম
সেখলো দিমিণি রোতা। হামি পুছলো, “কি হইয়েছে,
দিমি ?” বল্লো, “কুছ হয়নি, তুই যা”। বল্লো নীচে
চলে গেল।”

—বটে ?

লছমন কিছুক্ষণ চুপ কৰিয়া থাকিয়া আবার মুহূৰ্ত্তে কহিল,
“আপু চিঠি উঠি পড়কে খোড়া আসুকেন, দাদাবাবু ;
দিমিণিকো খোড়া দেখবেন ; গোস্তা রাখবেন না।”
বলিয়া বৃদ্ধ লছমন সিং আত্মীয় প্রণত সেলাম কৰিয়া
চলিয়া গেল।

অচলেশ চিঠি খুলিয়া পড়িল ; উক্কা লিখিয়াছে—

চিরবন্ধু আমার, আবাল্যের সখা,
আজ তোমার চিঠি লিখছি; আমার আনন্দের সংবাদ দিচ্ছে, আর
তোমার এ-আনন্দের অংশীদার করতে।

কাল তুমি আসবে জেবহিলায়, আসোনি কেন ? তুমি শিক্কাৰ,
দার্শনিক। হিঃ, তোমার এখনও এ কাপুৰতা কেন ? হুখ, হুখ,
হতাশা তো তোমার পৰ্শ করতে পারে না—তবে কেন তুমি কাল
সঙ্গে গাঁড়িয়েছিলে ?

আজ প্রথম বাতায় পথে তুমি এসে আমার আশীৰ্ব্বাদ করবে না ?

তুমি হঠাৎ অসুস্থ হও, আমি তোমার ভুলে গেছি। কিন্তু
তা নয় ; বাতায় বস, কৈশোৰের সন্তান আমার, তোমার কি আমি
ভুলতে পারি ?

তোমার আমার হুণী করতে চাই, বিধান কর কি ?

আজ আমরা এখান থেকে বেরিয়েই চলে যাবি—একবারে করেক সালের জন্ম যুরোপ-জন্মণ। সকলে কি 'সারপ্রাইজ' টাই না পাবে?—সেখ তে, কি সবীমত, কি প্রাণবন্ত জীবন এখানে ?

অবিশ্বাস ক'রে একটু রাগের জন্ম দেখা দিয়ে যেও—দেখে যেও, নিকাচনে আমি জুল করেছি কি না।

তোমার চিরস্বপ্নের
উকা

পত্র ঘেন অচলেশের পরাজয় বহিয়া আনিয়াছিল। কাল রাত্রে আবার এই উকাই নাকি কানিয়াছিল? কি কলহীনা, প্রেহেলিকামরী এই নারী!

উকা ও শ্রামলবিকাশের বিদ্রোহের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। গৃহের কর্মীহীনীয় সকলে তাহাদের প্রবাসগমনের সব উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া দিবার জন্ত বাহির হইয়া গিয়াছেন। পুরস্কারের সজ্জাচরণ সম্পন্ন হইলে বরষা দিবার লইবে।

অচলেশ আসিয়াছে—একবার শেষদেখা সে উকাকে দেখিলে। কলহকে প্রাণপণ শক্তিতে সংবত করিয়া নিকল পাশাপাশির মত সে দাঁড়াইয়া—তবু বেন তার স্বর্গীক অবসাদের চিত্র ছুটিয়া উঠিয়াছে। চক্ষু দুটি শান্ত, তবুও শান্ত, হাসিমুখ।

সজ্জাচরণ সমাপ্ত হইলে শ্রামলবিকাশ একটা শান্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাহিরে আসিল—দুই চোখে তার লালসার দীপ্তি, মুখে ভয়ঙ্করের হাসি। হৃদয়জিত গাফীর সম্মুখে আসিয়া অচলেশের সহিত দু-একটা কথা বলিতে লগিল।

উকা আসিল—মহামহিমমরীর মত। নব-অভিবিজ্ঞা সম্রাজীর মত দৃষ্ট চরণ-ভঙ্গীতে—কমলার মত লীলাচকল হাসিমুখে—শ্রামলবিকাশের পার্শ্বে দাঁড়াইল। দ্বিভ্রম অচলেশ কি বলিব ?

দু-একটা কথা বলিয়া শ্রামলবিকাশ গাড়ীতে উঠিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। দুই জন ভক্তলোক তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন—মুহূর্তের জন্ত শ্রামলবিকাশের মুখ শবের মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে তাহা দমন করিয়া সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল—“কি চাই মরণ ?”

—আপনি এঁদের কোম্পানীর টাকা আত্মসাৎ ক'রে আজ বিলত পালাছিলেন—আপনার নামে জরুরী সমন আছে।

উক্তজন্য উকার মুখ লাল হইয়া গেল। জীহ্বস্বরে বলিয়া উঠিল, “কি ?”

একই সঙ্গে শ্রামলবিকাশ সবোচ্চ গর্জন করিয়া উঠিল, “মুখ সামলে কথা ক'বেন, মশায়!”

ভক্তলোক সহাস্যে স্বভাভাভর হইতে একরকম কাগজ

বাহির করিয়া বলিলেন, “অনর্থক গুণ্ডগোল করবেন না মশায়; তাহলে আমরা আপনাকে পুলিশ দ্বারা ধরে নিয়ে যেতে বাধ্য হবো।”

শ্রামলবিকাশের গর্জন শুদ্ধ হইল। উকা স্বামীর মুখ চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “কি, তুমি ভণ্ড, প্রতারক ?”

শ্রামলবিকাশ উকাকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া বলিল, “চুপ্ করো, উকা। যে কাজ তোমার নয়, তাতে কথা বলো না।”

উকা বেতনপত্রের মত কঁপিতে লগিল।

বিশেষত্বহীন সর্পের মত শান্তভাবে শ্রামলবিকাশ ভক্তলোককে জিজ্ঞাসা করিল, “তাহলে কি করতে চান আপনি ?”

—হয় অগম্যত পাঁচ লাখ টাকা ফেরৎ দিন, নতুবা আমাদের সঙ্গে ফটকে আছেন। এখনও মিটিয়ে ফেলা যায়।

“সেখুন, প্রতারণা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, সে-টাকা আমি ধন-স্বরূপ নিয়েছিলাম।” বলিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি শ্রামলবিকাশ একপাশে গিয়া একখানা দলিল লিখিয়া আনিয়া তাহার হাতে দিল।

ভক্তলোক সেটা পড়িয়া দেখিলেন। সবাগত ভ্রত ছুঁচুর জন ভক্তলোককে বাপারটা বুঝাইয়া সামান্য-স্বরূপ তাহাদের স্বাক্ষর লইয়া দলিল পাঠ করিয়া কানাইলেন।

“আমি শ্রীশ্রামলবিকাশ চৌধুরী, পিতা ঐনিমাইদাস চৌধুরী, পৈতৃক নিবাস মনোহরপুর, মৎ কষ্টক কোম্পানীর কাশ, হইতে গৃহীত পাঁচ লাখ টাকা, হৃদয়সেত প্রতিশোধ দেওয়া-স্বরূপ আমার বড় তরফ মাধ্যবগের সমস্ত সম্পত্তি উল্লিখিত—কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিলাম। অতঃপর উক্ত মাধ্যবগের সম্পত্তির উপর ভবিষ্যতে আমার আর কোন দাবি-দায়িত্ব রহিল না—”

“দাবি-দায়িত্ব ছেড়ে মাধ্যবগ কাকে বিক্রী করছো, দাদা, তা তো তুমি বিক্রী করতে পার না ?” বলিয়া তবুহুর্ভে হুঁশীরা উকা ও শ্রামলবিকাশের নিকট আগাইয়া আসিল।

সম্মুখে মাথার উপর উদাত্তকণা বিধর সর্প দেখিল লোকে যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, শ্রামলবিকাশ তেমন বিবর্ণ হইয়া গেল।

উকা এক কথ স্বপ্নাভিত্তের মত চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু হঠাৎ, কি জানি কেন, জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—“কেন মাধ্যবগ বিক্রী করতে পারেন না ?”

“কারণ সম্পত্তি দাদার নয়, অচলেশ বারু—এই সেখুন তার প্রমাণ।” হুঁশীরা হুটুটি কতকগুলো কাগজপত্র বাহির করিয়া ফেলিল।

ময়নামতীর চর—বন্দে আলো মিয়া। ডি-এম-লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

একই গ্রামোচ্চারণ রেকর্ড দুই মেশিনে দুই জন বাঙালীলৈক্যের যে ভাষ্যত্বা হইয়া উদ্ভাৱনের কাব্য ও বন্দে আলো মিয়ায় দুইটি কাব্যের তক্কা প্রায় ভতখানিই। জসীম উদ্ভানের মেশিনে মাঝে মাঝে অপসরণ শুনাইলেও হাদে হাদে রেকর্ডটি কর্ণাড়া কাগাস, বন্দে আলোর মেশিনের আওয়াজ ততটা মিঠা না হইলেও সর্বত্র হৃৎপট করিয়া তোলে। রস-উপভোগের কোথাও বাধা হয় না।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে Narrative কাব্যের অভাব নাই—বোধায় 'উপর শাকের আঁটি তবুও আছে।

'ময়নামতীর চর' 'ময়নামতীর বটগাছ' প্রভৃতি কবিতার জন্য গোলাবোধ আছে।

শ্রী সজনীকান্ত দাস

দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার সহিত শ্রীযুক্ত রিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাণোপকথন। অধ্যাক্ষে নিম্নলিখিত নং ১৫। ১০৭, মেছুয়ারবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল, বি-এ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। ১৯৩০ সাল। ২০১ পৃষ্ঠা। কাগজে বাঁধা।

কাংলা ভাষাতে অর্থনীতি সম্বন্ধে বই বেশী নাই। ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে বই ত আরও বিরল। "দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক" এই অভাব অনেকটা দূর করবে। মার্কিন, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে নানা তথ্য এই বইখানিতে আছে। তাছাড়া সহজ এবং সাবলীল। "Big five banks"-এর তর্জমা "ব্যাংক ব্যাঙ্ক" বেশ হৃৎপট লাগিল। কঠিন বিষয় সহজ করে বোঝানর ক্ষমতা প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত। নানা বিষয়ের অবতারণা না করে মূল তথ্যগুলি নিরূপণ করে সেই বিষয়গুলি বুঝিয়ে বলতেই বইখানি এমন হৃৎপট লাগে। কলেজে কেমিস্ট্রি (Chemistry) পড়বার সময় একখানা জার্মান বইয়ের তর্জমা পড়েছিলাম। মাষ্টার এবং ছাত্রের গল্পের সূত্র কাণোপকথনের ভিতর দিয়ে সমগ্র রসায়নশাস্ত্রের মূলতথ্য সেই বইখানিতে আলোচিত হয়েছিল। মাষ্টারই বেশী পণ্ডিত কিংবা ছাত্রই বেশী পণ্ডিত এই সম্বন্ধে বার-বার মনে হয়েছিল। আলোচ্য বইখানিতেও প্রকৃষ্টরূপে সব সময়ে মামুলী প্রশ্ন করলেই। তার জিজ্ঞাসার কলেই উত্তরগুলি তত্ব বর্ণনা দ্বারা হয়নি এবং এইজন্যই বইখানি চিত্তাকর্ষক হয়েছে, সম্বোধন নাই।

"দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক" এতই ভাল লেগেছে যে, নিম্নক সমালোচনার পাতিয়ে এর গোবের কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আবার এটিও মনে হচ্ছে যে, এর পরবর্তী সংস্করণে এই ক্রটিগুলি দূর হ'লে ভাল হয়।

প্রথম অধ্যায়ে "ভারতে ব্যাঙ্কের প্রসার" সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় দেশী ব্যাঙ্কগুলির কথা মনে রাখা হয়নি। বোধ করবার না হ'লেও এবং নামে ব্যাঙ্ক না হ'লেও অনেক দেশী ব্যবসায়ী অস্ত্রের টাকা আমানত রাখেন, মুদ্রতি হুজী ডিকারিট করেন, এক জার্মানি থেকে অস্ত্রের হুজীর সাহায্যে টাকা পঠান ইত্যাদি। এদের ব্যাঙ্কের বলা উচিত বোধ হয়, যদিও এ-কথা মনেতেই হবে যে শুধু নিজের নিজের টাকা কর্তৃত্বানয়ন যে-সব ব্যবসায়ী করেন তাদের ব্যাঙ্ক বলা উচিত নয়।

আর একটা কথা এই যে, ১৯৩০ সালে প্রকাশিত বইতে

১৯২৫ সালের তথ্য দেওয়া হয়েছে। Banking Almanac, Statist এবং Economist-এর Banking Supplements বা কে-কেনেড জার্নালেই আরও আধুনিক তথ্য এবং Statistics পাওয়া যেতে পারত। এটি না করার কারণ কিছু কিছু ভুলও হয়েছে। নিকিউরিটি রেপে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে ১৯৩০ সালে যে নোট ছাপান যেতে তার পরিমাণ ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউন্ড মাত্র (২০৫ পৃষ্ঠা), ২৬ কোটি পাউন্ড (Currency and Bank Notes Act, 1928) এর পছন্দে ছাপা তুলে অস্ত্রের মেন লঞ্চের ছ-চারটি চোখে পড়ল। এগুলি পরবর্তী সংস্করণে তির্যাহিত হবে আশা করি এবং এই সব নানা দেশের ব্যাঙ্কগুলির পর্যালোচনার কলে আমাদের মনে ব্যাঙ্কিংয়ের কি কি দিকে উন্নতি করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে একটি অধ্যায় যেন দেওয়া হয় প্রকৃষ্ট-রূপে লেখা এই গ্রন্থটিতে জানাচ্ছি।

শ্রী হরিশ্চন্দ্র সিংহ

টেডয়ের পর টেড—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কাত্যায়নী বুক ষ্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

বিংশ শতাব্দীর নব্যপ্রান্ত নারীর নবীনতম চেতনা—আত্মপ্রকাশ। এর অর্থ সে আজ বিবাহী, কেন-না, যুগ-যুগের শত আচারের মুখল, সাধারণ হিসাবে নারীর যে অসম সম্ভাব্যতা, সেটাকে উপলব্ধি করিতে সিতেছে না। কিন্তু শুধু মৃত বিনি-আচারই নয়, আত্মপ্রকাশের উচ্চারণ নারী আজ প্রাণপূর্ণ প্রেমকেও অস্বীকার করিয়া উঠিতেছে। "ভালবাসাটা মনের একটা আবহাওয়া, কতো দিন ভাঙেই করে থেকে কোনদিন বা ঝড় উঠে যেতে পারে।"

একটি বিবাহিতা আর একটি অদ্বী আধুনিকার জীবন-মনের ষাটপ্রতিষেধের মধ্য দিয়া লেখক তাহার প্রতিপাদ্যটি দুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নির্লিপ্ত সন্ধানীর জ্ঞান ললিতার বিবাহটি বদ্বারবর্তী হৃৎসত্ত, এবং পরীক্ষানয়; কিন্তু হৃৎসত্তের সূত্র আত্মবিশ্বাস, বাহ্য তাহার অমন লিখিত প্রেমকেও নিম্নে রাখ কন্ডিয়া মিল—তাহাকেও কি পৌরষের জ্বাল দেওয়া চলে? যে-নারী ললিতার প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে মহারস হইয়া উঠিতেছিল, হৃৎসত্তের মধ্যে সেই যেন সঞ্চিত নিম্ন হইয়া গিয়াছে।

ভাবার দিক দিয়া বইখানি এক-এক জারগার ট্রেসপ্যাট হইয়া পড়িছে। প্রমাণত নৃতনত্বের উচ্চ ট্রেসপ্যাটের মধ্যে পাঠকের মন হাঁকাইয়া ওঠে। লেখক এক-একটা লোকের মোহে পড়িয়া গেছেন বেন:—"নিরাত", "নির্ভা", "দেবতা", "নিরবয়",—সবই যিন-টার বার করিয়া পাওয়া গেল; "প্রত্যয়িত" পাঠ-ছয় বার পাইলে একটা বিভীষিকার মতই হইয়া পড়ে; এর উপর বখন আবার "নিম্নপ্রাণ" গলা কয়েক পাতা ওঠাইলেই আসিয়া হাজির হয়, তখন সত্যসত্যই প্রাণ কঠাগত হইয়া ওঠে। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ—সবই অমিশ্র।

গোপালি—শ্রীমদেন্দ্রনাথর গৌরবী। হুগলি বুক ষ্টল, ২২-এ হরি বোধ স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ছয় টাকা।

কুত্ৰ একটি রূপক নাটিকা; ২৩ পাতার তিনটি অঙ্ক শেষ। দিনের শেষে আলো-আঁধারের কবিক মিলে একটি পরম দুর্ভট জাগিয়া ওঠে। আলোর অবশেষেই বুড়ার অব্যবহিত পূর্ণ বলিয়াই এই দুর্ভটই বিবাহে হৃৎসত্ত; সৌন্দর্যে বিবাহ।

কাটা হাত হইলেও লেখক গোপালি এই ভাবরূপটি অনেক

ফুটাইরা তুলিয়াছেন। শেষ করিবার পরও বইয়ের ছয়টি মনে
ধানিক কণ লাগিয়া থাকে। ছাপা, বাঁধাই মামূল।

ঐতিহাসিক মুখোপাধ্যায়

রূপ-সায়র—ঐতিহাসিক নাটক, এম-এ, ১২ নং পয়নাথ
লেন, কলিকাতা। ১৫২ পৃষ্ঠা। দাম দুই টাকা।

এই পুস্তক পাঁচটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি পূর্বে “পুষ্পপাত্রের”
ছাপা হইয়াছিল। গল্পগুলি নিম্নোক্তই মামূল। ‘মহাকাব্য রচনা’ গল্পে
ঐক্যের উদ্দেশ্যে ভাবুকতা প্রকাশ করিয়াছেন। ‘প্রেমের অভিব্যক্তি’
নারীকান্দন অর্থাৎ নবোন্মত্তার বুলি আওড়াইয়াছেন। স্থানে স্থানে
ঐক্যের স্রুতির অভাব লক্ষিত হয়।

গৃহস্থের-সাধনা—ডাক্তার জীওচরণ পাল কর্তৃক সঙ্কলিত।
১২ নং বুনাথন পাল লেন, কলিকাতা হইতে জীওচরণ নিত্যানন্দ
ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৭৭। মূল্য বার আনা।

গৃহস্থের সংসারের অন্তর্গত সকল বাহ্যে ধর্মপাশে চলিতে পারে,
সেই উদ্দেশ্যে ঐক্যের এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার
কতকগুলি শ্লোককে ভিত্তি করিয়া ঐক্যের প্রাঞ্জল ভাষায় নিজ উপদেশ
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নারী সাধনাতা সম্বন্ধে ঐক্যের মত অগ্রদূত-
ব্যাখ্যা। পুস্তক স্বপাঠ্য হইয়াছে।

ঐগিরীন্দ্রশেখর বসু

অভিমান—ঐগিরীন্দ্রনাথ দেবী প্রণীত। স্কুলবাস চট্টোপাধ্যায়
এক সঙ্গ। মূল্য দেড় টাকা।

হোট গল্পের বই। বিভিন্ন গল্পের ভিতর দিয়া লেখিকা
আধুনিক যুগের নারী-চিত্রের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস
পাইয়াছেন। সে চেষ্টা তাহার বিফল হয় নাই। কিন্তু যে-বিষয়
সহীদ স্বভাব প্রবন্ধ লেখা চলে, হোট গল্পের স্বর পরিসরে তাহাকে
স্বাভাবিক করিয়া টানিয়া আনিতে গল্পের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং
অনাবশ্যক ইংরেজী শব্দ প্রয়োগও রচনার শক্তি বা সৌন্দর্য হ্রাস
করে না। কোন কোন গল্পে এই ত্রুটি বিদ্যমান। সামগ্রিক ত্রুটি
সবও তাহার লেখা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তাহার সাবলীল
ভাষার অপূর্ণ বিকাশ-ভঙ্গা ও চিন্তাশক্তির প্রবলতা সত্যই
উপভোগ্য। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত—কোথাও কষ্ট-কল্পনার লেশ-
মাত্র মনকে পীড়া দেয় না। বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

ঐরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি—প্রিয়নাথ সেন। প্রকাশক—ঐপ্রমোদ-
নাথ সেন, ১৮, মধুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা। মূল্য ২৪০ টাকা।

স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন ১৯০৩ সালে পরলোকগমন করেন। তিনি
স্বর্গীয়নাথ অপেক্ষা ৫৬ বৎসরের বড় ছিলেন এবং শুধু স্বর্গীয়নাথ
কর্তৃক, যিহোশূনাথের সঙ্গেও তাহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতা ছিল। যিহোশূনাথ,
জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিজ্ঞান, রসায়ন—সকলেরই সাহিত্যিক প্রচেষ্টার সহিত
তাহার গভীর সহানুভূতি ছিল বলিয়া তিনি তাহার প্রভাবের পরিচয়
প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে তাহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল,
করাদী সাহিত্যে ছিল অভিশয় অপরূপ। ঐক্যের যুগ ও
তাহার অব্যবহিত পরে সমাজে যে কৈশোরের আদর্শ সম্মান
পাইয়াছিল, প্রিয়নাথ সেন তাহার অল্পত বৃদ্ধি ছিলেন। প্রিয়নাথের
পর ও প্রবন্ধ স্বর্গীয়নাথের মুখিত সাহায্য করিয়া, কবির প্রথম

জীবনের কাব্যপট্টের উপযুক্ত ব্যাখ্যা তো এখনও হয় নাই; আর
সেই সঙ্গ আমরা সমগ্র বাংলা দেশের কিশোর-মল সেন-যুগ কি
করিয়া ফুটিয়াছিল তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

ঐপ্রিয়রঞ্জন সেন

নূতন পথে—ঐকনকলতা ঘোষ। জ্ঞান পাবলিশিং হাউস,
৪৪, বাহুড় বাগান স্ট্রীট কলিকাতা। পৃঃ ১০২। মূল্য দেড় টাকা।

আটটি গল্পের সমষ্টি। গল্প কোনটিই হয় নাই, পার-পারের যুগ
কতকগুলি দীর্ঘ আলোচনা বসাইয়া সেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু
ভাবের সারল্য ও হৃদয় উদ্ভিতির এই আলোচনাগুলি অতি মনোহর,
হইয়াছে। ছাপা বাঁধাই চলনসই।

ভাগ্যলক্ষ্মী—ঐশ্বর্য চন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক—ঐকানাইলাল
চট্টোপাধ্যায়, ৩৬/৪৩, বেনিয়ারটোলা লেন, কলিকাতা। পৃঃ ১৭০।
মূল্য দেড় টাকা।

ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টসের তোলা ‘ভাগ্যলক্ষ্মী’ ছবির উপভাস-
সংস্করণ। ব্যারকোপের বইয়ের একটা বিপর্যয়—প্রচুর ঘটনা সমাবেশ
করিতে গিয়া অনেক সময় উহা অস্বাভাবিকতায় কোঠায় গিয়া
পৌছায়। আলোচ্য বইটিতে কোথাও সে দোষ ঘটে নাই। ভাষাও
বেশ স্বকরে। গতপ্রসঙ্গিক উপভাস-সমুদ্র মধ্যে এই বইটি কিছু
বৈচিত্র্যের সঙ্গার কহিতে বলিয়া মনে হয়।

বিক্রমিকি—ঐযতীন সাহা প্রণীত। জীসমর দে কর্তৃক
চিত্রিত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, কলেজ রোড, কলিকাতা।
পৃঃ ৮২। দাম দশ আনা।

শিশুদের উপযোগী পাঁচটি গল্প। লেখক ও চিত্রকর উভয়েরই
স্বনাম আছে, এই বইটিতে সে স্বাভাবিক ক্রমেই নাই। যেমন লেখা
তেমনই ছবি—পাশাপাশি চলিয়াছে। স্বকৃষ্ণকে বাঁধাই। শিশুও
এই বই পাইয়া হুখী হইবে।

রাজ সিংহাসনে—ঐহেমেন্দ্রনাথ পালিত। প্রকাশক—
ঐপ্রমুদকুমার সরকার, ২০৮/১, অশ্বর সাহুলার রোড, কলিকাতা।
পৃষ্ঠা ৭০। মূল্য এক টাকা।

অল্পত ভাষা। হঠাৎ মনে হয়, অস্বাভাবিক ভাবে গল্পে ঢালা
হইয়াছে। কিন্তু তাহাও কোন রকম সঙ্গতি নাই। ক্রিয়া, বিশেষ্য,
বিশেষণগুলিকে যথেষ্ট উদ্ভাষিত করিয়া সাধু-অসাধু উভয় রূপের
নির্দিষ্ট সংযোগে বইটা অপূর্ণ বস্তু হইয়াছে। তার উপর
পাতার পাতার ফিল্ম রকমের ছাপার ভুল। ভাষার ব্যুৎপত্তি করিয়া
গল্প পর্যন্ত পৌছানো একেবারেই দুঃস্বপ্ন।

প্রেম ও প্রতিমা—ঐরমেশচন্দ্র দাস। এম. সি. সরকার
এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, কলেজ রোড, কলিকাতা। দাম এক টাকা।
পৃঃ ৪৪।

কবি রমেশচন্দ্রের কবিতা অনেক দিন হইতে নানা মাসিকে বাহির
হইয়া থাকে। দল-বিভাগের দ্বিপুস্তক ও রসমাধুর্য্যে তাহার
অধিকাংশ কবিতা এমন সারসার হইয়া উঠে যে, বঙ্গদেশের ব্যবধানও
তাহার দূরত্বকে থাকিবে না। বৃষ্টান্তবদ্ধ যিহোশূনাথের
‘প্রবাসী’তে ছাপা ‘বিরহিণী’ কবিতার উল্লেখ করা যায়।

বইবানিতে মোট আঠারোটি কবিতা। এক ‘স্বাত ভিখারী’ ছাড়া

বাক্যগুলিতে প্রেম ও প্রিয়ার কথা। কিন্তু বিবয়-বস্ত্র মোটামুটি এক ধরণের হইলও কবিতাগুলি একেবারে নয়। উদার কবি-মুষ্টি ঐহারই মধ্যে বিভিন্ন আলোকপাত করিয়াছে। সেই প্রিয়া কখনও নিস্তর রহস্যাক্ষর, আবার কখনও ভাষাকে সেবা যায় নিত্যন্ত সরলা পরীবলিকার রূপ। কখনও আসন্ন মাতৃ-র গরীয়সে সে সেবা-প্রতিবার মত সিন্ধু-কাল—কখনও সে নির্দিষ্ট কঠোর সেবতার মত—প্রেমিকের স্তব-গুণ্ডন তার প্রতি নিয়ত উৎসারিত হইতেছে, তবু সে কিরিয়া চাহে না; তারপর প্রিয়া ক্রমে অশরীর্য ধ্যানমুষ্টি হইয়া গড়াইয়াছে। 'রাত ভিখার' কবিতাটি অল্প ধরণের হইলেও বিশেষত্ব আছে—রাগির পুত্ৰভূত রহস্ত যেন একটি ভিখারীর কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বইখানির বহিরাবরণও প্রশংসনীয়।

শ্রীমনোজ বসু

ভক্তবাণী—শ্রীশিরকুমার রাহা প্রণীত। প্রথম পাবলিশিং: ২০০৮, ৩১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৩০। মূল্য ১/০।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে Thomas à Kempis-এর বিখ্যাত ভক্তগ্রন্থ Of the Imitation of Christ-এর কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। অনুবাদ হুম্বের হইয়াছে। ভক্ত-পাঠক ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

মন্দির—শ্রীকিরণচাঁদ দত্তবংশ প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। প্রকাশক: শ্রীগঙ্গাশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায়; মুদ্রাস্থ ডাক, পুরুলিয়া। প্রকাশ: ২০০৮।

সামক ও ভক্তকবি কিরণচাঁদ দত্তবংশের 'মন্দির' গ্রন্থটি বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। স্তব-বোকা বাইতেছে, গ্রন্থখানি বাংলার পাঠক-সমাজে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিয়াছে।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

নূতন সনাজের ইঙ্গিত—শ্রীবারাজকুমার বোষ প্রণীত ও ৮টি, মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বিজলা সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত। দাম চার আনা।

পুস্তিকাবানিতে লেখক মুক্তি চাহিয়াছেন, 'ওষু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, ধর্ম ও সমাজের মুক্তি' আরও বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে গেলে নারীর মুক্তি। 'হিন্দুর আজ' হ'লে বিচারের দিন এসেছে, সব ধর্মসংস্করণের নব কলেশের ধরবার দিন এসেছে—আজও সামাজিক কনুনিজম—নারীসেই ও ভক্ত-সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিমান।' কিন্তু সামাজিক বিপ্লব ঘটলেই কি রাজনৈতিক পূর্ণ অধিকার লাভ করা বাইবে? মুক্তি কথাটি সব জায়গায় খাটে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই শব্দটি নূতন তাৎপৰ্য্য গ্রহণ করে। যে-দেশে রাষ্ট্র ও সমাজ এক হইয়া গিয়াছে, সেখানে একের পরিবর্তনে অজ্ঞের পরিবর্তন সহজ এবং স্বাভাবিক। যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ বিভিন্ন, সেখানে উত্তম বিধা-বিত্তত্ব হয়। নূতন সমাজের ন্যূন রূপ কি, আদর্শ কি?

স্বপ্ন-শব্দ—শ্রীসাহেন চক্রবর্তী সংকলিত ও সুমিতা রামদালা প্রকাশিত হইতে প্রকাশিত। মূল: আট আনা।

বইখানিতে বহুসংখ্যক, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী,

চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি বহু দেশনায়ক ও চিন্তানায়কের বাণীর সংকলন আছে। কিছু বেদ-বাণী, কয়েকটি গীতার শ্লোক, বুদ্ধ-সেবের ঘটন এবং বিদেশী মনীষীদের বাণীও সংকলিত হইয়াছে। সংকলিত বাণীর ভাব অমসারে স্বপ্ন, সাধনা, সমাজ, সেবা প্রভৃতি নামে বইয়ের বহু অধ্যায়ের নামকরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা

চিকিৎসা-সঙ্গীত—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন কর্তৃক নাট্যকার রূপান্তরিত। প্রকাশক—এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লি., ১০, কালীজ স্কোয়ার, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ১/০ আনা।

পরশুরামের চিকিৎসা-সঙ্গীত গল্পটির সঙ্গে পরিচয় নাই, এমন পাঠক শিক্তি বাজালীর মধ্যে অর্হই আছেন। চিমিশি শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় ছবি আঁকিয়া মূল গল্পটিতে লোকগুলির রূপ দিয়াছিলেন। তিনিই আবার ইহা নাট্যকার রূপান্তরিত করিয়া লোকগুলির ভাবস্বরূপ দিয়াছেন; কলে ইহা পরম উপভোগের বস্তু হইয়াছে। এজন্য তিনি রসজ্ঞ পাঠকসমাজেরই ধন্যবাদে পাত্র। এই অতি চমৎকার ক্ষুদ্র নাট্যকাটি, শুধু বাংলার কেন, বাংলার বাহিরেও কোন-কোন ক্লাবে একাধিক বার অভিনীত হইয়াছে। ইহার অভিনয়-দর্শনকালে এমন লোকেরও মুখে হাসি দেখা গিয়াছে—যিনি অত্যন্ত গভীর, অর্থাৎ সহজ যিনি হাসেন না।

নাট্যকাটির তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে, স্তব-বোকা ইহা যে বোকা সম্ভব হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

মাতৃ-ঋণ—শ্রীমতা দেবী। প্রকাশক—ভরুয়াস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০০৮/১২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৩১৭, মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য উপগ্রন্থখানি 'প্রবাস'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার গল্পাংশটি পাঠকের মনে এমন কোতুলক জাগরণ দে গড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না-করিয়া বই রাখিয়া দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। লেখিকার নিপুণ তুলিতে প্রতাপের দারিত্র্যের মেষের জীবন অতি হুম্বের ফুটিয়াছে, আর ফুটিয়াছে ভবানাপুর প্রত্যেকের পিসিমার গৃহস্থালীর ছবি। সমস্ত বইখানিতে প্রতাপ ও পিসিমার বাড়ির ছবি সবাই বেনে আবিস্কার। সমাজ-দু-পাঁচটা কথাবার্তার ভিতর পিসিমা একেবারে রক্ত-মাংসের জীব হইয়া আসাদের চোখের সামনে দেখা দেন; আর এ-জাতের পিসিমার কাছে পাঠকেরা বস্তুতঃ আশা করে, তিনি তার বেশীও নয়, কমও নয়। যামিনীর চরিত্র সমুদ্র ও সরল বটে, কিন্তু বৈশিষ্ট্যহীন। মনে বিশেষ দাগ রাখিয়া যায় না। এদের সংসারের মধ্যে জানদার ছবি ফুটিয়াছে ভাল। জানদা ধর্ম-গর্বিত ও মুগ্ধ, কিন্তু সত্যিকারের না। স্তব-বোকা একেবারেই অস্পষ্ট।

বইখানিতে লেখিকার নিপুণ বর্ণনাত্মকতা, ভাবের সজীবতা ও সংযম, ঘটনাবলীর স্বাভাবিকতা আমাদিগকে অত্যন্ত আনন্দ দান করিয়াছে। প্রচ্ছদপটখানি হৃদয়ত্মক।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

১৮

যামিনী সেখান হইতে বড়ের বেগে আপন ঘরে আসিয়া আবার চুলিয়া গেল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সে অধিক রাতে বখন শয়নকক্ষে আসিল তখন উৎসব-মুখে সকলে যে বাহার বাড়ি গিয়াছে। তাহার নিজের ঘরেও আলো নাই; অন্ধকার। সেই অন্ধকারে জানালার গরাদে ধরিয়া নির্মলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মনও আনন্দ ভাল নাই। নিমন্ত্রিতা মহিলা বাহার আসিয়াছিলেন, বড়বো তাঁহাদের কি বেন জানাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ এ উহার কানে-কানে ফিস-ফাস করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে নির্মলার এক-একখানা গহনা হাত দিয়া নাড়িয়া-চড়িয়া কহিতেছিলেন, “এখানি কে দিয়েছেন ভাই? তোমার বাবা, না তোমার উনি?”

সে যে দরিরের কস্তা, তাহার পিতা যে ধনী নহেন এ-সকল কথা নির্মলা আগে কোনদিন ভাবে নাই। সে এত দিন তাহার বাবার সঙ্গে বে-জগতে ছিল, যে-সকল বিশ্বের আলোচনা করিত, তাহার বিশ্ব দেশ-দেশান্তের বাপ্ত, যুগ-যুগান্তের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। মস্তুর শতাব্দীতে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে ইঠাৎ কেমন করিয়া জোরার আসিয়াছিল, রোমাণ্টিসিজ্‌মের অতি গদগদ আইডিয়ার তাপে ইউরোপীয় সাহিত্যের কোন্‌ কিনারে কতইকু আবিল বাপ সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাদের আলোচনার স্রোত সসার ছাড়া সেই সকল ষাতেই বহিত। সেই জনহীন সংসার-সীমানার প্রান্তে কেবল পিতা এবং কস্তা প্রতিদিন পরস্পরকে সঙ্গ দিত। সেখানে আর কোন সঙ্গ ছিল না। এমনি করিয়া সংসারে যেখানে বহুদূরতার সংঘর্ষ, যেখানে অনেকের স্বার্থ, অনেক ভাল মন্দ লেখা কুটিলতা মেশামেশি হইয়া

পাশাপাশি রহিয়াছে সেখানকার সহিত নির্মলার কোনও পরিচয় হইত না। সে বড়লোকের বাড়িতে জন্মিয়াছে, না গরিবের গৃহে—এ-কথাটা ভাবিবারও প্রয়োজন তাহার কোনদিন হয় নাই।

কিন্তু আজ উপরের হলে যে-সব মহিলারা আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এক মল নির্মলাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে নির্মলা দরিরের কস্তা। এ-বাড়িতে তাহার প্রবেশাধিকার কিরূপে হইল সেই কথাটাই তাহার বিশ্বয়ে হতবাক হইয়া ভাবিতেছেন, এবং তাঁহাদের এই বিশ্বয়ের কথাটা খুব ভাল কাঁদা। তাহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য যামিনীর বড়বোদি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল। নির্মলা গভীর বেদনার সহিত বুঝিয়াছিল যত্নরবাড়িতে তাহার অল্প জায়গারের মত কোনো মর্যাদা কি সম্মান অধিকার তাহার নাই।

নির্মলার মনে আজ প্রথম ধাক্কা লাগিল। সে আন্তে আন্তে সেখান হইতে উঠিয়া নিজের শয়ন-ঘরে আসিল। আলো জ্বালাইয়া চারিদিকে চাহিল। দামী মেহগুনীর পাশকের উপর দামী নেটের মশারির ঝালর সজ্জার বাতাসে একটু একটু ঝাঁপিতেছে। আনন্দের নির্মলার কাপড়ের জরির কড়াঙলা বিজ্ঞাতালোকে ঝলমল করিতেছে। ঘরের বেদিকে সে চায় সেইদিকেই আরাম এবং বিলাসের উপকরণ। সুখস্পর্শ সোফা তাহারই জন্য বেন নীচু করিয়া রাখান। অর্গ্যানের কাছে মিউজিক টুলের উপর সেই মাপের একটা তেলভেট-দেওরা কুশান যামিনী কালই বিকালে দড়িকে দিয়া করায়াছে। তাহার উপর নির্মলার জরির কাজ-করা মথমলের লক্কো চটি জুতাটা রহিয়াছে। বোধ হয় ঘোররাটা ঘর খাঁটি দিবার সময় খুলা লাগিবার ভয়ে এখানে তুলিয়া রাখিয়াছে। নির্মলা শুক হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই ঘরের কোন-কিছুকে

আজও সে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক করিয়া দেখে নাই।
ঐ সোফাতে বসিয়া সে যামিনীকে বই পড়িয়া শুনাইয়াছে,
টুলে বসিয়া গান গাইয়াছে, ঐ জানালার কাছের
কাউচটার বসিয়া সূর্যাস্ত দেখিয়াছে। তাহার সমস্ত
অস্তিত্বের সঙ্গে এই ঘরখানার সম্বন্ধ এমন করিয়া এই কিছুদিন
মিশিয়া ছিল যে, নিজের প্রয়োজনের বাহিরে তাহাকে
কোন ছলেই মনে পড়ে নাই। আজ মনে হইতে লাগিল
এ শুধু বড় লোকের বাড়ির একখানা সাজান ঘর।
কিন্তু বড়লোকের বাড়িরই এক জন যে সমস্ত স্বপ্ন চালিয়া
ইহা সাজাইয়াছে, আপনার আদর দিয়া তাহাকে
আরত করিয়াছে একথাটাও নির্মালা আজ আর ভাবিল না।
কারণ একথাটা ভাবিতে হইলে আর এক জনকে
সর্বান্তঃকরণে যতটা গ্রহণ করিতে হয় নির্মালা তাহার
স্বামীকে এখনও তাহা করিতে পারে নাই। বিবাহের
প্রথম ছাড়া ভাব্তব জীবনে প্রেম কি বিবাহ লইয়া
সে কোন দিন মথ্যা ধাময় নাই। এ-সম্বন্ধে এই বয়সের
ময়ের স্বপ্ন সচরাচর যতটা সচেতন হয় নির্মালা মন
বিবাহের পূর্বে তাহা হয় নাই। যেটুকু সচেতন
তাহার স্বপ্ন হইয়াছিল, আত্মিকার প্রচণ্ড আঘাতে
তাহার সব সড়ই যেন চলিয়া গেল।

যামিনী দরজার বাহিরে থমকিয়া দাঁড়াইল। আশা
করিয়া আসিয়াছিল নিজের মনোভার প্রেরণী নারীর কাছে
নিবেদন করিয়া ধরিবে। আসিয়া দেখিল ঘরে আলো
নাই, শোকপরায়ণা নারী আপন মনোবাণী লইয়া তুচ্ছ
হইয়া যুক্তির মত জানালার গরাদেতে একটা হাত রাখিয়া
দাঁড়াইয়া আছে। তখন সে নিজের কথা ভুলিয়া গেল।
কাছে আসিয়া নির্মালা কাঁধের উপর পিছন হইতে একটি
হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, “অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে
কি করছ নির্মালা?” নির্মালা মুখ ফিরাইল। টাদের আলোর
তাহার চোখের জল চিক্-চিক্ করিতেছে।

“কি হয়েছে?”

“কিছু না।”

যামিনী তাহার বাঁধার চুল আঁড়ল দিয়া নাড়িয়া দিত
কহিল, “কি হয়েছে আমাকে বলো না। আমার
কাছে কোন দিন কিছু লুকিও না। আমি যে তোমার

জন্তে কত ব্যাকুল।” তাহার কণ্ঠস্বরে কাতর মেহ প্রকাশ
পাইতেছিল।

নির্মালা দৃঢ় পরিষ্কার স্বরে কহিল, “আচ্ছা, আমার
বাঁধা যে খুব দরিদ্র সে-কথা কি তোমরা জানতে না?”
যামিনীর কোন কথাই যেন তাহার কানে যায় নাই।

যামিনী অবাক হইয়া কহিল, “আজ হঠাৎ এ-কথা
কেন? কিন্তু তোমার বাঁধা ভো দরিদ্র নন। তাঁর মত
স্বপ্নের প্রাচুর্য্য এবং মানসিক ঐশ্বর্য্য ক’টা লোকের
আছে?”

“সে-বিচার আমি তোমাদের সঙ্গে করতে চাইনে।
কিন্তু তিনি যে দরিদ্র, তাঁর যে যথেষ্ট অর্থ নেই, এ-কথাটা
কি তোমরা জানতে না?”

দ্বীপ কঠোর কথায় যামিনী আহত হইল। নির্মালা
যত দিন এ-বাড়িতে আসিয়াছে কখনও তাহার মুখে এমন
কথা শোন নাই। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া
যামিনী কহিল, “আজ হঠাৎ এমন প্রশ্ন করবার প্রয়োজন
তে মার কেন হ’ল?”

নির্মালা আর কোন কথা না বলিয়া সামনের চেয়ারে
বসিয়া পড়িয়া ছই হাতে মুখ ঢাকিল। তাহার অঙ্গব্যাকুল
যেন নিঃশ্বাসে সন্ধ্যার স্তব্ধ আবরণ যেন উতলা হইয়া উঠিল।
যামিনী হুইচ টিপিয়া আলো জালিল।

আরও একটা চৌকি টানিয়া তাহার পাশে বসিল।
গভীর স্বরে কহিল, “শোন নির্মালা, আমি আজ প্রতিক্ষা
করেছি যত দিন না নিজ উপার্জন করে তোমাকে
প্রতিপালন করতে পারব তত দিন তোমাকে আর এ-বাড়িতে
আনব না। তত দিন তোমার বাপের বাড়িতে থাকতে
পারবে তো?”

নির্মালা কাভালের মত বলিয়া উঠিল, “আমি কি আমার
বাপের বাড়ি যেতে পাব? আমার বাবার কাছে থাকতে
পাব তো?” যেন জীবনের এই নূতন সম্বন্ধের কথা
সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে এমনই ভাবে ব্যাকুল হইয়া
সে প্রশ্ন করিল। তাহার এই ব্যাকুলতার কারণ ছিল।
আগ্নেই সন্ধ্যাবেলার অলঙ্কারের প্রসঙ্গে সমস্ত কথা জানিতে
পারিয়া শাওড়ী দাঁতে দাঁত চাপিয়া কটু কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,
“বা হবার হার পেছে, কিন্তু আর কোন হত্রেও সেই ছোট

লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। বৌ বেন বাপের বাড়ি যাবার নামও আর না করে।” কিন্তু বামিনী সে-কথা জানিত না। নির্মলায় ব্যাকুলতার কারণ সে বুঝিল না।

বামিনী কিছুকাল নির্নিমেয় দৃষ্টিতে নির্মলার দিকে চাহিয়া কহিল, “নির্মলা, এতই স্বচ্ছন্দে মরা কাটালে? আমার কেনও কিছুই পেরেই কি তোমার মারা নেই? নির্মলা, তোমাকে এখন বিয়ে করি নি তবুও আগ থেকে তোমার জন্তে এই ঘর সাজিয়েছি। এর সমস্তর সঙ্গে আমি এমন ক’রে জড়িয়ে গেছি যে কোথাও যদি একটা রাত্রি বাইরে কাটাতে হয়, তা’হলে আমার এই ঘরের জন্তে মন কেমন করে। নির্মলা, আমার এ ঘর কি তোমারও ঘর নয়?”

নির্মলা চারি দিকে একবার চুপচুপে চাহিয়া কহিল, “না। এ ঘরে আমার কোনো অধিকার নেই।”

“কেন?”

“এত সব দামী জিনিষ দিয়ে সাজান ঘর আমি কোন কালে দেখি নি। এর কোন-একটা জিনিষ কিনে দিতে হ’লেও হয়ত বাবার টাকার কুলোবে নশ।”

“কেবল জিনিষের ভীড়টাই দেখলে, কিন্তু এই-সব জিনিষের ঠেশাঠেশির পিছনে এক জন যে তার বা-কিছু সমস্তই তোমার হাতে তুলে দিতে চায় তাকে কি একটুও দেখতে পেলো না?”

নির্মলা ভাবিতেছিল, “আমার দরিদ্র পিতার সম্মান কি তাতে একটুও রক্ষা পাবে?” হৃদয়েই কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল। তা’হার পর বামিনী ধীরে ধীরে কহিল, “তোমাকে আঙ্গ বা সহ করতে হয়েছে, সে সমস্তই আমি তুল্যম। কিন্তু এইটুকু তুমি ভেবে রাখ, আমিও তার চেয়ে কিছু কম সহ করি নি। চল নির্মলা, আমরা এখন থেকে চলে যাই। কিন্তু...কিন্তু—”

“কিন্তু কি বল?”

“কিন্তু যেখানে তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন, যেখানে আমার আত্মীয়-পরিজনদেরা তোমাকে অসম্মান করবে না, সেখানে, সেখানেও কি নির্মলা, তুমি তোমার সমস্ত জন্ম আমার দিকে মেলো ধরতে পারবে না?”

নির্মলা অনেক কণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “কমা

ক’রো, যদি কোন অপরাধ করে থাকি। কিন্তু আমি বার-বার চেষ্টা করিও বার-বার আপনাকে স’পে দিতে গিয়েও বার-বারই নানা আঘাত পেয়ে আপনার মধ্যে ফিরে এসেছি। এ কি আমি বুঝতে পারছি না।”

“কি বুঝতে পারছ না?”

“মনে হচ্ছে কোথায় যেন টান পড়ছে। কোথায় যেন বাধা বয়ে গেল। জন্ম জন্মের আমার কোন অপরাধ নেই। আমার যা কর্ণবা, শেষ পর্যন্ত আমি তার কোনখানে ত্রুটি রাখতে চাই নে।”

“থাক ওসব কথা—” বামিনী উঠিয়া পড়িয়া কহিল, “ওসব কথা মীমাংসা হবার জন্তে সমস্ত জীবনটাই পড়ে রয়েছে। আপাততঃ তুমি জিনিষত্র শুদ্ধিয়ে রেখো, কল বেলা ন’টার ট্রেনে আমি কলকাতা যাব, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। মাকে বলে আসি গে।”

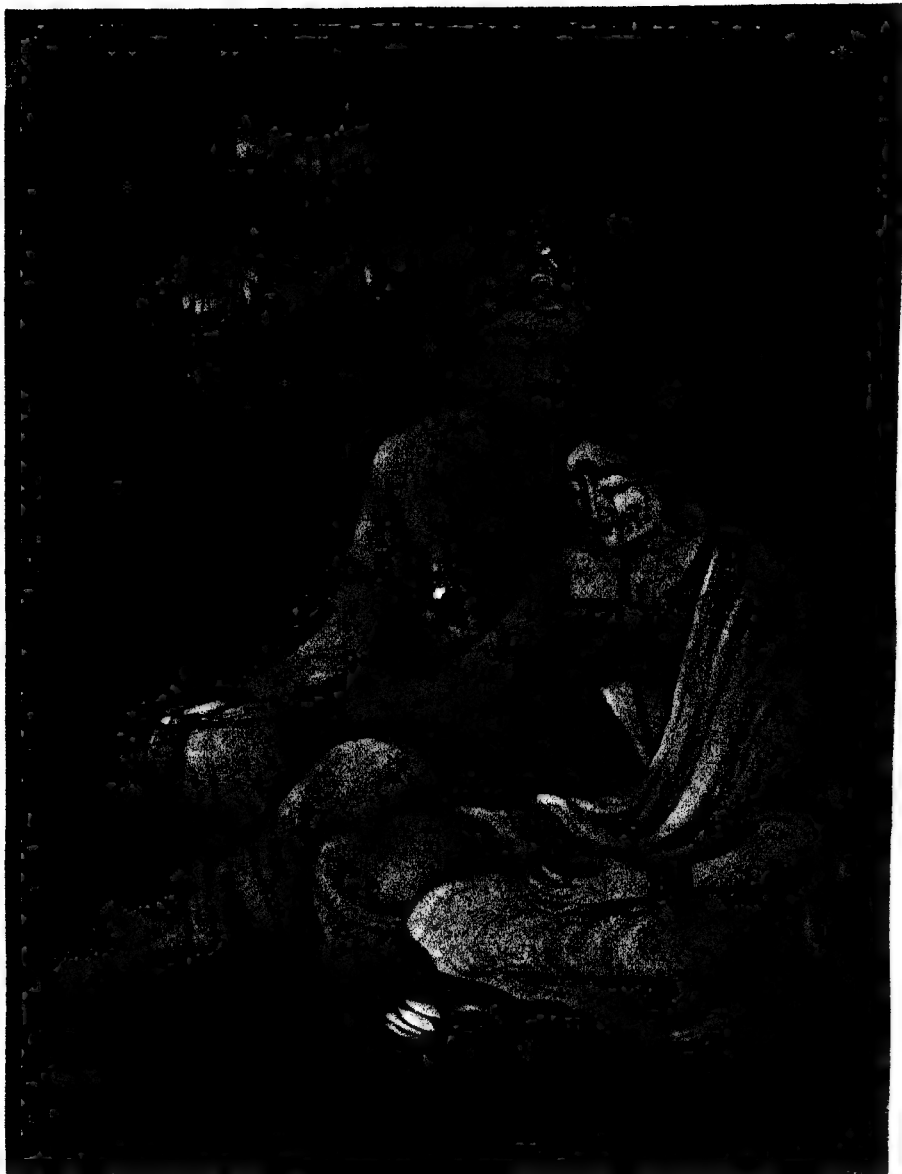
বামিনী ছয়ারের কাছ অবধি গিয়াছিল, নির্মলা ডাকিল, “শোন!”

সে ফিরিল। নির্মলা হাতের বালাটা খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, “আর দেখ, এই গয়নাগুলো...” বলিতে গিয়া সে স্বামিল। যেন সঙ্কোচে বাধিল। “এই গয়নাগুলো কি?” বামিনী—এই ছয়ারের উপর ভর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এই গয়নাগুলো তুমি নেবে না। এই তো?”

“হা, তাই। এইগুলোর তত্তেই আমার বাবাকে ওরা এত অপমান করেছেন। তা ছাড়া এসব জিনিষের উপর আমার বিদ্মোহ টান বা লোভ নেই।”

“বেশ, নিয়ো না। সেই ভাল। কিন্তু যদি জানতে, ওই গয়নাগুলোর জন্তে তোমার ববার চেয়ে আমাকে চের বেশী অপমান সহ করতে হয়েছে, তবুও তবুও—কিন্তু থাক সে-সব কথা। সে-কথা তুমি বুঝতে পারবে না। আমি যাই নির্মলা। রাত্রির মধ্যে তুমি ঠিক ক’রে নিও কি নেবে আর কি নেবে না?”

বামিনী নিজের অশান্ত ব্যথিত চিত্ত লইয়া দ্রুত কাছ সাফল্যের জন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু নির্মলা তা’হার জগতে প্রবেশ করিতে পারিল না। কোন কথা না বলিয়া কোন প্রশ্ন না করিয়া এক জনের জন্ম-জন্মের সমস্ত বেদনা নিঃশেষে অহুভব করিবার, এক জনের সমস্ত চিন্তাই আপন প্রশ্ন



মিলন
শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

জন্ম সাগরে নিমজ্জিত করিয়া লইবার যে চূর্ণত শক্তি নারীর আছে, তাহারই কাছে প্রসাদপ্রার্থী হইয়া যামিনী আসিয়াছিল, কিন্তু নারী সাদা দিতে পারিল না। সে আপন জন্মভার লইয়া বাতায়ন-প্রান্তে একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকেও কেহ খুঁশ না, তাহারও জন্মের বন্ধ্য কেহ দেখিল না।

১৯

শূন্যলা সেই সবেমাত্র গোয়ালবরে ঘুঁটের আঙনের ধোঁয়া দিয়া, তুলসীমূলে সন্ধ্যাদীপ জালিয়া দিয়া, হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বঁটি পাতিয়া তরকারী কুটিতে বসিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ নিত্যকার মত তাহার পড়িবার ঘরে আলো জ্বালাইয়া চশমার খাপ হইতে চশমাখানা বাহির করিয়া কোঁচার খুঁট দিয়া মুছিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সে সময় বাহিরে একটা মোটর দাঁড়াইবার আওয়াজ পাওয়া গেল। হর্পের আওয়াজ ঘন ঘন হইতে লাগিল। চন্দ্রনাথ চশমা পরিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন নির্মলা ও যামিনী সিঁড়িতে উঠিতেছে। তাহাদের আসিবার কোনরূপ কথা ছিল না, এমন অপ্রত্যাশিতরূপে নির্মলাকে দেখিয়া বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। নির্মলা নত হইয়া সেই বারান্দাতেই তাহাকে প্রণাম করিতেছিল, তাহাকে ছুই হাতে উঠাইয়া ধরিয়া একসঙ্গে তিনি অজস্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, “এস মা এস। কখন এসেছে? কোন্ ট্রেন ধরেছিলে? হঠাৎ এমন ক’রে আসা হ’ল যে... হঠাৎ বসি বড়ো বাপকে মনে পড়ে গেল? এই যে যামিনী, থাক... থাক আর প্রশ্নাম করতে হবে না। তারপর কি খবর?”

যামিনী সংক্ষেপে বলিল, “কলেজ খুলেছে। আসতেই হচ্ছিল তাই সঙ্গে ক’রে নিয়ে এলাম। স্নানি ওকে আনলেই আপনি খুশী হবেন। কিন্তু এবারে তো আপনার জিনিষ আপনার হাতে পৌঁছাল, এবারে আমি ঘাই।”

তাহার কণ্ঠস্থরে শেষের দিকে বেদনার আভাস। সমস্ত মুখে ক্লান্তির চিহ্ন সুপরিষ্কৃত। ঘরে ঢুকিয়া আলোতে চক্ৰকাণ্ডবাবুর নজরেও তাহা পড়িল। নির্মলার সঙ্গে বিবাহের আগে যামিনীর প্রতি তাহার মনোভাব যেমন

ছিল এখন যেন তাহার চেয়ে অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি একটি মুমিষ্ট হুকোমল মেহরস ভিতরে ভিতরে কখন উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। সে কেবল আজ তাহার পানে চাহিবারাত্রি তিনি টের পাইলেন। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “সে কি, যাবে কি? নির্মলা, যা ত মা, তোর মাকে বাড়ির ভিতর খবর দে।” প্রতিমাহুন্দরী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। নির্মলাকে দেখিবারাত্রি হাসিমুখে কহিল, “ঠাকুরশ্বি ভাই, এলে? এরই মধ্যে ঠাকুরজামাইটিকে এমন বশ ক’রে নিয়েছে যে যেখানে যখন যান, সঙ্গে ক’রে নিয়ে যান। দু-দিনের অদর্শন সহ্য হয় না। সত্যি ভাই, তোর ক্ষমতা আছে অস্বীকার করবার জো নেই।” প্রতিমার কথার মূরে একটা অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার মূর। সে বোটার দোষ নাই। বিবাহের পরই মেয়েদের পরম্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়। তখন আর বয়স বা সম্পর্কের জন্ত বড়-একটা আসিয়া যায় না। প্রতিমা তাই উজ্জ্বলিত হইয়া মনে করিয়াছিল এই দু-তিন মাসের মধ্যেই নির্মলার নিশ্চয় একটা বড় রকম পরিবর্তন ঘটয়া গিয়াছে। আগেকার সেই শুদ্ধ, সমাহিত, পুণ্ডললীন নির্মলা কখনই নাই। এখন সপ্তদশবর্ষীয়া যে-তরুণীকে প্রতিমা কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইয়া উৎকল হইয়া উঠিয়াছিল সে বসন্ত-ব্রতভীর মত প্রেম, চাকলো, অকারণ পুলকের হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কথায়, হাসিতে, দৃষ্টিপাতে আনন্দ ঝরিয়া পড়িতেছে।

প্রতিমার সহিত নির্মলা ভিতরে আসিল। আলোতে ভাল করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া কিন্তু প্রতিমার ভুল ভাঙিল। তাহার মনশ্চক্ষের সেই তরুণীর সঙ্গে কই নির্মলার ত কোথাও মিল নাই। বরঞ্চ সে যেন আগেকার চেয়ে আরও অনেক নিশ্চল। সাজসজ্জাও তাহার যেমন অনাড়ম্বর তেমনি সাদাসিধা। হাতে আগেকার সেই সর পেন বালা দু-গাছি ছাড়া আর কোথাও কোন অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নাই।

প্রতিমা অবাধ হইয়া ভাবিল, ইহাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। আজকাল সে শান্তভীর নির্দেশমত কাজকর্মে খুব তৎপর হইয়াছে। তাড়াতাড়ি টোব খরাইয়া চায়ের জল বসাইয়া দিয়া যামিনীর জন্ত জলখাবার সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল।

নির্মলা মাকে প্রণাম করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। আলো না জ্বালাইয়াই অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া তাহাদের ক্রিডার ছাদের এক কোণে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন আকাশে রূক্ষপক্ষের চাঁদ উঠে নাই। মাথার উপর তারাগুলি অত্যন্ত দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নক্ষত্রসম্পন্ন নিঃশব্দ অন্ধকারে নির্মলা তাহার মাথার অবগুঠন ফেলিয়া দাঁড়াইল, তাহার আশিশব্দ-অভ্যন্ত এই অব্যবহিত মুক্তিকে সমস্ত হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে চাহিল। অন্ধকারে কত ক্ষণ এমনই করিয়া দাঁড়াইয়াছিল খেয়াল নাই। পায়ের শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল যামিনী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে। ছুঁ-ছুঁনেই অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। নির্মলা প্রথমে কথা কহিল, “আমাকে কিছু বলবে?”

“কিছু বোলে না। অন্ধকারের মধ্যে কেবল তোমাকে অনুভব করিতে দাও।”

“আমি এক-এক সময় ভাবি, অবাক হয়ে কিছুতেই ভেবে পাইনে—” নির্মলা যেন আপন-মনে তন্ময় হইয়া বলিয়া চলিল, “আমার মধ্যে...”

“তোমাকে মিনতি করছি নির্মলা, চুপ করো। কত যত্ন থেকে তারার আলো এসে তোমার মুখে পড়েছে। রাত্রি শুষ্ক, অন্ধকার। এরই মাঝখানে আমার সমস্ত তোমাকে দিয়ে ভরিয়ে নিতে দাও। এখন কথা কওয়া সুবিধে না। আশ্চর্য্য, আমি তোমার কাছে এসুম, নিঃশব্দে উদ্বেচিত করে তোমার সামনে ধরলুম অথচ তুমি যে আমার মাঝে কিছুই খুঁজে পেলো না সে-কথাটা আজ এই অন্ধকারে চুপ করে তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যতটা টের পেয়েছি এর আগে কোনদিন তা পাই নি।”

নির্মলা চুপ করিয়া ছাদের আলিসায় ভর দিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনই থাকিল। যামিনী বলিল, “এবারে আমি যাই।”

“কোথা যাবে?”

“আমার সেই সাবেক মেসে। নিখিলকে বলে রেখেছি আমার ঘর ছুঁতে বুলিয়ে রেখেছে।”

নির্মলা যামিনীকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিল, কিন্তু তাহার যে-মন নবাবিকৃত সংসার হইতে মুক্তির জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মনই যেন যামিনীর প্রতি

স্বপ্নামুরক্ত নববধূর মন হইতে প্রবল হইল। নির্মলা শুধু বলিল, “মেসে কেন যাবে? এখানেও তো থাকতে পার।”

“না, পারি নে। নির্মলা তুমি রাগ করে না, কিন্তু আজ একটা কথা বলব। তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে গেলুম, মনে আশা ছিল আমার ঘর তোমারও ঘর হয়ে উঠবে। ভুল ভাঙলো। টের পেলুম সে তোমার হ’ল না। তাই আজ তোমারও আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারছি নে। তোমাদের ঘরে নিজের মনে করে থাকতে বাধে। কোথায় রং গেল একটা অদ্ভুত বাধা। কোনদিন এটা কাটবে কি না জানি নে; কিন্তু এইটুকু আমার মনে সান্দ্রনা থাকবে মিথ্যাকে আমি চাই নি। যাকে চেয়েছিলাম তাকে সর্বতোভাবে সত্য করে পাব বলেই প্রতীক্ষা করে এসেছি। আজও যদি প্রতীক্ষার দিন না ছুরিয়ে থাকে তাহলে জানব এখন আমার সাধনার পালা ফুরায় নি। কিন্তু অভিযোগ করব না কারও কাছে। আমি চললুম নির্মলা।”

বাইবার সময়ে সে নির্মলার হাত ছুঁখানি আপনাই হাতে টানিয়া লইয়া তাহাতে অধর স্পর্শ করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া বাইবার পরে ছাদে আবার তেমনি অথও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। অন্ধকার ছিন্ন করিয়া সারি সারি বাড়ির ছাদগুলির এক প্রান্ত হইতে রূক্ষপক্ষের এক খণ্ড চাঁদ উঠিল। কিন্তু নির্মলার মনে তাহার পূর্বদিনের প্রশান্তি আর ফিরিল না। মনে হইতে লাগিল কে যেন অধীর বেদনার ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার সেই বেদনার ছায়ায় প্রকৃত স্তম্ভিত, ভারাক্রান্ত। তাহাকে সমস্ত দিয়া গ্রহণ করিতে চাহিলেও মনের একটা দিক অতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে, মনে হয় মুক্তির অপরিসীম আকাশ হইতে যেন কাহার লালসাজীর্ণ অন্ধকার কারাগারের মধ্যে ঢুকিতে হইতেছে, আবার তাহারই নিরন্তর ব্যাকুলতায় তাহাকে ছাড়িয়া দিতেও মনের আর একটা দিক উদাস হইয়া যাইতেছে।

নির্মলা একাকী ছাদে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মনের ভিতর যুগল নির্মলার দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল।

সকালবেলায় চায়ের পেয়ালায় চিনি মিশাইতে মিশাইতে যামিনীর পূর্বতন সহপাঠী বন্ধু নিখিল কহিল, “ব্যাপারখানা

কি বলো দেখি? কাল অত রাজিতে হটোপুটি ক'রে এসে হাজির। এদিকে চেহারাখানা ঝাড়িয়েছে যেন ঝোড়ো কাকের মত। কি হয়েছে? বগড়া? কিন্তু কার সঙ্গে? না-বাপের সঙ্গে না নববধূর সঙ্গে? শেষেরটাই অবশ্য বিধাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কারণ তানা হ'লে শুধু না-বাপের কাছে হুটো বকুনি খাওয়ায় চেহারার উপর এতটা চিহ্ন থাকত না।”

যামিনী ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, “বগড়া আবার কি? ফেল করেছি পরীক্ষায়, বাজে কথার সময় নেই। উঠে পড়ে লাগতে হবে।”

এই বলিয়া তা খাওয়া শেষ হইবামাত্র সে তাড়াহাড়ি উঠিয়া দরজায় খিল দিল। নিখিল যামিনীর কুচি এবং প্রকৃতি জানিত। তাই দু-তিন দিন আগে খবর পাইলেও তাহার দুইখানা ঘর যথাসাধ্য সাজাইয়া-সুছাইয়া রাখিয়াছিল। টেবিলের উপর সজ্জিত পুস্তকের কাছে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া যামিনী বসিল। খুব নিবিষ্ট চিত্তে একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মনে পড়িতে লাগিল নির্মলার কথা। সেই প্রথম তাহার সহিত কেমন করিয়া আলাপ হয়। কেমন করিয়া এক দিন তাহাকে হাম্লেটের কিয়দংশ আবৃত্তি করিতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই তাহার সরল আশ্চর্যম্বৃত্ত ভাব। পূর্ব দিকের জানালাটা খোলা ছিল সেই দিকে বজর পড়িতে চোখে পড়িল সামনের ঘে দোতারা বাড়িটা এতদিন খালি ছিল তাহারই উপরের মাঝখানকার ঘরটায় জানালায় জানালায় জাফরানি রঙের পর্দা উড়িতেছে, খোলা ছয়রের অবকাশ-পথ দিয়া সাজান ঘরের কিয়দংশ চোখে পড়িতেছে। পালকের উপর ছদ্মস্তম্ভ বিছানো, ঘটিতে ঢালাও বিছানার উপর জরির মহলন্দ পাতা-পায়ের দিকে কাহার এক জোড়া লাল মখমলের চটি। কে এ-ঘরের অধিবাসিনী যামিনী তাহা জানে না, কিন্তু সেই ঘরখানার পানে চাহিবামাত্র তাহার মনটা হু হু করিয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল তাহার সেই স্বরের স্মৃতি। নিজের হাতে সে সাজাইয়াছিল, দেয়ালের কোন দিকে কোন ছবি টাঙাইবে, পর্দার রঙ কেমন হইবে এ লইয়া কত জল্পনা-কল্পনা কত আলোচনা,

নিজের মনে সে কত ভাগাভাগি। সারেরঙের শব্দের সহিত স্ত্রী-কণ্ঠের কোমল স্বরের আওয়াজ আসিল। যামিনী কিছু কিছু হিন্দী জানিত, গানের প্রথম লাইনটা ঘুরিয়া ফিরিয়া গীত হইতে শুনিতে লাগিল।

“পল্লব সো পাগে স্বরোরীম্...
যব ঘর আওয়ে প্যায়ে মোরি...”

অনেক কাল ধরিয়া বুখা পড়িবার চেষ্টা করিয়াও যখন কিছুতেই মন বসিল না তখন বিরক্ত হইয়া যামিনী শশ্বে দরজাটা খুলিয়া নিখিলের কাছে গিয়া বসিল, “এ কোন্ হতভাগা ঘর ঠিক করলে আমার জন্মে? সামনের ওই বাড়িটা যে জানালার গায়ে লাগাও, আর গান-বাজনার শব্দ উঠছে অহর্নিশ।”

নিখিল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, “জানি নে ভাই, আজ ক’দিন থেকে দেখছি কে একটা পার্সি মেয়ে ঐ ঘরটা ভাড়া নিরেছে। তা তোমার আর এমন অস্বৈধ কি? যে-সঙ্গে এখন তোমার দিন কাটছে তাতে আইন মুখস্থ করার চেয়ে গানের স্বরকার এমন কি মন্দ লাগবে?”

দরোয়ান একটা রেকাবীতে করিয়া একরাশ থাম ও পোষ্টকার্ড লইয়া সকালের ডাক বিলি করিয়া বেড়াইতেছিল। “চিঠি আপকা ভি হায় একঠো” যামিনীর কাছে আসিয়া সে থামিল। যামিনীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক্ করিয়া উঠিল। নিশ্চল চিঠি লেখে নাই তো তাহাকে? কথাটা মনে হইতেই একটা মধুর সম্ভাবনায়, অধীর আগ্রহে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল।

চিঠিখানা হাতে লইতেই কিন্তু আশা নিবিয়া গেল। নির্মলার চিঠি নয়। বাড়ি হইতে মা লিখিয়াছেন রাগ করিয়া যে, বৌ যখন এখানে থাকিতেই পারে না তখন তাহাকে আর এখানে না-আনাই ভাল। তাহার যামিনী বা নিশ্চল সঘর্ষে কিছু জানেন না। যামিনী যতদিন নিজে উপার্জন করিয়া তাহার স্ত্রীকে প্রতিপালন না করিতে পারে তত দিন সে যেন নিজের বাপের বাড়িতেই থাকে।

যামিনী চিঠিটা দলা পাকাইয়া জানালার বাইরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ওবাড়ি হইতে গানের স্বরের সঙ্গে অনেকের একত্র-মিলিত একটা হাসির গম্বু উঠিতেছিল। যামিনী বিরক্ত হইয়া ঘরের ওইদিককার

সমস্ত জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া অকুণ্ঠিত করিয়া হাতের কাছে যে বইটা পাইল টানিয়া লইয়া এখানের স্কেচেরটার উপর আসিয়া বসিল।

২১

ঘরের আলো জলিতেছিল, নিশ্শা পিতলের জয়পুরী ধূপদানিতে করিয়া ঘরে ধূপধূনা দিতেছিল। কাজ শেষ হইয়া গেলে শেল্ফের উপর হইতে একটা বই বাছিয়া লইয়া পড়িতে বসিল। চন্দ্রকান্তও অনেকক্ষণ হইতে একটা পুঁথি খুলিয়া অন্তমনস্কের মত বসিয়াছিলেন। এইবারে আস্তে আস্তে সেটা হইতে চোখ তুলিয়া ডাকিলেন, “নিশ্শা!”

“কি বলছ বাবা?”

কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া চন্দ্রকান্ত কহিলেন, “তোদের মধ্যে কি যেন একটা হয়েছে, না। সেদিন অত রাত্রিতে বিস্তর অস্বপ্নের সন্ধ্যা যামিনী ভাড়াভাড়া মেসে চলে গেল। তার পরে একটা দিনও আর আসে না। চিঠিপত্র লেখে তো?”

নিশ্শা মাথা নাড়িয়া কহিল, “না।”

“তবেই তো।” চন্দ্রকান্ত নিজের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিলেন, “তা হ’লেই যে দেখছি...”

নিশ্শা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “তা হ’লে কি বাবা? আচ্ছা, তোমার আজ হঠাৎ এসব কথা মনে হচ্ছে কেন? তিন-চার মাস আগে যখন তুমি আর আমি এই ছোট টেবিলটির ছপাশে বসে পড়াশোনা করতুম তখন তো কেউ আমাদের চিঠিপত্র লিখত না। তখন তো আমরা নিজেদের মধ্যেই বেশ ছিলুম। আমরা কি আবার আগেকার মত হ’তে পারি নে?” চন্দ্রকান্ত চাহিয়া দেখিলেন তাহার মুখমণ্ডল শান্ত। নিশ্শা অল্প ললাট-খণ্ডকৃত্তে কোন চিন্তা কিংবা অশান্তির ছায়া পড়িয়াছে কিনা বুঝা যায় না।

তিনি মুহূর্ত্তে কহিলেন, “আগেকার মত কেন হ’তে চাইছ নিশ্শা? আগে তো কেবল একমাত্র আমিই তোমার জীবনকে আবৃত করে ধরেছিলুম। কিন্তু আমার যা-কিছু দেবার, তোমাকে যা-কিছু দেখাবার সে সমস্তই নিঃশেষ

ক’রে এখন যে আমি চাইছি সংসারের মাঝে তুমি সাথিক হয়ে ওঠ। এক-এক সময় আমি অবাক হয়ে ভাবি...” চুলের মধ্যে তাহার আঙুলগুলি খামিয়া গেল। চিন্তিত মুখে বৃদ্ধ উজ্জ্বল বিজলি বাতির দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিবার জন্য চুপ করিলেন।

“আমার জন্তে আজকাল তুমি মনে মনে কেন এত ভাব বাবা?”

“আমি এক-এক সময় ভাবি—” নিজের চিন্তার হ্রস্ব ধরিয়া তিনি বলিয়া বাইতে লাগিলেন, “হয়ত তোমার উপর আমি অত্যাচার করেছি, নিশ্শা।”

“অত্যাচার কি করেছ, বাবা? আমাকে তুমি যত ভালবেসেছ, এত ভাল কেউ কাউকে বাসে না।”

“সে কথা নয় না। আমি নিজেকে দিয়ে তোমাকে বড় বেশী চেকেছি নিশ্শা। তোমার নিজের যথার্থ বিকাশ হয়ত তাতে বাধা পেয়েছে। তা নইলে...”

“তুমি আজ কথা বলতে বলতে এত থেমে যাচ্ছ কেন বাবা? তা নইলে কি?”

“তা নইলে যামিনীর মত ছেলের প্রতিও তোমার মন আকৃষ্ট হ’ল না কেন? তা ছাড়া যে-পরিবারে তুমি বড় হয়েছ সে-পরিবারের প্রতিও তোমার কিছু কর্তব্য রয়েছে।”

“সে কি কর্তব্য আমাকে বলে দাও না। আমি ত কিছুই বুঝতে পারি নে। তুমিও তো আমাকে এসব ক্ষেত্রে আগে কিছু বল নি।”

“না, আগে আমি ভাবতেও পারতাম না তোমাকে যদি দিয়ে আমার নিজের জীবনকে কখনও কল্পনা করতে হবে। কিন্তু এখন জন্মশঃ বুঝতে পারছি তোমারই হৃথের জন্তে তার প্রয়োজন। আমি কেন আমার বার্থ জীবনের সমস্ত সম্ভাব্য নিয়ে অহিনিশি তোমাকে ঘিরে থাকব? তুমি যে ফুলের মত সৌন্দর্য্যে, কল্যাণে, প্রেমে ফুটে উঠেছ। তোমাকে কত লোকে কামনা করছে। - আমার জীবন জীবনকে ত্যাগ ক’রে তুমি কি তোমার লক্ষীর আসন অধিকার করবে না মা?” বলিতে বলিতে আবেগভরে চোঁকি হইতে উঠিয়া তিনি নিশ্শার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার মাথার হাত রাখিলেন। তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে

লাগিল। নিশ্চলার চক্ষু দিয়া টপ্, টপ্, করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, “বাবা, সংসার তুমি কাকে বলছ? সংসার মানে যা বোঝায় তা আমি বুঝতে চাই নে। সেখানে কেবল কুশ্রীতা, শুধু হিংসা, ঘেহ, নীচতা। যে কয়েক মাস আমি স্বপ্নবৃত্তিতে ছিলাম সন্ধ্যা হ’লেই আমার মন ছটকট ক’রত। মনে হ’ত খুব একটা বন্ধ কারাগারের মধ্যে কে যেন আমাকে বেধে রেখেছে। তোমার এই ছোট্ট ঘরখানির ঝুলে এত মন কেন্দ্র করত। এই শান্ত নিরঞ্জনতার আলোটি জালিয়ে তুমি আর আমি বসে থাকি। তোমার মুখে আলো পড়েছে মধ্যে মধ্যে সেই মুখের দিকে চেয়ে দেখি। নেই সেই মুখে কোন বিকার কোন মলিনতা। বাবা, এর পরেও আর কি চাইবার থাকতে পারে? মনে মনে এইটুকুর জন্তেই যে আমি পিপাসান্ত হয়েছিলুম।”

চন্দ্রকান্ত অনেক ক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “আমারই ভুল হয়েছে নিশ্চল। তোমার বিয়ের পরে তুমি যখন চলে গেলে তখন নিজের এই অসহ্য কষ্টে বিস্মিত হয়ে একা বসে অনেক কথাই ভেবেছি। সেই সমস্ত ভাবনার কথা আজ তোমাকে বলি। প্রথম বয়সে সংসারের দিক থেকে খুব বড় রকম একটা দা খেয়েছিলুম। নিজের ধর্ম-বিশ্বাসের ফলে হিন্দুধর্মের নানারকম অর্থহীন লোকচার, নানা ক্ষুদ্রতা অসাম্য আমাকে পীড়া দিত। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আমি আকৃষ্ট হইলুম। সংসার হ’ল আমার উপর বিরূপ। তোমার মায়ের সঙ্গে খট্, আমার মধ্যস্থতিক বিচ্ছেদ। যদিও প্রকান্ত ভাবে কোন দিন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিইনি তবুও সংসারের অহুকুলতা কখনও পেলুম না। মাঝখানে যে বিদ্রব-রেখা পড়ল তার এক দিকে রইলুম আমি একা, অস্ত্র দিকে তাঁর ছেলেপিলে লোক-লোকিকতা ঠাকুরদেবতা সমস্ত সংসার নিয়ে তোমার মা। চিরদিনই এমনি একলা কাটিয়ে আসছিলুম, কিন্তু যেদিন একমুঠো ফুলের মত হুম্মর শুভ্র তোমাকে দেখলুম সেদিন কি যে শোভ হ’ল আবার আশ্রয় আশ্রয় নিজেকে জড়িয়ে ফেললুম। পুরুষের পক্ষে একলা থাকা ভেদন শক্তি নয় মা। কিন্তু নিজের মধ্যেই নিজে চিরকাল আশ্রয় হয়ে থাকা বড় কষ্টকর। সেই সঙ্গীর্ণ অবসর অন্ধকার থেকে তুমিই আমাকে মুক্তি দিয়েছিলে,

মা। নিজেকে তিলে তিলে এক জনের কাছে দান করবার যে দুর্ভাগ্য আনন্দ সেই আনন্দে আমার দিন রাত্রি ভরেছিল। কিন্তু.....” চন্দ্রকান্ত উত্তীর্ণ বয়স পায়চারি করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, “কিন্তু তোমাকে এত ভালবাসি নিশ্চল, যে তোমার জন্তেই আমার এখন দিব্যরাজি ভাবনা। কিসে তুমি সুখী হবে, কেমন ক’রে তোমার সমস্ত জীবন আনন্দময় কল্যাণপূর্ণ হবে? এই ভাবনাতেই আমার দৃষ্টিকে করেছে তীক্ষ্ণ, মনকে করেছে সজাগ। আমি এই তোমাকে বলছি মা, আমি তোমাকে দিলুম, উৎসর্গ ক’রে দিলুম। তোমাকে আমার জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন ক’রে, আমার জীবনের জাল থেকে সকল গ্রহি মোচন ক’রে তোমাকে তোমার জীবন-বিধাতার হাতে সমর্পণ করলুম। তোমার বিবাহের যে অভিপ্রায় তোমার জীবনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠতে চায় তাই সফল হোক নিশ্চল। তুমি সুখী হও, সুখী হও মা। আর আমি কিছু চাই না। আমার দিক থেকে কোন দায় কোন বন্ধন মনের মধ্যে রেখো না।”

নিশ্চল কখন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার নির্মীলিত চক্ষুর কোণ দিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। কোন্ এক রহস্যময় অজানা ভবিষ্যতের ছায়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল আর তাহারই সঙ্গে অনির্ণয়ে একটা তীব্র বেদনা। নিজের জন্ত নয়, কাহার জন্ত তাহাও সে ঠিক বলিতে পারে না। কিন্তু চোখের উপর দিয়া বায়োস্কোপের ছবির মত ছোটবেলাকার কত ঘটনাই না একে একে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সেই তাহার মবার চিরকাল চুপচাপ একলা বসিয়া থাকা। তাহাকে বিপুল আবেগ-ভরে কাছে টানিয়া লওয়া। মনে হইতে লাগিল তিনি যেন চিরহুঁস্বী, কেহ তাঁহাকে কোনদিন কাছে টানিয়া লয় নাই, কোনদিন বুঝিতে চায় নাই। নিশ্চলার সঙ্গেও আজই যেন তাহার চিরবিচ্ছেদের দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে। কিছু ক্ষণ পর চোখ মুছিয়া সে মুহূর্ত্তে কহিল, “বাবা, তোমার জীবন থেকে আমাকে বিদায় দিলে কেন? আমাকে তোমার কাছে ধরে রাখলে না কেন চিরদিনই?”

“গাছ কি ফলকে চিরকাল ধরে রাখে মা? নিজের

প্রাণরস দিয়ে তাকে সে যখন নিটোল পরিপক্ব করে তোলে তখন প্রকৃতির নিয়মেই তো গাছ থেকে সে খসে পড়ে যায়, আসে তার বিচ্ছেদের সময়। সেই বিচ্ছেদেই যে তার সাধকতা। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদও সেই রকম।”

“বেশ, তাই হবে। তুমি আমাকে না বলবে আমি তাই মেনে চলবার চেষ্টা করবো। কিন্তু এইটুকুমাত্র তোমাকে মিনতি তুমি আমার জন্ত রাতদিন ভেবে না বাবা।”

“তোমার জন্তে যে ভাবতে পাই সেই তো আমার সুখ মা। কিন্তু যেনে চলার কথা কেন বলচ? আমি কামনা করি জীবনের বিধান কেবল মেনে চলে নয়, আনন্দময় স্বতঃউৎসারিত স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই তাকে তোমার জীবনে সাধক করে তোলা তুমি। আমি এখন একটু ছাদে বাই নিশ্চলা। তুমি বসে এই বইখানার বাকীটুকু পড়ে নোও। যদি কোনস্থান বুঝিয়ে দেবার দরকার হয়, কিরে এসে বুঝিয়ে দেব।”

চন্দ্রকান্ত চলিয়া যাইবার পরে নিশ্চলা টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আজ কদিন হইতে শুলীলার জর হইয়াছে তাই রান্না করিবার জন্ত এক জন রান্নাশুনি রাখিতে হইয়াছে। অম্মর হইতে ঠিকা ধ্বিরের সহিত রান্নাশুনির কলহের শব্দ জন্মঃ উচ্চগ্রামে চড়িতেছে। নিশ্চলা ঘে-বরে করতলের ভিতর মন্তক রাখিয়া বসিয়াছিল সেখানেও অগোজ আসিতেছে, “...ইঃ শো বড় আমার দরদ রে! বাবুদের পাতে মাছভাজা কম পড়েছিল কেন? বলি ও বাবুন ঠাকরুণ, বলি শুনছ, কার চোখে ধুলো দেবে তুমি?...রাহু তেমন বাপের বিট নয় বুঝলে? ভারতের মধ্যে মাছভাজা গুঁজে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।”

নিশ্চলা গোলমালে বিরক্ত হইয়া একবার দুরারের কাছ পর্যন্ত আগিয়া গেল তাহার পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া পরিত্যক্ত চেয়ারটার বসিল। সংসারের এই সকল নিরতিশয় কৃত্রী গোলযোগ, অসুন্দর কলহ, ইতর বাক্যবিনিময় তাহাকে গভীর করিয়া রাখিল। কোথাও কি ইহার হাত হইতে রক্ষা নাই! গোলমাল জন্মঃ প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে। না, অবহেলা করা চলিবে না। সংসারের প্রতিও যে তাহার একটা কর্তব্য আছে। বেশন করিয়া পারে এ সকল সে খামাইবে। নিশ্চলা উঠিয়া তক্তের গেল।

পাচিকার কাছে গিয়া কহিল, “কি হয়েছে নালুর মা? এত গোলমাল কিসের?”

পাচিকা হাত-মুখ নাড়িয়া ধ্বিরের উদ্দেশে কহিল, “শতকধোয়ারি আবাগির মেয়ে, আমার নামে চোর অপবাদ দেয় গো! তোর নোলা খসে যাবে না!”

প্রত্যুত্তরে রাহু ঝিও গর্জন করিয়া উঠিল। নিশ্চলা শুভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। দুই পক্ষ হইতে অন্তঃপর যে-সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল তাহার ভাষা যেমনই কদর্য তেমনই অশ্লীল। সংসার-নাট্যশালার এই যে একটু টুকরা অকস্মাৎ তাহারই চোখের সামনে অভিনীত হইতে থাকিল সেই দিক পানে চাহিয়া নিশ্চলা বিমনার মত শুক হইয়া ভাবিতে লাগিল, সংসারে এ-সকলেরও প্রয়োজন আছে। এই-সব লইয়াই সংসার। সেখানে যাহারা থাকে এই ধরনের অসহ্য ইতরতার মাঝেই অহরহ তাহাদের বাস করিতে হয়। নিশ্চলা এইমাত্র রবীন্দ্রনাথের হিবট-লেকচারের রিলিজন অফ্ দি মানু পড়িতে পড়িতে উঠিয়া আসিয়াছিল। যাহার মধ্যে সে মগ্ন হইয়াছিল সে কি সুন্দর, কি গভীর। সেই কুলহীন প্রশান্তির মাঝখান হইতে উঠিয়া আসিয়া এইখানে দাঁড়াইবামাত্র তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। বহুক্ষণ অসাড়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে যাইবার সময় ঝিকে সন্ধান করিয়া অন্তঃস্থ মুদ্রকণ্ঠে কহিল, “ভদ্রলোকের বাড়িতে এ-সব কি কাণ্ড বল ত? বাও মুখ বুজে কাজ করো গে। ছিঃ, এখানে দাঁড়িয়ে এমন অভদ্র কাণ্ড করতে নেই।”

ঝি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, “ভদ্রলোকের বাড়ি কি দেখাচ্ছ গা দিদিঠাকরুণ। আজই কি নতুন তোমাদের বাড়িতে কাজ করছি। কলকাতায় এমন দশ-বিশটা ভদ্র নোকের বাড়ি কাজ করেছে। কেন কি করেছে আমি?” (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) “কেন আমি কি নাচউলি না আমি বাজারের ঘেয়ে যে তুমি আমার কথায় কথায় ভদ্র লোকের বাড়ির খোঁটা দিচ্ছ, দিদি?” নিশ্চলা অপরিণীত স্থণায় সেখান হইতে সরিয়া গেল। সে চোখের অন্তরাল হইবামাত্র ঝি বাঘনির দিকে ফিরিয়া আপন-মনেই বলিতে লাগিল, “ভদ্রলোকের বাড়ির কাণ্ডটা আমার সব জানা আছে। জানতে আর কিছু বাকী আছে কি এই রাহুর।”

তাহাকে চক্ষে অঞ্চল দিতে দেখিয়াই বায়ুন-ঠাকুরাণীর মন গলিয়াছিল। এখন সমস্ত ঝগড়াবিবাদ বিস্মৃত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, “কেন কি হয়েছে রে রাশু? হাঁ তাই বল ত তাই। আমাদের মধ্যে আর লুকোছাপা কি? তোদের এই দিমিদিগির কাণ্ডকারখানা আমারও যেন কেমন-কেমন ঠেকে। তবে বলতে তো আর পারিনে কিছু, নূতন লোক।”

“সব জানি, সব জানি। আমার চাকরি এই নিয়ে আজ দশ বছরের হ’ল। বিয়ের আগেও দেখেছি। সে কি কাণ্ড, পান্তর গাঁথবার জন্তে! এই তখনই মোটরে করে গে বেড়িয়ে নিয়ে আসছে। তখনই আসছে রাশ রাশ

গয়নাপত্তর। তার পরে মা জু-দিনও গেল না, সব কেড়েকুড়ে নিয়ে বাপের বাড়িতে ভ্রম্ ক’রে কেলে দিয়ে গেল। দেখিস নে (খুব নিয়কণ্ঠে) মারা অঙ্গে সেই আইবুড়ো বেলাকার লিকলিকে জু-গাছি বালা ছাড়া আর অস্ত কিছুই নেই।”

হাতের বইটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ঘাইতে ঘাইতে সেইটা কুড়াইয়া লইবার জন্ত নিশ্চল দাঁড়াইল, হেট হইয়া সেটা তুলিয়া লইবার সময় তাহারই বাড়ির পরিচারিকা-মহলে তাহার সম্মুখে কি আলোচনা হইতেছে কানে আসিল। নিমেষের জন্ত পাবাণ-মূর্তির মত সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সেখানে হইতে চলিয়া আসিল।

ক্রমশঃ

শবরীর প্রতীক্ষা

শ্রীবীণা দেবী

আনন্দে মারাটি প্রাণ উঠিছে শিহরি
আসিবেন আসিবেন আসিবেন হরি।
আসিবেন আসিবেন আসিতেই হবে তাঁর
বৈকুণ্ঠ ভাঙ্গিয়া দীন কুটীরে আমার।
এ যে ভক্তের ডাক প্রাণের আস্থান
এর চেয়ে দেবতার কোথা আছে স্থান।
হে আমার উপাসিত হুে আমার নারায়ণ
কখন আসিবে তুমি কোন্ সেই মহাক্ষণ।
কোন্ ভাবে কোন্ বেশে দাঁড়াবে সমুখে এসে
উছলি বিমল জ্যোতি আঁলোকিবে প্রাণমন।
শৈশব উন্মেষ হ’তে বসে আছি প্রতীক্ষায়
অগণিত কত শত সময় বহিয়া যায়।
গ্রীষ্মশেষে বর্ষা আসে, শরত হেমন্তে মিশে,
স্নীতান্তে বসন্ত আসি কত শোভা পায়,
ফলে ফুলে ভরি ডালা ধরণী সাজায়।
তারি সনে মম চিত্ত নবসাজে সাজে নিত্য,
তোমারি পূজার তরে ওগো প্রেমময়,
আশাপথ পানে চাহি দিন বহে যায়।
নারায়ণ নারায়ণ পূর্ণ কর প্রাণমন
হুঃখ দূর করি কর চিত্ত ভরপুর
স্বা কর নয়নময় প্রাণের ঠাকুর।
বাণীকা-বরসে আমি শুনেছিছু খবিবাকী
“নারায়ণ আসিবেন দ্বারারে তোমার
শবরী সাজারে রাখ পূজার সস্তার।”
জানি নাথ! জানি আমি চণ্ডালভনরা আমি
অপবিত্র দেহ মম পরশে না কেহ,
নীচ জাতি নাহি পাব মানবের স্নেহ।

তুমি ত গড় নি জাতি, তুমি ত দিয়েছ প্রাণ
তুমি কেন আসিবে না ভগবান ভগবান।
না না তিনি আসিবেন টলিবে আসন তাঁর
প্রাণের আস্থান এ যে নহে ব্যর্থ হইবার।
শৈশবে ডেকেছি তোমা শিশুর সরল মন
ভেবেছি খেলার সাথী তুমি বুঝি নারায়ণ।
বোবনে তুলেছি ফুল এনেছি নদীর জল
পরাব ফুলের মালা ধুয়ে দেব পদতল।
তুমি ফুল ভালবাস আপনি সেজেছি ফুলে,
তোমার মধুর নাম শিখিয়েছি পাখীকুলে।
আজিও বিহগদল আজিও নদীর জল
তোমার মধুর নামে করিতেছে ছলছল।
যৌবন অতীত এবে জরা আসিয়াছে নামি।
পূজার সস্তার লয়ে এখনও বসিয়া আমি।
নয়ন সমুখে মম নামিয়া আসিছে যোর,
কতদূরে আছ তুমি প্রাণের দেবতা মোর।
এখনও প্রভাতে উঠি বনে বনে বাই ছুটি
পশের মলিন ধূলি দূর করি ডায়,
কাটাটি কুড়ারে রাধি যদি বাজে পায়।
এই পথে আসিবেন আমার প্রাণের হরি
উখলিবে নদী জল চরণ পরশ করি।
প্রকৃতি সাজিবে ফুলে পাখীরা গাহিবে গান,
সে চরণ বকে ধরি সার্থক হইবে প্রাণ।
আগ্রহ উৎসুক প্রাণে চেয়ে আছি পথপানে
পদতলে প্রাণমন করিয়াছি নিবেদন,
তুলে লও কনকল নারায়ণ নারায়ণ।

লগনের পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু—

অজিত, তোমাদের ওখানে এক বাস্ব বই পাঠানো গেছে। তার মধ্যে একটা বই আছে কার্সো'র সম্বন্ধে, একটা অরকেনের মত নিয়ে। পড়ে দেখো এবং যদি লিখতে চাও লিখো। অরকেনের সঙ্গে আমার মতের যথেষ্ট মিল আছে; কিন্তু একটা বিষয়ে আমার মজা লাগে। অরকেন খৃষ্টের দিব্যত্ব মানেন না, ত্রিভুবাদ মানেন না, মধ্যাহ্নবাদ মানেন না, খৃষ্টের পুনরুত্থান মানেন না, বাইবেলের বর্ণিত অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করেন না, অথচ বলেন তিনি খৃষ্টান এবং খৃষ্টান ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অর্থাৎ অন্তান্ত ধর্মকে অতীতের ইতিহাসে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং তার সঙ্গে এমন একটা ধর্মের তুলনা করেন যেটাকে তিনি নিজের আদর্শের দ্বারা গড়ে তুলছেন। অবশ্য হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমারও এই রকমের মনোভাব। আমি বলছি বা কিছু মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে মেলে তাই হিন্দুধর্ম। কেননা, হিন্দুধর্মে জ্ঞান ভক্তি কর্ম তিন পছাৎকেই জীবনের সঙ্গে যোগের পছা বলেছেন। খৃষ্টান ধর্মের চেয়ে হিন্দুধর্মের একটা জায়গায় শ্রেষ্ঠত্ব এই দেখি, হিন্দুধর্ম সম্যাসবাদের ধর্ম নয়। খৃষ্টের উপদেশের ভিতরে যে ত্যাগের অনুশাসন আছে সেটা, নিশ্চয়ই পূর্ণতার বিরোধী। হিন্দুধর্মে গৃহধর্মকে একটা খুব আদরের স্থান দিয়েছে—অথচ তাকে দিয়েই সমস্ত জায়গা জোড়ে নি—তাকেও যথানিয়মে যথাকালে অতিক্রম করবার দ্বার খোলা রেখেছে। অতএব হিন্দুধর্মকে বাইরের দিকে যে-সব তুল আদরণে আবৃত করেছে তাকে বাদ দিয়ে যে জিনিষটাকে পাই সে ত কোনো ধর্মের চেয়ে কোনো অংশে নিকট নয়। কেননা, এতে মানুষের লক্ষ্য মন আত্মা এবং কর্মক্ষেত্র সমস্তকেই তুমার দিকে আহ্বান করেছে। আমি এই জন্তেই হিন্দুধর্ম ছাড়তে পারি নে—ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে

স্বতন্ত্র করতে পারি নে—কেননা, হিন্দুধর্মই যদি নিজের প্রাণশক্তির দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম হয়ে উঠে একথা সত্য না হয় তবে এ মরীচিকা টিকবে না, কারো কোনো কাজে লাগবে না। অরকেনের খৃষ্টান ধর্ম জিনিষটা যেমন, আমার হিন্দুধর্মও তেমনি; অর্থাৎ ওর মধ্যে যেটা নিত্য সত্য সেইটের দ্বারা ই ওকে বিচার এবং গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যাবে বিজ্ঞান হাজার হাজার ভুলের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে। সেই ভুলগুলোর দিকেই যদি তাকাই তাহলে কিসিন্দ্ৰ মিথ্যা, কেমিস্ট্রী মিথ্যা, সত্য বিজ্ঞান নেই বললেই হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রাণের মূলে সত্য আছে। সেই দিকেই তাকিয়ে তাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যোরতর বৈজ্ঞানিক যখন ধর্মকে বিচার করে তখন তারা ধর্মকে স্থির ক'রে দাঁড় করায় এবং বিজ্ঞানকে চলনশীল ক'রে দেখে। যেমন জীবনের গতি বদ্ধ হবামাত্র এই বিকৃতির বোঝা ভারি হয়ে ওঠে, অথচ জীবন চলবার পথে যতক্ষণ থাকে সমস্ত রোগ বিকার অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়েও তার স্বাস্থ্য প্রভিভাত হয়—ধর্মও ঠিক সেই রকমই, তাকে দাঁড় করিয়ে দেখলেই মুকিল। হিন্দুধর্মের শত্রু ও মিত্র উভয়েই তাকে দাঁড় করিয়ে দেখতে চায়—শমধর তর্কচূড়ামণিও তাকে খাড়া ক'রে ধরে ফুলচন্দন দেয় আর মিশনরি সাহেবও তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চূর্ণকালি মাখায়। কিন্তু আমি তাকে চলবার মুখে দেখি, তখন সে তার সমস্ত পাক এবং দূষিত পদার্থের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তখন সে যথার্থই পতিতপাবনী স্রোতস্থিনী। আমার মুকিল হয়েছে এই যে আমাকে গোড়া হিন্দুও একঘরে করে আমাকে গোড়া ব্রাহ্মও জাতে ঠেলে।

হঠাৎ এক বৈজ্ঞানিক ব'লে বসেছে প্রাণ জিনিষটাকে এক দিন নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরীতে তৈরি করতে পারবে—ওনে ধার্মিক লোকের চিত্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে

উঠেচে। অসুত এজারগায় আমরা নিশ্চিত। বিজ্ঞান এমন কিছুই বের করতে পারবে না যাতে আমাদের মর্যাদাকে ধাককা চমকে উঠতে হবে। মানুষবিশ্বী ত নানা বস্তুর যোগাযোগ করে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করচে, সেটাতে যদি আত্মকে ওঠবার কিছু না থাকে তবে মানুষ-বৈজ্ঞানিক অণুপরমাণুর যোগাযোগে প্রাণ সৃষ্টি করলেই বা বিপদ কোন্‌খানে? না-হয় এক দিন প্রমাণ হবে ধূলার মধ্যেও প্রাণ আছে—তাতে ধুলো বড় হয়ে উঠবে প্রাণ ছোট হয়ে যাবে না।

রেটস্‌ যে বইটা এডিট্‌ করচেন তা বাদে আরো অনেক তর্জমা জমে উঠেচে—রোটেনষ্টাইন সেইগুলো দিয়ে আর একটা বই ছাপাতে চাচ্ছেন—তার মধ্যে তোমার তর্জমাগুলোও যেতে পারবে। রোটেনষ্টাইন বলেন, আমার তর্জমার নীচেই তোমার তর্জমা তাঁর সব চেয়ে ভাল লাগে। ইংরেজি তর্জমায় তোমাকে ছাড়বার অভ্যপ্রায় আমার কোনোদিন ছিল না—এবং ছাড়িয়েছি বলে কোনোদিন কল্পনাও করিনি—গ্রহের চক্রান্তে গোলেমালে কোনোদিন কেমন করে বটে গেছে তা জানি নে—অতএব এতে আমার কোনো দোষ নেই।

আশ্বিন, ১৩৩৯

তোমাদের

জীববীজনাথ ঠাকুর

21, Cromwell Road.
South Kensington
S. W.

কল্যাণীয়েষু—

সন্ধ্যায়, দুই তিন মেল তোমার চিঠি পাইনি তাই তোমাকে লিখিনি, জানি যে আমার চিঠি তোমরা কোনো না কোনো নামে পাবে। আমার এ চিঠি যখন শাস্তি-নিকেতনে পৌঁছবে তখন শিউলি ফুলের গন্ধে তোমাদের বন আমোদিত হয়ে উঠেছে এবং স্বর্ঘ্যোদয় ও স্বর্ঘ্যাস্ত, শারদজ্যৈষ্ঠ সোনার পঙ্কবনের আশ্রয় শোভা ধরে লেখা দিচ্ছে। সেই চিরপরিচিত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে এখানকার আকাশের বিরুদ্ধে আমার মাথার অকৃত্যক্তি জাগচে। আমার মন বলচে, এখানকার আকাশের মধ্যে আমার খেয়াল নেই, সে মানুষের মন ভোলাতে চায় না। এখন জ্যোৎস্না-

রাত্রি কিন্তু সে কেবল পাজিতেই দেখি—নিশ্চয়ই আকাশে তারা আছে কেন-না অ্যাস্ট্রনমিতে তার বিবরণ পাওয়া যায় এবং সেখানে যে আছে সে-সবকে সন্ধান করবার লেশমাত্রি হেতু নেই। এখানকার আকাশ এই রকম কালো ব্লক-কোট্‌ এবং কালো চিমনিপাই টুপি প'রে অত্যন্ত ভব্যভাবে থাকে বলেই এখানকার লোকের কাজকর্মের কোনো ব্যাঘাত হয় না। আমাদের দেশের আকাশ আমাদের কাজ ভোলায়; শরৎকালের সোনালি আলোর আপিস আদালত মাটি করে দেয়—আকাশ আপনার সমস্ত জানালা দরজা এমন ক'রে অহোরাত্র খুলে রেখে দিয়েছে যে মন সে অমিশ্রণ একেবারে অগ্রাহ করতে পারে না। আমাদের বৈকব কাব্যে সেইজন্তেই যে বাশি বাজে সে বাশি কুল-বধূর কুলের কাজ ভুলিয়ে দেয়—সে আমাদের সমস্ত ভালো-মন্দ থেকে বাহির ক'রে আনে। কিন্তু এমন কথা এদেশের লোকে বুথে আনতেই পারে না—এমন কি ভগবান আমাদের ভোলাচ্ছেন এ কথা শুনলে এরা কানে হাত দেয়। কেন-না এদের আকাশে এই বাণী অবস্কৃত। আমাদের আকাশ যে ছুটির আকাশ, এদের আকাশ আপিসের আকাশ। এদের আকাশে দণ্ডা বাজে আমাদের আকাশে বাশি বাজায়। সেই জন্তে এরা বলে জীবনসংগ্রাম, আমরা বলি জীবনীলা। ভগবানের লীলার রূপ এখানে আবৃত হয়ে রয়েছে। এই জন্তেই এরা বলতে চায় তিনি নিজেকে পাবার জন্তে নিজে হুসুচেন। তার মধ্যে কোনখানে বিরাম নেই। কিন্তু আমরা যে নিজের চক্ষে দেখতে পাই সমস্ত কাজকে ছাড়িয়ে একটি মনোমোহন আনন্দরূপ আপনার অহেতুক সৌন্দর্য্যের মধ্যেই প্রকাশ পাকে। সেই কাজের বাড়িকে যদি না দেখতে পাই তাহ'লে কাজের বেড়ি আটপুটে বেধে ধরে। কাজের চেয়ে বড়কে হৃদয়ের পদ্মাসনে বসিয়ে তবে কাজ করতে হবে। আমরা সেই বিরামকে দেখেচি, সেই হৃদয়কে দেখেচি, আমরা সেই বাশি শুনেচি। কিন্তু বাশি যখন আমাদের টেনে আসে তখন যে পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে আসে, সেই হৃদয় পথটাকে আমরা এড়িয়ে চলতে চেয়েচি। এইখানেই আমরা একেবারে ঠকে গেছি। কেবল বাশি শুনলেই তো হয় না, বাশি

ভবে যে চলতে হবে; তখন যে হৃৎকের ভিতর দিয়ে যেতে হবে বাশির হৃৎকের মোহনমন্ত্রে সেই হৃৎখই যে গলার হার হয়ে উঠবে। কাঁটা পারে ফুটেবে—কিন্তু তাই যদি সহ্য করতে না পারব তবে বাশির হৃৎকরের মধ্যে প্রবেশ করলে কই? আজ পর্যন্ত হৃৎকের পথেই আনন্দের অভিসার হয়ে এসেচে, আর কোন পথ নেই। আমাদের শয্যা থেকে আমাদের যে ডাক দিচ্ছে সে তো শমনের পিয়াদা নয়, সে বাশির হৃৎকর। তবে আর ভাবনা কিসের? হৃৎকর না-হয় পেলুম, যথাসর্ব্ব্ব না-হয় দিলুম কিন্তু পরিপূর্ণতার মোহন রূপ যে অমৃত রূপ চোখে দিচ্ছে সে তো কিছুমাত্র মান হয়নি। আকাশ ভরে যে বাশি বাজচে সেইটেকে জীবনে বাজিয়ে নেবার শক্তি জেগে উঠক—সেই শক্তিই প্রেম। সে কোনো বাধা-বিপত্তি মানে না,

সে সব বইতে চায়, সব সইতে এগোর—তাকে ঘরের কোণে বসিয়ে রাখে কার সাধ্য! আলস্যে তাকে ঘুম পাড়ায় না, বিলাসে তাকে মদ খাওয়ায় না। সেই প্রেমের কর্ম, সেই মৌলবোর শক্তি, সেই হৃৎকের আনন্দ পরিণামটি উপলব্ধি করবার জন্তেই মন ব্যাকুল হয়ে আছে। মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও! আমাদের কাজকর্ম সমস্তই কুধার দ্বারা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত—তাকে অমৃতের মধ্যে উত্তীর্ণ করে দাও—তার থেকে লোহার শিকলের স্বাক্ষর একেবারে ঘুচে যাক—বীণার তারই বাজতে থাক।

৯ই অগ্নি, ১৩১৯

মেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

বর-চুরি

ত্রিসীতা দেবী

সত্তর-আশি বৎসর আগের কথা। তখনকার দিনের কথা এখন উপকথার মত শোনায়, তবু ঘটনাটা উপকথা নয়, নতাই।

হুই জমিদার বংশ—গুহ এবং মিত্র। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এবং হিংসাটা ইঁহার পুরুষাচর্য্যে উদ্ভারাবিকার-রূপে লাভ করিয়া আসিয়াছেন। কবে কি কারণে এই শত্রুতা প্রথম ঘটয়াছিল, দোষটা কোন পক্ষে ছিল, চিরস্থায়ী বন্ধোবন্ধের মধ্যে এই শত্রুতাটাকেও ধরিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ কি না, ইহা লইয়া কেহ মাথা ঘামাই নাই। বাড়ির কর্ত্তা হইতে নবাবিহিতা ছোট বৃষ্টির বনেও এই বৈরিতার ভাব সমান বহুশূল।

পাশাপাশি হুই জেলাতে ইঁহাদের জমিদারী, হুতরাং সর্ব্বত্রই ইঁহাদের অবকাশ ছিল প্রচুর এবং উভয় পক্ষের কেহই কোন দিন এমিকার কোন হুমিকাকে তুচ্ছ করিতেন না। আশাভ্রমে বোঝানো বাস্তবিক ছিল,

লাঠিয়ালে লাঠিয়ালে মাথাফাটাকাটাও ঘটত তাহার চেয়ে বেশী বই কম নয়। আধ হাত জমি লইয়া মামলা করিয়া লক্ষ টাকা খরচ করিয়া দেওয়া বা দশ-বিশটা মাসের প্রাণ নষ্ট করার মধ্যে ইঁহারা গৌরব বই অগৌরবের কারণ কিছু খুঁজিয়া পাইডেন না। দেখা-শুনা ইঁহাদের মধ্যে ছিলই না প্রায়, তবু সামাজিক বিবাহ আবাদি কাণারে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির গৃহে মধ্যে মধ্যে এই হুই কুলের প্রতীপদের সাক্ষাৎ হইয়াও বাইত। সেখানেও ভদ্রতার বানাই অপেক্ষা শত্রুতার বানাই বেশী হইয়া উঠিত এবং নিরস্ত্রশত্রুকে শঙ্কাহীন করিয়া তুলিয়া তাঁহারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে উভয়ে উভয়কে বড় রকমে পারেন অপমান ও অপমানিত করিবার চেষ্টা করিতেন। প্রাণে অনেকখানি তরঙ্গা না থাকিলে এই ছোট বংশের বাহুবলকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করিবার কথা কেহ ভাবিতও না।

মেয়ের ঘরের বাহির হওয়ার রীতি তখন ছিল না, নিত্যন্ত আত্মীয় ঘর না হইলে এই ছই বনিয়াদী ঘরের বধু বা কস্তার উৎসব উপলক্ষেও অন্তঃস্থ বাইতেন না। তবু শত্রুর গোষ্ঠীর সকল খবরই ইহারা ঘরে বসিয়াই রাখিতেন। কার কর ছেলে কর মেয়ে, কোথার তাহাদের বিবাহ হইতেছে, নূতন কুটুম্ব কিরূপ অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী, এ সকল খবর ত বাড়ির পুরুষদের নিকট হইতেই তাঁহারা পাইতেন। ইহা অপেক্ষাও অন্ধরমহলের খবর বাহা, বখা, কোন্ বধু কত অলঙ্কার লইয়া আসিল, কোন্ মেয়ের শ্রী কিরূপ, ক্রীপূর্ববে কোথায় মনের মিল আছে এবং কোথার নাই, তাহাও ইহারা নানা উপায়ে জানিয়া রাখিতেন। নিম্ন শ্রেণীর প্রজা বাহারা, তাহাদের ঘরের মেয়েরা ত অন্ধরমহলবাসিনী নয়, কাজের খাতিরে সর্বত্রই তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইত। জমিদার-বাড়ির অন্তঃপুরেও ইহাদের গতিবিধি অবাধ ছিল। জেলেনী মাছ লইয়া, তাঁতিনী শাড়ী লইয়া, যখন-তখন দেউড়ির দরওয়ানকে অগ্রাহ্য করিয়া সোজাহুজি ভিতরে চলিয়া যাইত। সুতরাং বেশ সহজেই এক বাড়ির হাড়ীর খবর আর এক বাড়িতে গিয়া পৌঁছিত।

যে-সময়কার কথা হইতেছে, তখন শুধু-বংশ উজ্জ্বল করিয়া আছেন চন্দ্রকান্ত জহ এবং মিত্র-বংশের মৈত্রীর অভাব সবচেয়ে জোহগলায় প্রচার করিতেছেন করালীকিরুর মিত্র। পূর্বেকার ধনবল এবং জনবল অনেকটাই কমিয়া গিয়াছে, আশা আছে এই ভাবে চলিতে থাকিলে, বাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও শেষ হইতে বিলম্ব হইবে না, বড়-জোর আর ছই পুঙ্খ চলিবে। কিন্তু তাই বলিয়া পিতৃপিতামহের নাম দুবাইয়া দেওয়া চলে না, তাঁহারা যে ভাবে বাহা করিয়া গিয়াছেন, ইহাদের আমলেও ঠিক সেই ভাবেই তাহা চলিতেছে।

করালীকিরুরই অবস্থা এই ছই বংশের মধ্যে একটু বেশী কাছিল হইয়া পড়িয়াছে। উপরি-উপরি কয়েকটা ভারি মামলার ভিত্তি হারিয়া গিয়াছেন, একে ছোট কস্তার বিবাহে বহুতর কর করিয়াছেন, দুইট পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহার বক্ষঃস্থল একাধিক ঘরে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। সত্যিকার প্রথা অনুযায়ী ভিত্তি উঠতি ঘর

দেখিয়া কস্তা দিয়াছিলেন, এবং পড়তি ঘর হইতে কু আনিয়াছিলেন। সুতরাং কস্তাগণ অন্তঃস্থ বাইবার সময় অলঙ্কার ও অর্থে উঠতি ঘরের বধুর উপযুক্ত ভাবেই গেলেন, বধুরা আসিলেন শুধু বিপুল কলগোরব লইয়া। এখনও এক পুত্র ও এক কস্তার বিবাহ বাকী। পুত্রটি হুর্ভাগ্যক্রমে পরিবারের উপযুক্ত নয়। দেখিতে স্বে-ভাইদের চেয়ে চের কালো ও দুর্বল, আভিজাত্যের অন্ত অনেক গুণ হইতেও বঞ্চিত। অল্প বয়স হইতেই মহিষ-বলি দেখিলে সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, বাপের চাবুকের ভয়ও তাহাকে সেখানে ধরিয়া রাখিতে পারে না। উৎপীড়িত প্রজাকে লুকাইয়া অর্থসাহায্য করিয়া আসে, দম্বিত প্রজাকে রাতারাতি জমিদারীর সীমানা পার করিয়া দিয়া আসে। শিকার-খেলা, বাঈনাচ দেখা, ও আহুযজিক আমোদ-প্রমোদে তাহার কোনই উৎসাহ দেখা যায় না, দিবারাত্রি বই পড়া ও বাগান করা লইয়াই তাহার দিন কাটিয়া যায়। বাড়িতে সকলেই তাহাকে কুপামিশ্রিত অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, এক তাহার মা ছাড়া। মা ছেলের ব্যবহারে একটু যে লজ্জিত নয়, তাহা নয়, তবে তাহার প্রতি সহানুভূতির ভাবটাই বেশী। তাঁহারই বংশের কোনো এক পূর্বপুরুষ শাস্ত্র-বংশের মুখে কালি দিয়া বৈফব হইয়া নবদীপে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এই ছেলে তাঁহারই অভাব পাইয়াছে বলিয়া সকলে তাঁহাকেই খোঁটা দেয়। বাহার জন্ত অত কথা সহিতে হয়, তাহাকে একটু বেশী রকম ভাল না বাসিয়া মা পারেন না। ছেলের সব আবক্ষার তাঁহারই কাছে; এ-ছেলে পায়তপকে যেমন বাপের হায়া মাড়ায় না, অন্ত ছেলেরাও ভেমনি মায়ের সংসর্গ অনৈকধ্যানি এড়াইয়া চলে। বিমল যে মায়েরই গোপন প্রস্তাবে এত-খানি মাটি হইয়াছে, এ-বিষয়ে কাহারও কোন্দো সন্দেহ নাই। ভাইরাও খোলাখুলি ভাবে তাহাকে খোঁটাম ভাকুর বলিয়া ডাকে, এবং মালা তিলক ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাইতে উপদেশ দেয়।

অন্ত ভাইদের সব যোগ-সড়ের স্বপ্নের স্বপ্নসেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিদ্যেশের কল কুড়ি পার হইয়া এক্ষণে চলিতেছে, তবু এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। মায়ের ইচ্ছা বিবাহ দীর্ঘ হই, নরত ছেলে-সন্তাই হইত কোনদিন সন্ন্যাসী হইয়া

বাহির হইয়া বাইবে। বাপ বলেন, সমান ঘরে বিধলের সম্বন্ধ করতে তাঁহার লজ্জা বোধ হয়, ইহাকে নিজের পুত্র বলিয়া লোকের সম্মুখে তিনি বাহির করিবেন কিরূপে? ছেলের যেমন চেহারা, তেমনি গুণ। দেখিলে বোধ হয় ঠিক কেন চালকলাভোজী ভট্টাচার্যের পুত্র, দিনরাত বই মুখে করিয়াও ঠিক তেমনই বসিয়া থাকিতে পারে। কেরানীর কাজে ইহাকে মানাইবে ভাল, ভবিষ্যতী করা ইহার কৰ্ম নয়। মা বলেন, “না-হয় অসমান ঘর থেকেই বউ আন, এমনও ত চের হয়। প্রথম দুই ছেলেরই বিয়েতে কুল ত চের দেখা গেছে, এবার না-হয় থাক।”

করালীকির ব বলেন, “আমি থাকতে ত নয়। ও-সব চক্রকান্ত শুধর ধারা হয়, করালী মিস্ত্রিরের দ্বারা হয় না। টাকার লোভে সে নাকি নাপিতের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছে।” চক্রকান্তের নামে এই অপবাদটি প্রচার করিয়া বেড়াইতে করালীকিরের বড়ই ভাল লাগে। ক্রমাগত বলিয়া বলিয়া তিনি কথাকাঁকে প্রায় সত্য বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। চক্রকান্ত সত্যই অবশ্য নাপিতের ঘরে ছেলের বিবাহ দেন নাই। অর্থের লোভে কিছু নীচু ঘরের মেয়ে তিনি আনিয়াছিলেন বটে। বধুর কুলগোরবের অভাব, তাহার পিতা অর্থ দিয়া এমন ভাবে মিটাইয়া দিয়াছিলেন, যে, চক্রকান্ত কৈরাসিন এ-কার্যের জন্য অনুতাপ করেন নাই। প্রধানতঃ কোইনের নিকট হইতে লব্ধ অর্থের সাহায্যেই তিনি করালীকিরকে উপরি-উপরি দুইটি বড় মাঝারি হারাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং বেহাইটিকে নাপিত প্রতিপন্ন করার দিকে করালীকিরেরই সঞ্চেষে বেশী ঝোঁক ছিল। বিবাহ করিতে বিধলের ইচ্ছা আছে কি অনিচ্ছা আছে, তাহা অবশ্য কেহ কোনদিন জ্ঞানিবার চেষ্টা করে নাই। এ-সকল কথা বর বা কথাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রথা তখন ছিল না।

চক্রকান্ত করালীকিরকে অপেক্ষা করলে অনেকটাই বড়। তাঁহার নিজের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ অনেক কালই চুকিয়া গিয়াছে, এখন লম্বা নাড়নীদের পাশা ব্রহ্ম হইয়াছে। বড়ছেলের কড়মেজের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এখন সেও ছেলের একটি মেয়ে এবং একটি দৌহিত্রী বিবাহ-বোন্দা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের জন্য পাত্র অনুসন্ধান

করা হইতেছে। দৌহিত্রীর মা, তাঁহার তৃতীয়া কন্যা। অল্পবয়সেই বিধবা হইয়া এই কন্যাটি মাত্র লইয়া সে আবার মা বাপের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। শ্বশুরবাড়িতে যে তাহাকে ভাত দিবার মত অবস্থা নাই, তাহা নহে। তবে মেয়ে ভরসা করিয়া সেখানে থাকিতে পারে না। শ্বশুর-শাশুড়ী বাচিয়া নাই, তাহুর-দেওরগুলি অতি হৃদান্ত, তাহাদের নামে বাবে গরুতে এক বাটে জল খায়। মেয়ের বিবাহের ভার তাহার মাতামহের উপরেই পড়িয়াছে। তিনি অবশ্য ইহাতে কিছু কাতর ন'ন। মেয়েটির রূপের খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রূপ দেখিয়া মাতামহই সাধ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন পূর্ণিমা। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, ইহাকে পরের ঘরে পাঠাইবার নামেই মায়ের বুক কাঁপিয়া উঠিত। তাই তখনকার দিনের আদর্শে মেয়ের বয়স যথেষ্ট হইয়া যাওয়া সবেও তাহার তখনও বিবাহ হয় নাই। বাড়ির লোকে অবশ্য তাহার বয়স দশের বেশী হইয়াছে তাহা স্বীকার করিত না, কিন্তু পূর্ণিমা বাস্তবিক তখন ত্রয়োদশী। তাহার চেয়ে দুই বৎসরের ছোট মামাতো-বোন কমকলতারও বখন বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় স্থির হইয়া আসিল তখন আর পূর্ণিমার বিবাহ না-দিয়া কি করিয়া চলে? সুতরাং চক্রকান্ত ঘটক-ঘটকীকে দৌহিত্রীর ভ্রাতৃও পাত্র খুঁজিতে বলিয়া গিলেন। পোজীর বিবাহ অপেক্ষা দৌহিত্রীর বিবাহে তিনি বেশ রচ কিছুই কম করিবেন না, তাহাও জানাইতে ক্রটি করিলেন না। দুই-একটি করিয়া এখার-ওখার হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল।

কিন্তু পূর্ণিমার বা উমাশ্রীকে কোনো সম্বন্ধই আর পছন্দ হয় না। রকম দেখিয়া তাহার মা বলিলেন, “অত খুঁৎ-খুঁৎ করলে কি আর ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় বাছা? একেবারে নিখুঁৎ মায়ব কি আছে? তবুই মধ্যে মধ্যে বাবু বাবু দিলে, ভালটুকুর দিকে তাকিয়ে কাঁচ করতে হয়। স্বাকী মেয়ের হাত।”

উমাশ্রী বলিল, “মা, লেব তোমার প্রতি সম্বন্ধ, ভগবান করল সবই থাক, তাই এ-কথা-কথতে পারছ। আমি যে মেয়ের দার মেয়েই না, লামার মত কলস

নেই। পাড়ার পট্টা নয়, এই একটি ত বেয়ে গর
অদৃষ্টে ছুঁতে আর আমি দেখতে পারব না। জাই বড়টা
পারি ভাল দেখে দিতে চাই। বাংলা দেশে কি এই চারটি
পাড়া ছাড়া পাড়া নেই?”

মা বলিলেন, “শাকবে না কেন? তবে শুধু ছেলে
হলেই ত হয় না, আমাদের করণীর খরও ত হওয়া চাই?।
সেরকম আর কষ্টা আছে? তোমার বাবার মাথা হেট
করে যেখানে-সেখানে মেয়ে দিয়ে দেওয়া যায় না ত?”

উমাক্ষী জানিত বাবার হেটমাথা টাকা পাইলেই
আবার সোজা হইয়া যায়। কিন্তু সে-কথা ত আর মাকে
বলা যায় না। সে শুধু বলিল, “তবু আর একবার ঘটক-
ঘটকীদের একটু খরতে বল। ছেলের বয়স খুব বেশী আমি
চাই না, স্বাস্থ্যও যেন ভাল হয়। লেখাপড়া জানা হ'লে
ভালই, একেবারে মুখ মাংসের স্বভাবচরিত্র প্রায়ই ভাল
হয় না।”

মা মেয়ের বাথা কোথায় জানিতেন, নিজের তাহার
জন্ত যে বরটি আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার না ছিল যৌবন,
না ছিল স্বাস্থ্য; স্বভাবচরিত্রেরও বিশেষ গৌরব করা চলে
না। হ্যাঁ, তবে অর্থ ছিল, কুলগৌরব ছিল, এ না দেখিলে
তাহাদের ত চলে না। হতভাগিনী মেয়ের অদৃষ্ট খারাপ,
তা এখন অর্থ, বা কুলগৌরবের উপর রাগ করিলে কি
হইবে? তিনি হাসিয়ার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, “তা বেশ,
ঘটকীদের বলে দেব আমার রাঙা দিদিমণির জন্তে টুলো
ভট্টচার ধরে আনতে।”

করালীকিন্দের বাড়িতেও খবর পৌছিয়া গেল যে,
চন্দ্রকান্ত গুহের পরিবারে জোড়া বিবাহের আয়োজন
হইতেছে। তিনি হাসিরা গোঁকে চাড়া দিয়া বলিলেন,
“এবার গুহেশ্বার গোরালা কি তাঁতি কার বাড়ি কান্দ
করেন দেখা যাক। সৎ কারস্থের জাত নয় মারলেই ভাল,
তবে টাকার আকাকাল সব হয়।”

অঙ্গরমহলেও ইহা লইয়া খুব আলোচনা চলিতে
লাগিল। বিমলের বিব্রা পিসীমা ভ্রাতৃজ্ঞানকে ওনারিয়া
ওনারিয়া বলিলেন, “ও বো, গুহরা ত ঢাক বাড়িতে জোড়াহু
সরগরম করে কুলছে, বাড়িতে জোড়া বিয়ে। তোমাদের
খর কি ছেলে-মেয়ে সেই একেবারেই চূপ করে থাকবে?”

করালী-গৃহিণী মুখ আঁখার করিয়া বলিলেন, “ও কথা
আমার শুনিবে কি হবে ঠাকুরকি? আমি ত বিয়ে দেবার
মালিক নই, যে মালিক তাকে শোনাও।”

ঠাকুরকি বলিলেন, “এ-সব মেয়েদেরই ব্যাপার, তারা
গিহন থেকে ঠেলা না দিলে কি বেটাছেলের এগোর?
তোমার গিরিজাও বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে বাপু, আর
চোখে দেখা যায় না, আমরা ও-বয়সে চার বছর খণ্ডর-খর
ক'রে এসেছি, আর বিমলের ত বয়সের গাছপাখর নেই।
ওর কি তোমার বিয়ে দেবেই না? সত্যিই কষ্ট ভিলক ধারণ
করাতে চাও নাকি?”

ভ্রাতৃজ্ঞান ননদের হল ফুটানোর চেষ্টা দেখিয়া মুখ তার
করিয়া উঠিয়া গেলেন। রাজে স্বামীকে বলিলেন, “হ্যাঁ গা,
তুমি ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে না, আর খোঁটা খেয়ে মরব কি
আমি?”

করালীকিন্দের বলিলেন, “এ ত বিনা-পরসার হবার
ব্যাপার নয়, পরসাদ আসে কোথা থেকে? অবস্থা ত
তোমার অজানা নেই। টাকা ধার করার কতরকম
চেষ্টা করছি, পাচ্ছি কই?”

গৃহিণী বলিলেন, “তা বিমলেরই বিয়ে লাগে না মুখ,
তাতে ত টাকা লাগবে না? বয়স ঘরে কিছু আসতেও
পারে। গিরির বিয়ে পরের বছর দিলেও হবে,
তোমার বোন বাই বলুন, সে এমন কিছু অরকণীয়া
হয়ে ওঠে নি। বিমলের বিয়ে ভাল দেখে দিলে, গিরির
বিয়ের খরচের ভাবনাও কিছু কমতে পারে।”

করালী ঠোঁটটা প্রায় উন্টাইয়া ফেলিয়া বলিলেন,
“পাগল হয়েছ? তোমার ঐ ছেলের জন্তে কেউ টাকা
দেবে? ওকে জমিদারের ছেলে বলে বিবাসই কেউ
করবে না।”

গৃহিণীর মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল দেখিয়া,
তাহাকে আবার একটু খর বল্লাহিতে হইল। খোঁটা
দিবার শোভটুকু ছাড়া যায় না, বড় মধুর জিনিষ,
আবার খুব বেশী চটাইয়া দিতেও লাল হইয়া না।

অগত্যা বলিলেন, “দেখা যাক, ঘটকচুড়মণি
বামাপদকে একবার ডাক দিই। বউ কি রকম চাও?
অন্ত বউদের মত কি আর পাবে?”

চালকলা-থেকে বায়ন, কতই আর বুদ্ধি হবে? করাসীর তখন শাসন নেই, আমার বাপের আমলে হ'লে একথা বুঝে আর উদ্ধার করতে হ'ত না বায়নের পোকে।"

গৃহিণী বলিলেন, "যাক্ গে দাসী-চাকরর সঙ্গে ঠাট্টা করেছে, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ত বলে নি? শুনেছি বটে শুধুদের নাতনী ভারি ডাকসাইটে হুম্মরী, সেদিন ব্রজ-তাঁতির বউও বলছিল।"

বরসকালে পিসীমারও হুম্মরী বলিয়া ব্যাতি ছিল, তাই পারতপক্ষে তিনি কাহাকেও হুম্মরী বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিলেন, "ওগো বার গান শুনি নি সে বড় গাউনি, আর বার রান্না খাই নি সে বড় রান্নুনি। বাংলা দেশে না-কি আবার এমন মেয়ে নেই? বামাপদ-নটক বাংলা দেশের সব মেরেকে দেখেছে না-কি? বিয়ে দিতে হবে, বাপমরা মেয়ে, কাজেই ও-রকম ভাল মন্দ হু-চার কথা না রটালে চলবে কেন?"

বিসলের মা বলিলেন, "না গো ঠাকুরঝি, মেয়ে হুম্মর হওয়ারই কথা, ছোটবেলার ওর মাকে দেখেছি খালা দেখতে, এ ত তারই মেয়ে, হুম্মর হবে না কেন?" ননদিনী বাক্কোর দরজায় পৌছিয়াও যে অতীত রূপের জাঁক করিয়া বেড়ান, ইহা করালী-গৃহিণীর ভাল লাগিত না।

যা হউক, দুই পরিবারেই আসন্ন উৎসবের সাদা পড়িয়া গেল। চক্রবর্তীর ত দুইটিই কল্যাদানের ব্যাপার, হুতরাং জোগাড়টা খুব রাজকীর ভাবেই হইতে লাগিল। উমাশরী নিজের যথাসর্ব্ব বাহির করিয়া দিল, গহনাতে টাকাতে তাহা নিতান্ত মন্দ হইল না। তা ছাড়া পূর্ণিমার মাতাসহও ক্ষুদ্র রাখিকেন না বোঝা গেল। মেয়ের অকালবৈধবা খানিকটা যে নিজের ঘোষে ঘটনাছে, তাহা অন্ততঃ নিজের কাছে তাহাকে স্বীকার করিতেই হইত, হুতরাং নাতনীর বিবাহে যথাসম্ভব খরচ করিয়া তিনি সে ক্ষুদ্রটার আয়শক্তি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাত্রটি পছন্দ হইলেই হয়, আর সব আরোজন এক রকম সম্পূর্ণই হইয়া গেল।

বিসলের মনও এদিকে পাত্রীর পর পাত্রী আসিয়া জুড়িতে লাগিল। দশ-বারোটিকে নামস্বর করার পর একটি পাত্রীর কথা বিসলের মনের একটু মনে লাগিল। মেরেকে

অবশ্য তিনি দেখেন নাই, বহদিন পূর্বে কোন এক কুইয়ের বাড়িতে তাহার মা-মাসীদের দেখিয়াছিলেন। তাহাদের ত চোখে ভালই লাগিয়াছিল, মেয়ে সেই রকম হইলে মন্দ হইবে না।

বিসলের পিসীমা বলিলেন, "মা-মাসীর মতই যে হবে এমন কি কথা আছে? তাই যদি সবাই হ'ত, তাহ'লে আর ডাকনা ছিল না।"

কথাটার ঠেশ্ কোথায়, তাহা আর কেহ বুঝুক বা নাই বুঝুক বিসলের মা বুঝিলেন। মনে মনে বলিলেন, "তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনও ঠেক দেখ না। রূপ ত আর কারও হয় না?" প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না, কারণ ননদের মুখের উপর কথা বলার নিয়ম তখনও প্রবর্তিত হয় নাই।

পিসীমা নিজেই বলিয়া চলিলেন, "নিজেরা একবার দেখতে পারলে হ'ত। যেটাছেলেরা ওসব বোঝেও না, ওদের চোখে খুণো মিতে কতকণ? সেই যে আমার সেন্দেদেওরের বিয়ের সর্ম্ম কি ঠকানটাই না ঠকালে।"

ব্রাহ্মজায়া বলিলেন, "নিজেরা কি ক'রে আর দেখা বার? সেই কোন্ রাজো তাদের বাড়ি, ধারে কাছে হ'লে না-হয় ছুতো-নাভা ক'রে দাসী-টাসী পাঠিয়ে দেখা যেত।"

নন্দ বলিলেন, "ওদের বাড়ি সেই জোড়তলা পাঁয়ে ত? আমাদেরও ত বাগানবাড়ি রয়েছে তার খুব কাছেই, চল না একটা ছুতো ক'রে দিন-কয়েক সেখানে থেকে আসি। তারপর মেয়ে দেখতে হ'ত কণ? কাছেই জগদ্ধাত্রী-মন্দির আছে, সেখানে পূজো দিতে গেলেই হ'ল?"

বিসলের মা মুখভার করিয়া বলিলেন, "তোমার ভাই যেতে দিলে ত? জোড়তলা যে শুধুদের জমিদারীর মধ্যে কললেই হয়, সেই জন্তে ওদিকে আমাদের কোনদিনই যেতে দেন না।" নন্দ বলিলেন, "তারা আছে নিজের বিয়ের ভাবনা নিয়ে, তোরা কোথায় বাচ্চিস, না-বাচ্চিস, তাই দেখতে আসছে আর কি? হ'লই বা তাদের জমিদারীর কাছে? এখন কোম্পানীর মুন্স, সে দেশ আর নেই যে বন্দ-বার খুশী বরে ঢুকে মাথাটা কেটে

নেবে। আঁচ্ছা দেখি, আমি করালীর মত করাতে পারি কি না।”

ভাইয়ের পিছনে বিধিত লাগিয়া তিনি তাঁহাকে প্রায় রাজী করিয়া জানিলেন। দিন-কতক পরিবার-পরিজনকে ঘুরে পাঠাইয়া দিতে তাঁহার খুব বেশী আপত্তি হইল না। উপযুক্ত পরিমাণে দরোয়ানে লাঠিয়াল অবশ্য সঙ্গে চলিল। এই মেরেটি গৃহিণীর পছন্দ হইলে যথেষ্ট জাত হইবার সম্ভাবনা ছিল, সেটাও আপত্তি না করার একটা কারণ। নিজেও দিন-কতক গিয়া বাগান-বাড়িতে থাকিয়া আসিবেন বলিয়া সকলকে তিনি আশ্বাস দিয়া রাখিলেন।

পূর্ণিমার এমিকে বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। পাত্র, উমানলীর খুব যে পছন্দ হইল তাহা নহে, কিন্তু এমিকে যে প্রায় ঠক বাঁছিতে গা উজাড় হইবার জোগাড়। পূর্ণিমার বিবাহ হইতেছে না বলিয়া কনকলতার বিবাহও সিঁহাইয়া বাঁছিতেছে, এবং বাড়ির লোক চটিয়া খুন হইতেছে।

করালীকিন্দের ঘরে বসিয়া বসিয়া এই সব্ব্বের কথা শুনিয়া রাগিয়া আঙন হইয়া উঠিলেন। এই পাত্রটিকে তাঁহার নিজের কনিষ্ঠা কস্তা গিরিজার জন্য মনে মনে বহুদিন হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। শুধু হাতে টাকা না থাকায়, সম্বন্ধ করিতে অগ্রসর হন নাই। পাত্রটি কুলগৌরবে অতিশয় গরীয়ান, কিন্তু আর্থিক অবস্থা মোটেই সে অল্পপাতে লুচ্ছল নয়, সুতরাং কস্তার সঙ্গে যথেষ্ট রক্তকাক্ষন বোধ না করিলে এ হেন পাত্রের আশা করা বৃথা। পাত্রটির শারীরিক শক্তি ও সাহস তখনকার দিনে বেশবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। চব্বিশ বৎসর বয়সেই অনেকগুলি ব্যায় শিকার করিয়া সে “বাবা হুয়েন” নাম পাইয়াছিল। এমন পাত্র কিনা শেষে চক্রকান্ত গুহ করেকটা টাকা বেশী দিয়া ভাড়াইয়া লইল? করালীকিন্দের একলা ঘরে বসিয়া আপনমনে গল্পহিঁতে লাগিলেন।

কিন্তু শুধু ঘরের কোণে বসিয়া গল্পন করিয়াই নিরন্ত থাকিবার মাহুষ তিনি নহেন। মনে মনে মতলব স্থির করিয়া, ভিত্তি কাজে লাগিয়া গেলেন। পাত্রটির

বাড়ি তাঁহার ঐ পুরোনিষিত বাগানবাড়ির খানিকটা কাছে পড়ে, অন্ততঃ এ-বাড়ি হইতে ত কাছে ষটে। কথাবার্তার সুবিধা হইবে বলিয়া কিছুদিনের মত বড় ছেলের উপর জমিদারী-মজুরাভ্যাস সব কাজের ভার দিয়া তিনি বাগানবাড়ি যাত্রা করিলেন। গৃহিণী ও বিমল, তাঁহার দিকিকে লইয়া দিন দশ-বারো আগেই ওখানে গিয়া শুছাইয়া বসিয়াছিলেন।

করালীকিন্দের বাগানবাড়িতে পৌছিয়াই আর সময় নষ্ট না করিয়া চক্রকান্ত গুহের যে জাতমান কিছুই নাই, তাহা প্রমাণ করিতে বসিয়া গেলেন। গৃহিণী ও দ্বিদি তখন বিমলের ভাবী বধূটিকে কি উপায়ে দেখা যায়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, করালী কি করিতেছেন না-করিতেছেন সেদিকে তাঁহাদের খেয়াল ছিল না। অবশ্য তাঁহারা জানিলেই যে করালীকিন্দের নিরন্ত করিতে পারিতেন তাহাও নয়।

মাহুষের নিম্মাটা প্রশংসা অপেক্ষা সহজে লোকে বিশ্বাস করে, সুতরাং করালীর চেষ্টা একেবারে বিফল হইল না। পূর্ণিমার সম্বন্ধটা একেবারে পাকা হইয়া আসিয়াছিল, আবার যেন কাঁচিয়া বাইবার উপক্রম করিল। দেনাপাওনা একপ্রকার স্থির হইয়াছিল, আবার তাহা লইয়া তর্কাতর্কি মূক হইল। কিন্তু করালীকিন্দের যেমন পণ-করিয়াছিলেন এ-বিবাহ ঘটতে দিবেনই না, চক্রকান্ত তেমনি বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই বিবাহ ঘটাইলেই, কাজেই দুই পক্ষের প্রচণ্ড টানটানির মধ্যে পড়িয়া, পাত্রের বাড়ির লোকেরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া বাইবার জোগাড় করিল।

কিন্তু তর্কাতর্কি, ঝগড়াঝাটের মধ্যেই পূর্ণিমার বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল, নিমন্ত্রণ-পত্রও বিতরণ হইয়া গেল। চক্রকান্ত ডাবিলেন পাত্রপক্ষ এবার আর কথা খুঁটাইতে ভরসা করিবে না। চক্রকান্ত গুহকে অতখানি অপমান করিতে সাহস করিবে, বাংলা দেশে এমন মাহুষ আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাসই করিতেন না।

বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। প্রকাত সাতসহলা বাড়ি লোকজন পদাঙ্ক করিতেছে। নববধূবাসী মহম্মৎ বলিয়াছে তিন-চার দিন আগে হইতে। বরবাজীদের আধর-

অত্যাধিকার বাহাতে কোন খুঁৎ না থাকে তাহা তদারক করিবার জন্য বৃদ্ধ কর্তা নিজেই আসরে নামিয়াছেন, অল্প কাহারও উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। নানারকম যুথাদ্যের আয়োজন হইয়াছে, স্থানীয় পাচকে সব যদি না পারে, একজন নানা স্থান হইতে পাচক ও ময়রা জোগাড় করিয়া আনা হইয়াছে। বিকাল হইতে পূর্ণিমাঙ্গলিণী পূর্ণিমা রক্তাধরে মালাচন্দনে ও রত্নালঙ্কারে সাজিয়া বসিয়া আছে, সখীর দল তাহাকে ঘিরিয়া কলরব করিতেছে। চারি দিকেই উৎসবের আনন্দ ও শোভা, শুধু উমাশশীর মনে আশঙ্কা ও আনন্দ যেন পাশাপাশি রাজত্ব করিতেছে। চার হাত এক হইয়া না-যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার আর শান্তি নাই।

সন্ধ্যার পরেই প্রথম লগ্ন। এখনও বরপক্ষীয়দের দেখা নাই। সকলেই একটু যেন উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিল। বাড়ি ত তাহাদের বেশী দূরে নয়, সময়মত বাহির হইলে এতক্ষণে আসিয়া পড়ার কথা। কি বাপার কেহ বুঝিতে পারে না। চক্রকান্তের মুখের দিকে তাকাইয়া সবাই ভয়ে ভয়ে এধার-ওধার সরিয়া যাইতে লাগিল, সাহস করিয়া কে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে যাইবে? বর যেন আসিয়া পড়িল বলিয়া, এমন ভাবে তিনি সকলকে কাজ করিতে হুকুম করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার কথাও কেহ ভাবিতেছে না।

লগ্ন আসিয়া পড়িল, কাহারও দেখা নাই। সকলের মানা অগ্রাহ করিয়া উমাশশী আসিয়া বাপের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, “বাবা, আমার খুকীর কি দশা হবে?”

চক্রকান্ত প্রলয়মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত মুখ তুলিয়া বলিলেন, “কাঁদিল নে, আরও লগ্ন আছে। বর এল বলে, তুই ভিতরে যা।”

উমাশশী ভিতরে চলিয়া গেল। চক্রকান্ত একবার কাহারি-বাড়িতে গিয়া কাহার সহিত কি পরামর্শ করিলেন শোনা গেল না, তাহার পর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “আলো যেন একটু না নেবে, বাঙ্গলা যেন এক মুহূর্ত না থাকে, আমি এক বস্তীর মধ্যে বর নিয়ে আসছি।”

উৎসব-ভবন কি এক নিদারুণ অজানা আশঙ্কার যেন রক্ত-

ধামে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পাঁচ-শ সশস্ত্র লাঠিয়াল, ঘোড়া ও হাতি লইয়া চক্রকান্ত বাহির হইয়া গেলেন। অন্তরমহলে জন্মনের রোল উঠিল, তাহাকে ডুবাইয়া নহবৎ সমানে বাজিতে লাগিল।

কিন্তু এক ঘণ্টা শেষ হইতে না-হইতে বর আসিয়া পড়িল। তুমুল শব্দ ও হনুমানিতে আকাশ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, প্রচণ্ড শব্দে বোমা পটকা ফুটিয়া পশুপক্ষীকেও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কান্নাকাটি তুলিয়া মেয়েরা দলে দলে ছাদে ও জানুয়ার ধারে ছুটিয়া বর দেখিবার জন্য।

বরের হাতী এ যে। চক্রকান্তের গৃহিণী আন্তরিক করিয়া উঠিলেন, “ওমা ও কে গো? এত আমাদের হুরেন নয়? কর্তা কোথা থেকে এ শুকুনো কালো ছোঁড়াকে নিয়ে এলেন?”

পাশ হইতে দাসী আশা বলিয়া উঠিল, “হায়, হায়, কোথায় যাব মা! এ যে মিস্ত্রিদের ছোট ছেলে বিমল! কর্তা একে কি করে আনলেন গো গিন্নিমা? এখনি যে খুনোখুনি বেধে যাবে? হায় হায় আমাদের বাঙা দিদিমণির একি হ'ল মা?”

কিন্তু সকল আন্তরিক, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তরের মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। চক্রকান্ত পূর্ণিমাকে নিজে নামাইয়া লইয়া সভাস্থলে চলিয়া গেলেন। অন্তরমহলে আবার কান্না উঠিল, “ওমা, স্ত্রী-আচার হ'ল না, কিছু না, একি বিয়ে গো মা!”

সম্প্রদান আদি হইয়া গেল। কন্যা জামাতাকে তুলিয়া আনিয়া চক্রকান্ত বলিলেন, “নাও, এবার কত স্ত্রী-আচার করতে পার কর।” বিমলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “নাভজামাই, ডাকতি করে এনে ছ বটে তোমার, তবে তুমিও আমার ধরের সব সেরা রক্ত লুটে নিয়ে চললে!”

পাঁচ-শ লাঠিয়াল সারারাত বাড়ি ঘিরিয়া রহিল। প্রতি মুহূর্তে সকলের মনে আশঙ্কা জাগিতে লাগিল এই বৃদ্ধ পুত্র-হরণের প্রতিশোধ লইবার জন্য করালমুষ্টি করালীকিরের আবির্ভাব হয়। আসন্ন সংঘর্ষের জন্য সকলে প্রস্তুত হইয়া রহিল। বাসর-বরেও সকলে শুক্ক হইয়া বসিয়া, শুধু বিমল এক-একবার চোরা চাহনীতে নবপরিণীতা পত্নীর অপূর্ণ স্মরণ যুগের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে করালীকিররও দলবল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাকিয়া বলিলেন, “বের কর আমার ছেলে, নহিলে একটরও ঘাড়ে মাথা থাকবে না।”

চন্দ্রকান্তের লাঠিয়ালরা কাহার যেন আদেশে ছই ফাঁক হইয়া পথ করিয়া দিল। বিমল ও তাহার বধু, ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

করালীকিরর মুগ্ধ বিষয়ে পূর্ণিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বধুও অশ্রুসজল বিদ্যারিত নেত্রে স্বপ্নের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ধানিক পরে করালীই নিতুক্রতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, “বাক, খুব চাল চাললেন গুহ-মশায়। কিন্তু জিতেছি ত আমিই। এস মা, তোমার নুতন ছেলের বাড়ি যেতে হবে যে?”

বর ও বধু অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। উভয় পক্ষের লাঠিয়ালের দল তুমুল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। উমাশশী সঙ্কোচাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ণিমার হাত বিমলের হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিল, “মা লক্ষ্মী, আশীর্বাদ করি এই ঘর ভোর চিরদিনের ঘর হোক। সব অশান্তি চিরদিনের মত তোদের মিলনে যেন দূর হইয়া যায়।”

মাছতের আঁজার করালীর হাতী অগ্রসর হইয়া আসিয়া বসিয়া পড়িল। বরকনেকে তুলিয়া লইয়া আবার উদ্গিয়া দাঁড়াইল, এবং মাঙ্গলিক ছলু ও শঙ্খ ধ্বনির ভিতর দিয়া ফিরিবার পথে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। উমাশশী অশ্রুস্রব চোখে মাতাপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী এস. এ. হসেন ইকবাল-উন-নিসা বেগম মহীশূর সরকারের শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত আছেন। তিনি সম্প্রতি বিলাতে লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষাবিষয়ক উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি হাইটমারল্যাণ্ডে অন্তর্জাতিক বাগিকা-গাইড-সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়া ছিলেন।



শ্রীমতী এস. এ. হসেন

পৃথিবীর বৃহত্তম জন্তু

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু, বি-এ

পৃথিবীর বৃহত্তম জীবের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অনেকেই হয়ত হস্তীর বিষয় চিন্তা করিবেন, কিন্তু হস্তীর অষ্টপক্ষাণ্ড রূপাকার প্রাণী যে পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে তাহা বোধ হয় অনেকেই প্রশ্নম চিন্তায় ধারণা করিতে পারিবেন না। এই বৃহত্তম জীবের পূৰ্ণপূৰ্ণযেরা স্থলচর হইলেও ইহার এক্ষণে মহাসমুদ্রে আশ্রয় লইয়া পৃথিবীর সৰ্ববিধ জীবজন্তুর মধ্যে আকার-অয়তনে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর এই বৃহত্তম জীবের সাধারণ নাম তিমি এবং বৈজ্ঞানিক নাম সিটেসিয়া (Cetacea)। দেহের বিপুলতায় স্থলচর জলচর সৰ্ববিধ প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া ইহার মহাজলধির কুক্ষিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

তিমি ও নীলকে সাধারণতঃ মৎস্ত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বাছড়কে পক্ষী বলিলে বৈরূপ ভ্রম হয় তিমি ও নীলকে মৎস্ত বলিলেও তদ্রূপ ভ্রমে পড়িতে হয়। জলে অবস্থান করিলেও তিমির আদৌ মৎস্ত-জাতীয় নহে। চতুষ্পদ জীবের সহিত ইহাদের বাহ্যিক কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও দেহের আভ্যন্তরিক গঠনে অনেক বিষয়ে উহাদের সহিত তিমির মিল আছে। তিমির ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, নেরুদণ্ড, গ্রীবা, যকৃত, পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রাশী এবং জননেন্দ্রিয় চতুষ্পদ প্রাণীদের অতুল্যরূপ। চতুষ্পদ প্রাণীদের মত ইহার ফুসফুসের দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য সম্পন্ন করে। চতুষ্পদ জীবের মতই ইহাদের হৃৎপিণ্ড চারিটি কোষে বিভক্ত। এই হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া ইহাদের বিপুল কালবরে উচ্চ শোষণিত ধারা প্রবাহিত হয়। ইহাদের 'পাখনা,' পের, মস্তক প্রভৃতির অস্থির সহিত চতুষ্পদের কঙ্কালের সাদৃশ্য আছে। ইহাদের দেহের দুই পার্শ্বের পাখনার অস্থিগুলি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উহা মৎস্তের সাধারণ পাখনার মত নহে। এই পাখনার কঙ্কাল দেখিতে আমাদের হস্তের কঙ্কালেরই মত। ইহার মধ্যে স্বকান্ধি, উর্দ্ধ ও নিম্ন বাহুর অস্থি, এবং পঞ্চাঙ্গুলির অস্থিসকল স্পষ্টই

দেখিতে পাওয়া যায়। পাখনা দুইটিকে ইহার হস্তের মতই ব্যবহার করে। স্তম্ভপান করাইবার সময় ত্রী-তিমির শাবককে পাখনার দ্বারা টানিয়া লয় এবং ভীত বা তাড়িত হইলে ইহা দ্বারা শাবককে ধরিয়া পলায়ন করে। চতুষ্পদ-দিগের মতই তিমির শাবক প্রসব করে এবং উহাকে এক বৎসরকাল স্তম্ভপান করাইয়া থাকে। এই সকল কারণে মনে হয় তিমিদের পূৰ্ণপূৰ্ণযেরা স্থলচর জীব ছিল এবং সে-কালের অতিকায় গোধা, অতিকায় সরীসৃপ এবং অতিকায় চতুষ্পদদিগের মত পৃথিবীর শৈশবে মেদিনী বিকস্পিত করিয়া বিচরণ করিত। যে আদিম মানবের অত্যাচারে মামথ বা অতিকায় হস্তী প্রভৃতি বিনুণ হইয়া গিয়াছে সেই অসভ্য যুগযুগজীব আমমাংসভাজী মনুষ্যের তাড়নাতেই বোধ হয় সে-যুগের তিমির সাগরগর্ভে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। শেষে যুগযুগান্তরের ক্রম-বিবর্তনের ফলে তাহাদের পূৰ্বরূপিত ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া জলে বাসোপযোগী হইবার নিমিত্ত মৎস্তের মত হইয়া গিয়াছে এবং হস্ত দুইটি পাখনায় ও দেহের শেষাংশ মৎস্তপুচ্ছের মত রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে।

জলে আসিয়া বাস করার নিমিত্ত তিমির দেহের আকার-পরিবর্তনের সহিত উহাদের অস্থিসমূহের গঠনও বিস্তরিত হইয়াছে। ৬০ ফুট দীর্ঘ তিমির ওজন প্রায় ১,৯০০ মণ বলিয়া অনুমান করা যায়। গ্রীনলাণ্ড-তিমিদের ওজন প্রায়ই এক শত টন বা প্রায় ২,৭৫০ মণ হইতে দেখা যায়। হস্তীর সহিত তুলনা করিলে এই প্রকার একটি তিমিকে প্রায় ৮৮টি হস্তী অথবা ৪৪০টি বৃহৎ ভল্লকের সহিত ওজন সমান হইতে দেখা যায়। ইহাণেক্ষা বৃহৎ তিমির ওজন যে কিরূপ তাহা অসম্ভবসাপেক্ষ। এই প্রকার বিপুল দেহের অস্থিগুলি হস্তিকঙ্কালের মত নিরেট হইল তিমিকে জলে আর সত্তরণ দিতে হইত না। এই বিপুল দেহকে সমুদ্রের জলের মধ্যে ভাসমান রাখিবার

নিমিত্ত ইহাদের দেহের অস্থিগুলি ছিদ্রময় এবং চর্মের নিম্নে খুব পুরু বসার উৎপত্তি হইয়াছে। সুপারি বা নারিকেল গাছ কাটিলে গাছের গুঁড়িকে যেমন সহজ দেখায় তিমির অস্থিগুলিও সেইরূপ ছিদ্রময়। এই



স্পার্ম বা তৈলতিমি

ছিদ্রগুলি আবার তৈলে পূর্ণ থাকে। কলিকাতার বাহুঘরে তিমির যে-সকল কঙ্কাল রক্ষিত হইয়াছে সে-গুলি লক্ষ্য করিলেই ইহাদের অস্থির গঠন উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

জলে আসিয়া বাস করার কলে অস্থির গঠন-পরিবর্তনের সহিত যে বসার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এক ইঞ্চি পুরু চর্মের নিম্নে প্রায় ১০ হইতে ১৫ ইঞ্চি পুরু বদা ইহাদের সমস্ত দেহটিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কর্ক যেমন বৃক্ষের কাণ্ডকে চারি দিকে আবৃত করিয়া শীতাতপের আধিক্য হইতে গাছকে রক্ষা করে তিমির পুরু বদাও সেইরূপ ইহাদিগকে সহজে ভাসমান থাকিবার উপযোগী করিয়া জলের শৈত্য হইতে ইহাদের অতাপ রক্ষা করে। তিমি ব্যতীত সীল এবং সিঙ্গুঘোটকদের সেরে এই উদ্দেশ্যে পুরু বসার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রাণিকবিদদেরা তিমিকে সাতটি প্রধান শ্রেণীতে

বিভক্ত করিয়া থাকেন। তিমিদের মধ্যে কতকগুলির দন্ত থাকিতে এবং কতকগুলিকে দন্তহীন হইতে দেখা যায়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিষুবমণ্ডলের অন্তর্বর্তী সমুদ্র-সমুদ্র 'স্পার্ম' হোয়েল' বা তৈলতিমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিমির আকারে সাধারণতঃ ৫৫ ফুট হইতে ৬০ ফুট অবধি দীর্ঘ এবং প্রায় ১৬ ফুট উচ্চ। ৭৬ ফুট দীর্ঘ তৈলতিমি প্রত হইবার কথাও শুনা গিয়াছে। স্ত্রী-তৈল-তিমির ক্রান্ত একরূপ বৃহৎ হয় না। খুব বৃহৎ হইলেও স্ত্রী-তৈলতিমিকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুটের অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায় না। এই তিমিদের কেবল মাত্র নিম্ন চোয়ালের মাড়িতে দন্তের শ্রেণী থাকিতে দেখা যায়। উপর চোয়ালে দন্ত থাকে না। নিম্ন-চোয়ালে দন্ত বসিবার নিমিত্ত উপরকার চোয়ালে অনেকগুলি গহ্বর থাকিতে দেখা যায়। বৃহৎ তৈলতিমির এক একটি দন্ত ওজনে প্রায় এক সের হইতে দুই সের অবধি হইয়া থাকে।

তৈলতিমি ব্যতীত উত্তর-হিমকোট-মণ্ডলের সমুদ্র-বাসী নার্কালিগেরও উপর-চোয়াল হইতে অল্প আকারের একটি পাকান দন্ত দেহের সহিত সমান্তরালে বাহির হইয়া থাকে। নার্কালেরা মাত্র বিশ-পঁচিশ ফুট দীর্ঘ হইলেও ইহাদের দন্ত ৯ হইতে ১৪ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই দন্ত কাঁপা এবং দেখিতে গোলাকার হুন্সাগ্র দন্তের মত। ইহার বর্ষ হস্তিদন্তের মত শুভ্র এবং অগ্রভাগ হুচের মত তীক্ষ্ণ। এইরূপ আকারের নিমিত্ত



এসলাণ্ডের বৃহৎ তিমি

ইহাকে নার্কালের দন্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বিধাবোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা উহাদের উপর-চোয়ালে রূপান্তরিত ছেদনদন্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সাধারণতঃ নার্কালদের একটিমাত্র দন্ত থাকিলেও

দুই দন্তযুক্ত নার্কালেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দস্তহীন তিমির মধ্যে গ্রীনল্যাণ্ডের বৃহৎ তিমি এক স্বী-পুরুষ উভয় শ্রেণীরই উপর-চোয়াল হইতে এই প্রকার দন্ত বাহির হইয়া থাকে। কখন কখন এই দন্ত পাকান-ভাবের না হইয়া বেশ মসৃণ হইয়া থাকে।

আবার অনেক সময় এই দন্তকে ঈষৎ ফুকাকারেও বর্ধিত হইতে দেখা যায়। বর্ষ এবং গঠনে গজদন্তের মত হইলেও বস্তুহিসাবে ইহা গজদন্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ। গজদন্ত সেরূপ কালক্রমে হরিদ্রাভ হইয়া যায়, নার্কালের দন্ত সেরূপ হয় না। পূর্বে এই দন্ত মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত। এই দন্ত নার্কালের আকৃতিকে ভীতিপ্রদ করিয়া দিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা অতি নিরীহ প্রাণী। দন্ত দ্বারা শত্রু আক্রমণ করিতে বা আত্মরক্ষায় এই দন্ত ব্যবহার করিতে ইহাদিগকে বড় দেখা যায় না। কি উদ্দেশ্যে যে ইহাদের মুখে এই সুদীর্ঘ দন্তের উদ্ভব হইয়াছে তাহা এখনও বিশেষ বুঝিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ অবস্থায় ইহাদের জীড়া-কৌতুক লক্ষ্য করিলে এই দন্তকে ইহাদের পক্ষে নিগ্রহ-স্বরূপ বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারে।



তিমি-জাতীয় জীড়াশীল ডলফিন

দন্তের সংরক্ষণে ইহাদের বিশেষ যত্ন দেখা যায় না। এই দন্তকে প্রায়ই সমুদ্র-শৈবালে জড়িত ও অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। গ্রীনল্যাণ্ডের বৃহৎ তিমির প্রায়ই ইহাদের অঙ্গসংরক্ষণ করিয়া থাকে। এই কারণে সে-দেশের লোকেরা নার্কালকে তিমির অগ্রদূত বলিয়া থাকে। ডেভিস-প্রাণালী ও ডিস্কো-উপসাগরে বহু নার্কাল দেখিতে পাওয়া যায়।

দস্তহীন তিমির মধ্যে গ্রীনল্যাণ্ডের বৃহৎ তিমি এক নীল তিমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রীনল্যাণ্ডের তিমির দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ হইতে ৭০ ফুট। তিমি বলিতে সাধারণতঃ গ্রীনল্যাণ্ডের তিমিকেই বুঝাইয়া থাকে।



ররকোয়াল বা নীল তিমি
মুকবদীর জীমগীলনাথ পাল কর্তৃক অঙ্কিত

ইহাদের মুখে দন্তের পরিবর্তে পঞ্জরাস্থির মত অনেক-গুলি লম্বা লম্বা হাড় থাকিতে দেখা যায়। এই হাড়গুলি উপরকার চোয়াল হইতে চিক্ননীর দাঁতের মত নীচের চোয়ালে নামিয়া আসে। এই হাড়গুলিকে ইংরেজীতে 'হোয়েল বোন' বলে। পূর্ণবয়স্ক তিমির মুখে হোয়েল বোনের সংখ্যা প্রায় ৫০০। বাঁজুরির শিকের মত এই হাড়গুলি ঠুঁ ইকি অন্তরাল করিয়া সাজান থাকে।

ইহাদের মধ্যে মাঝের হাড়গুলিকে দীর্ঘাকার এবং দুই পার্শ্বের হাড়গুলিকে ক্ষুদ্র হইতে দেখা যায়। হোয়েল বোনের এই সকল হাড়ের মাঝে মাঝে আবার ঘন পুরু রোমাকালীর উৎপত্তি হইয়া ইহাকে একটি প্রকাণ্ড চাঁকনির মত করিয়া দিয়াছে

দন্ত না থাকায় এত তিমির হোয়েল বোনের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শব্দাদি ধরিয়া আহার করে। গ্রীনল্যাণ্ডের চতুর্পার্শ্ববর্তী সমুদ্র এবং স্পীটসবার্জেন দ্বীপের জনহীন তুষার-সমুদ্রই ইহাদের প্রিয় বাসস্থান। পৃথিবীর উত্তর গোলাকর্ষের ৭৪ এবং ৮০ ডিগ্রির মধ্যে ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের তাপে এই স্থানে অত্যধিক মাত্রায় ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শব্দাদির

উত্তর হর বলিয়া এই স্থানেই ইহাদিগকে বহুসংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়। উত্তর-আমেরিকার নদীগুলির মুখেও বহু তিনি দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রের উপর এক জাতীয় পক্ষ্মবৃত্ত ক্ষুদ্র পতঙ্গকে



ভোঁতাঝুখা তৈলতিমি

ভালিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহাদের বর্ণ কালো এবং আকার সীমবীজের মত ক্ষুদ্র। সমুদ্রের উপরিভাগে ইহারা পুঞ্জীভূত ভাবে অবস্থান করে। লিনিয়স এই পোকায় মাম দিয়াছিলেন 'মেডুসা'। পক্ষ্মাচার মেডুসারা উদ্ভিত পাবে না। এই পক্ষ ইহাদিগকে সস্তরগে সহায়তা করিয়া থাকে। তিমিরা, বিশেষতঃ গ্রীনলাণ্ডের তিমিরা, পুঞ্জীভূত অবস্থায় ভাসমান এই মেডুসাকে ধরিয়া আহার করে। ইহাদের চোয়ালে প্রায় সকল সময়েই এই পোকাকে সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। এই পোকা এক পুঞ্জীভূত ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শব্দকাণ্ডি ইহাদের প্রধান

আহার। ইহাদের পাকস্থলী বিদীর্ণ করিলে উন্মধ্যে সর্বদাই নদী বা মলমের মত এক প্রকার মেঘবৎ পদার্থ থাকিতে দেখা যায়। নার্কালরাও গ্রীনলাণ্ডের তিমির মত সমুদ্রের পোকামাকড় খাইয়া জীবনধারণ করে।

তৈলতিমি বা স্পার হোরেলরা কিন্তু এতদপেক্ষা পোকা ভক্ষণ করে না। ইহাদের জিহবার আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের গলনশীল বিশেষ প্রশস্ত। এই গলনশীল আকার এতদূর বৃহৎ যে ইহারা অনায়াসে একটি বৃহৎ বুয়কে স্ফাংকরণ করিতে পারে। ইহারা বহু পরিমাণে নানা জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য ও কটল-কিশ্ব ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের পাকস্থলী জীর্ণ করিলে

ভগ্নাধো সর্কদা সদ্যোগলাধঃকৃত বা অর্ধজীর্ণ ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু মৎস্য ও কটল-কিশ্ব থাকিতে দেখা যায়। ইহাদের পাকস্থলীর মধ্যে অনেক সময়েই আট-নয় ফুট লম্বা মৎস্য থাকিতে দেখা গিয়াছে। মৎস্য বাতীত শুণ্ডক ও ডলফিনকেও

ইহারা খাদ্যবোধে অনেক সময় ভাড়া করিয়া থাকে। ইহাদের গলনশীল আকার ও মৎস্যহারের পরিমাণ হিসাব করিলে ইহাদিগকে সমুদ্রের রাক্ষস না বলিয়া থাকা যায় না। অক্রান্ত হইলে বা মৃত্যুর পরেই ইহারা কটল-কিশ্ব প্রভৃতিকে পাকস্থলী হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে।

কাৎ অথবা চিং হইয়া ইহারা শিকার ধরিয়া থাকে। ক্রুদ্ধ হইলে ইহারা নৌকা প্রভৃতি দংশন করিয়া চূর্ণ করিয়া দেয়।

দস্তহীন তিমির প্রসঙ্গে যে নীল তিমির উল্লেখ করিয়াছি তাহার ইংরেজী নাম Rorqual, তিমিদের মধ্যে ইহারা আকারে সর্বাধিক বৃহৎ। ইহারা আকারে



নার্কাল বা বড়বস্তী তিমি

৮০।৮৫ ফুট হইতে ১০০ ফুট অর্থাৎ দীর্ঘ হইয়া থাকে। সিব্বল্ডস্ ররকোয়াল (Sibbald's rorqual) বর্তমানকালে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আফ্রিকার ১১ ফুট উচ্চ বৃহত্তম হস্তীর সহিত এই তিমির তুলনা করিলে গজরাজকে একটি ক্রীড়নক বলিয়া বোধ হইবে। নীল তিমিরা তৈলতিমি এবং গ্রীনলাণ্ডের তিমির মত তুলকাই না হইয়া অপেক্ষাকৃত সজ ও লম্বাকার হইয়া থাকে।

উত্তর-ম্যাটলটিক মহাসমুদ্রে ইহাদিগের প্রধান বাসস্থান। বঙ্গোপসাগরেও নীল তিমির মত এবং ইহাদের নিকট-গোত্রীয় এক জাতীয় তিমি বাস করে। কলিকাতার সাহসরে নীল তিমির একটি বৃহৎ মন্তকাণ্ডি রক্ষিত

হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সম্মীপের তটে একটি ছোট 'ররকোয়াল' আসিয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গোপসাগরে গ্রীনলাণ্ডের তিমির মত দন্তহীন তিমিও বাস করে। ইহার নাম 'বেলিন' তিমি। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে আরাকান প্রদেশের নিকটবর্তী আম-হাট' দ্বীপে ৮৪ ফুট দীর্ঘ একটি 'বেলিন' তিমির মৃতদেহ আসিয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতার বাত্মঘরে এই তিমির নিম্ন-চোয়ালের অস্থি দুইখানি একটি ঘরের দুই পার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছে। অস্থি দুইখানির আকার দেখিলেই এই তিমির বিশাল কলেবরের বিষয় কিঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে। এখানকার বাত্মঘরে ক্ষুদ্র 'বেলিন' তিমির একটি সম্পূর্ণ কঙ্কালও রক্ষিত হইয়াছে। এই তিমিটি ব্রহ্মদেশের খেবুচং নামক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার হস্তাঙ্গুলির সংখ্যা চারিটি। আরব-সমুদ্র, মালাবার এবং সিংহলের উপকূলেও 'বেলিন' তিমিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্ভ্রতি বোম্বাইয়ের কোলাবা-পয়েন্টের তটে একটি পক্ষাশ্রুত দীর্ঘ বেলিন তিমির মৃতদেহ আসিয়া পড়িয়াছিল। মন্তক ব্যতীত তিমি দেহের অবশিষ্ট অংশ সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত ছিল। দুই-তিন দিন এই ভাবে জলের মধ্যে পড়িয়া থাকায় উহার পুচ্ছের অধিকাংশ অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিমিটি মুখ বাদান করিয়া পৃষ্ঠোপরি শয়ান থাকায় উহার বৃহৎ মুখগহ্বরদের আয়তনাদির কতক পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মুখগহ্বর এরূপ বৃহৎ ছিল যে, তাহার মধ্যে ছয় জন মানুষ অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিত। কিছুকাল পূর্বে সিদ্ধেশ্বরের উপকূলে আর একটি তিমির মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছিল। উহার মন্তক প্রায় ১৭ ফুট ৮ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ ছিল। তিমিটির মন্তকের অস্থিখানি করাচী শহরের বাত্মঘরে রক্ষিত আছে।

নীল তিমি নাম হইলেও ইহাদের বর্ণ আদৌ নীল নহে। সাধারণ তিমিদের মত ইহাদের পৃষ্ঠের বর্ণ কালো এবং উদরের বর্ণ স্বেত। বিশেষত্বের মধ্যে ইহাদের চোয়ালের নিম্নভাগ হইতে উদরের মাঝামাঝি কতকগুলি

ঘোর লাল বর্ণের 'ডোর' অঙ্কিত থাকিতে দেখা যায়। গ্রীনলাণ্ডের তিমির মত ক্ষুদ্র লম্বুকা দি ভক্ষণ না করিয়া নীল তিমির হেরিং, মাকেরেল প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে।



করাত মাছ—তিমির শত্রু

উত্তর-সমুদ্রে আর এক জাতীয় স্বেত বর্ণের ক্ষুদ্র তিমি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আর একটি নাম 'বেলুগা'। ইহারা বারো হইতে বোল ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। গ্রীনলাণ্ডের চারি ধারে, সেট-লরেন্স উপসাগর ও সেট-লরেন্স নদীতে ইহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়।

তিমির একপ্রকার প্রাণী হইলেও তিন-চারি ফুট দীর্ঘ শুণ্ডকও তিমির গোষ্ঠীভূত জীব। নীল তিমি ব্যতীত অপর তিমিদের মন্তক উহাদের দেহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। তৈলতিমির মন্তক অনেক সময় উহাদের দেহের প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া থাকে। এইরূপ প্রকাণ্ড মন্তকে মন্তকের আকারও খুব বৃহৎ হইয়া থাকে। ইহাদের মস্তিষ্ক দেখিতে গোলাকার ও তাহার উপর অনেক খাঁজকাটা থাকিতে দেখা যায়। এইরূপ প্রকাণ্ড মন্তকে মুখগহ্বরটিও অত্যন্ত বিশাল। মুখগহ্বর এরূপ বৃহৎ হইলেও তৈলতিমি ব্যতীত অপর তিমির গলনশীল অত্যন্ত সক্ষীর্ণ। বৃহৎ গ্রীনলাণ্ড-তিমির গলনশীল এরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহার মধ্যে ছেলেশের বাহুও প্রবেশ করান যায় না। এই কারণে ইহারা সমুদ্রের ক্ষুদ্র গঁড়ী জগলী, শামুক, 'কটল ফিশ', 'স্কেট মাছ', ক্ষুদ্র চিংড়ী এবং পোকামাকড় ব্যতীত আর কিছুই ভক্ষণ করিতে পারে না।

তিমির মুখগহ্বর ঘেরিয়া বৃহৎ ইহার জিহ্বাও সেইরূপ প্রকাণ্ড। এই জিহ্বা সাধারণতঃ আঠার ফুট দীর্ঘ ও লম্বা ফুট প্রশস্ত হইয়া থাকে। ইহাদের জিহ্বা নিম্ন-চোয়ালের

সক্ষিত এক্সপ ভাবে সংযুক্ত থাকে যে, তিমিরা ইহাকে প্রায় সঞ্চালন করিতে পারে না। ইহাকে জিহ্বা না বলিয়া একটি প্রকাণ্ড পুরু চর্কির গদি বলিলেও অতুক্তি হয় না। এই জিহ্বা হইতে বহু পরিমাণ চর্কি পাওয়া



শেত ভরুক—তিমির শত্রু

যায়। ইহাদের মুখের মধ্যে লালানিঃসারক গ্রন্থি নাই বলিলেই হয়।

তিমিদের চক্ষু উহাদের দেহের অস্থপাতে এক্সপ ক্ষুদ্র যে, তাহা লক্ষ্য করাই যায় না। ইহাদের চক্ষু বৃষচক্ষু অপেক্ষা বৃহৎ নহে। ৭৬ ফুট দীর্ঘ এবং ৩৮ ফুট উচ্চ তিমির মস্তকে এই প্রকার চক্ষু থাকিলে তাহা সহজে দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবপর নহে। মৃত্যুর পর এই চক্ষু শুকাইয়া মটরের আকার ধারণ করে। চতুষ্পদদিগের মত তিমির চক্ষুতে ‘পাতা’ থাকে এবং সেই পাতা হইতে অক্ষিপক্ষ বাহির হয়। ইহাদের চক্ষু দুইটি মস্তকের পিছনে এমন স্থানে উন্মগত হয় যে, সমুদ্র পৃষ্ঠাৎ এবং উর্দ্ধ দিকের দর্শনে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। ইহাদের দৃষ্টিশক্তিও নিতান্ত মন্দ নহে।

ইহাদের শ্রবণশক্তি বিশেষ তীক্ষ্ণ। বহুদূরের সামান্ত শব্দও ইহারা আশ্চর্যরূপে অনুভব করিতে পারে। মস্তকের উপর ইহাদের কর্ণের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। বাহিরের চক্ষাবরণ তুলিয়া ফেলিলে চক্ষের পিছনে কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দাগের নিম্নেই ইহাদের শ্রবণরন্ধ্র বর্তমান থাকে। শ্রবণ শ্রবণশক্তির নিমিত্ত ইহাদের নিকট আগ্রসর হওয়া সকল সময় সম্ভবপর

হয় না। ইহারা যখন সমুদ্রের উপর লাফাইয়া জৌড়া করে বা নাসারন্ধ্র দিয়া বেগে মুখমধ্যস্থ জলকে উৎসাকারে বাহির করিয়া দেয় শিকারীরা তখনই সন্তর্পণে ইহাদের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইহাদের নাসারন্ধ্র মস্তকের পুরোভাগে অবস্থিত। অধিকাংশ তিমির মস্তকের উপরে একটি মাত্র নাসারন্ধ্র থাকিতে দেখা যায়। এই রন্ধ্রটি ভিতরে দুই ভাগে বিভক্ত। গ্রীনলাণ্ড-তিমির মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটি নাসারন্ধ্র আছে। ইহাদের নাসিকার রন্ধ্রগুলির আকার গোলাকার নহে। বেহালার খোলের উপরকার গর্তটির আকার বেরূপ বক্রভাবে ইহাদের নাসারন্ধ্রের আকৃতিও কতকটা সেইরূপ। খাসপ্রখাস বাতীত এই রন্ধ্রদ্বারা ইহারা মুখমধ্যস্থ জলকে বেগে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বাহির করিয়া দেয়। জলে নিমজ্জিত হইবার সময় ইহারা নাসারন্ধ্রকে একটি মাংসপেশী দ্বারা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

তিমিরা সাধারণতঃ দুই-তিন মিনিট অন্তর খাস-গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ক্ষণে ক্ষণে জলের উপর



তলোয়ার মাছ—তিমির শত্রু

ভাসিয়া উঠে। ভীত বা তাড়িত হইলে অল্প ঘণ্টা কাল অবধি ইহারা সিদ্ধগর্ভে ভুবিয়া থাকিতে পারে। প্রখাস-ত্যাগকালে কুসুমের উষ্ণ বায়ুরাশিকেও ইহারা ছয় হইতে আট ফুট উর্দ্ধে বাশ্যাকারে ফোয়ারার মত বাহির করিয়া দেয়। নাসাপথে ইহাদের ক্ষলোৎক্ষেপণের শব্দ দুই-তিন মাইল দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। আহত তিমির ঘন ঘন খাস-প্রখাসের শব্দও ঝড়ের মত বহুদূর হইতে প্রতিগোচর হইয়া থাকে।

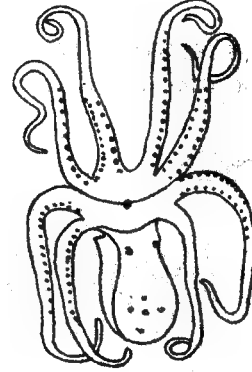
ইহাদের তিনটির অধিক ‘পাখনা’ থাকে না। এই পাখনা যে বাস্তবিকপক্ষে ইহাদের হস্ত তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। দেহের দুই পার্শ্বে দুইটি এবং

পৃষ্ঠের উপর মাত্র একটি করিয়া ইহাদের পাখনা থাকে। পাখের পাখনা দুইটি প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই পাখনার সাহায্যেই ইহার ইচ্ছামত বামে বা দক্ষিণে ঘিরিয়া থাকে। কোন কোন তিমির পৃষ্ঠের উপরকার পাখনাটি থাকে না। তৈলতিমির পাখের পাখনা ত্রিকোণাকার। দেহের তুলনায় ইহাদের পাখনা দুইটি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ইহাদের চর্ম অত্যন্ত মৃদু। পৃষ্ঠের উপরিভাগের চর্মের বর্ণ কৃষ্ণ এবং উদরের চর্মের বর্ণ স্বেত হইয়া থাকে। চর্মের উপর আবার কখন কখন স্বেত ও হরিত্রা বর্ণের বহু দাগ থাকিতে দেখা যায়। পুচ্ছ ও পাখনার উপরেই এই বর্ণচিহ্ন বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই চিহ্নের মধ্যে কখন কখন ঘরবাড়ি ও গাছপাশার মত অঙ্কিত থাকিতে দেখা যায়। একবার এক জন প্রাণিতত্ত্ববিৎ একটি তিমির পুচ্ছের উপর ইংরেজী সংখ্যায় ১২২-এর মত চিত্রাঙ্কন থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

তিমিদের দেহের উপরকার চর্ম তুলট কাগজের মত পুরু। এই চর্মের নিম্নে এক ইঞ্চি পুরু আর একটি চর্ম; এই শেষোক্ত চর্মটিই ইহাদের প্রকৃত চর্ম। এই পুরু চর্মের নিম্নেই ইহাদের দেহে দশ-পনের ইঞ্চি স্থল বসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বসা তুষারাবৃত উত্তর-মেরু-সমূহে ইহাদের দেহতাপ রক্ষা করে। এই বসার স্তর তুলিয়া ফেলিলেই ইহাদের মাংস ও মাংসপেশীসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মাংসপেশীগুলি দেখিতে অবিকল চতুঃপদদিগের মত। তিমির স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে ইহাদের বসার বেশ সুন্দর হরিত্রা বর্ণের দেখািয়া থাকে। তৈলতিমির মস্তকে ও গ্রীনলাণ্ড-তিমির দেহে অত্যধিক পরিমাণে বসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বসার নিমিত্তই কেবল মাত্র এই দুই জাতীয় তিমিকে অত্যধিক পরিমাণে শিকার করা হয়। ৬০ ফুট লম্বা একটি তিমির দেহ হইতে অধিক ৮০০ মণ বসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি সুবৃহৎ গ্রীনলাণ্ড-তিমি হইতে প্রায় ৩৭৮০ মণ হইতে ৪৫২০ মণ অবধি তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৈলতিমির সুবৃহৎ মস্তকটি বসার পরিপূর্ণ থাকে। এক-একটি তৈলতিমির মস্তক হইতে প্রায় ৫০০ গ্যালন বসা

বাহির করা হয়। ইহাদের মস্তকের কসাকে ইংরেজীতে ‘স্পার্মাশেট’ (Spermaceti) বলে। বর্তিকা ও গন্ধদ্রব্যাদি নির্মাণের জন্যই তৈলতিমির মস্তকের বসা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ভাবে বসার পরিপূর্ণ না থাকিলে এই



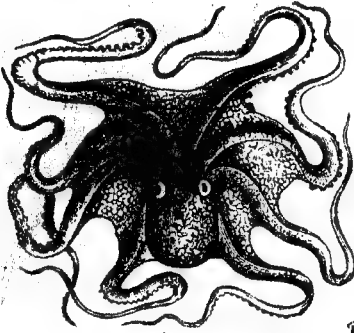
কটল কিল
তিমির খাম্বা

বৃহৎ মস্তক লইয়া চলাফেরা করা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। বসার পরিপূর্ণ থাকার ইহাদের মস্তকটি লঘু হইয়া ভাসিবার উপযোগী হইয়াছে।

তৈলতিমির দেহ হইতে স্যাঁদারগ্রিস (ambergris) নামক একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। ইহাদের অন্তঃস্থ পিত্ত পাথরীর মত এই পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা একটি তিন-চারি ফুট লম্বা থলির ভিতর তৈলাপেক্ষ এক প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে বলের মত জড়িত থাকে। এই বলের বর্ণ হরিত্রাভ এবং এক-একটি বল ওজনে আর্দ্র সের হইতে দশ সের অবধি হইয়া থাকে। থলির মধ্যে চারিটির অধিক ‘স্যাঁদারগ্রিসের’ বল থাকিতে দেখা যায় না। এক শ্রেণীর জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, স্যাঁদারগ্রিস পীড়িত তৈলতিমির বক্রতল পদার্থবিশেষ। সকল তিমির উদরে স্যাঁদারগ্রিস থাকে না। সর্কাপেক্ষা বলবান ও বয়স্ক তিমিদের উদরেই ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই পদার্থকে তিমিরা মধ্যে মধ্যে দেহ হইতে বিষ্ঠার মত বাহির করিয়া থাকে। ইহার গন্ধ ঈষৎ মিষ্ট ও ‘মেটে’ ভাবের। স্যাঁদারগ্রিস

মহাসাগরে, ব্রজিল ও আফ্রিকার উপকূলে, ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের সন্নিকটে ভারত-মহাসাগরের দীপপুঞ্জের তটদেশে এবং চীন ও জাপানের উপকূলে এই পদার্থকে ভাসিতে দেখা যায়। নানাবিধ গন্ধদ্রব্য নির্মাণে ইহার বিশেষ ব্যবহার হইয়া থাকে।

তিমির পুচ্ছ ইহাদের আকর্ষণকার প্রধান অঙ্গ ও সত্তরণের প্রধান অবলম্বন। ইহাদের পুচ্ছের আকার

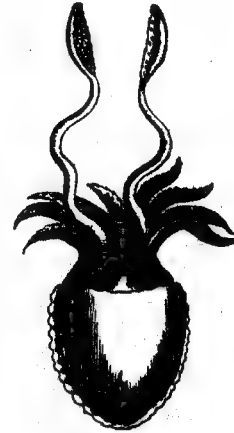


কটল ফিশ
তিমির খাদ্য

অনেকটা চিংড়ি মাছের লেজের মত। মৎস্তের পুচ্ছ সাধারণতঃ খেঁভাবে থাকে তিমির পুচ্ছ ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে উদগত হইয়া থাকে। জলের উপর ইহাদের লেজ সমান ভাবে পড়িয়া থাকে। মৎস্তেরা যেমন লেজকে বাঁধে ও দক্ষিণে সঞ্চালন করিয়া সত্তরণ দেয় তিমিরা তাহার বিপরীত পদ্ধতিতে পুচ্ছকে উর্দ্ধ ও অধঃ ভাবে চালনা করিয়া অগ্বেসর হয়। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহারা পুচ্ছের আঘাতে তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করে। ইহাদের পুচ্ছের আঘাত এরূপ ভীষণ যে, ইহার এক আঘাতেই বৃহৎ বৃহৎ হাল্কর, করাত মাছ, তলোয়ার মাছ প্রভৃতির প্রাণবিয়োগ ঘটিয়া থাকে। এই সকল প্রাণী তিমিকে আক্রমণ করিলে ইহারা পুচ্ছের দ্বারা এরূপ ভাবে আঘাত করিতে থাকে যে, সমুদ্রের উপর দে-আঘাতের শব্দ হই-তিন ঘাইল ঘুরেও মজলিধোঁষ বা কামানের শব্দের মত প্রতীকমান হইয়া থাকে। ইহাদের পুচ্ছ প্রসারে প্রায় ২৫ ফুট অবধি হইয়া থাকে। এই শেজের দ্বারা ইহারা শিকারীদের নৌকা

প্রভৃতিও জলমগ্ন করিয়া দেয় এবং ইহার সাহায্যে তিমিরা জলের মধ্য হইতে অন্যায়সে উর্দ্ধে লাফাইয়া থাকে।

তিমি-জাতি, বিশেষতঃ তৈলতিমিরা, সর্কদা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদের এক-একটি দলে বিশ হইতে পঞ্চাশটি তিমিকে থাকিতে দেখা যায়। স্ত্রী-তিমি এবং তাহাদের শাবকদ্বারাই এই ক্ষুদ্র দল পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। এক-একটি দলে একটিমাত্র পুরুষ-তিমি দলের রক্ষকস্বরূপ অবস্থান করে। এই তিমিটির আকার সর্দাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া থাকে। ভয় বা তাড়না পাইয়া পলায়ন করিবার কালে পুরুষ-তিমিটি দলের একেবারে পশ্চাৎগে চলিয়া যায় এবং পিছনে থাকিয়া সমস্ত দলটি চালনা করিয়া পলায়ন করে। দলের মধ্যে একটি তিমি আহত হইলে দলের অন্ত তিমিরা ভয়ে পলায়ন না করিয়া আহত তিমির চারি দিকে ঘুরিতে থাকে এবং এইরূপে বহু তিমি এককালে সহজেই নিহত হয়। গ্রীনলাণ্ড-তিমিদের



কটল ফিশ
তিমির খাদ্য

মধ্যে কিন্তু এইরূপ দল বাঁধিয়া সত্তরণ করার রীতি লক্ষিত হয় না। ইহাদের মধ্যে মাত্র স্ত্রী ও পুরুষ তিমিকে একত্র হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

আকারে বড় হইলেও তিমিরা, বিশেষতঃ গ্রীনলাণ্ড-তিমিরা, অত্যন্ত ভীক। সমুদ্রে 'উল্ফিন' নামে

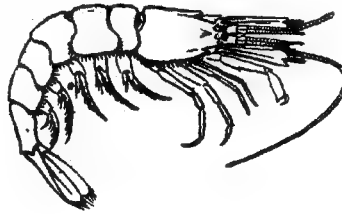
তিমি-জাতীয় এক প্রকার জীব আছে। ইহার মাত্র ১০ ফুট অবধি দীর্ঘ হয়। গ্রীনল্যান্ডের তিমির। ইহাদের দিকটে দেখিতে পাইলেই একেবারে ভয়ে সমস্ত হয়। পলায়ন করে। ১০ ফুট দীর্ঘ ডলফিনকে দেখিয়া ৩০।৭০ বা ৮০ ফুট দীর্ঘ তিমির পলায়ন

অবশ্যই হস্তাকর। স্বদেশের বৃহত্তম জাতি
হস্তীরা নির্ভয়ে ব্যাঘ্রাদির দমুখীন
হইলেও সামান্ত মুখিক ও শশককে
বিশেষ ভয় করে এবং ইহাদের দর্শনে
একেবারে অধীর হইয়া পড়ে। এ-বিষয়ে
হস্তী-চরিত্রের সহিত তিমি-প্রকৃতির
কতক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়।
বিপদের কোনও আশঙ্কা না থাকিলে
তিমিরা সমুদ্রের উপর অনেক সময়
স্থির ভাবে ভাসিয়া থাকে বা জল
দান করিয়া এবং নাসারন্ধ্র দ্বারা
উৎসাকারে উর্দ্ধে জ্বলাৎসকপণ করিয়া

ক্রীড়াশীলতার পরিচয় দিই থাকে। কখন কখন আবার বুককে ঘিরিয়া ছেলোদের লাফালাফি করার মত ভিমিকে ঘিরিয়া সীলদের সমুদ্রে লাফালাফি করিতে দেখা যায়।

ইহাদের গতি সাধারণ অবস্থায় ঘণ্টার চারি মাইলের অধিক নহে। কিন্তু শিকারীর বলমে বিদ্ধ হইলে ইহারা এক্রূপ বিজ্ঞ-বেগে সমুদ্রগর্ভে নামিতে থাকে যে, সে-সময়ে নৌকার গায়ে বল্লমের দড়ির ঘর্ষণ লাগিয়া নৌকার কাঠে আগুন লাগিয়া যায়। এই কারণে বল্লম বিদ্ধ করিয়াই শিকারীরা বল্লমের দড়ির উপর জল চালিতে থাকে। বর্তমানকালে নতন পদ্ধতিতে তিমি শিকার করা হয়। তিমিরা যখন সমুদ্রের উপর ছিরভাবে ভাসিয়া থাকে তখন কামানের মুখ হইতে তিমি-শিকারের বর্ষাসকল বাক্সের সাহায্যে নিক্ষেপ করিয়া ইহাদিগকে নিহত করা হয়।

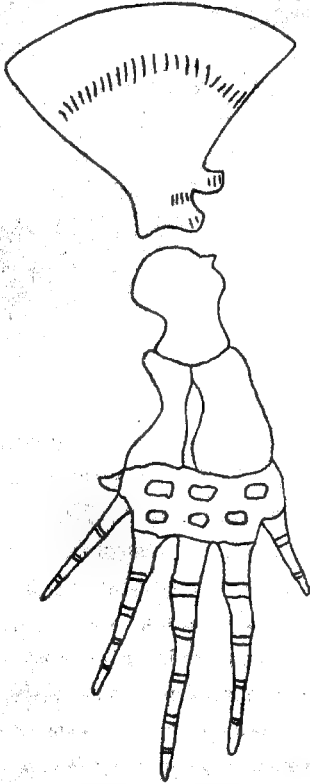
তিমিরের আচরণে দাম্পত্য প্রেমের কিঞ্চিৎ আভাস
পাওয়া যায়। তিনি-দাম্পত্যের মধ্যে একটিকে আহত
করিলে অপরটি আহত তিমির সৰ্ব ত্যাগ করিয়া পলায়ন
করে না। তাহার সহিত শেখ পর্য্যন্ত বৃষ্টির ফিরিয়া প্রণয়া-
সক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। পুঙ্খ-তিমির। নিজ নিজ



প্রসবের কিকিং পূর্বে, ইহারিগকে অন্ত সময় অপেক্ষা হুলতর দেখা যায়। গর্ভের মধ্যে জ্রণের বর্ণ প্রথমে সাদা থাকে। প্রসবকালে শাবকের বর্ণ কিছু কাল দেখাইয়া থাকে। জরায়ুর মধ্যে জ্রণকে প্রথমে মাত্র ১৭ ইঞ্চি দীর্ঘ দেখা যায়। এই জ্রণ জরায়ুর মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া প্রসব-কালে ১০ ফুট দীর্ঘ আকার ধারণ করে। স্ত্রী-তিমি সাধারণতঃ এককালে একটির অধিক শাবক প্রসব করে না। এই শাবকের পালন ও সংরক্ষণে স্ত্রী-তিমি অপত্য-স্নেহের বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকে। শাবক আহত হইলে স্ত্রী-তিমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে না। ইহার সর্বদা শাবককে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করে। শিকারীর দ্বারা তাড়িত হইলে পালনায় মধ্যে শাবককে ধরিয়া পলায়ন করে। শাবক সঙ্গে থাকিলে অন্ত সময় অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র ইহার সমুদ্রের উপর খাস গ্রহণের কল উঠিয়া আসে।

ইহাদের দুইটিমাত্র ত্বন থাকে এবং ত্বনের আকার গম্বাশি পদ্যর মতই হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ত্বন দুইটি উদরের মধ্যে গুটান থাকে। গুস্তানকালে এই ত্বনকে ইহার। বেগে ফুট হইতে দুই ফুট অবধি বাহির করিয়া

থাকে। সমুদ্রের উপর কাৎ ভাবে অবস্থান করিয়া ইহারা শাবককে গুলপান করাইয়া থাকে। অনেকে ছুঁড়ের পরিমাণও বড় কম থাকে না। গবাদির ছুঁড়ের সহিত এই ছুঁড়ের অনেক সাদৃশ্য আছে। তিমিশাবক প্রায় এক



তিমির হত্যা

বরহত্যার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

বৎসর কাল তন্ম্যাপান করিয়া থাকে। এই সময় সাধারণ চকুশব্দবিশেষের শাবকের মত ইহারা বেশ হটপুট হয় এবং ইহাদের দেহে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্নেহ সঞ্চিত হইয়া থাকে। এক-একটি শাবকের দেহ হইতে এই সময়ে প্রায় পঞ্চাশ ঘ্যারেল বা পাণ্ডুর বাহিতে পারে। জাত্যবিক তত্ত্বদান করার কালে গ্রী-তিমি কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম হইয়া পড়ে।

তনত্যাগের পর তিমি-শাবকের দেহ আর সেরূপ শীঘ্র বর্জিত হয় না।

জীব-জন্তুর শরীরের উকুনদের মত তিমিদের দেহে এক প্রকার পরভোজী কীট থাকিতে দেখা যায়। ইহারা তিমির পৃষ্ঠদেশ ও পাখনার নিম্নে সংলগ্ন হইয়া রস রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। এই সকল রসশোষক কীট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেও তিমিরা ইহাদিগকে কোনও মতে বিদূরিত করিতে পারে না। এক জাতীয় সামুদ্রিক পক্ষী এই সকল কীটকে উন্নয়ন করিয়া তিমির প্রভূত কল্যাণ সাধন করে।

জাহাজের খোলে যেমন শামুক ও গঁড়ী লাগিয়া থাকে তিমিদের দেহেও সেইরূপ এই উকুন ব্যতীত এক জাতীয় পুষ্কভুজকে সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। ইহারা এরূপ ভাবে তিমিদের শরীরে লাগিয়া থাকে যে, তিমির নীলাভ বা কৃষ্ণ নীল চর্ম একেবারে ইহাদের খেত বর্ণে আবৃত হইয়া পড়ে। অনেক সময় তিমিদের চোয়ালে বিস্তারিত সামুদ্রিক তৃণাদি সংলগ্ন থাকে। এইরূপ তৃণসংলগ্ন তিমিকে অনেক সময় এক অদ্ভুত আশ্রয় জীব বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ বিশাল আকার এবং এরূপ শক্তিশালী জীব হইলেও তিমিদের শত্রুসংখ্যা বড় কম নহে। সমুদ্রের তলোয়ার মাছ (Sword fish) ইহাদের সর্বপ্রধান শত্রু। তলোয়ার মাছের প্রায় ১০ ফুট হইতে ১৫ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদের মুখের উপর চোয়ালটি তলোয়ারের মত লম্বাকারে বর্জিত হয় বলিয়াই ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের মুখের তলোয়ারটি প্রায় চার-পাঁচ ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং ইহার অগ্রভাগ অত্যন্ত ধারাল। এই তলোয়ারের দ্বারা ইহারা তিমিকে আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যত করিয়া থাকে। অনেক সময় ইহাদের সম্মিলিত আক্রমণের ফলে তিমির জীবননাশ ঘটিয়া থাকে।

গ্রীনলাণ্ডের তিমিকে উত্তর-আটলান্টিক-সমুদ্রের এক জাতীয় হাল্কর আক্রমণ করিয়া সংহার করে। এই হাল্করের নাম গ্রীনলাণ্ড শার্ক। ইহারা জীবন্ত তিমির দেহ হইতে মাংসখণ্ড ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে এবং তাহার ফলে শেষে তিমির প্রাণবিরোধ ঘটিয়া থাকে।

তলোয়ার মাছের মত সমুদ্রের করাত মাছেরাও তিমির

বিশেষ শত্রু। ইহাদিগকে মাছ না বলিয়া হাঙ্গর বলা উচিত। দৈর্ঘ্যে ইহারা প্রায় ১৫ ফুট অবধি হইয়া থাকে। তলোয়ার মাছের মত ইহাদের উপর চোরাশিট অত্যধিক বর্জিত হইয়া করাচের আকার ধারণ করে। কলিকাতার বাত্মঘরে করাচ মাছ রক্ষিত হইয়াছে। তিমিকে দেখিতে পাইলেই উহার দেখে ইহারা করাচ বিদ্ধ করিয়া দেয়। ইহারা এমন বেগে তিমির অঙ্গে করাচ বিদ্ধ করে যে, অনেক সময়েই উহাকে আর বাহির করিতে পারে না এবং করাচ তিমির শরীরের মধ্যে ভাঙিয়া রহিয়া যায়।

তিমির আর একটি প্রবল শত্রু গ্র্যাম্পাস্ (grampus)। ইহারা তিমি-জাতির অন্তর্ভুক্ত জীব। দৈর্ঘ্যে গ্র্যাম্পাসের প্রায় বিশ-একুশ ফুট হইয়া থাকে। ইহারা হাঙ্গরের মতই হিংস্র। বৃহদাকার তিমিকে দেখিতে পাইলে ইহারা বৃকের মত দলবদ্ধ হইয়া উহাকে আক্রমণ করে। বারংবার আক্রমণের ফলে শেষে তিমির প্রাণবিরোধ ঘটিলে উহার মেরুমাংসে ইহারা উদরপূর্তি করিয়া থাকে। তলোয়ার মাছ, করাচ মাছ এবং গ্র্যাম্পাসদের ভয়ে তিমিদের সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়।

মেরুপ্রদেশের খেত ভল্লুককেও তিমির শত্রুমধ্যে গণনা করা বাইতে পারে। সীল ও ওরালরাসের মাংস যেমন ইহাদের প্রিয় আহার, তিমির বসা ও মাংসও তেমনই ইহাদের বিশেষ প্রাভোভনব সামগ্রী। সমুদ্রের তীরে তিমি আসিয়া পড়িলে বা সমুদ্রের জল জমিয়া বরফের মধ্যে তিমি ধরা পড়িলে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে।

উত্তরমেরু প্রদেশের ও উত্তর-ইউরোপের শিকারীরা তিমির সর্বপ্রধান শত্রু। তিমির বসা ও মাংস গ্রীনল্যাণ্ড-বাসী এন্ড্রোমিদের প্রধান খাদ্য। ল্যাপল্যাণ্ডবাসীরাও জীবন-

ধারণের জন্ত তিমির মেরু ও মাংসের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। ইহাদের অবিরাম হননের ফলে তিমির সংখ্যা বিশেষ ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্বে সমুদ্রের যে-সকল অংশে বহু তিমি দৃষ্ট হইত, এক্ষণে সে-সকল স্থানে ইহারা একবারেই বিরল। সপ্তদশ শতাব্দীতে দিনেমারেরা অসংখ্য তিমি বধ করিয়াছিল। তিমি শিকারের জন্ত তাহাদের ২৬৬ খানি কাহাজ ও চৌদ্দ হাজার শিকারী নাবিক এক সময় নিযুক্ত ছিল। তাহার পরে অন্ত্যাত্ত জাতিরাও বদার লোভে ইহাদের শিকারে প্রবৃত্ত হয়।

সুইডেনের একবারে দক্ষিণে বণ্টিক সমুদ্রের উপর ইটোড্ নামে একটি বন্দর আছে। কিছুকাল পূর্বে এই বন্দরের নিকট একটি বাট ফুট দীর্ঘ তিমির প্রস্তরীভূত দেহ মুক্তিকামধ্য হইতে বাহির করা হইয়াছিল। উহার দেহ আধুনিক যুগের ঐ আকারের তিমি-দেহের প্রায় সাতাশ গুণ বৃহৎ এবং ভারী।

তিমির সহিত স্থলের বৃহত্তম জীব হস্তীর কতকটা চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে। উভয় প্রাণীই বেশ শান্ত ও নিরীহ, কিন্তু ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হইলে উভয়েরই প্রকৃতি অতীব ভীষণ হইয়া উঠে। একটি তৈলতামি একবার অক্রান্ত হওয়ায় নয়খানি নৌকা দংশন করিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। অক্রান্ত তিমির পুচ্ছাবাত্তের দৃশ্য দেখিলে পরম নির্ভীকেরও হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। আবার সাধারণ অবস্থায় এই উভয় জীবই অনেকটা ভীক-প্রকৃতির। হস্তী ও তিমি উভয়ের দেহ হইতেই মূল্যবান সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত হস্তীর মূল্য লক্ষ টাকা হইলে একটি তিমির মূল্য সে-হিসাবে কোটি টাকা ধাৰ্য করা বাইতে পারে।

মনের গহনে

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

এ-পাশে শিবের মণ্ডপ। মাঝখানে একটি ডোবা। ও-পাশে নদাই ঘোষের ছোট্ট কুঁড়ে ঘর।

শিবের মণ্ডপ অরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছাদের খানিকটা অংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। খামুশলা সৰু হইয়া আসিয়াছে, গাজনের চাক বাজিলে বুড়া মানুষের দাঁতের মত হুল্‌হুল্‌ করিয়া নড়ে। তথাপি বে ভাঙিয়া পড়ে না, সে নিশ্চয় বাবা ধর্মরাজের মহিমা। প্রতি বৎসর গাজনের সময় মণ্ডপের শ্রাতবরোরা মণ্ডপ সংস্কারের জন্য টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করে। গাজল কাটিয়া যায়, কিন্তু টাকা ওঠে না। আবার বে কে সেই। এমনি করিয়া বছরের পর বছর কাটে। মণ্ডপের অবস্থা জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হয়। মণ্ডপের ‘দেয়াসীন’ চাকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মাথা কোটে। বাবা ধর্মরাজ অবশেষে তাহার স্বর্গে ভঙ্গ করেন। ‘দেয়াসীন’ মণ্ডপের বিতীর্ণ প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দেয়। ভজেরা ঘন ঘন ‘বলো শিবো ধর্মরাজ’ বলিয়া চীৎকার করে, কেহবা দেয়াসীনকে বাতাস করে, কেহবা বেতের ছড়িটা বিয়া ভিড় সরায়।

—বাবা, কি অপরাধ হয়েছে বলুন?

দেয়াসীন পাশের গ্রামের চাঁড়ালদের একটি আধা-বয়সী মেয়ে। পরণে রক্তাশ্বর। গলায় এবং হাতে অনেকগুলি রক্তাক্তের মালা। মাথায় জটা। কথা कहিলেই ডুক্‌ ডুক্‌ করিয়া মনের গন্ধ বাহির হয়। বাবা সযোজন করা হইল তাহাকে নয়, তাহার মাথায় বে দেবতা ভঙ্গ করিয়াছেন তাহাকে।

বাবা দেয়াসীনের মুখ দিয়া বলিলেন—আমার ঘরের কি করুণি? কতদিন থেকেই তো বলছি। কি করুণি? কি করুণি? জল হবে ডেকেছিল? হবে না ত। তোদের খান হবে বলে কি আমি ভিজব নাকি? হবে না তো? আমার ঘরের কি করুণি বল?

বাবা বহুদিন হইতে এমনি থায়া শাসাইয়া আসিতেছেন।

গ্রামের বোলে আনার বাবার উপর শ্রদ্ধাও অটুট। কিন্তু তথাপি মণ্ডপের সংস্কার আর এই কয়েক বৎসরে কিছুতে হইয়া উঠিতেছে না। তবু এ-পর্যন্ত এই অপরাধে বাবার রক্তরোষ কাহারও উপর নামে নাই। গ্রামের লোকে বাবার মন্দিরের ধূলা জিহবার অগ্রভাগ হইতে ললাট পর্যন্ত ভক্তিবরে স্পর্শ করে। বলে,—বাবা আমাদের সদাশিব। নইলে এত অপরাধের বোকা নিয়ে কোন দিন ভরাডুবি হয়ে যেত। ছেলেপুলে নিয়ে...

না, বাবার সদাশিবের সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিদ্মুদ্র কারণ নাই। এতগুলি সন্তানের সম্বৎসরের সমস্ত অপরাধের বিষ তিনি নিজের কণ্ঠে তুলিয়া লইয়া গাজনের কয়টা দিন বিনা আপত্তিতে রৌদ্রে পোড়েন এবং বৃষ্টিতে ভেজেন। তাঁহার পক্ষে মৃত্যুর কথা এই যে, বেশী দিন এই ভাড়া মণ্ডপে তাঁহাকে বাস করিতে হয় না। বারো মাসই পুরোহিতগৃহে থাকেন।

মণ্ডপের অবস্থা এইরূপ।

ডোবার অবস্থাও তাহার চেয়ে ভাল নয়। এ-পাড়ার এইটাই খিড়কী বলিলে খিড়কী, সদর বলিলে সদর। বাসনমাজা, হাত-পা ধোওয়া এই জলেই হয়। মুখে দিবার উপায় থাকিলে মুখ ধোওয়াও চলিত। কিন্তু সে উপায় নাই। শুধু এই ঘাটের দিকটা ছাড়া বাকী সাড়ে তিন দিকে চতুর্দেয় বাঁশের ঝাড় এমন অন্ধকার করিয়া আছে যে, জলে সূর্যালোক পড়িবার কোন প্রকার আশঙ্কা নাই।

একলা শুনিয়া শহরের লোকে নাসিকা কুণ্ডিত করিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সমস্ত ব্যাপার ও তাঁহার জ্ঞানেন না। পাড়াগাঁয়ে বাঁশ নিভাপ্রয়োজনীয় বস্তু। ঘর ছাওয়া, খুঁটি ভৈরি করা আছে। বাঁশের পাতা জলে পড়িয়া জল মট করে এ-তথ্য তাহারের নিজেদেরও অবদিত নয়। কিন্তু উপায় কি? প্রতিবেশীরা কেহই

ভাল লোক নয়। চোখের সুখ হইতেই বাশ চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছে; দূরে চোখের আড়াল হইলে কি আর ঝড়ের চিহ্ন রাখিত ?

তবু তাহাই নয়। এই অতি তুচ্ছ ডোবাটিই এ-পাড়ার একটি মূল্যবান সম্পত্তি। সন্ধ্যাসরের শাক ইহাতেই উৎপন্ন হয়। তাহা তুচ্ছ করিবার বিষয় নয়। ঘাটের উপর সমুখ দিকে হাত দুই মাত্র স্থান ছাড়া বাকী সমস্তই শাক, শাক, শাক—জল নজরে পড়ে না। এক-এক পরিবার এক-একটি মাত্র কঞ্চির সাহায্যে অদ্ভুত কৌশলে নিজের নিজের শাক আটকাইয়া রাখিয়াছে। এম্বিকের শাক ওদিকে বাইবার উপায় নাই। তাও কি আর যায় না! কিন্তু সে কটিং! তখন এই শাক লইয়াই একটা কোঁদারী বাধিয়া যায়।

কিন্তু শুধুই কি শাক! আপনি নয়টা-দশটার সময় যদি এদিকে আসেন, দেখিবেন,—অবশ্য একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে,—দেখিবেন, একটি বৃদ্ধ সেই বাঁশবনের নীচে অন্ধকারে অন্ধকারে বকর মত স্তম্ভ:ণ পা ফেলিয়া মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বাঁহাতে একটা ভাঙা এনামেলের বাটিতে কতকগুলি কৈচো এবং একটা সরু তালপাতায় পাঁখা কতকগুলি স্রাটা, মাঙুর ইত্যাদি মাছ। তিন-চারিট মাত্র। এই করটি সংগ্রহ করিতেই তাহাকে ষার-হই ডোবার ধারে ধারে পরিক্রমণ করিতে হইয়াছে।

এই লোকটিই নদাই ঘোষ!

বয়স পঞ্চাশের বেশী হইবে না। কিন্তু দেখিলে মনে হয় ঘাটের কাছাকাছি। মাথার চুলগুলি সব পাকিয়া গিয়াছে। মুখে ঝোঁতা ঝোঁতা দাড়ি। শীর্ণ, দীর্ঘ ষেহ,—কোমর বাঁকিয়া গিয়াছে। চোখ কোটির-প্রবীর্ণ, চর্মে লোল এবং ককল। বাঁ-পাখানা অস্বাভাবিক রকম লক্ষ। সেজন্ত ঝোঁড়াইয়া ঝোঁড়াইয়া হাটে। মুখে দাঁত বলিতে একটুও নাই। শীর্ণ, ভাঙা গাল একেবারে যুগ্মের ভিত্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

ডোবার ওধারে তাহার বাড়ি এবং এই ডোবাটি তবু শাক নয়, তাহার সন্ধ্যাসরের বাঁহা সরবরাহ করে। অতাব কেনল অগ্নের এবং বস্ত্রের। কিন্তু সে আর কতই

বা! এক জোড়া বস্ত্রে তাহার দিয়া একটা বৎসর ঢলিয়া যায়। আর অল্প? একটা পেটে কতইবা লাগে? সপ্তাহে দুইটা দিন মুনবি খাটিলেই সে-অগ্নের সংস্থান হইত। বত দিন শরীরে সামর্থ্য ছিল তার বেশী সে কখনও খাটেও নাই। নিতান্ত নিকপার হইয়া যদি কখনও কেহ মাঠে খাটিবার জন্ত তাহাকে ডাকিতে আসিত, পেটের ব্যথার অজুহাতে প্রায়ই তাহাকে সে ঘুরাইয়া দিত। লোকটা উহারই মধ্যে একটু শয্যাবিলাসী। বেলা নয়টার আগে আর তাহার অতি-পুরাতন ছিন্ন মলিন শয্যার বাহিরে পারতপক্ষে আসে না। যখন শরীরে সামর্থ্য ছিল তখনও আসিত না, এখনও না।

অবশ্য শরীরে সামর্থ্য ছিল বলিতে একথা বুকিলে ভুল হইবে যে, এককালে তাহার শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল। যথেষ্ট সামর্থ্য তাহার কোন কালেই ছিল না। চিরদিনই অমনি চাঙা এবং লিকলিকে দেহ, কোলের কাছে কুঁজো। গত পঁচিশ বৎসর কাল বছরে ছয় মাস ম্যালেরিয়ার ভুগিলে সামর্থ্য আর থাকে কি করিয়া? তা নয়, তবে পেটের ভাতের সংস্থানের জন্ত সপ্তাহে দুই তিন দিন মাঠে খাটিতে যেটুকু সামর্থ্যের প্রয়োজন হয় সেটুকু সামর্থ্য এককাল ছিল। কিন্তু গত দশ বৎসর হইতে আর তাহাও নাই। এখন আর মাঠে খাটিতে পারে না।

সে একপক্ষে ভালই হইয়াছে। সকালবেলায় মাঠে খাটিতে বাইবার জন্ত এখন আর কেহ অকালে নিত্রান্ত করিয়া বিরক্ত করিতে আসে না। বেলা: নয়টা পর্যন্ত নির্রিমে ঘুমটা হয়। ডোবার মাছ এবং শাক ত আছেই। আর আছে ডোবার ধারে কয়েক ঝড় বাশ। তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার বৎসরের কাপড় হুখানির দাম ওঠে। আর...

এইখানেই তাহার ভাগ্যকে অসাধারণ বল্য চলে।

দৌবন নদাই ঘোষের বিবাহ হয় নাই। কতকটা কস্তাপক্ষীরদের দৌবে। পদ-না হইয়া কেহই এই স্রপাত্তের হাতে কস্তা সস্ত্রদান করিতে সম্মত হয় নাই। কতকটা তাহার নিজের অলপভায়। তাহার নিজের ভরফ হইতেও কোন আশ্রয় দেখা যায় নাই। আর কতকটা আত্মীয়-

জনের অভাবে। মা-বাপ ছেলেবেলাতেই হারাইয়াছে। বড় কিংবা ছোট একটা ভাই পর্যন্ত নাই, যে খুঁজিয়া-পাড়িয়া ভাইয়ের জন্য একটু কষ্টগ্রস্ত করিয়া আনিবে। বৌবনটা এমনি করিয়াই কখন যে কাটিয়া গেল বোঝাই গেল না। অবশেষে, চল্লিশ বৎসর বয়সের সময়, ম্যালেরিয়ার হাতে পড়িয়া শরীর বখন জীর্ণ, একমাত্র প্রীতিবিপুল উদয়প্রদেশ ছাড়া দেখাইবার মত কিছুই বখন অবশিষ্ট নাই, তখন অকস্মাৎ এক শুভলগ্নে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। ছোটবাবুর বহু কীর্ষির মধ্যে এই এক কীর্ষি। পাত্র এক পাত্রী দেখা, লগ্নপত্র সম্পাদন, আশীর্বাদ, গাত্রহরিদ্রা, শোভাবাত্রা, বিবাহ, বাসরশয়ন, পাকস্পর্শ, ফুলশয্যা,—এক কথার সংবাদপত্রে সংবাদটি প্রকাশিত হওয়া ছাড়া সমারোহ বলিতে আর যাাই-কিছু বোঝায় তাহার কোথাও ত্রুটি ছিল না। নহবৎ বলিল। ঢাক, ঢোল, সানাই, কীশি বাজিল। এমন কি ছেলেরা তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া শেষে কতকগুলো টিন আনিয়া বানাইতে লাগিল। একত্র একটু পরসাপ নদাইকে ব্যয় করিতে হয় নাই। সমস্ত ছোটবাবু নিজের পকেট হইতে দিয়াছেন। পাঁচ জনের কাছে কিছু চাষাও উঠিয়াছিল। নদাই মনে মনে খুশী হইলেও খুব লজ্জিতই বোধ করিতেছিল। এ-বয়সে আর কেন এসব?

নদাই মিথ্যা বলে নাই। সত্যই এ-বয়সে আর এ-সবের আয়োজন ছিল না, এবং শেষ পর্যন্ত সেই কথার সত্যতাই প্রমাণিত হইল। ফুলশয্যার সকালে বহুকণ্ঠে অনেক খোজাখুঁজির পর কেবল নদাইকে পাওয়া গেল,—হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় খাটের নীচে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। বধু নাই। বরে, বাহিরে, কোথাও নাই। এমন কি ছোটবাবু নিজে লোক নাহাইয়া ডোবার জলে পর্যন্ত খোজ করিলেন। সেখানেও নাই। সম্ভব কসত্ত্ব সকল স্থানেই খোজ করা হইল। কোথাও পাওয়া গেল না।

নদাইয়ের জ্ঞান বখন হইল তখন বেশী দশটা। এই রকম সময়েই সাধারণতঃ জ্বর আরম্ভ হয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল।

তখনও তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই। কোয়ার

ভরানক ভর হইয়াছে। ছুই চোখের কোণ-বাহিরে কেবল অশ্রু গড়াইতেছে। উত্তরে সে শুধু হাতের ডানু উল্টাইয়া জানাইল, বধু নাই।

কোথায় গেল?

জানে না।

তাহাকে এমন হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া গেল কে?

নদাই ফাঙুল দিয়া খাটের নীচেটা দেখাইয়া দিল।

আরও বেশী হইলে কথটা স্পষ্ট করিয়া জানা গেল:

বৌভাতের হাজাম মিটাইয়া এমনিতেই ফুলশয্যার দেরি হইয়া গিয়াছিল। বর-বধুর শুইতে রাজি এগারোটা কি বারোটা হইবে। নদাই বধুর একটা হাত ধরিয়া প্রীতি-সন্ধ্যা করিতে বাইবে, বউ এক ঝটকা দিয়া হাত টানিয়া লইল। ঠোঁটে হাত দিয়া ইঙ্গিতে বলিল, চুপ।

নদাই ভাবিল, বোধ করি কেহ জানালার গোড়ায় আড়ি পাতিতেছে। সেই ভয়েই বধুর এই সতর্কতা। আড়ি পাতিবার অবশ্য তাহার কেহ নাই। তবু পাড়ার মেয়েরা কি আর ছাড়িবে?

বধু পা ফুলাইয়া খাটের উপর নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নদাইও আর কথা না কহিয়া যেমন ছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

এমনি বোধ করি ঘণ্টাখানেক কাটিল।

নদাই আর থাকিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে ডান হাতখানি বধুর কাঁধের উপর রাখিল।

—এই—বলিয়া বধু কাঁধের এক ঝাঁকুনীতে নদাইয়ের হাতটা ফেলিয়া দিল।

আরও অনেক কণ কাটিল। ছোটবাবুদের বালাখানার বড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছুইটা বাজিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে নদাইয়ের চোক ঘুমে চুলিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু বধু ঠার তেমনি বসিয়া আছে।

নদাই কিস্ কিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার ঘুম পায় নি?

বধু খাড় নাড়িয়া জানাইল—না, পায় নাই।

—ছুটে যাও হে।

—বাহক।

—হ্যাঁ, বাজবে বইকি? এস—বলিয়া নদাই যেমন বধুকে বাহুপাশে বাঁধিতে বাইবে অমনি বধু ভড়াঙ্ক করিয়া নীচে লাকইয়া পড়িয়াই ফল্ করিয়া আলো নিবাইয়া দিল। তারপর কোথা দিয়া কি হইল, ভাবিলে এখনও জংকল্প হয়, যম-দূতের মত কতকগুলো লোক পট্ পট্ করিয়া তাহাকে আট্টপুটে বাঁধিয়া বোধ হয় বউ লইয়া চলিয়া গেল। মইলে বুউ গেল কোথায়? মোট কথা, ইহার পরে ঠিক কি যে হইল তাহা আর স্মরণ নাই।

ছোটবাবু অনেক ভাবিয়া বলিলেন সেই যমদূতগুলো নিশ্চয় এর নীচে ছিল। বলিয়া আঙুল দিয়া খাটের নীচেটা নির্দেশ করিলেন।

নিতান্ত ভালমানুষের মত নদাই বলিল—বোধ হয়।

সে যাহাই হউক, সময় এবং স্রোতের মত বধুও একবার গেলে আর ফিরিয়া আসে না। বধু আর কোন দিন স্বামীর ঘর করিতে আসিল না। নদাইও যণায় লজ্জার তাহার কথা আর ভিজসা করিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বধু না-আসিলেও স্বপ্ন পিতৃহৃৎ হইতে মাসের মধ্যে দুইবার কোন-না-কোন পক্ষ উপলক্ষ্যে চাল, ডাল, মুন, তেল হইতে আরম্ভ করিয়া মাসের নিত্যব্যবহার্য প্রত্যেক দ্রব্য এত পরিমাণে আসিতে লাগিল যে, নদাইয়ের অন্নসম্ভার চিহ্নমাত্র রহিল না। এইজন্যও বধুর বিরোগব্যথা নদাইয়ের বুক হইতে অনেকটা দূর হইল। আর বাকীটা দূর হইল ছোটবাবুর আশ্বাসে।

ছোটবাবু এ-প্রাণের হঠাৎ-কঠা-বিধাতা বলিলেও অত্যন্তি হয় না। এ-প্রাণের বোলো আনারই তিনি জমিদার। বছর চল্লিশ বয়স। দিয়া হুগুফু চোরা। লেখাপড়া বিশেষ করেন নাই। কিন্তু গানে, বাজনাং, বক্তৃতার অধিতীর। বস্তুতপক্ষে এখানকার বিয়েটার পাটির ইনিই প্রাণ-স্বরূপ। অত্যন্ত আয়ুসে লোক,—বাহাকে বলে মজলিসী। নদাই তাহার অত্যন্ত স্নেহভাজন।

কিছু দিন নদাই মুখ হুজিয়াই কাটাইল। পাড়ার লোকেরা তাহার দ্বী-ভাগ্যের জন্য হুং প্রকাশ এবং বস্তুর-ভাগ্যের জন্য আনন্দ জ্ঞাপন করে।

—মেরেবাসের কথা ছেড়ে হাও বোঁ, ওসর চরিত্র মেবতার। পর্যন্ত বৃদ্ধিতে পারেন না। কিন্তু এমন খণ্ডর ক'জনের হয় বল ত? বাসে দু-বার ভাব করা কি এই বাজারের সোজা ব্যাপার না কি?

নদাই হ্যাঁ না কোন কথাই বলে না। কিন্তু আলোচনাটা শুনিবার জন্য বসে। লোকে এই হুজারের পাড়া কে কে তাহা অনুমান করিবার জন্য বহুলোকের নাম করে। তাহার পাড়ারই ছেলে-ছোকরা। কথাটা নদাই বোঁকের মনে লাগিলেও সে মুখ ফুটিয়া সমর্থন করিতে স্তম পার। ছেলেগুলো সত্যই হুশমন-প্রকৃতির। নদাই চূপ করিয়া থাকে। মনে মনে ভাবে, অমন হুন্দরী মেয়ে তাহার কপালে সহিবে কেন? মেয়ের মুখ সে দেখিয়াছে।

অবশেষে নদাই এক দিন ছোটবাবুকে ধরিয়া বলিল। বিবাহ না করিলে তাহার একটি দিনও চলিতেছে না। এই বয়সে নিজের হাত গোড়াইয়া রাখা করার ঝকঝকি কি সহজ!

এই কথা!

ছোটবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্বাস দিলেন, এক পক্ষের মধ্যে বিবাহ দিয়া তবে তাহার অন্ন কাম।

ছোটবাবু ইচ্ছা করিলে, কি না হয়। এক পক্ষও অপেক্ষা করিতে হইল না। দুই-তিন দিনের মধ্যেই কোথাকার কে এক জন আসিয়া পাত্র দেখিয়া গেল। দেখামাত্র পাত্র পছন্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদ এবং দিন স্থির।

পাড়ার আবার বহুবনিতার মনে খুলী আর ধরে না। কেবল নদাই নিজে একটু খুংখুং করিতে আশিলা। মেয়েটা নাকি কালো। নদাইয়ের স্বভিগটে শুধনও তাহার প্রথম পত্নীর অপরাধ রূপলাগা ভাসিছেছিল। কিন্তু এ-আপত্তির কথা মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে সাহস করিল না।

শুভদৃষ্টির সময় মনে হইল, মুখ ফুটিয়া বলিলেই ভাল ছিল। প্রথম পত্নীর শুধু বটাই কম। ছিল না, মুখ-খানিও বেশ কচি কচি। এ-মেয়ের যেমন কালো, তেমনি কুৎসিত। মুখের গড়ন একেবারে পুরুবাণি। গাল ভাঙিয়া গিয়াছে। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে,

ছোটবাবু উৎকর্ষ হইয়া উঠিলেন। এত দিনের অভ্যাসে তিনিও যেন কোথায় একটু ফাঁক অহুতব করিতেছিলেন। নদাই তাহার চিরদিনের বিনীত হাসি হাসিয়া নিজের জায়গাটিতে গিয়া বসিল।

গোটা-হুই কনসার্টের পরেই অভিনয় আরম্ভ হইয়া গেল, —এব চরিত্র। জীযুতবর্ণ, বিপুলকায় মহারাজা ধীরগভীর পরীক্ষণে প্রবেশ করিয়া আসরেই গড় হইয়া মা-দুর্গাকে প্রশংসা করিয়া চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দীর্ঘদ্রব্য, অত্যন্ত শীর্ণকায় মন্ত্রী এবং বাম পার্শ্বে বেটে, কাঠি-কাঠি গড়নের সেনাপতি আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজার দুটি লম্বা ছিন্ন ভাবে নিবন্ধ। মন্ত্রীর নিতান্ত নিরীহ স্বভাব ভালমাহু বস্ত্রলোক। আসরে আসিয়া সেই যে চোখ নাখাইলেন আর তুলিলেন না। সেনাপতির বয়স অল্প। আসিয়াই একবার চারি দিকে চাহিয়া লইলেন। উপরের আলো এবং তরবারির দৈর্ঘ্য মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, রণোন্নততার তরবারির ধোঁচা লাগিয়া আলোটা ভাঙিয়া যাইতে পারে কিনা। অল্প আসরে একবার সে-চুপটনাও ঘটয়াছে।

রাজা জলদগভীরকণ্ঠে রাজ্যের বিবরণ জানিতে চাহিলেন। মন্ত্রীর আধ-আধ শীর্ণকণ্ঠে তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া থাকিতেই সেনাপতি অসিদ্ধাক্ষর হৃদয়ে বিভক্ত বাংলার প্রায় পাঁচ মিলিটকাল অনর্গল এত কথা বলিয়া গেলেন এবং তরবারিটা এতবার আঞ্চালন করিলেন যে, সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া গেল। আর নিস্তক। যাহিটি নড়িলে জানিতে পারা যায়।

ছোটবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—নাঃ! গান এয়া জমায়ে দেখছি।

মুহুর্তে সকলেই সে-কথার সার মিলেন। বস্তপক্ষে সেনাপতির বীররসোদগারের পরে সে-বিষয়ে আর কাহারও রহস্য সংশয় ছিল না।

রাজা সেনাপতির মতেই মত দিলেন। তাহাই হয়। পৃথিবীতে কোন কালেই ভালমাহুদের জন্ম হয় না। দর্শকেরও মন্ত্রীর উপর মহাহুত্ব দিয়া। লোকটার একটা ভাল শোবার পর্য্যন্ত নাই।

সে বাহাই হউক, কিন্তুকল্য ঝাঝঝাঝের পর মন্ত্রী

এব সেনাপতি উভয়েই প্রস্থান করিলেন এবং ম্যানেজার বংশীধ্বনি করিবামাত্র হুরোরাণী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নদাই চমকিয়া ছোটবাবুর পায়ে হাত দিল।

—কি হ'ল?

—কিছু নয়। বলিয়াই নদাই হাতখানি সরাইয়া লইল।

আশ্চর্য্য মিল! অবিকল তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর মত! তেমনই ভাঙা গাল, কোটির-প্রতিষ্ট জলন্ত চোখ যেন দপ, দপ, করিয়া জলিতেছে; মুখের গড়নও তেমন পূর্ণবালি। হুরোরাণী আসিয়াই চোঁচাইতে লাগিলেন। এবং এবং তাহার জননীর সঙ্কে তাহার যাহা কিছু অভিযোগ ছিল তাহা এমন হাত নাড়িয়া বিবৃত করিতে লাগিলেন যে, দর্শকেরা পর্য্যন্ত তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। নদাই কিন্তু সে-সকল কথার এক বর্ণও শুনিতেছিল না। তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর কণ্ঠস্বর সে একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। ইহার চীৎকার শুনিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, দ্বিতীয়া স্ত্রীর কণ্ঠস্বরও অবিকল এইরূপ। এমন করিয়া কটমট করিয়া চাহিয়া সে এক দিন তাহাকেও ধমকাইয়াছিল। আশ্চর্য্য মিল বটে!

অনেক রূপ ধরিয়া চীৎকার করিয়া অবশেষে হুরোরাণী চলিয়া গেল। গান জমিয়া গিয়াছে। আসর নিস্তক নদাই উঠিয়া বসিয়াছিল, হুরোরাণী চলিয়া যাইতে আবার ধামে ঠেস দিল।

অতঃপর আসিলেন হুরোরাণী, এবং হাত ধরিয়া। এ ছোকরার বীররসের বক্তৃতা নয়, কল্প রসের। ‘মহারাজ বলিয়াই বন্ধ করিয়া কাঁথিয়া ভাসাইয়া মিল। কিন্তু কল্প রসের বক্তৃতা ইহাকে মানার ভাল। রংটি ফরসা মুখখানি বেশ চল্‌চলে, গলার স্বরও মিষ্টি। এক নম্র বক্তৃতা করিয়াই মাতা-পুত্র গান আরম্ভ করিল। সে গানে হুরো পাশাপাশি এবং হইল।

কিন্তু নদাই একবার আলক্তরে আড়চোখে তাহা দিকে চাহিয়াই মোক্ষা হইয়া উঠিয়া বসিল। ‘হাম-কাঃ পাজ সমস্তই যে বিবৃত হইয়া গেল। এই বিচিত্র আলোচনা দ্বারা, অভিনয়তা ও অভিনেত্রীদের বিবিধ স্বর্ণের স্তম্ভী পরিচ্ছন্ন, বাস্যরসের মধুর ধ্বনি, সমস্ত মিলিয়া তাহাকে যে কোন্‌ কল্পলোকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল।



বাংলা

রুতী প্রবাসী বাঙালী

শ্রীযুত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কৃতী ছাত্র; তিনি সম্প্রতি 'দীৱকাসিম' সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা



শ্রীযুত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

করিয় লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বিলাতে সামরিক শিক্ষায় বাঙালী বালকের কৃতিত্ব—

শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ ভাট্টা বিলাতের কুলে অধ্যয়ন কালে ও-টি-সি অর্থাৎ 'অক্সিস' টেনিং কোর্স-এ যোগ দিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সম্প্রতি ও-টি-সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া লওনে সময় বিভাগ হইতে সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে। অতঃপর সে পরিশুদ্ধক রিজার্ভ টেরিটোরিয়াল আর্মি, টেরিটোরিয়াল আর্মি রিজার্ভ অক্সিস, বা এ্যাক্টিভ নিউশিয়া অব ক্যানাডা নামক সেনাদলে

ভর্তি হইতে পারিবে। আকস্মিক বিপৎপাতের সময় যখন নানা সেনাদলকে সম্মিলিত হইতে হইবে তখন শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথও সময়-কিভাবেগের অন্তর সেক্টরার নিকট সৈনিকের কার্যের জ্ঞত বাহাতে পদবাবহার করে সেইজন্য সার্টিফিকেট অগ্ররোধ করা হইয়াছে।

যে-সব বালক এ-বৎসর ও-টি-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সময়-বিভাগ হইতে সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ বয়ঃকনিষ্ঠ। দেবেন্দ্রনাথ চতুর্দশ বৎসর বয়সে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বালক-ছোড়া প্রতিযোগিতায়' প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সংবাদ



শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ ভাট্টা

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তদবধি প্রতি বারই বালক-চালনা প্রতিযোগিতায় দেবেন্দ্রনাথ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতেছে।

ফরিদপুরে ব্রতচারী-বিদ্যালয়—

শ্রীযুত গুরুদাস দত্ত, আই-সি-এস, ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক। আদর্শ নাগরিক প্রস্তুত করিয়া সমাজ-সেবার জনস্বপ্নকে উৎসাহ করা এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। অস্তিত্ব জ্ঞানের ভায় করিদপুরেও গত ২২এ জাণুয়ারী একটি ব্রতচারী সমিতি গঠিত হইয়াছে।



ବ୍ରତଚାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ—କରିବପୁର



ବ୍ରତଚାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ—କରିବପୁର

(୧) କି. ଏ. ଇ. ପୋର୍ଟାର, ଆଇ. ସି. ଏଲ୍ (ସଭାପତି) (୨) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବନୀଧର ବଲ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ (ପ୍ରଧାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ)
(୩) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ (ସମ୍ପାଦକ)। ନିକ୍ଷାପରିଗଣ ଦ୍ଵାରା ନାମ ଓ ଉପସିଦ୍ଧି।

স্মৃতির সভাপতি করিমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মি: এ. ই. পোট্টার, সম্পাদক করিমপুর হিতৈষী কুলের প্রধান শিক্ষক জীবন্ত কিতাশাস্ত্র দত্ত, এবং জেলার তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার সভা।

ব্রতচারীর আদর্শ ব্যাপকভাবে বিস্তারের জন্ত গত ২১এ মার্চ করিমপুর একটি ব্রতচারী শিক্ষা-কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছিল। মাসাধিক কাল যাবৎ জেলার সাতাশটি কুল হইতে চৌত্রিশ জন শিক্ষক ও তেত্রিশ জন ছাত্র ইহাতে যোগদান করেন। এখান ব্রতচারী ব্যায়াম, সমষ্টি-সঙ্গীত, রাইবেশ নৃত্য ও সঙ্গীত, জারী নৃত্য ও সঙ্গীত, বাউল নৃত্য ও সঙ্গীত, রাইবেশ কসরৎ প্রভৃতি বিষয় টোল, গুব-গুব-গুব, মাদল ও কশির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। নিখিল-বঙ্গ ব্রতচারী শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান পণ্যবেক্ষক জীবন্ত নবনোদর বন্দোপাধ্যায়, বি-এ, বি-টি এখানে থাকিয়া শিক্ষাবাসনে সহায়তা করেন। শিক্ষার্থীগণের মধ্যে মোল জন শিক্ষক ও উনিশ জন ছাত্র প্রথম শ্রেণী, এগার জন শিক্ষক ও সাত জন ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী, ছয় জন শিক্ষক ও দুই জন ছাত্র তৃতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। বিগত ২৪এ এপ্রিল বাংলার শিক্ষা-বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর মি: জে. এন্. বটমুলি শিক্ষার্থীগণকে যোগ্যতামুসারে ট্রেনিং সার্টিফিকেট, পদক ও ব্রতচারী ব্যাজ প্রদান করেন।

শিল্প-কলা প্রদর্শনী—

গত ২২এ আগষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর চারি দিবস কলিকাতার বিজ্ঞানাগর কলেজের প্রাশিক্ষা-বিভাগের প্রযত্নে একটি শিল্পকলা প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল।

বাংলার অশ্রুতম শিল্পী জীবন্ত অনন্তবর্মার নাগ মহাশয়ের ঐকান্তিকতায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। নাগ মহাশয়ের বহু ছাত্র ও ছাত্রী তাঁহাদের শিল্প-কলার নিদর্শন স্বরূপ নবোদয় শিল্পসভার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যথা—মাতের আস, ঝিৎক, কড়ি, সামুক, ছিঁড়া কাগজ, গাছের পাতা, মোম, মাটি, রঙের পাথর, ভাস্ক্য কাচ প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু সমূহ হইতে প্রস্তুত নানারকম উৎকৃষ্ট ও মনোমুগ্ধকর শিল্পকাব্য। তুলা হইতে প্রস্তুত তাজমহল, গন্ধ, পক্ষী প্রভৃতি বস্তুসমূহ, রেশম ও পশম হইতে জাত বিভিন্ন ফটা-শিল্প ও গালিচা, আসন প্রভৃতিতে বিচিত্র চিত্রণের কাজও প্রদর্শনী অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ইহা ছাড়া নাগ-মহাশয়ের চিত্রকলা, দেশীয় ফুল ও ফল হইতে চিত্রণের কাজের বার্ষিক রঙীন নকশা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যময়ী ও পরিবর্তনশীল রাগ-রেখার চিত্রণ প্রদর্শনাতে দেখান হয়।

বিজ্ঞানাগর কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রাশিক্ষা-বিভাগে শিল্পকলা-শিক্ষা প্রবর্তনের মহান উদ্দেশ্য লইয়াই প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। জািবিকা সংস্থার উপযোগী এইরূপ একটি শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র দেশের কলাগুরু হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ

এলিক্যান্টা গুহার ত্রিমূর্তি শিব—

প্রবাসী ১৩৪০, জীবন সংখ্যার পঞ্চ-মত বিভাগে চতুর্থ শিবের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—“শিবকে আমরা পঞ্চমুখ বলিয়া জানি। তবু প্রাচীনকালে সময়ে সময়ে তাঁহার চতুর্মুখ মূর্তিও গঠিত হইত। অর্ধভারতের অজমগড় রাজ্যে নাটনা নামক



ত্রিমূর্তি শিব



ত্রিমূর্তি শিব



ত্রিমূর্তি শিব

স্থানে চতুমুখ শিবের একটি অতি মূল্যবান মূর্তি আছে। এই মূর্তিট অস্থান ৩২০-৩৫০ খৃঃ অব্দে গঠিত হয়। এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কতি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এলিফাণ্টা গুহায় একটি ত্রিমূর্তি বা তিন-মুখো শিবও দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত্রিমূর্তি হস্তি-হৃতি-দায়ের প্রতীক-স্বরূপ। এলিফাণ্টার ত্রিমূর্তি শিবের সহিত অজয়গড়ের চতুমুখ শিব-মূর্তির সাদৃশ্য আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে এই শিব-মূর্তি ৬০০-৮০০ খৃষ্টাব্দে খোদিত।

অর্থ নৈতিক প্রসঙ্গ

ওট্টো আর্থ চুক্তির সম্পর্কে ভারতীয় কমিটির রিপোর্ট—

ওট্টো আর্থ চুক্তির সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার রিপোর্ট সঙ্কতি প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি একমত হইতে পারেন নাই। স্তর জোসেফ ভোর, ক্যাপ্টেন লালচাঁদ, স্যার জ্যাক নয়েস, ভাই পরমানন্দ, ডাঃ ডি হুজা, মিঃ এইচ পি মোদী, মিঃ আর পি বাগলা, মিঃ এফ ই জেম্‌স্‌, ও শের্‌ হাজি আবদুল্লাহ হাকিম, ইহার রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মত এই যে,

(ক) যুক্তরাজ্যে (ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েলস ও নর্থ আয়ারল্যান্ড) যে সমস্ত পণ্য আমদানির জন্য “হবিধা” ভোগ করে, সেগুলি ভারতের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে প্রধান।

(খ) অন্যান্য দেশ অপেক্ষা যুক্তরাজ্যই “হবিধা ভোগী” ও অন্যান্য পণ্যের ভাল বাজার বলিয়া দেখা যাইতেছে—

(গ) এই “হবিধা” বন্দোবস্ত (preferential scheme) প্রচলিত হইবার পর হইতে, ভারতে যুক্তরাজ্যের পণ্য আমদানির অধোগতি রুদ্ধ হইয়াছে ও হ্রাস দিকে চলিয়াছে।

(ঘ) প্রথম বৎসরেই বিনিময়ের পারস্পরিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ঙ) হবিধার বন্দোবস্ত ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের সম্পদকে মূল-বান।

(চ) ভারতবর্ষে যে হবিধা প্রদান করিতেছে তাহাতে ইংলণ্ডের বেশ সাহায্য হইতেছে।

(ছ) ভারতবর্ষে যে হবিধা দিয়াছে তাহাতে ভারতের রাজস্বের কোনই ক্ষতি হয় নাই।

(জ) ভারতবর্ষে যে হবিধা দিয়াছে তাহাতে ভারতের কোন পণ্যের অহবিধা হয় নাই।

অর্থাৎ কমিটির মত এই যে হবিধা দান ব্যবস্থা ভারতবর্ষ ও যুক্তরাজ্য উভয়েরই উপকার করিতেছে।

এই কমিটির দুইজন বাঙালী সদস্য স্তর আবদার রহিম ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী স্বতন্ত্র বিবৃতিতে বলেন যে, যুক্তরাজ্য ভারতবর্ষের কৃষিজাত দ্রব্যে যে হবিধা দিয়াছে তাহাতে ভারতের উপকার হয় নাই কিন্তু ভারতবর্ষ যুক্তরাজ্যকে যে হবিধা দিয়াছে তাহাতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়াছে। হুতরাং তাহাদের মন্তব্য এই যে যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য বিদেশ সম্পর্কে “কোটা” প্রণয় প্রচলিত হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত সীতারাম রায় বলেন যে চুক্তির ফলে ভারতে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বাড়ে নাই, যে পণ্য উৎপন্ন হয় তাহারও বাকসার বৃদ্ধি পায় নাই কিন্তু কতিপয় ভাল ভাল ক্ষেত্রের সহিত কলহ বাধিয়াছে মাত্র! তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করিবার লওয়া যায় যে, যুক্তরাজ্যের বাজারই আমাদের একমাত্র প্রধান বিদেশ হান, তবুও ভারত যে দেশের অধীন তাহারই উপর একান্ত নির্ভর করা এবং পণ্যবাহী অন্যান্য বাজারকে লোপ করা ভারতের অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হইবে না।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে কেহ-কেহ কোন-কোন বিবরে সতর্ক দৃষ্টি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ডাঃ ডি মজা বলেন—এই ব্রিটিশ ভারতের চাউল, কচি ও নারিকেলের ব্যবসায়কে আঘাত করিয়াছে। ভাই পরমানন্দ বলেন এ অংশস্থান বড়ই তাড়াতাড়ি হইয়াছে—আরও এক বৎসর পরে হইলে ফলাফল আরও ভাল বুঝা যাইত। মিঃ এক, ই, জেমস বলেন যে এই ব্যবসায় ভারতে চাউল ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়াছে।

পাটের সংশোধিত পূর্ণাভাব—

সম্প্রতি পাটের সংশোধিত পূর্ণাভাব প্রকাশিত হইয়াছে যথা—

জিলা	পরিমাণ—চাবের (অস্থান)	উৎপাদনের (অস্থান)	উৎপাদনের (অস্থান)
	হাজার একর	হাজার বেল	(১ বেল = ৪০০ পাউণ্ড)
বাংলা	গত বৎসর	এ-বৎসর	গত বৎসর
২৪ পরগণা	৬১	৫৭.১	২০০
নদীয়া	৩৬	৩০	৯৫
মুর্শিদাবাদ	২১	১৭.৮	৬৫
যশোহর	৭০	৬৬	২১৫
খুলনা	৩১	২৩	৮৫
বর্ধমান	৩	১.৫	১১
মেদিনীপুর	৫	৩.২	১৫
কলকাতা	৩৪	২৯	১২৭
হাওড়া	৪	৩	৯
রাজশাহী	৯১	৮৬.৬	২৮০
দিনাজপুর	৫৯	৫৫	১৮০
জলপাইগুড়ি	৩২	৩২	১১০
দাঙ্গিলিং	২	২	৭
রংপুর	২৫২	২৫২	৮৫০
বগুড়া	৮৫	৮৪.৭	২৫৫
পাবনা	৮০	৮২.২	২৭০
মালদহ	৩০	২৩	৮০
কোটবিহার	২৫	২৪.৩	৪৪.২
ঢাকা	২৬৫	২৯০	৮৭৫
মহম্মদসিংহ	৫৬৬	৫২৬	১,৯২৪.৪
ফরিদপুর	১৫০	১৪০	৫০১
বাখরগঞ্জ	৩২	৩২	১০০
চট্টগ্রাম	৩	৩	১.২
সিপুয়া	১৮৩	২০৪	৬২৫
মোয়ামালী	৫	৫	১৫৫
সিপুয়া রাজ্য	১.৪	১.৪	২.৩
মোট	২,১৬৮.৭	২,১৮৬.১	৭,৯২১.১
মোট বাংলা প্রদেশ	২,১৬৮.৭	২,১৮৬.১	৭,৯২১.১
বিহার-উড়িষ্যা	১৯২.১	১৬৫.৬	৪৭৩.২
আসাম	১৫৬.৭	১৪৫.৩	৪৫৬.৮
মোট	২,৫১৭.৫	২,৪৯৭.০	৮,৮৫১.১

পূজার সময় নানা কারণেই নগদ টাকার প্রয়োজন বলিয়া কৃষকগণ পাট বিক্রয় করিয়া কেসিতে ব্যয় হয়, তাহাতে দর অতি নিম্নপরেই থাকে তদুপর্য এই পূর্ণাভাব প্রকাশ পাইলে ত্রেতাগণ দর কমাইয়া লইবার আরও হযোগ পায়। এই সকল পূর্ণাভাব যে সিঁতুল এক্সপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। পাট তদন্ত কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ও

সংখ্যানিষ্ঠ উভয় দলই এই পূর্ণাভাব সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহা কল্পিত এবং সত্য হইতে দূরে।

পাটের মাসিক রপ্তানি—

পাটের দর—অল্প কৃষকগণ দলাল, করিয়া বা আড়তদারের দরদার উপরই নির্ভর করেন। তাহার পাটের চাহিদা নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম কারণ তাহার জ্ঞানই না যে কোন মাসে কি পরিমাণ পাট বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। নিম্নের তালিকা হইতে কাঁচা পাটের রপ্তানির হিসাব পাওয়া যাইবে— (হাজার টন)

মাস	১৯২২-৩০	১৯৩১-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
এপ্রিল	৫০.৫	৪২.৯	৪৫.৫	৩৪.৪	৪২.০
মে	৩৫.৭	৪১.৫	৩৮.০	৩০.৭	৪৬.৬
জুন	৩৯.৯	৪০.৫	৩১.৭	১৯.৫	৬০.৫
জুলাই	৩৫.৭	৩১.১	৪৩.৮	৩০.৪	৫৭.২
আগস্ট	৪১.৮	২৪.৭	৩৩.৭	২৭.২	৪৮.১
সেপ্টেম্বর	৮৮.৫	৩৬.৫	৪০.২	৪৮.৪	৪৯.৯
অক্টোবর	১০২.১	৬৬.১	৬১.৩	৬২.২	৬৭.৩
নবেম্বর	১৩৬.৮	৭৮.৮	১০৩.১	৬৪.৮	১১২.৩
ডিসেম্বর	৯২.২	৮৬.৯	৯৪.১	৮২.২	৮২.৩
জানুয়ারী	৭৪.৩	৬৮.৯	৪৩.৭	৬২.২	৬৬.০
ফেব্রুয়ারী	৫৭.৬	৫০.৩	২১.৬	৫১.৮	৬০.২
মার্চ	৪৪.৮	৫১.৪	২৯.৯	৪৮.৬	৫৫.৯
	৮০৩.৯	৬১৯.৬	৫৮৬.৬	৫৬৩.১	৭৪৮.৩

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পূর্ব তিন বৎসর আগেকা ১৯৩০-৩৪ কাঁচা পাটের রপ্তানি অধিক হইয়াছে কিন্তু পাটের দর বৃদ্ধি পায় নাই। অর্থাৎ দর সম্পূর্ণরূপে চাহিদার উপর নির্ভর করে নাই। এই বৎসর এপ্রিল ও মে মাসে যথাক্রমে ৬০.৩ ও ৫০.৮ হাজার টন পাট রপ্তানি হইয়াছে, পূর্ব পূর্ব বৎসরের এপ্রিল ও মে মাসের তুলনায় বেশী হুতরাং আশা করা যায় যে এই ভাবে চলিলে এ-বৎসরও রপ্তানির পরিমাণ বাড়িবে। কিন্তু দর দেখা যাইতেছে তুলনায় অনেক কম।

গত বৎসর কলিকাতার পাটের দর কিরূপ উর্দ্ধতি-পড়তি হইয়াছিল তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। (এক বেলের দর)

	প্রথম শ্রেণী	লাইটনিং	রেড (ঢাকাস)
মে ১৯৩৩	৩১.০	৩২	৩৫
জুন	২৯.০	২৭	৩০
জুলাই	২৯.০	২৭.০	৩০
আগস্ট	২৮.০	২৬.০	৩১.০
সেপ্টেম্বর	২৫	২৩	২৮
অক্টোবর	২৫	২২.৫	২৮
নবেম্বর	২৪	২১	২৬.০
ডিসেম্বর	২৬	২৩	২৭.০
জানুয়ারী ১৯৩৪	২৮.০	২৪.০	৩১
ফেব্রুয়ারী	২৯.০	২৬	৩১.০
মার্চ	২৮.০	২৫	৩০.০
এপ্রিল	২৭	২৩.৭	৩০
মে	২৬.০	২২	২৭.০

গত নবেম্বর মাসেই পাট রপ্তানি হইয়াছে সব চেয়ে বেশী কিন্তু তখনই দর ছিল সব চেয়ে কম।

বাংলা দেশে যৌথ-মণ্ডলী—

আইনের বিধান মতে অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ একানকইট যৌথ-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। যথা—

গত চারি মাসে—এপ্রিল হইতে জুলাই—ভারতীয় কোম্পানী

বাংলা দেশে যৌথ-মণ্ডলী	মণ্ডলীর সংখ্যা					মূলধন (হাজার টাকায়)			
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	মোট	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই
ব্যাঙ্ক	১	-	৬	১	৮	১০০	-	৩,২০০	২০
জীবন, অগ্নি, সামুদ্রিক বীমা	১	-	-	-	১	২০	-	-	-
'প্রজিডেন্ট' বীমা	৪	৮	৪	৩	১৯	২৪০	৪৮০	২০০	১৪০
মুদ্রণ, পুস্তক-প্রকাশ ইত্যাদি	১	১	১	৩	৬	-	-	-	-
রাসায়নিক দ্রব্য ও ক্রাফটসনিক ব্যবসায়	৩	-	১	-	৪	১০০	১০০	৫০	৬০
লৌহ, ইস্পাত, জাহাজ নির্মাণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রভৃতি	১	-	-	-	১	১৪০০	-	৩০	-
মাটি, পাথর, সীমেন্ট, চূণ ও	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অগ্নিপ্রাণের দ্রব্য	১	-	-	-	১	২০	-	-	-
এজেন্ট (মাসেনজিং এলেন্দী)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
কোম্পানী সহ	৩	৪	১	২	১০	১০০	-	-	-
কয়লার খনি	১	-	-	-	১	১৪০	৮০	-	-
হোটেল, নাট্যশালা, প্রমোদ-স্থান	১	-	২	-	৩	১৪০০	-	-	১০০
মোটর গাড়ীর সংক্রান্ত	-	১	-	১	২	৩০০	-	২০০০	-
ইন্জিনিয়ারিং	-	১	-	১	২	-	১০০	-	১০০
শিল্প, ভাষা প্রভৃতি	-	১	-	-	১	-	৫০	-	৪০
কাপড়ের কল	-	১	-	-	১	-	৩০০	-	-
সোনার খনি	-	১	-	-	১	-	১৫০০	-	-
জমিদারী, ভূমি	-	১	-	১	২	-	৪০০০	-	-
টেনারি ও চামড়ার ব্যবসায়	-	-	১	-	১	-	১৫০	-	৬০০
বরফ ও এরিয়েটেড জল	-	-	১	-	১	-	-	২০০	-
পাটের কল	-	-	১	-	১	-	-	১৫	-
পাটের প্রেস	-	-	১	-	১	-	-	১০০	-
অস্ত্রাস্ত্র মিল ও প্রেস	-	-	১	-	১	-	-	৭০০	-
বেবিগেশন	-	-	-	১	১	-	-	-	-
কাঁচ	-	-	-	১	১	-	-	-	১০০০
'স' ও কাঠের মিল	-	-	-	১	১	-	-	-	১০০
অস্ত্রাস্ত্র ব্যবসায়	২	২	১০	১	১০	৩০০	৬৫	১৫২৫	৪৪০
মোট	১০	২১	৩০	২১	৮২	৪২,২০	৬৮,২৫	২৫,৮২	১,১২,২০

বাংলা দেশে গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেকটিই যে বাঙালীর মূলধনে বা উদ্ভোগে গঠিত তাহা নহে। সবগুলির কর্তৃক্বেও বাংলা দেশে সামরিক নহে। সবগুলিই যে নতুন তাহাও নহে, কতকগুলি পূর্বে হইতেই কার্যক্ষেত্রে ছিল, নতুন ভাবে গঠিত হইল মাত্র। সব চেয়ে বেশী মূলধন লইয়া গঠিত হইয়াছে একটি বেবিগেশন কোম্পানী। ইহা

বাঙালীর নহে। সব চেয়ে বেশী সংখ্যক গঠিত হইয়াছে প্রজিডেন্ট কোম্পানী।—মোট উনিশটি। এগুলি অল্প সবই বাঙালীর। দেশের শিল্প উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানীতে এখনও বাঙালীর আর্থিক আশাস্বরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

নৃত্যরতা ভারতী

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সভ্যতার বিকাশের সময় মানুষের কোন ধর্ম কিংবা কোন জাতি ছিল না। অপরিচিত অপরিচিতায় দেখা হ'লে দ্বিষ্টের সন্ধান, “কি নাচ তুমি নাচ?”

নৃত্যের ভঙ্গী দিয়ে তারা বুঝত কে কোন্ দলের, কোন্ পাহাড় বা কোন্ দ্বীপে থাকে। তার পর সভ্যতার প্রথম আলোকে তাদের মনে ধর্মভাব জেগে উঠল, নৃত্যের সঙ্গে ধর্মকেও তারা জড়িয়ে ফেলল এবং এক মধ্য দিয়ে তারা জানত কে ভূতপ্রেতের উপাসনা করে বা কে দেবদেবীর উপাসনা করে। উপাসনা এবং ধর্মালুষ্ঠানই ছিল তাদের নৃত্য।*

জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কাজেও বীজ-রোপণ, শস্ত-কর্জন, পরিণয়ে নৃত্য ছিল তাদের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মহেন্দ্রজাদোতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন বহু নৃত্যেরা নয় নারীমূর্তি পাওয়া গেছে—এইরূপ আদিম যুগ থেকেই ভারতে নৃত্যকলার নানা রূপ চর্চা হয়ে আসছিল।

তার পর ঐতিহাসিক যুগে আর্যসন্তানেরা ভারতের নিবিড় বিজন ঘন বনপ্রান্তর, প্রভাতের নবোদিত সূর্যের স্বর্ণাভ আকাশ, মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত ভাস্করের রক্ত ও গভীর রূপ আর অন্তর্যমান দিনের অন্ধকারভরা নিস্তর আকাশের বৈচিত্র্যের মধ্যে তাদের অন্তর-দেবতার বিকাশ উপলব্ধি করেছিলেন।

তাই দেবি বৈদিক যুগে প্রথম ঋক থেকে নৃত্য, তার পর সাম থেকে গীত, যজু থেকে অভিনয় এবং অথর্ব থেকে রস। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা একটি নাট্যশালা তৈরি করলে এর প্রয়োগভার ভারতের ওপর গিয়ে পড়ে। প্রয়োগকালে

শিব সেখানে ছিলেন। সকলের অহরোধে শিব তু ডেকে এনে ভরতকে অঙ্গহারগুলোর প্রয়োগ দেখাতে আদেশ দেন। সেখানে তু বেসব নৃত্য দেখান তাই বিশ্ববিখ্যাত প্রসিদ্ধ তাণ্ডব। এদিকে পার্বতী সন্তুষ্ট হয়ে



উদযত এবং একপদ ভঙ্গী—বরবদ

*“The dance was, in the beginning, the expression of the whole man, for the whole man was religious. Thus dancing was born with religion and worship. The other intimate association of dancing was with love.”—(Westermarck. *History of Human Marriage*)

লাস নামে কমনীয় নৃত্য ভারতকে দেখান। ভারত ঐ তাণ্ডব নৃত্য মন্থ্যালোকে আনেন আর পার্বতী নিজে বাণ-

উৎসর্গে লাভ্য নৃত্য শিখিয়ে দেন। ওদের নিকট থেকে বমণীরা এই নৃত্য শিক্ষা করেন। ক্রমে ক্রমে গর সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু নটরাজের ধর্ম হয় আখ্যা-অনার্যের যুদ্ধ এবং শিবকে বৈদিক

হাতির ডমরুর গুরু গুরু শব্দ মহাযোগে ব্যাপ্ত; বা-হাতির বজ্রাঘি হু হু শব্দে জলছে—এ যেন মহাকালের বিরটি ধ্বংসের প্রলয় নাচন।

তার পর ভারতে ধর্মনৃত্যের বেশী প্রচলন হয় পুরাণের সময়। কালীর অপূর্ণ নৃত্য, গণপতি-নৃত্য, পুরাণের ঘটনাবলী নিয়ে শিল্পকুশলীরা নিত্য নূতন নৃত্য উদ্ভাবন করতে লাগলেন। প্রাচীন ভারতের এই-সব শিল্পীরা যেমন নৃত্যকুশলী ছিলেন তেমনি এক-এক জন মনোবিদও



হুমারী এবং পরিবাহিত ভঙ্গী—অজন্তা



প্রণয়-নৃত্য

ছিলেন। একটি ভৈরবী কিংবা পুরবীর রূপকে নৃত্যে কি ভাবে রূপান্তরিত করা যায় তা তাঁরা জানতেন। দেবসভায় অমরাদের সৃষ্টি হ'ল সেই সময়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিয়ে এই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে নৃত্যের বহুল প্রচলন চলেছে।

এই সময় ভারতে বহুল পরিমাণে প্রণয়-নৃত্যের বিকাশ হয়, এ-নৃত্যের প্রধান ভঙ্গী দোলন। এখন বাংলার পাড়ারগারে যে বিবাহ-নৃত্য হ'লে থাকে বোধ হয় ইহা প্রাচীনের প্রণয়-নৃত্যেরই রূপান্তর। সাঁওতাল কিংবা ঐরূপ অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে এখনও অনেক কুমারী শিখিল কবরীকে কটি-সকালনে গানের ভালে ভালে নাচায়। বাহা বৈদিক যুগে প্রথমে ধর্ম ও আত্মন বিকাশ

কৃত্রিম সঙ্গে এক ক'রে নেওয়া। সে বা হোক, শিব যে ভারতের নৃত্যজগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে এসেছেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তিনি ভারতের মহানট, নটরাজ, নটেশ্বর। তাঁর তাণ্ডব নর্তনে ত্রিভুবন কম্পিত; ছিন্নভিন্ন আলোড়িত জটাজাল দূর দিগন্তে প্রসারিত হ'য়ে একে বেকে মহাচেউ তুলছে; ডান

জন্ম করা হ'ত, অতীতের তাত্ত্বিক তারই বোলেতে
অর্থসমতার সমাধান হ'তে লাগল। উপাসনার অঙ্গ রূপে
তখন বে-মৃত্যের প্রাচীন ছিল এবং বে-মৃত্যের দ্বারা
পূজার বিধান আছে,

“মৃত্যুং নম্রা তথ্যমোতি রুদ্রলোক অশেষম্
করং মৃত্যোম সংপূজ্য তত্বেকামৃতমো ভবৎ।”

(বিষ্ণু ধর্মোত্তর)

ইহা এখন দেবদাসীর মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে।

মৃত্যুর এই গুলটপালটির কলে আগন্তুক নট ও
অভ্যাগতা নটীরা দেশের প্রত্যেককে মৃত্যুগীত শোনাতে
লাগল। যাদের আগেই ঠিক করা হ'ত তারা বেতনভোগী
ব'লে নিজেদের কলানৈপুণ্য নির্দিষ্ট দিনে দেখাত
(বাৎসরিক)। রামায়ণে দেখতে পাই, কুলীলব মৃত্যু
ও গীতের সাহায্যে সমস্ত রামায়ণের উপাখ্যান ব'লে বেড়াত।
ভারতের মৃত্যুর ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম কুলীলব
মৃত্যুর সঙ্গে গীতিকার যোগ হয় এবং উহা অর্থকরীও
বটে। এই অর্থকরী মৃত্যুবিদ্যার মধ্যে আবার দুইটি রূপ
আছে—একটি উদ্দেশ্যসাধন (indirect) আর একটি
অভাবপূরণ (direct)।

অব্যশূল মুন্সিকে আনার জন্য যে-সব রমণী পাঠান
হয়েছিল তারা সবাই মৃত্যু দিয়ে অব্যশূলকে ভুলিয়েছিল,
এমিকে মুন্সরী উর্জশী বধন বিখ্যামিত্রের ধ্যান তাড়লেন সেও
মৃত্যু দিয়ে। এরূপ পেশাদার নর্তক-নর্তকীদের কথা
হু-হাজার বছর পূর্বের কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’ দেখতে
পাওয়া যায়।

মহাভারতে গাণ্ডীবধারী অর্জুন চমৎকার মৃত্যুকল।
শিখোঁছিলেন। তিনি রণ-ভাঙ্গার অর্ধাৎ যুদ্ধ-মৃত্যুই সমগ্রিক
প্রসিদ্ধ ছিলেন। বৈদিক যুগে আর্থ-অনার্থ যুদ্ধেও কিছু
কিছু যুদ্ধ-মৃত্যুর প্রচলন ছিল, কিন্তু রাবায়ণ ও মহাভারতের
সময়েই ইহার সমগ্রিক উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল। পক্ষপাতবের
হৃদয়েই অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন কুহেলী নামে নর্তকীর
কেন ধারণ করে ক্রিষ্ণ-অজ্ঞানপুর্বে মৃত্যুশিক্ষা দিচ্ছেন।
মহাভারতের সময় পুরুষ-মাত তারকে প্রচলিত হয়।
রাবণ নীতার প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ-পক্ষে দেখে মৃত্যু হয়েছিলেন।

ভারতীয় মৃত্যু কলার মধ্যে এক হল রূপ-ভাঙব ও

লাভ। ভাঙবের দুটি রূপ ‘শেখলি’ ও ‘বহরপ’। শাভেরও
তাই ‘দরিত’ ও ‘বৌবত’। ভারতীয় মৃত্যু অত্যন্ত
অনুষ্ঠানবহুল এবং আগাগোড়াই কলারূপে ও মূল্যবত।
শেখলি মৃত্যু অভিনয় কম, কিন্তু অঙ্গসজ্জা বেশী।



উদয়শঙ্কর

বহরপ ভাবপ্রধান এবং চোখ-মুখের নানারূপ তরঙ্গ
সমাবেশ। কুরিত মৃত্যু আগিলন ও হৃদয় আর বৌবত
ভান-লয়-ভান দ্বারা নিরমিত হয়। আবার ভারতীয়
মৃত্যুর অঙ্গসজ্জা অনেক রকম, শুধু মাথার হেলনই
চকিশ রকম। যেমন, অধোমুখ্য, অকম্পিত, কম্পিত, সম,
অকম্পিত, পরাবৃত, উৎক্লিষ্ট, দোলিত, আলোলিত,
মৌল্য, প্রকম্পিত ইত্যাদি।

(১) সম-বহরপ মৃত্যু নট কিংবা উচিত মর—
অচকস, তখন তাহাকে সম-মৃত্যু কলা হয়। সম-মৃত্যু—

নৃত্যের প্রারম্ভে প্রার্থনা, কাঁধাবিরতি কিংবা প্রণয়ে কপট-
ক্রোধ প্রকাশ করবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(২) অধোমুখ্য—বখন মস্তক নত করা হয়, তাহাকে



নর্তকী

নর্তকী

(শ্রীপুরগচাপন হাট্ট মহালয়ের সৌজন্যে)

অধোমুখ্য বলা হয়। অধোমুখ্য—লজ্জা, ছেঁখ, উদ্বেগ,
মূর্ছা ইত্যাদি ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

দৃষ্টি চল্লিশ রকম। যেমন ধীর,
রোদ্র, তৃপ্ত, ককণ, বিশ্রয়, শঙ্কিত,
শূন্ত, উগ্র, শান্ত, মলিন, স্নান,
মুকুল, কুঞ্চিত, মদির, লজ্জিত, হঠ,
সাঁচী ইত্যাদি।

সাঁচী—চক্ষুর মণি বখন এক
কোণে আনা হয় তখন তাহা
সাঁচী-দৃষ্টি। সাঁচী-দৃষ্টি কোন বিবর
সম্বন্ধে আশ্রিতে কিছু বলা, কোন
কাজ আরম্ভ করা ইত্যাদি আশ্র
প্রকাশ করে।

(২) নিম্নীলিত—অনুনিম্নীলিত
চক্ষুকেই নিম্নীলিত বলা হয়।

নিম্নীলিত দৃষ্টি, প্রার্থনা, ধ্যান, ইত্যাদি ভাব প্রকাশ
করে।

প্রীবার দোলন চার রকম। যেমন, হৃন্দরী, তিরস্মিত,
পরিবর্তিতা এবং প্রকম্পিতা।

প্রকম্পিতা—মুগের তায় পিছনে এবং সামনে দোলন
করার নাম প্রকম্পিতা। প্রকম্পিতা দোলনে ‘তুমি ও
আমি’ এই অমুট মর্দরধ্বনি প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া
মুখের পরিবর্তন চার রকম, জ-বিকার সাতি রকম এবং
বাহ-সঞ্চালন আটাল রকম।

বাহ্যসঞ্চালন, যেমন অঙ্গপতাক, পতাকা, ত্রিপতাকা,
মগর, অরাল, চন্দ্রকলা, মুকুল, ত্রিশূল ইত্যাদি।

বখন উক্ক হস্তের সমভাবে বক্র এবং অঙ্গুলীগুলি
বিস্তৃত থাকে তাহার নাম পতাকা। পতাকা—মেঘ,
বন, নদী, বায়ু, প্রথর সূর্য্যরশ্মি, সমুদ্র, বৎসর, মাস
ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে।

অরাল—গমন পতাকার তর্জ্জনী-অঙ্গুলী বক্র ভাবে
অবস্থান করে তাহাকে অরাল বলা হয়। অরাল—বিপান,
অমৃত এবং বটিকা ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

নৃত্যে ভাবপ্রকাশক অঙ্গুলী-বিন্যাসকে বলা হয় হস্তক।
সংযুক্ত—হস্তক আটত্রিশ রকমের। যেমন—সুচীমুখ্য,
মৃগশীর্ষম, শিখরম, মুকুলম, অঞ্জলি, নিত্যম, লতা, কেশবন্ধ,
নলিনী পদ্মকোষ, বক্রমান, লীনমুক্তা দোল ইত্যাদি।



সাপ্তাহিক নৃত্য

অঙ্গুলি—যখন পতাকা হস্তধর সংযুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় অঙ্গুলি। অঙ্গুলি নয়, নয়দ্বার, বিনয় প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

দোল—যখন পতাকা হস্তধর উরুর উপর স্থাপন করা হয় তখন দোল হস্ত হয়। ইহা নৃত্যের প্রথম ভঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়।

অসংযুক্ত হস্তক ও নৃত্য হস্তক বত্রিশ রকমের। বাঁশী, ধানদুর্কা, বস্ত্র, ফুল ইত্যাদি নিয়ে যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় তাকে বলা হয় চালক। হাতে হাতে, পায়ে পায়ে বা হাত পায়ে যে মিলন তার নাম করণ। করণ ও রেচক সংযুক্ত হয়েই অঙ্গ-হারের সৃষ্টি। এই অঙ্গহারগুলো নৃত্যের মধ্যে প্রধান জিনিষ। অঙ্গহার বত্রিশ রকমের। যেমন—অপরাজিত, ভ্রমর, অলাতক, গতি-মণ্ডল, বৈশাখরেচিত, বিজ্ঞানভাঙ ইত্যাদি। করণ আবার এক শত আট রকমের। যেমন—

লালটিভলক, গলাবতরণ, বলিতরু, সমনঞ্চ, লীন, তটিসম, উর্জ্জাল, নিরুজ্জিত, বলিত, লোলিত, চতুর, ভালবিলসিত, দোলপাদক, সর্পিভ, নিভষ, জনিত, নিবেশ ইত্যাদি।

এই এক শত আটটি করণ নৃত্যে, বুদ্ধে, নিবুদ্ধে সর্বত্রই প্রযুক্ত হবে। আবার যে-সময় হাত নৃত্যে চালনা করা হয়ে থাকে তাকে বলা হয় মাতৃকা। কটিদেশ যখন কর্ণসম এবং বক্ষ উন্নত হ'ব তাকে বলা হয় সৌর্ধব। করণের এই এক শত আটটি ভঙ্গী নৃত্যে প্রধান স্থান অধিকার করে এসেছে। এই করণ সুদৃঢ়তার বৃদ্ধানের অঙ্গই করা হয়ে থাকে। বলিতরুতে হাত দুটি শুকতুণ্ড অবস্থায় ঘুরিয়ে নেওয়া চলবে এবং উরুর দৃঢ় করতে হবে, শুকতুণ্ড আবার ঠিক এইরূপ,

“আভাংমদভা কর্ণা, কুর্কিতোহুই কতখ।

শেখা জিন্নবলিতা হাতা সেহনলং করে।”

বক্ষস্থলে পতাকাঙ্গুলি, হস্তক ও অঙ্গর সংপ্রসারিত এবং

অসংযুক্ত কবিত্ত থাকলে লীনকরণ হয়। নৃত্যের এই অঙ্গবিক্ষেপ ছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ বিধে বিশেষ ভঙ্গী করতে হয়। যেমন—বিহুকে নৃত্যে দেখাত হ'লে ত্রিপতাকা হস্তধরে ধারণ করতে হবে, পার্শ্বভীকে বোঝাতে



নৃত্য—(কুমারী অমলা মল্লী)

হ'লে ডান হাত উঁচু করে অর্ধচন্দ্র এবং বাঁ-হাত নীচু করে অর্ধচন্দ্র ধারণ করতে হয় এবং এই হস্তধর অভয়া ও বরদা ভাবে স্থাপন করতে হয়। এই ভাবে ব্রজা, শিখ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কাঙ্কিকেশ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি প্রত্যেক দেবদেবীকে নৃত্যে দেখাতে হ'লে অন্তর ভাব সন্নিবেশিত করতে হয়।

দশ অবতারের মন্ত, কৃষ্ণ, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বুদ্ধ (বলরাম), কৃষ্ণ এবং কলি প্রভৃতি ভঙ্গীতেও যত্নর ভাবে নৃত্য করতে হয়। যেমন বাঁ-হাত কটিতে এবং অর্ধপতাকা ডান হাতে থাকলে পরশুরাম মনে করতে হবে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কত্রিয়, বৈশ্য, চত্র, সূর্য্য, বৃদ্ধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহ, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা পুত্রকন্যা, ডাই-ভদ্রী ইত্যাদিও বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রত্যেকের ভাব প্রস্ফুট করতে হয়।

ভারতীয় শূভে পদনকালন প্রধান চার ভাগে বিভক্ত।
যথা—বসন্ত, উৎপ্ৰাণন, ভ্রমরী এবং পদচরী। বসন্ত
পদনকালন আবার দশ ভাগে বিভক্ত। যেমন—মোখিত,
প্রেক্ষাণ, প্রেরিত, স্বস্তিক ইত্যাদি।

স্বস্তিক—পদবিক্ষেপে ডান পা বাঁ-পায়ের উপরে স্থাপিত



বসন্ত-শূভা—(স্বামী অহরুণাচার্য)

ক'রে ডান হাত বাঁ-হাতের উপর রাখতে হয়। উৎপ্ৰাণন
পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যেমন—অলঙ্ক, কর্ণদ্বি, মোখিত
ইত্যাদি।

ভ্রমরী পদবিক্ষেপ লাভ ভাগে বিভক্ত। যেমন—উৎপ্ৰাণন,
চক্র, একপদ, কুচিত, অঙ্ক ইত্যাদি।

কুচিত—ইচ্ছিক নির্ভর ক'রে স্বাক্ষরকার নাম কুচিত
ভ্রমরী।

পদচরী আট ভাগে বিভক্ত। যথা—চলন, বিদ্য,
লোলিত ইত্যাদি।

লোলিত—পৃথিবীকে পদস্পর্শ করেও করে না
অথচ পা কীপতে থাকার নাম লোলিত।* ইহা ছাড়া বহু
প্রকার পদ স্থাপন আছে। যেমন—মুগ, হস্তি, অংক,
সিংহ, সর্প, ভেক, বীরোচিত প্রভৃতি। আবার শূভের
উদ্দেশ্য হবে,

“সেবকব্যা প্রভীতো বস্তানমান
মনোহরঃ সবিদ্যা সোহমঃ
বিক্ষেপা নৃত্যমিত্যুচ্যত বুধিঃ
লল্যাস্তিষ্ঠতে বাহ্যঃ
বাহ্যাস্তিষ্ঠতে মনঃ
ললঃ তাল সমায়জঃ
ততো নৃত্য প্রবর্ততে।” (সংগীত দামোদর)

আবার নৃত্য যে করবে সে হবে,

“নৃত্যে নানমরূপেন সিন্ধিন্ চীতায় রূপতঃ
চার্ভবিতান বহুভ্যাং নৃত্যমন্তবিভবনা।”

(সার্কণ্ডের পুত্রাং)

বেহেতু রূপহীনের নৃত্য বিড়ম্বনা। রূপবতীর দেহ
হবে কীর্ণ, মূল্যহীন, এবং নবীন মন হবে
আত্মবিশ্বাসী, প্রহুজ। বাহ্যবস্ত্রের সঙ্গে তাল-লয়-মান
ঠিক রাখবে এবং সুমোহন পরিচ্ছদে ভূষিত হবে তবেই
সে নর্তকী।

“হোলমিত্তবিত্তীর্ণকেনপাশনিবেশিতঃ।
মহিবিলসিত পৃষ্ঠে মনস্ত পুশ্যাবতঃ লবঃ।
বেশী বা লয়লা বীথী নৃত্যজালবিদ্যাজিহিতঃ।
কলিতং পুণ্ডলৈর্ভালং কল্লুরীচল্যনামিনা।
মুচিভং চিত্রকং ভালে মেত্রে স্ববল্লনাজিতে।
উন্নতং কাঞ্চিৎকলে তালপাং ত্রৈ চ কর্ণকোঃ।” ইত্যাদি।

আবার নর্তকীর এই দশটি গুণ থাকতে প্রয়োজন।
সে নৃত্যেতা, ভ্রমরী পদ্ধতিতে অভিনয়, কোমলতা, সোনারী,
সরীতনিপুণা হবে; তার চকু দুটি উজ্জ্বল, চারুকলার
প্রতি একপ্রত্যুৎ সঙ্গুণ থাকে চাই। এই সব গুণ বে-
নর্তকীর মধ্যে আছে তবু সে-ই কামনির্ভরিত কিশিনী পাতে
নৃত্যের প্রারম্ভে পুশ অঙ্গুলি দিয়ে নৃত্য আরম্ভ করতে পারে।
ভারতীয় শিল্পাঙ্গার ভাষাতে যেমন একটি নিজস্ব
অঙ্গার লোকের বিকাশ থেকে পাওয়া যায় সেজন্য ভারতের

* এইগুলি অঙ্গরক বিদ্যা শিল্পশাস্ত্রের উপর সম্পাদিত
অন্বিত্যের-বিভাজিত ‘কলিঙ্গ-সর্পদ’ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই নৃত্যও ভাবপ্রধান। ভারতের এই যুগে নৃত্যকলায় চর্চা প্রায় ঘরে ঘরেই হ'ত, জীবনের অজান্তে নানারূপ অর্থবাদের সঙ্গে ইহা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল। এরই কলে ভারতে নৃত্যের চরম উন্নতি হয়।

আজকাল যখন গণিকাদের স্থান সমাজের নিম্নতরে, তখন ছিল এর বিপরীত। বাৎস্যায়ন বলেন যে খ্রী-সম্রাটের মধ্যে যে-সব কলাবিদ্যা আবদ্ধ হয়ে আছে সেগুলি জেমে নেবার জন্তেই গণিকাদের গোষ্ঠীতে স্থান দেওয়া উচিত। 'গোষ্ঠী সমবায়ের প্রধান অঙ্গ ছিল গণিকা। কারণ তারা নৃত্যবিদ্যার বিশেষ পারদর্শী ছিল এবং তাদের নৃত্য ও কলানৈপুণ্য দেখার জন্তে তাদের ঘরে বাওয়া একটা সামাজিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহর্ষি দত্তক অনেক দিন গণিকাদের ঘরে থেকে তাদের বৃত্তিরহস্ত ও সাংস্কারিক কলানৈপুণ্য নিজে আয়ত্ত করেছিলেন। এমন কি বৌদ্ধ যুগে মহারাজ অশোক যখন দেশভ্রমণে যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে এক বিরাট গণিকাবাহিনী থাকত।

মরণ যখন মানুষের আসে তখন না-কি চার দিক থেকেই আসতে শুরু করে দেয়। ভারতের জীবনমুখ্য যতই ঘনিষ্ঠে আসতে লাগল ততই তার দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, কলা দীর্ঘে দীর্ঘে ভঙ্গসাজের হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের

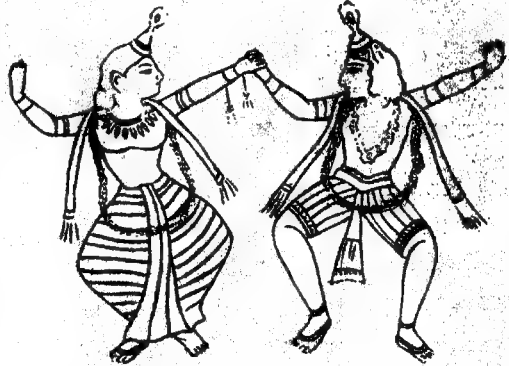


নটরাজ

বিষয়, এই অধ্যাপকের যুগেও কলকাতার উৎসব ভারতের জনসাধারণ বহুল পরিমাণে ক'রে আসছিল। শিব কবচিন থেকেই ভারতের নৃত্যের আসর থেকে উঠে গাড়িলেন, কিন্তু এই কলকাতা ভাঙতে দেবে নাই। কীর্ঘ-ব্রতিত 'রত্নাকরী' নাটকে কলকাতার কবচিন থেকেই কলকাতা

পারা যায় যে, কত প্রাচীন যুগ থেকেই কলকাতা এইরূপ উৎকর্ষ লাভ ক'রে আসছিল।

"কেহ নৃত্য করিতে করিতে পিতৃকীর্তির অল ঢুকিয়া ঘরিতেছে, কেহ তাঁর শিখিল দেহ লইয়া পাঁছে ঘোল



রাস-নৃত্যে রাধাকৃষ্ণ

খাইতেছে, কেহ কেহ আবার নৃত্যে মাতাযাতি হুক করিয়াছে—কাহারও খোঁশা এলোমেলো, পারের নৃসর নৃত্যের ভালে ভালে এদিকে-সেদিকে গুন গুন শব্দে ছিটকাইয়া পড়িল। কিছুই আজ লক্ষ্য নাই, নৃত্যে তারা মাতোরাই, ক্রমাগত বৌদ্ধশাসন দেখে গলায় হার বকের 'পর আছড়াইয়া পড়িল।"

কিন্তু পৌরাণিক আখ্যানের অধিকাংশ রূপসাহসী ভারতের পরবর্তীকালে যে দীর্ঘে দীর্ঘে লোপ পেতে বসেছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে ভারতের ইতিহাসে বৈদেশিক রাজাদের বার-বার আক্রমণে ভারতকে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে, প্রায় পাঁচ শত বৎসর শুধু নৃত্যকলা নর কোন দিকেরই অনুশীলন ঘোটেই হ'তে পারে নি।

তার পর মোগল-রাজত্বের সময় মুসলমানী নাচ হুক পড়ে। মোগল-রাজত্বের সময় নৃত্যের ক্ষয়-ক্ষয় একেবারে দূর হ'লেও, মোগল সম্রাটগণ চাককলার চর্চায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। মোগল আমলে সঙ্গীত ইত্যাদির ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, কিন্তু নৃত্য-সম্বন্ধে এরূপ কিছু বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে মোগল

আমাদের খুব মূল্যবান জলভ করে। খানি বুতোর ছবি প্রকৃতির শ্রীকৃষ্ণ পুরণটান নানার মহাশয়ের নিকট আছে। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময় বুতাকলা খুব পিছনে পড়ে। সে এসে ইটালি বাহির চাকটিকো, মাস্তুরের মন ডালানোর জন্তে।

দিনের পর দিন দেশ যখন এলোমেলো, তখন বাংলায় শ্রীচৈতন্যমহোদয়ের জন্ম হ'ল। তিনি সারা বাংলার মাঠে ঘাটে বইয়ে দিলেন এক নতুন আবহাওয়া, সহজধারার দিলেন প্রাণ মাতিয়ে। ভাগবতের মনুই ছিল,

“যো বুতাকি প্রকটায়। তাইব বহুভুক্তিতঃ
স নির্গতঃ পাশানি ক্রান্তায় শতধ্বনি।”

এই বৈকুণ্ঠলক নৃত্য দেখতে পাই বাউল, কীর্তন, ভাগের গান, ধামারী, শ্লোকনৃত্য, কুমুর, ইত্যাদি। কুমুর চার ভাগে বিভক্ত, ব্রজলীলা, আগম (ভবানী বিষয়ক), লহর (কৌতুক), খেউড় (অঙ্গীল)। তার পর সৃষ্টি হ'ল কুশল, গভীরী ইত্যাদি গান ও নাচ। অতীত এই সব গান ও নাচকে পল্লী-নৃত্য ও গীত এবং মেয়েদের সংক্রান্ত ব্যাপারকে বলা হয় ব্রজ নৃত্য ও ব্রজকথা।

পল্লী-নৃত্যে আজকাল কোন কোন গানের সঙ্গে নাচ আছে। ভবানী নাচ আছে গান নাই। সব গানেরই একটি নিজের রূপ ও একটি ধারা আছে, সব গানের লক্ষে সব নাচ কিংবা সব নাচের সঙ্গে সব গান ঘেঁষে নাই। ভবানীর বক্রবিরাগী বাউল বুয়ে বুয়ে নেচে বলে,

আমার জন্মের কথা বলব কোথা
শোনয়ে ও ভাই সকল।
এ কালের আগম দিগম কেউ জানে না রে
আমি জানি ভাই ভেবে হ'লান পাগল।
এসেছিলি খানি হাতে
এ কালের আসে কলী হলি রে।
তোমার জানা বাওয়া সমান হ'ল।
হলি দিনে কাশা মিছে তোমার ভুলান
সাধের জনম বুঝাই দিগি রে
টানলে টুকলে তোমার বসন্তলে না
হয়েছিল অতল।
কারগার বলে হ'লে চড়ে
ভাই দেখে পাগল। কানাই হেসে মরে
তরে নেচে নেচে আপন মনে
দেখলি না রূপ দেখার করে
ও ভাই সকল।

(নবীলতা গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

“সুখা নাচে চক্রে নাচে আঁধা নাচে তারা
পাতালে বাহুরী নাচে বলি শোর গোর।”

বৈকুণ্ঠ যুগে পুরাণের ঘটনাবলী নিয়ে বুতোর প্রচলন হয়েছিল দেখতে পাই নশ অবতারের নৃত্য—
যাহা আজও প্রচলিত। ‘কুমুর’ নৃত্য বহুধা বিভক্ত।
বোধ হয় কুমুর কুমুর শব্দ থেকেই ‘কুমুর’-নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ‘কুমুর’ নৃত্য থেকে বাংলা দেশে বহু নৃত্য ও গীত প্রচলিত হয়েছিল—আবার কুমুর নামে একটি সুর হ'তেও ‘কুমুর’-নৃত্যের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন,

“মন মোহন হেরি মাতল মনসিজ
বুতী যুগলত গায়ত ‘কুমুর’।” (পদকল্পিত)

কিংবা

“চরণে চরণ বেড়া জিতল হইয়া
কুমারী গায়িত জাম দানরা বাজাইয়া।”

আমাদের অনেকের ধারণা পুরুষ ও নারীর একসঙ্গে নৃত্য করা পাশ্চাত্য দেশের সৃষ্টি; কিন্তু আমাদের দেশেও প্রাচীন কাল থেকেই পুরুষ-প্রকৃতির, শিবভাবানীর, কুমারী-রাধার যুগলনৃত্য স্বক হয়েছিল। বৈকুণ্ঠ যুগেও দেখতে পাই,

যতক গোপিনী আছিল তত হৈল কাণ্ড
নাচিতে লাগিল সব ঊগমভ ভর
পায়ের নেপুয় বাজে হাতের কড়ণ
মধুর বাঁশরী বাজায় মদনমোহন
নাচিতে নাচিতে গুঠে পায়ের তরল
পতীর শব্দে বাজে ইন্দের মূলক
জুবন ভরিয়া গেল এ রসের গানে
ভাঙিল শিবের ধ্যান উঠে দেকী মনে
পাকস্থলে গান গায় ভবক বাজায়
নাচে দিব ঠ্যান দিয়া ভবানীর গায়।

বৈকুণ্ঠ-যুগে দেৱেন্দ্রের ব্রজনৃত্য ও ব্রজকথা ছাড়াও তাদের জীবনকে যুর ও কুমুর করে গড়ে তোলবার জন্তে বহু ছড়া, পাখা ও নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিবাহিত জীবনে বাংলা দেশে পরিণয়-উৎসবে যে নৃত্যগীত হয়ে থাকে তা সর্বজনবিদিত। ওই বাংলার নর, ভারতের অন্যান্য দেশেও লোকনৃত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন গুজরাতি নৃত্য, ও ব্রজদেশের নৃত্য। বাংলার বরণ-নৃত্যের খুব উৎকর্ষ হয়, বরণের ভঙ্গীর তালে তালে মেয়েরা বলে ওঠেন,

কি কুশ বয়েসো ও হামের মোহামিনী।
প্রমোদী বরণ বয়ে

হাতের কড়মকি কয়েলো
কি বরণ বয়েলো ও রামের সোহাগিনী।
সোহাগী বরণ বয়ে
হেলকে দুলে মাজ পড়েলো
কি বরণ বয়েলো ও রামের সোহাগিনী।
সোহাগী বরণ বয়ে
পলায় হায় উলমল করে,
নুখেতে মধুর হাসি
দশনেতে খেলো দাঁহিলীলো
কি বরণ বয়েলো ও রামের সোহাগিনী।
সোহাগী বরণ বয়ে
বুকের কাপড় খসে পড়ে
পুটেতে খোপা পোলে
পায়ের নুপুর খসে পড়েলো
কি বরণ বয়েলো ও রামের সোহাগিনী।

(দলিচাগাম থেকে সংগৃহীত)

প্রথম বাঙালী নৃত্যকে প্রকার চোখে দেখলেন,
ঐক্যানন্দ কেশবচন্দ্র। তাঁর ‘নবজন্মানন্দ’ নাটকে নৃত্যের
স্থান অতি উচুে ছিল। তার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চোখের
দেখা দেখলেন না, তার প্রচলন শুরু করে দিলেন তাঁর
শান্তিনিকেতনে। বর্তমানে উদয়শঙ্কর ও তিমিরবরণের।
প্রভাবে দেশে নৃত্যের একটা নবজাগরণ শুরু হয়েছে।
উদয়শঙ্করের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত কুমারী অমলা, নন্দীও
কলিকাতার কোন-একটি বিশিষ্ট অঙ্কঠানে নৃত্য শিক্ষা
দিচ্ছেন।*

* এই প্রবন্ধের সাঁওতাল নৃত্য, প্রথম-নৃত্য হবি ছবানি শিল্পী
শ্রীকুমারজ্ঞান চৌধুরী কর্তৃক অঙ্কিত।

আলোচনা

“অম্পৃশ্যতা”

কুমার সত্যজিৎ দাশ খুলনা হইতে লিখিয়াছেন :—গত আশাঢ়
সংখ্যা প্রকাশীতে শ্রীযুক্ত শশধর দাস ‘অম্পৃশ্যতা’ নামক প্রবন্ধে
লিখিয়াছেন যে, বাকুই জাতি পূর্বে সর্বত্র অচল ছিল, বর্তমানে সর্বত্রই
গাচরগীর হইয়াছে।

বাংলাদেশে বস্তুতঃ দুই জাতি আছে বলা যায়—ব্রাহ্মণ ও শূত্র।
শূত্রের কতিপয় জাতি জল-চল, কতিপয় জল-অচল। বাকুজীবী জাতি
কখনই কোথাও জল-অচল শূত্র নহে। তাহার দিক দিয়া এ-কথা
বলিতে পারি যে বাকুজীবী জাতি অবিসংবাদিত ভাবে সবশাখ বলিয়া
সর্বত্রই পরিগণিত এবং সবশাখ জল-চল-শূত্র। আচারে, ব্যবহারে,
ধর্মে ও কর্মে বাকুজীবী জাতি হিন্দুসমাজের প্রচলিত সমাজ-সংহাসে
জল-চলের সমান পাইতেছেন, তাকে জল-অচল বলিলে তাহার
অবমাননা করা হয়।

“পরলোকে পুরুলিয়ার হরিপদ দাঁ”

‘হরিপদ সাহিত্য-মন্দির’র ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত হুবোধ্যকুমার
দেন জানাইয়াছেন :—

বর্তমান ভাদ্র মাসের প্রকাশীতে পুরুলিয়ার ‘হরিপদ দাঁ’ মহাশয়ের
সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়টির
উল্লেখ থাকা উচিত ছিল—

গত ১৩৩১ সালে হরিপদ দাঁ মহাশয় পুস্তকাগারটি নিজ ব্যয়ে নির্মাণ
করিয়া দেন এবং সাধারণ পাঠাগার গৃহটি কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপন ব্যয়ে তাহার ভূতপূর্ব সঙ্গীণা দেবীর
স্মৃতি রক্ষার্থ গত ১৩৩০ সালে প্রস্তুত করিয়া দেন। সেই কারণে
পুস্তকাগারের নাম “হরিপদ-সাহিত্য-মন্দির”, ও “সাধারণ পাঠাগার” গৃহে
“দলীলা দেবীর-স্মৃতি” নামক একটি প্রস্তর কলক সংলগ্ন রাখিয়াছে।



স্পষ্ট কথা

প্রথম নাথ রায়চৌধুরী

ওগো-ও সন্ন্যাস-ব্রাহ্মী,
দেবতার দেওয়া মুকুট যে নেভেয়া—
বাঁজাও হর সাজা!
তুচ্ছ-বাই-রোগী, হুঁতের ব্যক্তি
আর তুচ্ছ নো!—‘হেথি’ বৈগতিক
নাগের শত্রু, জীবাণু আত্মনিক

হল-ইতিহাস অতীতের!
দেশটা বাঁচাবে পতিতের?

কুসংস্কার ধারে!
কুসংস্কারী অন্ধের আঁখি,
কুসংস্কার অন্ধকারে।
কেন গানি চির-অপবশের
সব বয়সী সারা দেশের।
ভাবি যে বহু দিন-শেষের—

স্বাধীন-মানসে ঋণ
অস্বস্তি-তারাই হীন!

দোষের সহস্র যোগ
পুরুষেরই বেলা! নারী নিয়ে কেলা?
শিল্পী-বোঝে তার বিলোপ!

অবলা নাম-ত কিনেছ তের,
বাড়ালে অভ্যাচারেরই জের
তুমি যে মুক্তি শক্তি দেশের
যদি নিজ মুক্তি ধর
দানবে মানব কর!

চেতন, না অচেতন?
হাসি পার রোষে, সহিছ কি দোষে
অপমান-অপহরণ?
বোচকা-পুটলী পরের অধীন—
নও যে তুমি,—দেখাবে যে দিন,
হাতে হাতে শোধ পীড়নের ঋণ!—
সেই-ত তোমার রূপ!
পশুর কহুর চূপ!

আত্মবাস্তবী দল!
ভাঙাবে মান পারে ধরে আজ
কবির অশ্রু-জল!
ভাত-কাপড়ের অলীক-মালিক তোরে
রূপ-বোকা ভব-বোতুক ধরে
মের ছুটি, বাও নিজ পারে ভর করে
বাঁকো, কত কাজ শত থাকে!
যরে তেখে, কেউ যরে ভাতে!

চিত্র-পরিচয়

শিবাজী ও কল্যাণক বসিকী

কল্যাণক বসিকী আত্মজীবনী লেখক।
শিবাজী কল্যাণক বসিকীর পুত্র।
শিবাজী কল্যাণক বসিকীর পুত্র।
শিবাজী কল্যাণক বসিকীর পুত্র।
শিবাজী কল্যাণক বসিকীর পুত্র।
শিবাজী কল্যাণক বসিকীর পুত্র।
শিবাজী কল্যাণক বসিকীর পুত্র।
শিবাজী কল্যাণক বসিকীর পুত্র।

শিবাজী প্রেরণ করেন। তরুণী সৌন্দর্য শিবাজীর কবরে
অপূর্ণ ভাবের লকার করিল। শিবাজী বলিয়া উঠিলেন—
আমার মাতা যদি তোমার মাতা রূপবতী হইতেন তবে
শিবাজী রূপবান হইতাম।

কল্যাণক বসিকীর আশ্রয়িত করিয়া শিবাজী প্রচুর
উৎসাহিতকর এই কল্যাণক বসিকীকে প্রেরণ করেন।

বহির্জগৎ

জাপানে মহিলা প্রগতি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহিলারা শিকা-বীক্ষার পুরুষের জায়
অগ্রসর হইতেছে। পরিবারের গভীর ভিতরে তাহাদের কার্য এখন
আবদ্ধ নয়। সমাজ-সেবার বিভিন্ন বিভাগে তাহা বিস্তৃতি লাভ
করিতেছে। জাপান বর্তমান জগতের অগ্রতম প্রধান রাষ্ট্র। সে দেশের
নারীগণও কর্মের নানা ক্ষেত্রে যোগদান করিতেছে।



জাপানী মহিলা পূজা-নিবেদন করিতে
মন্দিরে গমন করিতেছেন।

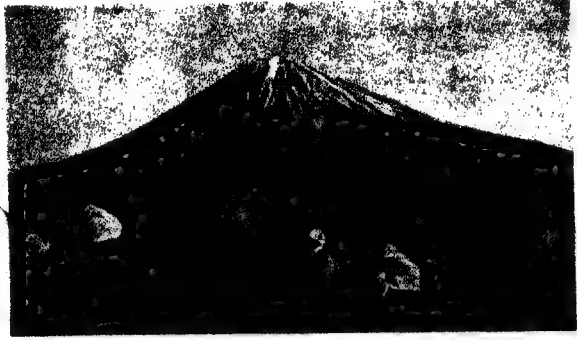
জাপানী মহিলারা নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিলেও তাগাহের
সহজ বৈশিষ্ট্যগুলি এখনও সম্পূর্ণ অবাহিত আছে। জাপানী মহিলা
পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়কেই সমান সম্মানের চক্ষে দেখে। তাহার
মত পিতৃভক্ত, পতিভক্ত নারী অস্ত্রের বিরল। সন্তান-প্রতিপালনেও
তাহার সমধিক আগ্রহ। মহাদুগের মত বর্তমানেও জাপানী মহিলা
পরিবারের অধ্যাক্ষ। অল্প পরিবার জন্ম দাতা পণ্যের স্বরণ করিয়া
থাকে।



কুমারী এম্. নিম্পো লস্ এনজেলোসের বিশ্ব-অলিম্পিক ক্রীড়ার বর্ষা
ছোড়া প্রতিযোগিতার চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন।



কুমারী এইচ. মিহাতা লস্ এনজেলোসের বিশ্ব-অলিম্পিক ক্রীড়ার
সস্তরণ-প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।



মুজি পর্বতে জাপানী বালিকার। চায়ের পাতা তুলিতেছে।



উচ্চাঙ্গের (১৯৫৪-১৮-৩) স্মৃতি-জাপানী জেনেরী (কাঠ খোদাই)।

জাপানী নারীগণকে রীতিমত গৃহস্থালী শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা গৃহমধ্যেই আবদ্ধ থাকেন না। তাহারা গৃহের বাহিরে নানা অমস্যাধ কার্যেও লিপ্ত হয়। জাপানী কৃষক কুলবধুরা চাষ-আবাদের সময় ভোজ্য হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ক্ষেত্রে কার্য করে। সেখানকার কতকগুলি কার্যে পুরুষের অপেক্ষা নারী পরিশ্রম করে বেশী। জাপানী জেনেরীরা সমুদ্রে ডুব দিয়া মণি-মুক্তা আহরণ করে। এই কার্য তাহাদের একরূপ একচেটিয়া।

প্রাচীন কালের ভারতীয় মহিলারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করিত। অন্ততঃ হাজার বছর পুর্বেকার জাপানী মহিলারাও সে এইরূপ বিদ্যার চর্চা করিত তাহার নিদর্শন আছে। সে-সুগে রাজপ্রাসাদে মহিলা কর্মচারী নিযুক্ত হইত। মহিলারা শুধু কেবলমুদ্রিত করিয়াই কাজ হইত না,

প্রাসাদের দৈনন্দিন ঘটনাবলী—রাজা-রানী কি বলিতেন করিতেন সকলই তাহারা লিখিয়া রাখিত। এই সকল কাহিনী এখন বড়ই আদরের সামগ্রী। একজিহ্ব ছত্র পরিসিত ‘গুয়াকা’ কবিতা রচনায়ও সে-সুগের মহিলারা সিদ্ধহস্ত ছিল। খ্রী-পুরুষের মধ্যে এই কবিতার আদান-প্রদান হইত। রাজ-মহাবীরের মহিলারা সকলেই কবি। এই সকল রোজ-রামচা, কবিতা ও কাহিনীর কতকাংশ মাস এখন পাওয়া যায়। ইহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ সেকালের পুরুষের রচনা অপেক্ষা মোটেই নিকৃষ্ট নয়। সে-সুগের দুরাসাকী শিকিবুর ‘গেঞ্জী কাহিনী’ এবং শিশোনাগনের ‘মাকুরানোসেনী’ নামক সংকলন-পুস্তক জাপানী সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

নাটকের অভিনয়েও ইহারা কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। চ/৩

শতাব্দী পূর্বে ইজু-মো-মো-ওকুনি নামে এক অভিনেত্রী ছিল। 'ওকুনি কাব্যিক' অভিনয়ে ইহার বেশ সুনাম হয়। জাপানের বর্তমান 'কাব্যিক' অভিনয় 'ওকুনি কাব্যিক' হইতে উদ্ভূত।

জাপানী মহিলার শারীরিক শক্তির আভাস ঈশপুর্নকট পাইয়াছি। ঈমানঃ ইহাদের শরীর চর্চার কথাও প্রকাশ পাইয়াছে। কুমারী

হিতোমি ও কুমারী মিহোতার কথা সকলেরই অজ্ঞ-বিশ্বস্ত জানা। হিতোমি এক জন প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি এখন পরলোকে। কুমারী মিহোতা সম্ভরণে বহু বিদেশী সম্ভরণ-ধীরকেও হারাইয়া দিয়াছেন। জাপানী নারীরা জুজুৎসু ও অন্তর্বিধ ক্রীড়া-কৌতুকের চর্চা বহুদিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। আমরা সম্প্রতি তাহা সবিশেষ জানিতে পারিয়াছি।

টোকিও বৌদ্ধ মহাসম্মেলন

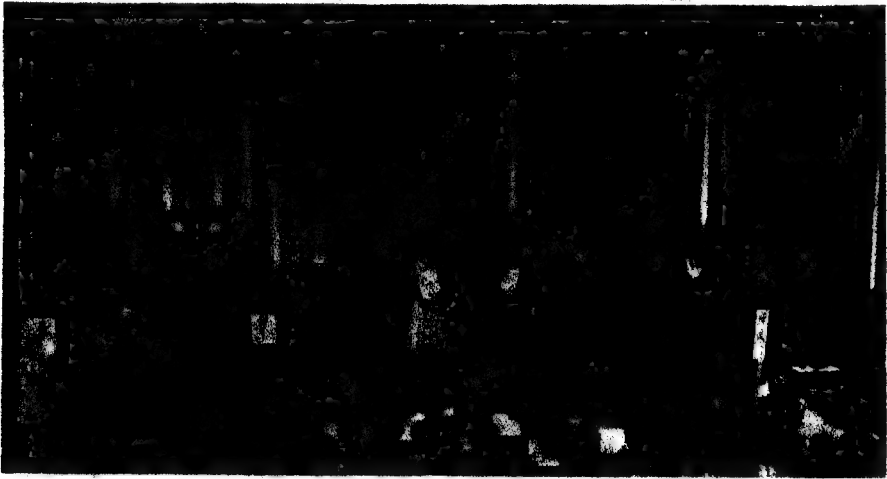
গত ১৮ই জুলাই হইতে ২৫ই জুলাই পর্যন্ত আপানের টোকিও নগরে বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধগণের এক মহাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে অনানু সাত শত প্রতিনিধি সমবেত হন। ভারতবর্ষের

শ্রদ্ধ হইতেও দুই জন প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করেন। সম্মেলন সম্পর্কীয় তিরখানি চিত্র এখানে দেওয়া হইল।



জাপানী মহিলারা নৃত্য-গীত-সহকারে বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের বিদেশী প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিতেছেন।





- ১। বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের উদ্বোধন-উৎসব।
- ২। সম্মেলন-সভাপতি



রাজস্ব সম্বন্ধে বঙ্গের প্রতি অবিচার

বাংলা দেশে যত রাজস্ব আদায় হয়, তাহার অধিকাংশ—মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশ—ভারত-গবন্মেণ্টে গ্রহণ করেন এক তাহা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে স্থিত প্রদেশসমূহে ব্যয় করেন। প্রথমতঃ, বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের এত অধিক অংশ ভারত-গবন্মেণ্টের লওয়া অসুচিত, এক দ্বিতীয়তঃ, তাহা লইয়া যে-যে বিভাগে ও যে-যে প্রকারে তাহা ব্যয়িত হয় তাহা হইতে পরোক্ষভাবে বাঙালীদিগকে বঞ্চিত রাখা অসুচিত। ভারত-গবন্মেণ্টের সর্বপ্রধান ব্যয় সামরিক। সৈন্তদলে এবং সৈন্তদের অহুচরদের মধ্যে বাঙালী নাই বলিলেই হয়। সুতরাং তাহাদের বেতন বাবতে প্রদত্ত সরকারী টাকার কোন অংশ বঙ্গে আসে না বলিলেই হয়। সৈন্তদলের জন্ত নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম পোষাক ইত্যাদি ক্রয় করিতে গবন্মেণ্টের অনেক টাকা খরচ হয়। এই সকল জিনিষ বঙ্গে প্রস্তুত করান হয় না। সুতরাং সেদিক দিয়াও বাংলা দেশ লাভবান হয় না। বদিও আমরা ইহা স্বীকার করি না, যে, বরাবর বাঙালীদিগকে সৈন্তদলে লইলে তাহারা যুদ্ধ করিতে পারিত না, তথাপি যদি ইহা মানিয়া লওয়া যায়, যে, বাঙালী রণনিপুণ নহে, তাহা হইলেও বাঙালীকে সামরিক এইরূপ অনেক বিভাগে কাজ দেওয়া যায়, যুদ্ধ করা যে-সকল বিভাগের কর্মচারীদের প্রধান কাজ নহে। যেমন, হিসাব বিভাগ, নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক বিভাগ, রসদসংগ্রহ ও কটন বিভাগ, এবং নানা প্রকার কেরানীর কাজ। গবন্মেণ্ট কোন প্রদেশের বা ধর্মের লোকদিগকে বিশেষ অগ্রগ্রহ করিয়া অন্যান্য প্রদেশের ও ধর্মের লোকদের প্রতি অবিচার করুন, ইহা আমরা চাই না। কিন্তু এক্ষণে দাবি ত্রাসজনক, যে, কোন প্রদেশের প্রতি কোন দিকে ও কোন প্রকারে অবিচার হইয়া থাকিলে ও

হইতে থাকিলে, অল্প দিকে ও অল্প প্রকারে সেই অবিচার-জনিত ক্ষতি পূরণ করা হউক। সেই জন্ত আমরা বলি, ভারত-গবন্মেণ্টকে বাংলা দেশের গবন্মেণ্টের বলা উচিত, সামরিক বিভাগের জন্ত আবশ্যক জিনিষপত্র যথাসম্ভব বাংলা দেশে প্রস্তুত করান ও বাংলা দেশ হইতে সংগ্রহ করা হউক, সামরিক হিসাব বিভাগ, নানা বৈজ্ঞানিক বিভাগ, রসদ-সংগ্রহ ও কটন বিভাগ প্রভৃতিতে এরূপ বাঙালীদিগকে নিযুক্ত করা হউক যাহারা অল্প দেশ বা প্রদেশের প্রার্থীদের সমকক্ষ বা তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।

সামরিক ব্যয় বড় বড় বর্ষের মধ্যে ভারত-গবন্মেণ্টের আরও নানা রকম ব্যয় আছে যাহা হইতে বাংলা দেশ লাভবান হয় না। সেই সব ব্যয়ের বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক, এবং কি করিলে বাংলা দেশ ও বাঙালী লাভবান হইতে পারে, তাহারও পথ এই সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা প্রদর্শন করিলে ভাল হয়।

মহিলা “বেদতীর্থ”

বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সংস্কৃতপরীক্ষামানদান-পরিষদের গত অধিবেশনে, অর্থাৎ চলিত কথায়, সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে উপাধিদানের সভায়, সভাপতি মাননীয় বিচারপতি মনোমোহন মুখোপাধ্যায় স্রীঃ সংস্কৃত অভিভাষণে বলেন,

“এতদস্মাৎ বঃঐন্দ্ৰিয় মহৎগৌরবকারণং জাতং যদেকং ব্রাহ্মণকুমারঃ সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়স্থগবেষণাবিশিষ্টাঙ্গীমাস্ত্রবাসিনী ‘বেদতীঃ’ উপাধিঃ সমলভত। ইতঃ প্রাক্ কল্যাণি কাণ্ডিনী মহিলা পত্নীকাং অনেনোপাধিা নৈব ভূষিতাস্তবৎ।”

“এই বৎসর আমাদের এই মহৎ গৌরবের কারণ হইয়াছে, যে, সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়ের গবেষণাবিশিষ্টাঙ্গী হইয়া ব্রাহ্মণকুমারী ‘বেদতীর্থ’ উপাধিতে সমলভতা হইয়াছেন। ই কখনও কোন মহিলা পত্নীকারিণী এই উপাধির দ্বারা নাই।”

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ইংরেজী অভিভাষণে অধিকন্তু বলেন, যে, ছাত্রীটি অক্সফোর্ডে উক্তর অব কিলসকি (“দর্শনাচার্য”) উপাধি লাভের জন্য ইংলণ্ডে যাইতেছেন এবং তন্নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “বোম্ব ভ্রমণবৃত্তি”



শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী

চারি হাজার টাকা পাইয়াছেন; মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই বৃত্তি পাইয়াছেন।

এই মহিলা শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, এম্, এ। ইনি ইংরেজী ও সংস্কৃত এই দুই বিষয়ে এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং “শাস্ত্রী” উপাধি লাভের জন্য বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত অর্থশীলনে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক এক শত টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। তিনি গৌরব বিধবী, সর্বপ্রকার গৃহকর্মে নিপুণ। পিতা স্বর্ণগত আচার্য্যের স্ত্রী হইয়া বহুবর্ষব্যাপী পীড়িত কন্যার সেবা করিয়া ভক্তি রসগতরসে পত্রাবলি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অতুলপ্রসাদ সেন

লক্ষ্মীপুর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে অযোধ্যা, আগ্রা-অযোধ্যা, ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ বিশেষ কতিপয় হইয়াছে। তিনি বাংলা দেশে ক্রমগ্রহণ করিয়া ও শিক্ষালাভ করিয়া পরে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাতে গান। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পর দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করেন। পরে তিনি লক্ষ্মী চীফ কোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে গান। কালক্রমে তিনি তথাকার প্রধান আইনজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হন, এবং সেখানকার বার-এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। লক্ষ্মীতেই তিনি স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করেন। যে রাস্তায় তিনি বাড়ি করেন, লক্ষ্মী মিউনিসিপালিটি তাঁহার সম্মানার্থ তাহার নাম রাখেন অতুলপ্রসাদ রোড। তিনি প্রকৃত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, দানও তদ্রূপ করিতেন। কোনও সংকল্পের আবেদন, কোন বিপদের প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি ধনী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন নাই।

আইনজ্ঞান ও প্রচুর অর্থ উপার্জনের জন্যই যে তিনি লক্ষ্মীতে সম্মান পাইতেন তাহা নহে, তিনি লক্ষ্মীপুরের প্রধান নাগরিক (“First Citizen”) বলিয়া স্বীকৃত হইতেন (এবং মৃত্যুর পর বহু শোকসভায় এই নামে অভিহিত হইয়াছেন) এই জন্য, যে, তিনি মাহুয়াটি অতি সজদয়, অমারিক, সজ্জন, বিদ্বান, সমুদয় হিতপ্রচেষ্টার ও সকল সদহতানের সহায় এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা অভাব ছিল না, শত্রু কেহ ছিল না। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে উদারনৈতিক ছিলেন, এবং সমগ্রভারতীয় উদারনৈতিক সংঘের এক অধিবেশনের সভাপতি, আগ্রা-অযোধ্যার প্রাদেশিক উদারনৈতিক সভার সভাপতি এবং উক্ত প্রদেশের উদারনৈতিক কনফারেন্সের দুই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি খ্যাতি “স্বদেশী” ছিলেন এবং স্বদেশী ব্যবহার ব্যবহার বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন।

শিক্ষাবিস্তারকারী তাঁহার প্রিয় ছিল। লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

তাহাকে উহার ভাই-চাচাভায়েদের পদ দিবার প্রস্তাব হয়। তিনি তাহা গ্রহণ না-করিয়া উক্ত রঘুনাথ পুরুষোত্তম পুরস্কারে উহা দিতে বলেন। তদনুসারে পরাজ্ঞাপো মহাশয় উহাতে নিযুক্ত হন।

তিনি যেমন আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশকে নিজের বাসভূমি করিয়াছিলেন, তথাকার লোকেরাও তেমনি তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্পদিকে তিনি আবার সেই প্রদেশের প্রবাসী বাঙালীদের এক জন নেতা ও লক্ষ্যের বাঙালীদের নেতা ছিলেন। তাঁহাদের সব সামাজিক কাজে, সব সংস্কৃতিমূলক কাজে, বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদে, শিক্ষায় তাঁহারা তাঁহার সহযোগিতা লাভ করিতেন। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের তিনি অত্যন্ত প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, এবং ইহার দুই অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রবাসী বাঙালীদের মাসিকপত্র ‘উত্তরা’র তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মধ্যে তাঁহার স্থিতি ভাগ্যকর থাকিবে গানরচয়িতা, সুগায়ক, এবং কবি বলিয়া। তিনি প্রাণের গভীর আবেগে গান ও কবিতা রচনা করিতেন, এবং তিনি যে গান করিতেন তাহাতে তাঁহার প্রাণের ও মর্ম্মবেদনার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার গান ও কবিতার “কাকলী” “কয়েকটি গান” ও “গীতিকুঁড়” এই তিনখানি বহি মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার অনেকগুলি গান বাঙালী সমাজে সুপরিচিত। তাহার দুই একটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। এগুলি “জাতীয়-সঙ্গীত”-শ্রেণীর। একটি এই:—

হও ধরমেতে বীর, হও করমেতে বীর,
হও উল্লসিত, নাহি ভয়।
তুলি জেদান্তে জ্ঞান, হও সবে আশ্রয়ান,
সাথে আছে ভগবান—হবে জয়।
তেত্রিশ কোটি মোরা, নহি কভু কণি,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা ইন,
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে হমিন;
ঐ দেখ প্রভাত উদয়।
নানা ভাব, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে বেশ মিলন মহান;
দেখিরা ভারতে মহাভারতের উদ্যান, জগজন মাসিবে বিনয়;
ভার বিরাজিত বাহর করে, বির পরাজিত ভাদেয় করে,
নানা কভু নাহি ঋণে ডরে, সত্যের নাহি পরাজয়।

আর একটি এইরূপ—

বল বল বল সবে, শত বীণা বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে;
কর্মে মহান হবে, ধর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিয়ে আবার পুরাতন এ পুরবে।



অতুলপ্রসাদ সেন

আজো গিরিরাজ র যছে প্রহর',
মিষি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায় গজা গোদাবরী,
এখনো অমৃতবাহিনী,
প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহাবন, প্রতি জনপদ,
তীর্থ অগণন,
বহিছে গৌরবাহিনী।
বিহুবা মৈত্রী, কপা, লালাবতী,
সতী, মাধবী, সীতা, অরুণভা,
বহু বীরবাল্য বীরেন্দ্রপ্রহতি,
আমরা তাদেরি সন্ততি,
অনলে দহিয়া দ্বারা রাখে মান,

পতিপুত্র তরে হুণে ভাজে প্রাণ,

আমরা তাদের সম্বতি ।

নিম্নোক্ত তৃতীয় গানটি খুব বেশী সভাসমিতিতে গীত
হইয়া থাকে ।

উঠগো ভারতলক্ষী, উঠ আদি জগতজনপূজা,

হুংসংকল্প সব নাশি কর দূরিত ভারতলক্ষা,

ছাড়াগো চান্দ শোভাসঙ্গ কল্প সজ্জা,

পূনঃ সঙ্গ করি সঙ্গীত হুংসংকল্প,

জননীগো হই তুলে তব,

সাম্রাজ্যবাস দেহ তুলে চক্ষে,

কাঁচিছ তব চরণতলে,

সিংগতি কোটি নরনারীগো ।

কাণ্ডারী নাহিক কমলা

দুখলক্ষিত ভারতবর্ষে,

শক্তি মোহা সব যাওঁ,

কালসাগরকম্পন দর্শে,

স্তোমস অস্তরঙ্গশে, নব হুংসং,

পুনঃ চলিবে ভরণী হুংসংকল্প ;

জননীগো ইত্যাদি :

ভারতপ্ৰাণন কর পূর্ণ,

পুনঃ কোকিলকুজিত কুঞ্জে,

হুংসংকল্প করি চূর্ণ,

কর পূরিত প্রেম অলিঙ্গুণে,

দূরিত করি পাশপুঞ্জ, তপঃকুঞ্জে

পুনঃ বিমল কর ভারত পুষ্পে,

জননীগো ইত্যাদি ।

“জাতীয়-সঙ্গীত” এবং অন্ত সাধারণ সঙ্গীত ছাড়া তাঁহার
রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত অনেকগুলি আছে । তাহার মধ্যে একটি
উদ্ধৃত করিব । তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির মধ্যে তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ
কল্পিয়া নহে, কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি বলা কঠিন, কিন্তু
এই বলিয়া, যে, তিনি, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অনুসারে,
উপেক্ষিত অনাদৃত অহম্মত লোকদের সেবা বহুপূর্ণ হইতেই
করিয়া আসিতেছিলেন, যখন হিরজনদের সেবার আধুনিক
আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই, এবং এই গানটিতে তাঁহার দীন-
সেবক ধর্মের ছাপ পড়িয়াছে ।

নীচের কাছে নীচ হ’তে লিখিলি না রে মন !

(হুং) হুণী জনের করিস পূজা, হুণীর অবতন, (হুং মন) !

লাগেনি খায় পায় ধূলি,

কি নিবি তার চরণধূলি ।

নরর সোনার, বনের কাঠেই হয়ার চন্দন, (হুং মন) !

ক্লেমধন মায়ের মতন,

হুংসংকল্পেই অধিক বতন,

এই মনেতেধনী যে জন, সেই ত মহাজন, (হুং মন) !

রখা তোর কঙ্ক, সাক্ষর,

সেবাই ময়ের জেষ্ঠ লখন !

মানবের পরম তর্কীকানের জীতন, (হুং মন) !

মতামতের তর্ক মত,

আসিস তুলে পয়স মতা,

সকল ঘরে সকল মরে আছেন নিরঞ্জন, (হুং মন) !

এই গানটি অতুলপ্রসাদের “কাকলী” নামক গ্রন্থে
আছে । বাড়িলের হুং, দাদ্রা ।

প্রদেশসমূহে শিক্ষার সরকারী ব্যয়

বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের অধিকাংশ ভারত-গবন্মেণ্ট
গ্রহণ করায় একটি কুফল এই হইয়াছে, যে, বাংলা দেশে
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক বিভাগে
ব্যয় অত্যন্ত কম হয় । বঙ্গের রাজস্ব প্রধানতঃ বঙ্গেই ব্যয়িত
হইলেও এই সব বিভাগ রাজস্বের ত্রায়া অংশ পাইত কি না,
তাহা অনুমান করিয়া আলোচনা করা নিম্নলি । হুতরাং
তাহা করিব না ।

শিক্ষার জন্য বঙ্গে সরকারী ব্যয় কিরূপ কম হয়, তাহা
ভারত-গবন্মেণ্টের আধুনিক পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট হইতে
দেখাইব । ইহা ১৯২৭-৩২ সালের রিপোর্ট । নীচের
তালিকার অঙ্কগুলি ঐ রিপোর্ট হইতে গৃহীত । ব্যয়
১৯৩১-৩২ সালের ।

প্রদেশ :	লোকসংখ্যা :	সরকারী শিক্ষা-ব্যয় :
মাদ্রাজ	৭,৬৭,৪০,১০৭	২,৫৫,৭১,৭১৫
বোম্বাই	২,১৮,৫৭,৮৬৬	১,২০,০১,৬৮৮
বাংলা	৫,১১,১৪,০০০	১,৪৪,৫০,০৩০
আগ্রা-অযোধ্যা	৪,৮৭,০৮,৭৬০	২,১৭,৯৭,০৩০
পঞ্জাব	১,৭৬,৮০,৮৫০	১,৬৪,৯২,৬৮১
বিহার-উড়িষ্যা	৩,৭৬,৭৭,৮৫০	৫৫,৬৭,০২৬
মধ্যপ্রদেশ	১,৫৫,০৭,৭০০	৪৭,৬২,২২৭
আসাম	৮৬,২১,২৫১	৮৮,৮২,৬৮৬

বঙ্গের লোকসংখ্যা সব প্রদেশের চেয়ে বেশী । অথচ এখান-
কার সরকারী শিক্ষাব্যয় মাদ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্যা ও
পঞ্জাবের চেয়ে কম । বঙ্গের লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের আড়াই গুণ,
কিন্তু বোম্বাই-গবন্মেণ্ট বাংলা-গবন্মেণ্টের চেয়ে শিক্ষাব্যয়
বেশী করেন । বঙ্গের লোকসংখ্যা পঞ্জাবের দ্বিগুণের অধিক ।
পঞ্জাবেও বঙ্গের চেয়ে সরকারী শিক্ষাব্যয় বেশী । এই সব
প্রদেশের প্রত্যেকটিতেই মোট রাজস্ব আদায় বঙ্গের চেয়ে
কম হয়, এবং ভারত-গবন্মেণ্ট কোন প্রদেশ হইতেই বঙ্গের
রাজস্বের মত এত বেশী অংশ গ্রহণ করেন না ।

বিহার-উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের লোকসংখ্যা
ও সরকারী শিক্ষাব্যয় বঙ্গের চেয়ে কম ; কিন্তু এই সব প্রদেশে
রাজস্ব-আদায়ও বঙ্গের চেয়ে খুব কম হয় ।

১৯২৬-২৭ সালে বঙ্গে সরকারী শিক্ষাব্যয় ছিল ১,৪৭,২৪,৬৬৬ টাকা। পাঁচ বৎসর পরে ১৯৩১-৩২ সালে তাহা কমিয়া হয় ১,৪৪,৫০,০৩৯ টাকা। অর্থাৎ শিক্ষার ব্যয় কোথায় ক্রমাগত বাড়িলে, তাহা না হইয়া ৩,৪৪,৬৪৭ টাকা কমিয়াছে। ভারত-গবন্মেণ্টের শতবার্ষিক রিপোর্টে ১৯৩১-৩২ সালে বঙ্গের সরকারী শিক্ষাব্যয় ১,৪৪,৫০,০৩৯ লেখা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৩২-৩৩ সালের বঙ্গীয় শিক্ষারিপোর্টে তাহা ১,৪৪,৪৬,৮৫২, অর্থাৎ আরও কম, লিখিত হইয়াছে। সরকারী শিক্ষাব্যয়ের হ্রাস এখানেই থামে নাই। ১৯৩২-৩৩ সালে উহা আরও কমিয়া ১,৩৫,২১,৪৩৩ টাকা হইয়াছিল—আরও নয় লক্ষের উপর কমিয়াছিল !!

শিক্ষাব্যয়ের ছাত্রদত্ত অংশ বঙ্গে অধিকতম

বাংলা দেশে ১৯৩১-৩২ সালে মোট শিক্ষাব্যয় হয় ৪,২২,৮৭,০০৬ টাকা। ইহার মধ্যে গবন্মেণ্ট দেন ১,৪৪,৫০,০৩৯, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি দেন ১৬,৪৮,৬৬২, মিউনিসিপ্যালিটিগুলি দেন ১৫,০৪,৯৪৩ (মোট পব্লিক টাকা ১,৭৬,০৩,৬৪৪), ছাত্রেরা বেতন বাবতে দেন ১,৮০,০২,৫৭৯ এবং আয়ের অন্তান্ত সংস্থান হইতে পাওয়া যায় ৬৬,৮০,৮১৩ টাকা। অল্প কোন প্রদেশেই ছাত্রদের নিকট হইতে এত বেশী টাকা আদায় হয় না। নীচের তালিকা দেখুন। ১৯৩১-৩২ সালের হিসাব—

প্রদেশ।	ছাত্রদত্ত বেতন।	প্রদেশ।	ছাত্রদত্ত বেতন।
মাদ্রাজ	২৭৪১০৪০	পঞ্জাব	৭২১৫০২৭
বোম্বাই	৮১১৭৫০০	বিহার-উড়িষ্যা	৪০০০৫০৭
বাংলা	১৮০০২৫৭৯	মধ্যপ্রদেশ	১৭৫৪৮৫৭
আন্ধ্রা-অযোধ্যা	৬৭৫৭১৭	আসাম	৮৩৩৪৪৩

১৯৩২-৩৩ সালের বঙ্গীয় শিক্ষারিপোর্ট এই বৎসর জুলাই মাসে বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি, ছাত্রদত্ত বেতনের সমষ্টি ১৯৩২-৩৩ সালে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বাড়িয়া, ১,৮০,০২,৫৭৭ টাকার জায়গায় ১,৮২,৬৫,১৭৭ টাকা হইয়াছে। অর্থাৎ গবন্মেণ্ট ক্রমশঃ শিক্ষাব্যয়ের নিজ অংশ কমাইতেছেন, এবং ছাত্রদের অভিভাবকেরা ক্রমশঃ অধিকতর দিতেছেন। তাহার আর একটি প্রমাণ এই, যে ১৯২৬-২৭ সালে বঙ্গে ছাত্রদের প্রদত্ত বেতনের সমষ্টি ছিল ১,৬২,১৯,৫০৩, এবং তাহা

বাড়িয়া ১৯৩২-৩৩ সালে হয় ১,৮২,৬৫,১৭৭ টাকা। অবশ্য ইহা ঠিক বটে, যে, ছাত্রের সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া তাহাদের প্রদত্ত বেতনের সমষ্টিও বাড়িতেছে। কিন্তু ছাত্র যেমন বাড়িতেছে, গবন্মেণ্টেরও তেমনি শিক্ষাব্যয়ের নিজ অংশ বাড়ান উচিত; নতুবা শিক্ষার উৎকর্ষ কি প্রকারে সাধিত হইবে? এক হাজার ছাত্রের জন্য গবন্মেণ্ট বস্ত্র ব্যয় করেন, আর শত ছাত্রের জন্য তার চেয়ে কম ব্যয় করিলে শিক্ষার উন্নতি কেমন করিয়া হইবে?

শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের স্থান

বঙ্গে শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষার উন্নতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের অগ্রণীষ প্রধানতঃ বাঙালীদের শিক্ষানুরাগ ও শিক্ষার জন্য দানে বটিয়াছে বা বটিয়াছিল। শিক্ষানুরাগ বাঙালীর এখনও আছে, যদিও শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী হওয়ায় সেই অমুরাগে প্রবল আঘাত লাগিতেছে। কিন্তু শিক্ষানুরাগ সমান থাকিলেও শুধু অমুরাগেই ত শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি হইতে পারে না; তাহার জন্য ব্যয় করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। আগেই দেখাইয়াছি, বঙ্গের গবন্মেণ্ট শিক্ষাব্যয়ের নিজ অংশ কমাইতেছেন। ছাত্রদত্ত বেতনের সমষ্টি বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু অভিভাবকদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে। বঙ্গে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধনী ছিলেন জমিদারেরা। ধনী জমিদার কিছু এখনও আছেন। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে এখন জমিদাররা দূরবহাশ্ব। আগে যে সব জমিদার শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বংশধরদের সে ব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই। বঙ্গের বাণিজ্যও প্রধানতঃ অবাঙালীদের হস্তগত—অনেক ছোট ছোট ব্যবসা পর্য্যন্ত অবাঙালীদের হাতে গিয়াছে। এই জন্য শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করিবার ক্ষমতা বঙ্গে বাঙালীদের চেয়ে অন্তান্ত প্রদেশে তথাকার লোকদের বেশী।

এই কারণে দেখিতে পাইতেছি, লোকসংখ্যা হিসাবে বঙ্গে ছাত্রছাত্রীর মোটসংখ্যা অন্তঃক্ষেপে কোন প্রদেশের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত হইলেও বর্তমানে অন্তঃক্ষেপে কোন প্রদেশের চেয়ে বেশী নয়। নীচের তালিকায় তাহা দেখাইতেছি। ইহা ১৯৩২ সালের হিসাব।

প্রদেশ।	মোট ছাত্রছাত্রী।	লোকসংখ্যার শতকরা কম জন।
মাদ্রাস	২২,২৪,৮৮২	৬.২৫
বোম্বাই	১৩,৩৫,৫৪৭	৬.১১
বাংলা	২৭,৮০,২২৫	৫.৫৫
আন্দ্রা-অবোধা	১৫,১৭,৯৮৮	৩.১৩
পঞ্জাব	১৩,৩৩,৫৬৭	৫.৬১

এই তালিকার দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গের লোকসংখ্যা অন্ত প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী হইলেও, ইহার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাদ্রাসের চেয়ে কম। মোট লোকসংখ্যার শতকরা কম জন কোন-না-কোন শিক্ষালয়ে শিক্ষা পাইতেছে, তাহার হিসাবও দেখিতে পাই, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পঞ্জাব বাংলা দেশের চেয়ে অগ্রসর।

ভারতের কোন প্রদেশেই উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বা প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হয় নাই। সুতরাং উচ্চশিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষা হৃগিত রাখিয়া বা কমাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে আরও মন দেওয়া হউক, আমরা মোটেই এরূপ ইচ্ছা করি না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি বলিয়া উহার যথেষ্ট বিস্তার হইতেছে কি না, তাহা দেখা একান্ত আবশ্যক। বালিকাদের মধ্যে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার সামান্যই হইয়াছে; অধিকাংশ বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। এই জন্য প্রাথমিক শিক্ষার হিসাবে কেবল বালকদের সংখ্যা দেখাইব। সকল বঙ্গের ও শিক্ষাপ্রার্থীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা একত্র দেখাইব। ১৯৩১-৩২ সালের সংখ্যা দিব।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছে মাদ্রাজে ২২,৬৫,৯৬০ জন বালক, বোম্বাইয়ে ৯,৭৫,৮৬৬, বঙ্গে ১৬,৮২,৫০৩, আন্দ্রা-অবোধা ১১,৩৬,৬৪৯, পঞ্জাবে ৩,৮৬,৪৭০। প্রাথমিক শিক্ষাতেও মাদ্রাজ অগ্রণী। জনবহুলতম বাংলা অগ্রণী নহে।

নারীরাও মানুষ বলিয়া তাহাদের জ্ঞানলাভ শিক্ষালাভ আবশ্যক। তত্ত্ব, বৈ-পরিবারে গৃহীণী শিক্ষিতা সে-পরিবারে বালকবালিকা সকলকেই শিক্ষা দিবার প্রয়াস থাকে। এই জন্য কোন প্রদেশেই অগ্রসর তাহার ধর হইতে হইলে নারীশিক্ষার বিস্তার কোন প্রদেশে কিরূপ হইতেছে তাহা জানা দরকার।

১৯৩২ সালের হিসাবে দেখিতে পাইতেছি বিশ্ববিদ্যালয়

হইতে প্রাথমিক পাঠশালা পর্যন্ত মোট ছাত্রীর সংখ্যা মাদ্রাজে ৭,৪২,৫৩৬, বোম্বাইয়ে ২,৯২,৬৫৮, বঙ্গে ৫,৫৯,৭১২, আন্দ্রা-অবোধা ১,৬৭,৬১১, পঞ্জাবে ২,১৩,২৮৭। এক্ষেত্রেও মাদ্রাজ প্রথমস্থানীয়, বাংলা নহে। মোট নারীসংখ্যার শতকরা কম জন শিক্ষা পাইতেছে, সে-হিসাবে দেখি, মাদ্রাজে শতকরা ৩১ জন, বোম্বাইয়ে ২৮, বঙ্গে ২৩। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বঙ্গের চেয়ে পড়ার প্রকোপ কম, এবং ক্রীতদাসত্বের হিন্দুদের অহুপাত বেশী। তা ছাড়া, এই দুই প্রদেশে সহশিক্ষার চলন বেশী। মাদ্রাজে ছেলের শিক্ষালয়ে শিক্ষা পায় ৩,৭৯,৩৩৪ জন মেয়ে, বোম্বাইয়ে ১,০৫,৮৭৮ জন, এবং বঙ্গে ৯৭,৯২৬ জন।

বঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। ১৯৩২ সালে উহা ছিল মাদ্রাজে ৪৪,৭১,০৯১ টাকা, বোম্বাইয়ে ২৫,৬৩,১১২, বঙ্গে ১৮,০৯,০২৮, আন্দ্রা-অবোধা ১৫,৪৮,৭৭৯, এবং পঞ্জাবে ১৭,৬৭,১২২।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার বঙ্গের স্থান স্থির করিতে হইলে জানিতে হইবে, যে, বঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় দুটির ও কলেজগুলির ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৭,৬২৩, মাদ্রাজে ২০,৯৭৬, বোম্বাইয়ে ১৪,৪৯৯ এবং পঞ্জাবে ১৬,৯৭১। শুধু সংখ্যা দেখিয়া মনে হইতে পারে, বাংলা এক্ষেত্রে অগ্রসরতম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বঙ্গের লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের প্রায় আড়াই গুণ। সুতরাং বোম্বাইয়ের হিসাবে বঙ্গের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোটামুটি পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হাজার হওয়া উচিত ছিল। পঞ্জাবের লোকসংখ্যা বঙ্গের অর্ধেকের কম। সুতরাং পঞ্জাবের হিসাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসকলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নূনকল্পে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার হওয়া উচিত ছিল।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সকল ছাত্রসংখ্যা ১৯৩১-৩২ সালে মাদ্রাজে ছিল ২,০৬,৩২২, বোম্বাইয়ে ১,২৪,১৬৭, বঙ্গে ৪,৫১,৬৭২, আন্দ্রা-অবোধা ২,১৭,১২০ এবং পঞ্জাবে ৬,৭৯,৫৮০। প্রদেশগুলির প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে, যে, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বঙ্গের আরও উন্নতি হওয়া উচিত। পঞ্জাবের হিসাবে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে চৌদ্দশতের লক্ষ ছাত্রছাত্রী হওয়া উচিত।

আমরা কুলনার ভ্রত যে-সব সংখ্যা দিয়াছি, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সকলকেই ধরা হইয়াছে। সকলের মধ্যে শিক্ষাবিত্তার হইলে তবে সে দেশ বা প্রদেশকে উন্নত বলা যায়। বঙ্গে হিন্দু শিক্ষার মুসলমানদের চেয়ে কিছু অগ্রসর বলিয়া বাংলা দেশটাই উন্নত, এল্পম মনে করা ভুল।

আমরা আগেই বলিয়াছি, শিক্ষাবিস্তারে বঙ্গের উন্নতি প্রধানতঃ বঙ্গের লোকদের—বিশেষতঃ হিন্দুদের—চেষ্ঠায় হইয়াছে। গবর্নেন্ট শিক্ষার ব্যয়ের নিজের অংশ ক্রমশঃ কমাইতেছেন। গবর্নেন্ট নিজের দায়িত্ব হইতে নিকৃতি পাইতে পারেন না। কিন্তু গবর্নেন্ট শিক্ষাদান বিষয়ে নিজের কর্তব্য কখন বা না-কখন, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য আমাদের করিতে হইবে। একা একা বা অল্প দশ জনের সহিত মিলিত হইয়া আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ উচ্চতর শিক্ষার স্থাপন ও পরিচালন করিতে পারি। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত পুরুষ ও নারীরা ত শিক্ষাবিত্তারকল্পে অনেক কাজ করিতে পারেনই; যে-সব ছেলেমেয়ে বর্ষশ্রমিক দ্বিতীয় ভাগ শেব করিয়াছে, তাহারা পর্যাপ্ত নিরক্ষর ছেলেমেয়ে ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগকে অ আ ক খ চিঃ ইয়া দিতে পারে।

শারদীয় অবকাশে কর্তব্য

শারদীয় অবকাশে হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা এবং হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী নিজদের গ্রামে ও শহরে বাইবেন। তাহারা ছুটির আনন্দ উপভোগ করুন। সেই সঙ্গে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিত্তারের কিছু চেষ্ঠা তাহারা করিতে পারিলে তাহাদের আনন্দ বাড়িবে।

বঙ্গে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী জ্ঞাপনী

বঙ্গে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য ও মন্তব্য বাংলা-গবর্নেন্ট প্রেস-অফিসারের দায়িত্ব-প্রকরণের কাগজের সম্পাদকদিগকে জানাইয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা প্রকার সুবিধা সম্বন্ধে

ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ইহা দুঃখের বিষয়। ঢাকার শিক্ষার ব্যয় কম; অথচ ভাল ভাল অধ্যাপক আছেন, লাইব্রেরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার সম্ভাব্য ও সরঞ্জাম বেশ আছে। স্বাস্থ্যও ভাল। আমরা এ-সব কথা ইতিপূর্বে লিখিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, যে, ঢাকার ছাত্র ও ছাত্রী আরও বেশী হওয়া উচিত। তাহা না হইবার কারণ সম্বন্ধে আমাদের অনুমান এই, যে, অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়াছে, এবং কতকগুলি ঘটনা ও সরকারী ব্যবহার দরুন ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক আশঙ্কা আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাডুয়েট বিভাগে ছাত্র বেশ বাড়িয়া আবার যে কমিয়া গিয়াছিল ও ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, সরকারী মতে তাহার কারণ আর্থিক ও রাজনৈতিক।

১৯০২ সালে পোষ্ট-গ্র্যাডুয়েট বিভাগে ছাত্রীসংখ্যা ৫৬ ছিল। তাহা ১৯০৩ সালে দ্বিগুণ হয়। ইহা সম্ভাব্যের বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজসমূহে ১৯০২-০৩ সালে ২০,৩২৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে হিন্দু ১৭,০৯০, মুসলমান ২,৮১৮ এবং অন্যান্য ৪১৫ ছিল। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরও বেশী হওয়া উচিত—বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে।

কলেজগুলিতে ১৯২৭ সালে ২২,২৪০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল, তাহা কমিয়া ১৯৩২ সালে ১৯,৭৪৪ হয়। সরকারী মতে ইহার প্রধান কারণ কৃষিক্ষেত্রে সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ও তজ্জনিত অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থার অবনতি।

সরকারী কাগজটিতে বলা হইয়াছে—

"It will be seen, therefore, that, taking all colleges together, more than half the cost of educating a student comes from provincial revenue."

ভাষণার্থঃ "অতএব, ইহা দৃষ্ট হইবে, যে, সব কলেজ একত্র লইল, এক-একটি ছাত্রকে শিক্ষা দিবার ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশী প্রাদেশিক সরকারী রাজস্ব হইতে আসে।"

সরকারী কলেজগুলির ছাত্রসমূহের শিক্ষাব্যয় ১৩,৩৬,০৩২ টাকার দুই-তৃতীয়াংশ—৯,১৬,৯৮৪ টাকা—গবর্নেন্ট দেন। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলির ছাত্রদের শিক্ষাব্যয় ১২,১১,২৮৭ টাকার মধ্যে ২,১৭,৮০৫ অর্থাৎ প্রায় বর্ধ অংশ গবর্নেন্ট দেন। বেসরকারী কলেজগুলির

ছাত্রদের শিক্ষাক্ষর ৭,৭৭,৫৬৪ টাকা মধ্যে সরকার কিছু দেন নাই। সব রকম কলেজের সব ছাত্রদের শিক্ষাব্যয়ের মোট পরিমাণ ১৯৩২-৩৩ সালে ছিল ৩৩,২৪,৮৮৩ টাকা। তাহার মধ্যে গবর্নেন্ট দিয়াছেন ১১,৫৫,৪৯১ টাকা এবং ছাত্রেরা বেতন বাবদে দিয়াছে ১৮,৭৫,৪৫৮ টাকা। সুতরাং গবর্নেন্ট অর্ধেকের উপর দিয়াছেন কি প্রকারে, বুঝা গেল না। সরকারী কলেজে অর্ধেকের উপর দিয়াছেন সত্য, অল্প কোন কলেজে নহে। এই সমস্ত সংখ্যা সরকারী আপনীতেই আছে।

উপসংহারে এই সরকারী মত প্রকাশ করা হইয়াছে, যে,

"So far as higher education is concerned, Bengal has no reason to be anything but proud of her record."

তাৎপর্য। "উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা দেশ তাহার কৃতিত্বের জন্য গর্ব অনুভব করিতে পারে।"

"শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের স্থান" প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি, যে, লোকসংখ্যা ধরিলে, বোম্বাই ও পঞ্জাবে উচ্চশিক্ষার বিস্তার বাংলা দেশ অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গের গর্বিত হইবার বিমুখ্যুৎ কারণ নাই।

ব্রিটেনে ও বঙ্গে উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষার ভারতবর্ষের মধ্যেই বঙ্গের কৃতিত্ব সর্বাধিক নহে, তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি ও বলিয়াছি। বিলাতের তুলনায়, যে, উহা কত কম, তাহা এখন বাঙালীদিগকে এবং বাংলা-গবর্নেন্টকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যিক।

কারখানার শিল্পদ্বারা নানাবিধ পণ্যাদ্রব্য উৎপাদনের প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য ইহুল বঙ্গে নাই বলিলেই চল, তাহিব্যয়ক উচ্চশিক্ষার কলেজ মোটেই নাই। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও স্কটল্যাণ্ডে এরূপ স্থল-কলেজ অনেক আছে। তাহাদের সংখ্যা ও তাহাদের ছাত্রদের সংখ্যা সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না। আমাদের কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন প্রধানতঃ কেতাবী বিদ্যা শিখান হয়, তাহার প্রয়োজন শিখান হয় না, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়-সকলেও প্রায় সেইরূপ। বিজ্ঞানের কার্যে দ্বারা প্রকৃত উৎসাহন শিখাইবার ব্যবস্থাও বিলাতে আলাদা আছে।

এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে ও তাহাদের অনঙ্গীভূত কলেজগুলিতে কত ছাত্র আছে, এবং বিলাতী ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কত ছাত্র আছে, তাহা বলিতেছি। তাহার আগে জানান সরকার, যে, বঙ্গের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটির উপর, এবং ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স ও স্কটল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৪,৪৭,৯০,৪৮৫, অর্থাৎ বাংলা দেশের চেয়ে কম।

১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার কলেজগুলিতে ২৭,৬২৩ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী ১৯৩০-৩১ সালে বিলাতে কত ছিল, ১৯৩৪ সালের হাইটেকার্স র‍্যালম্যান'ক অনুসারে (পৃষ্ঠা ৪০৫) তাহার হিসাব এই—

ইংলণ্ডের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৪,৯৬০

ওয়েলসের ১টি " ৩,০৭০

স্কটল্যাণ্ডের ৪টি " ১১,৬৫০

১৬ " ৪৯,৬৮০

অর্থাৎ বঙ্গের চেয়ে কম লোকসংখ্যাবিশিষ্ট ঐ তিনটি দেশে—ব্রিটেনে—বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজসমূহে বঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ ছাত্রছাত্রী পড়ে। তা ছাড়া, ব্রিটেনে নানাবিধ শিল্প ও বৃত্তি শিখিবার উচ্চ বহুসংখ্যক শিক্ষালয়ে যত ছাত্রছাত্রী শিক্ষা পায়, বঙ্গে বাহার সমতুল্য কিছু নাই, তাহাদের উল্লেখ করিলাম না।

অতএব, গর্বিত হইবার মত কিছু বাংলা দেশ ও তাহার গবর্নেন্ট করেন নাই।

সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের সরকারী শিক্ষাব্যয় শুধু

লণ্ডনের চেয়ে কম!

সমগ্র ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৭,১৭,৮০,১৫১। লণ্ডন কোর্টী অর্থাৎ লণ্ডন জেলার লোকসংখ্যা ৪৩,৯৬,৮২১। পাঠশালার ছেলেমেয়েরাও আছে, লণ্ডন ইংলণ্ডের ও ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী। এই রাজধানীর আপনাপনের কিছু শহরতলী তাহাতে যুক্ত করিয়া একটি কোর্টী বা জেলা গঠিত হইয়াছে এবং তাহার শিক্ষা ব্যয় প্রকৃতি সম্পর্কীয় কাজ লণ্ডন কোর্টী

কৌশল বা লণ্ডন জেলাবোর্ড দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাহার শিক্ষাসম্বন্ধীয় কাজের বিষয়ে ১৯৩৪ সালের ছইটেকাস' রালমানাকের ৬৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :-

"The Education service involves an annual expenditure of nearly £ 18,000,000."

"কৌশলীয় শিক্ষাবিষয়ক কাজে বার্ষিক প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ পৌণ্ড খরচ হয়।"

এই বহির ৬৭৪ পৃষ্ঠায় লণ্ডন কোর্টী কৌশলের শিক্ষাবিষয়ক ব্যয়ের ঠিক পরিমাণ দেওয়া আছে। তাহা ১,২৭,১৭,৩৫৪ পৌণ্ড। বিলাতী এক পৌণ্ড আমাদের ১০৩ টাকার সমান। ১,২৭,১৭,৩৫৪ পৌণ্ড আমাদের ১৬,৯৫,৬৪,৭২০ টাকার সমান। তাহা হইলে লণ্ডন জেলা বোর্ড ৪৩,৯৬,৮২১ জন অধিবাসীর শিক্ষার জন্য প্রায় সত্তর কোটি টাকা খরচ করেন।

ভারত-গবন্মেণ্টের এডুকেশনাল কমিশনার শ্রীর জর্জ' এণ্ডার্সন ১৯২৭-৩২ সালের যে পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্ট' লিখিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয় ভলিউমের ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের সমুদ্রয় প্রদেশের ১৯৩১-৩২ সালের শিক্ষাব্যয়ের বে-অংশ গবন্মেণ্ট দেব, তাহার পরিমাণ ১২,৪৬,০৭,০৯৩ টংকা। এই বার কোটি টংকালণ্ডন জেলার বোল কোটির চেয়ে কম। কথা উঠিতে পারে, যে, জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটিসমূহ শিক্ষার জন্য বহা ব্যয় করেন, তাহাও সরকারী টাকা এবং তাহাও সরকারী শিক্ষাব্যয় বলিয়া গণিত হওয়া উচিত। তথ্যস্ব। ব্রিটিশ-ভারতের সমুদ্রয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি ২,৮০,০১,৩১৩ টংকা এবং মিউনিসিপালিটিগুলি ১,৫৮,১৭,২২২ টংকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। এই ছুটি টংকা গবন্মেণ্টের দ্বারা সহিত যোগ করিলে মোট সরকারী শিক্ষাব্যয় হয় ১৬,৮৪,২৫,৬২৮ টংকা। কিন্তু সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের সরকারী শিক্ষাব্যয় এই ১৬,৮৪,২৫,৬২৮ টংকাও লণ্ডন জেলা বোর্ডে শিক্ষাব্যয় ১৬,৯৫,৬৪,৭২০ টংকার চেয়ে কম।

ব্রিটিশ-ভারতের ২৭,১৭,৮০,১৫১ জন অধিবাসীর শিক্ষার নিমিত্ত এদেশে সরকারী ব্যয় ব্যত হয়, বিলাতে একটি জেলাবোর্ড তাহার চুয়াল্লিশ লক্ষ লোকের জন্য তাহা মপেক্ষা বৈধী স্বায় করেন। এক মিকে সাতাশ কোটি মাস, অন্ত মিকে চুয়াল্লিশ লক্ষ মাস্হয়।

বিলাতে শিক্ষার জন্য যে এক বৈধী খরচ হইতে পারে, তাহার কারণ তথাকার লোকেরা ধনী ও স্বশাসক; তাহারা বৈধী ট্যাক্স দিতে সমর্থ এবং এই ট্যাক্সের টাকা কিরূপে খরচ হইবে, তাহার চূড়ান্ত নির্দেশ তাহাদের প্রতিনিধিরাই করে। আমাদের দেশে শিক্ষার জন্য বৈধী খরচ হইতে পারে না এই জন্য, যে, আমরা ধনী ও স্বশাসক নহি; বৈধী ট্যাক্স দিতে পারি না এবং বাহা দিই, তাহা কিরূপে ব্যয়িত হইবে তাহা নিয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ করিতে আমরা বা আমাদের প্রতিনিধিরা অসমর্থ। ব্রিটেনের ধনী হইবার একটি কারণ, ভারতবর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার অধিকারে আসিয়াছিল এবং এখনও অধিকারে আছে। যে-দেশ ব্রিটেনের অধিকারে আসা ও থাক। ব্রিটেনের ধনী হইবার একটি কারণ, সে-দেশের নিজেরও ধনী হইবার সম্ভাবনা আছে। এবং পৃথিবীর কোনও দেশের পক্ষেই স্বশাসক হওয়া অসম্ভব নহে। উদ্যোগ ও একাগ্র চেষ্ঠা থাকিলে আমরা স্বশাসক ও ধনী হইতে পারি, এবং শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যয় নিজেরা করিতে পারি ও গবন্মেণ্ট, মিউনিসিপালিটি ও জেলাবোর্ড প্রভৃতিকে করাইতে পারি।

শিক্ষার উপর এত জোর আমরা দিতেছি এই জন্য, যে, শিক্ষা ব্যতিরেকে আমরা পৃথিবীর অন্ত সভ্য ও বড় জাতিদের সমকক্ষ কখনও হইতে পারিব না। অতএব, আমরা দরিদ্র হইলেও, যুস্থ সবল থাকিবার খরচ ছাড়া অন্ত সব খরচ কমাইয়া বা ছাটিয়া দিয়া, শিক্ষাতে অর্থ, সময় ও শক্তি নিয়োগ করা আমাদের কর্তব্য।

নারীহরণাদি অপরাধ বৃদ্ধি

১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় পুলিশ রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে, ঐ সালে নারীহরণাদি অপরাধ বাড়িয়াছে। ১৯৩২ সালেও যে উহা বাড়িয়াছিল, তাহাও প্রসঙ্গতঃ ঐ রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে। ১৯৩২ সালের পুলিশ রিপোর্টে তাহা লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই সালের বঙ্গীয় শাসন রিপোর্টে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, যে, ঐরূপ অপরাধ বাড়েনি।

১৯৩৩ সালের পুলিশ রিপোর্টের উপর নকৌলিল

গবর্ণর বাহাদুরের মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে :-

"It is deplorable that offences against women coming under sections 366 and 354 of the Indian Penal Code, again show an increase. There were 52 cases more compared with the figure of the previous year, or an increase of 7.5 per cent. The increase reported in 1932 as compared with 1931 was 94 or 15.7 per cent, so that, though the position is far from satisfactory, the rate of increase has declined."

তাহাৎপর্বা। "ইহা শোচনীয়, যে, ভারতীয় নৃগণি আইনের ৩৬৬ ও ৩৫৪ ধারা মতে নগ্ননীর নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ আবার বাড়িয়াছে। ১৯৩২এর তুলনায় ১৯৩৩ সালে ৫২টা মোকদ্দম, অর্থাৎ শতকরা ৭.৫টা বাড়িয়াছে। ১৯৩১এর তুলনায় ১৯৩২ সালে ৯৪টা অর্থাৎ শতকরা ১৫.৭ বাড়িয়াছিল। অতএব, অবস্থাটা সন্তোষজনক না হইলেও, অপরাধ-বৃদ্ধির হার কমিয়াছে।"

এরূপ অপরাধ দমন লক্ষ্যে সরকারী মন্তব্যে বলা হইয়াছে—

"The matter is one which continues to engage the attention of Government, and the question whether the Whipping Act of 1909 should not be amended so as to make persons convicted of offences against women liable to the punishment of whipping is now under examination. The attention of local officers will be drawn to the necessity of putting down the evil in those districts where the number of cases shows an increase."

তাহাৎপর্বা। "এই বিষয়টি গবর্নমেন্টের মনোযোগ পাইয়া চটিতেছে। ১৯৩৩ সালের বেতাবাত আইন এরূপভাবে সংশোধিত হওয়া উচিত কিনা, বাহাতে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধদিগকে বেতাবাত দণ্ড দেওয়া চলে—এই প্রশ্নটি এখন বিবেচিত হইতেছে। যে-সব জেলায় এই অপরাধ বাড়িয়াছে, তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী-দিগকে ইহা দমন করিবার দিকে মন দিতে বলা হইবে।"

বঙ্গের অস্থায়ী গবর্ণর শ্রম জন উড্‌হেড্‌, চাকার পুলিশ-কর্মচারী ও কনেটবলদিগকে পুরস্কারবাকালে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিয়াছেন—

"There is a particular form of crime to which Sir John Anderson made special reference last year and which still gives cause for anxiety, and that is crime against women. I have noticed with concern that there was an increase in this class of crime during 1933. It is not possible to say how far the increase is real or how far it may be due to a greater readiness on the part of interested parties to report cases of this kind, but it is clear that a remedy is called for. The matter is one which continues to engage the attention of Government and, as has already been announced in the resolution on the working of the Police Department for the year 1933, the question of making offences against women punishable by whipping is under consideration. But, whatever decision is arrived at on that thorny question, there is much that the police can

do to discourage and prevent these despicable crimes. I do not doubt that you are already fully alive to this fact, but it is evident that there is room for improvement and I look to all ranks to co-operate in removing what is rapidly becoming a serious blot on this province."

তাহাৎপর্বা। "বিশেষ রকমের একটা অপরাধের বিবরণ শ্রম জন এন্ডারসন গত বৎসর বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন, বাহা এখনও উদ্বেগ জন্মাইতেছে; তাহা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ। ১৯৩৩ সালে এই শ্রেণীর অপরাধ বাড়িয়াছিল, ইহা আমি উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। এই বৃদ্ধি কতটা প্রকৃত, কতটাই বা ইহা, ইহা তাহা এইরূপ দুর্কর্ম দমনে ইচ্ছুক তাহার আগেকার চেয়ে তাহার বৎসর দিতে বেশী প্রভুত হইয়াছেন বলিয়া তাহার কল, বলা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট, যে, ইহার প্রতিকার চাই। এই বিষয়টিতে গবর্নমেন্ট আগেকার মত মনোযোগ করিতেছেন, এবং, পুলিশ রিপোর্টের উপর সরকারী মন্তব্যে যেমন বলা হইয়াছে, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধে বেতাবাত দণ্ড দেওয়া হইবে কিনা তাহা বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু এই বিষয়স্থল প্রথমটি লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত বাহাই হউক, পুলিশ এরূপ অনেক কিছু করিতে পারে, বাহাতে এই দৃশিত দুর্কর্মসকলের দমন ও নিবারণ হইতে পারে। আমার সন্দেহ নাই, যে, আপনারা এ-বিষয়ে ইতিমধ্যেই সচেষ্ট আছেন; কিন্তু ইহাও স্পষ্ট, যে, আপনাদের কর্তব্যসাধনে অনেক উন্নতির অবসর আছে। এবং আমি সর্বশ্রেণীর পুলিশ কর্মচারীর নিকট ইহা আশা করিতেছি, যে, তাহার, বাহা বঙ্গের একটা গুরুতর কলঙ্ক পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাহা দূরীকরণে সহযোগিতা করিবেন।"

উড্‌হেড্‌, সাহেব প্রাণীণ সিভিলিয়ান। অনেক জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিয়া পুলিশের কার্যকারিতা এক অবহেলা বা অকর্ম্মাভা হই দিকই ভাল করিয়া জানেন। তিনি, উপরে উক্ত বাক্যগুলির শেষের দিকে বাহা ভদ্রতাবার বলিয়াছেন, তাহার সোজা অর্থ এই, যে, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে পুলিশের বাহা কর্তব্য তাহা পূর্ণমাত্রায় সাধিত হয় না, অনেক কিছু করিবার আছে বাহা পুলিশ করে নাই কিন্তু তাহাদের করা উচিত। অতঃ পুলিশ-বিভাগের উচ্চকাজে নিযুক্ত এমন অনেক লোক আছেন, বাহারা এই শ্রেণীর অপরাধের দুরূহ বুরেন এবং তাহার দমন ও নিবারণ চান। নীচের দিকও এরূপ কর্মচারী একেবারেই নাই, এমন বলা যায় না। কিন্তু মোটের উপর শ্রম জন উড্‌হেডের একথা সত্য, যে, পুলিশের দ্বারা এই-সব দুর্কর্ম দমন ও নিবারণক্ষে বাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। এখন যদি তাহা হয়, তাহা হইলে মঙ্গল।

গভীর্ণীর সম্পাদক বার্ডকাসকে নারীহরণারি

নিবারণ ও দমনকল্পে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। এই বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অনতিক্রান্ত। তিনি লিখিয়াছেন—

পুলিশের সাহায্য না পাইলে নারীহরণ বাংলাদেশ হইতে কখনও দূর করা যাইবে না। সার জন তাহা জানেন, হুতরাং পুলিশকে এই দুর্কর্ম নিবারণে বিশেষ মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন। অনেক সময়ে নিম্নশ্রেণীর পুলিশ নারীহরণ অপরাধ দমন করিতে অস্বহেল করে, নারীহরণ যে অপরাধের বিষয়, তাহা দমন করা যে পুলিশের কর্তব্য, তাহাও তাহার মনে করে না। ভূতপূর্ব পুলিশ-ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যান ও গবর্নর সার জন এডওয়ার্ড প্রুভি অনেক পুলিশকে তাহাদের কর্তব্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু আমরা অতিক্রান্ত হইতে বলিতেছি উক্ত শ্রেণীর পুলিশ কর্মচারী নারীহরণ যেমন গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করেন, নিম্নশ্রেণীর অনেক কর্মচারী তেমন মনে করেন না। কোন কোন স্থলে ধানায় খবর দিতে গেলে পুলিশ এজাহার গ্রহণ না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে তাড়াইয়া দেন। সে বাহা হউক, আমরা অতীতের কথা আলোচনা করিতে চাই না। ভবিষ্যতে বাঙ্গলার সমস্ত ধানায় পুলিশ নারীহরণ দমনের জন্য মনোযোগী হইবেন এবং সার জন উদ্বেষ্ট যেমন বাঙ্গলার কলঙ্ক দূর করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, ছোট বড় সকল শ্রেণীর পুলিশ সেইরূপ প্রয়াসী হইবেন। গবর্নমেন্টের নিকট আমাদের অনুরোধ এই, শীঘ্র অপরাধবিনশকে বেয়ন ও দানব ব্যবস্থা করুন। কিন্তু কেবল বেয়ন ও নয়, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করিলে তাহাদের মনে ভয় হইবে না।

অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাও বে উচিত, আমরাও তাহা আগে আগে লিখিয়াছি। অনেক সময় অশক্ততা নারীকে গোপনে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, গৃহ হইতে গৃহান্তরে লইয়া রাখা হয়। যাহারা এইরূপে বনমায়েদদের সহায় হইয়া অশক্ততা নারীকে নিজ নিজ গৃহে লুকাইয়া রাখিতে দেয়, তাহাদেরও শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত, ইহাও আমরা অনেক বার লিখিয়াছি।

এক সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় দলবদ্ধ ভাবে নারীহরণ ও নারীধ্বংসের প্রাচুর্য হওয়ার তথাকার গবর্নমেন্ট অপরাধীদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে এই অপরাধ বন্ধ হইয়া যায়। কলিকাতা হাইকোর্টের পরলোকগত জজ সৈয়দ আমীর আলী এদেশেও দলবদ্ধ ভাবে নারীর উপর অত্যাচারের দৃষ্ট প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন। আমরা সাধারণতঃ প্রাণদণ্ডের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু এইরূপ অপরাধে ব্যবস্থাবিন নীকাসন হও নিশ্চয়ই হওয়া উচিত।

নারীনিগ্রহের প্রতিকারে সামাজিক কর্তব্য

নারীদের উপর অত্যাচার দমন ও নিবারণের জন্য

গবর্নমেন্ট কি করিতে পারেন, তাহার আলোচনা রাজপুরুষেরা করিয়াছেন, গবর্নমেন্টের প্রধান ব্যক্তি বক্তৃতায় ও পুলিশ রিপোর্টের উপর মন্তব্য করিয়াছেন। এই আলোচনার প্রধানতঃ পুলিশ কি করিতে পারে এবং অপরাধীদের শাস্তি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই আলোচিত হইয়াছে। গবর্নমেন্টের এবং সর্বসাধারণের আর এক দিকেও কর্তব্য আছে। নারীদিগকে আশ্রয়কার সমর্থ করিবার চেষ্টা বত করা নাইবে, এই কর্তব্য ততই সাধিত হইবে।

অনেক স্থলে দেখা যায়, কোন বালিকা হয়ত খণ্ডুরালরে উৎপীড়িতা, তহাকে পিতৃগৃহে লইয়া যাইবার লোভ দেখাইয়া ছুর্ত লোকেরা তাহাকে খণ্ডুরালর হইতে লইয়া যায় এবং তাহার উপর অত্যাচার করে। কখনও বা কোনও বধূকে ছুর্ত লোকেরা এই মিথ্যা সংবাদ দেয়, যে, তাহার পিতা, মাতা, বা অন্য স্বজন পীড়িত, এবং তাঁহার সহিত দেখা করিতে লইয়া বাইবার ছলে তাহার সর্বনাশ করে। শিক্ষিতা বালিকা বা মহিলাকে এই প্রকারে ঠকান সহজ হয় না। হুতরাং নারীশিকার বিস্তার এইরূপ প্রতারণা ও প্রতারণার দ্বারা অত্যাচারের একটা প্রতিকার। যেখানে অন্তঃপুরে বধূদের উপর অত্যাচার হয়, সেখানে পিতৃগৃহে লইয়া বাইবার ছল চলে। অতএব সমাজের একরূপ সংশোধন ও সংস্কার আবশ্যক যাহাতে অন্তঃপুরে বধূদের উপর অত্যাচার না হয়। বিবাহে বরপক্ষ বাঞ্ছিত বরণণ ও যৌতুক না পাইলে অনেক সময় বধুর উপর অত্যাচার করে। বিবাহ সম্বন্ধে নীচ ধারণা থাকার এবং কতকটা আর্থিক কারণে এইরূপ অত্যাচার হয়। এ-বিষয়ে লোকমতের উন্নতিসাধন আবশ্যক।

বালিকা ও তরুণী বিধবাদিগকে প্রেমের বুলোভন দেখাইয়া পরে ছুর্তেরা তাহাদের উপর অত্যাচার করে। বালবৈধবা ঘটতে পারে না যদি বাল্যবিবাহ না থাকে। অতএব বালবৈধবের প্রতিকার বিবিধ—বাল্যবিবাহ বন্ধ করা এবং বাহাদের বাল্য বিবাহ ও পরে অল্পবয়সেই বৈধবা ঘটাইছে, তাহাদের পুনরার বিবাহ দেওয়া। বালিকা ও তরুণী বিধবাদের বিবাহ আগেকার চেয়ে বেশী প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার আরও অধিক প্রচলন দরকার।

অনেক স্থলে কোন প্রকার প্রলোভন না দেখাইয়া, কোন রকম ছল প্রদারণা না-করিয়া বলপূর্বক বাড়ির বাহিরে বা বাড়ির মধ্যে হইতে হরণ করিয়া কুমারী, সখ্যা ও বিধবাদের উপর দ্রুত লোকে অভ্যচার করে। এসকল স্থলে, যদি আত্মীয়-স্বজন বা অন্ত লোক কেহ থাকেন, তাহাদের সংখ্যা খুব কম হইলেও দ্রুতদের কাজে বাধা দেওয়া উচিত। তাহাদের সংখ্যা ও শক্তি যথেষ্ট হইলে দ্রুত লোকেরা পরাক্রান্ত ও দ্রুত হইবে। যথেষ্ট না-হইলে হরণ তাহারা আহত বা হত ও হইতে পারেন। এক্ষণ সম্ভাবনা থাকা সবেও কলমারেলদের কাজে বাধা দেওয়া উচিত। এই কর্তব্যবোধ মুসলমান সমাজে ও হিন্দু সমাজে সর্বত্র জাগ্রত হওয়া আবশ্যিক। যে-যে গ্রামে ও শহরে এক্ষণ দ্রুত লোক আছে বলিয়া জানা যাইবে বা সন্দেহ হইবে, সেখানেই নারীরক্ষক দল গঠিত হওয়া কর্তব্য।

দ্রুতদের দৃষ্টিতে বাধা দিবার লোক থাকিলে যদি তাহারা হত বা আহত ও অক্ষম হন, কিংবা যদি সেরূপ লোক না-থাকেন, কিংবা অন্ত যে-কোন অবস্থায়, নারীর উপর অভ্যচারের উপক্রম হইলেই, তিনি বাহাতে প্রাণপণে তাহাতে বাধা দিতে পারেন, সামাজিক মতের দ্বারা ও শিকার দ্বারা নারীদের মনে তদনুরূপ যথেষ্ট সাহস ও শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করা আবশ্যিক, এবং তাহাদের শরীরও গঠন করিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষা অস্ত্রব্যবহারে দক্ষ ও আত্মরক্ষা করিয়া উচিত। অস্ত্রও সর্বত্র তাহাদের কাছে থাকা চাই। এসব কথা নিত্য পুরাতন, নতুন নয়। কিন্তু পুরাতন কথা পুনঃপুনঃ স্মরণ করিবার প্রয়োজন আছে।

অন্তঃপুরের বাহিরে, সম্পর্কিত লোক বা নিঃসম্পর্ক লোক বাহারা নারীদের উপর কোন প্রকার অভ্যচার করে, তাহাদের বিরুদ্ধে জনমত খুব প্রবল হওয়া উচিত। দ্রুত লোকেরা ধনী ও পক্ষপাতবিশিষ্ট হইলে তাহাদের সামাজিক শাসন হয় না। ইহা নিত্য লজ্জার বিষয়।

নারীরক্ষাবিষয়ে হিন্দুসমাজের কতকগুলি শ্লোক কল্পিতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে (অর্থাৎ সভা সমিতি আদি গঠন করিয়া) উল্লেখ্য হইয়াছেন। আরও অধিক লোকের উদযোগী হওয়া উচিত। নারীরক্ষায় যে-কোন সভাসমিতি গঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা

যথেষ্ট কাজ করিতে পারেন না। আমরা তাহাদিগকে অর্থ-সাহায্য করি না। ইহা গুরুতর ত্রুটি।

মুসলমান সমাজের কেহ কেহ ব্যক্তিগত ভাবে নারীরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে, কেহ কেহ নিজেকে বিপন্ন করিয়াও নারীরক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণ সভ্য সংবাদ খবরের কাগজে পড়িয়া প্রীত হইয়াছি, এবং এই সংলোকগুলির প্রতি আন্তরিক প্রীতি অনুভব করিয়াছি। যে-সব বিপন্ন বা আজান্ত নারীর সাহায্য ইহার করিয়াছেন, তাহাদের অনেকে হিন্দুনারী। ইহাতে আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যে, তাহারা নারী বলিয়াই নারীকে সম্মান করিতে, বিপন্ন মানুষের সাহায্য বিপন্ন বলিয়াই করিতে জানেন।

সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ সভাসমিতি গঠন করিয়া মুসলমান সমাজের লোকেরা এ-বিষয়ে কোন কর্তব্য করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেহ আমাদের অজ্ঞতা দূর করিলে উপকৃত হইব।

একবার একটি মুসলমান কাগজে পড়িয়াছিলাম, যে, মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকায় এবং নারীহরণাদি না-হওয়ার বা খুব কম হওয়ার এ-বিষয়ে কিছু করিবার প্রয়োজন সে-সমাজে অনুভূত হয় নাই। কিন্তু সরকারী বিবরণে যে-সব সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, অভ্যচারিতা নারীদের মধ্যে মুসলমান নারীর সংখ্যাই অধিক। অতএব, যদি সাম্প্রদায়িক ভাবেই এ-বিষয়টির আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেও মুসলমানদের সমষ্টিগতভাবে, বলবদ্ধভাবে, কিছু করা উচিত। হিন্দুসমাজে, সকলের দ্বারা অনুসৃত ও পালিত না-হইলেও, যেমন “যত্র নারীস্ত পূজ্যস্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ,” “যেখানে নারীরা পূজিত হন সেখানে দেবতারা আনন্দ পান,” এই বাক্য প্রচলিত আছে, তেমনি মুসলমান সমাজে, “স্বর্গ জননীর পদতলে” বা এতদ্রূপ বাক্য শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা মুসলমান সমাজে শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যেই নারীরক্ষার বিষয়ে অগ্রণীভ দেখিবার আশা করি।

হিন্দুসমাজ সভাসমিতি গঠন করিয়াছেন বলিয়া যে বলিয়াছি, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকেও ধরিয়াছি। যে নারীরক্ষাসমিতির প্রধান কর্মী শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ দত্ত,

তাহা হিন্দুসম্প্রদায়-নিবিশেষে সকল অত্যাচারিতা নারীর সহায় হইয়া থাকেন।

আগে অত্যাচারিতা হিন্দুনারীদের স্থান হিন্দুসমাজে প্রায়ই হইত না। এখন অনেক স্থলে স্থান হয়। সব স্থলে হয় কিনা বলিতে পারি না। সব স্থলেই হওয়া উচিত ও আবশ্যিক।

উপরে প্রসঙ্গতঃ নারীর উপর অত্যাচারের কারণ যে প্রধানতঃ দুর্বৃত্ত লোকদের পাশবিক প্রবৃত্তি তাহা পরোক্ষভাবে বলা হইয়াছে। তা ছাড়া, অন্য কারণও আছে। পৃথিবীর সব মহাদেশের বিস্তৃত দেশে পাপ-বাবসা চালাইবার জন্য অনেক বালিকা ও তরুণীকে ছলে-বলে-কৌশলে সংগ্রহ করা হয়। ভারতবর্ষে এবং বাংলা দেশেও হয়। বন্ধে অপকৃতা অনেক নারীর যে আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহার কারণ, হয় তাহাদিগকে কোন দুর্বৃত্ত লুকাইয়া রাখিয়াছে, কিংবা সামাজিক পাপের দালালদের কাছে দূরে বিক্রী করিয়াছে, কিংবা প্রাণবধ করিয়াছে। বালিকা ও তরুণীদিগকে পাপবাবসার জন্য পণ্যবস্তুর মত ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে লীগ অব নেশন্সের বিভূক্ত রিপোর্ট আছে। ইহা দমন করিবার চেষ্টা নানা দেশে হইতেছে। আমাদের দেশে একবারেই হইতেছে না, এমন নহে। ভারতের মহিলাদেরও দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে।

কোন কোন নারীহরণের আর একটি উদ্দেশ্য, ধর্মাস্তর গ্রহণ করাইয়া সেই ধর্মসম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বোধনা-নিকেতন

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে স্থাপিত বোধনা-নিকেতনের নাম প্রবাসীর পাঠকেরা জানেন। ইহা জড়বুদ্ধি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য বাহা করিতে চায়, তাহা পূর্বে পূর্বে প্রবাসীতে লিখিত হইয়াছিল। ইহার বিস্তারিত বার্ষিক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহা সচিহ্ন এবং ইংরেজীতে লিখিত। বাঙালী ছাত্র ভিন্ন বাংলা দেশের বাহির হইতে অবাঙালী ছাত্র ছাত্রীরাও ভর্তি হইয়াছেন। ইহাতে যে-কাজ আরও হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা এক কাজ

কিন্তু চলিতেছে, তাহা বাহারা জানিতে চান, তাহারা ইং পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। বন্ধের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বটমলী সাহেব ইহা দেখিয়া কি বলিয়াছিলেন, ষ্টেটসম্যান কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগের অল্পতম কণ্ঠচরী অধ্যাপক ওয়ার্ড সোআর্থ ইহা দেখিয়া কি লিখিয়াছেন, এবং এইরূপ অন্তান্ত লোকদের মত এই রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে। ছাত্রদের কিন্তু উন্নতি হইতেছে, চিত্তের স্বাধীনতা বৃদ্ধি হইয়াছে। বাহাদের বাড়িতে জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়ে আছে, তাহাদের এই রিপোর্টটি দেখা উচিত। জনহিতৈষী অন্ত লোকদেরও ইহা দ্রষ্টব্য। ৩৫ বিজয় মুখোজা গলি, ভবানীপুর, কলিকাতা, এই ঠিকানায় ইহা সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিনামূল্যে পাওয়া যায়। বাহারা ইহা ডাকে লইতে চান তাহারা তাহাকে পাঁচ পয়সার ডাক-ট্যাম্প পাঠাইবেন। এই প্রতিষ্ঠানটির খুব অর্থের প্রয়োজন, এবং ইহা সাহায্যের যোগ্য। বাহারা সাহায্য করিতে চান, তাহারা টাকাকড়ি গিরিজাকৃষ্ণ স্বাবর নামে পাঠাইবেন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রথমতঃ হিমালয়ে ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমরা যখন তাহার ভ্রমণকাহিনীর কথা, “চড়াই উৎরাই” প্রভৃতির কথা, আগ্রহের সহিত “সাহিত্যে” পড়িতাম, সেদিন এখনও মনে পড়ে। পরে তিনি অন্তান্ত রচনার দ্বারা খ্যাতিলাভ করেন। সম্পাদকের কাজও তিনি বহু বৎসর করিতেছেন। তাহার পঁচাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার সম্বাধোগ্যভাবে তাহার সম্বন্ধনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিকই হইয়াছে। গবর্নেন্টও তাহার সমাদর করিতে জটী করেন নাই— তাহাকে রায়-বাহাদুর খেতাব দিয়াছেন।

মিস্ মেয়ের আবার ভারত-ভ্রমণ ?

কেহ কেহ থবর পাইয়াছেন, কুথিখাতা মিস্ মেয়ে আবার ভারতভ্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহার আগেকার দৃষ্টি কীট আছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা ১৯১৩ বৎসর আগে আমেরিকানদের অধীন হয়। জনবহি তাহারা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমেরিকার কতক লোক তাহাদের এই চেষ্টার বিরোধী, কারণ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার স্বাধীন থাকিলে তাহারা নী হইতে পারে। মিস্ মেয়ো এই দ্বীপপুঞ্জে বেড়াইয়া এক খানা বহি লিখিয়া দেখায়, যে, তথাকার লোকেরা হের ও স্বাধীনতার অযোগ্য, বলিও সভ্য কথা তহি নহে। বাহা ইউক, এই ক্যাডাফ্রিয়া লেখিকার লেখা সত্ত্বেও আমেরিকার ব্যবস্থাপক সভার ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতার অসম্মত আইন পাস হইয়া গিয়াছে। কারণ, আমেরিকার অধিকাংশ লোক—কতক লোক তাহাদের নিজেদের স্বাধীনতার জন্য এবং কতক লোক খাঁটি নরহিতৈষণা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা বশতঃ—এরন ফিলিপিনোদের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে।

মিস্ মেয়োর দ্বিতীয় কীর্তি ভারত-ভ্রমণের পর “মাদার ইণ্ডিয়া” (“ভারত জননী”) নামক পুস্তক রচনা। ইহাতে ভারতীয়দের প্রাচীন ও আধুনিক বহু কুৎসা আছে। এক্সপ বহি লিখিবার কারণ, কয়েক বৎসর হইতে ভারতীয়দের স্বরাজ্যভাঙ আন্দোলন প্রবল হইয়াছিল এবং ইংলণ্ডের অল্পসংখ্যক লোক ভারতবর্ষকে স্বরাজ্য দিতে চায় এই রকম একটা আভাস রচিত হইয়াছিল; কিন্তু অগণিত ইংরেজ ভারতবর্ষের স্বরাজ্যভাঙের বিরোধী ছিল এবং এখনও আছে। পরোক্ষ প্রমাণ হইতে ইহা অনুমিত হইয়াছে, যে, মিস্ মেয়ো ইহাদের চর রূপে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ও “মাদার ইণ্ডিয়া” লিখিয়াছিল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে ইহার খুব কাঁট তি হইয়াছিল এবং ইহা ক্রোধ জন্মান প্রভৃতি ভাব্য অসম্ভাবিত হইয়াছিল। এ-দেশের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু এবং তাহারাই প্রধানতঃ স্বরাজ্যভাঙের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই জন্য মিস্ মেয়ো বিশেষ করিয়া তাহাদেরই ঘোষণাবাদন করিয়াছেন। কোন দেশের কোন জাতিই নিখুঁত নয়—আলোচ্য নহে। কিন্তু অবিস্মৃত গোবের আকরক কোন জাতি নয়। বাহা ইউক, মিস্ মেয়োরা বহি পড়িয়া অনেক ইংরেজ ও স্বরাজ্য পাশ্চাত্য জাতির লোকের ধারণা বদলাইয়াছে, যে, ভারতীয়েরা—বিশেষতঃ হিন্দুরা—অতি অল্প জাতি এবং স্বরাজ্যের লস্কর অযোগ্য।

যেতদগ্ৰ অর্থঃ হোআইট শেপারে এবং সন্ততঃ তদপেক্ষাও নিকট অনুর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য জর্জেট পালেমেন্টারী কমিটির রিপোর্টে ভারতবর্ষকে স্বরাজ্য দিবার কোন আভাস নাই। সুতরাং তাহাতে বাধা দিবারও কোন প্রয়োজন নাই। অতএব, মিস্ মেয়োরা দ্বারা আবার বহি লিখিয়া ভারতীয়দিগকে হের ও স্বরাজ্যের অযোগ্য বলিয়া পুনর্বার প্রমাণ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা বাইতেছে না। অথবা, একটা প্রয়োজন থাকিতেও পারে। জর্জেট পালেমেন্টারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর একবার, এবং তদনুসারে পালেমেন্টে ভারত-শাসন আইনের খসড়া উপস্থাপিত হইবার পর আর একবার ভারতীয়দের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে স্বরাজ্য দেওয়া হইল না বলিয়া আন্দোলন হইতে পাওয়া এই দুই সময় ইংলণ্ডের কতিপয় ভারত-স্বরাজ-পক্ষপাতীকে এবং ইংলণ্ডের বাহিরের ভারত-স্বরাজের পক্ষপাতী লোকদিগকে অরগ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে, যে, ভারতীয়েরা অতি অসম্মত, মনুষ্য নামের অযোগ্য।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রার্থের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রি বলিয়াছেন, মিস্ মেয়োরা পক্ষ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার কোন অনুমতির দরখাস্ত গবর্নমেন্ট পান নাই। কিন্তু দরখাস্ত আসিলে তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে কি না, তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি খবরের কাগজে পড়িয়া থাকিবেন, যে, কয়েক দিন পূর্বে নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত আমেরিকান ঔপন্যাসিক কিন্সেরার লুইসের পত্নীকে জার্মেনী হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে, যেহেতু জার্মান কর্তৃপক্ষের ধারণা তিনি সাংবাদিকরূপে খবরের কাগজে জার্মেনীর নিরাপত্তার ঝুঁকিতেছিলেন। ভারতবর্ষ জার্মেনীর স্বত্ব স্বাধীন দেশ হইলে মিস্ মেয়োরা প্রতি কি ব্যবস্থা হইত, কিন্সেরার লুইসের পত্নীর প্রতি জার্মেনির আমের হইতে তাহা অনুমান করা বাইতে পারে। নোবেল-প্রাইজপ্রাপ্ত লেখকের পত্নী মিস্ মেয়োরা যত দেশ লোক নহেন।

অথচ, তাহাদের পক্ষ ভারত-ভ্রমণের সময় এই ত্রীলোককে গবর্নমেন্ট প্রাসাদে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল।

এবং গবর্নমেন্টের লোকদের ও সরকারী কালজপত্রের সাহায্যে পাওয়াছিল। স্বল্প ভণ্ডন লর্ড লিটন বাড়িলাহেব ছিলেন। তাহার প্রাসাদ হইতে এক জন ইংরেজ কর্মচারী মিস্ মেয়ের কোন কোন স্থান দর্শন করিবার সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষকে যে চিঠি লেখা হইয়াছিল, আমরা মর্ডান রিভিউ ও প্রবাসীতে তাহার কোটোগ্রাফিক নকল ছাপিয়াছিলাম। স্বরত্নসচিব বলিয়াছেন, ভ্রমণকারীদিগকে যে-সব সুবিধা দেওয়া হয়, মিস্ মেয়ের জন্ত তার বেশী কিছু করা হয় নাই। সব বা অধিকাংশ বিদেশী ভ্রমণকারীকে কি গবর্নমেন্ট প্রাসাদে রাখা হয় এবং সরকারী উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা কি তাহাদের ভ্রমণ দর্শন প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দেন?

মিস্ মেয়ে আমাদের কুংসা করিলেই আমরা ছোট হইয়া যাইব না। প্রকৃত ছোট বা বড় হওয়া আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আমাদের প্রদত্ত টাকায় পরোক্ষ সাহায্যে আমাদের অগম্য হইয়াছে, ইহা আমরা চাই না। পরোক্ষ সাহায্য বলিতেছি এই জন্ত, যে, গবর্নমেন্ট প্রাসাদ ও অন্তঃসমুদয় সরকারী বাড়ি ভারতবর্ষের টাকায় নিমিত্ত হইয়াছিল ও রক্ষিত হইতেছে এবং এদেশের উচ্চতম হইতে নিম্নতম সরকারী কর্মচারী ভারতবর্ষের টাকা হইতে বেতন পান। ভারতীয়েরা চায় না, যে, তাহাদের প্রদত্ত টাকায় নিমিত্ত ও রক্ষিত বাড়িতে আশ্রয় পাইয়া তাহাদের বেতনভোগী লোকদের সাহায্যে তাহাদের মিথ্যা কুংসা প্রচারিত হয়।

শরৎচন্দ্র চৌধুরী

সাতাশী বৎসর বয়সে ময়মনসিংহের শরৎচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজের প্রাচীনতম ব্যক্তির তিরোভাব ঘটিল। তিনি গত কয়েক বৎসর আর্থিক বশতঃ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন সামর্থ্য ছিল, তখন নানা সমাজস্বস্তিকর কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। বিদ্যালয়গাঠা করেকখানি ভাল বহি তিনি লিখিয়াছিলেন। ময়মনসিংহে তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহা বর্তমান বিদ্যামণী বালিকা-বিদ্যালয়ের সহস্রপাত করে। তিনি স্বাধীনচিন্ততা ও উদার জ্ঞানের জন্য পরিচিত ছিলেন।

বৈপ্লবিক অপরাধের হ্রাস

১৯৩০ সালের বঙ্গীয় পুলিশ রিপোর্ট ও তাহার উপর কলিকাতা পুলিশ বাহিনীর মন্তব্য এবং এই সালের

কলিকাতা পুলিশ রিপোর্ট ও তাহার উপর সর্কোজিল গব-বাহিনীর মন্তব্যে দেখিলাম, যে, মঙ্গল বৈপ্লবিক সময় এই বৎসর আগেকার চেয়ে অনেক কমিয়াছে।

বঙ্গীয় পুলিশ রিপোর্টের উপর গবর্নমেন্টের মন্তব্য আছে—

"Excluding cases that occurred within the jurisdiction of the Calcutta Police, there were 41 outrages and other crimes committed in Bengal by terrorists against the Government in the previous year."

কলিকাতা পুলিশের এলাকার মধ্যে যাহা বটে তাহা বাত সত্যাকর। এ বৎসর ৪১টা অপরাধ করে, পূর্বে বৎসর ৪৪টা করিয়াছিল।

কলিকাতা পুলিশ রিপোর্টের উপর গবর্নমেন্টের মন্তব্য আছে—

"The year under review was one of notable success against the terrorist organizations."

"এই বৎসর সন্ত্রাসকলসমূহের বিরুদ্ধে সাকল্যের বিশেষ একটা বৎসর।"

এই প্রকারে কমিয়া যাবে বর্তমান হিংসামূলক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ লোপ পাইলে নানা দিক দিয়া দেশ শান্তবান হইবে। এইরূপ কাজের দ্বারা দেশের স্বাধীনতাশাস্ত্রের বিপ্লবমাত্রও সমাধা নাই। অথচ এইরূপ কাজ করিতে গিয়া অল্পকাল বালক ও যুবক নরহত্যা ও ডাকাতি করিতেছে; এবং প্রাণদণ্ডে, কারাবন্দে, ও নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে। ইহাতে অস্ত্রের প্রাণ ও সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে, তাহাদের নিজের জীবনও ব্যর্থ হইতেছে। অধিকন্তু, বিস্তর লোক সম্বেদভাজন হইয়া সন্ত্রাস হুগে ভোগ করিতেছে। আর একটি কথা; এই হইতেছে, যে, স্বদেশের অবশেষে প্রাদেশিক রাজত্বের স্থলে একটি অংশ হিংসামূলক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দমনে নিযুক্ত পুলিশ কর্মচারীদের বেতনাদি বাবতে ব্যয়িত হইতেছে। এই প্রচেষ্টা লুপ্ত হইলে এই টাকা শিকারিভায়ে, বাস্তবায়িত, কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতি প্রভৃতি কার্যে ব্যয়িত হইবার সম্ভাব্যতা সম্ভাবনা বটে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা থাকিলে সে সম্ভাবনাও নাই।

বাহ্যনীয় রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও

আর্থিক অবস্থা

পুলিশ এবং সন্ত্রাসের ব্যক্তি বহু পরিমাণে কম হইলে বর্তমান হিংসামূলক বৈপ্লবিক সন্ত্রাসিক কার্যাবলীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হইতে পারিবে। এইরূপ দাবি

স্বাদের প্রকার আমরা ইতিপূর্বে একাধিক বার তাহা প্রকাশ দিয়াছি। কিন্তু আমরা ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু আরও কিছু চাই। আমরা চাই, দেশের এরূপ রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, এবং আর্থিক ব্যবস্থা ও অবস্থা যাহা থাকার কনোহ ও বোঝেন উপনীত স্বাভাবিক হিসাবমূলক কার্য রিতে প্ররোচিতও হইবে না। এরূপ অবস্থা একদিনে আসা যায় না। তাহার জন্য সময় চাই, বুদ্ধিমত্তা সহকারে বিশ্রম করা চাই। সেরূপ পরিশ্রম করিতে হইলে ফল্যের আশাও চাই।

স্বাস্থ্যিক প্রচেষ্টার একটা প্রধান কারণ নৈরাশ্র। বয়েন্ট সরকারী ব্যবস্থা ও কার্য দ্বারা এই আশার উদ্বেক দূর, যে, দেশের যুবা বয়সের লোকদের সমুদয় শক্তি। পৌরুষ অহিংসার পথ দিয়াই উপযুক্ত কার্যক্ষেত্রে ইহা যেমন অন্ত সব সভ্যদেশের এই বয়সের লোকেরা ইয়া থাকে।

জামশেদপুরে বাঙালী

ইহা সত্য নহে, যে, জামশেদপুরে লোহা-ইস্পাতের কারখানা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে বাঙালীর অতি-প্রাধান্য ঘটিয়াছে, যদিও রাষ্ট্রপরিষদের (কৌন্সিল অব ইণ্ডিয়া) এক জন মুসলমান সদস্য দ্বিতীয়ত এই মর্মেণের দৃষ্টিকোণে বিতরণ করিয়াছেন, যে, জামশেদপুরে বাঙালীরাই একচেঁটা প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। কেমন করিয়া দিবসে? কারখানাটির মালিক, উহার অধিকাংশ অংশের মালিক, বাঙালীরা নহেন। বেশীর ভাগ অংশ বোম্বাই-জরাজীর্ণের প্রাধান্য স্থানোজার বাঙালী নহেন, আমেরিকান। জেডম্ জামশেদপুরে যত কাজ লেখানে পাইয়াছে, তাহা মালিকের জোরে আর, অধিকাংশ কাজ যদি বাঙালীরা পাইত, তাহা হইতেই বা অত্যাধিক হইত? রাজনৈতিক কারণে জামশেদপুর এখন বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকিলেও উহা বঙ্গের অংশ। বঙ্গের বাঙালীর প্রাধান্য কোন দিকেই থাকা কি অস্তায়?

বহুদূরত্ব রাজ্যের লোহার খনি হইতে লোহা আনিয়া এই কারখানা চলে। খনি আবিষ্কার করেন বর্মীয় প্রথমখনাথ হু। বর্মীয় জামশেদজি টাটা কারখানা অন্তর্য স্থাপন করিতে চান। বর্মী বর্মীর তাহাকে তথা ও যুদ্ধিক সহকারে প্রাধান্য সমর্থ হন, যে, বর্তমান জামশেদপুরেই উহা স্থাপন করা সমীচীন হইবে। জামশেদজি টাটা বর্মীর প্রথমবাবুর পরস্পর অঙ্গসঙ্গে কাজ করেন। বর্মীরা অসম্মত ও বাধা দিলে হইত। বর্মী কারখানার কার্যে অতিক্রম দ্রুত প্রাকৃতিক ভাবেই বর্মীরাই প্রথমকার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই

সময়ে বেঙ্গল টেরিটোরিয়াল ইন্সটিটিউটের শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েক জন বাঙালী যুবক ইহাতে কাজ করিতে যান।

গোড়া হইতেই, গোড়ার পূর্বে হইতেই, এই কারখানা সঙ্গে বাঙালীদের যোগ রহিয়াছে।

বাঙালীর প্রতি ঈর্ষা-বিদ্বেষ খুব বিস্তার লাভ করিতেছে যাহারা ঈর্ষা করে, বিদ্বেষ করে, তাহাদের পক্ষে ইহা ভাল নয়; ভারতীয় মহাজাতি গঠনের পক্ষেও ইহা ভাল নয়।

আমরা যদি বলি, বঙ্গের বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান এখন অতি সামান্য; উত্তরে স্থানিতে পাই, তোমরা অযোগ্য বলিয়াই যোগ্যতর লোকদের দ্বারা ঐ ক্ষেত্রে হইতে তাড়িত হইয়াছ। আমরা যদি বলি, বঙ্গের ব্যক্তিগত প্রধান স্থান বাঙালীর নাই; উত্তরে বলা হয়, তোমাদের যোগ্যত না-থাকায় তোমরা উহা দখল করিতে পার নাই। আমরা যদি বলি, বঙ্গের প্রধান পণ্যশিল্প পাটের কারখানা বাঙালী স্থান নগণ্য; উত্তর পাই পূর্ববৎ। যদি বলি, সৈন্তদে বাঙালীর স্থান নাই; উত্তর পাই, তোমরা অযোগ্য।

এই সমস্ত উত্তর সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও ইহা স্বীকার করা যায় না, যে, বাঙালী কোনও কাজের যোগ্য নহে, কোনও দিকেই তাহার যোগ্যতা নাই। সুতরাং জামশেদপুরে যতগুলি বাঙালী কাজ পাইয়াছে তাহারা অযোগ্যতার জোরেই বা অযোগ্যতা সবেও কাজ পাইয়াছে, ইহাও স্বীকার করা যায় না।

যদি ইহা সত্য হইত, যে, বাঙালীর জামশেদপুরে খুব বেশী পরিমাণে কাজ পাইয়াছে, তাহা কি একটা অসাধারণ দোষের বিষয় হইত? বাণিজ্যে কো কৌন জাতির প্রাধান্য ঘটিয়াছে, ব্যক্তিগত কাহারও কাহারও দিগ্ভায়ে, সৈন্তদে কাহারও কাহারও দিগ্ভায়ে তথাপি কেবল একটা শহরের একটা কারখানায় বাঙালীকে সত্য বা কল্পিত প্রাধান্য লোকদের চোখ টাটাইবার কার হইয়াছে!

বাঙালীদিগকেও শু বাভিরা ব্যক্তিগত হইলে যোগ্যতার দ্বারাও তাহারা কাজ পাইবে না? বাঙালীর যদি একেবারে নিঃশব্দ ও কম্পদকহীন হয়, তাহা হইলে বাহারা তাহাদের জগদ্ব্যমিতে ব্যবসায়াদি দ্বারা লাভবান হয়, সে-লাভের পথ কোথায় থাকিবে, তাহাও শু ভাবি দেখা উচিত।

কাশীতে বাঙালী, বালিকা-বিদ্যালয়

অগ্রো-অযোগ্য প্রদেশের মধ্যে শব্দসমূহ চেরে যে বাঙালী থাকেন করিতে। বাহা দেখানে প্রাধান্য

